শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

গৃহস্থ

মাসিক পত্র

চতুর্থ খণ্ড

(সন ১৩১৯ সালের কার্ত্তিক হইতে ১৩২০ সালের আশ্বিন পর্য্যন্ত)

প্রিণ্টার — শ্রীলালমোহন মল্লিক ও শ্রীক্ষেত্রনাথ কর।

ইণ্ডিয়া [illegible] — [illegible] নং মিডিল রোড্, ইটালি, কলিকাতা।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

১। আলোচনা

২। প্রবন্ধ

৩। মফঃস্বলের বাণী

৪। পরিশিষ্ট

বর্ণানুক্রমিক চিত্রসূচী

আলোচনা

প্রবন্ধ

পরিশিষ্ট

গৃহস্থের মূল্যাদির নিয়ম।

১। গৃহস্থের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য রাজসংস্করণ তিন টাকা ও সাধারণ সংস্করণ দুই টাকা। স্বতন্ত্র ডাক মাসুল দিতে হয় না।

২। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ছয় আনা।

৩। নমুনার জন্য ছয় আনার টিকিট পাঠাইলে, নমুনা পাঠান যায়।

৪। কার্ত্তিক মাস হইতে পর বৎসরের আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়। বর্ষের প্রথম হইতেই গ্রাহক হইতে হয়। যিনি যে বৎসর গ্রাহক হইবেন, মূল্য প্রাপ্তির পর সেই বৎসরের প্রথম হইতেই তাঁহাকে কাগজ পাঠান যাইবেক।

৫। কাগজ যাহাতে বাঙ্গালা মাসের প্রথম তারিখেই ডাকে পাঠান যাইতে পারে সেইরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, সুতরাং কোনও মাসের ৫ই তারিখের পূর্ব্বে কাগজ না পাইলে, গ্রাহক স্থানীয় ডাকঘরে ও আমাদিগকে জানাইবেন। তাহা না হইলে অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী হইব না। উহা গ্রাহককে চারি আনা মূল্যে ক্রয় করিতে হইবেক।

৬। কাহারও উত্তর পাইবার প্রয়োজন থাকিলে, রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে পত্র লিখিবেন অথবা পত্রমধ্যে উত্তর প্রেরণের জন্য অৰ্দ্ধ আনা ষ্ট্যাম্প পাঠাইবেন, নহিলে উত্তর দেওয়া হয় না।

৭। গৃহস্থের প্রয়োজনীয় বিষয়, বিশেষতঃ পরীক্ষিত মুষ্টিযোগাদি লিখিয়া পাঠাইলে, সাদরে গৃহীত ও প্রকাশিত হয়। প্রকাশার্থ প্রবন্ধ "গৃহস্থ-সম্পাদক" ২৪নং মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৮। লেখক, যদি প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে ফিরিয়া পাইতে চাহেন, তবে প্রবন্ধ মধ্যে নিজের ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন ও প্রতি-প্রেরণের জন্য টিকিট পাঠাইবেন। অমনোনীত প্রবন্ধ রাখা হয় না সুতরাং পরে চাহিলে দিতে পারা যাইবে না।

৯। মনোনীত প্রবন্ধ, প্রাপ্তি মাত্রই প্রকাশ করা সম্ভব নহে। যে গুলি মনোনীত হইবে তাহা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করা যাইবে।

১০। বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যাদির বিষয়, এই ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট লিখিলে জানিতে পারিবেন। সাধারণতঃ এই বিজ্ঞাপনের মত লম্বা, এক ইঞ্চ প্রস্থ বিজ্ঞাপন কেবল এক বারের জন্য এক টাকা। মূল্য অগ্রিম দেয়।

১১। পুরাতন গ্রাহক, পত্রিকা সম্বন্ধে কোনও সম্বাদ চাহিলে, নিজের গ্রাহক নম্বর দিবেন।

১২। দুই এক মাসের জন্য স্থানান্তরে যাইতে হইলে, স্থানীয় ডাকঘরেই ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিবেন, বেশী দিনের জন্য হইলে, যে মাস হইতে পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, তাহার পূর্ব্ব মাসের ২০এ তারিখের পূর্ব্বে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা কাগজ হারাইলে, আমরা দায়ী হইতে পারিব না।

বিনামূল্যে।

গৃহস্থের গ্রাহকগণ দুই পয়সার টিকিট পাঠাইলে, চল্লিশখানা স্বদেশী পোষ্টকার্ড বিনা মূল্যে পাইবেন।

শ্রীহরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
সহঃকার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীরাজরাখাল ঘোষ
ইণ্ডিয়া প্রেস ও "গৃহস্থের" স্বত্বাধিকারী।
২৪নং মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা।

আদর্শ গৃহস্থ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়

"ভারতবাসী 'জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়' বলিয়াছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না—পরজাতি বিদ্বেষ এবং পরজাতি পীড়ন তাঁহার স্বজাতি-বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অপর একটি মহামন্ত্র উচ্চারণ করিবেন—

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

India Press, Calcutta.

"যে দিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কামধর্ম্ম একত্রিত হইবে, সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে, তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না। তোমরা ভালবাসা, তোমরা করিলেই হইবে। দুইই তোমাদের হাতে। এখন ইচ্ছা করিলে তোমরাই পৃথিবীর কর্ত্তা ও নেতা হইতে পার। সে আশা যদি তোমাদের না থাকে তবে বৃথায় আমি বকিয়া মরিতেছি।"

বঙ্কিমচন্দ্র

৪র্থ খণ্ড
৪র্থ বর্ষ

বৈশাখ, ১৩২০

৭ম সংখ্যা

আলোচনা

১। ধর্ম্মের জয়

"আমাদের সমাজে এখন ভাবুকতার অভাব হইয়াছে। যে ভাবুকতায় লোকে ভবিষ্যতের মহতী সিদ্ধি ধ্যান করিয়া বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র স্বার্থগুলি ত্যাগ করিতে পারে, সামান্য আরম্ভের মধ্যে অন্তর্নিহিত সমগ্রতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাতেই সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করিতে উৎসাহিত হয়; যে ভাবুকতার অনুপ্রাণনায় বিদ্যাবান্ ব্যক্তি নিজের গৌরব বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভ উপেক্ষা করিয়া সমাজের সকল স্তরে বিদ্যা-প্রচারেই আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন,—স্বকীয় উচ্চতর শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা খর্ব্ব করিয়া দেশের জন্য শিক্ষা-লাভের সুবিধা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত জীবন অতিবাহিত করিতে সমর্থ হন; যে ভাবুকতায় ধনবান্ স্বয়ং উৎকর্ষ প্রকাশ করিয়া সমগ্র সমাজকে বিদ্যায়, ধনে, ধর্ম্মে উন্নীত করিবার জন্য সচেষ্ট হন, এবং ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়া জলদান, অন্নদান, ঔষধদান ও বিদ্যাদানের ব্যবস্থা দ্বারা ঐশ্বর্য্যের সার্থকতা

উপলব্ধি করিতে পারেন; যে ভাবুকতার প্রভাবে ভগবান যাহাকে যে শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী করিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন, তিনি সমাজ-সেবায় এবং সকল প্রকার দারিদ্র্য-মোচনে সেই শক্তির সম্পূর্ণ প্রয়োগকেই জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম মনে করেন;—সেইরূপ বৈরাগ্য-প্রসূতি ভাবুকতার বন্যা না আসিলে কোন দিন কোন সমাজে নূতন অবস্থার সংগঠন হয় না। যে ভাবুকতায় চিত্তের উন্মাদনা না হইয়া উৎপ্রেরণা হয়, যাহার ফলে শক্তি বিক্ষিপ্ত না হইয়া সংহত ও সংক্ষিপ্ত হয়, যাহার বশে সমাজ ও সংসারের উন্নতি বিধানের জন্য মানব স্থির-সংযতভাবে গৃহত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, আমাদের এখন সেইরূপ ভাবুকতাময় বৈরাগী ও সন্ন্যাসীর প্রয়োজন হইয়াছে।* যতদিন পর্য্যন্ত সাহিত্যালোচনা, বিজ্ঞান-চর্চ্চা এবং শিক্ষা-প্রচার সফলতার অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত না হয়; অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত এই সমুদয় কার্য্যে যোগদান করিয়া দেশের লোকেরা নিজেদের স্বার্থ, নিজেদের উন্নতি, নিজেদের পারিবারিক উপকার বিশেষরূপে সাধন করিতে না পারে; যতদিন পর্য্যন্ত জনসাধারণ এই সকল পন্থা অবলম্বন করিয়া সকল প্রকারে লাভবান্ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ঘোর নৈরাশ্য মাথায় রাখিয়া, সর্ব্বস্ব ক্ষতি স্বীকার করিয়া, অশেষ অকৃতকার্য্যতা সহিয়া এবং নিজ জীবনকে জলাঞ্জলি দিয়া ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য অগ্রগামী কর্ম্মীদিগকে একাকী নীরবে তপস্যা করিতে হইবে।"

বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতির জন্য একজন সাহিত্যসেবী বঙ্গসমাজে এইরূপ ভাবুকতা চাহিয়াছেন।

কথাটা বড় গভীর, কথাটা বড় কাজের, কিন্তু বোধ হয় এখনও ইহা বেশী লোকের কাণে গিয়া পৌঁছে নাই। আমাদের বিশ্বাস, আমরা যে যুগে রহিয়াছি তাহার পক্ষে ইহা চরম সত্য—শেষ কথা। এই বাক্যই আমাদের আধুনিক জন-সমাজের দীক্ষা-মন্ত্র হইয়া থাকিবে। এই উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিয়াই আমাদের বংশধরেরা জীবন গঠিত করিবে।

যে হিসাবে আমরা এতদিন ভাল-মন্দ বিচার করিতাম, আমরা এখন সে হিসাব ছাড়াইয়া উঠিয়াছি। সেই মাপকাঠিতে আর আমরা সন্তুষ্ট নহি। আমরা জাতীয় জীবনের উচ্চতর সোপানে পদার্পণ করিয়াছি। আমাদের দায়িত্ব বাড়িয়াছে—আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র বড় সহজ সরল নয়। আমাদের আদর্শপুরুষের হাব-ভাব, কাজ-কর্ম্ম, চিন্তা ও সাধন মামুলি ধরণের হইবে না।

তিনি জনসাধারণকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিবেন। সেই পূজার জন্য নিজকে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনা থাকিবে। তিনি সর্ব্বদা যে কোন সদুপায়ে সকলকে সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। উপযুক্ত সেবক হইবার জন্যই তাঁহার সকল শিক্ষা হইবে। তিনি হয়ত কোন এক শাস্ত্রে অশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু নগণ্য গ্রামের মধ্যে বাস করিয়া অনাথ, দরিদ্র ও রোগীর সেবা করিবার জন্য তাঁহার সকল উৎসাহ প্রদান করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না। যেখানে দেশের মঙ্গল

সেখানে তাঁহার নিজের প্রবৃত্তি বা সুযোগের কথা তাঁহার নিকট তুচ্ছ হইবে। সমাজের দশজনকে ভবিষ্যতে পণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য তিনি নিজের সর্ব্ববিধ উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিবেন। ধনবান্ হইয়া জন্মিলে তাঁহার কর্ম্ম আরম্ভ হইবে—ধনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া। তাঁহাকে লোকে খুঁজিবে না—তিনি তাঁহার দান দিবার জন্য সকলকে খুঁজিয়া বেড়াইবেন। তিনি নিজের প্রাপ্য বা অধিকারের কথা ভাবিবেন না। সর্ব্বদা দেয় ও কর্ত্তব্যের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি থাকিবে। তিনি সকল বিষয়ে নিজকে ছোট করিবেন—পরকে বড় করিবার জন্য। অনুন্নত লোককে যথাসম্ভব উন্নত করিয়া তুলিবার নিমিত্ত তাঁহার অধ্যবসায় প্রযুক্ত হইবে। এজন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র ও সুযোগ সৃষ্টিই তিনি তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম বিবেচনা করিবেন।

এইরূপ বৈরাগ্যের প্রভাবে গঠিত কর্ম্ম-বীরেরাই বর্ত্তমান যুগের ভার বহন করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহাদের আহ্বানেই সমাজ সাড়া দিবে। তাঁহাদের স্পর্শেই সাহিত্য জাগিবে, তাঁহাদের প্রচেষ্টায়ই শিল্প ফলপ্রসূ হইবে। তাঁহাদের জীবনেই ধর্ম্ম সজীবতা লাভ করিবে—তাঁহাদের কর্ম্মেই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে আন্তরিকতা আসিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাইলেই বা ওকালতীতে পশার হইলেই বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা জগৎকে চমকিত করিতে পারিলেই জননায়ক হইবার যোগ্যতা জন্মিবে না। যাহার তাহার ডাকে লোকে আর উত্তর দিবে না। এখন আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, ত্যাগের পরিচয়, সন্ন্যাসের সার্টিফিকেট না দেখাইতে পারিলে কর্ম্মক্ষেত্রে কেহ কিছু করিতে পারিবেন না। সমাজের কোন কাজে মেকী চালাইবার দিন আর নাই।

২। পারস্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম

বঙ্গদেশে চৈতন্যদেব ভক্তি ও প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া আপামর সাধারণকে প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন। পারশ্যদেশে সুফি-ধর্ম্ম সেইরূপ ধর্ম্মের সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ সাধন করিয়াছে। খৃষ্টের অষ্টম শতাব্দীতে পারশ্যদেশীয় কয়েকজন মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি এই ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন। আবু হাসিম ইহার প্রথম পথপ্রদর্শক। বুল-আন আলামিশ্রি, সুফি-ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বায়াজিদ মনসুর গাল হাজাজ—ইহাদের নাম এই ধর্ম্মের ইতিহাসে বিশেষ বিখ্যাত। প্রাচীন গ্রীসে প্লেটো একটা ভাবতন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া যান। পরবর্ত্তী কালে যাঁহারা নব প্লেটো-সম্প্রদায় আখ্যা লাভ করেন তাঁহারাই কোন কারণে পারশ্যদেশে আসিয়া প্লেটো-প্রতিষ্ঠিত ভাববাদের প্রচার করেন। ইউরোপীয়গণ বলেন যে ইহাতেই সুফি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। কিন্তু নবাগত পাশ্চাত্য ভাবুকদিগের নিকট সুফি-সম্প্রদায় কতক অংশে ঋণী হইলেও সুফি-সম্প্রদায় তাঁহাদের সৃষ্ট এ কথা স্বীকার করা চলে না।

সুফি-সম্প্রদায় ভগবানকে পরম প্রেমিক বলিয়া উপাসনা করেন। মানবমাত্রেই প্রেমের শক্তি অনুভব করিয়াছেন। সেই প্রেম স্থূল বিষয়ে আসক্তি জন্মাইয়া মলিন হইয়া যায়—কিন্তু মানবের স্বাভাবিক ভাব-

প্রবণতা মার্জ্জিত করিয়া লইলেই মানব প্রকৃত প্রেমের অধিকারী হইতে পারে। ইহাতে জাতিভেদ নাই, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দলাদলি নাই, বালক যুবা বৃদ্ধ নাই, কাল সাদা বলিয়া পার্থক্য নাই; সকলেই এই প্রেমের অধিকারী, এবং গুরু ব্যতিরেকে সকলেই পরম প্রেমিকের সঙ্গ-সুখ লাভ করিতে পারেন।

*
* *

৩। মুসলমান সম্বন্ধে ইংরাজী পত্রিকা

কলিকাতার 'ইংলিশম্যান' এবং বিলাতের সুবিখ্যাত 'পল্‌মল্‌ গেজেট' দুঃখের সহিত বলিয়াছেন "এইবার মুসলমানগণ হিন্দুদিগের সহিত যোগ দিতে বসিল। তাহারা স্বায়ত্ত-শাসন চাহিয়াছে—হিন্দুদিগের চরমপন্থিগণের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে!"

মজরুলহক সাহেবের কংগ্রেস-বক্তৃতার সমালোচনা উপলক্ষে তাঁহারা বলিয়াছেন মুসলমানগণের মধ্যে একটি বিশাল শক্তিশালী উদারনৈতিক দলের আবির্ভাব হইতেছে। তাঁহাদের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসমিতির সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে। এই মিলনের কারণ সম্বন্ধে ইংরাজ-সম্পাদকগণ ভাবিতেছেন, হয় ত ইতালী এবং বল্কানে খ্রীষ্টানদিগের দুর্ব্যবহারে মুসলমানগণ বিরক্ত হইয়াছে, এবং সেই জন্যই এইরূপ হিন্দু-প্রীতি দেখাইতেছে। তাঁহারা মনে করেন, এ সব গৌণ কারণ। ব্রিটিশ-শাসনের প্রতিই মুসলমানগণ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে, ইহাই তাঁহাদের মতে হিন্দু-মোস্‌লেম-প্রীতির মুখ্য কারণ।

৪। বল্কানে মুসলমান-নির্য্যাতন

কিছু কাল হইল লণ্ডন মুসলমান-লীগ্‌ ইংলণ্ডের বৈদেশিক বিভাগের আণ্ডার-সেক্রেটারীর নিকটে এক আবেদন পত্র-প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই—

"বল্কান সমরের সময়ে তুরস্কের যে সমস্ত মুসলমান সেনাবিভাগে প্রবেশ না করিয়া সাধারণ গৃহস্থভাবে শান্তির সহিত জীবন যাপন করিতেছিলেন, শত্রুপক্ষগণ তাঁহাদিগকে স্ত্রীপুরুষ যুবাবৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে নির্য্যাতন করিয়াছে। সভ্যজগৎ এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহা নিবারণ করিতে কোনরূপ প্রয়াস পান নাই। এক্ষণে সমস্ত সভ্যদেশের প্রতিনিধিগণের একটি বৈঠক আহ্বান করা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য। শান্ত নাগরিক এবং অসৈনিক ব্যক্তিবৃন্দের উপর খ্রীষ্টান সৈনিকেরা নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়াছে। সেই বৈঠকে তাহারই বিচার হৌক।"

মুসলমান-লীগ্‌ আধুনিক সভ্যজগতের অনুমোদিত সমর-নীতি অনুসারেই বিচার প্রার্থনা করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে, যুদ্ধের সময় দুই শত্রুপক্ষের কেবল মাত্র সৈনিকেরাই পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিতে পারে, কিন্তু কোন পক্ষের সাধারণ প্রজাপুঞ্জের উপর হাত তুলিবার অধিকার কোন সৈনিকেরই নাই। সকল লড়াই-ই উভয় পক্ষের সেনার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য।

৫। তিব্বত-প্রসঙ্গ

কিছু দিন হইল বিলাতী 'কনটেম্পরারি রিভিউ' পত্রিকায় জনেক ইংরাজ-লেখক একটি

প্রবন্ধে তিব্বত সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানাইয়াছেন। তিনি সরকারী কাগজপত্র এবং লাসার সংবাদ পত্রিকা পাঠে বুঝিয়াছেন, "চীন তিব্বতে তাহার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবান। সেই জন্য চীনারা নানা উপায়ে প্রচার করিতেছেন যে তিব্বত, নেপাল, সিকিম, ভূটান এ সমস্তই মঙ্গোলীয়দিগের দেশ, সুতরাং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির বন্ধন স্বাভাবিক। তাহারা নিজেদের স্বার্থ নিজেরাই বুঝে। বিদেশীয়গণের হস্তক্ষেপ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই—বিদেশীয়েরা মঙ্গোলীয়দিগের মধ্যে স্বাভাবিক প্রীতির ব্যাঘাত জন্মাইতেছে মাত্র। অতএব তাহাদিগকে বাধা দেওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সেই উদ্দেশ্যে তিব্বত ও নেপালের একত্রযোগে কর্ম্ম করা উচিত।"

"এইরূপে চীন ভূটানকেও উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে, এমন কি গুর্খাদিগের ব্রিটিশ রাজভক্তি যাহাতে ক্ষুণ্ণ হয়, তাহার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিতেছে না।"

"অতএব যাহাতে তিব্বতের দ্বারা নেপাল, ভূটান, সিকিম বিচলিত না হয়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এখন তাহার উপায় অবলম্বন করা উচিত। কারণ তাহা না করিলে ভারতবর্ষের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এ যাবৎ তিব্বত সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করেন নাই—কিন্তু সে উদার নীতি আর রক্ষা করা চলিবে না। তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষের শত্রুনিবারণের কথাই বেশী ভাবিতে হইবে।"

দেখা যাইতেছে—বিচক্ষণ ইংরাজেরা তিব্বতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন।

৬। চীনের কথা

চীনদেশে প্রধানতঃ পাঁচটি জাতির বাস। যাহাদিগকে চীনা বলি, তাহারা দেশের আদিম অধিবাসী নহে। কোথা হইতে তাহারা সর্ব্ব প্রথম আসে, বলা সুকঠিন। তবে এ কথা ঠিক—তাহারাই সর্ব্ব প্রথম দেশে সুশাসন-প্রণালী, কৃষিকার্য্য, রেশমপ্রস্তুতকরণ প্রভৃতির জ্ঞান আনয়ন করে। চুলের রং কালো ছিল বলিয়া অন্যান্য জাতি তাহাদিগকে 'কৃষ্ণকেশ' বলিয়া অভিহিত করিত। এই জাতি সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, শ্রমশীল এবং ব্যবসায়ী। রাজনীতি-বিদ্যায়ও এই জাতি অধিকতর অভিজ্ঞ।

দ্বিতীয় জাতি—মাঞ্চু বা পূর্ব্বতাতারী। ইহারা ১৬৪৩ খ্রীঃ অব্দ হইতে বিগত ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত চীনের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল। ইহাদের আক্রমণ ও অত্যাচারে চীনারা বহুদিন ধরিয়া বহু কষ্ট ভোগ করিয়াছে। ইহাদেরই জন্য চীনের সেই প্রসিদ্ধ প্রাচীর। ইহাদের জন্যই চীনের বিগত রাষ্ট্রবিপ্লব।

তৃতীয় জাতি—মঙ্গোলীয়গণ অথবা পশ্চিম-তাতারী। কুবলা খাঁর নেতৃত্বে ইহারা চীনদেশ জয় করে। পেকিন নগরে ইহাদের দ্বারাই প্রথম রাজধানী স্থাপিত হয়। কুবলা খাঁ বৌদ্ধধর্ম্ম বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার সময়ে এবং তাঁহার পরবর্ত্তী যুগে মঙ্গোলীয়গণের আনুকূল্যে বৌদ্ধধর্ম্ম চীনদেশে উন্নতি লাভ করে। মঙ্গোলীয়গন আশী বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিল। শেষে বিলাসিতা এবং নানা প্রকার দোষে ১৩৬৬ খ্রীঃ অব্দে চীনাদিগের দ্বারা সিংহাসন হইতে

বিতাড়িত হয়। এই সময় তাহারা পলাইয়া মাঞ্চুদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তথায় পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদান প্রদান করিতে থাকে।

চতুর্থ জাতি—তিব্বতীয়গণ। হিন্দুদিগের নিকটে যেমন কাশী, মুসলমানদিগের নিকটে যেমন মক্কা, খ্রীষ্টানদিগের নিকটে যেমন রোম, চীনাদিগের কাছেও লাসা তেমনি। এই খানেই বৌদ্ধধর্ম্মের শিরোমণি বড় লামা বাস করেন। অনুর্ব্বর তিব্বত দেশ সেই জন্যই চীনারা ছাড়িতে চায় না।

পঞ্চম জাতি—মুসলমান। যুদ্ধপ্রিয় বলিয়া চীনদেশে ইহারা খুব বিখ্যাত। মঙ্গোলীয়-গণের দ্বারা ইহাদের ভাগ্য বহুবার বিপর্য্যস্ত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন আরও বহু বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়, বিভিন্ন সমাজ চীনে বর্ত্তমান। সে গুলির বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক।

চীনের নবপ্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্রের পতাকায় পূর্ব্বোল্লিত পাঁচটি জাতির প্রতিনিধি-স্বরূপ পাঁচটি রং গ্রহণ করা হইয়াছে।

সর্ব্বোপরি লাল রং=আঠারটি প্রদেশের অধিবাসী চীনা

তারপর হলুদ রং=মাঞ্চুরিয়ার অধিবাসী মাঞ্চু বা পূর্ব্বতাতারী

তারপর নীল রং=মঙ্গোলীয় বা পশ্চিম-তাতারী

তারপর সাদা রং=তিব্বতীয়

তারপর কালো রং=মুসলমান

*
* *

৭। জাপানে চীনবাসী ছাত্র

জাপানে চীনবাসী ছাত্রদিগের জন্য ভিন্ন স্কুল আছে, চীন-গবর্ণমেণ্ট জাপান-গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া চীনা ছাত্রদিগের শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এমন কি জাপানে চীনা ছাত্রদিগের সংখ্যার এত বাহুল্য যে অন্য দেশীয় ছাত্রগণের তথায় বিশেষ স্থানাভাব হইয়া পড়িয়াছে।

১৯০৪ সালে প্রতিমাসে গড়ে ১০০ জন চীনা ছাত্র জাপানে পাঠান হয়। ১৯০৫ সালের জানুয়ারীতে ২৪০৬ হইতে ৮৬২০ জন বাড়িয়াছিল, নভেম্বরের শেষে, মাসে গড়ে প্রায় ৫০০ শতের বেশী ছাত্র জাপানে গিয়াছে। এক ১৯০৫ সালেই ৬২১৪ জন চীনা ছাত্র জাপানে যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চীন-গবর্ণমেণ্ট মাত্র দুইজন ছেলে জাপানে পাঠাইয়াছিলেন! অল্পদিনের মধ্যেই চীনদেশে কি বিপুল উন্নতি-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা ইহা হইতেই অনুমেয়। প্রায় ১০,০০০ হাজার চীনা ছাত্রের মধ্যে অর্দ্ধেকই চীন-গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত। ইহাদের শতকরা ২৮ জন ছাত্র টোকিওতে আছেন। এই সব ছাত্রের অধিকাংশই আইন, পুলিশের কার্য্য, সামরিক নৌবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করিতেছেন।

*

৮। ইউরোপের নূতন সমস্যা

এখন দেখিতেছি অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারী লইয়াই ইউরোপে গোল বাধিবে। অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারীতে কোন মতে জোড়াতালি দিয়া একটা রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন কোন রাষ্ট্রনীতি-বিশারদ বলিতেছেন—এই জোড়াতালি আর টিকান কঠিন। তাহাদের আশঙ্কা—এই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ শীঘ্রই খসিয়া পড়িবে।

আর খাস ইউরোপের বুকের উপর একটা ভাঙ্গাচুড়া আরম্ভ হইলে ভাঙ্গাগড়ার ঢেউ অনেক দূর গিয়া পঁহুছিবে। তুরস্কের রাজ্যে ভাগ বসান লইয়াই এতদিন ইউরোপে শান্তিভঙ্গের ভয় ছিল। এক অদ্ভুত ও অভাবনীয় উপায়ে তাহার মীমাংসা হইতে চলিয়াছে। তাহার জন্য ইউরোপের জাতিগুলির মধ্যে ভয় অনেকটা কমিয়া আসিতেছে। এখন তাঁহারা অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারীর অবস্থায়ই বড় ভীত হইয়াছেন। তাহার কারণ বলিতেছি।

অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারীকে নিতান্ত জোর করিয়া এক দেশ বলা যায়। কোন বিষয়েই এই রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য নাই। সকল লোকই রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মের উপাসক বটে। কিন্তু ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতিতে ধর্ম্মের দোহাই আর চলে না। আধুনিক জগতে ধর্ম্মমতে ঐক্য থাকিলেই রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে বন্ধুত্ব ও সদ্ভাব রক্ষিত হইবে এরূপ আশা নাই। অধিকন্তু, ভাষা, জাতি, সাহিত্য, সভ্যতা সকল বিষয়েই অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারীতে অসংখ্য অনৈক্য, বৈষম্য, পার্থক্য রহিয়াছে। বুদ্ধিবলে এই অনৈক্যগুলির সমন্বয় হইতে পারিত। ভিন্ন ভিন্ন বিজিত জাতিগুলিকে কমবেশী স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিলে রাষ্ট্রের ঐক্য কথঞ্চিৎ রক্ষা হইতে পারিত। কিন্তু উদার শাসননীতি অবলম্বন না করিয়া অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারীর কর্ত্তারা তাঁহাদের অনেক প্রজার বিরাগভাজন হইয়াছেন।

একটা দৃষ্টান্তে বুঝা যাইবে। এই রাষ্ট্রে সার্ভ-জাতির সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এই পরাধীন সার্ভ-বংশীয়গণের স্বজাতিরা স্বাধীনভাবে পার্শ্ববর্ত্তী সার্ভিয়া-রাজ্যে বাস করিতেছে। সার্ভিয়া-রাজ্য বুল্গেরিয়ার সঙ্গে মিলিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে। যুদ্ধের ফলে সার্ভিয়া-রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে—সমুদ্রের কূলে এই রাজ্য একটা বন্দর লাভের প্রয়াস করিতেছে।

এইখানে অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারীর সঙ্গে সার্ভিয়ার মনোমালিন্য উপস্থিত। অষ্ট্রীয়ার সার্ভজাতীয় প্রজাপুঞ্জ রক্তের টানে স্বাধীন সার্ভিয়ার দিকেই ঝুঁকিয়াছে। কাজেই অষ্ট্রীয়া তাহার সার্ভ প্রজাদিগকে যথাসম্ভব নির্য্যাতিত করিতেছে। ফলে স্বাধীন সার্ভিয়ার সঙ্গে ইহারা শীঘ্রই যোগ দিবে—বড় একটা সার্ভিয়া-রাজ্য গড়িয়া উঠিবে। তাহার উপর হাঙ্গারী প্রদেশের সঙ্গে অষ্ট্রীয়া-রাজ্যের প্রকৃত বিরোধ ত চিরকালই আছে।

এই অবস্থায় অষ্ট্রীয়ার মধ্যে মহা অশান্তি বিরাজ করিবে—তাহা অতি স্বাভাবিক। ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের লোক লইয়া তাঁহাকে বসবাস করিতে হইতেছে অথচ তাহাদিগকে তোয়াজ করিয়া যথাসম্ভব সন্তুষ্ট রাখিতে তিনি অসমর্থ। কারণ অষ্ট্রীয়াতে জার্ম্মাণেরা বিজেতা জাতি, জার্ম্মাণদিগের সঙ্গে সার্ভ বা অন্যান্য জাতির সমান অধিকার দিতে তাঁহারা বড়ই কুণ্ঠিত। কাজেই ভিতরকার গোলমাল মিটান বড়ই দুরূহ ব্যাপার। এদিকে রাজ্যে সেনাবলের যথেষ্ট অভাব। সৈনিক বিভাগে উপযুক্ত লোক নাই—সমর শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা নাই। অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারীর যুদ্ধ করিবার একেবারেই কোন ক্ষমতা নাই। বিচক্ষণেরা তাঁহার ধাপ্পায় ভয় পাইবেন না।

অতএব দেখা যাইতেছে অষ্ট্রীয়ায় সার্ভিয়ায়

গোল বাধিতে বড় বেশী দিন লাগিবে না। তাহা হইলে অষ্ট্রীয়ার বিজেতা জার্ম্মাণ-জাতি আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইবেন। তখন ইউরোপের ঘর সামলাইতে অতিশয় বেগ পাইতে হইবে।

এই সব বুঝিয়া শুনিয়া অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এখন হইতেই অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারীর একটা রফা করিবার পরামর্শ দিতেছেন।

*
* *

৯। প্রাচ্য চিত্রকলা-প্রদর্শনী

আমাদের শিল্প নষ্ট হইয়াছে, বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে, ব্যবসায় নষ্ট হইয়াছে। আমরা সকল প্রকার কলাবিদ্যা ভুলিয়াছি। আজ কাল আমাদের ধন নাই, ঐশ্বর্য্য নাই, সুখ নাই, সম্পদ নাই। এখন জীবন নিরানন্দময়, সংসার অন্ধকারময়। সমাজে সঙ্গীতের আদর নাই —শিল্প-নৈপুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা নাই। কারু-কার্য্য এখন অবহেলার সামগ্রী হইয়াছে। লেখা-পড়া কেবলমাত্র পুঁথি মুখস্থ করায় পর্য্য-বসিত হইয়াছে। ক্রীড়া-কৌতুক, আমোদ-প্রমোদ, উল্লাস-উচ্ছ্বাস—এই সকল জীবন-বত্তার লক্ষণগুলি দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। ভারতের সরস্বতী এখন মলিন ও শীর্ণকায়। বাগ্‌দেবীর অঙ্গে কোন আভরণ নাই—বীণাপাণির বীণায় ঝঙ্কার নাই। সঙ্গীত ও সাহিত্যের জননী এখন সঙ্গীতহীনা।

সুখের কথা—নানা দিক হইতে আমাদের এই সর্ব্বতোমুখী অবসাদ দূর করিবার আয়োজন চলিতেছে। আমাদের স্বাধীন চিন্তা নানা দিক্ দিয়া কাটিয়া বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের জাতীয় জীবন নানা ধারায় প্রবাহিত হইয়া নানা উপায়ে জন্ম-ভূমিকে সুশ্রী ও সহাস্যবদনা করিতেছে। গত ফাল্গুন মাসের কলিকাতার ধর্ম্ম-সমবায়-কোম্পানী-নির্ম্মিত হিন্দুস্থান-বীমা-সমিতির বিশাল ভবনে অনুষ্ঠিত প্রাচ্য চিত্রকলার প্রদর্শনী দেখিয়া আমাদের মনে আশার উদ্রেক হইয়াছে। আমাদের জীবনীশক্তির প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইবার কারণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে।

এই প্রদর্শনীতে সর্ব্বসমেত আঠার জন চিত্রকরের কার্য্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। কয়েক জন নূতন লোকের নাম দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। বুঝা গেল চিত্র-বিদ্যা আমাদের সমাজে ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে। নবীন শিল্পিগণকে এই প্রদর্শনীতে স্থান দিয়া অনুষ্ঠাতারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। কয়েকটি চিত্র সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দে বাঙ্গালীর জিনিষ-গুলি ও হিন্দুর সুপরিচিত সামগ্রী লইয়া চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তাঁহার 'তুলসী গাছ'টি সকল হিন্দুর মনেই ধর্ম্মভাব জাগরিত করিবে। তুলসী-মঞ্চের চারিদিকে একটা ভক্তি ও শ্রদ্ধা যেন মাখান আছে, ইহাতে তরুণ শিল্পীর প্রতিভা কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করের 'বাল্মীকির তপস্যা' এবং 'ননিচোরা' হিন্দু ইতিহাসের দুইটি চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা-দের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই—কবিত্বের কোন পরিচয় পাইলাম না। তবে বাল্মীকির ধ্যাননিমীলিত লোচন দুইটি অতি সুন্দর হইয়াছে। 'ননিচোরা'-চিত্রে বাঙ্গালী শিশুগণ

নন্দলালের 'গোকাল-ব্রত'

India Press, Calc

প্রীত হইবে—একটু স্বাভাবিকতা আছে। কর মহাশয়ের 'সরস্বতী' সকলেরই মন মুগ্ধ করিবে। এরূপ 'কুন্দেন্দুধবলা'র চিত্র বোধ হয় আর কখনও কেহ দেখে নাই। কিন্তু ফুলগুলি আকাশে কেন ঝুলিতেছে? শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আদর্শ রাধিকা'-কল্পনাটি বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে গৃহীত। শিল্পীর রচনাও আদৃত হইবার যোগ্য। কিন্তু তাঁহার 'প্রথম দর্শন' চিত্রে রমণীর পাশ-বালিশের মত পাগুলি অতি কদাকার হইয়াছে। যে কোন দর্শকের মনেই বীভৎস রসের সঞ্চার হইবে। বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চের নক্সা করিয়া ঠাকুর মহাশয় কতকগুলি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এইগুলি দেখিয়া সকলেই প্রীত হইবেন—নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

১০। নন্দলালের প্রতিভা

সুনিপুণ নন্দলালের 'গোকাল-ব্রত' চিত্রটি অতি মনোরম হইয়াছে। কি বিষয়-নির্ব্বাচন, কি সূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশ, কি চিত্রিত বিষয়ের অন্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা—সকল দিক্ হইতেই এই অঙ্কনটি অতি উচ্চ শ্রেণীর কারু-কার্য্য হইয়াছে। বঙ্গের গ্রাম্য জীবনে হিন্দুর পারিবারিক কার্য্যকলাপের মধ্যে গোকাল-ব্রত অনুষ্ঠানটিই কবিত্বময়—হৃদয়ের প্রসার-বর্দ্ধক। বৈশাখ মাসে হিন্দু বালিকারা দুর্ব্বা-চন্দন দ্বারা গরুর পূজা করিয়া থাকে। একটি বালিকা হাতে পূজার সামগ্রী ধরিয়া গরুর সম্মুখে বসিয়া আছে, গরুর ঢুঁ মারিবার ভয়ে বালিকা ভীত হইতেছে—অথচ বসিয়াই আছে। এই বিষয় লইয়া কবি চিত্রে যে সূক্ষ্ম ভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই চিত্রের নকল চিত্র বিরাজ করুক। দেশের জাতীয় অনুষ্ঠানগুলি নবজীবন লাভ করিবে—সন্তান-সন্ততিরা চিত্রে জাতীয় জীবন আস্বাদন করিতে শিখিবে।

নন্দলালের 'রামায়ণী চিত্রগুলি' এবারও প্রদর্শিত হইয়াছিল। এইগুলি আমাদের জাতীয় সম্পদ। কবি আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজের প্রধান প্রধান স্মরণীয় ঘটনাগুলিকে হিন্দুর আদর্শে চিত্রিত করিয়া সমগ্র জাতিকে ঋণে আবদ্ধ করিলেন। তিনি অবতার রামচন্দ্রের চরিত্র প্রত্যেকটি চিত্রে অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত ফুটাইতে সমর্থ হইয়াছেন। বীরবর, ত্যাগিশ্রেষ্ঠ, নবযুগের প্রবর্ত্তক রামচন্দ্র হিন্দু চিত্রকরের ভক্তিপূর্ণ চিত্তে সত্য সত্যই প্রতি-বিম্বিত হইয়াছেন। চিত্রকরের ধ্যান করিবার ক্ষমতা আছে, আধ্যাত্মিক বিষয় বুঝিবার প্রবৃত্তি আছে, আধ্যাত্মিক ভাব ফুটাইবার শক্তি আছে, হিন্দুর জাতীয় ইতিহাসে তাঁহার দখল আছে। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রারম্ভ কালে নন্দলালের অভ্যুদয়ে সাতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি।

১১। অতুলকৃষ্ণের কালীমূর্ত্তি

তার পর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'কালী-মূর্ত্তি'। 'গোকাল-ব্রত' এবং 'কালী'—এই দুইটি চিত্রই এবারকার প্রদর্শনীতে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য। অতুলকৃষ্ণের চিত্রে ভয়ঙ্করা কালীর তাণ্ডবনৃত্যে সমগ্র মেদিনী যেন কাঁপিতেছে। চিত্র দেখিয়াই মনে হয়,

বিশ্ব ভরিয়া আলোড়ন হইতেছে—ত্রিভুবনের মধ্যে এক বিরাট্ শক্তির কার্য্য চলিতেছে। এইরূপ ভাব মনে জাগান যে সে শিল্পীর সাধ্য নয়। মূর্ত্তিটির পশ্চাৎভাগে এক অসীম শূন্য বিরাজমান। তাহাতে গাম্ভীর্য্য বাড়িয়াছে, চিত্তে অপরূপ ভাবুকতার সঞ্চার হইতেছে। কালী-মূর্ত্তি অনেক দেখিয়াছি—কিন্তু এরূপ সংহারকর্ত্রীর চিত্র এই প্রথম দেখিলাম। ভয়ঙ্কর-রসে কবির হাত আছে। কঠোরতার সৌন্দর্য্য, কষ্টের মাধুরী, শ্মশানের নিবিড় আনন্দ, বিনাশের অমৃত—চিত্রকর আস্বাদ করিয়াছেন। তাঁহার চিত্রে দর্শকেরাও প্রলয়ের অনন্ত সুখ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

অতুলকৃষ্ণের 'কালিয়-দমন'-চিত্রেও ভয়ঙ্কর রসেরই অবতারণা হইয়াছে বটে। কিন্তু তিনি সুষ্ঠুরূপে তেজস্বিতা ও শক্তির ক্রিয়া ফুটাইতে পারেন নাই।

যাহা হউক, অতুলকৃষ্ণ যে সকল বিষয়ে হাত দিয়াছেন তাহা দেখিয়া আশা হয়। মামুলি প্রেমের জগৎ, হা-হুতাশের জগৎ ছাড়াইয়া আমরা দিন দিন কত দূরে সরিয়া আসিতেছি—সাহিত্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্রেও তাহার প্রমাণ পাইয়া বুক আশায় ভরিয়া গেল।

আমাদের জাতীয় জীবনে গাম্ভীর্য্য আসিয়াছে। বিশ্বের গূঢ় তত্ত্বগুলি এবং জগতের সমস্যাসমূহ গভীর ভাবে বুঝিবার জন্য আমাদের প্রয়াস হইতেছে। ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ-স্বীকার, কঠোরতা, নির্ভীকতা, বৈরাগ্য, সাধনা, ভক্তি—এই সকল ভাব লইয়া আমরা কাব্য রচনা করিতেছি, সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছি, চিত্র আঁকিতেছি, মূর্ত্তি গড়িতেছি। বাঙ্গালী বাজে কথায়—ফাঁকা আওয়াজে—নিরর্থক বাক্‌বিতণ্ডায় সময় ব্যয় করিবে না, ইহাই তাহার পরিচয় ও পূর্ব্বাভাষ।

*
* *

১২। চিত্র-সমালোচনা

শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে মহাশয়ের 'পলাতক'-চিত্রে ভয়-বিহ্বল বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তির অবস্থা অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার আরও চারি পাঁচটি রচনা প্রদর্শিত হইয়াছে—সকল গুলিতে ভাব প্রকাশ করিবার প্রয়াস আছে, কিন্তু সফলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে 'জন্মাষ্টমী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত দুর্গেশ-চন্দ্র সিংহের 'সান্ধ্য মেঘ' চিত্রণে নৈপুণ্য আছে। তাঁহার 'শিব-পূজা'য় সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু পূজার স্থান-নির্ব্বাচনটি তত সুবিধাজনক হয় নাই। তাঁহার 'ভগ্ন মুকুর' চিত্রে কোন বিশেষত্ব নাই। ইনি নানা বিষয়ে হাত দিয়াছেন—কোন্ বিষয়ে ঠেকিবেন বুঝা যাইতেছে না। কোন দিকেই সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ দেখিলাম না। তবে হাতের সাফাই আছে, রং ফলাইবার ক্ষমতা আছে। তিনি বাহ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু মানবচিত্তের নিগূঢ় চিন্তারাশি লইয়া তাঁহার খেলিবার শক্তি নাই।

শ্রীযুক্ত বেঙ্কটাপ্পা মান্দ্রাজী চিত্রকর। তাঁহার কেবল একটিমাত্র রচনা প্রদর্শিত হইয়াছে। রামচন্দ্র নিদ্রিত, ধরিত্রী রামচন্দ্রকে পাদুকা উপহার দিতেছেন—সীতা তাহা গ্রহণ করিতেছেন। এই চিত্রে রামচন্দ্রের বৈরাগ্য ও অনাসক্তি বেশ ফুটিয়াছে, কিন্তু

রমণীদ্বয়ের অঙ্কনে কবি বিশেষত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তবে সীতা দেবীর ভক্তিভাবে উপহার-গ্রহণ বেশ চিত্রিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনারায়ণ দত্তের 'তারামূর্ত্তি'তে রং ফলাইবার ক্ষমতা দেখিলাম—চণ্ডী দেবীর ঈষৎ আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু অতুল কৃষ্ণের 'কালী'র কাছে এই 'তারামূর্ত্তি' নিষ্প্রভ।

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকটি চিত্র পাঠাইয়াছেন। কোন কোন বাঙ্গালা কবিতাকে চিত্রে ফুটাইবার প্রয়াস দেখিতে পাইলাম। কিন্তু চিত্রগুলি দেখিয়া কোন রসবোধ হয় না। কয়েকটি চিত্রের নীচে কবিতার দুই-এক পংক্তি লেখা আছে, তাহাতেও চিত্র বুঝিবার বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় না। 'সান্ধ্যপ্রদীপ'-চিত্রটি ভালই বুঝা যায়, কিন্তু বুঝাইবার জন্য চিত্রকর যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সার্থকতা পাই না। আর একটি চিত্র অঙ্কন করিয়া ঠাকুর মহাশয় একজন ডাকওয়ালার গানকে স্থায়ী আকারে ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে কবির মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে। দুইটি লোক নির্জ্জন পার্ব্বত্য দেশের পথ বহিয়া চলিতেছে—চারিদিকে সুদূরবিস্তৃত প্রান্তর। এই দুইটি পথিকের পশ্চাদ্ভাগ জনপ্রাণীশূন্য—আড়ম্বরশূন্য—বিশাল ও বিস্তীর্ণ। এই ব্যাকগ্রাউণ্ডের প্রভাবে অনন্তের পথে যাত্রা—কোন এক দূর জগতের বার্ত্তা—কোন অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইতেছে। দর্শক মাত্রেই ব্যাখ্যা ব্যতীত পথিকদ্বয়ের এই অনুসন্ধানের প্রয়াস বুঝিতে পারিবেন। 'পাণ্ডবগণের পলায়নে' বিশেষ কিছু পাইলাম না। তবে পলায়নের অবস্থাটা মন্দ চিত্রিত হয় নাই। মুকুল-চন্দ্রের 'পলাতকে'ও আমরা এই শক্তি দেখিয়াছি।

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের 'যমুনা-জলে'-চিত্রে নয়ন রঞ্জনই হয় না। তবে তাঁহার 'রোগী' এবং 'গোপিনী' এই দুইটি চিত্রে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা জীবন্তরূপে ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা দেখা যায়। বিহারী চিত্রকর শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদের 'রাগিণী মেঘ মল্লার' চিত্রে মৌলিকতা নাই—কিন্তু কারুকার্য্যটি মন্দ হয় নাই। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র-নাথ মজুমদারের সাতটি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাঁর আলোচ্য জগৎ এখনও অতি বিস্তীর্ণ—কোনও এক বিষয়ের জন্য সাধনা করিলে সফলকাম হইতে পারিবেন আশা করা যায়। তাঁহার 'হর-পার্ব্বতী' না ধরাই উচিত ছিল। প্রায় চিত্রেই তথাকথিত ভারতীয় চিত্রকলার বিসদৃশ অঙ্গুলি এবং অঙ্গের সৌষ্ঠবহীনতা বর্ত্তমান আমরা অন্যান্য যে সকল চিত্রের কবিত্ব উপভোগ করিয়াছি, তাহার মধ্যে এইরূপ অস্বাভাবিকতা বা বৈসাদৃশ্যের প্রভাব পাই নাই।

আর একজন বিহারী শিল্পী শ্রীযুক্ত নারায়ণ প্রসাদ কয়েকটি চিত্র দিয়াছেন। তাঁহার 'হর-গৌরী' অতি সুন্দর হইয়াছে। গৌরীর কোলে গণেশ শুইয়া আছে। গৌরীর চক্ষু মুদ্রিত, গণেশের চোখ খোলা। গণেশের শয়ন চিত্র অতিশয় মনোহারী হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হাকিম খাঁ মহাশয়ের দুইটি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। দুইটিই অত্যধিক মূল্যে বিক্রয় হইবে—কিন্তু কোনটিরই বিশেষত্ব

খুঁজিয়া পাইলাম না। একটি চিত্রে দিল্লীর রাস্তা দিয়া বন্দী দারাকে লইয়া যাওয়া হইতেছে। প্রকাণ্ড দুর্গের একেবারে নিকটে দারার হাতী আসিয়া উপস্থিত। তাহাতে বিষয়টা বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় ঘটিয়াছে। এই দুইটি পদার্থ ব্যতীত আর কোন জন-প্রাণী চিত্রের মধ্যে আছে কি না দেখিবার অসুবিধা হইতেছে—তাহাদের অস্তিত্বের কোন প্রভাব চিত্রের উপর পড়িতে পায় না। বিশাল অট্টালিকা ও বিশাল হস্তী—এই দুই বৃহৎ চিত্রের চাপে পড়িয়া চক্ষুও নির্য্যাতিত হইতেছে, চিত্তের দুয়ারও অবরুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। তাহার উপর, চিত্রকর দারার মানসিক অবস্থা বুঝাইবার কোন প্রয়াস পান নাই।

১৩। অর্দ্ধেন্দ্রকুমারের মৌলিকতা

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী এবার কালী-মূর্ত্তিতে হাত দিয়াছেন। তিনি শাস্ত্র-বচনের সঙ্গে মিলাইয়া চিত্র আঁকিয়াছেন। ধ্যানগুলি বুঝিবার জন্য তাঁহার যত্ন আছে—হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিয়া তিনি চিত্রে ধর্ম্ম-তত্ত্বগুলি ফুটাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহার পন্থা অনুসরণ না করিলে হিন্দুর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে কোন চিত্রকর সমর্থ হইবেন না। যে সকল কবি ও শিল্পী হিন্দুর দেবদেবী লইয়া ব্যাপৃত আছেন তাঁহাদের আর গতি নাই। অলীক ও মন-গড়া ভাবুকতার দ্বারা হিন্দুর জাতীয় ধর্ম্মের বিন্যাসগুলি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। গাঙ্গুলী মহাশয় চিত্রবিদ্যার সঙ্গে শাস্ত্র-চর্চ্চা যোগ করিয়াছেন দেখিয়া আশার উদ্রেক হয়।

তাঁহার চিত্রাঙ্কনেও ক্ষমতা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। গত বৎসরে প্রদর্শিত তাঁহার 'চৈতন্য' আমাদের মনে আছে। এবারকার কালীমূর্ত্তিটিও প্রদর্শনীর একটি বিশেষত্ব। তিনি অতুলকৃষ্ণের ন্যায় সমগ্র বিশ্বে প্রলয়ের সঙ্গীত ও নৃত্য দেখাইতে প্রয়াসী হন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য—কালীর আকৃতি-গত স্বরূপটি প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি এ বিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অতুলকৃষ্ণের চিত্রে পারিপার্শ্বিক পরিকল্পনার মধ্যে কালীর সংহার-মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। অর্দ্ধেন্দ্রকুমার কালীর বিকট মূর্ত্তিরই আরাধনা করিয়াছেন—জগতের অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে কালীর যোগ রাখেন নাই। অতুলকৃষ্ণে ধ্বংসের ছবি—প্রলয়ের চিত্র দেখিতে পাই। অর্দ্ধেন্দ্রকুমারে কালীর ব্যক্তিগত রূপ, স্বকীয় বিশেষত্বই প্রকটিত হইয়াছে। তিনি যে ধ্যানটিকে মূর্ত্তি দিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

'কালী কপালাভরণা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী
বিচিত্রা খট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনাভীষণা
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা ॥'

এই বিবরণের বিকট মূর্ত্তিটি অর্দ্ধেন্দ্রকুমারের চিত্রে অতি দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। সাধারণের দৃষ্টিতে এই 'সাঁওতালী' কালী অতি কদাকার ও বিশ্রী বোধ হইবে। কিন্তু যিনি ভাবুক তিনি বুঝিবেন ইহার মধ্যে সুষমা আছে। কবি এই রাক্ষসী মূর্ত্তির মধ্যে যে সৌন্দর্য্য ঢালিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করের

'সরস্বতী'

India Press, Calcutta

সকলকেই তাঁহার স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিকতার প্রশংসা করিতে হইবে। 'অতিবিস্তার-বদনা'র লাবণ্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া তিনি আমাদের চিত্রকর-জগতে নূতন কলার খনি—অভিনব সৌন্দর্য্যের আকর—আবিষ্কার করিয়া দিলেন। তাঁহার কৃতকার্য্যতায় মামুলি সৌষ্ঠবের পথ ছাড়িয়া বিভীষিকার গরিমা দেখাইতে অনেক শিল্পীই অগ্রসর হইবেন। ভারতীয় কলার ইতিহাসে অর্দ্ধেন্দ্রকুমার একটা নূতন অধ্যায় খুলিবার সূত্রপাত করিলেন।

*
* *

১৪। চিত্র-প্রদর্শনীর সার্থকতা

এবারকার প্রদর্শিত চিত্রগুলি দেখিতে দেখিতে কয়েকটা সাধারণ কথা মনে আসিয়াছে।

প্রথমতঃ, বঙ্গে বিদ্যার জগতে—কলার সংসারে—সাহিত্যক্ষেত্রে পরানুবাদ ও পরানুকরণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। স্বাধীনভাবে নিজস্ব দান করিবার জন্য শিল্পী, কবি, লেখক, চিত্রকর নিজ নিজ হাতিয়ার ধরিয়াছেন। সকল দিকে ব্যক্তিত্ব, মৌলিকতা, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনচিন্তা আধিপত্য লাভ করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালীরা বাঙ্গালার নদ-নদী, জীব-জন্তু, উৎসব-আমোদ সম্বন্ধেই চিত্র আঁকিতেছেন, গান গাহিতেছেন, কাব্য লিখিতেছেন। বঙ্গে ভারতবর্ষের সামগ্রীগুলি—হিন্দুর ঐতিহাসিক ঘটনা সকল এবং জাতীয় জীবনের বিচিত্র অনুষ্ঠানসমূহ—শিল্প, কলা ও সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় হইতেছে। চিত্রের ভিতর দিয়া, কাব্যের ভিতর দিয়া আমরা আমাদের স্বদেশকে চিনিতে আরম্ভ করিয়াছি—স্বসমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে শিখিতেছি। তৃতীয়তঃ, এই সকল শিল্পকলা অবলম্বন করিয়া আমরা ভারতের বিশেষত্বসমূহ—আমাদের জাতীয় জীবনের স্বতন্ত্র আদর্শগুলি—আমাদের ইতিহাসগত পার্থক্যই প্রকাশিত করিতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব, আধুনিক ইউরোপীয় জীবনের আদর্শ, বিদেশীয় জাতীয়তার আধিপত্য আমরা ক্রমশঃ ছাড়াইয়া উঠিতেছি। আমাদের চিত্রে, সাহিত্যে, নানাবিধ কলার অনুষ্ঠানে, হিন্দুত্ব—হিন্দুজীবনের সনাতন আদর্শ—ভারতবাসীর স্বাভাবিক লক্ষ্য ফুটিয়া উঠিতেছে। আদর্শের দাসত্ব—লক্ষ্যের দাসত্ব—সাধনার দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া আমরা আমাদের স্বধর্ম্ম খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের যে লক্ষ্য—আমাদের পুরাতত্ত্ব-সংগ্রহের যে উদ্দেশ্য—সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই আমাদের চিত্রকরেরা তুলি, রং ও পেন্সিলের সাহায্যে সাধারণের গোচর করিতেছেন।

চতুর্থতঃ, বিদেশীয় কলা-জগতে সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবার যে সকল রীতি আছে, তাহাও আমাদের শিল্পিগণ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন। পারশ্য কবিদিগের রং ফলাইবার ক্ষমতা, আমাদের চিত্রকরগণ নিজস্ব করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। পুরাতন মোগল শিল্পীদিগের নিকট আমাদের চিত্রকরেরা বাস্তব জগতের বিবিধ বস্তু অতি স্পষ্ট ও বিশদরূপে চিত্রিত করিবার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছেন। আধুনিক জাপানীরা কলাজগতে এক অভিনব সৌন্দর্য্যের, অতি সূক্ষ্ম সুষমার অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের হাত-সাফাই ও সহজসুলভ ভাবপ্রকাশের ক্ষমতাও আমাদের

চিত্রজগতে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এতদ্ব্যতীত, ইউরোপীয় রোমান্ ক্যাথলিক-যুগের ধর্ম্ম-প্রাণ ভাবুক কবিগণ চিত্রে ও কারুকার্য্যে এক আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্মপ্রবণতা ফুটাইয়াছিলেন। আমাদের শিল্পীরা এই আধ্যাত্মিক ভাব ফুটাইবার ক্ষমতা লাভ করিতেছেন। চিত্রের নিগূঢ় রহস্যগুলি উদ্ঘাটন করিবার যোগ্যতা আমাদের কলা-জগতেও আধিপত্য লাভ করিতেছে। সুতরাং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কলাজগতের শ্রেষ্ঠ টেক-নিক্‌গুলি আমাদের নিজস্ব হইয়া যাইতেছে। অতীত ও বর্ত্তমান যুগের শিল্পচাতুর্য্যসমূহ এবং সৌন্দর্য্য ফলাইবার কায়দা সকল আমাদের বঙ্গীয় চিত্রজগতে স্থান পাইতেছে। বিদেশের নিকট, অতীতের নিকট যাহা যাহা গ্রহণীয়, সকলই আমরা উদারভাবে গ্রহণ করিতে শিখিতেছি। এই উপায়ে আকৃতির লাবণ্যে নজর পড়িতেছে, বাহ্য সৌষ্ঠব পুষ্ট হইতেছে, কলানৈপুণ্য বাড়িতেছে। ফলতঃ, আমাদের সুকুমার শিল্পগুলি সম্পদ লাভ করিতেছে। জাতীয় কলা ঐশ্বর্য্যশালী হইতেছে।

অতএব দেখা গেল যতগুলি উপকরণ থাকিলে স্বতন্ত্র জাতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব পরিপুষ্ট হয়, সকলগুলিই বঙ্গীয় কলাজগতে আসিয়া জুটিয়াছে। গত ছয় বৎসর ধরিয়া প্রাচ্য শিল্পের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রদর্শনীগুলি উত্তরোত্তর আমাদের এই ধারণাই বদ্ধমূল করিতেছে।

১৫। ভারতীয় চিত্রকলার আদর্শ

আমরা বলিলাম জাতীয় উন্নতির সর্ব্ববিধ উপাদান আমাদের চিত্র-জগতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই সময়ে আমাদের জীবনের লক্ষ্য, ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ, আমাদের জাতীয়তার মূলমন্ত্রগুলি আরও গভীরভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। আমাদের শিল্পি-গণকে ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব, শিল্প-শাস্ত্র বিশেষরূপে শিখাইবার আয়োজন করা কর্ত্তব্য। হিন্দুত্ব বুঝিবার জন্য যথোচিত আয়াস স্বীকার আবশ্যক, সাধনা আবশ্যক। আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে কাব্য, সাহিত্য ও দর্শনবাদের অভ্যন্তরে কিছু ভাবুকতা প্রবিষ্ট হইয়াছে। সেই ভাবুকতায় কথঞ্চিৎ তরলী-কৃত হিন্দুত্বের আভাস পাওয়া যায়, উপনিষৎ-বেদান্তের ক্ষীণ উপদেশ শুনা যায়। সেইটুকু কোন মতে আওড়াইতে পারিলেই হিন্দুর মূল-মন্ত্র বুঝিতে পারা যাইবে না। কারলাইল, এমার্সন, টলষ্টয় প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঋষিবর্গকে ছাড়িতে হইবে। তাহার পরিবর্ত্তে স্বদেশের আব্‌হাওয়ায় যে সকল মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। কেবল তাহাই নহে, এই আব্‌হাওয়ায় যে সকল আচার-ব্যবহার, অনু-ষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতি পরিপুষ্ট হইয়াছে তাহাও বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার জন্য কষ্ট কল্পনা প্রয়োজন—সে শিক্ষা আমা-দিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে—সে সাধনায় আমাদিগকে ব্রতী হইতেই হইবে।

তাহা না করিলে অনধিকার-চর্চ্চার দোষে পদে পদে বিব্রত হইতে হইবে। মনে রাখিবেন—যে কোন উপায়ে বাস্তব জগতের অপদার্থতা, অসম্পূর্ণতা ও নশ্বরতা প্রমাণ করিলেই হিন্দুসভ্যতা প্রকাশ করা হইল না।

শ্রীযুক্ত দুর্গেশচন্দ্র সিংহের
'শিবপূজা'

India Press, Calcutta.

মনে রাখিবেন, ইহ সংসারকে হীন দেখাইলেই আধ্যাত্মিকতা প্রমাণিত হইল না। মনে রাখিবেন, হিন্দুর শিল্পশাস্ত্রে মাপ জোকের খুঁটি নাটি বড় কম ছিল না। মনে রাখিবেন, হিন্দুর নীতিশাস্ত্রে দেবদেবীর মূর্ত্তি-গঠন বিষয়ে সামান্য মাত্র নিয়মভঙ্গের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা ছিল। মনে রাখিবেন, এখনও নগণ্য পল্লীগ্রামের সামান্য রমণীরাও জানেন যে, মূর্ত্তিগুলিকে বিকৃত ভাবে গড়িলে শিল্পী ও গৃহস্থের প্রতি আরাধ্য দেবদেবীগণ অসন্তুষ্ট হন। মনে রাখিবেন, অঙ্গের সৌষ্ঠব নষ্ট করিলেই, শরীরকে ক্ষীণ ও অবসন্ন ভাবে আঁকিলেই ধর্ম্ম-প্রাণতা, ভাবুকতা ব্যক্ত করা হইল না। মনে রাখিবেন, হিন্দুর বিচারে—'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্'। মনে রাখিবেন, হিন্দু বিষয়কর্ম্মে অমনোযোগী ছিলেন না, রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে উদাসীন ছিলেন না, সংসারকে বাস্তবজগৎকে, সমাজরক্ষাকে অবহেলা করেন নাই, পরিবার পালনকে, গৃহস্থ-ধর্ম্মকে উপেক্ষা করেন নাই। মনে রাখিবেন, হিন্দু ইন্দ্রিয়ের জগৎকে বিনষ্ট করেন নাই—তাহার উপর অতীন্দ্রিয়ের ছাপ মারিয়াছিলেন; হিন্দু ভোগকে বর্জ্জন করিতেন না,—ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা, অনাসক্তির দ্বারা ভোগ-বাসনাকে শান্ত সংযত নিয়ন্ত্রিত করিতেন। হিন্দুর বিধানে মানবজীবনের সকল অভিব্যক্তিই—পার্থিব সকল অনুষ্ঠানই—যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে। এই জন্য হিন্দুর বৈরাগ্য, হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা, হিন্দুর পরকালবাদ অলীক ধারণামাত্র ছিল না—হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত না। পরন্তু সংসারের কার্য্য-কলাপসমূহই ধর্ম্মভাবের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইত, ভোগের অনুষ্ঠানগুলিই আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত হইত, সমাজের সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠানই বৈরাগ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইত। ইহার ফলে হিন্দুর ভাবুকতা, হিন্দুর সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্য্যে, গার্হস্থ্যে, রাষ্ট্রে, শিল্পে, পল্লীজীবনে, সকলের অভ্যন্তরেই স্বকীয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কার্য্যতঃ সকল ক্ষেত্রে সন্ন্যাস ও সংসারের সমন্বয়, ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য বিধান, অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্ধিস্থাপন, ইহাই হিন্দুর সনাতন সাধনা। তাই হিন্দুর আদর্শ-কবি কালিদাস হিন্দুর আদর্শ-গৃহস্থ নরপতির জীবন চিত্রিত করিয়াছেন :—

জুগোপাত্মানমত্রস্তো ভেজে ধর্ম্মমনাতুরঃ।
অগৃধ্নুরাদদে সোঽর্থমসক্তঃ সুখমন্বভূৎ॥

তিনি আত্মরক্ষা করিতেন—কিন্তু ভয়ের জন্য নয়; তিনি ধর্ম্মের নিয়ম পালন করিতেন—কিন্তু অনুতাপের বশে নয়; তিনি ধন গ্রহণ করিতেন—কিন্তু লোভের প্রভাবে নয়; তিনি সুখ ভোগ করিতেন—কিন্তু আসক্তির জন্য নয়।

সুতরাং হিন্দুর সনাতন আদর্শে—আত্মরক্ষা, ধর্ম্মের নিয়মপালন, ও সুখভোগ—সকলেরই যথানির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। এই সকল জাগতিক, সাংসারিক ও বৈষয়িক কার্য্যাবলী হিন্দুর বিচারে গর্হিত ও নিন্দনীয় নহে।

সুখের বিষয়—হিন্দুর এই বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের দিকে, হিন্দু সভ্যতার সাংসারিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি পড়িয়াছে। পণ্ডিতেরা হিন্দুর নীতি-শাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ইত্যাদি সর্ব্ববিধ সমাজ-শাস্ত্র মন্থন

করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল হিন্দুর পদার্থবিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় হিন্দুর রাসায়নিক জ্ঞান সাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় হিন্দুর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বাহির করিয়াছেন। এই উপায়ে হিন্দুর জাতীয় ইতিহাস ও অতীত গৌরব-কথার আলোচনায় বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের চিত্র পরিস্ফুট হইতেছে। এই নবযুগের ইতিহাসালোচনায় বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সমুদয় তত্ত্ব আমাদের শিল্পে ও চিত্রকলায় ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। নীতিশাস্ত্র ও মূর্ত্তিতত্ত্ব অনুসারে শিল্পিগণ স্বকীয় কারুকার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রয়াসী হইতেছেন। তাহার নমুনা এবার চিত্র-প্রদর্শনীতে দেখিয়াছি। চিত্রকরেরা বাস্তব জগৎকে আর উপেক্ষা করিতেছেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শরীরের সৌষ্ঠবকে ক্রমশঃ কম অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের ক্রমশঃ বিশ্বাস জন্মিতেছে যে বাহ্য আকৃতির লাবণ্য ভুলিলেই অন্তঃসৌন্দর্য্য প্রকটিত হয় না। শারীরিক ও বৈষয়িক লক্ষণগুলির প্রতি দৃষ্টি না দিলে ভারতীয় কলাজগতের সম্যক্ উন্নতি হইবে না।

১৬। হিন্দুসমাজ-তত্ত্ব

এত দিনে দেখিতেছি হিন্দুরা নিজেদের সমাজকে গভীরভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন। একচোখো সংস্কারকের দিন আর নাই। এখন শিক্ষিত লোকের মধ্যে হিন্দু-সভ্যতার ইতিবৃত্ত খুঁজিবার প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে।

হিন্দুর রীতিনীতি, সৌজন্যশিষ্টাচার, আহার-বিহার, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সকল প্রকার সামাজিক কার্য্যকলাপ নানা বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থায় পড়িয়া নানা আকার ধারণ করিয়াছে। সেই অবস্থা-সমূহ না জানিয়াই এবং সেই আকারগুলি না বুঝিয়াই আমাদের শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণ হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে এ যাবৎকাল মতামত প্রকাশ করিতেন। সুখের কথা গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এইরূপ মত প্রচার অনেকটা বন্ধ হইয়াছে। এই বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে ধীরতা, সংযম ও নিরপেক্ষতা আসিয়াছে। এখন হিন্দুর সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলি বৈজ্ঞানিকের প্রণালীতে আলোচিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত শশধর রায়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকগণ নানা দিক হইতে হিন্দুসমাজের ক্রমবিকাশ এবং বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সাধু প্রয়াসে ধন-বিজ্ঞানের সাহায্যে শরীর-বিজ্ঞানের সাহায্যে এবং রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সাহায্যে হিন্দু-সমাজ-বিজ্ঞানের নানা তথ্য সংগৃহীত হইতেছে। এখনও কোন বিষয়ে সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিবার উপযোগী মালমসলা পাওয়া যায় নাই।

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র পণ্ডিতগণের নিকট কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছেন। চৈত্র

সংখ্যায় আমরা সেগুলি প্রকাশ করিয়াছি। সেই প্রশ্নের উত্তর পাইলে আমরা যথাসময়ে প্রকাশ করিব।

মাঘমাসের 'বিজয়া'-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুর জাতিভেদ সম্বন্ধে কয়েকটা ভাবিবার কথা বলিয়াছেন। কথাগুলি হিন্দুর অন্যান্য আচার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সেই প্রবন্ধ হইতে নিম্নে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম:—"ভারতে আর্য্য-সমাজ প্রতিষ্ঠার কালে দ্বিজাতিগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সার্ব্বভৌম অধিকার ছিল। উহারা ভারতের যে কোন প্রদেশের স্বজাতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন, তেমনি যে কোন প্রদেশের স্বজাতীয় বরকে কন্যাদান করিতে পারিতেন। এই অধিকারটা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অধিকতর ভাবে ছিল। রাজপুতনার রাজপুতগণ সেদিন পর্য্যন্ত সিংহল, সুমাত্রা, গান্ধার, পারস্য প্রভৃতি দূরদূরান্তরের দেশ হইতে বিবাহ করিয়া কন্যা ঘরে তুলিতেন। মহারাজ মানসিংহ পাঁচটী বাঙ্গালী কন্যাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন।

জাতি স্বাধীন থাকিলে এই অধিকার জাতির প্রবল অংশের থাকেই। পরাধীনতা আসিলে পরাজিত পরাধীন জাতির কোন অংশের কোন অধিকারই থাকে না। তখন জাতি সর্ব্ব-সাকল্যে পতিত হইয়া যায়। তখন বিজেতার প্রভাব হইতে কিসে জাতির বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে পারা যায়, এই চিন্তাতেই প্রত্যেক সমাজই বিভোর হইয়া থাকে। তখন চাচা আপন বাঁচা—এই সূত্রই সকলের অবলম্বনীয় হয়। * * *

জাতিরক্ষার এই মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধযুগের পর, পাঠান আক্রমণের সময়ে বাঙ্গালার, তথা ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশের, হিন্দুসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই হেতু উন্নতির পরিহার করিয়া স্থিতিই আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ হইয়া আছে।

হিন্দুর কণ্ঠের পরাধীনতার নিগড় দিনে দিনে যতই ভারী হইতে লাগিল, ততই প্রাদেশিকতা (Provincialism) ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রকট হইতে লাগিল। এক বাঙ্গালার মধ্যে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মধ্যে চারিটা করিয়া আটটা শ্রেণী হইয়া গেল। এই প্রধান শ্রেণীর মধ্যে আবার উপ-শ্রেণীর উদ্ভব হইল। জাতি ও ধর্ম্ম ব্যক্তিগত (personal) হইল, গোষ্ঠীর (communal) প্রভাব দিনে দিনে ক্ষীণ লাগিল এই অবস্থায় কেবল বাহ্যাচারগত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, নাম-মাহাত্ম্যে হিন্দুকে সজীব রাখিবার চেষ্টা অনেকের হইল। শূলপাণি হইতে রঘুনন্দন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপকগণ স্মৃতিশাস্ত্র ধরিয়া বাঙ্গালীর হিন্দুত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ আচণ্ডালে হরিনাম বিতরণ করিয়া হিন্দুত্বের প্রসার বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। শেষে, পাছে বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্ম হিন্দুত্বের সূত্র বর্জ্জিত হয়, তাই পরবর্ত্তী বৈষ্ণব অধ্যাপকগণ হরিভক্তিবিলাস প্রমুখ নানাবিধ আচারমূলক ব্যবস্থা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থার প্রভাবে বঙ্গীয় স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব হিন্দুগণের মধ্যে একটা সমতা স্থাপিত

হইয়াছিল। সেই সমতা জন্যই পরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান সম্ভবপর হইয়াছিল। বৈষ্ণব ও শাক্ত শৈবের সম্মিলনে বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের পুষ্টি-সাধন হইয়াছিল।"

*
* *

১৭। ভারতে গো-সংরক্ষণ

খাঁটি দুধ ও ঘী দেশে এখন দুষ্প্রাপ্য। দুধের বদলে সাদা জল, ঘীর বদলে নারিকেল তেল, বাদামের তেল এবং নানা জন্তু ও সাপের চর্ব্বী খাইয়া আমরা উৎসন্ন যাইতেছি। এইরূপ আর কিছুদিন চলিলে আমাদের অস্তিত্ব একেবারেই লোপ পাইবে।

সেই বিনাশের পথ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য পশ্চিমের যুক্তপ্রদেশ হইতে একটি জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী খুলিবার প্রস্তাব হইতেছে। তাহার নাম হইবে 'ভারতবর্ষের গো-সংরক্ষণ-কোম্পানী'। ইহার মূলধন ধরা হইয়াছে পঞ্চাশ কোটি টাকা। পাঁচ টাকা করিয়া দশ কোটি অংশে তাহা বিভক্ত হইবে।

কোম্পানী মনে করেন, পাঁচখানি গ্রাম লইয়া যদি এক একটি গোশালা তৈয়ারী হয়, তাহা হইলে তাহাতে পঞ্চাশটি গরু রক্ষিত হইতে পারিবে। প্রত্যেক ছোট সহরে একটি গোশালায় পাঁচ শত, এবং প্রত্যেক বড় সহরে (জেলা) এক হাজার গরু রক্ষিত হইতে পারিবে। ভারত ব্যাপিয়া এই কার্য্য চালাইবার কথা হইয়াছে। তজ্জন্য প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক জেলায় আফিস খুলিতে হইবে। বহু কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইবে। কার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে গোড়ায় কতকগুলি উৎসাহী, সত্যনিষ্ঠ এবং অবৈতনিক কর্ম্মীর প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যোপযোগী মূলধনও থাকা চাই।

বিরাট সঙ্কল্প। কার্য্যে কতদূর পরিণত হয় বলা যায় না। হইলে দেশের মহৎ উপকার সাধিত হইবে। আমাদের যুবকবৃন্দও অর্থোপার্জ্জনের একটা নূতন পথ দেখিতে পাইবেন।

অত বড় মূলধনের কথা ছাড়িয়া দিলাম। সামান্য কিছু অর্থ লইয়া দেশের যুবকগণ যদি ব্যক্তিগত ভাবে জেলার বিভিন্ন স্থানে গোরক্ষণ-আশ্রম ও দুগ্ধশালা খুলিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেও যথেষ্ট উপকার হয়। স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে। তাঁহাদের জীবনে একটা উদ্যমও আসে। দেশবাসীরা মামুলি পথ ছাড়িয়া নূতন পথে আসিতে সাহস করিতে পারে। শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণ, অন্নসংস্থানের নূতন উপায় দেখাইবার দৃষ্টান্তস্থল হইতে আকাঙ্ক্ষা করুন।

১৮। ডাকাতি-নিবারণের উপায়

পূর্ব্ববঙ্গে ঘন ঘন ডাকাতি হইতেছে। পুলিশ এ সম্বন্ধে কিছুই করিতে পারিতেছে না। তাই পুলিশ-বিভাগের ইনস্পেক্টর জেনারেল শ্রীযুক্ত হিউজেস্ বুলার সাহেব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে গ্রামবাসীর সাহায্য ভিন্ন পুলিশের অনুসন্ধান-কার্য্য একেবারে অসম্ভব।

ঢাকার 'হেরল্ড' পত্রিকা এই মন্তব্যের আলোচনায় বলেন, "গ্রামবাসী কিরূপে ডাকাত ধরিতে সমর্থ হইবে সে প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। খুব সম্ভব গ্রামবাসীকে আত্মরক্ষায় সুনিপুণ করিলে এ কার্য্য অনেকটা সম্ভবপর হয়। কিন্তু কেবল মাত্র কতগুলি অস্ত্রশস্ত্র দিয়া লোকদিগকে সজ্জিত করিলেই চলিবে না, তাহাদিগকে সেইগুলির ব্যবহারও শিক্ষা দিতে হইবে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে শারীরিক ব্যায়াম এবং আত্মরক্ষার জন্য গ্রাম্যসমিতি গঠন করা আবশ্যক। এইরূপ সমিতি পূর্ব্বে গঠিত হইতেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা গবর্ণমেণ্টের সন্দেহ-দৃষ্টিতে পতিত হয়। পুনর্ব্বার সেগুলি জাগাইলে ভাল হয় না কি ?"

*
* *

১৯। ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য বাঙ্গালী

ব্যবসায়েও বাঙ্গালীর হাত আছে। বাঙ্গালী কেবল মাত্র চাকরীগত প্রাণ নহে। স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জনেও বাঙ্গালী সমর্থ। বাঙ্গালী আপনার বুদ্ধিকে সব ক্ষেত্রেই খাটাইতে পারে। তাহার পরিচয় আমরা অনেক দিক হইতেই পাইয়াছি। কলিকাতার শ্রীযুক্ত স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ পাল, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দে, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ব্যক্তিগণ, পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ উকিল, আসামের শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বড়ুয়া ব্যবসা-জীবনে বাঙ্গালীর গৌরব এবং উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল।

কিন্তু বাঙ্গালী তাহার ব্যবসায়ের কৃতিত্ব শুধু বঙ্গদেশেই আবদ্ধ রাখে নাই। বম্বে, পাঞ্জাব, পশ্চিমের যুক্ত প্রদেশ, মাদ্রাজ, বর্ম্মা প্রভৃতি বহুস্থলে তাহার ব্যবসা-নৈপুণ্য প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ক্রমে ক্রমে সে সকলের পরিচয় দিব। সম্প্রতি আমরা যুক্ত প্রদেশের একজন প্রবাসী বাঙ্গালীর পরিচয় দিতেছি। ইনি উত্তর ভারতে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ। ইহাঁর জীবন সকলেরই অনুকরণীয়। সামান্য আরম্ভ হইতে কিরূপে মানুষ ব্যবসায়ে সাধুতা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে, চিন্তামণি বাবু তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এলাহাবাদ হইতে বঙ্গভাষার সুলেখক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক বি, এ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"প্রয়াগের "ইণ্ডিয়ান প্রেস" বাঙ্গালীর একটি প্রধান কীর্ত্তি। গবর্ণমেণ্টের মুখপত্র সুপ্রসিদ্ধ "পায়োনিয়র" (The Pioneer) প্রেসের পরেই প্রয়াগে "ইণ্ডিয়ান প্রেসের" স্থান। ইহার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ বাঙ্গালী, এবং প্রধান কর্ম্মচারিগণ প্রায় সকলেই বাঙ্গালী। এই প্রেস উত্তর ভারতে বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন মুদ্রাঙ্কনের জন্য খ্যাত। আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই রবিবর্ম্মার চিত্র আদৃত দেখিতে পাওয়া যায়। বহু ব্যক্তি, সর্ব্বথা মনোমত না হইলেও, উৎকৃষ্টতরের অভাবে, রবিবর্ম্মার চিত্রই সযত্নপূর্ব্বক গৃহে রক্ষা করিতেছেন। নীরবকর্ম্মী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি বাবু প্রভূত অর্থব্যয়ে সেই অভাব পরিপূরণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি এতদর্থে বহু আয়াস স্বীকার করিয়া ইংলণ্ড হইতে একজন জার্ম্মাণ চিত্রকর ও একজন জার্ম্মাণ মুদ্রাকর মাসিক সাত শত টাকা বেতনে আনয়ন করিয়াছেন। ইহাঁরা ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্র-

শিল্পিগণের উৎকৃষ্ট চিত্রনিচয় মুদ্রিত করিতেছেন। এদেশীয় কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত অন্য কোন প্রেসে এমন উচ্চ অঙ্গের মুদ্রাঙ্কন-কার্য্য হয় কি না সন্দেহ। এই ১৯১৩ খৃঃ অব্দের শেষভাগে ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত সুচারু চিত্রাবলী বিক্রয়ার্থ প্রকাশিত হইবে, আশা করা যায়।

"পাণিনি" আফিসের "Sacred Books of the Hindus Series"এর অমূল্য গ্রন্থরাজি সমস্তই এই প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া থাকে। বহু চিত্রশোভিত হিন্দী মাসিক "সরস্বতী" এই প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

ইণ্ডিয়ান প্রেসের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া মেজর বামনদাস বসু মহাশয় গত ১৯১১ খৃঃ অব্দের নভেম্বর মাসে "Indian Medicinal Plants" নামক ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদাবলীর বৈজ্ঞানিক ও শাস্ত্রীয় আলোচনামূলক গ্রন্থের জন্য তেরশত চিত্র মুদ্রিত করিতে দিয়াছেন। এই কার্য্যের জন্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি বাবু স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে এমন দ্রুত কার্য্য চলিতেছে যে ইতিমধ্যেই অর্দ্ধেক অপেক্ষা অধিক চিত্র মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ আগামী পূজার পূর্ব্বেই সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে।"

২০। স্বদেশ-সেবকের সংবর্দ্ধনা

আমরা ছাত্রগণের রুচি-পরিবর্ত্তনের জন্য আশান্বিত হইয়াছি। তাঁহারা এখন বুঝিয়াছেন—পরের জন্য স্বার্থত্যাগ এবং নিষ্কাম সেবাব্রতই সাধারণের হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার একমাত্র উপায়। তাঁহারা বুঝিয়াছেন শুধু জন্মের বলে কতকগুলি টাকার অধিকারী হইলেই 'বড়লোক' হওয়া যায় না। দেশের শিক্ষা, সাহিত্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি মঙ্গল কার্য্যে সে অর্থ ব্যয় করিলেই যথার্থ বড় হওয়া যায়।

আমরা সম্প্রতি ছাত্রগণের অন্তঃকরণে এই মহান্ আদর্শ লক্ষ্য করিবার একটা সুযোগ পাইয়াছি। মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে সংবর্দ্ধনা করিতে যাইয়া ছাত্রগণ যে অভিনন্দনপত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের এই ভাবানুরাগেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

*
* *

২১। কারখানার তালিকা

'ডেলি সিটিজেন' পত্রিকায় ভারতবর্ষের কারখানা ও তাহাতে নিযুক্ত লোকদিগের তালিকা বাহির হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহা বিবৃত করিলাম—

১৯১০ সালে ভারতবর্ষে ৯৮টি কারখানা খোলা হইয়াছে। সকলগুলিই "ভারতবর্ষীয় কারখানা-আইন" অনুসারে স্থাপিত। ইহাদের কতগুলি সরকারী, কতগুলি বেসরকারী। এই সকলের মধ্যে ১৬টি ছাপাখানা, ১৬টি রেলওয়ে ওয়ার্কসপ্, ১০টি ক্যানাল ও এঞ্জিনিয়ারীং ওয়ার্কসপ্, এবং বহু-সংখ্যক সামরিক অস্ত্রাগার ও বারুদ প্রভৃতির কারখানা আছে।

কোম্পানী বা ব্যক্তিগতভাবে রক্ষিত কারখানার সংখ্যা ১৯০৯ সালে ছিল ২৬২৩, এবং ১৯১০ সালে হইয়াছে ২৮৩৪। এই

মকৃষ্ণ সেবাশ্রম কন ল রিদ্ব
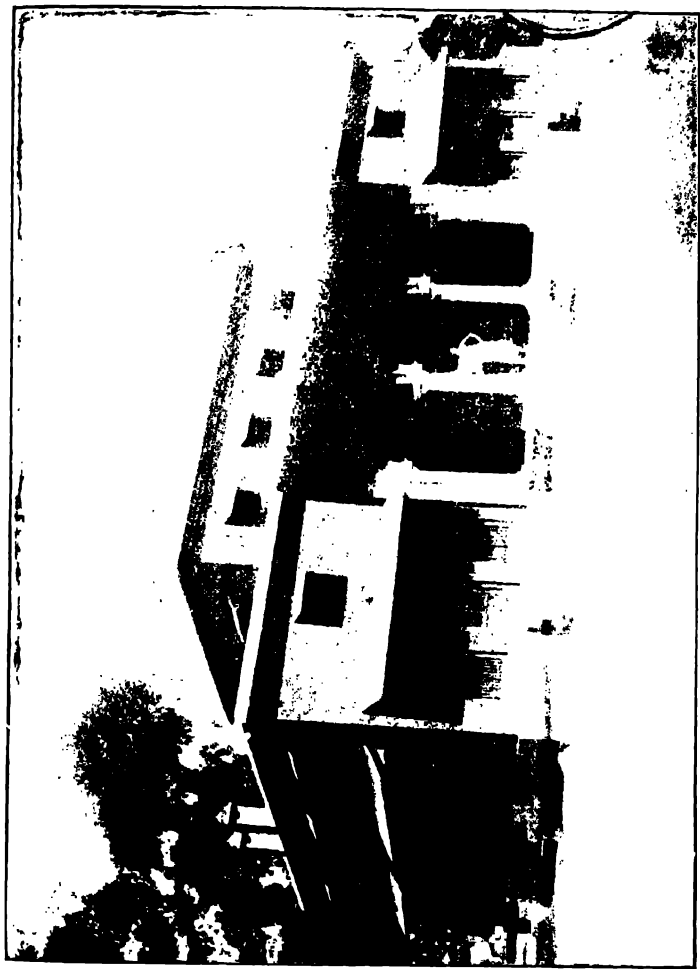
গুলি বাষ্পযন্ত্রের দ্বারা চালিত। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি উল্লেখযোগ্য—

কার্পাস বহিষ্করণ ও চাপন যন্ত্র	...	১৩৯০
কার্পাস বা কাপড়ের কল	...	২৩৬
চাউলের কল ...	...	২১৫
পাট-চাপন যন্ত্র ...	...	১৩৮
করাতের কল ...	...	১০১
লৌহ ও পিতলের কল এবং ঢালাইখানা ...	...	৯০
রেলওয়ে ওয়ার্কসপ্	...	৬৫
পাটের কল ...	...	৫৯
ময়দার কল ...	...	৩৭

বাষ্পচালিত কারখানার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত গুলির সংখ্যা শতকরা ৮২টি। বোম্বাই প্রদেশে কার্পাসের কলকারখানার সংখ্যা অধিক, বঙ্গদেশে পাটের কল বেশী। চাউল এবং করাতের কারখানা অধিক।

১৯০৬ সালে কার্পাস-বহিষ্করণ ও চাপন যন্ত্রের সংখ্যা ছিল ৯৬৯, ১৯০৭ সালে ১০৬৬, ১৯০৮ সালে ১১৮৩, এবং ১৯০৯ সালে ১৩৯০। যে সমস্ত কারখানায় বাষ্পযন্ত্র চলে না, তাহাদের সংখ্যা ৫৬৫। তন্মধ্যে ২৮টি পাট চাপনের কারখানা, এবং ১১টি ছাপাখানা।

সমস্ত কারখানায় যে সমস্ত লোক খাটে, গড়ে তাহাদের দৈনিক সংখ্যা ১৯০৮ সালে ছিল ৯৫১,১০০, ১৯০৯ সালে ১,০৮৪১৩২ এবং ১৯১০ সালে হইয়াছে ১,০১৪২৪১।

কারখানায় নিযুক্ত স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১১৫,৫৪০, এবং বালক-বালিকার সংখ্যা ৫২০২৬। স্ত্রীপুরুষ সমস্ত লোকের সংখ্যা বঙ্গদেশে শতকরা ৩২ জন; এবং বোম্বাই দেশে শতকরা ২৯ জন।

১৮৫১ সালে ভারতবর্ষে সর্ব্ব প্রথম কাপড়ের কল খোলা হয়। ১৮৭৯-৮০ সাল হইতে ১৮৮৩-৮৪ সাল পর্য্যন্ত গড়ে ৬৩টি কল কার্য্য করিয়াছে। তারপর প্রত্যেক পাঁচ বৎসর অন্তর ঐ সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে। প্রথমবারের সংখ্যা ৮৩টি, তারপর ১২৭, তারপর ১৫৯, তারপর ১৯৫ এবং তারপর ২১৮। ১৯০৯-১০ সালে ঐ কলের সংখ্যা ছিল ২৪১। হইয়াছে ২৫০।

পূর্ব্ববিধ সময়ের মধ্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যাও ৫১,০০০ হইতে ২৩০,৮০০ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে।

ঐ সমস্ত কলের মধ্যে ২০৫টি কেবল সূতাকাটা, এবং ১৯টিতে বয়ন-কার্য্য চলিয়াছে। অবশিষ্টগুলিতে সূতা-কাটা এবং বয়ন উভয়বিধ কার্য্যই হইয়াছে।

২২। কন্‌খলে রামকৃষ্ণ-মিশনের সেবাশ্রম

এডুকেশন গেজেট হইতে আমরা নিম্নে কন্‌খল রামকৃষ্ণমিশন-সেবাশ্রমের একাদশ বার্ষিক বিবরণ সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশ করিতেছি,—

"স্বামী বিবেকানন্দের নিকট "দরিদ্র নারায়ণ" সেবার অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার কয়েকজন শিষ্য হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী কন্‌খলে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে একটী ভাড়াটে বাটীতে এই সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক অধ্যবসায়ে এবং সকল সৎকর্ম্মেই ভারতবাসী সর্ব্বসাধারণের

যে পুণ্য প্রবৃত্তি মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে তাহার সহায়তায় এই সেবাশ্রম উহার বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে। সাধু, সন্ন্যাসী, দরিদ্র তীর্থযাত্রী এবং স্থানীয় অধিবাসিগণকে রোগের সময় যত্নের সহিত ঔষধ, পথ্যদান ও শুশ্রূষা দ্বারা রোগমুক্ত করিবার চেষ্টাই ইহার কার্য্য। আশ্রম স্থাপনার সময় হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১১॥০

৫৬,৮৭৪ জনের

ধ্যে ৯৪৫ জনকে

আশ্রমের হাঁসপাতালে রাখা হইয়াছিল। প্রথম দেড় বর্ষে রোগীর সংখ্যা ১০৫৪ মাত্র হইয়াছিল। ১৯১১ অব্দে উহার ৯ গুণ অর্থাৎ ৯৪২০ হয়। ইহার মধ্যে প্লেগ রোগী ১৯৭, ক্ষয় ১৮৩, কলেরা ২২০ ইত্যাদি ছিল। সাধারণের নিকট এ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৩০, ৯২২/১৫ চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ৩০,৩৩৭৷৵১০ খরচ হইয়াছে, উদ্বৃত্ত ছিল ৫৮৪॥৫ মাত্র।

আশ্রমের শুভানুধ্যায়ীবর্গকে দুইটী আনন্দের সংবাদ জানাইতেছি। এই আশ্রমের বিশেষ উপকারিতা বুঝিয়া বিগত দুই বৎসর হইতে হরিদ্বার মিউনিসিপ্যালিটী মাসিক ১৫৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিতেছেন এবং ভারত-গবর্ণমেণ্টও ইহার বিশেষ উপকারিতা উপলব্ধির নিদর্শনস্বরূপ বিগত ১৯১২ সালে মিরাট সদরে অনুষ্ঠিত দরবারে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী কল্যাণানন্দকে একটী দরবার মেডেল প্রদান করিয়াছেন।

এক্ষণে যাহাতে আশ্রম আরও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়, তজ্জন্য ইহারভিতর আরও অন্ততঃ তিনটী ওয়ার্ডের প্রয়োজন।

১ম, গৃহস্থ রোগিগণের জন্য একটী পৃথক হাঁসপাতাল; ২য়, কলেরা রোগীর পৃথক ওয়ার্ড এবং ৩য় অন্যান্য সংক্রামক রোগিগণের জন্য পৃথক ওয়ার্ড।

লোকের ধর্ম্ম-সংস্কারে বাধা প্রদান না করিয়া সেবা করাই আশ্রমের উদ্দেশ্য, কিন্তু গৃহিগণকে সাধুগণের সহিত এক হাঁসপাতালে রাখিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ৮ জনের অধিক লোকের স্থান নাই। এজন্য গৃহস্থ-দিগের একটী পৃথক ওয়ার্ডের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। উহার আনুমানিক ব্যয় ৫০০০৲ টাকা।

২য়, চিকিৎসা ও শুশ্রূষা-প্রার্থী রোগীর সংখ্যা মেলার সময় অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়া থাকে। সুতরাং ইহারও বিশেষ প্রয়োজন। সম্ভাবিত ব্যয় ৩০০০৲ টাকা।

৩য়, এতদ্ব্যতীত প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি অন্যান্য সংক্রামক রোগীর জন্যও একটী স্বতন্ত্র ওয়ার্ড রাখিলে কার্য্যের সুবিধা হয়। সম্ভাবিত ব্যয় ৩০০০৲ টাকা।

এক্ষণেই আশ্রমে প্রতিমাসে প্রায় ২০০৲ টাকার উপর খরচ হইতেছে। ক্ষয়রোগ চিকিৎসালয়ে রোগী লওয়া আরম্ভ হইলে এই খরচ অন্ততঃ দেড়গুণ বাড়িয়া যাইবে। অথচ আশ্রমতহবিলে মাত্র ৫৮৪॥৫ জমা এবং আশ্রমের কার্য্য প্রধানতঃ এককালীন দাতাগণের অনিশ্চিত দানের উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং আশ্রমের কার্য্য স্থায়ী ভাবে চালাইতে গেলে প্রথমতঃ নিয়মিত মাসিক চাঁদা-দাতৃবর্গের সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়া প্রয়োজন। "অনেকে" বর্ষে বর্ষে কিছু কিছু দিবার সংকল্প করিয়া টাকা পাঠাইলেই কার্য্য চলিবে!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

India Press, Calcutta.

যাঁহারা হরিদ্বারের ন্যায় তীর্থস্থানে নিজ নিজ প্রিয় আত্মীয়-স্বজনের স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপনের ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে জানান যাইতেছে যে, তিনটী বাটী নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে, যদি কেহ তাহার কোন এক একটীর সমুদয় ব্যয় প্রদান করেন, তবে তাঁহাদের ঈপ্সিত নামেই সেই ওয়ার্ডের নামকরণ হইবে। অথবা কেহ ইচ্ছা করিলে উক্ত বাটীগুলির এক একটী ঘরের ব্যয়স্বরূপ ১০০০৲ টাকা দিলেও সেই ঘরটী তাঁহার আত্মীয়ের স্মৃতিমন্দির রূপে উৎসর্গীকৃত হইতে পারে। আর যাঁহারা এক একটী রোগীর সমুদয় খরচ দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে ঐ হিসাবে মাসিক দশ টাকা করিয়া দিতে হইবে। অথবা ৪০০০৲ টাকার স্থায়ী ফণ্ড করিয়া দিলে তাহার সুদ হইতে উক্ত রোগীর ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। এতদ্ব্যতীত গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য অথবা আশ্রমের সাধারণ খরচের জন্য টাকা প্রয়োজন। অনেকের অল্প অল্প দানেই এই মুষ্টি ভিক্ষার দেশে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র পালন হইয়া থাকে। এ গৌরব ইয়ুরোপীয় কোন দেশেরই নাই। সেইরূপ মনে মধ্যবিত্তেরা ও ধনীব্যক্তিরা কার্য্য করিতে থাকুন। বলা বাহুল্য এই সেবাশ্রম বেলুড়মঠস্থ রামকৃষ্ণ-মিশনের শাখাস্বরূপ—উহা বিগত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রী হইয়াছে। টাকা-কড়ি (১) নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অথবা (২) স্বামী কল্যাণানন্দ-রামকৃষ্ণ-মিশন সেবাশ্রম কনখল পোঃ, জেলা সাহারণপুর। (৩) কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, ১২।১৩ গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা।

উপসংহারে বক্তব্য রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমগুলি যে কার্য্য করিতেছেন, উহা বাস্তবিক এক বিরাট জাতীয় যজ্ঞস্বরূপ। সেবকগণ উহার পরিচারক মাত্র। পূজা সর্ব্বসাধারণের, সুতরাং উহার সাকল্য বা বৈকল্যের দোষগুণও তাঁহাদেরই। আজ তাঁহাদের নিকট, বিশেষতঃ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট, আমরা ইহার কয়েকটী অভাবের কথা জানাইলাম, আশা করি, তাহাদের সহযোগিতায় আমরা উত্তরোত্তর এই পূজা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইব। বিশেষ স্মরণ রাখা উচিত—কাজটী বাঙ্গালীর, বাঙ্গালা দেশ হইতে বহুদূরে এই কার্য্যের দ্বারা ভারতীয় অন্যান্য জাতির নিকট বাঙ্গালীর গৌরব বাড়িয়াছে। সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ ও স্থায়ী করিবার চেষ্টা কি বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য নহে? যাঁহারা সৎকার্য্য-মাত্রেই দান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কিছু বলা বাহুল্য। কিন্তু যাঁহারা স্থানীয় কার্য্য মনে করিয়া এইটীকে স্থানীয় অধিবাসিগণেরই ইহাতে সাহায্য করা উচিত মনে করেন, তাঁহাদের জ্ঞাতার্থে বলি, এ কার্য্যকে বাস্তবিক স্থানীয় বলিতে পারা যায় না। কারণ, এটী তীর্থস্থান। এস্থানে ভারতের সর্ব্বস্থান হইতে যাত্রিগণ সমবেত হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ রেলের কল্যাণে এই সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। পাঠক মহাশয় ভাবিয়া দেখুন যে, ৫৬৯৭৪ সংখ্যক রোগী এখানে চিকিৎসিত হইয়াছে, সুতরাং এই আশ্রমের উপকারিতা বুঝিয়া দরিদ্র নারায়ণগণের সেবার নিমিত্ত আপনি যাহা কিছু দিবেন, তাহাই সেবার পুণ্য-কার্য্যে দাতার কল্যাণ জন্য ব্যয় হইবে।”

২৩। পঞ্জাবের সাহিত্যপ্রচারক সত্যদেব

বিদেশপ্রত্যাগত যুবকগণ এত দিনে প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজের সেবায় নিযুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে অনেক স্থলেই স্বার্থান্বেষীরূপে দেখিয়া আসিতেছি। নিজের মূল্যের কথা না ভাবিয়া পরার্থে জীবন যাপন করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের মধ্যে বড় বেশী দেখি নাই। এবারকার কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনে আমরা এক জন স্বার্থত্যাগী প্রকৃত সাহিত্যপ্রচারকের সংবাদ পাইয়াছি। তিনি পঞ্জাবের শ্রীযুক্ত সত্যদেব।

ইনি আমেরিকার ক্যালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী গ্র্যাজুয়েট। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া মাতৃভাষার উন্নতিকামনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে তিনি পঞ্জাবে হিন্দী-সাহিত্যের প্রচার করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি এক জন সুলেখক ও সুবক্তা। আমেরিকার শিক্ষালয়, সেখানকার শিক্ষার্থীর আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে ইঁহার কয়েকখানি হিন্দী পুস্তিকা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইনি আরও কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া মনস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন। নিঃস্বার্থ সাহিত্য-সেবার জয় হউক। ভগবানের আশীর্ব্বাদে সত্যদেবের মনস্কামনা পূর্ণ হউক।

২৪। চাকরী-কমিশনে আশামের সাক্ষী

আমাদের ভাল ভাল লোকেরা সকলেই চাকরীতে প্রবেশ করে—ইহা আমাদের ইচ্ছা নয়। বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ দেশের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হন—ইহাই আমাদের হৃদয়ের কামনা। স্বাধীনভাবে অন্ন অর্জ্জন করিবার পথগুলি খুলিয়া দেওয়াই আমাদের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রধান কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব মনে করি। ইহাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিৎ।

এই সকল কারণে আমরা চাকরীর আন্দোলনে বড় বেশী মিশিতে চাহি না। উচ্চ শ্রেণীর বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণকেও এ দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে আমরা অনুরোধ করি। এ জন্য সম্প্রতি যে 'চাকরী-কমিশন' বসিয়াছিল, তাহার কার্য্যাবলীর আলোচনায় আমরা বেশী মনোযোগ দি নাই। তবে বড় বড় চাকরী লাভের একটা ভাল দিক্ও আছে। তাহাতে রাষ্ট্রশাসনের নিয়মগুলি দখল করা যায়। সুতরাং এদেশীয় লোকের মধ্যে কয়েক জনের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হওয়া আবশ্যক—এ কথা আমরা স্বীকার করি। এই নিমিত্ত স্বদেশীয় লোকের উচ্চপদলাভবিষয়ে যে আন্দোলন হইতেছে তাহাতে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি আছে। সম্প্রতি আশাম ব্যবস্থা-সভার সদস্য মাননীয় শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ মহাশয় 'চাকরী-কমিশনে' যে সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহা 'বসুমতী' হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আমাদের এবিষয়ে বক্তব্য মোটা কথাগুলি ঐ উক্তিতে আছে।

"বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে লোকগ্রহণের যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। পূর্ব্বে অবস্থা বুঝিয়াই এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। দেশে তখন শিক্ষিত লোক ছিল না,—সুতরাং তখন বিদেশ হইতেই যোগ্য লোক আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এখন ইংরেজী পদ্ধতি অনুসারে শাসনকার্য্য পরিচালন করিবার যোগ্য লোক এ দেশে যথেষ্ট পাওয়া যায়। সুতরাং কি আর্থিক, কি রাজনীতিক, কোনও হিসাবেই ঐ প্রথা বহাল রাখা উচিত নহে। ভারত অত্যন্ত দরিদ্র দেশ। এ দেশে সিভিলিয়ান-দিগের বেতন ও পেন্সন বাবদ এত অধিক অর্থব্যয় করা অসঙ্গত। দেশীয়দিগকে ঐ সিভিলিয়ানের পদ হইতে বঞ্চিত রাখিলে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের চেষ্টার আইন ও মহারাণীর ঘোষণা-বাণীর প্রতিকূলতাচরণ করা হইবে। এখন অতি অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোকই ঐ সকল বিধির কথা জানেন,—কিন্তু ক্রমশঃ সমাজের নিম্নস্তরের লোক পর্য্যন্ত ঐ সকল কথা জানিতে পারিতেছে। শাসক রাজপুরুষ-দিগের পদে দেশীয় ব্যক্তি নিযুক্ত হইলে কাজ ভাল হইবে। কারণ, দেশীয়গণ শাসিত প্রজার ইচ্ছার ও আকাঙ্ক্ষার সহিত পরিচিত, তাহাদের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন, তাহাদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সুসংস্কার-কুসংস্কার সকল বিষয়ের সহিত সম্যক্ পরিচিত। ইংরেজ রাজপুরুষগণ দেশীয়দিগের ভাষাই জানেন না, সংস্কারাদির খোঁজখবর রাখেন না; দেশীয়দিগের সহিত সহানুভূতিসম্পন্নও হইতে পারেন না, এমন কি, তাহাদের সহিত মেলা-মেশা করিবার অবকাশও পান না। প্রত্যেক সহরে য়ুরোপীয়দিগের ক্লাব আছে। মফস্বলে চা-কর, পাটের সওদাগর, রেল ও ষ্টীমারের কর্ম্মচারী প্রভৃতি যে সরকারী য়ুরোপীয় আছেন, য়ুরোপীয় রাজ-পুরুষগণ তাঁহাদেরই সঙ্গ করেন, দেশীয়দিগের সহিত তাঁহারা মিশিতে চাহেন না। দেশীয়-গণও অবাধে ও নির্ভয়ে উঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা করেন না; কারণ দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ য়ুরোপীয় রাজপুরুষদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে য়ুরোপীয় রাজপুরুষগণ তাঁহাদের সহিত আবশ্যক শিষ্টাচার প্রদর্শন করেন না। শীতকালে সফরে বাহির হইয়া য়ুরোপীয় রাজপুরুষগণ য়ুরোপীয়দিগের বসতি-সান্নিধ্যেই শিবির সন্নিবিষ্ট করেন, এবং কোথাও বা তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। মফস্বলে 'ইনস্পেকসন বাঙ্গলা' গুলিও লোকালয় হইতে দূরে অবস্থিত। সুতরাং সদরে থাকিলেও রাজপুরুষগণ যেরূপ দূরস্থ ও দুষ্প্রাপ্য থাকেন, মফস্বলে আসিলেও সেইরূপ দূরস্থ ও দুষ্প্রাপ্য থাকেন। রাজপুরুষগণ সফরে বাহির হইলে প্রজারা তাঁহার সহযাত্রী মোক্তার ও দরখাস্ত-লেখকদিগের দ্বারা তাহাদের অভাব ও অভিযোগের কথা তাঁহার গোচর করেন। সদরেই হউক আর মফস্বলেই হউক, ইংরেজ রাজপুরুষগণ প্রজাদিগের সম্বন্ধে সরাসরি কোনও অভিজ্ঞতাই অর্জ্জন করেন না,—তাঁহারা রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। ঐ সকল রিপোর্ট প্রায়ই ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ থাকে।

য়ুরোপীয় রাজপুরুষগণ স্বার্থপর ব্যক্তিদিগের রিপোর্টে নির্ভর করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের শাসিত জেলায় অশান্তি আত্মপ্রকাশ

করিয়াছিল। যে জেলার পরিচালনভার দেশীয়দিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল,—সে জেলায় অশান্তি আত্মপ্রকাশ করে নাই। নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার মধ্যে বিস্তারগত পার্থক্য ভিন্ন অন্য কোনও পার্থক্যই নাই। কিন্তু মিঃ জে, এন, গুপ্তের শাসনাধীনে নোয়াখালী কিরূপ শান্ত ছিল, পক্ষান্তরে, কুমিল্লার অশান্তি কিরূপ প্রকট হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, য়ুরোপীয়গণের সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা, চরিত্রবল এবং ঐরূপ অনেক গুণ আছে। কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলাম। বিলাতে সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষা-গ্রহণ-ব্যবস্থায় দুই চারি জন অত্যন্ত কার্য্যদক্ষ লোক পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেই খাতিরে দেশীয়দিগকে উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত করা কখনই বিধেয় নহে। এখন শাসনকার্য্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, পরিশ্রম ও সহানুভূতিরই প্রয়োজন।"

২৫। অধ্যাপক শেষাদ্রি

মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শেষাদ্রি মহাশয় ইংরাজীতে কতকগুলি শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার রচনাগুলি মাঝে মাঝে কলিকাতার 'কলেজিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাঁহার প্রবন্ধে স্বাধীন চিন্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনা ও পাঠ্য-তালিকা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার চিন্তাশীল প্রবন্ধরাজি দ্বারা আন্ধ্র প্রদেশের শিক্ষাজগতে আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান-পত্র পাঠ করিয়া একটি সুচিন্তিত মন্তব্য লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতবাসীকে সকল বিষয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। অধিকন্তু তিনি বিবেচনা করেন হিন্দুর দর্শন, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রতি ভারতীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় নাই—এই জন্য ভারতীয় ছাত্রগণের শিক্ষা সরস ও সম্পূর্ণ হইতে পারিতেছে না। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সর্ব্বতোভাবে জাতীয় সভ্যতার অনুকূল ও উপযোগী না করিতে পারিলে ভারতবর্ষে শিক্ষা-বিস্তারের সুফল ফলিবে না। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে চাহেন।

২৬। স্বদেশীর প্রতিষ্ঠালাভ

মেদিনীপুর হিতৈষী প্রকাশ :—"হিন্দুস্থান সমবায়-বীমা-মণ্ডলীর প্রধান সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় কতকগুলি বড় বড় দাবী সংক্রান্ত জটিল বিষয়ের মীমাংসা এবং টাকা প্রদান করিতে মেদিনীপুরে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি এখানে দুই তিন দিন অবস্থান করায় স্থানীয় গণ্য-মান্য সম্রান্ত ব্যক্তিবর্গ হিন্দুস্থান বীমা-মণ্ডলীর বহু তথ্য জ্ঞাত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

সমসাময়িক অন্যান্য বীমা কোম্পানী অপেক্ষা হিন্দুস্থান বীমা মণ্ডলীর কার্য্য যে সতেজে চলিতেছে তাহা অনেকেই জ্ঞাত ছিলেন; এবং সুরেন্দ্র বাবুর কথায় আরও

সমবায় সৌধ

হিন্দুস্থান-সমবায়-বীমা মণ্ডলীর নিজ সম্পত্তি

(হর্ম্ম্যসমবায় কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত)
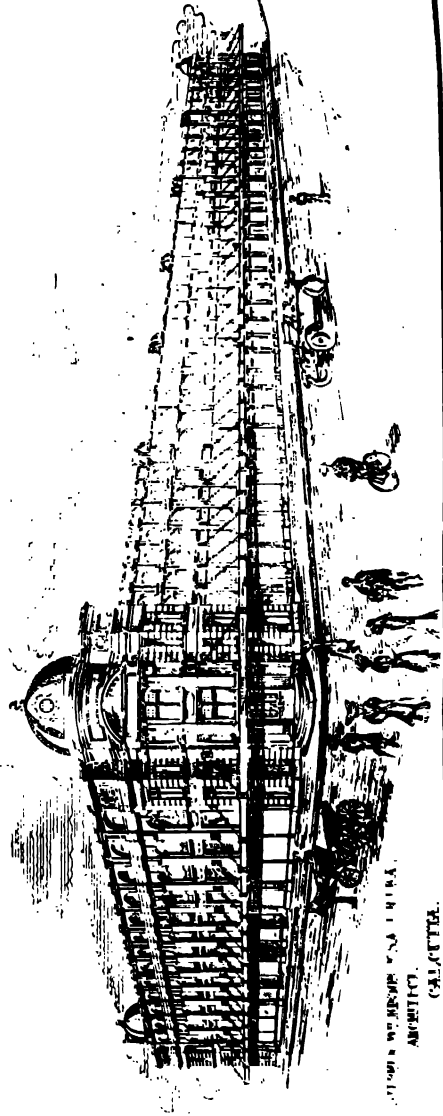
ARCHITECT.
CALCUTTA.

বুঝিলেন যে উক্ত কোম্পানী সঞ্চিত মূলধন যেরূপ উচ্চ হারে খাটাইতে সক্ষম হইয়াছেন তাহাতে উহার বীমাকারিগণ দাবীর উপর যথেষ্ট পরিমাণ লভ্যাংশ পাইবার আশা করিতে পারেন।

এতদ্ব্যতীত সমবায় নীতি অনুসারে পরিচালিত বীমা কারবারের আর একটি গুহ্য কথা সুরেন্দ্র বাবু প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই সমবায়-বীমা-মণ্ডলীর সদর কার্য্যালয় সমবেত-সঞ্চয়ের একটি ধনভাণ্ডার বিশেষ! তাহা হইতে মূলধনের স্রোত-প্রবাহ শতমুখে প্রবাহিত হইয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে। যে সকল বীমা-কোম্পানীর টাকা কোম্পানীর কাগজে বা অপরাপর "সিকিউরিটীতে" ন্যস্ত আছে বা বিদেশে খাটিতেছে তাহার উপস্বত্বের কোন অংশ আমাদের দেশের অভাব মোচনের কাজে আসে না। আমরা 'প্রিমিয়ম' আকারে সে টাকা যোগাইলাম, কিন্তু ফল ভোগে বঞ্চিত হইলাম। মূলধনের অভাবে আমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য ম্রিয়মাণ, অথচ আমাদেরই সমবেত সঞ্চয়ের টাকা লইয়া অপরে কতস্থানে কত ভাবে ধন-সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে। কিন্তু 'হিন্দুস্থানে'র গঠন-পদ্ধতির গুণে যাহারা যে কোন আকারে তাহাতে টাকা দিয়াছে তাহারা সর্ব্বতোভাবে সেই টাকার উপস্বত্ব ভোগের অধিকারী।"

'হিন্দুস্থান-বীমামণ্ডলী' বাঙ্গালীর স্বদেশী প্রচেষ্টার একটি উৎকৃষ্ট ফল। এই স্বদেশী প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতেছে দেখিয়া সকলেই আশান্বিত হইবেন। এই মণ্ডলীর কর্ম্মক্ষেত্র সমগ্র ভারতবর্ষ,—কেবল ভারতবর্ষই বলি কেন—সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, পারশ্য প্রভৃতি দূর বিদেশেও ইহাদের প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়াছে। সম্প্রতি এই বীমামণ্ডলী বিলাতকেও স্বকীয় কর্ম্মকেন্দ্রের মধ্যে টানিয়া আনিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এজন্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে এই মণ্ডলীর প্রতিনিধিস্বরূপ বিলাতে পাঠান হইয়াছে তিনি সেখানে থাকিয়া ইংলণ্ডবাসিগণকে বাঙ্গালীর এই যৌথকারবারটির সঙ্গে লিপ্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। বাঙ্গালীর চেষ্টা জয়যুক্ত হউক।

এই সঙ্গে আর একটি সংবাদ দেওয়াও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না হিন্দুস্থান-বীমামণ্ডলী এখন নিজের বাড়ীতে আসিয়াছেন। এই অট্টালিকা আটলক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইংরাজ পরিচালিত 'এঞ্জিনিয়ারিং জার্নাল' বলেন—"এত বড় অট্টালিকা সমগ্র ভারতে এই প্রথম।" এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন—বাঙ্গালীর আর একটি স্বদেশী কোম্পানী—'দত্ত সমবায়'।

সুতরাং বাঙ্গালী ব্যবসায় জানে। এত বিরোধের মধ্যেও সাত আট বৎসর স্বদেশী কোম্পানীগুলি বাঁচিয়া গেল। অতএব ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায়, আর বাজে লোকের সমালোচনায় কাণ দিবেন না।

২৭। ম্যালেরিয়া কমিশন

পাবনা হইতে নবপ্রকাশিত সাপ্তাহিক 'স্বরাজ' পত্রিকায় নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে :—

"ম্যালেরিয়া-কমিশনের কর্ত্তা মেজর ফ্রাই সাহেব তাঁহার সুদীর্ঘ রিপোর্টের একস্থলে বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া এই নূতন নহে, বা যথেচ্ছভাবে রেলরাস্তা-নির্ম্মাণ প্রভৃতি ম্যালেরিয়াবিস্তারের অন্যতম মুখ্য কারণ নহে; বাঙ্গালা দেশের নদী নালা চিরকালই এইভাবেই ছিল এবং রেলওয়ে বিস্তারের বহুপূর্ব্বেই ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী এখানে পূর্ণভাবে স্বীয় একাধিপত্য বিস্তার করিতেছিল।

মেজরসাহেবের এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে আমরা একেবারে অবাক্ হইয়াছি। কি প্রকার স্বাধীন গবেষণার দ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, রিপোর্টে তাহা প্রকাশ করেন নাই। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে কোনই অনুসন্ধান করেন নাই বা করিবার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন নাই। তাঁহার পূর্ব্বগামী কোনও ইউরোপীয় রাজপুরুষ না কি এই কথা বলিয়াছেন, তাই মেজর সাহেব তাঁহার কথা অভ্রান্ত সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা বুঝিতে পারি না গবর্ণমেণ্ট এইরূপ কমিশন দ্বারা শুধু অর্থব্যয় ব্যতীত অন্য কি ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। বঙ্গদেশের আর্থিক সামাজিক প্রভৃতি বিষয়ের জন্য বাঙ্গালীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইতে মোটা বেতনে আহির বিলাতী সাহেবের আমদানী দ্বারা এ সমস্ত জটিল সমস্যার নিরাকরণ হইতে পারে এমন বিশ্বাস আমাদের নাই।

মেজর সাহেব যে সম্পূর্ণ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ঐতিহাসিক মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। বঙ্গদেশ চিরকালই নদীমাতৃক দেশ বলিয়া খ্যাত ছিল। ১০০। ১৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার বাণিজ্যসম্পদ কম ছিল না। এই বাণিজ্যের লোভেই ইংরাজগণ এদেশে প্রথম আগমন করেন। তখন কিন্তু দেশে রেল ছিল না, এই বিশাল বাণিজ্যের প্রায় ষোল আনাই দেশের নদনদীর সাহায্যে চলিত। আমরা নিজের কথা কিছু বলিতে চাহি না। মেজর সাহেব যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বার্ণিয়ার প্রভৃতি যে সমস্ত ইউরোপীয় পর্য্যটক ব্যবসায়ের খাতিরে এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করেন, তাহা হইলেই আমাদের উক্তির যৌক্তিকতা বুঝিতে পারিবেন।

অবশ্য আমরা এ কথা বলি না যে ম্যালেরিয়া এদেশে কোন কালেই ছিল না। কিন্তু ইহা অবিসম্বাদী সত্য যে ৫০। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ রেলওয়ে বিস্তারের পূর্ব্বে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এত ছিল না। তখন বঙ্গদেশের নদনদী সজীব ছিল, পানীয় জলের অভাবে লোকে কষ্ট পাইত না, বা প্রতিবৎসরে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য সকলকে দেওঘর, মধুপুর বা পুরী যাইতে হইত না, বাঙ্গালী তখনও এত ক্ষীণজীবী ছিল না। ১৮৫৪ সালে প্রথম রেল-লাইন খোলা হয়। তারপর এখন ক্রমে ক্রমে রেল-লাইনে বঙ্গদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইংরেজ সওদাগরগণই এই সমস্ত রেল-লাইন খোলার প্রধান পাণ্ডা, সুতরাং যাহাতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিস্তার ও সুবিধা হয় কেবল সেই-দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল, দেশের জল নিকাশ বা অন্যান্য সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি তাঁহাদের কোনও দৃষ্টি ছিল না। নিরপেক্ষ

ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে যে এইরূপ যথেচ্ছভাবে রেলরাস্তা নির্ম্মিত হওয়াতে দেশের জলনিকাশের যথেষ্ট ব্যাঘাত হইয়াছে, ছোটবড় নদীসকল ক্রমে মরিয়া গিয়াছে বা যাইতেছে, এমন কি পদ্মানদীতেও গ্রীষ্মকালে নৌকা ঠেকিয়া যায়! অথচ মেজর সাহেব বলিয়াছেন কি না বাঙ্গালাদেশের নদনদীর অবস্থা ইহা অপেক্ষা কোন কালেই ভাল ছিল না! ইউরোপীয় রাজপুরুষগণের অধিকাংশেরই একটা দোষ আছে এই যে তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ধারণা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, ফলে, কোনরূপ স্বাধীন ন্যায়সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। কিন্তু তাঁহাদের এই ভ্রমসিদ্ধান্ত যে কতদূর ক্ষতিজনক তাহা দেখিবার ক্ষমতা বা অবসর তাঁহাদের নাই। বৃদ্ধদের নিকট আমরা শুনিয়াছি যে কিঞ্চিদধিক ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলা বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু রেল-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ম্যালেরিয়া দেখা দেয় এবং আজ বর্দ্ধমানের মত ম্যালেরিয়া বাঙ্গালায় খুব কম স্থানেই আছে। বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলার সম্বন্ধেও এ কথা কম-বেশী কিছু কিছু খাটে। মেজর সাহেব কি আমাদের এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারেন?

বাঙ্গালী কিছু চিরদিনই এরূপ ক্ষীণজীবী, কঙ্কালসার ছিল না। সামরিক বিদ্যাতে প্রসিদ্ধিলাভ করুক বা না করুক, তাহার বাহুতে যে যথেষ্ট বল ছিল তাহা প্রমাণের জন্য বড় বেশী দূর যাইতে হয় না। বেশী দিনের কথা নয়। পাবনা জেলার অনেকেই বোধ হয় শালঘর নিবাসী মৃত কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয়ের শারীরিক শক্তির বিষয় শুনিয়া থাকিবেন। কথিত আছে, একদা মৃত মজুমদার মহাশয় ছাতা না লইয়া গ্রামান্তরে রওনা হন। কিন্তু পথিমধ্যে বৃষ্টি আইসে। তখন অনন্যোপায় হইয়া তিনি নিকটবর্ত্তী কোন খাল হইতে ছোট একখানি নৌকা তুলিয়া লইয়া তাহাই মাথায় ধরিয়া গন্তব্য স্থানে উপনীত হন। আর একবার তিনি অশ্বারোহণে কোথায় যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একটি অল্পপরিসর অথচ গভীর খাল ছিল, তিনি ভাবিলেন ঘোড়াটি যেরূপ দুর্ব্বল তাহাতে তাহাকে লইয়া উহার পক্ষে লম্ফদ্বারা খাল অতিক্রম করা সম্ভবপর নহে। তখন তিনি নিজেই ঘোড়াটিকে বগলে ধরিয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক খাল পার হইলেন! এ কথা হয় ত আজকাল অনেকেই বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। কিন্তু ইহার একবর্ণও অতিরঞ্জিত বা কল্পিত নহে। উক্ত মজুমদার মহাশয় মাত্র ৮।১০ বৎসর হইল প্রায় শত বৎসর বয়সে কাশীপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র এখনও জীবিত আছেন। কিন্তু হায়, কি শোচনীয় পরিণাম! দুরন্ত ম্যালেরিয়ার আক্রমণে ভীমসদৃশ কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয়ের পুত্র আজ দু'বেলা ভাত হজম করিতে পারেন না!

কিন্তু ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ শক্তিশালী ব্যক্তি এদেশে বিরল ছিল না। গ্রামে গ্রামেই অনেক কৃষ্ণধন পাওয়া যাইত। কিন্তু এই ৫০ বৎসরে দেশের যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। অনেক কারণ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ম্যালেরিয়া যে ইহার একটি মুখ্যকারণ তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আর দেশের নদনদীর শোচনীয়

পরিণাম যে ম্যালেরিয়া বিস্তারের অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই

২৮। জয়দেব ও চণ্ডীদাস

সেদিন রামপুরহাটে জয়দেব ও চণ্ডীদাসের স্মৃতি-রক্ষার জন্য একটা সাহিত্য-সভার বৈঠক হইয়া গিয়াছে। বীরভূমের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ কবিবর শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম্, এ, সি, এস্, মহাশয় বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। সেই সভায় একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। 'বীরভূমবাসী' পত্রিকা হইতে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

"কাহাকেও সম্মান করায় হীনতা প্রকাশ পায় না। আমরা যখন কাহাকেও সম্মান করি, তখন গুণেরই সম্মান করিয়া থাকি। সদ্‌গুণ থাকিলে সম্মান করি, আর অসদ্‌গুণ থাকিলে ঘৃণা করি। কাজেই গুণবান ব্যক্তির সম্মান না করিলে বুঝিতে হইবে যে, আমরা সদ্‌গুণ কি তাহা বুঝিতে পারি না। ইহাতে আমাদের হৃদয়ের দীনতাই প্রকাশ পায়, গুণবান ব্যক্তির তাহাতে কিছু আসে যায় না। ইংরাজ প্রভৃতি জাতি যে জগতে এত বড় হইয়াছে তাহার কারণ এই যে তাহাদের নানা সদ্‌গুণ আছে, আর তাহারা গুণের আদর করিতে জানে। এ যে দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কার করিতে যাইয়া স্কটসাহেব প্রাণ হারাইয়াছেন, তাহার জন্য ইংরাজ কি না করিতেছেন! প্রত্যেক ইংরাজের হৃদয় তাঁহার পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে! তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য বিপুল আয়োজন করিতেছে। যাও সেক্সপীয়রের জন্মভূমি গিয়া দেখ, ইংরাজ কেমন গুণের পূজা করিতে জানে। কবির জন্মভূমি আজ প্রত্যেক ইংরাজের তীর্থস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম যদি মানুষের প্রাণ থাকে, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে, তবে সে গুণের আদর করিবেই। আর বাঙ্গালী আমরা, আমরা আজ সব হারাইয়াছি। কালের কুটিল চক্রে বদ্ধ হইয়া আমরা কেবলই ঘুরিতেছি, আমাদের মাথা ঘুরিতেছে, আমরা সদসৎ বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। নহিলে কি আজ কবি-কোকিল জয়দেবের মধুর কাকলি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না? নহিলে কি চণ্ডীদাসের অমৃতময়ী কবিতা আমাদের কর্ণে অমৃত ঢালিয়া দেয় না? নহিলে কি আজ জয়দেব-চণ্ডীদাসকে আপনার জন ভাবিয়া তাহাদের চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিই না?

জয়দেব চণ্ডীদাস যে আমাদের নিজের লোক। তাঁহারা ত আমাদের পর নহেন। তাঁহারা উভয়েই এই বীরভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া, এই বীরভূমেই রাধাকৃষ্ণের মধুর নাম গাহিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সঙ্গীত-তরঙ্গ বঙ্গদেশ ভাসাইয়া ভারত প্লাবিত করিয়াছে। সুদূর ইয়ুরোপখণ্ডেও তাঁহাদের যশোগীতি ধ্বনিত হইতেছে। জয়দেব চণ্ডীদাস জগতের সমক্ষে বাঙ্গালার, বীরভূমবাসীর মান বাড়াইয়া গিয়াছেন। জগৎ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে বীরভূমবাসীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতেছে, ইহাদেরই মধ্যে জয়দেব চণ্ডীদাসের ন্যায় মহাকবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জয়দেব চণ্ডীদাসের গুণ ইহাদের মধ্যে অবশ্যই আছে। একবার যখন

হইয়াছে, তখন আবার ইহাদের মধ্য হইতে জয়দেব চণ্ডীদাস জন্মিতে পারে। জয়দেব চণ্ডীদাস আমাদের এতটা মান বাড়াইয়া গিয়াছেন। কে তোমার বীরভূমকে চিনিত? এই দুই মহাকবির জন্যই আজ কেন্দুবিল্ব নান্নুর সভ্যজগতে সুপরিচিত হইয়াছে। আর জয়দেব চণ্ডীদাসের দেশের লোক বলিয়া আমরাও সম্মানিত। তাই আমাদের বীরভূমের কবি নবীন বাবু দর্পভরে বলিয়াছেন,—

কে বলে তোমারে মাতা দীনাকন্যা অশিক্ষিতা,
তোমার গৌরব কথা আধুনিক নয়।
কবিকুল চূড়ামণি ভাবের অমৃত খনি
মহামান্য জয়দেব তোমার তনয়।
চণ্ডীদাস অন্যতর গীতি কাব্যে পুরন্ধর
অমর তনয় তব, কার ইহা হয়?
সুসন্তান প্রসবিয়া লভেছ যে যশঃ
তাহা সামান্য ত নয়।

কিন্তু হায়! এই মহাকবিদ্বয়ের জন্মস্থানে তাঁহাদের ন্যায় মহাপুরুষের উপযুক্ত কি স্মৃতি-চিহ্ন আছে? কিছুই নাই। "কেন্দুবিল্ব সমুদ্রসম্ভব রোহিণীরমণের' সাধের কেন্দুবিল্ব আজ শুকাইয়া গিয়াছে। "নান্নুরের মাঠে গ্রামের বাটে বাশুলি বৈঠে যথা" তাহা আজ যেন শ্মশানের বিভীষিকা হৃদয়ে ধরিয়া দিতেছে। যে স্থানে চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের গুণগান করিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে সেখানে আজ এক প্রকাণ্ড সমুন্নত স্তূপ ভিন্ন আর কিছু নাই। তাহার পার্শ্বে যে "বাশুলি আদেশে গাহে চণ্ডীদাস" সেই বিশালাক্ষী দেবীর জীর্ণ মন্দির বাঙ্গালীর ঔদাসীন্য ও প্রাণহীনতার উজ্জ্বল নিদর্শন স্বরূপ অতি দীনভাবে দাঁড়াইয়া আছে। কীর্ণাহারে যেখানে রজকিনী সহ চণ্ডীদাস সমাহিত হন, সেই স্থানে এক মন্দিরের ভগ্নস্তূপে নানাবিধ বৃক্ষ বায়ুবেগে স্বন্‌স্বন্‌ শব্দ করিয়া কবির জন্য যেন দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। বীরভূমবাসিগণ, আপনাদের জয়দেব ও চণ্ডীদাসের কবিতা গীতিকাব্য-জগতে অতুলনীয়। এমন সুললিত কবিতা, এমন প্রেমময় ভাব পৃথিবীর কোন সাহিত্যে নাই। ইহা কি আমাদের স্পর্দ্ধার বিষয় নহে? আমাদের সব গিয়াছে, কিন্তু আছে আমাদের পদাবলী সাহিত্য। এ হেন পদাবলী-সাহিত্যের জনক জয়দেব ও চণ্ডীদাস আমাদেরই বীরভূমের। আমরা তাঁহাদের সম্মান করিব না? তবে কে করিবে? এতদিন আমরা আমাদের কবিদ্বয়ের সম্মান না করিয়া আপনার মুখে প্রচুর কালিমা লেপন করিয়াছি। ঐ দেখ আমাদের কবি জজ নন্দাচরণ আমাদের সেই কালিমা মুছাইবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। তিনি নিজে কবি, তাই কবির মহিমা বুঝিয়া তাঁহাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের জন্য আমা-দিগকে আহ্বান করিতেছেন। আজ যদি তাঁহার আহ্বানে আমাদের চৈতন্য না হয়, আমরা যদি তাঁহার কথায় আমাদের কলঙ্ক-মোচনের জন্য ব্যগ্র না হই, তবে বিপুলকায়া জাহ্নবীর অগাধ জলেও আমাদের মুখের কালিমা বিধৌত হইবে না।"

২৯। ভ্রমপ্রদর্শন

দিনাজপুরের বালুরঘাট হইতে পূর্ব্ববঙ্গের উদীয়মান প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্, এ, মহাশয় লিখিয়াছেন:—

"চৈত্র সংখ্যা গৃহস্থে মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত এক খানি মূর্ত্তির ফটোগ্রাফ বাহির হইয়াছে। মূর্ত্তিখানিকে গৃহস্থে ভৈরবী মূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত করান হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয় তাহা ঠিক হয় নাই। ফটোগ্রাফ দেখিয়া যতদূর ঠিক করা যায় তাহাতে এই দেখা যায় যে একটি অর্দ্ধোপবিষ্ট চতুর্ম্মুখ দশহস্তে নানা প্রহরণধারী পুরুষের বাম উরুর উপর একটি ত্রি-আননী দশহস্তে দশপ্রহরণধারিণী স্ত্রীমূর্ত্তি অর্দ্ধোপবিষ্টা এবং উভয় মূর্ত্তি দুইটি শয়ান শবের উপর স্থিত। সকলের নীচে বাহনের স্থানে একটি হংসারূঢ়া স্ত্রীমূর্ত্তি। মূর্ত্তিখানা শুক্রাচার্য্যের রাজসিক শ্রেণীভুক্ত ঘোর তান্ত্রিকমূর্ত্তি। মূর্ত্তিখানার সমস্ত ক্ষুদ্র অংশগুলি ছবিতে ভাল দেখা যায় না, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে মূর্ত্তিখানা হয় হরপার্ব্বতীমূর্ত্তির প্রকারভেদ, না হয় বৌদ্ধ হলাহল লোকেশ্বরের প্রকার-ভেদ। পুরুষ-মূর্ত্তিটি যদি উর্দ্ধলিঙ্গ হয় এবং মূর্ত্তির উপরিভাগে যে তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে তাহার দুইটি যদি কার্ত্তিকের ও গণেশের মূর্ত্তি হয় তবে নিশ্চয় ইহা হরপার্ব্বতী মূর্ত্তি। দক্ষিণধারের ক্ষুদ্রমূর্ত্তিটি গণেশের বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু ছবিতে ভাল দেখা যায় না। সর্ব্বোপরিস্থিত ক্ষুদ্র মূর্ত্তি খানি যদি ধ্যানী বুদ্ধের হয় তবে সম্পূর্ণমূর্ত্তিখানি হলাহল লোকেশ্বরেরই। হলাহল লোকেশ্বর এবং হরপার্ব্বতী একই দেবতা, এবং তাহাদের রূপ-কল্পনাও এক রকমেরই, তবে তিনি দুই ধর্ম্মে গৃহীত হইয়া দুই নামে অভিহিত হইয়াছেন। হরপার্ব্বতীর ধ্যান যথা :—

বন্দে সিন্দুরবর্ণং মণিমুকুটলসচ্চারুচন্দ্রাবতংসং
ভালোদ্যন্নেত্রমীশং স্মিতমুখকমলং
দিব্যভূষাঙ্গরাগং।
বামোরুন্যস্তপানেররুণকুবলয়ং সন্দধত্যাঃ
প্রিয়ায়া
বৃত্তোত্তুঙ্গস্তনাগ্রে নিহিতকরতলং
বেদটঙ্কেষ্টহস্তং ॥

এই ধ্যানের সঙ্গে মূর্ত্তিখানির মিল আছে, তবে আসনের দুইটি শব, বাহন হংসারূঢ়া স্ত্রী এবং কতকগুলি অতিরিক্ত এই মূর্ত্তি খানির বিশেষত্ব। হস্ত ও মুখের অতিরিক্ত বৃদ্ধি শেষকালের শৈব তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ বজ্রযান মতের দেবতাগণের বিশেষত্ব। নেপালের দেবতাগণের হস্ত ও মুখ বৃদ্ধি অসাধারণ। চৈত্রের ভারতীতে এইরূপ একটি বহু হস্ত ও মস্তকবিশিষ্ট দেবমূর্ত্তির ছবি বাহির হইয়াছে, উহা দেখিয়াই বোধ হয় যে উহা নেপালী অথবা তিব্বতীয় শিল্প-প্রসূত।

এই সমস্ত পাথরের ও ধাতুর মূর্ত্তি বাঙ্গালা দেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই দুই চারি খানা পাওয়া যায়। যাহারা এই সকলের অনু-সন্ধানে কিছু ঘুরিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে লোক-সাধারণ এই সকল মূর্ত্তির নাম ও পরিচয় বিষয়ে কিরূপ অজ্ঞ। কোথাও বিষ্ণুমূর্ত্তি বুড়াকালী বলিয়া পূজিত হইতেছে, কোথাও বা ধ্যানীবুদ্ধ সরস্বতী আখ্যা লাভ করিয়াছে! এই রকম সর্ব্বত্র। এই অবস্থায় যাঁহারা প্রাচীনমূর্ত্তি ইত্যাদির বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেন অথবা তাহাদের পরিচয় সাধারণ্যে প্রকাশিত করেন, তাঁহাদের আরও অবধান বলম্বন করা আবশ্যক।"

পল্লী-সেবক*

ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র—পল্লীগ্রাম ;
ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্র—সহর

বাঙ্গালাদেশে কয়েকবৎসর হইতে শিক্ষা-বিষয়ক আন্দোলন চলিতেছে। দেশের আধুনিক শিক্ষা যে দেশবাসীর উপযোগী নহে তাহা অনেকে বুঝিয়াছেন। নূতন প্রকারের অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এমন কি নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। কিন্তু এই বিদ্যালয় এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বারা দেশবাসীর প্রকৃত অভাব মোচন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে না। দেশবাসী কাহারা এবং দেশবাসীদের প্রকৃত অভাব কি—এ বিষয়ে আমাদের অনেক সময়ে ভুল ধারণা থাকে। কেবল মাত্র ধনী এবং মধ্যবৃত্ত সম্প্রদায় লইয়া দেশ নহে, কয়েকটি সহর মিলিয়া দেশ গঠিত হয় নাই। বাঙ্গালা দেশকে বুঝিতে হইলে সহরের বড় রাস্তা, আফিস-আদালত ছাড়িয়া শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে ছায়া-সুনিবিড় পল্লীগ্রামে আসিতে হইবে। দেশবাসীর হৃদয় বুঝিতে হইলে স্বদেশহিতৈষীর বক্তৃতা এবং উকিল-হাকিমের জারিজুরীর প্রতি মনোযোগ না দিয়া, যে কৃষক ক্ষেত্রে লাঙ্গল ঠেলিতে ঠেলিতে রাম-প্রসাদী গান ধরিয়াছে তাহার গান শুনিতে হইবে। বাস্তবিক বাঙ্গালাদেশে সহরের সংখ্যাই বা কত? খুব জোর ১২০, কিন্তু গ্রামের সংখ্যা ২০৩,৬১৪। দেশবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন পল্লীগ্রামে এবং কেবল মাত্র ৫ জন সহরে বাস করে। সুতরাং বাঙ্গালীর কোন অভাব মোচন-উদ্দেশ্যে বিশেষ কোন আয়োজন করিবার সময় যদি পল্লীবাসীদের কথা ভুলিয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে উহাকে বাঙ্গালীর অনুষ্ঠান বলা যায় না।

বাস্তবিকপক্ষে "দরিদ্রের পর্ণ-কুটিরেই জাতির জীবন"—এ কথা আমাদের দেশের প্রতি বিশেষ প্রযোজ্য। ইহার কারণও আছে। বাণিজ্য-ব্যবসায়ের ভিত্তির উপর সহরের সৃষ্টি। পাশ্চাত্য জগতের বৈষয়িক এবং রাজনৈতিক উন্নতি বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ জন্য সেখানে সহরগুলিই সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ। কয়লার খনি, অথবা শিল্প-দ্রব্যের উপাদান যেখানে সহজে পাওয়া যায়, দ্রব্য প্রস্তুত-করণ বা দ্রব্যবিক্রয়ের যেখানে সুবিধা আছে, সেখানে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, অসংখ্য শ্রমজীবী এবং ব্যবসায়ী আসিয়া সেখানে সহর সৃষ্টি করে। বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতি-মূলক সভ্যতা সহরেই পরিপুষ্ট এবং বর্দ্ধিত হয়। আমাদের দেশে ইহার ঠিক বিপরীত দেখা যায়। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতির উপর ভারতবর্ষের জাতীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত নহে। প্রাকৃতিক জন্ম-নিকেতনের প্রভাব হেতু আমাদের দেশ

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চট্টগ্রাম অধিবেশন উপলক্ষে লিখিত।

কৃষিকার্য্যে উন্নতি লাভ করিয়া অতি প্রাচীন কালেই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। পাশ্চাত্য-জগতে সহরগুলি যেরূপ বাণিজ্য-ব্যবসায় দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে, আমাদের দেশের গ্রামগুলি সেরূপ কৃষিকার্য্যের উন্নতির দ্বারা বিশেষ পুষ্টি লাভ করিয়াছে। এ জন্য ভারত-বর্ষের সভ্যতা পল্লীগ্রামেই বিকাশ লাভ করিয়াছে—সহরে, রাজধানীতে নহে। আধুনিক ইউরোপের সমস্ত বড় বড় সামাজিক, বৈষয়িক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আন্দোলনগুলি সহরে উদ্ভূত হইয়া সেখানকার চিন্তা এবং কর্ম্মজীবনের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে পল্লীগ্রামে পৌছিয়া থাকে। আমাদিগের দেশে ইহার ঠিক বিপরীত। আমাদিগের অতীত ইতিহাসের সমস্ত আন্দোলনগুলি পল্লীগ্রামের চিন্তা দ্বারা পুষ্ট হইয়া ক্রমে সমগ্র দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। আমাদিগের যাবতীয় দর্শন এবং বিজ্ঞানের সত্যসমূহ তপোবনেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বশিষ্ঠ, কপিল, বিশ্বামিত্র, শঙ্করাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া নানক, গুরুগোবিন্দ, রামদাস, তুকারাম, কবীর, চৈতন্য পর্য্যন্ত, যাঁহারা ভারতবর্ষের শিক্ষা-গুরু, যাঁহাদিগের মধ্যে ভারতবর্ষের অন্তরতম প্রাণ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, তাঁহারা সকলেই লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনাদিগের সাধনায় সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। ভারতীয় সভ্যতার বৈচিত্র্য পল্লীজীবনের চিন্তা এবং কর্ম্মপ্রণালীর দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে পল্লী ও নগরের ভাব-বিনিময়

কিন্তু পল্লীগ্রামে যে ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ হইয়াছিল, তাহার ফলে সহরগুলিও অনতিবিলম্বে নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিত। ভারতবর্ষের প্রধান নগরগুলি অধিকাংশই দেবতার আবাসভূমি, পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্র। বৎসর বৎসর অসংখ্য তীর্থ-যাত্রিগণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের পল্লীসমূহ হইতে যখন সেই সকল নগরীতে উপস্থিত হইত, তখন নানাধর্ম্মমতাবলম্বীদের মধ্যে নূতন নূতন বিষয়ের আলোচনা হইত, নূতন বিজ্ঞান এবং দর্শনবাদের মীমাংসা হইত, যাহা সত্য তাহা গৃহীত এবং তাহারই প্রচার হইত। এইরূপে মহানগরী এবং তীর্থক্ষেত্রসমূহেই ভারতবর্ষের সমগ্র চিন্তা এবং কর্ম্মের আন্দোলনগুলির শৃঙ্খলা ও সমন্বয় সাধিত হইত। ভারতবর্ষের সমস্ত মহাপুরুষগণ সাধু এবং বিদ্বৎ-মণ্ডলীর নিকট তাঁহাদিগের সত্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এই সকল স্থানকেই শ্রেষ্ঠ স্থান মনে করিতেন। অসংখ্য নরনারীর চিন্তা এবং কর্ম্মজীবনের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদিগের সত্যগুলি এইরূপে একটা বিচিত্র এবং অসীম শক্তি লাভ করিত, তখন প্রচার-কার্য্যের আর কোন বিঘ্ন থাকিত না। মহর্ষি বশিষ্ঠের ধর্ম্মজীবনের সহিত অযোধ্যানগরী এবং যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত মিথিলানগরী বিশেষ সংশ্লিষ্ট। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের সূচনা পাটলিপুত্র নগরীতেই হইয়াছিল, বাবা নানক এবং গুরুগোবিন্দের ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে অমৃতসহরনগরী, তুকারাম এবং রামদাসের ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে পুণা ও সতারানগরী এবং চৈতন্যদেবের ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে গৌড়নগরী ও শ্রীধামক্ষেত্র বিশেষ সংশ্লিষ্ট। পল্লীগ্রাম এবং নগর-জীবনের মধ্যে এরূপ

ভাবের আদান-প্রদানের সম্বন্ধ থাকায় আমাদিগের দেশে সত্য আবিষ্কার এবং সত্য-প্রচারের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

সহর এবং পল্লীগ্রামের সে সম্বন্ধ এখন লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। ভারতবর্ষের পল্লীগ্রামে সম্পূর্ণ নূতন নূতন শক্তিপুঞ্জের আবির্ভাব হইয়াছে। দেশে অসংখ্য রেলের রাস্তা স্থাপিত হইতেছে, সহরের ছাপাখানায় অসংখ্য দৈনিক, সাপ্তাহিক ছাপা হইয়া প্রত্যহ গ্রামে গ্রামে বিক্রীত হইতেছে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য আর পুরাতন নিয়মে চলিতেছে না। পোষ্টমাষ্টার বাবু এবং পিয়নের সঙ্গে ব্যাপারী এবং পাইকারগণও দেখা দিয়াছে। গুরুমহাশয়ের টোল উঠিয়া গিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে নিম্ন-প্রাথমিক এবং উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হইতেছে। মাঝে মাঝে নরমাল স্কুলে পাশ ইন্‌স্পেক্টর বাবুও দেখা দিতেছেন। হাট-বাজারে কেবলমাত্র স্বদেশীয় কৃষি এবং শিল্পজাত দ্রব্য যে বিক্রয় হয় তাহা নহে, সহর হইতে চিনি, বিলাতী কাপড় এবং কেরোসিন তৈলের আমদানী হইতেছে। মণিহারী দোকান বেশ পসার জমাইয়াছে।

পল্লীগ্রামগুলি সমস্ত বিষয়ে সহরের অনুগামী হইবার জন্য ব্যস্ত। সহরে যে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতিপত্তি, সমস্ত গ্রামগুলি তাহাই অনুকরণ করিবার জন্য লালায়িত। পল্লীগ্রাম এবং নগরের পূর্ব্বেকার ভাব-বিনিময়ের সম্বন্ধ আর নাই। নগরগুলিই এখন দৃষ্টান্তস্থল এবং পল্লীগ্রাম তাহার অনুগামী মাত্র।

আধুনিক ভারতে পরানুকরণ

আমাদিগের একটা বিশেষ দুর্ভাগ্য এই যে,—ইউরোপ তাহার কত শতাব্দীর বিপুল প্রয়াস, দুঃখ এবং সঙ্কীর্ণতার মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশের ফলে যে অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহা নকল করিতে পারিলেই আমরা আমাদিগকে ধন্য মনে করি। সে অবস্থায় উপস্থিত হইবার জন্য সমাজের কিরূপ বল এবং সামর্থ্য আবশ্যক তাহা ভাবিয়া দেখি না। সে অবস্থায় আমাদিগের সমাজ তদুপযোগী ব্যবস্থা করিয়া বিকাশ লাভ করিতে পারিবে কি না, তাহা চিন্তা করিবার অবসর থাকে না। আরও দুঃখের বিষয় এই যে—ইউরোপের সেই অবস্থা ইউরোপীয় সমাজের পক্ষেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং শান্তিদায়ক কি না এবং মানবসভ্যতার কত দূর পরিপোষক, তাহা আমাদের বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদিগের দেশে বৈষয়িক অবনতি হইয়াছে, অমনি আমরা ইউরোপের অর্থোৎপাদন-প্রণালীগুলি নকল করিয়া চারিদিকে কলকারখানা খুলিতেছি। ইউরোপ বাণিজ্য-ব্যবসায় দ্বারা ধনী হইয়াছে, অমনি আমরা কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া একেবারে সহরে আসিয়া উপস্থিত। ইউরোপীয় সভ্যতা নগর-জীবন-গঠনকেই তাহার একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে, এই জন্যই পল্লীজীবনের প্রতি আমাদিগেরও বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, নাগরিক জীবনকে আদর্শ মনে করিয়া আমরাও স্বকীয় সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন করিতেছি। ফলতঃ, ভারতবর্ষ আধুনিক ইউরোপকে অনুকরণ করিয়া তাহার পল্লী-জীবন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছে; ইহাতে কেবলমাত্র যে তাহার সভ্যতাবিকাশের পথ রুদ্ধ হইবে তাহা নহে, পরন্তু ইহাতে আমাদের বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা

আছে। ইউরোপকে এ বিষয়ে অনুকরণ করিতে যাওয়া আমাদিগের যে একটি জাতীয় প্রকৃতি-বিরুদ্ধ এবং ইতিহাসবিরুদ্ধ কাজ হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ।

আমাদিগের দেশে আধুনিককালে কতকগুলি সহর নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে আমাদিগের এখনও হৃদয়ের কোন সংযোগ হইতে পারে নাই। ইউরোপ হইতে আমরা আমাদিগের সহরে সভা, সমিতি, ইউনিয়ন, ক্লাব, লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপালিটী সমস্ত লইয়া আসিয়াছি, কিন্তু এগুলির সেরূপ প্রাণ নাই। উহাদিগকে আমরা আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারি নাই।

ভারতবর্ষের সমাজ ইউরোপীয় সভ্যতাকে এখনও আপনার নিগূঢ় প্রাণশক্তিদ্বারা নিজস্ব করিয়া লইতে পারে নাই। ভারতবর্ষের নগরজীবনে ইউরোপীয় নগরজীবনের অন্ধ এবং মূঢ় অনুকরণ হইয়াছে মাত্র।

অন্যদেশের মাটী হইতে শিকড় উৎপাটন করিয়া কোন গাছকে যদি সম্পূর্ণ বিভিন্নস্থানে আনা যায়, সে ঐ নূতন মাটীর রস আকর্ষণ করিতে না পারিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ইউ-রোপীয় বিবিধ অনুষ্ঠানগুলিরও আমাদিগের দেশে আসিয়া সেই অবস্থা হইয়াছে। ভারত-বর্ষের সনাতন ভূমির সঙ্গে উহাদিগের কোন পরিচয় হয় নাই এবং কখন হইবে কি না তাহা বলা যায় না। অধিকন্তু, আমাদের স্বকীয় মনুষ্যত্বটুকুও হারাইতে বসিয়াছি। ইউরোপীয় সভ্যতার বাহ্য জড় অংশকে সহজে অনুকরণ করিবার ফলে আমাদিগের বিশেষত্ব—সামা-জিক জীবনের নিষ্ঠা-সংযম, আধ্যাত্মিকতা এবং ব্যক্তিগত জীবনের ভক্তি, প্রেম ও বৈরাগ্য ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। ভগবানে অবিশ্বাস, অর্থপৈশাচিকতা, গৃহবন্ধনের শৈথিল্য, চরিত্র-হীনতা, বিলাস-প্রিয়তা প্রভৃতি পাপ আমা-দিগের নাগরিক জীবনকে আক্রমণ করিয়াছে।

পল্লীজীবনের স্বাতন্ত্র্যলোপে আধুনিক ইউরোপের অবনতি

আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতায় নগরজীবন এবং পল্লীজীবনের কি সম্বন্ধ তাহা এখন ভাবিবার বিষয়। সেখানকার পল্লীজীবন এবং নগরজীবনের যে সম্বন্ধ আছে তাহা কি আমাদের আদর্শ হইবার যোগ্য?—আমাদিগের অনুকরণ স্থল? পাশ্চাত্য জগতে গ্রামগুলি সমস্ত বিষয়েই সহর এবং নগরীকে অনুকরণ করে। নগরগুলি এরূপে সমস্ত বিষয়ে গ্রামের চিন্তা এবং কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তাহার ফলে জাতীয় সভ্যতা বিভিন্নমুখী না হইয়া একমুখী হইতেছে, বৈচিত্র্যের পরিবর্ত্তে প্রাণহীন অন্তঃসারশূন্য সমতা আসিয়া সমাজকে আক্রমণ করিয়াছে। পল্লীবাসীদিগের নিজস্বরুচি আর নাই, "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ," এ কথা এখনকার পাশ্চাত্য সভ্যজগতে খাটে না। যাহা সহরের রুচি তাহাই গ্রামে আদৃত হইবে। এ জন্য লণ্ডন, প্যারী, নিউ-ইয়র্কের হাটবাজারে দ্রব্য যাচাই না করিয়া কোন ব্যবসায়ী সন্তুষ্ট হয় না, কারণ সেখানে যদি উহার আদর না হয় তাহা হইলে দেশের কেহই উহা লইবে না। যাহা কিছু নূতন—বিলাসের সামগ্রী হউক অথবা চিন্তাশীল ব্যক্তির গভীর গবেষণার ফল বা পাগলের বিকৃত মস্তিষ্কের নিদর্শন হউক না কেন,—উহার দ্বারা যদি সহর একবার

মাতিয়া উঠে, তাহা হইলে সমগ্র দেশে উহার আদরের সীমা থাকে না। রাজধানী হইতে সমস্ত দেশ জুড়িয়া শতধারায় যে বন্যার জল বহিতে থাকে, তাহাতে পল্লীগ্রাম ও সহরের সকল বিশেষত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য একেবারেই ধুইয়া যায়। গ্রাম্য সাহিত্য, গ্রাম্য শিল্পকলা, গ্রাম্য আচার-ব্যবহার এবং আমোদ-প্রমোদ ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। গ্রামের আপনার হৃদয় বা প্রাণ নাই, গ্রাম এখন সহর এবং রাজধানীর ছায়ামাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে পাশ্চাত্য জগতে সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ সহরগুলি তাহাদিগের নিজেদের মাপকাঠির দ্বারা দেশের সমস্ত চিন্তা এবং কর্ম্মকে বিচার করিতেছে। এই ঐক্য ও সমতা এখন সভ্যতার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পল্লীজীবনের স্বাতন্ত্র্য এবং বিশেষত্ব লুপ্ত হইয়া জাতীয় সভ্যতাকে অনেক পরিমাণে খর্ব্ব করিতেছে।

ইউরোপ তাহারই সভ্যতার জন্মস্থান পল্লীগ্রামকে এখন ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। মধ্যযুগে যখন পল্লীগ্রামের কৃষক এবং শিল্পীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর ইউরোপীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন পল্লীগ্রাম হইতে মহাপ্রাণ মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব হইত, তাহার ফলে ইউরোপীয় জগৎ তাঁহাদিগের প্রতিভা এবং চরিত্র-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিল।

পল্লীগ্রামের সে দিন আর নাই। ইউরোপীয়েরা এখন অসংখ্য রেলরাস্তা স্থাপন করিয়াছে, অসংখ্য কারখানা নির্ম্মাণ করিয়াছে, বৈষয়িক উন্নতির জন্য কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর না করিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রবর্ত্তন করিয়াছে। অসংখ্য জাহাজ পৃথিবীর সমস্ত দেশ হইতে এখন ইউরোপের কৃঠি এবং বাণিজ্যাগারের উপকরণ যোগাইতেছে। অসংখ্য শ্রমজীবী পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া সহরের কলকারখানায় অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগের মনুষ্যত্ব হারাইতেছে। পল্লীগ্রামে কৃষিকার্য্যের অবনতি হইলেও প্রকৃতিজাত দ্রব্যের অভাব নাই, কারণ বিদেশ হইতে দ্রব্যের আমদানী হইতেছে। যতই গ্রামগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা, ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইউরোপ বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে তাহার পল্লীগ্রামগুলি বিসর্জ্জন দিয়াছে—বিপুল অর্থলাভের জন্য তাহার সামাজিক জীবনের সুখ এবং শান্তি চিরকালের জন্য হারাইয়াছে।

আদর্শ সভ্যতার লক্ষ্য

কিন্তু সমাজের এক স্থানের আদর্শকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ ভাবিয়া দেশের অন্যান্য স্থানের চিন্তা ও কর্ম্মজীবনকে সেই আদর্শ অনুসারে বিচার ও নিয়ন্ত্রিত করিলে, জাতীয় সভ্যতাকে দরিদ্র করা হয় এবং দেশের ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবন ও চিন্তা-জীবনের বিকাশের পথ রোধ করা হয়। পল্লীজীবন এবং নগরজীবনের আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পল্লীজীবন এবং নগরজীবন সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে বিকাশ লাভ করে। পল্লীগ্রামে জাতির বৈষয়িক এবং সামাজিক জীবনের সমস্ত উপাদান এবং উপকরণগুলি উৎপন্ন হয়। পল্লীগ্রামে সমাজের নিত্য আহারের সংস্থান হয়। পল্লীগ্রামের প্রকৃতিজাত বস্তু সহরে আনীত হইলে, সহর তাহার কলকারখানার সাহায্যে উহা হইতে নানা প্রকার দ্রব্য এবং বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুত করে। এইরূপ নিত্যনৈমিত্তিক অভাবমোচনোপযোগী দ্রব্যা-

দির উপকরণ যোগাইয়া পল্লীগ্রামগুলি যেরূপ বৈষয়িক জীবন যাপনের সহায় হয়, সেরূপ সামাজিক জীবনের উপাদানগুলিও পল্লীগ্রামের আব্‌হাওয়াতেই উৎপন্ন হয়। নগর এই সমস্ত উপকরণগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সমাজের চিন্তা এবং কর্ম্মের গতি ও প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়। নগরে শক্তির ব্যবহার এবং বিকাশ, কিন্তু শক্তির জন্ম পল্লীগ্রামে। পল্লীগ্রামই ভাবুকতার জন্মভূমি, প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রই বিরাট এবং মহনীয় ভাব-আবিষ্কারের শ্রেষ্ঠ স্থান। পল্লীগ্রামে চতুরতা প্রশ্রয় পায় না,—নিষ্ঠা, প্রেম, সংযম, মহত্ত্ব, পবিত্রতা এবং সত্যানুরাগ, মানব-হৃদয়ের সমস্ত দেবভাবগুলি পল্লীগৃহেই অঙ্কুরিত হয়। গ্রামের চিন্তার মধ্যে স্বভাবতই একটা সরস মৌলিকতা এবং ভাবপ্রবণতা লক্ষিত হয়, যাহার জন্য তাহারা অনেক সময়ে অসীম শক্তি লাভ করে। বাস্তবিক, যে সমস্ত বিপুল আন্দোলন অতীতকাল হইতে পৃথিবীর বক্ষ আলোড়িত করিয়া মানবজীবনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া আসিতেছে, সে সমস্তই সহরের কর্ম্মময় ব্যস্ততা হইতে অনেক দূরে পল্লীজননীর নিভৃত ক্রোড়ে লালিত হইয়াছিল। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, কনফুশিয়াস, সাদী, হাফিজ, সেণ্টফ্রান্সিস, মার্কস, পেষ্টালজি সকলেই বিশ্বপ্রকৃতির নিকট তাঁহাদিগের শিক্ষা এবং দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। অরণ্য, প্রান্তর, মরুভূমি অথবা গিরিগহ্বরেই তাঁহারা জ্ঞানের আলোক পাইয়াছিলেন। পল্লীগ্রামগুলি এই সমস্ত জগদ্‌গুরুগণকে লালনপালন করিয়া জগতকে সভ্য করিয়াছে। পল্লীগ্রামই সভ্যজগতের জন্মভূমি।

ভারতবর্ষে পল্লীগ্রামের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা

ভারতবর্ষের পল্লীজীবন আজকালকার নূতন অবস্থার উপযোগী হইয়া কি ভাবে গঠিত হইবে তাহাই এখন বিবেচ্য বিষয়। প্রতীচ্যের প্রভাব ভারতবর্ষের নগরেই প্রথম আসিয়াছে, এমন কি আজকালকার নগরগুলি পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবেই সৃষ্ট। কিন্তু এই পাশ্চাত্য প্রভাব ভারতের জীবন-প্রবাহকে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের প্রকৃত প্রাণ এখনও পল্লীগ্রামে কিয়ৎ পরিমাণে সজীব রহিয়াছে, পল্লীবাসীদিগের মধ্যে ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শগুলি এখনও বিদ্যমান। পল্লীসমাজে এখনও পরনির্ভরতা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, স্বাধীন চিন্তা এবং স্বায়ত্ত-কর্ম্ম এখনও সেখানে বিকাশ লাভ করিতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা পল্লীগ্রামে আসিয়া পৌছিয়াছে বটে, কিন্তু তবুও সেখানে চরিত্রের মাহাত্ম্য, ত্যাগস্বীকার, কর্ত্তব্যবোধের নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের ধর্ম্মজীবন এবং মহাপ্রাণতা এখনও পল্লীগ্রামকে উন্নত রাখিয়াছে। এখন আমাদের স্বদেশসেবকগণকে পাশ্চাত্য জগতের চিন্তা ও কর্ম্মরাশি দ্বারা পল্লীগ্রামের এই সনাতন জীবনপ্রবাহকে নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজের চরিত্রদোষে পল্লীসমাজ এখন কঠোর দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত। পল্লীবাসীর অন্নবস্ত্রাভাব এখন তাহার সর্ব্বপ্রকার উন্নতির প্রধান অন্তরায়। দারিদ্র্যদোষে ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন আধ্যাত্মিকতার আদর্শ মলিন

হইয়া পড়িয়াছে। নানা উপায়ে এই দারিদ্র্য মোচন করিতে হইবে, দারিদ্র্য মোচন করিয়া ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত আধ্যাত্মিক জীবনের সুমহান্ আদর্শকে জগতের সমক্ষে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে। ইউরোপের বিজ্ঞান এবং ভারতবর্ষের বৈরাগ্য তখন সম্মিলিত হইয়া একটা মহাজীবনের সূচনা করিয়া দিবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সেই মহামিলনের কেন্দ্র-স্থল হইবে,—ভারতবর্ষের পল্লীগ্রাম।

কয়েকটী পাশ্চাত্য বৈষয়িক অনুষ্ঠানের আলোচনা

যৌথ ঋণ-দান-মণ্ডলী

পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন প্রদেশে কোন কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারের দ্বারা সেখানকার দেশহিতৈষিগণ দারিদ্র্য নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। আমাদিগের দেশের পক্ষে সে গুলি উপযোগী কি না প্রত্যেক সমাজ-সেবকের তাহা আলোচনার বিষয়। বিশেষতঃ যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা কৃষককুলের দারিদ্র্য-হ্রাস এবং ধনবৃদ্ধি, সে গুলি আমাদের দেশে প্রযোজ্য কি না তাহা বিচার করিতে হইবে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জগতে বিপুল বাণিজ্য-ব্যবসায়ের আন্দোলন হইয়াছিল। তাহার ফলে ইউরোপীয় সমস্ত জাতিই কল-কারখানার বিরাট আয়োজন করিয়া পৃথিবীর বাণিজ্য করায়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপীয় জগতে আর একটি আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল, ইহার দ্বারা সেখানকার কৃষিকার্য্যের বিপুল উন্নতি সাধিত হইতেছে। ইহার নাম সমবায়-আন্দোলন, বা কৃষিকার্য্যে যৌথ-কারবার প্রচলন। স্কুল্জ, রাইফেজেল, হাস, উলেমবার্গ, লুজাতী, ডুর্পোট প্রভৃতি সমাজ-সেবকগণ আপনাপন সমাজের দারিদ্র্য-পীড়িত এবং ঋণভারগ্রস্ত কৃষিজীবিগণের দুঃখ মোচন করিবার জন্য এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহার ফলে জর্ম্মাণী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালী, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের কৃষকসমাজ নূতন প্রাণ লাভ করিয়াছে। কৃষিজীবিগণকে ঋণভার হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহারা যে পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে নির্দ্দেশিত হইল।

কোন কৃষকের ঋণ গ্রহণের সময় যদি তাহার ঋণভার অন্য কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া ভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলে মহাজনের অর্থনাশের বিশেষ আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং সুদের হার সে কম করিয়া দিতে পারে। কয়েকজন কৃষক এইরূপে একটি মণ্ডলী স্থাপন করিয়া মণ্ডলীর নিকট হইতে অল্প সুদে ধার লইতে পারে। মণ্ডলী কৃষকগণকে ঋণ দিবার জন্য যে দেনা করে তাহার জন্য কোন একজন কৃষক বা সমস্ত কৃষক মিলিয়া দায়ী থাকে। ইহাকে অসীম-দায়িত্ব-বিশিষ্ট ঋণ-দান-মণ্ডলী বলা যায়। কৃষকগণও যাহাতে মণ্ডলীতে আমানত রাখে তাহার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া হয়। সব শেষে যখন মণ্ডলীর সভ্যগণের আমানত টাকা উহার বাহিরের দেনার সমান হয়, তখন বাহিরের টাকা ফেরত দিয়া আমানত টাকাই সমিতির মূলধনরূপে পরিণত হয়।

প্রত্যেক কৃষকের ঋণের জন্য মণ্ডলীর অন্য

সভ্যেরা দায়ী বলিয়া তাহার গৃহীত ঋণ যাহাতে যথাকার্য্যে ব্যয়িত হয় এবং অতি অল্প ব্যয়ে যাহাতে ঋণ-গ্রহণকারীর অভীষ্টকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে তাহাও সকলে লক্ষ্য রাখে। সভ্যেরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কার্য্যপ্রণালী বিশেষ সতর্কতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করে বলিয়া তাহাদিগের মধ্যে কেহ স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না। উপরন্তু এ কারণে উহাদিগের কর্ম্মশক্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায়। সমবেত কার্য্য-প্রণালী বিভিন্নপ্রকারে সমাজের মঙ্গলসাধন করে। আমাদিগের দেশে এইরূপ ঋণ-দান-মণ্ডলীস্থাপনের ফলে কেবলমাত্র ঋণভার হইতে কৃষকগণ যে মুক্ত হইতেছে তাহা নহে। অনেক স্থলে বিবাহশ্রাদ্ধাদি সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে কত অর্থ ব্যয়িত হওয়া উচিত তাহাও সমিতির দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রামে হিংসা-বিদ্বেষ এবং দলাদলির ভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, মামলা মোকদ্দমা অনেক সময় সমিতির দ্বারাই নিষ্পত্তি হইয়াছে, দরিদ্র কৃষকগণ মিতব্যয়ী হইতে শিখিয়াছে, এরূপে তাহাদিগের সামাজিক এবং নৈতিক অবস্থা বিভিন্ন প্রকারে উন্নতি লাভ করিয়াছে।

যৌথ-বিক্রয়-মণ্ডলী এবং যৌথ-শস্যভাণ্ডার

পাশ্চাত্য প্রদেশে কেবলমাত্র ঋণদান-মণ্ডলী স্থাপনের দ্বারা যে কৃষকসমাজের উন্নতিবিধানের চেষ্টা হইয়াছিল তাহা নহে। আরও অনেক প্রকার সমবায়-অনুষ্ঠানের সূচনা হইয়াছিল। কৃষকগণ যাহাতে তাহা-দিগের পণ্যদ্রব্য সুবিধা মত বিক্রয় করিতে পারে তাহার উপায় বিধান করা হইয়াছিল। সমবায়-সমিতি স্থাপন করিয়া সমিতির উপর পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ভার প্রদান করিয়া ইউরোপীয় কৃষকগণ বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়াছে। কৃষিপ্রধান দেশে দালাল এবং পাইকারগণ কৃষিজাত দ্রব্যের লাভাংশ আত্মসাৎ করে, কৃষকেরা তাহাদিগের নিকট হইতে শস্যোৎপাদনের জন্য ঋণগ্রহণ করিয়া অনেক সময় তাহাদিগকে শস্যাদি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, ফলে কৃষিকার্য্যের উন্নতি লাভ করিয়াও কৃষকগণ লাভবান হইতে পারে না। এ স্থলে গ্রাম্যসমিতি কেবল মাত্র ঋণদানে সন্তুষ্ট না থাকিয়া যদি কৃষকগণের পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়ভার লইতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের বিশেষ মঙ্গল সম্ভাবনা। আমাদিগের দেশে কৃষকগণ প্রভূত পরিশ্রম করিয়াও যে লাভবান হইতে পারে না, তাহার প্রধান কারণ তাহারা দালাল-গণের নিকট হইতে দাদন লইয়া উহাদিগকে অত্যল্প মূল্যে ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। দুই একটি উদাহরণ দিলে ইহা বুঝা যাইবে। পাট চাষের জন্য কৃষকেরা আষাঢ় মাসে ৫৲ অথবা ৫॥০ দাদন লইয়া আশ্বিন মাসে দালালকে এক মণ পাট দিয়া থাকে। এক মণ পাট বিক্রয় করিয়া দালালেরা ৯৲, ১০৲ পাইয়া থাকে। সুতরাং কৃষকগণ অর্থাভাব এবং দাদন গ্রহণের জন্য লভ্যের অধিকাংশ হইতে বঞ্চিত হয়। তিসি অথবা বুট চাষের জন্য দালালেরা কৃষককে ৫৲ অথবা ১॥০ ঐ দুইটি ফসল উৎপাদনের জন্য দাদন দিয়া থাকে। তিন চারি মাস পরে দালালেরা কৃষকের নিকট এক মণ তিসি অথবা বুট পাইয়া উহা ৭৲ অথবা ২॥০ দরে

সহরের হাটে বিক্রয় করে। এ স্থলে যদি কৃষকগণ কোন গ্রাম্যসমিতির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া সমিতির দ্বারাই তাহাদিগের পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করাইতে পারে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদিগের কঠোর পরিশ্রমের উপযুক্ত ফললাভ করিতে সমর্থ হইবে। আধুনিক অবস্থায় কৃষকগণ নয়ালির সময় (যে সময় নূতন শস্যের আমদানী হয়) শস্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়, তখন শস্যের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। যৌথ-বিক্রয়-সমিতি এবং যৌথ-ভাণ্ডার স্থাপন করিলে বাজার মন্দা হইলেও পণ্য দ্রব্য 'ধরিয়া রাখা' যাইতে পারে; উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত স্থানে ন্যায্য দরে তাহা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত হইবে। মধ্যবর্ত্তী সময়ে কৃষকগণের সংসারখরচের জন্য সমিতি তাহাদিগকে ঋণ দিবে। বাস্তবিক পল্লীগ্রামে যৌথ-ভাণ্ডার এবং যৌথ-বিক্রয়-মণ্ডলী স্থাপন বিশেষ বাঞ্ছনীয়। ইহাদিগের দ্বারা কৃষকসমাজ পণ্যদ্রব্যবিক্রয়ের সুবিধা লাভ করিয়া স্বকীয় পরিশ্রম সার্থক করিতে পারিবে। তাহাদিগের উৎসাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে তখন ঋণ-গ্রহণের আর কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

যৌথ-ক্রয়-মণ্ডলী

কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধানের জন্য যৌথ-ঋণ-দানসমিতি, শস্য-ভাণ্ডার এবং বিক্রয়-সমিতি যেরূপ প্রয়োজনীয় যৌথ-ক্রয়-সমিতিও সেরূপ আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সম্পাদনের জন্য অভিনব যন্ত্র এবং কৃত্রিম সারাদির ব্যবহার আবশ্যক। ইহাদিগের মূল্য অধিক বলিয়া পরস্পরের সহায়তা ভিন্ন ঐগুলি ক্রয় করা অসাধ্য। যৌথ-ক্রয়-সমিতি স্থাপন করিলে পরস্পরের সাহায্যে পাইকারী দরে উপযুক্ত কৃষিযন্ত্র এবং সার-ক্রয় এবং বীজ শস্য সংগ্রহ করা খুব সুবিধা জনক হইবে। হলাণ্ড, বেলজিয়াম, জর্ম্মানী, অষ্ট্রীয়া, বোহিমিয়া, মোরাভিয়া, প্রভৃতি প্রদেশে এই প্রকার যৌথ-ক্রয়-সমিতির দ্বারা সেখানকার কৃষকেরা নানাপ্রকার যন্ত্র এবং কৃত্রিম সার ব্যবহারের সুবিধা লাভ করিয়া স্বকীয় আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছে।

কৃষিকার্য্যে সমবায়

আমাদিগের দেশের কৃষিজীবনের মধ্যে সমবায়-প্রণালীর প্রচলন বিশেষ আবশ্যক। বাস্তবিক পক্ষে সমবায়-প্রণালী প্রয়োগ না করিলে কৃষিকার্য্যের উন্নতি অসম্ভব। ব্যবসায়ে যেমন কলকারখানার আয়োজন না করিলে ফললাভ করা সুকঠিন সেরূপ কৃষি-কার্য্যে পরস্পরের সহায়তা দ্বারা শস্যোৎপাদন এবং শস্যবিক্রয়ের সুবিধা না থাকিলে উহা বিশেষ লাভজনক হয় না। কৃষিকার্য্যে কলের উপর নির্ভর না করিয়া প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের উপর অধিক নির্ভর করিতে হয়। মানুষ তাহার বুদ্ধি এবং পরিশ্রম নিয়োগ করিয়াও শস্যোৎপাদন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করিতে পারে না। এজন্য কৃষিকার্য্য ক্ষুদ্র আয়োজনেই সুচারুরূপে পরিচালিত হয়। অনেক ব্যবসায়ে যেমন মূলধন অধিক করিয়া আকার বৃদ্ধি করিলেই লাভ অধিক হয়, কৃষিকার্য্যে সেরূপ হয় না। বস্তুতঃ কৃষিকার্য্যে বৃহৎ ব্যবসায় লাভজনক নহে। অথচ ঋণ গ্রহণ, শস্যোৎপাদন ও শস্যবিক্রয় সম্বন্ধে অল্প মূলধনবিশিষ্ট সামান্য কৃষকের অনেক অসুবিধা আছে। এই সকল অসুবিধা

অনেকগুলি কৃষক মিলিত হইয়া কাজ করিলে ভূত হইতে পারে।

পাশ্চাত্য দেশে আজকাল এইরূপ নানা ক্ষেত্রে সমবায় প্রথা অবলম্বিত হইতেছে। সমবায়ের সেই সকল সুবিধা আমাদের দেশে চিরকালই বর্ত্তমান ছিল। ভারতবর্ষকে এ বিষয়ে ইউরোপের নিকট নূতন করিয়া শিখিতে হইবে না।

আত্মনির্ভরতা এবং সমবায় প্রবৃত্তি ভারতবাসীর মজ্জাগত

আমাদিগের দেশের কৃষকেরা কৃষিকার্য্যে পরস্পরের সহায়তার প্রয়োজনীয়তা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল। গ্রামে অনেকগুলি কৃষককে মিলিত হইয়া জমি চাষ করিতে প্রায়ই দেখা যায়। অন্যূন ১৫, ২০ জন এরূপে প্রত্যহ একজন বন্ধুর জমি তৈয়ারী করে। যাহার জমি তৈয়ারী হইল, সে তাহার সমস্ত বন্ধুদিগের জমি যতদিন না তৈয়ারী হয় ততদিন তাহাদিগের সঙ্গে পরিশ্রম করে। এরূপে অল্পসময়ে এবং অল্প আয়াসে সকলেরই জমিতে লাঙ্গল এবং সার দেওয়া হয়। ইহাকে প্রচলিত কথায় 'জ্জাতা' বলে। গুড় তৈয়ারী করিবার সময় কৃষকদিগের সহকারিতার আর একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামের সমস্ত কৃষক মিলিত হইয়া একটি ইক্ষু-পেষণ-যন্ত্র ক্রয় করে বা ভাড়া লয়। ইক্ষু চাষ শেষ হইলে কৃষকেরা সমবেত হইয়া ঐ যন্ত্রের সাহায্যে রস বাহির করিয়া গুড় তৈয়ারী করে। প্রত্যেক কৃষকের হালের বলদ রস বাহির করিবার সময় নিযুক্ত হয়। এই প্রকার পরস্পরের সহায়তায় কার্য্যকরণপ্রণালীর (Co-operation) উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে। দুই তিনটি গ্রামের কৃষকেরা অনেক সময় সমবেত হইয়া কয়েকজন রাখাল বালক নিযুক্ত করে। কাহারও গো-মহিষাদি অপরের জমিতে আসিয়া শস্য নষ্ট না করে তাহা দেখিবার ভার রাখালবালকদিগের উপর ন্যস্ত হয়। যাহার গরু বা মহিষ অপরের জমিতে আসে, তাহাকে কিছু জরিমানা দিতে হয়। জরিমানার টাকায় বালকদিগের মাহিয়ানা দেওয়া হয়। এরূপে কয়েকটি গ্রাম সমবেত হইয়া খোঁয়াড়ের কার্য্য অল্প ব্যয়ে এবং বিনা পরিশ্রমেই চালাইয়া থাকে।

বাস্তবিক পক্ষে সমবেত কার্য্যকরণ এবং পরস্পর বিশ্বাসের (co-operation) উদাহরণ আমাদিগের পল্লীজীবনে এখনও ভূরি পরিমাণে পাওয়া যায়। গ্রামে মামলা-মোকদ্দমা আরম্ভ হইলেও এখনও পল্লীসমাজ তাহার মণ্ডলকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। মণ্ডল এখনও গ্রাম্যবিবাদ, জাতিবিবাদ, গৃহবিবাদ, ভূমিস্বত্ব প্রভৃতি বিষয়ের মীমাংসা করিতেছেন। গ্রামবাসী অধিকাংশ স্থলেই মণ্ডলের পরামর্শ না লইয়া আদালতে যায় না। মণ্ডলও কখন কোন ব্যক্তির অনিষ্ট আকাঙ্ক্ষা করিয়া পরামর্শ দেন না। প্রত্যেক গ্রামবাসীর সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁহার প্রধান লক্ষ্য, তাই পল্লীসমাজস্থ কোন ব্যক্তি বিপদে পড়িলে তাঁহার শরণাপন্ন হয়। মণ্ডল শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমন করিয়া থাকেন। রাজদণ্ড অপেক্ষা মণ্ডলের নিকট অপমান এবং লাঞ্ছনা পল্লীবাসীরা অধিক ভয় করে। বাস্তবিক আমাদিগের দেশের জনসাধারণ

চিরকালই রাজা এবং রাজকর্ম্মচারিগণকে বহিঃশত্রু হইতে দেশরক্ষা ভার সমর্পণ করতঃ গ্রামের মণ্ডলের অধীন থাকিয়া গ্রাম্যজীবনে সুখ এবং শান্তিস্থাপনের জন্য আপনাদিগের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিত। জনসাধারণের সমবেত চেষ্টা এবং উদ্যোগে সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলাবিধান বিশেষ কঠিন হইত না। ইহার ফলে আমাদিগের পল্লীগ্রামগুলি স্বাতন্ত্র্য না হারাইয়া বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন পথে বিকাশলাভ করিতে পারিত। রাষ্ট্রীয় জীবন আমাদিগের দেশে সমাজের সমস্ত শক্তিকে কখনও করায়ত্ত করিতে পারে নাই। সমাজের জীবনীশক্তি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীভূত না হইয়া সমগ্র সমাজে ব্যাপ্ত থাকায়, রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্নতি-অবনতির সঙ্গে আমাদিগের জাতীয় শক্তির বিশেষ বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় নাই। পল্লীগ্রামসমূহ এরূপে স্বাধীন চিন্তা এবং কর্ম্মশক্তির আধার হইয়া সমগ্র সমাজের আত্মশক্তি, আত্মনির্ভরতা, পরস্পর সহানুভূতি এবং সমবায় প্রবৃত্তিকে আজও পর্য্যন্ত সজীব রাখিতে পারিয়াছে।

আমাদের কর্ত্তব্য

আমাদের এই সনাতন প্রেম, সৌহার্দ্দ্য, মিলন ও আত্মনির্ভরতা অনেক কারণে দেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। এখন আমাদিগকে আমাদের পুরাতন জিনিসই নূতন নামে চালাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সমাজের এই প্রকৃতিগত সমবায়প্রবৃত্তি এবং আত্মনির্ভরতাকে অভিনব বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় নিয়োজিত করিয়া আমাদিগের দেশের দারিদ্র্যও মোচন করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে কৃষকগণকে ঋণ-দান সমিতিতে সমবেত করিয়া তাহাদিগকে ঋণ-জাল হইতে মুক্ত করিতে হইবে। যৌথ-ক্রয়-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া গো-মহিষাদি পশু, এবং উপযুক্ত কৃষিযন্ত্র, সার এবং বীজ-শস্য, সংগ্রহ এবং ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যৌথ-বিক্রয়-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া গ্রামের উৎপন্ন শস্যসমূহ ন্যায্য দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামে শস্যগোলা স্থাপন করিয়া কৃষকগণকে সাময়িক ভরণ-পোষণের নিমিত্ত অল্প সুদে শস্য কর্জ্জ দিতে হইবে। বিদেশী মহাজনকে শস্য কর্জ্জদান, শস্যসঞ্চয় এবং শস্যরপ্তানি ইত্যাদি ব্যবসায়ে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে না দিয়া, গ্রাম্য সভার দ্বারাই গ্রামের শস্য আদান-প্রদান-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অপরিমিত পরিমাণে শস্য-রপ্তানি বন্ধ করিয়া গ্রামের সঞ্চিত শস্য যাহাতে দুর্ব্বৎসরে দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পল্লীভাণ্ডার স্থাপন করিয়া কৃষিজীবিগণের জন্য বস্ত্র, তৈল, লবণ প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী পাইকারী দরে বিতরণ করিবার সুবিধা সৃষ্টি করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে সমিতি স্থাপন করিয়া মড়ক ইত্যাদিতে গো-মহিষাদির জীবন-বিমা করিতে হইবে, উৎকৃষ্ট বৃষ ক্রয় করিয়া আনিয়া গোবংশের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। শিল্পজীবিগণের জন্য যৌথ-ঋণ-দান-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া শিল্প-কর্ম্মের উপযুক্ত যন্ত্র ও উপকরণ পাইকারী দরে ক্রয় এবং বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিক্রয়-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া শিল্পিগণের প্রস্তুত দ্রব্য যথামূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে

হইবে। তন্তুবায়গণের জন্য তন্তুবায়-মণ্ডলী স্থাপন করিয়া সুতা, রেশম, রং এবং শিল্প-কার্য্যের অন্যবিধ সামগ্রী পাইকারী দরে বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বস্ত্র-বয়নের পর তন্তুবায়গণের যাহাতে বস্ত্র-বিক্রয়ের কোন অসুবিধা না হয় তাহার জন্য বিক্রয়-সমিতি গঠন করিয়া উহার উপর স্থানান্তরে বস্ত্র-বিক্রয়ের ভার ন্যস্ত করিতে হইবে। সূত্রধরগণের জন্য মণ্ডলী স্থাপন করিয়া বড় বড় গাছ চিড়িবার জন্য উপযুক্ত টেবিল এবং করাত বিতরণ করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ ঘৃত এবং মাখন প্রস্তুত করিবার জন্য সমিতি স্থাপন করিতে হইবে, প্রত্যেক গৃহস্থ গরুর দুগ্ধ সমিতির কার-খানায় আনিয়া কারখানার কলে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে ঘৃত মাখন প্রস্তুত করাইয়া লইবে। পল্লী-সমিতি স্থাপন করিয়া গ্রামে কয়েকটি ইক্ষু-পেষণ-যন্ত্র, ধান এবং ডালভাঙ্গার যন্ত্র, আম, কাঁঠাল, কুল, পেয়ারা প্রভৃতি ফল এবং বনের মধু হইতে বিবিধ প্রকার আচার এবং মোরোব্বা প্রস্তুত-করণ-যন্ত্র ক্রয় করিতে হইবে। এ সমস্ত যন্ত্রাদি গ্রামবাসি-গণের যৌথ-সম্পত্তি, সুতরাং সকলেরই ব্যবহার্য্য হইবে। গ্রামে মৎস্য রক্ষা এবং সঞ্চয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া ধীবরগণকে নিকারীদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে হইবে। গ্রামকে মহামারী ম্যালেরিয়া প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্বাস্থ্য-সমিতি গঠন করিতে হইবে। সমবেত সমিতি গঠন করিয়া গ্রামে গ্রামে কূপ খনন, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, খাল কাটিয়া কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য জল-সরবরাহ, বনজঙ্গল পরিষ্কার, দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন, অবৈতনিক কৃষিবিদ্যালয় এবং শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পল্লীসেবকের আবশ্যকতা

এই সমস্ত অনুষ্ঠান যাহাতে সমগ্র দেশে প্রসার লাভ করিতে পারে তাহার জন্য পল্লীসেবক আবশ্যক। আমাদিগের দেশের জনসাধারণ একেবারেই অজ্ঞ এবং নিরক্ষর এবং নানা কারণে নিশ্চেষ্ট ও উদ্যমহীন। তাহাদিগকে প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে এই সমস্ত অনুষ্ঠানের উপকারিতা বুঝাইতে হইবে। ইহাদিগের উপকারিতা একবার বুঝিতে পারিলেই তাহারা উদ্যোগী হইয়া নিজেদের কাজ নিজেরাই করিতে পারিবে। কিন্তু প্রথমে প্রচার আবশ্যক এবং প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য অসংখ্য কর্ম্মবীরের উৎসাহ এবং ব্যাকুলতা আবশ্যক। বহুবৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া উহার কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সহিত না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই। অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্র অরণ্যে রোদন করিয়াছিলেন, তাঁহার বাণী বাঙ্গালা শুনে নাই। তাহার কুড়ি বৎসর পরে একজন সন্ন্যাসী দীন-দরিদ্রের জন্য প্রাণে প্রাণে কাঁদিয়া ভারতবাসীর নিকট তাঁহার দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী প্রাণপণ চেষ্টা এবং অদম্য উৎসাহ

দায়স্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলেন। অগ্নিময় বিশ্বাসের সহিত তিনি ভারতবাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন, "যাও এই মুহূর্ত্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলের দীন-দরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক পতিতা রমণীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। যাও তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও, এবং তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর—বলি—জীবন বলি, তাঁহাদের জন্য, যাঁহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাঁহাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীনদরিদ্র পতিতদের জন্য।" বিবেকানন্দের আহ্বান ভারতবাসীর নিকট ব্যর্থ হয় নাই। তাহার পর আজ চারি পাঁচ বৎসর হইল আর একজন বাঙ্গালী শিক্ষা-প্রচারক প্রচলিত ভারতীয় শিক্ষাপ্রণালীকে আগাগোড়া বদলাইয়া নিঃস্বার্থ সমাজসেবা এবং কর্ম্মোপাসনার ভিত্তির উপর শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভারতবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা-প্রচারের গোড়ার কথা—'সাধনার বীজমন্ত্র' এই,—ফ্যাক্টরীতে, "কারখানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ যথেষ্ট হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থের হিসাবটা বাড়িয়াছে। পণ্ডিত হইয়া সকলে নিজেকেই বড় করিতে শিখিয়াছেন। সেরূপ পাণ্ডিত্য বাড়াইবার আর প্রয়োজন নাই। এখন দরিদ্রের বন্ধু, অশিক্ষিতের সহায়, নিম্নশ্রেণীর উপদেষ্টা লোকহিতৈষী 'মানুষে'র সৃষ্টি করা যায় কি না। দূরদর্শী ব্যক্তিগণের ভাবিবার বিষয়।" গ্রামে গ্রামে বিবিধ সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করিয়া—পল্লীতে পল্লীতে দেশের বিচিত্র কথা শুনাইয়া পল্লীজীবনে নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার করিবার জন্য তিনি দেশের শিক্ষিত লোককে পরহিতব্রত গ্রহণ করিতে এবং প্রচারকের জীবন অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন। "যেখানে অতি নিস্তব্ধ বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া কৃষকেরা শ্রম বিনোদন করিতেছে, যেখানে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোন সময়ই কোন চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ হয় না, সকলেই শান্তির সহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম সমাধা করিতেছে, যেখানে সভ্যতার বাহ্যাড়ম্বর এখনো বেশী প্রবেশ করে নাই, যেখানে হিন্দুমুসলমান একমন একপ্রাণ হইয়া পাড়ার সমস্ত কাজ করিয়া থাকে, যেখানে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা এখনো প্রবিষ্ট হয় নাই, সমস্ত লোকই পূর্ব্বপুরুষদের চিরন্তন প্রথা প্রত্যেক সামাজিক ও পারিবারিক কাজেই বজায় রাখিবার জন্য যত্নবান, যেখানকার আম কাঁঠাল বনের দেবমন্দির হইতে ভক্তি ও শ্রদ্ধা এখনও অপসৃত হয় নাই—সেই সুখের নীড়, শান্তির আধার, আমাদিগের পল্লীসমাজে নূতন নূতন কথা শুনাইয়া পল্লীবাসীদের মনে এক অভিনব ভাব ঢালিয়া তাহাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে, দেশের কোথায় কোন্ চিন্তা কোন্ কাজ হইতেছে। সকলের সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া এই আধুনিক পৃথিবীর নূতন অবস্থার উপযুক্ত করিয়া গ্রাম্য জীবনকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে। গ্রামের সঙ্গে সহরের যে বিরোধ কিছু কাল হইল ঘটিয়াছে,

এবং এজন্য পল্লীতে যে দোষ প্রবেশ করিয়াছে, সমস্তই প্রতীকার করিবার জন্য ঘরে ঘরে—হিন্দু মুসলমান, কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণ, জোলা তাঁতী সকলকে শিক্ষাদান করিয়া স্বীয় অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করিতে উপদেশ দিতে হইবে"। *

এই বিপুল শিক্ষাদান এবং সেবার কার্য্য করিবার জন্য বাঙ্গালা দেশে দরিদ্রবন্ধু এবং শিক্ষাপ্রচারক অল্পবিস্তর দেখা দিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশে লোকশিক্ষা-প্রচার-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গদেশের অনেক জেলায় এবং কলিকাতায় বিবেকানন্দ মিশন, জাতীয় বিদ্যালয়, সুহৃদ-সমিতি, শ্রমজীবি-শিক্ষা-পরিষৎ, অবৈতনিক পাঠশালা, গ্রন্থাগার, সান্ধ্য শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও অধ্যাপকগণ এবং অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণ এই সমস্ত সদনুষ্ঠানের পরিচালনা করিতেছেন। বিদ্যালয়াদিতে ছাত্রদিগকে ইতিহাস, সাধারণ হিসাব, ভূগোল, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে দেশের বিভিন্ন স্থানের দৃশ্য এবং বড় লোকের প্রতিকৃতি দেখান হইতেছে। স্থানে স্থানে কৃষি এবং শিল্প-শিক্ষারও আয়োজন হইয়াছে।

দুর্দ্দশার পরিমাণ

কিন্তু দেশে কার্য্য আরম্ভ হইলেও প্রয়োজনের অনুরূপ কিছুই আয়োজন হয় নাই। গ্রামে গ্রামে অসংখ্য লোক একেবারে নিরক্ষর ও দারিদ্র্য-পীড়িত। পল্লীবাসীদিগের এখন অসংখ্য অভাব, সে সমস্ত মোচন করিতে হইবে। বাঙ্গালা দেশের সমস্ত পল্লীগ্রামে শিবমন্দির, কালীমন্দির প্রভৃতি দেবালয় এখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, গ্রামের হরিসভার জন্য চাঁদার খাতায় অনেক টাকা বাকী পড়িতেছে, কথকতা, যাত্রাগান, কবির গান প্রভৃতি উৎসাহ অভাবে ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হয় না, পানীয় জল পানায় ভরাট হইয়াছে, নদীগুলি সংস্কার অভাবে ক্রমশ শুকাইয়া যাইতেছে। সমৃদ্ধিশালী নগরীর শ্রীবৃদ্ধির জন্য ধনীলোকের অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, অথচ তাঁহাদিগের জন্মস্থানের দারিদ্র্যের অবধি নাই। তাঁহাদিগের নিজ নিজ ভদ্রাসন—পূর্ব্বপুরুষেরা যেখানে এতকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহারা এখন পরিত্যাগ করিয়াছেন। সমস্ত দেশ এখন বন-জঙ্গলময় হইয়া পড়িয়াছে, জলসরবরাহ একেবারেই বন্ধ হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অসংখ্য গ্রাম একসঙ্গে উজার হইয়া যাইতেছে। যে সমস্ত লোক কোন প্রকারে প্রাণ ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহারা আপনাদের পৈতৃক ভিটা পরিত্যাগ করিয়া সহরে চাকুরী খুঁজিতেছে। অনেক গ্রাম এরূপে এখন একেবারেই লোকশূন্য। যে গ্রামে প্রায় কুড়ি ত্রিশটি টোলে শাস্ত্রজ্ঞগণ অধ্যাপনা করিতেন, বিভিন্ন জেলা এবং বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রেরা আসিয়া যেখানে শিক্ষালাভ করিত, যে গ্রাম "বারো মাসে তেরো পার্ব্বণে" মুখরিত থাকিত, দুর্গা এবং কালীপূজার সময় প্রায় দুই তিন শত বাড়ীতে মহোৎসব হইত,

* শিক্ষা-সমালোচনা—অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার প্রণীত

বারোয়ারী পূজার বিপুল সমারোহ জনসাধারণের হৃদয়ে বল এবং মনে আনন্দ সঞ্চার করিত, হরিনাম কীর্ত্তন, রামায়ণ এবং চণ্ডীর গান জ্যোৎস্নাস্নাত রজনীকে আরও মধুর করিয়া তুলিত, সে গ্রাম এখন নিস্তব্ধ, নিরানন্দ,—শৃগাল-ব্যাঘ্রের রঙ্গভূমি। গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলে মনে হয় যেন গ্রামে কোন এক ভীষণ মহামারী গ্রামকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। মাঝে মাঝে বনজঙ্গলের ভিতর হইতে দুই একটা পতনোন্মুখ কোঠা বাড়ী দৃষ্টিগোচর হয়, উহাদিগের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য কেহই সেখানে বাস করে না। যে সকল গ্রাম একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই তাহাদিগেরও ক্রমাবনতি হইতেছে। অধিকাংশ গ্রামের কৃষি এবং শ্রমজীবিগণকে অন্নাভাবে অনশনে থাকিতে হয়। কৃষকগণের সমস্ত পরিশ্রম জমিদারের খাজনা এবং মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতেই ব্যয়িত হয়। একবার ঋণ গ্রহণ করিলে সে ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। অবশেষে সাহায্য এবং পরিচ্ছদের ব্যয় বহন করাও কঠিন হইয়া পড়ে। অন্নাভাববশতঃ কৃষকদিগের রোগাধিক্য এবং পরিশ্রমকাতরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার সঙ্গে বার্ষিক দুর্ভিক্ষ, জলাভাব, গোবংশের অবনতি এবং জমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস জড়িত হইয়াছে, কাজেই কৃষকদিগের দুর্গতির সীমা নাই। শিল্পজীবিগণকেও দারিদ্র্য হেতু পাইকার প্রভৃতির নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে হয়, ন্যায্যদরে তাহাদিগের দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধা নাই বলিয়া তাহারা পরিশ্রমোপযোগী ফল লাভ করিতে পারে না। উপরন্তু, বিদেশ হইতে পল্লীর হাট বাজারে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের আমদানী হইয়াছে। গ্রামের শিল্পজাত দ্রব্যের আদর কমিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে বিদেশী দ্রব্যের আমদানী হেতু কাঠ, পিত্তল, মাদুর এবং মাটীর কাজ ব্যতীত সমস্ত শিল্পই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। মধ্যবৃত্ত সম্প্রদায় চাকুরীর লোভে বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য সহরে আসিতেছেন, চাকরী পাইলে তাঁহারা ভ্রমক্রমে নিজবাসস্থানে প্রত্যাগমন করেন না। জমিদারবর্গ নানা কারণে ভোগবিলাসের লীলাভূমি নগরীতে আসিতে বাধ্য হন—এবং ক্রমশঃ আপনাদিগের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যান। প্রজাদিগের উন্নতির জন্য তাঁহাদিগের বিশেষ উৎসাহ থাকে না। সমাজের শিক্ষিত মধ্যবৃত্ত এবং ধনীসম্প্রদায় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গ্রামে দলাদলি, বিবাদ, মামলা, মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যবৃত্ত সম্প্রদায় সমাজে গুরুস্থানীয় ছিলেন, তাঁহাদিগের অবর্ত্তমানে, নৈতিক শিক্ষার অভাবে, জনসাধারণের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের ধনী এবং মধ্যবৃত্ত সম্প্রদায়ের লোক সকলেই চাকুরীজীবী অথবা চিরপ্রবাসী; এবং জনসাধারণ—যাহা লইয়াই দেশের সমাজ এবং দেশের বল—রুগ্ন, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, অনশনক্লিষ্ট এবং ঋণভারগ্রস্ত, চিরদারিদ্র্যকে একমাত্র সখা করিয়া কালাতিপাত করিতেছে। হিতোপদেশে আছে,—

রোগী চিরপ্রবাসী পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী।
যজ্জীবতি তন্মরণং যন্মরণং সোঽস্যবিশ্রামঃ॥

বাস্তবিক বাঙ্গালীসমাজ এরূপ জীবন যাপনে কতদিন সন্তুষ্ট থাকিবে?

পল্লীসেবকের কর্ম্মক্ষেত্র

যে সমাজে এই সমস্ত বিপুল অভাব সেখানে দুই একজন ভাবুক, কর্ম্মী, বা দুই একটি শিক্ষা-পরিষৎ বা সাহিত্য-পরিষৎ কি করিবেন! এখন পল্লীতে পল্লীতে কর্ম্মোপাসক ভাবুকের প্রয়োজন, গ্রামের হাটবাজারে পল্লীসেবকের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ব্যাকুলতার প্রয়োজন। দুঃখের কথা—আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একটা রব উঠিয়াছে—"দেশের কাজ করিবার সুযোগ কোথায়?" তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রই খুঁজিয়া পান না! বড়ই অনুতাপের বিষয় এই যে—তাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করা, সভাসমিতিতে বক্তৃতা করা এবং কতকগুলি হুজুগ সৃষ্টি করাই দেশের কাজ মনে করেন। সমাজব্যাপী দেশভরা এতগুলি অভাব রহিয়াছে। স্থিরভাবে সংযতভাবে সেইগুলি পূরণ করা যাইতে পারে। তাহাতে সকলেরই সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। কোন বিঘ্ন বা বাধা পাইবার কারণ নাই।

শিক্ষিত ব্যক্তিকে এখন পল্লীতে বাস করিতে হইবে, হাটে হাটে ভ্রমণ করিতে হইবে, পল্লীবাসীকে দেশবিদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পকৃষিকর্ম্মের কথা শুনাইতে হইবে, তাহাদের আর্থিক, নৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা নানা উপায়ে উন্নত করিতে হইবে। গ্রামের রাস্তায় ঘাটে প্রত্যেক লোককে সাদরে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, গ্রামের স্বাস্থ্য উন্নতির নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণ গ্রামের ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি নিবারণ করিবার জন্য যত্নবান্ হইবেন। গ্রামের পুষ্করিণীগুলি প্রতি বৎসর সংস্কৃত করাইতে হইবে। নদীর গতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে হইবে। যেখানে কৃষকেরা ক্ষেতে লাঙ্গল দিতেছে, সেখানে গিয়া তাহাদিগের সঙ্গে মিশিয়া কৃষকের কর্ম্মে সাহায্য করিতে হইবে। চাষ-আবাদের কি কি অসুবিধা আছে, তাহাদিগের হালের গরু এবং যন্ত্রাদির কিরূপ অভাব, জলসেচনের ব্যবস্থা কিরূপ, শস্যসমূহের বীজসংগ্রহ এবং সারের ব্যবস্থা কি প্রকার—এই সমুদয় তথ্য অবগত হইয়া চাষীদের মধ্যে নিজ নিজ বিদ্যা প্রয়োগ করিবার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে খাঁটি কৃষক হইতে হইবে। গ্রামে মহাজনের অত্যাচার আছে কিনা; গ্রামের কত জন কৃষক ঋণভারগ্রস্ত, কত জন লোক মহাজনের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে; গ্রামের সুদের হার কত, কিস্তিখেলাপী সুদ কিরূপ; গ্রামে সওয়া, দেড়া, বাড়ী প্রভৃতি কিরূপ প্রচলিত; গ্রামের পাইকার আড়ৎদার কিরূপ দাদন দিয়া থাকে, এই সকল অবস্থা বুঝিয়া ধনবিজ্ঞানের উপদেশগুলি গ্রাম্য সমাজে কাজে লাগাইতে হইবে।

যাঁহারা শিল্প, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিখিয়া পণ্ডিত হইতেছেন তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্য এখন এই সমুদয় তথ্যসংগ্রহে এবং গ্রাম্য জীবনের উন্নতি বিধানে প্রয়োগ করিতে হইবে। উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া সহরে বসিলে বিজ্ঞানপ্রচার, শিল্পপ্রচার, ব্যবসায়-প্রচার হইবে না। এখন বিজ্ঞানবিদ্গণকে স্বয়ং গ্রামে বসিয়া কৃষকের অসম্পূর্ণতাগুলি সম্পূর্ণ করিতে হইবে—হাতে-কলমে কাজ দেখাইয়া শিল্পীদিগকে উন্নত শিল্প-প্রণালীর প্রবর্ত্তনে উৎসাহিত করিতে হইবে।

গ্রামে গ্রামে যাইয়া প্রাচীন পুঁথি, কুলজী গ্রন্থ, প্রাচীন গীত, ছড়া বচন, জনপ্রবাদ প্রভৃতি সঙ্কলন করিতে হইবে। পল্লীসমাজের অমোদপ্রমোদ, ধর্ম্মকর্ম্ম, মেলা-উৎসব প্রভৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে এবং তাহাদের মধ্যে সরসতা ও সজীবতা প্রদান করিতে হইবে।

যেখানে কৃষক লাঙ্গল ঠেলিতে ঠেলিতে গান ধরিয়াছে, 'মন তুমি কৃষি কাজ জান না, এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ ক'রলে ফলতো সোনা'; যেখানে তাঁতী কাপড় বুনিতে বুনিতে গাহিতেছে "ওহে হর, এই ভবেতে তাঁত বুনা কাজ খুব ভালই জান," যেখানে মাঝি নদীর স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া উদাস প্রাণে গাহিতেছে "মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাহিতে পারি না,"—তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদের অকপট হৃদয়ের ভক্তি এবং প্রেমের গভীরতা বুঝিতে হইবে। তাহাদের নিকট সরলতা, ভক্তি ও তন্ময়তা শিখিতে হইবে। গম্ভীরার গান, ভাটিয়াল গান, বিষহরির গান, রাধাকৃষ্ণ ও হরগৌরী সম্বন্ধীয় গান ইত্যাদি সকল প্রকার হৃদয়োচ্ছ্বাসগুলির আদর বাড়াইতে হইবে। গ্রামে যখন সকলেই সুপ্ত, তখন যে মুদী দোকানে আলোক জ্বালিয়া গুণ গুণ স্বরে আপন মনে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত পাঠ করিতেছে, তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ঐ পুস্তকগুলি সেখানে কিরূপ মূল্যে পাওয়া যায়, সুলভ সংস্করণ অথবা বিনামূল্যে ঐগুলি বিতরণ করিলে উহাদিগের আদর হয় কি না, কোন্ সংবাদ-পত্র তাহারা পাঠ করে, উহাদের মধ্যে কোন্গুলি তাহাদিগের নিকট ভাল বোধ হয়। তাহার পর লোকশিক্ষার জাতীয় প্রণালী বুঝিতে হইবে; কথকতা, যাত্রা এবং কবিগান, রামমঙ্গল গান, চণ্ডীগান, হরিনাম এবং গৌরনিত্যানন্দ নাম-কীর্ত্তন প্রভৃতিতে বাঙ্গালার পল্লীসমাজে কেমন আনন্দের ভিতর দিয়া শিক্ষাপ্রচারের বিপুল আয়োজন হইয়াছে তাহা দেখিতে হইবে। এই সমস্ত শিক্ষা-প্রচাররীতি স্থির রাখিয়া ইহাদের বিষয় ও প্রণালী সম্বন্ধে উৎকর্ষ সাধন করিতে পারা যায় কি না তাহা ভাবিতে হইবে। গ্রামে কোথায় কোন ভাল কথক, কবি, যাত্রাওয়ালা অথবা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সামান্য কুটিরে লোক-চক্ষুর অন্তরালে কালাতিপাত করিতেছেন, তাঁহাদিগের সংবাদ লইতে হইবে। তাঁহাদিগকে লোকশিক্ষা-প্রচার কার্য্যে যথাসম্ভব নিযুক্ত করিতে হইবে। গ্রামের ভিক্ষুক ভিক্ষুণী যাহারা ঘরে ঘরে হরিনাম করিয়া 'ঠাকুরুণ বিষয়' রাধাকৃষ্ণের গান গাহিয়া আসিতেছে, তাহাদের ভিক্ষাবৃত্তি পল্লীসমাজের আধ্যাত্মিক বোধকে সজীব রাখিয়া যাহাতে আরও সার্থক হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

এইরূপ নানা ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিবার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীসেবকগণকে দেশের সামাজিক, ঐতিহাসিক ও আর্থিক তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

পল্লীবাসীদিগের অসংখ্য অভাব-অভিযোগ, তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা জানিবার এবং বুঝিবার জন্য এখন গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন প্রকার অনুসন্ধানকারীর প্রয়োজন। গ্রামের সমস্ত কৃষক, সমস্ত শিল্পী, সমস্ত শ্রম-

জীবীর নিকট হইতে তাহাদিগের পারিবারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সংগ্রহ করিতে হইবে। অনুসন্ধান করিতে হইবে—পরিবারের মধ্যে কয়জন উপার্জ্জন করে, স্ত্রীলোকদিগের উপার্জ্জন আছে কি না, পুরুষ বা স্ত্রীলোকের উপার্জ্জনে পরিবারের সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান হয় কি না, যদি কর্জ্জ করিয়া থাকে ঐ কর্জ্জ কত বৎসরের, কর্জ্জের কারণ কি, বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধীয় ব্যয়ের জন্য কি না, যদি পরিবারের উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে উহা কিরূপে প্রয়োজিত হয়; সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, যৌথ-ঋণদান-মণ্ডলী বা অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট গচ্ছিত রাখা হয় কি না। গ্রামের হাটে হাটে যাইয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে পল্লীর হাটে কোন্ কোন্ দ্রব্যের আমদানী হইতেছে, সে সমস্ত দ্রব্য পল্লী-গ্রামেই প্রস্তুত হইতে পারে কি না, গ্রাম হইতে শস্যের রপ্তানি কি পরিমাণে হয়; উহার সঙ্গে পল্লীগ্রামের দুর্ভিক্ষ ও অন্নাভাবের কোন সম্বন্ধ আছে কি না। প্রত্যেক মণ ধান, পাট, গম, বুট, সরিষার জন্য কৃষক অথবা পাইকারগণ কত লাভ করে; গ্রামে জমি বন্ধক দিবার জন্য কি প্রণালী অনুসৃত হয়; খায়খালাসী, কটকবালা প্রভৃতি কিরূপ প্রচলিত—ইত্যাদি নানা-বিষয়ক অনুসন্ধান করিতে হইবে। যেখানে জোলা, তাঁতী, ভাস্কর, কাঁসারী তাহাদিগের আপনাপন কুটিরে বসিয়া কাজ করিতেছে, তাহাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, তাহাদের উপকরণ-সামগ্রী কিরূপ মূল্যে ক্রয় করে; তাহাদিগের প্রস্তুতদ্রব্য যথামূল্যে বিক্রয় হয় কি না; পাইকারেরা তাহাদিগের দ্রব্য সহরে বিক্রয় করিয়া কিরূপ লাভ করে; তাহাদিগের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য সহরের ধনী এবং মধ্যবৃত্ত সম্প্রদায় কিরূপ সাহায্য করিতে পারে। তাহার পর প্রত্যেক গ্রামের মণ্ডলের নিকট সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, গ্রামে দলাদলি আছে কি না, মোকদ্দমার সংখ্যা বাড়িতেছে না কমিতেছে, গৃহবিবাদ, গ্রাম্যবিবাদ প্রভৃতি মিটাইয়া দিবার জন্য তিনি কি ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার ঐ কার্য্যে কোনরূপ সহায়তা করা যায় কি না। গ্রামের নৈতিক অবস্থা কিরূপ, গ্রামে কতজন মদ্যপায়ী, তাড়িখানার সংখ্যা এবং আবগারীর আয় বাড়িতেছে কি কমিতেছে, মদ্যপান নিবারণের জন্য কি উপায় অবলম্বন করা উচিত।

আমাদের ভবিষ্যৎ

এই উপায়ে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত যখন জনসাধারণের গভীরতর ভাব-বিনিময় হইতে থাকিবে, তখন শিক্ষিত সমাজ আপামর জনসাধারণের সুখ-দুঃখ, আমোদ-আহ্লাদ, ধর্ম্মকর্ম্ম প্রভৃতি আর অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবেন না। তখন তাঁহারা বুঝিবেন, পল্লীসমাজই ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের অন্তঃস্থল। যুগ-যুগান্তকাল ধরিয়া ভারতবর্ষের উপর যে চিন্তা-স্রোত অব্যাহতভাবে বহিয়া আসিতেছে সে স্রোত সহরের আফিস আদালত কলকারখানার মধ্যে আবিল এবং নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পল্লীসমাজে এখনও তাহা নিরাবিল এবং প্রবল। তখন পল্লীজীবনের শান্তি, সরলতা, প্রেম, আধ্যাত্মিকতা এবং আনন্দ তাঁহাদিগের জাতীয় জীবনের একমাত্র অপূর্ব্ব সম্পদ বলিয়া বোধ হইবে। ইহার

ফলে পল্লীজীবনে গৌরব-বোধ জন্মিবে, সমগ্র সমাজ ভাবুকতার দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িবে, দেশের সর্ব্বত্র শীঘ্রই একটা বিপুল আন্দোলন সৃষ্ট হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন প্রকৃত জন-নায়কগণ দেখা দিবেন। তাঁহারা অসংখ্য জনসাধারণের দুঃখদারিদ্র্য মোচন এবং শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবেন।

"প্রজানাং বিনয়াধানাদ্ রক্ষণাং ভরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥"

জনসাধারণের সমস্ত আশা-ভরসা, আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শ এই জন-নায়কগণের জীবনে অভিব্যক্ত হইবে। কত শত বৎসর ধরিয়া যে বেদনা অব্যক্ত ও অস্ফুট ছিল তাহা এখন প্রকাশের সুযোগ পাইবে। এত দিন ধরিয়া ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য জগতের নিকট যে বিজ্ঞানশিক্ষা লাভ করিতেছিল তাহা এখন সার্থক হইবে। গ্রামে গ্রামে অসংখ্য কৃষিশিল্পবিদ্যালয় এবং বিজ্ঞানাগার খোলা হইবে এবং সমবেত প্রণালীতে কৃষি এবং শিল্পকার্য্য পরিচালিত হইতে থাকিবে। লোকশিক্ষা এবং সমবায়-অনুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন চলিতে থাকিবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ভারতবর্ষের পল্লীবাসীর দারিদ্র্য মোচন করিবে। ভারতীয় পল্লীবাসীর আধ্যাত্মিক জীবন তখন নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবে।

পাশ্চাত্য জগৎ বিজ্ঞানের সাহায্যে বিপুল অর্থ অর্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত শান্তি এবং আনন্দ লাভ করিতে পারে নাই। এজন্য সাম্য-নীতিমূলক সমাজ-তন্ত্র এবং অতীন্দ্রিয়ভাবাপন্ন সাহিত্য ও চিত্রকলার দ্বারা পাশ্চাত্য জগৎ তাহার সমাজের প্রতিযোগিতা, অনৈক্য এবং উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। কিন্তু কারল্ মার্কস্ ও এঞ্জেলস্, রাস্কিন এবং মরিশ প্রভৃতি কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীরগণ ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্কার এবং পরিশোধন-কার্য্যে বিফল হইয়াছেন। ভারতবর্ষের পল্লীসেবকগণকে সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পারদর্শী ভারতবর্ষের পল্লীসেবক বিজ্ঞানসাহায্যে ভারতীয় পল্লীজীবনের দারিদ্র্য-দুঃখ মোচন করিয়া এক বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক আন্দোলনের সূচনা করিয়া দিবেন। এই আন্দোলনের সংস্পর্শে আসিয়া পাশ্চাত্য জগৎ তাহার সামাজিক জীবনে সুখশান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিবে।

এই উপায়ে ভারতবর্ষের পল্লীসেবক নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া বিশ্বজগৎকে একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন উপহার দিবেন।

[ক] পরিশিষ্ট

পারিবারিক আয়-ব্যয়ের তালিকা

চৈত্রের "গৃহস্থে" প্রকাশিত হইয়াছে।

[খ] পরিশিষ্ট

পারিবারিক ব্যয়ের আদর্শ-তালিকা

	মজুর	কৃষক	সূত্রধর	কর্ম্মকার	দোকানদার	মধ্যবৃত্ত
ক। খাদ্য	৯৫·৪ } ৯৯·৯	৯৪ } ৯৭	৮৪·৫ } ৯৬·৫	৭৯ } ৯০	৭৭·৫ } ৮৬·৫	৭৪·০ } ৭৮·৩
খ। বসন	৪·৫	৩·০	১২·০	১১	৯	৪·৩
গ। চিকিৎসা		১·০	১	৫	৬	৭·৪
ঘ। শিক্ষা					১·৫	৬·৩
ঙ। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ	·১	২·০	২·০	৪	৫·০	৮·০
চ। বিলাসের সামগ্রী			·৫	১		
	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম, এ,
অধ্যাপক—ধনবিজ্ঞান, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র

আমরা আমাদের জগদীশচন্দ্রকে কেবল একজন বৈজ্ঞানিক বা আবিষ্কারক বা চিন্তাবীর মাত্র রূপে দেখি না। * * * তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার আবহাওয়ার মধ্যে হিন্দুসভ্যতার চরম উপদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের বাণী—হিন্দুর হিন্দুত্ব—তাঁহার বিজ্ঞানালোচনার ভিতর দিয়া বিংশ শতাব্দীর নরসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। * * * বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ—সকলেই একভাবের ভাবুক, একই মন্ত্রের দ্রষ্টা, একই বাণীর প্রচারক।

আমাদের জগদীশচন্দ্র

হিন্দুর বিজ্ঞান-চর্চ্চা সার্থক হইয়াছে, বিজ্ঞান শিখিয়া হিন্দু নিজকে ভাল করিয়া চিনিয়াছে —হিন্দু আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। কেবলমাত্র বিজ্ঞান-চর্চ্চা কেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার সকল অনুষ্ঠানই হিন্দুর স্বতন্ত্রতা-বোধকে জাগরিত ও পুষ্ট করিতেছে। পাশ্চাত্য জগতের প্রভাবে হিন্দুর জাতীয় বিশেষত্ব বিলুপ্ত হইল না, বরং হিন্দুই পাশ্চাত্য যন্ত্র ও হাতিয়ারগুলি হিন্দুর আদর্শে, হিন্দুর জাতীয় লক্ষ্য অনুসারে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন। যে দিন বিবেকানন্দ বিদেশে বেদান্ত প্রচার করিলেন, সে দিন বুঝিলাম ভারতবর্ষের প্রভাব পাশ্চাত্য জগতে বিস্তৃত হইবে। যে দিন দেখিলাম 'বিশ্বমানব-পরিষদে'র প্রথম সভায় বাঙ্গালীর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সভাপতির পদে আহুত হইয়াছেন, সে দিন বুঝিলাম হিন্দুর বাণী শুনিবার জন্য পাশ্চাত্য জগৎ এখনও ব্যগ্র। আর আজকাল রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে সম্বর্দ্ধনা লাভ করিতেছেন, তাহাতেও বুঝিতেছি —ভারতবাসী ইউরোপকে, হিন্দুসাহিত্যসেবী বিজ্ঞানাভিমানী পাশ্চাত্য জগৎকে হিন্দুর সনাতন কথা শুনাইতেছেন। এখন ও ইউরোপীয়েরা হিন্দুর নিকট অনেক বিষয় শিখিতে চেষ্টিত।

আমরা বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে এই জন্যই ভারতবাসীর গৌরব, বাঙ্গালীর গৌরব, হিন্দুর গৌরব মনে করি। তিনি অনেক স্বাধীন চিন্তার সুফল সমগ্র সংসারকে দিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক জগৎ তাঁহার আবিষ্কারসমূহের ফলে যথেষ্ট ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে। মানব-জাতিকে তিনি ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা সকলেই তাহা স্বীকার করেন। আমরাও তাহা বুঝিয়া না বুঝিয়া গৌরব বোধ করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা আমাদের জগদীশচন্দ্রকে কেবল একজন বৈজ্ঞানিক বা আবিষ্কারক বা চিন্তাবীরমাত্র রূপে দেখি না। আমরা তাঁহাকে হিন্দুর মূলতত্ত্বের প্রচারক স্বরূপ মনে করি। তিনি ভারতের মর্ম্ম-কথা আধুনিক জগৎকে শুনাইয়াছেন। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার আবহাওয়ার মধ্যে হিন্দু সভ্যতার চরম উপদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের বাণী—হিন্দুর হিন্দুত্ব—তাঁহার বিজ্ঞানালোচনার ভিতর দিয়া বিংশ শতাব্দীর নর-সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশসমূহ এই উপায়ে ভারতের বিশিষ্ট সাধনার দ্বারা আলোকিত হইল। বৈজ্ঞানিক সংসার এই উপায়ে হিন্দুর ভাবে প্রভাবান্বিত হইল। এই উপায়ে হিন্দুর জাতীয় বিজ্ঞান বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত করিল।

বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্র-নাথ—সকলেই একভাবের ভাবুক, একই মন্ত্রের দ্রষ্টা, একই বাণীর প্রচারক। ভারতবাসীর ইউরোপ-বিজয়ের ইঁহারাই প্রথম সেনাপতি। এই দিগ্বিজয়ী বীরগণ তাঁহাদের নিজ নিজ উপায়ে ভারতবাসীকে কর্ম্মের পথ দেখাইয়া-ছেন। ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ, সাহিত্য-সেবিগণ, বিজ্ঞানের উপাসকগণ, আর

ইউরোপের 'বুলি' আওড়াইবেন না, নিজকে বুঝিতে চেষ্টা করুন—নিজের কথা প্রচার করুন। ভারতের সাধনা হৃদয়ঙ্গম করিয়া হিন্দুর জাতীয় সভ্যতার সনাতন পথ ধরিলে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী লাহোর ইউনিভার্সিটি হলে একটি সভা হইয়াছিল। ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার আরম্ভেই তিনি জীবকের সহিত নিজের তুলনা করিয়া বলেন, "বহুদিন পূর্ব্বে এই মহাত্মা বঙ্গদেশ হইতে তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য আগমন করেন এবং শেষে ভগবান বুদ্ধের চিকিৎসক হন। সেই সময় হইতে প্রায় পঞ্চবিংশ শতাব্দী গত হইয়া গিয়াছে। আজ আবার আর একটি পর্য্যটক ঠিক জীবকেরই মত বঙ্গদেশ হইতে আগমন করিয়া আপনার আহৃত জ্ঞান উপহার দিতে উদ্যত।"

তারপর তিনি বলেন, "জ্ঞান কখনও কোন জাতিবিশেষের একক সম্পত্তি নহে। জ্ঞান কখনও কোন ভৌগোলিক সীমা স্বীকার করে নাই। জগতে সবাই পরস্পর-নির্ভরশীল। সুতরাং যুগে যুগে চিন্তার বিনিময়ে মানবজাতিই সমৃদ্ধ হইতেছে।

এই তক্ষশিলায় গ্রীক ও প্রাচ্য আর্য্যগণ একবার মিলিয়াছিলেন। সেই মিলনে তাঁহারা নিজের নিজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেয় বিনিময় করিয়া গিয়াছেন। বহু শতাব্দী পরে আজ আবার ভারতবর্ষে সেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ঘটিয়াছে। এই মিলনের ফলে দুই সভ্য জাতিকেই অধিকতর সুন্দর ও সার্থক হইতে হইবে। তাহা না হইলে তাহাদের প্রকৃত মহত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারিব না।

"এ কথা ঠিক, মধ্যে কিছুদিন ভারতবর্ষে মানসিক জড়ত্বের বাহ্যতঃ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে অবস্থা নিতান্তই ক্ষণিক। ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে ঋতু-বিবর্ত্তনের ন্যায় মানসিক ক্রিয়াশক্তির বিপুল আন্দোলন পৃথিবীর পৃথক্ পৃথক জাতির মধ্যে প্রবাহিত হইয়া যায়। মধু ঋতু আগমনে সকলেরই সঞ্জীবতা ফিরিয়া আসে। তেমনি বংশ-পরম্পরালব্ধ জ্ঞান ও প্রকৃতি নব বিকাশের অপেক্ষায় এতদিন ভারতবর্ষের মধ্যে সুপ্ত ছিল।"

"বিজ্ঞান প্রাচ্য কিম্বা পাশ্চাত্যের কোন বিশেষ সম্পত্তি নহে। ইহা বিশ্বের—ইহাতে সকল জাতির সমান অধিকার। কিন্তু যেখানে ইহার প্রথম উদ্ভব, সেখানকার স্বকীয় একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য ইহা লাভ করিয়াই থাকে। হয় ত সেই জন্যই ভারতবর্ষ তাহার অভ্যাসগত সামঞ্জস্য-বিধানের সহজজ্ঞানে একত্বের ভাব উপলব্ধি করিয়াছিল। হয় ত সেই জন্যই সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের মধ্যে বহুর পরিবর্ত্তে এককেই লক্ষ্য করিয়াছে। সেই চিন্তার ধারাই আমার মত একজন ভারতীয় পদার্থবিদ্ কর্ত্তৃক অনুসৃত। জড়জগতের উপরে কোন্ শক্তিগুলি কার্য্য করিতেছে, ইহা অনুধাবন করিতে যাইয়াই আমি দেখিয়াছি, জীব ও জড় পরস্পর-সংযুক্ত—উভয়ের মধ্যে কোন সীমারেখা পাওয়া যায় না!"

তদনন্তর বক্তা তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেন। বাঙ্গালীর একটা গৌরবের কথা এই যে, জগদীশচন্দ্র

লাহোরে বক্তৃতার মূল্যস্বরূপ যে অর্থ পাইয়াছিলেন সমস্তই তিনি পঞ্জাবে বিজ্ঞান প্রচারের জন্য দান করিয়াছেন।

জগদীশচন্দ্র আমাদের ঘরের লোক। অথচ তাঁহার বিষয় আমরা খুব কমই জানি। ইহাপেক্ষা আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে? কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় সম্প্রতি বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানপ্রচারক আজীবন সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় "বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার" নাম দিয়া বঙ্গভাষায় একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার ভাষা সরল ও সুপাঠ্য। ম্যাট্রিকুলেশনের ছাত্রগণও তাহা বেশ বুঝিতে পারিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তকখানিকে ঐ শ্রেণীর পাঠ্য করিলে ভাল হয়। আমাদের বিশ্বাস আছে এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা আমাদের জগদীশচন্দ্রকে কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিব।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রীয় জগতে নবীন শক্তির আবির্ভাব

[মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাসে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দ এক অতি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর আধুনিক ইউরোপীয় তুরস্ক জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ কন্‌ষ্টান্টিনোপল নগর দখল করেন এবং পাশ্চাত্য জগতে প্রাচ্য প্রভাব বিস্তারের সূত্রপাত হয়। সেই ঘটনায় বিশাল সুপ্রাচীন রোমক-সাম্রাজ্যের পূর্ব্ববিভাগ গ্রীক সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং খৃষ্টান সমাজের উপর মুসলমানজাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার ফলে গ্রীক রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টান পণ্ডিত, সাহিত্যসেবী, অধ্যাপক, দার্শনিক, শিল্পী, কবি, লেখক ইত্যাদি সর্ব্ববিধ বিদ্যার উপাসকগণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগকে আতিথ্য দান করিয়া দক্ষিণ ইউরোপ, পশ্চিম ইউরোপ এবং মধ্য ইউরোপের রাজন্যবর্গ ও ধনি-সম্প্রদায় নিজ নিজ দেশে শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পের উন্নতি বিধান করিতে যত্নবান্ হন।

প্রাচ্য ইউরোপের এক প্রান্তে মুসলমান-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার প্রভাবে এসিয়ার বিভিন্ন দেশের সহিত খৃষ্টান জাতিপুঞ্জের ব্যবসায় ও বাণিজ্য যথেষ্ট বাধা পাইতে থাকে। এসিয়ায় আসিবার জন্য ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণ আর ভূমধ্যসাগরের পথ ব্যবহার করিতে পারিতেন না। কাজেই তাঁহারা নূতন পথ আবিষ্কার করিতে বাধ্য হইলেন। এই পথ বাহির করিতে যাইয়া তাঁহারা একটা নূতন ভূখণ্ডই আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের ধারা নূতন পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল, এজন্য পুরাতন ব্যবসায়ী জাতিপুঞ্জের পরিবর্ত্তে ইউরোপে নূতন ব্যবসায়ী সমাজ সৃষ্ট হইল। ব্যবসায়-জগতের ভার-কেন্দ্র ভূমধ্যসাগর হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগরে স্থানান্তরিত হইল। ভূমধ্যসাগরের কূলবর্ত্তী জাতিসমূহের পরিবর্ত্তে আটলাণ্টিক সাগরের সমীপবর্ত্তী

দেশসমূহ ব্যবসায়-জগতে প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিল।

নূতন প্রণালীতে বিদ্যাবিস্তার ও শিক্ষা-প্রচারের প্রভাবে সমাজে নবশক্তি আসিয়াছিল। নূতন পৃথিবী আবিষ্কারের ফলে ইউরোপের জনগণের হৃদয়ে নূতন উৎসাহ নূতন সাহস জাগরিত হইয়াছিল। ব্যবসায়ের নূতন পথ উন্মুক্ত হইয়া নূতন নূতন জাতির অর্থ-শক্তি পুষ্ট করিয়াছিল। শিল্প, কারুকার্য্য, সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র—সর্ব্বত্র এক অভিনব শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। ইউরোপের সকল দেশে নূতন চিন্তা-প্রণালী, নূতন শাসন-প্রণালী, নূতন রণ-প্রণালী ও নূতন ধর্ম্মপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। স্থূলজগৎ, মানসিক-জগৎ, বৈজ্ঞানিক-জগৎ, রাষ্ট্রীয়-জগৎ সকল কর্ম্ম-ক্ষেত্রেই নূতন নূতন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং নূতন নূতন বাণী প্রচারিত হইয়াছিল। ইউরোপে মানবজীবন নবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে পাশ্চাত্য জগতে একটা যুগান্তরের সৃষ্টি হইয়াছিল। সকল বিষয়ে নবীন ইউরোপের সূচনা হইয়াছিল।

আমরা দেখিতেছি—আমাদের সম্মুখে সমগ্র মানবজাতির পক্ষে এইরূপ একটা যুগান্তরের সৃষ্টি হইতেছে। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দের ঘটনায় কেবলমাত্র ইউরোপখণ্ডের অভ্যন্তরে পুরাতনের পরিবর্ত্তে নূতনের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। আমাদের সম্মুখে যে যুগান্তরের উপক্রম হইতেছে, তাহার ফলে ইউরোপ ও এসিয়া—কেবল এই দুই ভূখণ্ড কেন—ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এসিয়া—সমগ্র পূর্ব্ব জগৎ এবং সমগ্র পশ্চিম জগৎ—পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দের ঘটনায় আমেরিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে মাত্র এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতে যে বিপ্লব সংঘটিত হইবে তাহাতে আমেরিকা স্বয়ংই প্রধান উদ্যোক্তা। চীন, জাপান প্রভৃতি এসিয়াখণ্ডের দেশ সকল সেই সময়ে পাশ্চাত্য জগতের নিকট নামে মাত্র পরিচিত ছিল কি না সন্দেহ। আধুনিক জগতে যে বিশ্বব্যাপী পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে চলিল, তাহাতে জাপান ও চীনের হাত অতিশয় প্রবল মাত্রায়ই থাকিবে।

আমরা নূতন কাটা প্যানামা খালের প্রভাবে এই যুগান্তরের সম্ভাবনা দেখিতেছি। এখাল কাটা হইলে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর যুক্ত হইয়া যাইবে। এই দুই মহাসাগরের উপকূলস্থ দেশসমূহ এবং অভ্যন্তরস্থ দ্বীপ-সমূহের অবস্থা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। পৃথিবীর ব্যবসায় ও বাণিজ্য-জগৎ একেবারে ওলট্ পালট্ হইয়া যাইবে। আর্থিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় মণ্ডলের ভারকেন্দ্র নূতন স্থানে সন্নিবেশিত হইবে। তাহার ফলে মানবজাতির ইতিহাসে সকল বিষয়ে পুরাতনের পরিবর্ত্তে নূতনের আবির্ভাব হইবে। নূতন বিদ্যা, নূতন সাহিত্য, নূতন শিল্প, নূতন বিচারপ্রণালী, নূতন কর্ম্ম-প্রণালী, নূতন জাতি সমাবেশ, অভিনব রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ—ইত্যাদি নবজগতের সর্ব্ববিধ লক্ষণগুলি দেখা দিবে। মানব-সমাজ রূপান্তর গ্রহণ করিবে।

মুসলমানগণের কন্‌ষ্টান্টিনোপল-অধিকার এবং আমেরিকাখণ্ডের প্যানামাখাল কর্ত্তন— এই দুইটি ঘটনা মানব-সভ্যতার ইতিহাসে একই গোষ্ঠীভুক্ত। দুই-ই তুল্য প্রভাব-সম্পন্ন, দুই-ই জগতের জীবনপ্রবাহে যুগান্তরের প্রবর্ত্তক। কন্‌ষ্টান্টিনোপল অধিকারের প্রভাব এখন ঐতিহাসিক মাত্রেই বিবৃত করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকেও এই প্রভাব বিশদরূপেই উল্লিখিত হয়। প্যানামার প্রভাব এখন কেবলমাত্র দূরদর্শী রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদেরা এবং সমাজনীতিবিশারদেরাই দেখিতেছেন। এই খালের সুদূরবিস্তৃত ফলাফল সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী-প্রচারকই নিঃসন্দেহে কোন কথা বলিতে অসমর্থ। আধুনিক শক্তি-পুঞ্জের সমাবেশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সমীপ-বর্ত্তী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দু-একটা ইঙ্গিত করা যাইতে পারে মাত্র। আমরা বারান্তরে এই প্রভাবের যথাসম্ভব বিস্তৃত আলোচনা করিব।

এবার আমরা আর একটা বিষয়ে পাঠক-গণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। এই বিষয়টিও প্যানামা খালের প্রভাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমরা দক্ষিণ আমেরিকাখণ্ডে নূতন রাষ্ট্রীয় শক্তিসমাবেশের কথা বলিতেছি। এই ভূভাগের জাতিপুঞ্জ ধীরে ধীরে লোক-চক্ষুর অন্তরালে বিকাশ লাভ করিতে করিতে বর্ত্তমান কালে অসীম শক্তি লাভ করিয়াছে। এই শক্তি অস্বীকার করিয়া আমেরিকা, জাপান, ইংলণ্ড এবং অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাতি আর এক মুহূর্ত্তও চলিতে পারেন না।—

আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে পঠিত ভূগোল হইতে দক্ষিণ আমেরিকার বিষয় খুব অল্পই জানি। আমরা সংসারের সংবাদ এত কম রাখি যে, আমেরিকা বলিলে আমরা উত্তর আমেরিকা বুঝিয়া থাকি। আবার উত্তর আমেরিকা বলিলে মার্কিণের যুক্তরাজ্যটুকু মাত্র বুঝি। সেই সব কারণেই দক্ষিণ আমেরিকা আমাদের নিকট এত দিন অবজ্ঞাত রহিয়াছে। কিন্তু এখন আর সে নগণ্য নহে—আমরা চক্ষু খুলিলেই বুঝিতে পারিব। সর্ব্ব দিকে তাহার ক্রমিক উন্নতি এবং বিপুল বিস্তৃতি সভ্যজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তাহার সঙ্গে বাণিজ্যের সম্বন্ধ পাতাইবার জন্য মার্কিণের যুক্তরাজ্য, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, স্পেন, ইটালী এবং অষ্ট্রিয়া অত্যধিক মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জাপান তাহার পশ্চিম উপকূলের সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির জন্য ষ্টীমারের লাইন খুলিয়াছেন। জাপান হইতে চিলিতে ষ্টীমারসংযোগে চাকে মণিজডার যাতায়াত করিতেছে।

আমেরিকার নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু এম্, এস্, সি মহাশয় মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় এই দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার স্বরাজ-সমূহের আন্তর্জ্জাতিক বিভাগের সরকারী রিপোর্ট ও প্রবন্ধাদি সমূহ হইতে সংগৃহীত।

দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন ইতিহাসও গৌরবসূচক। এখানে বহু কর্ম্মবীর, বহু রাষ্ট্রবিদ্, বহু লেখক এবং বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের কর্ম্মফলেই অদ্যকার দক্ষিণ আমেরিকা এই আকার ধারণ

করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত প্রধান প্রধান দেশের প্রধান প্রধান নগরীতে বহু বিজ্ঞ পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং উন্নত বিশ্ববিদ্যালয় বর্ত্তমান। লীমা, পেরু, আর্জ্জেন্টিনার অন্তর্গত কর্ডোভা নগরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হার্ভার্ড ও ইয়েল বিশ্ব-বিদ্যালয় অপেক্ষাও প্রাচীন। মার্কিণ-যুক্তরাজ্যের সেক্রেটারী ইলিহুরুট সাহেব বলেন, উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতার নিকটে অনেক কিছু শিখিতে পারে। পেরু, ইকোয়েডর এবং বলিভিয়ায় যে সমস্ত ধ্বংসরাশি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইতেও বুঝা যায় ঐ সব দেশ এক দিন বৈষয়িক ও মানসিক জগতে বহু উন্নত ছিল। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মনে করেন তাহাদের ঐ উন্নতির কারণ ভারতীয় সভ্যতা। হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ বোধ হয় এইখানে আসিয়া যবদ্বীপের মত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ আমেরিকার প্রাকৃতিক ভূগোলও অনেক কারণে প্রণিধান-যোগ্য। ইহার ব্রেজিল রাজ্য মার্কিণ-যুক্তরাজ্য অপেক্ষা আয়তনে অতিশয় বৃহৎ। ইহার য্যামেজন ও প্যারানা নদী উত্তর আমেরিকার সর্ব্ববৃহৎ নদী-গুলি অপেক্ষাও বেশী জল বহন করে। এই নদীগুলির জন্যই ইহার আভ্যন্তরিক নৌ-বাণিজ্য খুব সহজসাধ্য। কিন্তু কয়জনে এ সব খবর রাখেন? কয়জনে জানেন ব্রেজিলের রাজ-ধানী রাইয়ো ডি জেনাইরো আমেরিকার অন্যান্য নগরের সহিত সমান দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে চলিতেছে? কয়জনে জানেন ইহার লোকসংখ্যা এখন ৯০০,০০০ এবং পৃথিবীর মধ্যে সভ্যতা, ব্যবসায়, কলা, সাহিত্য এবং শিক্ষার ইহা একটি প্রধান কেন্দ্র? কয়জনে জানেন আর্জ্জেন্টিনার রাজধানী ব্যুয়েনোস আইরেস প্যারীর নীচেই দ্বিতীয় ল্যাটিন সহর? কয়জনে জানেন ইহার লোকসংখ্যা ১,২০০,০০০ এবং ইহাও উন্নতির পথে দ্রুতপদে অগ্রসর? এই সহরেই গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ৩০,০০০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে যে অপেরাগৃহটি নির্ম্মিত হইয়াছে, পৃথিবীর মধ্যে তাহাই সর্ব্বা-পেক্ষা সুন্দর এবং বৃহৎ। আর্জ্জেন্টিনা এবং চিলি রাজ্যের মধ্যে রেলপথের জন্য যে সুড়ঙ্গটি কাটা হইয়াছে, তাহাও পৃথিবীর দীর্ঘতম টানেলের মধ্যে একটি। পেরুর লৌহবর্ত্ম ও জগতের মধ্যে একটি বিস্ময়কর ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার!

দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যগুলির আয়তন এবং স্বাস্থ্যসম্বন্ধেও অনেকের বিকৃত ধারণা আছে। ব্রেজিলের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কলোম্বিয়ার আয়তন জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়াম যুক্ত করিলে যত বড় হয়, তত বড়। অন্যান্য রাজ্যগুলির আয়তনও এইরূপ। অনেকের বিশ্বাস দেশটি গ্রীষ্ম-প্রধান, কেননা বিষুবরেখা উত্তর ব্রেজিল এবং ইকোয়েডরের মধ্য দিয়া গিয়াছে, এবং দেশের উত্তর দিকটা গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত। কিন্তু অনেকেই বোধ হয় জানেন না—কলোম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ইকোয়েডর, পেরু এবং ব্রেজিল রাজ্যসমূহে খুব উচ্চ ও বিস্তীর্ণ সমতলভূমি আছে। সমুদ্র হইতে সেগুলি বহু উচ্চে বলিয়া সেখানকার আবহাওয়া সমস্ত বৎসর ধরিয়াই বেশ সুখ-শীতল থাকে, এবং শস্যাদিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে।

অনেকে আবার মনে করেন দক্ষিণ আমে-রিকায় বিদ্রোহ-বিপ্লব লাগিয়াই আছে।

এখানে বাণিজ্য বা ব্যাঙ্কিং চলিতে পারে না। কিন্তু এরূপ ধারণা করিলে উন্নতিশীল দক্ষিণ আমেরিকাবাসীদিগের উপর অন্যায় করা হয়। ব্রেজিল, আর্জ্জেন্টিনা, চিলি এবং পেরুতে যে ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতেছে, সাধারণের মনের গতি যেরূপ, তাহাতে কোন বিপ্লবের কথা মনেই উঠিতে পারে না। যদিও মধ্যে মধ্যে এখানে সেখানে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্রোহের চেষ্টা হয় বটে, কিন্তু সেগুলি বাড়িয়া উঠিতে পারে না—চারিদিকে রেল-রাস্তা বিস্তৃত—সৈন্য পাঠাইয়া সত্বরই সে-গুলিকে দমন করা হয়।

অধুনা প্যানামা-যোজকের দক্ষিণে প্রায় ৫০,০০০,০০০ লোকের বাস। লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। বিদেশ হইতে বহুলোক আর্জ্জেন্টিনা, ব্রেজিল, উরুগোয়ে এবং চিলিতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মার্কিণযুক্তরাজ্যে বিদেশীয়গণের প্রবেশ-পথ যতই বাধাপ্রাপ্ত হইবে, ততই দক্ষিণ আমেরিকায় তাহারা আসিয়া জুটিবে। দক্ষিণ আমেরিকার সমস্তগুলি উন্নতিশীল দেশই তাহাদিগকে লইবার জন্য আগ্রহান্বিত। আর্জ্জে-ণ্টিনায় বিদেশী লোকের সংখ্যা বেশী। গত ১৯০৮ সালে তথায় যে সমস্ত বিদেশী যায় তাহাদের সংখ্যা নিম্নে বিবৃত করা গেল।—

স্পেন দেশীয়	...		১২১,৪৯৭
ইটালীয়	...	...	৯৩,৪৭৯
সিরিয়ান	...	...	৯,১১১
রুসীয়	...	...	৮,৫৬০
ফরাসী	...	...	৩,৮২৩
অষ্ট্রিয়াবাসী	...		২,৫৫১
জার্ম্মান্	...		২,৪৬৯
পর্ত্তুগীজ	...	...	২,০৮৩
ব্রীটন	...	...	১,৮৭৯
হাঙ্গারিয়ান	...	..	৯৩৪
সুইস	...	...	৬৬৫
ব্রেজিলীয়	...	...	৬২৫
দিনেমার	...	.	৪৬৩
উত্তর আমেরিকাবাসী			৩৪১
অন্যান্য	...	.	৩,২২৯
		মোট	১৫৫,৭১০

এই "অন্যান্যে"র মধ্যে চীনা এবং জাপানীর সংখ্যাও বড় কম নহে। যাঁহারা কৃষিজীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক, আর্জ্জেন্টিনার উর্ব্বর ভূমি তাঁহাদিগের জন্য বহু দিন উন্মুক্ত থাকিবে। পশ্বাদির ব্যবসায়ও এখানে বেশ চলিতে পারে।

দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীগুলি বড়ই মিশ্রিত। স্পেনীয়, পর্ত্তুগীজ, নিগ্রো এবং সেখানকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিবাহের আদান প্রদান হইয়া থাকে, সেইজন্য সেখানে জাতিবিদ্বেষ নাই—কেবল চিলিতে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। বলা বাহুল্য, বর্ণ-বৈষম্যের জন্য দক্ষিণ আমেরিকায় বিদেশীয়-দিগের কোন কষ্টই হয় না—তাঁহারা বেশ সুখেই সেখানে বাস করিতে পারেন।

ব্রেজিল ব্যতীত আর সব দেশেই স্পেনীয় ভাষার চলন। ব্রেজিলে পর্ত্তুগীজ ভাষা চলিয়া থাকে, স্পেনীয় ভাষা সেখানে খুব কমই শ্রুত হয়। দুইটি ভাষাই শুনিতে প্রায় একরূপ—খুব অভ্যস্ত না হইলে দু'য়ের পার্থক্য অনুভব করা কঠিন। প্রত্যেক শিক্ষিত স্পেনীয় বা পর্ত্তুগীজই ফ্রেঞ্চ ভাষা তাহার মাতৃভাষার মতই বলিতে বা পড়িতে পারে।

এখন দক্ষিণ আমেরিকায় কিরূপে যাওয়া যায় তাহাই বলা যাইতেছে। সাউদামটন, হাম্বার্গ, চারবোর্গ, লিসবন অথবা মার্সেলিস্ হইতে প্রায়ই মেল এবং যাত্রী-ষ্টীমার রাইয়ো ডি জেনাইরো এবং ব্যুয়েনোস আইরেস-এর জন্য যাত্রা করে। সেই সব ষ্টীমারে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে যাওয়া যায়। দেশের অভ্যন্তরে গমনাগমনেরও নানা রকম সুবিধা আছে। প্রতি বৎসর নূতন নূতন রেল রাস্তা তৈয়ারী হইতেছে। আর্জ্জেন্টিনায় ইতিমধ্যেই খুব সুন্দর রেলের বন্দোবস্ত হইয়াছে; ব্রেজিলে বৃহৎ বৃহৎ বন কাটিয়া রেল রাস্তা দ্বারা নানা স্থানের সঙ্গে রাইয়ো ডি জেনাইরোর যোগ সাধিত হইতেছে; চিলি সর্ব্ব দিকে রেল বিস্তার করিতেছে। বলিভিয়া রেলের জন্য কিঞ্চিদধিক ১৫০,০০০,০০০৲ টাকা ব্যয় করিতেছে; কলাম্বিয়া. ইকোয়েডর, পেরু, উরুগোয়ে, প্যারাগোয়ে এবং ভেনিজুয়েলা রাজ্যও নূতন নূতন নক্সা অনুসারে রেল-রাস্তার কার্য্যে হাত দিয়াছে।

ব্যবসা, বাণিজ্য এবং গতায়াতের এইরূপ সুবিধা হওয়ায় দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশের মধ্যে নূতন রকমের বৈষয়িক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। খুব সম্ভবত আগামী দশ বৎসরের মধ্যেই ইহার বৈষয়িক উন্নতি পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। বোধ হয় অনেকেই জানেন না বিগত ১৯০৮ সালে গ্রেট ব্রীটেন মার্কিণের যুক্তরাজ্য অপেক্ষা আর্জ্জেন্টিনা রাজ্য হইতেই বেশী শস্য ও মাংস কিনিয়াছিলেন। এ কথা এখানে বলা উচিত আর্জ্জেন্টিনার উত্তর প্রদেশে শীঘ্রই তুলার চাষ আরম্ভ হইবে। হইলে, বোধ হয় মার্কিণের যুক্তরাজ্য তাহার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারিয়া উঠিবে না। কলোম্বিয়া, ইকোয়েডর, পেরু, বলিভিয়া এবং চিলি রাজ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, টিন, প্ল্যাটিনাম্ এবং নাইট্রেটের খনি বিদ্যমান—সেইজন্য ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা এই সব জায়গায় কারবার খুলিতে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন।

এইরূপে নানাদিক হইতেই দক্ষিণ আমেরিকাতে দ্রুত উন্নতি হইতেছে—তাহার সমস্ত রাজ্যগুলিই সজীব ও সতেজ হইয়া উঠিতেছে। তাহার এই নব অভ্যুদয় বিদেশীয়েরা খুব ভাল চক্ষে দেখিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। তাহার প্রতি মার্কিণ-যুক্তরাজ্যের ভাবটাও বড় সন্দেহজনক। কিন্তু এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। দুইটি আমেরিকার মধ্যে যাহাতে বিশ্বাস ও অনুরাগ অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার আয়োজন হইতেছে। মার্কিণ-যুক্তরাজ্য হইতে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি দক্ষিণ আমেরিকায় যাইয়া সখ্য স্থাপন করিয়া আসিতেছেন। ইহার ফলেই দুই আমেরিকার একটি মিলন-সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহার ডিরেক্টর দুই আমেরিকাস্থ ২১টি রাজ্যের ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত। তিনি সকল রাজ্যের কাছেই নিজের কাযের জন্য দায়ী। এই সমিতিটি সকলগুলি রাজ্যের ধন দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। এই সমিতি বা বিউরোর কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্য ২৫ জন মাত্র। তাহাদের কেহ শাসন-বিভাগ, কেহ অনুবাদ-বিভাগ প্রভৃতিতে কার্য্য করেন। এই বিউরোর লাইব্রেরীতে যে

সমস্ত বই আছে, তাহাদের সংখ্যা ১৫,০০০ অপেক্ষা কিছু বেশী।

প্যানামার খাল কাটা হইলে এই সমিতির কার্য্যপ্রণালী কি ফল প্রসব করিবে, তাহা এখন ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

দাক্ষিণাত্যে বৈষয়িক আন্দোলন

আজকাল ভারতের সর্ব্বত্রই ব্যবসা-বাণিজ্য ও কলকারখানার উন্নতি হইতেছে। ইহা খুব সুলক্ষণ। আমরা মনে করি, ভারতবর্ষের উপরে বৃথা গালি বর্ষণের দিন আর নাই। বাণিজ্য-জগতে ভারত শীঘ্রই পৃথিবীর মধ্যে উচ্চস্থান লাভ করিবে।

আমাদের মন যে ঠিক বুঝিয়াছে তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বৈষয়িক আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানের বিবরণ 'গৃহস্থে'র পাঠকগণকে ক্রমে ক্রমে উপহার দিব। অদ্য দাক্ষিণাত্যের বিবরণ দিতেছি।

মহারাষ্ট্র

বোম্বাই প্রদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি-কল্পে ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত অনেক আয়োজন হইয়াছে। দেশের ধনিগণ বিশেষভাবে এই দিকে লক্ষ্য ফিরাইয়াছেন। অনেকেরই ইচ্ছা হইয়াছে—ব্যবসা ও বাণিজ্য শিক্ষা দিবার জন্য একটি কলেজ খুলিতে হইবে। তদর্থে শ্রীযুক্ত জগমোহন দাস এবং জীবন দাস মাধব দাস বম্বে-গভর্ণমেণ্টকে ২½ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। সেই টাকা দিয়া উক্ত কলেজের একজন অধ্যাপককে সাহায্য করা হইবে। সু-বিখ্যাত পার্শী দানবীর শ্রীযুক্ত ওয়াডিয়া-মহোদয়ের প্রদত্ত ধনভাণ্ডারের ট্রাষ্টিগণ গভর্ণমেণ্টের হাতে 'পোর্ট ট্রাষ্টিস বোর্ডে'র আয় ধরিয়া দিয়াছেন। তাহা হইতে বৎসরে প্রায় ৪৮০০৲ টাকা আয় হইবে। শ্রীযুক্ত ওয়াডিয়ার নামে সেই টাকায় একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করিতে হইবে। স্যর চুণিলাল মাধবলাল একলক্ষ টাকা এবং বম্বে চেম্বার অব কমার্স বৎসরে ১৫০০৲ টাকা দিয়াছেন। মিল-ওনার্স এসোসিয়েসন, ইণ্ডিয়ান মার্চাণ্টস্ চেম্বর এণ্ড ব্যুরো, বম্বে নেটিভ পিস্ গুড্‌স্ মার্চ্যাণ্ট এসোসিয়েসন এবং আমেদাবাদ মিল-ওনার্স এসোসিয়েসন প্রত্যেকে বৎসর ১০০০৲ টাকা দিয়াছেন।

বম্বে-গভর্ণমেণ্ট ঐ সব টাকা দিয়া শীঘ্রই একটি বাণিজ্য-শিক্ষার কলেজ খুলিবেন। কলেজে দুইজন অধ্যাপক (তন্মধ্যে একজন প্রিন্সিপ্যাল) এবং দুইজন লেকচারার নিযুক্ত হইবেন। এই ধরণের কলেজ ভারতবর্ষে এই-ই সর্ব্ব প্রথম। পূর্ব্বোক্ত কলেজস্থাপন ভিন্ন আরও অন্যান্য উদ্দেশ্যে অনেকে গভর্ণমেণ্টকে টাকা দিয়াছেন। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ধনী অনারেবল স্যর স্যাশুন, জে, ডেভিড ৮ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। তাহা দিয়া (১) কৃষক বালকদিগকে মাতৃভাষায় কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য গ্রামে গ্রামে কৃষি-বিদ্যালয় খুলিতে হইবে; (২) গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী বা বাহিরের লোকদিগকে চাষবাস এবং কৃষি-যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিবার

জন্য সাহায্য করিতে হইবে; (৩) গভর্ণমেণ্টের অথবা গভর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়-সমূহে কৃষিশিক্ষার্থী ছাত্রদিগের জন্য হোষ্টেল খুলিতে হইবে। বড়োদার পার্শী ডাক্তার মাণেকসাগিমি উইল করিয়া ১,১০,০০০৲ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে পার্শী ছাত্রদিগকে বৃত্তি দেওয়া হয়, এবং তাহার সুদ হইতে উপযুক্ত পার্শী ছাত্রগণকে বিদেশে বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইয়া থাকে।

বলা বাহুল্য, বঙ্গদেশের ন্যায় বোম্বাই হইতেও বহু ছাত্র প্রতি বৎসর বিদেশে শিক্ষার্থ প্রেরিত হইতেছেন। এতদর্থে প্রবর্ত্তিত 'হিন্দু এডুকেশন ফণ্ডে'র সাহায্যে ইতিমধ্যে বহু ছাত্রকে নানা বিষয় শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠান হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন আই, সি, এস পাশ করিয়াছেন। একজন জাপানে আর একজন জার্ম্মাণীতে রসায়ন শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন। একজন ছাত্র জার্ম্মাণীতে পি, এইচ ডি, পাশ করিয়া, সেই খানেই শিক্ষকতা করিতেছেন। মধ্যে একটি কারখানা হইতে তিনি রংএর কার্য্যও শিক্ষা করিয়া লইয়াছেন। একজন ছাত্র আমেরিকা হইতে চিনি প্রস্তুত করণ শিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কৃষিকার্য্য, ব্যবসাবাণিজ্য, ব্যাঙ্ক-স্থাপন প্রভৃতি শিখিবার জন্যও বহু ছাত্র ঐ ফণ্ডের সাহায্যে বিদেশে প্রেরিত হইতেছেন। বিষয়নির্ব্বাচনে 'ফণ্ডে'র পরিচালকগণের বেশ যোগ্যতা আছে বুঝা যায়।

বোম্বাই প্রদেশে যে সমস্ত কারখানার কার্য্য চলিতেছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।—

(১) এফ্ এস্ প্যারেক টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট্, সুরাট।—ইহার কার্য্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, ইহাতে যে সমস্ত ছাত্র তিন বৎসরে পাঠ শেষ করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ১৯০৯ সালে ৩০ এবং ১৯১০ সালে ২৮। ১৯১২ সালে দশজন ছাত্রকে দ্বিতীয় গ্রেডের আর্ট-সার্টিফিকেট এবং ৩৩ জন ছাত্রকে তৃতীয় শ্রেণীর এঞ্জিনিয়ারের সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছে।

(২) ভারতবর্ষীয় কার্পাস তেল কোম্পানী লিমিটেড্, নওসরি।—এই কারখানাটি ১৯১১ সালের সেপ্টেম্বর হইতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এই কোম্পানীর তেল আমেরিকার তেলের সমকক্ষ। ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে ইহা খুব সস্তায় কাটিতেছে। অনেকেই এই কোম্পানীর পরিষ্কৃত তেল রন্ধনকার্য্যে ব্যবহার করেন।

(৩) সোয়ান কল, বম্বে।—এই কল বাষ্পে চালিত হয়। কিন্তু বাষ্প অপেক্ষা তড়িতে চালাইলে বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য 'টাটা হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানী'র সহিত যুক্তি করিয়া এই কোম্পানী তড়িত আনাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। দুই বৎসরের মধ্যেই টাটা কোম্পানী তড়িত যোগাইবেন।

(৪) রত্নজী দেশোভাই কারানী এণ্ড কোম্পানী।—ইহাঁদের দ্বারা আণ্ডেরি এবং বার্সোবার মধ্যে একটি ট্রামের রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে। কার্য্যও বেশ সুন্দর চলিতেছে। কোম্পানীর মূলধন শীঘ্রই দুই লক্ষ টাকা হইবে।

(৫) পয়সা ফণ্ড গ্ল্যাস-ওয়ার্কস্, তালিগাঁও।—এই কোম্পানীর কায ভালই

হইতেছে। ব্যবহারযোগ্য প্রায় সমস্ত রকম কাচের জিনিষই এখানে তৈয়ারী হয়। কিন্তু অর্থাভাবে কোম্পানী এখনও অনেক কায দেখাইতে পারিতেছেন না।

(৬) পার্ল মিলস্ লিমিটেড, বম্বে।—এখানে সূতা কাটা ও কাপড় বুনানের কল আছে। ইহার মূলধন পঁচিশ লক্ষ টাকা। ২৫০৲ টাকা করিয়া ১০,০০০ অংশে তাহা বিভক্ত।

(৭) কাটনি সিমেন্ট এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোম্পানী লিমিটেড, বম্বে।—ইহার মূলধন বিশলক্ষ টাকা। পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট, নানা রকম টাইল, গ্ল্যাসের পাইপ, ইঁট, চীনামাটি, চূণ প্রভৃতি এখানে তৈয়ারী হয়।

(৮) নায়েগারা ট্রেডিং কোম্পানী।—এই কোম্পানী পুণায় একটি ধৌতি কার্য্যালয় খুলিয়াছেন। তাহাতে কাপড় চোপড় ধোয়া হয়। এখানে কাপড় রঙ্গাইবারও বন্দোবস্ত আছে।

(৯) টাটা লৌহ ও ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড, বম্বে।—এখানে সুন্দর সুন্দর লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ারী হইতেছে। তাহাদের খ্যাতি বিদেশে পর্য্যন্ত রটিয়াছে। জাপান এই কোম্পানীর একটি বড় খরিদদার।

(১০) মিষ্টর এম্ চোটানীর নব প্রতিষ্ঠিত মিল।—এই মিলের এঞ্জিন ও বয়লার মেসার্স মার্স্যাল এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড এবং করাত-যন্ত্র মেসার্স র‍্যান্সম্ এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড যোগাইয়াছেন।

(১১) দি সিস্টারস্ অব অল্ সেণ্টস্, মাঝগাঁও, বম্বে।—ইঁহারা একটি শিল্পবিদ্যালয় খুলিয়াছেন। সেখানে নানাবিধ বন্য বৃক্ষের ফল হইতে চেন, হ্যাটপিন্, রুমাল বাঁধিবার আংটী প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে।

গত বৎসরে বোম্বাই প্রদেশে নিম্নলিখিত ব্যাঙ্কগুলি খোলা হইয়াছে।—

(১) দি পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক, বম্বে।

(২) ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার ব্যাঙ্ক, হাবলি।

(৩) লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক, পুনা।

(৪) দাক্ষিণাত্য ব্যাঙ্ক, হাবলি।

(৫) সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, বম্বে।

(৬) ক্রাউন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, শিকারপুর, সিণ্ড।

(৭) জৈন ব্যাঙ্ক, আমেদাবাদ।

(৮) ন্যাশন্যাল ফাইন্যান্সিং এণ্ড কমিশন করপোরেশন, বম্বে।

(৯) ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক, বম্বে।

ব্যাঙ্ক ব্যতীত কতগুলি কো-অপারেটিভ সমিতিও বোম্বাই দেশে খোলা হইয়াছে। নিম্নের তালিকা দৃষ্টে বুঝা যাইবে কতগুলি সহরে এবং কতগুলি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত—

(১) কনর ক্ষত্রিয় আরবন্ (সহরস্থ) কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী

(২) নহবর গ্রাম্য কো-অপারেটিভ „ „

(৩) হুরিয়ান হিপ্পারাগী গ্রাম্য „ „

(৪) সোলাপুর তাঁতী আরবন্ „ „

(৫) পুণা ডিষ্ট্রিক্ট আরবন্ „ „

বিগত রয়েল একজিবিশনে বোম্বাইয়ের অনেকগুলি কলকারখানা স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন। বাহুল্যভয়ে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলাম না।

বম্বের মুক্তিফৌজ-সম্প্রদায়ও একটি প্রদর্শনী খোলেন। তাহাতে প্রদর্শিত জিনিষগুলি নিম্নলিখিত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছিল।—

(ক) কয়েদীদিগের প্রস্তুত জিনিষ।
(খ) রেশমের কায।
(গ) হাতের তাঁত।
(ঘ) লেস, সুতা ও সীবন-কার্য্য।
(ঙ) ক্ষেত্রে উৎপন্ন পদার্থাদি।

আন্ধ্র দেশ

এই প্রদেশে তালগাছ হইতে আঁশ বাহির করা হইতেছে। সেই আঁশ পরিষ্কার করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠান হয়। সেখান হইতে সেইগুলি দিয়া ঝাঁটা, ক্রস প্রভৃতি তৈয়ারী হইয়া আসে। ১৯১১ সালে নয় মাসে প্রায় ১১ লক্ষ টাকার তালগাছের আঁশ মাদ্রাজ হইতে গ্রেটব্রিটেন, জার্ম্মাণী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে চালান দেওয়া হইয়াছিল।

১৯১১ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯১২ সালের নভেম্বর মধ্যে মাদ্রাজে নিম্নলিখিত 'নিধি' বা ব্যাঙ্কগুলি স্থাপিত হইয়াছে—

কুম্বুর সুব্রমনিয়া বিলাস উপকার নিধি, কুন্নুর, কোয়েম্বটরে তিনটা নিধি, নেলোরে একটি।

গুণ্টুর জেলায় পূর্ব্বে হীরকের খনি ছিল। কিন্তু কতদিন হইতে তাহার কার্য্য বন্ধ রহিয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না। কলিকাতা হইতে খনিবিদ্যায় পারদর্শী মিষ্টর আই, সি, ইন্‌সিনার্নি তথায় প্রেরিত হইয়াছেন। তিনি এখন কৃষ্ণানদীর উপর অবস্থিত কোলারে অনুসন্ধান করিতেছেন। লোকে বলে সেইখান হইতেই কোহিনূর সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কৃত হয়।

কোয়েম্বটর জেলার অধীন পোলাচী, তিরুপুর, পালামেত্‌, জামাত্রা প্রভৃতি স্থানে ফল হইতে কার্পাস বহিষ্করণের জন্য নূতন নূতন কারখানা খুলিবার প্রস্তাব চলিতেছে।

১৯১১ সালের মে মাসে টিরুপুরে একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। তথায় অনারেবল মিষ্টর আলফ্রেড চ্যাটারটন সাহেব একটি বক্তৃতায় বুঝাইয়াছেন, কোয়েম্বটর জেলায় কি প্রণালীতে ক্ষেত্রে জল দেওয়া উচিত। চ্যাটারটন সাহেব যন্ত্র-ব্যবহারের পক্ষপাতী।

মাদ্রাজের স্বাধীন ত্রিবাঙ্কুররাজ্য কৃষি-বাণিজ্যের উপযুক্ত স্থান। তথাকার গভর্ণমেণ্ট সেইজন্য সেখানে কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ দিয়াছেন। অন্যান্য বৈষয়িক বিষয়ে এতদিন পশ্চাৎপদ থাকিলেও ত্রিবাঙ্কুরে অল্পদিনের মধ্যেই নানারূপ শিল্পের আয়োজন দেখা দিয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি উল্লেখযোগ্য—

বস্ত্রাদি বয়ন।—হাণ্ডলুমের দ্বারাই এখন পর্য্যন্ত কার্য্য চলিতেছে। কোন মিল এখনও স্থাপিত হয় নাই।

লেস-মোজা প্রভৃতি বয়ন।—খ্রীষ্টান মিশনরী স্ত্রীলোকগণ কর্ত্তৃক এই কার্য্যটি দরিদ্র নীচজাতীয় লোকদিগের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাই অধিকাংশ স্থলে এই কায করে। মিশনরীদিগের নিকট হইতে সূতা পায়, এবং তাহাই দিয়া লেস তৈয়ারী করে। ইউরোপে এই লেস খুব আদৃত হইতেছে।

তেলের ঘানী ও তৎসংক্রান্ত ব্যবসা।—ত্রিবাঙ্কুরে নারিকেল তেল সবিশেষ ব্যবহৃত হয়। রন্ধনেও এই তেল লাগে। এই তেলের প্রায় ১২টি কারখানা আছে। নারিকেলের ভিতরকার শাঁস পিষিয়া এই

তেল বাহির করা হয়। আজকাল ইউরোপে নারিকেলের শাঁস খুব যাইতেছে। কিন্তু এইরূপে নারিকেলের শাঁস যদি বিদেশে চলিয়া যায়, তবে তেল হইবে কোথা হইতে ?

গাছের আঁশের ব্যবসা।—নারিকেলের ছোবড়া দিয়া এখানে সুন্দর দড়ী ও মাদুর তৈয়ারী হয়। ১৯১০—১৯১১ সালে ঐ সব জিনিব বিদেশে রপ্তানী করিয়া ৬৮ লক্ষ টাকার চেয়েও কিছু বেশী টাকা ঘরে আসিয়াছিল। কিন্তু নারিকেলের দড়ীতে যত লাভ হইয়াছে, মাদুরে তত হয় নাই। বিদেশ হইতে আমরা যে সকল পাপোয, ব্রুস প্রভৃতি পাই, সে সব ঐ দড়ী হইতেই প্রস্তুত। সুতরাং দেশে ঐ জিনিষগুলি তৈয়ারী না হইবার কোনই কারণ নাই। আমাদের আশা আছে দেশের ধনিগণ তাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ দেশীয় শিল্পে নিয়োগ করিবেন। দুঃখের বিষয় ত্রিবাঙ্কুরে নারিকেল-আঁশের মাদুর ও অন্যান্য জিনিষ প্রস্তুত করিবার যে কয়টি কারখানা আছে, তাহা কেবল বিদেশীয়দিগেরই হাতে। দেশের ধনিগণ এই কারখানাগুলির সংখ্যা বাড়াইলে দেশের মহা উপকার হয়।

ত্রিবাঙ্কুরে নারিকেলের আঁশ ব্যতীত কলা-গাছ, তালগাছ প্রভৃতির আঁশেরও ব্যবসা চলে। কলাগাছের আঁশের ব্যবহার ত্রিবাঙ্কর-বাসিগণ বহুদিন হইতেই অবগত। প্রায় ১৯ রকমের কলাগাছের চায দেশে হইয়া থাকে। তালপত্রের মধ্যকার শিরা হইতে আঁশ তোলা হয়। ইহার ব্যবসা চনর নামক নীচজাতীয় লোকদিগের মধ্যেই বিশেষ আবদ্ধ।

পূর্ব্বোক্ত ব্যবসাগুলি ব্যতীত ত্রিবাঙ্কুরে চিনি ও কাগজ প্রভৃতিও প্রস্তুত করা হয়। এখানে মাছের ব্যবসা বেশ চলিতে পারে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় ত্রিবাঙ্কুরবাসিগণ এখনও সে দিকে মন দেন নাই।

দেশালাই ও রেশমের কারখানা অল্প দিন হইল ত্রিবাঙ্কুরে স্থাপিত হইয়াছে। খুব আশা করা যায় ইহাদের ফল ভালই হইবে।

তামা ও পিতলের কায।—মাদ্রাজের মাদুরা, তাঞ্জোর, নেলোর, ভিজাগাপটম, ত্রিচিনপলি, ত্রিবাঙ্কর, মদ্দালিয়, করতগিরি, মাগাদি, বেলুর, তাগারি এবং শ্রাবণ প্রভৃতি স্থানে তামা ও পিতলের নানা রকম জিনিষ হইয়া থাকে। সেই সব জিনিসের উপর এমন সুন্দর সুন্দর দেবমূর্ত্তি, লতাপাতা আঁকা হয় যে দেখিলে মোহিত না হইয়া থাকা যায় না। আবার তামা বা পিত্তলের দ্বারা গঠিত নানা রকম দেবমূর্ত্তি, সাপ, ব্যাঙ, টিক্‌টিকি, অদ্ভুত পশু, অদ্ভুত মনুষ্যমূর্ত্তিগুলিও দেখিতে বড় চমৎকার। ভারতবর্ষের হিন্দুদেবালয়ে যে সমস্ত ঘণ্টা ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রায় মাদ্রাজেই এই সব ব্যবসাদ্বারা কতলোকই যে সেখানে প্রতিপালিত হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু বিলাতী জিনিষের মোহে পড়িয়া যদি এই গুলির ব্যবহার পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে শুধু দেশবাসীকে নিরন্ন করিব না—সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ কলাবিদ্যা, তাহাও দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিব। এ বিষয়ে এখনই আমাদের সাবধান হওয়া আবশ্যক।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ,
জাতীয় শিক্ষাসমিতি, মালদহ।

বাঙ্গালার জমিদারগণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা বাঙ্গালার বড় লোকগুলিকে মানুষ করিবার ভার লইতেছেন। তাঁহারা অনুসন্ধানের ফলে বুঝিয়াছেন—বাঙ্গালী জমিদারগণ এখন পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করিতে অগ্রসর হন নাই। এজন্য ধনি-সমাজে শিক্ষার আলোক প্রবেশ করে নাই। তাঁহারা মনে করেন—গরীব লোকের সঙ্গে বড় লোকের ছেলেরা মিশিতে চায় না। এইজন্য সাধারণ স্কুল-কলেজে তাঁহারা যাইতে অনিচ্ছুক। অতএব ধনিসমাজে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য একটা স্বতন্ত্র স্কুল এবং একটা স্বতন্ত্র কলেজ গঠন করা আবশ্যক। সেই সকল বিদ্যালয়ের জন্য বাছাবাছা মাষ্টার, অভিভাবক ও শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইবেন, সেই সকল বিদ্যালয়ে ধনি-সমাজের উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম, পোলাও-কোপ্তা, কায়দা-কানুন, আস্বাব সভ্যতা ইত্যাদির আয়োজন করা হইবে। সেখানে জমিদারপুত্রেরা মধ্যবিত্ত ও নির্ধন ছাত্রগণ হইতে পৃথক্‌ভাবে ও পৃথক্ আদর্শে লেখা-পড়া, চলা-ফেরা, সৌজন্য-শিষ্টাচার, লেন-দেন, কাজকর্ম্ম ইত্যাদি শিখিবেন। দেশের জনসাধারণ এক জাতি; এবং বড় লোকেরা আর এক জাতি—এই ধারণা ধনী ছাত্রদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হইবে। এই প্রণালীতে দশ বার বৎসর কাল গড়িয়া উঠিলে তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানে বসিবার উপযুক্ত হইবেন।

আমরা মনে করি—জমিদারগণের অবস্থা ভুল বুঝা হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের জন্য ব্যবস্থাও উল্টা করা হইতেছে। আমরা এবার বঙ্গীয় ধনিসমাজে বিদ্যাচর্চ্চার প্রকৃত অবস্থা আলোচনা করিতেছি। বারান্তরে তাঁহাদের জন্য যথোচিত ব্যবস্থার নির্দ্দেশ করিব।

প্রথম কথা—আমাদের ধনিসমাজ বাস্তবিকই কি অশিক্ষিত, মূর্খ, চরিত্রহীন? বাঙ্গালার জমিদারেরা কি লেখা পড়া শিখিবার, মানুষ হইবার আদৌ কোন চেষ্টা করেন না? সৎশিক্ষার প্রভাব কি বড় লোকের মধ্যে একেবারেই বিস্তৃত হয় নাই? বিষয়টা গভীরভাবে তলাইয়া দেখা আবশ্যক। এজন্য একটা গোড়ার কথা মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। প্রশ্ন এই যে,—'শিক্ষিত লোক কাহাকে বলে?' 'শিক্ষিত লোকের লক্ষণ কি কি?' 'কোন্ কোন্ চিহ্ন দেখিলে একটা লোককে মানুষ বলিব?' সাধারণ হিসাবে উকীল, ব্যারিষ্টার, মাষ্টার ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার, কেরাণী, হাকিম, ইত্যাদি লোকেরা শিক্ষিত। তাঁহারা স্কুলে কলেজে পড়িয়াছেন, বিদেশে গিয়াছেন, সংবাদপত্রে লিখিয়া থাকেন, সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিতে পারেন—কংগ্রেস-কন্‌ফারেন্সের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

আমরা জানিতে চাহি—এই সমুদয় শিক্ষিত লোকের সঙ্গে জমিদারগণের প্রকৃত পার্থক্য কোথায়? কোন্ কোন্ বিষয়ে এই শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পয়সাওয়ালা লোক হইতে মহৎ? বিলাস, উচ্ছৃঙ্খলতা, চরিত্রহীনতা ইত্যাদি

অনেক দোষই বাঙ্গালীর আছে। এই দোষগুলি কি বড়লোকেরই একচেটিয়া? 'শিক্ষিত' সম্প্রদায় কি অতিশয় সচ্চরিত্র, নির্লোভ, স্বার্থত্যাগী, পরোপকারী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ? যদি দেখিতাম কংগ্রেস-কন্‌ফারেন্সের কর্ত্তাদের মধ্যে নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রের বিশেষ প্রাধান্য আছে—তাহা হইলে শিক্ষিত গ্রাজুয়েট সম্প্রদায়ের সঙ্গে 'অশিক্ষিত' জনসাধারণ ও 'অর্দ্ধশিক্ষিত' জমিদার-সমাজের প্রভেদ বুঝিতে পারিতাম। যদি বাঙ্গালার হাকিম, উকীল, কেরাণী ও মাষ্টার-কুলের মধ্যে স্বধর্ম্মে অনুরাগ, স্বজাতিবাৎসল্য, স্বদেশ-প্রেম অত্যধিক মাত্রায় দেখিতাম, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষার মর্য্যাদা বুঝিতে পারিতাম—তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণকে এক স্বতন্ত্র জাতি-বা গোষ্ঠী-ভুক্ত করিতে প্রবৃত্তি জন্মিত, তাহা হইলে অন্যান্য লোকের তুলনায় বড় লোকেরা যে বাস্তবিকই অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত তাহা বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কি দেখিতেছি? চরিত্রের হিসাবে, মনুষ্যত্বের মাপে, পাপপুণ্যের বিচারে, ধর্ম্মরাজ্যের পরীক্ষায় সমগ্র বাঙ্গালী সমাজই প্রায় একাকার। কেবল "এ পীঠ আর ও পীঠ" মাত্র। ধনী নির্ধন, বিদ্বান্ মূর্খ, 'শিক্ষিত' 'অশিক্ষিত'—সকলেই যে বাঙ্গালী সে বাঙ্গালী, 'যে তিমিরে সে তিমিরে'। এই অবস্থায় উনিশ বিশ করা বড় কঠিন—এক প্রকার অসম্ভব। 'শিক্ষিত' সমাজ বড় বেশী পুণ্যবান্ নহেন এবং জমিদার-সমাজ বড় বেশী পাপাত্মা নহেন। নিজ নিজ বুকে হাত দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে—তুলনায় বড় লোকেরা সত্যসত্যই বিশেষ পশ্চাতে পড়িয়া নাই।

বরং অনেক বিষয়ে বাঙ্গালার জমিদারেরা যথেষ্ট সৎশিক্ষার, সচ্চরিত্রতার, নিঃস্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালী সমাজ, বাঙ্গালার গ্র্যাজুয়েটগণ, বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়, বঙ্গের নেতৃগণ বহুবিষয়ে জমিদারদিগের সাধুতা ও মহত্ত্বের নিকট ঋণী।

বড় লোকগুলিকে গালি দেওয়া, তাঁহাদিগকে মূর্খ অসৎ বলা, আজ কাল একটা 'ফ্যাশন' দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি—বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে স্বদেশ-সেবার কোন অনুষ্ঠানে বাঙ্গালী জমিদার অগ্রসর হন নাই? সমাজ-হিতের কোন্ কর্ম্মে বাঙ্গালার জমিদার বাধা দিয়াছেন? লেখাপড়া-শেখা কোন্ লোকের সঙ্গে 'অশিক্ষিত' জমিদারেরা ধর্ম্মের আন্দোলনে, সমাজের সংস্কারে, বিদ্যার প্রচারে, শিল্পের প্রতিষ্ঠায়, ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তনে এবং বিবিধ সদনুষ্ঠানের বিস্তারে যোগ দিতে পশ্চাৎপদ রহিয়াছেন বা কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন? বড় লোকেরা যে কেবল সকল সময়ে 'শিক্ষিত' সমাজের ইঙ্গিত অনুসারে বা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা নহে। অনেক স্থলেই তাঁহারা নিজে চেষ্টা করিয়া, স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া হিন্দু ও মুসলমান সমাজের রীতি-নীতি, উৎসব-মেলা, কাজকর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কোন তথাকথিত জন-নায়কের অনুরোধ বা উপদেশের অপেক্ষা না করিয়াই অনেক স্থলে তাঁহারা হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিবিধ অভাব মোচন করিয়া আসিতেছেন। টোল ও মক্তব-প্রতিষ্ঠা, পণ্ডিত-বিদায়, পুষ্করিণী-খনন, ধর্ম্মগ্রন্থ-প্রচার, দেবালয়-নির্ম্মাণ, পাঁজি-পুঁথি বিতরণ, অন্নদান, ঔষধ-

দান, জলদান বঙ্গদেশের হিন্দু ও মুসলমান জমিদারগণের সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। বাস্তবিক যখন যাহা যাহা সমাজের আবশ্যক হইয়াছে, বাঙ্গালার জমিদার সমাজ অকাতরে তাহা করিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা মহানুভবতার সহিত প্রকৃত গৃহস্থ-ধর্ম্ম পালন করিয়া আসিয়াছেন। এই জন্য বঙ্গদেশে লোকশিক্ষার বিবিধ ব্যবস্থা, সংস্কৃত-চর্চ্চা, বিদ্যার আদর, স্বধর্ম্মে অনুরাগ এখনও রহিয়া গিয়াছে।

তাহার পর—আধুনিক যুগের নূতন আদর্শ অনুসারে কলেজ-প্রতিষ্ঠা, স্কুল-প্রতিষ্ঠা, পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা, টাউনহল-প্রতিষ্ঠা, ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা, তাহাতেই কি জমিদারেরা কম সাহায্য করিয়াছেন? এই যে এত বড় একটা স্বদেশী আন্দোলন বাঙ্গালার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, তাহার পুষ্টি-সাধনেই কি জমিদার-সমাজের হাত বড় কম? উকীলেরা, মাষ্টারেরা বক্তৃতা করিয়াছেন, প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, দেশবাসীকে বুঝাইয়াছেন, স্বীকার করি। জমিদারেরাও কি এইরূপ প্রচারকের কর্ম্ম করিতেছেন না? অধিকন্তু জমিদার সম্প্রদায় গলাবাজি করিয়াই নিরস্ত হন নাই। তাঁহাদিগকে তহবিল খুলিয়া জলের মত টাকা খরচ করিতেও হইয়াছে এবং হইতেছে। শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সম্মিলন, প্রদর্শনী, কংগ্রেস, সংবাদপত্র, বিদেশ-প্রেরণ—কোন্ দিকে তাকাইব?—সর্ব্বত্রই জমিদারের হাত দেখিতেছি। জমিদার কি বাস্তবিকই অশিক্ষিত? জমিদার কি সত্যসত্যই চরিত্রহীন?

এখন কেতাবী-শিক্ষার বিষয় আলোচনা করা যাউক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা বলিতেছেন—বঙ্গীয় জমিদারেরা আজকালকার সর্ব্বসাধারণের স্কুল-কলেজে সন্তানগণকে পাঠাইতে বড় বেশী ইচ্ছা করেন না। এই-জন্য জমিদার-সমাজে লেখাপড়া বা কেতাবী-শিক্ষা প্রবেশ করে নাই। কোন কোন জমিদারও এই কথাটা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আমরা ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বৎসরের ক্যালেণ্ডারগুলি খোলা হউক,—এবং বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালাদেশের সকল জেলায় যতগুলি স্কুল-পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের রেজিষ্টার-বহিগুলি বাহির করা হউক। আমরা এ বিষয়ে কোন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির অনুমান বা স্মৃতিশক্তি বা মতের উপর নির্ভর করিতে চাহি না। হিসাব করিলে দেখিতে পাইব যে—যে মতের উপর দাঁড়াইয়া কর্ম্ম করিবার ব্যবস্থা হইতেছে তাহার কোন ভিত্তি নাই। আমরা প্রমাণ করিতে পারি, বাঙ্গালার জমিদারেরা নিজ নিজ ছেলেদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন—তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়াছেন—স্কুলে পাঠাইয়াছেন, কলেজে পড়াইয়াছেন। দেশের মধ্যে বই মুখস্থ করাইবার যতগুলি সুযোগ রহিয়াছে, সকল সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করিতে তাঁহারা যত্নবান্ হইয়াছেন। এমন কোন জমিদারের ঘর নাই যেখানে শিক্ষালাভ বিষয়ে অভিভাবকেরা সম্পূর্ণ উদাসীন ও পরাঙ্মুখ। মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং নির্ধন সমাজ লেখা পড়া শিখিবার ও মানুষ হইবার যে যে চেষ্টা করিয়াছেন—বড়

লোকের সমাজও ঠিক সেই সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, জমিদারগণের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষায় প্রকৃত ঔদাসীন্য আমরা খুঁজিয়া পাই না।

তবে—জমিদারেরা মূর্খ, অশিক্ষিত, স্কুলে যায় না, কলেজে পড়ে না—এ কথাটা রটিল কেন? তাহার কারণ বুঝাইয়া দিতেছি। বঙ্গীয় জমিদারগণের তালিকা বাহির করুন। এই সেদিন ব্যবস্থাপক সভার সভ্য-নির্ব্বাচনের সময়ে গবর্ণমেণ্টের গেজেটে বাঙ্গালার সকল জমিদারের নাম, ধাম, আয়, সদর খাজনা ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। সেই তালিকাগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায়, পয়সাওয়ালা বড় লোক আমাদের দেশে বড় বেশী নাই। বহু ব্যক্তিকে জমিদার বলিয়া ঐ সকল তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহাদের অধিকাংশ লোকই প্রকৃত প্রস্তাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক—বিশেষ স্বচ্ছল অবস্থার লোক নহেন। তাঁহাদিগকে বড় লোক ভাবে স্বীকার করিয়া লইতে অনেক প্রকৃত বড় লোকেরা বাস্তবিকই কুণ্ঠিত হ'ন, এবং জনসাধারণও তাঁহাদিগকে বড় লোক বলিয়া বিশেষ সম্মান করে না।

যাহা হউক, আমরা যখন একেবারেই দরিদ্র নির্ধন, আমাদের হিসাবে তাঁহারা সকলেই রাজা, মহারাজা, বাবু, জমিদার, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহারা সকলেই 'বড় লোক'। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা কত? গেজেট পাঠ করিলে জানা যায়—গবর্ণমেণ্টের খাতায় দুই শ্রেণীর বড় লোক আছেন। এক শ্রেণী কিছু বেশী বড় লোক—তাঁহারা বেশী খাজনা দিয়া থাকেন—তাঁহাদের বড় লাট সাহেবের ভারতীয় সভায় সভ্য নির্ব্বাচন করিবার অধিকার আছে। আর এক শ্রেণী কিছু কম বড় লোক—তাঁহারা কম খাজনা দিয়া থাকেন। তাঁহাদের বঙ্গীয় লাটসভায় সভ্য-নির্ব্বাচনের অধিকার আছে মাত্র। বঙ্গপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এই দুই শ্রেণীর বড় লোকের দ্বারাই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। এই দুই শ্রেণীর বড় লোকের মোট সংখ্যা প্রায় ছয় শত এবং প্রথম শ্রেণীর বড় লোকের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন শত মাত্র, সুতরাং সমগ্র বঙ্গসমাজের মধ্যে জমিদারেরা একেবারেই মুষ্টিমেয়। অতএব স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বড় লোকেরা মুষ্টিমেয় থাকিবেন তাহা কি অন্যায়? এদিকে পরীক্ষায় পাশ করার নিয়ম বড় লোক, গরীব লোক সকলের পক্ষেই একরূপ। অতএব গড়ে জনসাধারণেরা যেরূপ পাশ হয় বড় লোক সমাজেও সেইরূপ পাশ হইবে। সুতরাং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে বড় লোকের সংখ্যা অতি অল্প থাকিবে, তাহা ত স্বাভাবিক। যদি সাধারণ হিসাবে বড় লোক গরীবলোকের সংখ্যার অনুপাতকরি, তাহা হইলে বাঙ্গালার গ্যাজুয়েট সমাজে যদি এক জন মাত্র জমিদারের আসন থাকে তাহা হইলেও দোষের হইবে না। যদি বঙ্গদেশের লেখক, বক্তা, শিল্পী, কবি, গায়ক ইত্যাদি গুণী ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন করিয়া লোক বড়-লোকের গোষ্ঠীভুক্ত থাকেন, তাহা হইলেও অনুপাত রক্ষিত হয়। সমগ্র সমাজের কথা যখন ভাবি—তখন কেতাবী-শিক্ষিত ডিগ্রীধারী বড়লোকদিগের সংখ্যা কম দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারি না।

চারি পাঁচ শত ঘর বড়লোকের মধ্যে কয় জন পাশ-করা লোক থাকিতে পারেন? তাঁহারা জনসাধারণের পাশ-করা লোকের সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া যাইবেন। তাহাতে দুঃখিত বা হতাশ হইবার কারণ কি?

এই গেল কৃতকার্য্য ছাত্রদিগের কথা। তার পর কেতাবী শিক্ষার অপর দিক্ দেখা যাউক। যাহারা অল্প বয়সে পড়াশুনা ছাড়িয়া দেয়—যাহারা পাশ করিতে পারে না—যাহারা 'স্কুল পার' হয় না—যাহাদের কলেজের দুএক শ্রেণী পর্য্যন্ত দৌড়—যাহারা বি, এ ফেল—তাহাদের হিসাব করা যাউক। ভাল করিয়া গণিলে বুঝিতে পারিব—বড়-লোকের সমাজে ছাত্র, যুবক ও প্রৌঢ় অনেক 'ফেল্' 'বকাটে' অকর্ম্মণ্য, অকৃতকার্য্য, অর্দ্ধ-শিক্ষিত এবং ইংরাজীতে কম অভিজ্ঞ রহিয়াছেন বটে। কিন্তু লেখাপড়ার যে নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহা বড়লোকের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর এবং গরীবের পক্ষে বিশেষ সুখকর নয়। সুতরাং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও অকর্ম্মণ্যগণের সংখ্যা বড় কম নয়। অবশ্য বেশী ত বটেই—আমরা পরস্পর তুলনায় অনুপাতের কথা বলিতেছি। মনে করুন, ৫০,০০০ সাধারণ ছাত্রের সঙ্গে ১০০০ অর্থাৎ পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র ধনী ছাত্র লেখা পড়া শিখিতেছে। সুতরাং ধনী ছাত্রের মধ্যে যদি ৯০০ লোক অকর্ম্মণ্য অকৃতকার্য্য, অর্দ্ধশিক্ষিত থাকেন তাহা হইলে গরীব সমাজের মধ্যে সেই অনুপাতে অন্ততঃ ৪৫,০০০ অর্দ্ধশিক্ষিত, অকর্ম্মণ্য লোক থাকিবেন তাহা ত স্বাভাবিক। আমরা বলিতে চাহি—গরীবের মধ্যে এই অনুপাতের অপেক্ষা অনেক বেশী লোক ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। অকৃতকার্য্য ছাত্রগণের তালিকায় বড় লোক অপেক্ষা গরীব লোকের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণেই বেশী। চোখ খুলিয়া সমগ্র দেশটাকে বুঝিতে চেষ্টা করিলে এই জ্ঞানই জন্মিবে।

বড় লোকের সন্তানগণকে মানুষ করিবার প্রয়োজন আছে স্বীকার করি। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও জন সাধারণের অভাবগুলি পূরণ করিবার প্রয়োজন তদপেক্ষা বেশী। কেতাবী শিক্ষার দিক হইতে বড় লোকের ছেলেরা প্রকৃত প্রস্তাবে পশ্চাৎপদ নাই—বরং স্কুল-কলেজে পড়াশুনা সম্বন্ধে জনসাধারণেরই বেশী অভাব।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। গরীবের ছেলেরা একবার 'ফেল্' হইলে, দুই বার ফেল্ হইলে—অনেক সময়ে দশ বার ফেল্ হইলেও হা'ল ছাড়ে না। তাহারা স্কুল-কলেজের বেঞ্চগুলি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকে—বিদ্যালয়ের ঘর-গুলিকে ভোগ-সত্ত্বের দাবীতে অধিকার করিয়া নূতন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে থাকে, এবং মাষ্টার মহাশয়-গণের সঙ্গে পরামর্শদাতার সম্বন্ধ পাতাইয়া দিন কাটায়। কিন্তু বড় লোকের ছেলেদের এইরূপ অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, পরিশ্রম-স্বীকার দেখা যায় না। তাহারা দু একবার ধাক্কা খাইয়াই ঘরে আসিয়া বসে। ইহার কারণ কি আর বুঝাইতে হইবে? মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্রেরা ও অভিভাবকেরা জানে—তাহা-দিগকে নিজে খাটিয়া অন্ন সংস্থান করিতে হইবে। সুতরাং স্বাস্থ্য নষ্ট হয় হউক, শরীর ভাঙ্গে ভাঙ্গুক, চিত্ত অবসন্ন ও স্ফূর্ত্তিহীন হয়

হউক—ছেলেগুলিকে পাশ করিতেই হইবে, সার্টিফিকেট আনিতেই হইবে। অতএব ভাল মানুষের মত তাহাদিগকে স্কুল-কলেজে যাওয়া আসা করিতে হয়। বড় লোকেরা ত বড় লোক—তাঁহাদের অন্নচিন্তাই যদি থাকিল তবে আর বড় লোক কিসের? সুতরাং 'ফেল্'-হওয়া ধনী ছাত্রগণের অত্যধিক ইস্কুল-প্রীতি দেখাইবার প্রয়োজন কৈ?

অতএব বড় লোকেরা স্কুল-কলেজ ভাল বাসে না—আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা স্কুল-কলেজ খুব ভাল বাসে—এ কথাটা সকল দিক হইতেই একেবারে অসত্য। ধনি-সমাজ শিক্ষালাভে অমনোযোগী—বিদ্যার্জ্জনের সুবিধাগুলি ব্যবহার করিলেন না, এই কথা সর্ব্বাংশে মিথ্যা আর জনসাধারণ কেতাবী শিক্ষার প্রতি বড় বেশী অনুরাগী—বইগুলি মুখস্থ করিবার জন্য বড় বেশী লালায়িত—এই মতও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেতাবী শিক্ষা সম্বন্ধে, বড় লোক আর গরীব লোকের মধ্যে প্রবৃত্তিগত ও প্রকৃতিগত প্রভেদ কিছুমাত্র নাই। দুই সমাজই যথাসম্ভব বই মুখস্থ করিয়াছে—দুই সমাজেই পাশ হইয়াছে—দুই সমাজেই ফেলও হইয়াছে। সুখ বা দুঃখ দু'এরই এক। দুই সমাজেরই এক অভাব—এক অবস্থা। সমগ্র দেশে একই ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে। তাহার প্রতীকার একই উপায়ে হইবে। আমরা পরে তাহার আলোচনা করিব। এবার আমরা চরিত্রের তুলনা করিলাম—কৃতকার্য্য ছাত্রগণের হিসাব করিলাম—ফেল্ হওয়া লোকের সংখ্যা গণিলাম। কোন বিষয়েই বড় লোকের অবস্থা স্বতন্ত্র—এরূপ বুঝিলাম না। সুতরাং তাঁহাদের শিক্ষালাভের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার পক্ষপাতী আমরা নহি।

সমালোচনা-বিজ্ঞান

[সুবিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক ডাউডেনের "Interpretation of Literature' প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত]

কেহ যদি একশত খানা ভাল বই পড়িতে চায়, তাহা হইলে কোন্ পুস্তকগুলির নাম করা উচিত, ইহা লইয়া আমরা অনেক সময় গণ্ডগোল করিয়া থাকি। কিন্তু ইহার মীমাংসা অপেক্ষা কি প্রণালীতে একখানি মাত্র পুস্তক ভালরূপে পড়া যায় এই কথাটার মীমাংসা হওয়া সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য।

যে কৌশল, বুদ্ধি বা ক্ষমতার দ্বারা এক খানি পুস্তক ভালরূপে আয়ত্ত করা যায়, তাহাই যদি আমাদের জানা না থাকিল, তবে ভাল বা মন্দ বই পড়ি, তাহাতে আমাদের কি যাইবে আসিবে?

বাস্তবিক পক্ষে যত দিন পর্য্যন্ত একখানি গ্রন্থ আমাদের কাছে তাহার জীবন্ত শক্তি প্রকাশ না করে, যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের অন্তরের সহিত তাহার দ্বন্দ্ব-বিরোধ না ঘটে, যত দিন পর্য্যন্ত তাহার সহিত আমাদের প্রকৃত মিলন না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত আমরা ত তাহাকে "অলসের আমোদ" বলিয়াই মনে করিব!

সুতরাং ভাল পুস্তক আয়ত্ত করিতে হইলে উপযুক্ত বোদ্ধা বা সমালোচকের পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। সেই পন্থা অবলম্বিত হইলেই আমরা প্রত্যেক বড় লেখকের গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইব—যদিও সে চেষ্টায় কষ্ট বড় কম নহে! কারণ বড় লেখকেরা কিছুই গোপন করিতে চাহেন না বলিয়াই তাঁহাদের মর্ম্মকথা আবিষ্কার করা শক্ত হইয়া উঠে। আবার কোন কোন লেখক তাঁহাদের তত্ত্বকে গোপন রাখিতেই ভাল বাসেন। আমরা যতই সে তত্ত্বকে সন্ধান করিতে যাই, ততই তাঁহারা রহস্যময় হইয়া উঠেন। এই সব লেখকই বেশী চিত্তহারী এবং চিরকাল অনুসরণযোগ্য। বল দেখি, কে কবে সেক্সপিয়রকে সম্যক অধিকার করিয়াছে? তিনি এখনও বহু দূরে—এখনও দুরধিগম্য।

সেক্সপিয়রের মত সমস্ত গ্রন্থকারকেই যিনি বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাকে আমরা নিপুণ শিকারীর সহিত তুলনা করিতে পারি। বাস্তবিক পক্ষে সাহিত্যজগতে পাঠকমাত্রই শিকারী—কেহ বা পটু, কেহ বা অপটু। সকলেই মানসিক উন্নতি বা আমোদের জন্য শিকার করিয়া ফিরিতেছেন। সকলকেই শিখিতে হয়, কেমন করিয়া মৃগের নিকটে গোপনে যাওয়া যায়, কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে পাহারা দিতে হয়, কেমন করিয়া ধীরে ধীরে অতর্কিতভাবে তাহার নিকটস্থ হওয়া যায়, কেমন করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিতে হয়! ধরিয়া ফেলিলে, সে তাহার চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে থাকে, হাত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য সর্ব্বথা যত্ন করে। তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেও তাহার কণ্ঠনির্গত আর্ত্তরব—তাহা আয়ত্ত করিবে কে? সে যে তখনও দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া সকলের নিকট হইতে দূরে অবস্থিত!

সাহিত্যের সমালোচনাও এইরূপ শিকার। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সাহিত্য নিজেই একটা সমালোচনা নহে কি?—বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবের অন্তর-প্রকৃতির দ্বার উদ্ঘাটন? অর্থাৎ মানবের অন্তরে এবং বাহিরে কি আনন্দ, কি উৎসব, কি বিবাদ, কি বিপ্লব, কি সৃষ্টি, কি ধ্বংস অবিরাম লীলা করিয়া চলিয়াছে, তাহার বিশ্লেষণ? যাহা নিজে সমালোচনা করে, তাহার আবার সমালোচনা কি? সমালোচনার সমালোচনা—সে কি কথা! এইরূপ প্রশ্ন-কর্ত্তাই হয় ত বলিবেন, যে গ্রন্থখানি অথবা যে কবিতাটি নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ না করে—তাহার সমালোচনার কোনই আবশ্যকতা নাই। কিন্তু সাহিত্য বলিতে আমরা বহিঃপ্রকৃতি ও মানবজীবনের সমালোচনা ছাড়া আরও বেশী কিছু বুঝি। মানব-জীবনের কত বিস্তীর্ণ দিক আছে, অনুভবের কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রণালী আছে, কত অভিনব আশা, কত নূতন নূতন চিন্তার রাজ্য, বিশাল বিশ্বাস এবং কত অকল্পিত আদর্শের কথা সাহিত্যে প্রকাশ করে। বিশেষতঃ প্রত্যেক বড় মৌলিক লেখকই পৃথিবীতে একেবারে একটা নূতন জিনিষ আনয়ন করেন——সেটি তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাহাতে জীবন এবং প্রকৃতিকে দেখিবার নূতন ভাব বর্ত্তমান। তিনি আমাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে নূতন জিনিষ সৃষ্টি করেন—অনুভবের একটি নূতন শিরা, চিন্তার একটি

নূতন যন্ত্র, জীবনসম্বন্ধে একটা নূতন ধারণা, অথবা উচ্ছ্বাসের একটি অভিনব ঝঙ্কার। এইরূপ লেখককে আমরা প্রকাশক অপেক্ষাও বড় নাম দেই—তাঁহাকে আমরা প্রণেতা বা সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অভিহিত করি।

যে ভাব-জগতে আমরা ঘুরি ফিরি—জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, এবং যে জগৎ এই জড়জগতের মতই সত্য, তাহা প্রধানত মানুষেরই সৃষ্টি। অসংখ্য লোকদ্বারায় এই চিন্তা, আশা, ভয়, আনন্দ ও প্রেমের জগৎটি সৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে, এবং এখনও হইতেছে। প্রত্যেক বৃহৎ ভাবুক, বৃহৎ কলাবিদ্ এই জগৎটি সৃষ্টি করিতে যত্ন পাইয়াছেন। কত মহান চরিত্র-সমূহে এই জগতটি অধ্যুষিত। কত পুরুষ—কত স্ত্রী—কত হ্যামলেট কত ইমোজেন, কত প্রতাপ—কত শৈবলিনী—সকলেই মনুষ্য মস্তিষ্কের সৃষ্টি।

তাহা হইলে সাহিত্যকে আমরা মানব-চিত্তেরই একটি সৃষ্ট অংশ বলিয়া ধরিতে পারি। এইরূপ ধরিলেই তাহার সমালোচনা-প্রণালী সহজসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তথাপি সাহিত্যকে সহজে বুঝা বড় শক্ত। তাহার বিপুল বিস্তারের সম্যক জ্ঞান আমাদের হওয়াই কঠিন। হঠাৎ কোন নূতন সত্যের আলোক আমাদের চক্ষু ঝলসাইয়া দেয়। আমরা চোখ খুলি—কিন্তু দেখি না, আমরা কাণ পাতি—কিন্তু কিছু শুনি না। তবু স্বীকার করি একটা কিছু আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। এই স্বীকার করাতেই আমরা লাভের পথে অগ্রসর হই।

এ কথা সত্য, যে গ্রন্থকার নূতন সত্য প্রচার করেন, তাঁহার কথা গোড়ায় অস্পষ্ট বা হেঁয়ালীর মত ঠেকে। আবার অধিকাংশ লোকেই নূতন সত্য সত্বর বুঝেন না—নূতন ভাবকে সত্বর গ্রহণ করেন না। তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন। তবে বড় লেখকের লেখা নিজেই শেষে তাহার অর্থ প্রকাশ করে, কিন্তু তাহাতে অনেক সময় লাগে—হয় ত এক পুরুষ সময়ও তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে।

নূতন সত্য বুঝাইবার জন্য উপযুক্ত লোক হইলে অনেক দিক দিয়া সুবিধা হয়। তবে সাহিত্যের বাজারে যে সমস্ত ব্যবসাদার সমালোচক আছেন, তাঁহারা কিন্তু বিশেষ কিছু সাহায্য করেন না। এই সব ব্যক্তি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক পত্রিকারূপ উচ্চ বেদী হইতে সাহিত্যের আইন-কানুন জারী করেন। ইঁহাদের সহিত হাকিমদের তুলনা করা যাইতে পারে। কত যে নূতন কবি, কত যে নূতন ঔপন্যাসিক ইঁহাদের দ্বারা শাস্তি পান, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কাহাকেও বা ইঁহারা সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেন, কাহাকেও বা সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে উপহাসাস্পদ করিয়া তুলেন, কাহাকেও বা সপ্তাহের জন্য হাজতে পাঠান!

অবশ্য সাহিত্যে এরূপ সমালোচকের একেবারে দরকার নাই, এ কথা আমরা স্বীকার করি না। ইঁহারা যদি বিদ্বেষ বা বন্ধুত্বের ঘুসখোর না হন, তাহা হইলে অনেক সময়েই প্রকৃত বিচার করিতে পারেন। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসামীদিগের মধ্যে যদি প্রকৃত কোন কবি—কোন শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা কীটস্ থাকিয়া যান, তাহা হইলেই মুস্কিল। হাকিম সমালোচক তাঁহার অপরিচিত ভাষা

(যে ভাষা বুঝাইবার লোক আদালতে তখন মেলে না) শুনিয়াই ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন এবং হয় ত তাঁহার বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রমাণ না পাইয়াও শাস্তির হুকুম জারী করেন! তাহাতে কবির কোন অনিষ্ট অবশ্যই হয় না—বরং সাধারণের সাগ্রহ দৃষ্টি তাঁহার কাব্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা জানি, এইরূপে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কীট্‌স্‌, শেলী, কোলরিজ, টেনিসন, কার্লাইল, ব্রাউনিং, হুইটম্যান সকলেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। কত মূর্খই না তাঁহাদের গায়ের উপর কপির ডাঁটা, পচা ডিম ছুঁড়িয়া মারিয়াছে! আবার কেহ কেহ বা প্রথম জীবন অপেক্ষা শেষ জীবনেই বেশী কষ্ট ভোগ করিয়াছেন।

এই সব লেখকদিগের অদৃষ্টে এইরূপ কেন ঘটিল, যখন আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি, যখন আমরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমালোচকের উক্তি শুনিতে পাই, তখন দেখি, অস্পষ্টতাই তাঁহাদের প্রধান দোষ। কিন্তু এই অস্পষ্টতারও কারণ আছে। কবিকে আমরা সৌন্দর্য্যের প্রচারক বলিয়া থাকি। কিন্তু তিনি শুধু সৌন্দর্য্যের নহে—আবেগ ও উচ্ছ্বাসেরও প্রচারক। কবি যখন সৌন্দর্য্য-আদর্শের জন্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন—যে আদর্শকে পৃথিবী তখনও গ্রহণ করিতে শেখে নাই—তখন তাঁহার উচ্ছ্বাসটা কৃত্রিমতা, বুদ্ধিহীনতা বা খাঁটি পাগলামীর মত বলিয়াই বোধ হয়। উনবিংশ শতাব্দীর কবি কোলরিজের 'খ্রীষ্টাবেল' কবিতাটির সৌন্দর্য্যে এখন প্রায় সকলেই মুগ্ধ। কিন্তু "এডিনবরা রিভিউ" এর সমালোচকের কাছে এটা কেবল প্রলাপের মত বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। এমন কি তিনি লেখককে পাগলামীর জন্য ঔষধ পর্য্যন্ত খাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন! আর একজন সমালোচক লিখিয়াছিলেন, "অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে এরূপ অর্থহীন আজগুবি কবিতা ছাপাখানা হইতে বাহির হয় নাই।" কলিন্স, গ্রে এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাগ্যেও এইরূপ সমালোচনা হইয়াছিল। শেলীর 'এলাষ্টর' প্রকাশিত হইলে, অনেকেই বলিয়াছিলেন, পুস্তকখানার শেষে টীকা বা টিপ্পনী দেওয়া কবির নিতান্ত কর্ত্তব্য ছিল। রবার্ট ব্রাউনিংএর "পলীন" সম্বন্ধেও একটা গল্প আছে। বইখানা প্রকাশিত হইলে, জনষ্টুয়ার্ট মিল উহার সমালোচনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া একটি পরিচিত পত্রিকার সম্পাদককে পর মাসে পত্রিকায় কিছু জায়গা রাখিতে অনুরোধ করেন। তদুত্তরে সম্পাদক জানান, পুস্তকখানির সমালোচনা হইয়া গিয়াছে। মিল যখন সেই সমালোচনা পাঠ করেন, তখন দেখেন যে সেই সমালোচনাটির একটি মাত্র গুণ যে তাহা সংক্ষিপ্ত, কারণ একটিমাত্র লাইনে তাহা শেষ হইয়াছিল। সেটি—"পলীন পরিপূর্ণ 'হ য ব র ল তা'র একখানি ক্ষুদ্র সমষ্টি!"

যাহা হৌক, বড় লেখকের স্কন্ধে অস্পষ্টতার দোষ আরোপ করিতে শুনিলেই আমাদের গেটের একটি কথা স্মরণ হয়—"অস্পষ্টতার দোষে কোন গ্রন্থকারকে গালি দেওয়ার পূর্ব্বে নিজকে ভাল রকম করিয়া পরীক্ষা করা উচিত—নিশ্চিতভাবে জানা উচিত যে নিজের ভিতরটা খুব পরিষ্কার আছে কি না। সন্ধ্যার অন্ধকারে খুব পরিষ্কার হস্তও অস্পষ্ট দেখাইতে পারে!"

অন্য কথায়, একটি গ্রন্থকারকে পাঠ করিতে যাইয়া, তুমি নিজে আলোক না অন্ধকার কি লইয়া যাও? একাগ্রতা, সরল বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, গ্রহণ করিবার ধৈর্য্যময়ী ক্ষমতা, অভিনব হইলেও যাহা কিছু সুন্দর তাহার সহিত সহানুভূতি দেখাইবার ক্ষিপ্রতা কি তোমার সঙ্গে থাকে? যদি থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তোমার সঙ্গে আলোক আছে, নতুবা কেবল অন্ধকার!

কবির উপরে আর একটি দোষ চাপান হয়—সেটি নীতিহীনতা। অস্পষ্টতার সহিত এই দোষের সংযোগ নিতান্তই সাংঘাতিক। কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, কবির প্রধান কর্ত্তব্য তাঁহার পাঠকের চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ, প্রশস্ত এবং মুক্ত করা। নীতির নিয়ম পালনেচ্ছা থাকিলেও তাঁহাকে অনেক সময় বিধিবদ্ধ জাগতিক নীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হয়, কারণ সত্য সেখানে প্রস্তরীভূত প্রবাদবাক্য ছাড়া আর কিছুই নহে, এবং সেই জন্য তাহা সমস্ত রকম অবাধ বিকাশ এবং উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়া পড়িয়াছে।

সূক্ষ্ম সহানুভূতি এবং কল্পনাবলে মানুষের হৃদয়, মস্তিষ্ক এবং বাহুর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করত নৈতিক নেতা হওয়াও কবির অন্যতম কর্ত্তব্য। কিন্তু মানুষের মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করিতে যাইয়াই তাঁহাকে এমন নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয়—যাহা প্রথাবদ্ধ শুষ্ক নিয়ম ছাড়া আর কিছুই নহে। প্রত্যেক যুগেই যখন মানুষের নীতির আগ্রহ নবজাগ্রত হয়, এবং মানুষের বৃহত্তর জীবনের পক্ষে প্রবল আন্দোলন চলিতে থাকে, তখন সংস্কারকদিগকে পুরাতন পদ্ধতি পরিবর্ত্তনের জন্য, সমাজের স্থিরবদ্ধ আচারনিয়মকে বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য অনেক তিরস্কার ভোগ করিতে হয়। অথবা অনেক সময় এরূপও হইতে পারে যে, ভাব বা উৎসাহের আতিশয্যে তাঁহাদিগকে একবার এদিক, আরবার ওদিক ধাবিত হইতে হইয়াছে। কিম্বা সীমাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে। উচ্চ সত্য প্রকাশ করিতে যাইয়া অনেক সময় তাঁহাদিগের ভুল-ভ্রান্তিও যে না ঘটিতে পারে, এমনও নহে। সে সময় আমাদের কর্ত্তব্য সেই ভুলকে স্বীকার করা, তাহাকে দোষ দেওয়া এবং ভ্রান্তদিগকে ক্ষমা করিয়া তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করা। অতএব একজন মৌলিক লেখকের বিরুদ্ধে অস্পষ্টতা বা নীতিহীনতার আরোপে আমরা এই বুঝিব যে, তিনি পৃথিবীতে এমন চিন্তা বা আবেগ দান করিয়াছেন, যাহা পৃথিবীর পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন, এবং যাহা পৃথিবী তখন গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

মিল সাহেব তাঁহার 'আলফ্রেড ডি ভিগ্নি' সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধে বলিয়াছেন, কবি বা চিত্রকর দুইটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত। একদল রক্ষণশীল, আর একদল গতিশীল। রক্ষণশীল-দল স্থিরবদ্ধ বিশ্বাস এবং অতীতকে ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের আবিষ্কার ফল প্রকাশ করেন। তাঁহাদের উচ্চ ক্ষমতা থাকিলে, হৃদয় সহানুভূতি পূর্ণ হইলে সামান্য চেষ্টাতেই তাঁহারা উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারেন। অতি সত্বরই তাঁহাদের প্রসিদ্ধি লাভ ঘটে। সার ওয়াল্টার স্কট এই ধরণের কবি। কিন্তু গতিশীলদল অনেক বিষয়েই কম সৌভাগ্যবান। আশা বিশ্বাস এবং উদারতার উজ্জ্বল

মূর্ত্তির দিকে তাঁহারা উড্ডীন, কিন্তু সে মূর্ত্তির চরণতল পৃথিবীর উপরে স্থাপিত হয় নাই। প্রবল সাহসে ভর করিয়া তাঁহারা শূন্যে—বহু উর্দ্ধে উঠিতে পারেন, কিন্তু প্রবল ঝড়ের আঘাতে তাঁহাদের বিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনাও কম নহে। এই ধরণের লেখককেই লোকে অস্পষ্টতা বা নীতিহীনতা দোষে দুষ্ট করিয়া থাকে। দৃঢ়-সংগঠিত সমাজে সাবধানে চলিবার যে সমস্ত নিয়ম আছে, তাহা তাঁহার জানা থাকে না। হয় ত সেই জন্যই অনেক সময় তাঁহাকে সমাজ হইতে বিতাড়িত হইতে হয়। হয় ত আত্মশক্তির অকৃতকার্য্যতায় দুঃখিত ও হতাশ চিত্তে অনেক সময় তাঁহাকে সমাজের আদর্শ-স্থল হইতে বহু দূরে সরিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু সেই আদর্শস্থলে অন্যান্য সামাজিক লোকেরা বেশ বিচরণ করিয়া থাকেন, কেন না তাঁহাদের ত পাখা নাই!—উড়িবেন কিরূপে?

যে লেখক তাঁহার যুগের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস এবং অনুভাবকে সাহিত্যে প্রচার করেন, অথবা কোন উন্নতিশীল অচিরসংগঠিত প্রতিষ্ঠানের নেতা হন, তাঁহার খ্যাতি আকস্মিক এবং প্রচুর। কিন্তু যিনি একাকী নেতারূপে অগ্রসর, তাঁহার খ্যাতি প্রারম্ভে কিছুতেই হইতে পারে না।

যাহা হৌক, ভাগ্যক্রমে আমরা যদি এই শেষোক্ত ধরণের লেখকের প্রতি আকৃষ্ট হই, তাহা হইলে আমাদের এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, সমস্ত রকম বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও আমরা তাঁহাকে বুঝিবই বুঝিব। দেখিবই দেখিব, তাঁহার উদ্দেশ্য কি—তাঁহার বাণী কি। এইরূপ করিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, লেখক ও তাঁহার সমগ্র রচনা আমাদের সমগ্র জীবনের উপরে কি কায় করে। আমাদের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য এই হইবে যে, আমরা মানুষের সহিত জীবন্ত সম্বন্ধ পাতাইব —এবং সেই উপায়ে মনুষ্যত্ব ও প্রকৃতির মধ্যে ক্রীড়াশীল মঙ্গলশক্তিগুলিকে, আয়ত্ত করিব। এইরূপ উদ্দেশ্যের কাছে বৃথা নাম বা অহঙ্কারের জন্য যে গ্রন্থপাঠ, তাহা নিতান্তই অর্থহীন; বিদ্যাবত্তা বা বিশেষ জ্ঞানের জন্য যে গ্রন্থপাঠ, তাহা নিতান্তই একদেশী বা অসম্পূর্ণ। আমরা পড়িব—কিন্তু এ সকলের জন্য নহে—জীবনের জন্য। আমরা পড়িব—যাহাতে আমরা বাঁচিতে পারি। কিন্তু আমাদের সকল সময় মনে রাখিতে হইবে, ভাল ভাবে জীবন যাপন করিতে হইলে কেবলমাত্র উপদেশ প্রভৃতিই আমাদের আবশ্যক নহে, (যদিও সেগুলি আমরা কাজে লাগাইতে পারি) আমাদের সকলের উপরে আবশ্যক সুনিয়ন্ত্রিত শক্তির অধিকার। সুতরাং শুষ্ক নীতি বা বক্তৃতার মোহ হইতে আমরা দূরে থাকিব।

সাহিত্য ও কলার বহু বৃহৎ গ্রন্থ আছে। কিন্তু সেগুলি আমাদিগকে শুষ্ক উপদেশ দেয় না। সন্তরক যেমন সমুদ্রের কাছে গমন করে, আমরাও তেমনি তাহাদের কাছে যাই। আমরা তাহাদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ি, তাহাদের তরঙ্গ বুকে গ্রহণ করি, হাসি, খুসি হই এবং প্রেমময় সমুদ্রের মুক্ত সীমাশূন্য শক্তির অংশ লইয়া সুস্থদেহে আসি। যদিও সমুদ্র তাহার রহস্যময় প্রবাল-সঙ্গীত গান করিয়াছে, তাহার তরঙ্গ আমাদের চারিধারে করতালী দিয়া ফিরিয়া

গিয়াছে এবং মুহূর্ত্তের জন্যও কোন নীতিবাক্য উচ্চারণ করে নাই, তথাপি আমরা সুস্থ ও সবল হইয়াছি। ইহাই ত আমাদের পরম লাভ!

এইরূপ সমুদ্রের মত লেখকই সেক্সপিয়র বা গেটে। তাঁহাদের মধ্যে যদি কোন কলঙ্ক থাকে, তবে তাহা তাঁহাদের বিশালতায় ঢাকিয়া যায়। সমুদ্রে আগাছা আছে। কিন্তু তাহার সংবাদ না রাখিলেও চলে!

অনেকে উপদেশ দেন, বড় লেখকের গ্রন্থ ভক্তিভাবে পাঠ করা উচিত। এই উপদেশের অর্থ যদি এই হয় যে, অসহিষ্ণু বা অবাধ্যতার ভাবে ভাল গ্রন্থ পাঠ করা অবিধেয়, তাহা হইলে উপদেশটি মন্দ নহে। কিন্তু এই উপদেশে যদি আমাদিগকে বীরপূজার ভাবে জাগ্রত হইতে বলা হয়, তাহা হইলে ইহা নিতান্তই হীন। এ কথা কি ঠিক নহে—মনিব তাঁহার পূজক বা ভৃত্য অপেক্ষা ভাইকে দেখিতেই বেশী ভালবাসেন? তাহার কাছেই অন্তঃকরণ খুলিয়া আলাপ করেন? কার্লাইল বীরপূজক ছিলেন বলিয়াই যে বার্ণস এবং জনসনকে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি তাঁহাদিগকে ভ্রাতৃভাবে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার ঐ প্রশংসা। যে লেখক আমাদিগকে তাঁহার অন্ধকার মন্দিরে লইয়া প্রণত হইতে বলেন, তিনি বৃহত্তর এবং উৎকৃষ্টতর বিষয় হইতে আমাদিগকে অবরুদ্ধ করেন। কিন্তু বড় লেখক এরূপ নহেন। তিনি আমাদিগকে আলোক এবং বাতাসের মধ্যে আনয়ন করেন—আমাদিগকে এমন শক্তি ও সাহস দান করেন, যাহাতে আমরা তাঁহাদিগকে উপভোগ করিতে পারি, এমন জ্ঞান দেন, যাহাতে আমরা বিপুল ধরণীর উপরে—মুক্ত আকাশের তলে সুখে বিচরণ করিতে পারি।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে সাহিত্য কেবলমাত্র কতগুলি ঘটনাপুঞ্জের বিবৃতি নহে—সাহিত্য কোনরূপ কার্য্যকলাপ প্রদর্শন করে না, বরং কেমন করিয়া একটি মনের শক্তি ও কার্য্য আর একটি উন্মুক্ত মনের উপর ক্রীড়া করে, তাহাই দেখাইয়া থাকে। সুতরাং বড় লেখককে বুঝিতে চাহিলে পাঠককে সাহস ও ভ্রাতৃভাবের সঙ্গে সমস্ত শক্তি ও চাতুর্য্য সংগ্রহ করিতে হইবে—যতদূর সম্ভব তাঁহাকে নানা দিকে সাবধান থাকিতে হইবে। এইরূপ হইলেই তিনি কেন্দ্রস্থলে পৌছিতে পারিবেন এবং দেখিতে পাইবেন—বড় লেখকের কোন লেখাই অসম্বদ্ধ নহে, সকলের মধ্যেই বিশেষ যোগ আছে, এবং সকলই একটি কেন্দ্রজীবনের সঙ্গে গ্রন্থিত।

তারপর পাঠক-সমালোচককে আরও একটু অগ্রসর হইতে হইবে। সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া তিনি বড় লেখকের ভাবের ধারা নীরবে হৃদয়ে গ্রহণ করিবেন। নিপুণ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ এবং ঠিকমত ভাব গ্রহণ করিতে হইলে তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য এবং স্বার্থশূন্যতার প্রয়োজন হইবে। জর্জ ইলিয়ট বলিয়াছেন, "গ্রহণশক্তি ধৈর্য্যের মতই বিপুল এবং বিরল।"

আবার যাঁহারা কেবল মাত্র সামান্য কয়েকটি ভাব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, তাঁহারা সেই ভাবগুলি সম্বন্ধেই খুব জোর দিয়া কথা বলেন, এবং তাঁহাদের জন্যই সাহিত্য এবং কলায় সম্প্রদায় সৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁহারা যে বড়

বেশী দিন স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারেন না, ইহা সুনিশ্চিত। অদূর ভবিষ্যতেই তাঁহাদের অবলম্বিত সত্য ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে থাকে। কোন একটা ভাব বুঝিলেই চলে না, তাহাতে অনুপ্রাণিত হওয়া চাই—তাহার জন্য নিজের সৌন্দর্য্য-উপভোগক্ষম স্বাভাবিক শক্তির সম্যক স্ফুরণ চাই।

যাঁহারা সাহিত্য বা কলা সম্বন্ধে কোন কিছু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া থাকেন, তাঁহারা জীব ও প্রকৃতির প্রধান নিয়মগুলি অবজ্ঞা করেন না—তাঁহারা কোন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহেন না। তাঁহারা দেখিতে পান, জীব ও প্রকৃতির নিয়মগুলি বিশ্বসাহিত্যিকেরই প্রধান প্রধান গ্রন্থের মধ্যে সুস্পষ্ট ও ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। বাল্মীকি, হোমর, কালিদাস, সেক্সপিয়র, দান্তে, গেটে, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির লেখা পড়িতে গিয়া বাস্তবিকই আমরা প্রকৃত জীবনের পরিচয় পাই। তাঁহাদের লেখায় আমরা জীবনের রাজপথে বিচরণ করি—আমরা কোন উপসাগরের উপরে ভাসি না, বরং তরঙ্গভঙ্গমধুর মহাসমুদ্র আমাদিগকে আনন্দের হিন্দোলে দোল দিতে থাকে।

সুতরাং সাহিত্য পাঠ করিতে গিয়া আমরা যদি নিজের ভিতরকার 'বরোং—সাম্প্রদায়িকতার স্বার্থ-আবর্জ্জন বিসর্জ্জন দেই, তাহা হইলে বিশ্বসাহিত্যিকের সঙ্গে আমাদের সার্থক যোগ সম্পন্ন হয় এবং সেই যোগেই আমরা জীবনের প্রকৃত নিয়ম এবং উদ্দেশ্য কি, ধরিতে পারি।

লোকে বলে কবিত্বশক্তি জন্মগত—কিন্তু অনুশীলনে তাহা বিকাশ প্রাপ্ত হয়। পাঠকের সমালোচনা-শক্তিও তদনুরূপ। বিশেষত প্রকৃত প্রেমিক না হইলে সমালোচকও হওয়া যায় না। পোপ যথার্থই বলিয়াছেন, "কবি এবং সমালোচক উভয়েই স্বর্গ হইতে অবতরণ করেন—একজন দিবার জন্য, আর একজন গ্রহণ করিবার জন্য!"

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী

দোলপূর্ণিমায় সমাজসেবা

বড় দিনের ছুটির পর আর একটা বড় ছুটি সেদিন চৈত্র মাসে পড়িয়াছিল। এক দিকে হিন্দুর দোলপূর্ণিমা আর একদিকে ইষ্টার। দুই উৎসবের যোগ এক সঙ্গে ঘটিয়াছিল। সুতরাং ভারতবর্ষের উকীল, হাকীম ইত্যাদি চাকরীজীবী মহলে নিশ্বাস ছাড়িবার অবসর আসিয়াছিল। এই সুযোগে ভারতের স্বদেশ-সেবকগণ তাঁহাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানগুলি সারিয়া লইলেন। ছুটির দিনে লোকে বেড়াইতে যায়—বাহিরে হাওয়া খাইতে যায়—ছেলেরা বন ভোজনের ব্যবস্থা করে। সকলেই যথাসম্ভব কাজে ঢিল দেয়। আমাদের এরূপ দুরবস্থা যে আমরা সেই খেলিবার দিনগুলিকেই মাতৃপূজার একমাত্র অবসর ভাবে গ্রহণ করি। আমাদের পঞ্জিকায় দেশসেবার আর কোন দিন নাই।

আমাদের ধর্ম্মে বার মাসে তের পার্ব্বণ নাই। বৎসরে এক উৎসব, তাহাতেও কোন মতে 'নমো নমো' করিয়া কয়েকটা দুই তিন মিনিট ব্যাপী প্রস্তাব পাঠ। ইহাই আমাদের দেশ-চর্য্যার একমাত্র অনুষ্ঠান। আর সারা বৎসর স্বদেশ, স্বধর্ম্ম, স্বসমাজ আমাদের চিন্তারাজ্যের বহির্ভূত থাকে।

জননী জন্মভূমির প্রতি এরূপ কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া শিক্ষিত ভারতবাসী, আর কতদিন কাটাইবে ? এত অর্থসঞ্চয় করিলে, এত বিদ্যা অর্জ্জন করিলে, এত বক্তৃতা করিলে, এত নামদার লোক হইলে—এখনও কি ভোগ-বাসনা তৃপ্ত হইল না ? ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা জন্মিল না ? শাস্ত্রে আছে 'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ'। পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে বনগমন করিবে—সংসারত্যাগ করিবে। কিন্তু কৈ ? সুখ-শান্তি, মান-মর্য্যাদা সবই ত পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল ভোগ করিলে। এখনও কি বিষয়ে অনাসক্তির কাল, বৈরাগ্য ও মুনিবৃত্তি অবলম্বনের সময় আসে নাই ? কেহ কেহ অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যচিন্ত হইয়া সমাজের সেবায় লাগিয়া যাউন না। বৎসরব্যাপী লোক-সেবা, বৎসরব্যাপী সাহিত্য-চর্চ্চা, বৎসরব্যাপী ধর্ম্মপ্রচার, বৎসরব্যাপী শিল্পকর্ম্ম—ইত্যাদি অনুষ্ঠানে কয়েকজন ভারতবাসী সমগ্র জীবন, সমগ্র উৎসাহ, সমগ্র শক্তি নিয়োগ করুন না।

যাহা হউক—একেবারে হতাশ হইবার কারণ নাই। 'শনৈঃ শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্'। এ দুঃখের দিনেও একটা সুখের কথা বলিতেছি। আজকালকার ছুটি গুলিতে একটা দুইটা বা দশটা মাত্র সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না। ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়সম্বন্ধে, সাহিত্যসেবীরা সাহিত্যের উন্নতিসম্বন্ধে, রাষ্ট্র-নীতির প্রচারকেরা রাষ্ট্রীয় আলোচনায়—এইরূপে নানা শ্রেণীর লোক নানা বিষয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, সাহিত্য, জাতি, রাষ্ট্র, শিল্প, ব্যবসায়—ইত্যাদি সকল বিষয়েই বহুস্থানে বহুবিধ আন্দোলন এক সঙ্গে চলিতে থাকে। প্রদর্শনী, মেলা, সম্মিলনী, কংগ্রেস, কনফারেন্স, সভা, বক্তৃতা, ইত্যাদি লোক-শিক্ষাবিস্তারোপযোগী অসংখ্য উপায় অবলম্বন করিয়া ভারতের হিন্দু, মুসলমান, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্ধন নিজ নিজ অভাব আলোচনা করেন এবং অভাব পূরণের ব্যবস্থা করেন। জাতীয় জীবন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কর্ম্মময় ও ঘটনাবহুল হইয়াছে।

এবারকার ছুটিতে ভারতবর্ষে অনেকগুলি অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। আমরা কয়েকটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতেছি। প্রথমে একটা কথা বলিয়া রাখিতে চাহি। আমরা হিন্দু—হিন্দুর সংস্কারগুলি আমাদের মজ্জাগত। তাই একটা সংস্কার এই সুযোগে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। সেটা এই। প্রায় সাড়ে চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে এই দোলপূর্ণিমার মত আর একটি শুভযোগ বঙ্গদেশে আসিয়াছিল। সেই যোগে যুগাবতার শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া সমগ্র বঙ্গসমাজকে প্রেমের ভাবুকতায় আপ্লুত করিয়াছিলেন। জ্যোতিষীরা বলিতেছেন সমগ্র হিন্দু নরনারী আবাল বৃদ্ধ বনিতা বিশ্বাস করেন—একবারকার এই শুভ পূর্ণিমায় সেই মহেন্দ্র ক্ষণের পুনরাবর্ত্তনে ভারতসমাজে বিংশ

শতাব্দীর শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা আমাদের সংস্কার আমাদের জাতীয় ধারণা।

সমগ্র হিন্দুসমাজ এখন এক নবভাবে প্রফুল্ল। আন্তরিকতার সহিত বিংশ শতাব্দীর প্রেমাবতার বিজ্ঞানাবতার গৌরাঙ্গের সঙ্গ লইবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইতেছে। তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে। হিন্দুসমাজের ধুরন্ধরগণ, সমাজ হইতে শীঘ্র শীঘ্র হৃদয়ের আবিলতা এবং চিত্তের সঙ্কীর্ণতা অপসারিত করিবার ব্যবস্থা করুন। সেই জন্য দেশের সর্ব্বত্র সাধু অভিলাষ মাত্রের সম্মান বাড়াইবার আয়োজন করুন—যে অনুষ্ঠানে মহৎ উদ্দেশ্যের কণিকা মাত্র থাকিবে সেই খানেই মস্তক অবনত করিতে সকলকে অভ্যস্ত করুন, সৎপ্রয়াসের নগণ্য আরম্ভকেও শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দিন। অন্তঃশুদ্ধিই ধর্ম্মজীবনের প্রথম সাধন।

আমরা প্রথমে লক্ষ্ণৌ নগরে অনুষ্ঠিত সমগ্র **ভারতীয় মোস্লেম লীগের** কার্য্যের উল্লেখ করিব। এই মোস্লেম লীগ এতদিন ভারতীয় জাতীয়মহাসমিতি কংগ্রেসের আদর্শকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। এবারকার বৈঠকে তাঁহাদের মতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহারা কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্যকেই ভারতীয় মুসলমানগণেরও আদর্শ এবং লক্ষ্য ভাবে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক সুদক্ষ ভাবে পরিচালিত 'হাব্লুল মাতিন,' নামক বাঙ্গালা দৈনিক পত্রিকায় 'হিন্দু ও মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। নিম্নে তাহা প্রকাশ করা গেল:—

লক্ষ্ণৌ নগরে "অল ইণ্ডিয়া মোসলেম লীগের" ২৩শে মার্চ্চ তারিখের অধিবেশনে যে কয়েকটী প্রস্তাব পরিগৃহীত হয় তন্মধ্যে একটীর মর্ম্ম এইরূপ:— সমগ্র ভারতীয় মুসলমান সমিতি তাঁহাদের এই দৃঢ় বিশ্বাসটী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন যে, ভারতীয় জনসাধারণের ভাবী উন্নতি পরিণতি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পর মিলিত ভাবে ও সম্মিলিত স্বরে কার্য্য করার উপর নির্ভর করিতেছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে অপ্রীতিকর ভেদভাবের অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহার পরিসর বৃদ্ধির জন্য দুষ্ট লোকের চেষ্টা এই সমিতি অতি নিন্দনীয় বলিয়া মনে করিতেছেন। সমিতি আশা করেন যে অতীত কালে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্প্রীতি ছিল তাহার পুনরুদ্ধারকল্পে হিন্দু-মুসলমানদিগের নেতৃবৃন্দ মধ্যে মধ্যে মিলিত হইবেন এবং সাধারণের মঙ্গলজনক কার্য্যের অনুষ্ঠানে সম্মিলিত ভাবে ও একতার সহিত কার্য্য করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিবেন।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অতীত কালের প্রীতির ভাব এবং বর্ত্তমান কালে তাহার অভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আমাদের অনেক দিন ধরিয়া ইচ্ছা ছিল। আজ তাহার শুভ অবসর পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

হিন্দু ও মুসলমান এক মায়ের দুইটি সন্তান। কোন পরিবারের দুই সহোদর ভ্রাতার মধ্যে সদ্ভাব না থাকিলে পরিণামে সেই পরিবারের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। ইহার দৃষ্টান্ত আইন-আদালতের কল্যাণে নিত্য প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। যাহা পরিবার সম্বন্ধে সত্য, তাহা ক্ষেত্র বিশেষে সম্প্রদায় বা জাতি সম্বন্ধেও সত্য। ভারতবর্ষের কথা আপাততঃ ছাড়িয়া দিয়া কেবল বাঙ্গালা দেশের

কথাই আলোচনা করা যাউক। বাঙ্গালাদেশে হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটী প্রধান ধর্ম্ম-সম্প্রদায়। বাঙ্গালাদেশের বাঙ্গালী জনসাধারণ বলিতে উভয় সম্প্রদায়কে বুঝায়। সংখ্যার হিসাবেও সমগ্র বঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের সংখ্যাই প্রায় সমান। দেশের সর্ব্বপ্রকার শুভাশুভ কার্য্যের সহিত উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ সমানভাবে জড়িত। কোন সাধারণ জনহিতকর কার্য্যে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটীকে বাদ দিয়া অপরটী একক কোন-রূপেই সফলমনোরথ হইবার আশা করিতে পারেন না। উভয়ে সম্মিলিতভাবে কোন কার্য্য করিলে সেই কার্য্যটীতে যতটা শক্তির সঞ্চার হইবে, কোন একটী সম্প্রদায় একাকী সেই কার্য্য সাধন করিতে গেলে তাহাতে ততটা শক্তির বিনিয়োগ করিতে পারিবেন না। হিন্দু মুসলমান পরস্পর নিকটতম প্রতিবাসী; এরূপ দুইজন প্রতিবাসী পরস্পরের সহিত বিরোধ করিয়া শান্তি ও সুশৃঙ্খলার সহিত জীবন যাপন করিবার আশা করিতে পারেন কি? পরস্পর মনের মিল না থাকিলে উভয় পক্ষেরই পরস্পরের ছল ধরা বা ছিদ্রান্বেষণ করা স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে বিবাদ বিসম্বাদ নিত্য ঘটনায় পরিণত হয়। তাহার ফল, উভয় পক্ষেরই বলক্ষয়। এই সুযোগে অপরে নিজের স্বার্থ সাধন করিয়া লয়। যাহারা হিন্দু ও মুসলমানের কোন একজনকে অপরের সহিত বিবাদ করিবার পরামর্শ দেয় তাহারা উভয় সমাজেরই শত্রু। নিজেদের স্বার্থপুষ্টির আশা না থাকিলে কেহ হিন্দু মুসলমানের মনে হিংসা-প্রবৃত্তির উত্তেজনা করিয়া পরস্পরের মনে বিদ্বেষ ভাবের সৃষ্টি করিতে চাহে না। যখনই কেহ হিন্দু অথবা মুসলমান কাহারও নিকট আসিয়া তাহাকে এরূপ পরামর্শ দেয় যে—ঐ দেখ, তোমার প্রতি-বাসীর দিকে চাহিয়া দেখ; উহার কত ধনৈশ্বর্য্য, উহার কত সুবিধাসুযোগ, উহার কত অধিকার, আর তোমার কিছুই নাই; তুমি আর উহার সহিত সম্বন্ধ রাখিও না; তুমি উহার মুখের দিকে না চাহিয়া নিজের উন্নতির চেষ্টা কর, ভয় কি আমরা আছি—তখনই বুঝিতে হইবে যে ঐ লোকটী কখনই নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে তোমার কর্ণে এই ভেদ-মন্ত্র জপ করিতে আসে নাই; প্রথমতঃ দুই ভায়ের মধ্যে ভেদ ঘটাইতে পারিলে তাহার স্বার্থপুষ্টি হইবে; তার পর তোমার অদৃষ্টে যা থাকে ঘটিবে। তখনই ঐ ছদ্মবেশী হিতৈষী হইতে সাবধান হইতে হইবে, তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে হইবে এবং সম্ভবপর হইলে তাহার ছদ্মবেশের খোলস দূরীভূত করিয়া তাহাকে তাহার প্রকৃত মূর্ত্তিতে লোকসমাজে প্রকাশ করিতে হইবে। তবেই এই সকল তথাকথিত কপট হিতাকাঙ্ক্ষী-দিগের কূটমন্ত্রণা-জাল হইতে উদ্ধার লাভ করা যাইতে পারে।

যাহারা হিন্দু মুসলমানে ভেদ ঘটাইবার প্রয়াসী তাহারা উভয়ের ধর্ম্মমতকেই অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা হিন্দুর কর্ণে মন্ত্র দেয় যে মুসলমান গোহত্যাকারী ও গোখাদক; অতএব মুসলমান তোমার শত্রু। তাহারাই আবার মুসল-মানের কাছে আসিয়া বলে যে হিন্দুরা গো-জাতিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে; গো-কোরবানি তোমাদের ধর্ম্মাঙ্গ ও ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য, তাহারা উহাতে বাধা দেয়; তাহাতে তোমাদের ধর্ম্মহানি ঘটে। অতএব হিন্দু তোমার শত্রু, তোমার ধর্ম্মের শত্রু। সুবিধা পাইলেই উহাকে জব্দ করিয়া দাও! গোহত্যা উপলক্ষে এ পর্য্যন্ত ভারতের যেখানে যেখানে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়াছে, একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই জানিতে পারা যায়, ইহাদের প্রত্যেকটীতেই অশিক্ষিত ও অজ্ঞ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়াছে। শিক্ষিত হিন্দু বা শিক্ষিত মুসলমান কখনও এরূপ দাঙ্গায় যোগ দেন নাই। কর্ণে জপার মন্ত্রণা শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের নিকট কখনও ফলপ্রদ হয় নাই।

ধূর্ত্তগণ তাহা বুঝে বলিয়া তাহারা সহজে শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের নিকট এরূপ প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইতে ভরসা করে না। অশিক্ষিত লোকে সে হিন্দুই হউক বা মুসলমানই হউক, সহজেই ইহাদের দ্বারা প্রতারিত হয় এবং ইহাদের ফাঁদে পড়িয়া পরস্পর দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া হীনবল হইয়া পড়ে এবং পরিশেষে মামলা-মোকদ্দমা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পুরস্কারস্বরূপ মনস্তাপ মাত্র লাভ করে।

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে গো-হত্যা লইয়া হিন্দু-মুসলমানে বিবাদের সৃষ্টি ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত বিশেষ চেষ্টার ফল। কলিকাতায় কত কসাইখানা রহিয়াছে, তাহাতে প্রত্যহ কত শত গো-হত্যা হইয়া থাকে। কই সে জন্য ত কোন হিন্দুকে কখনও আপত্তি করিতে দেখি নাই বা শুনি নাই। তবে ঈদ পর্ব্বের সময় কেন তাহারা আপত্তি করে? ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য প্রচ্ছন্নভাবে আছে। সেই রহস্যটা কি? আমাদের মতে তাহাই চক্রান্তকারীদের চাল। কোন কোন উদারহৃদয় হিন্দু সংবাদপত্র বলিয়া থাকেন,—তাঁহাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণকে পরামর্শ দিয়া থাকেন যে, মুসলমান যদি স্বীয় ধর্ম্ম বিশ্বাস মতে গো-কোরবানি করিয়া থাকে, তবে তাহাতে হিন্দুর কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। আশা করি, হিন্দু-নেতৃগণ সকলেই একটু আয়াস স্বীকার করিয়া তাঁহাদের অশিক্ষিত ভ্রাতৃগণকে এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন।

আর মুসলমানও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির বৃদ্ধিকল্পে কিছুই যে করিতে পারেন না এমন নহে। গো-হত্যায় হিন্দুর মনে যদি বাস্তবিকই কষ্ট হয়, গো-কোরবানি প্রত্যক্ষ করিতে হইলে যদি হিন্দু যথার্থই মর্ম্মপীড়িত হয়, তবে যেখানে বহুসংখ্যক হিন্দুর বাস সেখানে সকলের চক্ষুর সমক্ষে গো হত্যা না করিলেও চলিতে পারে। ইহাতে কাহারও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, অপিচ উভয় পক্ষের মধ্যে সদ্ভাব স্থায়ী রক্ষা ও অক্ষুণ্ণ থাকে। মুসলমান আরও একটু উদারতা দেখাইতে পারেন। গতবারের বকরিদের সময় তুরস্ক-যুদ্ধে আহত ও মৃত সৈনিক ও তাহাদের পরিবারবর্গের সাহায্যের জন্য বহুসংখ্যক মুসলমান গো-কোরবানি না করিয়া ছাগ ও মেষ কোরবানি করিয়াছিলেন। সেই জন্য সেবার এক রেঙ্গুন ছাড়া ভারতের আর কোন স্থান হইতে দাঙ্গা হাঙ্গামার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আমাদের প্রস্তাব এই যে যেখানে সেখানে কোরবানি একেবারেই অপরিহার্য্য কেবল সেই সেই স্থানে ছাড়া অন্যত্র ছাগ ও মেষ কোরবানি করিলে বোধ হয় হিন্দু মুসলমানে বিরোধের আশঙ্কা অনেকটা কমিয়া যায়।

হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব বৃদ্ধির পক্ষে উভয় সম্প্রদায়ই যাহা যাহা করিতে পারেন তাহা আমরা যথাসাধ্য বিবৃত করিলাম। হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সুবিবেচক লোকের অভাব নাই। আশা করি, তাঁহারা হিন্দু ভ্রাতৃগণকে অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করিতে পরামর্শ দিবেন। মুসলমানদিগের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে, 'অল ইণ্ডিয়া মোসলেম লীগে'র অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবটী যাহাতে কেবল কাগজে কলমে না থাকিয়া যায়, উহা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাঁহারা সে পক্ষে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে বিরত থাকিবেন না।"

তারপর বীরভূমের

বঙ্গীয় কায়স্থ-সম্মিলন।

বঙ্গে কায়স্থের প্রভাব অতি প্রাচীন কাল হইতে বিদ্যমান। মুসলমানদিগের সময়েও বঙ্গের বারভূঁইয়া বা বার ভাইয়ার নাম স্বাধীনতা-জ্ঞাপক ছিল। মহম্মদপুরের সীতারাম, বিক্রমপুরের কেদার রায়, যশোহরের প্রতাপাদিত্য এখনও দেশবিদেশে

কায়স্থ-সমাজকে পরিচিত করিয়া জয়মাল্য প্রদান করিতেছে। অনেকে বর্ত্তমানে তাঁহাদিগের সহিত পূর্ব্বপুরুষের সম্বন্ধের পরিচয় দিবার জন্য লালায়িত। যেন কি এক অব্যক্ত সম্মান ও গৌরব নামগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট। বঙ্গের তেজস্বী কবি মাইকেল, নির্ভীক লেখক রামগোপাল, শিশির ও যোগেশ দত্ত, দরিদ্র-বন্ধু মনোমোহন, বাগ্মিবর লালমোহন, নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র, ব্যঙ্গরসবীর অমৃতলাল, স্বনামধন্য রাসবিহারী, হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, স্বাধীনচেতা সারদাচরণ, বক্তা বিপিনচন্দ্র, ভারতের প্রথম আইন-সচিব সত্যপ্রসন্ন, বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র আজিও বাঙ্গালী কায়স্থ-সমাজকে জাতীয় জীবনের অতি উচ্চে আসন প্রদান করিয়াছে। তাই যখন বঙ্গে নানা স্থানে কায়স্থের সম্মিলন, সভা বা সমিতির কথা শুনিতে পাই, তখন মনে বল আসে, হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়, প্রাণে তেজ, বীর্য্য ও সাহসের উদ্রেক হয়, আশা হয় লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার হইলেও হইতে পারে। কিন্তু যখন তাঁহাদের সম্মিলনীর মন্তব্যগুলির সহিত, উদ্দেশ্যের সহিত ও সুদীর্ঘ বক্তৃতার সহিত কার্য্যের অসামঞ্জস্য ও বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় তখন ক্ষোভে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইতে হয়।

এবার বড়দিনের সময়ে কলিকাতায় সর্ব্বভারতীয় কায়স্থ-সম্মিলন নামক একটি বৃহৎ সভা হইয়াছিল। মামুলি প্রথার কোন অভাব হয় নাই। মন্তব্য ছিল ২৫টি। কেবল ছিল না আন্তরিকতা ও হৃদয়বত্তা।

মন্তব্যগুলির মধ্যে চিরপরিচিত (১) বিবাহে পণগ্রহণ নিষেধ, (২) দরিদ্র কায়স্থ সন্তানদিগের বিদ্যোপার্জ্জনার্থে সাহায্য (৩) কায়স্থ বিধবাদিগের সাহায্য ও কায়স্থসমাজের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রচলন মন্তব্যগুলি দেখিলাম। বিবাহে পণ গ্রহণ বর্জ্জনের পরিবর্ত্তে এখন অর্জ্জনেরই আধিক্য পরিলক্ষিত হইতেছে। সহরের নিমন্ত্রণপত্রের নিম্নে "বিবাহে লৌকিকতা গ্রহণে অসমর্থ" লিখিলেই পণ বর্জ্জন করা হয় না। কোনরূপ চুক্তি না থাকিলেও বিবাহের সময় বাই-সাইকেল প্রভৃতি উপহার না দিলে বিবাহই হয় না—ইহা 'ক'য় স্বীকার করিলাম বঙ্গের অনেক যুবকের পিতা এখনও অর্থগৃধ্নু, কিন্তু বিবাহের পর যুবকদিগের এ সব ব্যবহার বড়ই লজ্জাকর। সহরের বার মাসে তের পরবের ঢেউ যে মফঃস্বলে অতি প্রবল বেগে প্রচলিত হইয়াছে ইহা সকলেই অবগত আছেন। সহরের বিবাহের দাবী কাহারও অবিদিত নাই। মফঃস্বল সহরের চির অনুকরণ-প্রিয়। সহরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিই মন্তব্যের প্রবর্ত্তক, তাঁহারাই আবার ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিবাহের দাবীর প্রধান যাচক। সুতরাং যাহারা ইহার প্রবর্ত্তক তাঁহারাই যদি নিবর্ত্তক হয়েন, তবেই ইহার প্রতীকার হইবে, নচেৎ মন্তব্য চিরদিন লিখিত মন্তব্যই থাকিবে, কার্য্যে কখন পরিণত হইবে না।

বাঙ্গালী কায়স্থ বঙ্গের গৌরব। এই সমাজকে সজীব ও সতেজ করিতে হইলে জেলায় জেলায় দরিদ্র ছাত্রদিগের জন্য উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে সাহায্যের বন্দোবস্ত করা উচিত। সহরের ছাত্রগণ বিলাসিতায় যে অর্থ অপব্যয় করেন উহা যদি নিজেদের দরিদ্র ভ্রাতাদিগের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হয় তবে অনেক সুফল আশা করা যায়।

সেদিন বীরভূমে বঙ্গীয় কায়স্থ-সম্মিলন কতকগুলি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন। যাহাতে ২।৪টি মন্তব্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন তদ্বিষয়ে স্থায়ী কার্য্যকরী সভা অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করিলে আমরা সুখী হইব।

একণে বাঙ্গালার

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের

কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। এবারকার ঢাকার অনুষ্ঠানটীতে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরা মাঘ সংখ্যায় বাঁকিপুরের কংগ্রেস সম্বন্ধে আলোচনা উপলক্ষে বলিয়াছিলাম :—"কংগ্রেসকে রক্ষা করা নিতান্তই প্রয়োজন। যাঁহারা কিছু কাল হইতে বিরক্ত হইয়া কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহারা আবার যোগদান করুন এবং নূতন জীবন অর্পণ করিবার জন্য সচেষ্ট হউন। এই প্রতিষ্ঠানটি তিন দিনের গল্প-গুজবের স্থান বটে, কিন্তু ইহাকে একেবারে অগ্রাহ্য করা উচিত নহে।"

ভারতীয় কংগ্রেসের বাঙ্গালী সংস্করণ ঢাকার কন্‌ফারেন্সে আমাদের এই ইচ্ছা অনেকটা পূর্ণ হইয়াছে দেখিতে পাই। কন্‌ফারেন্সের সভাপতি ছিলেন স্বনামধন্য স্বদেশসেবক স্বয়ং শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত। সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন—সমগ্র বঙ্গের বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের স্বার্থত্যাগী কর্ম্মোপাসক সমাজসেবকগণ। তাঁহাদের মিলনে ঢাকার বৈঠকটি অতিশয় সফল হইয়াছে। তাহার উপর ঢাকার প্রবীণ উকীল ব্যারিষ্টার ডাক্তার মহাশয়গণ নিজেরা স্বেচ্ছাসেবক হইয়া সমবেত প্রতিনিধিগণের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। অতএব একটা বক্তৃতার আসরে এবং কথাবার্ত্তার বৈঠকে যতদূর সম্ভব,—সকল দিক হইতেই ঢাকার অনুষ্ঠানটিতে আন্তরিকতা, হৃদ্যতা এবং সরস জীবনবত্তা প্রবিষ্ট হইয়াছিল। অধিকন্তু, সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতায় মামুলি কথার চর্ব্বিত চর্ব্বণের অংশ বেশী ছিল না। তিনি কতকগুলি কথা মাত্র বলেন নাই। প্রায় সকল কথাই কাজের কথা—কর্ম্মপ্রণালীর কথা। তিনি নিজে যাহা করিতেছেন—ভারতবর্ষের অন্যান্য কর্ম্মীরা যাহা করিতেছেন—সেই সমুদয় বিষয়ই স্পষ্টভাবে বিশদরূপে তাঁহার বক্তৃতায় আলোচিত হইয়াছে। তিনি স্বদেশসেবকগণের কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন—সঙ্গে সঙ্গে সেবকগণের ব্রত-উদ্‌যাপনের পন্থাও দেখাইয়া দিয়াছেন। কতকগুলি ফাঁপা অসার ভাবুকতায় তাঁহার বক্তৃতা পূর্ণ নহে। প্রকৃত কর্ম্মীরা তাঁহার উপদেশে অনেক সঙ্কেত পাইবেন। আমরা সকলকে অশ্বিনী বাবুর অভিভাষণটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমরা স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া কতক অংশ জনসাধারণের গোচর করিতেছি।

আমরা আশা করিয়াছিলাম অশ্বিনী বাবু মাতৃভাষায় তাঁহার বাণী প্রচার করিবেন। কিন্তু আশা পূর্ণ হইল না। তবে তিনি ইংরাজীতে প্রবন্ধ পাঠ করিবার পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় খানিকটা বলিয়াছিলেন। তাহাতেই সমগ্র বক্তৃতার সার কথা নিহিত ছিল—তাহাতেই তিনি সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আমাদের বিশেষ পরিতোষের কথা এই যে, আমরা গত তিন চারি মাস ধরিয়া দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথার আলোচনা করিয়াছি। দেশনায়ক অশ্বিনীকুমারও সেই সকল বিষয়ে আমাদের মতগুলিই সমর্থন করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় সম্মিলনগুলির সার্থকতা কিসে বাড়িতে পারে, তাহার আলোচনা তিনি মুখ্যতঃ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা যে সকল কাজের কথায় পরিপূর্ণ তাহা হইতেই সকলে কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সগুলির সার্থকতা ও উপকারিতা বাড়াইবার উপায় বুঝিতে পারিবেন। আমরা এই বিষয়ে আগামী বারে বিশদরূপে আলোচনা করিব।

এবারও "জাতীয় শিক্ষার" আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতাদি হইয়াছিল, এবং বাঙ্গালী সমাজ হইতে সৈন্যসংগ্রহের আবশ্যকতা প্রচারিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবাদ এবারকার সম্মিলনের একটি বিশেষত্ব।

অশ্বিনী বাবু বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষমতা ও আত্ম-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন :—

"আমরা কি বাঙ্গালীদিগকে দেশের স্বাধীন রাজ্যসমূহের কর্ণধারস্বরূপে গৌরবের সহিত কর্ম্ম করিতে দেখি না? সুবিধা দিলে তাঁহারাও কি জেলার সুযোগ্য কর্ত্তা হন না? সময় আসিলে দেশের সহস্র সহস্র যুবকবৃন্দ কি দল বাঁধিয়া সৎকার্য্যে সফলতা লাভ করেন না? তাহা দেখিয়া বিপক্ষেরাও কি প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন? ইহাতেই আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। বিগত অর্দ্ধোদয় যোগ, চূড়ামণি যোগ এবং ব্রহ্মপুত্র-স্নানে আমাদের দেশের যুবকবৃন্দ যে ভাবে সহস্র সহস্র যাত্রীকে সেবাশুশ্রূষা ও সাহায্য করিয়াছিলেন তাহাতে ইংরাজ-চালিত পত্রিকা-গুলিও ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এইগুলি কি আমাদের জীবনী শক্তি ও দল গঠন করিবার ক্ষমতার প্রমাণ নহে? আমাদের হৃদয় আছে, আমাদের শক্তি আছে। এখনও দেশের বহুস্থানে যুবকেরা সমিতিগঠন করতঃ রোগীকে শুশ্রূষা করেন, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেন এবং বন্ধুবান্ধবহীন মৃতের শেষ সৎকার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রফুল্লতা ও দৃঢ়তা অবশ্য প্রশংসনীয়। আমি কিছুতেই ভুলিতে পারিব না আমার নিজের জেলায় প্রায় ২০০ দুই শত সমিতির বন্ধুগণ ১৯০৬ সালের বিপদের মধ্যে এবং স্বদেশী আন্দোলনে কেমন গুপ্তভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী ঠিক যন্ত্রের মত চালিত হইয়াছিল, কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই। তাঁহাদের অনেকেই দরিদ্রকে সাহায্য করিবার জন্য নিজ হস্তে পুষ্করিণী খনন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। অনেকে ইচ্ছাপূর্ব্বক চৌকীদার সাজিয়া বদমায়েস এবং চোর তাড়াইবার জন্য সমস্ত রাত্রি 'রণে' ফিরিয়াছেন। অনেকে চোর পর্য্যন্ত ধরিতেও সমর্থ হইয়াছেন। আমি জানি, কত অসহায় ভদ্র পরিবার ইঁহাদের দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন। আমি জানি, দুইটি গ্রামের ব্রাহ্মণ সন্তানগণ নিজের হস্তে দেড় মাইল বিস্তৃত রাস্তা তৈয়ারী করিয়াছেন। আমি কিছুতেই ভুলিতে পারিব না কেমন করিয়া নবজীবনের ধারা সমাজের নিম্নতম শ্রেণীতে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়াছে।"

বিবিধ সদনুষ্ঠানের জন্য ধনসঞ্চয়ের উপায় সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের উপদেশ এই :—

"আমাদের দেশে শ্রাদ্ধাদিতে অনেক টাকা ব্যয় হয়। কেহ বা জাঁক দেখাইবার জন্য কেহ বা প্রাচীন রীতির প্রতি শ্রদ্ধাবশত ইহা করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ ভাবে টাকা ব্যয় আর আমরা সমর্থন করিতে পারি না। সময়ের পরিবর্ত্তনে এই শ্রাদ্ধের ব্যয়-প্রথা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। একটি ভদ্রলোক তাঁহার ভ্রাতৃবধূর শ্রাদ্ধে ১৬০৲ টাকা ব্যয় করিবেন স্থির করিয়া ৬০৲ টাকায় শ্রাদ্ধ সারিয়া বাকী ১০০৲ টাকা আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ টাকা দিয়া মৃতার নামে গরীব দুঃখীকে খাওয়ান হইয়াছিল। এইরূপ দৃষ্টান্ত যত বাড়ে ততই ভাল। শ্রাদ্ধবাবদ টাকা কমাইয়া বাকী টাকায় বেশী চিরস্থায়ী ফণ্ড করা যাইতে পারে।

ফণ্ডটা যতই সামান্য হোক না কেন, তাহা হইতেই সাধারণের বহু উপকার সাধিত হয়। শ্রাদ্ধের মত অন্যান্য উৎসবেও যদি এইরূপে টাকা সংগৃহীত হয় তাহা হইলে সেই টাকা দিয়া দেশের মধ্যে বহু সদনুষ্ঠানের কর্ম্মকেন্দ্র সৃষ্টি করা যাইতে পারে। একটি লোকের দান অপেক্ষা বহু লোকের যৎকিঞ্চিৎ দানই বিশেষ সন্তোষজনক। অল্পে অল্পেই বেশী হয়। মহারাষ্ট্রের "পয়সা ফণ্ড" কি সুন্দর কায করিয়াছে—টালিগাঁওএর গ্ল্যাস কারখানা এবং "ন্যাশনেল" কলেজটি এই ফণ্ড হইতেই উৎপন্ন। দাক্ষিণাত্যের যেখানেই তুমি যাও না কেন, সেই খানেই দেখিবে একটি বাক্সের মধ্যে যৎসামান্য এমন কি একটি পয়সা পর্য্যন্ত ফেলিতেও তোমাকে অনুরোধ করা হইতেছে। আমি বুঝিতে পারি না বঙ্গদেশেও কেন এইরূপ পয়সাফণ্ড হইবে না?"

এই প্রস্তাব যুক্তি দ্বারা বুঝাইবার আর প্রয়োজন নাই। বঙ্গদেশে এইরূপ বহু ফণ্ডের কার্য্য বিবিধ নামে চলিতেছে। সুতরাং মহারাষ্ট্রের একটা পয়সা ফণ্ডের দৃষ্টান্তে বঙ্গসমাজের ঘুম ভাঙ্গাইতে হইবে না। তবে ভারতবর্ষের নানাস্থানে এরূপ সৎকার্য্য হইতেছে এ কথা জানা আমাদের আবশ্যক।

কর্ম্মপরিচালনা ও দলগঠন সম্বন্ধে অশ্বিনী বাবুর মত এই –

"একটি কেন্দ্রসমিতিও তাহার শাখা-প্রশাখা অপেক্ষা স্থানে স্থানে স্বাধীন সমিতি হওয়া আমি বেশী বাঞ্ছনীয় মনে করি। তাঁহারা জেলার প্রয়োজনমত কার্য্য করিবেন এবং বৎসরের শেষে তাঁহাদের কার্য্যফল এই প্রাদেশিক সমিতিতে জানাইবেন।"

আমরা সর্ব্বদা সকল বিষয়েই এইরূপ শক্তি-বিকীরণ নীতির পরিপোষণ করিয়া আসিতেছি। কি সমাজ-সেবা, কি সাহিত্যচর্চ্চা, কি শিক্ষা-বিস্তার সকল বিষয়েই আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বপ্রধান কেন্দ্র-গঠনের পক্ষপাতী।

তারপর, আধুনিক ভারতের কয়েকটা স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অশ্বিনী বাবু সকলকে আশান্বিত করিয়াছেন:—"এখনও বঙ্গদেশের ন্যাশনেল কলেজ, দৌলতপুর বিদ্যালয়, বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বঙ্গদেশের বাহিরে আর্য্যসমাজ, ভারতবর্ষীয় সেবকসমিতি, ফার্গুসন কলেজ, রামকৃষ্ণ-মিশনের ভারতব্যাপী কর্ম্ম আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। এগুলি দেখিয়া কি বুঝা যায়? বুঝা যায়—ত্যাগ ও

ভক্তির ভাব এখনও আমাদিগকে ছাড়ে নাই। এখনও আমরা হৃদয়ের সেই উদার ভাবকে বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া কাযে লাগাইতে পারি।"

তারপর, স্বদেশসেবকগণের কর্ম্মক্ষেত্র। এ সম্বন্ধে অশ্বিনী বাবু বলেন "ভদ্রমহোদয়গণ, আপনরাই ত জননায়করূপে আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। আপনারাই ত অসমর্থ লোকদিগের মুখে অন্ন দিবেন, অপারগ লোকদিগের জন্য কর্ম্মকেন্দ্র সৃষ্টি করিবেন, যাহারা নিজে কি করিবে জানে না, তাহাদিগকে শিক্ষা দিবেন, কৃষি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্য করিবেন। দেশের যাবতীয় ধনাগমের পথ উন্মুক্ত করিবেন, স্বদেশীর ভাব জাগাইয়া দিবেন, পয়ঃপ্রণালী এবং উত্তম জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন। আপনারাই ত রোগীকে চিকিৎসা করাইবেন, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের শিক্ষা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত করিবেন, কৃষিশিল্প এবং অন্যান্য নানা বিষয় স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই শিখাইবেন, নানা শ্রেণীর বিদ্যালয় খুলিবেন, যুবকদিগের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক উন্নতির জন্য ব্যবস্থা করিবেন—মাদকদ্রব্য নিবারণ কল্পে চেষ্টা করিবেন, গ্রামের মধ্যে যথাসম্ভব শালিসীর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবেন, সমাজের মধ্যে নীতির চর্চ্চা আনিবেন, নিম্ন শ্রেণীদিগকে উন্নত করিবেন এবং দেখিবেন যাহাতে দেশের মধ্যে অধর্ম্ম এবং অবিশ্বাসের ভাব না জাগে—।"

এবারকার একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—খুলনায়

বঙ্গীয় মোক্তারগণের সম্মিলন।

আমরা ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনিয়াছি সময় আসিলে কাঠের পুতুলও হাঁ করে—মরা গাঙেও বাণ ডাকে। আজ দেখিতেছি সত্য সত্যই আমাদের দেশে সেই সময় আসিয়াছে। এখন কোথাও কেহ নির্জ্জীব বা অসাড় ভাবে থাকিতে চাহে না। সকলেই নব উদ্যমে নবজীবনের রাজপথে দ্রুতপদে চলিতে অগ্রসর। সকলেই নিজ নিজ সমাজও নিজ নিজ ব্যবসার উন্নতি করিতে এবং নিজ নিজ অধিকার ঘোষনা করিতে উদ্যোগী। তাই আজ অপ্রত্যাশিত দিক হইতেও জীবনের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে।

আমাদের দেশে ব্যবহারজীবীদিগের মধ্যে মোক্তারগণ এতকাল কৃপার পাত্র ছিলেন। তাঁহাদের কথা ভাবিতেই আমাদের মনে পড়িত, শামলা আঁটা বক্তলাবিহারী দীনহীন মূর্ত্তি। কিন্তু দেশের মধ্যে তাঁহারা যে "কেউ কেটা" নহেন, তাঁহাদেরও যে চিন্তা ও কর্ম্ম করিবার শক্তি আছে, তাঁহারাও যে তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ, এতদিনে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

আমরা দেখিতেছি শুধু উকীলগণই দেশের লোক-মত সৃষ্টি করিবার উপায় নহেন, কিন্তু মোক্তারগণও দেশ সম্বন্ধে পাঁচটা কথা ভাবিতে পারেন, তাঁহাদের মধ্যেও প্রাণ আছে—তাঁহারাও কর্ম্মপটু। এবারকার মোক্তার-সম্মিলনে তাঁহাদের কর্ম্মশক্তির পরিচয় পাইয়াছি। আমরা আশা করি, দেশের অন্যবিধ মঙ্গল কর্ম্মেও অচিরেই তাঁহাদের নেতৃত্ব প্রকাশ পাইবে।

যাহারা প্রকৃত দেশবাসী অর্থাৎ দেশের নিম্ন-শ্রেণী তাহাদের সঙ্গেই মোক্তার মহাশয়গণের বেশী সম্বন্ধ। অতএব দেশের

কায করিবার পক্ষে তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা আছে। তাঁহাদের নবজাগরণ তাই আমাদের কাছে অতিশয় আশাপ্রদ।

বাঙ্গালা দেশের এমন জেলা নাই যেখান হইতে মোক্তারগণ খুলনার এই সভায় না আসিয়াছিলেন। খুলনাবাসী তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য যে বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, যে সব সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষুদ্র খুলনার পক্ষে বাস্তবিকই বড় গৌরবজনক। তাহা হইতে এ কথা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে খুলনাবাসী কোন কিছু সদনুষ্ঠানে একযোগে মিলিতে পারেন। খুলনার উকীল, হাকিম, জমিদার, প্রবীণ ও নবীন, অজাতশ্মশ্রু-কষ্টসহিষ্ণু স্বেচ্ছা-সেবকদল সকলেই আমাদের ভক্তির পাত্র।

উক্ত সমিতিতে সাতটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। মোক্তারগণের অধিকার-বিস্তার, রেভিনিউ এজেণ্টকে ব্যবহারজীবীর ক্ষমতা প্রদান, প্রতি বৎসর বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে উক্ত সমিতির অধিবেশন এবং তদর্থে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সংগঠন প্রভৃতি প্রস্তাবগুলির উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি প্রস্তাবই সমীচিন হইয়াছে। বিশেষত এইরূপ সম্মিলন যে কেবল মাত্র একবার হইয়াই বন্ধ হইয়া গেল না, প্রতি বৎসর ইহাকে যে বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে দেখিতে পাইব, তাহাতেই আমাদের আনন্দ হইতেছে। এইরূপেই মোক্তার মহাশয়-গণের এতদিনকার তথাকথিত জড়তা বিনষ্ট হইবে—এইরূপেই তাঁহাদের মধ্যে উদ্যম আসিবে—এইরূপেই তাঁহাদের মধ্যে একতা জন্মিবে। এই রূপেই বঙ্গসমাজে বিবিধ অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক স্বরূপ নূতন একশ্রেণীর লোকের অভ্যুদয় হইবে। দেশের লোকবল বাড়িবে।

এখন চট্টগ্রামের

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে

আসা যাউক। একদিনে এক সঙ্গে এতগুলি আন্দোলন—অনেকে এই ব্যবস্থা পছন্দ করেন না। তাঁহারা সম্মিলনে সম্মিলনে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিয়া দুঃখিত—তাহাতে প্রত্যেক সম্মিলনের ক্ষতি আশঙ্কা করিতেছেন। আমরা মনে করি, দেশের সমস্যাগুলি ক্রমশঃ এত গভীর, জটিল ও বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে যে এখন নানাবিধ সম্মিলন এক সঙ্গে হইতে থাকিবেই। দিনক্ষণ হিসাব করিয়া প্রত্যেক বড় বড় সম্মিলনের জন্য স্বতন্ত্র দিন নির্দ্ধারিত করা ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

অনেকে বলেন—রাষ্ট্রীয় সম্মিলন আর সাহিত্যসম্মিলন একই স্থানে হওয়া উচিত। অনেকে বলেন—বড় বঙ্গের সাহিত্যসম্মিলন এবং উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের বিভাগীয় সাহিত্য-সম্মিলন একদিনে হওয়া উচিত নয়। আমরা এরূপ মনে করি না। আমরা মনে করি যাঁহারা এরূপ পরামর্শ দিয়া থাকেন তাঁহারা সমাজের সমস্যা ও অভাবগুলি অতি ক্ষুদ্রভাবে দেখিতেছেন—এই পরামর্শ অনুসারে কর্ম্ম করিলে দেশকে ছোট করিয়া রাখা হইবে। শিক্ষা-সম্মিলন, ব্যবসায়-সম্মিলন, শিল্প-সম্মিলন, জাতি- বা গোষ্ঠী-গত সম্মিলন ইত্যাদি কত বড় বড় অনুষ্ঠান বঙ্গদেশে হইতেছে ও হইবে।

সেইগুলির মধ্যে কোন একটির প্রতি বিশেষ সম্মান দেখান বা তাহার জন্য কয়েকটা বড় ছুটি নির্দ্দিষ্ট রাখা এবং সেই দিনে অন্যান্য অনুষ্ঠান বন্ধ রাখিতে পরামর্শ দেওয়া প্রকৃত দেশহিতৈষীর কার্য্য নয়। আমরা মনে করি, তিলি-সম্মিলনই হউক বা সাহিত্য-সভাই হউক, শিক্ষক-সম্মিলনই হউক বা শিল্প-সম্মিলনই হউক—সকলেরই কেন্দ্র দেশ। সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা—সকলেরই গোড়ার কথা দেশ। সুতরাং সকল আন্দোলনই সমান প্রয়োজনীয়—সকলেরই সমান মর্য্যাদা এবং সকলকেই সমান সুযোগ দেওয়া আবশ্যক। অতএব প্রয়োজন হইলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই সঙ্গে বিভিন্ন সম্মিলন হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয় মনে করি। ইহাতে নানা স্থানে দেশের কর্ম্মকরী শক্তি অতি সত্বরই নানা ভাবে বাড়িতে থাকিবে। আশা করি বিচক্ষণগণ দেশের মুখ চাহিয়া সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দিবেন না—সকল অনুষ্ঠান গুলিকে এক স্থানে একত্রীকৃত করিবার উপদেশ দিবেন না এবং এক সঙ্গে বহু স্থানে নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজনে আপত্তি করিবেন না।

এবারকার দৃষ্টান্তে অনেকেরই চোখ ফুটিবে আশা করি। ঢাকার বৈঠক এবং চট্টগ্রামের বৈঠক কোন অংশেই অসম্পূর্ণ হয় নাই—উভয়েই আশাতীত প্রতিনিধি সমাগম হইয়াছিল। অবশ্য অনেকে দুই তীর্থেরই যাত্রী—তাঁহারা একটাতে বঞ্চিত হইয়াছেন। কিন্তু ক্ষতি কি? একাধিক তীর্থের যাত্রী অনেকেই থাকিবেন। কিন্তু—সকল তীর্থেরই সমান ফল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সকলেরই কেন্দ্র দেশ। সুতরাং দুঃখের কোন কারণ নাই।

তারপর দিনাজপুরের সাহিত্য-সম্মিলন এবার বন্ধ রাখা হইল। কর্ত্তারা যে বড় বেশী মনস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। উত্তরবঙ্গ হইতে একজনমাত্র চট্টগ্রামে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন—মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির একজন প্রতিনিধি। আর একজন রঙ্গপুর হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে না পাঠাইলে শাখা-পরিষদের মুখ রক্ষা হইত না তাই। কিন্তু সমগ্র উত্তরবঙ্গ একেবারেই যোগ দিতে পারিল না. পশ্চিমবঙ্গই বা কি করিল? কলিকাতার অধিবাসী বা প্রবাসী লোকেরা সর্ব্বত্রই যাইয়া থাকেন। তাঁহাদের কথা না ধরিলাম। রাঢ় অঞ্চল এবং মধ্য-বঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে কয়জন চট্টগ্রামে যাইতে পারিয়াছিলেন? এই সব হইতেই বুঝা উচিত—বড় বঙ্গের সম্মিলনই হউক বা ছোট বঙ্গের সম্মিলনই হউক যখন যে অঞ্চলে অনুষ্ঠান হইবে তখন সেই অঞ্চলের লোকই বেশী জুটিবে। ইহা স্বাভাবিক। পারিবারিক সুবিধা অসুবিধা, অর্থব্যয় সবই ভাবা উচিত। তবে কেন অন্যান্য বিভাগীয় অনুষ্ঠানগুলি বন্ধ রাখি?

এবারকার সাহিত্য-সম্মিলনে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিবার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। এজন্য আমরা সুখী। বিজ্ঞান-সভাটাকে যে কয়েকজন তথাকথিত 'বিশেষজ্ঞে'র একটা ক্ষুদ্র বৈঠকে পরিণত করা হয় নাই—এজন্য আমরা আরও আনন্দিত। শিল্প, স্বাস্থ্য, ব্যবসা, কৃষি প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে নানা স্বাধীন অনুসন্ধানের ফল সভাস্থলে বিবৃত হইয়াছিল।

উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেরই উপকার হইয়াছে—আশা করি প্রবন্ধলেখকগণ শীঘ্রই সেগুলি দেশীয় পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত করিয়া সমস্ত বঙ্গের পাঠকগণকে শিক্ষিত করিবেন। রাজসাহী হইতে অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী চট্টগ্রামের বিজ্ঞান-সভায় কোন প্রবন্ধাদি পাঠাইলেন না কেন? কলিকাতা বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক মনীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ও সদলবলে চট্টগ্রামে উপস্থিত হইবেন শুনিয়াছিলাম। তাঁহাদেরই বা আসা হইল না কেন? তাঁহারাও শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে মৌলিক অনুসন্ধান করিতেছেন। তাঁহাদিগের কার্য্যফলগুলি পাইলে বাঙ্গালীর উপকারই হইবে।

অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বৈজ্ঞানিক বৈঠকে হিন্দুর রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিয়াছিলেন। আমরা পদার্থবিজ্ঞানের সভায় রাধা কুমুদ বাবুর বক্তৃতা সমীচীন মনে করিলাম না। যদি ভিন্নভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বৈঠক করিতে হয়,—ধনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান—এই সকল বিজ্ঞানের আলোচনার জন্যও স্বতন্ত্র সময় নির্দ্ধারিত করা আবশ্যক। এবার পদার্থ-বিজ্ঞানের চাপে—ইতিহাস ও মানব-বিষয়ক সর্ব্ববিধ বিজ্ঞানই কাণা হইয়াছিল। এজন্য অনেকে দুঃখিত। বিজ্ঞান আমরা চাই, কিন্তু বৈঠকে বৈঠকে দলাদলি চাই না। যখন দিন আসিবে তখন বৈজ্ঞানিক সম্মিলন, ঐতিহাসিক সম্মিলন, সমালোচক সম্মিলন ইত্যাদি নানাবিধ সম্মিলন হইতে পারিবে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় সাহিত্য সম্মিলনের বিজ্ঞান শাখা, ইতিহাসশাখা, ইত্যাদি শাখাবিভাগের আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রবন্ধগুলি শাখা হিসাবে পড়া উচিত নহে—অন্য কোন নিয়মানুসারে পাঠ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। সকল প্রবন্ধই সাধারণ শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে পঠিত হওয়া উচিত। আশা করি কথাটায় সকলে কাণ দিবেন।

এবারকার সাহিত্য-সম্মিলনে আমাদের কয়েকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। প্রথমতঃ সাহিত্যে স্বাস্থ্যের আলোচনা। স্বয়ং সভা-পতিই এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এসম্বন্ধে একটি প্রস্তাবও যথারীতি আলোচিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান। তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্যসম্মিলন-প্রতিষ্ঠার্থ পরামর্শ-সভায় নিম্নলিখিত

প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছিল :—

"বঙ্গসাহিত্যের সমধিক আলোচনার জন্য পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় সাহিত্যসেবী একত্র হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন প্রতিষ্ঠাকল্পে পরামর্শ করিবার নিমিত্ত সমবেত হ'ন; এবং স্থির হয় যে এতদ্বিষয়ে চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনে সমাগত পূর্ব্ববঙ্গবাসী সাহিত্যসেবিগণের অভিমত সংগ্রহ করা হউক।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ :——অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ, গৌহাটী, কটন কলেজ (শ্রীহট্ট) কবিবর শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি, এল, উকীল (চট্টগ্রাম) কবিরাজ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত বিদ্যাভূষণ, সম্পাদক, আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষিণী (ঢাকা) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত

এম, এ, ঢাকা কলেজ (ঢাকা) অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, (ফরিদপুর) সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত এম, এ, (বরিশাল), শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র চৌধুরী বি, এ, হেডমাষ্টার করিমগঞ্জ হাই স্কুল (শ্রীহট্ট) অম্বিকাচরণ দে বি, এ, বিজয়া সম্পাদক (শ্রীহট্ট) সতীশচন্দ্র দেব বি, এল, উকীল, করিম গঞ্জ (শ্রীহট্ট) পরেশলাল সোম বি, এল মৌলবী বাজার (শ্রীহট্ট) ক্ষীরোদচন্দ্র পুরকায়স্থ এম, এ, হেড মাষ্টার সাতকানিয়া হাই স্কুল, চট্টগ্রাম (শ্রীহট্ট) গিরিশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী, মৌলবী বাজার (শ্রীহট্ট) বিপিন-বিহারী নন্দী, উকীল, পটীয়া, (চট্টগ্রাম) সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত কাব্যতীর্থ, চটল-ধর্ম্মমণ্ডলী-সম্পাদক (চট্টগ্রাম), অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ, (ঢাকা) দেবকুমার রায় চৌধুরী জমিদার (বরিশাল)।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভার পরে অনুকূল অভিমত প্রদান করিয়াছেন :———-শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, বি এ, বি টি (ঢাকা) পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (ময়মনসিংহ) কালীকৃষ্ণ ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন রায় (ফরিদপুর) শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (আগরতলা) মহম্মদ রওশান আলী, কোহিনূর-সম্পাদক (ফরিদপুর) অম্বুকূলচন্দ্র গুপ্ত (ফরিদপুর) ।"

তার পর আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা—বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, এম্, এ ক্লাস পর্য্যন্ত বিজ্ঞান, দর্শন, ইত্যাদি

সকল বিষয়ই বাঙ্গালা ভাষায় শিখাইবার কথা।

আমাদের আশা—অল্প কালের মধ্যেই বাঙ্গালার ছাত্রগণ বঙ্গদেশের উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে যাহা কিছু শিখিবেন—সবই মাতৃভাষায়। অবশ্য আমাদের মাতৃভাষায় এখনও বি এ, বি, এস্‌সি, এম্ এ, এম, এস, সি, ক্লাসের উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক প্রণীত হয় নাই। কিন্তু এই বইগুলি লেখা বা লেখান বড় বেশী কঠিন ব্যাপার নয়। পারিভাষিক শব্দ লইয়া গোলযোগের জন্য ভাবিবার প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে এখন অনেক বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমালোচক, ঐতিহাসিক আছেন—যাঁহারা অন্নবস্ত্রের সুবিধা পাইলে, নিশ্চিন্তভাবে সাহিত্যসেবার সুযোগ পাইলে বৎসরে দুই তিন খানা করিয়া উচ্চশ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিতে পারেন। আমরা ইহা পূর্ণ অন্তঃকরণে বিশ্বাস করি। অতি অল্প কালের ভিতরই বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদেশীয় ভাষার একাধিপত্য চলিয়া যাইবে—এই আশা ও আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল। এই আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ, আশা ও বিশ্বাস সকল সাহিত্য সেবীর অন্তঃকরণে সংক্রামিত করিতে হইবে। এজন্য আমরা অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের "সুযোগ-সৃষ্টি" নীতি বা 'যোগ্য ব্যক্তিগণের' অন্নবস্ত্রের অভাবপূরণ করিবার প্রস্তাব গত সংখ্যায় অনুমোদন করিয়াছিলাম। অধ্যাপক সরকার মহাশয় ইহাকে 'সংরক্ষণ' নীতি বলিয়াছেন। আমরা সুখী হইলাম আমাদের অনুমোদিত প্রস্তাব চট্টগ্রামের সম্মিলনে আলোচিত হইয়াছে। সেখানকার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ও নিজের

বক্তৃতায় এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বিশদরূপে বিবৃত করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছিলেন।

তাঁহার অভিভাষণের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে:—

"বঙ্গসাহিত্য এতকাল কেবল অল্প কয়েকজন প্রতিভাবান্ লেখক বা কবিসঙ্গমেই যে কিছু উন্নতি লাভ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশের পরিসর, এবং বাঙ্গালীর সংখ্যা তুলনায় এই প্রতিভাবান ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্য। * * * আমাদের রাষ্ট্রীয় অবস্থা, অর্থ নৈতিক অবস্থা, এবং পঞ্চাশ বৎসরের কালানুপাতে, এই উন্নতি সামান্য না হইতে পারে—কিন্তু অন্য সভ্য সাহিত্যের তুলনায় যথেষ্ট নহে বলিয়াই মনে করিতে হয়। * * *

আমাদের সন্তানগণের শিক্ষাব্যাপার জাতীয় ভাষার সাহায্যে সংসাধিত হয় না বলিয়া, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি মাতৃভাষার আধার মধ্যে এবং উহার সাহায্যে বিকশিত হইতে পারে না বলিয়া, আমাদের বাক্-দেবতা এবং জ্ঞান-দেবতা এক নহে বলিয়াই হয় ত, এই নিদারুণ শৈথিল্য এবং বিক্লবতা উপজাত হইতেছে। হয় ত কেন, ইহা নিশ্চিত যে, এই উপসর্গের গতিকে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন ইংরাজীভাষার মধ্যে সমর্থ ভাবে চলিতে জানিয়াও, মাতৃভাষার মধ্যে আসিয়া কৌতুককর শিশুতা এবং পঙ্গুতার আশ্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে; এবং আমাদের সাহিত্য-সেবকগণের অধিকাংশ যৌবনউপযোগী সবলতা এবং সামর্থ্য লাভ করিতে পারিতেছেন না। ইহা নিদারুণ দুর্দ্দশা এবং দুর্ভাগ্যের বিষয়। আমরা দিগ্বিজয়ী হইতে জানিয়াও মাতৃভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে যাইয়া, চারি শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ইংরাজের সমতুল্য! আমাদের সৌভাগ্য গতিকে এখন এই অভাব নিরাকৃত হইতে চলিয়াছে, বঙ্গভাষা এদেশের উন্নত শিক্ষা ব্যাপারে রাজকীয় শিক্ষা-পরিষদ্ কর্ত্তৃক অপরিহার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিন্তু, বঙ্গসাহিত্য এখনো উক্ত নির্দ্ধারণের উপযুক্ত যোগ্যতা দেখাইতে সর্ব্বাংশে সমর্থ নহে—এণ্ট্রেন্স কিংবা ইণ্টারমিডিয়েট কিংবা বি-এ ক্লাসের শিক্ষার্থীর উপযোগী গ্রন্থ আমাদের সাহিত্যে যথেষ্ট নহে! ইংরাজী গ্রন্থনিচয়ের সহিত এক্ষেত্রে তুলনা করিতে যাওয়াও ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচিত। এখন, এই সমস্যা কিরূপে উত্তীর্ণ হইব? সকল বাঙ্গালীর সমক্ষেই এই সমস্যা উপস্থিত। এই অবস্থায় কেবল মৌলিক প্রতিভার উপরে নির্ভর করিতে যাওয়া, আর আকাশের আকস্মিক হাওয়ার প্রত্যাশায় উৎগ্রীব হইয়া থাকা একই কথা! কবে কোন দৈবানুগৃহীত ব্যক্তি আসিয়া আমাদের এই অভাব পূরণ করিয়া দিবেন—এইরূপ প্রত্যাশা দুরাশা বই নহে! * * *

এই ক্ষেত্রে আমরা বাঙ্গালী কেবল একটি মাত্র কার্য্য করিতে পারি, আমাদের ভাষাটীকে অন্ততঃ সমবেত চেষ্টায় অনুশীলন পূর্ব্বক তাহার শক্তি সামর্থ্য এবং যোগ্যতা প্রসারিত করিয়া উন্নত প্রতিভার সহজ-সিদ্ধ কর্ম্ম-ভূমিরূপে পরিণত করিতে পারি। এই সমবেত চেষ্টা-চর্চ্চা এবং সবল সহানুভূতির অভাবে আমাদের সাহিত্য নানাদিকে কাহিল থাকিয়া আসিয়াছে। * * * আমাদের একটা বিশেষ অভাব আছে; মনে হয়, উহাই বর্ত্তমান অবস্থায় বঙ্গসাহিত্যের প্রধান অভাব, সুতরাং এই সম্মিলনের পক্ষে বিশেষ ভাবেই চিন্তনীয়। সম্মিলিত চেষ্টা সহানুভূতি এবং অর্থ সাহায্য ব্যতীত, এই অভাব, বঙ্গীয় সাহিত্যসেবকগণের স্বতঃ-প্রণোদনা হইতে আরও একশত বৎসরে নিরাকৃত হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। * * * এখন পরিষদ্ অন্য দিকেও মনোযোগী হইতে পারেন। বলা বাহুল্য, তাহা অনুবাদ। সভ্যসাহিত্য সমূহের বিশিষ্ট ভাব এবং জ্ঞান সম্পত্তির যথাযথ অনুবাদ-গ্রন্থ আমাদের

ভাষায় একেবারে নাই। বঙ্গভাষার বর্ত্তমান শক্তি ইয়োরোপীয় সাধারণ ভাব-চিন্তার গ্রহণেও কিছুমাত্র যোগ্যতা দেখাইতে পারিতেছে না—এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর মন আপনাআপনি অগ্রগামী হইতেছে না; * * * কোনকালে হইবার সম্ভাবনাও নাই। আমাদের কবি প্রতিভাবান্ ব্যক্তিগণ নিজের হৃদয়ের আনন্দ-প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়াই চলিবার জন্য বাধ্য; * * * অপরাপর লেখকগণ, প্রায় সকলেই, দেশের প্রচলিত অভিরুচির পরিপোষণ করিয়াই চলিতেছেন। দেশের সাধারণ অভিরুচি কস্মিন্ কালেও অভিনবত্ব পছন্দ করে না। * * *

এই ক্ষেত্রে কতিপয় যোগ্য ব্যক্তি ব্রতবদ্ধ না হইলে, আপনাদের লেখনীকে সাধারণের রুচি-পরিচর্য্যা হইতে স্বাধীন করিয়া চালাইবার জন্য বদ্ধ-পরিকর না হইলে, উন্নত ভাব-চিন্তা কিংবা দেশ-বিদেশের উন্নত সাহিত্য-আদর্শকে কথায় কাযে (আপাততঃ অরুচিজনক ঔষধের স্বরূপেও) প্রয়োগ করিতে আরম্ভ না করিলে, আমাদের সাহিত্যের ধাত্ কখনো বিশ্ব-সাহিত্যের সমতা লাভ করা সম্ভাবনা নাই, এই কথা শতবার বলিব। * * * অনুবাদ করিতে—পরকীয় ভাষার ভাব এবং জ্ঞান-সম্পত্তিকে অক্ষুন্ন ভাবে ভাষান্তরিত করিতে হইলেও, এক শ্রেণীর প্রতিভার আবশ্যক। এই প্রতিভার উদ্বোধন এবং উদ্দীপনা করাই আমাদের সমবেত শক্তির কর্ত্তব্য হইবে। * * * পরম আবশ্যকীয় যাহা, পুনর্ব্বার বলিব, তাহা অনুবাদ—ইয়োরোপীয় সদ্গ্রন্থনিচয়ের প্রকৃত শক্তি বঙ্গভাষার মধ্যে গ্রহণ। এই বিষয়ে আপনাদের সমক্ষে স্বতন্ত্র প্রস্তাব উপস্থিত হইবে আশা করি; আমি এই পরিব্যাপক অভিযোগের উল্লেখ মাত্র করিয়াই নিবৃত্ত হইতেছি।"

মাতৃভাষার অকপট সেবক এবং পরিপোষক বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও বৈজ্ঞানিক সভার সভাপতির আসন হইতে এই "সংরক্ষণ-নীতি" অবলম্বন বিষয়ক প্রস্তাবেরই মর্ম্মকথা অতি স্পষ্টরূপে সকলকে শুনাইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালার বিজ্ঞান-সাহিত্যের অভাব দূর করিবার জন্য বিষয়টা আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য মাতৃভাষার প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:—

"ইংরাজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থাতে বিজ্ঞানশিক্ষার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এদেশের লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র দশ জন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করে। তাহাদের মধ্যেও বোধ হয় চারি আনা অর্থাৎ লাখের মধ্যে ২॥০ জনের বিজ্ঞানে বাধা থাকে না। কাজেই অবশিষ্ট অগণ্য লোকের পক্ষে বিজ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে যদি বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চ্চা হইত তাহা হইলে এতদিনে বিজ্ঞান-সম্বন্ধে কত ভাল ভাল পুস্তক লিখিত হইত। সেই সকল পুস্তকের সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ব্যতীত আরও অনেক লোকে বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে পারিত। * * * যদি ইংলণ্ডে সমুদয় বিজ্ঞান-চর্চ্চা জাপানীভাষায় হইত তাহা হইলে সেখানে কি ফ্যারাডে বা ডেভি জন্মিতে পারিত?

যাঁহারা ইংরাজী-ভাষার সাহায্যে হইয়া বিজ্ঞান শিক্ষা করেন তাঁহাদের ক্ষতি সামান্য নহে। * *

যে সকল ভারতীয় ছাত্রের বাল্যকাল ভাষা-শিক্ষাতেই অতিবাহিত হয়, পরবর্ত্তীকালে তাহারা মৌলিক গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হয় না। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, জাপানী ছাত্রগণকেও ত বিদেশীয় ভাষায় বিজ্ঞানাদি চর্চ্চা করিতে হয়। ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, জাপানীরা আজিও মৌলিক গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই আর জাপানীদের

বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা বাঙ্গালীদের ইংরাজী শিক্ষা অপেক্ষা অনেক সহজ। তাহারা ইংরাজী ভাষার উচ্চারণ ও Idiom এর বিশুদ্ধিরক্ষার জন্য আদৌ ব্যস্ত নহে। শুধু ইংরাজী ও জার্ম্মান ভাষায় লিখিত পুস্তক পড়িয়া তাহার অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করে। * * *

যদি সক্রেটিস, প্লেটো, এরিষ্টটল প্রভৃতি দার্শনিক-দিগের মতবাদ গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়া জানিতে হইত, তাহা হইলে ইউরোপের শিক্ষিত লোকের মধ্যে শতকরা কয়জন লোক সে দিকে অগ্রসর হইতেন? যদি হিব্রু শিখিয়া বাইবেল পড়িতে হইত তবে পৃথিবীর লক্ষ লোকের মধ্যে কয়জনমাত্র তদ্বিষয়ে সফলকাম হইতেন? আমাদের দেশেও যদি সংস্কৃত না পড়িয়া রামায়ণ ও মহাভারত পড়িবার সম্ভাবনা না থাকিত, তবে দেশের কি দারুণ দুর্গতিই না হইত। * * *

যাহা হউক, সম্প্রতি প্রকাশচন্দ্র সিংহ প্রণীত "তর্কবিজ্ঞান"কে আই, এ পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা-ভুক্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

পৃথিবীর অপরাপর জাতিগণ কি প্রকারে আপনাদের ভাষার উন্নতি বিধান করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমে রুশিয়ার কথা ধরা যাক। রুশিয়ার ভাষা অনার্য্য ভাষা; সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ আর্য্যভাষাসমূহের সহিত উহার কোনও সম্পর্ক নাই, সেই জন্য রুশিয়ার ভাষা শব্দসম্পদে বড়ই দীনা। বেশি দিনের কথা নহে, চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রুশিয়ানগণ মাতৃভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিতেন। তাঁহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফরাসী ভাষার ব্যবহার করিতেন এবং বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য প্রধানতঃ জার্ম্মান্ ভাষা অবলম্বন করিতেন। এমন কি মেণ্ডেলিয়েফ-প্রমুখ মনীষিবর্গ জার্ম্মান্ বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রিকায় আপনাদের গবেষণার ফলসমূহ প্রকাশিত করিতেন। কিন্তু তাঁহারা অল্পদিনের মধ্যেই হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, মাতৃভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান প্রচার না করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে না। এইজন্য মেণ্ডেলিয়েফ তাঁহার অমূল্য রসায়ন-শাস্ত্রের গ্রন্থ রুশিয়ান ভাষায় লিখিলেন। তাহার পর হইতে রুশিয়ান বৈজ্ঞানিক-গণ যাবতীয় মৌলিক গবেষণা মাতৃভাষায় প্রচার করিয়া আসিতেছেন।

এসিয়া খণ্ডে যে জাতি পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, আমাদের যে তাঁহাদের পথ অনুসরণ করা উচিত সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? জাপানী ভাষা এখনও সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই, সেই জন্য জাপানীরা উচ্চ অঙ্গের মৌলিক গবেষণা ইংরাজি ও জার্ম্মান ভাষায় প্রচার করেন; কিন্তু তাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষা, এমন কি কলেজের লেক্‌চার পর্য্যন্ত জাপানী ভাষায় দিতেছেন। জাপানীরা বেশ বুঝিয়াছেন যে, বিদেশীয় ভাষা অবলম্বন পূর্ব্বক বিজ্ঞানচর্চ্চা প্রথমতঃ অপরিহার্য্য বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেশীয় ভাষাতেই বিজ্ঞানচর্চ্চা সমধিক বাঞ্ছনীয়। আশার কথা, হাওয়া ফিরিয়াছে। * * *

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ধনকুবের এণ্ড্রু কার্ণেগি প্রদত্ত বৃত্তির সাহায্যে শত শত যুবক অনন্যমনাও অনন্যকর্ম্মা হইয়া বিজ্ঞান-সেবায় ও গবেষণায় ব্রতী হইয়াছেন। আমাদের দেশেও এইরূপ ব্যবস্থার বোধ হয় সময় আসিয়াছে।"

সাহিত্যক্ষেত্রে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন বিষয়ক প্রস্তাব দুই বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহের সাহিত্য-সম্মিলনে গৃহীত হইয়াছিল:—

"বঙ্গভাষার বিশেষ পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য সমুন্নত ভাষার ন্যায় তাহাকে উন্নত করিবার জন্য দেশের কৃতবিদ্য শক্তি-শালী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্বারা উপযুক্ত উপায়ে

বিবিধ শাস্ত্রের গ্রন্থাদি রচনা, সঙ্কলন ও অনুবাদ করাইবার নিমিত্ত একটি ধনভাণ্ডার স্থাপিত হউক।”

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্, এ; সমর্থক—মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর (কাশিমবাজার), শ্রীযুক্ত জলধর সেন (নদীয়া), সুরেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, (বরিশাল), দেবকুমার রায় চৌধুরী (বরিশাল)। অনুমোদক—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ, (কলিকাতা)।

ইতিমধ্যে ‘রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা-সমিতি’ কবিবর রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ বর্ষোৎসব উপলক্ষে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ এই সংরক্ষণ-নীতির উদ্দেশ্য অনুসারে বঙ্গভাষায় উচ্চ সাহিত্যের সৃষ্টির জন্য ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এবারকার সম্মিলনে একটা ‘সাহিত্য-সংরক্ষণ-ভাণ্ডার’ ও ‘সাহিত্য-সংরক্ষণ-সমিতি’ প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রস্তাবটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনে “সাহিত্য-সংরক্ষণ-নীতি” অবলম্বনের প্রস্তাব উত্থাপিত ও যথাযথ অনুমোদিত এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। সেই প্রস্তাব অনুসারে অনুবাদ প্রভৃতি দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের শক্তিবৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধনোদ্দেশ্যে “সাহিত্য-সংরক্ষণ ভাণ্ডার” নামে একটি ধন-ভাণ্ডার স্থাপিত হউক। বঙ্গের প্রত্যেক জেলা হইতেই ইহার জন্য তত্রত্য যোগ্য কৃতী ব্যক্তিগণের সাহায্য লইয়া অনুষ্ঠান আরব্ধ হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি, এল্ (চট্টগ্রাম)

সমর্থক— „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (কলিকাতা)

„ অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত এম্, এ, (বরিশাল)

অধ্যাপক— „ অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার এম্, এ, বি, এল্, (ফরিদপুর)

„ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, (বহরমপুর)

সাহিত্যসংরক্ষণভাণ্ডারের সদস্যগণ

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর (মুর্শিদাবাদ), ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু ও ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সারদাচরণ মিত্র, দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, দেবকুমার রায় চৌধুরী (বরিশাল), অধ্যাপক পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য (গৌহাটী), সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত (কলিকাতা), রমেশচন্দ্র মজুমদার (ঢাকা), প্রকাশচন্দ্র সিংহ (কুমিল্লা), বিপিনবিহারী চৌধুরী (ফরিদপুর), অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, অধ্যাপক বনমালী বেদান্ততীর্থ (বরিশাল), শশিকান্ত সেন (চট্টগ্রাম), অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্, এস্, সি, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এস্. সি, হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্,এ, অধ্যাপক অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্, এ, বি, এল্, শ্রীযুক্ত শশধর রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ (রাজসাহী), অধ্যাপক নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এস্, সি, শশাঙ্কমোহন সেন ও অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্, এ সম্পাদকদ্বয়।

‘সংরক্ষণ’শব্দটার অর্থ বুঝিতে গোল হইয়াছিল। এজন্য অধ্যাপক সরকার মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন। সংরক্ষণের অর্থ

কেবল মাত্র রক্ষা করা বা যাহা আছে তাহা বাঁচাইয়া রাখা, জমাইয়া রাখা, উদ্ধার করা বা সংস্কার করিয়া রাখা নহে। প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির মুদ্রণ ও প্রকাশ, পুরাতন কীর্ত্তির উদ্ধার বা সংস্কার—এই সংরক্ষণের অর্থ নহে। এই 'সংরক্ষণ'-শব্দটি ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সুপ্রচলিত protection-নীতির প্রতিশব্দ। অল্প সময়ের ভিতর ছোটকে বড় করিবার উপায়, অনুন্নতকে উন্নতিশীল করিবার প্রণালী, শিশুকে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট করিবার পন্থা, প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করিয়া নূতন অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানকে বড় হইবার সুযোগ দেওয়া এবং তদুপযোগী করা এই Protectionনীতি বা সংরক্ষণনীতির অঙ্গীভূত। যাহা নাই তাহা সৃষ্টি করা বা যাহা সামান্য ভাবে আছে তাহাকে বিশেষ ভাবে বাড়াইয়া তোলাই সংরক্ষকগণের উদ্দেশ্য। রাষ্ট্র, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য—ইত্যাদি রাষ্ট্রীয়, বৈষয়িক ও আর্থিক অনুষ্ঠানে এই নীতির ব্যবহার ন্যূনাধিক পরিমাণে পৃথিবীতে অহরহ চলিতেছে। যাঁহারাই স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে, নিরপেক্ষভাবে বসিয়া থাকিলে বা সমাজের স্বাভাবিক সৎপ্রয়াসের উপর নির্ভর করিলে, বা কোন একটা অনুষ্ঠানকে স্বাধীনভাবে বাড়িতে দিয়া দেখিতে থাকিলে কার্য্য প্রায়ই অগ্রসর হয় না। এই জন্য সমাজে 'সংরক্ষক' আবির্ভূত হ'ন। তাঁহারা দশজনকে নিজের মতে আনিয়া নিজের আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে কর্ম্ম করান। এজন্য সেই সংরক্ষকগণ সেই কর্ম্মীদিগের মানসম্ভ্রম, সুযোগসুবিধা, অন্ন-বস্ত্র, উপাধি, খেতাব ইত্যাদি নানাবিধ অভাব মোচন করিবার ব্যবস্থা করেন। তাহার ফলে একটা ছোট খাটো সমাজও অল্পকালের ভিতরেই জগতে প্রতিপত্তি লাভ করিতে থাকে।

আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য এখন এইরূপ ভাবা ও করা প্রয়োজন। বঙ্গভাষায় ১০।১২ বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই উচ্চ আদর্শ ও আকাঙ্খা প্রচার করা এবং নানা উপায়ে নানা স্থানে ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ছোট বড় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা এখন সকল সাহিত্য-সেবীরই এক মাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে চক্ষু রাখিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। স্বাধীনভাবে নিজ নিজ সৎপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা বা ঐতিহাসিকেরা যাহা যাহা করিতেছেন, কেবল সেইগুলি দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। এখন সংরক্ষকের প্রয়োজন—যাঁহারা দশজন সাহিত্যসেবীকে অন্য সকল কাজ ছাড়াইতে পারেন; এবং তাঁহাদের সকল উৎসাহও শক্তি বাঙ্গালাসাহিত্যের চরম উন্নতির জন্য নিয়োগ করাইতে পারেন। সাহিত্য ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য এইরূপ সংরক্ষণ নীতি অবলম্বিত হইলে, প্রথমতঃ বাঙ্গালী সাহিত্যসেবিগণ সাহিত্যসেবার নানাবিধ সুযোগ পাইবেন, দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের শক্তি, সময় ও সাধনা কতকগুলি বাজে কাজে বিক্ষিপ্ত না হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের জন্য 'সংরক্ষিত' হইতে পারিবে।

এবারকার সভাপতির অভিভাষণ, পরিশিষ্টাংশ বাদ দিলে, অনেক দিক্ হইতে অতীব

মূল্যবান্। জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ সরলস্বভাব অক্ষয়চন্দ্র, বঙ্কিম ভূদেব নবীনচন্দ্রের সাহিত্য-বন্ধু, রামেন্দ্রসুন্দর বিপিনচন্দ্রের সাহিত্যগুরু, আধুনিক নব্য সাহিত্যসেবিগণের পিতামহ-স্থানীয়। তাঁহার বক্তৃতায় প্রবীণের গাম্ভীর্য্য ও নবীনের ভাবুকতার অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছিল। নবীনেরা আজকাল যাহা ভাবিতেছে তিনি তাহাতেই সায় দিয়াছেন। নব্যবঙ্গের চিন্তা ও কর্ম্মরাশির প্রভাব কদমতলার মৌনী সাহিত্যাচার্য্যকেও আক্রমণ করিয়াছে। আশার কথা বটে। ইহার দ্বারা বঙ্গসমাজের সকল স্তরেই আদর্শের সমতা ও লক্ষ্যের ঐক্য বুঝিতে পারিতেছি। তবে অক্ষয়চন্দ্র অশ্বিনীকুমারের ন্যায় আবার যুবা হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে পারেন নাই। অশ্বিনীকুমার ঢাকায় যে বক্তৃতা পাঠ করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়—তিনি একজন কর্ম্মী, তিনি অনেকের মধ্যে একজন—তিনি দশজন কর্ম্মবীরের সঙ্গে একত্র যোগে কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন—কর্ম্মক্ষেত্র হইতে তিনি শীঘ্র বিদায় গ্রহণ করিবেন না, নব্য বঙ্গকে—উদীয়মান কর্ম্মিবৃন্দকে আরও বহুকাল তিনি সৎপথে পরিচালিত করিবেন। এজন্য তাঁহার অভিভাষণে দৃঢ়তা আছে—কর্ম্মপ্রণালীর সঙ্কেত-নির্দ্দেশে স্পষ্টতা আছে—বাধাবিঘ্ন দুর্যোগ অসুবিধা কাটাইয়া উঠিবার তেজ ও সাহস আছে। অক্ষয়চন্দ্রের অভিভাষণে সেই ভবিষ্যতে জ্বলন্ত বিশ্বাস, আত্মশক্তিতে প্রগাঢ় নির্ভরতা, কার্য্যোপযোগী পাণ্ডিত্য এবং জননায়কোচিত ভার বহন করিবার ক্ষমতা নাই।

তথাপি বলিব—অক্ষয়চন্দ্রের অভিভাষণ বাঙ্গালা-সাহিত্যে সবিশেষ আদৃত হইবার যোগ্য। অশ্বিনীকুমারের বক্তৃতা পাঠ করিলে সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিবেন—তাঁহার কথা এতই স্পষ্ট ও বিশদ।

তিনি বলিয়াছেন—"আমাদের কি এই আকাঙ্ক্ষা নহে যে পৃথিবীর জাতিপুঞ্জের মধ্যে আমরাও একটি জাতি বলিয়া পরিগণিত হইব? কিন্তু আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে হইলে আমাদের আত্মবিশ্বাস বৰ্দ্ধিত করিতে হইবে, আমাদের পরমুখাপেক্ষী থাকিলে চলিবে না। আমরা একটি জাতিতে পরিণত হইবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে বদ্ধপরিকর হইব। * * * বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমরা বঙ্গ-বিভাগ এবং স্বদেশী আন্দোলনে এমন শক্তির পরিচয় দিয়াছি যাহা জাতিগঠনেরই সহায়ক। আমরা দেখাইয়াছি, আমাদের মধ্যে—এই বাঙ্গালীর মধ্যে—জীবন আছে, শক্তি আছে, উদ্যম আছে। আমরা বুঝিতে পারিয়াছি ইচ্ছা করিলে আমরা আমাদের ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে পারিব। তাহার জন্য দেবতার সাহায্য আমাদিগকে ভিক্ষা করিতে হইবে না—আমাদের অন্তর-নিহিত দেবত্বকে জাগাইয়া তুলিলেই চলিবে। ইচ্ছাশক্তির বলেই আমরা সমস্ত সামর্থ্য একটি লক্ষ্যের দিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব। আমাদের গৌরব আছে—আমরা শ্রীচৈতন্য, রামপ্রসাদ, বিদ্যাসাগরের বংশধর। সেই জন্যই আমরা কিছু উচ্ছ্বাস-প্রবণ। এই উচ্ছ্বাসের মধ্যে এখন মাতৃভূমির প্রতি আমাদের অনুরাগের ক্ষীণ রেখা দেখা দিয়াছে। এই ইচ্ছাশক্তিকেই জাগাইতে হইবে। আমাদের পূর্ব্ব পিতামহদিগের অন্তর-বহ্নি আমাদের মধ্যে ধূমায়িত হইয়া

আছে। একবার তাহা আমরা জ্বালাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা ভস্মাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। আবার তাহাই আমাদিগকে জ্বালাইতে হইবে—জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে, নিবিতে দিলে চলিবে না। ইহারই উত্তাপে আমরা শৈত্য নিবারণ করিব—ইহারই প্রোজ্জ্বল শিখায় বহু বৎসরের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনারাশি ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। আসুন আমরা আবার আর একটি দীর্ঘ কর্ম্মে ব্রতী হই। কেহ কেহ বলেন আমাদের দেশহিতৈষিণী বৃত্তি এখন মন্দীভূত—আমরা বিগত কর্ম্মক্লান্তিতে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। আমি একথা কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করি না। শৃঙ্খলিত কোন বড় কার্য্যে আমরা এখনও হস্তক্ষেপ করি নাই বলিয়াই আমাদের অকর্ম্মণ্যতা অনুমিত হইতেছে। কিন্তু কার্য্য স্থির হইয়া গেলেই আমরা তাহা গ্রহণ করিব, আমরা তাহা পালন করিব। তখন সকলে দেখিবে আমাদের কার্য্যের ফল কত দূর সন্তোষজনক হইয়াছে।"

কিন্তু অক্ষয়চন্দ্রের বক্তৃতা বুঝিতে হইলে একটু ধীরতা ও চিন্তাশীলতা আবশ্যক। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন নাই। তিনি যে আমাদের পিতামহস্থানীয়—তাঁহার বয়সের চাপ যে তিনি অশ্বিনীকুমারের ন্যায় ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পরিতেছি। সোজা ভাবে ভিতরকার কথাটা বলিয়া ফেলিতে পারিলে প্রবন্ধ জমাট বাঁধিত—কিছু বাজে কথা কমান যাইত, লোকে সহজে বুঝিত—তিনি ধন্য হইতেন—বঙ্গসাহিত্যকে কতদিনে কোন দিকে কি উপায়ে কোথায় লইয়া যাইতে হইবে সে সব কথা সাহিত্যসেবিগণের হৃদয়ঙ্গম করিতে কোন গোল বাধিত না।

ইহার কারণ বলিতেছি। তাঁহার বক্তব্য সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতার আরম্ভকালে বলিয়াছেন "আমি বলিব সাহিত্য সম্বন্ধে, ভাষা সম্বন্ধে, আর আমার চিরদিনের কথা বাঙ্গালার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে"। এই ভাবে কথাটা একেবারেই শুষ্ক, নীরস, আবেগশূন্য সাহিত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় তিনি যদি গৌরচন্দ্রিকায় বলিতেন,—'আমি বলিব দেশের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে" তাহা হইলে সমস্ত বক্তৃতার মর্ম্মকথাটা বলা হইয়া যাইত, বক্তব্যের সকল অংশের মধ্যে একটা ঐক্য ও সামঞ্জস্য বুঝিতে কাহারও কষ্ট কল্পনা করিতে হইত না। কারণ তিনি সত্যসত্যই আগাগোড়া 'দেশের' কথা প্রচার করিয়াছেন—সমাজের 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠার' উপায় আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রাণের কথা, জীবনবত্তার কথা, সরস সজীবতার কথা, জীবনীশক্তিবিকাশের কথা বাঙ্গালাসাহিত্যে বড় বেশী নাই। এজন্যই আমরা অক্ষয়চন্দ্রের অভিভাষণকে এত আদর করিতেছি। এজন্যই আমরা সকলকে এই প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

আমরা ভারতবর্ষে এখন প্রাণের আলোচনা চাই। যাঁহারা হাতে কলমে কাজ করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধির উপায় বাহির করিতেছেন এবং যাঁহারা এই বিষয়ে প্রবন্ধগ্রন্থাদি লিখিয়া বাঙ্গালার বৈষয়িক সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহাদের কর্ম্ম ও চিন্তা প্রাণবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে পরিচালিত হউক। যাঁহারা দেশের অতীত ইতিহাস এবং

সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা প্রাণবিজ্ঞানের নিয়মগুলি আলোচনা করুন। ইতিহাস-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান প্রাণবিজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হউক। যাঁহারা দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য চেষ্টিত, তাঁহারা জীবনীশক্তির ক্রমবিকাশ এবং জীবনীশক্তির রূপপরিবর্ত্তনগুলি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে এবং তদনুসারে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করুন। আর যাঁহারা সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও ভাবুন কি উপায়ে সাহিত্য গড়িয়া উঠে—সাহিত্যের সঙ্গে কর্ম্মজীবনের কি সম্বন্ধ, সমাজ সাহিত্যকে কতটা নিয়মিত করে। মোট কথা প্রাণের নিয়ম, জীবনবত্তার লক্ষণ, প্রাণ-প্রতিষ্ঠার উপায়, এবং জীবনীশক্তি চালিবার প্রণালীগুলি এখন আমাদের সাহিত্যসেবী, শিল্পী, রাষ্ট্র-সেবক, ধর্ম্ম-প্রচারক, শিল্প-স্রষ্টা ইত্যাদি সকল প্রকার চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীরেরই একমাত্র আবশ্যক হইয়াছে। ইহাই আমাদের বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য।

দেশের অতীত প্রাণ সম্বন্ধে অক্ষয় বাবু বলিয়াছেন,—

"এক সময়ে ভারতবর্ষে ঋষিমুনিদের, ব্রাহ্মণদের প্রাণ ছিল। সেই প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে তাঁহারা দেবভাষায় মন্ত্রশক্তিবলে প্রাণের দেবতার সহিত সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন। এক সময়ে ক্ষত্রিয়ের প্রাণ ছিল। সূর্য্যচন্দ্রবংশীয়েরা সেই প্রাণের বলে পুরাণ ইতিহাসে অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন। এক সময়ে বৈশ্যের বা পণিকের বা বণিকের প্রাণ ছিল। তাঁহারা সমুদ্রপথে পোতারোহণে একদিকে সিনিসিয়া ও বিনিস্ অন্যদিকে যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বলি বর্ণীয়, চীন, জাপান—এমন কি কাহারও কাহারও মতে, সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত ভারতের বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু তে হি নো দিবসা গতাঃ। সে দিন আর নাই। * * *

"জঙ্গলে, বাঘে, রোগের পথে যখন দেশের জল বন্ধ হয় নাই, যখন দেশের ছোট বড় সকল লোকে পল্লীগ্রাম প্রিয়তর বলিয়া জানিত, নদীগুলি যখন ভরাট হইয়া উঠে নাই,—তখন দেশের যে অবস্থা ছিল, এখন তাহা মনে করিতে গেলেও চক্ষে জল আসে। তখন দেশে অন্ন ছিল,—দুই বেলা দুই মুঠা মোটাভাত সকলেই খাইতে পাইত; দেশে বিস্তর তন্তুবায় ও জোলা ছিল,—মোটা কাপড় সকলেই পরিতে পাইত। আর ছিল—যাত্রা গান, কবি, পাচালি, কথকতা; [illegible] কাশীদাসী পাঠ হইত। চণ্ডীর গান, পীরের গান গীত হইত, আর হইত পূজা, অর্চনা আরাধনা, আজান; মেলা-মহোৎসব নিত্যই হইত, পর্ব্বাদিতে হিন্দু মুসলমানের সমান উৎসাহ; সর্ব্বত্রই হাসিখুসি, গল্পগুজব, গান বাজনা। পূর্ব্বাঞ্চলে নদীর উপর সারিগান ও ভটিয়াল গান পদ্মার মত ভীষণ নদীর প্রবাহ ছাইয়া রাখিত। * * *

আর এখন?

"এখন দেশ অস্বাস্থ্যকর হওয়াতে ঐ সকল অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে; সে উদ্যোগ নাই, সে উৎসাহ নাই; সে প্রাণ নাই, সে স্ফূর্ত্তি নাই; সে প্রফুল্লতা নাই সে রস নাই—সে সব কিছুই নাই। আছে কেবল জ্ঞানের মায়া; বিজ্ঞানের ছায়া, সভার আড়ম্বর, আর বক্তৃতার বিড়ম্বনা; আছেন—উকীল, মোক্তার, কৌন্সিলি ও ডাক্তার। আর আছে বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজের সংবাদপত্র এবং ইংরাজের নকলে দেশের ইতিহাস। অতি বিনীতভাবে কাতরে জিজ্ঞাসা করি, ঐ সকল খোয়াইয়া, এই সকল ছায়া লইয়া কি বাঁচিয়া থাকা যায়? আপনারাই বলুন, এই জরাজীর্ণ দেহে এই বিষম চিন্তার দুর্ব্বহ ভার আর কতকাল বহন করিব?

* * * আপনারা অপূর্ব্ব বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবক। সাহিত্য-সেবার উপকরণস্বরূপ হৃদয়ে প্রফুল্লতা আবার আনিতেই হইবে, বাঙ্গালার স্বাস্থ্যোন্নতি করিতেই হইবে; আপনারা এই বিষয়ে বদ্ধপরিকর হউন, আমি আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করিয়া ভগবতী ভারতীর এই পীঠমধ্যে, তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিয়া আপনাদের জয়গান করি। প্রসীদ ভারতি! ভারত-সন্তানে। * * *

"ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পাঁচটির পাঁচটিতেই আমরা সাধারণ ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গবাসী নানারূপে বিড়ম্বিত। আমরা শুষ্ক মাটীতে বাস করিতে পাই না; স্নান, পান ও রন্ধনের জন্য পরিষ্কার জল পাই না; পল্লীগ্রাম সকল জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছে; কাজেই প্রচুর সূর্য্যালোক পাই না; মাটী পচায়, গাছ-পচায়, জল পচায়, পাট-পচায় বায়ু অনেক স্থানে বিষম দূষিত হইয়াছে—বিশুদ্ধ বায়ু আমরা সেবন করিতে পাই না; রোগগ্রস্ত, অন্নাভাবে শীর্ণ অকালে জীর্ণ কোটি কোটি নরনারীর আর্ত্তরবে আকাশ পর্য্যন্ত দূষিত হইয়াছে, শূন্যপ্রাণে শূন্যপানে চাহিয়াও আমারা সান্ত্বনা পাই না।"

সুতরাং এখনকার কর্ত্তব্য নানা উপায়ে দেশকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলা। "দেশে প্রাণ সঞ্চারিত করিতে হইলে প্রথমে দেশের পরিচয় জানা প্রয়োজন। আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের পরিচয় পাইয়া তাহার পর দেশের সাধারণ লোকের ভাষা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাহার পর সেই ভাষায় আপনাদের ভাষার শক্তি মিলাইতে পারিলে, তবে দেশে প্রাণ বাড়িবে, সঞ্জীবতা বাড়িবে।" অক্ষয় বাবু আজীবন সাহিত্যসেবী। সুতরাং তাঁহার ব্যবস্থায় ভাষা ও সাহিত্যের কথাই বেশী শুনিব। ভাষায় কি উপায়ে প্রাণ আসিবে তাহার আলোচনায় তিনি বলিয়াছেন—

"প্যারীচাঁদের গ্রন্থ-সমালোচনা অবসরে বঙ্কিমবাবু যাহা বলিয়াছেন, সেই কথাগুলি ব্যতীত আমি আর একটি কথা আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি:—সে কথাটি এই যে, ভাষায় তেজ, আবেগ, বল, জীবন প্রাণ আনিতে বা রাখিতে হইলে লিখিত ভাষায় কথিত ভাষার অধিকতর সংস্রব রাখিতে হইবে। সকল বিষয়েই আমরা প্রাণ হারাইতে বসিয়াছি, যদি ভাষায় বা সাহিত্যে একটু প্রাণ রাখিতে পারি বা আনিতে পারি, তাহা হইলেও আমরা ক্রমে সকল বিষয়েই প্রাণ পাইতে পারি। * * *

ভাষাও একটি জীবন্ত জিনিষ। কুম্ভকারের প্রতিমার মত বা গৌরীপুরের কলের মত গড়াপেটা পদার্থ নহে। ইহার প্রবাহ বুঝিতে হইবে, গতি বুঝিতে হইবে। স্রোতে স্রোত মিলাইয়া খাল কাটিয়া জল আনিতে পার ভালই, কিন্তু প্রবাহ একটানা গন্তব্য পথে যাইবেই, কোন খানেই দক্ষিণ-বাহিনীকে উত্তর বাহিনী করিতে পার না। পৃথক বঙ্গলিপি যদি বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেও ছিল এমন বোধ হয়, তাহা হইলে পৃথক ভাষা তখন ছিল না, মনে করিতে হইবে কি? না, এমন মনে করিতে হইবে যে, সে সময়ে অবশ্য একটী পৃথক বঙ্গভাষা ছিল। তা যদি থাকে, আমরা ত সহস্র বৎসর পূর্ব্বের বঙ্গভাষার নমুনা পাইয়াছি। প্রবাহ বুঝিবার মত আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান হইয়াছে। * * *

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, ভাষা একটি প্রবাহ। তাহার গতি আছে, বেগ আছে। তাহাতে আবর্ত্ত আছে, প্রপাত আছে; আবার প্রবাহের ধারে ধারে চড়া আছে, শস্য-শ্যামলা ভূমি আছে, কর্কশ কঠিন পর্ব্বতমালা আছে। ইহার জলরাশি কমে বাড়ে বটে, কিন্তু নিয়তই চলিতেছে—কখন কুলুকুলু রবে, কখন বা গভীর গর্জ্জনে। * * *

"প্রাণ নিম্নস্তরে; নিম্নস্তরের ভাষা আমাদিগকে লইতেই হইবে। লিখিত ভাষা যত কথিত ভাষার সহিত কাছাকাছি থাকিবে, তত লিখিত ভাষার জীবনী পাওয়া যাইবে। লিখিত ভাষা কথিত ভাষাকে যত দূরে ফেলিয়া রাখিবে, ততই আপনি জীবন হারাইবে, সংস্কৃত, ল্যাটীন, গ্রীকের মত হইবে, নানা গুণ থাকিলেও জীবন্মৃতবৎ পড়িয়া থাকিবে। এখনও যে সংস্কৃত ভাষার একটু একটু প্রাণ ধুক্ ধুক্ করে, সে কেবল দেবারাধনা কোথাও কোথাও একটু জীবিত আছে বলিয়া। ভাষাকে জীবন্ত রাখিতে হইলে, তাহা সাধারণের বোধগম্য করা আবশ্যক; আর ভাষাকে সুন্দর করিতে হইলে তাহাতে রস সংযোগ করা আবশ্যক। রসময়ী ভাষাই সাহিত্যের আধার।" * * *

"ভারতের প্রাণ—বাঙ্গালার ক্ষীণ প্রাণ—এখন কেবল শস্যোৎপাদক কৃষকের হস্তে। এইজন্য ইংরেজেরা বলেন, ভারতবাসী প্রধানতঃ কৃষিজীবী। ঠিক কথা। বিদ্যা সাহেবদের কাছে; ক্ষত্রিয়ত্ব গোরার আছে; কলকারখানা, রেলগাড়ী, ষ্টীমার—সকলই সাহেবদের কাছে। ভারতবাসীর কোন দিকে কিছু যদি উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা থাকে ত সে কেবল চাষে। চাষেই আমাদের প্রাণ বাঁচে, চাষেই আমাদের প্রাণ আছে। * *

"সে প্রাণে আড়ম্বর নাই, জয়ডঙ্কা নাই, সভা নাই, বক্তৃতা নাই, সম্মিলন নাই, আস্ফালন নাই—এ সকল কিছুই নাই, তবু প্রাণ আছে, উৎপন্ন করিবার শক্তি আছে; তোমার আমার কাহারও তাহা নাই। ম্লেচ্ছর্ষি জন্ ব্রাইটের মহদ্বাক্য স্মরণ করুন — A nation lives in the cottage কুটীরবাসীকে লইয়াই দেশ বা জাতি।

"ঐ কথা ইংলণ্ডের মনীষি-মুখে। যে ইংলণ্ড প্রতাপে অদ্বিতীয়, শৌর্য্যে বীর্য্যে অসামান্য, সেনা-সজ্জে রণতরীসাকল্যে জগতে দুর্দ্ধর্ষ—সেই ইংলণ্ডের জন ব্রাইট বলিতেছেন,—কুটীরবাসী লইয়াই দেশ। আর আমাদের উপরিস্তরে কিছুই নাই বলিলেও চলে, অথচ আমরা নিম্নস্তরের জীবন বুঝি না; যেখানে সমাজের প্রাণ, সেখানকার গৌরব বুঝি না। নিম্নস্তরকে অবহেলা করিলে দেশের প্রাণে অবহেলা করা হয়। নিম্নস্তরের ভাষায় অবহেলা অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা করিলে আমরা সকলেই প্রাণ হারাইব।"

আমাদের প্রাণ যে এখন নিম্নস্তরেই আছে—এ কথা নবীনেরা আজকাল মর্ম্মে মর্ম্মে অবগত আছেন। সমাজসেবকেরা এবং লোকশিক্ষা-প্রচারকেরা তাঁহাদের আরব্ধ কর্ম্মের অনুকূল একটা অভিনব যুক্তি পাইলেন। কারণ যাঁহারা ভাবুক—যাহারা সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারা বুঝিবেন—অক্ষয় বাবু নবভারতের লক্ষ্য-প্রচারক বিবেকানন্দের কথাই আর এক ভাষায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। নিম্ন-শ্রেণীর অধিকার ঘোষণ এত জোরের সহিত খুব কমই হইয়াছে। এজন্যই বলিতেছিলাম—নবীনে প্রবীণে জীবনের আদর্শ এক হইয়া-গিয়াছে। বঙ্গসমাজের সকলে এক কথাই ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যাচার্য্য সাহিত্যের আসর হইতে বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণকে দেশের মাটির দিকে তাকাইবার উপদেশ দিলেন। তাঁহার অভিভাষণের ইহাই বিশেষত্ব।

দেশে প্রাণপ্রতিষ্ঠার আর এক উপায় জাতীয় সাহিত্য। এসম্বন্ধে অক্ষয় বাবুর মত চির-প্রসিদ্ধ। 'সনাতনীর' গ্রন্থকার অভিভাষণেও হিন্দুর সনাতন আদর্শেরই প্রচার করিয়াছেন। কথাটা বহুদিন হইতেই প্রচলিত—কিন্তু এখনও বহুকাল প্রচার করিতে হইবে। "আমাদের দুর্দ্দশাই এই—আমরা দূরে পশ্চিম দিকে নিয়তই নয়ন নিক্ষেপ

করিয়া আছি, কখন আপনাদের দিকে, আপনাদের ঘরের দিকে, আপনাদের গৃহস্থালির দিকে, আপনাদের কাব্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি না। * * * প্রাচীন উচ্চ আদর্শ আমাদের সাহিত্যে রাখিতেই হইবে। পুরাণ ইতিহাসের আদর্শ যদি সমাজে না থাকে, সমাজের আদর্শ যদি সাহিত্যে প্রতিফলিত না হয়, তবে বিকৃত সাহিত্যের দোষে সমাজও বিকৃত হইবে। আমাদের গৃহস্থালির মধ্যে যে শান্তি, যে প্রীতি, দয়ামায়া, দেবভক্তি, আতিথ্য, গুরুজনে ভক্তি আছে, তাহা ক্রমে লুপ্ত হইবে—আমরা মনুষ্যত্ব হারাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইব।"

সুখের কথা—সম্প্রতি আমরা ঘরমুখো হইয়াছি—নিজেদের অতীতকে না ভুলিয়া বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য পালন করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। শিক্ষা, শিল্প, সমাজ, ধর্ম্ম—সকল বিষয়েই আমরা নিজেদের বিশেষত্ব ও জাতিগত পারম্পর্য্য রক্ষা করিতেছি। সুতরাং অক্ষয় বাবুর অরণ্যে রোদন হইবে না।

আমরা সাহিত্য-সম্মিলন লইয়া অনেকক্ষণ কাটাইলাম। আমাদিগকে এখন সাহিত্য লইয়াই থাকিতে হইবে। অক্ষয়চন্দ্রও অভিভাষণে তাহাই বলিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার যুক্তি সম্পূর্ণরূপে আমাদের যুক্তি নয়। তিনি সাহিত্য-জিনিষটাকে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। সেরূপ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আমরা সাহিত্যকে আবদ্ধ রাখি না। তবে তাঁহার সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে:—

"সাহিত্য ছাড়া আমাদের আর কি আছে বলুন? আমাদের প্রকৃত পুরাতন সনাতন সমাজ, অসাড়, অনড় নিষ্কম্প, বিরাট দেহে বিশাল বক্ষে ভর করিয়া ভূমি লইয়া পড়িয়াছে; আর সেই দেহের উপর তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে,—নাচিতেছেন—নীতি সংস্কারক, ধর্ম্মসংস্কারক, সমাজসংস্কারক। সংস্কার লইয়া সম্মিলন হয় না। ভাঙ্গার পর গড়া হইলে সংস্কার হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে আমরা ভাঙ্গিতে মজবুত, গঠনে অপটু। সুতরাং সংস্কারক সম্মিলন আমাদের মধ্যে হইতেই পারে না। রাজনীতির আলোচনা দিল্লী প্রভৃতি পীঠস্থান ছাড়া, নির্ব্বাচিত পুরোহিতগণ মধ্যে ব্যতীত সাধারণের পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ। তাহার পর বিজ্ঞান। আমাদের মধ্যে বিজ্ঞান-রত্ন আছেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক-সম্মিলনের সময় এখনও হয় নাই। আমাদের সাহিত্য-সম্মিলনের একচালার পরচালা হইয়া বিজ্ঞান গত বৎসর হইতে কথঞ্চিৎরূপে জীবন রক্ষা করিতেছে। সুতরাং এক সাহিত্য-সম্মিলনই আমাদের একমাত্র অবলম্বন।"

আশা করি, এই কথা গভীর ভাবে বুঝিয়া বাঙ্গালী সুধীগণ বঙ্গসমাজে সাহিত্যসেবার জন্য অসংখ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করিবেন; এবং নানা ভাবে বঙ্গজননীর বাণীমূর্ত্তির আরাধনায় ব্যাপৃত হইবেন:—

"তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।"

———০———

পরিশিষ্ট

তজ্জাতীয়ৈনরৈঃ সম্যগ্দাহাদ্যাঃ সকলাঃ ক্রিয়াঃ।
সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং বান্ধবো নৃপতির্যতঃ ॥ ২৩ ॥
এতাস্তে কথিতা বৎস নিত্যনৈমিত্তিকাস্তথা।
ক্রিয়াং শ্রাদ্ধাশ্রয়ামন্যাং নিত্যনৈমিত্তিকীং শৃণু ॥ ২৪ ॥
দর্শস্তত্র নিমিত্তং বৈ কালশ্চন্দ্রক্ষয়াত্মকঃ।
নিত্যতাং নিয়তঃ কালস্তস্যাং সংসূচয়ত্যথ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ঋতধ্বজচরিতে মদালসোপাখ্যানেঽলর্কানুশাসনে
শ্রাদ্ধকল্পো নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথবা জাতীয় জনে আনাইয়া যত্ন করি'
দাহাদি যতেক কার্য্য করা'বেন কৃপা করি'।
ইহাতে কারণ এই—শুন শুন বাছাধন,
সবার বান্ধব হন রাজ্যেশ্বর নারায়ণ। ২৩।
এই ত বলিনু বৎস নিত্য, নৈমিত্তিক আর
শ্রাদ্ধ-আদি কার্য্য সব, নিত্য-নৈমিত্তিক সার।২৪।

দর্শকাল ইথে নিমিত্ত নিশ্চয়
চন্দ্রক্ষয়াত্মক কাল সেই হয়।
কার্য্যের নিত্যতা শাস্ত্রকারগণ
বিশেষ করিয়া করিলা বর্ণন;
এই সে কারণে, শাস্ত্রে ইহা কয়,
নিত্যনৈমিত্তিক জেনো সুনিশ্চয়। ২৫।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে, ঋতধ্বজচরিতান্তর্গত মদালসা-উপাখ্যানে
অলর্কের প্রতি শ্রাদ্ধকল্প কথন নামক ত্রিংশ অধ্যায়।

একত্রিংশোঽধ্যায়।

মদালসোবাচ।

সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং পিতুর্যঃ প্রপিতামহঃ।
স তু লেপভুজো যাতি প্রলুপ্তঃ পিতৃপিণ্ডতঃ॥ ১॥
তেষামন্যশ্চতুর্থো যঃ পুত্রলেপভুজান্নভুক্।
সোঽপি সম্বন্ধতো হীনমুপভোগং প্রপদ্যতে॥ ২॥
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
পিণ্ডসম্বন্ধিনোহ্যেতে বিজ্ঞেয়াঃ পুরুষাস্ত্রয়ঃ॥ ৩॥
লেপসম্বন্ধিনোশ্চান্যে পিতামহপিতামহাৎ।
প্রভৃত্যুক্তাস্ত্রয়স্তেষাং যজমানশ্চ সপ্তমঃ॥ ৪॥
ইত্যেষ মুনিভিঃ প্রোক্তঃ সম্বন্ধঃ সাপ্তপৌরুষঃ।
যজমানাৎ প্রভৃত্যূর্দ্ধমনুলেপভুজস্তথা॥ ৫॥
ততোঽন্যে পূর্ব্বজাঃ সর্ব্বে যে চান্যে নরকৌকসঃ।
যে চ তির্য্যক্ত্বমাপন্না যে চ ভুতাদিসংস্থিতাঃ॥ ৬॥

মদালসা বলে—"বৎস, করহ শ্রবণ,
সপিণ্ডীকরণ কার্য্য হইলে সাধন,
পিতার প্রপিতামহ, তথা হ'তে আর
পিতৃগণ-পিণ্ডেতে না পান অধিকার;
তদবধি গণ্য তিনি লেপভোজিগণে,
গণনীয় নাহি হন পিণ্ডভোগী সনে। ১।
তাঁ'দের চতুর্থ স্থানে যেই জন হয়
পুত্রলেপভোজী তিনি নাহিক সংশয়,
সম্বন্ধহীনতাবশে সেই সব জন
উপভোগ মাত্র পান, শুন বাছাধন। ২।
পিতা, পিতামহ আর যেবা পিতা তাঁ'র
প্রপিতামহনামেতে গণন যাঁহার।
এ তিনের মাত্র পিণ্ডে সম্বন্ধ নিশ্চয়,
ত্রি-পুরুষ এ সবারে শাস্ত্রে সদা কয়। ৩।
পিতার প্রপিতামহ হ'তে তিন জন
লেপ-ভোজ্য-সম্বন্ধেতে সবার গমন;
এঁদের সপ্তম যিনি সেই গৃহীজন
যজমান শ্রাদ্ধ কর্ত্তা শুন বাছাধন। ৪।
যজমান হ'তে সপ্ত পুরুষের আগে
অনুলেপভোজী সবে হন শ্রাদ্ধভোগে।
এই মত মুনিগণ করিলা নির্ণয়
গৃহী পক্ষে সম্বন্ধ নির্ণয় এই হয়। ৫।
নিজ পূর্ব্ব পুরুষের—কিম্বা অন্য তরে—
নরকনিবাসী যা'রা দুঃখ ভোগ করে
তির্য্যকযোনীতে যেবা লভিল জনম,
কিম্বা ভূতযোনি লভি' করি'ছে ভ্রমণ। ৬।

তান্ সর্ব্বান্ যজমানো বৈ শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্ যথাবিধি
সমাপ্যায়য়তে বৎস যেন যেন শৃণুষ্ব তৎ ॥ ৭ ॥
অন্নপ্রকিরণং যত্তু মনুষ্যৈঃ ক্রিয়তে ভুবি ।
তেন তৃপ্তিমুপায়ান্তি যে পিশাচত্বমাগতাঃ ॥ ৮ ॥
যদম্বু স্নানবস্ত্রোত্থং ভূমৌ পততি পুত্রক ।
তেন যে তরুতাং প্রাপ্তাস্তেষাং তৃপ্তিঃ প্রজায়তে ।
যাস্তু গাত্রাম্বুকণিকাঃ পতন্তি ধরণীতলে ।
তাভিরাপ্যায়নং তেষাং যে দেবত্বং কুলে গতাঃ ॥ ১০
উদ্ধৃতেম্বথ পিণ্ডেষু যাশ্চান্নকণিকা ভুবি ।
তাভিরাপ্যায়নংতেষাং যে তির্য্যক্ত্বং কুলে গতাঃ ১১
যেবা দগ্ধাঃ কুলে বাল্যাঃ ক্রিয়াযোগ্যা হ্যসংস্কৃতাঃ
বিপন্নাস্তেঽন্ন-বিকির-সম্মার্জ্জনজলাশিনঃ ॥ ১২ ॥
ভুক্ত্বা চাচামতাং যচ্চ জলং যচ্চাঙ্ঘ্রিশোধনে ।
ব্রাহ্মণানাং তথৈবান্যে তেন তৃপ্তিং প্রয়ান্তি বৈ ১৩
পিশাচত্ব মনুপ্রাপ্তাঃ ক্রিমি কীটত্বমেব যো
এবং যো যজমানস্য যশ্চ তেষাং দ্বিজন্মনাম্ ।
কশ্চিজ্জলান্নবিক্ষেপঃ শুচিরুচ্ছিষ্ট এব বা ॥ ১৪ ।

যজমান শ্রাদ্ধ করি' এ সবার তরে
নিরন্তর যথাকালে আপ্যায়িত করে ।
যে রূপে সে কার্য্য হয় করিতে সাধন,
বিস্তার করিয়া বলি, শুন বাছাধন । ৭ ।
গৃহীগণ ভূমে করে অন্ন বিকীরণ,
তাহাতে হয়েন তৃপ্ত ভূতযোনিগণ । ৮ ।
বস্ত্র হ'তে পড়ে জল যেবা স্নান-পরে,
বৃক্ষযোনিপ্রাপ্ত তাহে তৃপ্তিলাভ করে । ৯ ।
বংশমধ্যে দেবত্ব লভিল যত জন
তাঁহাদের তৃপ্তি গাত্রজলে অনুক্ষণ । ১০ ।
পিণ্ড উত্তোলন কালে যে অন্ননিচয়
পড়ে ভূমে, তির্য্যকের তাহে তৃপ্তি হয় । ১১ ।

ক্রিয়াযোগ্য বাল্যে যা'রা অগ্নিদগ্ধ হ'য়ে
অসংস্কৃত গেছে চলি এ দেহ তাজিয়ে,
বিকীর্ণ অন্নেতে আর সম্মার্জ্জন জলে
তৃপ্তিলাভ ক'রে তা'রা শ্রাদ্ধ কাল হ'লে । ১২
আহারান্তে আচমন কালে সেই জল,
কিম্বা পাদধৌত করি', যেবা বিপ্রদল,
তাহে তৃপ্তিলাভ করে অন্য প্রাণিগণ,
বিশেষ বলিনু এই রাখিহ স্মরণ । ১৩ ।
শুন, বৎস, এ বিধি আশ্রয়ে যেই জন
শ্রাদ্ধকার্য্য যথাকালে করেন সাধন
সেই যজমানের অথবা ব্রাহ্মণের
পরিত্যক্ত অন্ন জল মহা-আনন্দের,

তেনান্যে তৎকুলে তত্র তত্তদ্‌যোন্যন্তরং গতাঃ।
প্রয়ান্ত্যাপ্যায়নং বৎস সম্যক্ শ্রাদ্ধক্রিয়াবতাম্ ॥ ১৫
অন্যায়োপাৰ্জ্জিতৈরর্থৈর্যচ্ছ্রাদ্ধং ক্রিয়তে নরৈঃ।
তৃপ্যন্তে তেন চাণ্ডাল-পুক্কসাদ্যাসু যোনিষু ॥ ১৬ ॥
এবমাপ্যায়নং বৎস বৎস বহূনামিহ বান্ধবৈঃ।
শ্রাদ্ধং কুর্ব্বদ্ভিরন্নাম্বু-বিন্দুক্ষেপেণ জায়তে ॥ ১৭।
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধং নরো ভক্ত্যা শাকৈরপি যথাবিধি।
কুর্ব্বীত কুর্ব্বতঃ শ্রাদ্ধং কুলে কশ্চিন্ন সীদতি ॥ ১৮ ॥
তস্য কালানহং বক্ষে নিত্যনৈমিত্তিকাত্মকান্।
বিধিনা যেন চ নরৈঃ ক্রিয়তে তন্নিবোধ মে ॥ ১৯ ॥
কার্য্যং শ্রাদ্ধমমাবাস্যাং মাসি মাস্যুড়ুপক্ষয়ে।
তথাষ্টকাস্বপ্যবশ্যমিচ্ছাকালং নিবোধ মে ॥ ২০ ॥
বিশিষ্ঠব্রাহ্মণপ্রাপ্তৌ সূর্য্যেন্দুগ্রহণেঽয়নে।
বিষুবে রবিসংক্রান্তৌ ব্যতীপাতে চ পুত্রক ॥ ২১ ॥

পিশাচত্ব প্রাপ্ত কিম্বা ক্রিমিকীট আর,
যে যে হীন যোনিতে জনম হৈল যা'র,
যোন্যন্তরপ্রাপ্ত যত পূর্ব্বপিতৃগণ
আনন্দে সে অন্ন জল করেন গ্রহণ। ১৪-১৫।
যদি অন্যায়েতে অর্থ করি উপার্জ্জন
সেই অর্থে করে শ্রাদ্ধ কোন গৃহীজন,
চণ্ডাল-পুক্কসযোনি হয়েছে যাহার
তৃপ্ত হয় হেন পিতৃগণ যে তাহার। ১৬।
শুন, বৎস, শ্রাদ্ধ-অন্তে জল বিন্দু আর
অন্ন ত্যাগ করে লোকে,—বান্ধব তাহার,
সেই অন্ন জল বিন্দু করিয়া গ্রহণ
তৃপ্তিলাভ করে বহু পূর্ব্বপিতৃগণ। ১৭।
এই হেতু নরে সদা শ্রদ্ধাযুক্ত হ'য়ে
শ্রাদ্ধ করে অন্ততঃ সামান্য শাক ল'য়ে;
সেই শ্রাদ্ধ ফলে সেই বংশজাত জন
অবসন্ন-ভাব নাহি লভেন কখন। ১৮।
এবে বলি, শুন, বৎস, হ'য়ে একমন
নিত্য নৈমিত্তিক কাল, শ্রাদ্ধের যেমন।
কর্ত্তব্য সে শ্রাদ্ধ যেই বিধি অনুসারে
বিস্তারিয়া সেই সব বলিব তোমারে। ১৯।
চন্দ্রক্ষয়রূপা অমা লভিবে যখন
বিধিমতে শ্রাদ্ধ কার্য্য উচিত তখন।
পৌষাদির কৃষ্ণাষ্টমী শ্রাদ্ধ যোগ্য কাল,
অষ্টকায় শ্রাদ্ধ কৈলে না রহে জঞ্জাল। ২০।
এবে "ইচ্ছাকাল" বৎস, করিব বর্ণন,
বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ প্রাপ্তে, পাইলে গ্রহণ
অয়নে,* বিষুবে† সর্ব্ব রবি সংক্রমণে‡
ব্যতীপাতে শ্রাদ্ধ কর আনন্দিত মনে। ২১।

* উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ সংক্রান্তিতে। † মহাবিষুব ও জল বিষুব সংক্রান্তিতে। ‡ অন্যান্য সংক্রান্তিতেও।

শ্রাদ্ধার্হদ্রব্যসম্প্রাপ্তৌ তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে।
জন্মর্ক্ষগ্রহপীড়াসু শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত চেচ্ছয়া ॥ ২২
বিশিষ্টঃ শ্রোত্রিয়ো যোগী বেদবিজ্জ্যেষ্ঠসামগঃ
ত্রিণাচিকেতস্ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ ॥ ২৩ ॥
দৌহিত্র ঋত্বিগ্‌জামাতৃ-স্বস্রীয়াঃ শ্বশুরস্তথা।
পঞ্চাগ্নিকর্ম্মনিষ্ঠশ্চ তপোনিষ্ঠোঽথ মাতুলঃ ॥ ২৪
মাতাপিতৃপরশ্চৈব শিষ্যসম্বন্ধিবান্ধবাঃ।
এতে দ্বিজোত্তমাঃ শ্রাদ্ধে সমস্তাঃ কেতনক্ষমাঃ ॥ ২৫
অবকীর্ণী তথা রোগী ন্যূনাঙ্গস্তথাধিকাঙ্গকঃ।
পৌনর্ভবস্তথা কাণঃ কুণ্ডো গোলোঽথ পুত্রকঃ
মিত্রধ্রুক্ কুনখী ক্লীবঃ শ্যাবদন্তো নিরাকৃতিঃ।
অভিশস্তস্তু তাতেন পিশুনঃ সোমবিক্রয়ী ॥ ২৭

শ্রাদ্ধযোগ্য দ্রব্য প্রাপ্তি ঘটে যে সময়,
তখনি শ্রাদ্ধ করিতে উপযুক্ত হয়।
দুঃস্বপ্ন দর্শনে কিম্বা গ্রহ তপ্ত * হ'লে
গ্রহপীড়া কালে শ্রাদ্ধ করিবে সকলে। ২২।
বিশিষ্ট স্বভাবযুক্ত, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ,
যোগী, বেদবিৎ, জ্যেষ্ঠ সামগ যে জন,
নচিকেতা উক্ত উপনিষৎ-ত্রিতয়
পাঠ-উপাসনা যাঁ'র নিত্য কার্য্য হয়।
ত্রিমধু, সে ত্রিসুপর্ণ, ষড়ঙ্গে পণ্ডিত,
দৌহিত্র, ঋত্বিক আর জামাতা বিদিত,
ভগিনীর পুত্র আর শ্বশুর যে জন,
পঞ্চ-অগ্নিকর্ম্ম-নিষ্ঠ যেবা সুব্রাহ্মণ,
তপোনিষ্ঠ যেই জন, মাতুল সে আর,
পিতৃমাতৃভক্ত যেবা শাস্ত্র-শিষ্ট সার,
শিষ্য আর সম্বন্ধি বান্ধব যত জন
হেন দ্বিজোত্তমে কর শ্রাদ্ধেতে পূজন। ২৩-২৫
অবকীর্ণী যেবা ব্রহ্ম-চর্য্য-আদিশূন্য
হেন জনে শ্রাদ্ধে কভু না করিবে গণ্য।
রুগ্নদেহ কিম্বা হীন-অঙ্গ-যুক্ত হয়
অথবা অধিক-অঙ্গযুক্ত গণ্য নয়।
পৌনর্ভব, কাণ, কুণ্ডো, গোলক যে জন,
হেন জনে শ্রাদ্ধে নাহি করো আবাহন। ২৬।
মিত্রদ্রোহী, কুনখী, সে ক্লীব যেবা আর,
শ্যাবদন্ত, নিরাকৃতি, ত্যজ্য মধ্যে সার।
পিতৃঅভিশপ্ত কিম্বা পিশুন যে জন
সোমবিক্রয়ীরে বৎস করিবে বর্জন। ২৭।

* জন্মাদি নাড়ীচক্র কোনও গ্রহ উপতাপিত হইলে

কন্যাদূষয়িতা বৈদ্যো গুরুপিত্রোস্তথোজ্ঝকঃ।
ভৃতকাধ্যাপকোঽমিত্রঃ পরপূর্ব্বাপতিস্তথা ॥ ২৮ ॥
বেদোজ্ঝোঽথাগ্নিসন্ত্যাগী বৃষলীপতি দূষিতঃ।
তথান্যেচ বিকর্ম্মস্থা বর্জ্জ্যাঃ পিত্রেষু বৈ দ্বিজাঃ ॥ ২৯ ॥
নিমন্ত্রয়েত পূর্ব্বেদ্যু পূর্ব্বোক্তান্ দ্বিজসত্তমান্।
দৈবে নিয়োগে পিত্র্যে চ তাংস্তথৈবোপকল্পয়েৎ ॥ ৩০ ॥
তৈশ্চ সংযমিভির্ভাব্যং যশ্চ শ্রাদ্ধং করিষ্যতি।
শ্রাদ্ধং দত্ত্বা চ ভুক্ত্বা চ মৈথুনং যোঽনুগচ্ছতি।
পিতরস্তু তয়োর্মাসং তস্মিন্ রেতসি শেরতে ॥ ৩১ ॥
গত্বা চ যোষিতং শ্রাদ্ধে যোভুঙ্ক্তে যশ্চ গচ্ছতি।
রেতোমুত্রকৃতাহারাস্তন্মাসং পিতরস্তয়োঃ ॥ ৩২ ॥
তস্মাত্তু প্রথমং কার্য্যং প্রাজ্ঞেনোপনিমন্ত্রণম্।
অপ্রাপ্তৌ তদ্দিনে চাপি বর্জ্জ্যা যোষিৎপ্রসঙ্গিনঃ ॥ ৩৩ ॥
ভিক্ষার্থমাগতান্ বাপি কালে সংযমিনো যতীন্।
ভোজয়েৎপ্রণিপাতাদ্যৈঃ প্রসাদ্য যতমানসঃ ॥ ৩৪ ॥

কন্যাদূষয়িতা, বৈদ্যব্যবসায়ী আর
গুরুপিতৃ-ত্যাগী যেবা পাষণ্ডের সার;
বেতন লইয়া যে করায় অধ্যাপন
মিত্রহীন, অন্যপূর্ব্বা যে করে গ্রহণ। ২৮।
বেদত্যাগী, অগ্নিত্যাগী, বৃষালীর পতি,
দূষিত, বিকর্ম্মী জন শ্রাদ্ধে ত্যজ্য অতি।
পিত্র্যকর্ম্মে হেন বিপ্রে না কর গণন,
নিশ্চয় জানিও এই শাস্ত্রের বচন। ২৯।
পূর্ব্বদিনে যোগ্যবিপ্রে কর নিমন্ত্রণ,
দৈবে, পৈত্রে, সর্ব্ব কার্য্যে তাঁ'রাই ব্রাহ্মণ।৩০।
করিবেন শ্রাদ্ধ কার্য্য যেই যজমান,
উচিত সংযত ভাবে তাঁর অবস্থান।
শ্রাদ্ধ কার্য্য করি, করি শ্রাদ্ধেতে ভোজন,
কদাপি না করিবেক রমণী-গমন,
এ হেন অকর্ম্ম করে যেই দুরাচার,
এক মাস শুক্রশায়ী রহে পিতৃ তা'র। ৩১
নারী-সঙ্গ করি করে শ্রাদ্ধ যেই জন
কিম্বা যেই জন করে শ্রাদ্ধেতে ভোজন,
এক মাস পিতৃগণ, তাহা সবাকার
রেত-মূত্র নিরন্তর করেন আহার। ৩২।
নিমন্ত্রণ, পূর্ব্ব দিনে এই সেকারণে
কর্ত্তব্য বলিয়া বৎস, রেখো সদা মনে।
একান্ত তদ্দিনে যদি না মিলে ব্রাহ্মণ
তথাপি যোষিৎ-সঙ্গী না কর গ্রহণ। ৩৩।
ভিক্ষার্থ-আগত সুসংযত যতিগণে,
গ্রহণ করিবে, বৎস, শ্রাদ্ধের ভোজনে
প্রণিপাত করিয়া প্রসন্ন সে সবায়
করিয়া, শ্রাদ্ধান্ন দিতে সতত জুয়ায়। ৩৪।

যথৈব শুক্লপক্ষাদ্বৈ পিতৃণামসিতঃ প্রিয়ঃ।
তথাপরাহ্লঃ পূর্ব্বাহ্লাৎ পিতৃণামতিরিচ্যতে ॥ ৩৫ ॥
সম্পূজ্য স্বাগতেনৈতানভ্যুপেতান্ গৃহে দ্বিজান্।
পবিত্রপাণিরাচান্তানাসনেষুপবেশয়েৎ ॥ ৩৬ ॥
পিতৃণাময়ুজঃ কুর্য্যাদ্‌যুগ্মান্ দৈবে দ্বিজোত্তমান্।
একৈকং বা পিতৃণাঞ্চ দেবানাঞ্চ স্বশক্তিতঃ ॥ ৩৭ ॥
তথা মাতামহানাঞ্চ তুল্যং বা বৈশ্বদৈবিকম্।
পৃথক্ তয়োস্তথা চান্যে কেচিদিচ্ছন্তি মানবাঃ ॥ ৩৮
প্রাঙ্মুখান্ দৈবসঙ্কল্পান্ পৈত্রান্ কুর্য্যাদুদঙ্মুখান্।
তথা মাতামহানাঞ্চ বিধিরুক্তো মনীষিভিঃ ॥ ৩৯ ॥
বিষ্টরার্থে কুশান্ দত্ত্বা সংপূজ্যার্ঘ্যাদিনা বুধঃ।
পবিত্রকাদি বৈ দত্ত্বা তেভ্যোঽনুজ্ঞামবাপ্য চ ॥ ৪০ ।
কুর্য্যাদাবাহনং প্রাজ্ঞো দেবানাং মন্ত্রতো দ্বিজঃ।
যবাম্ভোভিস্তথা চার্ঘ্যং দত্ত্বা বৈ বৈশ্বদৈবিকম্ ॥ ৪১ ॥

শুক্ল হ'তে কৃষ্ণ পক্ষ পিতৃগণ-*প্রিয়
পূর্ব্বাহ্ন ও অপরাহ্ন, শ্রেষ্ঠ সে দ্বিতীয়। ৩৫।
অভ্যাগত ব্রাহ্মণে স্বাগত প্রশ্ন করি',
পূজিবেন যথাশক্তি মোহ পরিহরি,
কুশ-পানি করি সবে বসায়ে আসনে,
করিবেন যোগ্য সেবা পরম যতনে। ৩৬।
পিতৃকার্য্যে করিবেন অযুগ্ম ব্রাহ্মণ,
দৈবকার্য্যে যোগ্য হয় যুগ্মের বরণ।
অশক্ত হইলে তাহে বিধি এই মত
সর্ব্ব কার্য্যে লবে এক দ্বিজ মনোমত। ৩৭।
মাতামহ পক্ষে বিধি ওইত প্রকার
অথবা সে বৈশ্বদেব বিধি তাহে সার।
ব্যবস্থা করেন তাহে কোন কোন জন
উভয়েতে ভিন্ন বিধি করি নিরূপণ। ৩৮।
দৈব কার্য্য পূর্ব্বমুখে সাধন উচিত
পৈত্র কার্য্যে উদঙ্মুখে করাই বিহিত;
মাতামহ কার্য্যপক্ষে সেই সে নিয়ম
মনীষীগণের মুখে শুনি এই ক্রম। ৩৯।
কুশা বিছাইয়া দিবে বিষ্টর + কারণে,
অর্ঘ দান অর্চ্চনা করিবে সযতনে।
পবিত্র প্রভৃতি পরে করি সমর্পণ,
ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞা করিবে গ্রহণ। ৪০।'
বিশ্বেদেবগণোদ্দেশে যব যুক্ত জল
অর্ঘরূপে দিবে—দিবে গন্ধপুষ্পদল,

* চন্দ্রমা পিতৃগণের আবাস স্থান। তথায় কৃষ্ণ পক্ষ দিবা ও শুক্লপক্ষ রাত্রি হয়। + আসন।

গন্ধমাল্যাম্বুধূপঞ্চ দত্ত্বা সম্যক্ সদীপকম্।
অপসব্যং পিতৃণাঞ্চ সর্ব্বমেবোপকল্পয়েৎ ॥ ৪২ ॥
দর্ভাংশ্চ দ্বিগুণান্ দত্ত্বা তেভ্যোঽনুজ্ঞামবাপ্য চ।
মন্ত্রপূর্ব্বং পিতৃণাঞ্চ কুর্য্যাদাবাহনং বুধঃ ॥ ৪৩ ॥
অপসব্যং তথা চার্ঘ্যং যবার্থঞ্চ তথা তিলৈঃ।
নিষ্পাদয়েন্মহাভাগ পিতৃণাং প্রীণনে রতঃ ॥ ৪৪ ॥
অগ্নৌ কার্য্যমনুজ্ঞাতঃ কুরুম্বেতি ততো দ্বিজৈঃ।
জুহুয়াদ্ব্যঞ্জনক্ষারবর্জ্জমন্নং যথাবিধি ॥ ৪৫ ॥
অগ্নয়ে কব্যবাহায় স্বাহেতি প্রথমাহুতিঃ।
সোমায় বৈ পিতৃমতে স্বাহেত্যন্যা তথা ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥
যমায় প্রেতপতয়ে স্বাহেতি ত্রিতয়াহুতিঃ।
হুতাবশিষ্টং দদ্যাচ্চ ভাজনেষু দ্বিজন্মনাম্ ॥ ৪৭ ॥
ভাজনালম্ভনং কৃত্বা দত্ত্বাচ্চান্নং যথাবিধি।
যথাসুখং জুষধ্বং ভো ইতি বাচ্যমনিষ্ঠুরম্ ॥ ৪৮ ॥

পরে যথামন্ত্রে যত্নে করি আবাহন
যথারীতি দেবগণে করিবে পূজন। ৪১।
গন্ধ মাল্য জল আর ধূপ দীপ দিয়া
অপসব্যে পিতৃগণে যতন করিয়া
পূজিবেন নিরন্তর এই তত্ত্ব সার
অপসব্য সর্ব্ব কর্ম্মে—যে বিধি যাহার। ৪২।
দ্বিগুণ অর্পিয়া দর্ভ অনুজ্ঞা লইয়া
পিতৃগণে আবাহন সমন্ত্রে করিয়া
অপসব্য ক্রমে অর্ঘ্য যব তিল আর
পিতৃ-প্রীতি-তরে দিবে এই বিধি তার।৪৩-৪৪।
"অগ্নিকার্য্য কর" আজ্ঞা দিলে বিপ্রগণ
যথাবিধি করিবেক আহুতি অর্পণ।

ব্যঞ্জন-বিহীন, ক্ষারযোগহীন আর
হেন অন্ন হোমেতে প্রশস্ত জেনো সার।
"অগ্নয়ে কব্যবাহায় স্বাহা" উচ্চারিয়া।
প্রথম আহুতি দিবে সংযত হইয়া।
"সোমায় বৈ পিতৃমতে স্বাহা" মন্ত্রে পরে
দ্বিতীয় আহুতি দান করিবে সত্বরে।
"যমায় প্রেতপতয়ে স্বাহা" মন্ত্র সনে
তৃতীয় আহুতি দিবে সুসংযত মনে।
হুত অবশেষ যেবা ভাজনেতে রয়
ব্রাহ্মণ ভাজনে দিবে কহিনু নিশ্চয়। ৪৫ ৪৭।
"যথাসুখং জুষধ্বং ভো" এই বাক্য বলি'
মিষ্টভাষে আহ্বানিবে হয়ে কৃতাঞ্জলি। ৪৮।

দশভুজা মূর্ত্তি
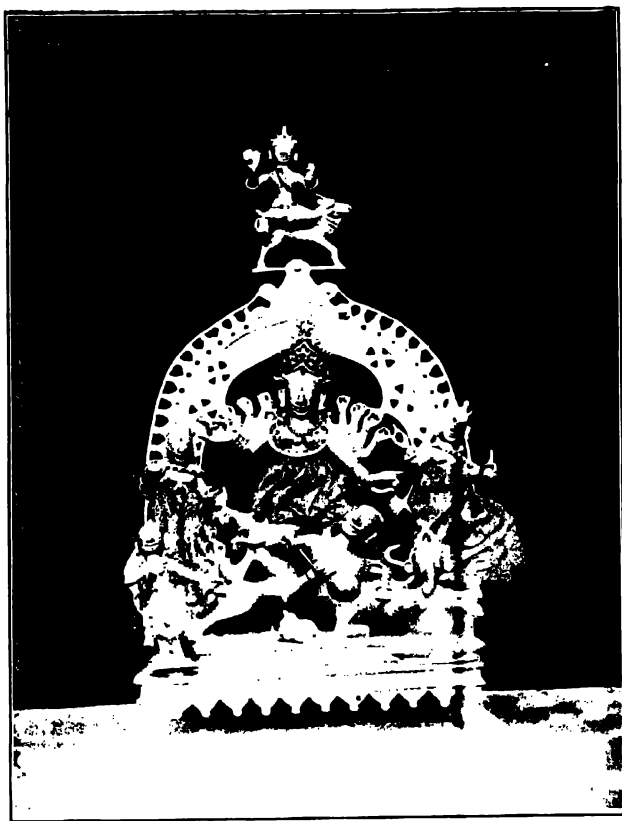
চক্রশালা ছনহরা গ্রামের অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রাজচন্দ্র দত্তের বাটীতে এই দত্ত-বংশের পূর্ব্বপুরুষ ভায়া সীতারামের প্রতিষ্ঠিত। । ভায়া সীতারাম (নায়েব) নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর আমলে চট্টগ্রামের দেওয়ান মহাসিংহের নায়েব ছিলেন—১৭৫০—৬০।

India Press, Calcutta.

"যে দিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কামধর্ম্ম একত্রিত হইবে, সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে, তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না। তোমরা ভারতবাসী, তোমরা করিলেই হইবে। দুই-ই তোমাদের হাতে। এখন ইচ্ছা করিলে তোমরাই পৃথিবীর কর্ত্তা ও নেতা হইতে পার। সে আশা যদি তোমাদের না থাকে তবে বৃথায় আমি বকিয়া মরিতেছি।"

বঙ্কিমচন্দ্র

৪র্থ খণ্ড
৪র্থ বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০

৮ম সংখ্যা

আলোচনা

১। দারিদ্র্যনিবারণের উপায়

আমরা দেখিতেছি—ক্রমশঃ আমরা আমাদের আর্থিক অবস্থার গোড়ার কথাটা ভুলিতে বসিয়াছি। আমাদের শিল্প নষ্ট হইয়াছে কেন? আমাদের ব্যবসায় লুপ্ত হইল কেন? আমাদের কৃষি আর বিশেষ লাভ-জনক নয় কেন? আমরা আমাদের অন্নাভাব ও বস্ত্রাভাব দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্যে ও দেশীয় শিল্পে মোচন করিতে পারিতেছি না কেন? আমাদের বৈষয়িক জীবন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে চলিয়াছে কেন?

আমরা একটা শিশু জাতি নহি। আমাদিগকে ওস্তাদি চালে নাবালক বলিয়া উড়াইয়া দিবার অধিকার কাহারই নাই, নিতান্ত নির্লজ্জ না হইলে পৃথিবীর কোন লোকই আমাদিগের মুরুব্বি সাজিয়া গায়ে হাত বুলাইতে পারেন না। হস্তপদবিশিষ্ট মানুষের যাহা যাহা থাকা সম্ভব, আমাদের সে সবই ছিল। সেগুলি এখন নাই কেন? ধন, সম্পদ, ঐশ্বর্য্যের চিহ্নমাত্র এখন দেখা যায় না কেন? দারিদ্র্যই আমাদের চিরসহায় রহিয়া যাইতেছে কেন?

আমাদের জননায়কগণ এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার বেশী চেষ্টা করেন না। আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিরা এজন্য ভাবিবারই সময় পান না। শিল্প সম্মিলন, শিল্প-প্রদর্শনী, সমবায়-ঋণদান-সমিতি, ব্যবসায়-শিক্ষা, ছাত্রগণকে বিদেশে প্রেরণ—ইত্যাদি কতকগুলি জগদ্বিখ্যাত ভাল জিনিষের মধ্যে যাহা কিছু হাতের কাছে আসে তাহাতেই সাময়িক উত্তেজনায় মাতিয়া যাওয়া আমাদের স্বভাব হইয়া পড়িতেছে। সব দিক ভাবিবার বা দূর ভবিষ্যৎ বুঝিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবার শক্তি আমাদের একেবারেই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বাহিরের লোকেরা একটা ধুঁয়া ধরাইতেছেন, আমরা অমনি তাহাতে তন্ময় হইয়া যোগ দিতেছি। এজন্যই দুঃখ করিতেছিলাম—বুঝি বা আমরা আমাদের স্বদেশের জাতীয় স্বার্থের প্রতি ক্রমশঃ অন্ধ হইয়া পড়ি।

পণ্ডিতেরা ধন-বিজ্ঞানের সূত্র আওড়াইয়া যাহাই বলুন না কেন, আমরা বলিব আমাদের আধুনিক দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণ এক। সেটি এই যে, বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যব্যাপারে আমরা সকল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী। আমরা চীন দেশে মাল পাঠাইব কি সুইজর্লণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্যসম্বন্ধ পাতাইব, তাহা আমাদের দেশীয় ব্যবসায়িগণ এবং মহাজনেরা নিজ নিজ প্রকৃত স্বার্থ বুঝিয়া স্থির করিতে পারেন না। আমরা ইংলণ্ড হইতে আমাদের অভাব মোচন করিবার জন্য দ্রব্য আমদানী করিব কি যবদ্বীপ হইতে জিনিষপত্র আনিব, তাহাও আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থা করিতে পারি না। কেবল আমদানী-রপ্তানীই নহে—সকল বিষয়েই ভারতবাসীর বৈষয়িক প্রচেষ্টাগুলি নানা ভাবে বাধাবিঘ্ন পাইয়া থাকে। সেই গুলি ছাড়াইয়া উঠিতে হইলে অমানুষিক শক্তির প্রয়োজন। সেরূপ অসাধ্যসাধন আমরা করিতে পারি নাই। এজন্যই আমাদের শিল্প-ব্যবসায়গুলি পর হস্তগত। এজন্যই আজ আমাদের কাপড় যোগাইতেছেন বিদেশের তাঁতীরা, ঔষধ দিতেছেন বিদেশের চিকিৎসকগণ, রেশম রঙাইতেছেন বিদেশের রংরেজেরা। এজন্যই আমাদের দেশে কৃষি ছাড়া আর কোন সম্বল নাই। আর যতটুকু কৃষিকার্য্য হয় তাহাতেও আমাদের জনগণের পেট ভরিবার জন্য শস্য উৎপন্ন হয় না। আমাদের কৃষকেরা বিদেশীয় শিল্পের জন্য "কাঁচা মাল" তৈয়ারী করে মাত্র। বিদেশীয় সমাজগুলির ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য ভারতবর্ষ একটা বারোয়ারী কৃষি-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ভারতবাসীর নিজের কোন লক্ষ্য নাই। বিদেশীয় সমাজসমূহ ভারতবাসীকে নানা ভাবে যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে।

সুতরাং বিদেশের বণিক্ সমাজগুলির আধিপত্য কমানই আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা বিদেশের তাঁতে কাপড় প্রস্তুত হইবার জন্যই এদেশে পাট প্রস্তুত করিব, ততদিন আমাদের আর্থিক উন্নতি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যতদিন আমরা বিদেশীয় ডাক্তারখানা ও ভৈষজ্যালয়গুলির ইঙ্গিতক্রমে আমাদের গাছগাছড়ার চাষ করিব ততদিন আমাদের পেট দু'বেলা না ভরিলেও ভরিতে পারে

এই আধিপত্য কি উপায়ে কাটাইয়া উঠা যায় তাহাই সকল দেশহিতেচ্ছুর একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। আমাদের অর্থ-শক্তি, ব্যবসায়-শক্তি ও শিল্প-নৈপুণ্য কি উপায়ে বিদেশীয় শিল্পী, ব্যবসায়ী এবং ধনকুবেরগণের প্রভাব হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনাই সকল সুধীজনের একমাত্র কর্ত্তব্য। ব্যাপার বড় সহজ নয়। বহুকালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী সমাজগুলি আমাদের দেশের নগণ্য পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের প্রভাব কমাইতে হইবে—তাহাদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে—তাহাদিগকে অস্বীকার করিয়া আমাদের বৈষয়িক প্রচেষ্টা-গুলি চালাইতে হইবে। অঘটন ঘটাইবার উপযুক্ত শক্তি না থাকিলে এ কার্য্য সাধিত হইবে না। সুতরাং সাধারণ ধন-বিজ্ঞানের নিয়মে আর এ সমস্যার কিনারা পাওয়া যাইবে না।

*
* *

২। তথাকথিত ধন-বিজ্ঞান

মামুলি ধন-বিজ্ঞানের নিয়ম দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় খাটে। অস্বাভাবিক অবস্থায়, ব্যাধির অবস্থায় অন্যবিধ নিয়ম-কানুনের আবশ্যক। ইংলণ্ডে, আমেরিকায় বা জার্ম্মাণিতে জনগণ এবং ধনপতিগণ অন্যান্য দেশের বাজারগুলি করতলগত করিবার জন্যই চেষ্টিত। পৃথিবীর কত অংশ ইঁহা-দের বাণিজ্যবশে আসিবে এই হিসাবই ইঁহাদের প্রধান হিসাব। আমাদের ত সর্ব্ব অঙ্গেই ঘা—আমরা নিজের অভাবই কোন মতে মোচন করিতে পারিতেছি না—দেশ-বিদেশের বাণিজ্য দখল করা ত দূরের কথা। আমরা চাই—কোন উপায়ে জীবন ধারণ করিতে, আত্মরক্ষা করিতে। আত্মরক্ষার ধন-বিজ্ঞান এক জিনিষ, দিগ্বিজয়ের ধন-বিজ্ঞান আর এক জিনিষ; তাহা কি আর বুঝাইয়া দিতে হইবে? কাজেই 'অবাধ বাণিজ্যে'র পক্ষে কয়টা অনুকূল কথা বলা যায়, সেগুলি আমরা শুনিয়া ও বুঝিয়া কার্য্যক্ষেত্রে বড় বেশী কিছু করিতে পারিব না। সমবায়-ঋণদানমণ্ডলী সৃষ্টি করিয়া জার্ম্মাণির রাইফিসন মহোদয় তাঁহাদের কৃষককুলের এবং শ্রমজীবিগণের রং ফিরাইয়া দিয়াছেন। তাহা জানিয়া আমরা কি করিব? কারণ তাঁহাদের চাষের উন্নতি করিয়া তাঁহারা স্বদেশের শিল্পকেই আত্মনির্ভর করিতেছে। নিজেদের অভাব ও অসম্পূর্ণতা বুঝিয়া সেগুলি নিবারণের জন্য কৃষি বল, শিল্প বল, ব্যবসায় বল,—সকল বিষয়ের যথোচিত ব্যবস্থা করিতেছে। অন্য কোন দেশকে বড় করিবার জন্য অথবা অন্য কোন সমাজের ঋণ শোধ করিবার জন্য তাহারা লাঙ্গল ধরে না, জমিতে উন্নত সার লাগায় না, দলবদ্ধভাবে কেনা বেচা করে না বা চরকা ব্যবহার করে না। কাজেই তাহাদের পণ্ডিতেরা ও চিন্তাশীল লোকেরা নিজ অবস্থার উপযোগী আর্থিক নিয়ম, শিল্পপ্রতিষ্ঠার নিয়ম, ধার দেওয়া ও ধার লওয়ার নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তোতাপাখীর মত সেগুলি মুখস্থ করিয়া মরি কেন? সেই নিয়মগুলিকে ঋগ্বেদের মন্ত্রস্বরূপ সকল ব্যাধি-নিবারণের একমাত্র ঔষধ মনে করি কেন?

আমরা যদি আমাদের ঘরের শিল্পের উন্নতি-

বিধানের জন্য কৃষি-ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে পারিতাম, তাহা হইলে কৃষকগণের জন্য এই সকল নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া তাহাদের রং বদলাইয়া ফেলিতে পারিতাম। ঘোড়াকে বেশী হৃষ্ট পুষ্ট না করিলে সে বেশী ভার বহিতে পারে না। এই জন্যই তাহার খোরাকের দিকে প্রভুর দৃষ্টি থাকে। ঘোড়ার তাহাতে সাময়িক স্বার্থ সিদ্ধ হইল বটে—কিন্তু অন্যান্য ভারবাহী জীবের সঙ্গে তাহার বিশেষ কোন জাতিগত পার্থক্য সৃষ্ট হইল না। আমরাও না হয় আমাদের দুচার ঘর কৃষককে অন্নবস্ত্রের সাহায্য করিয়া, অল্প সুদে টাকা ধার দিয়া, তাহাদের মহাজনের কবল হইতে রক্ষা করিয়া চায-আবাদের সহায় হইলাম। কিন্তু তাহাদের এই সাময়িক সুখভোগ এবং স্বচ্ছলতার চরম লক্ষ্য কি? আমরা এই উপায়ে প্রকৃতপক্ষে বিদেশীয় শিল্পেরই উন্নতিবিধানে সহায় হইতেছি, বিদেশীয় সমাজগুলিকেই অধিকতর সমৃদ্ধিশালী করিবার চেষ্টা করিতেছি।

এই জন্য জার্ম্মাণিতে যে নিয়মে সমাজে আশার কথা প্রচারিত হয় এবং জীবনবত্তার লক্ষণ দেখা যায় সেই নিয়মে আমাদের সমাজে বড় বেশী উন্নতি দেখা যায় না। কোন কোন অঙ্গে সাময়িক কিছু উপকার হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে স্থায়ী জীবন বিকাশের সুযোগ সৃষ্ট হয় না।

* *
*

৩। বৈষয়িক জীবনের গোড়ার কথা—সংরক্ষণ

এইরূপে অনেক তথাকথিত ভাল ব্যবস্থাও আমাদের প্রয়োজনানুসারে অনুকূল না হইতে পারে। লোকে যাহাকে সাধারণতঃ সস্তা বলে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের হিসাবে মহার্ঘ বিবেচিত হওয়া অসম্ভব নয়। কাজেই ধন-বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া আমাদের লাভ নাই। আমাদিগকে এখন অন্য বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হইতে হইবে। খাঁটি ধন-বিজ্ঞানের স্থান এ স্থলে বড় সঙ্কীর্ণ। হাতের তাঁত ভাল কি এঞ্জিন-পরিচালিত কলকারখানা ভাল, এ সব আলোচনা এখন বিদ্যালয়ের ডিবেটিং ক্লাবেই চলিতে থাকুক। শিল্প-প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা এবং যৌথ-ঋণদানমণ্ডলীর উপকারিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থিগণের মহলে আলোচিত হউক। ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ কি শিল্পপ্রধান দেশ,--ভারতবর্ষ বিদেশের নিকট অনেক ধন ধার লইয়াছে—এজন্য তাহাকে বহুকাল ধার শোধ করিবার জন্য আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বেশী করিতে হইবে—ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় প্রকৃত কর্ম্মীদের কার্য্য বেশী অগ্রসর হইবে না। মামুলি ধন-বিজ্ঞানের উপদেশে আমাদিগকে হতাশ করিয়া তুলিবে মাত্র। তবে আমাদের আর এক প্রকার ধন-বিজ্ঞানের প্রয়োজন আছে বটে—তাহা ব্যাধিগ্রস্ত, বিপদ্‌গ্রস্ত, সমাজের উদ্ধারোপযোগী ধন-বিজ্ঞান। সুতরাং ধন-বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মের উপর নির্ভর করিলে আমাদের চলিবে না। আমাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এখন অন্যবিধ নিয়ম পালন করিতে হইবে। সে সকল নিয়ম আর একটা বড় বিজ্ঞানের এলাকাধীন। ধন-বিজ্ঞানকে তাহার অন্যতম সহযোগিরূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে মাত্র।

সেটি শক্তি-বিজ্ঞান, প্রাণ-বিজ্ঞান, জাতি-বিজ্ঞান বা সমাজ-বিজ্ঞান। এখন আমাদিগকে কতকগুলি বনিয়াদি শক্তির স্থানে নূতন নূতন কতকগুলি শক্তির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমাদের বৈষয়িক কর্ম্মক্ষেত্রে অল্পমাত্র জীবনীশক্তির স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। তাহাকে তাহার প্রতিকূল শক্তিপুঞ্জের প্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া নানা উপায়ে জাগাইয়া ও বাড়াইয়া তুলিতে হইবে।

একটা ক্ষুদ্র স্বল্পপ্রাণ ব্যবসায়ী জাতিকে জগতের বৈষয়িক ক্ষেত্রে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার উপযুক্ত করিতে হইবে। সুতরাং এখন সকল প্রকার বিপক্ষ শক্তিসমূহ হইতে স্বদেশীয় কৃষি ও শিল্পের প্রাণ রক্ষা করা, আমাদের নিজ নিজ শক্তিগুলিকে বাড়াইবার জন্য যথাসম্ভব সুযোগ সৃষ্টি করা বিদেশীয় প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়া স্বকীয় বৈষয়িক জীবনের স্বাধীন বিকাশের জন্য পথ খুলিয়া দেওয়াই আমাদের শিল্প-প্রচারকগণের একমাত্র সাধনা হওয়া কর্ত্তব্য। ধন-বিজ্ঞান শিখিবার প্রয়োজন নাই। প্রাণ-প্রতিষ্ঠার নিয়ম আলোচনা করাই আমাদের একমাত্র শিক্ষণীয় বিষয়। ধনের কথা না ভাবিয়া প্রাণের কথা ভাব। তাহা হইলেই সকল কথা বিশদরূপে বুঝিতে পারিবে। ইহাই আমাদের গোড়ার কথা।

* *
*

৪। বিলাস-বর্জ্জন

আমাদের সন্দেহ এই যে, আমরা প্রাণের কথা এবং শক্তিবিকাশের কথা আজ কাল যেন কিছু কম আলোচনা করিতেছি। এজন্য আমাদের বৈষয়িক আন্দোলনের অভ্যন্তরে জীবন রক্ষা করিবার প্রণালী এবং শিল্প-সংরক্ষণ-নীতির কার্য্য কম হইতেছে। বিদেশীয় বণিক্‌সমাজগুলির আধিপত্য খর্ব্ব করা এবং স্বদেশীয় শিল্প ও ব্যবসায়গুলির জন্য নানাবিধ সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়ার কথা আমরা আজকাল যেন কিছু কিছু ভুলিয়া যাইতেছি। সংরক্ষণ-নীতির ভিতরকার কথাটা আমরা ভাল করিয়া বুঝি নাই মনে হইতেছে। কারণ যদি বিদেশীয় বণিক্-ও-শিল্পি-সমাজসমূহের একচেটিয়া প্রভাব হইতে স্বকীয় সমাজের প্রাণরক্ষা এবং স্বদেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের 'সংরক্ষণ' আমাদের ধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইত, তাহা হইলে এই সাত আট বৎসরে আমাদের জাতীয় চরিত্রে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ও উন্নতির লক্ষণ দেখিতে পাইতাম। যদি পুরা দমে শিল্প ও ব্যবসায়ের সংরক্ষণ-নীতি কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইতাম, তাহা হইলে অবুঝ হইয়া আমরা শীঘ্র শীঘ্র সুফলের আকাঙ্ক্ষায় ব্যগ্র হইয়া উঠিতাম না। যদি কোন মতে প্রাণে বাঁচিবার ইচ্ছা অত্যধিক মাত্রায় থাকিত, তাহা হইলে এই সর্ব্বনাশের সময়ে "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এই নিয়মানুসারে সংসারযাত্রায় বহু অনাবশ্যক অভাব বর্দ্ধন করিতে উৎসাহী হইতাম না।

যদি বিদেশীয় ব্যবসায়ী সমাজগুলির আধিপত্য সকল দিক হইতে বিধ্বস্ত করিতে প্রয়াস থাকিত, তাহা হইলে দূরদর্শী বিচক্ষণ গৃহস্থের ন্যায় কিছুকালের জন্য আমাদের অভাব ও বিলাসের মাত্রা যথেষ্ট কমাইতে পারিতাম। তাহা হইলে সামান্য দু একটা

লোভনীয় বস্ত্র ভোগ করিবার জন্য বিদেশীয় দ্রব্যভাণ্ডারগুলির শরণাপন্ন হইতে প্রবৃত্তি জন্মিত না। তাহা হইলে "মায়ের দেয়া মোটা কাপড়" পরিয়াই ভদ্রসমাজে বাহির হইতে লজ্জা বোধ করিতাম না; বরং তাহাতে এই বুঝিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতাম যে "দীন দুঃখিনী মা যে মোদের এর বেশী আর সাধ্য নাই।" তাহা হইলে নূতন নূতন আরব্ধ বহু শিশু শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি বাঁচিয়া যাইত। তাহা হইলে সকল বিষয়ে ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা, ভোগবাসনা বর্জ্জন এবং প্রকৃত বৈরাগ্যের লক্ষণগুলি চরিত্রের বিশেষত্ব হইয়া পড়িত। তাহা হইলে ভবিষ্যতের চরম উন্নতির ইচ্ছা প্রবল হইয়া বর্ত্তমানের নগণ্য আরম্ভের মধ্যে কর্ম্মিবৃন্দকে আনন্দিত করিয়া রাখিত। তাহা হইলে জনগণ স্থায়ী জাতিগত ইষ্টলাভের জন্য সাময়িক সুখভোগ এবং ব্যক্তিগত-স্বার্থ-সিদ্ধির প্রবৃত্তি জলাঞ্জলি দিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হইত।

অবশ্য আমাদের বৈষয়িক অনুষ্ঠানগুলি যে টুকু সফলতা লাভ করিয়াছে এইরূপ বৈরাগ্য এবং স্বার্থত্যাগের প্রবৃত্তিই তাহার কারণ। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু আমরা বিলাস-বর্জ্জন এবং অভাব-দমনের দিকে বিশেষ অগ্রসর হই নাই। বহু বিষয়ে ভোগের ইচ্ছা এখন কিছুকাল আমাদিগকে দমন করিয়া রাখিতে হইবে। ভাল পরা, ভাল খাওয়া, ভাল সাজা, ভাল আসবাবে ঘর ভরা এ সকল আদর্শ এখন সমাজ হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন—এ সব সৌখীন জিনিষ জোগাইবার ক্ষমতা এখন ভারতমাতার নাই। ভারতবর্ষের শিল্পে ও কৃষিতে এখন নানাবিধ উচ্চশ্রেণীর বিলাস-দ্রব্য তৈয়ারী হইতেই পারে না। সুতরাং যাঁহারাই এই সকল পদার্থ আবশ্যক মনে করিয়া তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন তাঁহারাই স্বদেশের শিল্প-ও-ব্যবসায়-জগতে "বাণের জল" ঢুকাইবার সাহায্য করিবেন, তাঁহারাই স্বসমাজের উন্নতি-সাপেক্ষ শিল্প-সংরক্ষণ-নীতির মূলে কুঠারাঘাত করিবেন।

প্রকৃত কথা এই যে—বৈদেশিক প্রভাব এড়াইতে হইলে নিজ নিজ ভোগের বাসনা আগে কমাইতে হইবে। আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির ফর্দ্দ ছোট না করিতে পারিলে আমাদিগকে বিদেশের শরণাপন্ন হইতেই হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় যতদিন অভাবের সংখ্যা অত্যধিক থাকিবে ততদিন আমাদিগকে পরমুখাপেক্ষী থাকিতেই হইবে। সুতরাং নানা উপায়ে অভাব কমাইবার জন্য এখন দেশে নৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করা আবশ্যক। যাঁহারা সমাজের সেবায় প্রবৃত্ত আছেন তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা এই ত্যাগের কথা, বিলাস-বর্জ্জনের কথা, অভাব কমাইবার কথা প্রচার করিতে হইবে। আমাদের জীবনে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আদর্শ স্থান না পাইলে আমরা সাংসারিক সুখভোগের ইচ্ছা দমন করিতে পারিব না। আর সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা না কমাইলে প্রতিকূল শক্তিগুলির হাত কোন মতেই এড়াইতে পারিব না। দেশকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়—বিলাস-বর্জ্জন ও অভাব-দমন। এই কথাটা যেন গোজামিল দিয়া না বুঝি।

অভাবের কথা কম ভাবানই সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'সর্ব্বমাত্মবশং সুখং' এবং 'সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্'—বৈষয়িক জগতের সংরক্ষণ-নীতি-প্রচারকদিগেরও ইহাই বাণী। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও মামুলি ধন-বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের উপকার-লাভের আশা বড় অল্প। আমাদের এখন প্রয়োজন নীতি-বিজ্ঞান বা ধর্ম্মবিজ্ঞান বা সহজ কথায় চরিত্র-বিজ্ঞান। চরিত্রের উন্নতিবিধান—হৃদয়ের আন্তরিকতা,—প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা—চিত্তের আত্মবশতা—এই সমুদয় এখন আমাদের আবশ্যক। এইরূপ চরিত্রগঠনই শিল্প-সংরক্ষণ-নীতির মূল মন্ত্র।

৫। স্বদেশী আন্দোলন

সুতরাং আমাদের প্রথম কথা—বিদেশীয় বৈষয়িক শক্তিপুঞ্জ হইতে আত্মরক্ষা। দ্বিতীয় কথা—এ জন্য অভাবের মাত্রা কিছু কমান। তৃতীয় কথা—তাহার জন্য উৎকট ভাবে দেশের দুঃখ বুঝিতে চেষ্টা করা।

অভাব কমাইবার কথা বলা হইল বটে, কিন্তু সকল অভাবই বর্জ্জন করা অসম্ভব। সুতরাং আমাদের চতুর্থ কথা—অত্যাবশ্যক অভাবগুলি দেশীয় কৃষি ও শিল্পের সাহায্যে পূরণ করা—অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলন।

লোকে বলে স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের শৈথিল্য জন্মিয়াছে। লোকে বলে আমরা হুজুগে পড়িয়া স্বদেশী করিয়াছিলাম। সেসকল কথায় কাণ দিবার আমাদের অবসর নাই। কারণ আমাদিগকে স্বদেশী আন্দোলনের পুষ্টির জন্যই যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে হইবে। এ কথাটা অনেকবার অনেক উপায়ে বলা হইয়াছে ও শুনান হইয়াছে। তদনুসারে কাজও যে কিছু হয় নাই তাহা নহে। বরং চারিদিকে বঙ্গদেশে এবং ভারতবর্ষে যে বিপুল বৈষয়িক জাগরণ দেখিতেছি, তাহা মূলতঃ স্বদেশী আন্দোলনেরই সৃষ্ট। তথাপি কথাটা নূতন অবস্থার উপযোগী করিয়া এখনও বহুকাল প্রচার করা কর্ত্তব্য। আমাদের সকল চেষ্টা এখন এই স্বদেশীর প্রতিষ্ঠা কল্পেই প্রয়োগ করিতে হইবে।

আমরা যেন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভুলিয়া না যাই। সাময়িক উত্তেজনার প্রভাবে আপাত মধুর অনেক জিনিসই ভাল বলিয়া বোধ হয়। অমঙ্গলও মঙ্গলের আকারে অনেক সময়ে আসিয়া দেখা দেয়। স্বদেশীর প্রচেষ্টায়ও অনেক অনর্থক বাক্‌বিতণ্ডা, অর্থের অপব্যয়, সময় ও পরিশ্রমের যথেষ্ট অপব্যবহার হইয়াছে ও হইতেছে। তাহা নিবারণ করিয়া দৃঢ়ভাবে স্বদেশী ব্রত উদ্যাপনের জন্য আমাদিগকে নিত্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বাজে কাজ এবং আনুষঙ্গিক ও গৌণলক্ষ্য-গুলি আসিয়া যেন আমাদের বৈষয়িক জীবনের ধ্রুবতারাকে মলিন করিয়া না ফেলে। তাহার জন্য আমাদিগকে লাজ-লজ্জার মাথা খাইয়া স্বদেশী মন্ত্র পুরাতন হইলেও সকলকে শুনাইতে হইবে। পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে আবার স্বদেশী-প্রচারক-গণের নানা ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে।

স্বদেশীর মূলমন্ত্রটা আমরা এখনও ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই। যখন দেখি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কৃষি-শিল্পের সংবাদ রাখিতে ঘৃণা বোধ করে, তখন বুঝিতে

পারি—স্বদেশী আন্দোলন দৃঢ়ভাবে আমাদের সমাজে বদ্ধমূল হয় নাই। যখন দেখিতে পাই বাঙ্গালার যুবকগণ একটা সামান্য কেতাবী শিক্ষার ফলাফলে অধীর হইয়া পড়ে, তখন বুঝিতে পারি প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য যে সাধনা, যে উৎসাহ আবশ্যক সে সাধনা ও উৎসাহের বিন্দুমাত্র তাহাদের হৃদয়ে বিকাশ লাভ করিতেছে না। যখন দেখি নূতন নূতন অনিশ্চিত পথে বিচরণ করিয়া অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে বাঙ্গালী ভয় পাইতেছে, তখন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারি যে বঙ্গসমাজের সকল স্তরে স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃত দীক্ষামন্ত্র সুবিস্তৃতি লাভ করে নাই।

দেশের অধিকসংখ্যক লোক চাকরী, মাষ্টারী, কেরাণীগিরি, উকীলী ছাড়িয়া দোকানদারীতে, কৃষিকর্ম্মে, গোষ্ঠ-প্রতিষ্ঠায় এবং গাছগাছড়ার ব্যবসায়ে লাগিতে আরম্ভ করিলে বুঝিতে পারিব দেশে স্বদেশী আন্দোলনের কাজ হইতেছে। বিদ্যালয়ের 'ফেল' হওয়া ছাত্রেরা যেদিন লেখাপড়ার অকৃতকার্য্যতায় হতাশ না হইয়া দেশের ভিতর নানাবিধ শিল্প, কৃষি ও ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান *সৃষ্টি* করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রয়াসী হইবেন তখন বুঝিব যে মামুলি আদর্শের মাপকাঠি ছাড়াইয়া আমরা জীবনের উচ্চতর আদর্শ ও লক্ষ্য ধরিয়াছি।

আমরা হতাশ হই নাই। আমাদের অতীতের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া দুঃখিত হইবার কারণ নাই। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বাঙ্গালার বৈষয়িক জীবনে যে নবশক্তি জাগিয়াছে তাহা উপেক্ষা করিবার সামগ্রী নহে। বারান্তরে আমরা তাহার যথোচিত পরিচয় দিব। তাহা হইতেই বুঝিবেন বঙ্গে প্রবীণে নবীনে মিলিয়া, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ একত্র কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালীর জন্য স্বাধীন জীবিকার উপায় কতভাবে গড়িয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। আমরা প্রয়াস চাহি—চেষ্টা ও যত্ন দেখিতে ইচ্ছা করি—সার্থকতা, সফলতা, কৃতকার্য্যতার ধার ধারি না। এই প্রয়াসগুলির বিবরণে সকলেই বুঝিবেন আমাদের সর্ব্বত্র আশার কারণই আছে—নৈরাশ্যের কোন হেতু নাই।

তথাপি আমাদের অধিকতর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। চাকরীতে যেন আমাদের কাহারও মন না যায়। স্বাধীন ভাবে ৪০।৫০৲ টাকার আয়ের সুবিধা-সৃষ্টির নিমিত্ত যথোচিত কষ্ট স্বীকার না করিয়া কেহ যেন মাষ্টারীতে না ঢুকি। উকীল মহাশয়গণ নিজেদের আর্থিক অবস্থা বুঝিয়া সন্তানগণকে আর যেন উকীল-ঘরের সীমানায় প্রবেশ করিতে না দেন। ওকালতীতে ৫০।৭৫৲ মাত্র আয় হয় এরূপ উকীলের সংখ্যা প্রত্যেক জেলায় কত জন? এই সামান্য আয়ে হিন্দু-গৃহস্থের যৌথ-পরিবারের ব্যয় কি চলিতে পারে? এইরূপ কষ্টে তাঁহারা সমাজকে নিরানন্দময় করিয়া তুলিতেছেন। বাঁধা পথে যে বড় সুখ আছে তাহা ত দেখি না। তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের শক্তি নূতন নূতন পথ আবিষ্কারের জন্য নিয়োগ করিতেছেন না কেন? অনিশ্চিত পথে না হয় আর কয়েক বৎসর বেশী কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। প্রতিবৎসর হাজার হাজার

গ্র্যাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইতেছেন। হইয়াই হতাশ! তাঁহাদের শতকরা দশ জন প্রত্যেকবার স্বাধীন অন্নের পথ বাহির করিবার জন্য বাঙ্গালাদেশের নদী-জঙ্গল, গাছ-গাছড়া, কৃষি, পশু ইত্যাদি ধনাগমের উপায় সকল তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করুন। তাহা হইলে পাঁচ বৎসরের ভিতরই কেরাণী ও মাষ্টারীগিরি অপেক্ষা শত গুণ আরামদায়ক জীবিকার পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়িতে পারে। কেবল একবার সাহস করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ভাসিয়া পড়া প্রয়োজন—একটা নূতন পথে চলিবার জন্য উৎসাহ প্রয়োজন।

এই সকল দিকে শক্তি-প্রয়োগকেই আমরা স্বদেশী আন্দোলনের কার্য্য মনে করি। স্বদেশী প্রতিষ্ঠার জন্য এইরূপ কর্ম্মযোগই আবশ্যক। এই দিকে আমাদের দৃষ্টি আরও বিশেষরূপে পড়া প্রয়োজন। এই সকল কর্ম্ম করিতে করিতেই বাঙ্গালীর শিল্পশিক্ষা, কৃষি-শিক্ষা, ও ব্যবসায়-শিক্ষা হাতে কলমে হইতে থাকিবে। কারখানায়, ফ্যাক্টরীতে, গোচার-মাঠে, কৃষিক্ষেত্রে শাগ্‌রেতী করিতে করিতে বাঙ্গালী ব্যবসায়ে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিবে। মামুলি বিদ্যালয়ের দুচার পাতা ধনবিজ্ঞান পাঠ করিয়া অথবা তথাকথিত টেক্নিক্যাল স্কুলের ওভারসিয়ারি পাশ করিয়া দেশের ধন বৃদ্ধি করিবার প্রণালী শিক্ষা হইবে না।

* *
*

৬। শিল্প-প্রদর্শনীর আর এক দিক্

আমাদের শিক্ষিত জনগণ কথাটা বেশ শক্ত ভাবে ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা বৎসর বৎসর নানা জেলায় বহু অর্থ ব্যয়ে কৃষি-প্রদর্শনী, খুলিতেছেন। কৃষি-প্রদর্শনীর শিল্প-প্রদর্শনীর উপকারিতা অস্বীকার কেহই করিবেন না। আমরা শিক্ষাপ্রচারের জন্য, শিল্প-প্রচারের জন্য বিজ্ঞানপ্রচারের জন্য প্রদর্শনী, সম্মিলনী, বক্তৃতা ইত্যাদি সবই চাই। কিন্তু প্রচার করিব কোন্ জিনিষ? লোককে শিখাইবার স্বাধীন কর্ম্মের কোন্ অনুষ্ঠান? কোন্ শিল্প, ব্যবসায় বা কৃষিকর্ম্ম দশ জনের সম্মুখে ধরিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিব? আর তাহার জন্য প্রতিবৎসরই কি সকল জেলায় একটা করিয়া প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান না করিলে চলে না? আমাদের বাঙ্গালা দেশে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বহুসংখ্যক প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সুফলও যথেষ্ট ফলিয়াছে সত্য। কিন্তু আনুসঙ্গিক ভাবে অর্থের অপব্যয় এবং শক্তির অপব্যবহার হইয়াছে কত বেশী? তাহাতেই মনে হয় আমরা আমাদের মুখ্য আদর্শ ও লক্ষ্য ভুলিয়া বাজে জিনিষে মাতিয়া যাইতেছি। যতটাকা বঙ্গদেশে প্রদর্শনী উপলক্ষে খরচ হইল তাহার অর্দ্ধাংশ দ্বারা শিল্প ও ব্যবসায়-বিষয়ক বহু সদনুষ্ঠান চলিত। প্রকৃত শিল্প-বিদ্যালয় খোলা হইতে পারিত—জাতীয় বিদ্যালয়গুলির শিল্প-বিভাগের উন্নতি সাধিত হইতে পারিত—কৃষিকর্ম্মে, তাঁতের কাজে, গো-পালনে, ঔষধ-প্রস্তুত-করণে অনেকে মূলধনের অভাবে উন্নতি দেখাইতে পারিতে-ছেন না। তাঁহাদিগকে সাহায্য করা যাইতে পারিত। অনেক অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত যুবককে ২০০।৩০০৲ অগ্রিম মূলধন যোগাইয়া

তাহাদের দ্বারা নানা স্বদেশীভাণ্ডার খোলা হইতে পারিত। বিদেশ হইতে যে সকল ছাত্র শিল্প ও বিজ্ঞান শিখিয়া স্বদেশ কর্ম্মক্ষেত্রের অভাবে হতাশ প্রাণে চাকরীতে ঢুকিতেছেন তাঁহাদের উৎসাহ ও উদ্যম বজায় রাখা যাইত—তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবার সুযোগ সৃষ্ট হইত। এইরূপ স্থায়ী কার্য্য করিবার সঙ্গে সঙ্গে ৪।৫ বৎসর পর একটা করিয়া প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যাইতে পারিত। আর বাস্তবিক তখন প্রদর্শনীর প্রয়োজনই কমিয়া যাইত।

তাহার পরিবর্ত্তে কি দেখিতেছি? প্রত্যেক বৎসর অজস্র অর্থ-ব্যয়, আমোদ-প্রমোদ আর দুই চারিটা মামুলি বক্তৃতা। এইজন্যই মনে হয় আমাদের জননায়কগণ জাতীয় স্বার্থ ভুলিয়া অন্ধভাবে গড্ডালিকা-প্রবাহ ন্যায় কর্ম্ম করিতেছেন। অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইতেছে না। প্রদর্শনী কিছু কাল বন্ধ রাখিলে কোন ক্ষতি হইবে না, তাহার পরিবর্ত্তে যাহা প্রদর্শন বা প্রচার করা কর্ত্তব্য তাহারই অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। যদি জননায়কগণ টাকা তুলিতে পারেন, যুবকগণকে নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে সাহায্য করুন। ছাত্রদিগকে অর্থকরী উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, অর্থকরী প্রাণিবিদ্যা, অর্থকরী ভূতত্ত্ব শিখাইবার জন্য প্রত্যেক জেলায় ছোটখাট কারখানা, কামারশালা, বিজ্ঞানালয় ও ব্যবসায়-বিদ্যা-লয়ের প্রতিষ্ঠা করুন। এই উপায়ে কয়েক বৎসর প্রকৃত স্বদেশী আন্দোলনের নানা কার্য্য চলিবে। তখন আপনা আপনিই প্রচারকার্য্য অগ্রসর হইতে থাকিবে। তখন হাটে বাজারে, মেলায়, উৎসবে, পূজার শোভাযাত্রায়—নানা উপলক্ষ্যে হাজার হাজার প্রদর্শনীর কার্য্য হইবে। দেশ উন্নত হইবে—সমাজ নবীন শক্তির অভ্যুদয়ে সঞ্জীবিত হইবে—জননায়কগণ ও গণপতিগণ ধন্য হইবেন। আর যদি আমোদ-প্রমোদের লোভ না দেখাইয়া—স্বীয় চরিত্র-বলে এবং দেশভক্তির প্রভাবে জনগণের অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করিতে না পারেন তাহা হইলে চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকুন। বাজারে দাঁড়াইয়া চিন্তাহীনতার ও অদূরদর্শিতার পরিচয় দিলে সমাজের অনিষ্ট হইবে।

আমরা অনেক কথা অবান্তরভাবে বলিলাম। মোটা কথা এই যে—বাঙ্গালাদেশে আর যেন শীঘ্র শিল্প-প্রদর্শনী খোলা না হয়। তাহার পরিবর্ত্তে স্বাধীনজীবিকা বাহির করিবার জন্য নানা কর্ম্মীকে নানা ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সাহায্য করা হউক। প্রদর্শনীতে মাতিয়া আমরা জাতীয় জীবনের চরম লক্ষ্য ভুলিয়া যাইতেছি। সাময়িক উত্তেজনায় আমরা প্রকৃত কর্ম্ম ক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছি। অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত জনসাধারণের টাকা অনর্থক ব্যয় করিবার অধিকার কাহারও নাই। গভীরভাবে তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে—গত ৫।৬ বৎসরে সমাজের অবস্থা যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, দেশে এখন কিছু কাল প্রদর্শনীর কোন প্রয়োজন নাই। এখন সময়োপযোগী নূতন নূতন বৈষয়িক কার্য্য আরম্ভ করা কর্ত্তব্য।

৭। প্রদর্শনী ও প্রচারক

আর একটা দিক হইতেও আমরা প্রদর্শনী-

দিনীপুরে প্রদর্শিত বৃহদাকার কৃষিজাত দ্রব

('হিন্দু-প্যাট্রিয়ট' হইতে সংগৃহীত)

India Press, Calcutta.

গুলির অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিতেছি। বিগত দুই তিন মাসে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় নানা প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্রই মামুলি অনুষ্ঠানের কোনই ত্রুটি হয় নাই। সেই সভা, সেই সমিতি, জিনিষগুলির সেই ক্ষণিক পর্য্যবেক্ষণ, সামান্য কৌতুক এবং তারপর সম্পূর্ণ বিস্মৃতি! কিন্তু এইরূপ সাময়িক প্রদর্শনীগুলিকে চিরস্থায়ী করিবার কোন আয়োজন দেখি না। এই সকলের প্রকৃত উদ্দেশ্য, সম্পূর্ণ সার্থকতার উপায় আমরা একেবারেই ভাবি না। ইহাদের সুফলকে চিরস্থায়ী করিতে হইবে—নানা স্থানে বিস্তৃত করিতে হইবে সে চিন্তা আমাদের নাই। প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য—প্রচার ও লোকশিক্ষা। কিন্তু প্রচারক ভিন্ন সে সব কার্য্য সহজে হইবার নহে। তবে প্রচারক বলিলেই আমরা যেন সভা-সমিতি, বক্তৃতার কথা মনে না করি। আমাদের হিন্দুর কাছে প্রচারকের প্রকৃতি অন্যপ্রকার। আমাদের তীর্থস্থানের পাণ্ডারা কি কম প্রচারক? তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ তীর্থস্থানের মহিমা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া ফিরিতেছেন। দূরতম পল্লীবাসীর সম্মুখেও তাঁহারা প্রসাদ, বিল্বপত্র সিঁদূর প্রভৃতি প্রদান করিয়া নিজের তীর্থস্থানকে কেমন জীবন্ত ভাবে ধারণ করেন! প্রচারকার্য্য ইহা অপেক্ষা সুষ্ঠুরূপে আর কি উপায়ে হইতে পারে?

আমাদের শিল্প, কৃষিজাত দ্রব্য এবং ব্যবসা প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা রকম শিক্ষা এইরূপ ভাবেই নানা স্থানে প্রচার করিতে হইবে। আমাদের এখন বৈজ্ঞানিক-শিক্ষাপ্রাপ্ত, শিল্প ও ব্যবসায়ে কৃতবিদ্য পাণ্ডার প্রয়োজন হইয়াছে। এই সকল বৈষয়িক ও শিল্প জগতের নিয়ম-প্রচারক পাণ্ডারা গ্রামবাসী চাষা, তাঁতী, সূত্রধর, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি সকল প্রকার শ্রমজীবীদিগের সহিত মিশিবেন। আজকালকার Specialist বা বিশেষজ্ঞ মহাশয়গণের ন্যায় কেবল দুচারটা মৌখিক সদুপদেশ দিবার জন্য নহে। শিল্পবিদ্যা এবং বিজ্ঞান ও ব্যবসায়ে পারদর্শী ধুরন্ধরেরা তাহাদের সঙ্গে কিছু দিন বসবাস করিয়া তাহাদের ঘরের লোক হইবার চেষ্টা করিবেন। হয় ত তাহার জন্য কখন কখন কৃষকের সঙ্গে এই উচ্চ শিক্ষিত শিল্পী ও ব্যবসায়িগণকে লাঙ্গল ধরিতে হইবে, তাঁতীর সঙ্গে তাঁত বুনিতে হইবে, সূত্রধর, কর্ম্মকার প্রভৃতিকে সাহায্য করিতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলেই নিম্নশ্রেণীদিগের আমোদ-প্রমোদ, বিবাদ-বিসম্বাদ, সুখ-দুঃখের সহিত প্রচারকগণের সহানুভূতি কেবলমাত্র মৌখিক রহিবে না—আন্তরিক হইয়া উঠিবে। তখন তাঁহারা অবসর মত তাঁহাদের "ঝুলি" হইতে কখন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, কল-কব্জা, কখন কৃষিজাত দ্রব্য, খনিজ পদার্থ, কখন মানচিত্র, ফটো-ক্যামেরা, কখন ম্যাজিকলণ্ঠনের ছবিওয়ালা কাচ, জীবজন্তুর অস্থি-পঞ্জর, চিত্র, গাছগাছড়া প্রভৃতি বাহির করিয়া দেখাইবেন, বুঝাইবেন—প্রত্যেকটির বিশেষত্ব কি, উপকারিতা কি, কেমন করিয়া উৎপন্ন, কেমন করিয়া গঠিত।

আমরা আশা করি, এইরূপে যদি শ্রমজীবী ও কারিগরদিগের সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত 'বিশেষজ্ঞ' ওস্তাদ মহাশয়গণ কৃষিক্ষেত্রে এবং শিল্প ও ব্যবসায়ের কারখানায় কিছুকাল

মানসম্ভ্রম ও অহঙ্কার ভুলিয়া কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে এক দিকে শিল্প-প্রচারকদিগের চরিত্রগঠন—অন্যদিকে সমাজের মধ্যে শিল্প-প্রতিষ্ঠা-প্রচারকার্য্য খুব সুন্দররূপে চলিতে থাকিবে। নিম্নশ্রেণীরা তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক নূতন আধুনিক তথ্য, উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী, বহু নব নব আবিষ্কার খুব সহজে জানিতে পারিবে—জানিয়া সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবে। বলা বাহুল্য, এই সময়ে প্রচারকগণ যে ভাষা ব্যবহার করিবেন তাহা যেন নিম্নশ্রেণীরা তাহাদের ঘরের ভাষা বলিয়াই বুঝিতে পারে।

হে পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পাদি শিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, জননী জন্মভূমি এইরূপ প্রচারকার্য্যই আপনাদের কাছে আশা করেন। আপনারা একবার নিজের 'prospect' ও বেতনের কথা ভুলিয়া সমাজের সেবায় নিযুক্ত হউন। তাহা হইলেই আপনাদের শিক্ষার্থে ব্যয়িত সমস্ত অর্থ সার্থক হইবে।

*
* *

৮। ভারতে জাপানী

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের জাপানী ছাত্র আর, কিমুরা পি, এইচ, ডি (টকিও বিশ্ব-বিদ্যালয়) কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা কিয়দংশ তাহা হইতে উদ্ধৃত করিলাম। আমাদের বিদেশগামী ছাত্রগণের কিরূপে জীবন যাপন করা উচিত এই প্রবন্ধ হইতে তাহার অনেক সঙ্কেত পাইবেন।

"আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং শিক্ষাগুরু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাকে আমার স্বদেশ জাপানের ধর্ম্ম, শিক্ষা, সামাজিক অবস্থা ও রীতি-নীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু লিখিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে আমি সুবিখ্যাত আনন্দবাজার পত্রিকায় কিছু লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমার মনে হয় জাপান সম্বন্ধে এদেশের কেহই এ পর্য্যন্ত ভালরূপ আলোচনা করিতে পারেন নাই। যাঁহারা জাপানের কোন বিষয়ে আলোচনা জন্য চেষ্টা করিতে অগ্রসর হন, তাঁহাদের বোধগম্য ভাষায় জাপানের কোন সঠিক ইতিহাস না থাকায় তাঁহারা সাধারণতঃ কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। ইংরাজী ভাষায় জাপান সম্বন্ধে লিখিত অনেক পুস্তকাদি আছে বটে, কিন্তু তাদৃশ পুস্তক দ্বারা জাপানের ঠিক ইতিহাস অবগত হওয়া একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কারণ ইংরাজ-লেখকের মধ্যে অধিকাংশই দুই তিন মাস কাল পর্য্যন্ত জাপানে বাস করিয়া সহস্র সহস্র বৎসরের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় জাপানের ঠিক সংবাদ পাওয়া দূরে থাকুক, অনেকস্থলে একেবারে অসঙ্গত ও বিপরীত তথ্যই প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

ভারতে আসা অবধি ভারতবাসিগণকে জাপানের ইতিহাস জ্ঞাত করাইবার আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত সেই সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুর অনুরোধে আনন্দবাজার পত্রিকায় আমার অভিলষিত বিষয় প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু আমাদের জাতীয় ইতিহাস লিখিবার পূর্ব্বে পাঠকগণকে আমার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করিতেছি।

আমি জগতের একটি সামান্য জীব, বহুকাল যাবৎ জগৎতত্ত্বের অন্বেষণ করিতেছি। জগৎ কি, জগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধই বা কি, মানুষ্য কি এবং তাহাদের উদ্দেশ্য এবং আবশ্যকতাই বা কি,—ইত্যাদি নানা বিষয়ের প্রশ্ন আমার মনে উদিত হইত, তজ্জন্য বাল্যকাল হইতে দর্শন-তত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব ইত্যাদি শিক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়া কলেজ-জীবন সমাপন পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করিলাম, কিন্তু ইহাতে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। আমি আশৈশব শুনিয়া আসিতেছি যে, ভারতবর্ষ, কেবল এসিয়াখণ্ডের এক প্রাচীন উন্নত দেশ নহে, জগতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা-ভূমি ও ধর্ম্মভূমি, প্রাচীন সভ্যতার আকরস্থলী, জ্ঞান ও ধর্ম্মের লীলা-নিকেতন। কলেজ-জীবন সমাপনান্তে আমি মনে করিলাম, ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যে দেশে আমার চির অভিপ্সিত বস্তু লাভ হইতে পারে।

তদনুসারে তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি ভারতে আসিয়াছি এবং গত তিন বৎসর যাবৎ পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিয়া তথায় পালি ভাষা, বাঙ্গালা ভাষা, সংস্কৃত ভাষা ও তৎসঙ্গে দর্শন ও ঐতিহাসিক বিষয় কিছু কিছু শিক্ষা করিয়া গত বৎসর কলিকাতা আসিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে আমি সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত মহাশয়গণের সমীপে ক্রমাগত বিদ্যালাভ করিতেছি, এবং অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট নানা বিষয়ে শিক্ষা সাহায্য পাইতেছি, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি। আমি সংকল্প করিয়াছি, বহু বৎসর ভারতে বাস করিয়া ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। আমি আশা করি ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতমণ্ডলী এই বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

আমি এই পত্রিকায় আমাদের দেশের সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে "ভারতে তিন বৎসর" এই সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিব এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হইয়াছে সেই প্রবন্ধে তাহা বিবৃত করিব।

বাস্তবিক পক্ষে বলিতে গেলে কেবল তিন বৎসরের মধ্যে বিদেশীর চক্ষে স্পষ্টরূপে ভারতের স্বরূপ অর্থাৎ ভারতের সার তত্ত্ব উপলব্ধি করা অসম্ভব। যেমন একটি বিষয় শিক্ষা করিতে গেলে অন্ততঃ দশ বৎসর যাবৎ একাগ্রচিত্তে চেষ্টা না করিলে সেবিষয়ে পণ্ডিত হইতে পারা যায় না, সেইরূপ বিদেশীর পক্ষে ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও অন্ততঃ দশ বৎসর বিবিধ শিক্ষা দ্বারা সামাজিক আচার-ব্যবহার জ্ঞাত না হইলে এবং দেশ দেশান্তরের নগরবাসী পল্লীবাসীর সহিত না মিশিলে ভারতের তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং যাহা আমি বলিতেছি তাহাকে ঠিক অভিজ্ঞতা না বলিয়া ধারণা বলিলেই ঠিক হয়। এইখানে আরও একটি বক্তব্য আছে। আমার পরিচয় দান সম্বন্ধে আমি বলিয়াছিলাম যে, ধর্ম্ম ও দার্শনিক তত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য এদেশে আসিয়াছি, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র তাহাই নহে, ভারতবর্ষের স্বরূপ তত্ত্ব উপলব্ধিও অন্যতম কারণ। ভারতবর্ষের স্বরূপ জ্ঞাত না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও দর্শন-তত্ত্ব

জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব। কারণ মানুষের স্বভাবের সহিত গুণেরও যেমন সম্বন্ধ আছে, ভারতবর্ষের তথ্যের সহিত দার্শনিক তত্ত্বেরও তেমনই সম্বন্ধ। বিশেষতঃ উপরিলিখিত উদ্দেশ্যেই আমি এখানে আসিয়াছি।

কেবল সংস্কৃত ভাষা এবং যাবতীয় দর্শন শিক্ষার্থ এদেশে আসা অপেক্ষা, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ডে যাওয়া বিদেশীর পক্ষে সুবিধা। সেখানে সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বহুল চর্চ্চা হইয়া থাকে এবং শিক্ষিত পণ্ডিতও অনেক। তাঁহারা শিক্ষা করিবার প্রণালী ও শিক্ষা দিবার প্রণালী এদেশের লোক অপেক্ষা ভাল জানেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। সুতরাং এখানে যাহা দশ বৎসরের মধ্যে শিক্ষা করা যায়, তাহা সেখানে তিন চার বৎসরের মধ্যে শিক্ষা করিতে পারা যায় এবং শৃঙ্খলা-যুক্ত পাণ্ডিত্য লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি ইহা কেবল ভাষাজ্ঞান মাত্র; ভাবার্থ উপলব্ধি বা আস্বাদন ভাষাজ্ঞান অপেক্ষা উন্নততম মার্গের জিনিস। উহা ভাষাজ্ঞানের দ্বারা সম্যক উপলব্ধি অসম্ভব। সে দেশের লোকে ভাষা-চর্চ্চার ফলে যতটুকু শিক্ষালাভ করিয়াছেন; তাহাই সে দেশের পক্ষে পর্য্যাপ্ত, কিন্তু এদেশে ঐ জ্ঞান উদ্ভূত ও বিকশিত হইয়াছিল। এদেশের লোক শুধু জ্ঞানামৃতের আলোচনা নহে সম্যক আস্বাদনও করিয়াছিলেন। ইহাই এদেশের বিশেষত্ব। সুতরাং আমি এদেশে আসা অবধি এদেশের প্রকৃতি কি, প্রকৃতির বিশেষত্ব কি শিখিবার জন্য তাহাই ধরিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, করিতেছি এবং করিব।"

*
* *

৯। মুসলমান স্বদেশ-সেবক

সারাইল হাই স্কুলের শিক্ষক জনাব মৌলবী আবদুলবারী সাহেব স্থানীয় মুসলমান ছাত্র-বর্গকে লইয়া এক জাতীয় ভিক্ষুকের দল গঠন করিয়াছেন, এই প্রকার ভিক্ষার দ্বারা মৌলবী সাহেব প্রায় ছয় শত টাকা সংগ্রহ করিয়া তুরস্ক সাহায্য-ভাণ্ডারে প্রেরণ করিয়াছেন। মৌলবী সাহেব যে আদর্শ-কর্ম্মী তাহাতে আর সন্দেহ নাই, যাঁহার সন্তুষ্টি সাধনের জন্য তিনি এই গৌরবজনক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, ইহ-পর-কালে সেই করুণাময় তাঁহাকে পুরস্কৃত করুন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা। আর যে সকল বালক তাঁহার উপদেশে এই সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছে, আশীর্ব্বাদ করি, যেন তাহাদের এই স্পৃহা দিন দিনই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমরা সর্ব্বত্রই এই আদর্শের অনুকরণ দেখিতে চাই।" (মোহম্মদী)

*
* *

১০। বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লব

"গত বৎসর য়ুরোপের অবস্থা লোকের মনে গুরুতর শঙ্কার উদ্রেক করিয়াছে। গত বৎসরেও কয়েক মাস ইতালী ত্রিপোলীয় যুদ্ধ চলিয়াছে। তাহার পর প্রাচ্য য়ুরোপে যে ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, আজিও তাহা নির্ব্বাপিত হয় নাই। ইংলণ্ডে শান্তি সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে যে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে শান্তি সংস্থাপিত হয় নাই, কিছুদিন যুদ্ধ স্থগিত ছিল মাত্র; তাহার পর আবার উহা জাগিয়া উঠিয়াছে। ফলে ইংলণ্ড ভিন্ন অন্য কোনও রাষ্ট্রপতির

নিকট হইতে তুরস্ক যে বিশেষ সহানুভূতি ও সমবেদনা পাইয়াছেন, তাহা মনে হয় না। আলোচ্য বর্ষেই য়ুরোপে তুরস্কের প্রভাব ক্ষয় পাইয়াছে, এ কথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে বলকানের এই ব্যাপার হইতে সমগ্র য়ুরোপ সমরানল প্রজ্বলিত হইবার আশঙ্কা অনেকের মনে উদিত হইয়াছিল। এখনও সে আশঙ্কা একেবারে তিরোহিত হয় নাই। বাহ্যত য়ুরোপ প্রশান্ত রহিয়াছে সত্য, কিন্তু সৈন্য-বৃদ্ধি, রণতরী-বৃদ্ধি প্রভৃতি বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া মনে হয়, অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষের ন্যায় য়ুরোপ জাতিবিদ্বেশের অনলে গুমে গুমে পুড়িতেছে। গ্রীসেরা রাজা বিপ্লবপন্থীর হস্তে নিহিত হইয়াছেন। পর্টুগাল, স্পেন প্রভৃতি দেশে সাম্যবাদ অশান্তির উদ্ভব করিয়াছে। রুস এখন সৈন্য ও রণতরী সজ্জিত করিয়া তাহার (প্রণষ্ট) গৌরব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় আছে। এসিয়াখণ্ডের অবস্থাও আশাপ্রদ নহে। পারস্যের অবস্থা সঙ্কটসঙ্কুল। প্রকৃতই রুস যে ভাবে তাহাকে করতলগত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে আর তাহার উদ্ধারের আশা নাই। ইংরেজ না থাকিলে পারস্য এত দিন রুসের কুক্ষিগত হইত। চীনের রাজনীতিক অবস্থাও সম্পূর্ণ আশাপ্রদ নহে। চীন যে প্রজাতন্ত্র নীতি অবলম্বন করিয়াছে, তাহা তাহার ধাতুতে সহিবে কি না, সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করিতেছেন। অর্থাভাবে চীনের অনেক সংস্কার-কার্য্য স্থগিত রাখিতে হইয়াছে ও হইতেছে। তবে য়ুয়ানসিকাই ও সানিয়েৎ সেনের চেষ্টায় চীন উন্নতির পথে কতকটা অগ্রসর হইতেছে। জাপানের চীনবিদ্বেষ যেন শনৈঃ শনৈঃ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। মাঞ্চুরিয়া ও তিব্বত এই বৎসর চীনের সহিত পৃথক্ হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই সকল বৈদেশিক ঘটনার স্মৃতি ও অতীত বৎসরের সহিত বিশেষভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে।”—

বসুমতী

*
* *

১১। হিন্দী সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত প্রবন্ধ

হিন্দী সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন কাশীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল দ্বিতীয় সম্মিলন বসিয়াছিল প্রয়াগে। এই দুই সম্মিলনে যত-গুলি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহার একটা তালিকা দিতেছি। বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবিগণের সেদিকে দৃষ্টি পড়া আবশ্যক। বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য আমাদিগকে হিন্দী ও অন্যান্য ভাষায় রচিত সাহিত্য হইতে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। এই দুইটি উত্তরভারতের সাহিত্য ক্রমেই সম্পদলাভ করিতেছে। বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দী ও মারাঠী সাহিত্য হইতে অনুবাদ ও সঙ্কলন প্রকাশ করিবার সময় আসিয়াছে। উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ এদিকে তাঁহাদের যত্ন প্রয়োগ করিলে সদুপায়ে সময় কাটাইতে পারিবেন।

প্রথম হিন্দী সাহিত্য-সম্মিলনে স্বদেশসেবক শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালবীর সভাপতি ছিলেন। নিম্ন লিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল :—(১) বর্ত্তমান নাগরী অক্ষরের উৎপত্তি, (২) হিন্দী কাব্য সাহিত্যের ভাষা, (৩) হিন্দী সাহিত্য, (৪) হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস,

(৫) ব্রজভাষা, (৬) দাদূ দয়াল এবং সুন্দর দাস, (৭) রাষ্ট্রভাষা এবং রাষ্ট্রলিপি, (৮) মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দীর অবস্থা, (৯) স্বাধীন কদর রাজ্যে নাগরী অক্ষরের প্রচার, (১০) নাটক ও উপন্যাস, (১১) ভাষা ও সাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টান মিশনারীদিগের কার্য্যাবলী, (১২) নাগরী প্রচারই দেশের উন্নতির উপায়, (১:) হিন্দী ভাষা, (১৪) হিন্দীর বর্ত্তমান অবস্থা এবং তাহার উন্নতির উপায়, (১৫) পঞ্জাবের হিন্দী, (১৬) বুঁদের খণ্ডের হিন্দী, (১৭) দেবনাগরী অক্ষর।

দ্বিতীয় সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতি ছিলেন কলিকাতার প্রসিদ্ধ হিন্দী সাহিত্যক শ্রীযুক্ত গোবিন্দ নারায়ণ মিশ্র। এই সম্মিলনে নিম্ন লিখিত প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

(ক) ঐতিহাসিক অনুসন্ধানবিষয়ক

(১) নাগরী অক্ষরের উৎপত্তি, (২) রাজপুতানায় হিন্দী গ্রন্থের অনুসন্ধান, (৩) হিন্দী পুঁথির অনুসন্ধান, (৪) হিন্দী ভাষা ও মুসলমান সমাজ, (৫) হিন্দী সাহিত্যে মুসলমান কবি, (৬) বুন্দেল খণ্ডের কবি, (৭) গোরখপুর বিভাগের কবি, (৮) নাট্যশাস্ত্রাচার্য্য ভবতমুনি,, (৯) চন্দ বরদাই।

(খ) আধুনিক অবস্থা বিষয়ক

(১) হিন্দী সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা (২) হিন্দীর বর্ত্তমান অবস্থা (৩) হিন্দীর বর্ত্তমান অবস্থা (৪) বঙ্গ ও বিহারে হিন্দী (৫) মধু প্রদেশে হিন্দীর অবস্থা, (৬) মধ্য-প্রদেশে হিন্দী সাহিত্য, (৭) মধ্য-প্রদেশে হিন্দীর অবস্থা, (৮) পঞ্জাবের হিন্দী।

(গ) সাহিত্য-বিষয়ক

(১) হিন্দী সাহিত্য, (২) হিন্দী কাব্য-সাহিত্যের ভাষা, (৩) সমালোচনা, (৪) নাটক, (৫) হিন্দী এবং ব্রজভাষা।

(গ) প্রাথমিক শিক্ষা

(১) প্রাথমিক শিক্ষায় হিন্দী পুস্তক, (২) প্রাথমিক শিক্ষায় বস্তু পরিচয়ের প্রয়োজণীয়তা

(ঘ) ব্যাকরণ

(১) হিন্দী ব্যাকরণ, (২) হিন্দীভাষার ব্যাকরণ, (৩) হিন্দীর ব্যাকরণ।

(ঙ) বিবিধ

(১) হিন্দীভাষা এবং দৈনিক পত্র, (২) হিন্দীকে জাতীয় ভাষা করিবার সুবিধা, (৩) স্ত্রীসমাজ এবং হিন্দী সাহিত্য, (৪) রেলওয়ে ষ্টেসনে এবং অন্যান্য স্থানে নাগরী অক্ষর ব্যবহারের আবশ্যকতা।

বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবিগণের মধ্যে কয়েক জনের নাম তিন সম্মিলনেই যুক্ত দেখিলাম। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় প্রথম হিন্দী-সম্মিলনে 'রাষ্ট্রভাষা এবং রাষ্ট্র লিপি' প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ছিলেন। দ্বিতীয় সম্মিলনে শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার ঘোষ 'সমালোচনা' প্রবন্ধ, এবং শ্রীযুক্ত শৈলজাকুমার ঘোষ 'প্রাথমিক শিক্ষায় বস্তুপরিচয়ের আবশ্যকতা' প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। এবারকার কলিকাতার সম্মিলনে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার 'হিন্দু সাহিত্য প্রচারক' প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দীতে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বঙ্গসমাজে হিন্দীর আদর বাস্তবিক বাড়ে নাই। এজন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

১২। যবদ্বীপে হিন্দুটোলা

নিজস্ব বজায় রাখা মানুষ মাত্রেরই স্বধর্ম্ম। নিজের আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রবৃত্তি মানবের পক্ষে অতি স্বাভাবিক। জাতিগত চরিত্রের সর্ব্বনাশ করিতে এবং স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিতে কোন সমাজই প্রস্তুত নয়। আধুনিক হিন্দুশাস্ত্র বিদেশগমন ও সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে যে নিষেধবাণী প্রচার করিয়াছেন তাহার মূলে এই গূঢ়তত্ত্বই অবস্থিত। পরাধীন সমাজের চরিত্রহানি এবং জাতীয় ধর্ম্মনাশ অতি সহজেই ঘটিয়া থাকে। জগতের অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাতির তুলনায় পরাধীন জাতি নিজকে ক্ষুদ্র ও অকর্ম্মণ্য মনে করে এবং সকল বিষয়ে অপরের অনুকরণ করিয়া জীবন গঠন করে। পরাধীনতার যুগে হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ এই স্বভাবসিদ্ধ এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সত্যের উপলব্ধি করিয়া ভারতবাসীর গতিবিধি, কাজকর্ম্ম, আহার-বিহারের নানা নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহাদের চিন্তাশীলতা, দূরদর্শিতা এবং মানব-চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সর্ব্বথা প্রশংসা-যোগ্য। আমাদের জাতীয় জীবন তাঁহাদের আটঘাট-বাঁধা নিয়মে শৃঙ্খলিত ছিল বলিয়া আজ পর্য্যন্ত আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও চরিত্রগত বিশেষত্বগুলি বাঁচিয়া রহিয়াছে। বহুবিধ রাষ্ট্রীয় অধীনতায়ও আমরা চিন্তার স্বাধীনতা ও আদর্শের স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলি নাই।

এই জন্য আজকাল যখনই হিন্দুর বিদেশ-গমনের কথা উঠে, তখনই আমাদিগকে ইতস্ততঃ করিতে হয়—আমরা অখণ্ড বিশ্বাসের সহিত কোন কথা বলিতে সাহস করি না। বিদেশীয় লোকেরা ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহাদের নিজ আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মকর্ম্ম, পোষাক-পরিচ্ছদ কিছুই পরিত্যাগ করেন না, তাঁহারা এখানেও খাঁটি স্বদেশী থাকিয়া যান। আমরাও যদি বিদেশী আহার-বিহার, আচার-ব্যবহার, কায়দা-সভ্যতা, ধর্ম্মকর্ম্ম, ইত্যাদি সকল বিষয়ে খাঁটি স্বদেশী থাকিতে পারি; তাহা হইলেই আমরা আমাদের কর্ত্তব্য পালন করিলাম। সুতরাং আমাদের বিবেচ্য এক মাত্র প্রশ্ন এই যে, বিদেশগামী ব্যক্তিরা স্বকীয় বিশেষত্ব নষ্ট করিবার জন্য বিদেশে যাইতে-ছেন? না, নানা উপায়ে তাহাকে পুষ্ট করিবার জন্য এবং বিদেশীয় সমাজে তাহার প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য যাইতেছেন? তাঁহারা কি ভিখারীর মত, গোলামের মত পরানুকরণ ও পরানুবাদের মোহে পড়িয়াছেন? না, জননী জন্মভূমির সনাতন সাধনাকে সমগ্র জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহাদের গুরু-রূপে অগ্রসর হইয়াছেন? তাঁহারা কি বাহ্য চাক্‌চিক্যে মজিয়া সাময়িক স্বার্থসিদ্ধি ও সুখ-ভোগের আশায় নিজের সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত? না, বিচক্ষণ কর্ম্মবীরের ন্যায় বিদেশের নানা মণিরত্ন আহরণ করিয়া স্বজাতির গৌরব বাড়াইবার জন্য চেষ্টিত? এবং নানা উপায়ে স্বধর্ম্ম-প্রচারের দ্বারা সমগ্র জগৎকে মজাইবার জন্য প্রবৃত্ত?

বলা বাহুল্য, এই সকল প্রশ্নের উত্তরগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার প্রতিকূল। কিন্তু আজকালকার বিদেশযাত্রা আমাদের জাতীয় ধর্ম্মের অনুকূলই হউক বা প্রতিকূলই হউক, সমাজের নেতৃগণ বিদেশগামীদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারেন

নাই—আর পারিবেনও না। যাঁহার অর্থ আছে, যাঁহার সুবিধা আছে, তিনি অন্য কোন পরামর্শদাতার সদুপদেশ গ্রাহ্য করিবেন না। প্রয়োজন হইলে জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতা বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। সমাজ-শাসনের দিন আর নাই। এই সকল যথেচ্ছাচার এখন সমাজের স্বাভাবিক কার্য্যকলাপের মধ্যে পরিগণিত হইয়া যাইতেছে। আমাদিগকে তাহা স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে।

তবে নানা দিকে আশার লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। আমরা অতীতের ভুলগুলি একটু একটু করিয়া বুঝিতে পারিতেছি। জাতীয় জাগরণের নানা লক্ষণের মধ্যে জাতীয় ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং স্বদেশীয় সভ্যতার প্রতি সমাদর বাড়িতেছে দেখিতে পাইতেছি। এখন আমাদের চিত্তসংমোহন ও বুদ্ধিভ্রংশ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। পরের মুখে ঝাল খাইয়াই আর আমরা সন্তুষ্ট থাকি না। নিজের আদর্শ, নিজের উৎকর্ষ খুঁজিয়া বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছি। বিদেশীয় সভ্যতার আবহাওয়ায় স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তারে মনোনিবেশ করিয়াছি। পাশ্চাত্য জগৎকে সকল বিষয়ে আমাদের শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু বলিয়া আর বেশী মনে করি না।

চিত্তসংমোহনের যুগে যখন আমরা বিদেশে যাইতাম, তখন ফিরিয়া আসিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য চাকরী করিতাম, দেশের লোককে গালি দিতাম, নিজ পরিবারের ইষ্ট সাধনকেই সর্ব্বস্ব মনে করিতাম, স্বদেশের রীতিনীতি, সৌজন্য-শিষ্টাচার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকলই অবজ্ঞা করিয়া বিদেশের মহিমা খ্যাপন ও কীর্ত্তি প্রচার করিয়া জীবন ধন্য করিতাম। এখন নানা কারণে সুর ফিরিয়াছে, আজকাল বিদেশ হইতে ফিরিয়া কেবলমাত্র নিজ পরিবারের কথাই সর্ব্বদা ভাবি না—স্বদেশের বৃহৎ পরিবারের চিন্তাও অনেক সময়ে করিয়া থাকি। স্বজাতির গৌরববিকাশ ও স্বধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনেই এখন বেশী আনন্দ উপভোগ করি। বিদেশীয় সভ্যতা ও আদর্শের মোহ অনেকটা কাটাইয়া উঠিতে পারি। বরং পাশ্চাত্য জগৎকে অনেক নূতন কথা শিখাইব এই স্পর্দ্ধা করিতেও সঙ্কোচ বোধ করি না। এই সুযোগে আমরা স্বজাতি-রক্ষা ও স্বধর্ম্ম-রক্ষার জন্য এখন বিশেষভাবে স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে পারি। জগতে আমাদের প্রভাব বিস্তারের জন্য নূতন ভাবে বহুবিধ কর্ম্ম আরম্ভ করা আবশ্যক। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন—একটা বিশাল বিদেশীয় সমাজের মধ্যে বাস করিয়া একজন বা দশ জন হিন্দু বা ভারতবাসী কোন মতেই তাঁহাদের জাতীয় বিশেষত্ব, ধর্ম্মের বিশেষত্ব, চরিত্রের বিশেষত্ব রক্ষা করিতে পারেন না—সেখানে আধিপত্য লাভ ত দূরের কথা। হাজার হাজার অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ও বিভিন্নভাবে ভাবুক লোকের মধ্যে দু'দশ জন ভারতীয় হিন্দু তলাইয়া যাইবেন, তাহা ত নিঃসন্দেহ। ভারতবাসীর স্বধর্ম্ম, হিন্দুর হিন্দুত্ব, ভারতের জাতীয় গৌরব রক্ষা ও পুষ্ট করিতে হইলে বিদেশীয় সমাজের অভ্যন্তরে কয়েকটা ছোট-বড় ভারতী-টোলা, বা হিন্দুপল্লী বা হিন্দুস্থানীপুর গঠন করিতে হইবে। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ভারতবাসীরা নিজ নিজ ধর্ম্মকর্ম্ম, কায়দা-কানুন, সভ্যতা, সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিবেন।

এবং সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভারতীয় উপনিবেশ হইতে ভারতবর্ষের বাণী প্রচার করিতে থাকিবেন। তখন আমাদের সে দিন ফিরিয়া আসিবে, যখন আমরা একটা স্বতন্ত্র সভ্যতার অধিকারী ও প্রবর্ত্তকভাবে পৃথিবীর নানা স্থানে বিচরণ করিতে সমর্থ হইব, সে দিন আর হিন্দুকে আট-ঘাট বাঁধিয়া চলিতে হইবে না, যখন হিন্দুগণ পরানুকরণে ব্যস্ত না থাকিয়া পৃথিবীর সভ্যতাকে নানা উপায়ে হিন্দুভাবে অনুরঞ্জিত করিতে সমর্থ হইবেন। তখন আবার সেই দিন ফিরিয়া আসিবে, যে দিন অধ্যাপক রাধাকুমুদ তাঁহার ভারতীয় সমুদ্র-বাণিজ্যের ইতিহাসগ্রন্থে জলন্ত ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন।

আমাদের আদর্শে ও লক্ষ্যে এইরূপ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের অনেকটা বিকাশ হইতেছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত। এজন্য ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা অতীতের ও বর্ত্তমানের চরিত্রনাশ, ধর্ম্মহানি এবং যথেচ্ছাচারগুলি ভুলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি। আপদ্ধর্ম্মের যুগে অনেক দুর্ব্বলতা, নীতিহীনতা এবং আদর্শশূন্যতা জাতির চরিত্রকে আক্রমণ করে। ভারতবাসী হিন্দুগণ তাহার প্রভাবে যথেষ্ট বিড়ম্বিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিলে ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য পালনে বাধা জন্মিবে। সুতরাং যদিও আমরা যে কোন অবস্থায় যে কোন ব্যক্তির বিদেশ গমনের পক্ষপাতী নহি, তথাপি বিদেশবাসী হিন্দুগণ যাহাতে সাধ্যমত স্বদেশ-প্রীতি ও স্বধর্ম্মানুরাগ হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরুক রাখেন তাহার জন্য আমাদের ভাগ্যগঠনের বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি—"হে ভগবান, বিদেশে আমাদের ভারতীয় স্বাতন্ত্র্য প্রচার করিবার প্রবৃত্তি ও সুযোগ সৃষ্টি কর।"

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় যবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া "সাহিত্য-সংহিতায়" সেখানকার দশ লক্ষ ঔপনিবেশিকের অবস্থা আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ভারতের শিক্ষিত হিন্দুগণকে যবদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম ও শিক্ষা-প্রচারকের ভার গ্রহণের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। প্রস্তাবটি খুব সময়োপযোগী এবং আমাদের জাতীয় আদর্শের অনুকূল। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে নানা দিকে হিন্দুসমাজে নূতন কর্ম্মপ্রবাহ ও নূতন চিন্তা-প্রবাহ ছুটিবে। বিদেশগমনাকাঙ্ক্ষী হিন্দুগণ, এই প্রস্তাবের বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন। জীবনের সম্মুখে একটা উচ্চ লক্ষ্য পাইয়া ধন্য হইবেন।

*

* *

১৭। গায়কবাড়ের গ্রন্থশালা।

বড়োদার মহারাজা শ্রীযুক্ত সয়াজীরাও গায়কবাড় বাহাদুর স্বরাজ্যে কতকগুলি গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অনেকেই তাহা জানেন। বড়োদারাজ্যে যেভাবে শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন চলিতেছে তাহা দেখিয়া ভারতসম্রাট সন্ন্যাসী অশোকের কথা মনে পড়ে। সমগ্র বড়োদা রাজ্যই যেন শিক্ষাপ্রচারব্রতের জন্য দেবোত্তররূপে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, ভারতবর্ষে এরূপ গ্রন্থশালা, পুস্তকালয় ও পাঠাগারের প্রয়োজন বেশী নাই। প্রথমতঃ খরচ পত্রের কথা। লাইব্রেরী বলিলে যে আসবাব-সরঞ্জামের কথা মনে আসে, তাহার খরচ কুলাইবার

ক্ষমতা দরিদ্র ভারতবাসীর নাই। পল্লীতে অত টাকা খরচ করা এক প্রকার অসম্ভব। প্রত্যেক জেলায় কেবলমাত্র একটা করিয়া মন্দের ভাল পাঠাগার গঠন করিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, পুস্তকগুলি না হয় সংগৃহীত হইল। কিন্তু পড়ে কে? লিখিবার পড়িবার অভ্যাস আমাদের উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই এখনও জন্মে নাই। দরিদ্র সমাজ এবং অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজের ত কথাই নাই। এখন আমাদের দেশে পুস্তক-সংগ্রহ অপেক্ষা পুস্তক পড়াইবার লোকের বেশী প্রয়োজন। তাঁহারা সদ্‌গ্রন্থের উপদেশসমূহ কথায় বার্ত্তায় নানা স্থানে নানা ভাবে প্রচার করিয়া বেড়াইবেন। স্বাস্থ্যতত্ত্ব, আমাদের অতীত গৌরবকাহিনী, বর্ত্তমান যুগের নানা সদনুষ্ঠানের কথা, দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের বিবরণ, আমাদের কর্ম্মবীর ও সাহিত্য-বীরগণের শক্তি, উৎসাহ ও কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় এই উপায়ে লোকমুখে সমাজে ছড়াইয়া পড়িবে।

লোকশিক্ষা বাড়াইবার যত উপায় আছে, তাহার মধ্যে বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ কথক, প্রচারক এবং পর্য্যটকের আবশ্যকতা অধিক। লোকেরা লাইব্রেরীতে আসিয়া গ্রন্থ লইয়া যাইবেন, অথবা পুস্তকগুলি লইয়া গিয়া তাঁহারা বাড়ীতে বসিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিবেন—সে আশা বড় কম। আমাদিগকে এখন কিছুকাল পর্য্যন্ত লোকের ঘরে ঘরে যাইয়া সৎকথা শুনাইতে হইবে—সদ্‌গ্রন্থের উপদেশ তাঁহাদের দোকানে বসিয়া প্রচার করিতে হইবে। তাহার জন্য উৎসাহী কর্ম্মিগণের প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য।

গ্রন্থশালা সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন অনেক সময়েই আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। কোন্ কোন্ পুস্তক পাঠাগারে রাখা আবশ্যক অনেকে এই বিষয় জানিতে চাহেন। এখানেও আবার সেই দুইটা কথাই মনে পড়ে। প্রথমতঃ খরচপত্রের কথা—ভাল ভাল গ্রন্থ কিনিবার উপযুক্ত টাকা আমরা প্রায়ই সংগ্রহ করিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ আমাদের সমাজের বিদ্যাচর্চ্চার অবস্থা। বাঙ্গালা গ্রন্থ ছাড়া কোন ইংরাজী গ্রন্থ রাখিতে হইলে আগে ভাবিয়া দেখা আবশ্যক সাধারণ পল্লীগ্রামে ইংরাজী-জানা লোক বেশী আছেন কি না। আমাদের বিশ্বাস—যে সকল ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিলে দেশকে ধনে বাণিজ্যে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলা যায়, বিদেশী রাষ্ট্রনীতি, সামাজিক অবস্থা, ও বাণিজ্যের ইতিহাস বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায়, সে সমুদয় গ্রন্থ পাঠ করিবার ক্ষমতা আমাদের অতি অল্প লোকেরই আছে। আর তাহাদের মূল্য অত্যধিক।

এই অবস্থায় আমাদিগকে অতি সংযতভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হইবে। আমীরি চালের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন যেন কর্ম্মিগণের মনে উপস্থিত না হয়। আমাদের ধারণা এই যে, আমাদের দেশে বর্ত্তমান যুগে যত প্রকার কর্ম্ম আরব্ধ হইয়াছে, সকলগুলির সহিত দেশবাসীকে পরিচিত রাখা আমাদের শিক্ষা-প্রচারকগণের একমাত্র কর্ত্তব্য। সমগ্র দেশের প্রতিমূর্ত্তি যাহাতে সকল দেশবাসীর হৃদয়ে অঙ্কিত হয় তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। বর্ত্তমানের সমস্যাগুলি বুঝিতে আরম্ভ করিলে লোকেরা ক্রমশঃ বিদ্যা-অর্জ্জনে এবং শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত হইবে।

এই উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় যতগুলি ইংরাজী ও বাঙ্গালা দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্র প্রকাশিত হয় সেগুলি সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত, বিভিন্ন ফ্যাক্টরী, স্বদেশী ভাণ্ডার, বিদ্যালয়, সাহিত্য-পরিষৎ, বিবেকানন্দ-মিশন, সেবা-সমিতি, কৃষিসমিতি, যৌথ-কারবার-সমিতি ইত্যাদি সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের প্রস্‌পেক্‌টস্‌, উদ্দেশ্যাবলী এবং বার্ষিক বা মাসিক বিবরণী, ও কার্য্য-তালিকা সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। কেবল বঙ্গদেশেই আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। সমগ্র ভারতেরই তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। এজন্য পঞ্চনদ ও মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড় ও হিন্দুস্থানের জনগণ নানা ক্ষেত্রে যে সকল কর্ম্ম ও চিন্তা করিতেছেন তাহার সহিত পরিচিত থাকিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতের ইংরাজী পত্রিকাগুলি সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত, হিন্দীভাষায় যে যে সকল তথ্য প্রকাশিত হয় তাহাদের বিবরণীও সংগৃহীত হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে আর একটা প্রাদেশিক ভাষার সাহায্যে দেশকে জীবন্তভাবে চিনিবার সুযোগ ঘটিবে।

আমরা বর্ত্তমান অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সময়োচিত ব্যবস্থা করিলাম। আশা করি—আমাদের উৎসাহী কর্ম্মিগণের মন এই ব্যবস্থায় ছোট হইয়া যাইবে না। যাঁহারা অর্থ-সংগ্রহ করিয়া বড় বড় প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে সমর্থ তাঁহাদিগকে আমরা আবার বলি—গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন নাই, গ্রন্থ-প্রচারকেরই আবশ্যকতা বেশী। যে মুহূর্ত্তে পুস্তক সংগ্রহের জন্য পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন, সেই সময়েই অথবা তাহার পূর্ব্ব হইতেই প্রচারক-সংগ্রহের চেষ্টা করুন।

আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করিলাম তাহার সঙ্গে কথঞ্চিৎ সংশ্লিষ্ট একখানি প্রশ্ন-পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পত্র-লেখক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন সেন বৰ্দ্ধমানের একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। তিনি কতকগুলি ধর্ম্ম-ও-নীতিবিষয়ক গ্রন্থের তালিকা চাহিয়াছেন। এরূপ তালিকারও প্রয়োজন আছে। আমরা আমাদের পাঠকপাঠিকা-গণকে প্রশ্নকর্ত্তার সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।

"মান্যবরেষু,

ছেলে-মেয়েদের, সার্ব্বভৌমিক উদার ভিত্তির উপরে নীতি এবং ধর্ম্ম শিক্ষা-প্রদান জন্য আজকাল দেশময় একটা আকাঙ্ক্ষা লক্ষিত হয়।

ঈশ্বর-জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস, নীতি, চরিত্র—এক কথায়—প্রকৃত মনুষ্যত্ব, ফুটাইয়া তুলিবার সহায়কারী প্রাচীন নবীন বহু গ্রন্থরত্ন সব দেশের সব সম্প্রদায়েই আছে। কিন্তু, উপযুক্ত নির্ব্বাচন এবং পাঠের সুযোগ অভাবে সেগুলি হইতে আশানুরূপ ফল আদায় করা সাধারণের পক্ষে ঘটে না।

ফলে, আজকাল, নিত্য নূতন প্রকাশিত, মধ্যম অধম যাহা তাহা গ্রন্থ অতিমাত্রায় বিজ্ঞাপিত হইয়া, ঘরে ঘরে, উপকার যত না হউক, অনেক ক্ষেত্রে অপকার করিতেছে।

আজকাল, অতি উত্তম সারবান উপকারী গ্রন্থও বহু বাহির হইতেছে সন্দেহ নাই—কিন্তু, শিক্ষালয়ে এবং অন্তঃপুরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে সাবধানে বাছনি করিয়া দেয় কে?

জাতি-ধর্ম্ম-ভাষা-নির্ব্বিশেষে, ঈশ্বর-বিশ্বাস, ভক্তি, নীতি, চরিত্র-গঠনে সহায়কারী পুস্তকের একটি আদর্শ-তালিকা সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে মহোদয়গণের নিকট এই অনুনয়-পত্র দ্বারা নিবেদন করিতেছি যে, দয়াপূর্ব্বক নিজ নিজ জীবনগত অভিজ্ঞতা হইতে, অন্যূন ৫০ হইতে অনূর্দ্ধ ১০০ খানি, পুরাতন হউক বা হালরচিত হউক, এমন গ্রন্থের (ভাষা-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে) তালিকা দিউন, যেগুলি আপনার নিজ সন্তানের উদার মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে (ছেলের ২৪।২৫ বয়স পর্য্যন্ত, মেয়ের ১৫।১৬ পর্য্যন্ত) অবশ্য-পঠনীয় বলিয়া আপনি মনে করেন। নিজের আদর্শ অনুসারে যাহা উপযোগী মনে করেন তাহাই লিখিবেন।

তালিকাটি—(১) পুরুষ-পাঠ্য (২) স্ত্রী-পাঠ্য (৩) উভয়-পাঠ্য এই তারতম্যে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে।

প্রত্যেক গ্রামে, নগরে, প্রত্যেক স্কুলে কলেজে, বড় সহরের পাড়ায় পাড়ায়, "Century" "পুস্তক-শতক" নামে এক একটি আদর্শ Circulating Library-র ব্যবস্থা করা এবং ঐ গুলির নিয়মিত পাঠে উৎসাহ দেওয়া (বিদ্যালয়ে এবং অন্তঃপুরে) এবং পাঠের ফলের উপর পারিতোষিক দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারে না কি?

যাহা হউক, এ সম্বন্ধে ক্রমশঃ আরও প্রকাশ করা যাইবে।

আপাততঃ, পত্রোত্তরে, মহাশয়ের নিজ নির্ব্বাচিত তালিকাটি সত্বর পাঠাইলে চির-অনুগৃহীত হইব। মত-সমষ্টির সাহায্যে একটা সুসঙ্গত অথচ সহজ-সাধ্য রকমের কিছু খাড়া করিবার ইচ্ছা। দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রের উৎসাহপূর্ণ সহায়তা সানুনয়ে প্রার্থনা করি। ইতি

বশ—

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ।
(ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট)

সংগ্রহ-সৌকর্য্যার্থ, অত্রসহ একাধিক পত্র প্রেরিত হইল। মহাশয় নিজ চতুঃপার্শ্বস্থ বন্ধুবান্ধবের মধ্যে প্রচার করিয়া উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করেন, ইহাই সানুনয় নিবেদন।

একমতাবলম্বী একাধিক মহোদয় মিলিত হইয়া একযোগে এক এক খানি তালিকা নির্ব্বাচন করিলে চলিতে পারে।

প্রত্যেক মহোদয় নিজ নাম, ধাম, উপাধি, পদবী স্পষ্ট করিয়া লেখেন ইহাই প্রার্থনা।

আমাদের নিকট কোন তালিকা পঁহুছিলে আমরা তাহার যথোচিত সদ্ব্যবহার করিব। আমরা নিজেদের অভিমত একটা তালিকাও বারান্তরে প্রকাশ করিব।

*
* *

১৪। এস দুঃখ

এবার নববর্ষের আবাহনে বিচক্ষণ 'বরিশাল হিতৈষী' প্রকৃত স্বদেশসেবকের মূলমন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। তিনি নানা ভাবে দুঃখদারিদ্র্য, বিপদ-দুর্য্যোগেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া সমগ্র বঙ্গসমাজকে দুঃখের আবাহনে যোগ দিতে বলি:

"এস এস নববর্ষ, আমরা আবার তোমার আবাহন করিতেছি—বিগত বর্ষ সুখে গেল কি দুঃখে গেল সে হিসাব আমরা করিব না—

কারণ সুখদুঃখের অনুভূতি আমাদের নাই—আমরা স্রোতে সেওলার মত ভাসিতেছি—কূল কিনারা দেখি না, তাই আমাদের সুখদুঃখের হিসাব কি; এ কথা সত্য আমরা হতাশ নহি, এখনও হতাশ হই নাই—Man never is but always to be blessed—মানুষ বর্ত্তমানে সুখী নহে—সর্ব্বদাই সুখের আশায় জীবন ধারণ করে। আমরাও তাই ভাবি সুখের দিন আসিবে—অবশ্য আসিবে। তাই হে নব বর্ষ তোমাকে প্রাণ ভরিয়া আবাহন করি। তুমি এস—আমাদের দগ্ধ প্রাণ জাগ্রত কর—হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার কর। কর্ম্মশক্তি জাগ্রত কর—তামসিকতা দূর করিয়া দেও। ধীরে অতি-ধীরে যে কর্ম্মমন্ত্র আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, আগামী বর্ষে তাহার প্রভাব দৃঢ় কর। আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে সৎসাহস প্রদান কর। ইচ্ছাশক্তির প্রভাব বিস্তার কর—দেশহিতে ও পরহিতব্রতে আমাদিগকে দীক্ষিত কর, পরের কারণে স্বার্থ বলিদান দিতে শিক্ষা দেও। শুধু আপন লইয়া যেন আমরা বিব্রত না রহি, যেন পরের কথা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে—ধনীর অলস-শয্যা কণ্টকিত কর, দরিদ্রের কণ্টক-শয্যা আরও কণ্টকিত কর—শান্তি চাহি না—যে শান্তি মৃত্যুর নামান্তর মাত্র তাহা আমরা চাহি না—আমরা দুঃখকেই মাথার মুকুট করিয়া লইব—যদি সে বোঝা বহন করিবার শক্তি তোমা হইতে আমরা পাই—এ জীবনের সুদীর্ঘ পথ এখনও সম্মুখে—শান্তিবারি মায়ামরীচিকা আমরা চাহিনা—তুমি যদি একটি বর্ষে আমাদিগকে সমস্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে একটি পা অগ্রসর হইতে দাও তবে তোমার বিদায় কালে আমরা তোমাকে ধন্যবাদ দিব।

প্রাচীন এ দেশে বহু কালের সঞ্চিত, ঘনীভূত আবর্জ্জনা পঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে—ক্রমে সে আবর্জ্জনারাশি অপসারিত হইয়া আমরা সুখসূর্য্যের উদয় আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। হে নববর্ষ, তুমি আমাদের সে আকাঙ্ক্ষা, সে সাধনায় সিদ্ধ হইতে সাহায্য কর। আমরা তোমার নিকটে আর কিছুই কামনা করি না—তুমি আসিয়াছ এস, এসে আমাদিগকে পশ্চাতে না ফেলিয়া অগ্রসর হইতে সাহায্য কর। জয় ভগবান তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমরা নববর্ষে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হই। আমরা [illegible] ব্যবহার ভুলিয়া যাইব—আমাদের ক্ষমতার কথা চিন্তা করিয়া কাতর হইব না, [illegible] প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত লড়াই করিব—লক্ষ্মী আমাদিগকে দয়া করিবেন এমন ভরসা আমরা করি না—আমরা চাই অলক্ষ্মীকে অধিক সম্মান করি—লক্ষ্মী বড় চঞ্চলা—অলক্ষ্মী অচঞ্চলা এবং সরলা—আমরা তাহাকেই সহজে চিনিতে পারি—তাই তাহার সহিত একযোগে কার্য্য করাই সহজ মনে করি—তাই বলি হে নববর্ষ তুমি আমাদের জন্য সমৃদ্ধি আনিও না—তাহাতে আমরা দুঃখিত হইব না—কেবল আমাদের চিত্তের দৃঢ়তা রক্ষা করিও—দেখিও যেন প্রাণে লক্ষ্মীর চরণ প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টি আপতিত না হয়—উপবাসে শরীর দৃঢ় হয়—আত্মার ক্ষুধা আত্মাকে শক্তিশালী করে—তুমি উভয় ক্ষুধা বাড়াইও তাহাতে আপত্তি করিব না—বরং তোমাকে তজ্জন্য অভিনন্দন করিব—

ধনীর রাজপ্রাসাদে আমাদের আশ্রয় যেন না গ্রহণ করিতে হয়—দরিদ্রের পর্ণকুটীর আমাদের স্বর্গ—আমরা তথায় চিত্তের তৃপ্তি খুঁজিব—হে নববর্ষ আমাদের অভিপ্রায় অভিলাষ যেন এই ভাবে সিদ্ধ হয়। তুমি আমাদের সহায় হও।”

*

* *

১৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা হৃষীকেশ লাহা, ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ডাক্তার নীলরতন সরকার-প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং বেঙ্গলী, মডার্ণ রিভিউ, ইণ্ডিয়ান্ ওয়ারল্ড, অমৃতবাজারপত্রিকা, কলেজিয়ান ইত্যাদি দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্র বহু আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণভাবে প্রশংসা করেন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঢাকা হেরল্ডে মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বি, এল্ মহাশয়ের মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। মন্তব্যটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারবান।

বিপিন বাবু উক্ত বিদ্যালয়ের দুইটি জিনিষকে প্রশংসা করিয়াছেন। একটি—ছাত্রদিগের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যায়ামাদির বন্দোবস্ত থাকা, আর একটি—ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ে ছাত্রদিগের মধ্যে মৌলিক গবেষণাবৃত্তি স্ফূরণ করিবার উপায় অবলম্বন করা। কিন্তু ছাত্রদিগের স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য কোনরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত নাই দেখিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন। বিপিন বাবুর মতে দেশে ধনাগমের যতগুলি পন্থা আছে, সমস্তই এবং আরও কতকগুলি ছাত্রদিগকে শিখান কর্ত্তব্য।

বিদ্যালয়ের রেশিডেন্সিয়াল প্রকৃতি সম্বন্ধে বিপিন বাবুর মত এই যে—যখন ঐরূপ বিদ্যালয়ে দেশের প্রকৃত অভাব আদর্শ আচার-ব্যবহারের কোন স্থান নাই, তখন ছাত্রেরা ঐরূপ বিদ্যালয়ে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে দেশের সনাতন রীতি-নীতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে—ভুলিয়া যাইবে কি প্রকারে জাতীয় ভাবে নিজেদের সংসার-কর্ম্ম সমাধা করিতে হয়!

বিপিন বাবুর মতে উক্ত বিদ্যালয়ে এমন কোন ব্যবস্থা থাকা উচিত যাহাতে বাহিরের জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণ এক বা ততোধিক বিষয় শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়স্থ বিজ্ঞানাগার, কারখানা, লাইব্রেরী, যাদুঘর প্রভৃতি সময় সময় ব্যবহার করিতে পারে। বড় লোকদিগের পুত্রগণকে শিক্ষা দিবার জন্য যদি নিতান্তই কলেজ করিতে হয়, তবে তাহা পূর্ব্বোক্ত ধরণেরই হওয়া উচিত।

সর্ব্বশেষে বিপিন বাবু বলিয়াছেন, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীতে বঙ্গসাহিত্য পড়ান কর্ত্তব্য। বিদেশের উচ্চ বিজ্ঞান, দর্শন, সমালোচনা, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্ত বিষয় বঙ্গভাষায় যাহাতে অনূদিত হয় তাহার জন্য ছাত্রদিগের আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত করা আবশ্যক। ইহার জন্য যদি তাহাদিগকে সম্মান, বৃত্তি বা উপাধি দিতে হয়, তাহাও দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শিক্ষায় ব্যক্তিত্ব *

আত্মবোধের পরিবর্ত্তন

এমন এক সময় ছিল, যখন আত্মখর্ব্বতায় লোকে গৌরব বোধ করিত। স্বাধীনভাবে বর্দ্ধিত হইতে দিলে মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিনিচয় কেবল নিম্নগামীই হইবে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের সর্ব্বথা দমন ও উচ্ছেদসাধনকে তাহারা একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত। অপরের অধীনতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতির আসন প্রদান করিয়া মানব-প্রকৃতির দলন ও ব্যক্তিত্বের সংহারকে এই নীতিপালনের প্রধান সোপান বলিয়া বিবেচনা করিত।

কিন্তু নবযুগের শিক্ষাতত্ত্ব বিভিন্ন নীতির ঘোষণা করিতেছে। আত্মপরিচালন, আত্মপ্রকাশ, আত্মস্ফূর্ত্তি, আত্মনির্ভর ও আত্মশাসন আধুনিক শিক্ষার মূলমন্ত্র। এই আত্মা বা ব্যক্তিই শিক্ষার কেন্দ্র এবং ইহার বিকাশই শিক্ষার কার্য্য ও সাধনা। চারাগাছের ন্যায় শিশুও প্রশস্ত সীমার মধ্যে নিজ গন্তব্য স্থির করিয়া লয়, পরবর্ত্তী কালের ক্ষুদ্র সীমাসমূহ সামাজিক শক্তি ও আদর্শের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কেবলমাত্র অন্তর্নিহিত শক্তির অনুশীলন ও ক্রম-স্ফূরণের দ্বারাই এই গন্তব্যে পৌছান যায়। উদ্যানপালকের ন্যায় শিক্ষকের কর্ত্তব্য,—কোনও নূতন কিছু সৃষ্টি করা নয়, কেবল পুষ্টিকর আহার্য্য যোগান ও বেষ্টনী প্রস্তুত করিয়া দেওয়া মাত্র। এক কথায়, ব্যক্তিত্বের বিনাশ সাধন না করিয়া তাহার বিকাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে পারিলেই প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

মানবপ্রকৃতি যতই বৈচিত্র্যপূর্ণ হউক না কেন, এই বিধির যথাযথ প্রয়োগ সুফল প্রদান করিবেই। যে প্রকারের খাদ্য যে ব্যক্তির বিশেষ প্রকৃতির উপযোগী, কেবল তাহাই তাহার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। অপরাপর খাদ্য যতই চর্ব্বিত হউক না কেন, তাহা দ্বারা ঈপ্সিত ফল লাভ হয় না। অতএব ব্যক্তিকেই রাজাসন দিতে হইবে। মনোবিজ্ঞানের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আমাদের মধ্যে এমন কোন সাধুপুরুষ নাই, যিনি পূর্ব্ব হইতেই অপরের শিক্ষা-জীবনের লক্ষ্য ও মাপকাঠি স্থির করিয়া দিতে পারেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ অভিরুচি নিজেই ভাল বুঝিতেই পারে, নিজেই নিজের খাঁটি পথ বাছিয়া লইতে ভাল পারে। সত্য সত্যই, যদি সে ন্যায়সঙ্গত ভাবে কোনও মূল্যবান্ ও মঙ্গলময় কার্য্য করিতে চায়, তবে তাহাকে তাহার এই বিশেষ অধিকার "ব্যক্তিত্বের" পরিচালনা করিতেই হইবে।

এই পরিবর্ত্তনের কারণ

শিক্ষা বিষয়ে এই যে আমরা এক আত্মসম্মান ও ব্যক্তিত্বের দাবীর উত্থাপন

* "ব্রহ্মবিদ্যা" হইতে উদ্ধৃত।

করিতেছি, তাহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, আমরা আমাদের সব পাপকলঙ্ক মুছিয়া ফেলিয়া আদর্শ পুরুষ হইয়া বসিয়াছি? শীঘ্রই কি এই মর্ত্ত্যবাসী নরনারীগণের মধ্যে দেবতার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে? বোধ হয়, কখনই না। আমরা কেবলমাত্র এমন এক উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিতেছি, যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা ক্রমশঃ মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারিব। সেই উপায়টি এই যে, প্রত্যেককেই নিজ বিশেষত্বটি বুঝিয়া লইতে হইবে, অর্থাৎ সে নিজে যাহা, তাহাকে তাহাই হইতে হইবে। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে নিজ নিজ প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান ছিল, আজকালকার বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধানের দিনে নিশ্চয়ই আমরা তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছি; এবং ইহার ফলে বালকগণের শিক্ষাপ্রদানকালে স্বতঃই আমাদের মনে দুইটি জটিল প্রশ্নের উদয় হয়:—১ম, বালক-মনের মূলপ্রকৃতি; ২য়, ইহার অভিব্যক্তির ধারা।

প্রথম প্রশ্নটির সম্বন্ধে আমাদের এখন এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, বালকগণ স্বভাবতঃ ভয়, ভালবাসা, ঔৎসুক্য, অহঙ্কার, অনুকরণশীলতা, গঠনপ্রিয়তা, সৌন্দর্য্যবোধ প্রভৃতি বহুবিধ ভাব ও বৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিবার চেষ্টা ফলবতী করিতে হইলে, এই ভাব ও বৃত্তিসমূহের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং ইহাদিগকে ভিত্তি করিয়া তাহাদের শিক্ষাসৌধ গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, তাহাদের বৃত্তিগত প্রবৃত্তিসমূহের ক্রমবিকাশের দ্বারাই তাহাদের শিক্ষার উন্নতি সাধিত হয়, অন্ধভাবে ইহাদের দমনের দ্বারা এই উন্নতি লাভের আশা করা যাইতে পারে না। আবার, একের জন্মগত প্রকৃতির সহিত অন্যের জন্মগত প্রকৃতির সাদৃশ্য নাই এবং উভয়ের বেষ্টনী ও পারিপার্শ্বিকও এক নয়, সুতরাং দুই জন লোক সম্পূর্ণ একরকমের হইবে, এরূপ ধারণা করাও অন্যায়; তাহাদের জ্ঞানে, আকাঙ্ক্ষায় ও ক্রিয়াকলাপে পার্থক্য থাকিবেই। কলুষ ও কদাচার হয় ত পূর্ব্বের ন্যায়ই বিদ্যমান থাকিবে—এমন কি অনেক সময় বাড়িয়া উঠিতেও পারে; তথাপি কোনও লোককে শুভ ও সারবান্ কার্য্যের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইলে, তাহার স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহের শক্তির ব্যবহার করিতেই হইবে—কখনও দমন, কখনও বা গতিপরিবর্ত্তন, কিন্তু অধিকাংশস্থলেই তাহাদের উন্মেষ ও বিকাশে সাহায্য প্রদান করিতে হইবে। যে সমস্ত কার্য্য তাহার প্রিয় ও প্রকৃতির উপযোগী, সে সমস্ত কার্য্যই তাহার করিবার প্রয়োজন না হইতে পারে; কিন্তু যে কার্য্যটি তাহাকে করিতে হইবে, তাহা হইতে যদি কোন সুফল প্রত্যাশা করিতে হয়, তবে সেটি তাহার প্রকৃতির উপযোগী হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহাই তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশের স্তর হইবে এবং তাহার অতীত জীবন-কাহিনী বিবৃত করিবে।

ভাষা-রচনায় স্বাধীন চিন্তার মূল্য

বালকগণের শাসনকালে উল্লিখিত বাক্যটির সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নশিক্ষক প্রধান শিক্ষকের অনুকরণদ্বারা

স্ব-শ্রেণীশাসনে প্রায়ই অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। ছাত্রগণ এরূপ শিক্ষকের মধ্যে প্রকৃত শক্তির অভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি স্বভাবতঃই উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকে। ছাত্রগণের ভাষারচনা এই ব্যক্তিত্বের স্পষ্টতম উদাহরণ। রচয়িতা স্বীয় ভাবরাশি স্বাধীন-ভাবে ব্যক্ত করিতে পারিলেই রচনার মূল্য বৰ্দ্ধিত হয়, অপরের কথা ধার করিবার অভ্যাস করিলে চিরকাল কেবল ধারই করিতে হয়। এরূপ প্রথায় কোনকালে নূতন ও লাভজনক পদার্থের সৃষ্টি হয় না—জগতের কোনও উপকার হয় না। সুতরাং যখনই কোন মূল্যবান্ পদার্থের সৃষ্টি হইবে, তখনই তাহার উপর সৃষ্টিকর্ত্তার নিজত্বের ছাপ থাকিবেই।

ইহার কারণ এই যে, কেবল মাত্র আত্মপ্রকাশের দ্বারাই স্বাভাবিক ফল লাভ করা যায়। যতক্ষণ আমি জ্ঞাতসারে অপরের অনুকরণ করিতেছি, অথবা অজ্ঞাতসারে তৎকর্ত্তৃক এত মুগ্ধ হইয়াছি যে, স্বীয় প্রকৃতি ও শক্তির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিতেছি, ততক্ষণ আমি কেবল মিথ্যার ঢাক বাজাইতেছি মাত্র। অপরের চিন্তা যতই উত্তম হউক না কেন, তাহা দ্বারা আমি কখনই আপনাকে সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত করিতে পারিব না। এমত অবস্থায় নিজত্বের ভান করিয়া জগৎকে প্রতারিত করিব মাত্র। যে ব্যক্তি নিজের মূল্য উপলব্ধি করিতে যত্নবান্ নয়, সে কখনই অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। নিজের প্রতি সততা প্রদর্শনের জন্য ও অপরের ইচ্ছার অন্ধ-দাসত্ব হইতে নিজকে মুক্ত রাখিবার জন্য প্রথমতঃ নিজকে পাঠের ও সম্মানের সামগ্রী করিতে হইবে। তৎপর চিন্তায় ও শিক্ষায় মৌলিকতার আশা করা যাইতে পারে। অন্যের ধারণা ও চিন্তা স্বীয় অস্থিমজ্জাগত করিবার শক্তিদ্বারাও স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভাষারচনায় সাধারণ জীবনের অভিব্যক্তি

ভাষারচনা বিদ্যালয়ের শিক্ষার সারবত্তার প্রধান পরিচয়। ইহাদ্বারা সাধারণ জীবন অভিব্যক্ত হয়। সংসারের বিবিধ সম্বন্ধে বুঝিবার চেষ্টায় যদি কপটতা ও কৃত্রিমতার গন্ধ থাকে, তবে তাহা রচনায় ও জীবনে কুফল উৎপাদন করে। যাহা কিছু ভাল, তাহার মধ্যে সত্য পূর্ণরূপে বিরাজ করিবেই। সুতরাং মনুষ্য-সমাজে ব্যক্তিগত পার্থক্য যতই থাকুক না কেন, কোনও মানুষের চেষ্টা ও কর্ম্ম হইতে লাভের আশা করিতে হইলে, তাহাকে স্বীয় প্রকৃতির প্রতি খাঁটি থাকিবার শিক্ষা দিতে হইবেই।

আমরা আত্মচেষ্টাগঠিত মানুষ সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক কথাই শুনিয়া থাকি। ইহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষার সাহায্য না পাইয়াও কর্ম্মক্ষেত্রে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে; যে সকল লোক স্বীয় আভ্যন্তরীণ শক্তিরাশিদ্বারা চালিত হইয়া থাকে, ইহারা তাহাদেরই উদাহরণস্থল। সত্যসত্যই যে ব্যক্তি যে পরিমাণে মনুষ্য-পদবাচ্য, সে সেই পরিমাণেই আত্মশক্তিগঠিত। মানব-নামের অধিকারী হইবার জন্য তাহাকে স্বীয় দৃষ্টিশক্তি, যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধির পরিচালনা করিতে হইয়াছে। পারিপার্শ্বিকের সহিত মিলন-সাধনক্রিয়া তাহার স্বীয় শক্তিদ্বারাই সম্পাদিত

হইয়াছে, এবং উদার আত্মসম্মানই তাহার কৃতকার্য্যতা আনয়নে প্রথম সাহায্য প্রদান করিয়াছে। আত্মশক্তির প্রতি বিশ্বাসই কর্ম্মসফলতার প্রথম প্রয়োজন এবং আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের প্রতি বাধ্যতা এই বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া থাকে। জ্ঞানী যথার্থই বলিয়াছেন, "তুমি প্রথমে নিজের প্রতি সত্য ও বিশ্বাসযুক্ত হও, তাহা হইলে সকলের প্রতিই সত্য রক্ষা করিতে পারিবে।" ইংরাজ পণ্ডিত মিল বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তির আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাহার নিজের—তাহার স্বীয় শক্তি দ্বারা পুষ্ট ও পরিচালিত এবং স্বকীয় প্রকৃতির বাহ্য প্রকাশ—কেবল সে ব্যক্তিই চরিত্রবান্। যাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাহার নিজের নয়, সে চরিত্র-হীন—ঠিক যেমন বাষ্পচালিত কল চরিত্রহীন।"

প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বীয় বিশেষ ব্যক্তিত্বটি স্বীকার করিয়া লইবার প্রয়োজনীয়তা

অতএব জীবনযাত্রা আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক লোকেরই স্বীয় বিশেষ ব্যক্তিত্বটি স্বীকার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। অবশ্য প্রত্যেক মনুষ্যই কখনও কখনও স্বীয় শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতি এত বিশ্বাসহীন হইয়া পড়ে যে জীবন-সফলতা তাহার নিকট আকাশ-কুসুম বলিয়া বোধ হয়। স্বকীয় দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া ও চতুঃপার্শ্বস্থ বহুলোকের উচ্চতর গুণাবলী ও ক্ষমতারাশি দেখিয়া সে মনে মনে ভাবে যে, যদি সে এই উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে এক-জন হইত; এবং এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ঈর্ষ্যা তাহার মনকে অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু জ্ঞানী ইমার্সন বলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তিই শিক্ষা-জীবনের এমন এক স্তরে উপস্থিত হয়, যখন তাহার মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে, ঈর্ষ্যা অজ্ঞান-প্রসূত এবং অনুকরণ আত্মহত্যাস্বরূপ; ভালই হউক আর মন্দই হউক, তাহার উন্নতির সহায় স্বরূপ স্বীয় ব্যক্তিত্বটিকে গ্রহণ করিয়া লইতেই হইবে। এই বিশাল বিশ্ব মঙ্গলপূর্ণ সত্য, কিন্তু কোন ব্যক্তিই ভগবৎ-প্রদত্ত স্বকীয় ভূমিখণ্ডের যথাযথ কর্ষণে শ্রম ও শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত তাহা হইতে পুষ্টিকর শস্যের আশা করিতে পারে না।" এই বিশ্বাসের মধ্যে যেন আত্মভর্ৎসনার ভাব মিশ্রিত না থাকে। নিজের প্রতি প্রীতি, সন্তোষ ও বিশ্বাসের ভাব বর্দ্ধন করতঃ এ জগতে মূল্যবান্ কর্ম্ম করিবার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে হইলে, প্রত্যেককেই স্বীয় বিশেষ ব্যক্তিত্বের পরিচালন করিতে হইবে।*

এরূপ ব্যক্তিত্ববোধ কি সামাজিক শৃঙ্খলার কণ্টকস্বরূপ?

কিন্তু যেখানে সামাজিক শৃঙ্খলা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সেখানে এরূপ অজেয় ও অজিগীষু মন কি বাঞ্ছনীয়? যাহারা স্বীয় মত সহজে ত্যাগ করিয়া অম্লান বদনে অপরের মতের সমর্থন করে, তাহারাই কি প্রকৃত পক্ষে সামাজিক শৃঙ্খলার সহায়? কখনই না। স্বীয় স্বাধীন মত অক্লেশে পরিত্যাগ করিয়া অপরের ইচ্ছাধীন হইবার ক্ষমতাটি বিশেষ গুণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, কিন্তু এরূপ অন্ধ অধীনতা দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। যে জ্ঞান ও শক্তি অপরের মতসমর্থনের দাবীসমূহের

বিচারে সমর্থ, সেই জ্ঞান ও শক্তির দ্বারা এই দাবীসমূহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিলেই সারবান্ মিলন সম্ভব হয়, এবং যাহাদের ব্যক্তিত্ব পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারাই এরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারে।

এমন কি, যে সামরিক শিক্ষায় অন্ধভাবে আদেশ-পালনের প্রয়োজন অধিক, তাহাতেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূল্য দেখিতে পাওয়া যায়। সমর-প্রাঙ্গণে কখনও কখনও সৈনিক পুরুষগণ অধ্যক্ষদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহাদিগকেও স্বাধীন চিন্তার দ্বারা যুদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। জীবনের সর্ব্ববিধ অবস্থায় এই ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন-বোধই বর্ত্তমান কালে য়ুরোপীয় জাতিগণকে লোকশিক্ষায় প্রণোদিত করিয়াছে।

দৈনন্দিন সামাজিক জীবন যাপনেও আমাদিগকে এই আত্মবিচার ও আত্মনির্ভরতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সমাজে ডেমক্রেসির ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলেও, প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীন বিচার-শক্তি ও সচ্চরিত্রতা লাভ করিতে হয়।

সুতরাং আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ভীত, লজ্জিত, এবং যাহার মন দাসত্বের ভাবে পূর্ণ, সে কখনই আদর্শ পুরুষ নামে অভিহিত হইতে পারে না; পরন্তু যে অন্যের অনুকরণ না করিয়া স্বশক্তিপরিচালনে ভয়বোধ করে না—এক কথায় যে স্বাভাবিক ও সৎভাবে জীবন যাপন করে,—সে-ই আদর্শ ব্যক্তির আসন পাইবার যোগ্য। তাহার আত্মবিশ্বাস ও স্বাভাবিকতা সততা ও আত্মসম্মান আনয়ন করে এবং তাহার চিন্তা ও কর্ম্মরাশির উপর তাহার নিজত্বের ছাপ প্রদান করে।

প্রকৃত গ্রন্থপাঠে মানসিক প্রতিক্রিয়ার আবশ্যকতা

গ্রন্থ পাঠকালেও আমরা স্বাধীন চিন্তা ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়া থাকি। গ্রন্থপাঠ হইতে ফল লাভ করিতে হইলে, পাঠের উদ্দেশ্য স্থির, পঠনীয় বিষয়ের বিস্তার, শৃঙ্খলা ও সারবত্তা বিচার করিতে হয়। এই সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য স্বাধীনচিন্তা ও মানসিক বলের প্রয়োজন। একদিকে গ্রন্থোল্লিখিত সুতথ্যগুলি নিজস্ব করিবার জন্য যেমন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন, অপরদিকে গ্রন্থকর্ত্তার ভ্রান্তি ও যুক্তিহীনতা দর্শনে অধৈর্য্য হইতে নিজকে রক্ষার নিমিত্তও তেমনই মানসিক বলের প্রয়োজন। রাশি রাশি গ্রন্থপাঠ ও বহু বহু কর্ম্মে যোগদান করার পরও অনেক লোক কর্ম্মক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। গ্রন্থপাঠ ও কর্ম্মসাধনকালে ব্যক্তিত্বের অপ্রয়োগ বা অপপ্রয়োগই ইহার মুখ্য কারণ।

বিদ্যালয়ে শিক্ষায় সহজ দাবীগুলির পূরণে বালকগণের অস্বাভাবিক সঙ্কোচবোধ

এক্ষণে একবার শিক্ষাকালে বালকগণের অস্বাভাবিকতা ও অসাহসিকতার কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা তাহাদের কুফল বিচার করিয়া দেখা যাউক। অনেক সময় অনেক বালক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকট কোনও বিষয়

বুঝিয়া লইবার জন্য শিক্ষক মহাশয়কে প্রশ্ন করিতে ভয় ও সঙ্কোচ বোধ করে, এবং শিক্ষক কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াও সাহসের সহিত উত্তর প্রদান করিতে পারে না; অধিকাংশ স্থানে না বুঝিয়াও 'বুঝিয়াছি' বলিয়া শিক্ষক হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করে। বালকগণের এরূপ ব্যবহারের কারণ তাহাদের অস্বাভাবিক সঙ্কোচ ও আত্মখর্ব্বতা। শিক্ষা-ক্ষেত্রে সৎসাহসের অভাব এইরূপে তাহাদিগকে প্রকৃত শিক্ষালাভে বঞ্চিত করে।

গ্রন্থ ও শিক্ষকের প্রতি ছাত্রগণের অতিনির্ভরশীলতা

শিক্ষককে প্রীত করিবার ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াও অনেক সময় বালকগণ প্রকৃত উত্তর বিস্মৃত হইয়া শিক্ষকের মুখভাব নিরীক্ষণ করতঃ ভ্রান্ত উত্তর প্রদান করে। শিক্ষকের প্রতি অতি ভয় বা অতি শ্রদ্ধা হেতু তাহাদের এরূপ স্বভাববিকার ঘটিয়া থাকে। শিক্ষকের মতের বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা তাঁহার অসন্তোষোৎপাদন ভয়ে অনেক ক্ষমতাবান্ ছাত্রও অনেক সময় সদালোচনা হইতে ক্ষান্ত হয়। শিক্ষকের ন্যায় গ্রন্থের উপরও ছাত্রেরা অতি-নির্ভরশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। প্রাথমিক বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ও ব্যাকরণের লিখিত বিষয়গুলির অধিকাংশের সহিত অন্যত্র প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত থাকিয়াও বিদ্যালয়ে পাঠ প্রদান কালে ছাত্রগণ বহুক্লেশ অনুভব করিয়া থাকে। গৃহে নির্দ্দিষ্ট পাঠটি দশবার অধ্যয়ন করার পরও শ্রেণীতে আবৃত্তি করার সময় যদি তন্মধ্য হইতে একটি শব্দ বা একটি বাক্য বাদ পড়িয়া যায়, তবে অবশিষ্ট কথাগুলি আর বলিতে পারে না। কিন্তু পুস্তক ছাড়িয়া দিয়া যদি তাহাদিগকে তাহাদের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়, তবে অক্লেশে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া থাকে। মুদ্রিত অক্ষরগুলির প্রতি অতিভক্তিই তাহাদের অভিজ্ঞতাকে পশ্চাতে রাখিয়া প্রকৃত শিক্ষায় বিঘ্ন উৎপাদন করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও পাঠ গ্রহণকালে কখনও কখনও ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। পুস্তকে অনেক সময় অনেক কথাই লেখা থাকে; প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর প্রদানকালে কোনও কোনও বুদ্ধিমান ও বিচারশীল বালক পুস্তক-লিখিত অনাবশ্যক অংশ বাদ দিয়া সার কথা-গুলি বলে, কিন্তু আমাদের কোন কোন শিক্ষক মহাশয় পুস্তকলিখিত বিষয়গুলি যথাযথ আবৃত্তি করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করেন। শিক্ষকগণ কর্ত্তৃক অযথা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অনেক ক্ষমতাশালী ছাত্রেরও বুদ্ধি ও বিচারশক্তি ক্ষীণ হইয়া আইসে।

অনেক সময় শিক্ষককর্ত্তৃক এত অধিক পরিমাণ পাঠ নির্দ্দিষ্ট হয় যে, ছাত্রগণ পাঠ প্রস্তুত কালে স্বীয় চিন্তার সুবিধা ও অবসর পায় না; কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, স্বাধীন চিন্তার দ্বারাই পঠনীয় বিষয়গুলি যথাযথ নিজস্ব হইয়া থাকে। ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই এই অস্বাভাবিক রীতি পরে বুঝিতে পারিয়াও ত্যাগ করিতে পারে না। তাহার ফলে এই হয় যে, মধ্যবুদ্ধি ছাত্রবৃন্দ তাহাদের নিজের প্রশ্ন, সন্দেহ ও বক্তব্যের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হয়। অবশ্য কোনও কোনও বিচারশীল ছাত্র এ রীতির বিরুদ্ধাচরণ করতঃ স্বাভাবিক রীত্যনুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা করে।

বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের আত্মপরিচালন-শক্তির অভাব ও দমন

বিদ্যালয়ে শিক্ষকসমক্ষে পাঠপ্রস্তুতকালে অথবা প্রশ্নের উত্তর প্রদানকালে ছাত্রগণের মধ্যে আত্মপরিচালনশক্তির অত্যন্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। কোনও একটি প্রশ্নের যতটুকু উত্তর প্রদান আবশ্যক, বিবেচনা না করিয়া তাহার বেশী উত্তর প্রদান করা, উত্তর প্রদান শেষ হইয়া গেলেও শিক্ষকের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত বৃথা দণ্ডায়মান থাকা ইত্যাদি ইহার উদাহরণ। কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, এ শক্তির অভাব বালকগণের প্রকৃতিগত; কিন্তু গৃহে ও ক্রীড়াক্ষেত্রে ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও কোনও বালকের প্রকৃতিতে ইহার অভাব আছে বটে, কিন্তু শিক্ষকের অপরিচিত আকৃতি, নূতন স্থান ও নূতন শিক্ষাগৃহের প্রতি ভয় ও চমক অনেক সময় তাহাদের এই নবাঙ্কুরিত শক্তিকে অভিভূত করিয়া থাকে। কোনও কোনও বালকের মধ্যে এই শক্তির সদ্ভাব দৃষ্ট হইলেও, শিক্ষক ও অভিভাবকগণ ইহার অনুশীলনের ব্যবস্থা না করিয়া দমনেরই আয়োজন করেন। মানসিক গুণের সহিত নৈতিক গুণের ভ্রান্ত সংমিশ্রণই ছাত্র ও শিক্ষককে এই দমনক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিত করে। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, নীতির ক্ষেত্রে যে ত্যাগ ধর্ম্ম, মানসিক উন্নতিসাধনে তাহা অধর্ম্ম।

বাল্য হইতেই বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বালকগণের মধ্যে আত্ম-অধ্যক্ষতার শক্তির অনুশীলনের অভ্যাস জন্মাইবার চেষ্টা না করিয়া যদি তাহার উপেক্ষা ও দমনের আয়োজন করা হয়, তবে জীবনে অবসাদ ও চরিত্রে শৈথিল্য আসে, এবং বয়োপ্রাপ্ত হইয়াও তাহাদের কোনও কর্ম্মে অগ্রণী হইবার ও নূতন জিনিষ গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা থাকে না, শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তা, সৎপ্রশ্ন ও স্বাধীন গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহারা নিজে যন্ত্রের চালক না হইয়া যন্ত্রই তাহাদের চালক হইয়া বসে, এবং এইরূপে তাহাদের জীবন কৃত্রিম ও অধীন হইয়া পড়ে। তাহারা পরীক্ষায় সুন্দররূপে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেও কর্ম্মজীবনে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারে না। নিজের প্রতি বিশ্বাসহীনতা তাহাদের প্রকৃতিতে এত বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, কোনও নূতন সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে পুস্তক ও বন্ধুর উপর নির্ভর করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় তাহারা যাহা কিছু করে, তাহার মধ্যে সার খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কারণ, ইহা আমাদের স্বকীয় সুস্থ-প্রকৃতির প্রকৃত প্রকাশ নয়। এরূপ শ্রেণীর লোকগণকে মিল্ নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, "তাহারা জনতার মধ্যেই থাকিতে ভালবাসে, তাহাদের অভিরুচি কেবল সাধারণ পদার্থের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, বিশেষ রুচি ও বিশেষ চরিত্র দোষযুক্ত বলিয়া পরিত্যাগ করে, স্বীয় স্বভাবের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিতে করিতে এমন অবস্থায় উপস্থিত হয় যে, তাহারা কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিতে পারে না, তাহাদের মানবীয় গুণাবলী শুষ্ক ও লুপ্ত হয়, দৃঢ় ইচ্ছা ও আনন্দভোগের শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে, এবং অন্তরের

স্বাভাবিক ভাব ও মনের স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা থাকে না।"

ছাত্র-শিক্ষকসম্বন্ধে ছাত্রের ব্যক্তিত্বের অসম্মান ও তাহার কুফল

ছাত্র-শিক্ষক-সম্বন্ধেও আমরা ছাত্রের ব্যক্তিত্বের প্রতি শিক্ষকের অতিরিক্ত অসম্মান ও অবহেলার ভাব লক্ষ্য করিয়া থাকি। ছাত্রের ব্যক্তিত্বের প্রতি শিক্ষকের আচরণ সম্মানের ভাব প্রদর্শন না করিলে ছাত্রের আত্মসম্মানের হানি হয়। অনেক ছাত্রের ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মানের ভিত্তি, শিক্ষকের অহমিকা ও বিদ্রূপপূর্ণ ভাব দ্বারা চিরকালের জন্য শিথিল হইয়া যায়।

সাধারণতঃ শিক্ষকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। শিক্ষকমহাশয়গণ কখনও কখনও মনে করেন যে, বিদ্যালয় তাঁহাদের নিজের উপকার ও স্বার্থসিদ্ধির জন্যই বিদ্যমান আছে। শিক্ষকগণের এরূপ ভাব-পোষণ ছাত্রগণকে ভিক্ষুকের অবস্থায় পরিণত করে। ছাত্রগণ শিক্ষা সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে কোনও কোনও শিক্ষক অধৈর্য্যের ভাব দেখাইয়া থাকেন এবং শিক্ষকের কোন কথায় আপত্তি উত্থাপন করিলে ছাত্রগণের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্যের অভিযোগ উপস্থিত হয়। শিক্ষক মহাশয়গণের এরূপ ব্যবহার দ্বারা শিক্ষালাভের জন্য পারিপার্শ্বিকের প্রতি ছাত্রগণের মানসিক প্রতিক্রিয়ার শক্তি লোপ প্রাপ্ত হয়।

ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা স্থাপনের জন্য জগতে অনেক শোণিতপাত হইয়াছে, অথচ মনের উপর মনের অত্যাচার কিছুমাত্র অন্যায় বলিয়াও স্বীকার করা হয় না। ইহার কারণ এই যে, কি শিক্ষক কি পিতামাতা, সকলেই বালকগণের কেবল জ্ঞানের পরিমাণেই মত্ত রহিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের আভ্যন্তরীণ শক্তিরাশির প্রতি বড় দৃক্পাত করেন না।

ব্যক্তিত্বের সংরক্ষণ ও বিকাশ-সাধনে কাঠিন্য

শিক্ষায় ব্যক্তিত্বের স্থান যতই উচ্চে হউক না কেন, ইহার সংরক্ষণ ও বিকাশসাধন বড় শক্ত ব্যাপার। ইহার প্রধান কারণ এই যে, কিরূপে নিজের প্রতি সত্যরক্ষা করিতে হয়, আমরা তাহা জানি না;—"আত্মানং বিদ্ধি" ঋষিবাক্যের অর্থ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। অনেক সময় স্বীয় বুদ্ধিবলে নিজ প্রকৃতি ও নিজ চিন্তার সহিত পরিচয়লাভ করিতে পারি না, এবং এইরূপে দৃঢ় ইচ্ছা সত্ত্বেও আমাদিগকে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। বিদ্যালয়েও আমাদের শিশু-প্রকৃতির বিশেষত্বগুলি শিক্ষক ও শিক্ষারীতি দ্বারা দমিত হয়; কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় শিক্ষকই ব্যক্তিত্বের রক্ষা ও বিকাশ-সাধনের তত ধার ধারেন না।

প্রহারই বালকগণকে মানুষ করিবার একমাত্র উপায় নয়। তাহাদের মন ও চিত্তের স্বাধীনতার ভাব বর্দ্ধনের উৎকট প্রস্তাবে হয় ত আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়গণ চমৎকৃত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু উপায় নাই —সত্যের নিকট তাঁহারা না হয় সানন্দচিত্তে পরাভবই মানিলেন!

ব্যক্তিত্ব-বোধ-বৰ্জ্জিত লোক প্রকৃত মনুষ্য-পদবাচ্য হইতে পারে না। অতএব ইহার বিকাশ-সাধনে যথাযোগ্য সময় ও শক্তি প্রদান করিতেই হইবে। প্রত্যেককেই মানসিক জ্ঞান লাভের জন্য সৎসাহস অর্জ্জন করিতে হইবে, এবং দেখিতে হইবে, যেন অপরের প্রতি অতি ভক্তি তাহার স্বশক্তির প্রতি বিশ্বাসের মূল শিথিল করিয়া না দেয়। এই গুণ অর্জ্জন করিতে হইলে আত্মসম্মানের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে; এই আত্মসম্মান উপযুক্ত অনুশীলন দ্বারা লাভ করিতে পারা যায়। আত্মবোধের বিকাশ-সাধনই যদি শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে প্রত্যেককে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে, যেন অন্যের চাপে তাহার আকার-বিকৃতি না ঘটে। ব্যক্তিত্বের সংরক্ষণ ও বিকাশসাধন জন্য প্রত্যেককেই পরসম্মান ও আত্মসম্মান এবং পরচিন্তা ও আত্মচিন্তার জন্য সমান সময় ও সমান শক্তির ব্যয় করিতে হইবে। আমি কি ভাবি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া অন্যে কি ভাবে, তাহা না বুঝা পর্য্যন্ত যদি অপেক্ষা করি, তবে আমার পক্ষ হইয়া অন্যেই আমার চিন্তা করিয়া দিবে এবং আমাকে চিরকাল ভয় ও সঙ্কোচেই কাটাইতে হইবে। এতৎসম্বন্ধে ইমার্শন দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন;—"যে আলোক ভিতর হইতে উত্থিত হইয়া সমস্ত হৃদয় মন প্রভাম্বিত করে, কবি-ঋষির দিব্য জ্যোতির অপেক্ষা তাহারই সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হওয়া প্রত্যেক মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য। তথাপি সে নিজের চিন্তা অবহেলায় পায়ে ঠেলিয়া দেয়, কেননা সেটা তাহার নিজের। প্রতিভাবান্ ব্যক্তির প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে আমাদেরই পরিত্যক্ত চিন্তার চিহ্ন দেখিতে পাই; ইহা পরভাবে পুষ্ট হইয়া আমাদের নিকট পুনরাগমন করে। জগতের সুপ্রসিদ্ধ শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদিগকে এতদ্ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষা প্রদান করে না। ঘোর নৈরাশ্যের মধ্যেও স্বীয় অন্তরোদ্গত ভাবানুযায়ী কার্য্য করিতে তাহারা আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে। নতুবা কল্য একজন বিদেশী আসিয়া আমাদেরই চিন্তা বীরের ন্যায় সদর্পে ঘোষিত করিবে এবং আমাদিগকে তাহা সলজ্জ বদনে ও নতশিরে গ্রহণ করিতে হইবে।"

শ্রীনবীনচন্দ্র দাস,
মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির ছাত্র-শিক্ষক,
উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়,
আমেরিকা।

স্বজাতি-বিবাহে নিকট রক্ত-মিশ্রণ

মানব-বিজ্ঞানে বিবাহ-তত্ত্ব

মানব-বিষয়ক বিজ্ঞানে যাঁহারা সুপণ্ডিত তাঁহারা উদ্বাহ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বিবাহ-সম্বন্ধ ক্ষুদ্র সামাজিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইলেই নিকট রক্ত-সংযোগ হয়। তাহার ফলে কালক্রমে সন্তানগণের আকৃতি খর্ব্ব হয়, বলক্ষয় হয়, অঙ্গের বিকৃবতা জন্মে, এবং উৎপাদন-ক্ষমতা নষ্ট হয়। এক্ষণে এই

'ক্ষুদ্র সামাজিক গণ্ডী'র পরিসর কত দূর তাহা বিচার করিয়া স্থির করা উচিত। এক আদি পিতামাতার সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে বিবাহ হইলেই কি নিকট রক্ত মিশ্রণ হয়? এতৎ সম্বন্ধে জীবতত্ত্ব-বেত্তাগণের মত এই যে নিকট সংযোগে পূর্ব্বোক্ত কুফল ফলে বটে; কিন্তু অনেক স্থলে যাহাদের আদি পুরুষ এক, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আত্মীয় সম্পর্ক থাকিলে যদি সে সম্পর্ক অতীব দূরের হয়, এবং তাহারা যদি ভিন্ন স্থানে বসবাস করে এবং ভিন্ন অবস্থার মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে বিবাহে কোনরূপ কুফলের আশঙ্কা থাকে না। বরং এরূপ বিবাহের সবিশেষ উপকারিতা আছে। এতদ্দ্বারা বংশনিষ্ঠ কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ বংশপরম্পরায় অক্ষুণ্ণ থাকে, অথচ দূর সম্পর্কতা হেতু এবং বিভিন্ন প্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব হেতু জীবনী শক্তি হ্রাস পায় না। মানবতত্ত্ববিদেরা আরও বলেন যে যদিও নিকট রক্ত সংমিশ্রণে বংশ-বৃদ্ধি-ক্ষমতা হ্রাস হয়, তথাপি যাহাদের সঙ্গে মৌলিক অনেক বিষয়ে বিশেষ প্রভেদ আছে তাহাদের রক্ত-মিশ্রণে শুভফল উৎপন্ন হয় না। দুই বিভিন্ন জাতীয়গণের মধ্যে বিবাহ হইলে যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহাদের মধ্যে বন্ধ্যালক্ষণ অনতিবিলম্বে প্রকাশ পায়। এতদ্ভিন্ন এরূপ বিবাহে নৈতিক অবনতি এবং চরিত্রসংযমের অভাব অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলী পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, এক জাতীয় অতি নিকট সম্পর্কীয়গণের মধ্যে বিবাহ হইলে যেরূপ বংশলোপ অবশ্যম্ভাবী, দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয়গণের মধ্যে বিবাহ হইলেও বংশ-লোপ তদ্রূপ অবশ্যম্ভাবী। এতদ্ভিন্ন তদ্দ্বারা নৈতিক অবনতি এবং চরিত্র-সংযমের অভাব হয়। কিন্তু যদি এক জাতীয় অথচ দূর সম্পর্কীয়গণের মধ্যে বিবাহ হয়, তাহা হইলে যেমন এক দিকে বংশলোপের আশঙ্কা থাকে না, তেমনই অপর দিকে বংশনিষ্ঠ কতকগুলি বিশিষ্ট গুণাবলী বংশপরম্পরায় অক্ষুণ্ণ থাকে।

মানবসমাজের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে উপরি-উক্ত তত্ত্বগুলির যথার্থতা উপলব্ধি হয়। বহু জাতির বিবরণ পাওয়া যায়, যাহারা নিজ জাতিগত গুণবিশেষকে বংশপরম্পরায় রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের বিবাহের গণ্ডী অতি সঙ্কীর্ণ করিয়াছে, এবং তাহার জন্য বংশোৎপাদন-ক্ষমতা হারাইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয়গণের মধ্যে বিবাহ ফলের দৃষ্টান্ত আমাদের সঙ্কর-জাতির মধ্যে এবং আমেরিকায় মুলাটো সম্প্রদায় মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।*

এক্ষণে আমরা মানব-বিজ্ঞানের পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিবাহের নিয়মগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখাইব যে, সে গুলি ঐ সকল বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলীর

* যাঁহারা এবিষয়ে জানিতে চাহেন তাঁহারা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দেখিবেন। ১। Darwin's Animals and Plants under Domestication. ২। Bott and Gliddon's Types of Mankind. ৩। Thomson's Heredity. ৪। Gidding's Principles of Sociology. শ্রদ্ধেয় বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় পৌষের প্রবাসীতে তাঁহার 'বিবাহে বর্ণসঙ্কর' নামক প্রবন্ধে ঐ পুস্তকগুলি হইতে অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অনুকূল। আমরা দেখাইব যে হিন্দুশাস্ত্রকারগণ পূর্ব্বোক্ত দুই সীমার মধ্য পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিবাহে এক দিকে যেমন নিকট রক্ত-সংযোগ নিষেধ করিয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনই দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় রক্ত-মিশ্রণে নিষেধ করিয়াছিলেন।

হিন্দুশাস্ত্রে বিবাহের নিয়ম

হিন্দু শাস্ত্রে বিবাহ সম্বন্ধে মূলতঃ দুইটি নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে। প্রথম স্বগোত্র ও সপিণ্ড এবং দ্বিতীয় বিভিন্ন জাতীয় স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষেধ।

স্বগোত্রে বিবাহ নিষেধ

স্বগোত্র কাহারা ?

'স্বগোত্র' বলিতে কাহাদিগকে বুঝায় ? অতীব প্রাচীনকালে মনুষ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন দলবদ্ধ হইয়া এক এক স্থানে বসবাস করিত। দলস্থ সকলেই মূলতঃ এক আদি স্ত্রীপুরুষের সন্তান-সন্ততি ও তাঁহাদের বংশধর ছিল। কালে এক গ্রামের মধ্যে যাহারা বাস করিত তাহারা ঐ আদিপুরুষের সন্তান না হইলেও উক্ত দলের অঙ্গীভূত হইত। তাহারাও ঐ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিকল্পিত হইত, এবং গোত্রের পতিকে নিজের পিতা বা তৎস্থানীয় বলিয়া জ্ঞান করিত। এইরূপে একস্থানে বাস হেতু উহারা এক পরিবারভুক্ত লোকের মত পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় করিত। এই কারণে এক গোত্রভুক্ত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষেধ ছিল। এক গোত্রভুক্ত কোন পুরুষ অপর গোত্রভুক্ত কোন স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারিত।

এইরূপ বিবাহ হইলে বিবাহিতা স্ত্রী তাহার পিতৃপিতামহের গোত্রবহির্ভূত হইয়া তাহার স্বামীর গোত্রভুক্ত হইত।

সপিণ্ডগণের মধ্যে বিবাহ নিষেধ

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে যদি দুই স্ত্রীপুরুষের একের পিতৃকুলের এবং অপরের মাতৃকুলের আদি পুরুষ একব্যক্তি হয়, তাহা হইলেও এতদুভয়ের বিবাহে কোন বাধা নাই। কিন্তু এরূপ বিবাহে অতি নিকট রক্ত-সংযোগ হয় দেখিয়া শাস্ত্রকারেরা অপর একটি বিধি ধার্য্য করেন, তদনুসারে "সপিণ্ড"গণের মধ্যে বিবাহ নিষেধ।

সপিণ্ড কাহারা ?

"সপিণ্ড" শব্দের অর্থ লইয়া শাস্ত্রকারগণ একমত হইতে পারেন নাই। 'পিণ্ড' শব্দের ধাত্বর্থে 'শরীর' বুঝায়। এ মতে, যাহাদের দেহে এক আদি পুরুষের রক্ত বংশপরম্পরাক্রমে প্রবাহিত হয়, তাহাদিগকে "সপিণ্ড" বলে। এরূপ অর্থে মানবজাতীয় সকলেই পরস্পর পরস্পরের "সপিণ্ড," এজন্য বিবাহে নিকট রক্তসংযোগ কতদূর চলিতে পারে, এই বিষয়ে শাস্ত্রকারগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয়। পরিশেষে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির ব্যাখ্যাকার বিজ্ঞানেশ্বরের মতই সর্ব্বপ্রদেশে আদৃত হয়। তদনুসারে পিতৃকুলের সাত ও মাতৃকুলের পাঁচ পুরুষের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের বিবাহ নিষেধ। *

* মিতাক্ষরা আচার অধ্যায় যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির ১ম অধ্যায়, ৫৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা

কিন্তু "পিতৃকুলের সাত ও মাতৃকুলের পাঁচ" পুরুষ গণনা করিতে উভয়দিকেই কোন "পুরুষে" এক বা ততোধিক স্ত্রীলোকের ব্যবধান থাকা সম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার মিতাক্ষরার গণনায় উভয়দিকের কেবলমাত্র পুরুষদিগকেই ধরিয়াছেন। পরবর্ত্তী স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ এইজন্য স্ত্রীলোক ব্যবধান সত্ত্বেও উক্ত নিয়ম বলবৎ থাকার ব্যবস্থা দিয়াছেন। *

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে এক গোত্রভুক্ত কোন পুরুষের সহিত অপর গোত্রভুক্ত কোন স্ত্রীর বিবাহ হইলে বিবাহিতা স্ত্রী তাঁহার পৈত্রিক গোত্রবহির্ভূতা হইয়া তাঁহার স্বামীর গোত্রভুক্তা হন। কিন্তু তাঁহার সন্তান-সন্ততি পিতৃকুলের ভিন্ন গোত্র হইলেও "সপিণ্ড"। এই ভিন্ন-গোত্র সপিণ্ডগণকে শাস্ত্রে "বন্ধু" বলে। উহাদের সহিতও বিবাহ নিষিদ্ধ।

বরের তিন গোত্র ভিন্ন হইলে বিবাহ চলে

পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইল তাহা হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রকারগণ অনেক স্থলে অতি দূরসম্পর্কীয় যাহাদের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ নাই এরূপ অনেক কন্যা বিবাহ-অযোগ্যা বলিয়া বাদ দিয়াছেন। পরবর্ত্তী স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ এইরূপ কয়েক শ্রেণীর কন্যাগণকে বিবাহোপযোগিনী বলিয়া বিধান দিয়াছেন। যে কন্যা বরের পূর্ব্ব নিয়মানুযায়ী পিতৃকুলের সপ্তম এবং মাতৃকুলের পঞ্চম পুরুষানুবর্ত্তিনী হওয়ায় বিবাহ-অযোগ্যা, সে যদি বরের তিন গোত্র ছাড়াইয়াও বন্ধু হয় তাহা হইলে তাঁহার সহিত বিবাহে আর কোন বাধা থাকে না। এখানে তিন গোত্র গণনা করিতে যদি কন্যা বরের নিজ বন্ধুর কন্যাও হন, তাহা হইলে সেই বন্ধু-গোত্রও গণনা করিতে হইবে। অথবা যদি সে বরের বন্ধুর পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে তাহার (বন্ধুর) পিতার অথবা মাতার মাতামহকুলের কাহারও কন্যা হয়, তাহা হইলেও সেই বন্ধুর নিজ গোত্রও গণনায় ধরিতে হইবে। কিন্তু বরের বন্ধুর অপর কোন পূর্ব্বপুরুষগণের কন্যা হইলে কেবলমাত্র উক্ত বন্ধুর মাতামহের গোত্র হইতে গণনা আরম্ভ করিতে হইবে। একটি উদাহরণ দিয়া বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝান যাইতেছে। মনে করুন বরের প্রপিতামহের শাণ্ডিল্য গোত্র, তাঁহার কন্যা (বিবাহ দ্বারা) কাশ্যপ গোত্রা, ইহার কন্যা (উক্তরূপে) বাৎস্য গোত্রা, এবং এই কন্যার কন্যা ভরদ্বাজ গোত্রা, এই শেষোক্তা কন্যার অবিবাহিতা কন্যা ভরদ্বাজ গোত্রের হওয়ায় উহার সহিত বরের শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ এবং বাৎস্য এই তিন গোত্রের ব্যবধান থাকায় সে কন্যা বিবাহ-যোগ্যা, যদিও পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে তাহার সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ। †

এতদ্ভিন্ন আর কতকগুলি কন্যা বিবাহ-অযোগ্যা

এতদ্ভিন্ন আর কতকগুলি স্ত্রী বিবাহ-অযোগ্যা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহাদের

* রঘুনন্দন-কৃত "উদ্বাহ-তত্ত্ব", কমলাকর-প্রণীত "নির্ণয়-সিন্ধু"।
† রঘুনন্দন-কৃত উদ্বাহ-তত্ত্ব ২য় খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা

সহিত বরের নিকট রক্তের সম্পর্ক না থাকিলেও ইহাদের পূর্ব্ব সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিবাহ-বিরুদ্ধ। এই কারণে বিমাতার ভগিনী মাতৃস্থানীয়া বলিয়া, বিমাতার ভ্রাতুষ্পুত্রী ভগিনীস্থানীয়া বলিয়া, বিমাতার ভ্রাতুষ্পুত্রীর কন্যা ভাগিনেয়ী-স্থানীয়া বলিয়া ইহাদের বিবাহ নিষিদ্ধ। এইরূপ খুড়ী, জ্যেঠী, মামী প্রভৃতির ভগিনী, শালীর কন্যা, গুরু-কন্যা প্রভৃতির সহিত বিবাহ হইতে পারে না। *

হিন্দুর বিবাহে নিকট রক্ত-মিশ্রণ নিষিদ্ধ

পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা ধীর-ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, আধুনিক পাশ্চাত্য মানবতত্ত্ববিদেরা বিবাহে নিকট রক্ত-সংমিশ্রণের যে বিষম কুফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, প্রাচীন হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের নিকট তাহা অবিদিত ছিল না। তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বিবাহ বিধিগুলির আলোচনা দ্বারা আমরা দেখাইয়াছি যে, যাহাতে বিবাহ দ্বারা কোনরূপেই নিকট রক্ত-সংমিশ্রণ না হইতে পারে তাহাই ঐ গুলির মূল উদ্দেশ্য। এই কারণে তাঁহারা যাহাতে নিকট রক্ত-সংমিশ্রণের কিছুমাত্র সম্ভাবনা না থাকে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা এই ব্যবস্থা করিতে এতদূর সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যে সকল স্ত্রীকে বিবাহের সম্পূর্ণ অযোগ্যা বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই অপর জাতির শাস্ত্রানুসারে বিবাহে সম্পূর্ণ যোগ্যা বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এমন কি অনেকের শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদের সহিত বিবাহই বিশেষ প্রশংসনীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কি রোমান (১), কি য়িহুদী (২), কি মুসলমান (৩), কি ইংরাজ (৪) সকল জাতিরই আইনানুসারে কেবল মাত্র যে সকল স্ত্রীলোকের সহিত অত্যন্ত নিকট রক্ত-সংযোগ আছে, অথবা যাঁহারা বৈবাহিকসূত্রে অতীব নিকট আত্মীয়া তাঁহাদেরই সহিত বিবাহ হয় না। সুতরাং যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা কখনই বলিবেন না যে হিন্দুদিগের মধ্যে বিবাহে নিকট রক্ত-সংযোগের কিছুমাত্র সম্ভাবনা আছে বা তদ্দ্বারা নিকট রক্ত-সংযোগ হইতেছে।

বর্ত্তমানকালে বিবাহে রক্তমিশ্রণ-আশঙ্কা

পুরাকালে যখন ঐ নিয়মগুলি প্রচলিত হয়, তখন হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতিতে বিভক্ত ছিল; এবং ঐ চারি জাতির মধ্যে বিবাহের উক্ত নিয়ম প্রকাশিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে উক্ত চারি জাতি বহু বিভিন্ন উপজাতি ও সম্প্রদায়ে

* রঘুনন্দন-কৃত উদ্বাহ-তত্ত্ব, ২য় খণ্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা

(১) Sandar's Institutes and Institutions, 106-109.

(২) Leviticus, Chapters 18 and 20.

(৩) Hamilton's Hydraga, Book II, Chapter I. Macnaughten's Mahamadan Law, Chapter 39, 310, Buller's Digest of Mahomedan Law, 23.

(৪) Stephen's Blackstone, Book III, Chapter II.

বিভক্ত হইয়া যায়, এবং ঐ সকল উপজাতি ও সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ রহিত হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বিবাহের গণ্ডী এক একটি জাতির মধ্যেও সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়াছে। এই জন্য অনেকের মনে আশঙ্কার উদয় হইয়াছে যে, এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বিবাহে ক্রমাগত আদানপ্রদানে অতি নিকট রক্ত-মিশ্রণ হইতে পারে।

ভিন্ন-গোত্র বিবাহে নিকট রক্ত-সংমিশ্রণ

গত পৌষ মাসের "প্রবাসী"তে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় "বিবাহে বর্ণসঙ্কর" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে—"কেহ যদি সযত্নে এক একটি বংশের বৈবাহ্য কুলের সংবাদ লয়েন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, ভিন্ন গোত্রে বিবাহ দেওয়াতে অনেক স্থলেই অতি নিকটস্থ রক্তের মিশ্রণ করা হইতেছে। যে যে বংশের সহিত যাহার বিবাহ চলিতেছে, তাহাদের পক্ষে সেই বংশগুলি এক রকম নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কাজেই ক্রমাগত আদানপ্রদানের ফলে, কল্পিত স্বগোত্রের লোক অপেক্ষা ভিন্ন-গোত্রের লোকেরা অধিক পরিমাণে রক্তের নৈকট্য স্থাপন করিয়াছে * * * এই প্রথা হইতেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ভিন্ন-গোত্র-বিবাহের নামে আমরা অধিক পরিমাণে নিকট রক্তের মিশ্রণ করিতেছি।"

কথাটা কি বাস্তবিক তাহাই? কিন্তু মজুমদার মহাশয়ের পরামর্শ অনুসারে "সযত্নে এক একটি বৈবাহ্য কুলের সংবাদ" লইতে চেষ্টা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি তাহা সম্ভব হইত, তাহা হইলে দেখাইতে পারিতাম যে, ভিন্ন গোত্র বিবাহের নামে আমরা অধিক পরিমাণে নিকটস্থ রক্তের মিশ্রণ করিতেছি" না। মজুমদার মহাশয় বলেন যে "যে যে বংশের সহিত যাহার যাহার বিবাহ চলিতেছে তাহাদের পক্ষে সেই সেই বংশগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে।" কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের মধ্যে ক্রমাগত আদানপ্রদানের ফলে যে ভিন্ন-গোত্রের লোকের সহিত বিবাহসত্ত্বেও অধিক পরিমাণে নিকট রক্তের সংযোগ হইতেছে, ইহা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারা যায় না। আমি মজুমদার মহাশয়ের কথামত যথাসম্ভব আমাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবগণের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি। তাঁহারা কেহই বলেন না যে, তাঁহাদের পরিবার মধ্যে কাহার এমন কাহারও সহিত বিবাহ হইয়াছে যাঁহার বংশের কাহার সহিত তাঁহার কখন অতি দূর সম্পর্ক ছিল। মজুমদার মহাশয়ের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে একরূপ বিবাহ হইয়াছে কি না জানি না। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সযত্নে তাঁহার আত্মীয়গণের বৈবাহ্য কুলের সংবাদ লইয়া নিঃসন্দেহে এ কথা ঠিক করিয়া বলিতে না পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি যে, ভিন্ন গোত্রে বিবাহ দিতে গিয়াও আমরা বাস্তবিকই স্বগোত্রের অপেক্ষাও নিকট রক্ত মিশ্রণ করিতেছি। আর এক দিক দিয়া দেখিলে মজুমদার মহাশয়ের অনুমান ঠিক বলিয়া মনে হয় না। মজুমদার মহাশয় বলিয়াছেন "যে যে বংশের সহিত যাহার যাহার বিবাহ চলিতেছে তাহাদের পক্ষে সেই

সেই বংশগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে।" এ কথাটা কি ঠিক? সকলেই জানেন যে এক এক বংশোদ্ভব অনেক লোক লইয়া এক এক পরিবার। এইরূপ বহু বিভিন্ন বংশোদ্ভূত বহু বিভিন্ন পরিবার লইয়া এক একটি গোত্র। এক গোত্রভুক্ত কোন পরিবারের কাহারও অপর গোত্রভুক্ত কোন পরিবারের অপর কাহার সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া সেই দুই পরিবারের সহিত বিবাহ ভিন্ন গত্যন্তর নাই এ কথা কি করিয়া স্বীকার করা যায়? আমি নিজে এক জন ভরদ্বাজ গোত্রের। আমার ভগিনীগণের বেগের গাঙ্গুলীদের সহিত বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়াই কি আমার কন্যার বেগের গাঙ্গুলীদের সহিত ভিন্ন বিবাহ দিবার জো নাই? সুতরাং যে বংশের সহিত যাহার যাহার বিবাহ চলিতেছে, সচরাচর তাহাদের পক্ষে "সেই সেই বংশগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায়" দাঁড়াইয়া যাইবার কোন বিশেষ কারণ নাই।

বৈবাহ্য কুল নির্দ্দিষ্ট হওয়া বিশেষ কারণ সাপেক্ষ

অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে, আমাদের মত যাঁহারা কুলীন ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের মধ্যে কোথাও কোথাও বৈবাহ্য কুল নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। যাঁহারা ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের গঙ্গোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় বা বন্দ্যোপাধ্যায়গণের সহিত বিবাহ দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু সে কেবল মাত্র কন্যার বিবাহের বেলায়ই। পুত্রের বিবাহ তাঁহারা এতদ্ভিন্ন অন্যান্য গোত্রে বা কুলেও দিতে পারেন। এইরূপ যাঁহারা একেবারে বংশজ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক স্থলেই "পালটি ঘরে" বিবাহ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সুতরাং বিজয় বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা আংশিক মাত্র সত্য। যদি কোথাও কোন বংশের বৈবাহ্য কুল নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় দাঁড়াইয়া গিয়া থাকে, তাহা সাধারণ নিয়মে হয় নাই। সেই সেই বংশের অবস্থা-বিপর্য্যয়ই তাহার কারণ, অতীব ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বিবাহে আদান-প্রদান ক্রমাগত হইতে থাকিলে যে নিকট রক্তের সংমিশ্রণ হয় তাহা স্থূল বুদ্ধিতেই বুঝা যায়। কিন্তু হিন্দুদিগের গোত্রের গণ্ডী এরূপ ক্ষুদ্র নহে যাহাতে নিকট রক্ত-মিশ্রণ সম্ভব। এক একটি গোত্রের গণ্ডী এরূপ ক্ষুদ্র নহে যাহাদের মধ্যে পরস্পরের বিবাহে নিকট রক্ত সংযোগের কোন প্রকার আশঙ্কা বা সম্ভাবনা থাকিতে পারে। হিন্দুসমাজ এক বিরাট ব্যাপার। উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই খণ্ড বিখণ্ড করা যা'ক না কেন, প্রতি অংশ এক এক সমাজ হইয়া দাড়াইয়া গিয়াছে। এইরূপ সমাজের গণ্ডী যে সকল স্থলেই অত্যন্ত ক্ষুদ্র তাহা নহে, এবং সেই গণ্ডীর মধ্যে ক্রমাগত বিবাহে সকল স্থলেই নিকট রক্ত-সংমিশ্রণ হয় না।

যেখানে বিবাহে নিকট রক্ত-মিশ্রণ হয় সেখানে বিবাহ-গণ্ডী বৃদ্ধি হওয়া উচিত

অবশ্য যদি কোথাও নির্দ্ধারিতরূপে জানা যায় যে নির্দ্দিষ্ট কুলের মধ্যেই বিবাহের আদান-প্রদান ক্রমাগত হওয়ায় বাস্তবিকই

পূর্ব্ব আত্মীয়-স্বজনের সহিতই বিবাহ হইতেছে, সে স্থলে বৈবাহ্য গণ্ডীর পরিসর বৃদ্ধি করাই শ্রেয়ঃ। নচেৎ নিকট রক্ত-সংমিশ্রণ ক্রমাগত চলিতে চলিতে বংশ লোপ হইবার আশঙ্কা।

অন্যান্য সমাজে বিবাহগণ্ডী ক্ষুদ্র

এই বিষয়ে হিন্দুসমাজের সহিত অন্যান্য আধুনিক সমাজগুলির তুলনা করিয়া দেখা ভাল। ব্রাহ্মসমাজ অতি অল্প দিন হইল গড়িয়া উঠিয়াছে। উহার অন্তর্ভূত লোক-সংখ্যা হিন্দুজাতীয় কোন জাতির কোন গোত্রবিশেষের অন্তর্ভূত লোক-সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অল্প। এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। এজন্য ব্রাহ্মসমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদানে নিকট রক্ত-সংযোগ রীতিমত সম্ভাবনা। অবশ্য আপাততঃ তাহার বিষময় ফল তাদৃশ উপলব্ধি না হইতে পারে। কারণ ব্রাহ্ম-সমাজ হিন্দুসমাজের বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি লইয়া গঠিত হইয়াছে। সেই জন্য প্রথমতঃ কিছু দিন ধরিয়া উহার মধ্যে নূতন নূতন রক্তের মিশ্রণ চলিতেছিল। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের আর তাদৃশ বিস্তৃতি নাই, এবং অত্যল্পসংখ্যক লোকেই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইতেছে। এই কারণে ব্রাহ্মসমাজ এক অতীব ক্ষুদ্র গণ্ডীতে পরিণত হইয়াছে, এবং সেই গণ্ডীর ভিতরেই বিবাহ চলিতেছে। পঞ্জাবের আর্য্য-সমাজেরও ঐরূপ অবস্থা। আমাদের বিলাত-ফেরত সাহেবগণের এ বিষয় বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া দেখা উচিত। তাঁহারা সকলে মিলিয়া এক ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গঠন করিতেছেন এবং ঐ সম্প্র-দায়ের মধ্যেই তাঁহারা বিবাহ আবদ্ধ করিতে-ছেন। অবশ্য কেহ কেহ হিন্দুসমাজভুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন, কেহ বা হিন্দু-সমাজে চলিয়া গিয়াছেন। আবার কেহ বা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত হইয়া থাকিলেও এ দায় হইতে কতদূর নিষ্কৃতি পাইবেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

হিন্দুদের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ নিষেধ

এতদূর পর্য্যন্ত আমরা দেখাইলাম যে, হিন্দু-জাতির মধ্যে বিবাহে নিকট রক্ত-সংমিশ্রণের কোন আশঙ্কা ছিল না এবং হয় নাই। এখন আমরা দেখাইব যে, হিন্দুশাস্ত্রকারগণ দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয়গণের মধ্যে বিবাহ হইলে তাহার ফল যে বিষম তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া বিবাহের নিয়ম সকল বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজে প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিজাতি ছিল, এবং মন্বাদি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে ঐ বিভিন্ন জাতির পরস্পরের মধ্যে বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না। তদনুসারে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ জাতির মধ্যে, উচ্চবর্ণের পুরুষের নিম্নবর্ণের স্ত্রীর সহিত বিবাহ, ধর্ম্মানুগত না হইলেও, প্রচলিত ছিল। কিন্তু উচ্চবর্ণের স্ত্রীর সহিত নিম্নবর্ণের পুরুষের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। * কিন্তু উচ্চবর্ণের পুরুষের সহিত নিম্নবর্ণের স্ত্রীর বিবাহ হইতেই কালে হিন্দু-সমাজে বিভিন্ন মিশ্রজাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

* মনুসংহিতা, ৪র্থ অধ্যায় ১২।১৩ শ্লোক

রঘুনন্দন, কমলাকর প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ পৌরাণিক বচনের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন জাতির পরস্পরের মধ্যে বিবাহ নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিধানে বহুকাল হইতে হিন্দু-সমাজে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ রহিত হইয়াছে। *

তাহার উপকারিতা

এরূপ নিষেধে হিন্দুসমাজের সবিশেষ উপকার ভিন্ন অপকার হয় নাই। হিন্দুসমাজস্থ জাতিভেদের উৎপত্তি গুণকর্ম্মভেদ হইতে। সমাজভুক্ত যে যে ব্যক্তি সামাজিক যে যে কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতেছিল, তাহারা সকলে মিলিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্যানুসারে এক একটি জাতি গঠন করিল। এইরূপে গঠিত বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণ বংশপরম্পরা-ক্রমে নিজ নিজ জাতীয় কর্ত্তব্যকর্ম্মগুলি পালন করিতে করিতে তদুপযোগী কতকগুলি বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী হইয়াছিল। যে গুণ এক জাতির বিশেষত্ব তাহা অপর জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইত না। এইরূপ কোন বিশেষ গুণান্বিত জাতিদের মধ্যে বিবাহ স্ব স্ব জাতীয় মধ্যে আবদ্ধ হইলে সে বিবাহের ফলস্বরূপ সন্তান-সন্ততিতে তৎ তৎজাতীয় বিশেষ গুণগুলি বিশেষরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। যে শিল্প-কুশলতার গুণে পূর্ব্বকালে এদেশীয় শিল্প সকল দেশ বিদেশে আদর লাভ করিয়াছিল, তাহার কারণ এই খানে। বিবাহেই এইরূপ বংশনিষ্ঠ কতকগুলি গুণ বংশপরম্পরাক্রমে অক্ষুণ্ণ থাকে, এ কথা পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণও নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

স্বজাতি-বিবাহে নিকট রক্ত-সংযোগের আশঙ্কা

কিন্তু স্বজাতীয়গণের মধ্যে পরস্পরের বিবাহে আশঙ্কাও অনেক আছে। যদি কোন বিশেষ কারণে কোন জাতির গণ্ডী অতি ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলে এইরূপ বিবাহে সেই জাতিতে নিকট রক্ত-সংমিশ্রণ চলিতে থাকে। তাহার ফলে সেই জাতি সন্তান-সন্ততি উৎপাদন-ক্ষমতা হারাইয়া অবশেষে একেবারে লোপ প্রাপ্ত হয়। আভিজাত্যের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য যে সকল বড় লোকেরা কেবল বড় লোকদের মধ্যেই বিবাহ দিয়াছেন, তাঁহাদের বংশ এইরূপে বৈবাহিক সম্বন্ধের গণ্ডী ক্ষুদ্র হওয়ায় অচিরে লুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। কতকগুলি বিশেষ গুণাবলী সংরক্ষণ মানসে, বংশনিষ্ঠ করিবার চেষ্টায় অনেক জাতি উৎপাদন-ক্ষমতা হারাইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার উদাহরণ জগতে বিরল নহে।

এইরূপ বিষম ফলের এক মাত্র কারণ নিকট রক্ত-সংমিশ্রণ। কতকগুলি গুণ বিশেষ বংশনিষ্ঠ করিতে যাইয়া এবং বংশ-মর্য্যাদা রক্ষার চেষ্টায় ক্রমাগত বিশেষ শ্রেণীর পাত্রীর সহিত বিবাহ করার ফলে ঘনিষ্ঠ রক্ত-মিশ্রণ হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় বংশ-লোপ অবশ্যম্ভাবী। †

* রঘুনন্দন-কৃত উদ্বাহ-তত্ত্ব, ২য় খণ্ড, ৬২ পাতা।

† Thomson's Heredity এবং Weissman's Essays on Heredityতে এই বিষয়ের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

হিন্দুদিগের স্বজাতি-বিবাহে উহা হইতেছে কি না

আমাদের স্বজাতীয় বিবাহে এইরূপ ঘটিতেছে কি না এবং বিশেষতঃ আমাদের উচ্চ জাতির মধ্যে প্রচলিত কৌলীন্য-প্রথায় এই ফল ফলিতেছে কি না তাহা বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখা উচিত।

উচ্চ জাতিতে ক্ষয়ের লক্ষণ

আমাদের সমাজস্থ উচ্চশ্রেণীর অবস্থা বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, তাহাতে জীবনী শক্তি অতি ক্ষীণ গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। আমাদের মধ্যে শিশুর মৃত্যু অধিক, যুবকগণ অতীব অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, প্রৌঢ় বয়সেই অধিকাংশ লোকে বার্দ্ধক্যবয়সোপযোগী অকর্ম্মণ্যতায় অভিভূত হইয়া পড়েন, "জীবন্ত আশীর্ব্বাদ স্বরূপ" বৃদ্ধবৃদ্ধাগণের সংখ্যা দিন দিন কম দেখা যাইতেছে। এই গুলি যে ক্ষয়ের লক্ষণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এইরূপ ক্ষয়ের কারণগুলি আমি প্রবন্ধান্তরে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। * এখানে উহাদের পুনঃ আলোচনার আবশ্যতা নাই।

স্বজাতি-বিবাহ উহার কারণ কি না

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের কারণ অনুসন্ধান করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমাদের মধ্যে প্রচলিত জাতিভেদের দরুণ উচ্চশ্রেণীয় জাতির পরস্পরের মধ্যে বিবাহ রহিত থাকায় এবং স্বজাতীয়ের মধ্যে বিবাহ আবদ্ধ থাকায় এক দিকে যেমন ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ রক্তের সংমিশ্রণ হইতেছে, অপরদিকে তেমনি ভিন্ন জাতির মধ্যে নূতন রক্তপ্রবাহ সঞ্চালন বন্ধ হইতেছে। এতদুভয়ের ফলেই ক্রমশঃ তাহাদের বংশলোপ হইতেছে। এইজন্য তাঁহার মতে উচ্চশ্রেণীর জাতিগণের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ চলন হওয়া উচিত।

আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে হিন্দুশাস্ত্রে বিবাহের যে নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে, 'তাহাতে ঘনিষ্ঠ রক্ত-মিশ্রণের কোনরূপ আশঙ্কা নাই। অবশ্য কোন কোন স্থলে কোন জাতি-বিশেষে বিবাহের গণ্ডী ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হওয়ায় নিকট রক্তসংমিশ্রণের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে আমি বলিয়াছি যে উহা সাধারণ নিয়মে হয় নাই, অবস্থা-বিপর্য্যয়ে পড়িয়া কোন জাতির এ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে।

বিভিন্ন জাতির বিবাহ

যদি তর্কস্থলে স্বীকার করা যায় যে সাধারণতঃ যাহাদিগকে উচ্চশ্রেণী বলা যায়, তাহাদের মধ্যে বিবাহে নিকট রক্ত-মিশ্রণ হইতেছে, তাহা হইলে এক্ষণে বিচার করিতে হইবে যে, তজ্জাতিগণের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ দ্বারা নূতন নূতন রক্ত সংমিশ্রণ করিয়া তাহাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন কর্ত্তব্য কি না?

মানবতত্ত্ববিদের মত

এই বিষয় বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ সমাজ-তত্ত্ববিদ্গণের নির্দ্ধারিত উদ্বাহ-তত্ত্বগুলি

* হিন্দুজাতির ক্ষয়।

আর একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সামাজিক জীবনের পক্ষে বিবাহে নিকট রক্তের যোগ যেমন হানিকর, অত্যন্ত বিভিন্ন জাতির রক্ত-সংযোগও তাদৃশ অনিষ্টদায়ক। যাহাদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে মৌলিক প্রভেদ আছে, যাহাদের বাহ্য-উত্তরাধিকারের ও জাতীয় আকাঙ্ক্ষার মিল নাই এবং জাতীয় রীতিনীতি বা প্রকৃতিতে বিশেষ বৈষম্য আছে—তাহারা উন্নত হইলেও তাহাদিগের সঙ্গে রক্তমিশ্রণে শুভফল উৎপন্ন হয় না।

শ্রদ্ধেয় মজুমদার মহাশয়ও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে যে, হিন্দু জাতিসমূহের মধ্যে কোন্ কোন্ জাতি নির্ভয়ে পরস্পরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন। এই প্রশ্ন যেরূপ বৃহৎ উহার বিচারও তদ্রূপ জটিল। সুতরাং আপাততঃ বঙ্গদেশের কয়েকটি উচ্চ-শ্রেণীর জাতির সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

হিন্দু উচ্চজাতির অবস্থার সমতা

মজুমদার মহাশয় বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত উচ্চজাতিগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, "উহাদের মধ্যে দৈহিক অবস্থার পার্থক্য নাই, মানসিক গুণের প্রভেদ নাই, নৈতিক বলের ভিন্নতা নাই, ধর্ম্মপ্রাণতায় অমিল নাই; অথচ বাহ্য-উত্তরাধিকারে সমতা আছে; জাতীয় আকাঙ্ক্ষায় মিল আছে, আচার-ব্যবহারে সাদৃশ্য আছে এবং ভাষা ও ভাবের ঐক্য আছে।" "উচ্চশ্রেণীগুলির অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে উচ্চজাতীয়দিগের মধ্যে রক্ত-মিশ্রণ হইলে আকাঙ্ক্ষিত অন্তর্নিহিত গুণের রক্ষা হইবে এবং নব-রক্ত-মিশ্রণে সুফলও ফলিবে।"

মজুমদার মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি স্বীকার করিয়া লইলেও মানব-বিজ্ঞানের দিক হইতে ব্রাহ্মণ ও তদিতর জাতির রক্তমিশ্রণ আমাদের সামাজিক জীবনের উন্নতির পক্ষে বিশেষ আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। সমাজবিজ্ঞান অনুসারে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও পারিপার্শ্বিক বাহিক অবস্থা এক হইলেই যে দুই জাতির পরস্পরের রক্তসংমিশ্রণে সুফল ফলে তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। মজুমদার মহাশয় সমাজবিজ্ঞানের দিক হইতে উক্ত বিষয়ের বিচার করিতে যাইয়া উহার অপরদিক দেখিতে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন।

মনুষ্য-জীবনে বাহ্য অবস্থার প্রভাব অপেক্ষা উত্তরাধিকারিত্বের প্রভাব অধিক

আধুনিক প্রাণি-তত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন যে, প্রাণিগণের বীজাণুতে (Germ plasm) কতকগুলি সংস্কার গুপ্ত ভাবে অন্তর্নিহিত থাকে। সেই গুলি উপযুক্ত অবস্থায় পড়িলে ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া তাহাদের বিশেষত্ব জ্ঞাপন করে। উহাদিগকে বাহিক অবস্থা একেবারে নষ্ট করিতে পারে না, এবং উহারাই বাহিক অবস্থা অপেক্ষা অধিক স্পষ্টভাবে জীবের অভিব্যক্তির পন্থা নির্দ্দেশ করে। প্রাণিগণ অধিকাংশ দোষ-গুণ জন্মের পর শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে এবং জন্মমাত্রে কেবল কতকগুলি দোষগুণ শিক্ষা

লাভ করিবার উপযোগী দৈহিক অবস্থা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু শিক্ষার ফলে যে সকল গুণ লব্ধ হয়, তাহা আমাদের মূল জৈবনিক শক্তি বা সংস্কারকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। আবার শিক্ষালব্ধ দোষ-গুণগুলি কেবল জন্মফলে লাভ করা যায় না। মজুমদার মহাশয় এ কথা গুলি পরে স্বীকার করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণের উত্তরাধিকারিত্ব

সুতরাং এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে শত শত বৎসরের নিষ্ঠা, সংযম ও ত্যাগ এবং বিশিষ্ট আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মানুশীলনের প্রভাবে ব্রাহ্মণ জাতিতে কতকগুলি বিশিষ্ট গুণাবলী সংস্কার স্বরূপে অন্তর্নিহিত আছে।

অতএব যদি এ কথা স্বীকার করা যায় যে, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত জাতীয়গণের মধ্যে শারীরিক, মানসিক বা নৈতিক বা পারিপার্শ্বিক বাহ্যিক অবস্থার কোন প্রভেদ নাই, তাহা হইলেও যে মূলতঃ তাহাদের জৈবনিক শক্তি বা সংস্কার সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহা অস্বীকার করা যায় না।

ব্রাহ্মণের জীবনী শক্তি ও সংস্কার অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন

সেই জৈবনিক শক্তি বা সংস্কার উপযুক্ত অবস্থায় পড়িলে ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া ব্রাহ্মণ সন্তানে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বজ্ঞাপক গুণাবলী বিকাশ করিতে পারে, এবং বাহ্যিক অবস্থা যেরূপ হউক উহাদিগকে একেবারে ধ্বংস করিতে পারিবে না। *

অতএব শারীরিক গঠনের বিচারে, মানসিক শক্তির বিচারে, কিম্বা নৈতিক বিচারে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতিতে বর্ত্তমান কালে কেহ কোন রূপ প্রভেদ লক্ষ্য করিতে না পারেন, কিন্তু জন্ম, কর্ম্ম ও "অবয়বের" সমতা যতই থাকুক, মানুষে মানুষে শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভেদ ঘটিবেই ঘটিবে। যদি মানুষে মানুষে এই প্রভেদ থাকিবেই তবে জাতিতে জাতিতে ঐরূপ অবস্থায় কোন প্রভেদ থাকিতে পারে না তাহা কোন্ যুক্তি-বলে বলিব? প্রত্যক্ষ বিচারে জাতি মাত্রে কোন প্রভেদ দেখিতে না পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে কোনরূপ প্রভেদের বীজ—কোনরূপ বিশেষ শক্তি যাহাতে কালে আকাশ পাতাল প্রভেদ প্রকাশিত হইতে পারে তাহা—অন্তর্নিহিত থাকিতে পারে না তাহা কে বলিবে? সে প্রভেদের অস্তিত্বের কথা বিজয় বাবু "কল্পিত" বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। কিন্তু যিনি মানব-বিজ্ঞান মনঃসংযোগে পাঠ করিবেন, তিনি তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

* এই বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ফাল্গুনের প্রবাসীতে বিজয় বাবুর প্রবন্ধের আলোচনায় Karl Pearson's 'Groundwork of Eugenics' নামক পুস্তক হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

"Our experience is that nature dominates nurture, and that *inheritance is more fundamental than environment.* Environment modifies the bodily characters of the existing generation, but does not modify *Germ plasms.* At most environment can provide a selection, of which germ plasms among the many provided shall be potential and which shall remain latent."

জীবের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও পারিপার্শ্বিক বাহ্য অবস্থা জৈবনিক শক্তি নহে

বিজয় বাবু জীবের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও পারিপার্শ্বিক বাহ্য অবস্থাকেই জৈবনিক শক্তি বলিয়া মনে করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এতদুভয়ে মূলতঃ বিশেষ প্রভেদ আছে। একস্থানে বিজয় বাবু এরূপ ভাবে লিখিয়াছেন যে পড়িয়া মনে হয় যে, আমি উপরে যাহাকে জৈবনিক শক্তি বা সংস্কার বলিলাম তাঁহার মতে সেগুলি শিক্ষালব্ধ সম্পদ। শিক্ষালব্ধ সম্পদগুলি যে কেবল জন্মফলে লাভ করা যায় না তাহা অধিকাংশ মানবতত্ত্ববিদ্‌গণের মত। মানব-তত্ত্ব গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এতদুভয়ের সেরূপ প্রভেদ নাই। যাহা আজ শিক্ষালব্ধ তাহা বহুকাল পরে সংস্কারে পরিণত হয়। এবং সংস্কার যে জন্মলব্ধ তদ্‌বিষয়ে মতান্তর নাই।*

ব্রাহ্মণ ও অপর জাতির প্রভেদ এখন race-গত

আর এক কারণে বিজয় বাবু মনে করেন ব্রাহ্মণ জাতির সহিত অপর জাতির কোন প্রভেদ নাই। তিনি বলেন যে "আমাদের ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকের শরীরেই আর্য্যেতর অনেক জাতির রক্ত মিশ্রিত আছে।" তাহা হইতেই তিনি মনে করেন যে, "ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকদিগের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা race গত নহে।" এখানে বিজয় বাবু স্বীকার করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণাদি জাতিগণের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ আছে। সুতরাং বিচার্য্যের বিষয় এই মাত্র যে সেই প্রভেদ race-গত কি না? বিজয় বাবু যে কারণে উহা race-গত নহে বলিয়া মনে করেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কারণটি স্বীকার করিলেও উক্ত প্রভেদ যে race-গত নয় এ কথা প্রমাণ হয় না। [illegible] য় এ কথা বলি না যে অপর জাতির ন্যায় ব্রাহ্মণ জাতির সহিতও আর্য্যেতর অপর জাতির মিশ্রণ হয় নাই। এবং এই মিশ্রণের "প্রকৃতি এবং পরিমাণ" ব্রাহ্মণ ও তদিতর অপর জাতিতে একই ছিল এ কথাও আমি স্বীকার করি। কিন্তু অন্যান্য জাতির ন্যায় আর্য্যেতর অনেক জাতির সহিত রক্তমিশ্রণ হইলেও ব্রাহ্মণ জাতি বরাবরই স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। প্রাচীন হিন্দুকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া এবং ভারতবর্ষের অপর প্রদেশের হিন্দুসমাজের অবস্থা ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র মুসলমান আমলে বাঙ্গালা দেশের হিন্দুসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বেশ বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ

---

* George John Romanes' 'Darwin, and after Darwin' : Vol. II.

It is *certain and has long been known* that individually acquired characters are at all events much less heritable than are long inherited or congenital ones.

No evolutionist would at any time propound the view that *one generation depends for all its character on those acquired by its immediate ancestors*, for it would merely be to unsay the theory of evolution itself, as well as to deny the patent facts of heredity as shown, for example, in "avatism."

জাতি অপর সমুদয় জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। সেইজন্যই দেখিতে পাই যে স্মার্ত্ত-শিরোমণি রঘুনন্দনের মতে তৎসময়েও বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর এই দুই জাতি মাত্র বর্ত্তমান ছিল। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সে সময়ে অন্যান্য জাতির পরস্পরের সহিত রক্ত-মিশ্রণ হওয়াই সম্ভব। যদি তাহা না হইয়াও থাকে তাহা হইলেও অন্যান্য জাতির দৈনিক জীবনের আচার-আচরণ এ সকলে কিছুমাত্র প্রভেদ ছিল না। কেবল একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই অপর সকল জাতি হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল। যে কারণে ব্রাহ্মণ জাতির পক্ষে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সম্ভব ছিল এবং যে কারণে তাঁহারা উহা হারান নাই, তৎপ্রতি বিজয় বাবু মনোযোগ করেন নাই। সে কারণ আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ব্রাহ্মণ জাতির সমস্ত জীবনব্যাপী ধর্ম্ম-কর্ম্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-আচরণ, - ব্রহ্মচর্য্যসংযমে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক এবং দৈহিক জীবন অপর সকল জাতীয়গণের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। এ কথা যিনি অস্বীকার করিবেন তাঁহার সহিত তর্ক করা বৃথা মনে করি। ব্রাহ্মণ সন্তানগণ জন্ম হইতেই স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের শত শত বর্ষব্যাপী ধর্ম্ম-জীবনের ফল সংস্কারস্বরূপে উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত হন। সেই সংস্কারই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। সে সংস্কার শীঘ্র নষ্ট হইতে পারে না এবং বর্ত্তমানকালের অবস্থা-বিপর্য্যয়ে উহা এখনও নষ্ট হয় নাই। উহা আধুনিক প্রাণীবিজ্ঞানবিদেরা স্থির করিয়াছেন।*

এই কারণেই আমার মনে হয়, অপর জাতীয়ের সহিত বিবাহে ব্রাহ্মণগণ, ব্রাহ্মণত্ব বিকাশের ভবিষ্যৎ আশা সুদূর হইলেও, একেবারেই জন্মের মত হারাইবেন।

ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখার আবশ্যকতা

এখানেও বিচারের শেষ হয় না। ব্রাহ্মণের আর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রয়োজন কি? আমি বলি এখনও সে প্রয়োজন আছে। মানব-জাতির ক্রমবিকাশ ও উন্নতির দিক দিয়া দেখিলে হিন্দু সভ্যতার যদি কোনরূপ প্রয়োজন আজও থাকে, তবে যে ব্রাহ্মণে হিন্দুসভ্যতার চরম উৎকর্ষের বিকাশ সেই ব্রাহ্মণের প্রয়োজন আছে। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে পড়িয়া ব্রাহ্মণ আজ সে আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়াছে সত্য, সমগ্র ভারতসমাজই এখন আদর্শশূন্য। কিন্তু কে বলিতে পারে যে ব্রাহ্মণ আবার স্বীয় সনাতন শিক্ষা ও দীক্ষা

* George J. Romanes' *Darwin after Darwin.* It is sufficiently obvious that the adaptive work of heredity could not be carried on at all if there had to be *a discontinuity in the substance of heredity at every generation, or even after any very large number of generations.* -Galton's theory of storp.

While for the most part the phenomena of *heredity are due to the continuity of the substance of heredity through numberless generations,* this substance is nevertheless not absolutely continuous, but may admit in small though cumulative degrees of modification by use of inheritance and other factors of the Lamarikan kind." From George John Romanes' Darwin and after Darwin.

লাভ করিয়া জগতের গৌরব—গুরুর পদ পুনরধিকার করিতে পারিবেন না? অনেকে এ কথা কবিকল্পনা মনে করিতে পারেন। অনেকে ভারতবর্ষের পুনরুত্থান দুঃস্বপ্ন মনে করেন।

সুতরাং আমার বিশেষ ভয় যে, পাছে আমরা আমাদের সামাজিক এক বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে যাইয়া তদপেক্ষা আরও গুরুতর বিপদ আনয়ন করি। আমি মনে করি যে, যদি ব্রাহ্মণ জাতির বর্ত্তমান অবস্থায় অপর জাতির সহিত রক্তমিশ্রণ হইতে থাকে, তাহা হইলে যে ব্রাহ্মণ্য আদর্শ জগতের চরম আদর্শ এবং যাহা আমরা ব্রাহ্মণ সন্তানগণ নিজেই হারাইতে বসিয়াছি তাহার আর পুনর্ব্বিকাশের সম্ভাবনা পর্য্যন্তও চিরকালের জন্য দূর হইয়া যাইবে। হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণের এখনও শেষ অবস্থা আসে নাই। হিন্দুসমাজে এখন আবার জীবনী শক্তির সঞ্চলনক্রীড়া দেখা দিয়াছে। হিন্দুজাতীয় অপর সকল জাতিই সবলে স্বজাতীয় উন্নতির চেষ্টায় মনোনিবেশ করিয়াছে, কেবল ব্রাহ্মণ জাতির এখন সবিশেষ সাড়া পাওয়া যায় নাই। এখন যখন বিজয় বাবুর ন্যায় প্রবীণ, বিদ্বান ব্রাহ্মণসন্তান হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিকের ন্যায় আলোচনা করিতেছেন এবং ব্রাহ্মণদিগের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা নির্দ্দেশে সচেষ্ট হইয়াছেন, তখন আমার বিশেষ আশা হইতেছে যে অনতিকাল বিলম্বে ব্রাহ্মণও জাগিবে।

উপসংহার

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যদিও এক্ষণে প্রত্যক্ষ বিচারে ব্রাহ্মণগণের সহিত অপর উচ্চ জাতীয়গণের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক কোনরূপ প্রভেদ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা হইলেও ব্রাহ্মণসন্তানে জৈবনিক শক্তি বা সংস্কার অপর জাতীয়ের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একশতাব্দীব্যাপী অবস্থা-বিপর্য্যয়ে পড়িয়া সেই জৈবনিক শক্তি বা সংস্কার ব্রাহ্মণসন্তানে এখন স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারিতেছে না, এবং বাহ্যিক অবস্থা যেরূপ হউক না কেন উহাদিগকে শীঘ্র একেবারে ধ্বংস করিতে পারে না। কিন্তু উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় উহার বিকাশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু অপর জাতীয়গণের সহিত বিবাহ হইলে ব্রাহ্মণ-সন্তানের সেই সংস্কার বা জৈবনিক শক্তি একেবারে ধ্বংস হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এইজন্য আমি অপর জাতির সহিত ব্রাহ্মণের বিবাহের প্রস্তাবে বিশেষরূপে আপত্তি করি।

বর্ত্তমান কালে কি প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব বিকাশ হইতে পারে তাহা স্বতন্ত্র কথা। তাহার বিচার এখন হইতে পারে না। আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

ব্রাহ্মণ জাতির সম্বন্ধে যে কথা লিখিলাম কায়স্থ বৈদ্য সম্বন্ধে সে কথা ঠিক বলা যায় না। তবে উহাদের বেলায় সে কথা একেবারেই খাটে না তাহাও বলিতে পারি না। এতৎ সম্বন্ধে আমার অভিমত এই প্রকারেই ব্যক্ত করিয়া কায়স্থ ও বৈদ্য মহাশয়গণকে বিজয় বাবুর সহিত বিচারের জন্য আহ্বান করিতেছি।

শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায় বি, এল্।

চট্টগ্রামে প্রদর্শিত প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি

চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর ষষ্ঠ অধিবেশনের প্রদর্শনীতে আমি যে কয়েকখানি প্রাচীন হস্তলিখিত তুলট কাগজের পুথি উপস্থাপিত করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে মহাভারতখানি সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। এই পুথি খানি অন্ততঃ শতবৎসরের পুরাতন বলিয়া অনুমিত হয়। এই মহাভারতের ৫৫ পাতায় লিখিত আছে—

শ্রীশ্রীহোচনসাহা পঞ্চগৌড়নাথ।
ত্রিপুরদ্বারিকা সমর্পিল যাহাত্।
সোনার পালঙ্কি দিল এক শত ঘোড়া।
সানাই তোপর দিল লক্ষ কোটি কাড়া।
শ্রীযুত পরাগল খান মহামতি।
দরিদ্র তরাণ করে অনাথের গতি।
কুতূহলে ভারতের পুছন্ত কাহিনী।
কোন মতে পাণ্ডবে পাইল রাজধানী।

পঞ্চগৌড়ের অধিপতি (সম্রাট) হোসেন সাহা পরাগল খাঁকে সোনার পালঙ্ক, একশত ঘোড়া প্রভৃতি নানাবিধ মূল্যবান্ উপহার ও "ত্রিপুরদ্বারিকা" সমর্পণ করিয়াছিলেন। "ত্রিপুরদ্বারিকা" কি? ইহা সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম হইতে ত্রিপুররাজ্যে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ ফেনী নদীর তীরবর্ত্তী কোন স্থান হইবে; বোধ হয় কালে তাহাই "পরাগলপুর" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর এই পরাগল খাঁর আদেশ অনুসারে পদ্য মহাভারত রচনা করিয়াছেন। সংগৃহীত পুথির ৯০ পাতায় লিখিত আছে—

রুদ্র বংশ রত্নাকর তাতে জন্ম সুধাকর
লস্কর পরাগল খান।
পয়ার প্রবন্ধ স্বরে কবীন্দ্র পরমেশ্বরে
বিরচিত ভারত বাখান।

রুদ্রবংশরূপ রত্নাকরে পরাগলরূপ সুধাকরের উৎপত্তি হইয়াছে। যে সকল উচ্চজাতীয় হিন্দু মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন তাঁহাদের খাঁ উপাধি হইত। পরাগল কি তদীয় ঊর্দ্ধতন পিতৃ-পুরুষের মধ্যে কেহ রুদ্রবংশীয় হিন্দু ছিলেন। এইরূপ অনেক হিন্দু-convert মুসলমান এতদ্দেশে বিদ্যমান আছেন, ইঁহাদের মধ্যেও খাঁ উপাধির প্রচলন আছে। লস্কর শব্দের অর্থ সেনাপতি, ইহা পরাগল খাঁর কার্য্যগত পদবী।

মূলতঃ হিন্দু ছিলেন বলিয়া হিন্দুর পরম পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্র মহাভারতের প্রতি পরাগল খাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল; সেই জন্যই "কুতূহলে ভারতের পুছন্ত কাহিনী।" তাঁহার ঈদৃশ কৌতূহল স্বাভাবিক। কবীন্দ্র, পরাগলের (I.c. rigin) মূলের পরিচয় প্রদান করিয়াও সম্যক্ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। হিন্দুপ্রধানগণকে সংস্কৃত ভাষায় সম্বর্দ্ধনা করার রীতি অতি প্রাচীনকাল হইতে এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। "লস্কর" শব্দ সংস্কৃতমূলক নহে, এজন্য কবীন্দ্র তৎপরিবর্ত্তে "সেনাপতি" শব্দ প্রয়োগের সুবিধা খুঁজিতেছেন, আর রুদ্র-বংশের উল্লেখ দ্বারা পরাগলের মূল জাতির উল্লেখ করিলেও বর্ণের কথা বলা

উচিত মনে করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কবীন্দ্র বাঙ্গালা কবিতার মধ্যে পরাগলের প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদসূচক স্বরচিত একটি সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হস্তলিখিত পুথির ১০১ পাতার প্রথম পৃষ্ঠা হইতে শ্লোকের শেষ চরণ উদ্ধৃত হইল।

খান শ্রীপরাগল স জীবতি ক্ষত্রিয় সেনাপতিঃ।

হিন্দুদের মধ্যে জাতি ও বর্ণ দুইটিরই প্রচলন আছে। পরাগল জাতিতে রুদ্রবংশীয় ও বর্ণতঃ ক্ষত্রিয় ছিলেন, কবীন্দ্র এই উভয়ই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের দেশে "রুদ্র" একমাত্র কায়স্থের উপাধি। অন্য কোনও জাতিতে "রুদ্র" উপাধি দৃষ্ট হয় না। চট্টগ্রামে রুদ্রবংশীয় কায়স্থগণ অতি প্রাচীন ঔপনিবেশিক। ভরত রুদ্র রাজা ছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। চট্টগ্রাম চক্রশালায় রুদ্রবংশীয়দের দীঘি, মঠ প্রভৃতি বিস্তর সংকীর্ত্তির নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কবীন্দ্রের কথিত রুদ্রবংশ যে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়-বর্ণের অন্তর্গত, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই প্রাচীন হস্তলিখিত মহাভারত পুথি হইতে আমি উপরে যে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, মূল পুথি হইতে সেই সেই অংশ চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনীর শ্রদ্ধেয় সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, তথা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রমুখ প্রতিনিধিবর্গের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছিলাম, তাঁহারা উদ্ধৃতাংশ মূল পুথিতে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন।

জাগরণ

কবির নাম ভবানীশঙ্কর দাস—

এই জাগরণখানির রচনা সংস্কৃতপ্রধান ও বিশেষ পাণ্ডিত্যপরিপূর্ণ। কবি চণ্ডিকার অষ্ট অর্চ্চনা বা অষ্টমঙ্গলা রচনা করিতে গিয়া দেবীর নিকট আপনার অক্ষমতা ও কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

তব পদ পুণ্ডরীক চারু মকরন্দে।
ষট্পদ হইয়া পান করম্ আনন্দে।
বারেক করুণাং কুরু দেবি কৃপাময়ি।
তবাষ্টার্চ্চ পদবন্ধে রচিবারে চাহি।
কিরূপে বর্ণিব পূজার প্রসঙ্গাদি সব।
কিছুমাত্র জ্ঞান মোর নাহি জশনব।

জ, য; শ, ষ, স; ন, ণ; আর অন্তঃস্থ ব এবং বর্গীয় ব এগুলির প্রয়োগ জানি না, বর্ণজ্ঞান নাই, কিরূপে দেবীপ্রসঙ্গের কবিতা লিখিব? কেমন সুন্দর কথা দেখুন! এই জশনবের কথা শ্রীমন্তের অধ্যয়নে কবি দ্বিতীয়বার উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্যাকরণ অভিধান পড়িলেক সব।
ক্রমে ক্রমে জ্ঞান তার হৈল জশনব।

সংস্কৃত ব্যাকরণের এবং অভিধানের প্রতি কবির কিরূপ ঝোঁক দেখুন

শৃণুধ্বং সাধ্বঃ সব কর অবধান।
সঙ্ক্ষেপেতে পাঞ্চালিকা করিব বাখান।

"শৃণুধ্বং" "সাধবঃ" এগুলি খাঁটি সংস্কৃত, এমন সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত পদ স্থানে স্থানে বিস্তর রহিয়াছে, কবির অভিধান-জ্ঞান কিরূপ দেখুন

প্রথমে পূজার কথা করিলুম বাখান।
যেইরূপে পুনর্ব্বার পূজে মঘবান।

শুন শুন কহি এবে সে সব বৃত্তান্ত।
সেই মতে গুরুপত্নী হরে শচীকান্ত।
ভ্রময়ে পাকশাসন করী আরোহিয়া।
গৌতম দয়িতা দেখে রৈছে দাণ্ডাইয়া।
লুব্ধ হৈয়া বাসব তাহাকে কৈল বল।
ধ্যানক্রমে সে গৌতম জানিল সকল।
ক্রোধে মুনিপুত্র বীতিহোত্র তুল্য হৈয়া।
দর্প বাচে বলিলেক ইন্দ্র সম্বোধিয়া।

* * * *

শাপ পাই অন্তঃপুরে রহিল বিড়োজা।
লজ্জা হেতু এক মনে ভাবে নগেন্দ্রজা।

* * * *

নমো নমো নমো দুর্গা নগেন্দ্রকুমারী।
পূনর্ব্বার চরণাম্বুজ অর্চ্চিলা বৃত্রারি।

একই প্যারাতে, মঘবান, শচীকান্ত, পাকশাসন, বাসব, বিড়োজা ও বৃত্রারি এই ছয় প্রকার ইন্দ্রার্থক প্রতিশব্দ দেখিতে পাইলেন। দায়িতা, বীতিহোত্র, বাচ্ শব্দগুলিও চিন্তনীয় বটে। অন্যত্র দেখিতে পাইবেন—

দুর্গা নামাক্ষর দ্বয় বৃজিনের অরি।
সুধারস জ্ঞানে পান কর বক্ত্র ভরি।
ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্য সনে।
ভবানী শঙ্কর দাস পাঞ্চালিকা ভণে।

বৃজিন=পাপ, বক্ত্র=মুখ; পাঞ্চালিকা= পাঁচালী ইত্যাদি। ১৭০১ শকাব্দে এই জাগরণখানি রচিত হয়, এইটি শেষ জাগরণ। কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরাম ও মাধবাচার্য্যের জাগরণ অপেক্ষা শঙ্কর দাসের জাগরণ সংস্কৃত শব্দ-বহুল। যাহা হউক গ্রন্থকারের আত্মপরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

মোর আদিপুরুষ জন্মিল রাঢ়াগ্রাম।
আত্রেয় গোত্র কুলে জন্ম নরদাস নাম।
মহা ভাগ্যবন্ত কায়স্থ ছিলেন নর দাস।
রাঢ়া ভৌমে বদিখি প্রদেশে নিবাস।

কবি ভবানীশঙ্কর আপন বংশেরআদি বা বীজী পুরুষকে আত্রেয় গোত্রীয় কায়স্থ বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একটি সংস্কৃত শ্লোকও পুথিতে লিখিত আছে, তাহাতেও তাঁহার আদিপুরুষ নরহরি দাস (চলিত কথায় নরদাস) কুলীন কায়স্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন—শ্লোকটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

কুলীন কায়স্থ বরাদ্বরেণ্য
সুদয়য়ে শ্রীনরহরি দাসঃ।

কবি এই নরদাসের বংশাবলীর কথা বলিতেছেন—

তান বংশে জন্মিলেক কৃষ্ণ হৃদানন্দ।
পূর্ব্বদিকে ব্রজ কৈল হইয়া সানন্দ।
নীরাম্বের নিয়ম যে না যায় খণ্ডান।
চাটিগ্রামে আসিলেক ত্যাগি সেই স্থান।
চাটিগ্রাম রাজ্যে এক দেবগ্রাম স্থানে।
তথা গিয়া নিজপুরী কৈলা নন্দ মনে।

* * * *

তান পুত্র জন্মিলেক শ্রীমধুসূদন।
মোর পিতৃ-পিতামহ সেই মহাজন।

* * * *

গতি করিলেন সেই স্থান ত্যাগ করি।
নিবাস করিলেন সুখে চক্রশালা পরী।
তান মুখ্য পুত্র জন্মে নামে শ্রীয়মন্ত।
মহাসুখে বঞ্চিলেক সেই ভাগ্যবন্ত।
শ্রীযুত নয়ন রাম তাহান তনয়।
আমার জনক জান সেই মহাশয়।
কুল ধর্ম্মে রত পূত ছিল অনুক্ষণ।
শঙ্কর আমার নাম তাহান নন্দন।

নিজ পরিচয় দিয়া সবাকার তরে।
দেবীর প্রস্তাব গায় ভবানী শঙ্করে।
এক স্বান্ত হইয়া যে ভাবি জগমাতা।
প্রথমে কহিব সৃষ্টি পত্তনের কথা।

ইতি মঙ্গল বারের দিবা পালা।

এই আত্রেয় গোত্র ভবানী শঙ্কর দাসের বংশধরগণ অদ্যাপি চক্রশালা—ছনহরা গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন।

গীতাসার মহাযোগ

কবির নাম রতিরাম দাস—

পৌরাণিক অনেকগুলি শ্লোক তথা জয়দেব কৃত গীতগোবিন্দের দশাবতার স্তবের স্বাধীন মর্ম্মানুবাদ এবং মহাপ্রভু চৈতন্য চন্দ্রের গুণানুবাদে গ্রন্থখানি সমলঙ্কৃত। কবি গাহিয়াছেন—

সত্য ত্রেতা দ্বাপর যে কলিযুগ শেষ।
জীবের উদ্ধার হেতু চৈতন্য প্রকাশ।
শিব বিরিঞ্চি যারে ধ্যায়ে নিরন্তর।
সেই প্রভু প্রেম যাচে প্রতি ঘরে ঘর।
অস্ত্র যুদ্ধ ছাড়ি লৈলা এ ডোর কৌপীন
উদ্ধারিলা জগজন যত দীন হীন।
কাঁদিতে কাঁদিতে কহে রতিরাম দাস।
সবাইরে করিলা কৃপা আমি সে নৈরাশ।

আবার কবির গুরুভক্তি কিরূপ দেখুন, পুস্তকের শেষভাগে লিখিত হইয়াছে—

শ্রীগুরুর পাদপদ্মে ব [illegible] ার।
ভবার্ণব হোতে প্রভু [illegible] রহ উদ্ধার।
তোমার চরণ বিনে গতি নাহি আর।
রতিরাম দাস কহে সকলি অসার।
সর্ব্বশাস্ত্র বিচারিয়া মনে কৈলুম সার।
শ্রীগুরু চরণ বিনে গতি নাহি আর।
মনে ভাবি দেখ ভাই আর গতি নাই।
ভবার্ণব তরিবারে শ্রীগুরু গোসাঁই।
রতিরাম দাসে তবে মনে বিমর্ষিয়া।
নানা শাস্ত্র হোতে শ্লোক লইল উদ্ধারিয়া।
এই পুস্তক যেবা পাঠ শুনে গায়।
অন্তকালে সেই জন কৃষ্ণপদ পায়।
যেই জন পুস্তক লিখি ঘরেতে রাখয়।
কদাচিৎ সেই গৃহ লক্ষ্মী না ছাড়য়।

ইতি গীতাসার মহাযোগ পুস্তক সমাপ্ত।

শ্রীরামচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ স্বাক্ষরং ১২০৭ মঘি তাং ১১ই ভাদ্র রোজ বুদ্ধবার দ্বিপ্রহর বেলাতে পুস্তক সমাপ্ত

বিষ্ণুভক্ত—মোহমুদ্গর

অভিমন্যু রণে নিহত হইলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের শোকশান্তির জন্য যে উপাখ্যান বলিয়াছেন, পার্ব্বতী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মহাদেব তাহা প্রকাশ করিতেছেন। মোহ-মুদ্গর নামক এক বিষ্ণুভক্ত নৃপতির গল্প এই পুথিতে লিখিত হইয়াছে। কবির নাম রাঘব দাস।

বিষ্ণুভক্ত মোহমুদ্গর অদ্ভুত চরিত্র।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে শরীর পবিত্র।
এক মন চিত্ত দিয়া যে জন শুনয়।
মায়া মোহ পাপ তাপ শরীরে না রয়।
হরি গুণ গাইতে যেবা অন্য চিত্ত হয়।
অঘোর নরকে বাস তাহার নিশ্চয়।
দীন রাঘব দাসে যুগ পাণি হৈয়া।
বিষ্ণুভক্ত গুণ কহে সংক্ষেপে রচিয়া।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরগৌরী-সংবাদে অর্জ্জুন-শোক শান্তি মোহমুদ্গার পুস্তক সমাপ্ত।
লিপিকারকের নাম নাই।

বত্রিশ পুত্তলিকা

কবির নাম নাই। ভোজ রাজাকে বত্রিশ পুত্তলী বিক্রমাদিত্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন।

শীতবসন্তের পুথি

সুরসেন নামক রাজার শীত-বসন্ত নামক দুইটি পুত্রের গল্প। আখ্যান ভাগ অনেকাংশে আধুনিক প্রচলিত বিজয়বসন্তের গল্পের মতন। কবির নাম বাণীরাম ধর, জাতিতে সুবর্ণ বণিক, নিবাস চট্টগ্রাম। ইহা একখানি বৃহদাকারের পুথি। কোন ব্রাহ্মণের মুখে গল্প শুনিয়া কবি তাহা পদ্যে প্রচার করেন। গল্পটি কোন শাস্ত্রমূলক নহে, সুতরাং কবি নিজেই স্বীকার করিতেছেন ইহা সত্য কি মিথ্যা নারায়ণই জানেন।

কহে বাণীরাম ধরে শুন সর্ব্বজন।
সত্য মিথ্যা এহার জানয়ে নারায়ণ।

অন্যত্র—

কহে বাণীরাম ধরে এই মতে কুমারে
শান্ত করে যত প্রজাগণ।
প্রসঙ্গ শুনিয়া কহি শুনহ সুজন ভাই
সত্য মিথ্যা জানে নারায়ণ।

কবি আপনার পরিচয় দিতেছেন—

বণিক কুলেতে জন্ম চাটিগ্রামে ঘর।
স্বদেশ ছাড়িয়া আইলুম আইন্দি নগর।
তাতে এক দ্বিজবরে প্রসঙ্গ কহিল।
শুনিয়া যে মন বড় উল্লাসিত হৈল।
রাত্রি দিন ভাবি আমি পদ বলিবার।
যেন তেন মতে আমি করিলাম প্রচার।
গুণিগণ দোষ শুনি না লৈবা আমার।
বারে বারে তুয়া পদ কৈলাম নমস্কার।

কবি স্বদেশ ছাড়িয়া আইন্দিতে গিয়াছিলেন। এই আইন্দি কোথায়? ১২০৯ মঘিতে সংগৃহীত পুথিখানি লিখিত হইয়াছে—লিপিকারকের নাম নাই।

কন্ব মুণির পারণা ভঙ্গ

কবি রাধাকান্ত দ্বিজ প্রণীত।

নন্দ বাথানে গিয়াছেন, যশোদা গৃহে থাকিয়া বালক শ্রীকৃষ্ণকে খেলা দিতেছেন। এমন সময় কণ্ব মুনি তাঁহার গৃহে পারণার্থী হইয়া উপস্থিত। যশোদা ছেলেকে শয়ন-কক্ষে ঘুমাইয়া মুনির পারণা সামগ্রী করিয়া দিলেন। মুনি অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দ্বারের কপাট দিয়া পারণা করিতে বসিয়াছেন। অন্ন ব্যঞ্জন নিবেদন করিতে দিয়া মুনি চক্ষু বুজিয়া নারায়ণের ধ্যান করিতেছেন, অমনি যশোদার দুরন্ত ছাওয়াল মুনির সম্মুখস্থিত অন্ন ব্যঞ্জন সপাসপ খাইয়া ফেলিতেছেন।

মুনি বোলে শুন রাণি আমার বচন।
ধ্যানেতে বসেছি আমি গোবিন্দ চরণ।
অন্ন ব্যঞ্জন খায় আসি তোমার ছাওয়াল।
কিরূপে আসিল ঘরে না বুঝি জঞ্জাল।
দ্বারেতে কপাট দিলাম কিরূপে আসিল।
আচম্বিতে এথা আসি সব অন্ন খাইল।
রাণী বোলে অপরাধ হইছে আমার।
পারণা সামগ্রী করি দিবাম্ পুনর্ব্বার।
অবোধ ছাওয়াল আমার কিছু নাহি জানে।
ক্রোধ ক্ষমা কর মুনি তাহার কারণে।

ভণিতা :—

রাধাকান্ত দ্বিজের বাণী শুন শুন কণ্ব মুনি
নররূপে অবতার হরি।

তুলসী-মাহাত্ম্য

দ্বিজ কংসারি পণ্ডিতের পুত্র ভগীরথ প্রণীত।

কংসারি পণ্ডিত দ্বিজ সুত ভগীরথ।
পদ্মপুরাণে কহে তুলসীর মাহাত্ম্য।
সারদার চরণে আমি মাগি পরিহার।
তুলসীর গীত কিছু করিনু প্রচার।

আর একস্থলে ভণিতা আছে—

দ্বিজ ভগীরথ কহে পয়ার প্রবন্ধে।
তুলসীর গীত কিছু করি দীর্ঘ ছন্দে।

দীর্ঘ ছন্দের অর্থ লাচারী বা দীর্ঘ ত্রিপদী। প্রাচীন কবিগণ ত্রিপদীকে লাচারী বলিতেন। দীর্ঘকাল শ্বাস ধারণহেতু ত্রিপদী পড়িতে লাচার বা ক্লান্ত হইতে হয় বলিয়া ঐ ছন্দের নাম লাচারী হইয়াছে।

দ্বিজ ভগীরথ বোলে হরিপদ যুগলে
হরি পরে গতি নাহি আর।

লিপিকারকের নাম শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন ১১১২ মথি ১৫ই পৌষ।

সুন্দরাকাণ্ড

কবি অদ্ভুত আচার্য্য প্রণীত।

ভণিতা—

অদ্ভুত আচার্য্য কবি শ্রীরাম গুণ গায়।
সুন্দরাকাণ্ড সমাপ্ত পঞ্চম অধ্যায়।

লিপিকারক শ্রীরামসুন্দর গুহের পুত্র শ্রীপীতাম্বর গুহ সাং ছনয়া খানা পটিয়া ১২২৮ মথি ১৫ই আষাঢ় গুরুবার দণ্ডগো কাচারী মোকামে বেলা দেড় প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল।

রামের স্বর্গারোহণ

কবি ভবানী দাস বা ভবানন্দ দাস পণ্ডিত বিরচিত।

ভণিতা :—

ভবানী দাসের বাণী শুন শুন ঠাকুরাণী
গোলোকে আসিব প্রাণপতি।

কিন্তু অপর এক স্থলে ভণিতায় দৃষ্ট হয়।

রাম কান্ত মিত্রে বোলে ভবানন্দ দাসে।
হনুমান বীর কান্দে সকরুণ ভাষে।

রাম কান্ত মিত্র বলিতেছেন না ভবানন্দ দাস বলিতেছেন? কে কাহাকে শুনাইতেছেন? আবার এ স্থলে ভবানী দাস না হইয়া ভবানন্দ দাস হইল কেন? সম্ভবতঃ দুই-ই এক জনের নাম হইবে। যাহা হউক আবার পুথির পরিসমাপ্তিতে কৃত্তিবাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়।

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
উত্তরার শেষে রামের স্বর্গ আরোহণ।

প্রাচীন পুথির সংগ্রহকর্ত্তা
শ্রীজগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ।
বাণ্ডেল মরেণ্ডা লেন।
চিতাগঞ্জ।

আধুনিক সাহিত্যে ব্রাহ্মণ-চিত্র *

[বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচকগণ এই প্রবন্ধে একটা নূতন আলোচনাপ্রণালী দেখিতে পাইবেন। সমাজের কর্ম্মজীবন সাহিত্যের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যে তাহার বিবরণ বেশী পাওয়া যায় না। এই প্রবন্ধে লেখক যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন সেই প্রণালীর সাহিত্য-সমালোচনা আমাদের দেশে বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক]

প্রাচীনকালে ভারতীয় সাহিত্যে ব্রাহ্মণ জাতি

* "ব্রাহ্মণ-সমাজ" হইতে উদ্ধৃত

জ্ঞানে গাম্ভীর্য্যে চরিত্রে ধৈর্য্যে সংযমে ও বিনয়ে সকল জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্ব অপেক্ষা বিদ্যা, আচার ও তপস্যার গৌরব অধিক। তৎকালে কন্দমূলফলাশী বা শিলোঞ্ছবৃত্তি অরণ্যবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণের পদতলে কতশত রম্যহর্ম্ম্যবিহারী রাজরাজেশ্বরের চূড়ামণি বিলুণ্ঠিত হইত।

অধিক কি ভৃগুমুনির পদচিহ্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্বয়ং ভগবান্ ব্রাহ্মণজাতির গৌরব শতগুণে জগতে প্রকাশ করিয়াছেন।

মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে, যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ বাসুদেব, সাধারণের চক্ষে মর্ত্ত্যরূপে প্রতীত হইলেও, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষের গণনায় অর্ঘ্যদানের যোগ্য বলিয়া সগৌরবে বিবেচিত হইয়াছিলেন, তিনিই কি না যজ্ঞব্যাপারে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের পদপ্রক্ষালন-কার্য্যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই জাতীয় বহুতর ঘটনা ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের পত্রে পত্রে স্বর্ণাক্ষরে চিত্রিত আছে।

মনু বলিতেছেন :—

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥

বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালী-সমাজে অভিনীত বাঙ্গালাভাষায় নাটক ও গীতাভিনয়গুলির পর্য্যালোচনা করিলে প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণজাতির সাহিত্যিক দুরবস্থার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

আমি বাল্যকালে প্রহ্লাদচরিত্র-নামক নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়া ভাবিতাম দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু কি অবিবেচক! এমন সোণার কমল সচ্চরিত্র সুসভ্য রাজ-কুমারগুলিকে কোথাকার অসভ্য বর্ব্বর গণ্ডমূর্খ ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব করিতে নিয়োগ করিয়াছেন! এইরূপ ব্যক্তি কি রাজপরি-বারের শিক্ষক হইবার যোগ্য?

আমার বাল্যসুলভ ঋজু বুদ্ধিতে এইরূপ ধারণা জন্মিবার আর কোন কারণ ছিল না; শণ্ডামর্কের পোষাক-পরিচ্ছদ, হাব-ভাব, এবং মস্তক বিঘূর্ণিত করিলে চতুর্দ্দিকে প্রায় দুই হস্ত পরিমিত আকাশ মণ্ডল যাহার ভ্রমণ-ক্রিয়ার আশ্রয় হইয়া থাকে, সেই সুদীর্ঘ শিখা দেখিয়াই মনে মনে তাঁহাদিগকে অসভ্য ভাবিতাম।

কেবল বেশভূষাদি নহে, উক্তিগুলিও বিচিত্র! একটু নমুনা প্রদান করি :—

হিরণ্যকশিপুর ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে একজন (শণ্ড) আর্ত্ত স্বরে "জগদম্বে" বলিলেন, অন্যজন (অমর্ক) তাহার সঙ্গে ব্যতিব্যস্তভাবে "ভ্যা" শব্দটি যোগ দিলেন। এইরূপে সর্ব্বাবস্থায় হতভাগ্য ব্রাহ্মণ দুইটিকে স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ হাস্য ও বীভৎসরসের সমবায়-রূপে রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতাম।

সেই অবধি "শণ্ডামর্ক" শব্দের আভিধানিক অর্থ হইয়াছে (অন্ততঃ আমার পক্ষে) অসভ্য, গণ্ডমূর্খ, অকাল কুষ্মাণ্ডের ন্যায় কোনও ব্যক্তিবিশেষ। এইরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইতে হইলে লোকটা বড়ই "শণ্ডামার্ক" এই প্রকার ভাষা অধুনা সমাজ মধ্যেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অধিক কি, শণ্ডামার্ক শব্দের ঈদৃশ অর্থ সেই পবিত্র প্রহ্লাদ-চরিত্রের অভিনয় হইতেই উপজাত হইয়াছে।

তৎপরে যখন আমার শ্রীমদ্ভাগবত ও

বিষ্ণুপুরাণাদির সংস্কৃত শ্লোক পড়িয়া বুঝিবার শক্তি জন্মিল, তখন একবার কৌতূহল হইল শণ্ডামর্ক কি বাস্তবিকই এইপ্রকার অসভ্য ? শ্রীমদ্ভাগবতে শণ্ডামর্কের পরিচয় এই প্রকার—

পৌরোহিত্যায় ভগবান্ বৃতঃ কাব্যঃ
কিলাসুরৈঃ।
শণ্ডামর্কৌ সুতৌ তস্য দৈত্যরাজগৃহান্তিকে ॥
তৌ রাজ্ঞা প্রাপিতং বালং প্রহ্লাদং নয়-
কোবিদং।
পাঠয়ামাসতুঃ পাঠ্যানন্যাংশ্চাসুরবালকান্ ॥

শণ্ডামর্ক দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের পুত্র। তাঁহারা রাজ-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া রাজভবনের সমীপদেশে অন্যান্য অসুর বালকগণের সহিত রাজপুত্র প্রহ্লাদকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। তাহাদের তাদৃশ ভীতিবিহ্বলতা বা অসভ্যোচিত কোনও হাস্যজনক উক্তির সংবাদ বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিলাম না।

তাঁহারা নানাশাস্ত্রপারদর্শী ও বেদবেদাঙ্গবিদ্ ছিলেন। এবং অগ্নিস্তম্ভন ও জলস্তম্ভনের মন্ত্র ও অভিযোগ প্রভৃতি (আধ্যাত্মিক শক্তি) বহুতর অলৌকিক কার্য্য করিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল।

একদিন পানাসক্ত হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের মুখে বিষ্ণুর স্তুতি শুনিয়া ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইলেন, এবং গুরুপুত্রকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন।

ব্রহ্মবন্ধো ! কিমেতত্তে বিপক্ষস্তুতিসংহিতং।
অসারং গ্রাহিতো বালো মামবজ্ঞায় দুর্ম্মতে ॥
বিষ্ণুপুরাণ।

দুর্ম্মতে ! ব্রাহ্মণাধম। এ কি ? আমাকে অবজ্ঞা করিয়া বালককে বিপক্ষের স্তুতিবাচক কথা শিক্ষা দিয়াছ !

তখন শণ্ডামর্ক কিছুমাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত না হইয়া রাজার মুখের উপরই বলিয়া উঠিলেন—

ন মৎপ্রণীতং ন পরপ্রণীতং
সুতো বদত্যেষ তবেন্দ্রশত্রো।
নৈসর্গিকীয়ং মতিরস্য রাজন্,
নিযচ্ছ মন্যুং, কদদাঃ স্ম মা নঃ ॥
শ্রীমদ্ভাগবত। ৭ ৫।

হে ইন্দ্রশত্রো ! আমার উপদেশ বা অপরের উপদেশে তোমার পুত্র এইরূপ কথা কহিতেছে না। ইহা তাহার চিত্তে আপনা-আপনি উদিত হইয়াছে, অতএব হে রাজন্ ! ক্রোধ সংবরণ কর, এবং আমাদিগকে এইরূপ অনুচিত কুবাক্য বলিও না।

শণ্ডামর্ক ভীত বা কম্পিত হইবেন কেন ? হিরণ্যকশিপুর মত রাজাকে তাহাদের ভয় করিবার কোনও কারণ ছিল না ; কারণ ইঁহারা শুক্রাচার্য্যের ঔরস পুত্র, তদুপরি নিজেই মন্ত্র-তন্ত্র-বিশারদ ও নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ।

হিরণ্যকশিপু নিতান্ত ক্ষিপ্তপ্রায় না হইলে কখনই গুরুপুত্র শণ্ডামর্ককে অপমানিত করিতেন না। এতদ্ভিন্ন রাজা ও গুরুপুত্রের অন্যান্য উক্তিপ্রত্যুক্তিগুলিও অত্যন্ত ভদ্রোচিত ও সুসঙ্গত ভাবেই হইয়াছিল। তবে নাট্যকার, কেবল হাস্যরসের পরিপুষ্টির জন্য এই আশ্রমবাসী নিরীহ ব্রাহ্মণকে ঈদৃশ জঘন্যভাবে আসরে আনিলেন কেন ?

ইহাই কি বাঙ্গালীসমাজে ব্রাহ্মণভক্তির জলন্ত নিদর্শন নহে ?

কেবল শণ্ডামর্কের উপরই যে শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে তাহা নহে, অধিকাংশ নাটক ও

গীতাভিনয়ে যখন যে ব্রাহ্মণকে বাহির করিবার প্রয়োজন তখনই দেখিতে পাইবেন, দধি-চিড়ার উদ্গার দিতে দিতে অথবা গঞ্জিকার কলিকাহস্তে বা ব্রাহ্মণীর ভয়ে নিতান্ত বিহ্বল মানসে ব্রাহ্মণ-ঠাকুর রঙ্গক্ষেত্রে সমাগত হইতেছেন; উল্টা কোছা, দীর্ঘটিকী ও ছত্রের ঊর্দ্ধভাগে গাত্রমার্জ্জনী বন্ধন প্রভৃতি ব্রাহ্মণের চিরপ্রসিদ্ধ পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রবাহূত ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া দেবাচার্য্য বৃহস্পতি পর্য্যন্তও বর্ত্তমান বাঙ্গালার নাট্য-সাহিত্যে এই গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত।

আধুনিক নাট্যে ব্রাহ্মণের আর একটা দুর্দ্দশার উদাহরণ দেখান যাইতেছে :—

ত্রিলোকরাজ পুরন্দর ও অন্যান্য দেবমণ্ডলী যাঁহার শিষ্য, সেই দেবগুরু বৃহস্পতির পরিবারের বালকগণ ইন্দ্রের বাড়ীর নিত্য ঠাকুর-পূজার নৈবিদ্যের কদলী হইয়া মারামারি করিতেছে, আর স্বয়ং দেবগুরু বৃহস্পতি স্বার্থান্ধ ভ্রাতৃদ্রোহী স্ত্রীবশ নীচাশয়-রূপে এবং তদীয় সহধর্ম্মিণী পতিব্রতা সতী তারা উগ্র-চণ্ডা মুখরা ব্যভিচারিণী ও কুলপাংশুলারূপে উপস্থিত হইয়াছিল।

পুরাণে দেখিতে পাই রাজসূয়-যজ্ঞের দম্ভে চন্দ্র তারাকে বলপূর্ব্বক মন্দাকিনীর তীরদেশ হইতে হরণ করিলেন। পরে তারা ব্রহ্মার ব্যবস্থায় চন্দ্র হইতে সমুদ্ভূত গর্ভ ইষিকাস্তম্ভে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তান্তে বৃহস্পতির ভবনে গমন করেন।

ব্রহ্মা তারার সতীত্ব সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিয়া বলিলেন,—

দুর্ব্বলা বলিনা গ্রস্তা নিষ্কামা ন চ্যুতা ভবেৎ।
প্রায়শ্চিত্তেন শুদ্ধা সা ন স্ত্রী জারেণ দূষ্যতি॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

অকামা অবলা, যদি কোনও বলবান্-কর্ত্তৃক বলাৎকারপূর্ব্বক গৃহীত হয়, তাহা হইলে তাহার পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুতি হয় না; তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন; স্ত্রীলোক বলপূর্ব্বক জার-সঙ্গমে দূষিত হয় না।

বুধ বৃহস্পতির পুত্র নহে, চন্দ্রের পুত্র, বুধকে পরিত্যাগ করিয়াই তারা বৃহস্পতির আলয়ে গমন করেন। সেই বুধকে বৃহস্পতির পুত্র বলা নাট্যকারের নিতান্ত অজ্ঞতা বা স্বেচ্ছাচারিতা।

যাঁহারা নাটক-রচনার জন্য লেখনী ধারণ করেন, তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, অসঙ্গত ঘটনা, প্রকৃত হইলেও, নাটকের অনেক স্থলে তাহা পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্জ্জিত করিতে হয়।

যৎ স্যাদনুচিতং বস্তু নায়কস্য রসস্য বা।
বিরুদ্ধং তৎ পরিত্যাজ্যমন্যথা বা প্রকল্পয়েৎ।

সাহিত্যদর্পণ।

যে সকল সত্য ঘটনা নায়কের বা রসের অনুপযোগী বা বিরুদ্ধ, সেই সকল পরিত্যাগ করিবে অথবা অন্যপ্রকারে সংশোধন করিয়া দিবে। ইহা আলঙ্কারিক প্রমাণ। কোনও কোনও নাট্যকারের এইরূপ কুরসিকতা যে, যাহা ন্যায্য উচিত ও রসের অপরিপন্থী, নিজের অনবধানতা দোষে তিনি তাহাকে অন্যায্য ও বিরুদ্ধরূপে চিত্রিত করিতেছেন।

এইরূপ কদর্য্যভাবাপন্ন বৃহস্পতি-পরিবারের আদর্শে সমাজের উচ্চ উচ্চ ব্রাহ্মণপরিবার

গঠিত হইলে, কি যে নারকীয় ভাব সমাজে প্রবেশ করিবে তাহা ভাবিতেও দুঃখ হয়। সমাজ সমক্ষে উত্তম আদর্শ উপস্থিত করিয়া এই দুর্দ্দিনে সমাজের উপকার করা কর্ত্তব্য।

অধুনা নাটকীয় অঙ্কে ব্রাহ্মণের চরিত্র যেরূপ বিড়ম্বিত ও কলুষিত ভাবে চিত্রিত হইতেছে, তাহাতেই বোধ হয় অচিরেই শণ্ডামর্ক শব্দের ন্যায় ব্রাহ্মণ শব্দেরও নূতন অভিধান ও নূতন লক্ষণ শব্দকল্পদ্রুমে সন্নিবেশিত করিতে হইবে।

ইহার মধ্যেই কলিকাতার যাদুঘরে নাগা, কুকী, খাসিয়া প্রভৃতি অসভ্য জাতীয় মনুষ্যের মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তির সমীপে থানধুতি-পরিহিত বিরলকেশ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়া দর্শকের হাস্যোদ্গমের সহায়তা করিতেছে। যেমন সমাজে, তেমনি সাহিত্যে, ব্রাহ্মণের দুর্দ্দশার অবধি নাই। ষট্‌কর্ম্মী ব্রাহ্মণই তাহার লক্ষ্যস্থল। ইহাই কলি-মাহাত্ম্য।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ,
শ্রীহট্ট ব্রাহ্মণসভা-সম্পাদক।

মহারাষ্ট্রের কৃষি-সমিতি ও পয়সা-ফাণ্ড

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। ইহার প্রায় ⅘ অংশ লোক কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়াসমূহ ও কৃষির সহিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সংযোগ আমাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের এই প্রধান উপায়কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের এখন এদিকে দৃষ্টিপাত করিবার সময় আসিয়াছে। আবহমান কাল হইতে প্রচলিত নিয়মে কৃষিকার্য্য চালাইতে গেলে প্রতি-যোগিতায় অন্যান্য জাতির নিকট আমাদিগকে পরাস্ত হইতে হইবে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের এদিকে কতকটা দৃষ্টি পড়িয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশ এখনও বিশেষ সাড়া দেয় নাই। দাক্ষিণাত্যে জনসাধারণ যেরূপ ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা আমাদের অনুকরণীয় বলিয়া মনে করি; তাই তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীর একটা চিত্র পাঠকের সমক্ষে ধরিতেছি।

এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের দ্বারা আমাদের আশানুরূপ ফললাভ হওয়া এক প্রকার অসম্ভব মনে করিয়া বোম্বাই অঞ্চলের জনসাধারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিসমিতি গঠন করিয়া তাহাদের সহিত গবর্ণমেণ্ট কৃষিবিভাগের যোগ রাখিয়া কৃষকদিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য চালাইবার জন্য উপযুক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন। বোম্বাইয়ে ইতি মধ্যেই এইরূপ ২৯টি সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহাদের ১৭টি বোম্বাইয়ের মধ্যবিভাগে—পুণা, সাতারা, শোলাপুর, নাসিক ও আহম্মদনগর জেলায়—প্রতিষ্ঠিত।

আহম্মদনগর ও অন্যান্য তালুকে পর্য্যায়-ক্রমে বৎসর বৎসর কৃষি-প্রদর্শনী খোলা হইত। এই সমস্ত প্রদর্শনী হইতে লোকের মনে কৃষিবিভাগের উন্নতিকল্পে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। তাহা হইতেই প্রথমে ছোট ছোট সমিতি গঠিত হইল। পরে গ্রামবাসিগণ স্থানে স্থানে উঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল।

অনেক দিন পর্য্যন্ত এই সমিতির কাজ বিভিন্ন স্থান হইতে উত্তম বীজ সংগ্রহ করিয়া

কৃষকদিগকে অর্পণ করা ও প্রদর্শনী গঠনের সহায়তা করা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না; কিন্তু এক্ষণে 'দাক্ষিণাত্য কৃষি-সমবায়' নামক পুণার কেন্দ্রসমিতি তাহার অধীন সমিতি ও কৃষিবিভাগের যোগ্য কর্ম্মচারিগণের সাহায্যে বেশ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। ইহা এখন ত্রৈমাসিক সমিতিতে পঠিত প্রবন্ধাবলীর সাহায্যে ও পুণা হইতে দূরে স্থানে স্থানে সভা আহ্বান করিয়া কৃষিবিষয়ে লোকশিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। অধীন শাখাসমিতির সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় শিক্ষারও বেশ সুবিধা হয়। বিশেষতঃ এই কেন্দ্রসমিতি শেঠকী ও শেঠকারী নামক কৃষি-বিষয়ক যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দ্বারাও দিন দিন ইহার অনুকূলে লোকমত গঠিত হইতেছে। যে কৃষক একটু লিখিতে ও পড়িতে পারে সেই ইহা দ্বারা অনেক উপকার লাভ করে।

বাঙ্গালাদেশে আজ কাল এই ধরণের দুই একটা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে ও স্থানে স্থানে কৃষি-আলয় নির্ম্মিত হইতেছে বটে, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দিবার কোন চেষ্টাই দেখা যাইতেছে না। পুষায় একটিমাত্র কৃষি বিদ্যালয় আছে, কিন্তু তাহার কথা কয়জন জানে? শুধু পত্রিকা প্রকাশ করিলে বা স্থানে স্থানে উত্তম বীজ সংগ্রহ করিয়া বিক্রয়ার্থ বিজ্ঞাপন দিলে কি হইবে? কৃষক যদি উহার উপকারিতা না বুঝে তবে কি প্রকারে এই সমস্ত পত্রিকা প্রচার হইবে? কি করিয়াই বা কৃষকেরা উত্তম বীজ বপনের ফলাফল, জমিতে সার দিবার প্রণালী অবগত হইবে? সুতরাং প্রথমে সভাসমিতি গঠন করিয়া পল্লীতে পল্লীতে গিয়া কৃষকদিগের নিকট বিজ্ঞান-বার্ত্তা প্রচার করিতে হইবে; বুঝাইতে হইবে যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জমি চাষ করিতে তাহাদের অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমের আবশ্যক হইবে অথচ বেশী পরিমাণ ফললাভ হইবে। বুঝাইতে হইবে জমিতে সার দেওয়ারও নিয়ম আছে, ঐ নিয়মানুযায়ী চলিলে জমির উর্ব্বরতা-শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে পারে; শিখাইতে হইবে বিজ্ঞানের সাহায্যে সহজেই উদ্ভিদের আপদ্-সমূহের প্রতীকার করা যায়। শুনাইতে হইবে, জাপান, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ক্রমশঃ বিজ্ঞানের সাহায্যেই কৃষিকার্য্যে অধিকতর কৃতকার্য্যতা লাভ করিতেছে। দুই একটা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিলে, দুই একটি বীজভাণ্ডার স্থাপন করিলে অথবা জেলায় জেলায় বৎসরান্তে একবার প্রদর্শনী খুলিলেই কৃষকের উন্নতি করা হইল না। এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। পুষা কলেজের ন্যায় স্থানে স্থানে কলেজ স্থাপন করা আবশ্যক; স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয়েও কৃষক-ছাত্রদিগকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া বিশেষ দরকার। দক্ষিণ ভারতের ন্যায় এই দেশেও কেন্দ্র-সমিতির অধীন ছোট ছোট কৃষিসমিতি গঠিত হউক। তবেই আমাদের কাজ ক্রমশঃ সরল হইয়া আসিবে।

পুণার কৃষি-বিভাগের দ্বারা যে সমস্ত বিষয়ের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইতেছে সেই সমস্ত যদি কৃষকদিগের দ্বারা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর বিবেচিত হয় তবে যে স্থানে কৃষিসমিতি আছে সেখানে তাহার উপযোগী

বিষয়গুলি সভার সমক্ষে উপস্থাপিত করা হয়; কৃষকগণ এই প্রস্তাবসমূহ যদি লাভজনক বলিয়া মনে করে, তবে কেহ কেহ তখনই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নবান হয়। এইরূপে সকল স্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভাগুলি মিলিয়া এককালে অনেকগুলি প্রস্তাবিত বিষয়ের কার্য্য আরম্ভ করে এবং তাহাদের দ্বারা ঐ উন্নতির উপায় যখন লাভজনক বলিয়া প্রমাণিত হয়, তখন সাধারণ কৃষকেরাও সানন্দে তাহাদের অনুসরণ করিয়া থাকে। এই সমস্ত সমিতি কর্ত্তৃক উন্নতির কয়েকটি আবশ্যক ও সহজ উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে—

(১) গোময় ও গোমূত্রের উপযুক্ত রক্ষণ।

(২) বীজনির্ব্বাচন।

(৩) ময়লা নাশ করিবার জন্য তুঁতের ব্যবহার।

(৪) লাভজনক ও আশুপাকী বৈদেশিক বীজের চাষ।

(৫) প্রচুর পরিমাণে সূতা-উৎপন্নকারী তুলা ও পাটের চাষ।

(৬) ধানগাছে 'সান' নামক জিনিসের কাঁচা সারের ব্যবহার।

ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে জমিতে গোময়ের সার ব্যবহৃত হয় সত্য, কিন্তু চাষীরা উহার রক্ষণের নিয়ম জানে না বলিয়াই ঐ সারের দ্বারা উপযুক্ত পরিমাণ ফললাভ হয় না। গোমূত্র আমাদের প্রায় কোন কাজেই আসে না। গো-শালার এক পার্শ্বে একস্থানে গোময় যে ভাবে স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হয় তাহাতে সার হিসাবে উহার অনেকটা শক্তি কমিয়া যায়। যদি ঐ গোময় কোন গর্ত্তের ভিতরে পুতিয়া রাখা যায় ও বাড়ীর অব্যবহার্য্য জল নালা-নর্দ্দামা দিয়া ঐ কূপে আনয়ন করিয়া সারটিকে সর্ব্বদা সিক্ত রাখা হয়, তাহা হইলে উহার দ্বারা অধিকতর উপকারের আশা করা যাইতে পারে। মূত্র ও গোশালার মাটীকে সম্পূর্ণ সেঁতসেঁতে করিলে পর ঐ মৃত্তিকাও জমিকে উর্ব্বর করিবার শক্তি প্রাপ্ত হয়। এই উপায়ে সার প্রস্তুত করিতে কৃষকের অর্থব্যয়ের আবশ্যকতা নাই; তবে পরিশ্রমের দরকার হয়।

বীজ-নির্ব্বাচন-প্রণালীকেও উপেক্ষা করা উচিত নহে। দাক্ষিণাত্যের চাষারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে যে অনির্ব্বাচিত বীজ অপেক্ষা নির্ব্বাচিত বীজ বেশী ফসল উৎপন্ন করিতে সমর্থ। প্রতি বৎসর নির্ব্বাচিত বীজের দ্বারা উদ্ভিদ উৎপাদিত হইলে তাহার বীজের আশু পক্বতাশক্তি ও ঝড় হইতে আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সামগামনার তালুকের কৃষকেরা এই নীতির অনুসরণ করিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক্ষেত্রেও অর্থের কোন দরকার হয় না।

তৃতীয়তঃ কোন কোন স্থলে ময়লার জন্য বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে পারে না; এইজন্য প্রতি তিন বিঘা জমিতে বপনীয় বীজ পরিষ্কার করিতে এক আনা খরচ পড়ে। তুঁতে দ্রাবকে (Copper Sulphate Solution) বীজগুলি ধৌত করিয়া লইলে এই আপদের হাত হইতে উদ্ভিদকে উদ্ধার করা যায়।

অন্যান্য প্রস্তাবিত উপায়েও ফসলের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইতে পারে। মহারাষ্ট্রে এই কয়েকটি উপায় অবলম্বন ব্যতীত লোহার

লাঙ্গল, ইক্ষুপেষণের লোহার যাঁতা, পুণায় প্রস্তুত উণান ব্যবহারের জন্যও কৃষকদিগকে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। তবে এইগুলি ক্রয় করিতে কিছু অর্থব্যয়ের আবশ্যক, তাই মহারাষ্ট্রবাসী এ বিষয়ে এখনও ততটা কৃতকার্য্য হইয়া উঠেন নাই।

এই উন্নত প্রণালীতে কাজ করিবার জন্য বোম্বাই দেশে যে কয়েকটি সমিতি গঠিত হইয়াছে নিম্নে তাহাদের বিবরণ বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে।

(১) সাতারা জেলায় ইসলামপুর সমিতি—এই সমিতি পুনায় প্রস্তুত উণান ব্যবহার করিয়া তাহার উপকারিতা সাধারণকে বুঝাইয়া দিবার ভার লইয়াছেন। ইক্ষুর জমিতে ammonium sulphateএর সার দিলে জমির উৎপাদিকা শক্তি কতদূর বর্দ্ধিত হয়, তাহাও দেখাইয়াছেন।

(২) সাতারা জেলা কৃষি-সমবায়—ইঁহারা খারিফ্ শস্যের সময়ে দুইটি বীজ-ভাণ্ডার খুলিয়াছেন ও ব্যক্তিগত ভাবে অনেক সভ্যই নিজেদের উপযোগী এক একটি উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার ফলাফল স্থির করিতেছেন।

(৩) সান্‌গামনার সমিতি, আহম্মদনগর—এই সমিতি লোহার লাঙ্গল প্রভৃতি ব্যবহার ও বৈদেশিক বীজের চাষের কথা জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতেছেন। ব্যক্তিগতভাবে সভ্যগণের কেহ ইক্ষুর জমিতে সার দেওয়ার কাজ, কেহ বৈদেশিক বীজের ব্যবহার, বীজ-নির্ব্বাচন কেহ বা জমিতে বাঁধ দেওয়ার প্রণালীর কার্য্যতঃ প্রমাণ লোককে দেখাইতেছেন।

(৪) জামসেদ্ তালুক সমিতি বীজ-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন।

(৫) সোলাপুর-সমিতি সাধারণকে লোহার লাঙ্গলের উপকারিতা বুঝাইবার জন্য কয়েকখানা লাঙ্গল কিনিয়া তাহাদিগের দ্বারা ব্যবহার করাইতেছেন।

এই সমস্ত সমিতির কার্য্য হইতে বুঝা যায় মহারাষ্ট্রের স্থানীয় লোকসমূহ তাহাদের দ্বারা কতদূর উপকৃত হইতেছেন। সেখানে নূতন কোন প্রণালীর প্রবর্ত্তন এখন আর অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে না বরং ক্রমশঃ লোকেরা এইদিকে প্রাণ ঢালিয়া দিতে প্রস্তুত হইতেছেন।

এক্ষণে দেখা দরকার এই সমস্ত কাজ করিতে গেলে কি গুণ বা কোন্ জিনিসের দরকার। ভাবিয়া দেখিলেই তিনটি কথা মনে আসে—(১) উপযুক্ত কর্ম্মী, (২) অর্থ ও (৩) কাজ করিবার আকাঙ্ক্ষা। কর্ম্মী ও কাজ করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলে অর্থের জন্য কোন কাজই পড়িয়া থাকে না। ইচ্ছা হইলে উপায় আপনা হইতেই আমাদিগকে অনুসরণ করে; সুতরাং যাহাতে আমাদের বাঙ্গালা-দেশে কৃষি-বিভাগের উন্নতিকল্পে এইরূপ কর্ম্মীর সৃষ্টি হয়, তাহার চেষ্টা এখন হইতেই করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

শিল্পোন্নতির অর্থ সংগ্রহের জন্য মহারাষ্ট্র-বাসীগণ একটি পয়সা-ফাণ্ড স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে জাতি-দেশ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগৃহীত হইয়া থাকে। এই ভাণ্ডারের সাধারণ নিয়মাবলীর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

ইহার নাম ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফাণ্ড বা পয়সা-ফাণ্ড। ইহার সভ্যগণ ৫ ভাগে বিভক্ত।

(১) পৃষ্ঠপোষক—যাঁহারা ৫০০৲ বা ততোধিক টাকা এককালে দান করেন।

(২) সাহায্যকারী—যাঁহারা এককালে ১০০৲ হইতে ৫০০৲ টাকা দান করেন।

(৩) আজীবন সভ্য—যাঁহারা ৫০৲ হইতে ১০০৲ টাকা একবারে দেন।

(৪) সাধারণ সভ্য—যাঁহারা বৎসরে ১৲ টাকা করিয়া দেন।

(৫) ভোটদাতা—যাঁহারা বৎসরে দুই আনা হইতে ১৲ টাকা চাঁদা দেন।

আর যাহারা ৫০৲ টাকার কম এককালে দান করেন তাঁহাদিগকে বন্ধুবর্গ বলা হয়।

এই ফাণ্ডের কার্য্য সুন্দররূপে চালাইতে চারি রকমের সমিতি বা মণ্ডল গঠিত হইবে।

(১) কার্য্য-নির্ব্বাহক কেন্দ্র-সমিতি—

(২) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি

(৩) পল্লী-সমিতি

(৪) উত্তেজক সমিতি।

কেন্দ্র-সমিতি প্রতি পাঁচ বৎসরে একবার মনোনীত ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত হইবে। ইহার অর্দ্ধেক সভ্য পল্লী-সমিতি কর্ত্তৃক মনোনীত হইবে। এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী ও আজীবন সভ্যগণের দ্বারা, অবশিষ্ট এই সমস্ত মনোনীত ব্যক্তিগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন।

এই কেন্দ্র-সমিতি—সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক প্রভৃতি আপনাদের মধ্য হইতে স্থির করিয়া লইবেন।

কেন্দ্র-সমিতির সভ্যগণকে পৃষ্ঠপোষক হইতে নিম্নে বাৎসরিক ছয় টাকা চাঁদা দাতা সভ্যগণের মধ্যে যে কোন একটি পদ গ্রহণ করিতে হইবে।

সভাপতি অপর ৫ জন সভ্যের মত লইয়া সভা আহ্বান করিতে সমর্থ। সাধারণ কার্য্য নির্ব্বাহার্থ আর একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক অধীন সভা গঠিত হইবে।

কেন্দ্র-সমিতির সভাপতি বৎসরে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত নিজের ইচ্ছায় ব্যয় করিতে পারেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি এইরূপ ১০০০৲ পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে সমর্থ।

কেন্দ্র-সমিতি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি নিযুক্ত করা ব্যতীত বেতনভুক্ ও অবৈতনিক প্রচারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন. কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য নিয়ম প্রস্তুত করিবেন।

উত্তেজক সমিতি ও প্রচারকেরা এই কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির পরামর্শানুযায়ী চলিবেন।

যেখানে ১০ জন লোক বৎসরে আট আনা চাঁদা দেন সেখানে পল্লী-সমিতি গঠিত হইতে পারে। পল্লী-সমিতি বৎসরে যে চাঁদা সংগ্রহ করিবেন তাহা তাঁহাদের সভাপতির দ্বারা কেন্দ্র-সমিতিতে পাঠাইয়া দিবেন। এই সমিতি প্রচারকগণের কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন ও তাঁহাদের কোন দোষ দেখিলে কেন্দ্র-সমিতিকে জানাইবেন. কেন্দ্র-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন; সমিতির হিসাব-পত্র রাখিবেন। সমিতির ফাণ্ড বাড়াইবার চেষ্টা করিবেন; প্রচারকগণের থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া দিতে ও তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

প্রচারকেরা ফাণ্ড-সংগ্রহের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত হইবেন। তাঁহারা জনসাধারণের নিকট হইতে

নিজেদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। তাঁহাদিগকে সপ্তাহে একটি করিয়া কার্য্য-বিবরণী কেন্দ্র-সমিতিকে দিতে হইবে।

কেন্দ্র-সমিতি বাৎসরিক হিসাব ও বিবরণী প্রকাশ করিবেন।

মহারাষ্ট্রের এই পয়সা-ফাণ্ড বাঙ্গালাদেশের পক্ষে নূতন জিনিষ নহে। প্রায় প্রত্যেক সদনুষ্ঠানের জন্য আমাদের দেশে এই প্রণালীতে ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, দীন-দুঃখী প্রায় সকলেরই নিকট হইতে অর্থ সংগৃহীত হইত। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে স্বদেশী-ভাণ্ডার, সুহৃদ-ভাণ্ডার, ঋণ-দান-সমিতি, ছাত্র-ভাণ্ডার, দরিদ্র ছাত্রগণের সাহায্য, জাতীয় শিক্ষা, অনাথ-ভাণ্ডার, রাষ্ট্রীয়-সম্মিলন প্রভৃতির জন্য এই উপায়েই অনেকস্থলে অর্থ সংগ্রহ আরম্ভ হইয়াছিল। সে সময়ে এইরূপ অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে নিম্নলিখিত পন্থাসমূহ অবলম্বন করা হইয়াছিল।

(১) স্বাধীন উচ্চশিক্ষিত ব্যবসায়ী—অর্থাৎ উকীল, ডাক্তার, কন্‌ট্রাক্টর প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ।

(২) নিম্নশিক্ষিত সম্প্রদায়—অর্থাৎ মুদী, পাশারী, তাঁতী, তেলী, আড়তদার, মহাজন, যাঁহারা উচ্চ শিক্ষার ফলের উপর নির্ভর না করিয়া স্বাধীন ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন—তাহাদের নিকট হইতে দৈনিক লভ্যাংশের কিছু কিছু গ্রহণ। (ইঁহাদের দোকানে, জাতীয়-শিক্ষা, অনাথ-ভাণ্ডার, স্বদেশী-ভাণ্ডার প্রভৃতির জন্য স্থানে স্থানে যে বৃত্তি বসান হইয়াছিল তাহাকে ইঁহারা ঈশ্বরের বৃত্তি বলিতেন।)

(৩) স্বার্থত্যাগী ছাত্র ও যুবকগণের দান। (ছাত্রগণ জামা জুতা ত্যাগ করিয়া যে খরচ উদ্বৃত্ত করিতেন তাহাই এই উদ্দেশ্যে দান করিতেন।) তাঁহাদের অনুকরণে রমণী-সমাজও অলঙ্কারাদি বিলাস-সামগ্রী দান করিতেন।

(৪) অনেক বন্ধুবর্গের নিকট হইতে নিয়মিত মাসিক চাঁদা আদায়।

(৫) গৃহস্থগণের বাটীতে মুষ্টি-ভিক্ষার ভাণ্ড-স্থাপন। (গৃহস্থেরা প্রতিদিন এই ভাণ্ডে দুই বেলা দুই মুষ্টি চাউল রাখিলে সপ্তাহ পরে ছাত্রেরা তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিত।

(৬) বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে লোকের নিকট হইতে চাঁদা-সংগ্রহ।

(৭) সমিতির সভ্যগণের চাঁদা।

(৮) ষ্টীমার ঘাটে, রেলওয়ে ষ্টেশনে, খেলা প্রভৃতি স্থানে স্বেচ্ছাসেবকগণের দ্বারা বাক্স-ভিক্ষা-সংগ্রহ। এই বাক্স-ভিক্ষা উকীলের বাটীতে মক্কেলদিগের নিকট, ব্যবসায়ীর দোকানে খরিদদারগণের নিকট হইতেও করা হইত।

(৯) দেশের হিতার্থে যে সমস্ত সাধারণ লোকে চাঁদা দানে সম্মত ছিলেন তাঁহাদের দান গ্রহণ। (ইহাকে জাতীয় ভাণ্ডার বলা হইত)। এখনও বাঙ্গালাদেশে যাঁহারা সদনুষ্ঠানে ব্রতী তাঁহারা অল্পাধিক এই উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠানসমূহকে উপজীবিত রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। আর ভারতীয় দেশসমূহ এরূপ দানে কোন দিন কুণ্ঠিত হয় নাই, হইবেও না। জগৎ তাহাদের নিকট প্রথম পরসেবা, আতিথ্য,

আত্মত্যাগ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক গুণাবলীর নাম শ্রবণ করিয়াছিল। তবে যে আমাদের দেশের এত অধঃপতন হইল সে কেবল আমাদের চেষ্টার অভাব, আমাদের আলস্য। ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে কর্ম্মপ্রবণতা দেখা দিয়াছিল আজকাল তাহা একটু মন্দীভূত হইয়াছে। পুনরায় যদি আমরা সেই কাজ করিবার শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে পারি তবে আবার আমরা জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিব। ছয় বৎসর পূর্ব্বে পথিকগণের নিকট হইতে, ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে, ভিখারীদিগের নিকট হইতেও সাহায্য পাইতাম, পুনরায় সেইরূপই পাইব। এখন কেবল চাই আমাদের কাজ করিবার ইচ্ছা ও দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী স্বার্থত্যাগী কর্ম্মী।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সৌন্দরনন্দ *

৬

এদিকে সুন্দরী পতির প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় বাতায়ন-দ্বারে মুখ বহির্গত করিয়া দেখিতেছেন, তাঁহার কুন্তল তির্য্যগ্‌ভাবে নত হইয়া পড়িয়াছে, এবং হার বক্ষঃস্থল হইতে বিলম্বমান হইয়া রহিয়াছে, দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গভোগ হইতে পরিভ্রষ্ট প্রিয়তমের দিকে কোন ত্রিদিবকন্যা নয়নপাত করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার ললাট খেদবশত স্বেদজলে আর্দ্র হইয়া গিয়াছে, সাদর রচিত বিশেষক (তিলক) নিশ্বাসপবনে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, এবং নয়নযুগল চিন্তাবশত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি থাকিতে থাকিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; সহসা সখীজনের পদসঞ্চারধ্বনিতে প্রিয়ের আগমন আশঙ্কা করিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বঞ্চিত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার বদন বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, হিমাগমে বিবর্ণচন্দ্র গগনলক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহার আর শোভা নাই। তিনি প্রিয়ের অদর্শনে কাম ও কোপে দগ্ধ হইতে হইতে শোকসলিলময় চিন্তানদীতে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। তিনি পল্লবরাগলোহিত পাণিতলে কমল-প্রতিস্পর্দ্ধী বদনমণ্ডল স্থাপন করিয়া বসিলেন, মনে হইল যেন জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত পদ্মের উপর আর একটি পদ্ম নত হইয়া রহিয়াছে। সুন্দরী শোক ও ক্ষোভে নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন—"কোথায় তাঁহার সেই পূর্ব্বের অনুরাগ, আর কোথায় এই ক্ষণমধ্যে পরিত্যাগ!" ক্রমশ স্বামীর চরিত্রের প্রতি তাঁহার সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল।

তখন তাঁহার এক পরিচারিকা তাঁহাকে সাশ্রুলোচনে নিবেদন করিল—'স্বামিনি, আপনি স্বামীর উপরে কোন দোষ অর্পণ করিবেন না। চক্রবাক যেমন নিজের চক্রবাকী ভিন্ন কাহাকেও জানে না, তিনিও সেইরূপ আপনা ভিন্ন কোন প্রমদাকে জানেন না।

* মহাকবি অশ্বঘোষ-বিরচিত সংস্কৃত বৌদ্ধ মহাকাব্যের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ

আপনারই জন্য তিনি গৃহবাস অভিলাষ করেন, আপনারই পরিতোষের জন্য তিনি নিজের জীবনকে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর তথাগত তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করাইয়াছেন, নয়নসলিলে তাঁহার বদনমণ্ডল ভাসিয়া যাইতেছে!'

সুন্দরী এই কথা শ্রবণ করিয়া কম্পমান কলেবরে সহসা উত্থিত হইলেন, এবং তাহার বাহুযুগল গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে বিষদিগ্ধ শরাভিহত করেণুর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। রোদনে রোদনে তাঁহার নয়ন লোহিত হইয়া উঠিল, দেহলতা সন্তাপবশতঃ সংক্ষোভিত হইল, এবং হারযষ্টি শীর্ণ ও আকুল হইয়া পড়িল, তিনি ফলভারাবনত চূতলতার ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া আতপপ্রভাবে কমল-মালিকার ন্যায় শুষ্ক হইতে লাগিলেন। তিনি প্রিয়তমের গুণরাশি স্মরণ করিতে করিতে মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ক্লান্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, অলঙ্কারসমূহ উন্মোচন করিয়া চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছিলেন, এবং তাহাতেও বিশীর্ণপুষ্পস্তবকা লতার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন। প্রিয়তম ইহাকে ধারণ করিয়াছিল, এই মনে করিয়া তিনি সেই দর্পণকে আলিঙ্গন করিলেন, রুষ্ট হইয়া গণ্ডদেশ হইতে সেই বিন্যস্ত তমালপত্রতিলককে মার্জ্জন করিয়া ফেলিলেন, এবং শ্যেনক্ষতপক্ষ চক্রবাকের চক্রবাকীর ন্যায় অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতিকোমল ও অতিমহার্হ পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াও তিনি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন, তাহা তাঁহাকে কোন সুখই প্রদান করিতে পারিল না। প্রিয়তমের বসনভূষণ ও বীণা প্রভৃতি চারিদিকে সন্দর্শন করায় তাঁহার শোকমোহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তিনি পঙ্কাবতীর্ণার ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

গৃহের অঙ্গনাগণ নিম্নতলে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারা সুন্দরীকে রোদন করিতে শ্রবণ করিয়া ত্রস্তহৃদয়ে উপরিতলে গমন করিলেন, মনে হইল যেন কিন্নরীগণ পর্ব্বতপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহাদের বিষণ্ণ বদন অশ্রুক্লিন্ন হওয়ায় বোধ হইতেছিল যেন সরসীর শতদলগুলি বৃষ্টিসলিলে আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা সেখানে সুন্দরীকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তিনি তখন শারদজলধর মধ্যে সৌদামিনী-পরিবেষ্টিত শশাঙ্কলেখার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

সেই সীমন্তিনীগণের মধ্যে যিনি বয়োধিকা ও সকলের মাননীয়া ছিলেন, তিনি সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার অশ্রু মার্জ্জন করিয়া দিলেন, এবং বলিতে আরম্ভ করিলেন:—'বৎসে, তুমি রাজর্ষিবধূ, তোমার স্বামী ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া চলিতেছেন, অতএব এ সম্বন্ধে তোমার শোক করা অনুরূপ নহে। ইক্ষাকুবংশে অধিকারসূত্রে তপোবনবাসই ত অভিলষিত। শাক্যকুলের বহু প্রধান ব্যক্তি মুক্তির আশায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছেন, তুমি ত তাঁহাদের স্ত্রীসমূহকে জান; গৃহ তাঁহাদের তপোবনের ন্যায়, এবং সাধ্বীব্রতকেই তাঁহারা কামভোগের ন্যায় আশ্রয় করিয়া থাকেন। যদি কোন রূপগুণাধিকা কামিনী তোমার স্বামীকে নষ্ট করিয়া থাকেন, তবে তুমি রোদন করিতে পার। কেননা কোন্ রূপগুণবতী মনস্বিনী অঙ্গনা ইহাতে অশ্রুমোচন না করিয়া থাকিতে পারেন?

অথবা, যদি তোমার স্বামী কোনরূপ বিপন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও তোমার বাষ্পবিসর্জ্জন অনুরূপ হইতে পারে। অতএব এ বিষয়ে পতিদেবতা কুলকামিনীর বিশেষ দুঃখের কারণ নাই। অপর পক্ষে তিনি এখন বীতস্পৃহ হইয়া, ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া, স্বস্থ-সুখী হইতেছেন, ফল প্রাপ্ত হইতেছেন, এবং আর তাঁহাকে কোন ব্যসন দর্শন করিতে হইবে না, অতএব এই আনন্দসময়েও তুমি এরূপ রোদন করিতেছ কেন?'

এইরূপ বহুপ্রকার উক্ত হইলেও সুন্দরী ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিলেন না। ইহা দেখিয়া অপর একজন সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন—'ভয় নাই, তুমি অচিরেই তোমার প্রিয়তমকে দর্শন করিতে পারিবে। তিনি যদি লক্ষ্মীরও অঙ্কে আরোহণ করেন, আর তুমি যদি তাঁহার পার্শ্বে অবস্থিত না থাক, তাহা হইলে তাঁহার আনন্দ হইবে না। অপর পক্ষে তিনি যদি কৃচ্ছ্র বিপদেও পতিত হন, আর তোমাকে দেখিতে পান, তাহা হইলে তাঁহার কষ্ট হইবে না। তোমার প্রতি তাঁহার যে ভাব, ও যে অনুরাগ আছে, তাহাতে তিনি আপনার বিরহে কিছুতেই ধর্ম্মে অবস্থান করিতে পারিবেন না, তিনি যদি সন্ন্যাস গ্রহণও করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও পরিত্যাগ করিবেন।'

যুবতীজনেরা তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া এইরূপে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে ধৈর্য্যলাভ করিতে না পারায় তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। তখন তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন প্রিয়তম দ্রমিড়ের জন্য অভিমুখী রম্ভাকে অপ্সরারা পরিবেষ্টিত করিয়া প্রবোধ প্রদান করিতেছেন।

এদিকে নন্দ দেহে সন্ন্যাসলক্ষণসমূহ বহন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের ভাব বিভিন্ন। তিনি মনে মনে সুন্দরীকে চিন্তা করিয়া নানা বিতর্কের সৃষ্টি করিতেছেন। মধুমাস উপস্থিত হইয়াছে, কুসুমলক্ষ্মী চারিদিকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, পুষ্পকেতু সর্ব্বত্র অভিসার করিতেছেন, এবং যৌবনও পরিপূর্ণ; নন্দ বিহারে শান্তি পাইতেছেন না। সহকারবীথির মুকুলরাশি উদ্গত হইয়াছে, আর ষট্পদবৃন্দ তাহাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পতিত হইতেছে। নন্দ তাহা দর্শন করিয়া প্রিয়তমার চিন্তায় নবগৃহীত অবরুদ্ধ গজরাজের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। একদিন তিনি শরণাগতগণের শোক অপনোদন করিতেন, কিন্তু তখন তিনি নিজেই অশোক-পাদপ অবলম্বন করিয়া শোককাতর হইতেছেন, প্রিয়ার জন্য কত শোক করিতেছেন। সুন্দরী অশোককাননকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি প্রিয়ঙ্গুলতা দর্শন করিয়া অশ্রুমুখী প্রিয়ার কথা মনে করিতেছেন, আর নয়ন-সলিলে তাঁহার গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। তিলকদ্রুমের শিরোভাগ কুসুমস্তবকে ভরিয়া গিয়াছে, কোকিলা তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; নন্দ তাহা অবলোকন করিয়া ভাবিতেছেন বুঝি বা সুন্দরী ধবল বসন পরিধান করিয়া অট্টালের উপর গিয়াছেন আর তাঁহার মস্তকের অগ্রভাগমাত্র দেখা যাইতেছে। সহকারকে আলিঙ্গন করিয়া অতিমুক্তলতা কুসুমিত হইয়া উঠিয়াছে; নন্দ তাহা দর্শন করিয়া ভাবিতেছেন—'হায়! সুন্দরী কি আমাকে এইরূপ আলিঙ্গন করিয়াই

প্রিয়ারণিসম্ভূত কামানল বিতর্কধূম নিঃসারিত করিয়া ও মোহশিখা বিস্তারিত করিয়া তাঁহার হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল, তিনি তাহাতে দগ্ধ হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন :—

আজ আমি বুঝিতে পারিতেছি, যাঁহারা অশ্রুমুখী প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা করিয়াছেন, করিতেছেন, বা করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সুদুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন, বা করিতেছেন, অথবা করিবেন। প্রিয়ার তরল লোচন ও ললিত বচন বন্ধনস্বরূপ, ইহা এতদূর দৃঢ় যে দারু বা তন্তু বা লৌহেরও বন্ধন তাহার সমান হইতে পারে না। নিজের পৌরুষ বা সুহৃদ্বর্গের বলে অন্যান্য বন্ধনকে ছেদন করিতে পারা যায়, কিন্তু জ্ঞান বা রূক্ষতা না থাকিলে স্নেহবন্ধনকে ছেদন করিতে পারা যায় না। যাহাতে শম উপস্থিত হইতে পারে সেরূপ জ্ঞান আমার নাই, এবং রূক্ষতার সহিতও আমার সম্বন্ধ নাই। এক দিকে বলবতী বিষয়ভোগবাসনা, অপরদিকে গুরু বুদ্ধ। ভিক্ষুবেশ গ্রহণ করিয়াও প্রিয়া-বিয়োগে চক্রবাকের ন্যায় আমি শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। সেই যে আমি দর্পণ ধারণ করিয়াছিলাম, আর প্রিয়া আমার কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া ঐ যে কথা বলিয়াছিল, এখনও আমার হৃদয়ে তাহা বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রিয়া যে তখন সজল চঞ্চল নয়নে বলিয়াছিল তাহার সেই তিলক শুষ্ক হইতে না হইতেই আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, তাহা এখনো আমার হৃদয়ে বেদনা প্রদান করিতেছে।

নন্দ এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে প্রাচীন কত কত দেব, মুনি, ঋষি ও নৃপতি-গণের কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল কামাভিভূত হইয়া অগ্নি স্বাহাকে এবং ইন্দ্র অহল্যাকে সেবন করিয়াছিলেন, আমি ত ক্ষুদ্র মানব। সূর্য্য রম্ভার প্রতি অনুরাগ করিয়া নষ্ট হইয়াছিলেন শুনিতে পাওয়া যায়। বৈবস্বত ও অগ্নি স্ত্রী নিমিত্ত বহুবর্ষ যাবৎ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ কামপরতন্ত্র হইয়া চণ্ডালযোনিজ অক্ষমালাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋষি পরাশর মৎস্যগর্ভজাত কালীকে সেবন করিয়াছিলেন, এবং তাহা হইতেই বেদবিভাগকর্ত্তা দ্বৈপায়নের জন্ম হয়। কাশিজনপদে ধর্ম্মপরায়ণ দ্বৈপায়ন বেশবধুর সহিত বিহার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মসুত অঙ্গিরা রাগাধীন হইয়া সরস্বতীকে সেবন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই গর্ভে নষ্ট বেদের পুনঃপ্রবক্তা পুত্র সারস্বতের জন্ম হয়। রাজর্ষি দিলীপ স্বর্গস্ত্রী উপভোগ করেন, এবং তাহাতেই কাশ্যপের উৎপত্তি হইয়াছিল। তপস্যার শেষ সীমায় গমন করিলেও অঙ্গদের যমুনার গর্ভে সারঙ্গপুষ্ট নামক পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করে। শান্ত মনে অবস্থান করিলেও রাজকন্যা শান্তার কথা শুনিয়া ঋষ্যশৃঙ্গের ধৈর্য্য বিচলিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিবার জন্য সমগ্র রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলেও বিশ্বামিত্র ঘৃতাচীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন ও তাহার সহবাসে দীর্ঘ দশ বৎসর সময়কে এক দিবসের ন্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। স্ত্রীসংসর্গে মৃত্যু হইবে এই শাপসংবাদ জানিয়াও পাণ্ডু মাদ্রীর সহবাস করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও কত কত কথা নন্দের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি আরও চিন্তা

করিতে লাগিলেন যে, ইঁহাদেরও মত লোকে যদি কামাভিভূত হইয়া স্ত্রীসংসর্গ করিতে পারে, তাহা হইলে প্রিয়তমাকে দর্শন না করিয়া আমি যে কাতর হইয়া পড়িব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অতএব আমি আবার গৃহেই গমন করিয়া কামকেই সকাম করিব। যে ধর্ম্মপথ হইতে চ্যুত হইয়াছে, যাহার চিত্ত অন্যত্র আসক্ত এবং ইন্দ্রিয়সমূহ চঞ্চল, তাহার পক্ষে (সন্ন্যাসীর) বেশ ধারণ করা উচিত নহে। করতলে ভিক্ষাপাত্র ধারণ করা হইয়াছে, মস্তক মুণ্ডিত হইয়াছে, মান পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং বিকৃত বসনও পরিহিত হইয়াছে, কিন্তু যদি ধৃতি না থাকে, শান্তি না থাকে, তাহা হইলে চিত্রার্পিত প্রদীপের ন্যায় সে ব্যক্তি থাকিয়াও থাকে না। যে ব্যক্তি (গৃহ হইতে) নিঃসৃত হইয়াছে, কিন্তু কামরাগ নিঃসৃত হয় নাই; যে ব্যক্তি কাষায় (কষায়রক্ত, সন্ন্যাসি-বস্ত্র) বসন বহন করিয়াছে, অথচ বিষয়রাগহীন হইতে পারে নাই; যে ব্যক্তি হস্তে পাত্র ধারণ করিয়াছে, অথচ গুণসমূহ দ্বারা সৎপাত্র হইতে পারে নাই; পরিচ্ছদ ধারণ করিলেও সে ব্যক্তি গৃহীও নহে ভিক্ষুও নহে। ভিক্ষুবেশ ধারণ করিয়া আবার কিরূপে তাহা পরিত্যাগ করিব, এ চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই; কেননা, বহু বহু নরপতি তপোবন পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিয়াছেন। সপুত্র শাল্বাধিপতি, অম্বরীষ, রামোঽন্ধ্র, ও সতিকৃতি রন্তিদেব, ইঁহারা চীর ত্যাগ করিয়া নববসন ধারণ করিয়াছিলেন, এবং কুটিল জটা ছেদন করিয়া রাজমুকুটে পরিশোভিত হইয়াছিলেন। অতএব গুরু যখন ভিক্ষার্থ গমন করিবেন, আমি তখন এই কাষায়বসন পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিব। মন আমার স্খলিত হইয়া গিয়াছে, এ অবস্থায় এই মানার্হ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আমার এই ইহলোক পরলোক উভয়ই বিনষ্ট হইবে।

৮

নন্দের নয়ন চঞ্চল, তিনি গৃহগমনের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন। নিকটে এক জন শ্রমণ ছিলেন, তিনি মঙ্গলদৃষ্টিতে তাঁহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন—'আপনার বদন অশ্রুতে ভাসিয়া যাইতেছে, ইহার কারণ কি? ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। শারীরিক ও মানসিক এই দুই প্রকার বেদনা হইয়া থাকে। আপনার যদি শারীরিক বেদনা হইয়া থাকে, তবে তাহা চিকিৎসকের নিকটে অবিলম্বে প্রকাশ করুন, আর যদি তাহা মানসিক হয়, তবে তাহাও বলুন, আমি তাহার ঔষধ নির্দ্দেশ করিতেছি। হে সৌম্য, যাহাই হউক, আমাকে বলা যদি সম্ভবপর মনে করেন, তবে সত্য কথা প্রকাশ করিয়া বলুন।'

নন্দ শ্রমণের করতল নিজ করতলে ধারণ করিয়া অপর এক বনে গমন করিলেন। তাঁহারা সেখানে এক কুসুমপরিমলোদ্গারী শুচি লতাগৃহে উপবিষ্ট হইলেন। নন্দ বলিতে আরম্ভ করিলেন—'আপনি ধর্ম্মচারী, জীবসমূহে সততই আপনার মৈত্রভাব রহিয়াছে, আপনার হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ। আপনার আমার প্রতি এই হিতৈষিতা দেখিতে পাইতেছি, এবং সেই জন্যই আপনাকে আমার এই হৃদয়ের ভাব বলিতে ইচ্ছা করিতেছি। সংক্ষেপত শ্রবণ করুন, প্রিয়ার বিরহে এই

(সন্ন্যাস) ধর্ম্মে আমি আনন্দ পাইতেছি না। প্রিয়ার অভাবে আমার সুখ নাই।

শ্রমণ এই কথা শ্রবণ করিয়া নিজের মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"হায়! চপল মৃগ ব্যাধের ভয়ে অরণ্য হইতে নির্গত হইয়া স্বযূথ-আসক্তিতে গীতরবে বঞ্চিত হয়, এবং জালে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করে; জাল-গৃহীত বিহঙ্গকে কেহ করুণা করিয়া ছাড়িয়া দিলে সে আবার নিজেই পিঞ্জরে প্রবেশ করিবার ইচ্ছায় ফলপুষ্পশালী বনে বিচরণ করিতে থাকে, পঙ্কময় বিষম নদীতল হইতে করী কলভকে উঠাইয়া দিলে, সে আবার জলতৃষ্ণায় কুম্ভীরযুক্ত নদীতে সন্তরণ করিতে ইচ্ছা করে; সসর্প গৃহে কোন সুপ্ত ব্যক্তিকে কেহ জাগাইয়া দিলে সে জাতভ্রবিম হইয়া নিজেই উগ্র ভুজঙ্গকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে; প্রবল অনলে যখন বনদ্রুম দগ্ধ হয়, বিহঙ্গ তখন তাহা হইতে উড়াইয়া গিয়া নীড়ের তৃষ্ণায় আবার তাহাতে পতিত হইতে ইচ্ছা করে।

সেই শ্রমণ এইরূপ চিন্তা করিয়া হিত-কামনায় নন্দকে বলিতে লাগিলেন—'আপনি শুভাশুভ বিচার করিয়া দেখেন নাই, আপনার চিত্ত বিষয়ভোগে নিবিষ্ট, আপনি চক্ষু লাভ করেন নাই, অতএব মঙ্গলে যে আপনার অনুরাগ হইতেছে না, তাহা যুক্তিযুক্তই। যাহার তৃষ্ণা আছে, সে ধনশ্রীতে আনন্দ লাভ করে, মূর্খ ব্যক্তি কামসুখে আনন্দিত হয়, আর সুজনেরা জ্ঞানের দ্বারা ভোগসামগ্রীকে অবজ্ঞাত করিয়া নিবৃত্তিতে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। আপনি প্রসিদ্ধ, উচ্চ বংশে আপনার জন্ম হইয়াছে, আপনি এই পবিত্র বেশ ধারণ করিয়াছেন, অতএব বায়ুবেগে পর্ব্বতের প্রণতির ন্যায় আপনার এই গৃহ-গমনবুদ্ধি উপযুক্ত নহে। যে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অবজ্ঞা করিয়া পরাধীনতাকে স্পৃহা করে, সেই এই মঙ্গলাবহ শান্তিপথে অবস্থান করিয়া দোষযুক্ত গৃহবাসে কামনা করিতে পারে। বিষবতী লতাকে আশ্রয় করিলে, বা সসর্প গুহাকে মার্জ্জন করিলে, অথবা উন্মুক্ত অসিধারাকে ধারণ করিলে যেমন তাহার পরিণামে বিপদ উপস্থিত হয়, স্ত্রী-সেবনেও সেইরূপ হইয়া থাকে।' শ্রমণ এই বলিয়া আরো বহু প্রকারে স্ত্রীসম্ভোগের ও স্ত্রীজাতির নিন্দা করিলেন। অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন—'যদি কোন শূকরকে উত্তম অন্ন ভোজন করাইয়া রমণীয় শয্যায় শয়ন করান হয়, তাহা হইলেও সে নির্ম্মুক্ত হইয়া পরিচিত অশুচি দ্রব্যের নিকট ধাবিত হইবে; এইরূপই যাহাদের কাম-তৃষ্ণা থাকে, তাহারা মঙ্গলাবহ নিবৃত্তিসুখ আস্বাদন করিয়াও শান্তবন পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহবাসে অভিলাষ করিয়া থাকে। যেমন হস্তে উল্কা ধারণ করিলে বায়ুবেগে তাহার শিখা সমূহ চঞ্চল হইয়া উঠে, এবং তাহা হস্তকে দগ্ধ করে; যেমন ভুজঙ্গ চরণ দ্বারা আক্রান্ত হইলে ক্রোধবেগে দংশন করিয়া থাকে; অথবা যেমন শিশু হইলেও গৃহে পোষণ করিলে ব্যাঘ্র হত্যা করিয়া থাকে; স্ত্রী-সংসর্গও সেইরূপ বহুবিধ অনর্থের কারণ। অতএব আপনি নারীসমূহে এই সকল শারীরিক ও মানসিক দোষ অবগত হইয়া, নদীর জলের ন্যায় চঞ্চল কামসুখকে ক্লেশ ও শোকের কারণ জানিয়া, এবং এই জগৎকে আম (কাচা) পাত্রের ন্যায় নশ্বর জানিয়া

মুক্তির জন্য অভিলাষ করুন, আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না।

৯

মুমূর্ষু আতুর ব্যক্তি যেমন হিতৈষী বৈদ্যের কথা গ্রহণ করে না, রূপবলযৌবন-মত্ত নন্দও সেই প্রকার ঐ শ্রমণের বাক্য শ্রবণ করিলেন না, তিনি গৃহে গমন করিবার জন্য উদ্যত হইলেন, শ্রমণ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য আবার বলিতে লাগিলেন—

"এই রূপ, বল ও নবযৌবন, ইহাদিগকে আমি যেরূপ দেখিতেছি, আপনিও সেইরূপ দেখিতেছেন, কিন্তু আমি যেরূপ এই তিনটিকে অস্থির বলিয়া বুঝিতেছি, আপনি সেরূপ বুঝিতেছেন না। এই শরীর রোগের আয়তন, জরার বশীভূত, নদীতটের পাদপের ন্যায় চঞ্চল ও জলফেনের ন্যায় দুর্ব্বল; আপনি ইহা মনে করিতেছেন না। জগতে হিম-আতপ, জরা-ব্যাধি ও ক্ষুধা-প্রভৃতি পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, নিদাঘে সূর্য্যরশ্মিপ্রভাবে জলের ন্যায় সমস্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, অথচ আপনি নিজের বলের দর্প করিতেছেন। লোক যেমন মৃণ্ময় আমঘট আশ্রয় করিয়া ক্ষুভিত মহার্ণবকে উত্তীর্ণ হইবার জন্য ইচ্ছা করে, আপনিও সেইরূপ এই অসার দেহ লইয়া বিষয়সেবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন। আমি ত মনে করি মৃণ্ময় আমঘট অপেক্ষাও এই দেহ নিঃসারতর; কেননা, যথোচিত ভাবে ধারণ করিলে ঘট দীর্ঘকাল থাকিতে পারে, কিন্তু এই দেহকে তাদৃশ ভাবে রক্ষা করিলেও ইহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। পৃথিবী, জল, বায়ু ও অনল এই চতুর্বিধ ধাতু শরীরকে আশ্রয় করিয়া নিরুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় অনর্থ উৎপাদন করিয়া থাকে। মন্ত্রের দ্বারা ভুজঙ্গমগণকে শান্ত করিতে পারা যায়, ঐ ধাতুসমূহকে নহে; আবার ব্যক্তিবিশেষকেই সর্প দংশন করিয়া থাকে, কিন্তু ধাতুসমূহ সকলকেই বেদনা প্রদান করে। পান-ভোজন-শয়নাদি দ্বারা এই শরীরের কত পরিচর্য্যা করা যায়, কিন্তু ইহা সামান্য ব্যতিক্রমও সহ্য করে না; মহা-ভুজঙ্গের ন্যায় কুপিত হইয়া উঠে। অতএব এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আপনি শরীরকে সবল বলিয়া মনে করিবেন না।'

'বলাভিমানী সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বল কোথায়? বজ্র যেমন পর্ব্বতের মহা-শৃঙ্গসমূহকে বিনষ্ট করে, পরশুরাম সেইরূপ তাঁহার সমস্ত বাহুকে কর্ত্তন করিয়াছিলেন। দানব নমুচিরই বা বল কোথায়? তিনি সংগ্রামে কুপিত অন্তকের ন্যায় উপস্থিত হইলেও, বাসব তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন। কৌরবগণেরই বা বল কোথায় থাকিল? তাঁহারা বল ও তেজে জ্বলিত হইয়া সংগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু গতাসু হইয়া সমিধ্-উদ্দীপ্ত যজ্ঞীয় অনলের শেষ ভস্মে পরিণত হইয়াছিলেন। অতএব যাঁহারা বলবীর্য্যাভিমানী ছিলেন তাঁহাদের এই পরিণাম আলোচনা করিয়া এ জগৎকে জন্মমৃত্যুজরার বশীভূত চিন্তা করিয়া আপনি আর বলের অভিমান করিবেন না।

'আর যদি আপনি নিজ বলকে মহৎ বলিয়া জানেন, তবে আসুন, ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত যুদ্ধ করুন; যদি জয় করিতে পারেন, জানা যাইবে আপনার বল মহৎ, অন্যথা তাহা মিথ্যা। যাঁহারা অশ্ব-রথ-গজ-পদাতিকে জয় করিতে পারেন তাঁহাদিগকে বীর বলিয়া মনে

করা যায় না; কিন্তু যে মনীষীরা এই চপল ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে পারেন তাঁহারা বীরতর।

'আর যে আপনি নিজের শরীরকে অতিস্বরূপ বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। দেখুন গদ (শ্রীকৃষ্ণের অনুজ) সাম্য (? শাম্ব ?) ও সারণের (?) শরীর কোথায় থাকিল? চিত্রচন্দ্রকধারী ময়ূর যেমন স্বভাবতঃ নিজের রূপ ধারণ করে, আপনিও যদি শরীর সংস্কার না করিয়া ঐরূপ রূপ ধারণ করিতে পারেন, তবে আপনি রূপবান্ বলিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা না করিলে আপনার রূপ কোথায়?

'আপনি নিজের নবযৌবন দেখিতেছেন, আর মন আপনার তাহাতেই গৃহোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে, শৈলনদীর বেগের ন্যায় চপল মনকে সংযত করুন, যৌবন চলিয়া যাইতেছে আর তাহা আসিবে না। ঋতু অতীত হইলেও পুনর্ব্বার আগমন করে, ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেও চন্দ্রমা পুনর্ব্বার উপস্থিত হয়। কিন্তু নদীর জল ও মানবের যৌবন যদি একবার গমন করে, তবে তাহা গমন করিল, আর প্রত্যাগমন করে না। কেহ মদ্যপান করিলে নিশাবসানে তাহার মত্ততা চলিয়া যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি রূপবলযৌবনে মত্ত, জরা আগমন না করিলে তাহার সে মত্ততা অপনীত হয় না। অতএব আপনি যৌবনের অভিমান করিবেন না।

'আরও দেখুন, কামোপভোগের দ্বারা তৃপ্তি হয় না, উদ্দীপ্ত অগ্নি হবির দ্বারা শান্ত হয় না; লোকে যত-যত কামসুখে প্রবৃত্ত হয়, তত-ততই তাহার বিষয়লালসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যে ব্যক্তি বিষয়সুখকামনায় এই বহু দুঃখভাজন শরীরের সেবা করে, তাহাতে আনন্দলাভ করে, তাহার তাহা ঔষধপান-জনিত সুখের কামনায় রোগসেবা ভিন্ন কিছুই নহে। কিম্পাক (মহাকাল) ফলের রূপ, রস ও গন্ধ সবই আছে, কিন্তু তাহা যেমন বধের জন্য, পুষ্টির জন্য নহে, সেইরূপ চঞ্চল বিষয়সমূহও অনর্থের জন্য, মঙ্গলের জন্য নহে।

'মোক্ষধর্ম্মই একমাত্র মঙ্গল। আপনি আমার এই সজ্জনসম্মত মত গ্রহণ করুন, অথবা এ বিষয়ে আপনি কি নিশ্চয় করিলেন বলুন।'

নন্দ সমস্ত শ্রবণ করিলেন, কিন্তু মদান্ধচিত্ত দ্বিরদের ন্যায় ধৈর্য্য বা সুখ কিছুই লাভ করিতে পারিলেন না। তখন শ্রমণ তাঁহার গৃহসুখাভিমুখ হৃদয়ভাব অবগত হইয়া সমস্ত কথা বুদ্ধের নিকটে নিবেদন করিলেন।

১০

নন্দ ব্রত পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছে শুনিতে পাইয়া মুনি তাঁহাকে আহ্বান করিলেন ও জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত অবগত হইলেন। তিনি তখন তাঁহাকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় তাঁহার হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক আকাশপথে উত্থিত হইলেন, এবং তখন—

"কাষায়বস্ত্রৌ কনকাবদাতৌ
বিরেজতুস্তৌ নভসি প্রসন্নে।
অন্যোন্যসংশ্লিষ্টবিকীর্ণপক্ষৌ
সরঃপ্রকীর্ণাবিব চক্রবাকৌ॥" ১০. ৪

সেই কাষায়বসনধারী কনকগৌর ভ্রাতৃদ্বয় নির্ম্মল গগনে শোভিত হইতে লাগিলেন; তাঁহাদিগকে দেখিয়া মনে হইল যেন কোন

সরোবরে দুইটি চক্রবাক পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। তাঁহারা যাইতে যাইতে দেবদারু-গন্ধামোদিত দেবর্ষিসেবিত হিমালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—যেন তাঁহারা অগম্যপার নিরাশ্রয় গগন (-সমুদ্রের) দ্বীপে আসিয়া অবতরণ করিলেন। নন্দ পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, তিনি দেখিলেন কোনস্থানে হিমগিরির বহুবিস্তীর্ণ ধবল শৃঙ্গে কলাপগুচ্ছ সঙ্কুচিত করিয়া ময়ূর শয়ন করিয়া রহিয়াছে; বোধ হইতেছে যেন বলদেবের দীর্ঘ-পীন বাহুতে বৈদূর্য্য কেয়ূর শোভা পাইতেছে; কোন স্থানে মনঃশিলা ও ধাতুশিলার সংসর্গে সিংহের শরীর পীতবর্ণ হইয়া গিয়াছে; দেখিয়া মনে হয় যেন আকাশের তপ্তকাঞ্চনচিত্রিত রজতময় অঙ্গদ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কোন স্থানে বা বিচরণ করিতে করিতে চমরমৃগের পুচ্ছ সহসা বৃক্ষে সংলগ্ন হইয়া যাইতেছে, আর সে আর্য্যবৃত্ত অভিজাত ব্যক্তি প্রীতির ন্যায় তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। তিনি দেখিলেন গুহাসমূহ হইতে সুবর্ণগৌর কিরাতসঙ্ঘ নির্গত হইতেছে। তাহাদের শরীর ময়ূরপিচ্ছে অলঙ্কৃত; এবং কুসুমশোভিত বল্লরীর ন্যায় কিন্নরীগণ চতুর্দ্দিকে লীলা বিহার করিতেছেন।

এইরূপ দেখিতে দেখিতে এক স্থানে তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল, তিনি অবলোকন করিলেন এক বানরযূথ দেবদারু-শ্রেণির মধ্যে পাদপ হইতে পাদপান্তরে বিচরণ করিতেছে। মুনি সেই বানরযূথের মধ্যে দেখিতে পাইলেন একটি বানরী যূথ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, এবং তাহার একটি চক্ষু নাই। তিনি তখন নন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'নন্দ, বল দেখি, এই বানরী রহিয়াছে, এবং তুমি যাঁহাকে অভিলাষ করিতেছ, তিনিও রহিয়াছেন, এই উভয়ের মধ্যে রূপ ও চেষ্টায় কাহাকে তুমি চারুতর বলিয়া মনে করিতেছ?' নন্দ কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া চাহিলেন 'ভগবন্, কোথায় সেই উত্তমাঙ্গনা আপনার বধূ, আর কোথায় এই মৃগী।'

সুগত কোনো উত্তর প্রদান করিলেন না। তিনি নন্দকে সঙ্গে গ্রহণ করিয়া একেবারে ইন্দ্রের ক্রীড়াবনে উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রের কেলিবনের সৌন্দর্য্য ও শক্তি অতুলনীয়। সেখানে কোন কোন পাদপ প্রতি ঋতুতে, কোন কোনটি বা প্রতিক্ষণেই (নব-নব) আকৃতি গ্রহণ করে, আবার কোন কোন পাদপশ্রেণি যুগপৎ সমস্ত ঋতুরই লক্ষ্মীকে ধারণ করিয়া থাকে, কোন কোন বৃক্ষ সুরভিস্রগ্‌দ্বর গথিত মালা প্রসব করে, কোন কোনটি বা কুণ্ডলপ্রতিস্পর্দ্ধী কর্ণানুকূল অবতংসসমূহ ধারণ করিয়া থাকে। এইরূপ হারকুণ্ডল-নূপুর-কেয়ূরাদি সর্ব্ববিধ আভরণ ও বহু প্রকার সূক্ষ্মচিক্কণ হৃদয়ঙ্গম বসনরাজি সমস্তই সেখানকার সমুন্নত মহীরুহ-সমূহে সর্ব্বদাই ফলিত হইয়া রহিয়াছে। সেখানে সরোবরসমূহ প্রস্ফুটিত পদ্মে সমাকীর্ণ, সে পদ্ম কাঞ্চনময়, তাহার নাল বৈদূর্য্যমণির, এবং কেশরসমূহ হীরকের। বিহঙ্গেরা কূজন করিতেছে ও শ্রোতৃবর্গের হৃদয় হরণ করিতেছে। অমরগণ বিহার করিতেছেন, তাঁহাদের জরা নাই, ব্যাধি নাই, তাঁহারা সর্ব্বদাই আনন্দ অনুভব করিতেছেন।

নন্দ জানিতে পারিলেন তিনি যে লোকে গিয়াছেন, সেখানে নিদ্রা নাই, তন্দ্রা নাই, রোগ নাই, শোক নাই। তিনি তখন জরামৃত্যুর বশীভূত নরলোককে মনে করিয়া শ্মশানস্বরূপ ভাবিতে লাগিলেন, আর বিস্মিত-নয়নে পুনর্ব্বার দেবরাজের সেই ক্রীড়াবন দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই সময়ে অপ্সরারা সৌন্দর্য্যগর্ব্বে পরস্পরকে অবলোকন করিতে করিতে সেই বনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধীর-উদাত্তভাবে গান গাহিতে লাগিল, কেহ কেহ বা করস্থিত কমলকে ললিত ভাবে ছিন্ন করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা পরস্পর-আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিল।

জলধর হইতে যেমন তড়িৎপতাকাসমূহ নির্গত হয়, সেইরূপ ঐ দেবাঙ্গনাগণকে বনান্তর হইতে সেখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া নন্দের শরীর চঞ্চল জলস্থিত চন্দ্রপ্রভার ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল, ও দৃষ্টি কৌতূহলের বশীভূত হইল। তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তাঁহার তৃষ্ণার উদয় হইল, এবং যেন সেই জন্যই তিনি তাহাদের সেই দিব্য বপু ও ললিত চেষ্টাকে মনের দ্বারা হরণ করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদিগকে লাভ করিবার জন্য কাতর হইয়া উঠিলেন; চঞ্চল ইন্দ্রিয়াশ্বের সাহায্যে মনোরথ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ লইয়া যাইতে লাগিল, তিনি ধৈর্য্যলাভ করিতে পারিলেন না।

লোকে যেমন মলিন বসনকে ক্ষারে দিয়া আরো মলিন করে, এবং তাহা মলের ক্ষয়ের জন্যই হইয়া থাকে, তাহার উৎপাদনের জন্য নহে; অথবা যেমন কোন চিকিৎসক শরীরের ক্লেশসমূহ হইতে কাহাকেও উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা করিয়া তাহাকে আরো ক্লেশ প্রদান করিবার চেষ্টা করে, মুনিও সেইরূপ নন্দের রাগকে বিনষ্ট করিবার ইচ্ছায় তাহাকে অধিকতর রাগের মধ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। সূর্য্যের দীপ্তি যেমন দীপপ্রভাকে বিনাশ করে, দিব্যাঙ্গনার সৌন্দর্য্যও সেইরূপ মানবাঙ্গনার সৌন্দর্য্যকে অন্তর্হিত করে, কেননা "সর্ব্বো মহান্ হেতুরণোর্বধায়।" সমস্ত বৃহৎ ক্ষুদ্রের বিনাশের কারণ।

মুনি তখন সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'নন্দ, এই দিব্যাঙ্গনাগণকে দর্শন কর, ভাল করিয়া দর্শন কর, এবং যথার্থ বল কে তোমার অভিমত—এই দিব্যাঙ্গনাগণ অথবা যাঁহাতে তোমার মন গমন করিয়াছিল?'

নন্দ রাগানলে হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিত হইতেছিলেন, স্বর্গাঙ্গনাগণের দিকে দৃষ্টি নিবিষ্ট করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন 'ভগবান্, আপনার বধূব সহিত সেই এক-নয়নহীন বানরীর যে অন্তর, এই দিব্যাঙ্গনা-গণের সহিত আপনার বধূরও সেই অন্তর। পূর্ব্বে যেমন তাঁহাকে মনে করিয়া আমার অপর স্ত্রীসমূহে কোন আস্থা হইত না, সেইরূপ সম্প্রতি ইঁহাদিগকে দর্শন করিয়া আমার আর তাঁহার প্রতি আস্থা নাই। পূর্ব্বে মৃদু আতপে তপ্ত হইয়া পশ্চাৎ প্রবল অনলে দগ্ধ হইলে যেরূপ হয়, আমারও সেইরূপ হইয়াছে। আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অতি প্রবল রাগানলে দগ্ধ হইতেছি, আজই ইহা আমাকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবে। অতএব বচন-সলিলে আমাকে সেচন করুন, প্রসন্ন

হউন, আমি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি, আমার ধৈর্য্য নাই, আমি প্রাণত্যাগ করিব, অথবা এই মুমূর্ষকে বচনামৃত প্রদান করুন!'

গৌতম বলিতে আরম্ভ করিলেন 'নন্দ, ধৈর্য্য অবলম্বন কর, বিকার পরিত্যাগ কর, চিত্ত সংযত করিয়া অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, তুমি যদি এই অঙ্গনাগণকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে শুল্ক প্রদান করিতে হইবে, সে শুল্কের নাম তপস্যা। বলের দ্বারা, সেবার দ্বারা, দানের দ্বারা, বা সৌন্দর্য্যের দ্বারা ইহাদিগকে লাভ করা যায় না, ধর্ম্মচর্য্যার দ্বারা পাওয়া যায়, অতএব যদি তোমার তাহাতেই আনন্দ হয়, নন্দ, তুমি ধর্ম্ম আচরণ কর। এই স্বর্গলোকে অমরগণের সহিত বাস, রম্য উপবনশ্রেণী, ও জরাবিহীন এই অঙ্গনাগণ,—ইহারা শুভকর্ম্মের ফল, ইহাদিগকে অন্য কেহ দিতে পারে না, এবং বিনা কারণেও ইহাদিগকে পাওয়া যায় না। অতএব যদি অপ্সরাগণকে অভিলাষ কর, অপ্রমত্ত হইয়া নিয়ম অনুসরণ করিয়া চল, তোমার এই স্থির ব্রতে আমি প্রতিভূ হইয়া থাকিলাম, যাহাতে তাহাদের সহিত তোমার সম্মিলন হয় আমি তাহা করিব।'

'তাহাই হইবে' বলিয়া নন্দ স্বীকার করিলেন, তাঁহার ধৈর্য্য উপস্থিত হইল। অনন্তর মুনি তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার ভূতলে আগমন করিলেন।

১১

নন্দ নন্দনচারিণী সেই সমস্ত অঙ্গনাকে দর্শন করিয়া নিজের দুর্দ্দম চঞ্চল মনকে নিয়মমন্ত্রে বন্ধন করিলেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন। একদিকে সংযত শান্ত ভাব, অপরদিকে তীব্র মদন,—একদিকে জল, অপরদিকে অগ্নি,—তিনি ইহাদিগের সংসর্গে শান্ত ও শুষ্ক উভয়ই হইতে লাগিলেন। অপ্সরাগণের চিন্তা ও বিস্তীর্ণ নিয়মে তাঁহার সেই রমণীয় সৌন্দর্য্য অপগত হইল। স্ত্রী-প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তিনি তখন বীতরাগের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, তিনি তাহাতে আনন্দিতও হইতেন না, বা ক্ষুভিতও হইতেন না।

তাঁহাকে এই প্রকার অবলোকন করিয়া একদিন আনন্দ প্রীতিপূর্ব্বক বলিলেন 'আপনি যে এই ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া নিয়ম অনুষ্ঠান করিতেছেন, ইহা আপনার বিদ্যা ও বংশের অনুরূপ। মৃদু ব্যাধিকে অল্প যত্নেই নিবারণ করিতে পারা যায়, আর প্রবল ব্যাধির জন্য প্রবল যত্নই করিতে হয়, এবং তাহাতেও তাহা শান্ত হয়, বা হয় না। আপনার প্রবল মানসিক ব্যাধি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা যদি আপনার নিবৃত্ত হইয়া থাকে, তবে আপনার ধৈর্য্য সর্ব্বপ্রকারে প্রশংসনীয়। কিন্তু আপনার এই নিয়ম ও ধৈর্য্যে আমার এক সন্দেহ আছে; আমি অনুনয় করিতেছি, আপনি যদি আমার নিকট বক্তব্য মনে করেন, প্রকাশ করিতে পারি। আমি ইহা সরলভাবে বলিতেছি, আপনি অন্য কিছু মনে করিবেন না। আপনি ত জানেন—"দুর্লভং তু প্রিয়হিতং স্বাদু পথ্যমিবৌষধম্।" ১১-১৬। স্বাদু অথচ পথ্য ঔষধের ন্যায় প্রিয় অথচ হিত বাক্য দুর্লভ। প্রণয়বশবর্ত্তী হইয়া ইহা আপনাকে বলিতে যাইতেছি, আপনার অপকার ইচ্ছা করিয়া নহে; আপনার মঙ্গলই আমার উদ্দেশ্য, আমি আপনাকে উপেক্ষা করিতে পারি না।

'লোকে বলিতেছে আপনি দিব্যাঙ্গনা-লাভের জন্য এই নিয়মচর্য্যা করিতেছেন, ইহা কি সত্য, অথবা মিথ্যা পরিহাস ?'

নন্দ শ্রবণ করিয়া দীর্ঘশ্বাসত্যাগপূর্ব্বক মস্তক কিঞ্চিৎ অবনত করিলেন। আনন্দ ইঙ্গিতে তাঁহার হৃদয়ের ভাব অবগত হইয়া পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

'যেমন কেহ উপবেশন করিব মনে করিয়া স্কন্ধে অতি ভার পাষাণ বহন করে, আপনিও সেইরূপ কামোপভোগের জন্য এই নিয়ম বহন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বণিকেরা যেমন লাভেচ্ছায় পণ্য ক্রয় করিতে ইচ্ছা করে, আপনার ধর্ম্মচর্য্যাও সেই প্রকার পণ্যস্বরূপ, তাহা শান্তির জন্য নহে। রোগশান্তিজনিত সুখের আশায় যেমন কেহ রোগ কামনা করে, আপনিও সেইরূপ বিষয়তৃষ্ণায় দুঃখকে ইচ্ছা করিতেছেন। যেমন কেহ (পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া) মধুকেই দেখিতে পায়, প্রপাত দেখিতে পায় না; আপনিও সেইরূপ দিব্যাঙ্গনাগণকে দেখিতে পাইতেছেন, পরিণামে যে পতন হইবে তাহা দেখিতেছেন না। আপনার হৃদয় কামানলে জ্বলিত হইতেছে, আর শরীরে আপনি ব্রত বহন করিতেছেন; এ আপনার কোন্ ব্রহ্মচর্য্য ? ইন্ধনের দ্বারা অগ্নির তৃপ্তি হয় না; যে ব্যক্তি স্বয়ং অতৃপ্ত, কামোপভোগের দ্বারা তাহার তৃপ্তি হয় না। তৃপ্তি না হইলে শান্তি হয় না, শান্তি না হইলে সুখ কোথায়, সুখের অভাবে প্রীতি হয় না, এবং বিনা প্রীতিতে রতি (আনন্দবিহার) হয় না।

আপনি যদি রতি প্রার্থনা করেন, অধ্যাত্ম-বিষয়ে মনোভিনিবেশ করুন। সে রতি শান্ত ও অনবদ্য, তাহার জন্য বাদ্য, স্ত্রী, বা বিভূষণের প্রয়োজন নাই; আপনি একাকীই যে-কোন স্থানে থাকিবেন, সেই খানেই তাহা লাভ করিতে পারিবেন। তৃষ্ণা থাকিলেই মনের দুঃখ থাকে, অতএব আপনি তাহা ছেদন করুন, এবং তাহা হইলেই আর দুঃখ থাকিবে না। যে কামোপভোগে সতৃষ্ণ, সম্পদ্-বিপদ ও দিবা-রাত্রি কোন অবস্থাতেই বা কোন সময়েই তাহার শান্তি হয় না। দুষ্কর কর্ম্মে স্বর্গলাভ করিলেও লোক আবার সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া থাকে; তখন তাহার আর কোন পুণ্য অবশিষ্ট থাকে না, সে তখন হয় নরকে, অথবা তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। স্বর্গে অত্যুত্তম বিষয়সমূহ উপভোগ করা যায় সত্য, কিন্তু সে স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইলে যখন বিষম দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন সেই সুখাস্বাদে লাভ কি ? 'রাজা শিবি জীববাৎসল্য হেতু একটি শ্যেনপক্ষীকে নিজের মাংস প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকেও স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হইয়াছিল। মান্ধাতা ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন প্রাপ্ত হইয়াও আবার অধঃপতিত হইয়াছিলেন। নহুষ দেবরাজ্য শাসন করিয়া পৃথিবীতে পতিত হন, তিনি ভুজঙ্গযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এখনো তাঁহার মুক্তি হয় নাই। সেইরূপ রাজা দিবিড়ও স্বর্গে গমন করিয়া পরিভ্রষ্ট হন, ও সমুদ্রে সূর্য্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন।'

তিনি এইরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন— 'আপনি ইহার দ্বারাই বুঝিতে পারিবেন স্বর্গ-সুখের কিরূপে ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব তাহার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া আপনি

সহস্রভুজা দেবী

(স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালের অধীশ্বরী)

টেঙ্গিয়ার মন্দিরে অবস্থিত

India Press, Calcutta.

অপবর্গ লাভের ইচ্ছা করুন। যদি কোন বিহঙ্গকে সূত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে দূরতর স্থানে গমন করিয়াও আবার ফিরিয়া আসে, এইরূপ অজ্ঞানসূত্রে আবদ্ধ ব্যক্তিও দূরে গমন করিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। অতএব এই জগৎকে জন্ম-ব্যাধি-মরণ-দুঃখে পরিব্যাপ্ত মনে করিয়া, যাহা শিব অমর অজর ও অমৃত, যাহা শোকহীন ও ভয়হীন, এবং যাহা রক্ষাস্বরূপ, তাহারই জন্য ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করুন, স্বর্গের রুচি পরিত্যাগ করুন।

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

চীনে হিন্দুর প্রভাব

কোন গুরুতর ব্যাধিগ্রস্ত অচেতন রোগীর রোগাবসানে যেমন তাহার চৈতন্য লাভের সঙ্গে তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মনে নানা ভাব ও আশার সঞ্চার হইতে থাকে, আমাদিগের বহু শতাব্দীর ব্যাধিগ্রস্ত জাতিটা আজকাল সেই দশায় উপস্থিত হইয়াছে। চারিদিক হইতেই তাহার সাড়া পাওয়া যাইতেছে। এই অধঃপতিত জাতিটা যে উত্থানের চেষ্টা করিতেছে, আহা! এখানে তাহাকে ধরিয়া তুলিবার বা সাহায্য করিবার কেহ নাই। বরং তাহাকে বিকার-গ্রস্ত মনে করিয়া দাবাইয়া শোয়াইয়া রাখিবার চেষ্টা অনেকে করিয়া থাকে। রোগী কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছে যে এ দুনিয়াতে তাহাকে আপন বলিতে কেহ নাই, তাহাকে নিজের চেষ্টায় নিজের শক্তি দ্বারাই উঠিতে হইবে। সেই শক্তি বৃদ্ধির জন্য তাহার সাহিত্য-টনিক, শিল্প-বাণিজ্যাদি পুষ্টিকর পথ্য এবং পারি-পার্শ্বিক রাষ্ট্রীয় জীবনের বিশুদ্ধ আব্-হাওয়ার প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই চতুর্দ্দিকে এত আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে। সেই কারণেই আজ আমি চীনে হিন্দুর প্রভাব সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিখিয়া মনের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে ইচ্ছা করি।

হিন্দুর যা কিছু চীনের সঙ্গে আদান-প্রদান তাহা বৌদ্ধ যুগ হইতেই আরম্ভ। বৈদিক যুগের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে হিন্দুর প্রভাব চীন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষ ও হিন্দুর কথা চীন দেশ হইতে উদ্ধার করিতে হইলে অগাধ চীনীয় ভাষা-সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছার প্রয়োজন। তাহা না পারিলে অমূল্য রত্ন উদ্ধার করা অসম্ভব। এ কার্য্যে জীবন-ব্যাপিনী সাধনা ও বহু অর্থের প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে আমরা প্রাচীন ভারত ও চীনের প্রসঙ্গে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি—তাহা কেবল ইউরোপীয় খ্রীষ্টীয়ান মিশনারিগণের ও অন্যান্য পর্য্যটকগণের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে। কিন্তু তাঁহাদিগের নিকট প্রাচীন ভারত ও হিন্দুর বিশেষ বিবরণ আমরা জানিবার আশা করিতে পারি না। কারণ তাঁহারা আপন আপন জাতি ও ধর্ম্মের কথা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। অধঃপতিত ভারত ও ঘৃণিত হিন্দুর কথা জগত সমক্ষে প্রকাশ করিয়া হিন্দুর

প্রভাব প্রচার করা তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালীর অন্তর্গত নহে। তাঁহারা যদি তাহা করিতেন তাহা হইলে আমরা আরও কত লুপ্ত রত্ন সংগ্রহ করিতে পারিতাম।

সুপ্রসিদ্ধ মিশনারি মার্শাল ব্রুমহল (Marshall Broomhall) সাহেব চীন-সাম্রাজ্য (Chinese Empire) নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে খাস চীনার অষ্টাদশটী প্রদেশের ও তিব্বত, মাঞ্চুরিয়া, মংগোলিয়া প্রভৃতি অধীনস্থ প্রদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই গ্রন্থের এক বা দুই প্রদেশের লেখক ভিন্ন ভিন্ন। ইউনান প্রদেশের বিবরণের লেখক রেভারেণ্ড ম্যাকার্থী।—তিনি তাঁহার প্রবন্ধের মুখবন্ধেই লিখিয়াছেন যে "It is generally accepted that the inhabitants of this province originally came through Burma from Hindustan" আবার 'চায়না ইনল্যাণ্ড মিশন' কর্ত্তৃক China of the Gospel নামক ১৯১২ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে ইউনান প্রদেশের প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে "Yunan (south of the clouds) previous to 1259 A. D. was ruled by native Princes who were of Hindu origin. * * *" কিন্তু পাদরি সাহেবগণ কোন্ গ্রন্থ হইতে এই তত্ত্ব সংগ্রহ করিলেন তাহা অনুসন্ধানে জানিতে পারি নাই। দুঃখের বিষয় এই যে রেভারেণ্ড ম্যাকার্থী গত বৎসর এ জগত হইতে অন্তর্ধান হইয়াছেন। তিনি জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই ইহার অনুসন্ধান পাইতাম। কারণ তিনি আমার বিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার কথা পূর্ব্বে আমি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত করিয়াছিলাম।

এই তত্ত্বের প্রমাণমূলক গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেছি এবং ইউনানফুর দৈনিক চীন পত্রিকায় এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দিতেছি যে যিনি এই বিষয়ে কোন প্রাচীন গ্রন্থ অথবা কোন প্রাচীন শিলালিপির বিবরণ আমাকে দিতে পারিবেন তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট কতক পরিমাণ অর্থ পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। যদি এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হই তাহা হইলে হিন্দু চীনের লুপ্ত গৌরবের এক অধ্যায় উন্মুক্ত হইবে।

ইউরোপীয় খ্রীষ্টিয়ান মিশনারিগণ যে ভারত ও ভারতবাসীর গৌরব বৃদ্ধি করিতে বিমুখ তাহার একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিব। তাহাদ্বারাই আমার কথা প্রমাণিত হইবে। এ কথাটী এই প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও অপাঠ্য হইবে না বলিয়া আশা করি।

মার্শাল ব্রুমহল সাহেবের পূর্ব্বোক্ত পুস্তকে তিব্বত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের লেখক সি-সিল পলহিল (Cecil Polhill) সাহেব। তিনি বিদেশী কর্ত্তৃক লাসা নগর দর্শন বা দর্শনের অভিলাষী ব্যক্তিগণের বিষয় লিখিয়াছেন যে "Since Manning's Visit to Lhasa in 1811, and the French Fathers Huc and Gabet's stay of six weeks in 1845, many attempts have been made by European travellers to reach that city, the Russian General

বুদ্ধ সঙ্ঘ

টেঙ্গিয়ের মন্দিরে অবস্থিত

India Press, Calcutta.
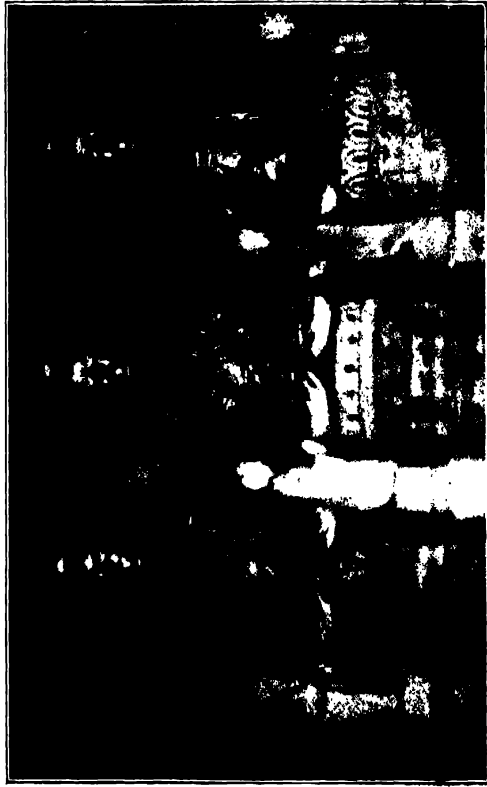
Prejvalski several times nearly succeeding. In 1892 Rock-hill from Sining came within a week's journey of Lhasa and in 1890 M. Bauvalot and Price Henry of Orleans reached Tengrinot, 95 miles north of Kashmir. In 1891 Captain Bower from the same point came within 200 miles north-west of the city, and in 1893 Miss Annie Taylor from China got within twelve days of the capital. Dr. Suen Helden has since then reached a spot 150 miles from the City. It was left however, for the British Expedition of 1904 to set before the eyes of the Public by means of Camera and Pen the hidden treasures of this hitherto forbidden City."

এই রিপোর্ট পাঠ করিয়া শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের মনে কি ভাবের উদয় হইবে জানি না। এই "hitherto forbidden city" লাসানগরের ভূরি ভূরি বিবরণ যিনি camera and pen দ্বারা পৃথিবীর মাঝে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া জগৎ সমক্ষে ধরিয়াছেন তাঁহার নাম-গন্ধও পলহিল সাহেবের প্রবন্ধে নাই। যে রকহিল সাহেব Rockhill রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাসের তিব্বত সম্বন্ধীয় গ্রন্থের মাত্র ভূমিকা-লেখক এবং যিনি মাত্র লাসার সাত দিনের পথ দূরে পৌঁছিয়াছিলেন তাঁহার নাম এই প্রবন্ধে স্থান পাইল, অথচ মূল গ্রন্থকর্ত্তা ও সর্ব্বপ্রসিদ্ধ পর্য্যটকের নাম তাহাতে উল্লেখ-যোগ্য বিবেচিত হইল না, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের কারণ আর কি হইতে পারে? ১৯০৪ খৃঃ তিব্বতে ব্রিটিশ অভিযান পৌঁছিবার পূর্ব্বে ১৯০৩ খৃঃ আমেরিকার ভৌগোলিক তত্ত্বাবিষ্কারক নিকল্‌সন সাহেব * যখন পূর্ব্ব তিব্বতের ভৌগোলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে এদেশে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার হাতে শরচ্চন্দ্র দাসের তিব্বত ভ্রমণ বিষয়ক পুস্তক ছিল। নিকলসন সাহেব এই পুস্তক তাঁহার Guide স্বরূপ সঙ্গে রাখিতেন এবং তাঁহার অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই পুস্তকের বিবরণ মিলাইয়া দেখিতেন। দাস মহাশয়ের তিব্বত ভ্রমণ বিষয়ক পুস্তক এখানকার সাহেবদিগের প্রত্যেকের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা দেশে কয়জন শিক্ষিত লোকের উক্ত পুস্তক আছে জানি না। আমার বোধ হয় যে অধিকাংশ শিক্ষিত লোক এই পুস্তকের খবরও রাখেন না। শ্রীযুক্ত নয়ন সিং ও তিব্বত ভ্রমণ করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইঁহারা ভারতবাসী বলিয়া এত উপেক্ষিত।

চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার

খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে হানরাজবংশ (Han Dynasty) চীনদেশে রাজত্ব করিতেন। হোনান প্রদেশের ল-ইয়াং নামক নগরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। এই নগর অনেকের মতে উক্ত প্রদেশের বর্ত্তমান প্রাচীন

* নিকল্‌সন সাহেবের তিব্বত ভ্রমণ বৃত্তান্ত পূর্ব্বে প্রবাসীতে সচিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

রাজধানী খাই-ফেং নগরের নামান্তর মাত্র। ৬৫ খৃঃ হান-বংশের প্রসিদ্ধ সম্রাট মিংটী একটা নিশীথ স্বপ্ন দেখেন যে এক সুন্দর সুবর্ণকান্তি দেবপুরুষ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মের কথা শুনাইতেছেন। নিদ্রা ভঙ্গের পর তাঁহার অন্তঃকরণে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা হইল।* সম্রাট মিংটী চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের অভিপ্রায়ে তদীয় একজন বিজ্ঞ কর্ম্মচারীকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। তাঁহার নাম ছিল সাই-ইং। কর্ম্মচারী ভারতবর্ষের তা-ইউ-শী্র নগর উপস্থিত হইয়া তৎকালীন বিখ্যাত বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করতঃ তথা হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অনেকগুলি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।† সম্রাট আগন্তুক বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে অতি সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের বাসের জন্য এক সুরম্য শ্বেতমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সাধুগণ উক্ত মন্দিরে বাস করতঃ স্বদেশ হইতে আনীত সমস্ত গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন।

ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসী চীনীয় ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। আর আজ বিংশ শতাব্দীতে আমাদিগের দশাটা কি?

চীনীয়গ্রন্থে বুদ্ধদেবের নাম লেখা হইয়াছে শির-চা-মৌনী। আমি প্রথমে ইহার অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, পরে অনেক চিন্তার পর ঠিক করিলাম যে শাক্যমুনির নাম বিকৃতভাবে লিখিত হইয়া শিরচা মৌনী করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা আভাস পাওয়া যায় যে চীন ভাষা হইতে ভারতবর্ষের ব্যক্তির ও স্থানের নাম সকল বিশুদ্ধভাবে অনুবাদ করা কত শক্ত।

উক্তগ্রন্থে শাক্যমুনির বিবরণ বিষয়ে লিখিত আছে যে শির-চা মৌনী—"চিবল নগরের রাজার ছেলে ছিলেন। একদা মৃতদেহ ও জরা-গ্রস্ত লোকসকল দেখিয়া তাঁহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইল। তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে গিয়া যোগাভ্যাস করেন এবং পরে নিজের ধর্ম্ম প্রকাশ করেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য‡ ধর্ম্মের বিদ্বেষী। তিনি সর্ব্ব মানবের সমান অধিকার ঘোষণা করেন, উচ্চজাতি নীচ জাতীয় বলিয়াপ্রভেদ তাহার ছিলনা। উপরোক্ত "চিবলনগর" বোধ করি কপিলবস্তুর অপভ্রংশ হইবে কেননা চীনা ভাষায় ক'র স্থানে চ উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা পেকীনকে চীনারা পেচীন বলিয়া থাকে। এই কারণে কপিল হইতে, চ বিল এবং ক্রমে চবিল হইতে চিবলে পরিণত হইয়াছে।

হোনান প্রদেশের ছুংশাল অঞ্চলে "পবিত্র পঞ্চগিরি" নামে অতি উচ্চ এক পর্ব্বতমালা

* ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ ও তিব্বত হইয়া বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণের এদেশে আগমনে সম্রাটের এই ধর্ম্মের বিষয় জানা ছিল এবং সেই জ্ঞানই বা তাঁহার স্বপ্ন দর্শনের সহায়তা করিয়া থাকিবে।

† যে চীনীয় গ্রন্থ হইতে এই বিবরণ সংগৃহীত হইল তাহাতে তাইউ-শী নগরের নাম আছে। কিন্তু আমার বোধ হয় বর্ত্তমান ত্রিহুতের নাম বা বিকৃত ভাবে লিখিত হইয়া থাকিবে।

‡ এই গ্রন্থে ব্রাহ্মণদিগকে "ব্রমন" বলা হইয়াছে।

সিংহবাহিনী দেবী

টৈঙ্গিপের মন্দিরে অবস্থিত

India Press, Calcutta.

আছে। তাহার গহ্বরে শৈলগাত্রে সহস্র সহস্র বুদ্ধ-মূর্ত্তি খোদিত রহিয়া শত শত বৎসর যাবত চীনে হিন্দুর প্রভাব ঘোষণা করিতেছে। এই গুহা সকলের বহির্ভাগে প্রস্তর গাত্রে এক মহাকায় বুদ্ধ-মূর্ত্তি খোদিত আছে। সেই মহাকায় মহামুনির কৃত্রিম মূর্ত্তির সহিত প্রাকৃতিক দৃশ্য মিলিত হইয়া তথায় এক অপূর্ব্ব শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত "চাইনিজ এম্পায়ার" নামক গ্রন্থে চিকিয়াং প্রদেশের প্রবন্ধ-লেখক পাদ্রী মোল সাহেব (A. E. Moule)। তাঁহার প্রবন্ধে দেখিতে পাই যে এই প্রদেশের হাংচাও নামক সহরের "পশ্চিম হ্রদের" অপর পারে যে সকল বিখ্যাত মঠ ও মন্দির আছে—তাহার কতক খৃঃ ৩০৬ অব্দে, অবশিষ্ট গুলি ৫৮১ অব্দে ভারতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই পবিত্র তীর্থ দর্শনের জন্য চীনের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বহুযাত্রী তথায় গিয়া থাকে, এবং এই প্রদেশের কুঠো নামক ক্ষুদ্রদ্বীপের বুদ্ধ-মন্দির এত পবিত্র যে প্রতি বৎসর মধ্য এসিয়া হইতে বহু যাত্রী এই তীর্থে আগমন করিয়া থাকে। এই প্রদেশের প্রসিদ্ধ নিংপু নগর খৃঃ পূঃ ২২০৫ বৎসরে স্থাপিত হয়। ৬৯৩ খৃঃ "ঠিয়েন-ফোং-টা" বা "ঈশ্বরাদিষ্ট-মঠ"—এখানে নির্ম্মিত হয়। এই মঠের চূড়া দৃষ্টে—মোল সাহেব উক্ত মঠের ফটোগ্রাফের নিম্নে লিখিয়াছেন যে

"The form of the Chinese Táb (Pagoda) is probably derived from the spire on the top of the Hindoo Dagoba, as its name doubtless taken from the first syllable of the word".

এই প্রাচীন মহাসাম্রাজ্যের প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে বহু বৌদ্ধ মন্দির ও বুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদের প্রাণে কত আনন্দ হয়। কিন্তু যখন ভাবি যে এই সুদূর চীন দেশের গ্রামে গ্রামে যাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রহিয়াছে তাঁহার মাতৃভূমিতে আজকাল তাঁহার চিহ্ন মাত্রও নাই তখন দুঃখ ও ক্ষোভে মন পরিপ্লুত হয়। হায়! তাঁহার নিজ দেশে শতকরা ৭২ জন তাঁহার নাম পর্য্যন্ত জানে কি না সন্দেহ। এখন আমাদের কর্ত্তব্য এই যে প্রতি নগরে ও গ্রামে এই মহাপুরুষের স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যাঁহার প্রতিভায় প্রায় সমস্ত এসিয়া আলোকিত, যাঁহার নামে আমাদিগের প্রাচীন সভ্যতার পরিচয়, যাহার প্রভাব চীন ব্রহ্ম তিব্বত মংগোলিয়া জাপান শ্যামের ঘরে ঘরে বিদ্যমান এবং যাঁহার জন্য ভারত বহুলোকের নিকট স্বর্গভূমি বলিয়া গণ্য, তাঁহাকে ভুলিয়া থাকা কি আমাদের পক্ষে সম্ভবে? তাহা যদি হয় তবে আমরা অতি বর্ব্বর ও অকৃতজ্ঞ।

চীন দেশে খাস চীনাদের মধ্যে তিন প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত—বৌদ্ধধর্ম্ম, কনফুসিয়ান ধর্ম্ম এবং তাও ধর্ম্ম। * এই তিন ধর্ম্ম চীন জাতির

* তাও ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক লাও-লাঙ্ক ও কনকুসিয়স বুদ্ধদেবের প্রায় সমসাময়িক লোক ছিলেন। লাওলা শব্দের অর্থ বুড়-খোকা, কেননা ইনি না কি ৮০ বৎসর যাবত মাতৃগর্ভে ছিলেন। শ্বেত শ্মশ্রু পক্ক সুকেশ লইয়া ভূমিষ্ঠ হন।

ব্যক্তিগত জীবন মধ্যে এমন ভাবে মিশ্রিত যে তাহার একটী হইতে অপরটী বাছিয়া বাহির করা কঠিন। যেমন আমাদিগের দেশে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম। শাক্তের বাড়ীতে কালী দুর্গা, শিবলিঙ্গ কৃষ্ণ রাধিকা একমণ্ডপে এক পুরোহিত দ্বারা অহরহ পূজিত হইয়া থাকেন। তবে আমাদিগের দেশে যেমন খাঁটি বৈষ্ণব আছেন, এদেশেও আময় প্রভৃতি স্থানে খাঁটি বৌদ্ধ আছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে এত কাল পরে বুদ্ধদেবের অন্ন চীন দেশ হইতে মারা গেল। রাষ্ট্র বিপ্লবের পর হইতে সমস্ত মন্দিরের দেবদেবীর সঙ্গে বুদ্ধ-মন্দিরের অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি সকল "কালাপাহাড়েরা" চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। বর্ত্তমানে চীনাদিগের ধর্ম্ম যে কি তাহা ঠিক করা কঠিন হইয়াছে, কারণ তাহারা ঈশ্বর বলিয়া যে কেহ আছেন তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না, এমন কি ঈশ্বর বলিয়া কোন শব্দও চীন ভাষায় নাই।

হিন্দুর দেবক্ষমতা

প্রাচীন কালে ইউন-নান প্রদেশে হিন্দু-দিগের দৈব বলের বেশ খ্যাতি ছিল। এই প্রদেশের প্রাচীন বৃত্তান্ত লিখিত বহু গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্য হইতে একখানি গ্রন্থ হইতে তিনটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত করিব।

১। টালিফু নগর টেঙ্গিয়ে হইতে ১২ দিনের পথ। এই সহরের নিকট চাও চাও নামক সহরে বহু হিন্দু বাস করিত। তাহার মধ্যে "শ্বেত শ্মশ্রু" নামে এক সিদ্ধ পুরুষ বাস করিতেন। এই প্রদেশে মশার বড় উৎপাত ছিল। তিনি দৈববলে সমস্ত মশার বংশ নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। একদা তিনি ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে ভারতবর্ষে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি অলৌকিক ক্ষমতাবলে তাঁহার মাতার মৃতদেহকে অল্প সময়ের মধ্যে আনিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার ভ্রাতা পাছে মাতৃদেহ হরণ করিয়া লইয়া যায় এই আশঙ্কা হইয়াছিল। তাঁহার ভ্রাতার নাম ছিল "রক্ত শ্মশ্রু" বা লালদাড়ি।

২। পূর্ব্বকালে এতদঞ্চলে হাংচাও নামক এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে একদা রাজ্যে তিন বৎসর যাবত অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। রাজ্যে বৃষ্টি আনিবার জন্য তিনি "পেই হুবো" বা "শ্বেতশ্রুত" সন্ন্যাসীকে অনুরোধ করেন। সন্ন্যাসী ঐ উদ্দেশ্যে নানা প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন এবং যাগযজ্ঞ করেন। তাহার ফলে আকাশে প্রচুর মেঘ জন্মে কিন্তু বৃষ্টি পড়ে না। তখন তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া একখানি যষ্টিদ্বারা আকাশের মেঘ সকল ঘাঁটিয়া দেন। তাহার ফলে যে স্থানের মেঘ ঘাঁটিলেন সেই স্থানে মাত্র অল্প বর্ষাপাত হইল, অন্যত্র হইল না।* আশানুরূপ বৃদ্ধি না হওয়ায় রাজা বড় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। তখন শুনিলেন যে অপর একস্থানে আর

* টালিফু অঞ্চলে দশ হাজার ফুটের উপর উচ্চ পর্ব্বত সকল আছে। উচ্চ পর্ব্বত গাত্রে সময় সময় স্তুপাকার তুলারাশির ন্যায় মেঘ সকল ধীরে ধীরে যাইতে থাকে। অনেক সময়ে উচ্চ পর্ব্বতে উঠিয়া মেঘের আড়ালে পড়িয়াছি। আমরাই যদি মেঘের আড়ালে পড়িতে পারি তাহা হইলে মেঘনাদ যে মেঘের আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন তাহার আশ্চর্য্য কি? আর এই হিন্দু সন্ন্যাসীই যে লাঠি দ্বারা মেঘ ঘাঁটিয়াছিলেন তাহার বিচিত্র কি?

লম্বোদর নি-নাই-ফু দেবতা

টেঙ্গিয়ের মন্দিরে অবস্থিত

India Press, Calcutta.
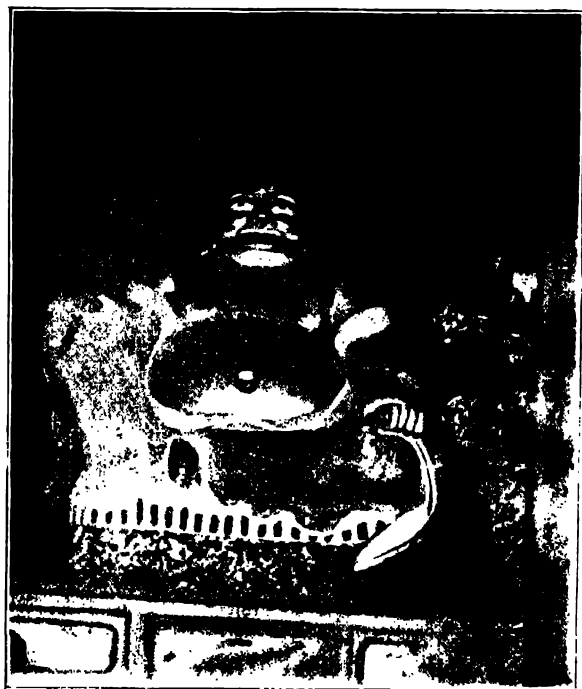
এক হিন্দু সাধু আছেন তাঁহার অসীম ক্ষমতা। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজা শ্বেতশ্মশ্রুকে সঙ্গে করিয়া তথায় গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে সাধুকে দেখিবামাত্র শ্বেতশ্মশ্রু সাষ্টাঙ্গ হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। রাজা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন যে "ইনি আমার গুরু।" তখন উক্ত সাধুর ললাটে পাঁচটি অক্ষরের চিহ্ন দেখিতে পাইয়া স্বয়ং তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া রাজ্যে বৃষ্টিপাতের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। এই সাধুর নাম ছিল সাও-হাই। ইনি রাজাকে কহিলেন যে "সাত বৎসর যাবত আপনার রাজ্যে বৃষ্টিপাত হইবে না, কারণ আপনার শাসন কালে অনেক পাপ সঞ্চিত হইয়াছে। বিনা বিচারে অনেক নরহত্যা হইতেছে।" এই কথায় রাজা বড় ভীত হইলেন এবং সুবিচার ও ন্যায়ের দ্বারা রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। নানা পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইল। তাহার ফলে দেশে বর্ষাপাত হইয়া লোকের কষ্ট নিবারণ হইল।

৩। অ-ইউ-ঠিয়া নামক একজন হিন্দু যোগী ওয়াং-পী নামক রাজার শাসনকালে এদেশে বাস করিতেন। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা বলিয়া দিতেন। তিনি অতি ধার্ম্মিক ও নীতিপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার বয়স এক শত বৎসরের উপর হইয়াছিল। তবুও তিনি খুব শক্তিশালী ও সুস্থকায় ছিলেন। মিয়ানি নামক সহরে তিনি থাকিতেন। একদা হঠাৎ অদৃশ্য হইলেন। যে দিবস তিনি অদৃশ্য হন, তাহার পর দিবস ফু-আড় নামক সহরের নিকট লোকে তাঁহাকে যোগাসনে বসিয়া ধ্যান করিতে দেখিয়াছিল, অথচ মিয়ানি হইতে ফু-আড় সহর ২০ দিনের পথ। লোকে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইত।

বাঙ্গালা ও বর্ম্মার রাজার সঙ্গে কুবলাই খাঁর সৈন্যের যুদ্ধ

ভিনিশ দেশীয় প্রসিদ্ধ পর্য্যটক মার্কোপোলো (Marco-Polo) ইউনান প্রদেশের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে ১২৭২ খৃঃ তাতার-সম্রাট কুবলাই খাঁ ইউনান প্রদেশে শান্তি স্থাপনের জন্য বহু সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাতার সৈন্য ভোটান (বর্ত্তমান ইউং-ছাং-ফু, টেঙ্গিয়ে হইতে ৪ দিনের পথ উত্তরে) পৌঁছিলে তৎকালীন বর্ম্মা ও বাঙ্গালার রাজা এই সংবাদ পাইয়া তাতারদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য বহু সৈন্য সংগ্রহ করেন। বাঙ্গালা ও বর্ম্মার রাজা তখন অতি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন এবং অত্যন্ত সম্পদশালী ও ক্ষমতাবান রাজা ছিলেন। তিনি ২০০০ হস্তী ও ৬০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ইউং-ছাং-ফু বা ভোটানে আসিয়া কুবলাই খাঁর সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাতারদিগের ১২০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। বাঙ্গালা ও বর্ম্মার রাজার এই বহুসংখ্যক সৈন্য অল্পসংখ্যক তাতার সৈন্যের সম্মুখীন হইলে তাতার অশ্বারোহিগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, কিন্তু শত্রু-সৈন্যের বহুসংখ্যক হস্তী দৃষ্টে তাতার সৈন্যের অশ্ব সকল ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সুচতুর তাতার-সেনাপতি বিপদ গণিয়া আপন

লোকদিগকে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পদাতিক সৈন্যের ন্যায় শত্রু সৈন্যের হাতীর উপর তীর চালাইতে আদেশ দিলেন। তৎকালে ধনুর্বিদ্যায় তাহাদের সমকক্ষ কেহ ছিল না। তাতারদিগের বিষাক্ত বাণাঘাতে রাজার হস্তী সকল জর্জ্জরিত হইয়া বিষম গর্জ্জন করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। মাহুতগণ কিছুতেই তাহাদিগকে ফিরাইতে পারিল না। ইহার দ্বারা রাজার বহু সৈন্য হত হইয়া যুদ্ধে পরাভূত হইল। এক এক হাতীতে ১০।১২ জন যোদ্ধা ছিল, তাহাদের প্রায় সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। বর্ম্মা ও বাঙ্গালার অবশিষ্ট সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিল।

এখন আমাদিগের বিচার করা কর্ত্তব্য যে এই বাঙ্গালা ও বর্ম্মার রাজা কে ছিলেন, কেনই বা তিনি বর্ম্মা ছাড়িয়া এ অঞ্চলে যুদ্ধ করিতে আসিলেন। এই ইউনান অঞ্চল তখন নিশ্চয়ই বর্ম্মা ও বাঙ্গালার রাজার অধীন ছিল, না হয় তাঁহার অধীনস্থ রাজ্য মধ্যে গণ্য ছিল। বঙ্গদেশে যেমন কড়ির চল সেই মত এ রাজ্যে তখন কড়ি অর্থ রূপে ব্যবহৃত হইত। হিন্দুদিগের মত শবদাহ-প্রথাও সেই কালে এ দেশে ছিল। মার্কোপোল তাহা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। তাতারে মোগলদিগের সময়ে শবদাহ-প্রথা পরিত্যক্ত হইয়া সমাধি-প্রথা প্রচলিত হয়। এ দেশের লোকে দুগ্ধ, মাংস ও অন্ন ভোজন করিত। কিন্তু বোধ হয় হিন্দু-প্রভাবের লোপের সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধের ব্যবহার এদেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। এদেশে লোকে দুগ্ধ দোহন বা দুগ্ধপান করিতে জানে না।

মার্কোপোলোর ইংরেজী গ্রন্থলেখক মেজর ইউল (পরে কর্ণেল ইউল)। মেজর ইউল তাঁহার গ্রন্থের টিকায় বাঙ্গালা ও বর্ম্মার রাজার বিষয় অনেক আলোচনা করিয়াছেন। ইনি মনে করিয়াছেন যে মার্কোপোলার সময়ে পেগু নগর বর্ম্মা রাজার অধীন ছিল, সম্ভবতঃ মার্কোপোলো পেগুকে বাঙ্গালা বলিয়া ভুল করিয়া থাকিবেন, আবার বলিয়াছেন যে বর্ম্মার রাজা সম্ভবতঃ আপনাকে বাঙ্গালার রাজা বলিয়া দম্ভ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনিই আবার স্বীকার করিয়াছেন যে তৎ-কালে ভারতের গাঙ্গ্য প্রদেশের সঙ্গে (Gangetic India) বর্ম্মার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

১০১৭-১০৫৯ খৃঃ রাজা অনুরথ পাগানের রাজত্ব করিতেন। তিনি ভারতের সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত আপন রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং বৈতালীর (ত্রিহুতের) রাজার কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সম্বন্ধে বর্ম্মার ঐতিহাসিকগণের লিখিত বিবরণে দৃষ্ট হয় যে ১০৬৪ খৃঃ রাজা ক্যান শিট্টা (Kyan Tsitcha) তাঁহার কন্যাকে বাঙ্গালার রাজার পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে মনস্থ করেন। বাঙ্গালার রাজার রাজধানী তখন পাট্টেই-করা নগরে ছিল। রাজার কন্যার এই বিবাহ প্রস্তাবে তাঁহার মন্ত্রিবর্গের অমত হয়, কিন্তু রাজকন্যা ইতি মধ্যে গর্ভবতী হইয়াছিলেন। সুতরাং বাঙ্গালার রাজকুমারের ঔরসে ব্রহ্মরাজকন্যার যে পুত্র জন্মে সেই পুত্রই পাগানের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই রাজার নাম হইল আলাটং শিতু। ইনি আপন রাজ্যের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে গিয়া রাজা

অনুরথ কর্ত্তৃক স্থাপিত বুদ্ধদেব-মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইনি বাঙ্গালার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতেন এবং পাট্টেই-করা রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। আলাটংশিতু ১০১ বৎসর যাবত জীবিত ছিলেন। ৭৫ বৎসরকাল রাজত্ব কালে তাঁহার পুত্র নরথু কর্ত্তৃক হত হন। নরথু তাঁহার বিমাতাকেও হত্যা করেন। বাঙ্গালার রাজা আপন কন্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আটজন যোদ্ধাকে পাগানে প্রেরণ করেন। ব্রাহ্মণগণের বিশুদ্ধ চরিত্রের জন্য রাজ-প্রাসাদে নিঃসন্দেহে তাঁহাদিগকে অবস্থান করিবার আদেশ দেওয়া হয়। এই ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণগণ সুযোগ পাইয়া রাজা নরথুকে হত্যা করেন। এই জন্য এই রাজার নাম হইয়াছিল "কালা (হিন্দু) কর্ত্তৃক নিহত রাজা।" এই ঘটনা ১১৭১ খৃঃ ঘটে। রাজা নরথুর প্রপৌত্র নরতিহ্না পদি (নরসিংহ পতি) মার্কোপোলর সময়ে বর্ম্মার রাজা ছিলেন। ইনিই বোধ করি তাতারগণের সঙ্গে এই প্রদেশে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে বর্ম্মার রাজা বাঙ্গালার রাজবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে মেজর ইউল লিখিয়াছেন যে "All these circumstances show tolerably close relations between Burma and Bengal and also that the dynasty then reigning in Burma was descended from a Bengal stock." সার আর্থার ক্যারি এই উপরোক্ত বিষয় সকল আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান কর্ত্তৃক বাঙ্গালা অধিকারের পর বর্ম্মার রাজা বঙ্গদেশের রাজার উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু এ কথা ব্রহ্মদেশের রাজদরবারের ইতিহাসলেখকগণের গ্রন্থে কোথায়ও নাই। ১৮১৮ খৃঃ ৬ই সেপ্টেম্বর ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ "মার্কুইশ অব্ হেষ্টিংস্" নামক পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে ব্রহ্মদেশের রাজা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে মুরশিদাবাদ হইতে পূর্ব্বাঞ্চলের সমস্ত প্রদেশ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, কেননা ঐ প্রদেশ তাহার অধীনস্থ রাজ্য মধ্যে গণ্য। আরাকানের রাজাও না কি ১৮১৪ খৃঃ ঐ প্রকার দাবি করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন।

সার আর্থার ক্যারি তৎকালীন বাঙ্গালার রাজধানী পাট্টেই-করাকে বিক্রমপুর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কারণ তথায় তখন বৈদ্যবংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন। পাট্টেই-করা পাথর গড়ের (Stone Fort) অপভ্রংশ।

শ্রীরামলাল সরকার
টেজিয়ে, চীন।

ভারতীয় মুসলমান রাজগণের সাহিত্যসেবা ও শিক্ষাবিস্তার

[ভারতবর্ষে বিদ্যাচর্চ্চা এবং শিক্ষাপ্রচার চিরকাল পল্লীবাসী জনসাধারণের স্বাধীন চেষ্টায়ই সাধিত হইত। রাষ্ট্রের শাসননিরপেক্ষ হইয়া ভারতের হিন্দু ও মুসলমান প্রজাপুঞ্জ সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিক্ষার পুষ্টিবিধান করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয়ে উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাঁহারা রাজশক্তির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন না। এই জন্য স্বায়ত্ত শিক্ষা ও স্বাধীন চিন্তা ভারতীয় সভ্যতার দুইটি প্রধান বিশেষত্ব। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান নরপতিগণ বিদ্যাচর্চ্চা ও সাহিত্যানুশীলন একেবারে উপেক্ষা করিতেন না; বরং তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যানুরাগী ও সাহিত্যসেবী ব্যক্তিগণকে অর্থ সাহায্য ও ভূমিসম্পত্তি প্রদানের দ্বারা 'সংরক্ষণ' করিতে অগ্রসর হইতেন।

এই প্রবন্ধে মুসলমান রাজগণ কর্ত্তৃক সাহিত্য-ও-বিদ্যা-সংরক্ষণ-কার্য্যের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। লেখক কয়েকখানি পারস্য ভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থ এবং অন্যান্য ইংরাজী গ্রন্থের সাহায্য লইয়া এতৎ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ সঙ্কলন করিয়াছেন। এই তথ্যনিচয় গ্রন্থাকারে ইংরাজী ভাষায় ইংলণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। প্রবন্ধ-লেখকের আর একখানি গ্রন্থ ইতিমধ্যে বিলাতে যন্ত্রস্থ রহিয়াছে। তাহাতে ভারত-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রী মহাপণ্ডিত কৌটিল্য প্রণীত সুবিখ্যাত 'অর্থশাস্ত্র' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে প্রাচীন হিন্দু সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। লেখক ভারতীয় ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধানে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।]

মুসলমান-আক্রমণে ভারতে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রেও পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছিল। তখন আর কেবলমাত্র বৈদিক মন্ত্রের বা বৌদ্ধ সূক্তের আবৃত্তিতে ভারতবর্ষ মুখরিত নহে; পরন্তু তৎসঙ্গে কখন বা তৎসমুদয় নিবৃত্ত করিয়া সুললিত কণ্ঠনিঃসৃত কোরাণের উপদেশবাণী ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রুতিগোচর হইত। রাজকীয় সাহায্য ও উৎসাহ প্রধানতঃ ইস্‌লামিক শিক্ষাপ্রণালীর উপর প্রযুক্ত হইল, ভারতবর্ষে প্রাচীন সভ্যতা রক্ষার ভার জনসাধারণের উপর অর্পিত হইয়াছিল। কখন কখন নূতন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নিকট ইহাকে লাঞ্ছিত ও আংশিকভাবে বিনষ্ট হইতে হইয়াছে। সেই সময়কার বহু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ধ্বংসের কথা, বহু পুস্তকাগারের লুণ্ঠনের কথা, এবং হিন্দুই হউক আর বৌদ্ধই হউক, বহু প্রাচীন বিদ্যা-বিদ্‌গণের হত্যা এবং নির্য্যাতনের কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি। এই সময় পুরাতনের পরিবর্ত্তে নূতনের প্রবর্ত্তনের যুগ।

মুসলমান রাজত্বের সময়ে নরপতি বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্যানুরাগী হইলে তাঁহার সভা সাধারণতঃ সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতি বাণীদেবীর বরপুত্রগণ দ্বারা পরিশোভিত

থাকিত, এবং তাহার প্রভাব সমগ্র সাম্রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া সাহিত্যকে সঞ্জীবিত ও উন্নত করিয়া রাখিত। নরপতির অনুকরণে সাম্রাজ্যের ধনকুবেরগণ নিজ নিজ দান দ্বারা পাঠশালা, বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত এবং প্রসিদ্ধ বীণাপাণির সেবকগণকে উৎসাহান্বিত ও পরিপুষ্ট করিতেন। অপরদিকে সম্রাট ভোগবিলাসী ও যথেচ্ছাচারী হইলে এবং বিদ্যার আদর না করিলে অচিরেই তাঁহার সাম্রাজ্যে বিদ্যা ও সাহিত্যের অধঃপতন হইত। তাঁহার সাম্রাজ্যে যথার্থ সাহিত্যসেবী বিরল হইত। কারণ সেই সময়ে নরপতিগণই প্রধানতঃ সকল শক্তির আধার ছিলেন। বিদ্যালয়সমূহ, শিক্ষকগণ এবং সাহিত্যিকগণ তাঁহাদিগের উৎসাহ, পরিপোষণ এবং সাহায্যে তাঁহাদিগের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া উন্নত হইত। তাঁহাদিগের বিদ্যানুরাগের তারতম্যে সাহিত্যক্ষেত্রেও তারতম্য উপস্থিত হইত। এমন কি অনেক সময় তাঁহাদিগের ইচ্ছাই জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করিত। কিন্তু আলাউদ্দিন খিলিজির রাজত্বকালের ন্যায় কখন কখন আমরা দেখিতে পাই সম্রাট নিজে সাহিত্যানুরাগী না হইলেও এবং নিজে পাঠশালা বিদ্যালয় প্রভৃতিতে দান ও পণ্ডিতগণের বাৎসরিক বৃত্তি প্রভৃতি বন্ধ করতঃ সাহিত্য-সম্পদবৃদ্ধির বিপক্ষতাচরণ করিলেও দেশের সাহিত্য বেশ উন্নতাবস্থায়ই রহিয়াছে। এই অসামঞ্জস্যের কারণ একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, পূর্ব্ব রাজগণের অনুকরণে জনসাধারণ ও ধনকুবেরগণের উৎসাহ ও পোষকতা দেশের শিক্ষা ও সাহিত্য-সংরক্ষণে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

কিন্তু নরপতির অনাদর বহুবৎসর ব্যাপী হইলে জনসাধারণ ও ধনিগণের মধ্যেও ধীরে ধীরে বিদ্যার আদর হ্রাস পাইতে থাকে, এবং পরিশেষে দেশের সাহিত্য সম্পদেরও ক্রমাবনতি হইতে থাকে। বাস্তবিক পক্ষে সম্রাটের পরিপোষকতা ও উৎসাহ দেশের বিদ্যা ও সাহিত্যসম্পদ্‌বৃদ্ধির একমাত্র সম্বল ছিল। বিশেষতঃ যখন রাজাই সমস্ত রাষ্ট্রীয় শক্তির পরিচালক ছিলেন, তখনকার দিনে দেশের সাহিত্যসম্পদ্ বৃদ্ধি বা অবনতির জন্য তিনিই একমাত্র দায়ী। সুতরাং দেখা যাইতেছে দেশের শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চ্চার অবস্থা বুঝিতে হইলে তাহার ভাগ্যনিয়ন্তা আক্রমণকারিগণ ও রাজন্যবর্গের বিদ্যা ও বিদ্যানুরাগের প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে।

গজনীর রাজবংশ

সাহিত্য ও শিক্ষার ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা সুলতান মহম্মদ হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে মুসলমান রাজগণের কার্য্যাবলীর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সুলতান মামুদ্ মূর্ত্তিপূজার বিরোধী ও মূর্ত্তিবিধ্বংসকারী বলিয়া ঘৃণিত হইলেও তাহার চরিত্রে সদ্‌গুণাবলী দৃষ্ট হয়। তিনি সাতিশয় বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন বলিয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বী বিদ্বানদিগকে উৎসাহিত করিতেন না এবং প্রজাগণের শিক্ষার উন্নতির জন্য কোন প্রকার যত্ন করিতেন না।

তাঁহার দান ও চরিত্রের মহত্ত্ব কেবল তাঁহার রাজধানী গজনীতেই আবদ্ধ ছিল। সুতরাং

হিন্দুগণের নিকট তাঁহার চরিত্রের কালিমাই সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, তাঁহার মহত্বের ক্ষীণরেখাও হিন্দুস্থানে আসিয়া পড়ে নাই। তিনি কেবল লুণ্ঠনকারী, নিষ্ঠুর এবং গোঁড়া মুসলমান বলিয়াই আমাদের নিকট পরিচিত। তাঁহার সপ্তদশবার ভারত আক্রমণ, দেবালয় ও দেবদেবীর মূর্ত্তি ধ্বংস-করণ, অসংখ্য লোকের নিষ্ঠুর হত্যা ও অমানুষিক লুণ্ঠনের কথা শুনিয়া হিন্দুমাত্রই স্বভাবতঃ তাঁহাকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন ও তাঁহার এক কালিমাময় বীভৎস মূর্ত্তি হৃদয় মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইবেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার হৃদয়ের মহত্বের কথা আমরা কিছুই জানি না। সুতরাং তাহার কতকগুলি সুস্পষ্টভাবে ধরিয়া তোলা দরকার।

তারিখ-ই-গাজিদার লেখক হামদুল্লা মুস্তাফার একটা গল্প আছে। তাহা বড়ই সুন্দর। "মামুদের চেহারা অত্যন্ত বিশ্রী ছিল। একদিন দর্পণে তাঁহার মুখ দেখিয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তান্বিত ও বিষণ্ণ হইলেন। তদ্দর্শনে উজীর তাঁহার এরূপ বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—'শুনিয়াছি রাজদর্শনে লোকের মনে বলের সঞ্চার হয় ও নয়ন পরিতৃপ্ত হয়; কিন্তু ভগবান আমার যেরূপ আকৃতি দিয়াছেন তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে, আমাকে দেখিলে লোকে চক্ষু বুজিবে—তাহাদের মনে বিভীষিকা ও কাপুরুষতার উদ্রেক হইবে।' উজীর বলিলেন 'সহস্র লোকের মধ্যে একজনেরও আপনার মুখ দেখিয়া সৌভাগ্য হয় কি না সন্দেহ, কিন্তু আপনার গুণাবলী ও চরিত্রের মহত্ত্ব সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া লোকের মনে কার্য্য করিতেছে"।* সুতরাং নিরপেক্ষভাবে মামুদের দোষগুণ বিচার করিতে হইলে তাঁহার দোষাবলীর অভ্যন্তরে লুক্কায়িত এই "গুণাবলী ও চরিত্রের মহত্বের" বিষয়ও বিবৃত করা প্রয়োজন।

মামুদের বিদ্যোৎসাহিতা সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ও সমুজ্জ্বল অক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য। গাজিদা পাঠে জানা যায় তিনি কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতগণকে বাৎসরিক চারি লক্ষ দিনার করিয়া দান করিতেন। কিন্তু তাঁহার শিক্ষানুরাগ কেবল পণ্ডিতগণের পরি-পোষণেই পরিসমাপ্ত হয় নাই। স্থায়িভাবে শিক্ষাপ্রচার কল্পে তিনি বহু শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। স্বর্ণ-রৌপ্যখচিত কার্পেট-বিমণ্ডিত সুদৃশ্য প্রস্তর-নির্ম্মিত সুশোভন মসজিদের সন্নিকটে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষালয়সমূহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থি-গণের পরিপোষণের সমুদয় খরচ তিনিই বহন করিতেন। তদ্ব্যতীত সেই সকল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জীবনীশক্তি স্থায়ী করার জন্য তিনি অসংখ্য মুদ্রা ব্যয় করিতেন।

আমরা ফিরিস্তাতে আরও দেখিতে পাই একাধারে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, বহু ভাষাবিদ্, কবি ও মহাজ্ঞানী আন্সারি তৎসময়ে গজনী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এবং তিনিই মামুদের সভায় সাহিত্যের নির্ব্বাচন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহা হইতে

* ইলিয়ট তৃতীয় কাণ্ড ৬৩ পংক্তি।

স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে তিনি কিরূপ গুণের আদর ও জ্ঞানীর পূজা করিতে জানিতেন।

দেখা যাইতেছে বহু রক্তপাত ও লুণ্ঠন দ্বারা মামুদ যে প্রভূত ধন আহরণ করিয়াছিলেন, শিক্ষার্থী পোষণ, বিদ্বজ্জনের পোষণ, বিদ্যালয় সংস্থাপন প্রভৃতি বহুবিধ সদনুষ্ঠানে ব্যয়িত হওয়ায় তাহার প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল।

অত্যল্প দিনের মধ্যেই গজনী নগরী শিক্ষিত, জ্ঞানী, কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও শিক্ষার্থিগণের আগমনের প্রধান লক্ষ্যস্থান হইয়া পড়ে। একাধারে বিদ্বজ্জন সমাগমে, বিবিধ কারুকার্য্যখচিত সুরম্য হর্ম্ম্যের প্রভাবে, তাহাতে স্থাপত্য শিল্পের পরাকাষ্ঠায় এবং বিজ্ঞানসম্মত বিবিধ উপাদানে নগরী অতি সত্বরই অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। তৎকালে উহা প্রাচীন কালের উজ্জয়িনী ও পাটলীপুত্রের ন্যায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

আতবী নামক একজন প্রতিভাবান প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ছিলেন। বলা বাহুল্য তিনিও মামুদের পরিপোষকতায়ই পুষ্ট। তিনি তারিখ-ই-যামানি নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি সবুক্তিজীন ও তাঁহার বংশধরের বিবরণ অতি সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

তাঁহার সভায় আজেরি রাজি নামক একজন পারসিক কবি ছিলেন। একদা তিনি একটি ক্ষুদ্র মহিমা-গীতির রচনার জন্যই সুলতানের নিকট হইতে চতুর্দ্দশ সহস্র ডির্জাম পারিতোষিক পাইয়াছিলেন।

সেই সভায় প্রসিদ্ধ খোরাসানী কবি আসুদি-তুমি ফারদুসীর শিক্ষক ছিলেন। সুলতান তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সানামা প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। পরে ফারদুসী গজনী হইতে পলায়ন করিলে সুলতানের অনুরোধে তিনি ৪০০০ পদাবলীযুক্ত সানামার এক অধ্যায় প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বহু দেশীয় প্রসিদ্ধ কবি ও ভাঁড়ও মামুদের সভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ্ আনসারি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আমরা গজনী বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি মামুদের প্রশংসা করিয়া বহু গীতিকা ও স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। তাহার সম্বন্ধে একটী মজার গল্প আছে। এক দিন সুলতান তাহার প্রিয়ার প্রতি অতি অন্যায় ব্যবহার করায় অনুতাপে অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন—কখন বসেন—কখন উঠেন—কখন বা দৌড়ান। এরূপ অবস্থায় অনুচরগণ তাঁহার সমীপস্থ হইতে ভয় পাইতেছিল। এমন সময় আনসারী একটি গীতিকা রচনা করিয়া তাহাকে আহ্বান করিলেন। সুলতান তাহাতে এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তাহাতেই তাহার চিত্তের উদ্বেগ অন্তর্হিত হইল এবং তিনি তাহার মুখ তিন বার করিয়া স্বর্ণ মুদ্রায় পরিপূর্ণ করিয়া দিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। সুলতান তাঁহাকে শিক্ষার তত্ত্বাবধানের কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কোন নূতন গ্রন্থই সুলতানের নিকট উপস্থিত হইতে পারিত না। তত্রত্য ৪০০ কবি ও বিদ্বান

এবং গজনী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় ছাত্র তাঁহাকে গুরুরূপে মান্য করিতেন। শেষ জীবনে তিনি রাজ-কবিপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। সেই সময় উদীয়মান কবি ও প্রতিভাবান জ্ঞানিগণের রাজানুগ্রহের যোগ্যতা-যোগ্যতা ও পরিমাণ তাঁহাকেই বিচার করিতে হইত।

আনসারীর শিষ্য ও বীররসের কবি আমজুদিও মামুদের সভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়া কোয়াসিদা নামক গ্রন্থে মামুদের সোমনাথ লুণ্ঠনের সময়কার গুণাবলীর কীর্ত্তন করিয়াছেন।

আনসারীর অন্যতম শিষ্য ফারুকীও সেই সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

এই সভাতেই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সাহানামা-লেখক অমর কবি ফারদুসিও বিদ্যমান থাকিয়া মামুদের বিদ্যোৎসাহিতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। মামুদের বিদ্যানুরাগের প্রশংসা শ্রবণ করিয়াই তিনি তাঁহার সভায় আগমন করেন। সুলতান তাঁহাকে সানামা গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত করেন। প্রসিদ্ধ দাকিকি পূর্ব্বে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তিনি জনৈক ভৃত্যহস্তে নিহত হওয়ায় গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ফারদুসি তাহাতেই পুনঃ হস্তক্ষেপ করেন। ফারদুসির মৃত্যু ও তাহার সহিত মামুদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উভয়ই অতি রহস্যপূর্ণ ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট। তাহার একটু বিবরণ দিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ফারদুসির সেই প্রসিদ্ধ গ্রন্থেই আমরা দেখিতে পাই তিনি কবিতা রচনায় অত্যন্ত আমোদ উপভোগ করিতেন। দৈবাৎ একদিন কে একজন তাঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করেন। তিনি তাহার প্রতিশোধ লইতে গজনীতে সুলতান মামুদের নিকট গমন করেন। নগরীর সন্নিকটস্থ হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন একটি উদ্যানে তিন জন লোক কথোপকথন করিতেছে। তাহাদের নিকট সাহায্য পাইবার আশায় কবিবর তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতে গেলেন। তাঁহারা বলিলেন তাঁহারা সুলতানের সভাকবি। তাঁহারা কবি ব্যতীত অন্য কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না, এবং যিনি তাঁহাদের তিনজনের রচিত তিন পংক্তির কবিতার শেষ চতুর্থ চরণ পূর্ণ করিতে পারিবেন তাঁহারা তাঁহার সঙ্গেই বাক্যালাপ করিতে পারেন। ব্যক্তিত্রয় স্বয়ং আনসারি, আমযুদি ও ফারুখি। এতৎ-শ্রবণে ফারদুসী তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিয়া অত্যল্প সময়ের মধ্যে শেষ চরণটি পূর্ণ করিয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহারা তাঁহার প্রতিভাতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেও তাঁহাদের দলভুক্ত করিয়া লইলেন। শীঘ্রই তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। সুলতানের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে তিনি কবিবরের যথোপযুক্ত পুরস্কার ও আদর করিয়া প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিতে ত্রুটী করিলেন না। পরে তিনি সানামা রচনার জন্য সুলতান কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইলে প্রতি সহস্র শ্লোক রচনা করিয়া সম্রাটের সম্মতির জন্য উপস্থিত হইলেই সম্রাট তাহাকে প্রতিবারই সহস্র দিনার পারিতোষিক রূপে প্রদান করিতেন। ষষ্ঠি সহস্র শ্লোকযুক্ত বৃহৎ গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিলে তিনি প্রত্যেক শ্লোকের জন্য এক এক দিনার করিয়া পাইবার

আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু কতকগুলি হীনচেতা লোকের পরামর্শে সম্রাট মাত্র ৫০,০০০ ডির্হাম তাহার পারিতোষিক রূপে প্রদান করিলেন। কবিবর স্নান সমাপ্ত করিয়া উঠিয়াছেন এমন সময় পারিশ্রমিক তাঁহার নিকট আনয়ন করা হইল। তিনি ঐ পারিতোষিকের পরিমাণ দর্শনে নিতান্ত ভগ্নহৃদয় হইয়া উহার তৃতীয়াংশ স্নানাগার রক্ষককে প্রদান করিলেন, অন্য তৃতীয়াংশ তৎসময়ে আগত এক মাংস-বিক্রেতাকে, এবং অপর তৃতীয়াংশ মুদ্রাবাহককে প্রদান করিয়া ফেলিলেন।

স্থলতানের এই অন্যায় আচরণে তাঁহার সমস্ত আশার মূলে কুঠারাঘাত হওয়ায় তিনি মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। কবিবর কাব্যেই এই অন্যায়াচরণের প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হইলেন। তদনুসারে তিনি স্থলতানের উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া ৪০টি শ্লোক সানামার সঙ্গে যোজনা করিয়াছিলেন এবং স্থলতানের রোষাগ্নি হইতে নিস্তার পাইবার আশায় তাঁহার রাজ্যের বহির্ভাগে তাজ নামক আপনার জন্মভূমিতে গমন করিলেন। ইহার কিছুদিন পর মামুদ আত্মাট্-বিন্ হাসেন ময়মারদির নামক রাজকবির সমভিব্যাহারে একদিন মৃগয়া করিতে গমন করেন। সেই সময় উভয়ে কোন সময়ে তাজের নিকটবর্ত্তী হইলে হাসেন ময়মুদিন সানামা হইতে উদ্ধৃত করিয়া কতিপয় শ্লোকে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তিনি শ্লোক শুনিয়া সাতিশয় প্রশংসা করিয়া সেগুলি কাহার রচিত তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থলতান সেগুলি ফারদুসীর রচিত জানিয়া তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণের জন্য অতিশয় অনুতাপ করিয়া ফরদুসীর তাজ নগরীস্থ ভবনে তৎক্ষণাৎ ৬০,০০০ দিনার লইয়া যাইতে আজ্ঞাপ্রদান করিলেন এবং কবিবরের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যখন নগরের এক দ্বার দিয়া স্থলতানের লোক তাহার জন্য ৬০,০০০ দিনার লইয়া যাইতেছিল তখন তাঁহার নশ্বরদেহ সমাধিস্থ করিবার জন্য অন্য দ্বার দিয়া বাহির করা হইতেছিল। কবিবরের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী কন্যাকে ঐ মুদ্রা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি তাঁহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যথেষ্ট ধনসম্পত্তি আছে বলিয়া এবং তাঁহার অর্থের আর কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কন্যা পিতার আত্মসম্মান-বোধকে অবজ্ঞা করিলেন না।

মামুদের দান ফার্দুসির কন্যা প্রত্যাখ্যান করিলেন, মামুদ ঐ অর্থ দিয়া তাজের নিকট-বর্ত্তী স্থানে একটি পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইয়া মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিলেন।

মামুদের যুদ্ধানুরাগও এক সময় তাঁহার বিদ্যানুরাগের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছিল। ১০২৩ খৃঃ তিনি গোয়ালিয়ার দুর্গ অবরোধ করেন। কিছুকাল পরে দুর্গের নায়ক নন্দ রায় সন্ধিস্থাপন করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং তিনশত অনারূঢ় হস্তী স্থলতানের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা ফেরিস্তার বিবরণ হইতে এ বিষয়ে মতভেদ দেখিতে পাই। তাহাতে জানা যায় যে, নন্দ

সুলতানের সৈন্যগণের সাহস পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ঐ সকল মদোন্মত্ত হস্তী ও একটি কবিতা প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুলতান সন্ধির নিয়মানুসারে হস্তী উপহার পাইলেও কবিতা পাইয়া সমধিক প্রীত হইয়াছিলেন। নন্দ রায়ের কবিতা তাঁহার সভাস্থ ভারতবর্ষ, আরব ও পারস্যের পণ্ডিতগণ দ্বারা এরূপ প্রশংসিত হইয়াছিল এবং উহাতে সুলতানের এরূপ আনন্দ হইয়াছিল যে, সুলতান তাঁহাকে কালঞ্জর দুর্গের সহিত ১৫টি দুর্গের শাসনভার প্রদান করেন। জেতার নিকট বিজেতার সাহিত্যের এরূপ সম্মান অতি অল্পই দেখা যায়। মামুদের জীবনের এই ঘটনা জগতের সমক্ষে তাঁহার গভীর সাহিত্যানুরাগ প্রচার করিয়া তাঁহাকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

সুলতান মামুদ যেমন একদিকে বিখ্যাত যোদ্ধা, অন্যদিকে সেইরূপ শিক্ষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ফেরিস্তা যথার্থই বলিয়াছেন সুলতান মামুদ অপেক্ষা পণ্ডিত কোন রাজা এই সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই।

মামুদ মৃত্যুকালে তাঁহার সাম্রাজ্যের সহিত সাহিত্যের অনুরাগও গজনীরাজকে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষানুরাগ বহুকাল পর্য্যন্ত গজনী রাজ্যে জাগ্রত ছিল। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই মামুদের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে তৎপুত্র মসায়ুদ পিতৃ গৌরব স্মরণ রাখিয়া, স্কুল ও কলেজ সমূহ স্থাপন করিয়া তৎসংলগ্নস্থানে সাধারণের মিলন-গৃহ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের রক্ষা ও পুষ্টির নিমিত্ত উপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। সুপণ্ডিতগণের মিলনে গজনী সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রচারের নিমিত্ত তাঁহার বৃহৎ সাম্রাজ্যের কয়েকটি প্রধান নগর নগরীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মসায়ুদ সর্ব্বদাই পণ্ডিত-সঙ্গ ভাল বাসিতেন। এজন্য পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগের গ্রন্থসমূহ তাঁহার নামেই উৎসর্গ করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সংখ্যাতীত কলেজ, মস্‌জিদ্ এবং ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আমরা তাৎকালিক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আলবেরুণী (Alberuni) হইতে প্রমাণ পাই যে, তিনি পণ্ডিতগণের সাহায্য ও শিক্ষা-প্রচার-কল্পে মুক্তহস্ত ছিলেন। আলবেরুণির লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় প্রাচীন সংস্কৃত ও গ্রীক সাহিত্যের পার্শ্বে আরবী ও পারসী সাহিত্য থাকিয়া ভারতবাসীর জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিল। ভারতীয় গণিত জ্যোতিষ, ফলিত জ্যোতিষ, ঔষধ ও চিকিৎসা-শাস্ত্র মুসলমান ছাত্রগণের প্রথম ও প্রধান শিক্ষার বিষয় ছিল এবং ভারতীয় গ্রন্থসমূহ বিশদভাবে আরব্য ও পারস্য ভাষায় এই সকল উদ্যমশীল ও অনুসন্ধিৎসু ছাত্রগণ কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়াছিল।

মামুদের পরবর্ত্তী যে চারিজন সুলতান গজনির সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তাঁহারা কেহই বিদ্যানুরাগী ছিলেন না। ফেরিস্তার বিবরণ হইতে জানা যায় যে সুলতান ইব্রাহিম একজন ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন, ধর্ম্ম ও নীতি-শাস্ত্র শ্রবণে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং তিনি প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ঐ সব বিষয়ের আলোচনা ও বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন; বক্তৃতা

সময়ে তাঁহার উপদেষ্টা তাঁহার প্রতি যে সব নিন্দাবাদ প্রদান করিতেন, তিনি অসাধারণ স্থৈর্য্য ও ধীরতার সহিত তাহা সহ্য করিতেন। সুলতান ইব্রাহিমের হস্তলিপিও অতিশয় সুন্দর ছিল। তিনি হস্তে কোরাণের দুই খণ্ড প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া মক্কা এবং মদিনার বিখ্যাত গ্রন্থশালার জন্য খালিফের নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন।

পরবর্ত্তী সুলতান বৈরাম-বিন-মুসাউদ অসাধারণ জ্ঞান-পিপাসু ছিলেন! তাঁহার বিদ্যানুরাগ এবং সাহিত্য-সেবিগণের উৎসাহ প্রদান সাহিত্য-জগতে এক অভিনব শক্তি জাগরিত করিয়াছিল, শিক্ষা-ক্ষেত্রে এক বিপুল ভাব-বন্যা উপস্থিত করিয়াছিল। তাঁহার পণ্ডিত-সমাজের মধ্যে শেখ নিজামি এবং সৈয়দ হোসেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য; উভয়েই কবিত্ব এবং দার্শনিকতায় বিপুল যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। নিজামি, মুখজন্-আসর নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। সুলতান বৈরাম অনেক বৈদেশিক গ্রন্থও পার্শি ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছেন; ভারতের কলিলভিমনা (পঞ্চতন্ত্র নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ) তাহাদের অন্যতম। এই গ্রন্থখানি পারস্যের রাজা নওসের-ওয়াণের প্রধান উজির কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃত হইতে 'পেলভি' ভাষায় অনূদিত হয়; হেরাণ-উল-রসিদের রাজত্বকালে ইহা 'আরবি' ভাষায় লিখিত হয়। এই আরবি ভাষা হইতেই সুলতানের অনুজ্ঞাক্রমে ইহা পার্শিভাষায় অনুবাদিত হয়। কিন্তু এই অনুবাদ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ না হওয়ায় মুল্ল-হোসেন ওয়াইজ কাশাফি কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া ইহার বর্ত্তমান নাম "আনওয়ার-সোহেইনি" প্রাপ্ত হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত আমরা গজনি রাজপরিবারের শিক্ষানুরাগের বিষয় আলোচনা করিলাম। দেখা গেল যে, রাজপরিবারের শিক্ষা কয়েকটি রাজার শিক্ষাতেই আবদ্ধ; সুলতানগণ নিজেরা বিদ্যাশিক্ষা করিতেন এবং বিদ্যা-শিক্ষার সাহায্যকল্পে বিদ্যানুরাগীদিগকে সরকার হইতে অর্থ সাহায্য প্রদান করিতেন।

ঘোরী রাজবংশ

গজনি বংশের ন্যায় ঘোর বংশ বিদ্যাশিক্ষায় ততটা সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। এ সময়ে দেশে বিদ্যাচর্চ্চা অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। দেশে আর সে ভাবুকতা ছিল না। এই বংশের প্রারম্ভে দেশের উপর দিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে এক মহা বিপ্লব স্রোত বহিয়া গিয়াছিল। প্রথম ঘোররাজ মহম্মদ ঘোরী এই বিপ্লবের নেতা। তাঁহার আদেশক্রমে তৎকালীন এসিয়ার অদ্বিতীয় নগরী গজনি, তাহার সুরম্য অট্টালিকা, মনোহর উদ্যান এবং সৌন্দর্য্যরাশির সহিত সপ্তদিবস ধরিয়া অনলে দগ্ধীভূত হইয়াছিল, দস্যুগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল। এতদিন ধরিয়া এই সাহিত্য-কেন্দ্রে যাহা কিছু সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা ভস্মীভূত হইয়া গেল। দেশের এই অভাব আর শীঘ্র দূর হইল না। মহম্মদ ঘোরীই প্রকৃত পক্ষে ঘোরবংশ-স্থাপয়িতা; কিন্তু তিনি শাস্ত্র অপেক্ষা শস্ত্র বিদ্যাতেই সমধিক পরিচিত। তাঁহার দেশ-জয় কোন কোন অংশে সুলতান মামুদকেও অতিক্রম করিয়াছিল।

সার্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া দেশে কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহ, অশান্তিউচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজ করিতে-

ছিল। সাহিত্য-চর্চ্চা দেশে তখন মোটেই ছিল না। কিন্তু অশান্তি-অশৃঙ্খলতার পরিবর্ত্তে শান্তি-শৃঙ্খলতা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই মহম্মদ আপন রাজ্যে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই শিক্ষা কেবল মোসলেম্ ধর্ম্ম বিষয়েই হইত, কেবল মাত্র মুসলমান প্রজাগণের উন্নতিকল্পেই ইহার প্রচলন হইল।

কি রাজ্যজয়াকাঙ্ক্ষা, কি মুসলমান ধর্ম্মপ্রচার, কি যুদ্ধবিগ্রহ, এই সকল বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিলেও তিনি কোন সময়েই শিক্ষাপ্রদান যে তাঁহার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা বিস্মৃত হইতেন না।

ইহা ব্যতীত তিনি যখন আজমীরে ছিলেন তখন তাঁহার কার্য্যবিবরণী হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে তিনি কতকগুলি তুর্কিদাসের শিক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফেরিস্তাতে উল্লেখ আছে—

"মহম্মদ ঘোরীর একমাত্র কন্যা ব্যতীত অন্য কোন সন্তানসন্ততি না থাকায় তিনি তুর্কিদাসগণের শিক্ষাদান করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। কুতবুদ্দিন ব্যতীত তাহার আরও চারজন দাস কালে রাজা হইয়াছিলেন—তাজুদ্দিন বুলডাজ্ তাহাদের অন্যতম।"

এই দাসগণের মধ্যে তিন জন মহম্মদের মৃত্যুসময়ে বিস্তৃত ভূখণ্ডের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; কুতবুদ্দিন ভারতের, বুলডাজ গজনীর, নসিরুদ্দিন কুবাচী স্থলতান এবং সিন্ধের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন। ইহা হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে তিনি বিদ্যা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কঠিন শাসনকার্য্যের সম্বন্ধেও তাঁহার শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেন। ইহা বাস্তবিকই যুবরাজগণের অত্যাবশ্যক শিক্ষণীয় বিষয়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা
এম্, এ, বি, এল্।

আর্য্যসমাজের গুরুকুল

বড় দুঃখের কথা আমরা এখনও দেশকে সম্যক্ জানিতে চেষ্টা করি না। ইহার পথঘাট নদী-নালা প্রভৃতির ভৌগোলিক বিবরণ, কৃষিশিল্প ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতির তথ্য, দেশীয় জাতিপুঞ্জের আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতি নীতি প্রভৃতির ইতিহাস, ইহার চতুর্দ্দিকের নানামুখী আন্দোলন, অনুষ্ঠান- প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির জ্ঞান কিছুই আমাদের আয়ত্ত নহে। তবু যদি আমরা দেশ দেশ বলিয়া চীৎকার করি—সেটা কি বাস্তবিকই একটা ফ্যাশন বলিয়া বোধ হইবে না? কিন্তু এইরূপ কৃত্রিমতা লইয়া আর কতদিন চলিবে? ইহাকে ত বর্জ্জন করিতেই হইবে। এখন সত্যকারের ব্যাকুলতার প্রয়োজন যাহাতে দেশকে চিনিতে পারিব। এখন এই দেশের 'মাটীর' উপরে 'মাথা ঠেকাইতে' হইবে, এখন হৃদয়ের সমস্ত শিরা উপশিরা দিয়া দেশের সমস্ত মর্ম্মস্থানকে বেষ্টন করিয়া ধরিতে হইবে। তাহা হইলেই আমাদের দেশ-প্রীতি সত্য হইয়া দাঁড়াইবে, নচেৎ নহে।

তাই আমাদের জানা কর্ত্তব্য বঙ্গদেশ এবং বঙ্গদেশের বাহিরে কি আয়োজন, কি অনুষ্ঠান চলিতেছে।
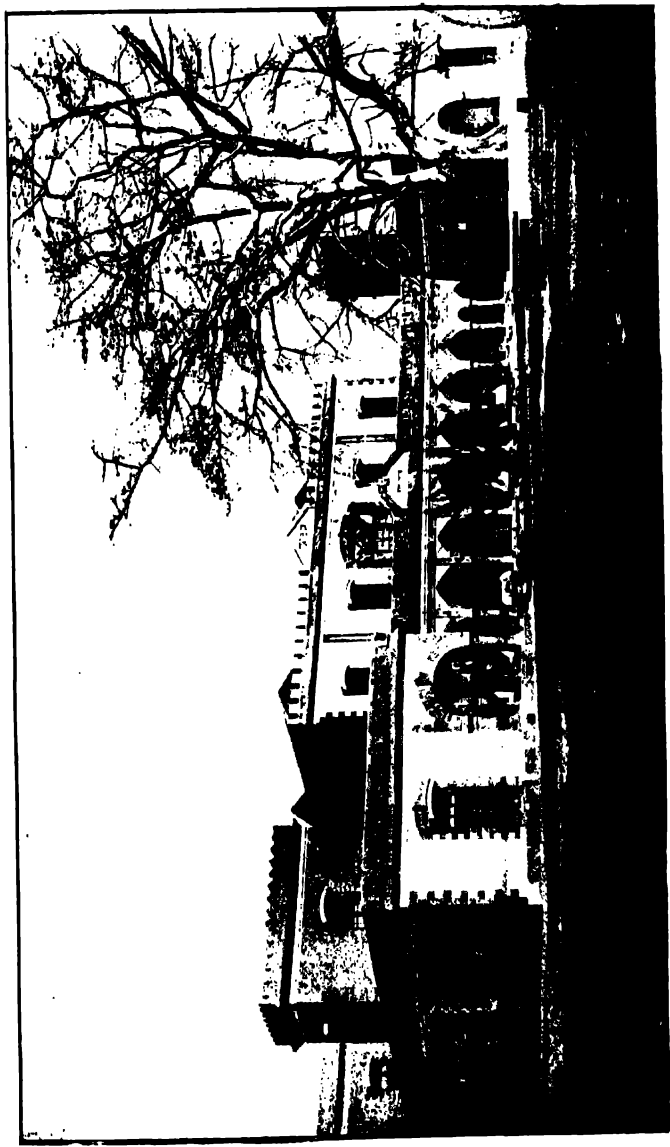
আর্য্যসমাজের গুরুকুল

আমাদের অনেকেই বোধ হয় জানেন না, পঞ্জাবের আর্য্য-সমাজ কি বিপুল অনুষ্ঠানে হাত দিয়াছেন। *

আর্য্যসমাজ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহাঁরা সমস্ত বিষয়েই প্রায় হিন্দুর মত, কেবল "বৈদিকযুগের পরবর্ত্তী হিন্দুসমাজের আচার-অনুষ্ঠান, জাতিভেদ, মূর্ত্তি-পূজা প্রভৃতির বিরোধী।" স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বৈদিক ধর্ম্মই ইহাঁরা সর্ব্বস্থলে প্রচার করিয়া থাকেন।

ইহাঁরা ভারতবর্ষের যুবকবৃন্দের চরিত্র-গঠন মানসে নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন। স্কুল, কলেজ, গুরুকুল প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা তাহারই নিদর্শন।

নাগরী অক্ষর প্রচলন, হিন্দীভাষার প্রবর্ত্তন এবং নিম্নশ্রেণীর উত্তোলন ও মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতিকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করণ ইঁহাদের অন্যবিধ উদ্দেশ্য। এই শেষোক্ত প্রকরণটির নামই শুদ্ধীকরণ। ইহাদ্বারা আর্য্যসমাজিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের জল চলিত না, আর্য্যসমাজে আসিয়া তাহাদের জল চলিতেছে। দেশের মধ্যে দেবনাগর অক্ষর এবং হিন্দীভাষার প্রচলন হওয়ায় ভাষার পার্থক্যও দূরীভূত হইতেছে। নানা প্রদেশের নানা ভাষাভাষী লোকেরা আর্য্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া হিন্দীভাষা শিখিতেছেন। তাই পরস্পরের মধ্যে অবাধ মিলনের সুযোগ ঘটিতেছে।

আর্য্যসমাজের বহুশাখা রেঙ্গুন, মাদ্রাজ, কলিকাতা প্রভৃতি সহরে স্থাপিত হইয়াছে। প্রচার-কার্য্যই এই সব শাখার উদ্দেশ্য। শুনা যায় রামকৃষ্ণ-মিশনের মত আমেরিকা এবং জাপানেও ইহাঁদের শাখা প্রতিষ্ঠা করিবার আয়োজন চলিতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আর্য্যসমাজিগণ স্কুল, কলেজ, গুরুকুল প্রভৃতি স্থাপিত করিয়াছেন। স্কুল কলেজের ছাত্রেরা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়া থাকে। লাহোরের 'দয়ানন্দ এংগ্লো বৈদিক কলেজ', পঞ্জাবের অন্যান্য উচ্চ ইংরাজী স্কুল সমূহ, জলন্ধরের 'কন্যা-মহাবিদ্যালয়' এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু গুরুকুল আশ্রমের ছাত্রগণ সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেয় না। তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই গুরুকুলেরই পরিচয় দিব।

আর্য্যসমাজিগণ প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছেন ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই ভারতবর্ষ উৎসন্ন যাইতেছে। এই গুরুকুলে সেই ব্রহ্মচর্য্যই রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। এতৎসঙ্কল্পে হরিদ্বার কাংড়ির গুরুকুলই বিশেষ কৃতকার্য্যতা দেখাইয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাই তাঁহাদের কথাই থাকিবে।

গুরুগৃহে শিক্ষাদান ভারতবর্ষের একটি বিশেষ আবিষ্কার। ইহারই ফলে ভারতবর্ষের সর্ব্ববিধ শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা আমাদের সেই বিশেষ আবিষ্কারকে এখন অবজ্ঞা করিতে বসিয়াছি। তাহার একমাত্র কারণ—আমরা আমাদের গুরুগৃহকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া তুলিতে সুযোগ ও অবসর পাই নাই।

* গত ফাল্গুনের 'গৃহস্থে' তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইয়াছে। পাঠক তাহা হইতেই অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

এমন কি, অনেকের বিশ্বাস, আমাদের সেই প্রাচীন শিক্ষালয়গুলির দ্বারা বর্ত্তমান যুগের অভাব মোচন একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু বড় সৌভাগ্যের কথা আর্য্যসমাজিগণ সেই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে বসিয়াছেন। তাঁহারা হরিদ্বার কনখলের নিকটবর্ত্তী কাংড়ি গ্রামে, প্রকৃতির একটি রম্যলীলা-ভূমিতে গুরুকুল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

তাঁহাদের উদ্দেশ্য—এই আশ্রমের ব্রহ্মচারিগণ সংযত সবল শিক্ষিত ও ত্যাগী হইয়া ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার প্রকৃত ব্রাহ্মণের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবেন। তাহারা একদিকে বেদ উপনিষদ্ সংস্কৃত সাহিত্য দর্শন পড়িবে অন্যদিকে আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা-সমূহ হিন্দীর মধ্য দিয়া শিক্ষা করিবে। এইরূপ করিতে পারিলেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সার্থক হইবে—নচেৎ নহে। কিছুকাল হইতে বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষাপরিষৎও এই উদ্দেশ্যই কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন।

গুরুকুলে অবস্থিত ব্রহ্মচারী ছাত্রগণ তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন কি উপায়ে গঠন করিতেছে, সে বিষয় জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল হইতে পারে। আমরা নিম্নে তাহাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি, পাঠকগণ ইহা হইতে গুরুকুল সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করিতে পারিবেন।

উর্দ্ধতন ছাত্রগণ প্রতিদিন প্রাতঃকাল ৪ ঘটিকায় এবং নিম্নতন ছাত্রগণ ৪½ ঘটিকায় আশ্রমস্থ ঘণ্টা-নিনাদে শয্যা ত্যাগ করে। তারপর শৌচাদি করিয়া নানা রকম ব্যায়াম, ড্রিল প্রভৃতিতে যোগ দেয়। এই সময় উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক তাহাদিগের সঙ্গে থাকেন। ব্যায়ামান্তে তাহারা গঙ্গায় যাইয়া স্নান করে। স্নানের সময় সন্তরণ অবশ্য করণীয়, এমন কি তাহাতে মধ্যে মধ্যে প্রতিযোগিতাও চলে। ভয়ানক শীতের সময় স্নানাগারেই স্নান করিবার নিয়ম। স্নানান্তে ৫॥০ হইতে ৬টা পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্রহ্মচারীকে সন্ধ্যা অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শাস্ত্রীয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়। তারপর তাহারা দুগ্ধ বা কিছু লঘু পথ্য গ্রহণ করিয়া ৬-১৫ মিনিটে পাঠাগারে আসিয়া সমবেত হয়। ১০॥০ টা পর্য্যন্ত ক্লাস চলে। ১০॥০ টার পরেই প্রাতরাশের সময়। বলা বাহুল্য ব্রহ্মচারীদিগের নিরামিষ ভোজন করিতে হয়। আহারের পরে ২-৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত বিশ্রামের সময়। তখন উর্দ্ধতন ব্রহ্মচারীরা গ্রন্থশালা হইতে পুস্তকাদি লইয়া পাঠ করিতে পারে। ২-৪৫ মিনিট হইতে ৫-১৫ মিনিট পর্য্যন্ত আবার পাঠারম্ভ হয়। গ্রীষ্মকালে অধ্যাপনার সময় দুই এক ঘণ্টা কম হইয়া থাকে। পড়া শেষ হইয়া গেলে—বৈকালে ছেলেরা নানাবিধ ক্রীড়া করে। সন্ধ্যার সময় আবার আহ্নিক, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি সমাধা করিতে হয়। তারপর নৈশাহার। আহারের পর দিনের পাঠ আবৃত্তি করিতে হয়। রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় ঘুমাইবার নিয়ম। ছোট ছেলেরা আধ ঘণ্টা পূর্ব্বেই ঘুমায়।

আহার এবং পাঠ-আরম্ভের পূর্ব্বে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। তাহার অর্থ—

"ওঁ, ভগবান আমাদিগকে (শিক্ষক এবং ছাত্র) রক্ষা করুন। তিনি আমাদিগকে সর্ব্বোচ্চ সুখ ভোগ করিতে দিন, আমরা যেন

পরস্পরের শক্তি (মানসিক ও শারীরিক) বৃদ্ধি করিতে পারি। আমাদের পাঠ যেন সার্থক হয়। আমরা যেন পরস্পরের সহিত শান্তিতে বাস করিতে পারি।"

উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণও পূর্ব্বোক্তভাবে জীবন যাপন করে। কিন্তু তাহাদের কর্ত্তব্য সমাধার জন্য তাহারা নিজে নিজেই দায়ী।

ছাত্রগণকে তাহাদের দৈনন্দিন কার্য্য-লিপি রাখিতে হয়—সেই গুলি আবার প্রতি সপ্তাহে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। রন্ধনশালার কার্য্যও ছাত্রগণ করে—অবশ্য তত্ত্বাবধায়কের অধীনে এবং চিকিৎসকের অনুমোদনে। তাহাদিগকে এইরূপে গৃহস্থালী শিখান হয়। অধ্যাপকদিগের মধ্য হইতেই একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।

নৈতিক শিক্ষাসম্বন্ধে গুরুকুলের বন্দোবস্ত খুব সুন্দর। অধ্যাপকদিগের সহিত নিরন্তর সহবাসে এবং চরিত্রগঠনোপযোগী নানারূপ কার্য্য করিলেই নীতিশিক্ষা হয়, কতগুলি নীতিকথা মুখস্থ করিয়া কোনই ফল নাই। ইহাই ভারতবর্ষের চিরন্তন নিয়ম। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ও কিছুকাল ধরিয়া বাঙ্গালাদেশে এই মত প্রচার করিতেছেন। এখানে ছাত্রগণ বাহিরের অনিষ্টজনক প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অধ্যাপকদিগের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করে—তাঁহাদিগকে সকল সৎকর্ম্মের পথপ্রদর্শক বলিয়া মনে করে। তাহাদের পাঠ প্রণালী, তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা, তাহাদের খেলাধূলা এমন সুনিপুণভাবে চালিত হয় যে, তাহারা কোন বিষয়েই কষ্ট মনে করে না। সকল স্থলেই শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য ও আনন্দ অব্যাহত থাকে। ভারতের এইরূপ প্রাচীন গুরুগৃহকেই লর্ড কর্জ্জন তাঁহার স্মরণীয় ঢাকা-বক্তৃতায় প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন ভারতবর্ষের ছাত্রদের পক্ষে ইহার পুনঃপ্রবর্ত্তন যত শীঘ্র হয়, ততই মঙ্গল। বস্তুতঃ গুরু যেখানে শিক্ষার্থীকে সুখ-দুঃখ-হর্ষ-আমোদে পরীক্ষা করিতে পারেন, তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তির নিয়ন্তা হন—তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন, সেখানেই ছাত্রের শিক্ষা সার্থকতা লাভ করে। ভারতবর্ষের পল্লীতে পল্লীতে তাই গুরুগৃহের প্রয়োজন হইয়াছে।

সকল সময় মনে রাখিতে হইবে এই গুরুগৃহ আমাদের নিজের দ্বারা সৃষ্ট—নিজেরই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই; নতুবা সুফলের আশা বড় কম। শিক্ষাদানের এই জীবন্ত উৎসগুলি পরের হাতে তুলিয়া দিলে দেশের প্রধান প্রধান শিক্ষাতত্ত্ববিৎ ও পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মপ্রবৃত্তি লুপ্ত হইয়া যাইবে। ছাত্রগণ দেশকে বুঝিবেনা—দেশের জন্য গৌরব অনুভব করিবে না, সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রহীনও হইয়া পড়িবে। তাই হরিদ্বারের গুরু-কুল, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়, বঙ্গের জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্, ভারতবর্ষের টোল-চতুষ্পাঠীসমূহ যতদিন নিজের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে পারিবে, ততদিনই দেশের মঙ্গল। আমরা যেন আত্মশক্তির উপর বিশ্বাসবান হই—কোন কিছু সাময়িক মোহ, লোভ বা ক্ষণিক সফলতা, বা উত্তেজনার বশেই যেন নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া না বসি।

সুখের কথা, গুরুকুল আর্য্যসমাজিগণের আত্মশক্তির দ্বারা প্রবর্ত্তিত—আত্ম-

শক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত—আত্ম-শক্তি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। সেই জন্য ইহা দিন দিন উন্নত হইতেছে, দিন দিন সার্থকতার পথে যাইতেছে। ইহার অন্তর্গত সমস্ত বিভাগগুলির বিবরণ দিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

পুস্তকাগার ও পাঠাগার

গুরুকুলের অধীনে একটি গ্রন্থশালা আছে। তাহাতে প্রায় ৬০০০ উত্তম পুস্তক রক্ষিত। অনেক আলমারিতে প্রধান প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থ—বেদ, ব্রাহ্মণ, আর্য্য সাহিত্য প্রভৃতি আছে। ইংরাজী পুস্তকের সংখ্যাও এখানে কম নহে। ইতিহাস, জীবনচরিত, শিক্ষা-বিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু পুস্তক আছে। পাঠাগারে দেশী ও বিলাতী, সংস্কৃত ও ইংরাজী নানা রকম পত্রিকা রক্ষিত হয়। অবসরমত ছাত্র ও শিক্ষক সেইগুলি পাঠ করেন।

আলোচনা-সমিতি

উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর ছাত্রগণের মধ্যে কতগুলি ইংরাজী সংস্কৃত ও হিন্দী আলোচনা-সমিতি আছে। সংস্কৃত ভাষাকে উৎসাহ দিবার জন্য একটি সংস্কৃত-উৎসাহিনী সভা আছে। সপ্তাহে একদিন তাহার বৈঠক হয়। বক্তৃতাগুলি সংস্কৃতে হইয়া থাকে। সমস্ত সমিতিগুলিই আচার্য্য এবং প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে চালিত হয়। ছেলেদেরও একটি সংস্কৃত উৎসাহিনী সভা আছে—তাহা হইতে একখানি সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

সাহিত্য-পরিষদ্

গুরুকুল আশ্রমে একটি সাহিত্য-পরিষদ আছে। প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাস ও সাহিত্যের প্রতি যাহাতে লোকের অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, যাহাতে লোকে সংস্কৃত ভালরূপে বলিতে ও লিখিতে পারে, যাহাতে সংস্কৃত এবং আর্য্য ভাষায় (অর্থাৎ হিন্দী ভাষা) ভাল গ্রন্থ লিখিত হয়, তাহার বন্দোবস্ত করাই এই পরিষদের উদ্দেশ্য। শিক্ষাপ্রচারের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সাহিত্যালোচনার অনুষ্ঠান যুক্ত হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয় মনে করি। বঙ্গদেশে মালদহ-জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি এই উভয়বিধ কার্য্যে এক সঙ্গে হস্তক্ষেপ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইরূপ কার্য্যারম্ভ নানা স্থানে হইতেছে জানিলে সুখী হইব। এই পরিষদ্ হইতেই 'সারস্বত সম্মিলন' বৎসর বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাহাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে পণ্ডিতগণকে সভাপতিত্বে বরণ করিয়া আনা হয়। এই সারস্বত সম্মিলনেই বঙ্গদেশের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন এম, এ মহাশয়দ্বয় বিভিন্ন বারের বৈঠকে সভাপতি হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সাহিত্য-পরিষদ্ কেবলমাত্র গুরুকুলাশ্রমের ব্রহ্মচারীদিগের উপকার করে না—সাধারণেরও উপকার সাধন করে। হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠাতারা এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের মাতৃভাষার জন্য উদ্যোক্তারা যাহা করিতেছেন আর্য্য-সমাজের এই শিক্ষালয়টি স্বতন্ত্রভাবেও তাহাই করিতেছেন।

সাধারণতঃ এই পরিষদে যে সব বৈঠক হয়, তাহাতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং দর্শন প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি পঠিত ও আলোচিত হইয়া থাকে।

অধ্যাপক সভা

তারপর গুরুকুলে "অধ্যাপকসভা" নামে একটি সমিতি আছে। একপক্ষ অন্তর ইহার বৈঠক বসে, এবং অধ্যাপনা সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হইয়া থাকে। এই সভা হইতেই প্রাচীন তন্ত্রের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণকে নব্য-তন্ত্রের শিক্ষা ও বিদ্যালয়-পরিচালনা-প্রণালী শেখান হয়।

চিকিৎসালয়, গোশালা, বাগান

গুরুকুলের অধীনে একটি দাতব্য চিকিৎ-সালয়, একটি গোশালা এবং একটি সবজীবাগান আছে। চিকিৎসালয়ের ঔষধাদি গুরুকুল এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে বিতরিত হয়, এবং গোশালার দুধ ও সবজীবাগানের তরীতরকারী, ফলমূল প্রভৃতি ব্রহ্মচারীদিগের প্রয়োজনেই লাগে।

শিল্প

এতদ্ব্যতীত এখানে একটি তাঁত খোলা হইয়াছে। ব্রহ্মচারিগণ তাহার প্রস্তুত কাপড়ই পরিধান করিয়া থাকেন।

গুরুকুলের ছাত্র

প্রতি বৎসর এই গুরুকুল হইতে শিক্ষা পাইয়া বহু ছাত্র বহির্গত হইতেছেন। বলা বাহুল্য তাঁহারা কোনরূপ সরকারী চাকরী বা সরকারানুমোদিত কোনরূপ কার্য্য করিতে অনধিকারী, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা দুঃখিত নহেন। কারণ আর্য্য-সমাজ তাঁহাদিগকে দেশের নানা কল্যাণ কর্ম্মে ব্রতী রাখিতে সমর্থ। এই সমস্ত ছাত্রেরাই আর্য্য-সমাজের বিদ্যালয়ে অধ্যাপক হন। ইহাঁরাই বৈদিক ধর্ম্ম, হিন্দী ভাষা, নাগরী অক্ষর দেশের নানাস্থানে প্রচার করিয়া ফেরেন। ইহাঁরাই নিম্নশ্রেণীর উত্তোলন, শুদ্ধীকরণ প্রভৃতি আর্য্য-সমাজের উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা পান।

এইরূপ নিঃস্বার্থ কর্ম্মের উপযুক্ত করিতে হইলে ছাত্রদিগকে কি প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য সহজেই তাহা অনুমেয়। গুরুকুল সেই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। আর্য্য-সমাজের গুরুকুলগুলি সত্যসত্যই দেশের যাবতীয় কর্ম্মক্ষেত্রের ভার লইবার উপযুক্ত কর্ম্মবীর প্রস্তুত করিবার কারখানা স্বরূপ। যুক্ত প্রদেশের ছোটলাট বাহাদুর স্যার জেম্স্ মেষ্টন সাহেব সেদিন এই গুরুকুল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গিয়াছেন। সরকারী কাগজ-পত্রে ইহাকে বিষম ভীতির কারণ বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে, সেইজন্য তিনি নিজে ইহা দেখিতে আসিয়াছিলেন। সুখের কথা, তিনি ইহা দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "...এখানে—এই ভীষণ বনের মধ্যে একদল কর্ত্তব্যপরায়ণ সন্ন্যাসী প্রাচীন ঋষিদিগের রীত্যনুসারে নূতন বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষাদান-কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। এই কার্য্যের জন্য তাঁহারা কিছুমাত্র অর্থ প্রত্যাশা করেন না! এখানকার ছাত্রগণ বেশ সুস্থ, সবল, সুশীল, রাজভক্ত, সত্যবাদী এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ। অতি সুন্দর খাদ্যে তাহাদের শরীরের পরিপুষ্টি হইতেছে—তাহাদের সুখেরও ইয়ত্তা নাই।"

আমরা ছোটলাট বাহাদুরের এই সদাশয়তায় বড়ই প্রীত হইয়াছি। আমাদের স্বদেশী আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও যদি সরকারী কাগজে কোন বিকৃত ধারণা থাকে, তাহাও এইরূপেই দূরীভূত হইবে। বঙ্গের জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্, বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রভৃতিও বহুদিন হইতে পুলিশের সন্দেহ-দৃষ্টিতে পড়িয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি লর্ড কার্মাইকেল মহোদয়ের মাহাত্ম্যে তাহা বিদূরিত হইয়াছে। ইহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই।

বাস্তবিক পক্ষে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সৎকর্ম্মকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। আর বিশেষত যে কর্ম্মের আদর্শ পরানুকরণে প্রবর্ত্তিত হয় নাই—যে কর্ম্মের প্রণালী স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত—যে কর্ম্মের প্রতিপালনে চিত্তের স্ফূর্ত্তি, অন্নের স্বাধীনতা, স্বাস্থ্যের লাবণ্য অক্ষুন্ন থাকে, তাহার আদর সর্ব্বত্র হইবেই। তাই গুরুকুল বহু উচ্চ শিক্ষিত ইংরাজ ও দেশীয় ব্যক্তিবৃন্দ দ্বার এত প্রশংসিত।

কিন্তু অনায়াসেই এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহার জন্য বহু কষ্ট করিতে হইয়াছে। যে স্থানে আজ এই গুরুকুল অবস্থিত, সেস্থানটি পূর্ব্বে ভীষণ দুর্গম জঙ্গলে আবৃত ছিল। এমন কি ইহার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মাজী মুন্সীরাম সেই জঙ্গলে পথ হারাইয়া বহুকষ্টে গন্তব্যস্থানে পৌছিয়াছিলেন। চারিদিকে ভীষণ হিংস্র জন্তুরও প্রাদুর্ভাব ছিল। যে সব মজুরেরা এই জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছিল, তাহারা রাত্রে কিছুতেই সেখানে বাস করিতে পারিত না। মহাত্মাজী মুন্সীরাম নিজে অনবরত তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। শেষে ধীরে ধীরে জঙ্গল পরিষ্কার হইয়া গেল, এবং বর্ত্তমান আশ্রমটির উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত হইল। ইহার প্রতিষ্ঠাকল্পে অর্থসংগ্রহের জন্য কিরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহাও ভাবিবার বিষয়। কিন্তু সাধু উদ্দেশ্য এবং অদম্য শক্তির কাছে কিছুই অসম্ভব নহে।

আজ গুরুকুল একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশে পর্য্যবসিত। এই উপনিবেশটি নিজেই নিজের অন্নবস্ত্র যোগাইয়া থাকে—নিজেই নিজের সমস্ত ভার বহন করিয়া থাকে। কিছুতেই এখানে পরমুখাপেক্ষী হইবার প্রয়োজন নাই।

ভারতবর্ষের পল্লীসমূহকে এই গুরুকুলের আদর্শে আত্মনির্ভর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা প্রত্যেক দেশহিতৈষীর একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। যত দিন আমরা খাঁটী "পল্লীসেবক" না হইতে পারিব, ততদিন আমাদের উন্নতির আশা নাই, ইহা নিশ্চিত।

উপসংহারে গুরুকুল সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ইহার প্রতিষ্ঠাতারা যে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহা ভারতবর্ষের আর কোথায়ও অনুসৃত হইতেছে কি না জানি না। পঞ্চনদের দয়ানন্দ য়্যাংগ্লো বেদিক কলেজে লালা হংসরাজের ন্যায় ত্যাগী শিক্ষাব্রতধারী অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রের ফার্গুসন কলেজে শ্রীযুক্ত পারঞ্জপাই মহোদয়ের ন্যায় ত্যাগবীর শিক্ষাপ্রচারক কর্ম্ম করিতেছেন। সাধারণতঃ এই দুইটি প্রতিষ্ঠানকে সমগ্র ভারতবর্ষের লোক আদর্শ জাতীয় প্রতিষ্ঠানস্বরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু হরিদ্বারের গুরুকুল-প্রতিষ্ঠায় যে স্বাধীন সংকল্প ও স্বায়ত্তকর্ম্মের আদর্শ

বিদ্যমান এই দুইটি বিদ্যালয়ে তাহার কোন পরিচয় নাই। গুরুকুলের সঙ্গে যদি ভারতবর্ষের অন্য কোন শিক্ষালয়ের তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎই তাহার সমকক্ষ। আর্য্যসমাজের 'গুরুকুল' এবং বাঙ্গালীর 'জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ' কেবলমাত্র এই দুইটি শিক্ষালয়ই ভারতবর্ষে শিক্ষাপ্রণালীর স্বাধীনতা, কর্ম্ম-পরিচালনার স্বাতন্ত্র্য এবং ছাত্রজীবনের অভিনব উচ্চ আদর্শ ও লক্ষ্য প্রচার করিয়া আসিতেছেন। এজন্য এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের সফলতা ও কৃতকার্য্যতা অন্যান্য সাধারণ স্কুল-কলেজের হিসাবে মাপা যাইবে না। ইঁহাদের আদর্শ সম্পূর্ণ বুঝিতে হইলে ভারতবাসীকে এখনও বহুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম্, এ,
অধ্যাপক—ধনবিজ্ঞান, কৃষ্ণনাথ কলেজ
বহরমপুর।

ভারতের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ

আমাদের দেশে দুই শ্রেণীর শিক্ষিত লোক আছেন। এক শ্রেণীর শিক্ষালাভ ইংরাজী ধরণে পরিচালিত স্কুল-কলেজে হইয়া থাকে, এবং অপর শ্রেণীর আমাদের সনাতন আদর্শে পরিচালিত গুরুগৃহে বা টোল-চতুষ্পাঠী পাঠশালায় হয়। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সম্প্রদায় শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। ইঁহারা যাহা কিছু অধ্যয়ন করেন, সমস্তই সংস্কৃতের সাহায্যে। সংস্কৃতের প্রতি ইঁহাদের অনুরাগ এত প্রবল যে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অপর ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি পাঠে ইঁহাদের আদৌ প্রবৃত্তি হয় না, শ্রদ্ধাই উৎপন্ন হয় না। জ্যোতিষ, দর্শন, গণিত প্রভৃতি যে যে বিষয় সংস্কৃতে নিবদ্ধ আছে, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ তৎসমুদয় এখনও আদরের সহিত আলোচনা করিয়া থাকেন। কোন নিকৃষ্ট বিষয়ও সংস্কৃতে লিখিত হইলে ইঁহারা তাহা আদর করিয়া আলোচনা করেন, কিন্তু কোন উৎকৃষ্ট বিষয়ও ভাষান্তরে আসিলে তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। পুরাকাল হইতে বংশপরম্পরায় সংস্কৃত আলোচনা করায় তাহার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ রক্তের অণু-পরমাণুতে মিশ্রিত হইয়া এইরূপ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বকাল হইতেই সংস্কৃত ভাষার প্রতি ব্রাহ্মণপণ্ডিত সম্প্রদায়ের এইরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ থাকাতে ভারতের গৌরবাবহ বহু বহু রত্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং আশা করা যায় সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে। সংস্কৃতকে ছাড়িয়া দিলে এখন আর ভারতের নিজস্ব বলিতে তেমন কিছু নাই।

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন ইঁহাদের সম্বন্ধে একটি গুরুতর বিষয় আলোচনার জন্য রহিয়াছে। ইঁহাদের সংখ্যা যদি অল্প হইত, অথবা ইঁহারা অধিকাংশই যদি জড়বুদ্ধি হইতেন, তাহা হইলে ইঁহাদের প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়া কিছুদিন কাটাইলেও চলিতে পরিত, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কলিকাতার আদ্য, মধ্য ও উপাধি-পরীক্ষায় এত বিদ্যার্থী উপস্থিত হয় যে, তাহাদের সমষ্টি কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্রবৃন্দের সংখ্যা হইতে অনেক বেশী দেখা গিয়াছে। কলিকাতার এই সকল সংস্কৃতবিদ্যার্থী বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে আসিয়া থাকে। আমরা বিশেষরূপে জানি দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃতবিদ্যার আলোচনা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে অনেক অধিকরূপে হইয়া থাকে। এইরূপে দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে সমগ্র ভারতে সংস্কৃতবিদ্যার্থীর সংখ্যা আজকাল কত অধিক হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণ জনগণের পরিচিত না হইলেও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতসমূহের মধ্যে যে অনেকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি আছেন ইহা না বলিলেও চলে।

ইহা ছাড়া, কালের গতি যাহাই হউক না কেন, বিশাল হিন্দুজাতি ও হিন্দুসমাজের উপর এখনও যে তাঁহাদের অনেক প্রভাব রহিয়াছে, এবং তাঁহারা যে এখনও সমাজের অনেক উপকার করিতেছেন ও সুযোগ পাইলে আরও অধিক করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ দেশের এখনও যে কার্য্য করিতে-ছেন, ইংরাজী শিক্ষিতগণেরও তাহা সর্ব্বদা অনুকরণীয়। শিক্ষা প্রচারই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণের মুখ্য কার্য্য, তাহা তাঁহারা করিতেছেন। নিঃস্বার্থভাবে স্থান দিয়া অন্ন দিয়া তাঁহারা দারিদ্র্যজ্বালায় পীড়িত হইলেও দেশের সহস্র সহস্র বালককে বিদ্যা দান করিতেছেন। 'টাকা না পাইলে পড়াইব না',—এই আসুর-ভাব স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেও এখনও তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে আক্রমণ করিতে পারে নাই। তাঁহাদের নিকটে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য উপস্থিত হয়, তাহারা অধিকাংশই চাকরী লক্ষ্য করিয়া গমন করে না, এবং শিক্ষিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালেও ঐ ভাবকেই মুখ্যরূপে হৃদয়ে পোষণ করে না। পূর্ব্ব-পরম্পরাক্রমে গুরুশিষ্য-সম্প্রদায় অনুসরণ করিয়া শিক্ষাপ্রচারই তাঁহাদের উদ্দেশ্য থাকে এবং তাহারই দ্বারা যথাকথঞ্চিৎ জীবিকানির্ব্বাহ করেন। দেশের সর্ব্ববিধ শিক্ষাপ্রচারের জন্য এইরূপ একটি সম্প্রদায় যে অত্যাবশ্যক, তাহা সহজেই বুঝা যায়, এবং ভারতের বিশেষ সৌভাগ্য যে, সে ইহা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। অতএব যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণের সহিত দেশের এইরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাঁহাদের কল্যাণ-অকল্যাণ ও উন্নতি-অব-নতিতে দেশেরও তৎসমুদয় অবশ্যম্ভাবী, তাহা বলাই বাহুল্য।

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ পবিত্র শিক্ষকের আসনে অধিরূঢ় আছেন, তাঁহাদিগকে সেইরূপই থাকিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাদিগকে এজন্য অধিকতর যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে। ভারতের যে প্রাচীন শিক্ষাভাণ্ডার আছে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তাহা অধিকার করিয়াছেন। এইবার তাঁহাদিগকে দেশদেশান্তরের শিক্ষা-সমূহ সঞ্চয় করিয়া, এবং স্বদেশেও যে যে বিদ্যা নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎসমুদয়কে সংগ্রহ করিয়া, ঐ প্রাচীন শিক্ষাভাণ্ডারের বৃদ্ধি-সাধন করিতে হইবে। . জ্যোতিষ, পুরাতন গণিত পূর্ব্বে ভার... বা দেশান্তরে যাহা যাহা প্রচলিত ছিল, সংস্কৃত ভাষায় তৎ-সমুদয় [illegible] ইয়াছিল। ব্রাহ্মণ [illegible]ণ্ডিতগণ তাহা অনায়াসে [illegible]কার করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পর ঐ সমস্ত শাস্ত্রের আলোচনায় যে

সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে গুলি সংস্কৃতে সংগৃহীত হয় নাই, অতএব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণও তাহা আর জানিতে পারেন নাই। তাই আর্য্যভট্ট ও ভাস্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী জ্যোতিষিক তত্ত্বসমূহে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতসমাজ অন্ধ রহিয়াছেন। বরাহ মিহিরের পরে নূতন বৃহৎসংহিতা লিখিবার প্রয়োজন হইয়াছে, কিন্তু লোক নাই, ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজও তাই সে সম্বন্ধে কিছু জানেন না। তর্ক ও দর্শন-বিদ্যায় ভারতীয় পণ্ডিতগণ সুপ্রসিদ্ধ। পাশ্চাত্য তর্কদর্শনের কথা তাঁহাদের নিকট পৌঁছে না, পৌঁছিলে তাঁহারা ঐ সকল বিদ্যায় আরও কত উন্নতি করিতে পারিতেন। চতুষ্পাঠীতে ন্যায়-বেদান্তাদির সঙ্গে সঙ্গে কান্ত-হিগেল প্রভৃতিরও দর্শন আলোচিত হইত। বিদ্যার অন্যান্য শাখাসম্বন্ধেও এই কথা। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতসমাজকে এই সকলের সহিত পরিচিত হইয়া উঠিতে হইবে। তাঁহারা যদি এই সকল পাশ্চাত্য গণিত, জ্যোতিষ, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ হইয়া উঠেন, তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে আমাদের প্রাদেশিক ভাষা-সমূহও সমৃদ্ধ হইবে, তাহা হইলেই ঐ সকল পাশ্চাত্য গ্রন্থের অনুবাদ সহজ হইয়া পড়িবে। সংস্কৃতের সাহায্য ব্যতিরেকে উহার কোনও সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা প্রাদেশিক ভাষায় পাশ্চাত্য বিদ্যাসমূহকে অনুবাদ করিবার পক্ষপাতী, তাঁহারা এইরূপে বহু কর্ম্মী লাভ করিতে পারিবেন। সহস্র সহস্র সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেখিতে দেখিতে কত কাজ সম্পন্ন করিয়া ফেলিতে পারিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর অনেক ছাত্র দর্শন-পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত সফলতা লাভ করিয়া বাহির হইতেছেন, কিন্তু কয়জন কয়খানি পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে প্রাদেশিক ভাষায় পুস্তক লিখিয়াছেন? ইঁহারা যে সেই বিষয় অনভিজ্ঞ বলিয়া করিতে পারিতেছেন না, তাহা নহে; তাহাতে তাঁহাদের গভীর পাণ্ডিত্য আছে, ইংরাজী ভাষায় তাহা তাঁহারা জলের মত লিখিয়া দিতে পারেন, কিন্তু বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তি বস্তুতই তাঁহাদের অনেকের জন্মে না। তাহার একমাত্র কারণ—ঐ বিদ্যা বিজাতীয় ভাষায় থাকা হেতু আমাদের নিকট বিজাতীয়ই রহিয়া গিয়াছে। আমাদিগকে তাহা নিজের করিয়া লইতে হইবে। আমাদের সেই নিজের ভাষা সংস্কৃত। পাশ্চাত্য বিদ্যাসমূহ যদি এদেশে আনিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমে সংস্কৃতেরই সাহায্যে আনিতে হইবে তাহার পর তাহাকে প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে। ইহাতে এক দিকে যেমন বিদ্যা প্রচার ও রক্ষণের সুব্যবস্থা হইবে, অপর দিকে তেমনি অতিরিক্ত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম নিবারিত হইবে। মহারাষ্ট্রে বসিয়া যদি কোন ব্যক্তি পাশ্চাত্য জ্যোতিষ বা গণিত স্বভাষায় অনুবাদ করিতে বসেন, বঙ্গবাসীর তাহাতে তেমন কোন লাভ নাই, এ দিকে এক জন বঙ্গবাসীকেও তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া খাটিতে হইবে। উভয়কেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে, উভয়েরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যয় হইবে, একের দ্বারা অপরের তেমন উপকারের সম্ভাবনা থাকিবে না। এই পন্থায় চলিলে সুদীর্ঘকালেও পাশ্চাত্য বিদ্যা এ দেশের নিজস্ব বলিয়া পরিগণিত হইবে না। জাপানে একটা ভাষা সেই এক

ভাষাতে অতি অল্পকালেরমধ্যে জগতের সমস্ত বিদ্যা আনীত হইয়াছে। ভারতে তাহা নহে, এখানে অনেক ভাষা। এ ক্ষেত্রে ভারতের সমগ্র প্রদেশের সাধারণ ভাষা সংস্কৃতকেই অবলম্বন করা আমাদের উচিত। ইহাকে অবলম্বন করিয়া, ভারতের যে কোন প্রদেশের লোক কার্য্য আরম্ভ করুন না, তাঁহার পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ের ফল সমগ্র ভারতবাসী সমভাবে ভোগ করিতে পারিবে।

সংস্কৃত শিক্ষা না করিলে ভারতের কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকেই যথার্থ শিক্ষিত বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। অতএব সংস্কৃত আলোচনা আরও বাড়াইতে হইবে। সরল ভাষায় নব নব বিষয়ে ইহাতে পুস্তক রচনা করিতে হইবে এবং তাহা করিতে হইলে যাঁহারা সংস্কৃত ও ইংরাজী উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ ইংরাজী গ্রন্থবর্ণিত তত্ত্বসমূহ সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে সমর্থ, তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে বিশেষরূপে কার্য্য করিতে হইবে।

আমরা জানি কিছু দিন পূর্ব্বে এই উদ্দেশ্যই হৃদয়ে পোষণ করিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, সাহিত্যাচার্য্য রামাবতার পাঁড়ে এম, এ প্রভৃতি কয়েক জন কৃতবিদ্য পুরুষ কাশীতে "মিত্রগোষ্ঠী" নামে একটি সংস্কৃত মাসিক প্রচার করিতেছিলেন। যদিও সে সমিতি বা পত্রিকা এখন নাই, তথাপি তাহার কার্য্য একবারে শেষ হয় নাই। কলিকাতা ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাভূষণ, বি, এ, বি, এস্ সি, মহাশয় "মিত্রগোষ্ঠীর" যখন সভ্য ছিলেন, তখন হইতেই পাশ্চাত্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সংস্কৃতে লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যদিও তিনি তাহাতে বহুদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, তথাপি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিবিধ বিদ্যা আলোচনা করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় উদ্ভিদ সম্বন্ধে তিনি যে গভীর গবেষণা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্ব প্রথমে "অন্নদা নিঘণ্টু" নাম দিয়া সংস্কৃতেই লিখিয়াছেন। তাহা হইতেই ইংরাজী অনুবাদ করিয়া কিয়দংশ Economic Botany of India নামক পুস্তকে বাহির হইয়াছে, এবং সম্পূর্ণভাবে হিন্দু-সাহিত্য প্রচারক শ্রীযুক্ত মেজর বামনদাস বসু আই, এম, এস্, এবং মহারাষ্ট্রের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত লেপ্টেনাণ্ট কার্ণেল কীর্ত্তিকার মহোদয়গণের লেখার সঙ্গে Indian Medicinal Plants নামক সুবৃহৎ পুস্তকে বাহির হইতেছে। দুঃখের বিষয় সংস্কৃত "অন্নদা নিঘণ্টু" হস্ত লিখিত অবস্থাতেই এখনও পড়িয়া রহিয়াছে।

পণ্ডিত রামাবতার পাঁড়ে এ বিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতের সমস্ত ইতিহাস সরল সংস্কৃত পদ্যে লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশান্তরেরও ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি বিষয়ের অবশ্য জ্ঞাতব্য তত্ত্ব এবং ইতিবৃত্তগুলিও তিনি রচনা করিয়াছেন। তাহার এই সকল সন্দর্ভ "বাঙ্ময়ার্ণব" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে মুদ্রিত হইতেছে।

আশা করি, অধ্যাপক রামাবতারের সাধু প্রয়াস শিক্ষিত ভারতবাসীর নিকট আদৃত হইবে। তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে সমগ্র ভারতের বিশাল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান,

প্রাণ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ধন-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের উপদেশাবলী অতি সহজে প্রচারিত হইতে পারিবে। আমাদের শিক্ষা-প্রচারক এবং সাহিত্যপ্রচারকগণকে এই কার্য্যের সার্থকতা যুক্তি দ্বারা বুঝাইবার আর প্রয়োজন নাই। যাঁহারা সমাজের সেবায় রত হইতে চাহেন, তাঁহারা একটা অভিনব কর্ম্মক্ষেত্র পাইবেন। অধ্যাপক রামাবতারের আদর্শে কতিপয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচারে ব্রতী হউন। বঙ্গদেশ হইতে শীঘ্রই অন্ততঃ একখানা উপযুক্ত সংস্কৃত মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে দেখিলে সুখী হইব। বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ, অনেক সময় বৃথা নষ্ট করিতেছেন—আর বিলম্ব করিবেন না। যে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন কিছুকাল তাহা প্রচার করিয়া জীবন ধন্য করুন।

আমাদের শাসন-কর্ত্তারা আজকাল ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অনুসন্ধানে উৎসাহ দিতেছেন, এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষ আগ্রহের সহিত আলোচনা করিতেছেন। সংস্কৃত-শিক্ষার সাহায্যের জন্য এবং পণ্ডিতদিগের নানাবিধ সুবিধা সৃষ্টি করিবার জন্য তাঁহারা উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। কার্য্যফল কিরূপ হইবে—তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। আমরা এ সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করিব। কলিকাতার বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ কর্ত্তৃক পরিচালিত মাসিক 'ব্রাহ্মণ-সমাজ' পত্রিকায় এ বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এবার তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত-শিক্ষার উন্নতিকল্পে সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন—এই সংবাদে আমাদের আশা ও আশঙ্কা সমভাবে উপস্থিত হইয়াছে। ধর্ম্মের সহিত এই আশা ও আশঙ্কা বিজড়িত বলিয়া আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করিতেছি।

হিন্দুরাজত্বের সময়ের কথা ধরিব না,—মুসলমান-রাজত্ব সময়েও সংস্কৃত বিদ্যার সবিশেষ উৎকর্ষ ছিল। বাঙ্গালার বিদ্যাগৌরব মুসলমান রাজত্বের সময় অধিকতর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল; তাহার কারণ একদিকে যেমন ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মানুরাগমূলক বিদ্যার্জ্জনে একাগ্র যত্ন, অন্যদিকে সেইরূপ মুসলমান রাজগণের অপূর্ব্ব বদান্যতাও সম্যক উল্লেখযোগ্য।

বিশাল দ্বারবঙ্গ-রাজ্য একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিতের বিদ্যার্জ্জিত সম্পত্তি। দাতা দিল্লীর মুসলমান বাদসাহ। একটি বৃহৎ সম্পত্তির উল্লেখ করিলাম, এতদ্ভিন্ন বহু ভূসম্পত্তি মুসলমানরাজগণ পণ্ডিতগণকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে হিন্দু-জমীদারেরাও পণ্ডিত রক্ষায় যত্নবান ছিলেন। এই কারণে সে সময়ে সংস্কৃতবিদ্যার উজ্জ্বলপ্রভা বিকীর্ণ হইয়াছিল। মিথিলায় গঙ্গেশোপাধ্যায়, পক্ষধর মিশ্র, স্মার্ত্ত বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতবৃন্দ মুসলমান শাসন সময়েই প্রাদুর্ভূত। বাঙ্গালায় বাসুদেব, রঘুনাথ, মথুরানাথ, জগদীশ, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন প্রভৃতি পণ্ডিতবৃন্দও মুসলমান শাসনের সময়েই আবির্ভূত। মুসলমান শাসনের অবসানে দেশীয় ভূস্বামিগণের বিদ্যানুরাগফলে সংস্কৃত চর্চ্চা কিছুদিন চলিয়াছিল, ভাঁটা

পড়িতে আরম্ভ হইলেও জোয়ারের টান তখনও ফিরে নাই। দেশে অনেক পণ্ডিত বিদ্যার প্রভাবে দিগন্ত-বিশ্রুত কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত-বিদ্যা-ভাগীরথীতে 'সারানি' ভাঁটা পড়িয়াছে, বেজায় বেগ, হুহু রবে জল সরিয়া যাইতেছে।

অধ্যাপকবংশ বিলুপ্ত প্রায়। ৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, ভরতচন্দ্র শিরোমণি প্রভৃতি অধ্যাপকগণের বংশধরেরা ইংরাজীনবিশ হইয়াছেন। অধিক কি এদেশে বর্ত্তমান সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের মধ্যে কেবলমাত্র ২।৩টি অধ্যাপকের পুত্র আগ্রহের সহিত শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেছেন। শাস্ত্রাধ্যয়ন-ত্যাগের মূলকারণ—অন্নাভাব। অন্নাভাবে একদল সংস্কৃত-চর্চ্চা ছাড়িয়া ইংরাজীর দ্বারস্থ হইলেন—তাঁহাদের অন্নচিন্তা দূর হইল—ধন-সম্পত্তিও হইল। আর একদল দেখাদেখি সেই পথের অনুসরণ করিলেন। পরে অন্নচিন্তা দূর হউক বা না হউক গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় এক পথে সকলেই ধাবিত হইল। ইংরাজী-শিক্ষার সুফলের পরিবর্ত্তে দেশ অধিক পরিমাণ কুফল গ্রহণ করিল। তাহার ফলে, অর্থলোভই সমাজে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।

এই অবস্থায় আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত মন্ত্রণাদাতার পরামর্শে সংস্কৃত-শাস্ত্র-চর্চ্চা বৃদ্ধির জন্য মনোযোগী হইয়াছেন। উপাধি এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষা প্রবর্ত্তনে তাহার চিহ্ন দেখা গিয়াছে। তাহার পর পণ্ডিত-কন্‌ফারেন্স বসাইয়া নানাস্থানে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া শাস্ত্রচর্চ্চা-বৃদ্ধির জন্য গভর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইয়াছেন। রাজকীয় অর্থ-সাহায্যের প্রভাবে যে বিদ্যানুশীলন মুসলমান-শাসনের সময়ে অধিকতর ছিল, তৎপরে রাজকীয় সাহায্যের অভাবে মন্দীভূত হইয়াছিল। এখনও রাজকীয় সাহায্য প্রভাবে পুনরায় যে বর্দ্ধিত হইবে, মুসলমান শাসন কালের ন্যায় এ সময়েও আমরা আবার গঙ্গেশ রঘুনাথ বাচস্পতি রঘুনন্দন প্রভৃতির ন্যায় প্রতিভা-শালী সুপণ্ডিতের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাইব, এমন আশা করিতে পারি। সেই আশার ক্ষণিক বিকাশে হৃদয় আলোকিত হইতেছে।

আশঙ্কা কিন্তু পরক্ষণেই। "তেল ও গেল, থালীও গেল" এমনটি না হয়—ইহাই আশঙ্কা। বিদ্যা কমিয়াছে, কিন্তু পাত্রাভাব এখনও একেবারে হয় নাই, যেরূপ পাত্র বিদ্যার্জ্জনে অধিকারী তাহা আজিও আছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের ফলে পাত্র লোপ না হয়, ইহাই আশঙ্কা। পাত্র লোপ হইলে বিদ্যা আর কোথায় উৎকর্ষ লাভ করিবে! এমন আশঙ্কা কেন হয় তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি ;—

ব্রাহ্মণের বিদ্যাই সম্পত্তি, ধন ব্রাহ্মণের সম্পত্তি নহে। ধনের জন্য ব্রাহ্মণের বিদ্যা নহে, ব্রাহ্মণ্যের জন্যই ব্রাহ্মণের বিদ্যা। এই যে সংস্কার—ইহাই ব্রাহ্মণকে বিদ্যার উপযুক্ত পাত্র করিয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তির এরূপ সংস্কার নাই, কেবল অর্থের জন্যই বিদ্যা-অর্জ্জন যাঁহারা আবশ্যক বিবেচনা করেন, আক্ষরিক বিদ্যায় সুনিপুণ হইলেও তাঁহারা প্রকৃত বিদ্বান্ নহেন; তাঁহারা বিদ্যাশিল্পী হইতে পারেন, কিন্তু বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি তাঁহাদের দ্বারা অসম্ভব।

বাগেরহাটের সন্নিকটস্থ শিবপুর গ্রামের

প্রস্তরমূর্ত্তি

"পল্লীচিত্র" হইতে সংগৃহীত।

চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কের মেলা উপলক্ষে এই শিবালয়ে
বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

ha Press, Calcutta

সত্য, সংযম এবং সন্তোষ আমাদিগের শাস্ত্রবিদ্যার প্রধান সহায়। যদি বিদ্যাচর্চ্চার ফলে বিদ্যার্থী বা অধ্যাপক-সম্প্রদায়ে সত্যাদির অভাব হইতেছে দেখা যায়, তাহা হইলেই বুঝিব, আমাদের তেলও গেল, থালীও গেল; বিদ্যার ছায়ায় প্রকৃত বিদ্যা অন্তর্হিত হইয়াছে, এবং বিদ্যা অর্জ্জন করিবার লোক পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।"

আমাদেরও আশঙ্কা এই যে, পাছে আমাদের স্বাধীন টোল ও চতুষ্পাঠীগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ক্রমশঃ চাকরীজীবী সমাজে পরিণত হন। তাহা হইলে ভারতবর্ষের শেষ নিদর্শন চিরকালের মত নষ্ট হইয়া যাইবে। আশা করি, আমাদের বিচক্ষণ জননায়কগণ স্বদেশের সনাতন শিক্ষালয়-গুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা—সাময়িক লোভের বশবর্ত্তী হইয়া পণ্ডিতেরা যেন স্বাতন্ত্র্য না হারান।

মফঃস্বলের বাণী

১। পল্লীচিত্র

খুলনা জেলা হইতে প্রকাশিত 'পল্লীচিত্রে' কয়েকটি অতি সুন্দর প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। আমরা দুইটি প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম। 'বর্ত্তমান অবস্থা'য় শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু বি, এল্ লিখিয়াছেন:—"আধুনিক হিন্দু শৈব নহেন, শাক্ত নহেন, বৈষ্ণব নহেন, গাণপত্য নহেন, মুসলমান নহেন, খৃষ্টান নহেন—কিছুই মানেন না, কিছুই বিশ্বাস করেন না, অথচ সবই বিশ্বাস করেন। তিনি নক্ষত্র মানেন না, অথচ ত্র্যহস্পর্শ, মঘা, অশ্লেষায় পা বাড়াইতে সাহস নাই। বিপদে পড়িলে কালী, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, সকলেরই আশ্রয় লন। মজলিসে বসিলে কালী অনার্য্য-দেবতা, কৃষ্ণ লম্পট-চূড়ামণি, শিব ভূঁতুড়ে, দশভুজা দুর্গা অপ্রাকৃত বলিয়া উড়াইয়া দেন। কিছু বুঝিলে না কিছু বুঝিতে চেষ্টাও করিলে না অথচ সব-জান্তা! প্রাচীনেরা লিখিতে পড়িতে, আহারে উপবেশনে, শয়নে যাত্রাকালে, কৌতুকে, সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে ভগবানকে স্মরণ করিতেন, সন্ধ্যা-বন্দনাদি ও গায়ত্রী জপ করিতেন, আমরা কিছুই করি না। প্রাচীনেরা শ্রাদ্ধাদিতে রামায়ণ গান শুনিতেন, বারোয়ারিতে কবিগান শুনিতেন, পূজা-পার্ব্বণে কীর্ত্তন-গান বা যাত্রা গান শুনিতেন। এখনকার আমরা জন্মাষ্টমী বা ঝুলনে পবিত্র ধর্ম্মমন্দিরে বেশ্যানাচ দেখি।"

'মাতৃত্ব' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দী লিখিয়াছেন:—"সীতা, সাবিত্রী, সুভদ্রা, অরুন্ধতীর চিত্র আর আমাদের ভাল লাগিতেছে না—সূর্য্যমুখীর একান্তে স্বামী লইয়া জীবনব্যাপী বিস্রম্ভালাপ, কুন্দনন্দিনীর অবৈধ প্রেম, কমলমণির পরিহাস-রসিকতা—ইহারাই সমুজ্জ্বল সতীত্বের সুস্পষ্ট চিত্ররূপে আমাদের মনোমোহন করিতেছে। কাজেই আমাদের উপন্যাসেও এই সকল

বাহুল্য সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইতেছে। 'বিনোদিনী' ভগ্নীপতির মুখে দুধের বাটী তুলিয়া দিতেছে, 'বিনোদ বোঠান' পথে পথে 'মহেন্দ্রের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিয়া ফিরিতেছে,' এদিকে 'উমা ও আশা'র মাতৃহৃদয় বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমরা বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়লালসার অপবিত্র শ্মশানে মাতৃত্বের চিতাশয্যা দেখিয়া পরম পুলকিত হইয়া উঠিতেছি! শুধু উপন্যাস কেন, কার্য্যেও আমরা স্ত্রীলোকদিগকে বিকৃত শিক্ষা দিয়া রঙ্গিণী করিয়া তুলিতেছি, যাহাতে তাহারা মহত্বের পথে অগ্রসর না হয় সেজন্য যথেষ্ট সতর্কতাও অবলম্বন করিয়াছি। ব্রত-পূজা, হোম প্রভৃতি তুলিয়া দিয়াছি, কেননা উহা কুসংস্কার-মূলক ও অর্থহীন; রামায়ণ মহাভারত পড়াই না, কেননা উহা অশ্লীল; ধর্ম্মচর্চ্চা নাই কারণ উহা নিষ্প্রয়োজন; একান্নবর্ত্তিতা উঠাইয়া দিয়াছি, কারণ উহা প্রেমের অন্তরায়।

শুদ্ধ যাহাতে তাহারা নাটক নভেল পড়িয়া প্রেমের অভিনয় করিতে শিখে, রোজ-পাউডার সাহায্যে যৌবনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে এবং সংসার-ধর্ম্ম সমুদায় ভুলিয়া স্বামীর সঙ্গে সদা রঙ্গ-রহস্যে কালাতিপাত করিতে পারে সেই জন্যই আমরা অতিমাত্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছি।"

২। কর্ম্মবীরের আত্মসমর্পণ

শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, এল্, এম্, এস্ মহাশয়ের "কৃষ্ণার্জ্জুন" প্রবন্ধ ('কুশদহ' পত্রিকায় প্রকাশিত) হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:—

"সময় সময় এক জনের সঙ্গে অন্য জনের শুভদৃষ্টি হইয়া থাকে। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ এক একটি হৃদয় অতর্কিতভাবে সহসা অন্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, এবং চিরদিন অচ্ছেদ্য প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। দ্বাপর যুগে দুইটি হৃদয়ে অকস্মাৎ শুভ সম্মিলন হইয়াছিল। পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বসৃতনয়। তাই কৃষ্ণ-বলরাম পাণ্ডব-ভবনে ভ্রাতৃগণ ও পিতৃস্বসার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে শিষ্টাচার ও প্রণাম বিনিময়ের পরে, ক্রীড়ামত্ত অর্জ্জুনের নিকট পরম সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ বালক শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন। অর্জ্জুন ক্রীড়াভঙ্গে ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন, আর সে চক্ষু ফিরিল না! সে আলিঙ্গনে কি সুধা, সে চক্ষুতে কি অমৃত, সে সম্বোধনে কি মধু রহিয়াছে। অর্জ্জুন মুগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" কৃষ্ণ বলিলেন, "আমি তোমার ভাই, কৃষ্ণ।" "কৃষ্ণ! সেই যার কাছে যাঁর কথা শুনেছি, সেই কৃষ্ণ? মাতুল মহাশয়ের পুত্র? কৃষ্ণ, আহা কি মধুর নাম! কৃষ্ণ, আর তোমাকে কোথাও দেখেছি কি? স্বপ্নে তোমার সহিত স্বর্গে মর্ত্ত্যে কি বিহার করেছি?" অর্জ্জুন যেন কৃষ্ণের গায়ে ঢলিয়া পড়িলেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে কোলে লইয়া বসিয়া পড়িলেন। উভয়ের উদ্বেলিত হৃদয় কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে কৃষ্ণ বলিলেন, "সখে, আমায় চিনেছ?" অর্জ্জুন বলিলেন, "আমি তোমাকে আগেই জানিতাম, মায়ের নিকট তোমার কথা শুনেই মনে হয় যেন তোমাকে দেখেছি।" অর্জ্জুন মনে মনে মায়ের বাক্য মিলাইতে লাগিলেন। ইনি তো সেই কৃষ্ণ,

তাঁহার কথা কি এমন মধুর, বুদ্ধি কি এমন প্রখর, চরিত্র কি এমন আকর্ষণময়, মূর্ত্তি কি এত সুন্দর! অর্জ্জুন চিন্তার সহিত ভাবের সহিত, কথার সহিত মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহিত কত কথা বলিলেন। মধুর মনোহর সুন্দর উপন্যাস-গল্প মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতির কথা, অর্জ্জুন কাহারও নিকট এমন শুনেন নাই। অর্জ্জুন ভাবিতেছিলেন ইনি কে? মনের কথা বেশ টানিয়া বাহির করিতে পারেন। যাহা আমি ভালবাসি ইনি আগেই তাহা শিখিয়া আসিয়াছেন। ইনি কে? প্রাণে প্রাণে মিলিয়া গেল! অর্জ্জুন কৃষ্ণ-প্রেমে মজিল, অর্জ্জুন মরিল। অর্জ্জুনের অর্জ্জুনত্ব দূর হইল, অর্জ্জুনে কৃষ্ণ, কৃষ্ণে অর্জ্জুন। মানবে মানবে এমন প্রেম কি কখনও হইতে পারে? প্রেমের ভাষা, প্রেমের গতি, প্রেমের উৎপত্তি, প্রেমের পরিণতি—এ অতি গভীর শাস্ত্র। স্বর্গে মর্ত্ত্যে সোপান বান্ধিয়া যায়।

কৃষ্ণ অনেক খুঁজিয়া খুঁজিয়া অর্জ্জুনকে পাইয়াছেন। সরল হৃদয়—সাধু চরিত্র—নির্ম্মল ব্যবহার; তেজোময় অমৃতময় কৃষ্ণের একটি অস্ত্রের দরকার ছিল। আজি মিলিল। সে আর কিছু নয় সন্দেহহীন, তর্কহীন নির্ভয়-যুক্ত প্রেম—যাহা বলে না, কেন? যাহা জিজ্ঞাসা করে না, কি জন্যে? অথচ যাহা সর্ব্বসিদ্ধির শক্তিময়। অপরিমেয় তেজ, অসীম শক্তি, অথচ সেই তেজের সঙ্গে সৌদামিনী, অতি উজ্জ্বল, অতি সুন্দর। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের মুখের দিকে চাহিলেন। কৃষ্ণ যেন তাহার মুখে খাণ্ডব-দাহন কুরুক্ষেত্র, বিশ্ববিজয়িনী শক্তি দেখিলেন। কৃষ্ণ দেখিলেন, সে শৌর্য্য কংস বা জরাসন্ধের মত অত্যাচারী নহে, তাহা দুর্য্যোধনের ন্যায় স্বার্থপর নহে, তাহা ভীমের ন্যায় হৃদয়হীন নহে। কৃষ্ণ ভাবিলেন, এতদিনে মনের মানুষ মিলিল। এই শক্তিবলে জগতীতলে কৃষ্ণ ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য স্থাপন করিবেন। এই শক্তি-বলে ধর্ম্মের জয় পাপের ক্ষয় হইবে। কৃষ্ণ দেখিলেন অর্জ্জুনের চক্ষে সেই জ্যোতি যাহার তেজে ধর্ম্মের আধার, সেই দৃঢ়তা যাহা প্রাণ গেলেও কখনো পাপ করিতে জানে না। সেই উন্নত প্রশস্ত কপাল যাহার রাজটিকা শত রাজার রাজ-সিংহাসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অর্জ্জুনের ওষ্ঠ যাহা জগতের সকল শক্তির নিকট অদম্য! অর্জ্জুনের হাসি যাহা পুণ্য জ্যোতিঃ। শ্রীকৃষ্ণ আবার অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন, "কৃষ্ণ, তুমি কি আমাদের ছাড়িয়া যাইবে?" কৃষ্ণ বলিলেন, "ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়িয়া যাইব, কিন্তু তোমার হৃদয়ে চিরদিন থাকিব।"

এইরূপে দুইটি হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল যাহা জগতে পবিত্র ব্রত সাধনের জন্য। বিধাতার বিচিত্র বিধানে যুগে যুগে এই শুভ সম্মিলন অশেষ কার্য্য উদ্ধার করিয়া থাকে। ত্রেতাযুগে রাম লক্ষ্মণ, দ্বাপরযুগে কৃষ্ণার্জ্জুন। একজন পবিত্রতার আদর্শ, অন্য সেবার পরাকাষ্ঠা—আত্মত্যাগী সংযতেন্দ্রিয়, পবিত্র নিষ্ঠার অসীম বহ্নি। একজন নেতা—অন্য কর্ম্মী, একজন আদেশ করেন না অথচ চালান, আর জন সমুদ্র কান্তারে, বিজন গহনে, অনিল অনলে সর্ব্বত্রই প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারেন। উভয়ের শুভ সম্মিলন জগতের অপার মঙ্গলময় দৃশ্য।"

৩। স্বাধীন জীবিকা

"বরিশাল হিতৈষী" নিম্নলিখিত প্রবন্ধ প্রচার করিয়াছেন:—

"নিউ ইয়র্কের ফিলিপস সাহেব "এরেনা" পত্রিকায় "স্বাধীন জীবিকা সংস্থানই স্বাধীনতার ভিত্তি" নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে আমাদেরও ভাবিবার কথা আছে, এইজন্য নিম্নে তাহার সার সঙ্কলন করিলাম।

"আমাদের (আমেরিকানদের) এক সময় ছিল যখন আমরা এখনকার চেয়ে আসলে হয় ত বেশী স্বাধীন ছিলাম, কিন্তু তখন স্বাধীনতাকে কেবল আমরা একটা হৃদয়ের ভাব মাত্র করিয়াছিলাম। কি করিয়া সেটাকে হজম করিয়া লইতে হয় তাহা আমরা জানিতাম না। সেটা যে কেবলমাত্র কল্পনা

আশ্রয় করিয়া একটা উচ্চ আদর্শরূপে থাকে তাহা নহে, প্রতিদিনের সকল কাজেই তাহার একটা মূল্য আছে তাহা বুঝিতাম না। ভাল থাকা, ভাল খাওয়া, ভাল পরা, বেশী অর্থ সঙ্গতি, বেশী অবকাশ, ছেলেদের ভাল শিক্ষা ও ভবিষ্যতে তাহাদের একটা গতি করিয়া দেওয়া ইহা যে স্বাধীনতার কার্য্য, উপাদান ও লক্ষণ তাহা বুঝিতাম না। আমরা সাধারণ হিতকার্য্যে উদাসীন ছিলাম, সরকারী কোন বিষয়ে কোন খবর লইতাম না, রাষ্ট্রকর্ত্তারাই যা' খুসি তাই করিতেন এবং আমরা যখন কর্ত্তাদের নির্ব্বাচন করিতাম তখন হৃদয় ভাবের আবেগ লইয়াই লড়ালড়ি করিতাম, কার্য্যকরী বুদ্ধিটাকে জলাঞ্জলি দিতাম; এই ঔদাসীন্য ও অবিবেচনার দ্বারা যে আমরা নিজেদেরই অন্ন মারিতেছি, অবকাশ মারিতেছি সে বোধ ছিল না।

"কিন্তু দেশের সর্ব্বত্র সুখসমৃদ্ধিকে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়ার সঙ্গে পলিটিক্সের যোগ আছে; অতি অল্পদিন হইল, এ কথাটা অস্পষ্টভাবে আমাদের মাথায় প্রবেশ করিতেছে।

"জনসাধারণের পরবশতাই সমস্ত অত্যাচারের মূল। যে পর্য্যন্ত জনসাধারণ জীবিকার জন্য পরাধীনতা অবলম্বন করিবে, ততদিন স্বাধীনতা একটা কথার কথা মাত্র। তাহাদিগকে শিক্ষাই দাও, আর তাহাদিগকে ভোট দিবার ক্ষমতাই দাও যতক্ষণ তাহারা পেটের ভাতের জন্য অন্যের মুখ তাকাইবে ততক্ষণ তাহারা পরাধীন মজুর হইয়াই থাকিবে।

"অতএব স্বাধীনতার একটি মাত্র পাকা বনিয়াদ আছে—সে স্বাধীন জীবিকার উপায়।

"প্রত্যেক জাতিই স্বাধীন হইবে—এইজন্যই তাহাদের গবর্ণমেণ্ট আছে। অতএব যখন স্বাধীন জীবিকাই স্বাধীনতার অবলম্বন তখন গবর্ণমেণ্টকে এইদিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

"প্রথম লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে অন্ন অর্জ্জন করিতে পারে। তারপরে দেখিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেকে শিক্ষা পায়।

"এইজন্য লেখক প্রস্তাব করিতেছেন যে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের পাবলিক কাজের ক্ষেত্রটিকে এমন ভাবে ব্যাপক করিয়া তুলুন যাহাতে দেশের যে কোনো অধিবাসী প্রত্যহ আট ঘণ্টা খাটিবার মত নিজের উপযুক্ত কাজ পাইতে পারে। সে কাজ যে সকলের মনের মত হইবেই এমন হইতে পারে না। কিন্তু যে লোক খাটিতে রাজি আছে সে যে অনুগ্রহ স্বরূপে নহে, অধিকার স্বরূপেই কাজ পাইবে এমন ব্যবস্থা যেন করা হয়। স্বাধীনতাভিমানী কোনো আমেরিকানই জীবিকার জন্য পরের দ্বারে উমেদারী করিয়া প্রবলের কাছে মাথা বিকাইয়া রাখিবে ইহা ঘটিতে দেওয়া হইবে না। পেটের অন্নের জন্য যদি দেশের অধিকাংশ লোককেই অপমান ও অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয় তবে "স্বাধীনতা" বলিয়া একটা সেণ্টিমেণ্ট লইয়া মানুষ উদ্ধার পাইবে না। কর্ম্মকে যদি যথার্থই সম্মানজনক করিয়া তোলা না হয় তবে কেবল মুখের কথায় শ্রমের গৌরব "Dignity of Labour" ঘোষণা করিয়া কোন ফল হইবে না।"

৪। সমাজসংস্কার

"প্রতিবৎসরই রাজনীতি, কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্সের সঙ্গে একটা করিয়া মামুলি সামাজিক কন্‌ফারেন্স বসিয়া থাকে। ইঁহারা রাজনীতির আলোচনা করেন, অথচ রাজ্যশাসনের সহিত ইঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ইঁহারা সমাজনীতির আলোচনা করেন, অথচ সমাজের কূট সমস্যা বুঝিবার ক্ষমতা বা চেষ্টা নাই। হিন্দুসমাজ হিন্দুধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুসমাজ আর কিছুই নহে, হিন্দুধর্ম্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্র মাত্র। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মকে ভাল করিয়া না বুঝিলে, হিন্দুসমাজকে বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। আর হিন্দুধর্ম্ম বুঝিতে হইলে হিন্দুর শাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান ও ভক্তি থাকা

চাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যাঁহারা বৎসর বৎসর হিন্দুসমাজ-সংস্কারের জন্য বক্তৃতা করিতেছেন, তাঁহাদের কয়জন শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া থাকেন, কয়জন প্রকৃত হিন্দু? তাহা যখন করেন না, তখন তাঁহারা সমাজসংস্কারে কতদূর অধিকারী তাহা সহজেই বুঝা যায়। যদি কোন চিকিৎসক শারীরবিদ্যা না শিখিয়া রোগীর অঙ্গে অস্ত্র প্রয়োগ করেন, তবে তিনি যে রোগীর প্রাণনাশ করিতে পারেন, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। তেমনি যদি কেহ হিন্দুসমাজের প্রকৃত রহস্য না বুঝিয়া যদি তাহার সংস্কার করিতে যান, তবে তাঁহাকে বাতুল ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে বলুন দেখি?— বীরভূমবাসী

৫। পূর্ব্ববঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন

"এবার চট্টগ্রামে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থান হইতে অনেক প্রতিনিধি তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ন্যায় পূর্ব্ববঙ্গেও যাহাতে প্রতিবৎসর সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইতে পারে সে সম্বন্ধে প্রতিনিধিগণ এক পরামর্শ সভা করিয়া উক্ত বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। উক্ত পরামর্শ-সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে, "বঙ্গসাহিত্যের সমধিক আলোচনার জন্য পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হউক এবং সুবিধাজনক সময়ে প্রতি বৎসর পূর্ব্ববঙ্গে এক একস্থানে পূর্ব্ববঙ্গবাসী সাহিত্যসেবিগণের একটি সম্মিলনের অধিবেশন হউক।" আমাদের চট্টগ্রামের সহযোগী 'হিতবার্ত্তা' ইহাতে দলাদলির গন্ধ পাইয়াছেন এবং তজ্জন্য ইহার বিরুদ্ধবাদী হইয়াছেন। আমাদের কিন্তু মনে হয় ইহাতে দলাদলির ভাব কিছুই নাই। আমরা আমাদের নিজেদের সাহিত্যিকদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইব, তাঁহাদের সহিত ভাব-ভাষার আদান প্রদান করিব, ইহাতে দলাদলি হইতে পারে না। পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন স্থাপিত হইলে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের কোনও রূপ ক্ষতি হইবে না, বরঞ্চ ইহার শক্তি বৃদ্ধিই পাইবে। প্রাদেশিক সমিতি হয় বলিয়া কি কেহ জেলা-সমিতিকে দোষ দিতে পারেন? আমার গ্রামের তৈয়ারী জিনিস আমি ব্যবহার করিব, আমার গ্রামের যাহাতে উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করিব ইহাতে কি কেহ বলিবেন যে আমি দেশের অনিষ্টকারী। পরন্তু এইরূপ ব্যক্তিগতভাব হইতেই সমগ্র দেশের প্রতি একটা ভালবাসা জন্মে এবং এইরূপ ব্যক্তিগত-ভাব হইতেই সমগ্র দেশের উন্নতিসাধিত হয়। সাহিত্য-সম্মিলনী দ্বারা সাহিত্যের প্রচার যত ছোট গণ্ডীর ভিতর হউক না কেন, আমরা ইহাতে কোনও কুফল হইতে পারে ইহা বিশ্বাস করি না। জানি না কি কুক্ষণে গবর্ণমেণ্ট বঙ্গবিভাগ করিয়াছিলেন, এই বিভাগের ফলেই লোকের "পূর্ব্ববঙ্গ" ভীতি (শব্দটির প্রতি—পূর্ব্ববঙ্গবাসীর প্রতি নহে) এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে কোথাও পূর্ব্ববঙ্গ শব্দটি দেখিলেই অনেকে চমকিয়া উঠেন, এই বুঝি আবার আর একটা ভাগ হইল। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন হওয়ার সময় ত কই এরূপ দলাদলির গন্ধ কেহ পান নাই। যাহা হউক আমাদের মনে হয় পূর্ব্ববঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন স্থাপিত হইলে আমাদের নিজশক্তিই আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে সক্ষম হইব এবং ইহাতে সুফল ভিন্ন কুফল হইবে না।"

ত্রিপুরা-হিতৈষী

৬। জাতীয় উৎসব ও শিক্ষাপ্রচার

উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর ৺ রাধেশচন্দ্র শেঠ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত মালদহের 'গৌড় দূত' পত্রে প্রকাশ :—

গম্ভীরা আসিয়া গিয়াছে। অনেক অনেক স্থানে গম্ভীরা-উৎসব শেষ হইয়া গেল। আগামী ১৫ই, ১৬ই এবং ১৭ই বৈশাখ এই তিন তারিখ ইংরেজবাজারে গম্ভীরা উৎসব

অনুষ্ঠিত হইবে। মালদহের সাধারণ অধিবাসিগণ অশিক্ষিত বলিলেও বলা চলিতে পারে। ঐ সমস্ত লোক প্রত্যেক বৎসর এই সময় নৃত্যগীত সংযোগে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করে এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করিয়া স্থানীয় নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি সংবিধান করিতে সচেষ্ট হয়। মালদহের প্রকৃত অবস্থা জানিতে ইচ্ছা হইলে, প্রত্যেক হৃদয়বান ব্যক্তির কর্ত্তব্য—গম্ভীর উৎসবে উপস্থিত হওয়া।

বিভিন্ন গ্রামের গম্ভীরা দেখিবার জন্য গোসাঞী বলদেবানন্দগিরি ও মালদহের হিতাকাঙ্ক্ষী কলিকাতানিবাসী বাবু কুমুদনাথ লাহিড়ী মহাশয়দ্বয় তথায় গিয়াছিলেন। সেই দিবস মকতুমপুর-বোলবাই-সমিতি কর্ত্তৃক গীত নীতিভ্রষ্ট শিক্ষিত যুবক ও ন্যায়-পরায়ণ 'চাষা,' মহেশপুর-বোলবাই-সমিতি কর্ত্তৃক গীত 'বন্দনা' ও কর্ম্মভীত কপট বৈরাগী এবং 'কর্ম্মপটু কৃষক,' কুতুবপুর-বোলবাই-সমিতি কর্ত্তৃক গীত 'মহান্ত গোসাঞীজীর দাতব্য চিকিৎসা' সম্বন্ধে গীতশ্রবণে ও নৃত্যাদি দর্শনে গম্ভীরা মণ্ডপে উপস্থিত জনগণ একবাক্যে বোলবাই-সমিতিগুলির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। জোত নিবাসী স্বনামখ্যাত ভোলানাথ খলিফা মহাশয় উপদেশপূর্ণ বোলবাই গান শ্রবণ করতঃ বিশেষ আনন্দলাভ করেন বলিয়া তৎপর দিবস আবার বোলবাই গানের আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে গণিপুর, টীপাজানি প্রভৃতি গ্রামের বোলবাই গানের দলও উপস্থিত হইয়াছিল। বহুলোক সমাগমে সুসজ্জিত গম্ভীরা মণ্ডপ আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মহন্তজী গ্রামবাসী জনগণের সহিত স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ব্যবসাদি সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেন, এবং বলেন যে গ্রামে অধিকাংশ লোক নেশা ইত্যাদি দ্বারা চরিত্রহীন ও নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। মহন্তজী গ্রামের কর্ত্তৃপক্ষগণকে একটা অবৈতনিক নৈশবিদ্যালয় এবং গ্রামে বৃদ্ধাদিগের একটি সান্ধ্য বৈঠক স্থাপন করিবার বিশেষ অনুরোধ করেন। ঐ বিদ্যাগারে সন্ধ্যার পর রামায়ণ মহাভারত পাঠও ছোট ছোট বালকদিগকে একটু একটু লেখাপড়া শিক্ষাদানের জন্য পরামর্শ দান করেন। তৎপর কুমুদবাবু গম্ভীরার উপকারিতা সম্বন্ধে একটি সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া বলেন 'আমি অপনাদিগকে শিক্ষা দিতে আসি নাই, আপানাদিগের নিকট শিক্ষা করিতে আসিয়াছি—আপনাদের ঘরে অনেক মূল্যবান্ জিনিস আছে, কিন্তু ঘর অন্ধকার থাকায় কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে গম্ভীরা হইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা অতিশয় বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। কারণ যদি একদিনে সমস্ত জেলার গম্ভীরা হইত তবে এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামে যাইবার সুবিধা পাইত না এবং পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় ও আলাপ প্রভৃতি পরিচয় কিছুই হইতে পারিত না। আজ ভক্তিভরে সেই প্রাচীন মহাত্মাগণকে প্রণাম করিতেছি।'

তারপর শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় কবিরাজ মহাশয়ের টীপাজানীর বোলবাই" সমিতি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিনয় করেন। পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া নিবারণ জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতিরেকে দেশী গাছ গাছড়ায় কিরূপে বিনা ব্যয়ে অনেক রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে তাহা গানের দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং ঐ সমস্ত গাছ গাছড়া সংগ্রহ করিয়া দর্শকবৃন্দকে দেখান হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গদাধর দাস (গণিপুর বোলবাই-সমিতি) 'জমিদার ও প্রজা' অর্থাৎ নিরক্ষর প্রজাগণের প্রতি জমিদারগণের ব্যবহার, নৃত্য গীত অভিনয় দ্বারা সকলকে বুঝাইয়া দেন। এই অভিনয় সময়ে দর্শকবৃন্দের মুখে বিষাদের চিহ্ন দেখা গিয়া ছিল। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ খলিফা জোতের মণ্ডল গম্ভীরার পক্ষ হইতে বলেন যে, গণিপুর ও টীপাজানির

বোলবাই সমিতির প্রত্যেককে একটি করিয়া মেডেল দেওয়া যাইবে।”

গম্ভীরোৎসবের উন্নতিলাভে বঙ্গবাসী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় যাঁহারা লোক শিক্ষার বিস্তারে প্রয়াসী হইয়াছেন তাঁহারা স্থানীয় উৎসব মেলাগুলিকে জাগাইয়া তুলুন। মালদহ-জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি গম্ভীরোৎসবকে সঞ্জীবিত করিয়া সমগ্র বঙ্গে জাতীয় কর্ম্ম-প্রণালীর পথ-প্রদর্শক হইয়াছেন। এজন্য তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আধুনিক মালদহের সর্ব্বতোমুখী জাগরণ মালদহ-জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির ৬।৭ বৎসর-ব্যাপিনী কঠোর সাধনার ফল। তাঁহারা নৈশবিদ্যালয় ও বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিল্প-শিক্ষার প্রবর্ত্তন, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও সাহিত্য-প্রচার, এবং লোক-সেবা ইত্যাদি যাবতীয় সদনুষ্ঠানের দ্বারা মালদহের জনগণের মধ্যে কর্ম্মপ্রবণতা সঞ্চারিত করিয়াছেন। এই জাতীয় শিক্ষার প্রচারকগণই মুখ্যতঃ এবং গৌণতঃ মালদহের সকল প্রকার উন্নতির মূলে। গম্ভীরার জাগরণ যে তাঁহাদেরই আয়াস প্রসূত তাহা বাঙ্গালার সাহিত্যজগতে এবং শিক্ষাজগতে অবিদিত নাই। সুখের কথা—তাঁহাদের আদর্শ এখন আর দুএকজন কর্ম্মীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। জনসাধারণ এই আদর্শকে নিজস্ব করিতে অভ্যস্ত হইতেছে। ‘গৌড়দূতে’ তাহার পরিচয় পাইয়া আশান্বিত হইলাম।

আমরা এই সুযোগে মালদহ জেলার সাহিত্য-সেবিগণকে একটা কার্য্য করিতে বলি। তাঁহারা ‘মালদহ-গম্ভীরা-সমিতি’ নাম দিয়া একটা সাহিত্য-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করুন। নানা উপায়ে বঙ্গ সাহিত্যের পরিপুষ্টিই এই সমিতির উদ্দেশ্য থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে ‘গম্ভীরা’ নাম দিয়া একখানা মাসিক পত্র প্রকাশ করিবার ভার গ্রহণ করুণ। তাহা হইলে দ্রুতগতিতে জেলার উন্নতি সাধিত হইবে।

বীরভূমে সাহিত্যসেবা

বীরভূমের নীরব কর্ম্মী শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় একখানি চরিতাভিধান লিখিয়াছেন। তাহাতে বাঙ্গালার পরলোকগত সকল সাহিত্যসেবীর জীবন বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের নাম ‘বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক’। ইহা ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা বারান্তরে ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিব। সম্প্রতি তিনি চণ্ডীদাসের স্মৃতিরক্ষার জন্য সবিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। আমরা স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে বৈশাখে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। তিনি এজন্য একটি প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চট্টগ্রাম অধিবেশনে উপস্থিত করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় সময়াভাবে তাঁহার প্রবন্ধ পঠিত বা আলোচিত হয় নাই। সেই প্রবন্ধ বৈশাখের ‘নব্যভারতে’ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যদেবের অগ্রদূত—সুতরাং বঙ্গসমাজের একজন যুগ-প্রবর্ত্তক এবং বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের একটি প্রধান স্তম্ভ। তাঁহার স্মৃতি রক্ষার চেষ্টা করা সকল স্বদেশ সেবকেরই একান্ত কর্ত্তব্য। সমগ্র বঙ্গদেশে শিবরতন বাবুর প্রয়াসের আদর হওয়া কর্ত্তব্য।

“চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি যেমন সুদূর অতীতে বঙ্গ সাহিত্যের অন্ধকারময় ক্ষেত্রে সমুজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়া সাহিত্যিকগণের হৃদয়ে কত ফলগর্ভ আশা সঞ্চারিত করিয়া দেন, তদ্রূপ তিনি প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর আবির্ভাবের মঙ্গলময় সংবাদ অগ্রদূতরূপে বহন করিয়া আনিয়া ভক্ত ও ভগবৎ-প্রেমিকের হৃদয়ে কত নিত্যানন্দময় মহোল্লাসের স্ফূর্ত্তি করিয়া দেন।

অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায় ধরি কান্দে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতলী যেন ভূমিতে গড়ায়॥

পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥

আবার।

আজ কে গো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যাম রায়॥
ইহার গৌরবরণ করে আলো।
চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল॥
তাহার ইন্দ্রনীল কান্তি তনু।
এত নহে নন্দসুত কানু॥

* * *

চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন দেশে॥

আমরা তাহার এরূপ ভাবাত্মক পদাবলী পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের জন্য, সমাগতপ্রায় প্রিয়তম-মিলনাকাঙ্ক্ষীর ন্যায়, প্রতি পলে সেই পুণ্য মুহূর্ত্তের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকি। সাধকের কথা, দিব্যদর্শীর কথা, কি কখন ব্যর্থ হয়? এরূপ সাধকের ঋণ কি আমরা পরিশোধ করিতে পারি! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুখে এক জয়দেব কবি,

'দেহি পদপল্লব মুদারং'

কহাইতে পারিয়াছেন; আর পারিয়াছেন, তুল্যরূপ অদ্বিতীয় কবি চণ্ডীদাস তিনি নিজেও যেমন,

'ও দুটী চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি।'

বা—

'সব তেয়াগিয়া ও রাঙা চরণে
শরণ লইনু আমি।',

বলিয়াছেন, সেইরূপ আবার প্রাণের আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ-মুখে কহাইয়াছেন—

"আমার ভজন তোমার চরণ
তুমি রসময়ী নিধি।"

একি অপূর্ব্ব তন্ময়ের ভাব! এ 'উপাসনা-রস' কি সহজ বোধ্য? চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

পিরীতি পিরীতি সব জন কহে
পিরীতি সাধন কথা
বিরিখের ফল নহে ত পিরীতি
নাহি মিলে যথা তথা।
পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে
পিরীতি সাধন যে।
পিরীতি রতন লভিল যে জন
বড় ভাগ্যবান সে॥
পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে॥
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস,
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ॥

মানুষ যখন ভগবৎ সঙ্গ বা সান্নিধ্য লাভের জন্য একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে, যখন মানুষ দেখিতেছে যে,

"আকাশ জুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই"

তখন চণ্ডীদাস আমাদিগকে কি অপূর্ব্ব আশ্বাস বাণী শুনাইতেছেন, তখন তিনি বলিতেছেন,

"কহে বড়চণ্ডিদাস মিলিবে তেথাই"

এই আশ্বাস বাণী যথার্থ প্রীতি বা প্রেম-লাভের আকাঙ্খায় যে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, তাহা জগতে কাহারও অবিদিত নাই। এই প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া যে অগণিত কবিপ্রতিভার উন্মেষ হইয়াছিল, তৎসমুদায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে কিরূপ উজ্জ্বল প্রভায় আলোকিত ও অমূল্য ধনে সম্পদশালী করিয়াছে, তাহা মাতৃভাষানুরাগীর নিকট বর্ণন করা অনাবশ্যক।

পরিশিষ্ট

গুরুদেব। এটা, এবং এর পরের সমস্ত টেবিল সায়ন। এ খাতার টেবিলগুলি পাশ্চাত্য গ্রন্থের সাহায্যে গঠিত। এতে চৈত্র অয়ন বাদ দিলেই নিরয়ণ স্ফুট হ'বে। ঐ বৎসরের চৈত্র অয়নাংশাদি ২১।৫২ বাদ দিলে ৬।১।৫৮ নিরয়ণ রবি হ'বে। সুতরাং এটা বাঙ্গালা ২রা কার্ত্তিক।

আমি। আচ্ছা আমি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের, ২৩এ জুন কসি। ১৮৮৩, ১৮৫০এর সমান, তার পর ৮৪ ইত্যাদি গুনিয়া ১৮৭৯, ১৯১২ অব্দের সমান হ'লো সুতরাং ১৪ কলা যোজ্য। এ বছর ফেব্রুয়ারি ২৯এ সুতরাং ৩১ + ২৯ + ৩১ + ৩০ + ৩১ + ২৩ = ১৭৫।

গুরুদেব। কিন্তু ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে লিপ ইয়ার না হ'বার দরুণ, একটু ব্যতিক্রম হবে। এক তারিখ পেছিয়ে নিতে হবে। অর্থাৎ ওটা ১৭৫ না ধ'রে ১৭৪ অঙ্কে মিলবে। অর্থাৎ ১৭৪ যে ৩।১।৩৭ আছে সেইটেই স্ফুট হ'বে। ক্বচিৎ দু এক কলা কমবেশী হ'তে পারে, কারণ এটা স্থূল।

আমি। স্থূল হ'লেও আপনার এই র‍্যাফেলের পাঁজিতে কর্কটের একরাশি, সাঁইত্রিশ কলা, পাঁচ বিকলা আছে।

গুরুদেব। সর্ব্বত্র অত ঠিক হবে না। না হ'লেও কাজ চলবে। এই নিয়ম অনুসারে কতকগুলি অঙ্ক ক'সে দেখো।

আমি। সব নিয়ম অনুসারেই কসবো। তবে আপনার টেবিল কাপি করবার জন্য দু দিন কসতে পারিনি।

গুরুদেব। নিয়ম করে কোন নির্দ্দিষ্ট সময় প্রত্যহ অন্ততঃ আধঘণ্টা অঙ্ক কোসো।

আমি। যে আজ্ঞা আজ থেকে তাই করবো। পূর্ব্বে যে (৫৩পৃঃ) সূর্য্য ভোগ্য নক্ষত্র দ্বারা রবিস্ফুট নির্ণয়ের উপায় ব'লে দিয়েছিলেন, এটা, তা অপেক্ষা সূক্ষ্ম।

গুরুদেব। নিশ্চয়ই। এটি স্থূল হলেও দুই এক কলা এদিক ও দিক হ'বে। একটা কসেই দেখ না। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবরের নিরয়ণ রবি কত পেলে?

আমি। ছয় রাশি ১ অংশ ৫৮ কলা।

গুরুদেব। ও দিন বাঙ্গালা কত?

আমি। ১৭৮০ শকাব্দার ২রা কার্ত্তিক।

গুরুদেব। ঐ কার্ত্তিক সংক্রমণ কতক্ষণের সময়?

আমি। শুক্রবার ৪৪ দণ্ডে। (২৩ পৃঃ)

গুরুদেব। বেশ কথা, তবে, যাইট দণ্ডের আর ১৬ দণ্ড বাকী। এই ষোল দণ্ড আর ১লা তারিখের ৬০ দণ্ড হ'লো এক দিন ১৬ দণ্ড। কার্ত্তিকের প্রথমে চিত্রার্দ্ধ ৬ দিন। ৩৮ দণ্ড ২৫ পল। অর্থাৎ এই ৬।৩৮।২৫ এ রবির গতি ২০০ কলা। কলিকাতা অঞ্চলে যখন প্রায় ৫টা. ৫৩ মি. তখন গ্রীণিচ মধ্যাহ্ন। সুতরাং সূর্য্যোদয় থেকে প্রায় ১২ ঘণ্টা বা

৩০ দণ্ড। অতএব ঐ ১ দিন ১৬ দণ্ডে এই ৩০ যোগ ক'রে হ'লো ১ দিন ৪৬ দণ্ড বা ১০৬ দণ্ড। আর চিত্রার্দ্ধের ৬। ৩৮ এ হ'লো প্রায় ৩৯৮ দণ্ড। এখন ত্রৈরাশিক কর—

৩৯৮ : ১০৬ :: ৪০০ : কত ?

$$\frac{১০৬ \times ৪০০}{৩৯৮} = \text{প্রায় ১০৭ কলা}$$

হস্তা নক্ষত্র পর্য্যন্ত ১০৪০০ কলা + চিত্রার ৪০০ + ১০৭ কলা মোট ১০৯০৭ কলা রবিস্ফুট =

৬০|১০৯০৭
৩০| ১৮১ — ৪৭
৬ — ১

অর্থাৎ ছয় রাশি এক অংশ সাতচল্লিশ কলা।

আমি। আমি আর একটা কসি। ঐ ২৩এ জুন ১৯১২এ স্ফুট পেয়েছি ৩। ১। ৩৭। আপনার র‍্যাফেলের পাঁজীতে রবির ক্রা ২৩। ২৭ উ আমাদের দেশের অক্ষ ২২। ৩০ উ আপনার টেবিল (১৯ পৃ) অনুসারে ৬। ৫১ অস্তকাল অতএব উদয় কাল ৫। ১৯, কাল সমীকরণাঙ্ক + ২; স্থতরাং মধ্যকাল ৫। ২১; ৫টা ৫১ অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত ১২ ঘণ্টা ৩২ মিনিট = ১২। ৩২ × ২॥ = ৩১ দণ্ড ২০ পল।

২৩এ জুন = ৯ই আষাঢ়

দিবারাত্রি ৬০। ০ দণ্ড
আষাঢ় সংক্রমণ দণ্ড ৯। ১০ পল
সংক্রমণ দিনে ৫০। ৫০ পল
মৃগশিরার্দ্ধ ৭ দিন ১ দণ্ড ৫৬ পল
৫০ ৫০ বাদ দিয়া
৬। ১১। ৫৪

৯ই আষাঢ় ৩১ দণ্ড ২০ পল পর্য্যন্তের
অর্থাৎ ৮ দিন ৩১ দণ্ড ২০ পলে
৬ ,, ১১ ,, ৪ পল মৃগশিরার্দ্ধ বাদ দিয়া
বাকী ২ ,, ২০ ,, ১৬ ,, মাত্র আর্দ্রা ভুক্ত
আর্দ্রাভোগ ১৪ দিন ৩ দণ্ড ৪৯ পল

৮৪০ + ৩ = ৮৪৩
৬০
৫০৫৮০ + ৪৯ = ৫০৬২৯ পল

২ দিন ২০ দণ্ড ১৬ পল
৬০
১২০ + ২০ = ১৪০
৬০
৮৪০০ + ১৬ = ৮৪১৬ পল

৫০৬২৯ : ৮৪১৬ :: ৮০০ : কত ?
৮৪১৬ × ৮০০ = ৬৭৩২৮০০
৫০৬২৯) ৬৭৩২৮০০ (১৩৩ কলা প্রায়
৫০৬২৯
১৬৬৯৯০
১৫১৮৮৭
১৫১০৩০

মৃগশিরা পর্য্যন্ত ৪০০০ কলা
\+ আর্দ্রার ১৩৩ কলা

৬০ | ৪১৩৩ সমষ্টি
৩০ | ৬৮ — ৫৩
২ — ৮

অর্থাৎ রবিস্ফুট নিরয়ন ২। ৮। ৫৩ কলা।

পূর্ব্বে পেয়েছি, ৩। ১। ৩৭, সায়ন রবি। খ্রীঃ ১৯১২ অব্দের চৈত্র অয়ন ২২। ৩৬ বাদ দিলে হয় নিরয়ন ২। ৯। ১, এও বেশী তফাৎ নয়।

এখন তফাৎ যা'তে না হয়, এমন কোন সঙ্কেত শিখিয়ে দিন।

গুরুদেব। সূক্ষ্মতর প্রকরণও তোমায় বল্‌বো, কেন না সূক্ষ্মতম ফল নির্ণয়ের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত, কালকে বিপল পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম করবার প্রয়োজন বিবেচনা করেন নি, এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি; স্ফুটেও সেইরূপ বিকলার চেয়ে সূক্ষ্ম করবার দরকার নাই, কলা পর্য্যন্ত শুদ্ধ থাক্‌লেই আমাদের প্রয়োজনীয় কার্য্য সমুদায়ের জন্য যথেষ্ট।

আমি। বেশী সূক্ষ্ম করায় দোষ কি ?

গুরুদেব। অনর্থক কর্ম্মভোগ বই আর দোষ কি ? আমার বিবেচনায় কস্‌বার সময় কলার দাশমিক তিন চার পদ পর্য্যন্ত রেখে কস্‌তে পার শেষে ফল নির্ণয় হ'য়ে গেলে, ঐ রাশি অংশ কলা রাখ্‌লেই যথেষ্ট, চন্দ্রের কলা এবং বিকলা পর্য্যন্ত রেখো, তার চেয়ে আর সূক্ষ্ম কর্‌বার চেষ্টা করে অনর্থক সময় নষ্ট করো না।

আমি। এখন সূক্ষ্ম স্ফুট নির্ণয়ের সঙ্কেত বলুন।

গুরুদেব। হাঁ বল্‌চি। প্রথমতঃ মনে রেখো সায়ন স্ফুট মেষ সন্নিহিত ক্রান্তিবিষুবৎ-চ্ছেদবিন্দু হ'তে গণিত হয়। কাল অনাদি, এ কথা বোধ হয় মনে আছে। সূর্য্যাদি গ্রহের বর্ত্তমান স্থান বা কোন নির্দ্দিষ্ট দিনের অবাস্থতিস্থান নির্দ্দেশ কর্‌তে হ'লে কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট সময় হ'তে গণনা করা কর্ত্তব্য। সেই দিনে গ্রহগণ কে কোথায় অবস্থিত জানা চাই, তার

পর গতিবশে অভীষ্ট দিনে কোথায় আছেন জানা যেতে পারে। এই গণনারম্ভের দিন ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন স্বীকৃত হ'য়েছে। সকল কথাই ক্রমে ক্রমে বল্‌চি শোন। রবির কেন্দ্র পরিভ্রমণের কাল, অর্থাৎ যে পরিমাণ সময়ে সূর্য্য একবার কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান থেকে সেই স্থানে পুনরায় আস্‌তে দেখা যায় তার পরিমাণ, ৩৬৫·২৫৯৬৪১ দিন এ কথা তুমি জান।

আমি। আজ্ঞা, হাঁ, আপনার খাতা হ'তে, পাশ্চাত্য মতে সূর্য্যের কেন্দ্র-ভ্রমণ-কাল ব'লে যে টেবিলটি আছে, তা তুলে নিচি, কিন্তু আমাদের দেশীয় মতের সঙ্গে ওর একটু তারতম্য পা'চ্চি (১৫ পৃঃ)।

গুরুদেব। কৈ দেখি, কোন টেবিলের কথা বল্‌চো ?

আমি। এই—

১— ৩৬৫·২৫৯৬৪১
২— ৭৩০·৫১৯২৮২
৩—১০৯৫·৭৭৮৯২৩
৪—১৪৬১·০৩৮৫৬৪
৫—১৮২৬·২৯৮২০৫
৬—২১৯১·৫৫৭৮৪৬
৭—২৫৫৬·৮১৭৪৮৭
৮—২৯২২·০৭৭১২৮
৯—৩২৮৭·৩৩৬৭৬৯

গুরুদেব। ও টেবিলটা না লিখ্‌লেও চল্‌তো। সামান্য একটু আধটু গুণ ভাগ করা দরকার। তবে যখন টেবিলটা লিখেছ, তখন গুণ ঠিক হ'লো কি না পরীক্ষার্থ ব্যবহার করতে পার। পূর্ব্বে যে টেবিল করেছ (১৫ পৃ) তার সঙ্গে সামান্য অন্তর। এখন মনে কর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ আমরা গণনারম্ভ কাল স্বীকার কর্‌লাম। আমাদের একটি অভীষ্ট উদাহরণ খ্রীঃ১৮৫৮অব্দ ১৭ই অক্টোবর, আর একটি খ্রীঃ১৯১২অব্দ ২৩এ জুন। প্রথমতঃ দিনাদি রবিকেন্দ্র নির্ণয় কর্‌তে হ'বে।

আমি। দিনাদি রবিকেন্দ্র কি ?

গুরুদেব। রবি ৩৬৫.২৫৯৬ ইত্যাদি পরিমিত দিনে ৩৬০ অংশ পরিভ্রমণ করেন, সুতরাং অভীষ্ট কালটি, ঐ খ্রীঃ ১৯০০ অব্দ হ'তে কত দিনাদি নির্ণয় পূর্ব্বক, যত বার ৩৬৫.২৫৯৬ ইত্যাদি বাদ দেওয়া যায় ততবার বাদ দিলে যে অঙ্ক থাকে তাহাই দিনাদি রবিকেন্দ্র, অর্থাৎ তাহারি সাহায্যে রবিস্ফুট নির্ণীত হ'বে। এখন অভীষ্ট অব্দ দ্বয়

খ্রীঃ ১৮৫৮ অব্দ ও খ্রীঃ ১৯১২ অব্দ
—১৯০০ —১৯০০

= —৪২ = +১২

এখন দেখ গণিতের নিয়মানুসারে একটি অব্দান্তর বা অব্দ পিণ্ড (—৪১) ঋণভাবাপন্ন ও অপরটি (+১২) ধনভাবাপন্ন হ'লো। এইবার অভিষ্ট দিন পর্য্যন্ত কত দিন নির্ণয় কর।

আমি। যে আজ্ঞা, এই কস্‌চি—

৩৬৫·২৪৯৬৪১	৩৬৫·২৪৯৬৪১
— ৪২	+ ১২
১৪৬০৯৯৮৫৬৪	৭৩০৪৯৯২৮২
৭৩০৪৯৯২৮২	৩৬৫২৪৯৬৪১
— ১৫৩৪০·৪৮৪৯২২	+ ৪৩৮২·৯৯৫৬৯২

ঋণভাবাপন্নটি পশ্চাদ্গামী অঙ্ক, সুতরাং ডিসেম্বর নবেম্বর ও অক্টোবরের ১৬ দিন বাদে যত দিন হয়, তাই ওতে যোগ কর্‌বো ?

গুরুদেব। না! জানুয়ারি হ'তে অক্টোবরের ১৭ তারিখ পর্য্যন্ত [illegible] বাদ দিতে হ'বে। গণিতের নিয়মানুসারে উভয়ত্র যোগ একটি আপনা হ'তে বিয়োগ হ'[illegible] [illegible] অঙ্ক পেয়েছ তার দু'টি, তত্তৎ বর্ষের আরম্ভ নির্দ্দেশক কি না ? এই দেখ—

	— ১৫৩৪০·৪৮৫		+ ৪৩৮২·৯৯৬
সেপ্টেম্বর শেষ পর্য্যন্ত	+ ২৭৩ দিন	মে শেষ পর্য্যন্ত	+ [illegible]
অক্টোবর	+ ১৭ দিন	জুন	[illegible]
	— ১৫০৫০·৪৮৫		+ ৪৫৫৬·৯৯৬

এই দু'টি অঙ্কের নাম দিনবৃন্দ বা অহর্গণ। ইহা হ'তে ক্ষেপাঙ্ক ১·৫৫ দিনাদি বিয়োগ কর।

আমি। যে আজ্ঞা

— ১৫০৫০·৪৮৫	+ ৪৫৫৬·৯৯৬
— ১·৫৫	— ১·৫৫
— ১৫০৫২·০৩৫	+ ৪৫৫৫·৪৪৬

গুরুদেব। ঠিক হ'য়েছে। এইবার উভয় অঙ্ক থেকে ক'টা পূর্ণ বর্ষ বাদ দিতে পার দেখ। শেষ ফল অবশ্য এক বর্ষের দিন পরিমাণ অপেক্ষা কম হ'বে।

আমি। তা হ'লে, দুই অঙ্ক থেকে বাদই দিতে হ'বে। শেষ ফল একটি ঋণ আর একটি ধন ভাবাপন্ন হ'বে। এবার টেবিলটি ব্যবহার করি—

	— ১৫০৫১·০৩৫		+ ৪৫৫৫·৪৪৬
৪০ বর্ষ	— ১৪৬১০·৫৮৬	১০ বর্ষ	— ৩৬৫২·৫৯৬
	৪৪১·৬৪৯		৯০২·৮৫০
১ বর্ষ	৩৬৫·২৪৯	২ বর্ষ	— ৭৩০·৫১৯
	— ৭৬·৪০০		+ ১৭২·৩৩১

এই ত হলো ?

গুরুদেব। না, প্রথম অঙ্কটি হয় নি, কারণ ওটি ১৮৫৮ অব্দের ১৭ই অক্টোবর থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কিন্তু অঙ্কটা জানুয়ারি থেকে অক্টোবরের ১৭ই পর্য্যন্ত করা চাই।

আমি। কচ্ছি—

৩৬৫·২৫৯
− ৭৬·৮০৯
২৮৮·৪৫০ দিন

গুরুদেব। ওত ১৬ই পর্য্যন্ত হলো। ১৮৯·৫৮ হবে। এই অঙ্ক দুটি দিনাদি রবিকেন্দ্র। এই বার রবি-মধ্য নির্ণয় করতে হ'বে।

আমি। রবি-মধ্য কি?

গুরুদেব। রবি এক বৎসরে ৩৬০ অংশ গমন করেন, সুতরাং তাঁর তাঁর প্রত্যহ ৫৯·১৩৬ মধ্য গতি। তদনুসারে ঐ দিন পরিমিত কালের মধ্যগতি নির্ণয় করিতে হ'বে।

আমি। আপনার রবির মধ্যগতির টেবিল থেকে কস্‌লে হ'বে।

গুরুদেব। তা'হ'বে বটে, কিন্তু আমার খাতায় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থানুসারে গ্রহগণের মধ্যগতি কসা আছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয় প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত জ্যোতির্বিদ পত্রে প্রকাশিত ভৌম-সিদ্ধান্ত হ'তে সংকলিত ব'লে যে টেবিলটি লেখা আছে তাহার সাহায্যে কস। ভৌমসিদ্ধান্ত এক খান সংগ্রহ ক'রে নও, এবং তাঁহাদের সম্পাদিত "বৃহস্পতি" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত পাশ্চাত্য মতে চন্দ্র ও সূর্য্যস্পষ্ট সাধন প্রণালীও প্রকাশিত আছে, তাহাও ঐ জ্যোতির্বিদ কার্য্যালয়ে (১৮১নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে) পাওয়া যায়, তাহার সাহায্যে সূক্ষ্মতর চন্দ্রসূর্য্য সাধন করতে পারবে।

আমি। এটাও তবে সূক্ষ্ম নয়?

গুরুদেব। সূক্ষ্ম বই কি? দু এক কলার বেশী তফাৎ হ'বে না। কোনও কাজেই এর চেয়ে সূক্ষ্ম দরকার নাই। বিশেষতঃ পঞ্জিকার সাহায্যেই গ্রহগণের স্থান নির্ণয় সুবিধাজনক। পূর্ব্বেই ত বলেছি রাফেল-প্রণীত পঞ্জিকা খ্রীঃ ১৮০০ অব্দ হ'তে বর্ত্তমান বর্ষ পর্য্যন্ত সকল সময়েরই কিনতে পা'বে, তৎ পূর্ব্বের সময়ের জন্যই এই সব অপেক্ষাকৃত স্থূল পন্থা শেখালাম। এখন কস।

আমি। আজ্ঞা হাঁ। আপনি বল্‌লেন দৈনিক মধ্যগতি ৫৯·১৩৬। সুতরাং এই রকম টেবিল ক'রে নিলাম, তার পর এরই সাহায্যে কসি, কি বলেন।

১ = ৫৯·১৩৬
২ = ১১৮·২৭২
৩ = ১৭৭·৪০৮
৪ = ২৩৬·৫৪৪
৫ = ২৯৫·৬৮০
৬ = ৩৫৪·৮১৬
৭ = ৪১৩·৯৫২
৮ = ৪৭৩·০৮৮
৯ = ৫৩২·২২৪

গুরুদেব। কস।

আমি। খ্রীঃ ১৮৫৮ অব্দের জন্য পেয়েছি ১৮৯·৫৮ দিনাদি রবিকেন্দ্র। সুতরাং—

২০০ দিনের মধ্যগতি = ১১৮২৭·২ কলা
৮০ „ „ = ৪৭৩০·[illegible] „
৯ „ „ = ৫৩২·২ „
·৫ „ „ = ২৯·৬ „
·০৮ „ „ = ৪·৭ „
সমষ্টি ২৮৯·৫৮ „ „ = ১৭১২৪·৬ „

গুরুদেব। অংশাদি কর।

আমি। অখণ্ডিতাঙ্ককে ৬০ দিয়ে ভাগ দিলাম; হ'লো ২৮৫।২৪·৬ দুই শ' পচাশি অংশ চব্বিশ দাশমিক ৬ কলা।

গুরুদেব। এইবার রবির নীচাংশ নির্ণয় করতে হ'বে। তৎপক্ষে উক্ত ভৌমসিদ্ধান্তের সূত্র এই—

"অব্দপিণ্ডকে ১·০৩১ দ্বারা গুণ করিয়া গত মাসাঙ্কের দশাংশ সহ যে কলাদি হইবে তাহার সহিত ২৮১।১৩ যোগ করিলে রবি-নীচাংশ হইবে।"—(ভৌম-সিদ্ধান্ত-২৯পৃ)

আমি। ২৮১।১৩ কি?

গুরুদেব। ২৮১ অংশ ১৩ কলা ঐটিই ক্ষেপক অর্থাৎ খ্রীঃ ১৯০০ অব্দের আরম্ভে উহাই নীচাংশাদি। আর ১·০৩১ কলা বার্ষিক গতি। এখন কস

আমি। বর্ষগণ বা অব্দ পিণ্ড (—৪২) ঋণ ভাব [illegible] রেখেছিলুম। [illegible] ১·০৩১ কলা দিয়ে গুণ ক'রে পেলাম—৪৩·৩০২ কলা, গত মাসাঙ্ক ৯ তার দশাংশ ·৯ যোগ ক'রে ৪৪·২ ঋণভাবাপন্ন সুতরাং ২৮১ অংশ ১৩ কলার সঙ্গে বিয়োগ ক'রে পেলাম ২৮০ অংশ আটাইশ দাশমিক আট কলা।

—৪২
১·০৩১
২০৬২
৪১২৪
—৪৩·৩০২
·৯
—৪৪·২০২

২৮১।১৩
—৪৪·২
২৮০।২৮·৮ রবি নীচাংশ

গুরুদেব। ঠিক হয়েছে, এখন রবির মন্দ-ফল নির্ণয় কর্ত্তে হবে'।

আমি। মন্দ-ফল কি?

গুরুদেব। জান ত কক্ষার (গতিপথের) একদিক সূর্য্যের নিকটে আর একদিক কাজে-কাজেই দূরে। এই নিকটস্থ বিন্দুর নাম নীচ ও দূরতম বিন্দু উচ্চ। নীচাংশ থেকে মধ্যগ্রহের দূরত্বের নাম মন্দ-কেন্দ্র, তদ্দারা সাধিত ফল—মন্দ-ফল।

আমি। কিরূপে নির্ণয় করতে হ'বে?

গুরুদেব। ভৌমসিদ্ধান্তে যে সহজ পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে তাই তোমায় বলচি। পূর্ব্বে রবিকেন্দ্র নির্ণয় করেছ, তার চতুর্থাংশ গ্রহণ ক'রে তারি সাহায্যে উক্ত গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠাস্থিত সারিণীর সাহায্যে ফল গ্রহণ করতে হ'বে। রবিকেন্দ্র পাওয়া গেছে ২৮৯·৫৮ তাতে ক্ষেপ ৫·৩৭ যোগ ক'রে হ'লো ২৯৪·৯৫ তার চতুর্থাংশ ৭৩·৭৪, এখন দেখ ঐ সারিণীতে ৭৩ সংখ্যার ফল—১৫২·৯ এবং ৭৪ সংখ্যার ফল —১৫১·১ অন্তর হলো ০।১·৮; এই অঙ্কটিকে ·৭৪ দিয়ে গুণ ক'রে পেলাম ১·৩৩২; এ অঙ্কটি ৭৩ সংখ্যক ফল থেকে বিয়োগ করলে পাওয়া গেল,—১৫১·৬ ইহাই মন্দ-ফল। এখন এই ফলত্রয়ের সমষ্টিই—উক্ত দিনে গ্রীণীচ মধ্য মধ্যাহ্নে রবিস্পষ্ট।

```
৭৩ = —১৫২·৯
৭৪ = —১৫১·১
─────────────
      ০। ১·৮
        ·৭৪
─────────────
         ৭২
        ১২৬
─────────────
       ১·৩৩২

—১৫২·৯
   ১·৩
─────────
 ১৫১·৬
```

গ্রন্থকারের অনুমতি লইয়া টেবিলগুলি দিতে পারিতাম। কিন্তু মুদ্রণ প্রমাদ বলে যেরূপ ভ্রম হইতেছে তাতে পাঠক ঐ ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ক্রয় করিয়া তদনুসারে অঙ্ক কসিলে, ভ্রমের দায় নিষ্কৃতি পাইবেন। এই জ্যোতিষ প্রসঙ্গের ৫০ পৃষ্ঠায় টেবিলে ক চিহ্নিত স্তম্ভে ৯৯-এর * না হইয়া ০৫ তার নীচে ১১ ইত্যাদি হইবে। পাঠক, জ পর্য্যন্ত পাঁচ ছত্র লক্ষ্য করিলে দেখিবেন, যে তিনটি বৎসরের অঙ্কের পর ছুটি ফাঁক আছে, কেবল যে বারে চতুর্থ বৎসর লিপইয়ার হ'বে না, সেইবার একেবারে সাতটি বৎসরের অঙ্ক পর পর বসিবে। এতদনুসারে ঐ চক্রের শেষাংশ শুদ্ধ করিয়া লইবেন।

আমি। রবিকেন্দ্র পেয়েচি + ২৮৫।২৪·৬ অংশাদি নীচাংশাদি + ২৮০।২৮·৮, এবং মন্দ ফল পেয়েছি—১৫১·৬ সুতরাং প্রথম ত্'টি যোগ ক'রে হ'লো ৫৬৫ অংশ ৫৩·৭ কলা কিন্তু ৩৬০ অংশে এক আবর্ত্তন, সুতরাং চক্র বিয়োগ ক'রে হ'লো দুই শত পাঁচ অংশ তিপান্ন দাশমিক চারি কলা। এইবার মন্দ-ফল সংস্কার করি। ১ অংশ ৫১ দাশমিক ছয় কলা বাদ দিয়ে হ'লো ২০৪ অংশ ১·৮ কলা গ্রীণীচ মধ্যাহ্নে রবিস্ফুট অর্থাৎ সায়ন তুলার ২৪ অংশে রবি অবস্থিত। এও ত তফাৎ হ'লো।

```
+ ২৮৫।২৪·৬
+ ২৮০।২৮·৮
─────────────
+ ৫৬৫।৫৩·৪
— ৩৬০
─────────────
+ ২০৫।৫৩·৪
—   ১।৫১·৬
─────────────
+  ২০৪।১·৮
=  ৬।২৪।১·৮
  সায়ন রবি
```

গুরুদেব। বাপু, প্রক্রিয়া যত লাঘব করা যায় ততই তফাৎ হয়, এই গণনায় কলা পর্য্যন্ত গণিত, এবং অনেকগুলি সংস্কার পরিত্যক্ত হ'য়েছে। বৃহস্পতিতে প্রকাশিত রবিচন্দ্র স্পষ্ট নির্ণয়ের নিয়মানুসারে কসলে ও তফাৎ টুকু থাক্‌বে না।

আমি। আচ্ছা অপর অঙ্কটাও আমি এই নিয়মানুসারে কসি। দিনাদি রবিকেন্দ্র পেয়েছি + ১৭২·৩৩১—১০০ দিনে ৫৯১৩·৬; ৭০ দিনে ৪১৩৯·৫; ২দিনে ১১৮·৩; ৩ দিনে ১৭·৭ এবং ·৩৩ দিনে ১·৮; এখন ৫৯১৩·৬ + ৪১৩৯·৫ + ১১৮·৩। ১৭·৭ + ১·৮ — ১০১৯০·৯ কলা — ১৬৯ অংশ ৫০.৯ কলা অংশাদি রবিকেন্দ্র। তারপর ১·০৬১ কলা × ১২ বৎসর

পরিশিষ্ট

ভুঞ্জীরংশ্চ ততস্তেঽপি তচ্চিত্তা মৌনিনঃ সুখম্।
যদ্‌যদিষ্টতমং তেষাং তত্তদন্নমসত্বরম্ ॥ ৪৯ ॥
অক্রুধ্যংশ্চ নরো দদ্যাৎ সংস্তবেন প্রলোভয়ন্।
রক্ষোঘ্নাংশ্চ জপেন্মন্ত্রাংস্তিলৈশ্চ বিকিরেন্মহীম্ ॥ ৫০ ॥
সিদ্ধার্থকৈশ্চ রক্ষার্থং শ্রাদ্ধং হি প্রচুরচ্ছলম্ ॥ ৫১ ।
পৃষ্টৈস্তু তৃপ্তৈশ্চ তৃপ্তাঃ স্থ তৃপ্তাঃ স্ম ইতিবাদিভিঃ।
অনুজ্ঞাতো নরস্ত্বন্নং বিকিরেদ্ভুবি সর্ব্বতঃ ॥ ৫২ ॥
তদ্বদাচমনার্থায় দদ্যাদাপঃ সকৃৎ সকৃৎ।
অনুজ্ঞাঞ্চ ততঃ প্রাপ্য যতবাক্কায়মানসঃ ॥ ৫৩ ॥
সতিলেন ততোঽন্নেন পিণ্ডান্ সব্যেন পুত্রক।
পিতৃনুদ্দিশ্য দর্ভেষু দদ্যাদুচ্ছিষ্টসন্নিধৌ ॥ ৫৪ ॥
পিতৃতীর্থেন তোয়ঞ্চ দদ্যাৎ তেভ্যঃ সমাহিতঃ।
পিতৃন্ সঞ্চিন্ত্য তদ্ভক্ত্যা যজমানো নৃপাত্মজ ॥ ৫৫
তদ্বন্মাতামহানাঞ্চ দত্ত্বা পিণ্ডান্ যথাবিধি।
গন্ধমাল্যাদিসংযুক্তান্ দদ্যাদাচমনং ততঃ ॥ ৫৬ ॥

ধীরে, যথা সুখে তাঁ'রা তদ্গত অন্তরে
ভুঞ্জিবেন মৌনভাবে, বসি সবে পরে।
যাঁ'র যাহা ইষ্ট, দিবে যথাশক্তি আনি'
ভোজনার্থে ধীরে ধীরে মনে প্রীতি মানি'।
কোনরূপে নহে যেন ক্রোধের উদয়
তুষ্ট ভাবে দিবে সব হইয়া সদয়। ৪৯-৫০।
রক্ষো-বিঘ্ন বিনাশক মন্ত্র জপ করি'
তিল সিদ্ধার্থক ছড়াইবে করে ধরি'।
শ্রাদ্ধকার্য্যে ছিদ্র বহু জানিহ নিশ্চয়
রক্ষামন্ত্র সেই হেতু উপযুক্ত হয়। ৫১।
"পৃষ্টৈ স্তৃপ্তৈশ্চ তৃপ্তাস্থ" জিজ্ঞাসিবে পরে
"তৃপ্তাস্ম" বলিবে বিপ্রগণ ফুল্লান্তরে।
পরে তাঁহাদের আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ
করিবেন ভূমিতলে অন্ন বিকিরণ। ৫২।
পরে প্রতি জনে ধীরে আচমন তরে
একবার দিবে জল প্রফুল্ল অন্তরে,
অনুজ্ঞা লইয়া পরে করিয়া যতন
সংযত করিয়া বাক্য কায় আর মন
সতিল অন্নের পিণ্ড করিয়া গ্রহণ
দর্ভোপরি পিতৃতরে করিবে অর্পণ। ৫৩-৫৪
সমাহিত হ'য়ে ল'য়ে পিতৃতীর্থে বারি
দিবে ভক্তি-ভরে বৎস, উপরে তাহারি। ৫৫।
মাতামহোদ্দেশে পিণ্ড সেইরূপে দিবে,
গন্ধ মালা আচমন পরেতে অর্পিবে। ৫৬।

দত্ত্বা চ দক্ষিণাং শক্ত্যা সুস্বধাস্ত্বিতি তান্ বদেৎ।
তৈশ্চ তুষ্টৈস্তথেত্যুক্ত্বা বাচয়েদ্বৈশ্বদৈবিকান্॥ ৫৭॥
প্রীয়ন্তামিতি ভদ্রং বো বিশ্বেদেবা ইতীরয়েৎ।
তথেতি চোক্তে তৈর্বিপ্রৈঃ প্রার্থনীয়াস্তদাশিষঃ॥ ৫৮॥
বিসর্জ্জয়েৎ প্রিয়াণ্যুক্ত্বা প্রণিপত্য চ ভক্তিতঃ।
আদ্বারমনুগচ্ছেচ্চ আগচ্ছেচ্চানুমোদিতঃ॥ ৫৯॥
ততো নিত্যক্রিয়াং কুর্য্যাদ্ভোজয়েচ্চ তথাতিথীন্।
নিত্যক্রিয়াং পিতৃণাঞ্চ কেচিদিচ্ছন্তি সত্তমাঃ।
ন পিতৃণাং তথৈবান্যে শেষং পূর্ব্ববদাচরেৎ॥ ৬০॥
পৃথক্ পাকেন চেত্যন্যে কেচিৎ পূর্ব্বঞ্চ পূর্ব্ববৎ॥ ৬১॥
ততস্তদন্নং ভুঞ্জীত সহ ভৃত্যাদিভির্নরঃ॥ ৬২॥
এবং কুর্ব্বীত ধর্ম্মজ্ঞঃ শ্রাদ্ধং পিত্র্যং সমাহিতঃ।
যথা বা দ্বিজমুখ্যানাং পরিতোষোঽভিজায়তে॥ ৬৩॥

পরে, যথাশক্তি করি দক্ষিণা অর্পণ,
"সুস্বধাস্তু" মন্ত্র পাঠ করিবে তখন।
সন্তুষ্ট অন্তরে তবে যত বিপ্রগণ,
"তথাস্তু" বলিয়া মন্ত্র করি' উচ্চারণ
বৈশ্বদেব মন্ত্র করিবেন উচ্চারণ
তা'র অর্থ যেবা বলি শুন বাছাধন। ৫৭।
"বিশ্বেদেবগণ, প্রীত হৌন এই কর্ম্মে—
মঙ্গল হউক, মতি রহে যেন ধর্ম্মে।"
এইরূপ বলিবেন যবে বিপ্রগণ
আশীষ তাঁ'দের কাছে করিবে গ্রহণ। ৫৮।
প্রিয়ভাষে তুষি' পরে, সবে ভক্তিভরে
প্রণাম করিয়া তবে বিসর্জ্জিবে পরে।
দ্বারদেশে পিছে পিছে করিবে গমন
তথা থাকি' অনুমতি করিবে গ্রহণ।
পেলে অনুমতি তবে, আসিবে ফিরিয়া
যত দ্বিজগণে স্তবে সন্তুষ্ট করিয়া। ৫৯।
পরে ফুল্ল মনে গৃহে আগমন করি'
করিবেক নিত্য ক্রিয়া পিতৃকার্য্য স্মরি'
অতিথিগণেরে পরে করা'বে ভোজন,
পিতৃ তরে নিত্য ক্রিয়া করিবে সাধন।
কেহ কহে পিতৃ নিত্য ক্রিয়া কাজ নাই,
পূর্ব্বমত কর্ম্ম সব করিবে সদাই। ৬০।
কেহ কহে পৃথক্ পাকে নাহি প্রয়োজন
কোন মতে পৃথক পাক অবশ্য-সাধন। ৬১।
পরে সেই অন্ন লয়ে ভৃত্যাদির সনে
অবশ্য ভুঞ্জিবে অতি সমাহিত মনে। ৬২।
এরূপে করিবে শ্রাদ্ধকার্য্য বিচক্ষণ
কিম্বা যাহে পরিতুষ্ট হন বিপ্রগণ। ৬৩।

ত্রীণি শ্রাদ্ধে পবিত্রাণি দৌহিত্রং কুতপস্তিলাঃ ।
বর্জ্জ্যানি চাহু বিপ্রেন্দ্রে কোপোঽধ্বগমনং ত্বরা ॥ ৬৪ ॥
রাজতঞ্চ তথা পাত্রং শস্তং শ্রাদ্ধেষু পুত্রক ।
রজতস্য তথা কার্য্যং দর্শনং দানমেব বা ॥ ৬৫ ॥
রাজতে হি স্বধা দুগ্ধা পিতৃভিঃ শ্রূয়তে মহী ।
তস্মাৎ পিতৃণাং রজতমভীষ্টং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ঋতধ্বজচরিতে মদালসোপাখ্যানেঽ-
লর্কানুশাসনে পার্ব্বণশ্রাদ্ধকল্পো নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

দৌহিত্র কুতপ আর তিল সুনিশ্চয়,
এই তিন শ্রাদ্ধকার্য্যে সদা শুদ্ধ হয় ।
ক্রোধ, পথশ্রম আর ত্বরা অতিশয়
এই তিন শ্রাদ্ধকার্য্যে সদা ত্যজ্য হয় । ৬৪ ।
রজত নির্ম্মিত পাত্র শ্রাদ্ধে যোগ্য হয়
রজত দর্শন, দান, করিবে নিশ্চয় । ৬৫ ।
শুনি শাস্ত্রে এই মত আছয়ে বর্ণন,
রৌপ্য পাত্রে স্বধা দুহিলেন পিতৃগণ ।
অতএব পিতৃগণে রৌপ্য প্রীতিকর,
তুষ্টি পুষ্টি লাভ তাহে হয় নিরন্তর । ৬৬

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে ঋতধ্বজচরিতান্তর্গত মদালসা উপাখ্যানে
অলর্কানুশাসনে পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ-বিধি কথন নামক
একত্রিংশ অধ্যায় ।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

মদালসোবাচ।

অতঃপরং শৃণুষ্বেমং পুত্র ভক্ত্যা যদাহৃতম্।
পিতৄণাং প্রীতয়ে যদ্বা বর্জ্জ্যং বাপ্রীতিকারকম্॥ ১
মাসং পিতৄণাং তৃপ্তিশ্চ হবিষ্যান্নেন জায়তে।
মাসদ্বয়ং মৎস্যমাংসৈস্তৃপ্তিং যান্তি পিতামহাঃ॥ ২
ত্রীন্ মাসান্ হারিণং মাংসং বিজ্ঞেয়ং পিতৃতৃপ্তয়ে।
চতুর্ম্মাসাংস্তু পুষ্ণাতি শশস্য পিশিতং পিতৄন্॥ ৩॥
শাকুনং পঞ্চ বৈ মাসান্ ষণ্মাসান্ শূকরামিষম্।
ছাগলং সপ্ত বৈ মাসানৈণেয়ঞ্চাষ্টমাসিকীম্॥ ৪॥
করোতি তৃপ্তিং নব বৈ রুরোর্মাংসং ন সংশয়ঃ।
গবয়স্যামিষং তৃপ্তিং করোতি দশমাসিকীম্॥ ৫॥

মদালসা বলে শুন, কুতূহলে,
করিব এবে বর্ণন,
পিতৃগণ তরে যাহা ভক্তিভরে
যোগ্য হয় আহরণ,
যাহে প্রীতি হয় তাঁ'দের নিশ্চয়
বলিব এখন তাই,
নহে প্রীতি কর যাহা নিরন্তর
যত্নে বর্জ্জিবে সদাই। ১।
হবিষ্যান্ন দানে পান তৃপ্তি প্রাণে
এক মাস নিরন্তর,
মৎস্য-মাংসে হয় পিতামহ চয়
দুই মাস তৃপ্তিপর। ২।
হরিণের মাংস করিলে সমাংস
তিন মাস তৃপ্তি হয়;
শশমাংস হ'লে তৃপ্ত পিতৃদলে
চারি মাস সুনিশ্চয়। ৩।
পক্ষি-মাংস পেলে তাঁ'রা অবহেলে
তৃপ্তি পান পঞ্চ মাস,
ছয় মাস কাল না রহে জঞ্জাল
পেলে বরাহের মাস।
ছাগ মাংস হয় তাহে তৃপ্ত রয়
সপ্ত মাস পিতৃগণ,
পেলে এণ মাস তৃপ্ত অষ্ট মাস
শাস্ত্রের এই লিখন। ৪।
তৃপ্তি রুরু-মাসে না যায় ন' মাসে
গবয়েতে দশ মাস
সদা-তুষ্ট মন রহে পিতৃগণ
না করে ভোজন আশ। ৫।

তথৈকাদশমাসাংস্তু ঔরভ্রং পিতৃতৃপ্তিদম্ ।
সংবৎসরং তথা গব্যং পয়ঃ পায়সমেব বা ॥ ৬ ॥
বাদ্ধ্রীণসামিষং লৌহং কালশাকং তথা মধু ।
দৌহিত্রামিষমন্যচ্চ যচ্চান্যৎ স্বকুলোদ্ভবৈঃ ॥ ৭ ॥
অনন্তাং বৈ প্রযচ্ছন্তি তৃপ্তিং গৌরীসুতস্তথা ।
পিতৃণাং নাত্র সন্দেহো গয়াশ্রাদ্ধঞ্চ পুত্রক ॥ ৮ ॥
শ্যামাক-রাজশ্যামাকৌ তদ্বচ্চৈব প্রশাতিকাঃ ।
নীবারাঃ পৌষ্কলাশ্চৈব ধান্যানাং পিতৃতৃপ্তয়ে ॥ ৯ ॥
যব-ব্রীহি-সগোধুম-তিল-মুদ্গাঃ সসর্ষপাঃ ।
প্রিয়ঙ্গবঃ কোবদ্রাশ্চ নিষ্পাবাশ্চাতিশোভনাঃ ॥ ১০ ॥
বর্জ্জ্যা মর্কটকাঃ শ্রাদ্ধে রাজমাষাস্তথাণবঃ ।
বিপ্রুষিকা মসূরাশ্চ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি গর্হিতাঃ ॥ ১১ ॥
লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং পিণ্ডমূলকম্ ।
করম্ভং যানি চান্যানি হীনানি রসবর্ণতঃ ॥ ১২ ॥

ঔরভ্রের মাসে　　একাদশ মাসে
　তৃপ্তি, ধীরে লুপ্ত হয়
গব্য পয়ঃ আর　　পায়সের সার
　সম্বৎসরে দূর নয় । ৬ ।
গণ্ডারের মাসে　　যেই তৃপ্তি আসে
　কিম্বা সে শোণিতে তা'র
কালশাকে আর　　মধু মিষ্টধার
　দৌহিত্রের দত্ত আর
কিম্বা কুলোদ্ভব　　অন্য লোক সব
　যেই মাংস করে দান । ৭ ।
সেই সমুদয়　　অনন্ত নিশ্চয়
　বাড়ে তাহে পিতৃ-প্রাণ ।
গৌরীসুত আর　　শ্রাদ্ধ সে গয়ার
　তৃপ্ত যাহে পিতৃগণ
অনন্ত অক্ষয়　　কহিনু নিশ্চয়
　করহ বৎস, শ্রবণ । ৮ ।

ধান্য সে শ্যামাক　　সে রাজশ্যামাক
　প্রশাতিকা নামে আর,
স-সার পৌষ্কর　　যাহে পিতৃদল
　তৃপ্তির না পান পার ।
ব্রীহি যব আর　　গোধূম সম্ভার
　তিল আর মুদ্গচয়
সর্ষপ, প্রিয়ঙ্গু　　কোদ্রবসে আর
　নিষ্পাব শোভন হয় । ৯-১০ ।
শ্রাদ্ধে বর্জ্য হয়　　মর্কটক চয়
　রাজমাষ অণু আর
মসুর নিচয়　　বিপ্রুষিক হয়
　শ্রাদ্ধেতে গর্হিত সার । ১১ ।
লশুন, গৃঞ্জন,　　পলাণ্ডুর গণ
　পিণ্ডমূল নামে আর
রসে বর্ণে দীন　　গন্ধেতে মলিন
　করম্ভ অতি অসার । ১২ ।

গান্ধারিকামলাম্বুনি লবণান্যষরাণি চ।
আরক্তা যে চ নির্য্যাসাঃ প্রত্যক্ষলবণানি চ ॥ ১৩ ॥
বর্জ্জ্যান্যেতানি বৈ শ্রাদ্ধে যচ্চ বাচা ন শস্যতে।
যচ্চোৎকোচাদিনা প্রাপ্তং পতিতাদ্‌যদুপার্জ্জিতম্ ॥ ১৪ ॥
অন্যায়-কন্যাশুল্কোত্থং দ্রব্যঞ্চাত্র বিগর্হিতম্।
দুর্গন্ধি ফেনিলঞ্চাম্বু তথৈবাল্পতরোদকম্ ॥ ১৫ ॥
ন লভেদ্ যত্র গৌস্তৃপ্তিং নক্তং যচ্চাপ্যুপাহৃতম্।
যচ্চ সর্ব্বজনোৎসৃষ্টং যচ্চাভোজ্যং নিপানজম্।
তদ্বর্জ্জ্যং সলিলং তাত সদৈব পিতৃকর্ম্মণি ॥ ১৬ ॥
মার্গমাবিকমৌষ্ট্রঞ্চ সর্ব্বমৈকশফঞ্চ যৎ।
মাহিষং চামরঞ্চৈব ধেন্বা গোশ্চাপ্যনির্দ্দশম্ ॥ ১৭ ॥
পিত্রর্থং মে প্রযচ্ছস্বেত্যুক্ত্বা যচ্চাপ্যুপাহৃতম্।
বর্জ্জনীয়ং সদা সদ্ভিস্তৎ পয়ঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি ॥ ১৮ ॥

গন্ধারিকা আর লবণাদি ক্ষার
অলাবু ত্যজ্য নিশ্চয়,
আরক্ত নির্য্যাস যে দ্রব্যে প্রকাশ
তাহা গ্রাহ্য কভু নয়। ১৩।
বাক্যে শুদ্ধ নয় তাও বর্জ্য হয়
সন্দেহ নাহিক তার
উৎকোচ অর্জ্জিত যে জন পতিত
বর্জ্য তার দ্রব্য ভার। ১৪।
কন্যাশুল্ক ধন করিবে বর্জন
ঘৃণিত সে ধন অতি,
পিতৃকার্য্য তায় শোভা নাহি পায়
ঘটায় বহু দুর্গতি।
দুর্গন্ধ যে জল সফেন সমল
কিম্বা স্বল্পোদক যা'য়,
গোগণ যাহায় তৃপ্তি নাহি পায়
শ্রাদ্ধ নাহি হয় তা'য়।

নিশাকালে জল আনিলে নিষ্ফল
কার্য্য তাহে সুনিশ্চয়;
সর্ব্বজনোৎসৃষ্ট কভু নহে ইষ্ট,
নিপানজ যেবা হয়। ১৫-১৬।
মৃগ-দুগ্ধ আর দুগ্ধ সে অজার
উষ্ট্রজাত দুগ্ধ আর,
অখণ্ডিত ক্ষুর আছে যে পশুর
গ্রাহ্য নহে দুগ্ধ তা'র।
প্রসবের পর দশদিনান্তর
যে গাভীর নাহি হয়,
মহিষের ক্ষীর কিম্বা চমরীর
শ্রাদ্ধে ত্যজ্য সুনিশ্চয়। ১৭।
"পিতৃ শ্রাদ্ধ তরে দুগ্ধ দেহ মোরে"
এইরূপ ভিক্ষা করি'
যদি দুগ্ধ পায় শ্রাদ্ধ নহে তায়
রাখিবে এ বাক্য স্মরি'। ১৮।

বর্জ্জ্যা জন্তুমতী রূক্ষা ক্ষিতিঃ প্লুষ্টা তথাগ্নিনা।
অনিষ্টা দুষ্টশব্দোগ্রা দুর্গন্ধা চাত্র কর্ম্মণি ॥ ১৯ ॥
কুলাপমানকাঃ শ্রাদ্ধে ব্যাযুজ্য কুলহিংসকাঃ।
কুলাধমো ব্রহ্মহা চ তথা বৈ রোগিণোন্ত্যজাঃ।
নগ্নাঃ পাতকিনশ্চৈব হন্যুর্দৃষ্ট্যা পিতৃক্রিয়াম্ ॥ ২০
অপুমানপবিদ্ধশ্চ কুক্কুটো গ্রামশূকরঃ।
শ্বাচৈব হন্তি শ্রাদ্ধানি যাতুধানাশ্চ দর্শনাৎ ॥ ২১ ॥
তস্মাৎ সুসংবৃতো দদ্যাৎ তিলৈশ্চাবকিরেন্মহীম্।
এবং রক্ষা ভবেচ্ছ্রাদ্ধে কৃতা তাতোভয়োরপি ॥ ২২
শাবসূতকিসংস্পৃষ্টং * দীর্ঘরোগিভিরেব চ।
পতিতৈর্মলিনৈশ্চৈব ন পুষ্ণাতি পিতামহান্ ॥ ২৩ ॥

ক্ষিতি জন্তুমতী কিম্বা রূক্ষা অতি
ভূমি অগ্নি দগ্ধ আর
দুর্গন্ধেতে ভরা যেই খানে ধরা
মৃত্তিকা না ল'বে তা'র। ১৯।
কুল-অপমান- রত যা'র প্রাণ
কুলধ্বংসকারী আর,
কুলের অধম হেন যত জন
ব্রহ্মঘাতী দুরাচার,
রোগযুক্তগণ, অন্ত্যজ যে জন
ত্যজ্য শ্রাদ্ধে জেনো সার।
নগ্ন, পাপি জনে শ্রাদ্ধ দরশনে
নষ্ট হয় শ্রাদ্ধ তার। ২০।
নপুংসক জন অপবিদ্ধগণ
কুক্কুট, গ্রাম শূকর,
রাক্ষস, কুক্কুর শুভ করে দূর
শ্রাদ্ধ দর্শনের পর। ২১।

এই সে কারণে, সদা সযতনে
সুসংবৃত হয়ে অতি,
ভূমির উপরে তিল ব্যাপ্ত ক'রে
রবে সদা শুদ্ধ মতি।
শুন, বৎস, সার এই ত প্রকার
সাবধান হওয়া চাই,
উভয়ের তরে শুভ লাভ হ'বে
শ্রাদ্ধেতে সন্দেহ নাই। ২২।
কাকে কি শূকরে স্পর্শ যদি করে
কিম্বা চিররুগ্ন জনে
পতিত মলিন জন অতি হীন
বর্জিবে অতি যতনে।
এদের স্পর্শন উচিত বর্জন
সন্দেহ নাহিক তা'য়,
শ্রাদ্ধেতে এমন পিতামহগণ
কভু পুষ্টি নাহি পায়। ২৩।

* কাকশূকর সংস্পৃষ্টমিতি বা পাঠঃ

বর্জ্জনীয়ং তথা শ্রাদ্ধে তথোদক্যাশ্চ দর্শনম্।
মুণ্ডশৌণ্ডসমাভ্যাসো যজমানেন চাদরাৎ ॥ ২৪ ॥
কেশকীটাবপন্নঞ্চ তথা শ্বভিরবেক্ষিতম্।
পূতি-পর্য্যুষিতৈশ্চৈব বার্ত্তাক্যভিষবাংস্তথা।
বর্জ্জনীয়ানি বৈ শ্রাদ্ধে যচ্চ বস্ত্রানিলাহতম্ ॥ ২৫ ॥
শ্রদ্ধয়া পরয়া দত্তং পিতৃণাং নামগোত্রতঃ।
যদাহারাশ্চ তে জাতাস্তদাহারত্বমেতি তৎ ॥ ২৬ ॥
তস্মাচ্ছ্রদ্ধাযুতং পাত্রে যচ্ছ ত্বং পিতৃকর্ম্মণি।
যথাবচ্চৈব দাতব্যং পিতৃণাং তৃপ্তিমিচ্ছতা ॥ ২৭ ॥
যোগিনশ্চ সদা শ্রাদ্ধে ভোজনীয়া বিপশ্চিতা।
যোগাধারা হি পিতরস্তস্মাৎ তান্ পূজয়েৎ সদা ॥ ২৮
ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যো যোগী ত্বগ্রাশনো যদি।
যজমানঞ্চ ভোক্তৃংশ্চ নৌরিবাম্ভসি তারয়েৎ ॥ ২৯ ॥

এই সমুদয় শ্রাদ্ধে বর্জ্য হয়
রজঃস্বলা দরশন,
মুণ্ডিত যে জন সুরাশক্তগণ
বর্জ্জিবে করি' যতন। ২৪।
কেশ-কীটাপন্ন দুষ্ট যেই অন্ন
কুক্কুর বীক্ষিত আর
পূতি পর্য্যুসিত বস্ত্রানিলান্বিত
দ্রব্য ত্যজ্য জেনো সার।
অভিষব আর বার্ত্তাকী অসার
শ্রাদ্ধে বর্জ্জ্য সুনিশ্চয়,
এই সমুদয় শ্রাদ্ধে বর্জ হয়
নাহিক তাহে সংশয়। ২৫।
শ্রদ্ধা সহকারে গোত্র অনুসারে
নাম করি' উচ্চারণ
শ্রাদ্ধের সময় যাহা দত্ত হয়
ভুঞ্জে তাহা পিতৃগণ। ২৬।
এই সে কারণে অতীব যতনে
অতি শ্রদ্ধাবান হ'য়ে
পিতৃগণ তরে পবিত্র অন্তরে
শ্রাদ্ধ-দ্রব্য দিবে ল'য়ে।
শস্ত দ্রব্যচয় সদা যোগ্য হয়
সেই সব সযতনে
পিতৃ-তৃপ্তি তরে পবিত্র অন্তরে
দিবে সদা পিতৃগণে। ২৭।
বিপশ্চিত জন শ্রাদ্ধের কারণ
নিমন্ত্রিবে যোগীগণে,
পূজিবে সবারে শ্রদ্ধা সহকারে
ভক্ষ্য পেয় অর্পণে।
যোগের আধার জেনো সদা সার
পিতৃগণ সুনিশ্চয়
এই সে কারণে সদা যোগীগণে
পূজন সুযুক্ত হয়। ২৮
সহস্র ব্রাহ্মণ হ'তে একজন
যোগির আগে ভোজন,
জলে নৌকা যথা যজমানে তথা
অনা'সে করে তারণ। ২৯।

৺ কবিবর দ্বিজেন্দ্র লাল রায়

"পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই, তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি,
বাসনা—তাহাই গুছায়ে যতনে সাজাবো তোমার চরণ দুটি;
চাহিনাক কিছু, তুমি মা আমার, এই জানি, কিছু নাহি জানি আর.
তুমি গো জননি হৃদয় আমার, তুমি গো জননি আমার প্রাণ।"

India Press, Calcutta.

"যে দিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কামধর্ম্ম একত্রিত হইবে, সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে, তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না। তোমরা ভারতবাসী, তোমরা করিলেই হইবে। দুই-ই তোমাদের হাতে। এখন ইচ্ছা করিলে তোমরাই পৃথিবীর কর্ত্তা ও নেতা হইতে পার। সে আশা যদি তোমাদের না থাকে তবে বৃথায় আমি বকিয়া মরিতেছি।"

বঙ্কিমচন্দ্র

৪র্থ খণ্ড
৪র্থ বর্ষ

আষাঢ়, ১৩২০

৯ম সংখ্যা

আলোচনা

১। বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষেত্র ও জাতীয় সাহিত্য

তোমরা যদি বাঙ্গালা সাহিত্যকে বড় করিতে চাও, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতিকে বড় করিয়া তোল। বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়া যদি সকল ভাব প্রকাশ করিতে চাও, সকল কথা বলিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বাঙ্গালার সমাজকে সকল বিষয়ে গৌরবান্বিত করিতে চেষ্টা কর, বাঙ্গালার লোকগুলিকে দূরদর্শী, প্রশস্তহৃদয় ও চরিত্রবান্ করিবার আয়োজন কর। যদি বাঙ্গালীর সাহিত্যকে বিশাল ও বিপুল বিস্তৃত দেখিতে চাও, তাহা হইলে নানা উপায়ে বাঙ্গালা দেশটাকে মানব-সমাজে পূজ্য বরেণ্য মহনীয় করিয়া তোল। বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত হউক, বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্য বাড়িয়া উঠুক, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য মানবজাতির সারস্বতক্ষেত্রে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। বাঙ্গালার সমাজ হইতে ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ কথা, স্বার্থের কথা, নীচাশয়তার কথা দূর করিয়া দাও। তাহার

পরিবর্ত্তে অসাধারণ চিন্তা, অসামান্য আলোচনা, অনন্ত কর্ম্মের কথা, অসাধ্য সাধনের প্রচেষ্টা, অসীম প্রেম ও অফুরন্ত জ্ঞানের কথা বাঙ্গালার জনগণের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে স্থান পাউক। বাঙ্গালার জেলায় জেলায় পঞ্চনদের কথা, মহারাষ্ট্রের কথা, দ্রাবিড়ের কথা, সিংহলের কথা আলোচিত হউক। পঞ্চনদের জেলায় জেলায়, দ্রাবিড়ের অঞ্চলে অঞ্চলে, সিংহলের নগরে নগরে বাঙ্গালার অনুষ্ঠান, বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠান, বাঙ্গালার ইতিহাস-কথা, বাঙ্গালীর শিল্পনৈপুণ্য, বাঙ্গালীর কাজকর্ম্ম আলোচিত হউক। বাঙ্গালার বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে চীনের সাহিত্য, জাপানের শিল্প, আমেরিকার ব্যবসায়, ইউরোপের রাষ্ট্র বাঙ্গালী শিশু ও যুবকের প্রতিদিনকার শিক্ষণীয় বিষয় হউক। চীন-জাপানের বিদ্যামন্দিরে, বার্লিন হার্ভার্ড কেম্ব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর সমাজ, বাঙ্গালীর রীতিনীতি বিভিন্ন দেশবাসীর পাঠ্য তালিকায় সন্নিবিষ্ট হউক। বাঙ্গালী দুঃসাধ্য কর্ম্ম আরম্ভ করুক, অসম্ভব সাধনায় নিযুক্ত হউক, বাঙ্গালী তাহার কর্ম্ম-রাজ্য বিস্তৃত করুক, বিশাল জগৎকে তাহার চিন্তার আয়ত্ত করুক, তাহা হইলে বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্মিলনগুলি সার্থক হইবে।

বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষেত্রকে সুদূরবিস্তৃত করিয়া তুলিবার জন্য উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের মালদহ অধিবেশনে পঠিত 'সাহিত্যসেবী' প্রবন্ধে যে কথা বলা হইয়াছিল তাহা হইতে আমরা নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম—

"মানবের কর্ম্মক্ষেত্রই সকল প্রকার ভাব ও ধারণার কারণ, জীবনের বৈচিত্র্যে ও গভীরতায়ই চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্য জন্মে। সুতরাং ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশ্বর্য্যশালী করিতে হইলে, বিবিধ উপায়ে প্রকৃত জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রকে বিচিত্র সমস্যাপূর্ণ ও ঘটনাবহুল করিয়া তুলিতে হইবে। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সমগ্রতা, সর্ব্বগ্রাহিতা এবং সচেষ্ট কর্ম্মপ্রবণতা প্রবিষ্ট না হইলে ভাষা নিজের সামর্থ্য প্রকটিত করিবার সুযোগ পায় না; সাহিত্যও নিজকে সর্ব্বত্র প্রসারিত করিয়া বিপুল ও বেগবান্ হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য-গুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইলে আমাদের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণের জীবন যাহাতে বিচিত্র কর্ত্তব্যময় এবং ঘটনা-বহুল হয়, তাহার চর্চ্চা করিতে হইবে। বাঙ্গালাদেশ এবং মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব ও আন্ধ্র দেশ যাহাতে পরস্পর পরস্পরকে বিশেষভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিনিতে পারে, তাহার আয়োজন করিতে হইবে। এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশে যাইয়া যাহাতে কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে, তাহার সহায়তা করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাসমূহ শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙ্গালা, মারাঠি ও তামিল অন্ততঃ এই তিনটী ভাষা যাহাতে ভারতবর্ষের সকল স্থানে উচ্চশিক্ষার বিষয় হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপে আমাদের প্রত্যেক প্রদেশকে অন্যান্য প্রদেশের সহিত বিচিত্র উপায়ে কুটুম্বিতা স্থাপন করিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ করিতে হইবে। ভারতবাসীরা যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে

জাতীয় শিক্ষা ও সাহিত্যের অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষক মাননীয় বিচারপতি

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দিনাজপুর অধিবেশনের সভাপতি।

(হিন্দুপেট্রিয়ট হইতে সংগৃহীত)

India Press, Calcutta.

বাস করিয়া তাহাদের সমাজে বিদ্যায়, বাণিজ্যে এবং অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে কর্ম্মচারীর পদে নিয়োজিত হইয়া যাহাতে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা বিদেশেই জীবন যাপন করিতে পারেন, বিভিন্ন দেশে যাহাতে আমাদের প্রচারকেরা ভারতবর্ষের সমাজ, ধর্ম্ম ও সাহিত্য আলোচনা করিয়া শিক্ষিত জাতির সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতে পারেন, এবং যাহাতে বিভিন্ন সভ্যজাতির রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সমাজের অবস্থা, সাহিত্যের ক্রম-বিকাশ, ব্যবসায় এবং ধর্ম্মজীবন আমাদের প্রদেশসমূহে সুবিস্তৃতরূপে আলোচিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ফরাসী ও জার্ম্মান্ অন্ততঃ এই দুইটি ইউরোপীয় ভাষা ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষা-পদ্ধতিতে সুপ্রচলিত করিতে হইবে।"

২। বিহারী স্বদেশসেবক কর্ম্মবীর লঙ্গৎ সিংহ

গত এপ্রিল মাসে মজঃফরপুর ভূমিহার ব্রাহ্মণ কলেজ গৃহে মৃত মহাত্মা লঙ্গৎ সিংহের জন্য একটি শোক-প্রকাশ-সভা আহুত হইয়াছিল। আমাদের ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। বাবু অরিক্ষ সিংহ, মৌলবী আবদুল হালিম, বাবু জং বাহাদুর প্রভৃতি বিহারের কতিপয় বিখ্যাত ভদ্রলোক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাহার বক্তৃতায় মৃত মহাত্মার জীবনীর একটা সুন্দর বিবরণ সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজকাল রাষ্ট্রীয়দিক্ হইতে বিহার প্রদেশ বঙ্গদেশ হইতে পৃথক্ হইলেও যুক্তবঙ্গের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ চিরদিনই অক্ষুন্ন থাকিবে। কারণ বহুকাল হইতে বিহার ও বঙ্গ একযোগে কাজ করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের চিন্তা ও আদর্শ চিরদিনই এক, তাহাদের উভয়েরই লক্ষ্য একাভিমুখী; আর আজও বাঙ্গালী বিহারী ছাড়া চলিতে পারে না; বিহারীও বাঙ্গালী ছাড়া চলিতে পারে না। বাবু লঙ্গৎ সিংহকে বিহারীরা Maker of Modern Tirhut আখ্যা দিয়াছিলেন। তিনি যদি বিহারে উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভূমিহার কলেজ স্থাপন না করিতেন, তবে আজ বিহার স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত কি না সন্দেহ। তিনি শুধু বিহারের শিক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন এমন নহে, বঙ্গমাতার যাবতীয় দুঃখ নাশের জন্য তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহুপূর্ব্বে তিনি বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় স্বাধীন অন্ন-সংস্থানের জন্য শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে লোকদিগকে উৎসাহ দিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার প্রধান মত ছিল—দেশকে সকল দিক হইতে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলা। সেই জন্য দেশের যাবতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স্, ইণ্ডিয়ান্ ষ্টোরসের তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৯০৬ সালে কলিকাতায় যে শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হয়, তাহার সফলতার একমাত্র কারণ মহাত্মা লঙ্গৎ সিংহের ঐকান্তিকী চেষ্টা। সে বৎসর জাতীয় মহাসমিতি ও শিল্পপ্রদর্শনী

উভয়ই কলিকাতায় সংগঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গালীরা গভর্ণমেণ্টের নিকট অর্থের সাহায্য কিছুমাত্র পান নাই ও সাধারণ লোক শিল্প-প্রদর্শনীর জন্য সাহায্যদানে অনিচ্ছুক ছিল, এই দুই কারণে প্রদর্শনীর সফলতার আশা সকলকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু রোগশয্যাগত লঙ্গৎ সিংহ তখন গাড়ীতে চড়িয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রদর্শনী সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছিল। বিহারের প্রধান কর্ম্মবীর লঙ্গৎ সিংহের চেষ্টায় বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল। লঙ্গৎ সিংহের অনুসরণ করা বাঙ্গালী ও বিহারী যুবকদিকের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য।

৩। মারাঠা জাতির সমাজ-সংস্কার

গত এপ্রিল মাসের 'মডার্ণ ওয়ার্লড' পত্রিকায় মহারাষ্ট্রবাসী শ্রীযুক্ত ভাজেকার বি, এ, এল, এল, বি, মহোদয় উত্তর ও দক্ষিণ মারাঠা জাতির মিলনের প্রস্তাব করিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি ও তাঁহার একজন বন্ধু ইতিমধ্যে আন্ধ্রদেশের মারাঠী ব্রাহ্মণ-দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ট্রেণেই দুইজন মাদ্রাজী ব্রাহ্মণের সহিত ঘটনাক্রমে দেখা হয়। তাঁহাদের বেশভূষা তামিলী হইলেও কথাবার্ত্তা প্রায় বোম্বাইয়ের মারাঠাদিগের ন্যায়। তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় ভাজেকার মহাশয় জানিলেন যে, দুই জাতিরই আচার-ব্যবহার প্রায় এক। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের বেশভূষা, কথাবার্ত্তা, হাবভাব প্রভৃতি অনেক বিষয়েই খুব বেশী সাদৃশ্য আছে। তাঁহারা তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপলি, মাদুরা, টিনেভেলি, টিচেঙ্গুাম প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইয়া ঐ সমস্ত স্থানের স্বজাতীয়দিগকে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভা আহ্বান করিয়া সেখানকার লোকমত এই মিলনের পক্ষপাতী কি না পরীক্ষাও করিয়াছিলেন। কোন কোন সভায় মাদ্রাজীরা বোম্বাই ব্রাহ্মণদিগের সহিত বিবাহের আদান প্রদানে সম্মত আছেন, এ কথাও প্রকাশ করিয়াছেন। বোম্বাইয়েও এইরূপ সদিচ্ছার অভাব নাই। শ্রীযুক্ত ভাজেকার যাহাতে এই মিলন সম্ভবপর হয় তজ্জন্য উভয় দেশবাসী ও বিশেষভাবে মাদ্রাজীর নিকট কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন —"বোম্বাইয়ের কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ এইরূপ মিলনে আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া যেমন সম্মতি-পত্র মুদ্রিত করিয়া বিলি করিতেছেন তেমনি মাদ্রাজ হইতেও এইরূপ সম্মতি-পত্র প্রচারিত হউক। ইহার বহুল প্রচারের জন্য মাদ্রাজের দেশস্থ ব্রাহ্মণবহুল গ্রামসমূহে সভাসমিতি আহূত হওয়া উচিত। মাদ্রাজ হইতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ বোম্বাইয়ে যাইয়া সভা সমিতি আহ্বান করুন। মাদ্রাজে বিশুদ্ধ মারাঠী ভাষায় কথাবার্ত্তা হওয়ার জন্য এখন হইতে বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক; এই উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মারাঠীভাষার পুনঃ প্রবর্ত্তন হউক।" এইরূপ আরও কয়েকটী প্রস্তাবে মিঃ ভাজেকার বোম্বাইয়ের ব্রাহ্মণগণের সহিত মাদ্রাজের দেশস্থ ব্রাহ্মণগণের মিলনের পথ দেখাইয়াছেন। তন্মধ্যে মাদ্রাজীদিগকে

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ সমূহে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য অনুরোধই উল্লেখযোগ্য। মান্দ্রাজী ছাত্র ও ছাত্রীরা যদি বোম্বাই প্রদেশে গিয়া বিদ্যালয়-কলেজে তাহাদের সহিত মিশিতে পারেন তবে বিবাহের আদান-প্রদান কতকটা সহজ-সাধ্য হইয়া আসিবে। পরিশেষে শ্রীযুক্ত ভাজেকার ব্রাহ্মণেতর জাতিদিগের মধ্যেও যাহাতে এইরূপ মিলন সংঘটিত হয় তাহার জন্য সাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন! তবে তিনি তাহাদের বিষয়ে বেশী কিছু জানেন না তাই বেশী কিছু লিখিতে বা বলিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত ভাজেকারের এই উদ্দেশ্য অতি মহৎ। আমরা আশা করি, তাঁহার এই আশা অচিরেই পূর্ণ হইবে। আর আমরাও বাঙ্গালী একবার চাহিয়া দেখি ভারতের দশা! আমরা ও আমাদের ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতির বিভিন্ন শ্রেণীতে বিবাহের আদান প্রদান করিতে পারি। তাহাতে জাতি-গঠনের সহায়তা করা হইবে। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, ভারতের কায়স্থ-সমাজে মিলনের চেষ্টা করিতেছেন। ময়মনসিংহ গৌরীপুরের স্বদেশসেবক জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহোদয়, বাঙ্গালার বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণসমাজে ঐক্য বন্ধনের প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহাদের সাধু উদ্যম জয়যুক্ত হউক।

*
* *

৪। আধুনিক জাপানের জাতীয় শিক্ষা

জাপান হইতে প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ 'সাহিত্যে' যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা হইতে আমাদের শিক্ষা-সংস্কারকগণ অনেক নূতন কথা শিখিবেন। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

"প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক অতি সরল ভাষায় লিখিত। তাহাতে নানারূপ উপদেশপূর্ণ সুন্দর সুন্দর গল্প সন্নিবিষ্ট আছে। গল্পগুলি প্রায়শঃই সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। পুরাকালের কীর্ত্তিমান্ স্বদেশভক্ত পুরুষদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত বিশদরূপে এই সমস্ত পুস্তকে বর্ণিত আছে। পুস্তকে সমস্ত গল্পের আদ্যোপান্ত না থাকিলে শিশুর মাতা-পিতাকে উহা বলিতে হয়। অভিভাবকেরাও সকলে সুশিক্ষিত। তাঁহারা সন্তানদিগের আগ্রহ বর্দ্ধিত করিবার জন্য গল্পগুলি বেশ সাজাইয়া গুছাইয়া বলিয়া থাকেন। ইহাতে বালক-বালিকাদিগের গল্প শুনিবার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠে; তাহারা স্বজাতীয় ইতিহাসবিশ্রুত মহাত্মাগণের কীর্ত্তিসমূহও হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকে। এইরূপে জাপ-শিশুগণ বাল্যকাল হইতে জাতীয় গৌরব শিক্ষা করিয়া থাকে।

* * * *

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক সপ্তাহে ছাত্রবর্গকে লইয়া শিক্ষকগণকে ভ্রমণে (Excursion) বাহির হইতে হয়। এই সময়ে ছাত্রগণকে নানারূপ কায়িক ক্লেশে অভ্যস্ত হইতে হয়। কোনও দিন ঝড়-বৃষ্টিতে তাহাদিগকে কর্দ্দমময় প্রকাণ্ড ময়দান অতিক্রম করিতে হয়; আবার কোনও দিন হয় ত অত্যন্ত রৌদ্রে দুই তিন মাইল পথ পদব্রজে চলিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিতে হয়। বালক-বালিকা-

দিগকে নদী কিম্বা সমুদ্রে পড়িয়া সাঁতার শিক্ষা করিতে প্রায়শঃই দেখা যায়। অবশ্য শিক্ষকগণ সর্ব্বদাই তাহাদের সঙ্গে থাকেন। তাঁহাদিগকেও ছাত্রগণের সহিত রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি ভোগ করিতে হয়। আমি একদা একদল ছাত্রকে পর্ব্বতের পাদদেশে কৃত্রিম যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি। ইহারা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। শিক্ষক একপার্শ্বে বসিয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষের বালকগণের মধ্যে কেহ সৈন্যাধ্যক্ষ, কেহ রণবাদ্যকর, এবং অন্যান্য সকলে যোদ্ধার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। আমি তাহাদের রণ-কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। জঙ্গলময় পর্ব্বতে শত্রুগণ কিরূপ ভাবে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, এবং তৎকালে কি বিধান আবশ্যক, শিক্ষকগণ তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। বলা আবশ্যক এই সময়ে বালকগণ প্রকৃত যোদ্ধার বেশ ধারণ করিয়া থাকে। তাহাদের হাতে ছোট ছোট ধার-বিহীন তরবারি ও হাওয়ার বন্দুক (air gun) দেওয়া হয়। দুষ্ট বালককে যে প্রণালীতে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহাও আশ্চর্য্যজনক। কোনও বালক অন্যায় কাজ করিলে, তাহাকে প্রহার করা দূরে থাকুক একটু রূঢ় ভাবাও ব্যবহৃত হয় না। দুই একটী সদুপদেশ দিয়া পাঠশালার ছুটী হইলে তাহাকে কিছুক্ষণের জন্য আটকাইয়া রাখা হয়। অন্যান্য ছাত্রবৃন্দ যখন মহা কোলাহল করিয়া ছুটী ঘোষণা করে, এবং গান ধরিয়া বিদ্যালয় হইতে বাহির হইতে থাকে, তখন আবদ্ধ বালকের মানসিক অবস্থা কিরূপ হয় তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

ছোট ছোট বালক-বালিকাকে কিরূপে আত্মসম্মান শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা একবার শুনুন। প্রহৃত হইয়া যদি কোনও ছাত্র অপর কোনও ছাত্রের বিরুদ্ধে শিক্ষকের কাছে নালিশ করে, তাহা হইলে, বিচারপ্রার্থীকে তিরস্কৃত হইতে হয়। মার খাইয়া চুপ করিয়া থাকা শুধু যে কাপুরুষের লক্ষণ, তাহা নয়। জাপানীরা বলে, তাহাতে বংশেরও গৌরবহানি হয়। এই কারণেই উপহাসচ্ছলে গায়ে হাত দিলেও জাপানীরা স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সকলেই তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার করিয়া থাকেন।

শিশুগণের হস্তাক্ষর-শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। জাপানী ভাষার অক্ষর অসংখ্য। প্রায় তিন সহস্রেরও উপর। জাপানীরা ঐ অক্ষরসমূহ থাকের কলম বা পেন দিয়া না লিখিয়া তুলি দ্বারা লিখিয়া থাকেন। বাল্যকাল হইতে তুলি দ্বারা অক্ষর লিখিতে হয় বলিয়া, প্রায় সকল জাপানীর হস্তই তুলিকা-ব্যবহারে বেশ অভ্যস্ত। বিদ্যালয়ে ছাত্রগণকে তুলি দ্বারা কেবলমাত্র যে অক্ষর লিখিতে হয় তাহা নহে। অনেক সময় উহার সাহায্যে তাহারা সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকিয়া শিক্ষকের দ্বারা তাহা সংশোধন করাইয়া লয়। ছাত্রগণ চিত্রাঙ্কনে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইবার পর প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকিতে শিক্ষা করে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে 'ফুজিইয়ামা' (FusiSan) জাপানীদের সর্ব্বাপেক্ষা আদরের বস্তু। বালক-বালিকাগণ সর্ব্বপ্রথম এই পর্ব্বতটী আঁকিতে শিক্ষা করে। এই পর্ব্বতটী সাম্রাজ্যের মধ্যে উচ্চতায় দ্বিতীয় হইলেও জাপানীরা উহাকে দেবতা-

জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। জাপগণ এই পর্ব্বতপ্রবরের বন্দনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। চিত্রকরগণ উহার আড়ম্বরশূন্য তুষারাবৃত দেহ অঙ্কিত করিয়া তুলিকা সার্থক করিয়াছেন। আবার পাঠশালার ছাত্রেরাও বর্ণপরিচয়ের পূর্ব্বেই উহার সহিত পরিচিত হইয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করে। জাপানীরাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আদর করিতে জানে। ভারতবর্ষের হিমালয় পর্ব্বত জগতের মধ্যে বৃহৎ হইলেও, উহার গৌরব আমরা কয়জন অনুভব করিয়া থাকি ?

৫। ভারতের কৃষক

'মডার্ণ রিভিউ' নামক মাসিক পত্রিকায় 'ভারতীয় কৃষক' সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ প্রবন্ধে কৃষকদের ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর বর্ত্তমান অবস্থা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। সাধারণের অবগতির জন্য বাঙ্গালা ভাষায়ও ইহার আলোচনা অত্যাবশ্যক। লেখক বলিয়াছেন—ভারতে কৃষকই আমার নিকট অত্যন্ত আদরের জিনিষ; আমি সন্ন্যাসীদিগকেও কৃষকদিগের উপরে স্থান দি না; কারণ তাঁহারা কৃষকদিগের দ্বারা পালিত। তার পর সহরের শিল্পী, তাঁতি, মুচি, কারখানার মজুর, কামার, সূতার প্রভৃতিও কম আদরের নহে। তৃতীয়তঃ ঝাড়ুদার, রাস্তাপরিষ্কারক, কাহার, রাঁধুনি, খানসামা, সহিস, কুলি প্রভৃতি যে সকল শ্রেণীর লোকে দেশ পরিপূর্ণ, যাহারা তাহাদের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, সমাজে তাহাদেরও প্রয়োজনীয়তা ও আদর অস্বীকার করা যায় না। তাদের রাজ্যে মৃত্যুর ন্যায় গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান; কারণ কৃষক, শিল্পী, ভৃত্য সকলেই মূক। কে তাহাদিগকে কথা বলিতে শিখাইবে ? তাহাদের কবি কি কেহ আছে ? তাহাদের জন্য রামায়ণ মহাভারত কে লিখিবে ? ভারত এখনও প্রকৃত কবির প্রতীক্ষা করিতেছে। কারণ তাহার সন্তানসমূহ ক্ষুদ্র কুটীরে, পর্ণগৃহে বাস করে; রাজপ্রাসাদ ও ধনীর অট্টালিকা তাহার নাই।

কেন আমি সুন্দর পরিচ্ছদে পরিশোভিত সম্মানার্হ লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এই সমস্ত জাতির প্রতি অনুরক্ত, তাহা কাহাকেও বিশদরূপে বুঝাইবার আবশ্যকতা দেখি না। এই শ্রমজীবীরাই ভারতের প্রাণ; এখানে রাজা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ব্যবহারবিদ্, মহাজন, চিকিৎসক, সন্ন্যাসী, পণ্ডিত, ভদ্রোপাধিধারী ব্যক্তির সংখ্যা আর কত ? কিন্তু কৃষক, শিল্পী, ঝাড়ুদার ত লক্ষ লক্ষ। তাহাদের সংখ্যা আমাদের অপেক্ষা এত বেশী যে তাহাতেই তাহারা আমাদের সমাজে উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য। বিশেষতঃ তাহারাই দেশের ধনোৎপাদন করে। তাহারাই দেশের লোককে আহার দান করে, বেশভূষায় সজ্জিত করে। তাহারাই ঘরবাড়ী, রাস্তা-ঘাট, গাড়ী-ঘোড়া প্রস্তুত করে। সমাজের অন্নদাতা আমাদের কৃষক-সম্প্রদায়। স্বামী বল, শৈব বল, পণ্ডিত বল, প্রচারক বল, উকীল বল, হাকিম বল, রাজা বল, মহারাজা বল, সকলেরই উপরে আমাদের কৃষকজাতি।

শিল্পীরা কৃষকদিগের কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দেয়। কৃষকেরা জমিতে যে সমস্ত দ্রব্য

উৎপন্ন করে শিল্পীরা তাহা লইয়া নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত করে। তাহাদের সাহায্যেই আমরা থালা-বাসন, জুতা-কাপড় হইতে আরম্ভ করিয়া রুদ্রাক্ষ-মালা পর্য্যন্ত আমাদের সভ্যতার পরিচায়ক যাবতীয় দ্রব্য পাই।

ভৃত্যশ্রেণীর লোকগুলি আবার সমাজের অত্যন্ত আবশ্যক কাজগুলি সম্পন্ন করে। ঝাড়ুদার না থাকিলে সহরের দশা কি হয়? বেহারা না থাকিলে আমাদের ভদ্রমহিলাদের উপায়ই বা কি হইত? রাস্তা পরিষ্কারকেরা এক সপ্তাহ কাজ না করিলে গর্ব্বস্ফীত অত্যুন্নত রাজ্যেশ্বরের মস্তকও তাহাদের পদানত করিতে পারে। এই ভৃত্য-শ্রেণীই আমাদের প্রকৃত প্রভু, কিন্তু তাহারা ইহা জানে না তাই রক্ষা।

সুতরাং আলস্যপরায়ণ, বাকপটু, বিলাসী, শিক্ষিত ভারত যেন এই অশিক্ষিত, অসভ্য নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে আমি প্রশংসা করিতেছি দেখিয়া ভীত বা অসন্তুষ্ট না হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ব্যক্তিগণও যেন আমার প্রতি বিরক্তির ভাব প্রকাশ না করেন। আমি সমাজের নিম্নস্তর হইতে উপরের দিকে লক্ষ্য করি। তাঁহারা উপর হইতে নীচের দিকে দেখেন। তাঁহারা রাজরাজড়ার উপাসনা করেন, আমি শ্রমজীবী-দিগকে পূজা করি।

আমাদের একটী দোষ আছে—ধনীদিগের প্রতি আমাদের আত্যন্তিকী ভক্তি। আমরা পরীর উপন্যাস বলিতে গেলে আগেই রাজা-রাণী লইয়া আরম্ভ করি। ইহাতে শিশুকাল হইতে ছেলেদের কল্পনাশক্তিতে আঘাত করা হয়।

আমাদের দেশের সন্ন্যাসিগণ কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধনীদিগের শরণাগত হন; তাঁহারা মনে করেন ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিরাই ধর্ম্ম বা সমাজ সংস্কারের যন্ত্রস্বরূপ। বাস্তবিকই ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। যাঁহারা সর্ব্বত্যাগী তাঁহারা কি না আমোদ-প্রমোদ-নিরত, আলস্যপরায়ণ ধনিগণের সহিত অপবিত্র সম্বন্ধ স্থাপনে প্রয়াসী। ভারতের বড়ই দুর্ভাগ্য, তাই তাহার সন্ন্যাসী সন্তানেরাও দরিদ্র কৃষকের কুটীরে পদার্পণ করেন না। আমাদের অন্যান্য প্রচারক, সমাজ-সংস্কারকেরাও উকীল, সরকারী কর্ম্মচারী, ডাক্তার প্রভৃতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত লোকদিগের প্রতি অনুগ্রহশীল। যে সমস্ত নূতন নূতন আন্দোলন হইতেছে, সমস্তই দেখিতেছি শিক্ষিত ও ধনীদের জন্য। জাতীয় মহাসমিতি তাহাদেরই জন্য অধিকতর বিচারাধিকার লাভের জন্য দাবী করিতেছে। যে সমস্ত বিদ্যালয়, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহাও তাহাদের জন্য। জমিদারগণ দরিদ্র কৃষকের টাকাদ্বারা তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণের শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন; দেশের উন্নতি সাধনের জন্য যে সমস্ত প্রচেষ্টা চলিতেছে সমস্তই উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর সুখ-সমৃদ্ধির জন্যই হইতেছে। দেশের উন্নতির অর্থ কি এই? অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দেশের চরমপন্থীরাই শিল্পী ও কৃষককুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। যদি তাঁহাদের উদ্দেশ্য একটু উচ্চতর হয়, তবে তাহা সাধারণতন্ত্র শাসনের প্রতিষ্ঠা—ইহার অর্থ জমিদার, মহাজন শিল্পী ও শিক্ষিত ব্যক্তি বর্গের শাসন। ভারতের প্রকৃত সন্তানগণ

এই সমস্ত আন্দোলন বা সমিতির নেতা বা সভ্য নহেন।

আজ ভারতীয় শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কৃষককুল করপীড়িত, অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট ও বস্ত্রহীন; মহামারী, দুর্ভিক্ষ তাহার নিত্য সহচর; আয়ের অধিকাংশ তাহাকে জমিদার, সরকারী কর্ম্মচারী, ব্যবহার-বিদ্, মহাজন, প্রভৃতিকে অর্পণ করিতে হয়। তবে তাহারা অজ্ঞানান্ধ তাই মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না। সুতরাং তাহাদিগকে মুক্ত করিবার ভার সুশিক্ষিতদিগের উপরই ন্যস্ত। এই উদ্দেশ্যে মধ্য ও উচ্চশ্রেণী হইতে মহাপুরুষেরা কর্ম্মক্ষেত্রে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। প্রেম অবস্থা ও জাতি বিচার করে না। যাঁহারা ভাবের ভাবুক ও স্বপ্ন-রাজ্যে ভ্রমণকারী তাঁহারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানবের অবস্থায় সহানুভূতি প্রকাশ ও সমবেদনা অনুভব করেন। তাঁহারা স্বজাতি কর্ত্তৃক সমাজচ্যুত ও প্রপীড়িত হইলেও যাহাদের সেবায় রত তাহাদিগের নিকট পূজ্য। তাঁহারা জানেন যে, যে শিক্ষার প্রভাবে আজ জগতের নিকট তাঁহারা পরিচিত, তাহা শ্রমজীবিগণের অর্থে পুষ্ট বিদ্যালয়েরই দান; সুতরাং কৃষককুলের সেবা দ্বারা সেই দান পরিশোধ করা একান্ত কর্ত্তব্যবোধে কৃতজ্ঞ সুধীবৃন্দ স্বার্থপর, আলস্যপরায়ণ লোক-সমাজ ত্যাগ করিয়া ঐ সমস্ত শ্রমজীবিগণের সহিত নিজেদের ভাগ্য গ্রথিত করেন।

তারপর লেখক দেশে এইরূপ বীরগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—যদি কেহ এমন শিক্ষিত থাকেন যিনি আত্মত্যাগী ও উন্নত প্রেমময় জীবন যাপনে প্রয়াসী, তিনি অন্যান্য সমস্ত আন্দোলন পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হউন। বাকপটু, পরান্নভোজী, ভীরু মধ্যবিত্ত লোককে পরিত্যাগ এবং দরিদ্রের সহিত যোগদান করুন। কৃষকের সহিত কৃষকের বেশে মিশিয়া যান। তাহাদের সহিত একত্রে বসিয়া তাহাদের ভাষায় কথা বলুন—তাহাদের সুখ দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করুন। মহাসমিতি, সম্মিলন প্রভৃতি স্থানের মঞ্চ হইতে বক্তৃতা দিলে তাহাদের প্রকৃত উপকার হইবে না। বিলাসবেশ পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের সহিত কাজে নামিতে হইবে। রাজা, উজির, উকীল কোনদিন তাহাদের উপকার করিতে পারেন নাই, পারিবেনও না।

এইরূপ সন্দর্ভ বাঙ্গলা ভাষায় নূতন বাহির হইতেছে। চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্, এ, মহাশয় পল্লিসেবক নামে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহাও এই উদ্দেশ্যেই লিখিত। বাস্তবিক আমাদের এখন ভাবিবার সময় আসিয়াছে। দেশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে একযোগে কোন কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে শিক্ষা দিতে হইবে। দেশে অন্নের অভাব আছে বটে, তবে তাহা একটু চেষ্টা করিলেই দূর করা যায়। কিন্তু সমবেত চেষ্টা চাই। যদি কৃষকদিগকে বিদেশে প্রস্তুত বিলাস-সামগ্রীর উপকরণ যোগাইতে না হয় ও তাহাদিগকে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির

উৎপাদনে উৎসাহিত করিয়া তোলা যায়, তবেই অন্নাভাব একটু কমিয়া আইসে। দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত নিরক্ষর ভদ্রলোকের ছেলেরা অলসভাবে দিন যাপন করিতেছে, তাহারা যদি মান-অভিমান ত্যাগ করিয়া কৃষিকর্ম্মে বা শিল্পকর্ম্মে মন দেয় ও উপার্জ্জন দ্বারা অন্ততঃ নিজের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া লয় তাহাতেও অভাব অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তৃতীয়তঃ যদি শিক্ষিত যুবকগণ উক্ত পদলাভকে জীবনের চরম লক্ষ্য মনে না করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা-অর্জ্জনে চেষ্টিত হন, তাহাতে বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যক্তিগত লাভ অধিক না হইলেও দেশের ধনাগম অধিক হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশে যে সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল, ত্যাগী, অকপট ও উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে প্রায় সমস্তগুলিই ধ্বংসোন্মুখ। এখন যুবকগণের মধ্যে ছয় বৎসর আগেকার কর্ম্মপ্রবণতা আর নাই। তবে এখনও নৈরাশ্যের কোন হেতু নাই, কারণ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া একত্র সম্বদ্ধ। রোগী হঠাৎ ভাল হইলেই একটু অত্যাচারে হঠাৎ আক্রান্ত হয়। যার উত্থান যত পতনও তত। তবে এখনও আমাদের উত্থানের অনুরূপ পতন হয় নাই, তাই আশা আছে। দেশের কর্ম্মিগণ চেষ্টা করিলে আমরা ক্রমশই অগ্রসর হইব। শিক্ষিত যুবকগণ এখন পা সেবক সাজিয়া গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করুন, তাহা হইলেই দেশের প্রকৃত হিত সাধিত হইবে

৬। গৃহস্থের সংসার

"যতদিন বাঙ্গালায় কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন, ততদিন বাঙ্গালীর ভৃত্যের অভাব হইত না। ব্রাহ্মণের বাড়ির অন্দরে ভৃত্য যাইতেই পারিত না; শূদ্রচাকরাণী পোড়া বাসন মাজিলেও বাড়ির মেয়েদের তাহা আবার ধুইয়া লইতে হইত। একটু অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণের বাড়িতেই বারো মাসে তের পার্ব্বণ হইত। কিন্তু কাহারও বাড়িতে পাচক-ব্রাহ্মণে রসুই করিত না। বাড়ির মেয়েরা এবং কুটুম্বিনী সকল ভোজের সকল রন্ধন করিতেন। কে কোন ব্যঞ্জন রন্ধন করিতেন তাহার পরিচয় দিতে হইত। যাঁহার অন্নব্যঞ্জন রন্ধন ভাল হইত তিনি প্রকাশ্যে প্রশংসা পাইতেন। সাধারণতঃ কোন ধনী নির্দ্ধন কাহারও বাড়িতে পাচক-পাচিকা থাকিত না। কুলকামিনীদিগকে কলসী করিয়া জল আনিতে হইত। বড় মানুষের মেয়ে রূপার কলসীতে জল আনিতেন; রূপ বাঁধা ঝাঁটা দিয়া ঝাঁট দিতেন, পিতল কাঁসা ও তামার তৈজস পাত্র স্বহস্তে পরিমার্জ্জিত করিতেন। গো-সেবার জন্য চাকর থাকিত, ভট্টাচার্য্যের তল্পী বহিবার জন্য ভৃত্য জুটিত। পাকা-পোক্ত রকমের চাকর-খানসামা অতি বড় ধনী মহা-রাজার বা জমীদারের বাড়ি ছাড়া আর কাহারও ছিল না। তখনকার গৃহস্থ নরনারী এখনকার বাবু-বাবুনীদের অপেক্ষা স্বাবলম্বন-প্রিয় ও কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহারা তাই দীর্ঘ-জীবী এবং নীরোগ হইতেন। এত হিষ্টিরিয়া ছিল না, এমন অম্ল রোগের প্রভাব ছিল না।

তখনকার লোকে যেমন খাইতে পারিত, তেমনই উপবাস করিতে পারিত। একাদশী অমাবস্যা পূর্ণিমায় ত অনশন ছিলই, ইহার উপর কত বারব্রতে নরনারী উভয়েই উপবাস করিতেন। কলিকাতায় ঘরে ঘরে জলের কল, সুতরাং সেকালের যোগ্যতা থাকিলে, গৃহস্থের ভৃত্যের অভাবই বোধ হওয়া উচিত নহে। কিন্তু সবাই যে বাবু ও বাবুনী! গৃহকর্ম্ম করিবে কে? আমরা জানি পাচক ব্রাহ্মণ পলাইয়াছে, বাবুরা বাজার হইতে লুচি ভাজাইয়া আনিয়া খাইয়াছেন; অথচ বাড়ীতে দেড় গণ্ডা স্ত্রীলোক মজুদ, তাহারা নড়িয়া বসিল না। ফলে পেটের অসুখ, অম্লরোগ দেখা দেয়। বয়কট বয়কট বল ত, চাকর-চাকরাণী পাচক-পাচিকা বয়কট করিতে পার? মাস খানেক স্থির থাকিলে সবাই সায়েস্তা হয়। সাড়ে সাতটাকা মণ চাউলের দর, সর্ব্ব-সামগ্রী মহার্ঘ্য, এ সময়ে একটু কর্ম্মী হইলে, চাকর-চাকরাণী-পাচক সব ঢিট্ হয়। তোমাদের যে, একবেলা চলে না, তাই তাহারা পাইয়া বসে।"—নায়ক।

* *
*

৭। ঐতিহাসিক ভ্রম-সংশোধন

বঙ্গদেশে ঐতিহাসিক গবেষণা ক্রমেই বিস্তৃত ও গভীর হইতেছে। তাহার ফলে আমরা বাঙ্গালীর বহু পুরাকীর্ত্তির সংবাদ পাইতেছি। সাহসে, বীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে, রাষ্ট্র-ব্যাপারে, বৈষয়িক ক্ষেত্রে, সমাজে, শিল্পে সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীর অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমরা জানিতেছি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে বাঙ্গালীর স্থান বহু উচ্চে।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম সাম্বৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত কুমার শরৎ কুমার রায় এম্, এ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে ঐরূপ কথাই বলিয়াছেন। তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন—"বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই, এই অপবাদ বহুকালাবধি প্রবাদ-বাক্যের ন্যায় প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষা-বিজ্ঞান-প্রণেতা মনস্বী বিনয়কুমারের তুল্য ব্যক্তিও এই ১৯১২ সালে তাঁহার 'ঐতিহাসক প্রবন্ধে' লিখিয়াছেন, 'ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে রাজপুত, শিখ ও মারহাট্টার কৃতিত্ব অনেকবার প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালীর ক্রিয়াশক্তি ও চরিত্রবল, বাঙ্গালীর ঐক্য এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এখনও বিশেষ ভাবে পাওয়া যায় নাই।"

রাজশাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধানসমিতি যে সকল নূতন মাল-মসলা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা হইতে অনেকেরই চোখ ফুটিবে। আশা করি, তাঁহার পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে এই ভ্রম সংশোধন করিবেন, এবং দেশের ঐতিহাসিকগণ বরেন্দ্র-অনুসন্ধানসমিতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নূতন তত্ত্বগুলি একবার আলোচনা করিয়া নিজ নিজ গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবেন।

* *
*

৮। সংস্কৃত ভাষায় পত্রিকা

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আমরা "ভারতের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজ" সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। তাহাতে কিছু অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি ভাটপাড়া হইতে

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবভূতি শর্ম্মা আমাদের ত্রুটি দেখাইয়া দিয়া অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আমরা সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ-পত্রিকাদি প্রচার দেখিতে ইচ্ছা করি। এইরূপ একখানি পত্রিকা বাঙ্গালা দেশে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষানুরাগী ব্যক্তিগণ এই সংবাদে আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই।

"বিদ্যোদয়" নামক সংস্কৃত মাসিক পত্র ভাটপাড়া হইতে প্রকাশিত হয়। এই বিদ্যোদয় পত্রিকাখানি ৪০ বৎসরের উপর চলিয়া আসিতেছে। ইহাতে একমাত্র সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন অপর কোনও ভাষার একেবারে ব্যবহার করা হয় না। ইহার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়। একমাত্র সংস্কৃত ভাষা লইয়া তিনি জীবন অতিবাহিত করিলেন, যৌবনের প্রারম্ভ হইতে এই বৃদ্ধকাল অবধি তিনি একমাত্র সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও পুষ্টিসাধন কল্পে বদ্ধপরিকর, নিজের অবশ্যপোষ্য পরিবার বর্গের ভরণ পোষণে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া তিনি একমাত্র সংস্কৃত পত্রিকার মুদ্রণব্যয়াদি বহন করিয়া আসিতেছেন।

* *
*

৯। আরোগ্য-শালা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ দার্শনিক শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ বেদান্তরত্ন এম্, এ মহাশয় সম্প্রতি কাশ্মীর রাজ্যের শ্রীপ্রতাপ কলেজের অধ্যক্ষ। সেখান হইতে তিনি নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন:—

"কোনও এক কলেজের এক সাহেব অধ্যক্ষ এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে হাসপাতাল স্থাপন খৃষ্টধর্ম্মেরই কার্য্য। হিন্দু ধর্ম্মে রোগি-পরিচর্য্যার কোন প্রশংসা নাই। ঐ বক্তৃতা কলিকাতার ষ্টেটস্‌ম্যানে ছাপা হইয়াছিল। বস্তুতঃ হাসপাতাল কথাটাও ঐরূপ সাক্ষ্য দেয় বলিতে হইবে। ছোট-কালে যখন ছাত্রবৃত্তি পড়িতাম, তখন ভূগোলে পড়িয়াছিলাম অমুকস্থান হাসপাতালের জন্য প্রসিদ্ধ। হাসপাতাল কি বুঝিতাম না, কেন না আমরা গ্রাম্যছাত্র; সহরে ভিন্ন বড় একটা হাসপাতাল অন্যত্র ছিল না। কাজেই ঐ অংশটুকু শিখিয়াছিলাম না।

হাসপাতালের সংস্কৃতনাম আরোগ্যশালা। আরোগ্যশালা কথা শুনিলে, গ্রাম্য বালকেও অর্থ বুঝিতে পারে। এমন সুন্দর শব্দ থাকিতে হাসপাতাল শব্দ চালান ভাল হয় নাই। হাসপাতাল থাক, কিন্তু আরোগ্যশালার পুনঃ প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয়। বাঙ্গালী গ্রন্থকারদিগের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করি।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে রোগি-পরিচর্য্যার প্রশংসা আছে (১।২০৯)। অপরার্ক রোগি-পরিচর্য্যার টীকা করিতে গিয়া "আরোগ্যশালা" ও আরোগ্যদানের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"নন্দিপুরাণে—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষানামারোগ্যং সাধনং যতঃ।
অতস্ত্বারোগ্যদানেন নরো ভবতি সর্ব্বদঃ॥
আরোগ্যশালাং কুর্ব্বীত মহোষধিপরিচ্ছদম্।
বিদগ্ধবৈদ্যসংযুক্তাং ঘৃতান্নমধুসংযুতাম্॥

আরোগ্যশালামেবং তু কুর্য্যাদ্যো ধর্ম্মসংশ্রয়ঃ
স পুমান্ ধার্ম্মিকো লোকে স কৃতার্থঃ
স বুদ্ধিমান্॥

সম্যগারোগ্যশালায়ামৌষধৈঃ স্নেহপাবনৈঃ।
ব্যাধিতং নীরুজীকৃত্য অপ্যেকং করুণাযুতঃ।
প্রয়াতিব্রহ্মসদনং কুলসপ্তকসংযুতঃ॥
আঢ্যোবিত্তানুসারেণ দরিদ্রঃ ফলভাগ্‌ভবেৎ।
দরিদ্রস্য কৃতঃ শালা আরোগ্যায় ভিষক্ তথা॥
অপি মূলেন কেনাপি চন্দনাদ্যৈরথাপি বা।
স্বস্থীকৃতে লভেন্ মর্ত্যে পূর্ব্বোক্তং
লোকমব্যয়ম্॥"

অনুবাদ। "আরোগ্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপায়। অতএব আরোগ্যদান করিলে সর্ব্বদান করা হয়। আরোগ্যশালা নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে উত্তম ঔষধ, স্বাস্থ্যকর পরিচ্ছদ, ঘৃত, মধু, অন্ন প্রভৃতি রাখিয়া দিবে এবং পণ্ডিত বৈদ্য (ডাক্তার) নিযুক্ত করিবে। (ইহার পর ৪৩টী শ্লোকে নিযোজ্যমান বৈদ্যের কিরূপ গুণ থাকা উচিত, তাহা বলা হইয়াছে। উহা উদ্ধৃত করি নাই)। ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে (কেবল উপাধির লোভে নহে) যিনি এইরূপ আরোগ্যশালা করেন, তিনিই ধার্ম্মিক, তিনিই বুদ্ধিমান্, তিনিই কৃতকৃত্য। ধনী ব্যক্তি এইরূপ আরোগ্যশালা করিয়া একটিমাত্র রোগীকে রোগমুক্ত করিতে পারিলেও সপ্তকুলের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন। দরিদ্র ব্যক্তি আরোগ্যশালা নির্ম্মাণ করিতে পারেন না, এবং বৈদ্যও নিযুক্ত করিতে পারেন না। কিন্তু দরিদ্র যদি কোনও সহজলভ্য মূল বা চন্দনাদির দ্বারা কাহাকে সুস্থ করিতে পারে, তবে তিনিও উক্তলোক প্রাপ্ত হন।"

আমাদের কলেজের ছাত্রেরা এবং আমাদের ইংরাজি-শিক্ষিতগণ যত পুস্তক পড়েন, তার সবটায় একটা কথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে থাকে—উহা এই যে, খৃষ্টান ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পৃথিবীর যত বড় কাজ খৃষ্টানেরাই করিয়াছেন। পৃথিবীর যত উদার মত খৃষ্টধর্ম্মই তাহার জননী। খৃষ্টধর্ম্ম গন্তব্য—অন্যান্য ধর্ম্ম পথের বিশ্রাম-স্থান মাত্র। তাহা ঠিক্ নহে। বিলাতি দর্শনে হেগেলের দল এই মত খুব চালাইয়া দিয়াছেন। আমরা তাহা মুখস্থ করিতেছি, বিশ্ববিদ্যালয় তাহা পাঠ্য করিতেছেন। উপরের কয়েক পংক্তি ঐ ভ্রমের কিঞ্চিৎ অপনোদন করিবে।"

সুবিজ্ঞ অধ্যাপক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহার সুবিস্তৃত আলোচনা দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত ইংরাজী মাসিক "ডন" পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই দীর্ঘ প্রবন্ধে কেবল 'আরোগ্যশালা কেন প্রাচীন ভারতবাসীর মানবসেবা সম্বন্ধীয় বহুবিধ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষের জনগণ ও নরপতিবৃন্দ কত বিভিন্ন উপায়ে মানুষের কষ্ট নিবারণ এবং সুখ-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতেন তাহার বিশদ বৃত্তান্ত সেই প্রবন্ধে বাহির হইয়াছে। আমরা আমাদের পাঠক গণকে 'ডনের' সেই সকল সংখ্যা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

১০। ভারতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিশনের উৎসব

ভারতবর্ষের নানা স্থানে রামকৃষ্ণবিবেকানন্দ মিশন প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন। তাঁহাদের আদর্শে আমাদের

জন-সাধারণ লোকসেবা ও পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিতে উৎসাহিত হইতেছেন। আমাদের ধর্ম্মজীবনে এই উপায়ে প্রকৃত আন্তরিকতার অভ্যুদয় হইতেছে। ইহা অতি সুলক্ষণ। দেশের প্রত্যেক জেলায় এই মিশনের শাখা প্রতিষ্ঠিত হউক, এবং বৈরাগ্যের প্রবৃত্তি ও কামিনী-কাঞ্চন-বর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা সকল সমাজে প্রচারিত হউক। তাহা হইলে আমাদের জাতীয় চরিত্র সংযত, সবল ও দৃঢ় হইতে থাকিবে। সম্প্রতি রাকৃষ্ণদেবের এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে কয়েক স্থানে ভজন-কীর্ত্তনাদি সহযোগে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা 'উদ্বোধন' হইতে সেইগুলির বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম।

"বিগত ৩রা চৈত্র বেলুড় মঠে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অষ্টাশীতিতম জন্মমহোৎসব আনন্দসহকারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্ত্তি অতি মনোহর-ভাবে লতা-পাতায় সজ্জিত হইয়া ভক্তবৃন্দের ভক্তি-উদ্দীপনার সাহায্য করিতেছিল। আঁদুলের কালীকীর্ত্তন, বৈষ্ণবচরণের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, অন্যান্য বিভিন্ন দলের নানাবিধ ভগবদ্-গুণানুকীর্ত্তন, দক্ষিণারঞ্জন বাবুর সুবিখ্যাত ব্যাণ্ড প্রভৃতি সারাদিন সমাগত দর্শক ও ভক্তবৃন্দের ভক্তি ও আনন্দ জাগ্রত রাখিয়াছিল। অপরাহ্নে ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের প্রচারক স্বামী দয়ানন্দ বহু শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে সুললিত ভাষায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। সারাদিন প্রসাদ, সরবত, জল প্রভৃতি বিতরিত হইয়াছিল এবং প্রায় আট দশ সহস্র ভক্তকে বসাইয়া খিচুড়ি প্রভৃতি প্রসাদ খাওয়ানো হইয়াছিল। হোরমিলার কোম্পানি প্রাতে ৭টা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত কলিকাতা আহিরিটোলার ঘাট হইতে মঠ পর্য্যন্ত ৪ খানি ষ্টিমার যোগে উৎসবদর্শনার্থি-গণের যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এবার একটি উঠিবার ও আর একটি নামিবার উত্তম জেটি প্রস্তুত হওয়াতে আরোহিগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত নৌকা ও রেলযোগে এবং পদব্রজে যে কত লোক আসিয়াছিলেন, তাহার সীমা নাই।"

"বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। বেলা সাড়ে এগারটার সময় সহরের নানা স্থান হইতে সঙ্কীর্ত্তন দল সমবেত হইয়া আশ্রমে ভজন করিতে লাগিল। পরে মঙ্গলারতি হইবার পর অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত হরিকথা হইল। বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও অসংখ্য শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট স্কুলের হেডমাষ্টার 'স্বামী বিবেকানন্দ ও আধুনিক বিজ্ঞান" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। অবশেষে প্রসাদ বিতরিত হইয়া উৎসব সমাপ্ত হইল।"

"উক্ত মঠে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসবও আনন্দের সহিত নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। বেলা দুইটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক হরিকথা (প্রহ্লাদচরিত্র) হয়। বিদ্যাভূষণ মহাভাগবত ও কৃষ্ণ আয়েঙ্গার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে অতি মনোহারিণী বক্তৃতা করেন। সভাপতি শ্রীনিবাসরাও মহাশয় বলিলেন, পরমহংসদেবের উপদেশ সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য, কারণ, উহা বর্ত্তমান কালের বিশেষ উপকারী। প্রায়

এক সহস্র দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষপূর্ব্বক সেবা করান হয় এবং ভক্তগণকেও প্রসাদ বিতরিত হয়।”

“বাঙ্গালোর বেদান্ত-সমিতিতে বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের উৎসব উপলক্ষে এক হাজার দরিদ্রের সেবা, নানাবিধ যন্ত্র ও কণ্ঠ-সঙ্গীত, ইংরাজী তামিল ও কানারিজ ভাষায় বক্তৃতা, সংকীর্ত্তনসহকারে স্বামীজির প্রতিকৃতিকে সহর প্রদক্ষিণ করিয়া আনা, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।”

“কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব উপলক্ষে কীর্ত্তন, প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতা, সঙ্গীত, প্রায় শতাধিক সাধু ভোজন ও প্রসাদ বিতরণাদি হইয়াছিল।”

“মান্দ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে বেলা ৯টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কীর্ত্তন হয়। পরে প্রায় দুই শত ভক্ত প্রসাদ পাইলেন, আর ৮০০০ দরিদ্র নারায়ণের সেবা করান হইল। বেলা ৩টা হইতে ৫।।০টা পর্য্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন অবলম্বন করিয়া অতি মনোহারিণী হরিকথা হইল। পরে মাননীয় পি, এস, শিবস্বামী আয়ারের সভাপতিত্বে মাননীয় জজ সদাশিব আয়ার “শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশের সারাংশ” সম্বন্ধে এক সুন্দর বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, ভগবৎপ্রেম এবং নারায়ণ জ্ঞানে সর্ব্বভূতের প্রতি ভালবাসাই তাঁহার প্রধান শিক্ষা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে যে কোন সাধুসম্প্রদায়ভুক্ত হউক না, ঈশ্বরকে নির্গুণ, সগুণ বা সাকার নিরাকার যাহা বলিয়াই বিশ্বাস করুক, কিছুতে কিছু আসিয়া যায় না; কিন্তু কে কতদূর ঈশ্বরানুভূতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহার পরীক্ষা এই যে, সে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সাকার বিগ্রহস্বরূপ জীবের প্রতি কতদূর প্রেমসম্পন্ন হইতেছে। এই প্রেম যখন সার্ব্বজনীন না হইয়া সীমাবদ্ধ ভাবে থাকে, অর্থাৎ নিজ আত্মীয় স্বরূপ স্ত্রীপুত্র বন্ধুবান্ধবের ভিতর আবদ্ধ থাকে, তখন তাহাকে আসক্তি বলে। এই আসক্তি বর্জ্জন করিয়া, রাগদ্বেষঘৃণাবৃত্তিকে সমূলে উৎপাটন করিতে পারিলেই সর্ব্বভূতের প্রতি প্রেমসম্পন্ন হইতে পারা যায়। উপসংহারে বক্তা বলেন, প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকভাবে ধর্ম্মান্দোলন করিতে হইলে তাহার আধুনিক ব্রাহ্ম-সমাজ, আর্য্য-সমাজ, থিওসফিক্যাল-সোসাইটি প্রভৃতি উদার ধর্ম্মান্দোলন সমূহের সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

বক্তৃতান্তে সভাপতি মহাশয় অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে যুবকগণের ধর্ম্মশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন এবং অসাম্প্রদায়িক ভাব বজায় রাখিয়া যথার্থ ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া যে সম্ভব, তৎসম্বন্ধেও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করেন।

অবশেষে আরত্রিক ও প্রসাদ বিতরণান্তে উৎসব সমাপ্ত হয়।”

“সারগাছি মুর্শিদাবাদে রামকৃষ্ণ অনাথাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব উপলক্ষে বহরমপুরের জজ পাণ্টন মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং মুর্শিদাবাদ মিশনের লোকহিতকর কার্য্য সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটি বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত কীর্ত্তনাদি

যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বহরমপুর হইতে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং তথাকার কলেজের বহু ছাত্র মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রায় আড়াই হাজার ভদ্র ও দরিদ্র নারায়ণের সেবা হইয়াছিল। এ বৎসর আশ্রমের নিজ জমিতেই মহোৎসবকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।"

"গত ৭ই চৈত্র সিদ্ধকাঠি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম-ভবনে রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উষায় নগরকীর্ত্তন, প্রবন্ধপাঠ, সঙ্কীর্ত্তন এবং দুই শত নিঃসহায় দরিদ্রকে একসের করিয়া চাউল ও একটি করিয়া পয়সা দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত, ঢাকা, নাগপুর, হবিগঞ্জ, রায়পুর (দেরাদুন), কনখল, রাঁচি প্রভৃতি স্থান হইতে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবের সংবাদ পাইয়াছি।"

আমরা আশা করি আগামী বর্ষে জন্মোৎসব উপলক্ষে বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলায় জেলায় এইরূপ দরিদ্র নারায়ণের সেবা অনুষ্ঠিত হইবে। আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ এখন হইতে তাহার জন্য প্রস্তুত হউন।

* *

১১। শিক্ষায় সর্ব্বনাশ

"এ দেশে একদল লোক আছেন, যাঁহারা হিন্দুর সামাজিক আচার-ব্যবহারকেই সকল অনর্থের মূল বলিয়া থাকেন। দেশে অকাল-মৃত্যু হইতে দুর্ভিক্ষ পর্য্যন্ত সবই ইহাঁরা বাল্যবিবাহাদির অনিবার্য্য ফল বলিতে কুণ্ঠিত হন না। কলিকাতায় নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এই দলের চাঁই ছিলেন। বোম্বাই অঞ্চলে ডাক্তার ভাণ্ডারকর এই দলের মুখপাৎ। তিনি কারণে অকারণে হিন্দু বিধির ও ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং সুপণ্ডিত, প্রত্নতত্ত্বে যশস্বী, যুরোপীয় সমাজে সমাদৃত। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার অবস্থায় একবার ছাত্রদিগের দুর্দ্দশার জন্য হিন্দু-সমাজকেই দায়ী বলেন ও বাল্যবিবাহাদিকেই সে দুর্দ্দশার কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ শ্রীযুত রাণাডে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দোষেই এ দেশের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। শ্রীযুত রাণাড়ে প্রধানতঃ মহারাষ্ট্রীয় ছাত্রদিগের অবস্থা দেখিয়া যাহা বলিয়াছেন, ভারতের সকল প্রদেশের ছাত্রদিগের সম্বন্ধে সেই কথা বলা যাইতে পারে। তিনি কঙ্কণ প্রদেশের ছাত্রদিগের অবস্থার আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, অধিকাংশ স্থলে দারিদ্র্য তাহাদের স্বাস্থ্যহানির সর্ব্বপ্রধান কারণ। ইহারা শিক্ষালাভ করিবার জন্য পল্লীগ্রামের গৃহ হইতে সহরে আসিয়া বিষম পরিশ্রম করে। আবার আপনারা খাটিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে বাধ্য হয়। ভারতের ছাত্রজীবনের এই দুঃসহ দুর্দ্দশা বিদেশীরা বুঝিতে পারিবেন না। এই গুরু শ্রমের ফলে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, আর সংসারে প্রবেশ করিতে না করিতে পীড়ার প্রথম ফুৎকারেই তাহাদের জীবনদীপ নির্ব্বাণ যায়। মহারাষ্ট্রীয় উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের অকাল মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ জনের অধিক ছাত্র-অবস্থায় দারিদ্র্য ও গুরু শ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া

অকালে লোকলীলা শেষ করিয়াছে। অনেকে যক্ষ্মায় বা মস্তিষ্কবিকারে প্রাণ হারাইয়াছে। কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই জগৎ ত্যাগ করিয়াছে—কেহ কেহ আরও কিছুদিন জীবন্মৃত থাকিয়া পরে মরিয়াছে। ৬০ জন গ্রাজুয়েটের অকাল মৃত্যুর কারণ পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, তাহারা গড়ে ৩৫ বৎসরও বাঁচে নাই—বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগের ১০ বৎসরের মধ্যে তাহাদের সব ফুরাইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে 'ইংলিশম্যান' কলিকাতার ছাত্রজীবনের দুর্দ্দশার আলোচনা করিয়াছিলেন। পল্লীর মুক্ত বায়ু ও গৃহের সস্নেহ যত্ন ত্যাগ করিয়া বালকগণ আত্মীয়স্বজনহীন অবস্থায় যেরূপ ভাবে কলিকাতার ছাত্রাবাসে বাস করে, তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি অনিবার্য্য বলিয়াই মনে হয়। ক্ষুদ্র কক্ষে বহু বালকের বাস, মলিন শয্যায় শয়ন, অপর্য্যাপ্ত আহার্য্য ভক্ষণ, রোগে শুশ্রূষার ও জীবনের আনন্দের অভাব—এ সকলই ছাত্রদিগের পক্ষে স্বাস্থ্যহানির কারণ। ইহার উপর শ্রমের অন্ত নাই। যে বিদ্যালয়-নির্দ্দিষ্ট পাঠ ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্রের মত লোকও "অসহনীয়" বলিয়াছেন, তাহা ত আছেই; তদুপরি আবার জীবিকা-অর্জ্জনের শ্রম আছে। বহু ছাত্র ছেলে পড়াইয়া কোনরূপে কলিকাতার ব্যয় নির্ব্বাহ করে। আর কোন দেশে ছাত্রগণ এরূপ কষ্টে—এরূপ দুঃখে বিদ্যার্জ্জন করে কি না সন্দেহ। নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিলে বলিতে হয়, এরূপ বিদ্যানুরাগ অন্য দেশের ছাত্র-সমাজে বস্তুতঃই বিরল। এই সকল বিদ্যার্থীর দুঃখে পাষাণও বিগলিত হয়। ইহাদের উপযুক্ত প্রশংসা করিবার ভাষা নাই।

ইহার পর শ্রীযুত রাণাডে বলিয়াছেন, দারিদ্র্যই ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যহানির এক মাত্র কারণ নহে। অন্যান্য কারণের মধ্যে অতিরিক্ত শ্রম ও বিদেশী ভাষায় শিক্ষিত বিদ্যার কঠিন পরীক্ষার বাহুল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদেশী ভাষায় বিবিধ বিদ্যা শিখিতেই ছাত্রদিগের প্রাণান্ত হয়। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র এই কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বিদেশী ভাষায় বিবিধ বিদ্যা শিখিতে হয়। কাজেই অনেক সময় কলেজে দশটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত প্রায় অবিরাম ক্লাসের পর ক্লাস চলিতে থাকে। ইহার ফলে জীর্ণদেহ, ভগ্নস্বাস্থ্য ও ক্ষীণদৃষ্টি যুবকের দলে দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে। আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাদিগকে তিল তিল করিয়া হত্যা করিতেছি। আমার মতে I. Sc. Course হইতে ইংরাজী একেবারেই তুলিয়া দেওয়া উচিত; এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পুস্তক অবলম্বনে শিক্ষা দেওয়া উচিত।" সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র আর একটি কথা বলিয়াছেন—"ইংরাজীতে বিজ্ঞানালোচনা হওয়ায় দেশবাসীর অধিকাংশই বিজ্ঞান-জ্ঞানলাভে বঞ্চিত। অথচ সামান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি না জানা থাকায় লোক কষ্টভোগ করিতেছে।"* * * অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের বৈজ্ঞানিক আলোচনা যদি দেশের লোকের নিকট সুপ্রাপ্য হয়, তাহা হইলে অনেক উপকার হয়।* * * * এই সকল বার্ত্তা যদি ঘরে ঘরে আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে হয়, যদি 'ঘাটে, পাটে, বাটে, মাঠে' এই সকল বিষয়ের আলোচনা

দেখিতে চান, তাহা হইলে মাতৃভাষার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই।"

অতিরিক্ত অধ্যয়নের চাপ—বিশেষতঃ বিদেশীভাষা আয়ত্ত করিয়া তাহাতেই বিবিধ বিদ্যা অর্জ্জনের শ্রম যে ছাত্রদিগের পক্ষে কষ্টকর তাহা স্বয়ং ভাণ্ডারকর মহাশয়ও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, বিদ্যাবিষয়ে সম্পূর্ণতালাভই ছাত্রদিগের আদর্শ হওয়া উচিত। তবে দেখা গিয়াছে, জগতে আর কোন দেশেই এই সম্পূর্ণতার আদর্শ লাভ করিতে হইলে সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হইতে হয় না। রাণাডে মহাশয় দেখাইয়াছেন, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ কোথাও এরূপ আদর্শ আদৃত নহে। যে সকল ছাত্র সাধারণভাবে কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে চাহে—অনার (Honours চাহে না, তাহাদের পক্ষে অধীত সকল বিদ্যায় বিশেষজ্ঞোচিত সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ কেবল এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই আবশ্যক মনে করেন। রাণাডে মহাশয় বলেন, যে সব ছাত্র ছয় বিষয়ের পাঁচ বিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কেবল এক বিষয়ে সাফল্যলাভ করিতে পারে না, তাহাদিগকে পরবৎসর আবার ছয় বিষয়ের পারদর্শিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে হয় কেন? বোধ হয় এ কথা কর্ত্তারাও বুঝিয়াছেন। তাই প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেইরূপ ব্যবস্থা হইতেছে।

তাহার পর রাণাডে মহাশয় বলিয়াছেন—পুস্তকের সংখ্যাধিক্য অতি ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ের বিবেচনা করিতেছেন দেখা যাউক, কি হয়।

ইহার পর রাণাডে মহাশয় বলিয়াছেন, এম্, এ, আইন প্রভৃতি উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে স্বাস্থ্যহানি ও অকাল মৃত্যু অত্যন্ত অধিক। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার আদর্শ উচ্চ করিয়া উৎকৃষ্ট ছাত্রদলকে হত্যা করিতেছেন! হিন্দু, পার্শী, পর্ত্তুগিজ, য়ুরোপীয় সর্ব্বশ্রেণীর ছাত্রই এইরূপ অতিশ্রমে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কি ভীষণ কথা!

রাণাডে মহাশয় আরও বলিয়াছেন, আজকাল শুনিতে পাই, ছাত্রগণ বিদ্যালয়-নির্দ্দিষ্ট পুস্তক ব্যতীত অন্য পুস্তক পড়িতে চাহে না—জ্ঞানানুরাগ দেখায় না, অধ্যাপকগণও কেবল পড়াইয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে? ছাত্রদল যখন ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া—উৎসাহ, উদ্যম সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাদের জীবনীশক্তিই অল্প। সে কিরূপে জ্ঞানানুশীলনে পরিশ্রম করিবে? আর অধ্যাপকগণ বিশ্ববিদ্যালয়নির্দ্দিষ্ট পুস্তক পড়াইয়াই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের আর কোন কাজ করিবার অবকাশ থাকে না।

এই সকল কথা বিশেষভাবে বিচারের ও বিবেচনার যোগ্য। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে যদি দেশের আশার স্থল—ভরসার কেন্দ্র ছাত্রসম্প্রদায়েরই সর্ব্বনাশ হয়; যদি ইহার ফলে আমরা সুস্থ—সবল—উৎসাহপ্রফুল্ল—কর্ম্মপ্রবণ যুবকসম্প্রদায় না পাইয়া রোগশীর্ণ—উদ্যমহীন রোগীর দল পাই, তবে যত শীঘ্র এ প্রণালীর অবসান হয়, তত শীঘ্রই মঙ্গল। অগ্রে জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইবে, তাহার পর শিক্ষার ব্যবস্থা।

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষাসংস্কারের—শিক্ষা-প্রণালী-পরিবর্ত্তনের আন্দোলন চলিতেছে। এ দেশের লোককে আর এ বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া—সরকারের উপর নির্ভর করিলেই চলিবে না। আমাদের শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্ত্তনের জন্য আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। আমাদের ভাল আমরা না বুঝিলে আর কেহ বুঝিবে না। সে কথা সরকারকে বুঝাইয়া—সহযোগিতায় সে কাজ সুসম্পন্ন করিতে হইবে।" বসুমতী।

*
* *

১২। বীরভূমে বাসুদেবমূর্ত্তি

বীরভূমের দক্ষিণগ্রাম হইতে সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত রামতারণ রায় সংবাদ পাঠাইয়াছেন:—"বীরভূমের প্রায় প্রত্যেক পল্লী, গ্রাম, নগর তন্নাস করিলে কৃষ্ণ-প্রস্তরখোদিত সুদীর্ঘ বাসুদেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। উহা বঙ্গীয় প্রাচীন ভাস্করদিগের সূক্ষ্ম শিল্পের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। এই সমস্ত প্রতিমূর্ত্তিগুলি এক্ষণে অযত্ন অবস্থায় গ্রামের প্রান্তে কোন এক বৃক্ষমূলে গ্রাম্যদেবতার আশ্রম স্থলে রক্ষিত। উহার উপর বর্ষার বারি, নিদাঘের রৌদ্র, হিমানীর শিশির বহুকাল হইতে পতিত হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ সকল মূর্ত্তি তজ্জন্য কণামাত্র বিকৃত কি বিমলিন হইল না। উক্ত মূর্ত্তিগুলি যে গ্রাম্য দেবতার মূর্ত্তি তাহা কি করিয়া বলা যায়। কারণ গ্রাম্য দেবতার পূজাদি শক্তির ধ্যানে হইয়া থাকে। যেখানে ব্রাহ্মণ-সংখ্যা বিরল প্রত্যহ পূজা করিবার সুবিধা ঘটে না সেখানে ও অপরাপর সমস্ত স্থানেই বিজয়া দশমীর দিন উক্ত গ্রাম্য দেবতার বাৎসরিক হোম, পূজা, বলিদান উক্ত শক্তিদেবীর উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। তজ্জন্য মনে হয় গ্রাম্য দেবতা যিনি তিনি বাসুদেব নহেন ভদ্রকালী * বা অপর কোন শক্তিমূর্ত্তি। বাসুদেব মূর্ত্তিগুলি কোন কারণবশতঃ তথায় রক্ষিত হইয়া থাকিবে। বাস্তবিকও ঐ সকল মূর্ত্তি ভিন্ন স্থান হইতে আনীত হইয়া গ্রাম্য দেবীর নিকট রক্ষিত হইয়াছে। অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর মুখে শুনিয়াছি কালাপাহাড় বাসুদেবমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি বিশেষ কোন কারণে উক্ত বাসুদেব দেবের উপর বিরক্ত হন। তৎপরে তাঁহার জাতি নাশের পর ঐ মূর্ত্তিগুলির পরম শত্রু হইয়া দাঁড়ান। তাঁহারই আদেশে ও যত্নে বঙ্গদেশের প্রত্যেক পল্লী ও নগরের বাসুদেব-মূর্ত্তিগুলি ভগ্ন ও স্বস্থানচ্যুত হইয়াছিল। বিধর্ম্মীরা কোন একটি মূর্ত্তিকে অভগ্ন রাখে নাই। একটু না একটু অংশ ভগ্ন করিয়া পুষ্করিণীতে উক্ত মূর্ত্তিগুলিকে ফেলাইয়া দিয়াছিল। বহুকাল পরে যখন উক্ত পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধার হয়, তখন ঐ সকল মূর্ত্তিগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রায় অধিকাংশ মূর্ত্তি ঐরূপে পুষ্করিণীর পঙ্ক হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল। এখনও যে আরও কতশত

* ভদ্রকালীর ধ্যান

ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী মসিমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তি,
নাহং তৃপ্তা জগদখিল-মিদং গ্রাসমেকং করোমি।
হস্তাভ্যাং ধারয়ন্তী জ্বলদনলশিখাসন্নিভং,
পাশযুগ্মং দন্তৈর্জম্ব্‌ ফলাভৈঃ পরিহরতু ভয়ং পাতু মাং ভদ্রকালী॥

প্রতিমূর্ত্তি পুষ্করিণীর গর্ভে নিহিত আছে তাহা কে গণনায় আনিতে পারে? গ্রাম্য হিন্দুরা এইরূপে প্রাপ্ত প্রস্তর মূর্ত্তিগুলিকে দেবতার স্থানে রক্ষা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই গ্রাম্য দেবতার প্রাত্যহিক পূজার সময় উক্ত মূর্ত্তিগুলির পূজাদি হইতে পারে। পূজাদি না হউক অন্ততঃ দেবস্থানে দেব-মূর্ত্তিকে রক্ষা করা তাঁহাদের হৃদয়ের ইচ্ছা। এই ইচ্ছাও উহাদের সাধু ইচ্ছা। তজ্জন্য এক্ষণে প্রত্যেক পল্লীর গ্রাম্য দেবতার আশ্রমে বাসুদেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। গ্রামবাসিগণ ভগ্নমূর্ত্তিকে ধ্বংস না করিয়া যে এইরূপে উহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন ইহা তাঁহাদের অতিশয় বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। সাধারণের বিশ্বাস প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেই বাসুদেবমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তাঁহারা আপন আপন গৃহে শিবলিঙ্গের ন্যায় উক্ত বাসুদেব-মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া প্রত্যহ পূজাদি করিতেন। অতি প্রাচীন সময় হইতে এইরূপ পূজা-পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছিল। ইহা বুদ্ধদেবের জন্ম গ্রহণেরও অতি পূর্ব্বে। অনেকে বলেন উক্ত বাসুদেবমূর্ত্তি বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। কিন্তু উক্ত মূর্ত্তিকে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বলা যায় না। কারণ ব্রহ্ম, চীন ও পূর্ব্ব উপদ্বীপে যে সকল বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় উক্ত মূর্ত্তির সহিত কথিত মূর্ত্তির কোন সাদৃশ্যই নাই। এ মূর্ত্তি পুরাণোক্ত শঙ্খ, চক্র, গদাপদ্ম-ধারী বিষ্ণুরই মূর্ত্তি। উহার গলদেশে যজ্ঞোপবীত, মস্তকে কিরীট, সুদীর্ঘ বপু। বিশ্বসংসার প্রতিপালন জন্য যেন দণ্ডায়মান! বসুদেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির সহিত এ মূর্ত্তির কোনরূপ সাদৃশ্য নাই। এক ঐরূপ মূর্ত্তির উপাসনা হিন্দুরা যে শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবার পূর্ব্বেও করিতেন না তাহা বলা যায় না। আমার বিশ্বাস এই মূর্ত্তিই প্রচীন হিন্দুগণের আদিম বিগ্রহ-মূর্ত্তি। কিন্তু সমগ্র দেবতার মূর্ত্তি এক নহে। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে দীক্ষিত। এক শ্রেণীর হিন্দুরা এই বাসুদেব-মূর্ত্তির উপাসনা অতি প্রাচীনকাল হইতে করিয়া আসিতেছিলেন। এবং এক্ষণকার শিবলিঙ্গ, রাধাকৃষ্ণ বা গোপাল-মূর্ত্তি শালগ্রাম-শিলার ন্যায় উক্ত বাসুদেব প্রতিমূর্ত্তি স্বীয় স্বীয় গৃহে স্থাপিত করিয়া নিত্য পূজা করিতেন। পাঠান অধিকারের শেষ পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবে পূজা-বন্দনা চলিয়া আসিতে-ছিল। কালাপাহাড়ের সময় হইতেই এই বাসুদেব-মূর্ত্তির ধ্বংস হয়। কথিত আছে এই সময় লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ একত্রিত হইয়া কোন রাজকীয় ষড়যন্ত্রে উক্ত বাসুদেবমন্ত্রের প্রতি অভিশাপ প্রদান করেন। তজ্জন্য উক্ত মন্ত্রের দীক্ষা-পদ্ধতি বঙ্গে বিরল হইয়া পড়ে। বাসুদেবমূর্ত্তিগুলি কালাপাহাড় কর্ত্তৃক ধ্বংস হয়। এ বিষয়ের সত্য তথ্য জানিবার উপায় নাই। কেবল লোক-শ্রুতিই ইহার অবলম্বন মাত্র। কালাপাহাড় যে এই দেবতার প্রতি অতি বিরক্ত হইয়া পড়েন তাহার প্রধান পরিচয় এই—যতগুলি এইরূপ ভগ্ন মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা সমস্তই বাসুদেবমূর্ত্তি। অপর কোন বিগ্রহমূর্ত্তি ঐরূপ ভগ্নাবস্থায় পাওয়া যায় নাই। এস্থলে স্বীকার করিতে হইবে তখন রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি, শালগ্রামশিলা, বা শিবলিঙ্গ অত্যল্প পরিমাণে স্থাপিত ছিল বা একেবারেই ছিল না।

তজ্জন্য কালাপাহাড় কর্ত্তৃক উক্ত মূর্ত্তিগুলির বিলোপ ঘটে নাই। অথবা কালাপাহাড়ের আদেশে উক্ত মূর্ত্তির কোন অনিষ্ট সাধিত হয় নাই। কেবল বাসুদেব-মূর্ত্তিগুলিই ধ্বংস ও স্থানচ্যুত হইয়াছিল।

এই মূর্ত্তিগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে হিন্দুদিগের প্রস্তরশিল্পে কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালী ভাস্করেরা কোন্ স্থানের প্রস্তরে এই মূর্ত্তিগুলি ক্ষোদিত করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। মুঙ্গেরের কৃষ্ণ প্রস্তর দ্বারা এই সকল মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ক্রমে ক্রমে উক্ত শিল্পিকুল প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে। প্রস্তরের খোদাই কার্য্যে বঙ্গশিল্পীকুল একসময়ে অতিশয় উন্নতিলাভ করিয়াছিল। দেব-দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ভিন্ন বড় বড় মন্দির ও হর্ম্ম্যগাত্রে প্রস্তরখোদিত বহুতর মূর্ত্তি প্রাচীন হিন্দু রাজত্বে স্থান প্রাপ্ত হইত। হিন্দুরাজাগণ এইরূপ শিল্পীদিগকে বিশেষরূপে উৎসাহ দিতেন। যে মন্দির উক্ত প্রস্তর-খোদিত প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা শোভিত না হইত, তাহা তৎকালে দর্শনের অযোগ্য হইত। মুসলমান রাজত্বের শেষ পর্য্যন্তও উক্ত শিল্পীকুল প্রাণে মারা যায় নাই। সম্রাট ও নবাবগণ উক্ত শিল্পের উৎসাহদাতা ছিলেন। বাঙ্গালার অনেক প্রাচীন মসজিদ ঐরূপ কারুকার্য্যে সমলঙ্কৃত ছিল। ইংরাজ রাজত্বকালে হর্ম্ম্যনির্ম্মাণপ্রণালী বিভিন্ন আকার ধারণ করায় ও বর্ত্তমান হিন্দুগণ প্রস্তরনির্ম্মিত দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনে পূর্ব্বাপেক্ষা শিথিলযত্ন হওয়ায় উক্ত শিল্পিগণের বংশধরেরা উদরান্নের জন্য নির্ম্মূল হইতে চলিল। এবং প্রাচীন ভারতের প্রস্তর-শিল্প ক্রমে ক্রমে লোপ প্রাপ্ত হইল। কাঁটোয়া ও দাইহাটের ভাস্করেরা বোধ হয় প্রাচীন শিল্পিগণের বংশধর হইতে পারেন। তবে উৎসাহ ও কার্য্যের অভাবে এই শ্রেণীর বহু শিল্পীবংশের বিলোপ ঘটিয়াছে, তাহা স্থির নিশ্চয়!!

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এক্ষণে সাহিত্য-পরিষদ হইতে নানা স্থানে ঐরূপ প্রস্তর-মূর্ত্তির সংগ্রহ ও বিবরণাবলী সংগৃহীত হইতেছে। বীরভূমের প্রত্যেক গ্রাম ও পল্লীতে ঐরূপ ও অন্য প্রকার প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহার অনুসন্ধান করে এরূপ স্বার্থবিবর্জ্জিত জ্ঞানী লোক কই। আমাদের এস্থানে "ফটোগ্রাফার" না থাকায় উক্ত বাসুদেবমূর্ত্তি ও অপরাপর প্রস্তর-ক্ষোদিত দেবদেবীর মূর্ত্তির চিত্র পাঠাইতে পারিলাম না। যদি কখন চেষ্টা সিদ্ধ হয়, তবে বহুতর ঐরূপ মূর্ত্তির "ফটো" আপনার নিকট প্রেরণের অভিলাষ রহিল।"*

* বাসুদেবের ধ্যান

বিষ্ণুং শারদচন্দ্র কোটিসদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদামম্ভোজং
দধতং সিতাব্জ-নিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্।
আবদ্ধাঙ্গ-দহারকুণ্ডল মহামৌলিং স্ফুরৎকঙ্কণং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার কৌস্তুভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতম্॥

গ্রাম্য দেবতার প্রথমোক্ত ধ্যানেই পূজা হয়। নীচের লিখিত বাসুদেবের ধ্যানে পূজা হয় না। সুতরাং বাসুদেব-মূর্ত্তিগুলি গ্রাম্য-দেবতার মূর্ত্তি নহে। ভদ্রকালীই গ্রাম্য দেবী।

আমরা রাঢ় অঞ্চলের জননায়কগণকে কর্ম্ম-তৎপর হইতে প্রার্থনা করিতেছি। কলিকাতা বা অন্য কোন স্থানের সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য-পরিপোষকগণের উপর নির্ভর না করিয়া তাঁহারা স্বাধীন চেষ্টায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত হউন। বড়ই দুঃখের কথা—প্রায় সকল বিষয়েই রাঢ় প্রদেশ বঙ্গসমাজের অতি নিম্ন স্তরে রহিয়াছে।

*
* *

১৩। বিদেশে হিন্দুর উপনিবেশ

আমরা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'যবদ্বীপে হিন্দুটোলা' শীর্ষক আলোচনা প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে বিদেশগত হিন্দুদিগের স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজ-রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজনীয়তা প্রচার করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী যবদ্বীপবাসী আধুনিক হিন্দু সমাজের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের এক সভায় তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়াছেন। তাহা সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধ হইতে ভারতবাসী হিন্দুগণের কর্ত্তব্যবিষয়ক অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"আমি পূর্ব্বে একাধিক বার বলিয়াছি যে, বালি অঞ্চলে প্রায় দশ লক্ষ ঔপনিবেশিক হিন্দু সন্ততি অবস্থান করিতেছেন—তাঁহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকল বর্ণই আছেন। তাঁহাদিগের সহিত ভারতের সম্বন্ধ অনেক দিন হইল বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা আমাদের কথা কখনও কখনও মনে করিলেও, আমরা ভারতবাসী তাঁহাদের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। ভারতের গৌরব, ভারতের সাম্রাজ্য, ভারতের বাণিজ্য, ভারতের ধন-ধান্য বৃদ্ধি করিবার জন্য পুরাকালে তাঁহারা যে কিরূপ অসাধারণ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে কিরূপে তাঁহারা ভারতীয় নৌবলের প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সে সব গৌরবকাহিনীর কোন কথাই আমরা জানি না; প্রাণমুগ্ধকর অবদানপরম্পরার বিষয় বর্ত্তমান কালেও আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাই তাঁহারা আমাদের পূর্ব্বজদিগের সহানুভূতি ও আমাদের সাহায্যপ্রাপ্ত হন নাই। তাঁহাদের পতন যে কোনও কারণে হউক না কেন, বর্ত্তমান স্থলে তাহার আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যে সকল ভারত-গৌরব ভারত-সন্তান বর্ত্তমান কালেও বালি প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগের সহিত আমাদের পুনরায় সম্বন্ধ সংস্থাপন করা কি উচিত নহে? দশ লক্ষ হিন্দু কি আমাদের নিকট হইতে চিরকালই বিচ্ছিন্ন-ভাবে অবস্থান করিবেন? তাঁহারা নিজেদের কথা আমাদের কাছে উত্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই বলিয়া কি বর্ত্তমান কালেও তাঁহারা ভারতীয় সমাজের অঙ্গ নহেন বলিয়া উপেক্ষিত হইবে? উপেক্ষা করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। বালিবাসী ভারতীয় সমাজের একটি অঙ্গ। এত দিন ঘটনাচক্রে এই অঙ্গ অবয়ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। কিন্তু যে সকল কারণে বালিবাসীর সহিত ভারতবাসীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ছিল। এক্ষণে সে সকল কোন কারণই

বর্ত্তমান নাই, এতএব বালিতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া বালিবাসী হিন্দুদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা প্রদান, তাঁহাদিগের মধ্যে ভারতীয় সদাচার সকলের পুনঃ প্রচলন করা কি উচিত নহে? ছয় হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলে, তিনজন ব্রাহ্মণ এক বৎসর কাল বালিতে অবস্থান করিয়া তদ্দেশবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন।

কিন্তু বালিবাসী স্বধর্ম্মে অনুরক্ত বলিয়া খৃষ্টান মহাশয়দিগের বলবতী আশা পূর্ণ হয় নাই। এরূপ অবস্থায় আমাদের নিশ্চেষ্ট অবস্থান কি শোভনীয়? যদি আমাদের সমধর্ম্মাবলম্বী বালিবাসীর ধর্ম্মভাব সুদৃঢ় করিবার জন্য আমাদের দেশ হইতে কতিপয় ধার্ম্মিক মহাশয়কে সে দেশে প্রেরণ করা যায়, তাহা হইলে বালিবাসীরা বুঝিবেন, ভারতের ৩০ কোটি সমধর্ম্মাবলম্বী তাঁহাদের ধর্ম্মভাব-বৃদ্ধির কামনা করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের নৈতিক বল বড় অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে না; প্রত্যুত আমরাও বড় কম উপকৃত হইব না। আমাদের ইতিহাসের একটা অমূল্য নূতন অধ্যায় নূতন ভাবে লিখিত হইবে। আমাদের যুবকগণের জন্য উক্ত দ্বীপপুঞ্জে সৌভাগ্যের নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকিলে আমাদিগকে নিশ্চয়ই প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে।"

সকল দেশের লোকেরাই দূরদেশস্থ স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের জন্য নানারূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকে। আমরাই কেবল উদাসীন থাকিব? আমাদের বিদেশযাত্রা, বিদেশ-বাস, বিদেশে ধর্ম্মশিক্ষা বিদেশে সমাজ-রক্ষা প্রভৃতির জন্য আমাদের নিজের কর্ত্তব্য কি কিছুই নাই? একটা সুসংবাদ পাইতেছি যে একটি স্বদেশী জাহাজ কোম্পানী খোলা হইতেছে। তাহাতে আমাদের দেশানুগত আহার-বিহার, আচার-ব্যবহারের আয়োজন থাকিবে।

* *
*

১৪ কয়েকজন পরলোকগত বাঙ্গালী

বিগত কয়েক মাসের মধ্যে বঙ্গজননী কয়েকটি সুসন্তান হারাইয়া কথঞ্চিৎ দরিদ্র হইয়াছেন। আমাদের উদীয়মান চিকিৎসক, কলিকাতার ডাক্তার-সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ গণেন্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ, এম্, ডি তাঁহাদের অন্যতম। অল্প বয়সে তিনি যথেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় মতের চিকিৎসা-প্রণালীর সমাদর করিতেন। তিনি একজন পরোপকারী সমাজ-সেবক যুবা ছিলেন। তাঁহার অভাবে বঙ্গীয় যুবকগণের একটি সদ্‌দৃষ্টান্তের অভাব ঘটিল।

তাহার পর আমাদের ব্যবসায়জগতের খ্যাতনামা কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন, এবং উদীয়মান কর্ম্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন। যুবা সুরেন্দ্রনাথ ৩৫।৩৬ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। মধ্যবঙ্গের কুশদহ পরগণা হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পরিচয় বাহির হইয়াছে। "এক সময়ে ডিপুটি হইবার সুযোগ থাকিলেও তাঁহার পিতার পরামর্শে সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের উপায় অবলম্বন

করেন। প্রথমে কমিশেরিয়েটে ছোলা ও ভূষি সরবরাহের কণ্ট্রাক্ট পান। কিন্তু তাহাতে বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় সুবিখ্যাত এণ্ড্রু ইউল কোংর সত্বাধিকারী স্যার ডেভিড ইউল মহোদয়ের উপদেশে পাটের দালালি শিক্ষায় প্রবৃত্ত হ'ন।*** ব্যবসায়ে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ নিত্য তাঁহার আপিসে মিলিত হইতেন। কোন কোন ইংরাজ তাঁহাকে আদর করিয়া "পাট ব্যবসায়ে নেপোলিয়ান" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীগণ তাঁহাকে স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মত শক্তি-সম্পন্ন মনে করিতেন।** তাঁহার আপিসের ব্যয়ই মাসে তিন সহস্র মুদ্রা ছিল। ইহা হইতে কার্য্যের পরিমাণ করা অসম্ভব নহে। পাকা গাঁটের কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য আগামী বর্ষে বিলাত যাইতে তিনি কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিলেন।** মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি স্বগ্রামের সন্নিকটস্থ স্কুলের উন্নতিকল্পে ৫০০৲ প্রদান করেন।** মৃত্যুর সপ্তাহ মাত্র পূর্ব্বে স্বগ্রামের পথ ঘাটের উন্নতিকল্পে তাঁহার দুইটি ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া গৈপুর লইয়া যান।*** পাটের কার্য্য শিক্ষার অবস্থায়, পিতা তখন বিদেশে, কলিকাতায় হাত পুড়াইয়া রাঁধিয়া খাইয়াছেন, তথাপি পিতাকে খরচের অনটনের কথা জ্ঞাপন করেন নাই।** ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে অতি উচ্চ আদর্শ।"

কয়েকদিনের মধ্যে বঙ্গীয় শিক্ষাজগতের দুইজন ধুরন্ধর পরলোক গমন করিয়াছেন। একজন ভারত বিখ্যাত অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে এম্, এ, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার। তিনি শিক্ষাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া প্রায় ৫০ বৎসর কাল এক ভাবে জীবন কাটাইয়াছেন তাঁহার সরলতা, ছাত্র-হিতৈষণা এবং চরিত্রের মহত্ত্বে বঙ্গসমাজ পঞ্চাশ বৎসর গৌরবান্বিত রহিয়াছে। তাঁহার স্বার্থত্যাগ প্রশংসনীয়। যাঁহারা বাঙ্গালীকে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দিবার জন্য মহারাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করেন তাঁহারা ঘরের মহাপুরুষগণকে ভুলিয়া যান। তাঁহাদিগকে অনেক বাঙ্গালী শিক্ষা-প্রচারকের নাম শুনাইতে পারি। আমাদের পরলোকগত শিক্ষাব্রতধারী অধ্যাপক গৌরী-শঙ্কর তাঁহাদের অন্যতম। গৌরীশঙ্কর বাবু অতিশয় নীরব কর্ম্মী ছিলেন। সমাজের কোন আন্দোলনে তাঁহার সাড়া পাওয়া যায় নাই। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে তাঁহার জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসরের ভিতর তিনি একবারও কলিকাতা ত্যাগ করিবার জন্য রেল গাড়ীতে চড়েন নাই। তথাপি তিনি জাতীয় উন্নতির আন্দোলনে বিশেষ-রূপেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ ভারতবর্ষে যে নবযুগের নূতন শিক্ষাপ্রচার করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার পুষ্টি সাধনের জন্য তাঁহার অধ্যবসায় প্রযুক্ত হইয়াছিল। তিনি নানা ভাবে এই শিক্ষাপরিষদের লালনপালনে যত্ন করিয়াছেন। বঙ্গজননীর এই নীরব সাধকের মৃত্যুতে বাঙ্গালী একজন প্রকৃত চরিত্রবান্ মনস্বী পুরুষ হারাইলেন।

আর একজন চরিত্রবান্ অধ্যাপক তরুণ বয়সে বঙ্গসমাজকে লোকবলে খর্ব্ব করিয়া-ছেন। তিনি আমাদের ছাত্রবন্ধু দেশহিতৈষী সরল স্বভাব বিনয়েন্দ্রনাথ সেন। তিনি শেষ বয়সে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের

ভারতের গণিত-রত্ন

৺ অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে

হিন্দু পেট্রিয়ট [illegible] গৃহীত

India Press, Calcutta.

অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু নানাভাবে নানা কর্ম্মক্ষেত্রের ভিতর দিয়া তিনি বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং যুবকসমাজের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। নিজ চরিত্রবলে সকলকে তিনি মোহিত করিয়া অনেকের জীবনের লক্ষ্য স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করিলেন। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

এই পাঁচ জন ব্যক্তিই কলিকাতার সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। তাঁহাদের অভাব কলিকাতার লোকেরা অহরহ ভোগ করিবে। এই কয় মাসের মধ্যে কলিকাতার বাহিরেও কয়েকজনের মৃত্যু হইয়াছে যাঁহাদিগকে স্থানীয় জনসাধারণ বড় শীঘ্র ভুলিতে পারিবে না।

'মেদিনীপুর হিতৈষী'তে মেদিনী পুরের একজন স্বদেশসেবকের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি "মেদিনীমাতার অমূল্য রত্ন, দেশের ও দশের গৌরব দরিদ্রের নয়নমণি প্রসন্ন কুমার মিত্র।" জনৈক লেখক তাঁহার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত শোকসভায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাঁহার সাধু জীবন আমাদের অনুকরণীয়। তিনি একজন আদর্শ গৃহস্থ পদ বাচ্য ছিলেন। বঙ্গসমাজে এরূপ সেবাব্রত গৃহস্থের অতীব আবশ্যক। "কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রসন্নকুমার যে সকলেরই সেবক ছিলেন! এমন দরিদ্র সেবক—এমন অকপট মিত্র—এমন হিতাকাঙ্ক্ষী মহাপুরুষ যে অনেক সাধনার ফলে মিলিয়াছিল। * * প্রসন্ন কুমার কি ছিলেন? তিনি আমাদের দেশের মিত্র—কাঙালের সখা—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। তিনি আমাদের ধর্ম্মের সহায়,—পুণ্যের অবলম্বন,—ত্যাগের আদর্শ। তাঁহাকে লাভ করিয়াই আমরা সেবাব্রতের মহিমা বুঝিয়াছিলাম—বুঝিয়াছিলাম সাধনার সহজ পন্থা কেমন করিয়া মিলে—বুঝিয়াছিলাম আত্মপ্রীতির স্থলে বিশ্বপ্রেমের বিকাশ কেমন করিয়া সাধন করিতে হয়। শোকার্ত্তের শোক দূর করিতে—ব্যথিতের ব্যাধি বিনাশ করিতে—ব্যথিতের ব্যথা নিবারণ করিতে এমন আর কে ছিল? কর্ত্তব্যের এমন পথ-প্রদর্শক—কর্ম্মক্ষেত্রে এমন বিশ্বস্ত সহচর—সংসার সংগ্রামে এমন আর কোথায় পাইব?

কর্ম্মবীর প্রসন্ন কুমার জীবনের শেষভাগ অবধি কর্ম্মসাধন করিয়া তাঁহার কর্ম্মব্রতের উদযাপন করিয়া গিয়াছেন। কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি যে অসাধারণ অধ্যবসায়, অবিচলিত ধৈর্য্য, অপূর্ব্ব উৎসাহ, প্রকৃত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা সচরাচর কয়জনের লক্ষ্য করা যায়? সময়ে অসময়ে, সুবিধায় অসুবিধায় যখনই তাঁহাকে ডাক না কেন—নিঃসন্দেহে, অকপটচিত্তে, হাসিমুখে তিনি তৎক্ষণাৎ আপনার প্রাণ ঢালিয়া তোমার সেই আহ্বানে যোগদান করিবেন। এমন ধারা প্রাণের লোক আর কয়জন দেখিয়াছ? মুখে বা অন্তরে বিরক্তির লেশ মাত্র নাই অথচ কর্ম্মপালনে কি আশ্চর্য্য দক্ষতা হেন আদর্শ কোথায় পাইবে? জীবনের শেষভাগে প্রসন্ন কুমার স্থানীয় কালেক্টারীর একাউণ্ট্যাণ্ট পদে উন্নীত হইলেও অধিকাংশ জীবন তিনি তথায় নাজিরের কার্য্যে অতিবাহিত করেন। এইজন্য "নাজির প্রসন্ন বাবু"

নাম ধনীর প্রাসাদ হইতে ভিক্ষুকের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ভাই মেদিনীবাসি! যদি এই সভার শোকে যথার্থ শান্তিলাভ করিতে চাও তাহা হইলে এস এখন হইতে জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম সমন্বিত এই মহাপুরুষের পবিত্র স্মৃতি সংরক্ষণে সচেষ্ট হই। তাঁহার পবিত্র কীর্ত্তি, জীবনের তপস্যা, "দরিদ্র নারায়ণের" সেবা অক্ষুন্ন রাখিতে প্রয়াস করি। চেষ্টা করি যেন তাঁহার বড় সাধের "দাতব্য ঔষধালয়" অক্ষয় ভাবে বিরাজ করিয়া তাঁহার অক্ষয় স্মৃতির অনুসরণ করে!"

এতদ্ব্যতীত একজন সাহিত্যসেবী এই সময়ের মধ্যে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের উদীয়মান ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারী শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার রায় বি, এ। ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সম্পর্কে তিনি পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ঐতিহাসিক সাধনার পূর্ব্বাভাষ মাত্র 'প্রতিভা'য় প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি তাঁহার পুণ্যব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য ঢাকার ছাত্রগণ অগ্রসর হইবেন।

বাঙ্গালায় কর্ম্মবীর ও চিন্তাবিরগণের সংখ্যা বাড়িতেছে বটে, কিন্তু এই সকল কৃতী পুরুষের অভাব মোচন বড় শীঘ্র হইবে না! সেবা বিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, শিল্প ও ব্যবসায় বিভাগ, চিকিৎসা বিভাগ—সকল বিভাগ হইতেই দু'এক জন করিয়া উৎসাহী ব্যক্তির তিরোধান হতভাগ্য জাতির পক্ষে বড়ই শোচনীয়। কেবল এইখানেই শেষ নহে। আবার সেদিন কলিকাতা সমাজের একজন শীর্ষ স্থানীয় কর্ম্মী পুরুষ মৃত হইয়াছেন। তিনি আমাদের জানকী নাথ ঘোষাল। তিনি বঙ্গদেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের একটি প্রধান স্তম্ভ ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে "সঞ্জীবনী" লিখিয়াছেন ঃ—

১৮৮৫ সাল হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত ২৬ বৎসর কাল জাতীয় মহাসমিতির যত অধিবেশন হইয়াছে, তিনি তাহার প্রত্যেক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের মহৎ লক্ষ্য, কংগ্রেসের শক্তি, কংগ্রেসের নিয়ম, কংগ্রেসের কার্য্যকারকদের সম্বন্ধে তাঁহার যেমন অভিজ্ঞতা ছিল, আর কাহারও তেমন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তিনি কখনও কংগ্রেসের সভাপতি পদে বৃত হন নাই বটে, কিন্তু কংগ্রেস তাঁহার জীবনের পরম প্রিয় জিনিস ছিল। বহু বৎসর কাল কংগ্রেসের রিপোর্ট তাঁহার সাহায্যেই প্রকাশিত হইত। যেখানে কংগ্রেস হইত, মান্দ্রাজ, বোম্বাই লাহোর কি অমরাবতী, সর্ব্বত্রই দুই তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে তথায় গমন করিয়া কংগ্রেসের সকল প্রকার ব্যবস্থা করিতেন।

একমাত্র পুত্রকে ত্যাগ করিয়া পিতা শান্তিতে গৃহবাস করিতে পারিলেন না। তিনি নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কেবল মাত্র ১০০০ টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া আর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিলেন। জয়চন্দ্র যখন সংসারে বিমনা হইয়া বাস করিতেছিলেন এমন সময় তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার জীবন বড় ভার হইল। তখন পুত্রের প্রতি তাঁহার স্নেহ আবার ধাবিত হইলে পিতাপুত্রে আবার এক প্রকার মিলন হইল।"

ছাত্র বন্ধু

৺ অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র নাথ সেন

India Press, Calcutta.

এই দুঃসময়ে ভগবান্ আমাদের জাতীয় কবি দিজেন্দ্র লাল রায়কেও পরলোকে টানিয়া লইলেন কবিবর বাঙ্গালীর মায়া কাটিয়া চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু বাঙ্গালী তাঁহাকে ভুলিবে না। বরং বর্ত্তমান সমাজের বংশধরগণ ক্রমশঃ যত বড় হইতে থাকিবে দ্বিজেন্দ্র লাল রায় তত অধিক সমাদর লাভ করিতে থাকিবেন। তিনি বঙ্কিম, ভূদেব, বিবেকানন্দের ন্যায় অমর হইয়াছেন—এই সকল জাতি-সংগঠন কর্ত্তাদের ন্যায় তাঁহার কীর্ত্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিবে। 'আমার দেশ' ও 'জন্মভূমি' গীতের রচয়িতা বাঙ্গালার সাহিত্যে এবং বাঙ্গালীর জাতীয়জীবনে চির-প্রসিদ্ধ থাকিবেন—একথা সাহস করিয়া বলিতে বিশেষ ভাবুকতার আবশ্যক হয় না। আমারা বাঙ্গালী জাতিকে গড়িয়া তুলিবার উপকরণ তাঁহার কাব্যনাট্যহাস্য হইতে কত খানি পাইয়াছি তাহা ওজন করা অসম্ভব। এই সকল ব্যাপার গণিয়া মাপিয়া স্থির করা যায় না। তবে যে কয়জন চিন্তাবীর আধুনিক বঙ্গসমাজকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম শ্রেণীর অন্যতম। সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

১৫। ময়মনসিংহের উদ্ভিদাগার

আমরা অবনত জাতি। এজন্য নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে আমরা আবদ্ধ থাকি নিজের বিদ্যা ও কর্ম্ম-পাণ্ডিত্যের বড়াই করিয়া কাল কাটাই। অপরের মহত্ত্ব স্বীকার করিতে অপরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আমরা একেবারেই অপারগ। উন্নত জাতির চরিত্রে উদারতা ও গুণগ্রাহিতা যথেষ্ট থাকে। আমরা যেখানে উল্লেখযোগ্য কিছুই পাইনা তাঁহারা সেখানে বীরত্ব, অলোকসামান্য প্রতিভা, ক্রিয়াশক্তির অদ্ভুত সদ্ব্যবহার লক্ষ্য করিতে পারেন। তাঁহাদের চোখ আছে—আমাদের চোখ নাই।

চোক থাকিলে আমরা বঙ্গসমাজে অনেক কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীরের পরিচয় পাইতাম—বাঙ্গালার নগন্য পল্লীগ্রাম ও মফঃস্বল হইতে বহু উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যসেবী, বিজ্ঞানসেবী, ব্যবসায়বিৎ, শিল্পকলাবিৎ, পরোপকারী, উন্নতচরিত্র লোককে জগতের সম্মুখে দাঁড় করাইতে পারিতাম। তাহাতে দেশের "লোক"-সংখ্যা সত্যসত্যই বাড়িত—বাঙ্গালী-সমাজ মহনীয় হইত—আমরাও ধন্য হইতাম।

ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর নগরের মোক্তার শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ মহাশয়কে আমরা বঙ্গজননীর এইরূপ একটি সুসন্তান মনে করি। বিজ্ঞানের আলোচনায় ব্যবসার ক্ষেত্রে, অধ্যবসায়ে ও কঠোর পরিশ্রম-স্বীকারের হিসাবে পৃথিবীর যে কোন দেশ তাঁহাকে লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইতে পারে। স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কর্ম্মের তিনি একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি একজন যথার্থ পল্লীসেবক। আমরা আমাদের সমাজের জন্য যেরূপ গৃহস্থ চাই তিনি তাহার আদর্শ স্বরূপ।

তিনি বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া কৃষি-কর্ম্মের জন্য ও উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের জন্য অসাধারণ অধ্যবসায়, কষ্টস্বীকার এবং অর্থব্যয় করিয়াছেন। তাহা দেখিলে অন্য দেশের লোকেরা তাঁহাকে "Martyrs" "Heroes of

Science" বা বিজ্ঞান বীরগণের শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাঁহার উদ্ভিদালয়কে বিজ্ঞানসেবীদিগের তীর্থক্ষেত্ররূপে বিবেচনা করিত। উদ্ভিদনিচয় তাঁহার নিকট কেবল মাত্র ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জনের সামগ্রী নহে এই সমুদয়ই তাঁহার ধ্যান-আরাধনার বিষয়। ব্যবসায় ক্ষেত্রে হাতে কলমে কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহার প্রভূত অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। সেই অভিজ্ঞতা তিনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থাকারে বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি মামুলি ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ নহে—স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণ মূলক, স্বাধীন গবেষণা প্রসূত প্রকৃত মৌলিকগ্রন্থ। আমরা নিম্নে এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি।

গ্রন্থকার ইউরোপ, আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা, মরিশশ্, ম্যাডাগাস্কার, সিসেলেস, সিংহল, ফিলিপাইনদ্বীপপুঞ্জ সিঙ্গাপুর, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, ট্যাসমেনিয়া বোর্ণিও, সুমাত্রা, জাভা, নিউকেলিডোনিয়া, পিনাং ও আণ্ডামাণ প্রভৃতি দ্বীপসমূহ এবং রুষিয়া, তুরস্ক, পারস্য, আরব, আফ্গানিস্থান, তির্ব্বত, চীন, মালয় এবং জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে ন্যূনাধিক বিংশতিবর্ষকাল পর্য্যন্ত বীজ ও উদ্ভিদাদি আনয়ন ও নিজ-উদ্যানে তাহাদের চাষ করিয়া যে ফললাভ এবং উক্ত সকল দেশজ উদ্ভিদসমূহের তত্ত্ব-সগ্রহ করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহারই সারমর্ম্ম হইতে 'উদ্যানতত্ত্ব-বারিধি ও উদ্ভিদের বিশ্বকোষের' পাণ্ডুলেখ্য লিখিত হইয়াছে। লোকে কথায় বলে—"যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে"। উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধেও এ কথাটি সর্ব্বথা প্রযোজ্য অর্থাৎ উদ্যান ও কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে যে তত্ত্ব এ গ্রন্থে নাই, তাহা অন্য কোনও গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে।

এই বিরাট গ্রন্থে উদ্যান-কার্য্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় তত্ত্ব এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সকল উদ্ভিদের আবিষ্কার হইয়াছে, উহাদের প্রায় সকলেরই জন্মস্থান, প্রকৃতি, গুণ, ব্যবহার ও চাষ-প্রণালী সরল ভাষায় বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, যে সকল উদ্ভিদ মনুষ্য বা মনুষ্যেতর কোনও প্রাণীর বিশেষ প্রয়োজন সাধন করিতে অসমর্থ এবং কেবল উদ্ভিদের তত্ত্বানুশীলনের জন্যই প্রয়োজনীয়, তাহাদের বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। তদ্ভিন্ন বিশ্বের যাবতীয় উদ্ভিদেরই চাষ-প্রণালী এবং তৎসম্বন্ধীয় অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ 'উদ্ভিদের বিশ্বকোষে' স্থানলাভ করিয়াছে।

ফলের বাগানের, ফুলের বাগানের, উদ্যান-শোভাকর ও মূলজ যাবতীয় বৃক্ষাদি এবং বর্ণপ্রদ, সূত্রপ্রদ, মধুপ্রদ, সুগন্ধপ্রদ, কাগজ প্রস্তুতোপযোগী, তৈলপ্রদ, সাবানপ্রদ, নির্য্যাস ও রবারপ্রসূ, চর্ম্মপরিষ্কারক এবং খাদ্যপ্রদ সমস্ত উদ্ভিদের বিবরণই উক্ত বিরাটগ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, মাঠজ ফসলসমূহের, রেসমকীটের এবং মৎস্য ও মধুমক্ষিকার চাষ-প্রণালীও ইহাতে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ও বৈদেশিক ভেষজাদির প্রকৃতি, গুণ, ব্যবহার ও চাষ-প্রণালী সম্বন্ধেও সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গোপালন ও গবাদি-পশুর চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অত্যাবশ্যক কোন কথাই বাদ পড়ে নাই।

প্রথম খণ্ড

এই খণ্ড তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ে যে সকল বিষয় আলোচিত হইবে, নিম্নে তাহার নির্ঘণ্ট প্রদত্ত হইল।

প্রথম অধ্যায়

১। ভূমি, ভূমি ও উদ্ভিদ সম্বন্ধীয় রাসায়নিক তত্ত্ব, সূর্য্যের উদ্ভিজ্জীবনের সম্বন্ধ, উষ্ণতা বা উত্তাপ, আলো, আর্দ্রতা, শৈত্য, জল, জলবায়ু এবং বায়ুমণ্ডল।

২। তুষার, শিশির, মেঘ, বৃষ্টি, বিভিন্ন প্রকার জল ও সার-তত্ত্ব।

পূর্ব্ববঙ্গের কৃষিবিজ্ঞান-সেবী কর্ম্মবীর ঈশ্বরচন্দ্র গুহ

India Press, Calcutta.

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। উদ্যানের স্থাননির্ণয়, সমতল ভূমির আবশ্যকতা, উদ্যানের নক্‌সা ও উদ্যান-প্রস্তুত-প্রণালী, প্রাকৃতিক-দৃশ্যযুক্ত উদ্যান প্রস্তুত, উদ্যান-সজ্জা, বিচিত্র পুষ্পসজ্জা, উপবন, কুঞ্জ, বিলাসভবন, লতামণ্ডপ, বৃক্ষের বিথীকা, বৃক্ষের গ্রূপ, নানাবিধ সবুজগৃহ, গ্রীষ্মাবাস প্রনালী ও তাহা রক্ষা করিবার উপায়।

২। সবুজগৃহে পোষণোপযোগী বৃক্ষের তালিকা, অর্কিড্-গৃহ, তৃণমণ্ডল, রাস্তা, ক্ষুদ্র পথ, গাড়ীর রাস্তা, খাল, হ্রদ, পয়ঃ-প্রণালী, সাঁকো, পোল ও উৎস প্রভৃতির রচনা-প্রস্তুতপ্রণালী।

৩। গুল্মোদ্যান, ফলের বাগান, সব্জীবাগ, উদ্যানের পশ্চাদ্ভাগ, আফিস ঘর, কার্য্যকারক, মালী ও কুলিদের বাসস্থান এবং গুদামঘর প্রভৃতি প্রস্তুত-প্রণালী।

৪। একোরিয়া (Aquaria—মৎস্যাদির আধার) প্রস্তুত-প্রণালী এবং তাহাতে চাষোপযোগী গাছের তালিকা।

৫। ফার্ণগৃহ (Fernery), কৃত্রিম পাহাড় (Rockery) মঞ্চ, (Mound), উদ্যান-সৌষ্টব (Garden ornaments) অর্থাৎ তছবির (Statue) স্তম্ভ,উদ্যানাসন ও লতা-ছত্র প্রভৃতি প্রস্তুত-প্রণালী।

৬। বেড়ার আবশ্যকতা ও বেড়াপ্রস্তুত-প্রণালী, জলসিঞ্চনের আবশ্যকতা ও জল-সিঞ্চন-প্রণালী, জলাশয়, সকলপ্রকার জল-সিঞ্চন-যন্ত্রাদির বিবরণ অর্থাৎ ঢেকীকল, চরকীকল, কপিকল, দ্রোণী, হোঁচা, পাইচা, টুক্‌ড়ি, চিনাকল, দমকল, (Pump), ডবল খোট, পারস্য-চক্র, হামবার্ণকল, মাস্কের জল-বিতারকযন্ত্র, নজলের জলবিতারকযন্ত্র, জল ও তরলসার বহনকারী গাড়ী, ন্যাপ্‌সেক স্প্রেয়ার নিউম্যাটিক গ্রীণহাউস্ স্প্রেয়ার, নিটল জাএন্ট স্প্রেপাম্প, লাইটনিংস্প্রেপাম্প, পিচকারী (নানাবিধ) ও জল দেওয়ার ঝরণা প্রভৃতির চিত্রসহ আবশ্যকীয় সমগ্র বিবরণ ও ব্যবহার-প্রণালী।

৭। বৈঠকখানার ঘরের বারান্দায় উদ্ভিদ-চাষের আবশ্যকতা ও চাষ-প্রণালী, বৈঠক-খানায় ও বারান্দায় চাষোপযোগী গাছের তালিকা, পাত্রে উদ্ভিদচাষের আবশ্যকতা ও চাষ-প্রণালী, টবের গাছ পাত্রান্তরকরণ-প্রণালী, পাত্রে উদ্ভিদ-চাষোপযোগী মৃত্তিকা প্রস্তুত-প্রণালী, পয়ঃনিঃসরণ-প্রণালী, পাত্রস্থ গাছে জল দেওয়ার প্রণালী, পাত্রে গাছ রোপণ ও পাত্রান্তর করিবার সময়, বিভিন্ন-প্রকার পাত্রের বিবরণ (সচিত্র) এবং পাত্রে চাষোপযোগী গাছের তালিকা।

৮। জলোদ্যান (Water garden) ও বিলোদ্যান (Bog garden) প্রস্তুত-প্রণালী এবং তাহাতে চাষোপযোগী উদ্ভিদের তালিকা, ঝুলানপাত্রে ও স্তম্ভোপরি উদ্ভিদের চাষ-প্রণালী।

৯। কিরূপে একরূপ জলবায়ুর গাছকে অন্যরূপ জলবায়ুর প্রকৃতিবিশিষ্ট স্থানের উপযোগী (acclimatisation) করা যায়, তাহার স্থূলতত্ত্ব।

১০। প্রদর্শনোপযোগী পুষ্প প্রস্তুত, পুষ্প-প্রদর্শন-প্রণালী এবং প্রদর্শন করিবার যন্ত্রাদি ; যথা—প্রদর্শন-বাক্স, প্রদর্শন-বোর্ড, স্প্রিংথর্প, পাত্র ও নল।

১১। ফুল ও ফুলের তোড়া, বিবাহ-ঘণ্টা (Weding bell), অন্ত্যেষ্টি এম্বেম (Funeral emblem), রিথ (Wreath), ক্রস্ (Cross), তোড়ার ফ্রেম, তোড়া প্রস্তুত-প্রণালী (সচিত্র), ফুল দীর্ঘকাল তাজা রাখিবার উপায়, ফুলের ব্যবসায় এবং ফুলের ব্যবসায়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি (সচিত্র)।

তৃতীয় অধ্যায়

১। বীজ, বীজের জাতি, মরণশীল-বীজ, বীজ-পরীক্ষা, বীজ প্রস্তুত ও সংগ্রহ-প্রণালী, বীজ-সংগ্রহের সময়, বীজরক্ষার নিয়ম, বীজ রোপণের সময়, শস্য-বীজ, সব্জীবীজ, ফুলের বীজ, ফলের বীজ, ক্ষুদ্র বীজ, ফার্ণ ও অর্কিড্ বীজ, জলজ গাছের বীজ, সকল প্রকার বীজ জলবায়ুর উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করিবার

প্রণালী এবং আমদানী কৃত বীজের বিবরণ।

২। বীজ হইতে বৃক্ষোৎপাদন-প্রণালী। বীজ রোপণোপযোগী মৃত্তিকা, বীজরোপণ-প্রণালী, শাক-সব্জী, ফুল, ফল, লতা ও গুল্মাদির বীজরোপণ-প্রণালী, বীজকে কি পরিমাণ মৃত্তিকার নীচে রোপণ করিতে হয়, বীজের কোন্ দিক উপরে ও কোন্ দিক নীচে রাখিতে হয়, জলজ উদ্ভিদ, অর্কিড্, ফার্ণ, ট্রিফার্ণ, বট, রবার, অশ্বত্থ, ডুমুর, কচু, জ্যাসনিয়া, গ্লক্সিয়ানা পাথরচূড় ও তালমূলী জাতীয় উদ্ভিদের বীজ রোপণ-প্রণালী, ক্ষুদ্র বীজে জলসিঞ্চন-প্রণালী, বীজের অঙ্কুরোদগম-কার্য্য এবং বীজের-ব্যবসায় ও রপ্তানীর জন্য বীজের প্যাকিং-প্রণালী।

৩। উষ্ণ চৌকা, গাছ প্রস্তুতের ফ্রেম, শীতল মঞ্চ, বৃক্ষশালা এবং হাপোরের আবশ্যকতা ও তাহা প্রস্তুত-প্রণালী।

৪। রসাল ও কোমল কাণ্ডক বৃক্ষ-গুল্মাদি, নানাবিধ উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধির প্রণালী, কলম কাহাকে বলে, নানাবিধ কলমের বিবরণ, গোজ-কলম, জিভ-কলম, গদিকলম, মুকুট বা টোপ কলম, ক্রোড় বা কোল কলম, পাশ বা পার্শ্ব কলম, জোড়-কলম, কাটিং, ডালকলম, গুটীকলম, মূলের জোড় কলম, কোমল ও রসালকাণ্ডক উদ্ভিদের জোড় কলম, চোখ কলম, চোঙ্গ কলম, কলম প্রস্তুত প্রণালী, কলমের সংযোগ-ক্রিয়া কলম বান্ধিবার প্রণালী, কলমের জন্য চারা প্রস্তুত-প্রণালী, কিরূপ শাখার সহিত জোড়কলম বান্ধিতে হয়, কলম বান্ধিবার পরবর্ত্তী কার্য্য, কলম প্রস্তুত করিতে যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হয় তাহার তালিকা, যথা—কেঁচি, করাত গাছকাটা ছুরি, জোড়-কলম কাটিবার ছুরি, বাটাল, হাতুড়, মিট্রোগ্রেপ, কলমগজ, কলমের মলম, উষ্ণ রঞ্জণমলম, স্নিগ্ধ রঞ্জণমলম ইত্যাদি, কলমের মৃত্তিকা, কাটিং কলম, কাটিং কিরূপে কাটিতে হয়, কিরূপে ডালের কাটিং করা সঙ্গত, ক্যাটিংএর হাপোর ও মৃত্তিকা, বেলগ্লাশ কাটিং প্রস্তুত প্রণালী, কাটিং বসাইবার সময়, যত্ন আঁশে কাটিং প্রস্তুত প্রণালী, কাটিং দ্বারা কলম প্রস্তুতের নূতন নিয়ম, জলে কাটিং বসাইয়া কলম প্রস্তুত প্রণালী, কাটিং প্রস্তুত হইবার পরে উহার শুশ্রূষা, মূলের কাটিং, ডাবাকলম সাধারণ প্রকার অঙ্গুরিয়াকাকারে কিরূপে ডাবাকলম প্রস্তুত করিতে হয়, শূন্যে ডাবাকলম প্রস্তুত প্রনালী, স্বাভাবিক ডাবাকলম, খোলাতে ডাবাকলম প্রস্তুত-প্রণালী, গুটী কলমের বিবরণ এবং গাছের কাণ্ড-পরিবর্ত্তন প্রণালী ইত্যাদি।

৫। মূল, মূলবিভাগ, পত্র, কাণ্ড ও শাখা, চোখ, কন্দমূল, করম (Corm) এবং রাইজোম (Rhygome) প্রভৃতি দ্বারা উদ্ভিদের উৎপাদন-প্রণালী।

৬। উদ্ভিদের শঙ্করজাতি উৎপাদন-প্রণালী।

৭। গাছ ও মূল ছাঁটিবার উদ্দেশ্য, ছাঁটি-বার-প্রণালী ও ছাঁটিবার-যন্ত্রাদির বিবরণ, গাছের কাণ্ড ও শাখার বল্কল চিরিবার উদ্দেশ্য, গাছের পাদদেশের বল্কল উঠাইয়া, উহাকে মারিবার উদ্দেশ্য, গাছের গোড়ার বল্কল আংশিক উঠাইবার এবং উহার কাণ্ডের মধ্য দিয়া ছিদ্র করিবার উদ্দেশ্য ইত্যাদি।

৮। বামনবৃক্ষ প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্য ও প্রস্তুত-প্রণালী, দূরদেশাগত উদ্ভিদের জীবন্যাস, সাময়িকরূপে অচৈতন্য বা নিদ্রিত গাছের বিবরণ, গাছ শুষ্ক করার উদ্দেশ্য, শুষ্ক করিবার প্রণালী, কাষ্ঠকাণ্ডক, রসাল-কাণ্ডক ও মূলজ গাছ এবং পত্রের অস্থিপঞ্জর প্রস্তুত-প্রণালী ইত্যাদি।

৯। উদ্ভিদের শত্রু—যথা মনুষ্য (চোর), গরু, ঘোড়া, ভেড়া, শূকর, ছাগ, হরিণ, সজারু, বানর, শৃগাল, ইন্দুর, শশক, কাঠবিড়াল, খট্টাশ, ভল্লুক, মহিষ, দাঁড়কাক, চড়ুই, বাবুই, ময়না, বাদুর, তোতা, সুতার পাখী, পিপিলিকা, উই, সুতার পোকা, ছাতা পোকা, চাটা, শামুক, উকুন, কড়া পোকা, ঘুণ, কেঠে পোকা,

চতন্য নাসারি, জামাল   মংমন
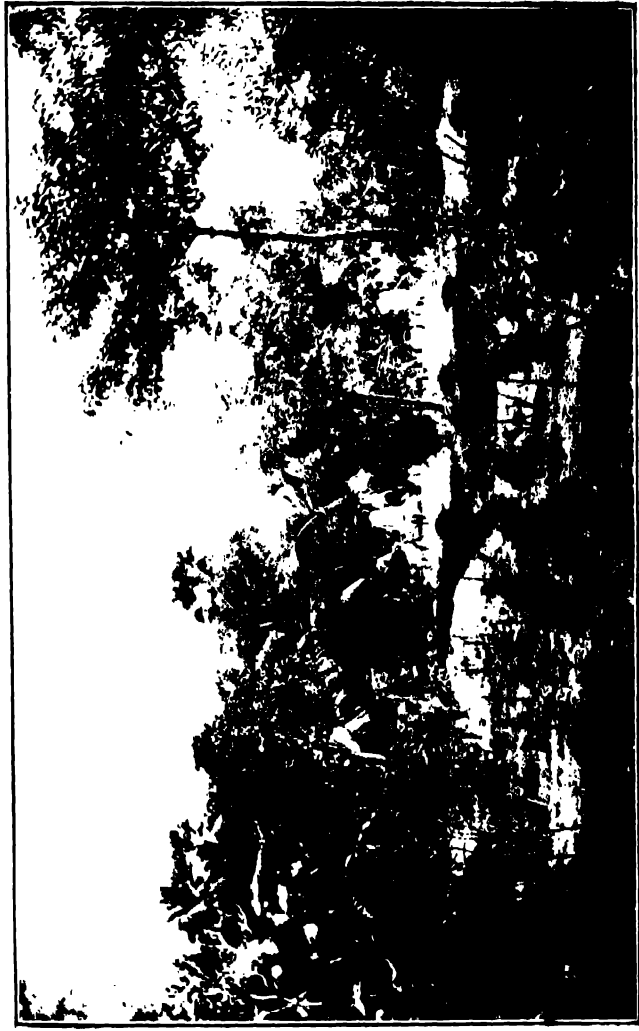
লাল মাকড়সা, কেউচা, পঙ্গপাল, মাছি, গোলাপের কেঠে পোকা, শুয়া পোকা, ফড়িঙ্গ ঘুগরা পোকা, গান্ধি পোকা, মশা, মেন্দা পোকা, তিকুট পোকা এবং সুতলী ও শোলা পোকা ইত্যাদি। এই সকল রিপুদমনের উপায়।

১০। উদ্ভিদের রোগ— যথা, ছাতারোগ, মূলের গুটা রোগ, ক্ষয়রোগ, মাজুরোগ, চিতি রোগ, ধুমাট রোগ, আঠা রোগ, রস রোগ, পাতাজড়া রোগ, পাঁচরা বা খোষা উঠা রোগ, মাংসপচা রোগ, দদ্রু রোগ, পরগাছা রোগ, মাংস বা কাষ্ঠবৃদ্ধি রোগ, মূলপচারোগ, পত্রের গুটী রোগ, পাতার কাল ছাতা রোগ ইত্যাদি এবং সকল প্রকার রোগ নিবারণের উপায়।

১১। যে সকল ঔষধ দ্বারা কীট-পতঙ্গাদি উদ্ভিদের নানা রোগ এবং জঙ্গলাদি বিনাশ করা যায় তাহার তালিকা ও প্রয়োগ করিবার যন্ত্রাদি, যথা—বিষ, নানাবিধ ইমালস্‌ন, সুতার পোকার প্রক্ষালণী, আর্শিনেট অব লাইম, আর্শিনেট অব লেড্, প্যারিস্ গ্রীণ, কষ্টিক সোডা, লণ্ডন পার্পল, কোর্য়াশিয়া, হেলেবোর পাউডার, কার্ব্বন বাই সালফাইড্, পাইরিথ্রাম, তামাকের গুড়া, রঞ্জন প্রক্ষালনী, ভেপোরাইট, কলি চুণ, তিমির তৈলের সাবান, বর্ডো-মিকশ্চার, এমোনিয়াক্যাল কপার, গন্ধক, সালফাইড্ অব পোটাসিয়াম, হিং, মিশ্রপ্রলেপ, পোটাস্, পার্ম্মাঙ্গেনেট্, ক্রয়োসিভ সাব লাইমেট্, নিকোটাইন, সাবান, মাগুও ওয়াশ্, বোল্‌তা নাশক ক্যাফার ডাইন পাউডার, কিউকেসা পাউডার, সালফেট্ অব এমোনিয়া, একস্ এল অল (কীটনাশক), ভেপোরাইট্ মিশ্র, এবল্ (কীটনাশক), ইউকেলিপ্টাস্ তৈল, ফিরতৈল, ভার্ম্মোরাইট, কোমল সাবান, নিকোটাইন্ গ্রীচ্, নাইট্রেট অব সোডা, সালফেট্ অব কপার, কেরোসিন তৈল,, লবণ, হিং, সেকোবিষ, উইড্ কিলার লন্‌সেণ্ড এবং উইড্ ইরেডিকেটার ইত্যাদি রোগবিশেষে প্রয়োগ-ব্যবস্থা এবং প্রয়োগ যন্ত্রাদি (সচিত্র)।

১২। বৃক্ষের ফল পাকিবার সময় নির্ব্বাচন করার উপায়, ফল সংগ্রহ, মজুত ও রপ্তানী করিবার প্রণালী, ফলের ব্যবসায়, এবং ফল ও ফলের বীজ দীর্ঘকাল রক্ষা করার উপায়।

১৩। উদ্যানের কার্য্যে কৃষাণ খাটাইবার নিয়ম, উদ্যানসংক্রান্ত দ্রব্যাদি, যন্ত্রাদি ও গাছের মজুত বহি ইত্যাদি।

১৪। উদ্যান কার্য্যে আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি—১১৫ প্রকার যন্ত্র।

১৫। গাছের রেজেষ্টরী বহি ও লেবেল বা টিকেট, প্রস্তরের, তামার, পিতলের, লৌহের, টীনের, দস্তার, কাষ্ঠের ও ইটের টিকেট, অক্ষয় ষ্ট্রেট্‌ফোর্ড টিকেট, আই-ডোয়াইন টিকেট, পর্শিলেইনের টিকেট এবং কাগজ ও বাঁশের টিকেট ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার টিকেটের বিস্তৃত বিবরণ।

১৬। হার্ব্বেরিয়ামের আবশ্যকতা এবং উহা প্রস্তুত প্রণালী।

১৭। কার্য্যালয়, গুদামঘর, নানা জাতীয় মৃত্তিকা প্রস্তুত রাখিবার আবশ্যকতা, এষ্টাব্লিশ-মেণ্ট, গাছ ও বীজ ব্যবসায়ীর কর্ত্তব্য, আমদানীকৃত গাছ, গাছ ও বীজ প্যাকিং ও রপ্তানী করিবার প্রণালী।

দ্বিতীয় খণ্ড

১। গাছের চাষ সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম, যথা—ভূমি প্রস্তুত ও গর্ত্ত-করণ-প্রণালী, গাছ রোপন করিবার সময়, সাধারণ গাছ ও বৃহৎ বৃক্ষাদি উঠাইবার প্রণালী, রোপণ-প্রণালী, ছায়া ও টোপার আবশ্যকতা, বৃহৎ ও মধ্যমাকার ফল, ফুল ও উদ্যানশোভাকর বৃক্ষাদি রোপণের নিয়ম, গুল্মজাতীয় উদ্যানশোভাকর গাছ রোপণের নিয়ম, ফল ও পুষ্পধারী লতাদি রোপণের নিয়ম, জলজ-উদ্ভিদ রোপণের নিয়ম, কাটাবাহার জাতীয়গাছ রোপণের নিয়ম, ফার্ণ ও উদ্যান-শোভাকর ঘাসজাতীয় গাছ রোপণের নিয়ম, অর্কিড্ রোপণের নিয়ম, পাম আর্থাৎ তাল জাতীয় গাছ রোপণের নিয়ম, ঋতুপুষ্প ও শাকসব্জী এবং ঔষধের গাছ রোপণের নিয়ম।

২। ন্যূনাধিক পাঁচশত উদ্যানশোভাকর ও পুষ্পধারী বৃহৎ ও তিনশত মধ্যমাকার বৃক্ষের এবং পুষ্পধারী, উদ্যান শোভাকর, রঞ্জিতপত্র ও আয়কর প্রায় বারশত গুল্ম ও রসালকাণ্ডক উদ্ভিদের বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন চারি পাঁচ শত মূলজ-উদ্ভিদ, দুই তিন শত লতার ও শতাধিক প্রকার জলজ-উদ্ভিদের বিবরণ ও চাষ-প্রণালী এই ভাগে প্রদত্ত হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ড

এই খণ্ডে ন্যূনাধিক তিন শত ফার্ণ অর্থাৎ পালই, শতাধিক ঝাউ জাতীয় গাছ, চারি পাঁচ শত অর্কিড বা পরাঙ্গ পুষ্ট-উদ্ভিদ এবং তিন চারি শত পাম বা তালজাতীয় উদ্ভিদের বিবরণ ও চাষ-প্রণালী বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ড

এই খণ্ডে ন্যূনাধিক তিন চারি শত প্রকার গোলাপ ও দেড়শত জাতীয় চন্দ্রমল্লিকার বিবরণ ও চাষ-প্রাণালী লিখিত হইয়াছে।

পঞ্চম খণ্ড

এই খণ্ডে ন্যূনাধিক চারি পাঁচ শত মরসুমী বা ঋতুপুষ্পের বিবরণ ও চাষ-প্রণালী লিখিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ খণ্ড

এই খণ্ডে ন্যূনাধিক দুই শত দেশীয় ও ভিন্ন দেশীয় ফল ও মূলের গাছের বিবরণ ও চাষ-প্রণালী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

সপ্তম খণ্ড

এই খণ্ডে বর্ণোৎপাদক, আঁশ বা সূত্রপ্রদ, মধুপ্রদ, সুগন্ধপ্রদ, কাগজ প্রস্তুতোপযোগী, তৈলপ্রদ, সারপ্রদ, নির্য্যাস ও রবারপ্রদ, চর্ম্মপরিষ্কারক, তুলাপ্রদ ও খাদ্যপ্রদ প্রায় একহাজার উদ্ভিদের বিবরণ চাষ-প্রণালী লিখিত হইয়াছে।

অষ্টম খণ্ড

অষ্টম খণ্ডে ন্যূনাধিক এক হাজার রকম দেশীয় ও বিদেশীয় শাক সব্জীর বিবরণ ও চাষ-প্রণালী বিবৃত হইয়াছে।

নবম খণ্ড

নবম খণ্ডে প্রায় দুই শত দেশীয় ও বিদেশীয় ভেষজ অর্থাৎ ঔষধের গাছের বিবরণ ও চাষ-প্রণালী লিখিত হইয়াছে।

দশম খণ্ড

পরিশিষ্ট (১)

ইহাতে দ্বাদশমাসের ক্যালেণ্ডার বা উদ্যানিক কৃষকের কর্ত্তব্যকার্য্যের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট (২)

ইহাতে মধুপ্রদ গাছ, খাদ্যপুষ্পের গাছ, সুন্দর বীজ উৎপাদক গাছ, সুগন্ধপ্রদ গাছ, বর্ণোৎপাদক গাছ, সারপ্রদ গাছ, নির্য্যাস ও রবার প্রসূ গাছ, এড়ি ও রেসম কীটের আহার্য্য গাছ, চর্ম্মপরিষ্কারক গাছ সূত্র ও আঁশপ্রদ গাছ, কাগজ প্রস্তুতোপযোগী গাছ, এবং তৈলপ্রদ গাছের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পশুখাদ্য, উদ্যানজ উদ্ভিদের সাধারণ শত্রু, সংক্রামক ব্যাধি ও তাহা দমনের উপায়, মাছ ও মক্ষিকার চাষ, রেসমকীটের চাষ, গোপালন, গোসেবা ও গোদুগ্ধ উৎপাদন, পশ্বাদির পীড়া ও চিকিৎসাবিধান, ফলের মোরব্বা, চাট্‌নী ও আচার প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার সহজ উপায়, উদ্ভিদ-খাদ্য ও তাহার তালিকা, কুক্কুট, হংস, পারাবত, ছাগ ও মেষ প্রভৃতি পশুপালন ও তাহাদের উন্নতিবিধান, ডিম্ব ও মাংস বৃদ্ধির উপায় বিধান এবং পশ্বাদির খাদ্য ও পীড়া নিবারণের ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

চীনের সভ্যতাগঠনে ভারতবাসীর কৃতিত্ব।

[ভারতবর্ষ অনেক বিষয়ে সমগ্র এসিয়ার শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু। ব্যবসায়, শিল্প, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, বিদ্যাচর্চ্চা ইত্যাদি মানব-সভ্যতার সকল বিভাগেই ভারতবাসী এসিয়ার জাতিসমূহকে ঋণে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। এই সকল কথা নানা দিক হইতে প্রচারিত হইতেছে। আজকাল যাঁহারা প্রাচীন ও মধ্যযুগের এসিয়ার শিল্প-বাণিজ্য, রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন, শিক্ষাবিস্তার এবং ধর্ম্ম-প্রচার ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই সমগ্র প্রাচ্য জগতে ভারতবর্ষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত বাহির করিতেছেন। আমরা ইতিমধ্যে কয়েকবার এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি। কয়েক বৎসর হইল জাপানী পণ্ডিত অধ্যাপক বুনিয়ো নানজিয়ো ইংরাজী ভাষায় এক খানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের অধ্যাপক ও সাহিত্যসেবিগণ চীনদেশের সম্রাট ও সামন্তগণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে কিরূপে স্বদেশীয় বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সাহিত্যের প্রচার করিয়াছেন তাহার বিবরণ সেই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই নিবন্ধ সেই গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত, ইহাতে কয়েক জন ভারতীয় পণ্ডিতের জীবন-কথা ও সাহিত্যালোচনা কথঞ্চিৎ বিবৃত হইয়াছে।]

১। কাশ্যপ মাতঙ্গ

ইনি মধ্যভারতীয় শ্রমণ। জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ৬৫ অব্দে একজন চৈনিক দূত এদেশে আসিয়াছিলেন, তিনি ৬৭ অব্দে তাহার সহিত চীনে গমন করেন। সেই সময় দ্বিতীয় মিন্তি (Min-ti) চীন দেশের রাজা ছিলেন। কাশ্যপ মাতঙ্গ হীনযান সূত্রের ৪২ বিভাগের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

২। ধর্ম্মরক্ষ

ইনি মধ্যভারতীয় শ্রমণ। বিনয়পিটকে সুপণ্ডিত ছিলেন। চীনে যাইবার জন্য প্রস্তাব করিলে রাজা যাইতে দিতে অস্বীকার করায়, তিনি গোপনে পলায়ন করেন। কাশ্যপ মাতঙ্গের কিছু পরেই সেখানে পৌঁছিয়াছিলেন। মাতঙ্গের সহিত ৪২ বিভাগের সূত্রের অনুবাদ করিয়াছিলেন, এবং মাতঙ্গের মৃত্যুর পর—

(১) বুদ্ধচরিত সূত্র ৬৮ অব্দে,

(২) দশভূমি ক্লেশাচ্ছেদিকা সূত্র ৭০ অব্দে,

(৩) ধর্ম্ম সমুদ্রকোষ সূত্র,

(৪) জাতক অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং

(৫) ২৬০টি শিলালিপি সংগ্রহ করিয়া উহাদের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

৩। চু-ফো-সো (Ku-Fo-Soh)

ইনি ভারতীয় শ্রমণ। চীন দেশে থাকিয়া দুইটি সূত্রের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

৪। ধর্ম্মকাল

ইনি মধ্যভারতীয় শ্রমণ। ২২১ অব্দে চীনে পৌঁছিয়াছিলেন। চীন দেশের লোকদিগকে বিনয়পিটকে অজ্ঞ দেখিয়া, ২৫০ অব্দে মহাসংঘিকের প্রতিমোক্ষের অনুবাদ করিয়াছিলেন। বিনয়পিটকের এই প্রথম অনুবাদগ্রন্থ।

৫। সংঘ-বর্ম্ম

ইনি ভারতীয় শ্রমণ। ২৫২ অব্দে কয়েক খানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দুই খানি মাত্র পাওয়া যায়,—

(১) মহাযান সূত্রের উগ্র পরিপৃচ্ছ,

(২) অপরিমতায়ুস-সূত্র।

৬। বিঘ্ন

ইনি একজন ভারতীয় শ্রমণ, প্রথমে অগ্ন্যু-পাসক ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি ২২৪ অব্দে ধর্ম্মসূত্রের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

৭। চু-লু-ইয়েন (Ku-lüh-yen)

ইনি ভারতীয় শ্রমণ। ২৩০ অব্দে কতকগুলি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিন খানি মাত্র পাওয়া যায়।

হীনযান সূত্রের—

(১) সুমতি সূত্র

(২) মাতঙ্গী সূত্র

(৩) বুদ্ধবৈদ্য সূত্র ("ভারতীয় বিবিধগ্রন্থাবলীর" অন্তর্ভূত)।

৮। খান-সন-হুই (Khān-san-hwui)

ইনি ভারতীয় শ্রমণ। কাম্বোজের প্রধান রাজ-মন্ত্রীর পুত্র। ২৪১ অব্দে চীনে পৌছিয়াছিলেন। ২৫১ অব্দে গ্রন্থানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি দুই খানি মাত্র পাওয়া যায়,—মহাযান সূত্রের ষট্‌পারমিতা সংগ্রহ সূত্র, একটি পুরাতন সম্যুক্তাবদান সূত্র ("ভারতীয় বিবিধ গ্রন্থাবলীর" অন্তর্ভূত)

৯। চু-সু-লান্ (Ku-shu-lān)

ইনি কোন ভারতীয় উপাসকের বংশধর, চীনদেশে জন্মগ্রহণ করেন। দুই খানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

১০। গৌতম সংঘদেব

কাবুল দেশীয় শ্রমণ। ৩৯১-৩৯৮ পর্য্যন্ত পাঁচ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহার তিন খানি মাত্র যায়,—

(১) হীনযান সূত্রের—মধ্যমাগম,

(২) হীনযান অভিধর্ম্মের—ত্রিপর্ব্বক শাস্ত্র,

(৩) অভিধর্ম্ম হৃদয়—শাস্ত্র।

১১। বুদ্ধভদ্র

ভারতীয় শ্রমণ। বুদ্ধের পিতৃব্য অমৃতোদনের বংশধর। ৩৯৮-৪২১ অব্দ পর্য্যন্ত ১৫ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ানের সহিত অনেক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কয় খানি মাত্র দৃষ্ট হয়।

মাহাযান সূত্রের—

(১) বুদ্ধাবতংশক মহাবৈপুল্যসূত্র।

(২) অনন্তমুখ সাধক ধারণী।

(৩) বুদ্ধধ্যান-সমাধি সাগর সূত্র।

হীনযান বিনয়ের—

(৪) মহাসংঘ বিনয়।

(৫) মহাসংঘিকার প্রতিমোক্ষ।

(৬) মঞ্জুশ্রী প্রণিধান সূত্র

(৭) ধর্ম্মত্রাত ধ্যান সূত্র।

১২। ধর্ম্মপ্রিয়

ইনি ভারতীয় শ্রমণ। বিনয়পিটকে সুপণ্ডিত ছিলেন। একখানি মাত্র গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মহাযান সূত্রের—দশ সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা।

১৩। বিমলাক্ষ

কাবুল দেশীয় শ্রমণ। তিনি খরচরে (কুচি) বিনয়পিটকের পণ্ডিত ছিলেন। সেইখানে কুমারজীব তাহার শিষ্য ছিলেন। ৪০৬ অব্দে চীনে পৌঁছিয়াছিলেন, সেই খানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কুমারজীব তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। ৪০৯-৪১৫ পর্য্যন্ত দুই খানি গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন একখানি মাত্র দৃষ্ট হয়। হীনযান বিনয়ের সর্ব্বাস্তিবাদ বিনয় নিদান।

১৪। সংঘ্যভূতি

কাবুল দেশীয় শ্রমণ। তিনখানি গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। হীনযানের অভিধর্ম্ম পিটকের,—

(১) বিভাষা শাস্ত্র।

(২) আর্য্য বসুমিত্র বোধিসত্ত্ব সঙ্গীতি শাস্ত্র।

(৩) সংঘরক্ষ সঙ্কয় বুদ্ধচরিত সূত্র ("ভারতীয় বিবিধ গ্রন্থাবলীর" অন্তর্ভূত)

(৪) অভি ধর্ম্মজ্ঞান প্রস্থান শাস্ত্র।

১৫। কুমারজীব

ভারতীয় শ্রমণ। ইহার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই উত্তরাধিকারসূত্রে রাজমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ৪০১ অব্দে চীনে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময় সীন (Tshin) বংশের শাসন-কর্ত্তা যাওহীন (Yao-Hhin) তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। ৪০২-৪১২ অব্দ পর্য্যন্ত অনেক গ্রন্থের অনুবাদ করেন এবং কতকগুলি পুস্তক ও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার তিন হাজারেরও অধিক শিষ্য ছিল। তাঁহার

(১) বজ্রচ্ছেদিকা প্রজ্ঞাপারমিতা;

(২) পূর্ণ পরিপৃচ্ছা;

(৩) বোধিহৃদয় ব্যূহ সূত্র।

(৪) বিমল কীর্ত্তিনির্দ্দেশ;

(৫) মৈত্রের ব্যাকরণ;

(৬) বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুনের জীবনী;

(৭) বোধিসত্ত্ব অশ্বঘোষের জীবনী।

(৮) গয়াশীর্ষ;

(৯) সুরঙ্গ সমাধি;

(১০) দীপঙ্করাবদান-সূত্র প্রভৃতি প্রায় ৫০ খানি গ্রন্থ দৃষ্ট হয়।

১৬। পুণ্যতর

ইনি কাবুল দেশীয় শ্রমণ। ৩৯৯-৪১৫ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে চীনদেশে পৌঁছিয়াছিলেন। ৪০৪ অব্দে একখানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন,

হীনযান বিনয়ের সর্ব্বাস্তিবাদ বিনয়।

১৭। বুদ্ধযশস্

ইনি কাবুল দেশীয় শ্রমণ। ৪০৩-৪১৩ অব্দ পর্য্যন্ত ৪ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

(১) মহাযান সূত্রের—আকাশগর্ভ বোধিসত্ত্ব সূত্র।

(২) হীনযান সূত্রের—দীর্ঘাগম;

(৩) হীনযান বিনয়ের—ধর্ম্মগুপ্ত বিনয়।

(৪) ধর্ম্মগুপ্ত প্রতিমোক্ষ

১৮। ধর্ম্মযশস্

ইনি কাবুল দেশীয় শ্রমণ। ৪০৭—৪১৫ অব্দ পর্য্যন্ত ৩ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহার ২ খানি বর্ত্তমান আছে।

মহাযান সূত্রের—স্ত্রীবিবর্ত্ত ব্যাকরণ সূত্র।

হীনযান অভিধর্ম্মের—সারিপুত্রাভিধর্ম্মশাস্ত্র।

১৯। ধর্ম্মরক্ষ

ইনি মধ্যভারতীয় শ্রমণ। ৪১৪ অব্দে চীন দেশে পৌঁছিয়াছিলেন এবং ৪২১ অব্দ পর্য্যন্ত উত্তর লিয়ান্ বংশের দ্বিতীয় শাসনকর্ত্তার

অনুরোধে কয়েকখানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই কয়েকখানি গ্রন্থ দৃষ্ট হয়।

মহাযান সূত্রের—

(১) ত্রিসম্বর নির্দ্দেশ ;

(২) মহাবৈপুল্য মহাসন্নিপাত সূত্র ;

(৩) মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র ;

(৪) সুবর্ণপ্রভাস সূত্র ;

(৫) অশ্বঘোষ প্রণীত বুদ্ধচরিত সূত্র, প্রভৃতি প্রায় ১৪ খানি গ্রন্থ দৃষ্ট হয়।

২০। বুদ্ধজীব

কাবুলদেশীয় শ্রমণ। ৪২৩ অব্দে চীনে পৌছিয়াছিলেন। ইনি তিন খানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার দুই খানি মাত্র দৃষ্ট হয়।

হীনযান বিনয়ের—মহিষাশক বিনয়।

মহিষাশকের প্রতিমোক্ষ।

২১। ধর্ম্মমিত্র

ইনি কাবুল দেশীয় শ্রমণ। ৪২৪ অব্দে চীনে পৌছিয়াছিলেন এবং ৪৪১ অব্দ পর্য্যন্ত গ্রন্থানুবাদ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি

মহাযান সূত্রের—

(১) আকাশগর্ভ বোধিসত্ত্ব-ধারণী সূত্র

(২) আকাশগর্ভ বোধিসত্ত্ব ধ্যানসূত্র, প্রভৃতি ৬ খানি গ্রন্থ আছে।

২২। গুণবর্ম্মা

ইনি কাবুল দেশীয় শ্রমণ, কাবুলের রাজার কনিষ্ঠপুত্র। ৪৩১ অব্দে চীনে পৌছিয়াছিলেন। ১০ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৫ খানি মাত্র দেখা যায়।

হীনযান বিনয়ের

(১) উপালি পরিপৃচ্ছা সূত্র ;

(২) উপাসক পঞ্চশিলরূপ সূত্র ;

(৩) ধর্ম্মগুপ্ত ভিক্ষুণী কর্ম্মণ ;

(৪) শ্রামণের কর্ম্মবাচ ;

(৫) নাগার্জ্জুন বোধিসত্ত্ব-সুহৃল্লেখ

২৩। সংঘবর্ম্মণ

ইনি ভারতীয় শ্রমণ। ৪০৩ অব্দে চীনে পৌছিয়াছিলেন। ৫ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৪ খানি মাত্র পাওয়া যায়।

হীনযান বিনয়ের—

(১) সর্ব্বাস্তিবাদ-নিকায়-বিনয় মাতৃকা।

হীনযান অভিধর্ম্মের—

(২) সম্যুক্তাভিধর্ম্ম হৃদয়াশাস্ত্র।

(৩) মহাশূর-বোধিসত্ত্ব-নির্দ্দেশ-কর্ম্মফল সংক্ষিপ্তসূত্র ("ভারতীয় বিবিধ প্রণালীর" অন্তর্ভুত)।

(৪) নাগার্জ্জুন বোধিসত্ত্ব সুহৃল্লেখ।

২৪। গুণভদ্র

ইনি মধ্যভারতীয় শ্রমণ। ব্রাহ্মণ জাতীয় ছিলেন। মহাযানের উপদেশাবলীর সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার নামও মহাযান ছিল। ৪৩৫ অব্দে চীনে পৌছিয়াছিলেন এবং ৪৪৬ অব্দ পর্য্যন্ত গ্রন্থানুবাদ-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

মহাযান সূত্রের—

(১) শ্রীমালাদেবী সিংহনাদ

(২) সন্ধিনির্ম্মোচন সূত্র ;

(৩) লঙ্কাবতার সূত্র ;

(৪) চন্দ্রপ্রভা কুমার সূত্র ;

(৫) জ্যোতিষ্ক সূত্র;
(৬) বিমনস্ সূত্র;
(৭) সুক সূত্র
প্রভৃতি ২৮ খানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন, তন্মধ্যে ২৭ খানি মাত্র দৃষ্ট হয়!

২৫। চু-ফা-চিন্ (Ku-Fa-kein)

ইনি ভারতীয় শ্রমণ। ৪৬৫-৪৭১ অব্দ পর্য্যন্ত ৬ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন, কিন্তু ইহাদিগের একখানিও দেখা যায় না।

২৬। সংঘবর্ম্মণ

সিংহল দেশীয় শ্রমণ। মহীশাস বিনয়ের সারাংশের অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই গ্রন্থখানি পাওয়া যায় না।

২৭। ধর্ম্মজাতযশস্

ইনি মধ্যভারতীয় শ্রমণ। ৪৮১ অব্দে এক খানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন।

মহাযান সূত্রের—অমিতার্থ সূত্র।

২৮। গুণবৃদ্ধি

মধ্যভারতীয় শ্রমণ। ৪৯২-৯৫ অব্দ পর্য্যন্ত ৩ খানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন, তন্মধ্যে ২ খানি মাত্র দৃষ্ট হয়।

হীনযান সূত্রের—
(১) সুদত্ত সূত্র;
(২) শতোপমা সূত্র ("ভারতীয় বিবিধ গ্রন্থাবলীর" অন্তর্ভূত)।

২৯। উপশূন্য

ইনি মধ্যভারতের উদ্যানের রাজপুত্র। ৫৩৮-৪১ অব্দ পর্য্যন্ত প্রথমে ৩ খানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ৫৪৫ অব্দে অন্য একখানি গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। ৫৬৫ অব্দে আরও একখানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন, ইহার মূল সংস্কৃত পুস্তকখানি কুষ্টানের (খোটেনের) একজন শ্রমণের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার ৪ খানি মাত্র গ্রন্থ দৃষ্ট হয়।

মহাযানের—
(১) বিমল কীর্ত্তি নির্দ্দেশ
(২) মহাকাশ্যপ সংগীতি
(৩) সঙ্গীতি সূত্র ধর্ম্মপর্য্যায়
(৪) সুচিক্রান্ত বিক্রমি—পরিপৃচ্ছ।

৩০। পরমার্থ

পশ্চিম ভারতের উজ্জয়িনীর শ্রমণ। ইহার অন্য নাম গুণরত। ৫৪৮ অব্দে চীনে পৌছিয়াছিলেন এবং ৫৫৭ অব্দ পর্য্যন্ত ১০ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন, ৫৫৭-৫৬৯ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ৪০ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন তন্মধ্যে

মহাযানের—
(১) শ্রদ্ধোৎপাদ শাস্ত্র।
(২) সন্ধিনির্মোচন সূত্র।
(৩) বিদ্যাদর্শন শাস্ত্র
(৪) বিদ্যাপ্রবর্ত্তন শাস্ত্র,
(৫) বুদ্ধগোত্র শাস্ত্র;
(৬) অভিধর্ম্ম কোষ শাস্ত্র;
(৭) লক্ষণানুসার শাস্ত্র
প্রভৃতি ২৯ গ্রন্থ দৃষ্ট হয়।

৩১। ধর্ম্মরুচি

ইনি দক্ষিণভারতীয় শ্রমণ। ৫০১,৫০৪ ও ৫০৭ অব্দে ৩ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ২ খানি পাওয়া যায়।

মহাযান সূত্রের—

(১) শ্রদ্ধাবলধানাবতার মুদ্রা সূত্র ;

(২) সর্ব্ববুদ্ধবিষয়াবতার।

৩২। রত্নমতি

মধ্যভারতীয় শ্রমণ। ৫০৮ অব্দে ত্রয়োধিক গ্রন্থের অনুবাদ করেন। কিন্তু ২ খানি দেখা যায়।

মহাযান অভিধর্ম্মের—

(১) সদধর্ম্ম পুণ্ডরীক সূত্র শাস্ত্র।

(২) মহাযানোত্তর তন্ত্র শাস্ত্র।

৩৩। বোধিরুচি

ইনি উত্তরভারতীয় শ্রমণ। ৫০৮ অব্দে চীন দেশে পৌঁছিয়াছিলেন এবং ৫৩৫ অব্দ পর্য্যন্ত ৩০ খানিরও অধিক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে

(১) মৈত্রেয় পরিপৃচ্ছা ধর্ম্মাষ্টক ;

(২) লঙ্কাবতার সূত্র

(৩) মঞ্জুশ্রী পরিচরণ সূত্র ;

(৪) ধর্ম্মপর্য্যায় সূত্র

(৫) বিদ্যামাত্র সিদ্ধিশাস্ত্র;

(৬) বিশেষ চিন্তাব্রহ্ম-পরিপৃচ্ছ

প্রভৃতি ২৯ খানি গ্রন্থ দৃষ্ট হয়।

৩৪। বুদ্ধশান্ত

ইনি মধ্যভারতীয় শ্রমণ। ৫২৪-৫৩৯ অব্দ পর্য্যন্ত ১০ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মহাযান সূত্রের—

(১) দশধর্ম্মক ;

(২) সিংহনাদিকা সূত্র ;

(৩) অনন্তমুখ সাধক ধারণী ;

(৪) ব্রজমন্ত্রধারণী

প্রভৃতি ৯ খানি গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে।

৩৫। গৌতমপ্রজ্ঞারুচি

ইনি মধ্যভারতের বারাণসীর একজন ব্রাহ্মণ। ৫৩৮-৪৩ অব্দ পর্য্যন্ত ১৮ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি

(১) ব্যাস পরিপৃচ্ছা ;

(২) পরমার্থ ধর্ম্মবিজয় সূত্র

(৩) ঈশ্বর রাজপরিপৃচ্ছা ;

(৪) মহাযান সূত্রের—বিমলদত্তাপরিপৃচ্ছা।

(৫) অষ্টবুদ্ধকসূত্র ;

(৬) মধ্যান্তানুগম শাস্ত্র

প্রভৃতি ১৫ খানি গ্রন্থ দৃষ্ট হয়।

৩৬। বিমোক্ষপ্রজ্ঞাঋষি (বিমোক্ষ সেন)

ইনি উত্তরভারতের উদ্যানের একজন শ্রমণ। কপিলবাস্তর শাক্যবংশের বংশধর। ৫৪১ অব্দে ৫ খানি গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মহাযান অভিধর্ম্মের—

(১) ত্রিপূর্ণ সূত্রোপদেশ ;

(২) ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন—সূত্রোপদেশ ;

(৩) কর্ম্মসিদ্ধপ্রকরণ শাস্ত্র ;

(৪) রত্নচূড় সূত্র চতুর ধর্ম্মোপদেশ ;

(৫) বিবাদশমন শাস্ত্র ;

৩৭। ধর্ম্মবোধি

ভারতীয় শ্রমণ। একখানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মহাযান অভিধর্ম্মের—মহানির্ব্বাণসূত্র শাস্ত্র

৩৮। নরেন্দ্রযশস্

উত্তর ভারতের উদ্যানের শ্রমণ। ৫৫৭-৬৮ অব্দ পর্য্যন্ত ৭ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন।

মহাযান সূত্রের—

(১) পিতাপুত্র-সমাগম ;

(২) চন্দ্রগর্ভবৈপুল্য ;

(৩) সুমেরুগর্ভ ;

(৪) চন্দ্রদীপ-সমধিসূত্র ;

(৫) মহাকরুণা পুণ্ডরীক সূত্র ;

(৬) প্রদীপদানীয় সূত্র ;

হীনযান অভিধর্ম্মের—

(৭) অভিধর্ম্ম হৃদয়-শাস্ত্র।

৩৯। জ্ঞানযশস্

ইনি মধ্যভারতের মগধে একজন শ্রমণ ৫৬৪ ৭২ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার শিষ্যদ্বয় যশোগুপ্ত ও জ্ঞানগুপ্তের সহিত ৬ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ২ খানি মাত্র দৃষ্ট হয়

মহাযানের—(১) মহামেঘ সূত্র,

(২) মহাযানাভিসময় সূত্র

৪০। জ্ঞানগুপ্ত

উত্তরভারতের গান্ধারের শ্রমণ। ৫৬১-৭৮ অব্দ পর্য্যন্ত ৪ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ২ খানি বর্ত্তমান আছে।

(১) নানাসম্যক্তমন্ত্র সূত্র

মহাযানের—

(২) সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকের অবলোকিতেশ্বর—সমন্তমুখ পরিবর্ত্তের গাথা।

৪১। গৌতম ধর্ম্মজ্ঞান

বারাণসীর একজন উপাসক ছিলেন, ইনি প্রজ্ঞারুচির জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রথমে কোন কোন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পরে ৫৮৯ অব্দে একখানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন।

হীনযানের—

বিভিন্ন কর্ম্মের ফলাফল সম্বন্ধে সূত্র।

৪২। বিনীতরুচি

ইনি উত্তরভারতের উদ্যানের শ্রমণ, ৫৮২ অব্দে ২ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন।

মহাযান সূত্রের—গয়াশীর্ষ সূত্র।

মহাযান বৈপুল্যধারণী সূত্র।

৪৩। ধর্ম্মগুপ্ত

ইনি দক্ষিণভারতীয় শ্রমণ। ৫৯০-৬১৬ অব্দ পর্য্যন্ত কতকগুলি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সম্প্রতি

(১) নিদান শাস্ত্র ;

(২) নিদান সূত্র ;

(৩) ভৈষজ্যগুরু—পূর্ব্ব প্রণিধান ;

(৪) বোধি-প্রাপ্তি সম্বন্ধে সূত্র

প্রভৃতি ১০ খানি গ্রন্থ দৃষ্ট হয়।

৪৪। প্রভাকর মিত্র

মধ্যভারতীয় শ্রমণ। ক্ষত্রিয় জাতি। ৬২৭ অব্দে চীনে পৌছিয়াছিলেন এবং তিন খানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মহাযান সূত্রের—

(১) রত্নতারাধারণ সূত্র ;

(২) মহাযান অভিধর্ম্মের প্রজ্ঞাপ্রদীপ শাস্ত্র টীকা

(৩) সূত্রালঙ্কার টীকা।

৪৫। ভগবদ্ধর্ম্ম

পশ্চিমভারতীয় শ্রমণ। এক খানি গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন—

মহাযান সূত্রের—সহস্রবাহু-সহস্রাক্ষ-অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বমহাপূর্ণপ্রতিহতা—মহাকারুণিক হৃদয়ধারণী।

৪৬। পুণ্যোপায়

ইনি মধ্যভারতীয় শ্রমণ। হীনযান ও মহাযান বিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রকারের ১৫০০ শতের অধিক ত্রিপিটক সাহিত্য সঙ্গে লইয়া, ৬৫৫ অব্দে চীনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ ভারত ও সিংহল পর্য্যটনের ফল। ৬৫৬ অব্দে চীন-সম্রাট চীনসাগরস্থ কোনডোর দ্বীপে বিভিন্ন প্রকারের ঔষধি আবিষ্কারের জন্য তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৬৬৩ অব্দে চীনে প্রত্যাগমন করিয়া ৩ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন, উহার দুই খানি পাওয়া যায়।

মহাযান সূত্রের—

(১) সিংহব্যূহরাজ বোধিসত্ত্ব পরিপৃচ্ছা;
(২) বিমলজ্ঞান বোধিসত্ত্ব পরিপৃচ্ছা।

৪৭। দিবাকর

মধ্যভারতীয় শ্রমণ। ৬৭৬-৮৮ পর্য্যন্ত অব্দ ১৮ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মহাযানের—

(১) ভদ্রপাল শ্রেষ্ঠি পরিপৃচ্ছা
(২) সিংহনাদিক সূত্র;
(৩) চণ্ডীদেবী ধারণী;
(৪) বিজয় ধারণী;
(৫) ঘনব্যূহ সূত্র;
(৬) মঞ্জুশ্রী পরিপৃচ্ছা;
(৭) ত্রিমন্ত্রসূত্র

প্রভৃতি ১৮ খানি গ্রন্থই দৃষ্ট হয়।

৪৮। বুদ্ধত্রাত

কাবুল দেশীয় শ্রমণ। এক খানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন—

মহাযান সূত্রের—মহাবৈপুল্য পূর্ণবুদ্ধসূত্র প্রসন্নার্থ সূত্র।

৪৯। বুদ্ধপাল

ইনি কাবুল দেশীয় শ্রমণ। ৬৭৬ অব্দে চীনে পৌছিয়াছিলেন। তিনি একখানি মাত্র গ্রন্থের অনুবাদ করেন।

মহাযান সূত্রের—সর্ব্বদুর্গতি পরিশোধন উষ্ণীষ বিজয় ধারণী।

৫০। দেবপ্রজ্ঞা

কুষ্টনের (খোটেন) একজন শ্রমণ, তিনি ৬৮৯-৯১ অব্দ পর্য্যন্ত ৬ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন।

(১) জ্ঞানালোকাধারণী সর্ব্বদুর্গতি-পরিশোধনী;
(২) সর্ব্ববুদ্ধাঙ্গবতী ধারণী
(৩) তথাগত প্রতিবিম্ব প্রতিষ্ঠানুশংসা,

প্রভৃতি ৬ খানি গ্রন্থই পাওয়া যায়।

৫১। সিহ্-হুই-চ (Shih Hwui-k)

ইনি ভারতীয় শ্রমণের পুত্র। জাতিতে ব্রাহ্মণ। চীনেই ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতা চীনে রাজদূতরূপে অবস্থান করিতেন। ৬৯২ অব্দে তিনি একখানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মহাযান সূত্রের—অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব স্তোত্র।

৫২। শিক্ষানন্দ

কুষ্টনের (খোটেন) একজন শ্রমণ। ৬৯৫-৭০০ অব্দ পর্য্যন্ত ১৯ খানি গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং পরে আরও কয়েকখানি গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে

মহাযান সূত্রের—

(১) মঞ্জুশ্রী বুদ্ধক্ষেত্র গুণব্যূহ;
(২) লঙ্কাবতার সূত্র;

(৩) পদ্মচিন্তামণি ধারণী সূত্র ;

(৪) সুবাহু মুদ্রাধ্বজ ধারণী ;

(৫) বুদ্ধাবতংশক মহাবৈপুল্য সূত্র;

প্রভৃতি ১৬ খানিগ্রন্থ দৃষ্ট হয়।

৫৩। লি ইউ থাও (Li-wu-Thâo)

উত্তর ভারতের একজন ব্রাহ্মণ। তিনি ৭০০ অব্দে একখানি গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন,—

মহাযান সূত্রের অমোঘ পাশধারণী।

৫৪। রত্নচিন্ত

ইনি উত্তরভারতের কাশ্মীরের একজন শ্রমণ। ৬৯৩-৭০৬ অব্দ মধ্যে

(১) অমোঘপাশ হৃদয় মন্ত্ররাজ সূত্র ;

(২) একাক্ষর ধারণী ;

(৩) পদ্মচিন্তামণি ধারণী সূত্র।

(৪) একাক্ষর হৃদয়মন্ত্র ;

প্রভৃতি ৭ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

৫৫। বোধিরুচি

ইনি দক্ষিণভারতীয় শ্রমণ। ব্রাহ্মণ-জাতীয়। ৬৯৩-৭১৩ অব্দ পর্য্যন্ত ৫৩ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি

(১) রত্নমেঘসূত্র ;

(২) ব্যাসপারিপৃচ্ছা ;

(৩) গর্ভসূত্র ;

(৪) বর্ম্মব্যূহ নির্দ্দেশ ;

(৫) অমিতায়ুস ব্যূহ ;

প্রভৃতি ৪১ খানা গ্রন্থ দৃষ্ট হয়।

৫৬। প্রমিতি

মধ্যভারতীয় শ্রমণ। একখানি গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মহাযান সূত্রের—মহাবুদ্ধোষ্ণীশ-তথাগত-গুহ্যহেতু সাক্ষাৎকৃতপ্রসন্নার্থ সর্ব্ববোধিসত্ত্ব-চার্য্য-সুরঙ্গম-সূত্র।

৫৭। সি-চে-ইয়েন (Shih-k'-yen)

কুষ্টানের (খোটেন) রাজপুত্র। ৭০৭ অব্দে তিনি চীনে রাজদূতরূপে প্রেরিত হন এবং সেই খানেই তিনি শ্রমণ হন। তিনি ৪ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

৫৮। বজ্রবোধি

দক্ষিণভারতের মালয় প্রদেশের একজন শ্রমণ। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ৮১৯ অব্দে চীনে পৌছিয়াছিলেন এবং ৭২৩ ও ৭৩০ অব্দে প্রতিবৎসর ২ খানি করিয়া গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

মহাযান সূত্রের—

(১) চণ্ডী দেবীধারণী ;

(২) পঞ্চক্ষর হৃদয়ধারণী ;

(৩) অচলদূতধারণী গুহ্যকল্প

প্রভৃতি ১১ খানি গ্রন্থ তৎকর্ত্তৃক রচিত বলিয়া জানা যায়।

৫৯। শুভকর সিংহ

মধ্যভারতীয় শ্রমণ। শাক্যমুনির পিতৃব্য অমৃতোদনের বংশের। তিনি নালন্দার মঠে অবস্থান করিতেন। ৭১৬ অব্দে অনেকগুলি সংস্কৃত পুস্তক সঙ্গে লইয়া চীনে পৌছিয়াছিলেন। ৭২৪-৭৩০ অব্দ পর্য্যন্ত ৪ খানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

(১) মহাবৈরোচনাভিসম-বোধি ;

(২) সুবাহুকুমার-সূত্র ;

(৩) সুসিদ্ধিকার-মহাতন্ত্র।

(৪) সুসিদ্ধিকার অর্চ্চনার নিয়ম ("ভারতীয় বিবিধ গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভূত")।

৬০। অমোঘবজ্র

উত্তরভারতীয় শ্রমণ, ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। ৭১৯ অব্দে চীনে পৌঁছিয়াছিলেন। ৭৪১ অব্দে তিনি ভারতবর্ষ ও সিংহল হইতে সাহিত্য-সংগ্রহের জন্য আগমন করেন এবং পুনরায় ৭৪৬ অব্দে পাঁচ শতের অধিক সাহিত্য লইয়া সেখানে পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি সেখানে বহুপ্রকার রাজ-সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন। অনেক গ্রন্থের অনুবাদ করেন।

(১) চণ্ডীদেবী-ধারণী;
(২) বোধিমণ্ডব্যূহ ধারণী
(৩) প্রজ্ঞাপারমিতা অর্দ্ধশতিকা;
(৪) বজ্রকুমার-তন্ত্র
(৫) অষ্টমণ্ডলক-সূত্র;
(৬) মহাশ্রী-সূত্র;
(৭) মরীচি-ধারণী;
(৮) বজ্রশেখর যোগ, বজ্রসত্ত্ব কল্প,

প্রভৃতি ১০৮ খানি গ্রন্থ আজও বর্ত্তমান আছে।

৬১। উ-নাঁই-সাঁই

ইনি উত্তরভারতীয় শ্রমণ। ইঁহার রচিত একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

৬২। ধর্ম্মদেব

মধ্যভারতের মগধের নালন্দামঠের একজন শ্রমণ। ৯৭৩-১০০১ অব্দ পর্য্যন্ত বহুগ্রন্থ অনুবাদ করেন। ৯৮২ অব্দে সম্রাট্ কর্ত্তৃক উপাধি পাইয়া সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন।

(১) বসুধরা-ধারণী;
(২) উদয়ান বৎসরাজ পরিপৃচ্ছা;
(৩) মহাদণ্ডধারণী;
(৪) দান সূত্র
(৫) মহাযান অভিধর্ম্মের—বজ্র [illegible]কি;
(৬) শোকবিনাশ-সূত্র;
(৭) অভয়-ধারণী;
(৮) রাষ্ট্রপাল সূত্র;
(৯) ধর্ম্মশরীর সূত্র;
(১০) সুবর্ণ-ধারণী;
(১১) মহাপ্রিয়া-ধারণী;

প্রভৃতি ১১৮ খানি গ্রন্থ দৃষ্ট হয়।

৬৩। থেন্-ছি-সাই

উত্তরভারতের জলন্ধরের অথবা কাশ্মীরের একজন শ্রমণ। ৯৮০ অব্দে চীনে পৌঁছিয়াছিলেন। ২০ বৎসর কাল অনুবাদ-কার্য্যে রত ছিলেন।

(১) ধম্মপদ;
(২) আর্য্যসঙ্গীতি গাথাশতক
(৩) দশনাম-সূত্র;
(৪) অল্পক্ষর প্রজ্ঞাপারমিতা;
(৫) উপমিতায়ুস্-সূত্র

মহাযান সূত্রের—

(৬) ঘনব্যূহসূত্র

প্রভৃতি ১৮ খানি গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে।

৬৪। দানপাল

উত্তরভারতের উদ্যানের একজন শ্রমণ, ৯৮০ অব্দে চীনে পৌঁছিয়াছিলেন এবং কতক বৎসর অনুবাদ-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

(১) কাশ্যপ পরিভর্ত্ত;
(২) চিন্তামণি-ধারণী সূত্র;
(৩) মেখলা-ধারণী;
(৪) বুদ্ধ-শ্রীগুণ-স্তোত্র;
(৫) মহাযান ভবভেদ শাস্ত্র;
(৬) আর্য্যতারা বোধিসত্ত্ব স্তোত্র;

প্রভৃতি ১১১ খানি গ্রন্থ আজ পর্য্যন্তও বর্ত্তমান আছে।

৬৫। ধর্ম্মরক্ষ

মধ্যভারতের অন্তর্গত মগধের একজন শ্রমণ। ১০০৪ অব্দে চীনে গমন করেন এবং ১০৫৮ পর্য্যন্ত অনুবাদ কার্য্যে রত ছিলেন। সম্প্রতি

মহাযান সূত্রের—

(১) রত্নমেঘ সূত্র;

(২) বোধি সত্ত্ব-পিটক;

হীনযান অভিধর্ম্মের—

(৩) প্রজ্ঞাপ্তিপাদ শাস্ত্র;

(৪) মহাযান রত্নমহার্থ শাস্ত্র;

(৫) তথাগতচিন্ত্যগুহ-নির্দ্দেশ

প্রভৃতি তদনুবাদিত ১২ খানি গ্রন্থ দৃষ্ট হয়।

৬৬। মৈত্রেয়ভদ্র

মধ্যভারতের অন্তস্থিত মগধের একজন শ্রমণ। তিনি চীনে রাজগুরু ছিলেন। তৎ-রচিত ৫ খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

৬৭। সূর্য্যযশস্

ভারতীয় শ্রমণ। তাঁহার অনুবাদিত ২ খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী,
জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি, মালদহ।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুরবস্থা

অভাবমোচন ও বিলাস

মানুষ তাহার অভাব-মোচন-উদ্দেশ্যে রাত্রি-দিন পরিশ্রম করিতেছে। সংসারের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদির বিপুল আয়োজনের উদ্দেশ্য মানুষের নানাবিধ অভাব মোচন করা। সহরের কলকারখানা বা গ্রামের পারিবারিক শিল্পকর্ম্ম, মন্থরগতি গরুর গাড়ী অথবা বেগবান মেল-ট্রেণ, নৌকা বা সামুদ্রিক জাহাজ, মুদীর দোকান অথবা বড় বড় হৌস্ বা ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সবগুলিই মানুষের নানাবিধ অভাব-মোচনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। অভাব-মোচনের জন্য সমগ্র সমাজ শ্রমবিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া নিম্নলিখিত কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে—

ক		উদ্বৃত্ত ধনভোগ		গ	
কৃষি এবং খনিজ দ্রব্য। দ্রব্য প্রস্তুত করণের উপকরণ সামগ্রী উৎপাদন।	পরিশ্রম মূলধন	বিলাস-সামগ্রী	পরিশ্রম মূলধন	দ্রব্য বিক্রয় বাণিজ্য	পরিশ্রম মূলধন
		খ দ্রব্য প্রস্তুত করণ			
		ঘ ধনোৎপাদন ক্রিয়ার ক্ষতিপূরণ মূলধন			

প্রথমে কৃষিজাত দ্রব্য অথবা খনিজ পদার্থ হইতে দ্রব্য প্রস্তুতকরণের উপকরণ-সামগ্রী পাওয়া যায় (ক)। ঐ সমস্ত উপকরণ লইয়া কারখানা-ফ্যাক্টরীতে দ্রব্য প্রস্তুত হয় (খ)। পরে বাণিজ্যের দ্বারা যাহার অভাব তাহার নিকট নীত হইয়া অভাব মোচন করে (গ)। এই তিন প্রকার কার্য্যের জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিশ্রম এবং মূলধনের সংযোগ প্রয়োজনীয়। ধনোৎপাদনের জন্য অহোরাত্র যে বিপুল পরিশ্রম লাগিতেছে, উহার বিনিময়ে মানুষ প্রথমতঃ আপনার অভাব মোচন করিতে পারিতেছে। আত্যন্তিক অভাব মোচন করিয়া উদ্বৃত্ত ধন হয় বিলাস-ভোগ (ঘ) অথবা ভবিষ্যৎ লাভের আশায় ধনোৎপাদনের জন্য পুনরায় নিয়োজিত করিতেছে (ঙ)। শেষোক্ত অর্থপ্রয়োগই সমাজের অর্থবৃদ্ধির বিশেষ সহায় হয়। দুই একটি উদাহরণ দিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কোন কৃষক শস্য বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা পাইয়াছে। সে ঐ টাকায় যদি একখান লাঙ্গল অথবা জমির উপযুক্ত সার ক্রয় করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহার কৃষিকার্য্যে পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইবে। কিন্তু যদি সে তাহা না করিয়া মদ খাইয়া ঐ টাকা খরচ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ব পরিশ্রমের কোন চিহ্নই থাকিবে না। সাময়িক উত্তেজনায় ক্ষণিক আমোদের জন্য অর্থ ব্যয়িত হইল, অর্থব্যয়ের কোন স্থায়ী ফল লাভ হইল না। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। কোন জমিদার কি করিয়া তাহার অর্থব্যয় করিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না। বিদ্যালয়-স্থাপন, পুষ্করিণী-খনন, শিল্পব্যবসায়-প্রবর্ত্তন প্রভৃতির জন্য অর্থ ব্যয় করা তাহার ইচ্ছা, কিন্তু সম্প্রতি পারিষদ-বর্গের পরামর্শে তিনি নৃত্যগীতাদির জন্য অনেক অর্থব্যয় করিতেছেন। যেস্থলে অর্থব্যয়ের ফল অধিকালব্যাপী হয় না, তাহাকে আমরা প্রচলিত কথায় বিলাস-ব্যাপার বলিয়া থাকি। নৃত্যগীতাদিতে অর্থব্যয়ের ফল বেশীক্ষণ থাকে না; অপরদিকে সেই পরিমাণ অর্থে যদি একটি ব্যবসায় বা বিদ্যালয় চলিতে থাকে, এই প্রকার অর্থ ব্যবহারের সুফল আমরা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। ধনবিজ্ঞানের দিক হইতে শেষোক্ত প্রকার অর্থ-ব্যবহারকে মূলধননিয়োগ (ঙ) বলা হয়। ইহার দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি অথবা নৈতিক এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধন হইয়া থাকে। একদিক হইতে দেখিতে গেলে মানসিক অথবা নৈতিক উন্নতি সমাজের ধনবৃদ্ধির উপায় মাত্র।

যেখানে অর্থ-ব্যবহার বৈষয়িক উন্নতির কোন কাজেই আসে না, অর্থ আছে অতএব অর্থ ব্যয় করিতে হইবে, নিজের বা সমাজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য যখন উহা নিয়োজিত হয় না, কেবলমাত্র ক্ষণিক সুখের জন্য স্বার্থান্ধদিগের দ্বারা ব্যয়িত হয়, তখন উহাকে আমরা বিলাসিতা, সৌখীনতা, বাবুয়ানী বলিয়া থাকি।

এইস্থলে একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। সামাজিক রীতিনীতি এবং দেশের জল-বায়ু অনুসারে অনেক দ্রব্য বিভিন্ন দেশে নিত্য আবশ্যক অথবা বিলাস-সামগ্রী হইয়া থাকে। ইউরোপে জুতা এবং জামা পরিধান কোন শ্রেণীর পক্ষেই বিলাস নহে, আমাদিগের দেশে দরিদ্র কৃষকগণের পক্ষে উহা বিলাস হইবে। আমাদিগের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে ছাতা

ব্যবহার বিলাস নহে, কিন্তু ইউরোপে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে উহা বিলাস হইবে। চীন দেশে চা পান বিলাস নহে, আমাদিগের দেশে ইহা বিলাস (চ)। বাস্তবিক পক্ষে বিভিন্ন দেশের জল-বায়ু এবং সামাজিক অভ্যাস অনুসারে বিলাস সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। দেশের জল-বায়ু এবং সামাজিক অনুষ্ঠানকে কেহ অবজ্ঞা করিতে পারে না। কিন্তু যদি কেহ কতকগুলি কৃত্রিম অভাব মোচন করিবার জন্য শুধু ব্যস্ত হয়, অথচ ঐ সমস্ত অভাব মোচন না করিলেও বৈষয়িক জীবন-সংগ্রামে তাহার শক্তির হ্রাস হয় না, তাহা হইলে ধনবিজ্ঞান অনুসারে আমরা তাহাকে বিলাসী বলিব।

বিলাস-ভোগ সম্বন্ধে কয়েকটি মতামত

এক্ষণে বিলাস-ভোগ কোন ব্যক্তিবিশেষ এবং সমগ্র সমাজের পক্ষে কতদূর বাঞ্ছনীয় তাহা বিচার করিতে হইবে। বিলাসীরা বলিয়া থাকেন, আমরা যদি বিলাস ভোগ না করি, অধিক সংখ্যক লোক কোন কাজ না পাইয়া অনাহারে থাকিবে। অনেক লোক বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য পরিশ্রম করিতেছে, উহাদিগের কাজ যাইলে সমাজের ক্ষতি হইবে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে তাঁহাদিগের ভ্রম দূর হইবে। যে টাকা তাঁহারা বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদের ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য খরচ করিতেছেন, সেই টাকায় যদি তাহারা একটি হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে রোগীদিগের শুশ্রূষা এবং তাহাদিগের খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য প্রায় অতগুলি শ্রমজীবী কাজ পাইত। শ্রমজীবীদিগের পক্ষে ফল সমানই হইত। উপরন্তু সমাজে একটি চিরস্থায়ী অনুষ্ঠানের সূচনা হইত; যাহাদিগের জীবন দুর্ব্বহ এবং অন্ধকারময় তাহারা কিয়ৎপরিমাণে সুখী হইয়া সমাজের শক্তি ও আনন্দ বৃদ্ধি করিত। এমন কি যদি ধনীরা বিলাস-ভোগে অর্থ ব্যয় না করিয়া ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া দেন, তাহা হইলে ব্যাঙ্কের দ্বারা উহা ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিয়োজিত হইবে। অনেক

এইরূপে কাজ পাইবে এবং ধনীদিগের

বৃদ্ধি পাইবে। য্যাডাম স্মিথ বলিয়াছিলেন, কোন ধনী যদি কয়জন চাকর নিযুক্ত করেন তিনি গরীব হইতে থাকিবেন, কিন্তু যিনি শিল্পী নিযুক্ত করেন তিনি আরও ধনী হইবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ধনীর নিজের অর্থবৃদ্ধি অপেক্ষা সমাজের অর্থ এবং আনন্দ বৃদ্ধি অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করিতে হইবে। বিলাসীরা আরও বলিয়া থাকেন, সমাজের যদি বিলাস-ভোগের আকাজ্ক্ষা না থাকে, তাহা হইলে অভিনব অভাবমোচনোপযোগী অভিনব দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত হইবে না। ইহার ফলে সমাজের ধনোৎপাদন-শক্তি হ্রাস পাইবে, কর্ম্মশক্তি ক্রমাগত একই প্রকার অভাব-মোচন-উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইলে উহা বিকাশ লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ধনোৎপাদনের আর এক দিকও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ধনোৎপাদন সময়-সাপেক্ষ। সমাজ যদি নিত্য নূতন জিনিষ চাহে, তাহা হইলে অনেক জিনিষ, যে গুলি কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে, সে গুলি বাজারে আসিবার পূর্ব্বেই পুরাতন হইয়া

যাইবে। ঐগুলি যদি বিক্রয় না হয় তাহা হইলে সমাজের কত পরিমাণ শক্তি যে ব্যর্থ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

নীতির দিক হইতে দেখিতে গেলে বিলাস-ভোগ সর্ব্বথা নিন্দনীয়।

রাস্কিন এক স্থলে লিখিয়াছিলেন—যতদিন পর্য্যন্ত সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই উপযুক্ত আহার এবং বাসস্থান লাভ না করিতে পারে, ততদিন সে সমাজে বিলাস-ভোগ অতি নিষ্ঠুর কার্য্য এবং সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। রাস্কিনের এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে ইউরোপ-আমেরিকায় অর্থের যেরূপ অপব্যবহার হয় তাহা ধারণা করিলে বিপুল অর্থশালী পাশ্চাত্য সমাজের পক্ষেও এ কথার সার্থকতা উপলব্ধি হয়। আমেরিকার এক একজন কোটিপতি বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত ভোজনে বসিয়া এক রাত্রে কোটি টাকাও খরচ করিয়া থাকেন! সেখানকার ধনীরা কে সর্ব্বাপেক্ষা উদ্ভট উপায়ে অর্থ ব্যয় করিতে পারে এই চিন্তাতেই ব্যস্ত! পাশ্চাত্য জগতে যেরূপ বিপুল অর্থোপার্জ্জন, সেরূপ অর্থের অপব্যবহারও সমান ভাবে দেখা দিয়াছে। অথচ অসংখ্য শ্রমজীবী আহার্য্য এবং পরিচ্ছদের ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারে না।

আমাদের বিলাসভোগ

আমাদের দেশে আজকাল বিলাস-ভোগ কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে পারিবারিক ব্যয়ের তালিকা সংগ্রহ করিয়া আমি একটি আদর্শ (average) তালিকা গঠন করিয়াছি। উহা হইতে দেশের মধ্যবিত্ত এবং শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাস-সামগ্রীতে ব্যয়ের পরিমাণ বুঝা যাইবে—

	মজুর	কৃষক	সূত্রধর	কর্ম্মকার	দোকানদার	দীন মধ্যবিত্ত
১। খাদ্য	৯৫·৪	৯৪·০	৮৪·৫	৭৯·০	৭৭·৭	৭৪·০
২। বসন	৪·০	৩·০	১২·০	১১·০	৯·০	৪·৭
৩। চিকিৎসা	×	১·০	১·০	৫·০	৫·৯	৮·০
৪। শিক্ষা	×	×	×	×	১·০	৩·৩
৫। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ	·৬	২·০	২·৫	৪·০	৫·০	৮·০
৬। বিলাসের সামগ্রী	×	×	১·০	১·০	১·৪	২·০
মোট	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০

ধনী লোকদিগের ব্যয়ের তালিকা সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই; তাঁহাদিগের তালিকা সংগ্রহ করিলে উঁহাদিগের বিলাস-সামগ্রীতে ব্যয়ের পরিমাণ জানা যাইত। উল্লিখিত তালিকাটি হইতে বুঝা যায় যে কয়েক শ্রেণীর শ্রমজীবী শিক্ষার জন্য ব্যয় না করিয়াও বিলাস-সামগ্রী ক্রয় করে। মধ্যবিত্তদিগের মধ্যে বিলাস-সামগ্রীর জন্য

ব্যয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রত্যেক শ্রেণী সামাজিক ক্রিয়াকলাপের জন্য অর্থব্যয় বিলাস, শিক্ষা এবং চিকিৎসার জন্য ব্যয় অপেক্ষা অধিক।

সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে ব্যয় বিলাসিতা নহে

এ ব্যয়কে অনেকে অর্থের অপব্যবহার মনে করেন। আধুনিক কালে ইহার ভার যে দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে ইহা স্বীকার্য্য। ইউরোপীয় সভ্যতার সমাগমে এ দেশের চালচলন খুব বাড়িয়া গিয়াছে। অনেকগুলি নূতন কৃত্রিম অভাব সৃষ্ট হইয়াছে, কাজেই এক্ষণে সামাজিক ক্রিয়াকলাপগুলি সংক্ষেপে সারিতে অনেকে বিশেষ মনোযোগী হইতেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের মাপকাঠির দ্বারা আমাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপগুলি বিচার করা অনুচিত। আমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম সমুদয় ধর্ম্ম এবং সমাজানুমোদিত; হিন্দুজাতি যে সামাজিক আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিল ঐ আদর্শের দিক হইতে ইহাদিগকে বিচার করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ

আমাদিগের দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রতিপত্তি এখনও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। স্বজাতি এবং সমাজের মর্য্যাদা লোপ পায় নাই। ব্যক্তিবিশেষের সুখদুঃখে স্বজাতিদিগের সহানুভূতি এবং সমবেদনা এখনও শ্রদ্ধার সামগ্রী রহিয়াছে। কোন হিন্দুকে আমরা তাহার জাতি এবং স্বজাতি-বর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবিতে পারি না। তাই হিন্দু তাহার মাথায় দারিদ্র্যের গুরুভার বহন করিয়াও সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে তাহার জ্ঞাতি এবং স্বজাতিবর্গের সহিত আমোদ-আহ্লাদ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এ প্রকার অনুষ্ঠান স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির নিকটতম বন্ধুদিগের সহিত বিলাসভোগের জন্য নহে,—ইহা আমাদিগের সামাজিক জীবনের সাধনার ফল। ইহা উচ্ছৃঙ্খলতা নহে, ইহা সমাজের বন্ধন। সামাজিক ক্রিয়াকলাপগুলি সমাজের সহিত হিন্দুর জীবন্ত যোগ-অনুভূতির ফল। হিন্দু জন্ম হইতেই সেবার জন্য বলিপ্রদত্ত। প্রথমে পারিবারিক জীবন, তাহার পর জাতিগত বা সামাজিক জীবন তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দেয়। পরিবার, জাতি বা সমাজকে উপেক্ষা করিয়া কেহই স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না, স্বেচ্ছাচারী হইলে সমাজ তাহার কঠোর শাস্তি-বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছে। হিন্দুসমাজ ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জাতিত্ব বিকাশের পথ মুক্ত করিয়া দেয়। গাছ যেমন পৃথিবী হইতে শিকড় ছাড়াইয়া ফল ধরিতে পারে না, সেরূপ হিন্দুর ব্যক্তিত্ব বিশাল সমাজ-ভূমিকে অতিক্রম করিয়া বিকাশ লাভ করে না।

পাশ্চাত্য জগতে ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ বিচার

আজ কাল নূতন সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদিগের দেশ এক নূতন প্রকার ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইয়াছে। এ ব্যক্তিত্ব পরিবার এবং সমাজবন্ধনকে অবজ্ঞা করে, এমন কি গৃহ-বন্ধনকেও অস্বীকার করিতে অনেক সময় কুণ্ঠিত হয় না। বন্ধনের ভিতর দিয়াই মুক্তি,

তাহা ইহা স্বীকার করে না। সমস্ত বন্ধনকে শৃঙ্খলের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিলে এ ব্যক্তিত্ব স্ফূর্ত্তিলাভ করে না। ব্যক্তিত্ব বিকাশ তখনই সম্পূর্ণ যখন বিলাস-ভোগ উচ্ছৃঙ্খল হয়, নিজ ইচ্ছা সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজের সমস্ত দাবীকেই অগ্রাহ্য করে। পাশ্চাত্য জগতে এ আদর্শ কোন দেশবিশেষের নহে। সমগ্র পাশ্চাত্য সমাজ বহুশতাব্দীর ক্রমবিকাশের ফলে এই আদর্শেরই পুষ্টি সাধন করিতেছে। অন্তর্দ্দেশীয় বাণিজ্য এবং যুদ্ধবিগ্রহ এবং স্বদেশে জীবনসংগ্রামের প্রতিযোগিতার ফলে এই আদর্শই সেখানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহার ফলে পাশ্চাত্য সমাজে মনুষ্যের কর্ম্ম-শক্তির যেরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, জগতে আর কোথাও এরূপ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু মনুষ্য সেখানে শক্তিশালী হইলেও আপনার শক্তির অপব্যবহার করিতেছে। ইহাতে সমাজে ঘোর অশান্তি এবং বিপ্লবের সূচনা দেখা গিয়াছে। বিগত ৪ঠা মার্চ্চ প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া একটি সুন্দর বক্তৃতাতে আমেরিকার জাতীয় জীবনের কঠিন সমস্যাগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আমেরিকা জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, আমেরিকার ব্যবসায়ী এবং ধুরন্ধরগণের প্রতিভার নিকট সভ্যজগৎ মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু বিপুল অর্থোপার্জ্জনের সঙ্গে অর্থের নিকৃষ্ট ব্যবহারও আমেরিকাবাসিগণকে জগতের সমক্ষে লজ্জা দিতেছে। অর্থোপার্জ্জনের বিনিময়ে সমাজে যে সমস্ত ভয়ানক ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে, তাহার দিকে দৃকপাত নাই—টাকার ঝনঝনানির শব্দে অসংখ্য শ্রমজীবীর রোদন-ধ্বনি শুনা যায় না। আমেরিকা বড় হইয়াছে, বড় হওয়াতে তাহার দীনতা আরও প্রকাশ পাইয়াছে।

পাশ্চাত্য সমাজ যে ব্যক্তিত্বকে তাহার বিপুল প্রয়াসের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে, উহা মানব-সভ্যতার পরিপোষক নহে বলিয়া সেখানকার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই একটা নূতন যুগের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এই নূতন যুগে সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইবে। সমাজের বাহিরে, দীনদরিদ্রদিগের দৈনন্দিন জীবন-প্রবাহ হইতে দূরে নিঃসম্পর্ক ভাবে বাস করা তখন হেয় হইবে। সমাজ যে সকলকে লইয়া,—সমাজে সকলেই সুখ-শান্তির জন্য পরস্পরের মুখাপেক্ষী, এবং এজন্য সকলেরই পরস্পরের নিকট কর্ত্তব্য আছে,—এ জ্ঞানের তখন উপলব্ধি হইবে। ধনী বা নির্ধন, পণ্ডিত বা মূর্খ সকলেই যে মানুষ—তাহার বোধ হইয়া মনুষ্যত্বের আর অমর্য্যাদা হইবে না। মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি যখন শ্রদ্ধা বাড়িবে, তখন প্রজাতন্ত্র এক নূতন প্রাণ পাইবে, সমাজের সকরুণ সহানুভূতির সুরের সহিত আপনার সুর মিলাইবে, উহার মঙ্গল সাধন করিতে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবে। রুসোর ঐক্যমন্ত্র, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের উচ্চ নৈতিক আদর্শ, শেলির গভীর সমবেদনা, এবং ম্যাজিনির ধর্ম্মমূলক প্রজাতন্ত্রবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া কার্লাইল এবং এমার্শনের মানব-পূজা, ধনবিজ্ঞানবিদ্‌গণের সমাজ-তন্ত্রবাদ,

জেমস ও বার্গসার আধ্যাত্মিকতা এবং আধুনিক চিত্রকলার অতীন্দ্রিয়তা প্রভৃতি স্থিরভাবে অনুধাবন করিলে সকলেরই মধ্যে একটা নূতন যুগের ভাবুকতা, মহাপ্রাণ নব-জীবনের সূচনা দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য জগৎ এখন এক বিপুল আন্দোলনের সম্মুখে রহিয়াছে।

আধুনিক হিন্দুসমাজে পরানুকরণ

আমাদের বিশেষ দুর্ভাগ্য,—ইউরোপ যে সময়ে আপনার সভ্যতার মূলমন্ত্র এবং আদর্শ-গুলি আমূল পরিবর্ত্তন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, আমরা এখন সে গুলিই খুব আগ্রহের সহিত আমাদের জাতীয় জীবনে অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছি। ইউরোপীয় জাতি-দিগের রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক উন্নতি, এবং তাহা-দিগের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তার করিবার ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া আমরা আমাদিগের জাতীয় আদর্শ এবং সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি। আমাদিগের দেশে পুরাতন এবং নূতন আদর্শের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভুত্ব এবং প্রাবল্যের নিকট আমাদের জাতীয় আদর্শগুলি হার মানিতে চলিয়াছে। আমা-দের একান্নবর্ত্তী পরিবার এবং জাতিভেদপ্রথার প্রতি শ্রদ্ধা কমিয়া আসিতেছে। ইউরোপ যখন আপনার মাপকাঠি পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছে আমরা ঠিক তখনই ইউ-রোপীয় মাপকাটি এদেশে আনিয়া উহার দ্বারা আমাদিগের সমস্ত অনুষ্ঠান বিচার করিতেছি। ইউরোপের সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যক্তিত্বের আদর্শ আমরা ভারতবর্ষে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছি। অথচ আমাদের সমাজের পক্ষে ঐ আদর্শ গ্রহণ করিবার সামর্থ একেবারেই নাই বলিলেও চলে। আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে অশান্তিকলহ আনিয়াছি, পাশ্চাত্য গৃহস্থের স্বার্থপরতা আনিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার স্বাধীনতা এবং কর্ম্মদক্ষতা লাভ করিতে পারি নাই। আমরা আমাদিগের জাতিভেদপ্রথাকে বন্ধন মনে করিয়া উহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছি, অথচ ইউরোপের ঐক্যমন্ত্র হজম করিবার শক্তি আমাদিগের নাই। পাশ্চাত্য সমাজে ব্যক্তিগত জীবনের স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তির স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের উপায় হইয়া সমাজের বিপুল অর্থোৎপাদনের সহায় হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে পাশ্চাত্য আদর্শের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তাহার উচ্ছৃঙ্খলতার আবরণ মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাধীন অন্ন-সংস্থানের কোন চেষ্টা হইতেছে না, অথচ পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা হইয়াছে। স্বার্থপরতার সঙ্গে অর্থপৈশাচিকতা এবং ভোগ-বিলাস-স্পৃহা সমাজকে আক্রমণ করিতেছে। ইউরোপীয় আদর্শের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আমাদের সমাজে বিলাস-প্রিয়তা এবং সমাজ-বন্ধনের শৈথিল্য আনিয়া দিয়াছে।

পরানুকরণের কুফল

পূর্ব্বেই আমাদের শ্রমজীবিগণের বিলাস-সামগ্রীতে ব্যয়ের পরিমাণ দেখান হইয়াছে। মধ্যবিত্তদিগের বিলাস খাতে ব্যয় যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহাও বলা হইতেছে। ইহার প্রতি এখনও সমাজের দৃষ্টি

আকৃষ্ট হয় নাই। আমাদের দেশে এখন হিন্দুজাতির উচ্চশ্রেণীর সংখ্যা যে হ্রাস পাইতেছে তাহার কারণ, সমাজে ভোগবিলাসের বৃদ্ধি এবং বৈষয়িক জীবনের প্রবাহ রোধ। নদীপ্রবাহের বেগ হ্রাস, বহুবৎসর চাষ, কৃষকের অল্পতা প্রভৃতি কারণে ভূমির উর্ব্বরতা হ্রাস পাইতেছে। গ্রাম্যশিল্পগুলি কলকারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় বিধ্বস্ত হইতেছে। শিল্পিগণের বংশ-পরম্পরালব্ধ কর্ম্মনৈপুণ্য ব্যর্থ হইতেছে। দেশে মধ্যবিত্তদিগের জন্য শিল্পব্যবসায় শিক্ষার বিশেষ কোন আয়োজন নাই। ধুরন্ধরগণেরও আবির্ভাব হয় নাই। অপরদিকে ভোগবিলাসের বাসনা বাড়িয়াই চলিতেছে। পল্লীগ্রামের কুটিরেও বিলাসিতার স্রোত পৌঁছিয়াছে। কৃষক এবং শ্রমজীবীদিগের মধ্যে কাঁসা-পিত্তলের বাসনের পরিবর্ত্তে এনামেলের বাসনের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। কাঁসা-পিত্তলের বাসনগুলি এনামেলের বাসন অপেক্ষা অধিককালস্থায়ী। এবং ভাঙ্গিয়া গেলেও ঐগুলি কাঁসা-পিত্তলের দরে বিক্রয় হয়। কিন্তু এনামেলের জিনিষগুলি অব্যবহার্য্য হইলে উহাদিগের পরিবর্ত্তে আর কিছু পাওয়া যায় না। বাস্তবিক পক্ষে তৈজসপত্রগুলি দরিদ্রদিগের মূলধন বিশেষ। অবস্থা মন্দ হইলে ঐগুলি বন্ধক রাখিয়া বা বিক্রয় করিয়া দৈনিক খরচ চালান যাইতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি কৃষকগণ দৃশ্য-মনোহর এনামেল বাসনে মুগ্ধ হইয়া দুর্দ্দিনের সহায় ঐ সমস্ত তৈজসপত্রকে ত্যাগ করিতেছে। জামা, জুতা, এবং মিহি সূতার বিলাতী কাপড় পরিধানও আরম্ভ হইয়াছে। দেশের বিদ্যালয়ের এমনি গুণ—কোন কৃষক এবং শ্রমজীবী কয়দিন পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে পড়িলেই বাবু না হইয়া ফিরিতে পারে না। অনেক সময় এমনি চাল বিগড়াইয়া যায় যে তাহারা বসিয়া থাকিবে ভাল তবু বাপ-পিতামহের কর্ম্ম করিবে না।

মধ্যবিত্তদিগের দুরবস্থা

কিন্তু মধ্যবিত্তেরা এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা দোষী। তাঁহাদিগের মধ্যে সকলেই চাকুরীজীবি। আফিস আদালতে তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হয়। কাজেই তাহারা বিদেশী বেশ-ভূষা, চালচলন অবলম্বন করিতেছেন। কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাদিগের সহরে থাকা আবশ্যক। গ্রাম অপেক্ষা সহরে সংসারের খরচ অনেক অধিক। গ্রামে থাকিয়া অনেক গৃহস্থ মৎস্য শাক-সবজী বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন, কিন্তু সহরে আসিয়া ঐগুলি ক্রয় করিতে হয়। সহরে দ্রব্যের মূল্য খুব অধিক। নিম্নলিখিত তালিকাতে দেশের মূল্যাধিক্যের পরিমাণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ১৮৭৩ সালের মূল্যকে ১০০ বলিয়া ধরা হইয়াছে—

	১৮৭৩	১৯০৬	১৯০৭	১৯০৮	১৯০৯	১৯১০
১। কৃষিজাত খাদ্যসামগ্রী—চাউল, ডা'ল, যব, ভুট্টা প্রভৃতি …	১০০	১৭৬	১৮১	২২৬	১৯৩	১৫৫
২। অন্য খাদ্য—ঘি, লবণ …	১০০	৮২	৯৬	৯৪	৮১	৯০
৩। চিনি এবং চা …	১০০	৬৮	৭৮	৪০	৭৮	৮৫
(১—৩) খাদ্য …	১০০	১০৩	১৪১	১৬৭	১৪৬	১২৭

৪। তুলা, রেশম, পশম, এবং পাট —বস্ত্রাদির উপাদান ...	১০০	১২২	১২৭	১০৮	৯৬	১০৮
৫। খনিজ পদার্থ—লোহা, তামা, কয়লা	১০০	১১৯	১৩৪	১৩৫	১২৪	১২৩
৬। অন্যবিধ—কেরোসিন, চামড়া, লোহা, ইত্যাদি ...	১০০	১৩৬	১৪৩	১৩৮	১২৭	১৩১
(৪—৬) দ্রব্য সামগ্রী ...	১০০	১২৭	১৩৫	১২[illegible]	১১৪	১২০
(১—৬) খাদ্য এবং দ্রব্যসামগ্রী	১০০	১২৯	১৩৭	১৩৯	১২৪	১২২

আহার্য্য সামগ্রীর মূল্য শতকড়া ২৭৲ এবং অন্য সামগ্রীর মূল্য শতকড়া ২২৲ বাড়িয়াছে। মূল্যাধিক্যের ফলে কৃষক, মহাজন এবং ব্যবসায়িগণ লাভবান হইয়াছে। যেখানে কৃষক দরিদ্র এবং ঋণভারগ্রস্ত সেক্ষেত্রে মহাজন এবং ব্যবসায়িগণই অধিক লাভ করিয়াছে। কৃষকদিগের লভ্য তাহারাই আত্মসাৎ করিয়াছে। শিল্পীদিগের অবস্থা মন্দ হইতেছে, কিন্তু তাহাদিগের আশা আছে, শিল্পজাত দ্রব্যের উপাদান-সামগ্রীর মূল্য বাড়িয়াছে, যখন শিল্পীরা তাহাদিগের নির্ম্মিত দ্রব্যও অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিত, তখন তাহাদিগের অবস্থা ভাল হইতে পারে। কিন্তু ইতিমধ্যে বিদেশী কলকারখানার প্রতিযোগিতায় তাহারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। মধ্যবিত্তদিগের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে। চাকুরীজীবিদিগের মাহিয়ানা বাড়িবার আশা নাই। বরং শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে ততই উহা কমিতেছে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে অথবা অন্যপ্রকার স্বাধীন অন্নসংস্থানের দিকে মন বেশী দেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার-বৃদ্ধির সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের আফিস-আদালতে বা ব্যবসায়ী-দিগের আফিসে কেরাণীগিরি পাওয়া কঠিন হইয়াছে; উকীল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়িগণের গড় আয় বিশেষ কমিয়াছে। অপরদিকে দেশের মূল্যাধিক্যের সমস্ত ভারই মধ্যবিত্তদিগের উপর পড়িয়াছে, কারণ মূল্যাধিক্যের সহিত তাহাদিগের আয়-বৃদ্ধির কোন সম্বন্ধই নাই। পূর্ব্বেই তাহা-দিগের সহরে অবস্থান পূর্ব্বক বিদেশী চালচলনের অবলম্বনের কথা ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অধিকমূল্য বিদেশী বেশভূষা পরিধান, চা-পান, সিগার-সিগারেট সেবন, বরফ-পান প্রভৃতির সঙ্গে সহরে অবস্থানের অন্যবিধ আনুসঙ্গিক ব্যয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাতায়াতে সময় সংক্ষেপ উদ্দেশ্যে না হইয়া অনেক সময়ে আরাম উপভোগের জন্য কেরাণীদিগের মধ্যে ট্রামের টিকিট বিক্রয় হইতেছে। সহরে স্বাস্থ্যরক্ষা, জলের কল, জল-সরবরাহ এবং আবর্জ্জনা-পরিষ্কারের জন্য মিউনিসিপালিটি সমুদয়ের খরচ খুব অধিক হইয়াছে, অনেক সহরেই মিউনিসিপাল ট্যাক্সের পরিমাণ দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পর সহরের বাড়ী-ভাড়াও বাড়িয়াই চলিতেছে। উপরন্তু সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া চাকুরীজীবিগণ বিশ্রামলাভের

জন্য উৎকট আনন্দ-উপভোগের পক্ষপাতী হইতেছে। উহাতে তাহাদিগের কেবলমাত্র যে অধিক ব্যয় হইতেছে তাহা নহে, নৈতিক অবস্থারও অবনতি হইতেছে। এই সমস্ত কারণে মধ্যবিত্তদিগের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে।

ক্রমিক সংখ্যা হ্রাস

মধ্যবিত্তদিগের ব্যয় বাড়িতেছে অথচ অন্ন-সংস্থানের সুবিধা হইতেছে না, সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে আধুনিক চালচলন রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। বৈষয়িক অবস্থার যদি ক্রমোন্নতি না হয় তাহা হইলে সমাজে হয় লোক-সংখ্যা হ্রাস পাইবে, না হয় সমাজানুমোদিত চালচলন রক্ষিত হইবে না। অধিকাংশ স্থলেই চালচলন রক্ষা করিবার জন্য সমাজের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয়, লোক-সংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকে। ফ্রান্স এবং নিউ ইংলণ্ডে বৈষয়িক জীবন-সংগ্রাম ইউরোপের অন্য দেশ অপেক্ষা কঠোর হওয়াতে এই দুই দেশে লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাত অধিক কম। এ জন্য এই দুই দেশের সমাজবিজ্ঞান-বিদ্‌গণ বিশেষ চিন্তিত হইয়াছেন। আমাদের দেশে উচ্চজাতিসমূহের সংখ্যা যে ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে তাহার প্রধান কারণ একই—আমাদের দারিদ্র্য। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের চালচলন উচ্চ হইয়াছে, অনেক নূতন কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু ঐ চালচলন রক্ষা, ঐ সমস্ত নূতন নূতন অভাব মোচন করিবার জন্য দেশে নূতন নূতন বৈষয়িক অনুষ্ঠানের সূচনা হয় নাই। আমাদের বৈষয়িক জীবন-প্রবাহ প্রবলতর না হইয়া বরং বৎসর পর বৎসর ক্ষীণ হইতেছে। কাজেই সমাজ তাহার লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া চালচলন রক্ষা করিবার জন্য অধিক ব্যস্ত হইয়াছে।

লোকসংখ্যা হ্রাসের প্রতিকার

ধনবৃদ্ধি বনাম সমাজ-সংস্কার

লোকসংখ্যা হ্রাসের অন্য কারণও থাকিতে পারে। কিন্তু বৈষয়িক জীবনের ক্রমাবনতি যে ইহার প্রধান কারণ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। একান্নবর্ত্তী পরিবার এবং জাতিভেদ-প্রথাকে কয়েকজন সমাজ-বিজ্ঞানবিদ্ লোকসংখ্যা হ্রাসের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া এই সবগুলির আমূল পরিবর্ত্তন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই সমাজবিজ্ঞানের দিক হইতে ইহাদিগের উপকারিতা স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহারা বলেন আধুনিক কালে ঐগুলি আমাদের বৈষয়িক জীবন-যাপনের সহায় না হইয়া অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একান্নবর্ত্তী পরিবার এবং জাতিভেদ-প্রথা যে এখন আমাদের বৈষয়িক জীবন-প্রবাহের বাধাবিঘ্ন রূপে পরিণত হইয়াছে তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এ প্রকার বাধাবিঘ্ন নদী-প্রবাহের মধ্যবর্ত্তী প্রতিরোধ স্বরূপ। নদীর গতি নদীমধ্যবর্ত্তী বাধাবিঘ্ন অপেক্ষা মূল প্রস্রবণের উপর অধিক নির্ভর করে। আমাদের দেশে বৈষয়িক জীবন-প্রবাহ যে ক্ষীণ হইয়াছে তাহার কারণ উহার মূল প্রস্রবণ নানা কারণে শুষ্ক হইয়া আসিতেছে। সমাজের ধনোৎপাদন-শক্তি হ্রাস পাওয়াতে দেশে কঠোর দারিদ্র্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে ধনোৎ-পাদনের মূল তথ্যগুলি আলোচনা না করিয়া

যদি আমরা যৌথপরিবার এবং জাতিভেদ-প্রথা প্রভৃতির আমূল পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করি, আমাদের জাতীয় শক্তির অসদ্ব্যবহার হইবে। সামাজিক বিপ্লবের সূচনা না করিয়া এখন দেশের ধনোৎপাদন-শক্তি কিরূপে বৃদ্ধি পায় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য সমস্ত চিন্তা নিয়োগ করিতে হইবে। দলাদলি এবং বিবাদের প্রশ্রয় দিবার অবসর আমাদের সমাজের নাই; এখন স্থিরভাবে সংযতভাবে সমাজের সকলকে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। ধনবৃদ্ধির জন্য সমাজের সমস্ত চিন্তা এবং কর্ম্মশক্তি নিয়োগ করিতে পারিলে, সমাজ তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় উপস্থিত হইবে। কঠোর দারিদ্র্য-ব্যাধি হইতে মুক্তি-লাভের পর সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি নূতন প্রাণ পাইবে, আপনাদিগের ক্রমবিকাশ ফলে তাহারা নূতন অবস্থার উপযোগী হইবে, তর্কবিতর্ক বাক্‌বিতণ্ডা দলাদলির তখন কোন প্রয়োজন হইবে না। সমাজের যাহা গোড়ায় গলদ, সেই কঠিন দারিদ্র্য-ব্যাধির প্রতিকার হইলে, সমাজ-শরীরের ব্যাধির কোন উপসর্গই আর দেখা যাইবে না, তখন সমাজ সবল হইয়া শান্তিলাভ এবং আনন্দ উপভোগ করিবে।

ধনবৃদ্ধির উপায়—বিলাসবর্জ্জন

ধনবিজ্ঞান-বিদেরা বলিয়াছেন, ধনাগমের প্রধান উপায় মূলধনবৃদ্ধি। ধনী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অন্নবস্ত্রাদির অভাব মোচন করিয়া যদি বিলাস-সামগ্রীতে তাঁহাদিগের উদ্বৃত্ত ধন ব্যয় না করেন; পরন্তু উদ্বৃত্ত ধন শিল্পবাণিজ্য-ব্যবসা ইত্যাদিতে নিযুক্ত হয় তাহা হইলে দেশের ধনবৃদ্ধি অতি শীঘ্রই হইবে।

ধনী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিলাস-বর্জ্জন এবং কৃষি ও ব্যবসায়-ক্ষেত্রে যোগদান এবং উদ্বৃত্ত ধন-নিয়োগ জাতীয় ধনবৃদ্ধির একমাত্র উপায়। আধুনিক কালে আমাদের দেশে কোন শিল্প এবং ব্যবসায় বিশেষ লাভ-জনক,—ফ্যাক্টরী, ছোট কারখানা অথবা গৃহ-শিল্প ইহাদিগের মধ্যে কোন্ অর্থোৎপাদন-প্রণালী বিভিন্নক্ষেত্রে অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, বহির্বাণিজ্য এবং অন্তর্বাণিজ্য দ্বারা আমাদের মধ্যবিত্তেরা কি পরিমাণ লাভ করিতে পারে, এ সমস্ত বিষয়ের শীঘ্রই মীমাংসা না করিলে বৈষয়িক জীবনে উন্নতির আশা করা বৃথা। এই প্রবন্ধে উক্ত জটিল বিষয়গুলি আলোচনা করা হইবে না। কিন্তু ধনোৎপাদনের আর একটি দিক,—ধনী এবং মধ্যবিত্তদিগের বিলাস-বর্জ্জন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

পূর্ব্বে সমাজের দিক হইতে বিলাসবর্জ্জনের আবশ্যকতার কথা বলা হইয়াছে। যে সমাজে অনেক লোক অন্নবস্ত্রাভাব মোচন করিতে সমর্থ নহে সেখানে বিলাস-ভোগ নিশ্চয়ই সমাজ-নিন্দিত এবং নীতি-বিরুদ্ধ। ধনোৎ-পাদনের দিক হইতে দেখিতে গেলেও বিলাস-বর্জ্জনের উপকারিতা বেশ বুঝা যাইবে। ধনোৎপাদন-ক্রিয়ায় সমাজের অনেক শক্তি ব্যয় হয়। এই শক্তিব্যয়ের ফলে সমাজ তাহার নানা-বিধ অভাব মোচন করিতে পারে। শারীরিক অভাবগুলি মোচন করিয়া সমাজ যদি ক্রমাগত নূতন নূতন কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিতে থাকে, তাহা হইলে শেষে সমাজ তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াও তাহারই চিন্তাপ্রসূত অভাব-গুলি মোচন করিতে সমর্থ হইবে না। বিলাসিতার সৌখীনতার সীমা নাই, কিন্তু

সমাজের শক্তির সীমা আছে। সুতরাং ব্যক্তির মত সমাজেরও তাহার নির্দ্দিষ্ট শক্তির যথোচিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, বিলাসভোগে শক্তির অপব্যয় করিলে সমাজ ক্রমে দুর্ব্বল হয়। আবার সামাজিক জীবন শুধু বর্ত্তমান লইয়াই নহে, ভবিষ্যতের অপ্রত্যাশিত আপদ-বিপদের জন্য সমাজের শক্তি সঞ্চয় করা উচিত। যে সমাজ কেবলমাত্র বর্ত্তমান লইয়াই ব্যস্ত, যে সমাজের সমস্ত ধন এক পুরুষেই আমোদ আহ্লাদ বিলাস উপভোগের জন্য ব্যয়িত হয়, সে সমাজ অপরিণামদর্শী, ভবিষ্যৎ দুর্দ্দিনে তাহার বিপদের সীমা থাকে না। সম্রাট নেপোলিয়নের পরাজয়ের কারণ, ইংলণ্ডের ধনী এবং ব্যবসায়িগণের মিতব্যয়িতা। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথমে ইংলণ্ডে তাহার পর সমগ্র ইউরোপীয় জগতে এক বিরাট বৈষয়িক আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল। উহার ফলে ইংলণ্ড ইউরোপের অন্য দেশ অপেক্ষা অধিক ধনশালী হইয়াছিল। ইংলণ্ড বিলাস-ভোগে অর্থ ব্যয় না করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল। নেপোলিয়নের সহিত যখন ইউরোপের যুদ্ধ বাধিল তখন ইংলণ্ডই নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতা হইল, ইংলণ্ডের অর্থ এবং সৈন্য-সাহায্যে স্পেন, জর্ম্মাণী এবং অষ্ট্রিয়া মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল, এবং শেষে নেপোলিয়নকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে যখন নেপোলিয়ন তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন, তখন ফরাসীদের দারিদ্র্যের সীমা ছিল না। ফ্রান্স অপেক্ষা ইংলণ্ড যুদ্ধের গুরু ব্যয়-ভার সহজে বহন করিতে পারিয়াছিল।

ভোগে অশান্তি

কেবলমাত্র যুদ্ধ বা বহিঃশত্রু হইতে দেশ রক্ষা এবং শান্তি স্থাপনের জন্য নহে, সামাজিক জীবনে আনন্দ-ভোগের জন্যও বিলাস-দমন আবশ্যক।

যে সমাজ বিলাস-ভোগে উন্মত্ত, তাহা শীঘ্রই কতকগুলি কৃত্রিম ব্যবধানের দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। সমাজের দরিদ্র সম্প্রদায়ের সমস্ত শক্তি তাহাদিগের প্রাথমিক অভাবগুলি মোচন করিবার জন্যই ব্যয়িত হয়। ধনীসম্প্রদায় কৃত্রিম অভাব মোচন উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করে। মানুষের কৃত্রিম অভাবের সংখ্যা স্বাভাবিক অভাব অপেক্ষা অধিক। কৃত্রিম অভাব সমূহের বৈচিত্র্যেরও সীমা নাই, কিন্তু প্রাথমিক অভাব সমূহের ঐরূপ বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না। বিলাস-সামগ্রীর সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের সীমা নাই বলিয়া একদিকে যেমন দরিদ্রসম্প্রদায় অন্নবস্ত্রাভাব পূরণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকে,—অপরদিকে ধনীদিগের মধ্যে কে কত প্রকার বিলাস-সামগ্রী ভোগ করিতে পারে তাহাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়। ক্রমশঃ ধনিগণের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আরম্ভ হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর বিভিন্ন চালচলন নির্দ্দিষ্ট হয়। অবশেষে ধনী এবং দরিদ্রদিগের মধ্যে ব্যবধান খুব অধিক হয়। ক্রমে অর্থের এবং বিলাস-ভোগের তারতম্যের সহিত সামাজিক ব্যবধান দেখা যায়। এইরূপে বিশিষ্ট জাতির সৃষ্টি হয়, প্রত্যেক জাতি নীচ জাতির সহিত বিবাহে আদান প্রদান করে না। অর্থের তারতম্যের উপর নির্ভর করিয়া জাতিভেদ-প্রথা একবার সৃষ্ট হইলে, সমগ্র সমাজ অর্থ-

লালসার দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। অর্থোপার্জ্জন সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকারের উপায় হইলে সমাজের আর কোন লক্ষ্য থাকে না। বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি, প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থের প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠে। ইহার ফলে জাতির যাহা চরম আদর্শ হওয়া উচিত,—সেই আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষ্য হইতে সমাজ ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। উপরন্তু সমাজে ঘোর অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। সমাজের অধিক সংখ্যক লোকই কয়েকজন মুষ্টিমেয় ধনীর বিলাস-সামগ্রী উৎপাদনের জন্য অহোরাত্র খাটিয়া মরে, অথচ তাহারা কোন প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদন করিতে পারে কি না সন্দেহ। অনৈক্য খুব অধিক হইলে সমাজে বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইবেই। পাশ্চাত্য জগৎ এখন ঠিক এই অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য সমাজে অশান্তি

পাশ্চাত্য জগতে ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। এ কারণ ধনী এবং দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী হইয়া পড়িয়াছে। এক দিকে কঠোর দারিদ্র্য আর এক দিকে বিলাস-ভোগের লীলাখেলা, ইহাই পাশ্চাত্য জগতের বৈষয়িক জীবনের চিত্র। অর্থের তারতম্য অনুসারে পাশ্চাত্য সমাজ বিশিষ্ট জাতিসমূহে বিভক্ত হইয়াছে। অর্থপূজার বিপুল সমারোহের মধ্যে সমাজের ধর্ম্ম, প্রেম এবং আধ্যাত্মিকতা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। ধর্ম্ম এখন ধর্ম্মের ভাণ মাত্র হইয়াছে। ধর্ম্মের মহাপ্রাণ ভাবুকতা পাশ্চাত্য সমাজের আব্ হাওয়াতে পুষ্টিলাভ করিতে পারিতেছে না। ধর্ম্ম অভাবে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করিয়াছে। পরিবারিক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা আর নাই, এমন কি গৃহবন্ধনের শৈথিল্যও দেখা দিয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অসংযম, রাষ্ট্রীয় জীবন দলাদলির ভাবে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে, দলাদলি ভুলিয়া সমগ্র সমাজের যাহা প্রকৃত অভাব তাহা চিন্তা করিবার অবসর নাই। ইহার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থের প্রতিপত্তিও দেখা দিতেছে।

ইউরোপে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ধনকুবেরগণই ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সমস্ত আইনকানুন নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। সমাজের চিন্তাপ্রণালীর মধ্যেও বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। সাহিত্য জগতে মহনীয় ভাব ও সত্য আর আবিষ্কৃত হইতেছে না। যে বিদ্যা অর্থকরী নহে তাহার সম্মান কমিয়া আসিতেছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি নহে। জীবিকার্জ্জনোপযোগী কর্ম্মশক্তির বৃদ্ধি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছে।

বিজ্ঞান বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুত করণের জন্য নিয়োজিত হইতেছে,—সমাজের বিশ্রাম-ভোগ যাহাতে সহজসাধ্য হয় এবং বিশ্রাম লাভ করিয়া সমাজ যাহাতে আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে পারে তাহারদিকে দৃকপাত নাই। ভূতির অভাব দেখা দিয়াছে। ডারুইন প্রমুখ সমাজ-তত্ত্ববেত্তারা বলিয়াছেন বিজ্ঞানের সহিত চিত্রকলাও এখন বিলাস-উপভোগের সহায় হইয়াছে, সমাজের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক আদর্শের সহিত তাৎকালিক চিত্রকলার যে জীবন্ত সম্বন্ধ ছিল তাহা এখন লোপ পাইয়াছে।

বিলাস-ভোগের সহিত সমাজে সহানুভূতির অভাব দেখা দিয়াছে। ডারুইন প্রমুখ সমাজ-তত্ত্ববেত্তারা বলিয়াছেন—সমাজ কেবলমাত্র প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়াই উন্নতি লাভ করিতে পারে। তাঁহারা বুঝাইয়াছেন প্রতিযোগিতার ফল সক্ষমের জয় এবং অক্ষমের পরাজয়, সক্ষমেরাই সমাজের উন্নতির পথ নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। এই মতই পাশ্চাত্য জগতে সাধারণতঃ গ্রাহ্য। তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, সমাজের মধ্যে যে কত লোক জীবনসংগ্রামে পরাজিত হইয়া দুঃখ এবং কষ্টের সহিত কালাতিপাত করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই কিন্তু তাহাদের মতে এই দুঃখ-ভোগ অনিবার্য্য। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, অসমর্থদিগের বিলোপই সমাজের কল্যাণপ্রদ, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে সমাজশক্তির অপব্যবহার হইবে। কিন্তু বিবর্ত্তনবাদের এই মূল তথ্যটি সমাজ-বিজ্ঞানের শেষ কথা নহে। কেবলমাত্র প্রতিযোগিতার দ্বারাই সমাজের ক্রমোন্নতি হইতে পারে না, প্রতিযোগিতার সহিত সহযোগিতাও সমাজের ক্রমবিকাশ নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ প্রতিযোগিতাকেই এখন সভ্যতা-বিকাশের মূলমন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছে,—সহযোগিতা সামাজিক উন্নতির কিরূপ সহায়, তাহা অনুভব করিতে পারে নাই। সুতরাং প্রতিযোগিতা এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল অনৈক্যকে বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য জগৎ স্বাভাবিক বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

আধুনিক সমাজ-তন্ত্রবাদ

কিন্তু এই অনৈক্যের সহিত যে বিলাস-ভোগের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং সমবেদনার অভাব দেখা গিয়াছে, তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এক নূতন দর্শনের সৃষ্টি করিতেছেন। তাহা অনৈক্য অস্বীকার করে, তাহা ঐক্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত—ইহার নাম সোসিয়ালিজম বা সমাজতন্ত্রবাদ। তাঁহারা বলেন, অনৈক্য নহে, ঐক্যই স্বাভাবিক,—পাশ্চাত্য সমাজে শতকরা ৮০ জন এখন যে দেশোৎপন্ন ধনসম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগও ভোগ করিতে পারিতেছে না, তাহার কারণ তাহাদিগের কর্ম্ম বা বুদ্ধি-শক্তির অভাব নহে। তাহার কারণ ধনীরা শ্রমজীবিগণকে তাহাদিগের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে কৃত্রিম অবৈধ উপায়ে শ্রমজীবিগণকে দরিদ্র করা হইয়াছে। এই বলিয়া তাঁহারা ধনীদিগকে বিচার করিবার ভার নিজেদের হাতেই লইয়াছেন। ধনীরা বিলাস-উপভোগে উন্মত্ত, তাহাদিগের সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া দরিদ্র শ্রমজীবিগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে যদি তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে অধিক পরিমাণে ট্যাক্স করিয়া ধীরে ধীরে ধনীদিগের নিকট হইতে সম্পত্তি দরিদ্রদের আয়ত্তে আনিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত দেশের সমস্ত সম্পত্তি এবং মূলধন সমাজের হস্তগত না হয়, ততদিন তুমুল আন্দোলন চালাইতে হইবে। শেষে সমাজ দেশের সমগ্র ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়া প্রত্যেকের অভাবানুযায়ী ধন বিতরণ করিবে। বিলাসিতা চিরকালের জন্য লোপ পাইবে। অথচ কর্ম্মশক্তিও হ্রাস পাইবে না। সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ তখন আরও ঘনিষ্ঠ বলিয়া

বিবেচিত হইবে। প্রত্যেকে আপনার দায়িত্ব বুঝিয়া সমাজের প্রতি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। অলস হইয়া সমাজের নিকট হইতে আপনার প্রাপ্য লইতে সকলেই লজ্জিত বোধ করিবে। সমাজতন্ত্র-বাদীদের ইহাই আশা। মানুষ তখন প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে,—সমাজে প্রতিযোগিতা এবং অনৈক্য থাকিবে না, ভ্রাতৃপ্রেম এবং সহকারিতা সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া দিবে।

সমাজ-তন্ত্রবাদের অলীকতা

সামাজিক জীবনে ঘোর অশান্তির ফলে এই উদ্ভট কল্পনার সৃষ্টি। সমাজে অনৈক্য না থাকিলে এক বৈচিত্র্যহীন সমতা আসিয়া সমাজকে আক্রমণ করিবে, ইহাতে সমাজ অচিরেই প্রাণহীন এবং অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িবে। ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। অধিকন্তু মনুষ্য যতদিন দেবত্বপ্রাপ্ত না হয় ততদিন সমাজতন্ত্রবাদীদের আশা কার্য্যে পরিণত হইবে না। প্রতিযোগিতা এবং অনৈক্য উভয়কে মানিয়াই মনুষ্য-সমাজ গঠন করিতে হইবে। কিন্তু প্রতিযোগিতা এবং অনৈক্য যাহাতে সমাজের মঙ্গলবিধানে প্রযুক্ত হয় তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হইবে।

হিন্দুসমাজে ঐক্য ও অনৈক্যের সমন্বয়

আমাদের পুরাতন সমাজ বিভিন্ন আশ্রম এবং অধিকারভেদ সৃষ্টি করিয়া একদিকে প্রতিযোগিতা রক্ষা এবং অপর দিকে গোষ্ঠীর প্রভাবকে প্রবল রাখিয়াছিল। ইহার ফলে সমাজ ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করিয়া উহার সহিত গোষ্ঠী-জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিয়াছিল। একদিকে ব্যক্তিত্ব বিকাশ, অপরদিকে সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা বিধান, হিন্দুসমাজের ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দুসমাজের এ আদর্শ এখন লুপ্তপ্রায়। মুসলমান-বিজয়ের পর হিন্দুসমাজের ক্রমোন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। এই কারণে হিন্দুসমাজের আদর্শগুলি পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। এই কারণেই হিন্দুর জাতি, কুল এবং ধর্ম্ম ক্রমশঃ ব্যক্তিগত হইতেছে, সমাজে গোষ্ঠী-জীবনের প্রভাব লোপ পাইতেছে। বিশাল সামাজিকত্বের আদর্শ ত্যাগ করিয়া হিন্দু এখন বাহ্য আচার-ব্যবহার এবং কার্য্যকলাপের বিশিষ্টতা সৃষ্টি করিয়া সমতাস্থাপন এবং গোষ্ঠীর প্রভাব রক্ষা করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। ইহাতে পদে পদে অকৃতকার্য্য হইতেছে। আধুনিক কালে বৈষয়িক জীবন-সংগ্রাম দিনে দিনে যতই কঠোর হইতেছে, ততই আচারমূলক সামাজিক ব্যবস্থা হীনবল হইয়া পড়িতেছে। বিশিষ্ট আচার-ব্যবহার এখন হিন্দুজাতির মধ্যে সমতা স্থাপন করিতে পারিতেছে না আধুনিক হিন্দু সমাজবন্ধনকে অগ্রাহ্য, করিতেছে, সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যক্তিত্ব এখন পুষ্টি লাভ করিতেছে। হিন্দুসমাজের ক্রমবিকাশ এখন ঠিক বিপরীত দিকে হইতেছে। হিন্দুসমাজ অহিন্দু হইতে চলিয়াছে।

হিন্দুসমাজের বাণী

কিন্তু এককালে হিন্দু-সমাজই সাম্য ও বৈষম্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আমাদের বৈষয়িক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং

ধর্ম্মজীবনে শান্তি এবং আনন্দ আনিয়া দিয়াছিল। হিন্দুসমাজ প্রতিযোগিতা রাখিয়াও স্বৈরাচার ও অসংযমের শাস্তি বিধান করিয়াছিল, অধিকার-ভেদ মানিয়াও স্বার্থপরতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন করিয়াছিল। হিন্দুসমাজ অনৈক্যকে বরণ করিয়াছিল, কিন্তু প্রেম এবং ভাবুকতার দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব, সমতা ও প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল। আধুনিক ধনবিজ্ঞানবিদ্‌গণ বিলাসবিষজর্জ্জরিত পাশ্চাত্য জগতে ঐক্য-মূলক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের ঘোর অশান্তি দূর করিবেন বলিয়া যে আশার কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই পাগলের পাগলামি। অনৈক্যকে না মানিয়া সমাজ গঠন করা অসম্ভব। অনৈক্যকে মানিতেই হইবে, অথচ অনৈক্য যাহাতে অত্যাচার ও নির্য্যাতনে পরিণত না হয়, তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। এই কথা পাশ্চাত্যজগতে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

বিংশ শতাব্দীতে হিন্দু-সমাজ এই কথাই পাশ্চাত্য জগতের নিকট প্রচার করিবে। এ কথা প্রচারিত না হইলে পাশ্চাত্য জগতের দুঃখ এবং অশান্তির অবসান হইবে না। শান্তি চাই, স্বস্তি চাই। বিলাস-অর্চ্চনার নিষ্ফল আয়োজনের ভারে প্রপীড়িত পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তঃস্থল হইতে দীনতার করুণ ক্রন্দন বিশ্বদেবতার চরণে পৌছিয়াছে। তাই বিশ্বজগতের সর্ব্বত্র নূতন জীবনের আয়োজন চলিতেছে। হিন্দুসমাজ ঐক্য ও অনৈক্য, সাম্য ও বৈষম্য, ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয় সাধন করিয়া এক নূতন জীবনের অমৃত-মন্দাকিনী-ধারা ধাতার কমণ্ডলু হইতে মর্ত্ত্যে আনয়ন করিবে। আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের সেই ভবিষ্যৎ সার্থকতার আশায় রহিলাম।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ,
অধ্যাপক,—ধনবিজ্ঞান, কৃষ্ণনাথ কলেজ,
বহরমপুর।

টীচিং বিশ্ববিদ্যালয় কাহাকে বলে ?

চৈত্র সংখ্যায় আমরা "রেসিডেন্‌শ্যাল" বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি। আমরা মনে করি—ভারতবর্ষে রেসিডেন্‌শ্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা উপকার হইবে না। এবার আমরা "টীচিং" বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিব।

গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—কোনটিই টীচিং বিশ্ববিদ্যালয় নয়। কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, এলাহাবাদ, পঞ্জাব—এই সকল স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেবলমাত্র পরীক্ষা-মন্দির। তাঁহাদের কর্ত্তৃপক্ষেরা ছাত্রদিগের উপর বৎসরান্তে বা দুই বৎসরের পর একটা করিয়া ছাপ মারিয়া দেন মাত্র। ছাত্রদের লেখাপড়া অন্য লোকের হাতে থাকে। যাঁহারা শিক্ষকতার কর্ম্ম করেন তাঁহাদের

অনেকেরই পরীক্ষার নিয়ম-কানুনের উপর হাত নাই। শিক্ষক-সমাজে ও পরীক্ষক-সমাজে বিশেষ কোন যোগ নাই।

সুতরাং যাঁহারা কেবলমাত্র কলিকাতা বা বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা টীচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা সহজে বুঝিতে পারিবেন না। এই বিষয়ে আমাদের দেশে কোন আলোচনাও হয় নাই। ভারতবর্ষের ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যে এই নূতন ছাঁচে ঢালা শিক্ষাপরিষদের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না।

আমাদের বিবেচনায় টীচিং বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা-পড়া শিখানটা ভালই হইবার সম্ভাবনা। ইহার ব্যবস্থায় ছাত্রেরা বইগুলি ভাল করিয়া পড়িবার ও বুঝিবার সুযোগ পায়। শিক্ষকেরা ছাত্রদিগকে 'পড়া' দিতে পারেন এবং তাহাদিগের পড়া নিতে পারেন। যে ছাত্র বুঝিতে পারিল না, তাহাকে বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা থাকে। যতটুকু শিখান হইল ততটুকুই পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার সময়ে ছাত্রের বিদ্যা অনুসারে প্রশ্ন করা যাইতে পারে। বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি সকল বিষয়েই এই কথা খাটে। ফলতঃ, বিদ্যা-চর্চ্চাটা টীচিং বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতিলাভ করিয়াই থাকে।

সেদিন শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি নিয়মের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া টীচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন উপযুক্ত অধ্যাপক বিজ্ঞান বা ইতিহাস বা দর্শন বা অন্যান্য বিদ্যা সম্বন্ধে মৌলিক অনুসন্ধান ও স্বাধীন গবেষণার সুযোগ প্রাপ্ত হ'ন। তাহাতে বিদ্যার সীমা বাড়িতে পারে—এবং ছাত্রেরা এই সকল জ্ঞানান্বেষী অধ্যাপকগণের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া অনুসন্ধিৎসু হইতে পারে। আমরা মনে করি ইহা টীচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়—ইহা একটি গৌণ লাভ মাত্র।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' পত্রিকায় 'আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি' নামক একটি প্রবন্ধে টীচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে বঙ্গসাহিত্যে আর কোন আলোচনা আমরা দেখি নাই। সেই প্রবন্ধে আমাদের মতের সমর্থন পাইতেছি। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল :—"এই পদ্ধতিতে শিক্ষকেরাই পরীক্ষকভাবে সমাজে গৌরব ও মর্য্যাদা লাভ করিতে থাকেন। যাঁহারা বিদ্যা দান করিতেছেন, তাঁহারাই শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনের নিয়ন্তা এবং ভাগ্য-গঠনের কর্ত্তা হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হ'ন। ইহাতে ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট, প্রশংসা-পত্র, ডিগ্রি অথবা অন্য কোনও সম্মান-বিজ্ঞাপক লিপি প্রদানের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে; এবং বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র পরীক্ষা-মন্দির না থাকিয়া প্রকৃত পাঠশালা ও শিক্ষালয়রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে।" এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবে চরিত্রগঠন এবং ধর্ম্মশিক্ষা হইতে পারে কি না তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। তবে "বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবলমাত্র পরীক্ষা-মন্দির না রাখিয়া প্রকৃত শিক্ষা-মন্দিরে—'টীচিং ইউনিভার্সিটিতে'—পরিণত করিলে জ্ঞানের মাত্রা বৃদ্ধি হইতে পারে,—ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা বিকশিত হইবে না।"

অবশ্য আমরা সাধারণ পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় হিন্দু-গৃহস্থের উপযোগী ধর্ম্মশিক্ষা আশা করিতেই পারি না। সুতরাং টীচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছাত্রদিগের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে কি না, অথবা দেশের আর্থিক ও অন্যান্য অভাব মোচন হইবে কি না এ যাত্রায় তাহা আলোচনা করিব না। বিদ্যাদানের প্রণালীর উন্নতি হইতে পারে, এবং পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার হইতে পারে—এই দুই কারণেই আমরা টীচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষপাতী। সাধারণের অবগতির জন্য টীচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার নিয়ম সম্বন্ধে আমরা অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের 'শিক্ষা-সমালোচনা' গ্রন্থ হইতে স্থানে স্থানে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে পরীক্ষার পদ্ধতি একটি প্রধান জিনিষ। পরীক্ষার নিয়মের ভাল-মন্দের উপর সুশিক্ষা-কুশিক্ষা নির্ভর করে। যদি এরূপ হয় যে সমস্ত বৎসর লেখা পড়া না করিয়াও শেষ কয়েকমাস অত্যন্ত পরিশ্রম করিলেই বেশ খ্যাতির সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাহা হইলে ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তিকে সহায়তা করা হয়।"

"প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির নিয়মানুসারে শিক্ষার্থীরা বৎসরান্তে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই গৌরব প্রাপ্ত হয়। বৎসরের প্রতিদিন বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী না হইলেও ছাত্রদিগের কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। এই রীতি বর্জ্জন করা উচিত।"

"যাহাতে ছাত্রেরা প্রতিদিনই প্রতিদিনকার পাঠ সমাধা করিয়া ফেলিতে পারে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ছাত্রদিগকে দৈনিক কার্য্যে মনোযোগী হইতে বিশেষ উৎসাহিত করিয়া তাহাদের চরিত্রের মধ্যে বিদ্যা-চর্চ্চার অভ্যাস ও স্থির জ্ঞান-পিপাসা সৃষ্টি করিবার জন্য দৈনিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।"

"প্রতিদিন ছাত্রদিগের পাঠের ফল নির্দ্ধারণ করিয়া একটি পুস্তকে লিখিয়া রাখা উচিত। বৎসরান্তে এই দৈনিক পরীক্ষার ফলসমূহ যোগ করিয়া বাৎসরিক পরীক্ষার ফলের সহিত মিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। শেষ পরীক্ষায় নিম্ন স্থান অধিকার করিয়াও যদি কোন ছাত্রের সমগ্র বৎসরের কার্য্যফল সন্তোষজনক হয়, তাহা হইলেও তাহাকে উচ্চ প্রশংসা প্রাপ্ত হইবার অধিকার দেওয়া উচিত।"

টীচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে আর একটা কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ে।

যে সকল দেশে টীচিং বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেই সকল দেশে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে। কোনও এক নিয়মে সকল বিদ্যালয়ের কাজ চলে না। স্থানীয় সুবিধা অসুবিধা অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নির্ব্বাচিত হইতে পারে, এবং ছাত্রগণের বুদ্ধিশক্তি অনুসারে শিখাইবার প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। বিদ্যালয়গুলিকে সকল বিষয়ে শাসন করিবার প্রয়োজন হয় না। টীচিং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বকীয় আভ্যন্তরীণ কার্য্যাবলীর নিয়ন্তা মাত্র থাকেন। দেশের আদ্য ও মধ্য পাঠশালাগুলি আপন আপন নিয়মে গড়িয়া উঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সাধারণ প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হইলেই ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

ভারতবর্ষে কাশী, আলিগড়, ঢাকা, পাটনা প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি টীচিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। আমরা আশা করি এখন হইতে বিভিন্ন জেলার নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকে যথাসম্ভব স্বস্বপ্রধান ভাবে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ দেওয়া হইবে। তাহার ফলে কোন বিদ্যালয়ে হয় ত শিল্প-শিক্ষার প্রাধান্য থাকিবে—কোন বিদ্যালয়ে হয় ত ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের প্রাধান্য থাকিবে। টোল, মক্তব, গুরুগৃহ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার শিক্ষালয় হইতেও ছাত্রগণ পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইবে। সকল বিদ্যালয়ে একই পুস্তক পড়াইবার প্রয়োজন হইবে না। ছাত্রেরা গুরুগৃহে বা পাঠশালায় কোন্ নিয়মে কি বিষয় শিখিতেছে—তাহারও অনুসন্ধানের আবশ্যকতা থাকিবে না; তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই হইল। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শাসন ও পরিচালনা সম্বন্ধে এই সকল সুবিধা না দিলে নাম মাত্র টীচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা কোন উপকার হইবে না।

দেশের লোকেরা আজকাল শিক্ষাসমস্যা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আশা করি তাঁহারা বিষয়টা মনোযোগ দিয়া গভীর ভাবে আলোচনা করিবেন। এজন্য সকল সভ্যদেশে ডে-স্কুল, বোর্ডিং-স্কুল, গ্রামার-স্কুল ইত্যাদি পাঠশালাগুলি কত নূতন নূতন 'টাইপ' বা ছাঁচে গড়া হইয়া থাকে তাহার হিসাব করিয়া দেখিবেন।

স্বদেশী আন্দোলন

১৯০৫ সাল হইতে স্বদেশী আন্দোলন চলিয়া আজ প্রায় দুই বৎসর আন্দোলন বন্ধ হইয়াছে। হইবার কারণ অনেক আছে তাহার মধ্যে আন্দোলনকারীদিগের দুর্ব্বলতাই অন্যতম কারণ। তাঁহারা যাহা বলিয়াই আন্দোলন বন্ধ করুন না কেন, "এখন আর গলাবাজীর আবশ্যকতা নাই, এখন কর্ম্মের দিন আসিয়াছে" "এখন গৃহে গৃহে শিল্প-কর্ম্ম প্রসারিত হউক" ইত্যাদি যাহাই বলুন, আন্দোলন যে বাঙ্গালায় একটা কৃষি-শিল্পের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ঢেউ তুলিয়া দিয়াছিল সেটা বড় ছোট খাট ঢেউ বলিয়া মনে হয় না।

বাঙ্গালার লক্ষ্মী 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্' এই আন্দোলনের প্রথম ফল। দেশে দেশে বঙ্গলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচারক ও চারণদল ছুটিয়াছিল। "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই," "পরব না আর পরের হাতে ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি" ইত্যাদি গানগুলি পথে পথে চারণদল গাহিয়া বেড়াইত। তার পর কেহ হাতের বালা বিক্রী করিয়া, কেহ গলার হার বিক্রী করিয়া, কেহ নিজের গৃহ বিক্রী করিয়া বঙ্গলক্ষ্মীর অংশ খরিদ করিল। বঙ্গলক্ষ্মী গগণ ভেদ করে জাহ্নবী-তটে আপনার গৌরব-

মণ্ডিত দেহখানি খাড়া করে বিরাজ করলেন। সে আজ কয়দিনের কথা। বাঙ্গালায় ভাবুক বেশী, আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য কত প্রকার ব্যাপার ঘটে গেল—কেউ জেলে গেল, কেউ দ্বীপান্তর গেল, কেউ নির্ব্বাসিত হ'ল, কারও বাটী সার্চ্চ হ'ল, সেটাও এই আন্দোলনের মধ্যেই পড়ে গেল। তার পর এদিকে যেমন বোম্বাইএ অনেক কল-কারখানা বাড়তে লাগল বাঙ্গালাতেই দুচারিটা আরও কলের প্রতিষ্ঠা হল। শ্রীরামপুরে 'কল্যাণজী কটন মিল', মেটেবুরুজে এ্যাণ্ড্রু ইউলদের 'বেঙ্গল মিলস্', হোগলকুড়েতে 'গণেশ ক্লথ মিল', কুষ্টিয়ায় মোহিনী মিল চলতে লাগল। কাপড়ের ব্যবহারটা এক রকম চলল, কিন্তু আন্দোলনটা ঢিমে পড়ায় আবার ঘুমন্ত ছেলেরা ঘুমুতে চলেছে। আবার স্কুল-কলেজের ছেলেরা চকচকে ঝকঝকে বিলাতী ছিটের, মলমলের আদ্ধির ডবল ব্রেষ্ট সার্ট, পাঞ্জাবী প'রে হেদোর ধারে, গোলদীঘিতে, থিয়াটার ঘরে বাহারে বাবু হ'তে চলেছে। যাক, তাদের বিশেষ দোষ নাই, যাঁরা তাদের এ পথে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা এখন কোথায়? কেউ রাজ-দরবারের দরবারী, কেউ হাইকোর্টে কৌন্সিলী করতে ব্যস্ত, আর কেউ দেশছাড়া। বাকী যারা তারা পথভ্রষ্ট হয়ে এখন আনাচে কানাচে রুটীর জন্যে বেড়াচ্ছে।

তার পর আবার দেশে যেমন ভাত কাপড়ের অভাব বাড়ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ সাবান-এসেন্সের কারখানা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টরী, ওরিয়েণ্টাল সোপ ফ্যাক্টরী, বুল বুল সোপ, লেটাস্ সোপ, নর্থওয়েষ্ট সোপ, ঘোষের সোপ কত কত সাবানের কারখানা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। ফাষ্টবুক প'ড়ে ছেলেরা জানে যে চুল আঁচড়াতে হয়। সাহেবদের মাথায় লম্বা টেরি দেখে তাদেরও সাধ হয় টেরি কাটতে। মেয়েদের ত চুলের প্রসাধন চাই-ই। সুতরাং বাঙ্গালায় দুটী চিরুণী ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা হল। বালী চিরুণীর কারখানা ও যশোহর চিরুণীর কারাখানা দুটী বেশ কাজ কচ্ছিল, কিন্তু প্রথম থেকে যেমন কাজ হচ্ছিল, এখন বোধ হয় তেমনটী হচ্ছে না। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভের পর থেকে কতগুলি কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তার মধ্যে কলিকাতা পটারি ওয়ার্কস্, বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্, আর্য্য কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ ও রসা কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ বেশ চলিতেছে।

গেঞ্জি মোজা পরাও আমাদের এখন একটা আবশ্যকের মধ্যে হয়েছে। দেশটার ঋতুগুলি সব একমতই চলছে! নদ নদী একটু শুকিয়েছে, জলাভাব অন্নাভাব বেড়েছে, কিন্তু আমাদের পরিধেয় ধুতি, কামিজ, মোজা, গেঞ্জির বাহুল্য হয়েছে। সেটা আমাদের দোষ হলেও, মেনে নিতে হচ্ছে যে আমাদের এটা আবশ্যক। কেননা আমরা সকলেই করি, আর জন কত লোক গেঞ্জি মোজা তৈরী ক'রে, বেচে কিনে স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জ্জন করে খাচ্ছে।

আহম্মদাবাদ, সিকারপুর প্রভৃতি স্থানে ভাল ভাল হোসিয়ারি, গেঞ্জির কারখানা হয়েছে। বাঙ্গালায় পাবনা শিল্পসঞ্জীবনী, কলিকাতার এন বসুর বেলেঘাটা হোসিয়ারি, মনোমোহন বাবুর কলিকাতা হোসিয়ারি, সিমলা হোসিয়ারি, নদীয়া গনাপুর করোনেশন

হোসিয়ারি, ঝামাপুকুর হোসিয়ারি, ভবানীপুর আর্য্যাবর্ত্ত হোসিয়ারি, বেঙ্গল হোসিয়ারি প্রভৃতি অনেক গুলি হোসিয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমাদের দেশের লোক লজ্জা নিবারণের জন্য কখনও পরের উপর নির্ভর করত না। নিজের পতিত জমির উপর কার্পাস বৃক্ষ রেখে তাই থেকে তুলা নিয়ে তাঁতীর হাতে কাপড় বুনিয়ে নিত। তাতে তাঁতীরও পেট ভরত, আর শুদ্ধ কাপড় পরাও হত, চর্ব্বি মাখান কাপড় পরতে হত না। সেই রকম, যা কিছু দেশের আবশ্যক ছিল, দেশের লোক আদান প্রদান দ্বারা সব মিটাইত। কিন্তু যতই দিন গেল ততই দেশের তাঁতী, মুচি, কামার, কুমার আপনার বৃত্তি ত্যাগ করতে বাধ্য হল। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যতই নষ্ট হ'তে চলল, যত লোকের পুরাতন জিনিষের উপর অনাস্থা বৃদ্ধি হতে লাগল ততই লোক বৃত্তিহীন হ'তে লাগল, দেশের দৈন্য বৃদ্ধি হ'তে লাগল। তার পর পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক দেশকে ভাসিয়ে দিলে। ছিদ্র গৃহে। আলোকমালা প্রবেশ করে গৃহবাসীকে অস্থির করে তুললে, নূতন আলোক নূতন কর্ম্মধারা প্রবাহিত করলে। বাঙ্গালী আত্মসম্মানের নূতন আদর্শ পাইয়া আত্মবৃত্তি ত্যাগ করিয়া চাকরী করিয়া সম্মানিত বোধ করিল! ইহাই এই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান লক্ষণ—"বাবু" আখ্যা বাঙ্গালীরা পাইয়া ধন্য হইল। একটী সাদা জামা, একখানা কাপড়, চকচকে জুতা, মাথায় টেরি আর প্রাতে ১০টা হইতে ৭ টা পর্য্যন্ত পরের হুকুম তামিল করা। আর একটী বিশেষ লক্ষণ, একান্নবর্ত্তী পরিবারস্থ হইয়া থাকিবার আবশ্যক নাই, ক্ষমতাও নাই, সে উদারতা এ আলোকে উলুকের মত থাকিতে পারে না। পুরাতন আলোক নিভিয়া গিয়াছে, সে আলোক দেশে আবার না জ্বালিলে, এ দেশের সে ধনধান্যপূর্ণ সে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সে রূপ দেখিতে পাইবে না।

এই পুরাতন আলোকের একটী রেখা ১৯০৫ সালে এদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। তাহারই কণা পাইয়া মা আমাদের দুঃখের মধ্যে সুখের আস্বাদ পাইয়াছেন। তাই একটু হাসি মায়ের মুখে প্রকাশিত হইয়াছে। তাই দেশে নূতন আশার পবন বহিয়াছে, তাই সন্তান মায়ের বন্দনাগীতি গাইতে শিখিয়াছে। তাহা ক্ষণকালতরে রুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু আবার দেশে সুখের হাসির স্রোত বহিবে। আজ যাহারা এখন ঘুমাইতে চাহিতেছে তাহারাও বীতনিদ্র হইয়া মায়ের পূজার আয়োজন করিবে। ইহাই আমাদের আশা—ইহাই আমাদের ভরসা।

স্বদেশী আন্দোলনের পর বাঙ্গালায় যে কয়টী কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তার মধ্যে অনেকগুলির অবস্থা ভাল নহে। এও একটা দুঃখের কথা সত্য; কেননা, অনেক লোক এই গুলিতে অর্থ সাহায্য করিয়া প্রবঞ্চিত বোধ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁদের কার্য্যকুশলতা দেখিয়া আর যাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্য দেখিয়া আমরা আমাদের কাজের দোষ দেই ও আত্মনির্ভরতা হারাই, তাঁদের বাণিজ্যের ইতিহাসের মূল দেখিলে, ও কেমন করিয়া দুঃখে কষ্টে এ অবস্থায় এসে দাঁড়াইয়াছে দেখিলে বুঝতে পারা যায়,

যে, আমাদের নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই। বাঙ্গালী ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া শ্ববৃত্তি-পরায়ণ হইয়াছিল, নূতন জাতের সৃষ্টি করিয়াছিল, উকিলী, কৌন্সিলী, কেরাণী, মাষ্টারী এ সকল একটী একটী জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। উকিলের ছেলে লেখাপড়া শিখবে উকিল হবার জন্য। আমাদের যেমন কামারের ছেলে কামার হ'ত, ছুতারের ছেলে ছুতার হ'ত, তেমনি মাষ্টারের ছেলে মাষ্টারি করতে শিখত, উকিলের ছেলে ওকালতী করতে শিখত। এখনও শিখে দুটী একটী বাদ যায়। তাই বলিতেছিলাম শ্ববৃত্তি পরায়ণ হয়ে, আমাদের দেশের লোক একটী একটী নূতন জাতিতে পরিণত হইতেছিল। এই স্বদেশী আন্দোলন সেটীকে একটু নাড়াইয়া দিয়া গিয়াছে। এখন ছেলেরা পড়িতে যায়—ভেবে কি করব, তবে এই তার আরম্ভ। এটা কিন্তু বুঝেছে যে ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া আর কাজ নেই, উপায় নেই।

সেইটী ভেবে সহরে ও মফস্বলে অনেক স্বদেশী দোকানদার হয়েছে। স্বদেশী দোকানদার মানে, যারা স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করে। মারোয়াড়ীরা বিলাতী বা বিদেশী দ্রব্য লইয়া ব্যবসা করে, তথাপি তাহারা আমাদের স্বদেশী! তারা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পিকুল ধ্বংস করিয়া বিদেশী ব্যবসা হইতে উপার্জ্জিত ধন দ্বারা কত ধর্ম্মশালা, পান্থশালা, দেবমন্দির, তড়াগ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন তাহারাও আমাদের স্বদেশী! যাঁহারা গরু মারিয়া জুতা দান করেন, তাঁহারাও আমাদের স্বদেশী; যে পার্শী বিদেশী পণ্যে জীবিকা অর্জ্জন করিয়া ভারতের টাকা লুটাইয়া দেন, যাহাদের অশন বসন সবই বিদেশী, তাহারাও আমাদের স্বদেশী! তাই বলিতেছিলাম যে, আমাদের বাঙ্গালায় স্বদেশী ব্যবসায়ী বলিলে বুঝিতে হইবে যে যাহারা স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিয়া দেশের অর্থ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন তাহারাই প্রকৃত স্বদেশী।

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে এই কথাই প্রযোজ্য। আবার যাহারা স্বদেশের সাধনা ধরিয়া আছেন তাহারা স্বদেশী। যাহারা চুরোট মুখে পা ফাঁক করিয়া পাজামার পকেটে হাত দিয়া আপনার পিতার হস্ত ধরিয়া নাড়া দেন, আর দেশ দেশ করিয়া চিৎকার করেন, তাহারা আমাদের "স্বদেশী" কথাটীর মধ্যে পড়িতে পারেন না। যাহারা আমাদের পুরাতন সমাজকে ভেঙ্গেচুরে পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে গঠিত করিয়া তুলিতে চান, তাহারা আমাদের স্বদেশী আখ্যার মধ্যে আসিতে পারেন না।

এই আন্দোলনের পূর্ব্ব হইতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে স্বদেশীভাণ্ডার ইণ্ডিয়ানষ্টোর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯০৫ সাল হইতে তাহার ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু হায় দুর্ভাগ্যবশতঃ তার সে শ্রী রহিল না। ইহার পর কে বি সেনের, লক্ষ্মীরভাণ্ডার, কত ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইল। কত ছোট জামা কাপড়ের দোকান হ'ল সব আবার উঠেও গেল। সকলেরই মুখে এক কথা 'লোকে স্বদেশী দ্রব্য আর চাহে না।' লোকের আস্থাই নাই, কেমন করিয়া খাঁটি স্বদেশী দ্রব্যের ভাণ্ডার চলিবে! যাহারা

খাঁটি স্বদেশী দ্রব্য লইয়া ব্যবসা করিতেন তাঁহারাই এখন বিলাতী বিদেশী সংমিশ্রণে ব্যবসা করিতেছেন। সকলে স্বদেশী পণ ত্যাগ করিয়া আপনাদিগের সত্য ভঙ্গ করিয়াছেন, একমাত্র স্বদেশী পণ্যজীবী, 'শ্রমজীবি-সমবায়' আপনার সত্যের উপর নির্ভর করিয়া এখনও দেশের মুখ চাহিয়া আপনার আদর্শ ধরিয়া আছে। লক্ষ্য—স্বদেশী শ্রমজীবীর কষ্টের লাঘব করা। ইহাই স্বদেশী আন্দোলনের লক্ষ্য, ইহাই স্বদেশ-পূজার উপকরণ।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ধাতু-শিল্পের কারখানা *

একদিন আহিমাদ্রিকুমারিকা সমগ্রভারত শিল্পগৌরবে সমুন্নত ছিল। কিন্তু অধুনা জার্ম্মেণী আমেরিকা ভারতবাসীর নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যসম্ভারে তাহার অভাব মোচন করিতেছে। বর্ত্তমান কালে সমগ্রভারত ব্যাপিয়া জাগরণের একটা ব্যাকুলতা জাগিয়াছে। শিক্ষা প্রচার ও সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত ও অধঃপতিত ভারতশিল্প-বাণিজ্যের দিকে দেশীয় লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে; এবং স্থানে স্থানে তদনুযায়ী কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। ইহা ভারতের শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। ভারতের বিভিন্নপ্রদেশে এখনও যে সকল শিল্পী প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া য়ুরোপীয় পণ্যের প্রতিযোগিতায় অতি কষ্টে উদরান্নের সংস্থান করিতেছে, দেশীয় সমৃদ্ধ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করিতে হইবে। তাহারা যাহাতে উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্য্য চালাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া ভারতকে 'পর-পণ্যে ভরা তনু আপনার' কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগে ভারতের যে যে প্রদেশে ধাতব শিল্পের কারখানা আছে তাহার একখানি ছবি বঙ্গীয় পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১। কাশ্মীর

ভারতের সর্ব্বোত্তর অংশে কাশ্মীরই শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভারের জন্য প্রসিদ্ধ। ব্যবহারোপযোগী বহুবিধ পিত্তল-নির্ম্মিত দ্রব্য এখানে পাওয়া যায়। সকলগুলি সুন্দর কারুকার্য্য-সমন্বিত। একদা এখানে তাম্রনির্ম্মিত দ্রব্যাদির বিশেষ আদর ছিল। কিন্তু ইহাদের অঙ্গ-সৌষ্ঠব শীঘ্রই হীনতা এবং মলিনতা প্রাপ্ত হয় বলিয়া অধুনা কাশ্মীরে আর ইহাদের সেইরূপ আদর নাই। দেখা গিয়াছে, কাশ্মীর হইতে দূর দেশে প্রেরিত হইয়া তাম্রনির্ম্মিত দ্রব্যাদি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহার মলিনতা দূর করিবার জন্য acid ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে ইহার সৌন্দর্য্য ও মসৃণতা উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়।

খোদাই ও তক্ষণ শিল্পে কাশ্মীর শিল্পিগণ অতিশয় নিপুণ। পিতল এবং তামার উপরে লাক্ষা এবং তামার উপরে টিনের গিল্টী

* বাঁকিপুরের শিল্প-সম্মিলনে পঠিত প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

অতিশয় কুশলতার সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে।

২। পঞ্চনদ

পঞ্জাবের শিল্পজাত দ্রব্য তত প্রসিদ্ধ নহে। কিন্তু অধুনা রেওয়ারী, দীল্লি, পাণিপথ, অমৃতসহর, গুজরাণওয়ালা, লাহোর, লুধিয়ানা, জলন্ধর, পেশুয়ার ইত্যাদি স্থানে তামা, পিতল এবং কাঁসার কাজ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ব্যবহারোপযোগী সাধারণ দ্রব্যাদি এই সকল স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহারা সৌন্দর্য্য ও কারুশিল্পে অনুন্নত। পিতল, তামা ইত্যাদি উপাদান সকল য়ুরোপ হইতে আমদানি হইয়া থাকে। পূর্ব্বে কুলু পাহাড় এবং হিমালয়ের অন্যান্য অংশ হইতে তামা-দস্তা ইত্যাদি ধাতু সংগৃহীত হইত। কিন্তু অধুনা সে সকল ধাতু বিদেশ হইতে আমদানি হইতেছে, তাহা অতি সুলভ বলিয়া দেশীয় খনির কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

৩। হিন্দুস্থান

আগ্রা ও অযোধ্যা প্রদেশে বেনারস, মথুরা, মৃজাপুর, মোরাদাবাদ, লক্ষ্ণৌ এবং ফরক্কাবাদ বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। তন্মধ্যে প্রথম তিনটিতে হিন্দুদের এবং শেষোক্ত তিনটিতে মুসলমানদের বাণিজ্য চলিয়া থাকে। মৃজাপুরে এবং ফরক্কাবাদে গৃহ-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। অন্যান্য কেন্দ্রগুলিতে যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে কতকগুলি সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাহিরে সমাদর লাভ করিয়াছে।

বেনারসে নির্ম্মিত দ্রব্যাদি চারুশিল্প-সমন্বিত। ইহাদিগকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—

(১) যজ্ঞীয় পাত্রাদি, পিতল-নির্ম্মিত প্রতিমা, কাঁসর ঘণ্টা ইত্যাদি।

(২) খোদাই ও তক্ষণশিল্পযুক্ত থালা, পাত্র, লোটা ইত্যাদি।

(৩) য়ুরোপীয় দর্শকদের জন্য প্রতীচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পকলার অদ্ভুত সংমিশ্রণজাত এক প্রকার ছুরি, কাঁচি, র‍্যাকাবী ইত্যাদি।

মথুরায় তামা ও পিতলের ছোট ছোট হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। স্বর্ণকারগণ এই সকল প্রতিমা প্রস্তুত করে। এই সকল প্রতিমা অতি প্রাচীন কাল হইতে একই ছাঁচে প্রস্তুত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এই শিল্পে ভারতীয় শিল্পকলার সমাবেশ লক্ষিত হইয়া থাকে। এখানে 'বাসুদেব কাটোরা' নামক এক প্রকার জলপাত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশাগত তীর্থযাত্রিগণ এই সকল পাত্র আগ্রহের সহিত ক্রয় করিয়া থাকে। এই সকল পাত্রে, কংশভীত বাসুদেব রাত্রের সূচীভেদ্য অন্ধকারে সদ্যজাত শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া যমুনা অতিক্রম করিয়া গোকুলে গমন করিতেছেন, এই চিত্রটি খোদিত থাকে।

মোরাদাবাদে নানা প্রকার তৈজসপাত্রে অতি নিপুণতার সহিত লাক্ষা ও টিনের গিল্‌টী করা হইয়া থাকে। তার পরে তাহার উপরে বিবিধ কারুকার্য্য করা হইয়া থাকে।

লক্ষ্ণৌ একদা ইসলাম অলঙ্কার-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল; কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের পর হইতে ইহার শিল্পকলার অধঃপতন হইয়াছে। এখানে স্থানীয় ব্যবহারের জন্য

খাসদানি, পানদানি, বদনা, ডেকৃচী ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মৃজাপুরে হিন্দুদের ব্যবহার্য্য তৈজসপত্রাদি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথা লোটা, থালা, বটুয়া ইত্যাদি। ফরক্কাবাদে সাধারণতঃ মুসলমানদের ব্যবহারোপযোগী তৈজসাদি প্রস্তুত হয়। মথুরা ও হামিরপুরে যেরূপ ছোট ছোট হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রচুর পরিমাণে বিক্রী হইয়া থাকে ঝাঁসি ও ললিতপুরেও সেইরূপ পিতলনির্ম্মিত ছোট ছোট জীব-জন্তুর বাণিজ্য হইয়া থাকে।

পিতলের কাজের জন্য জয়পুর সমধিকপ্রসিদ্ধ। সর্ব্বপ্রকার শিল্পে জয়পুর, কাশী ও তাঞ্জোর হইতেও শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। স্থানীয় শিল্প-বিদ্যালয়ের যত্নে জয়পুর শিল্প-বিজ্ঞানে সমুন্নত হইয়াছে। জয়পুর রাজদরবার হইতে শিল্পিগণ উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়া থাকে।

৪। বঙ্গদেশ

বেনারস, মাদুরা, জয়পুর ইত্যাদির তুলনায় বঙ্গদেশ ধাতব শিল্পে দরিদ্র। বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর কাঁসার বাসন; নদীয়া, চট্টগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং সাহাবাদ কাঁসা ও পিতল; ছোটনাগপুর পিতল ও দস্তা এবং ঢাকা ও মৈমনসিংহ লৌহ ও পিতল নির্ম্মিত তৈজসপত্রাদির বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আবশ্যকীয় তৈজসপত্রাদি ব্যতীত কোন কোন স্থানে নানাবিধ খেলনা, তালা, চেন, দোয়াত ইত্যাদি দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৫। ব্রহ্মদেশ

ব্রহ্মগণ তাম্রনির্ম্মিত পাত্রাদি ব্যবহার করে না। আদমসুমারীতে দেখা গিয়াছে মাত্র ৬০ জন লোক তামার কাজ ও ব্যবসা করিয়া থাকে। পিতলনির্ম্মিত পাত্রাদিও এখানে তত বেশী ব্যবহৃত হয় না। পিতলকে ইহারা পবিত্র ধাতু মনে করে। ধর্ম্মমন্দির পেগোডায় ব্যবহারের জন্য পাত্রঘণ্টা বৌদ্ধমূর্ত্তি ইত্যাদি ধর্ম্মসূচক দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৬। মধ্যপ্রদেশ

মধ্যপ্রদেশেও আবশ্যকীয় গৃহ-ব্যবহার্য্য তৈজসাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। নাগপুর, ভণ্ডর, পাউনী ইত্যাদি স্থানে পিতল, কাঁসা এবং তামার সুন্দর সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথা লোটা, লণ্ঠন, দীপাধার, বাটী, ঘণ্টা ইত্যাদি। ব্রহ্মপুরী, চন্দ, চিখ্‌লী এবং মন্দর ইত্যাদি স্থানও শিল্পকার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

৭। দ্রাবিড়

আন্ধ্র প্রদেশে তামা ও পিতল ইত্যাদি ধাতুর সুন্দর সুন্দর জিনিস প্রস্তুত হইয়া থাকে। মাদুরা, তাঞ্জোর, নেলোর, ভিজিগাপত্তনে প্রচুর পরিমাণে চারুশিল্পসমন্বিত তৈজসপাত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ললিত-শিল্পকলার জন্য এক সময় দ্রাবিড় ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। মাদ্রাজ মিউজিয়মে ভিজিগাপত্তন হইতে সংগৃহীত অশ্ব-হস্তী-উষ্ট্রারূঢ় ছোট ছোট পুতুল অনেক আছে। এই সকল পুতুলে শিল্পচাতুর্য্যের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করা হইয়াছে।

ট্রাভাঙ্কোর রাজ্যে তামা ও পিতলের শিল্প সমধিক উন্নত। এতদঞ্চলে ধনী ও মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারে ট্রাভাঙ্কোরনির্ম্মিত তৈজস-পাত্রাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মাদুরায় পিতল নির্ম্মিত বিচিত্র খেলনাগুলি শিল্প-জগতে সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

তাঞ্জোর ধাতু-শিল্পের কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছে। তাঞ্জোর নির্ম্মিত শিল্পজাত দ্রব্য সমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

(১) তামা ও রূপার সংমিশ্রণ। ইহাদ্বারা আধুনিক রুচিমত জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। য়ুরোপীয়গণ ইহার সমধিক আদর করেন।

(২) পিতল ও তামার সংমিশ্রণ। ইহাদ্বারা বিবিধ ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাতে হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করা হয়।

(৩) খোদিত পিতলের জিনিষ।

৮। মহারাষ্ট্র

বোম্বে প্রেসিডেন্সীতে নাসিক, পুণা, আহমেদাবাদ, বোম্বে ধাতুশিল্পের প্রধান কেন্দ্রস্থল। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি স্থান আছে; সেগুলি বিশেষ এক একটি জিনিষের উৎকর্ষের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

পুণার ধাতু-শিল্প অত্যন্ত বর্দ্ধনশীল। কাঁসার এবং তাম্বটগণ পিতলের জিনিষ প্রস্তুত এবং বিক্রয় করে। কাঁসার ও তাম্বট ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ও ধাতুর কাজ করিয়া থাকে। জিন্‌গার জাতি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর সুন্দর পিতলের জিনিষ প্রস্তুত করে। তাহারা মুটা মতি প্রস্তুত করে; ঘড়ি ইত্যাদিতে গিল্‌টী করে, তালা প্রস্তুত করে; তরবারী ও ছুরী পরিষ্কার ও মসৃণ করে। পুণার নির্ম্মিত দ্রব্যাদি সাধারণত এই কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে :—

(১) রন্ধনশালায় ব্যবহারোপযোগী
(২) জল বহনাদির জন্য
(৩) পানদানি
(৪) বাদ্য-যন্ত্রাদি
(৫) মানদণ্ড
(৬) প্রদীপ
(৭) পূজার জন্য রেকাবী ও অন্যান্য জিনিষ
(৮) পুতুল ও প্রতিমা
(৯) মণিমুক্তাযুক্ত সৌখিন দ্রব্য
(১০) বেশভূষা করিবার উপাদান
(১১) ভোজনালয়ের উপযোগী পাত্রাদি
(১২) খেলনা
(১৩) বিবিধ জিনিষ

সমগ্র ভারতবর্ষে বোম্বাই ধাতু-শিল্পের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্রস্থল। বোম্বাই এবং আহমেদাবাদের উৎপন্ন ধাতু-শিল্পজাত দ্রব্যাদি সমগ্র পশ্চিম ভারতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বোম্বাই নগরে ৪০০০ চারি হাজার পিতল-ও-তাম্রকার এবং ৫০০০ পাঁচ হাজার কর্ম্মকারের বসতি। এখানে সকল প্রকার ধাতুর দ্বারা সকল প্রকার দ্রব্যাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পিতল অপেক্ষা German Silver এবং Aluminiumএর কারখানা অধিক লাভজনক বলিয়া আজকাল এই দুই ধাতু বোম্বের কারখানা-সমূহে অত্যধিক প্রচলন লাভ করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী।

মালবিকাগ্নিমিত্র *

"মালবিকাগ্নিমিত্র" মহাকবি কালিদাসের অন্যতম নাটক। "অভিজ্ঞান শকুন্তলের" ন্যায় বর্ত্তমানকালে এই কাব্যের তত সুদূর-ব্যাপ্ত প্রখ্যাতি নাই। এমন কি কোন কোন ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে ইহা আদৌ "মেঘদূতের" এবং "শকুন্তলের" কবির লিখিত নহে। আলোচ্য ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এই নাটকখান কালিদাসের লেখা বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছি। তবে এতৎসম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে কিছু প্রমাণ প্রয়োগও থাকিবে। "মালবিকাগ্নিমিত্র" পাঠ করিয়া কালিদাস ও তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে যে সকল ভাবিবার কথা মনে হয় তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বিষয়।

কালিদাসের অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থগুলির অমৃতরসাস্বাদ পাইয়াও তাঁহার কাব্য-পাঠকদের মনে সামান্য একটু অপরিতৃপ্তির ভাব থাকিয়া যায়। এ অপরিতৃপ্তির কারণ কিয়ৎ পরিমাণে, মহাকবি সম্বন্ধে কিছু জানিবার অনিবার্য্য কৌতূহল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক মহাকবিগণের জীবনী ও শিক্ষাদি সম্বন্ধে অনেক বিষয়ই পাঠকবর্গের বিদিত আছে বলিয়া তাঁহারা আধুনিক কবিগণের কাব্যরস সম্পূর্ণ উপভোগ করিয়া থাকেন। মহাকবি সেক্সপিয়রের ঠিক সম্পূর্ণ জীবনী জানা যায় নাই বলিয়া তাঁহার পাঠকবর্গের যথেষ্ট মনঃক্ষোভ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সেক্সপিয়রের কাব্যরসাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহার বাল্যজীবন, শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অবস্থার কার্য্যাবলী এবং তাঁহার মনোগঠনপ্রণালীর প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, এই সকল চেষ্টার ফলে নানারূপ অদ্ভুত তথ্য সকল আবিষ্কৃত হইতেছে। কেহ বলিতেছেন তিনি কিছুকাল মাংস-বিক্রেতা ছিলেন, কেহ বলেন তিনি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন; কেহ বা তাঁহার নাটকে আইনের কথার বাহুল্য দেখিয়া তাঁহাকে এটর্নির কেরাণী বলিতেছেন। কেহ বা তাঁহার শৈশব ও যৌবনের উদ্দাম চরিত্রের লম্পটতা আবিষ্কৃত করিতেছেন। সেক্সপিয়র ত সেদিনকার লোক তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত কতকটা জানা থাকা সত্ত্বেও তাহার সম্বন্ধে নানা জল্পনা চলিতেছে। বহু প্রাচীনকালের কবি কলিদাসের জীবনী সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই। তাঁহার সম্বন্ধে নানা প্রবাদ প্রচলিত আছে। এই প্রবাদ বাক্যটি, তাঁহার কাব্যাবলী ও অন্যান্য কাব্য হইতে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ সংগ্রহ দ্বারা তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানিবার চেষ্টাও বহুদিন হইতে চলিতেছে।

কালিদাস সম্বন্ধে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে জানিবার জন্য সকলের অত্যন্ত কৌতূহল হয় এবং ইহার পরিতৃপ্তির জন্য কাব্যশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে এবং সাধারণ পাঠকবর্গ মধ্যেও নানা গবেষণা চলিতেছে। সে তিনটি বিষয় সংক্ষেপতঃ এই—

* এই প্রবন্ধটি কলিকাতা সাহিত্য পরিষদের ১৩১৯ পৌষের অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল

(১) কালিদাসের সময় নিরূপণ। অর্থাৎ তিনি কোন্ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন এবং কোন্ দেশ জন্মপরিগ্রহ দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, ইহার নির্দ্দেশ।

(২) কোন্ কোন্ কাব্যগ্রন্থগুলি নিঃসংশয়িতভাবে কালিদাসের লিখিত এবং সেগুলির মধ্যে কোন্‌টির পর কোন্‌টি লেখা।

(৩) মহাকবির জীবনীসম্বন্ধে কিছু সবিশেষ বৃত্তান্ত (details) জানিবার চেষ্টা। যে কবির প্রতিভা এইরূপ মহামহিমাময়ী এবং সর্ব্বতোমুখিনী তাঁহার মানসিক শক্তি কিরূপে ক্রমশঃ স্ফুরিত হইল, তাঁহার শিক্ষা ও দীক্ষা কিরূপ, কি ভাবে তিনি কবিজীবন যাপন করিয়াছিলেন, এই সব বৃত্তান্ত জানিতে সত্যই সকলের মনে একটা কৌতূহল হয়। তাঁহার মনোগঠন-প্রণালীর ধারা জানিবার জন্য একটা বলবতী ইচ্ছা হয়।

এই কয়েকটি বিষয়ে বিশেষতঃ প্রথম দুইটি বিষয়ে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা এবং এদেশেরও বহু পণ্ডিতেরা অনেক ভাবিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন এবং তাঁহারা অনেক সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও সাধারণ পাঠকবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্ত হয় নাই, বিশেষতঃ তৃতীয় বিষয়টি সম্বন্ধে তত বেশী লেখা হয় নাই এবং এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে নানারূপ বিপরীত মত প্রচলিত হইয়াছে এবং কোন বহিঃপ্রমাণ বা আভ্যন্তরীণ প্রমাণ আজও নিঃসন্দিগ্ধ এবং অকাট্য বলিয়া গৃহীত হয় নাই। এইজন্য আমার মনে হয় এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া ভাবিবার এবং বলিবার অনেক কথা আছে। পাণ্ডিত্যপরিপূর্ণ গবেষণা করিবার আমার কোন ক্ষমতা নাই। সাধারণ পাঠকের পক্ষ হইতে কালিদাসের কাব্যগ্রন্থগুলি পড়িয়া, কিরূপ মনের ভাব হয় এবং এই বিভিন্ন বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রত্যেক কাব্যগ্রন্থ হইতে কি কি বিষয় বলা যায় ইহা স্থির করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্প্রতি "মালবিকাগ্নিমিত্র" অবলম্বন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। কিছুদিন পূর্ব্বে অন্যত্র আমি "বিক্রমোর্ব্বশী" সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা করিয়াছিলাম। প্রসঙ্গ ক্রমে "বিক্রমোর্ব্বশী" সম্বন্ধেও দু'এক কথা বিশেষ ভাবে বলিব। বলা বাহুল্য কালিদাসের অন্য কাব্য-গ্রন্থগুলিই আমার বিশেষ অবলম্বন। আভ্যন্তরীণ প্রমাণের উপরই আমি অত্যন্ত নির্ভর করিয়াছি। অন্য বহিঃপ্রমাণ সম্বন্ধে আমার বলিবার বিশেষ কিছু নাই।

বর্ত্তমান কালে প্রায় অবিসংবাদিতরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে কালিদাস, "অভিজ্ঞানশকুন্তল" "বিক্রমোর্ব্বশী" এবং "মালবিকাগ্নিমিত্র" এই তিনখানি নাটক লিখিয়াছেন এবং "ঋতুসংহার", "মেঘদূত", "কুমার-সম্ভব" এবং "রঘুবংশ" এই চারিখানি খণ্ডকাব্য এবং মহাকাব্য লিখিয়াছেন। কালিদাসের রচিত অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। যতদিন না সেগুলি সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় ততদিন সেগুলি অন্যের লেখা বলিয়াই প্রচলিত থাকিবে। উপরে যে সাতখানি কাব্যের উল্লেখ করিলাম তন্মধ্যে "মালবিকাগ্নিমিত্র" "বিক্রমোর্ব্বশী" সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ মধ্যে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব

যে "মালবিকাগ্নিমিত্র"ও কালিদাসের মহীয়সী প্রতিভার অভ্রান্তলক্ষণোপেত। এক্ষণে দেখা যাউক "মালবিকাগ্নিমিত্র" পড়িয়া পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটি বিষয়ে কি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়।

প্রথম বিষয়টি অর্থাৎ কালিদাসের সময় নিরূপণ ব্যাপার অত্যন্ত প্রমাণজটিল হইয়া পড়িয়াছে। এ বিষয়ে অনেক তর্ক-প্রমাণাদি প্রযুক্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন বিপরীত মত এ বিষয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল কালিদাসের কাব্যের মধ্যস্থিত আভ্যন্তরীণ প্রমাণে ইহার সম্পূর্ণ মীমাংসা একরূপ অসম্ভব। বহিঃপ্রমাণের উপর এ বিষয়ে বিশেষ নির্ভর করিতে হইবে এবং কালিদাসের কাব্যের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ এ বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্যকারী হইবে। এইজন্য অতি সংক্ষেপেই এ সময় নিরূপণ ব্যাপার কথার শেষ করিব। যে সকল যুক্তি তর্ক হইয়া গিয়াছে তাহার আর পুনরালোচনা করিব না। যতদূর প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এক রকম স্থির হইয়াছে যে, কালিদাস খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে অথবা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। কেহ কেহ এরূপ বলেন যে ইহা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীতেই বর্ত্তমান ছিলেন। পূর্ব্বে নানা পণ্ডিতের নানা মত ছিল এবং কালিদাসের কাল খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে ১৪শ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইতেছিল। যাঁহারা কালিদাসকে বহু প্রাচীন করিতে চান, তাঁহারা ষষ্ঠ শতাব্দীর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নন এবং তাঁহারা অন্য প্রমাণ সংগ্রহে প্রয়াসী। যেমন "তিমিঙ্গিগিলোঽপ্যস্তি তদ্গিলোঽপ্যস্তি লক্ষ্মণ" সেইরূপ এক পক্ষের প্রমাণ তিমির, বিপরীত পক্ষে প্রমাণ তিমিঙ্গিল দৃষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ একটি কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব। অশ্বঘোষ নামক প্রাচীন বৌদ্ধ কবি "বুদ্ধচরিত" নামক একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থ বৌদ্ধদের নিকট মহাপূজ্য ধর্ম্মগ্রন্থও বটে। পণ্ডিতেরা চীন ভাষায় এবং ইংরাজী ভাষায় ইহার অনুবাদ দেখিয়া স্থির করিয়াছেন তিনি কোন কোন বর্ণনায় পঞ্চম শতাব্দীতে অথবা ইহারও বহু পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। অধ্যাপক কাওয়েল মহোদয় বলেন যে এই কাব্যের সহিত কালিদাসের কোন কোন কাব্যের বর্ণনার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে এবং কালিদাস অশ্বঘোষের অনেক ভাব ও ভাষা নিজস্ব করিয়া তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে সম্প্রসারিত ও সুবিকশিত করিয়া নিজের কাব্যের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিয়াছেন। আমি আমার নিজের ক্ষুদ্র যুক্তিবলে এইটুকু স্থির করিয়াছি কালিদাস তাঁহার ভাব ও ভাষার জন্য কেবলমাত্র রামায়ণের নিকট ঋণী এবং কিয়ৎ পরিমাণে মহাভারতের নিকট ঋণী—অশ্বঘোষের নিকট আদৌ ঋণী নহেন। এ বিষয়ে দু' একটি প্রবন্ধও লিখিয়াছি। অশ্বঘোষের সহিত সাদৃশ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, কাওয়েল মহোদয় যে সাদৃশ্য দেখিয়াছেন তাহা আদৌ সাদৃশ্য নহে এবং যদি কালিদাস অশ্বঘোষের অপূর্ব্ব ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতেন, তাঁহার কাব্যে নিশ্চয়ই বৌদ্ধধর্ম্মের কিছু প্রভাব কিছু ছায়া অবশ্য পরিলক্ষিত হইত।

কালিদাসের সমগ্র কাব্যগুলিতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের কোনরূপ প্রভাব নাই এবং এই আলোচ্যমান নাটকে পণ্ডিতা কৌশিকী বলিয়া যে পরিব্রাজিকার চিত্র আছে, তিনি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা হইলেও আদৌ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিনী নহেন। এ বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ এই নাটক মধ্যেই আছে। পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি। কাওয়েল সাহেবের মত শুধু সহজে খণ্ডনীয় এরূপ নয়, পক্ষান্তরে এরূপ প্রমাণ কিছু কিছু পাওয়া যাইতেছে যে বৌদ্ধ মহাকবিই কালিদাস পড়িয়াছেন এবং দুই একস্থানে কালিদাসের কাব্যগ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। মোটের উপর ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, কালিদাসের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে আজও পর্য্যন্ত একেবারে অভ্রান্ত সত্যে উপনীত হওয়া যায় নাই এবং এখনো এ সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা বলা যাইতে পারে। "মালবিকাগ্নিমিত্রের" মধ্যে ভাস ও সৌমিল্ল-নামক দু'জন কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী নাটককারের উল্লেখ আছে। ইঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। ইঁহাদের সঠিক পরিচয় পাওয়া গেলে কালিদাসের সময় সম্বন্ধে অনেকটা মীমাংসা হইতে পারে। এই নাটক মধ্যে একটা যবনবিজয়ের উল্লেখ আছে। এরূপ যবনবিজয় অনেকবার হইয়াছিল। অগ্নিমিত্র একজন ঐতিহাসিক রাজা। তাঁহার সময়ে বাস্তবিক এইরূপ যবনবিজয় হইয়াছিল কি না এ বিষয়েও অনুসন্ধান আবশ্যক। শর্ম্মিষ্ঠা প্রণীত একখানি নাটকের উল্লেখ, বৈদ্যশাস্ত্রের একজন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতের উল্লেখ, নানা বিষয়ে সভ্যতার উচ্চবিকাশের কথা এই নাটকে আছে। এই নাটকে বিশেষভাবে বৈদ্যশাস্ত্রের প্রতি অত্যাদর প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং কতকগুলি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের তত্ত্ব-কথার উল্লেখ আছে। প্রবাদ-কথিত ধন্বন্তরীর সহিত বন্ধুতা নিতান্ত অগ্রাহ্য করিবার বিষয় নহে। আমার মনে হয় কালিদাসের অন্য কাব্যগ্রন্থ অপেক্ষা এই কাব্যেই কালিদাসের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অনেক আভ্যন্তরীণ প্রমাণ পাওয়া যাইবে। পুষ্পমিত্র ও অগ্নিমিত্রের উল্লেখ থাকাতে এ কথা সঠিক বলা যায় যে কালিদাস খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে বর্ত্তমান ছিলেন। প্রাচীন ইতিহাস অনুসারে এই রাজারা খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। মেঘদূতের দিঙ্‌নাগ পণ্ডিত ও নিচোলের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেলে এই কাব্যের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ আরও সুদৃঢ় বলিয়া বিবেচিত হইবে। আপাততঃ এইটুকু পাওয়া যাইতেছে যে কালিদাস খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে কিম্বা তাহার পরে—আগে নহে—বর্ত্তমান ছিলেন। এ বিষয়ে এক্ষণে আমার অধিক আর বলিবার নাই। অন্য দু'টি বিষয় সম্বন্ধে এক্ষণে আলোচনা করিতেছি।

প্রথমেই "মালবিকাগ্নিমিত্রের" উপাখ্যান অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। কেবল এই গল্পটি হইতেই কোন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। গল্পটিও অতি মনোহর, উপন্যাসময়।

নাটকের উপাখ্যান এই—

নাটকের নায়ক অগ্নিমিত্র বিদিশা প্রদেশের রাজা। তাঁহার প্রধানা মহিষী দেবী ধারিণী

এবং কনিষ্ঠা মহিষী রাণী ইরাবতী। নাটকের নায়িকা মালবিকা বিধিনিয়োগে পরিচারিকারূপে দেবী ধারিণীর হস্তে ন্যস্তা। তিনি মালবিকাকে নাট্যাদি শিল্পকলায় নিপুণা দেখিয়া তাঁহাকে নিজের নাট্যাচার্য্য গণদাসের নিকট নাট্যাভিনয় ও সঙ্গীত-শাস্ত্র চর্চ্চার জন্য অর্পণ করিয়াছিলেন। একদিন রাজা এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী বিদূষী কুমারীর চিত্রলিখিত প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া দেবী ধারিণীকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ধারিণী রাজাকে অন্য কথা পাড়িয়া অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টা করিলেন, পাছে রাজা এই চিত্রলিখিত কন্যাকার প্রতি অনুরক্ত হন। রাজাও এই পরমসুন্দরী কুমারীর পরিচয় জানিবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেবীর বালিকা কন্যা কুমারী বসুলক্ষ্মী বলিয়া দিলেন চিত্রলিখিত কন্যার নাম মালবিকা। রাজার যেন চিত্রদর্শনেই প্রণয়সঞ্চার হইল। তিনি বিদূষকের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন কি উপায়ে এই কন্যাকার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করা যায়। সেকালের রাজারা স্বেচ্ছাচার ছিলেন না। অন্তঃপুর মধ্যে রাজা অপেক্ষা অন্তঃপুরবাসিনী মহিষীদেরই প্রবল আধিপত্য ছিল। রাজারা শিষ্টাচারবশতঃ এবং মহিষীদের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁহাদের অন্তঃপুর-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না। রাণীরাও অত্যন্ত সুশিক্ষিতা এবং উপযুক্তা বলিয়া অন্তঃপুর-শাসনে সম্পূর্ণ সমর্থা ছিলেন। রাজশক্তিপ্রয়োগে অথবা রাণীরা অনুরোধ করিলেও এই মালবিকার দর্শন সুলভ হইত না। কাজে কাজেই রাজাকে বিদূষকের কৌশলে নির্ভর করিতে হইল। বিদূষক কৌশলে রাজার নাট্যাচার্য্য হরদত্ত এবং দেবীর নাট্যাচার্য্য গণদাসের সঙ্গে তাঁহাদের পরস্পরের গুণ ও যোগ্যতা সম্বন্ধে বিবাদ বাধাইয়া দিলেন এবং অবশেষে গণদাস রাজা ও রাণী এবং পণ্ডিতা কৌশিকী নাম্নী রাজান্তঃপুরে স্থিতা মাননীয়া সন্ন্যাসিনীর সমক্ষে স্বীয় শিষ্যা মালবিকার অভিনয়ক্রিয়া দেখাইয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিলেন। যতিবেশধারিণী ব্রাহ্মণকন্যা কৌশিকীই এই অভিনয়-কার্য্য সম্বন্ধে উভয়ের গুণের বিচার করিলেন। রাজার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কিন্তু তিনি এক্ষণে মালবিকাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া তাঁহার প্রণয়লাভের জন্য অধীর হইয়া পড়িলেন। বিদূষক উভয়ের মিলনের জন্য পুনরায় সহায় হইলেন। তিনি মালবিকার প্রিয়সখী বকুলাবলিকাকে রাজার মানসিক অবস্থা এবং অভিলাষ জানাইলেন। মালবিকারও প্রণয়বিকারপ্রাপ্ত অবস্থা। ঘটনাক্রমে দেবী ধারিণী মালবিকাকে রক্তাশোকবৃক্ষের পুষ্পোদামের জন্য দোহদসাধন করিতে বলিলেন। সেকালের লোকের বিশ্বাস ছিল প্রমদাগণের চরণতাড়িত না হইলে অশোকবৃক্ষের কুসুমোদ্গম হয় না। দেবী ধারিণীরই কর্ত্তব্য ছিল—নববসন্ত-সমাগমে অলক্তাদি ভূষিত সনূপুর-চরণতাড়নে তপনীয় অশোকের দোহদসাধন করা। বিদূষকের কোনরূপ চপলতাবশতঃ দেবী দোলা হইতে পড়িয়া গিয়া চরণে আহত হইয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি মালবিকাকে এই অশোকবৃক্ষে অলক্তরঞ্জিত চরণতাড়ন-ব্যাপারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। মাল-

বিকার প্রিয়সখী অশোকবৃক্ষের সন্নিধানেই নূপুর ও অলক্তকাদি পরাইতেছিলেন। হঠাৎ রাজা ও বিদূষক সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং অন্তরালে থাকিয়া এই দোহদব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা মালবিকাকে দেখা দিলেন এবং তাঁহাকে একটু অপ্রস্তুত করিয়াই নিজের মনোভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। ঠিক এমনি সময়েই কনিষ্ঠা রাণী ইরাবতী আসিয়া সেখানে উপস্থিত। সকলেই শশব্যস্ত। সাধের প্রণয়-সম্ভাষণে মহাবাধা পড়িয়া গেল। মালবিকা এবং তাঁহার সখী একটু কৈফিয়ত দিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। ইরাবতী রাজাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন; রাজার অনুনয়-বিনয়েও প্রসন্না হইলেন না, এমন কি প্রস্থানকালে রাজাকে প্রহার করিতেও যেন উদ্যতা হইলেন। তার পর রোষবেগে প্রস্থান করিলেন। রাজা ও বিদূষক পুনরায় মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, তার পর কি কর্ত্তব্য।

এ দিকে দেবী ইরাবতী মহাদেবী ধারিণীকে রাজা ও মালবিকা-সংক্রান্ত বিষয় অবগত করাইলেন ইহার ফলে মালবিকা সখীর সহিত অন্তঃপুরের পাতাল-গৃহে অবরুদ্ধা হইলেন। বিদূষক এবারও ইহাঁদের উদ্ধারের উপায় করিলেন। এক নূতন বুদ্ধির উদ্ভাবন করিয়া রাজাকে আশ্বাস দিয়া ক্ষণকালের জন্য তিরোহিত হইলেন। রাজা চরণপীড়িতা দেবী ধারিণীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। এমন সময় হঠাৎ বিদূষক সেখানে গিয়া উপস্থিত। তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ যজ্ঞোপবীতে জড়ান। মহাসম্রমের সহিত তিনি সর্ব্বসমক্ষে বলিতে লাগিলেন, "আমায় পরিত্রাণ করুন; সর্পে আমায় দংশন করিয়াছে।" রাজা ও রাজ্ঞী এবং পরিব্রাজিকা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বিদূষকের প্রাণ বাঁচাইবার উপায় করিতে লাগিলেন। রাজা ধ্রুবসিদ্ধি নামক বৈদ্যরাজকে ডাকাইলেন এবং বিদূষককে তাঁহার চিকিৎসাধীন করিয়া দিলেন। তিনি বিধান দিলেন একটি সর্প-মুদ্রিকার আবশ্যক। রাণীর অঙ্গুরীয়কে সর্পমুদ্রিকা ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা খুলিয়া দিলেন। এই গৌতমনামধারী বিদূষকের সর্পদংশন ছল মাত্র। তিনি সর্পমুদ্রাযুক্ত দেবীর অঙ্গুরী লইয়া পাতাল-গৃহের দ্বাররক্ষিকাকে নিদর্শন দেখাইয়া মালবিকা এবং তাঁহার সখীর উদ্ধারসাধন করিলেন। রাজা এই বার্ত্তা পাইয়া "সমুদ্রভবন"নামক রাজপ্রাসাদে গেলেন। সেখানে বিদূষক মালবিকাকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। এইখানে রাজার সহিত মালবিকার মিলন হইল। কিন্তু এবারও মিলনে বাধা। পুনরায় সখীসমেতা ইরাবতী সেখানে উপস্থিত। তুমুল ব্যাপারের আয়োজন হইল। কিন্তু এমন সময়ে জয়সেনা-নাম্নী প্রতিহারিণী খবর দিল যে কুমারী বসু-লক্ষ্মী একটা পিঙ্গল বানর প্রত্যাড়িতা হইয়া অজ্ঞান হইয়াছেন এবং দেবী ধারিণী তাঁহাকে কোলে করিয়া তাঁর সংজ্ঞালাভের চেষ্টা করিতেছেন। সকলেই কুমারীকে দেখিতে গেলেন। এইরূপে এবারকার বিষম প্রণয়বাধা সহজে নিরাকৃত হইল।

দোহদের পাচ দিনের মধ্যে অশোকবৃক্ষে কুসুমোদ্গম হইল। দেবী ধারিণী মালবিকাকে বলিয়াছিলেন যদি পাঁচ দিনের মধ্যে তপনীয়

অশোকের কুসুম প্রস্ফুটিত হয়, তাহা হইলে তিনি মালবিকার মনোরথ পূর্ণ করিবেন। মালবিকার কি মনোরথ তাহা দেবী ধারিণী জানিতেন কি না সন্দেহ। তথাপি তাঁহার ও রাজার আশাবৃক্ষের কুসুম শীঘ্রই মুকুলিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। দেবী ধারিণী মালবিকা প্রভৃতি পরিজনের সঙ্গে অশোকতরুর নিকট নবপুষ্পোদ্গম দেখিতে গেলেন। তাঁহার অনুরোধে রাজাও সেখানে গেলেন। এদিকে খবর আসিল ধারিণীর ভ্রাতা বীরসেন প্রভৃতি দণ্ডাধ্যক্ষেরা বিদর্ভরাজ যজ্ঞসেনকে পরাজয় করিয়া বিদর্ভের প্রকৃত রাজা মাধব সেনকে কারামুক্ত করিয়াছেন এবং দুটি শিল্পদারিকা এবং নানাবিধ উপঢৌকন দূতের সহিত অগ্নিমিত্রের নিকট পাঠাইয়াছেন। রাজা ও দেবী অশোকতরুর কুসুম-শোভা দেখিতেছেন এমন সময় শিল্পদারিকাদ্বয় তাঁহার সমীপে প্রেরিতা হইল। তাঁহারা রাজা ও রাণীকে অভিবাদন করিলেন এবং পণ্ডিতা কৌশিকী ও মালবিকাকে দেখিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে পরস্পরের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। এই রমণীরা মাধবসেনের অন্তঃপুরচারিণী—আর এই মালবিকা রাজ-কুমারী এবং মাধবসেনের ভগিনী। পণ্ডিতা কৌশিকী মাধবসেনের মন্ত্রী সুমতির ভগিনী। রাজা ও ধারিণী এই পরিচয় পাইয়া পরম বিস্মিত হইলেন। কৌশিকী এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন। মাধবসেন তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা যজ্ঞসেন কর্তৃক কারারুদ্ধ হইয়া রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। মন্ত্রী সুমতি স্বীয় ভগিনী ও মালবিকাকে লইয়া গোপনে বিদিশা যাইতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল মালবিকাকে অগ্নিমিত্রের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। পথে এক দস্যুদলের সহিত সংঘর্ষ হওয়ায় সুমতি যুদ্ধে প্রাণ হারান। মালবিকা দস্যু-হস্ত হইতে প্রদেশের অন্যপথে বীরসেনের হাতে পড়েন। বীরসেন স্বীয় ভগিনী ধারিণীকে এই কন্যারত্ন প্রদান করেন। কৌশিকী ভ্রাতার সংকার করিয়া বিদিশায় আসেন এবং সন্ন্যাসিনী হন এবং রাজবাড়ীতে আশ্রয় পান। তদবধি মালবিকার পরিচারিকা-বৃত্তি। পণ্ডিতা কৌশিকী মালবিকাকে দেখিয়াও তাঁহার পরিচয় কাহাকেও দেন নাই। একজন সন্ন্যাসী সিদ্ধপুরুষ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন "এই কন্যকা এক বৎসর পরিচারিকা-বৃত্তি করিয়া সদৃশভর্ত্তৃগামিনী হইবেন।" সেই জন্য এই প্রতীক্ষা। সকলে শুনিয়া পরম প্রীত হইলেন। এদিকে রাজার পিতা পুষ্পমিত্র রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া কুমার বসুমিত্রকে অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত করেন। কুমার যবন-সেনা বিজয় করিয়া অশ্ব উদ্ধার করেন। এ বার্ত্তাও অগ্নিমিত্র সমীপে প্রেরিত হইল। রাজান্তঃপুরে আনন্দের সীমা নাই। পরে দেবী ধারিণী স্বয়ং উদ্যোগিনী হইয়া রাজাকে মালবিকার সহিত ধর্ম্মপরিণীত করিলেন। অনেক দুঃখ ও বাধার পর রাজা ও মালবিকার অপূর্ব্ব মিলন সাধিত হইল।

ইহাই নাটকের সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান। এই উপাখ্যানের সহিত কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশ আছে বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু যেমন পূর্ব্বে বলিয়াছি অগ্নিমিত্র এবং পুষ্পমিত্র ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা। তাহা হইলেও এই নাটকখানি সেক্সপিয়রের ইংলণ্ডীয় ইতিহাস

সম্পর্কিত নাটকগুলি কিম্বা "জুলিয়স্ সিজরে"র ন্যায় ঐতিহাসিক নাটক নয়। ইহা সেক্সপিয়রের "সিম্বেলিন" কিংবা "উইণ্টার্স টেলের" ন্যায় মনোরম উপন্যাসময় নাটক। ঐতিহাসিক ঘটনার মত দুটি ঘটনার সমাবেশ অর্থাৎ বিদর্ভজয় করিয়া মাধব সেনের উদ্ধার এবং যবন-বিজয়। ইহার উদ্দেশ্য নাটকের মনোহারিত্ব বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং মালবিকার গৌরববৃদ্ধির জন্য। মালবিকার মত রূপগুণযুক্তা কুমারী পরিচারিকা হইতে পারে না এবং তিনিও ধারিণীর ন্যায় রাজকুল-কুমারী, এই ঘটনা প্রকটিত করিবার জন্য ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশ একটি সুমহৎ কাব্যকৌশল। এই মনোহারিত্ব সৃষ্টি করিবার আর একটি উদ্দেশ্য আছে। কবি ইহার দ্বারা রাজার রাজচরিত্র অক্ষুন্ন রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি শুধু অন্তঃপুরের প্রণয়-ব্যাপারেই লিপ্ত নহেন, তিনি সমরকুশল, বীরপুরুষ ও প্রধান মন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদ অপেক্ষাও রাজনীতিকুশল। তিনি লোকোত্তর-চরিত। কখনও কুসুমের ন্যায় মৃদু কখনও বজ্রকঠোর। দুষ্যন্ত এবং পুরুরবার চরিত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও তাঁহাদের সকলেই এই ভাবটি বিদ্যমান ছিল। পণ্ডিতা কৌশিকীর চরিত্র অঙ্কনের উদ্দেশ্য মালবিকার চিত্র বিশেষভাবে স্ফুটিত করিবার জন্য। মালবিকার পিতৃরাজ্যে এইরূপ পণ্ডিতা ব্রাহ্মণরমণীর জন্ম এবং শিক্ষা। তিনি বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা ছিলেন না তাহা দেখাইতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কালিদাসের কোন কাব্যেই বৌদ্ধ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না এবং এ কাব্যের পরিব্রাজিকা বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা নহেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই। তিনি মালবিকার পিতৃরাজ্যের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী সুমতির ভগিনী, সম্ভবতঃ তিনি বিধবা ছিলেন। একটা পাঠান্তর হইতে এইরূপ মনে হয়। দস্যুহস্তে পড়িয়া ভ্রাতার মৃত্যুর পর তাঁহার অগ্নিসংকার করিয়া তিনি বিদিশায় গেলেন এবং কাষায় গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ সন্ন্যাস বা যতিব্রত ধারণ করিলেন। তাঁহার এই কাষায়-গ্রহণের ইতিহাস শুনিয়া রাজা বলিলেন "যুক্তঃ সজ্জনস্যৈষঃ পন্থা।" রাজা পরম হিন্দু এবং দেবদেবীতে বিশ্বাসবান্। তিনি পুত্রের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্য সুবর্ণাদি দান করিয়াছিলেন। তিনি একটা সাধারণ সত্য বলিলেন যে সজ্জনের এই পথ। পরিব্রজ্যা অবলম্বনের অর্থ চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করা। পণ্ডিতা কৌশিকী বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা হইলে তিনি অন্ততঃ একবারও ভগবান্ বুদ্ধের নাম করিতেন। পরিব্রাজিকার পরিচারিকার নাম সমাহিতিকা। ইহাও বৌদ্ধ নাম নয়, হিন্দু নাম; সন্ন্যাসিনীর পরিচারিকার উপযুক্ত নাম। 'সমাহিত' ও 'সমাধি' এই দুইটি শব্দ কালিদাসের অতি প্রিয়। ভগবান্ পিনাকপাণির সমাধির কথা তিনি হয় ত নিজের ধর্ম্মবিশ্বাসের অন্তর্গত করিয়াছিলেন। এই নাটকের পাত্র-পাত্রীদের নামগুলি বড় সুন্দর এবং কবিতাময়। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা কেন পণ্ডিতা কৌশিকীকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বিনী বলেন তাহা আমার বোধগম্য নয়। বোধ হয় পরিব্রাজিকা এই কথাতেই তাঁহারা ভ্রমে পড়িয়াছেন। কালিদাসের কাব্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবের অভাব হইতে আর

একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তাঁহার সময়ে অন্ততঃ তিনি যে প্রদেশে ছিলেন সেই সময়ে এবং সেই দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল এবং তাহার পরিবর্ত্তে পরমরমণীয় মহা উদার এক অপূর্ব্ব শৈব-ধর্ম্ম লোকের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। "কুমারসম্ভবে" তিনি স্বীয় ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার অন্যান্য কাব্যেও তাঁহার অভীষ্টদেবের মহাপ্রভাবের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উপমাতেও ভগবান্ দেবাদিদেবের সহিত তাঁহার শ্রেষ্ঠ বীর রাজাদের তুলনা করিতেন। শকুন্তলের দুষ্যন্তকে তিনি বলিয়াছেন "মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্"। রঘুতে আছে—

"মহেন্দ্রমাস্থায় মহোক্ষরূপং
যঃ সংযতি প্রাপ্তঃ পিনাকিলীলঃ॥"

এই মহাকাব্যেও হরগৌরীসম্বন্ধীয় একটি উপমা আছে। কবির মজ্জায় মজ্জায় এই শৈবধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছিল এবং তিনি ইহার বাহ্য প্রকাশে অত্যন্ত আনন্দলাভ করিতেন। বাল্মীকির রামায়ণ কালিদাসের বড় প্রিয় বস্তু ছিল। তিনি এই মহাকাব্য হইতেও পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের মহিমাময় ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহারা বিশুদ্ধরূপে কালিদাসের সময় নিরূপণ করিতে চান তাঁহাদের এমন একটি ঐতিহাসিক সময় বাহির করিতে হইবে যে সময়ে উজ্জয়িনীতে এবং উত্তর ভারতবর্ষে এইরূপ উদার রমণীয় শৈবধর্ম্ম বর্ত্তমান ছিল। "মালবিকাতে" এই শৈবমতের তত বেশী উল্লেখ নাই। ইহা তাঁহার প্রথম বয়সের লেখা। তাঁহার হৃদয়ে এই উদার ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ হইতেছিল এবং মালবিকাতে ইহার ক্ষীণ রেখা মাত্র দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান এই গ্রন্থে অত্যন্ত অধিক পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব প্রাচীন ইতিহাসের কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিল তাহাও পণ্ডিতগণের অনুধাবনীয়। "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকে সমসাময়িক সভ্যতার ছায়া অত্যন্ত অধিক পড়িয়াছে ; এত স্পষ্ট এবং সমধিক বর্ণনা তাঁহার অন্য কোন কাব্যে নাই। এই সভ্যতার কালনিরূপণও সম্ভবপর হইতে পারে।

কালিদাসের এই নাটকের সহিত তাঁহার অন্য দু'খানি নাটকের একই একসূত্রতা এবং একপ্রাণতা আছে। তাহা হইতে একই নিপুণ হস্তের চিত্রাঙ্কণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এরূপ সাদৃশ্য সেক্সপিয়রের "জুলিয়াস্ সিজরে" এবং "হ্যামলেটে" আছে এবং "মারচেণ্ট অব্ ভিনিস", ও "এজ ইউ লাইক ইটে" আছে। উপাখ্যানের অভ্যন্তরেই এই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। শকুন্তলের অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়কের ন্যায় "মালবিকাতে" সর্পমণি অঙ্গুরীয়কের কথা আছে। "বিক্রমোর্ব্বশীতেও সঙ্গমমণির উল্লেখ আছে। এই মণি অথবা অঙ্গুরীয়কের সাহায্যে নাটকীয় বস্তুর একটি প্রধান কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। রাজা ও নায়িকাদের প্রণয়ব্যাপারে এবং বিদূষকের হাস্য-পরিহাসে ও কার্য্যকলাপেও একটা সবিশেষ সাদৃশ্য আছে। তবে প্রভেদ এই যে একটিতে অপূর্ব্ব প্রতিভার প্রথম বয়সের চিত্রাঙ্কণ, অপরগুলিতে পরিণত বয়সের নিপুণতর হস্তের চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। তিনখানি নাটকেই প্রণয়িগণের এক পক্ষের অন্তরালে

থাকিয়া অপরপক্ষের প্রণয়ব্যথিত হৃদয়-বৃত্তান্ত অবগত হইবার বিবরণ আছে। প্রণয়ে পুনঃ পুনঃ বাধা এবং বাধার অতিক্রম তিনখানি নাটকে বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আরো অনেক সাদৃশ্য আছে। সবগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রতিভাশালী মহাকবির মনে যে সকল মহৎ ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার ক্রমবিকাশের একটা ইতিহাস এই তিনখানি নাটকে এবং অন্যান্য কাব্যে পাওয়া যায়। নায়ক ও নায়িকাদের প্রণয়ব্যাপারের সম্বন্ধে সাদৃশ্য ও বৈষম্যের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। "মালবিকাতে" কেবলমাত্র চিত্রদর্শনেই রাজার প্রথম প্রণয়োন্মেষ। "বিক্রমে" রাজার প্রথম দর্শনে এবং রথাবস্থানকালে অঙ্গস্পর্শে। "শকুন্তলে"ও প্রথম দর্শনে প্রণয়সঞ্চার, কিন্তু তাহা ক্রমশঃ বিকশিত হইয়াছিল এবং অত্যন্ত সংযত ভাবে। দুষ্মন্ত নিজের মনকে পরীক্ষা করিতেছিলেন এবং শকুন্তলা ঋষিকন্যা হইলেও অপ্সরসম্ভবা ও গ্রহণীয়া বলিয়া ক্রমে তাঁহার প্রতি প্রণয়াকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মালবিকার প্রণয়লাভের জন্য রাজা বিদূষককে নিয়োজিত করিলেন এবং বিদূষক মালবিকার সখীর শরণাপন্ন হইলেন। অন্য দু'খানি নাটকে প্রণয়ের বাধা অন্য প্রকারের এবং বাধা এক প্রকার অনতিক্রমণীয় ছিল। দৈব তাহাতে সহায় হইল। "মালবিকাতে" রাজার কামপ্রবণ অত্যন্ত বেশী। রাজা বয়সে প্রৌঢ় কিন্তু তাঁহার প্রণয়ের ভাব উদ্দাম প্রকৃতির। মালবিকা যখন নাট্যশালায় সজ্জাগৃহে প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন প্রণয়িনীদর্শনোৎসুক রাজার চক্ষু যবনিকা ছিন্ন করিতে চাহিতেছিল। রাজার মুখে রাজার রূপ-বর্ণনা উদ্দাম প্রণয়ের লক্ষণোপেত। "তন্বীশ্যামা শিখরীদশনা"র সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও এ বর্ণনা অত্যন্ত লালসা-বিজড়িত। মালবিকা ললিত কলায় নিপুণা বলিয়া রাজা বলিতেছেন—

"অব্যাজসুন্দরীং তাং বিজ্ঞানেন
ললিতেন যোজয়তা।
উপকল্পিতো বিধাত্রা বাণঃ কামস্য
বিষদিগ্ধঃ॥"

তারপর রাজা বলিয়া ফেলিলেন :—

"সর্ব্বান্তঃপুরবনিতাব্যাপারং
প্রতিনিবৃত্তহৃদয়স্য॥"
সা বামলোচনা মে স্নেহস্যৈকায়তনীভূতা।

তিনি রাজ্ঞীদের প্রেম পরিত্যাগ করিয়া একেবারে মালবিকাগতহৃদয় হইয়া পড়িলেন। সখীসমেতা শকুন্তলার প্রথম দর্শনে রাজা দুষ্মন্ত বলিয়াছিলেন :—"অহো মধুরমাসাং দর্শনং,"—

"শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো
যদি জনস্য।
দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥"

ইহা কেবল সৌন্দর্য্যের প্রশংসা মাত্র, ইহাতে প্রথমতঃ লালসা ছিল না। দুষ্যন্তের সংযত ভাব অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি বিদূষককে বলিয়াছিলেন,—

"সখে, ন পরিহার্য্যে বস্তুনি পৌরবানাং মনঃ
প্রবর্ত্ততে।"

মালবিকার নানারূপ অবস্থার সৌন্দর্য্য-বর্ণনা আছে। অলক্তক পরাইবার সময় তাঁহার বর্ণনা, দোহদজন্য চরণ-তাড়ন সময়ে তাঁহার অনুরূপ বর্ণনা,—সমুদ্র-ভবনে পুনরায় অন্য বর্ণনা। রাজা তাঁহাকে নানাভাবে

দেখিতেছেন। তাঁহার যেন রূপবর্ণনায় তৃপ্তি হইতেছে না। তারপর রাজার gallantryর ভাবটা বড় বেশী। "অঙ্কে নিধায় চরণাবুত পদ্মতাম্রৌ, সংবাহয়ামি করভোরু যথাসুখং তে" এই ভাবটা বড় অনাবৃত ভাবে মালবিকাতে বর্ণিত। "বিক্রমোর্ব্বশী"র বর্ণনা ইহা অপেক্ষা সংযত (refined). শকুন্তলের "অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈবঃ" প্রভৃতি বর্ণনাও refined এবং কাব্যাংশে অতুলনীয়। পুরুরবার উন্মত্ত প্রলাপে এবং যক্ষের বর্ণনায় একটা soul-love বা আত্মায় আত্মায় প্রেমের ভাব আছে। বাহ্য শারীর সৌন্দর্য্যের প্রতি মমতা "মালবিকায়" বড় বেশী আছে। এই বিষয়টি অনুধাবন করিয়া দেখিলে মনে হয় মালবিকাগ্নিমিত্র কবির যৌবন কালের লেখা। পরিণতবয়সের পূর্ণ প্রেমচিত্র "অভিজ্ঞানশকুন্তলে"। মহাকবি বোধ হয় নিজে মহাপ্রেমিক এবং কোন সময়ে অত্যন্ত বিরহকাতর ছিলেন।

কালিদাস মহাকবি সেক্সপিয়রের ন্যায় হাস্যরসেও খুব নিপুণ ছিলেন। সেক্সপিয়রের humourএর ন্যায় কালিদাসেরও humour আছে। তাঁহার তিনখানি নাটকের তিনটি বিদূষক, চিত্রলেখা প্রিয়ংবদা, শকুন্তলের পুলিশ-রক্ষিগণ প্রভৃতির সৃষ্টিকর্ত্তা হাস্যরসের দ্বারা জাগতিক ব্যাপারের একটা নতন সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। এই হাস্য করিবার ভঙ্গিও ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত। মালবিকার বিদূষক নাটকের ঘটনাবলীর সহিত অত্যন্ত অধিক বিজড়িত। তাঁহার হাস্য বড় বেশী serious রকমের এবং কখন কখন তাহা বাক্যের দ্ব্যর্থবোধক। ইরাবতীর সখী চন্দ্রিকাকে দেখিয়া তিনি রাজাকে বলিতেছেন, চোর এবং প্রেমিক উভয়েরই চন্দ্রিকা পরিহার করা কর্ত্তব্য। প্রণয়াতুর রাজার দৃষ্টিপথে মালবিকাকে দেখিয়া বিদূষক বলিতেছেন, "এই দেখুন আপনার মত্তানাশক মিছরীর টুকরা আসিয়া উপস্থিত।" এগুলি কিছু খেলো রকমের হাস্যরস। "বিক্রমোর্ব্বশীর" বিদূষক বড় বেশী বেকুব রকমের। তাঁহারই মূর্খতায় রাণীর পরিচারিকা রাজার প্রেমবৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং তাঁহারই হাত হইতে ভূর্জ্জপত্রলেখা হারাইয়া গিয়া রাণীর কাছে উড়িয়া গেল। মোদকখণ্ড এবং মোদকশরাব তাঁহার বড় প্রিয়। উদীয়মান পূর্ণচন্দ্র তাঁহার কাছে মোদকখণ্ডাকৃতি। শকুন্তলের বিদূষক অপেক্ষাকৃত অনেক স্থির ধীর এবং বুদ্ধিমান্। তিনি পাখির ব্যাপারের একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক। তিনি রাজমাতার কাছে ব্রতব্যাপারে রাজার প্রতিনিধি। শকুন্তলার প্রতি রাজার প্রণয় সঞ্চার দেখিয়া বিদূষক বলিতেছেন "পিণ্ডখর্জ্জুর ভক্ষণে উদ্বেজিত হইয়া মানুষের যেমন তেঁতুলে অভিলাষ হয় মহারাজের তেমনি হইয়াছে।" এ সমালোচনার তুলনা নাই। হাস্যরসের বিকাশ সমালোচনা করিলে "মালবিকা" তাঁহার আদি লেখা বলিয়া বোধ হয়।

কালিদাসের কাব্যাবলীতে কতকগুলি নূতন মহান্ শ্রেষ্ঠ ভাব (predominant ideas) আছে। "মালবিকায়" এই ভাবগুলির তুলনা দ্রষ্টব্য। তাঁহার একটি শ্রেষ্ঠ ভাব এই—তিনি উদ্ভিদাদি জড়জগতে একটা চৈতন্য প্রদান করিয়াছেন। এই চৈতন্য শুধু অন্তরের স্পন্দন মাত্র নহে। ইহার একটা

বাহ্য আবরণ আছে। তাহা মানুষের ন্যায় হস্তপদাদি-অবয়ববিশিষ্ট। এই ভাব কালিদাসের সম্পূর্ণ নিজস্ব। জড়জগতের পদার্থগুলি মানুষের প্রতিবেশী, মানুষের সুখ-দুঃখের সহিত তাহারা সম্পূর্ণ বিজড়িত। এ রকম উচ্চভাব (grand idea) অন্য কোন কবিতে দৃষ্ট হয় না। শকুন্তলার পতিগৃহে যাইবার সময় কণ্বমুনি তপোবন-তরুদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং
যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন
যা পল্লবম্।
আদৌ বঃ কুসুমপ্রবৃত্তিসময়ে যস্যা
ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং
সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥

ইহার পর কোকিল ডাকিল। কণ্বশিষ্য বলিলেন, কোকিলধ্বনি ছলে বনবাস-বন্ধু তরুরাজি প্রত্যুত্তর এবং অনুমোদন করিলেন। অশরীরিণী বনদেবতা কোকিলমুখে বাহ্য ভাবে আত্মপ্রকাশ করিলেন। আলবাল সেচনের সময় শকুন্তলা বলিতেছিলেন "সখি এই চূতবৃক্ষ বাতেরিতপল্লবাঙ্গুলীদ্বারা আমায় কি যেন বলিতেছে।" তার পর প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে লতা মনে করিয়া এই চূতবৃক্ষের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইতে বলিতেছিল। নবমালিকা বনজ্যোৎস্না সহকারের স্বয়ংবরা-বধূ। কুমারের অকাল বসন্ত বর্ণনায় এই ভাব পরিস্ফুট :—

পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ
স্ফুরৎপ্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ।
লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপুঃ
বিনম্রশাখা ভুজবন্ধনানি॥

রামচন্দ্র সীতাভ্রমে তটাশোকলতাকে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন। ইহা শুধু কবি-কল্পনা নহে, ইহা কবির একটা জীবন্ত বিশ্বাস একটা creed। এই বিশ্বাসেই মেঘে চৈতন্য আরোপ। মালবিকায় অশোকের দোহদ কবির এই বিশ্বাস-প্রসূত। মালবিকাতেও বাতেরিতপল্লব কথার উল্লেখ আছে এবং বসন্তশ্রীতে মনুষ্যত্ব আরোপ আছে।

কালিদাসের আর একটি শ্রেষ্ঠভাব শকুন্তলে উল্লিখিত হইয়াছে :—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্।
পর্য্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ॥

ইহার প্রায় সদৃশ ভাব মালবিকাতেও আছে। অনিমিত্তোৎকণ্ঠামপি জনয়তি মনসোমলয়বাতঃ। এই ভাবের কারণ প্রথমে কবি খুঁজিয়া পান নাই। পরিণত বয়সে কারণ দিয়াছেন :—

"তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জন্মান্তরসৌহৃদানি॥"

বর্ত্তমান যুগে Tennyson তাঁহার

"Tears idle tears I know not
what they mean"

কবিতাতে এই ভাব কতকটা ধরিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহার কারণ দেখাইতে পারেন নাই। I know not what they mean বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত।

Coming events cast their shadows beforehand ইহাও কালিদাসের একটা creed। কালিদাস বলিয়াছেন এই ছায়া নিজের হৃদয়ে পড়ে। মালবিকার শিল্পদারিকার মুখে কবি বলিয়াছেন,

"আগামী সুখং দুঃখং বা হৃদয়-
সমবস্থা কথয়তি"।

শকুন্তলেও এই ভাব বিশদ। পুরুষের

দক্ষিণাক্ষি বা দক্ষিণবাহু স্পন্দন এবং রমণীর তদ্বিপরীত তাঁহাদের শুভজনক, এভাবটাও তিনি কাব্যের প্রত্যেক স্থানে বর্ণন করিয়াছেন। আকৃতি বিশেষের প্রতি গৌরব কুমারসম্ভবে আছে :—

"ভবন্তি সাম্যেঽপি নিবিষ্টচেতসাং
বপুর্বিশেষেষ্বতিগৌরবাঃ ক্রিয়াঃ ॥"

মালবিকাতেও এই ভাবের উল্লেখ আছে। প্রথম অঙ্কে মালবিকা সম্বন্ধে এক সখী বলিতেছেন :

"আকৃতি-বিশেষে আদরঃ পদং করোতি"

এই ভাব কালিদাসের একটি সুন্দর কাব্য-কৌশল। প্রথমদর্শনে যে প্রেম তাহা শুধু লাবণ্যদর্শনে হয় না, এই লাবণ্যের অন্তরালে যেন আরো কিছু আছে। পূর্ব্বজন্মের প্রণয় অথবা ভগবানের অভিপ্রায় যেন ইহার সহিত জড়িত, তাই উভয়ের প্রণয় যেন অবশ্যম্ভাবি।

"কিমিব হি মধুরং মণ্ডনং নাকৃতীনাং"

এই ভাবও মালবিকাতে সাদাসিদাভাবে বর্ণিত আছে।

"অহো সর্ব্বাস্ববস্থাসু অনবদ্যতা জনস্য"।

এইরূপ কাব্য ভাবসাদৃশ্যে "মালবিকা"য় কালিদাসের হস্তাঙ্কন স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এবং তাঁহার "মালবিকা" তাঁহার প্রথম নাটক বলিয়া বোধ হয়। যে ভাবগুলি "মালবিকা"য় কেবলমাত্র অঙ্কুরাবস্থায় সেগুলি অন্যান্য কাব্যে সুন্দর বিকশিত। কতকগুলি একই প্রকারের ভাব ও ভাষা সংক্ষিপ্ত ভাবে কালিদাসের নানা কাব্যে দেখা যায়। "মালবিকা"তে তাহার অনেক উদাহরণ আছে। প্রতিভাশালী মহাকবিদের এই পুনরুক্তি বড়ই মনোরম, এবং তাঁহাদের কবিত্বময় প্রাণের অন্তরের আবেগের পরিচায়ক। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি :—

নাট্যশালায় মালবিকার গানের বস্তু এই—
দুর্লভঃ প্রিয়স্তস্মিন্ ভব হৃদয় নিরাশম্
অহহ্যাপাঙ্গকো মে স্ফুরতি কিমপি বামকঃ।
এষ স চিরদৃষ্টঃ কথং পুনর্দ্রষ্টব্যঃ ॥

শকুন্তলের উপান্তের ভাব এইরূপ—
শান্তমিদং আশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ
ফলমিহাস্য।"

আরো আছে—
"জানে তপসো বীর্য্যং সা বালা পরবতীতি
মে বিদিতং।"

শকুন্তলার মদনলেখের ভাবটাও প্রায় এইরূপ।

রঘুর এই শ্লোকটি বিখ্যাত—
তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ
শ্যামিকাপি বা"

ঠিক এই ভাবটি মালবিকায় আছে।

গণদাস বলিতেছেন—
"উপদেশং বিদুঃ শুদ্ধং সন্তস্তমুপদেশিনঃ।
শ্যামায়তে ন বিদ্বৎসু যঃ কাঞ্চনমিবাগ্নিষু ॥"

অগ্নিমিত্র প্রণয়িনী-বিরহে কৃশ হইতেছেন এবং বলিতেছেন—

"শরীরং ক্ষামং স্যাদসতি দয়িতালিঙ্গনসুখে"

ঠিক এই ভাবই শকুন্তলে আছে—

"অশিশিরতরৈরন্তস্তাপৈর্বিবর্ণমলীমসং"

বিরহী যক্ষও "কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।"

শকুন্তলে আছে—"পৌরব রক্ষ অবিনয়ং।"
ধারিণী বলিতেছেন—"অহো অবিনয়ং
আর্য্যপুত্রস্য।"

মালবিকায় মাধবী শোভা—

"লগ্নদ্বিরেফাঞ্জলিঃ তিলকৈঃ আক্রান্তাঃ।" ঋতুসংহার এবং কুমারে এই ভাষা প্রযুক্ত হইয়াছে। 'ভ্রমরসংবাধঃ' 'নবচূত প্রসবঃ' অবতংসনীয়" প্রভৃতি "মালবিকার" ভাষা "শকুন্তলাদি"তে সুন্দরভাবে পুনরুক্ত। এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ দ্বারা দেখান যাইতে পারে "মালবিকা" কালিদাসেরই প্রতিভার নব-প্রস্ফুটিত কুসুম।

এই মালবিকাগ্নিমিত্রে আরো কতকগুলি বিশেষ বিষয় দ্রষ্টব্য। এই কাব্যে বৈদ্য-শাস্ত্রের বিশেষ প্রশংসা এবং সর্পবিষ-চিকিৎসার উল্লেখ আছে। "বিক্রমে"ও বৈদ্যশাস্ত্রের উল্লেখ আছে, এবং রঘুর উপমা "অঙ্গুলীবোরগক্ষতা" বিশেষ বিখ্যাত। রাজনীতি নাট্যশাস্ত্র চিত্রবিদ্যারও বিশেষ আলোচনা এই নাটকে আছে। ইহা হইতে শুধু এই প্রতিপন্ন হয় যে কালিদাসের সময়ে এই সকল বিদ্যায় বিশেষ এবং সর্ব্বব্যাপিনী উন্নতি হইয়াছিল। এজন্য ইহা হইতে আরো বোঝা যায় যে কালিদাস স্বয়ং এই সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি রীতিমত শিক্ষিত হইয়া তবে কাব্য লিখিয়াছিলেন। সরস্বতীকুণ্ডে ডুব দিয়াই একেবারে সরস্বতীর বরপুত্র হন নাই। কবি গ্রে ও সেক্সপিয়র এক সরস্বতী কল্পনা করিয়াছিলেন, "To Him the mighty mother did unveil her awful face." কিন্তু সকলেই জানেন সেক্সপিয়রের শিক্ষাও সর্ব্বতোমুখী। কালিদাসকে যাঁহারা জ্যোতিঃ-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলেন তাঁহারা তাঁহাকে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ কবিরাজও বলিতে পারেন।

এই নাটকের স্ত্রীচরিত্রগুলি বিশেষরূপে সুশিক্ষাপ্রাপ্ত। ইহাতে শর্ম্মিষ্ঠা প্রণীত 'ছলিক' নাটকের উল্লেখ আছে। "বিক্রমে" সরস্বতীদেবী "লক্ষ্মীস্বয়ম্বর" প্রণেত্রী। স্ত্রীশিক্ষারও এ সময়ে চরমোৎকর্ষ হইয়াছিল। নাটকোক্ত পরিচারিকারাও সুশিক্ষিতা। তবে এ সময়ে বোধ হয় মদ্যপান-প্রথাটী বড় বেশী চলিত ছিল। কালিদাস ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি ফুলের বড় প্রিয় ছিলেন। অশোক, কুরবক, তিলক, কর্ণিকার প্রভৃতি তাঁহার প্রত্যেক কাব্যেই পাওয়া যায়। "মালবিকার" বসন্ত-বর্ণনার সঙ্গে ঋতুসংহারের বর্ণনা মিলাইলে বোধ হয় ঋতুসংহার এবং "মালবিকা" প্রায় এক সময়ের লেখা। কালিদাসের অন্যান্য কাব্যের ন্যায় মালবিকার বর্ণনা অতি প্রাঞ্জল এবং ভাষা ও ভাব বুঝিতে একটুও কষ্ট হয় না। কোন স্থানে ব্যাকরণ-দুষ্ট পদ বা অলঙ্কার-দুষ্ট ভাব নাই, এ সম্বন্ধে তিনি সেক্সপিয়র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেক্সপিয়রের এক সমালোচক বলেন— The Language of Shakespeare has been justly censured for its obscurity. These are lines and passages, upon whose impenitrable granite the brains of critics and commentators have been well-nigh dashed out; and yet their meaning is still uncertain.

মালবিকার চতুর্থাঙ্কে বিরহী রাজার একটা উক্তি ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। শ্লোকটি মন্দাক্রান্তা ছন্দের—

"তামাশ্রিত্য শ্রুতিপথগতামাশয়া বদ্ধমূলঃ
সংপ্রাপ্তায়াং নয়নবিষয়ং রূঢরাগপ্রবালঃ।

হস্তস্পর্শৈঃ কুসুমিত ইব ব্যক্তরোমোদ্গমত্বাৎ
কুর্য্যাৎ কান্তং মনসিজতরুর্ম্মাং রসজ্ঞং ফলস্য॥
ইহার ভাব ও ভাষা অবিকল মেঘদূতের দু' একটি শ্লোকের ন্যায়। হয় ত কবি এই সময়েই মেঘদূত লিখিবার আয়োজন করিতেছিলেন অথবা এইখানেই মেঘদূতের প্রথম অঙ্কুর; কিছু পরে তাহা পরিণত বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল।

কুমারসম্ভবের অকাল বসন্ত-বর্ণনায় আছে:—

"অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ
স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি।
পাদেব নাপৈক্ষত সুন্দরীণাং
সম্পর্কমাশিঞ্জিতনূপুরেণ॥"

আমার মনে হয় কবি নিজের "মালবিকাতে" বর্ণিত অশোক-দোহদের বিষয়ের উল্লেখ করিতেছেন। এইরূপ নানা আভ্যন্তরীণ প্রমাণে, বোধ হয়, অনুমাত্র সন্দেহ থাকিবে না যে "মালবিকা" মহাকবি কালিদাসেরই নাটক এবং ইহা তাঁহার যৌবনের লেখা। যৌবনের লেখা হইলেও ইহা তাঁহার পূর্ব্ব-সুশিক্ষার ফল। তিনি উত্তমরূপে আপনাকে কাব্য লিখিবার উপযুক্ত করিয়াছিলেন। সেইজন্য প্রস্তাবনায় নূতন কবির লেখা বলিয়াও সৎসাহস করিয়া নিজের নাটক প্রচার করিয়াছেন। এবং একটু মধুর গর্ব্বের ভাব এখানে দৃষ্ট হয়। গণদাসের মুখে নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সকল উক্তি দিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের আশৈশব বিশেষ শিক্ষার এবং নাটক লিখিতে উপযুক্ত হইবার চেষ্টার ইতিহাস বলিয়াই বোধ হয়। তিনি এই সময়ে আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে এবং রাজনীতিতেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। "ঋতুসংহার" কাব্যখানি সম্যক্ অনুধাবন করিয়া পড়িলে মনে হয় কবি ঋতুবর্ণনা সময়ে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা সমাপনান্তে গৃহস্থাশ্রমে নূতন প্রবেশ করিয়াছেন, এবং নবীন প্রেমিকের চক্ষে মানবহৃদয়ে এবং গৃহস্থের প্রাঙ্গণে ছয় ঋতুর প্রভাব, নিপুণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ঋতুসংহার তাঁহার সর্ব্বপ্রথম লেখা, তার পর "মালবিকা" তার পর "বিক্রম" তার পর মেঘদূত এবং পরে কুমার ও শকুন্তলা। রঘুবংশ তাঁহার সর্ব্বশেষে লেখা; হয় ত তিনি আরো কাব্য ও নাটক লিখিয়াছেন। তাহা এখন দুষ্প্রাপ্য। আমার মনে হয় "মালবিকা" ও "বিক্রমোর্ব্বশী" কাব্যাংশে "অভিজ্ঞানশকুন্তল" অপেক্ষা বড় বেশী ন্যূন নহে। প্রভেদ এই মাত্র যে মালবিকা তাঁহার প্রথম বয়সের লেখা এবং "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" তাঁহার পরিণত বয়সের প্রতিভার অমৃত ফল।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন এম্, এ।

মালদহের কবি ও গায়কগণ

বঙ্গদেশে লোকসাহিত্য, সঙ্গীতসাহিত্য প্রভৃতিতে অশিক্ষিতপটুত্বের বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়। কত মেঠো কবির গানে কেমন মাধুর্য্য, কেমন ভক্তির উচ্ছ্বাস, সমাজের কেমন পরিপূর্ণ চিত্র আমরা পাইয়া থাকি। লোকের মুখে মুখে সেগুলি ফিরিয়া থাকে। শিক্ষার গুণে সেগুলি পরিমার্জ্জিত না হইলেও, তাহাদের

আদর বড় কম নহে। স্বভাবকবিত্ব তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট।

আমাদের দেশের পাঁচালী, কীর্ত্তন, বাউল, ভাটিয়াল গান যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই তাহাদের ভাব-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। মালদহের গম্ভীরা-গানও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষতঃ ইহার সুর যাঁহারা একবার শুনিয়াছেন, তাঁহারা কিছুতেই ভুলিতে পারিবেন না—তাহার মাধুর্য্য এতই বেশী। সুরও এক রকম নহে। নানা রকম। আমরা সেই সুরগুলিকে কোন্ রাগ-রাগিণীতে ফেলিব, ঠিক করিতে না পারিয়া "গম্ভীরার সুর" নামে প্রচার করিলাম। কিন্তু কেবল সুরই গম্ভীরা-গানের বিশেষত্ব নহে। গানের বিষয় এবং অভিনয়-ব্যাপারও বড় চমৎকার। যাঁহারা অভিনয় করেন, তাঁহাদের নৃত্যগীতের ভঙ্গিমা এত সুন্দর যে বর্ত্তমান বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে তাঁহাদের দোসর খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সকলের নাচ এবং গান গাহিবার প্রণালীও এক রকম নহে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের কল্পনা অনুসারে নৃত্যের ভঙ্গিমা উদ্ভাবন করেন—সে নৃত্য বড় সহজ নহে। তালে তালে নানা রকমে পা ফেলিবার কায়দা বড়ই কঠিন। কিন্তু এত অবলীলাক্রমে তাহা সাধিত হয় যে দেখিলে অবাক না হইয়া থাকা যায় না। বাঙ্গালীর থিয়েটারে এখন বিলাতী বা পার্শী ধরণের নাচ সুরু হইয়াছে। কিন্তু সে নাচ যদি মনোরম হয়, তবে বাঙ্গালীর এই সহজ সুন্দর গ্রাম্যনৃত্য—এই নিজেদের কত প্রাচীন ঘরের জিনিস, ইহাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।

তার পর গান গাহিতে গাহিতে গান ছাড়িয়া দিয়া কথাবার্ত্তা বা রং-তামাসা করা, এবং হঠাৎ তাল না কাটিয়া গান ধরা বড়ই সুন্দর। বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চে এ প্রথা খুবই দৃষ্ট হয়। কিন্তু কত কাল হইতে মালদহে এই গম্ভীরার বোলবাই গানে তাহা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, ঠিক করা কঠিন। দেখিলেই মনে হয়, অভিনেতারা বুঝি থিয়েটার দেখিয়া এই সব অনুকরণ করিয়াছে। কিন্তু এমন দূরতম পল্লীবাসী অশিক্ষিত লোকের মধ্যে এই অভিনয়-প্রথার প্রচলন আছে, যাহারা থিয়েটারের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই। অতি প্রাচীন ব্যক্তিরাও এই প্রথার অস্তিত্বের কথা জানাইয়া থাকেন। অতএব ইহা যে সুপ্রাচীন, সে বিষয়ে সন্দেহ করা অসঙ্গত।

গম্ভীরা-গানের আর একটি বিশেষত্ব—ইহা সর্ব্ববিষয়ক। ইহাতে দেশের ধর্ম্ম কর্ম্ম, সমাজ-সংসার, শিক্ষা, অর্থ, শিল্পকৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয় লইয়াই আলোচনা হইয়া থাকে। তাই গম্ভীরা-গানে রামপ্রসাদের ভক্তিরস, বাউলের দেহতত্ত্ব, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রসিকতা, কৃষক কবি বার্ণসের নবযুগ-প্রবর্ত্তনের কবিত্বধারা সকলই পরিলক্ষিত হয়।

আমরা পাঠকগণকে একে একে এই গানগুলি ও তাহাদের রচয়িতাদিগের জীবন-সম্বন্ধে পরিচয় দিব। তবে জীবনসম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই ইহাঁদের জীবিকা-উপার্জ্জনের কথাও বলিতে হইবে। কিন্তু পাঠকবৃন্দের নিকটে অনুরোধ তাঁহারা যেন জীবিকানির্ব্বাহ-প্রণালীর মাপকাঠিতে ইহাঁদের কবিত্ব বিচার না করেন। দেশের

মালদহের কবিদ্বয়

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ও শ্রীরমণী কান্ত দাস

মালদহের কবি

মহম্মদ সুফী
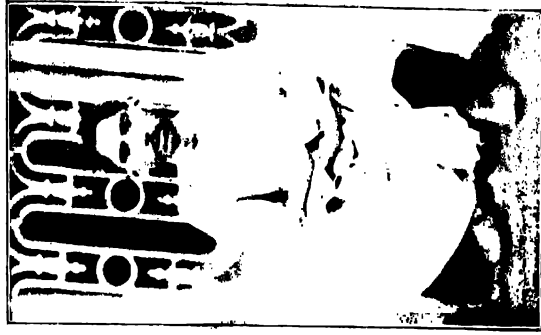
নাড়ীর সঙ্গে যাঁহারা জড়িত, যাঁহারা দেশের প্রকৃত অধিবাসী, তাঁহারা প্রাণের ভাষায় দেশসম্বন্ধে কিছু জ্ঞাপন করিলে তাহাও আমাদের বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। ইহাঁদের রচনায় উচ্চ সাহিত্যের ভাষা না থাকিলেও ভাব আছে, তাহাই আমাদিগকে উপভোগ করিতে হইবে।

ইতিমধ্যে আমরা নিম্নলিখিত ব্যক্তিবৃন্দের জীবনী ও গান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি—

১। ৺ধনকৃষ্ণ অধিকারী, চণ্ডীপুর
২। ৺কৃষ্ণদাস দাস, আইহো, মোচিয়া
৩। ৺কেশবচন্দ্র দাস গুরজী, মকদুমপুর
৪। ৺ডাক্তার ঠাকুরদাস দাস, মকদুমপুর
৫। শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, গিলাবাড়ী
৬। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস, মহেশপুর
৭। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কিশোরীকান্ত চৌধুরী, পুরাটুলী
৮। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস, মকদুমপুর
৯। কবিরাজ শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় হালদার, টাঁপাজানি
১০। মহম্মদ সুফী, ফুলবাড়ী
১১। শ্রীযুক্ত হরিমোহন কুণ্ডু, সাহাপুর
১২। শ্রীযুক্ত গদাধর দাস, গণিপুর
১৩। শ্রীযুক্ত রাধামাধব দাস, গণিপুর
১৪। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুপ্ত কাব্যরত্ন, আইহো, মোচিয়া
১৫। পণ্ডিত আবদুল জব্বর, মেজেমপুর, কালিয়াচক
১৬। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস দাস, কাশিমপুর, ভোলাহাট
১৭। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায়, কোতয়ালী
১৮। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাস, কোতয়ালী
১৯। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সাহ, আলিনগর, কালিয়াচক
২০। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ নন্দী, নিমাসরাই

উল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে আমরা অদ্য কয়েকজন মাত্র লোকের পরিচয় দিতেছি। বারান্তরে অন্যান্য সকলের বিষয় লেখা যাইবে।

মহম্মদ সুফী

ইহাঁর বাসস্থান—ইংরেজ বাজারের নিকট ফুলবাড়ী। বয়স ২১।২২ বৎসরের বেশী নহে। জেলাস্কুলের পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত ইহাঁর বিদ্যা। ইনি এখন দুই একটি ছেলের শিক্ষকতা এবং পোষ্টাফিসের পিয়নগিরি করিয়া জীবন কাটাইতেছেন। কিন্তু ভগবান ইহাঁকে যে কবিত্বশক্তি দিয়াছেন, তাহা কিছুতেই অবজ্ঞেয় নহে। ইহাঁর কবিত্ব বাস্তবিকই মনোরম—বাস্তবিকই তাহা অনায়াসলব্ধ সাহিত্যসম্পদ। ইহাঁর বর্ণনীয় বিষয়, বর্ণনা-ভঙ্গী, "ধরোয়া" উপমাগুলি অনুধাবন করিলেই ইহাঁর চিন্তাশীলতা এবং অনুসন্ধান-তৎপরতা বুঝা যায়। বস্তুবর্ণন এবং বিষয়-পরিকল্পনায় ইহাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। ইহাঁর রচনার কিছু নমুনা দিতেছি।

মালদহ রেলষ্টেশনের নিকটে কলিশন হয়, তদুপলক্ষে নিম্নের গানটি রচিত। একজন সাজিয়াছিল কলিশনে আঘাতপ্রাপ্ত যাত্রী। সে তাহার দুঃখের কাহিনী বন্ধুকে জানাইতেছে—

গম্ভীরার সুর

রেলে চাপিব না আর সাফ

বাপরে বাপ—।

এমন করা কি এসিষ্টাণ্ট মাষ্টার লেন টেলিগ্রাফ।

১। নয়টার সময় ছাড়ে ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেন,
ছুটা সাত মিনিটে এল মালদা ষ্টেশেন (রে)
লাইন ক্লিয়ার সাইন করা, দিলেন গার্ড
গাড়ী ছাড়া, ডিষ্ট্যান্স সিগনালের কাছে,
প্রায় আপট্রেনটি পৌছে. তখন বেগতিক
দেখ্যা গাড়ী থাকা মারলেন ড্রাইভার লাফ।

২। কি বলব রে দাদা দুখের কথা হামি তোরে.
এঞ্জিনের এক লোহা ছুটা নাচা গেল পুড়ে (রে).
পুড়ে যাওয়ায় মরি লাজে,
কয়েকদিন থাকা যাইনি কাজে,
দেখা হাসেন কত ডাক্তার বাবু, উকিল,
কবিরাজ, মোক্তার; এই দেশ, ঘরের
পয়সা দিয়া
রেলুয়াক, নাচায় আনলাম ছাপ—!

৩। রেলে রেলে ঘষণ দেখ্যা, বাবু গিয়া দোড়া.
ডি, টি. এসের কাছে খবর দিতে বসলেন
তারে (রে),
বোল উঠাতে টক্কা টরে, হাত বাবুর থর থর করে,
সাহেবকে দিতে এ সংবাদ, কয়েকটা ফারন হ'ল
বাদ, তখন ভালুকজ্বরার মত বাবুর গায়ে
আসে কাঁপ—।

৪। খবর পায়া জেলার সাহেব এলেন তাড়াতাড়ি.
তদন্তে জানিতে পারলেন ডাণ্ডিল মালগাড়া (রে)
সাহেব তখন জিজ্ঞাসিলেন,
কেন এরূপ হল বলেন,
(বাবুর) মুখে ধান দিলে হয় খৈ.
এখন হল হে চৈ,
রেলওয়ার একশ এক ধারায় বাবুর ঘটবে
কি যে পাপ—॥

নাচা—পাছা, রেলুয়াক—রেলওয়েকে।

কলিশন ঘটনাটির অবিকল বর্ণনা এবং রেল বাবুর অবস্থা কল্পনা বড়ই কৌতুকপ্রদ। কবি স্কট উচ্চ সাহিত্যের ভাষায় যাহা করিয়াছেন, এই অশিক্ষিত কবিও তাঁহার গ্রাম্য ভাষায় তাহাই করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

করোনেশন উপলক্ষে কয়েকজন খালাস-প্রাপ্ত কয়েদীর গান—

গম্ভীরার সুর

করোনেশনে মোরা খালাস পেলাম ভাই,
প্রাণভরে' সমস্বরে রাজার যশ গাই

১। মোদের মহারাজা যিনি, ইংলণ্ডে বাস করেন
তিনি, দেখিতে তাঁহারে কভু নাহি মোরা পাই,
পঞ্চম জর্জ্জ নামটি তাঁহার এই শুনিতে পাই।

২। প্রজারা সুখে থাকে যাতে, সোনায় সোহাগা
এনে সাথে, কাটা বঙ্গের অঙ্গ এঁটে রাখলেন
সাবেক রায়। *

৩। লর্ড হার্ডিঞ্জের পরামর্শে,
শান্তি এল ভারতবর্ষে,
বন্ধু দয়ার সাগর এমন সংসারেতে নাই।

৪। এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টে, জয়ধ্বনি উঠে উচ্চ কণ্ঠে,
শিক্ষার তরে ভারতবাসী অর্দ্ধ কোটি পায়
(টাকা)।

৫। এখন ভাই আজ সবাই মিলি, প্রাণভরে' বাহু তুলি,
রাজা-রাণীর জয় ঘোষণা করি সবে আয়।

৬। চল ভাই আপন আপন দেশে.
ভোগ করলাম জেল কর্ম্মদোষে.
এমন পথে চলব না আর কাণমলা সবে খাই।

(কয়েদীরা কোন্ কোন্ অপরাধে কোন্ কোন্ জেলে ছিল, তাহার পরিচয়)

* সোহাগা পাইন দিয়া যেমন অলঙ্কার জোড়া দেওয়া হয়, সদাশয় সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ সেইরূপ দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গকে এক করিয়াছেন।

গম্ভীরার সুর

প্রথম কয়েদী —প্রথমে ছিলাম আমি কলিকাতা আলিপুরে,
দ্বিতীয়—ঢাকা রাজসাহী রংপুর এলাম ঘুরে,
তৃতীয়—জানি তিনটি সহর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, লাহোর,
চতুর্থ—আমি মালদা ভিন্ন অন্য জানি না জেলা
চারিজন একত্রে—জেলের বিবরণ সবাই বলেক খুলা (এখন)
প্রথম—সখের সাইকেল গাড়ী চুরিতে ধরা পড়ি,
দ্বিতীয়—গণি মিঞার বাড়ী ঢাকাতে ডাকাতী করি
তৃতীয়—গিয়ে সাহেব হাত্তা, চুরি শিকারী কুত্তা,
আর (মেমের) বিলাতী জুতা,
চতুর্থ বাবুর হাতী চুরি, ধরা পড়ি গঙ্গার কূলে।
চারিজন।—জেলের বিবরণ ইত্যাদি।

(জেলে কয়েদীরা কে কি পরিশ্রম করিয়াছে, তাহার বিবৃতি)

প্রথম—ফুলকপি গাজর মলা, জল যোগাতাম দুবেলা,
দ্বিতীয়—পীড়তাম সরষাব ঘানি ও বড় বিষম ঠেলা,
তৃতীয়—আমার কাযটি ফাঁকা, টানতাম জেল দারোগার পাখা।
চতুর্থ—আমি ছিলাম সর্দার বি, সি কয়েদীর দলে।
চারিজন একত্রে—জেলের বিবরণ সবাই বলেক খুলা।

এইরূপে এক একটি পালা হিসাবে গানগুলি রচিত হয়। কবির আরও দুইটি পালার গান নিম্নে না উঠাইয়া থাকিতে পারিলাম না। এই দুইটি পালায় তিনি যে ভাব নিম্নশ্রেণী-দিগের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে শুধু নিম্নশ্রেণী নহে, আমাদের উচ্চশিক্ষিত যুবকদলও বহু বিষয় শিখিতে পাইবেন।

প্রথম পালাটি কুতুবপুর বোলবাই-সমিতি দ্বারা গীত। শ্রীমান অমরনাথ মণ্ডল ও শ্রীমান মদনমোহন মণ্ডল উক্ত সমিতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গায়ক ও নর্ত্তক। দ্বিতীয় পালাটি ইংরেজ বাজার বোলবাই-সমিতির গীত।

প্রথম পালার বিষয়—অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং চাকরী করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছে। কিন্তু দেশের অন্নাভাব বস্ত্রাভাব প্রভৃতি মোচন করিবার জন্য কেহই অগ্রসর হইতেছেন না। শিক্ষার অর্থই এখন আমরা পরীক্ষায় পাশ করা ইহাই বুঝিয়া লইয়াছি। এবং পাশ করিয়া চাকরী ও বিলাসিতায় উৎসন্ন যাইতে বাসিয়াছি। একজন চাষা গানে ও কথায় একজন চাকরীপ্রার্থী গ্র্যাজুয়েটের কাছে খেদ করিয়া এই সব বলাতে গ্র্যাজুয়েটের মন ফিরিল ও তাহার দেখাদেখি পরীক্ষামোহমুগ্ধ আর একজন বাবুরও চৈতন্য হইল।

দ্বিতীয় পালার বিষয়—কয়েকজন ছাত্র নানা রকম বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদেশে গেল। তারপর ফিরিয়া আসিয়া সেই সব বিদ্যা নিজের দেশবাসীকে শিক্ষা দিতে নিযুক্ত হইল। তাহাদের সকলেই সাহেবী হাবভাব পোষাক-পরিচ্ছদ সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেহ লাঙ্গল কাঁধে কৃষকের সহিত, কেহ মাকু হাতে তাঁতীর সহিত মিশিয়া মিশিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

প্রথম পালা

কুতুবপুর বোলবাই-সমিতি
(দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণন)
(শিবের বন্দনা)

গম্ভীরার সুর

কি কলি হে দশা দেনা, (শিব)
দাশেব লোকে পায় না অন্ন
১। হায় কি যে পণ্ডানার কথা ... যাঁর
... (শিব হে)

তখন গরীব দুঃখী আছিল সুখী টাকায় আট
মনের ভাও চা'লে হে—
কুঠে গ্যালো সেই সুখের দিন,
হ'নু দিনে দিনে দীনের অধীন,
এখন আট সের ভাও ছুটে না,
ডু'ব্যালা প্যাটে ভাত জুটে না,
(তোর) নন্দী, ভৃঙ্গী, বুঢ়া দামড়া
কি দিয়া পুজবো কহেক হামরা হে।
বছর বছর আস্‌ছিস্ কা'ন্ দ্যাশ লক্ষীছাড়া
শস্যশূন্য!

২। লক্ষীছাড়া কলি যদি, দ্যাশে রাখ্‌লি না কা'ন্
মা সরস্বতী (শিবহে)
তাকেও গাঁজার ধূঁয়াৎ উড়ালি তোর এমনি
পাগ্‌লা মতি হে—
মা সরস্বতী অভাবে এই দ্যাশে,
লোক বোকা হ'য়া আছে ব'সে,
চোখ দ্যাখ্‌না একনা খুল্যা,
ভোলা গেলি কি তুঁই ভুল্যা, (এই দ্যাশ্)
ত্রিশ কোটী লোকে ত তোকে,
ববাবম ববাবম ক'হা ডাকেছে,
আজ তাদ্যরে ভুল্যা সাগর পারের লোক
গুলাক কলি গণ্য মান্য।

৩। যে দ্যাশেতে সওয়া পহর বর্ষ্যা ছিল সোনা
(শিবহে)
আজ সেই দ্যাশের লোক গুলাকে পিজ্‌য়্যা
দিলি ত্যানা হে—
হায়রে সেই কুরুক্ষেত্র,
রাখলি না তার চিহ্ন মাত্র,
কত কীর্ত্তি কলি টুকরা,
কহিতে উঠে প্রাণ ডু'করা,
আদিনা, পাণ্ড্যা, গৌড়, রামকেলী,
এ সব নগর সমৃদ্ধিশালী হে
সেই সব নগর কলি কিহে বাঘ ভালুকের বাস
অরণ্য।

৪। মুন্সী কহে মা লক্ষী সরস্বতী গেলে, তাতে নাই
হামাদের ক্ষতি (ভাইরে)
কিন্তু এই বুঢ়া ছাড়্যা পালালে, হাম সুদ্ধর বাড়্‌ডা
হ'বে দুর্গতিরে—
যতই ভাবি সবই ভুল
এই আদম হামাদের আদি মূল,
ভক্তি ডোরে বান্ধেক ক'স্যা,
দেখিস যায় না যেন খ'স্যা,
স্নেহবাৎসল্য যদি না থাকত
পাটী বুঢ়া বিলাত পালাত (ভাই)
হামাদের ভাল বাসে, তাইত আসে,
বছর বছর খা'তে পরমান্ন।

ক'লির—কলি, কুঠে—কোথায়, ধূঁয়াৎ—ধূঁয়াতে,
তাদ্যরে—তাদেরে, লোক গুলাক—লোকগুলাকে,
পহর—প্রহর, পিজ্‌য়্যা—পরাইয়া, ত্যানা—ন্যাকড়া,
একনা—একটু।

শিবের বন্দনার মধ্যে দেশের জন্য কি মর্ম্মন্তুদ বেদনা! রবি বাবু প্রমুখ বহু কবি দেশের জন্য কাঁদিয়াছেন। কিন্তু ভগবানকে ডাকিতে যাইয়া দেশের দুর্দ্দশায় কাহারও এমন বাষ্পবিজড়িত কণ্ঠ শুনিতে পাই নাই। একজন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিতেছেন, "আমাদের লক্ষ্মী গিয়াছেন, আমাদের সরস্বতী গিয়াছেন, কিন্তু তবুও এই "বুঢ়া" এই মঙ্গল এখনও আমাদিগকে ছাড়েন নাই!"—কি সুন্দর কথা—কি আশার বাণী! আশা করি পাঠকবৃন্দ বন্দনাটি একটু তলাইয়া দেখিবেন।

চাষা ও একজন গ্র্যাজুয়েটের প্রবেশ

চাষার গীত

গম্ভীরার সুর

আহে বাবু হয় বাবু কেমনে হে জান, কহেক কেমনে হে জান, বাঁচবে কেমনে হে জান? আট সেরের ভাও লাগ্যাছে চাউল, চারদিকেই টান।

১। তোরা এ সব চাল ছাড়্যা (বাবুগিরি চাল ছাড়্যা)
নিজে যদি হাল ধর্যা, আবাদ করতি অনর্গল
থাকত দ্যাশের মান, সে—না কোচমান ছাঁটা,
টেড়ী কাটা, কষ্যা কোঁচান (ধবলি)।

জ্ঞাতিজনের সমাগমও এই প্রকারই হইয়া থাকে। ভবিষ্যতে আমাকে পোষণ করিবে এই মনে করিয়া মাতা পুত্রকে লালন পালন করেন, এবং পুত্রও তাঁহাকে এই মনে করিয়া সেবা করে যে, ইনি আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। জ্ঞাতিকেও অহিতকর এবং অজ্ঞাতিকেও হিতকর দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব লোক কার্য্যবশত স্নেহ প্রদর্শন বা ছেদন করে। তোমার যে প্রিয় বান্ধব জন পরলোকে রহিয়াছে, সে তোমার কি করিতেছে, এবং তুমিই বা তাহার কি করিতেছ? অতএব জ্ঞাতিজন-বিতর্কে চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করিও না।

'হয় ত তোমার মনে এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, অমুক দেশ উত্তম ও অমুক দেশ অধম। হে সৌম্য, তুমি এ বিতর্কও পরিত্যাগ করিবে। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু লোকের মহৎ ভয় উৎপাদন করে, এমন কোন দেশ নাই যেখানে এই মহৎ ভয় নাই। শরীর যেখানে যায় দুঃখও সেই স্থানে গমন করে। দেশ সুভিক্ষ ও রমণীয় হইলেও তাহাকে কুদেশ বলিয়া মনে করা উচিত, কেননা জরা প্রভৃতি ক্লেশে সেখানেও দগ্ধ হইতে হয়। সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদাই যখন সকলের দুঃখ লাগিয়া থাকে, তখন সেই দেশের প্রতি অভিলাষ বা আসক্তি করা উচিত নহে তোমার এই অভিলাষ ও আসক্তি নিবৃত্ত হইলেই তুমি দেখিতে পাইবে যে, এই জীবলোক জ্বলিত হইতেছে।

তোমার যদি কখন অমরণ-সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হয়, তবে ব্যাধির ন্যায় তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়া, জীবনের সম্বন্ধে এক মুহূর্ত্তও বিশ্বাস করিবে না। বিশ্বাস-ঘাতক কাল ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। লোক যে এই প্রত্যক্ষ নিশ্বাস-প্রশ্বাস করিয়া জীবিত রহিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য। জীবনের কোন বিশ্বাস নাই। অসি উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান শত্রুর ন্যায় কালকে কে বিশ্বাস করিতে পারে—ইহা জন্ম হইতেই হনন করিবার ইচ্ছায় লোককে অনুসরণ করিতেছে। শ্রুতবান্ বা বলবান্ হইলেও কোন লোক যমকে জয় করিতে পারে না, কেহ পারে নাই, এবং কেহ পারিবেও না। অতএব চঞ্চল আয়ুতে বিশ্বাস করিও না।

'অতএব এই সমস্ত বিতর্কের পরিত্যাগের জন্য সংক্ষেপত প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। ধূলিসমাচ্ছন্ন স্বর্ণ পাইবার ইচ্ছায় লোক যেমন প্রথমে স্থূল ধূলিসমূহকে ধৌত করিয়া তাহার পর বিশুদ্ধির জন্য সূক্ষ্ম ধূলিসমূহকেও ধৌত করিয়া থাকে, এবং তাহার পর বিশুদ্ধ স্বর্ণ অবয়ব সমূহ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মুক্তির জন্য যুক্তচিত্ত হইয়া প্রথমে স্থূল দোষ সমূহ পরিত্যাগ করিয়া তাহার পর বিশুদ্ধির জন্য সূক্ষ্ম দোষসমূহকেও পরিত্যাগ করিতে হয় এবং তাহার পর বিশুদ্ধ ধর্ম্মাঙ্গসমূহ লাভ করিতে পারা যায়, ও মন বিশুদ্ধ হইয়া উঠে। কর্ম্মকার যেমন বিশুদ্ধ স্বর্ণকে নানাবিধ অলঙ্কার-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত করিয়া থাকে, ভিক্ষুও সেইরূপ বিশুদ্ধ চিত্তকে অসাধারণ জ্ঞানসমূহে যথেচ্ছ নিযুক্ত করিতে পারে।'

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী

সার এবং সারের আবশ্যকতা ও ব্যবহার প্রণালী

জীবনধারণ জন্য প্রাণিগণের আহারের প্রয়োজন হয়। আহার্য্য বস্তু নানাবিধ। ভাত, ডা'ল, দুগ্ধ, মাংস, মৎস্য, শাক-সবজী, রুটী ও ফল-মূল প্রভৃতি আহার করিয়া আমরা জীবনধারণ করিয়া থাকি। উদ্ভিদ-কুলের জীবনধারণ জন্যও আহারের প্রয়োজন হয়। প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যু আছে। উদ্ভিদগণও এই স্বাভাবিক নিয়মের অধীন। প্রাণীর ন্যায় ইহাদেরও জীবন আছে। জীবনধারণ জন্য ইহাদেরও খাদ্যের প্রয়োজন হয়। ইহাদের দেহ যে যে উপাদানে গঠিত, উহার অধিকাংশই ইহারা ভূমি ও বায়ু হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উদ্ভিদকুল প্রতিনিয়ত ভূমিতে সঞ্চিত স্বাভাবিক সার গ্রহণ করিতেছে। কাজেই ভূমিতে স্বতই উহার অভাব হইয়া থাকে। সার দ্বারা ঐ অভাব পূরণ না করিলে ভূমি অতিশয় দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সেইজন্যই ভূমিতে উহার কোন উপাদানের অভাব হইলেই সার দ্বারা উহার পূরণ করিতে হয়। এই অভাব পূরণ জন্যই সার ব্যবহারের আবশ্যকতা হয়। সারই উদ্ভিদের খাদ্য।

উদ্ভিদ-দেহের জন্য অল্প বা অধিক পরিমাণে অম্লজান (Oxygen), অঙ্গারজান (Carbon), উদজান (Hydrogen), যবক্ষারজান বা শোরাজান (Nitrogen), পোটাশ (Potash), ফস্ফোরিক এসিড্ (Phosphoric acid), ও অত্যল্পপ রিমাণে চূণ (Lime) ও ম্যাগ্নিসিয়া (Magnesia), নামক পদার্থের প্রয়োজন হয়। ইহাই ইহাদের খাদ্য। সুতরাং যে সারে এই সকল পদার্থ বিদ্যমান আছে উহাই ভূমিতে প্রয়োগ করার আবশ্যক হয়। পক্ষান্তরে, কোন ভূমিতে ইহাদের কোনটীর অস্তিত্ব ও অপরের অভাব থাকিলে, যেটীর অভাব আছে সেইটীই প্রয়োগ করিতে হয়।

সকল উদ্ভিদের জন্যই যে একইরূপ সারের প্রয়োজন হয় তাহা নহে। উদ্ভিদের স্বভাব বিশেষে উহার জন্য যে সারের প্রয়োজন তাহাই প্রয়োগ করিতে হয়। স্থূলতঃ ভূমির অবস্থা ও গাছের স্বভাব বিবেচনায় সার নির্ব্বাচন করার আবশ্যক হয়। যথা—শিম্বীধারী উদ্ভিদের জন্য নাইট্রোজেন-প্রধান সার আবশ্যক। ভূমিতে উহার অভাব হইলে ঐ সার প্রয়োগ করিতে হইবে।

সারের ভূমিতে একরূপ জীবাণুর (Bacteria) অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয় ইহারাই ভূমি-স্থিত যবক্ষারজানকে নাইট্রেট (nitrate) আকারে পরিণত করিয়া উহাকে উদ্ভিদের আহার যোগ্য করে। যবক্ষারজান নাইট্রেট আকারে পরিণত হইলেই সহজে দ্রবীভূত হয় এবং উহা দ্রব হইলেই উদ্ভিদের আহার যোগ্য হয়।

ভূমিতে দ্বিবিধ জীবাণু দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এক জাতীয় জীবাণু এমোনিয়াকে (Ammonia) নাইট্রাইটস্ (Nitrites) আকারে ও অন্যরূপ জীবাণু নাইট্রাইটস্‌কে

(Nitrites) নাইট্রেট্ (Nitrate) আকারে পরিণত করে। এই সকল জীবাণু অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন কদাচিৎ দৃষ্টি-গোচর হয়। এই উভয়বিধ জীবাণুর একে অন্যের কার্য্য সাধন করিতে অক্ষম। এই জীবাণুগণ বায়ু হইতেও নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহার বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া উদ্ভিদের মূলে ও কাণ্ডে সঞ্চিত রাখে। কোন কোন উদ্ভিদে ইহার দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। শণ ও ধঞ্চে প্রভৃতি উদ্ভিদের মূলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটি (nodules) দৃষ্টিগোচর হয় উহাই জীবাণু কর্তৃক সংগৃহীত নাইট্রোজেন। উহা অগ্নিতে দগ্ধ করিলে একরূপ তীব্র গন্ধ অনুভব করা যায়। এই জাতীয় উদ্ভিদের সবুজ সার (Green Manure) ভূমির পক্ষে বিশেষ উপকারী। অধুনা বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই সকল জীবাণু সংগ্রহ করিয়া উহাদের চাষ করা হইতেছে। উহা এইক্ষণ বাজারে খরিদ করিতে পাওয়া যায়। উহা দ্বারা ভূমির টীকা (inoculation of the soil) দেওয়া হইতেছে। উহারা নাইট্রো-ব্যাক্টেরাইন্ (Nitro-bacterine) ও নাইট্রোজিন (Nitrogen) নামে পরিচিত। মৎকৃত সারতত্ত্ব নামক পুস্তকে সার সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্তব্য। এস্থলে সংক্ষেপে সচরাচর ব্যবহার্য্য কয়েকটী সারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সার সাধারণতঃ দ্বিবিধ। জৈবিক (organic) ও অজৈবিক বা ধাতব inorganic or mineral)। উদ্ভিজ্জ (Vegetable) ও জান্তব সার (animal manure) মাত্রই জৈবিক সার ও লৌহ (iron), ম্যাগনিসিয়া (Magnesia), সোডা (Sodium), পোটাস (Potassium) প্রভৃতি ধাতব (metalic or inorganic) সার। উভয় বিধ সার মধ্যে কোন কোনটী মৌলিক ও কোন কোনটী যৌগিক। যৌগিক সার মাত্রই কৃত্রিম (artificial) তদ্ভিন্ন উদ্ভিদ বিশেষের জন্য যে সার প্রস্তুত হয় উহাকে বিশেষ সার (Special manure) কহে।

১। গোময় (Cowdung) গোময় ও গোশালার আবর্জ্জনাই সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট সার। ইহা পচাইয়া যে সার প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গোময়-ভস্ম (Cowdung ashes) ও তরল গোময়ও সার স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গোময়-ভস্ম সারের পক্ষে তত উপযোগী নহে। বাস্তবিক উহা সারের কার্য্য করিতে অক্ষম। মৃত্তিকার উৎকর্ষ সাধন জন্য ইহার ব্যবহার হয়। বালি ও আঠাল মৃত্তিকার আশ ভাঙ্গিবার পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। কোন কোন কীটের উপদ্রব নিবারণ জন্যও ইহার ব্যবহার হয়। তরল গোময়ও কোন কোন অবস্থায় বিশেষ সারের কার্য্য করিয়া থাকে। গোময়ের ন্যায় উৎকৃষ্ট সার আর নাই। গোময় গর্ত্তে মজুত করিয়া সময় সময় উহা খোচাইয়া উলট পালট করিয়া দিতে হয়। বৃষ্টির জল দ্বারা উহা ধৌত হইলে অধিকাংশ সময়েই উহার সারাংশ নষ্ট হয়। তজ্জন্য গোময়ের স্তূপের উপরে ছায়লা করিয়া দেওয়া সঙ্গত। দেড় হইতে দুই বৎসর মধ্যে গোময় বিশেষরূপে পচিয়া থাকে। ইহা পচিলে শাক-সবজী ও মাঠজ ফসলের পক্ষে বিশেষ উপকারী হয়। ফল-মূলের ও অন্যান্য গাছের পক্ষেও

ইহা কম উপকারী নহে। গোময় ক্ষেত্রে ছিটাইয়া বা গাছের গোড়ায় দিয়া ব্যবহার করা যায়। গাছের গোড়া খোঁচাইয়া উহার চারিদিগের মৃত্তিকা উস্কাইয়া দিয়া উহাতে এই সার ব্যবহার করিতে হয়। সময় সময় জল দিলে উহা ক্রমে দ্রব হইয়া উদ্ভিদের আহারযোগ্য হয়। কোন কোন উদ্ভিদের জন্য সদ্য গোময় গুলিয়াও ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। গোময়ের তরল সার কোন কোন ফুল গাছের জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরাতন গোময় ব্যবহারের পূর্ব্বে উহা অত্যুষ্ণ জল দ্বারা ধৌত করা প্রয়োজন। কেননা পুরাতন জান্তব সার মাত্রেই অধিকাংশ সময়ে উদ্ভিদের অনিষ্টকারী কীটাদির আবাস-স্থান হয়। গরম জলে ঐরূপ সার ধৌত করিয়া লইলে উষ্ণতা দ্বারা ঐ সকল কীট মরিয়া যায়। গোমূত্রও উৎকৃষ্ট সার। গোমূত্র-মিশ্রিত গোময় সকল ফসলের পক্ষেই বিশেষ উপকারী।

অন্যান্য পশুর বিষ্ঠা (Dung of other animals)

ছাগ-বিষ্ঠা, ভেড়ার-বিষ্ঠা, ঘোড়ার-বিষ্ঠা, কপোত-বিষ্ঠা, কুক্কুট-বিষ্ঠা, ও মনুষ্য-বিষ্ঠা, প্রভৃতিও সার স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উদ্ভিদবিশেষে ইহাদের ব্যবহার হইয়া থাকে। এই সকল সার সকল উদ্ভিদের পক্ষেই উপকারী নহে। ইহাদের প্রত্যেকের গুণ ও ব্যবহার-প্রণালী স্বতন্ত্র রূপ।

রক্ত, মাংস ও অস্থি (Blood, flesh and bone)

জীবের রক্ত, মাংস ও অস্থি প্রভৃতিও সার স্বরূপে ব্যবহার হয়। এই সকল সার নানা আকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৎস্য পচাইয়া যে সার প্রাপ্ত হওয়া যায় উহাও কোন কোন উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

উদ্ভিজ্জ সার ও সবুজ সার (Vegetable and green manure)

উদ্ভিজ্জাদি পচাইয়াও উহা হইতে উৎকৃষ্ট সার প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহাও অধিকাংশ উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। উহাই উদ্ভিদের স্বাভাবিক খাদ্য। কেনন, অধিকাংশ সময়েই উদ্ভিদের পত্র, মূল ও ডাল-পালা প্রভৃতি ভূমিতে পচিয়া উহা স্বভাবতঃই উদ্ভিদের খাদ্য হয়। কোন কোন সজীব সবজীকে চাষ দিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশাইয়া দিয়া ভূমিতে সবুজ সার (Green manure) প্রদান করা হয়। উহাও উৎকৃষ্ট সার।

পাতার সার (Leaf mould)

উদ্ভিদের পাতা পচাইয়া উহা হইতেও উৎকৃষ্ট সার প্রাপ্ত হওয়া যায়। উদ্ভিদের পাতা সংগ্রহ করিয়া কোন গর্ত্তে পচাইয়া পাতার সার প্রস্তুত করিতে হয়। প্রায় এক বৎসরে উহা পচে। উহা পচিয়া গুড়ার মত হইলে ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে। ইহাও অধিকাংশ উদ্ভিদের পক্ষে উপকারী হয়।

ঘাসযুক্ত দোয়াশ ও দগ্ধমৃত্তিকা (Turfy loam and burnt soil)

ঘাস-মিশ্রিত মৃত্তিকার চাপড়া বা চাপ উঠাইয়া কোন স্থানে মজুত রাখিবার পরে তৎস্থিত ঘাসাদি পচিয়া গেলে উহাও সার স্বরূপে ব্যবহার করা যায়। উহাও উদ্ভিদের পক্ষে উপকারী খাদ্য। আবার উহা পোড়াইয়া লইলে উহাও উৎকৃষ্ট সার হয়। সাধারণ পোড়া মৃত্তিকাও কোন কোন

উদ্ভিদের পক্ষে সারের কার্য্য করে। পাত্রে যে সকল উদ্ভিদের চাষ হয় উহাদের পক্ষে দগ্ধ মৃত্তিকা বিশেষ উপকারী।

খইল সার
(Oilcake Manure)

সর্ষপ, রেড়ী, মূলা, শালগম, ও কপি প্রভৃতির বীজের খইলও উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট খাদ্য। কোন কোন উদ্ভিদের পক্ষে উহা অতিশয় উপকারী। খইল মৃত্তিকাতে গর্ত্ত করিয়া পুতিয়া রাখিয়া তদুপরি মৃত্তিকায় চাপ দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। ২০ দিন হইতে এক মাস মধ্যে উহা পচিয়া যায়। ঢাকিয়া না দিলে পচা খইল হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ বহির্গত হয়। খইল পচিবার পরে উহা গর্ত্ত হইতে উঠাইয়া শুষ্ক করিতে হয়। খইল শুষ্ক করিয়া উহার গুড়া সার স্বরূপে ব্যবহার করা হয়। তরুণ খইলের দাহিকাশক্তি প্রবল। সেইজন্য উহা পচাইয়া লইতে হয়। তরুণ খইল জলে গুলিয়াও কোন কোন গাছ ব্যবহার করা হয়। পান, ইক্ষু ও পটল প্রভৃতি গাছের জন্য তরুণ খইলের ব্যবহার হয়। সর্ষপ খইলেরই দাহিকা শক্তি আরও প্রবল।

আবর্জ্জনা (Sweepings)

বাড়ীর, বাগানের ও রাস্তার আবর্জ্জনা হইতেও উৎকৃষ্ট সার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবর্জ্জনা ভালরূপে পচিলেই সার রূপে ব্যবহার হইবার যোগ্য হয়। আবর্জ্জনা কোন গর্ত্তে বা এক স্থানে স্তূপ করিয়া রাখিতে হয়। উহা প্রায় এক বৎসরে পচিয়া ব্যবহারের উপযোগী হয়।

নীলের সিটী। (Indigo refuse.)

নীলের সিটীও উৎকৃষ্ট সার। উহা শাক-সবজীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। নীল গাছ পচাইয়া উহা হইতে নীল বাহির করিয়া নিলে উহার গাছ ও ডালপালা যাহা অবশিষ্ট থাকে উহা একস্থানে স্তূপ করিয়া রাখিলে ২।৩ বৎসর উহা পচিয়া সাররূপে পরিণত হয়। নীলের সার শাক-সবজী, তামাক ও সর্ষপ প্রভৃতির পক্ষে বিশেষ উপকারী।

গুড়ের মাৎ ও ভাটী খোলায় মদের ছাক
(Treacle or Distillery refuse)

গুড়ের মাৎ ও ভাটীখোলার মদের ছাকও সার স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। উহা পচিলেও উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট খাদ্য হয়। ইহা পাতার সার ও সবজী সার সহিত মিশ্রিত করিয়া শাক-সবজীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করিলে ঐ ক্ষেত্র হইতে আশাতীত ফললাভ করা যায়। সবজী চাষের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

সুট (Soot)

কাষ্ঠ ও কয়লা প্রভৃতি পোড়াইলে উহার ধোঁয়া হইতে কৃষ্ণবর্ণ গুড়া গুড়া একরূপ পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাকেই সুট বা ঝুল কহে। ইহাও সার স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা মূলজ বা উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ উপকারী, ইহা দ্বারা ভূমির কেঁচো প্রভৃতি কীট নষ্ট হয়। ইহা টবের গাছের পক্ষেও বিশেষ উপকারী।

আস্তাবলের আবর্জ্জনা
(Stable sweepings)

ইহাও পচিলে উৎকৃষ্ট সার হয়। ইহা ভালরূপে পচিতে প্রায় ২ বৎসর লাগিয়া থাকে। ইহা ভালরূপে না পচিলে উদ্ভিদের অপকার সাধন করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ।

আধুনিক মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ সন্তানগণ

[এই প্রবন্ধে পরলোকগত মারাঠা কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীরগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। লেখক মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে সি, আই, ই মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত "ভারত-সেবক-সমিতি"র সদস্য। তিনি ১০।১২ বৎসর বয়স্ক বাঙ্গালী বালকগণকে আধুনিক মহারাষ্ট্রের পরিচয় দিবার জন্য একখানি পুস্তিকা রচনা করিতেছেন। প্রবন্ধটি সেই পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়। এই বিবরণটুকু সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু কেবল শিশুগণের উপযোগী কেন, অনেক প্রবীণ বাঙ্গালীরও জ্ঞাতব্য। আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ সম্বন্ধে এত অজ্ঞ যে, এই যৎসামান্য পরিচয়েও কথঞ্চিৎ উপকার হইবে মনে করি। বিশেষ আক্ষেপের বিষয়, মহারাষ্ট্র সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা বঙ্গসাহিত্যে একেবারেই হয় নাই। অথচ আমরা 'ভারতবর্ষ', 'ভারতবাসী' 'জাতীয় মহাসমিতি' ইত্যাদি শব্দে নাচিয়া উঠি। আশা করি, আমরা জড়ত্ব ভাঙ্গিয়া পরস্পরকে চিনিবার আয়োজন করিতে বিলম্ব করিব না।]

১। পরশুরাম বল্লাল গোড়বোলে

কবি—ইনি আধুনিক মারাঠি সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম প্রসিদ্ধ লেখক। ইনি কতিপয় সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেন।

২। জগন্নাথ নানা শঙ্করশেট মুকুটে

(১) বিদ্যোৎসাহী, (২) বিদ্যানুরাগী, (৩) দাতা, (৪) রাজনীতিবিদ। ইনি বালক ও বালিকাদিগের জন্য পৃথক বিদ্যালয়, দাতব্য ঔষধালয়, ধর্ম্মশালার স্থাপয়িতা, 'বম্বে এসোসিয়েসনে'র সংস্থাপক, ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য।

৩। পুরুষোত্তম বাবা কেঙ্করে

(১) রাজনীতিবিদ, (২) দাতা। ইঁহার আন্দোলনের ফলে পর্ত্তুগীজরাজ্য গোয়ার রাজনৈতিক সভায় হিন্দুগণ প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকার পান। ইনি দুর্ভিক্ষের সময় লক্ষ টাকার শস্য অল্পমূল্যে ও বিনামূল্যে বিতরণ করেন।

৪। দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গ তর্খড়কর

(১) গ্রন্থকার (২) শিক্ষক (৩) ধর্ম্ম সংস্কারক। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "উপক্রমণিকা"

ও "কৌমুদী" ব্যাকরণের ন্যায় দাদোবাকৃত-"ব্যাকরণ" মহারাষ্ট্রের বিদ্যালয়ে প্রসিদ্ধ। ইনি অন্যান্য পাঠ্য পুস্তকও লিখিয়াছেন। ইনি উত্তম শিক্ষক ছিলেন, পরে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। 'প্রার্থনা'-সভার পূর্ব্বে যে সভা পরমহংস-সভা বলিয়া খ্যাতি লাভ করে, সে সভা ইঁহাদ্বারা স্থাপিত হয়।

৫। কেরো লক্ষ্মণ ছত্রে

(১) আদর্শ শিক্ষক, (২) বিদ্যানুরাগী। ইনি গণিত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ৫০৲ টাকা বেতনের শিক্ষকতা হইতে আরম্ভ করিয়া পুণা কলেজের গণিতের অধ্যাপক হন এবং হাজার বার শ টাকা বেতন পান। ইনি আদর্শ শিক্ষক ছিলেন।

৬। জোতিরাও গোবিন্দরাও ফুলে

(১) বিদ্যোৎসাহী (২) সমাজ-সংস্কারক। ইনি জাতিতে ফুলমালী। ইনি স্ত্রীশিক্ষা ও অন্ত্যজ জাতির (মাহারদিগের) জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ও দক্ষতার সহিত তাহার পরিচালন করেন। ভ্রূণহত্যা নিবারণের জন্য স্বব্যয়ে প্রসূতি-আগার স্থাপন করেন। ইনি বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও অন্ত্যজ জাতির উন্নতি বিষয়ে অনেক চেষ্টা করেন।

৭। গণেশ বাসুদেব জোষী

স্বদেশী বস্তুর ব্যবহার বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম প্রচারক। ইনি পুণার প্রসিদ্ধ 'সার্ব্বজনিক সভা'র সংস্থাপক ও স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারের বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম প্রচারক। নিজে স্বদেশী ছাড়া অন্য বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না। ইনি সাধারণতঃ "সার্ব্বজনিক কাকা" বলিয়া অভিহিত হইতেন।

৮। তাংজাওর মাধবরাও

(১) রাষ্ট্রনীতিবিদ, (২) দক্ষ রাজপুরুষ। ইনি ট্রাভাঙ্কোর ও ইন্দোর রাজ্যে দেওয়ানের এবং বড়োদায় দেওয়ান ও রেজেন্টের কার্য্য দক্ষতার সহিত করেন। এই তিন রাজ্যে বিশেষতঃ বড়োদা ও ট্রাভাঙ্কোরে ইঁহার সুশাসনকালে অনেক উন্নতি সাধিত ও সুবিধি প্রবর্ত্তিত হয়। ইনি মাদ্রাজের প্রথম কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির সভা-পতিত্ব করেন। ইনি মহারাষ্ট্র দেশীয় ব্রাহ্মণ। কিন্তু ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বহুকাল পূর্ব্বে মাদ্রাজ অঞ্চলে গিয়া বাস করিতেছিলেন। সেই প্রদেশেই ইঁহার জন্ম হয়। ইনি রাজা স্যার টি মাধবরাও নামে সুপরিচিত।

৯। হাইম সামুএল কেহামকর

(১) বিদ্যোৎসাহী ২) পরোপকারী। ইনি জাতিতে ইস্‌রাইল। চাকুরি ইঁহার উপজীবিকা ছিল। সাধারণের সাহায্যে স্বজাতীয় ইস্‌রাইলদিগের উপকারের জন্য ইনি এক সমিতি স্থাপন করেন এবং প্রায় চারি লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া তাহাদের জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর ইনি এই বিদ্যালয়ের কার্য্যে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

১০। বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক

(১) বিদ্যানুরাগী (২) প্রাদেশিক ও ভারত-বর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, (৩) গ্রন্থকার। বিদ্যাবত্তা ও বিদ্যানুরাগের জন্য ইঁহার খ্যাতি ছিল; বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য ও কলা বিভাগের প্রধান ডীনের পদে ইনি প্রথম ভারতবাসী মনোনীত হয়েন। প্রাদেশিক ও

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় যোগ্যতার সহিত কার্য্য করেন। মারাঠি সাহিত্যে সুলেখক ছিলেন।

১১। বামন আবাজী মোড়ক

(১) শিক্ষক (২) বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম চারিজন বি এ উপাধিধারীর অন্যতম—ইনি অনেক বিদ্যালয়ে দক্ষতার সহিত প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়া অবশেষে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ হাইস্কুল আমাদের কলিকাতার হিন্দুস্কুলের ন্যায় বোম্বে প্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উচ্চ বিদ্যালয়। হিন্দু-স্কুলের খ্যাতনামা প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ন্যায় ইনি সুশিক্ষক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহাঁর পূর্ব্বে কোন ভারতবাসী এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন নাই।

১২। মহাদেব মোরেশ্বর কুণ্ঠে

(১) শিক্ষক (২) কবি। ইনি শৈশবে দরিদ্র ছিলেন এবং 'মাধুকরী' করিয়া বিদ্যাভ্যাস করেন। ইনি কোল্‌হাপুর ও পুণার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য যোগ্যতার সহিত করেন। ইহাঁর রচিত "রাজা শিবাজী" কাব্য সুপ্রসিদ্ধ।

কলিকাতার হিন্দুস্কুল ও হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় ভোলানাথ পাল ও স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সহিত শিক্ষকরূপে মোড়ক ও কুণ্ঠে এই দুই ব্যক্তিরই তুলনা হইতে পারে।

১৩। বিনায়ক জনার্দ্দন কীর্ত্তনে

(১) মারাঠি সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম নাট্যকার। ইনি ইন্দোরে প্রথমে রাজকুমারের শিক্ষক ও পরে দেওয়ানের কার্য্য করেন। নয় বৎসর মাত্র বয়সে এক প্রবন্ধ লিখিয়া ইহাঁর যথেষ্ট খ্যাতি হয়। 'জয়পাল' নাটক ইহাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক।

১৪। শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত

(১) বিদ্যানুরাগী (২) গ্রন্থকার। সংস্কৃত ও জার্ম্মান ভাষায় ইহাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল; ইনি "বেদার্থ যত্না" নামক এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেসে প্রতিনিধি করিয়া বোম্বে গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে পাঠাইয়া দেন। ইনি বিবিধ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

১৫। বদ্রুদ্দিন তয়্যাবজী

(১) বিচারপতি (২) স্বদেশসেবক (৩) রাজনীতিবিদ (৪) ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। ইনি বোম্বাই অঞ্চলের খ্যাতনামা দেশভক্ত ও সর্ব্বপ্রথম দেশীয় ব্যারিষ্টারদিগের অন্যতম। ইনি ব্যারিষ্টারি কার্য্যে যথেষ্ট যোগ্যতা দেখান। সকল প্রকার দেশ-হিতকর কার্য্যে, বিশেষতঃ রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যে যোগ দেন, এবং সকল কার্য্যে সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। ইনি মাদ্রাজের প্রথম কংগ্রেসে সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, পরে হাইকোর্টের বিচারপতির কার্য্য দক্ষতা ও ন্যায়নিষ্ঠার সহিত করেন।

১৬। শামরাও বিঠ্‌ঠল কায়কানী

(১) উকিল (২) বিদ্যোৎসাহী (৩) গ্রন্থকার। ইনি বোম্বাই হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা উকিল ছিলেন এবং বিবিধ লোকহিতকর কার্য্য করেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের ও বিদ্যার্থী ছাত্রদিগের ইনি

তীব্রভাবে শিক্ষা (Suggestion) পাইয়া, তাহার মন যে (ভণ্ড না হইলে) অনেক পরিমাণে উন্নত হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শারীরবিধানবিদেরা মনে করেন সংকীর্ত্তনের সর্ব্বপ্রধান উপকার এই যে, উহা একান্ত নিরীহ অথচ আমোদজনক ও উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। সংকীর্ত্তন দেশে সুপ্রচলিত হইলে দেশের অনেক ডাক্তার খরচ ও ঔষধ খরচ কমিয়া যাইবে। অত্যন্ত ক্ষীণকায়, বক্রাকার, অতিস্থূলকায়, অজীর্ণ, অম্ল ও অন্যান্য বহুবিধ রোগশীর্ণ লোকের সংখ্যা দেশ হইতে কমিয়া যাইবে, এবং অন্যান্য লোকেরও বিবিধ রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার শক্তিও প্রভূত-পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে।

সংকীর্ত্তনের উদ্দাম নৃত্য ও উচ্চ চীৎকার করিবার সময় শরীরের ফুসফুস (Lungs) ও হৃদয়যন্ত্রের (heart) ক্রিয়া সবেগে হইতে থাকে। পায়ের ও হাতের মাংসপেশীসমূহও যথেষ্ট মাত্রায় পরিচালিত হয়। তদ্ব্যতীত উদরের মাংসপেশী সমূহ এবং পাকস্থলী (stomach) অন্ত্র (Intestines) যকৃত (Liver) মূত্রযন্ত্র (Kidney) ও অন্যান্য যন্ত্র নৃত্যকালে পরস্পরের সহিত সংঘর্ষণে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে থাকে। ইহাতে সেই সকল যন্ত্রের মধ্য দিয়া রক্ত সঞ্চালন-ক্রিয়া খুব বেগে হইতে থাকে ঐ যন্ত্রগুলি সবল ও সুস্থ হইয়া উঠে। নৃত্যের ফলে শরীরের উদর দেশের সঞ্চিত চর্ব্বি শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং শরীরে যে নূতন চর্ব্বি সঞ্চিত হয় তাহা শুধু শরীরের উদরদেশে জমিতে সুবিধা না পাইয়া শরীরের সর্ব্বস্থানে সমভাবে সঞ্চিত হয়। চর্ব্বি এইরূপ ভাবে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হওয়ায় শারীরিক সৌন্দর্য্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। পাকযন্ত্র ও যকৃৎযন্ত্র পর্য্যাপ্তরূপ রক্ত সঞ্চালন দ্বারা সবল হওয়ায় নৃত্যদ্বারা লোকের অজীর্ণাদি রোগ সমূহ সত্বর বিনষ্ট হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং ভুক্ত অন্ন সুন্দররূপে জীর্ণ করিবার ও শরীর মধ্যে গ্রহণ (absorption and assimilation) করিবার ক্ষমতাও যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অতিস্থূলত্ব রোগে ভুগিতেছেন এবং চিকিৎসায় কোন ফল পান নাই তাঁহারা দুই চারি দিন সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়া অসাধারণ ফল পাইবেন। নৃত্যের এই অসাধারণ গুণের জন্যই সক্রেটিস (Socrates) ইহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যায়াম বলিতেন। ইংরাজদিগের বল-নাচ (Ball-dance) যাহা তাঁহাদের প্রত্যেক যুবক-যুবতীকে শিখিতে হয় তাহা আমাদের সংকীর্ত্তনের মতই তাণ্ডব-নৃত্য। সংকীর্ত্তনে স্বাস্থ্যবৃদ্ধি হইবার আর একটি কারণ—বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বত্রই ভীষণ জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে। সকল লোকেই নিজ নিজ ব্যবসায়ের দুশ্চিন্তায় একান্ত ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার ও উদ্বেগের মাত্রাটা সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিতই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই উদ্বেগ (Worry) * মানুষের স্বাস্থ্যনাশের এক প্রধান কারণ। মানুষে দিবসের যতক্ষণ এই উদ্বেগের হস্ত হইতে মুক্ত থাকিতে পারে ততই উহা তাহার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবনের

* Saleeby's "Worry" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পক্ষে মঙ্গলকর। পাশ্চাত্য দেশে এজন্য বিবিধ ক্রীড়া-কৌতুকের প্রচলন হইতেছে। এতদ্দেশেও এক্ষণে ফুটবল প্রভৃতি ক্রীড়ার দিন দিন চলন হইতেছে। ঐ সকল স্বাস্থ্যকর ক্রীড়ার দেশ মধ্যে যতই প্রচলন হয় ততই দেশের মঙ্গল। ফুটবলে যে সকল লোক দর্শকরূপে উপস্থিত হয় তাহাদের ক্রীড়া সন্দর্শন জনিত আনন্দ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাদের ব্যায়াম অতি সামান্য মাত্রই হয়। সংকীর্ত্তনে কিন্তু সকলেই যোগ দিতে পারে। উহা ফুটবলের তুলনায় অতি অল্প ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। আর উহাতে অতি পরিশ্রমে শরীর খারাপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। এবং উহা ফুটবলের অপেক্ষাও অধিক আনন্দ-দায়ক। লোকের আনন্দ হইলেই নৃত্য করিতে ইচ্ছা হয় এবং নৃত্য করিতে করিতেও অন্তরে উল্লাসের উদয় হয়।

আমাদের যুবকগণ গ্রীষ্মাবকাশের বা পূজাবকাশের পর স্ব স্ব পল্লীগ্রাম হইতে সহরে ফিরিয়া আসিয়া বলেন যে কয়েক দিবস পরই পল্লীগ্রামে বাস করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়, সঙ্গীর অভাবে প্রাণ বিকল হইয়া উঠে; সহরে পলাইয়া আসিবার জন্য একান্ত ঔৎসুক্য জন্মে। পল্লীগ্রামে যে লোকের অভাব আছে তাহা নহে। কিন্তু তাহাদের সহিত মিশিবার উপায়ের অভাব। অনেক পল্লীগ্রামে ১৮ টাকা দিয়া একটা ফুটবল সংগ্রহ করা অসম্ভব ব্যাপার। বল সংগ্রহ হইলেও এক টুকরা খেলিবার জমি পাওয়া আরও শক্ত। পূর্ব্বের হাড়ু ডুডু, চিকে দাঁড়ী (চোড় চোড়) প্রভৃতি দেশী খেলা সভ্যতার চিড়িকে একবারে নির্ব্বাসিত। আছে শুধু তাদের গল্পের আড্ডা—প্রায় গাঁজা বা গুলির আড্ডা। আড্ডায় আত্ম-সম্মান-জ্ঞান যাহার বিন্দুমাত্রও আছে সেরূপ কোন যুবকেরই যোগদান করা উচিত নহে। ঐ সকল যুবক যদি স্ব স্ব গ্রামে এক একটী সংকীর্ত্তনের দল করিয়া তাহাতে যোগ দেন, তবে তাহাদের ছুটীর সময়টাকে তত কষ্টকর বোধ হইবে না ত বটেই পরন্তু দেশের একটা মহা উপকার হইবে। দেশের অশিক্ষিত সাধারণের সহিত মিলিত হইয়া এক সঙ্গে একটা কাজ করিলে তাহাদের সহিত যতটা সখ্য অন্য সহস্র উপায়েও তাহার কিছুই হইবে না।

আমার জনৈক পরিচিত ব্যক্তির বাটীর নিকটে তাহার কয়েক ঘর প্রজা সন্ধ্যার সময় সংকীর্ত্তন করিত। আমার সংকীর্ত্তন সম্বন্ধীয় মতগুলি তাহার নিকট প্রকাশ করিয়া তাহাকে সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে বলিলাম। তিনি বলিলেন সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা হয়, কিন্তু যাহারা সংকীর্ত্তন করে তাহাদের আচরণ দেখিলে আর আমার সে ইচ্ছা থাকে না। যাহারা আজ রাত্রে "হরি" "হরি" "গৌর" "গৌর" বলিয়া চীৎকার করিয়া, কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইতেছে তাহারাই কাল মদ খাইয়া বেশ্যাবাড়ী যাইতেছে কি কোনও মিথ্যা সাক্ষ্যের দ্বারা অর্থাগমের চেষ্টা করিতেছে।

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, যাহারা সংকীর্ত্তন করে তাহারা সেই শ্রেণীর, যাহারা সংকীর্ত্তন না করে তাহাদের অপেক্ষা হীনতর চরিত্রের লোক বলিয়া তিনি কোনও

প্রমাণ পাইয়াছেন কি না। তিনি স্বীকার করিলেন যে তিনি সেরূপ কোনও প্রমাণ পান নাই। অতএব আমাদের বিশেষ ব্যথিত হইবার কারণ নাই।

ইহা স্বীকার্য্য, সংকীর্ত্তনে প্রচুর ভণ্ডের আবির্ভাব হইয়া থাকে, অনেক স্থলে তাহারাই সংকীর্ত্তনের পরিচালক। কিন্তু কোন্ সংকার্য্যেই বা ভণ্ডের আবির্ভাব না হইয়া থাকে? স্বদেশের জন্য প্রাণ দিব বলিয়া যাহারা চীৎকার করিয়া থাকে তাহাদের মধ্যেও কি দল দল ভণ্ড নাই? দরিদ্র রূপ নারায়ণের সেবার জন্য যে সকল স্বামী বক্তৃতা করিয়া ও কাঁদিয়া বেড়ান তাহাদের মধ্যে অনেকেই কি দুর্ভিক্ষপীড়িতের জন্য সংগৃহীত অর্থে ক্রীত ল্যাংড়া আম ও লুচি পাঁটা খাইয়া অত্যধিক মাত্রায় স্ফীত কলেবর হইয়া পড়েন না? ফল কথা, যেরূপ বেশভূষা বা আচরণ করিলে লোকে কিয়ৎসংখ্যক লোকেরও শ্রদ্ধা, ভক্তি বা বিশ্বাসের পাত্র হইয়া নিজেদের আর্থিক বা অন্যবিধ—ঐহিক সুখাভিলাষ পূরণের সম্ভাবনা দেখিবে ভণ্ডেরা সেইরূপ আচরণ করিতে কখনই বিরত হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমাদিগকে সমুদয় সৎকার্য্যে যোগদান করা অসঙ্গত বিবেচনা করিতে হইবে। প্লেটোই বোধ হয় বলিয়া গিয়াছেন সাধু লোকে যদি সদনুষ্ঠানের নেতা না হন তবে তাঁহাদের আলস্য বা অনাস্থার জন্য তাঁহাদিগকে, সদনুষ্ঠান সকল অসাধু লোকের নেতৃত্বে পরিচালিত হইতেছে, তাহা দেখিতে হইবে।

ভণ্ড ও পাষণ্ডগণও যদি সংকীর্ত্তনে যোগ দেয়—তাহা হইলেও যে সমাজের কতক মঙ্গল হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ সংকীর্ত্তনের উচ্চ হুংকারও নৃত্যের সময় তাহার মন কুচিন্তায় ব্যাপৃত থাকিতে পারে না। পরে সংকীর্ত্তন জনিত গুরু পরিশ্রমে রাত্রে তাহার প্রগাঢ় নিদ্রা হওয়ার ফলে তাহার লোকের অনিষ্ট চিন্তা করিবার অবসর অনেকটা কমিয়া যাইবে। দুষ্কৃতের কুচিন্তা করিবার অবসর যতই কমে সমাজের ততই মঙ্গল।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ,
অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা।

সৌন্দরনন্দ *

১২

'আপনি অপ্সরার জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছেন!' আনন্দের এই কথা শ্রবণ করিয়া নন্দ অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন. তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বে স্বর্গকে ধ্রুব বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন শুনিলেন যে, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে, তখন তাঁহার কামনা আর সেই দিকে গমন করিল না; অপ্রমত্ত সারথির রথ যেমন উন্মার্গ হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহার মনোরথও সেইরূপ

* মহাকবি অশ্বঘোষ বিরচিত সংস্কৃত বৌদ্ধ কাব্যের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ

তাহা হইতে নিবৃত্ত হইল। স্বর্গতৃষ্ণা নিবৃত্ত হওয়ায় তখনই তিনি নিজেকে সুস্থ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। অপ্সরার চিন্তা তাঁহার হৃদয় হইতে একবারে অপগত হইল, তিনি নিত্য মঙ্গল পাইবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য তিনি ধীরে ধীরে গুরুর নিকটে আগমন করিলেন, এবং তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক অধো-বদন ও বাষ্পাকুললোচন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন—'ভগবন্, আপনি আমার দিব্যাঙ্গনালাভের প্রতিভূ হইছিলেন, কিন্তু আর আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। অার আমার মর্ত্ত্য বা দেব-লোকে প্রবৃত্তি নাই। যত্নের দ্বারা নিয়মের দ্বারা স্বর্গকে পাইলেও কামনার তৃপ্তি হইতে না হইতেই আবার তাহা হইতে পতিত হইতে হয়, অতএব এ স্বর্গকে নমস্কার, আমি এই স্থাবর জঙ্গমপূর্ণ সংসারকে দেখিয়া এখন আপনার সর্ব্বদুঃখ-বিনাশক ধর্ম্মেই আনন্দ লাভ করিতেছি। অতএব আপনি তাহা আমার নিকটে ব্যাখ্যা করিয়া বলুন, যাহাতে আমি পরম পদ প্রাপ্ত হইতে পারি।'

তথাগত বলিলেন—'নন্দ, অরণি মন্থন করিবার সময় যেমন অগ্নির পূর্ব্বে ধূম উত্থিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তোমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য এই বিচারের উদয় হইয়াছে। আমি ইহাতে আনন্দিত হইলাম। চঞ্চল ইন্দ্রিয়বাজিগণ তোমাকে কুপথে লইয়া যাইতেছিল, আজ সৌভাগ্যবশত তুমি সুপথে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। আজ তোমার জন্ম সফল, আজ তোমার মহান্ লাভ! নন্দ, এই সংসার গৃহেই আরাম অনুভব করে, নিবৃত্তির প্রতি অনুরাগ এখানে দুর্লভ। সকলেই প্রার্থনা করে যে, আমার যেন সুখ হয়, এবং দুঃখ না হয়; কিন্তু যাহাতে দুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইয়া থাকে, সেই সুখ যে কি, তাহা তাহারা বুঝে না। এই জগৎ নিয়ত দুঃখহেতু কামোপভোগে আসক্ত হইয়া অব্যয় সুখ যে কি তাহা জানিতেছে না। তুমি যখন বিষ পান করিয়া সময় থাকিতে থাকিতেই ঔষধ পান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তখন সেই সর্ব্বদুঃখাপহ অমৃত তোমার হস্তস্থিত। চণ্ড বায়ু উত্থিত হইলে সূর্য্য-প্রভা যেমন রজো দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, তোমার বুদ্ধিও সেই প্রকার এতদিন রজো দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। মঙ্গলের প্রতি তোমার এই যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা অতি যুক্ত। এই যে ইচ্ছা, ইহাই সমস্ত ধর্ম্মের হেতু। যদি গমন বা শয়ন করিবার ইচ্ছা থাকে, তবেই লোকে গমনে বা শয়নে প্রবৃত্ত হয়। লোকের যদি শ্রদ্ধা থাকে যে, ভূমির নিম্নে জল আছে, এবং তাহাতে তাহার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলেই সে তাহা খনন করে। অরণিতে অগ্নি আছে বলিয়া যদি শ্রদ্ধা না থাকে, অথবা তাহাতে প্রয়োজন বোধ না হয়, তাহা হইলে কেহ তাহা মন্থন করে না। শস্যের উৎপত্তিতে যদি কৃষকের শ্রদ্ধা না থাকে, বা তাহার প্রয়োজন মনে না করে, তাহা হইলে সে কখনো বীজবপন করে না। আমি শ্রদ্ধাকে হস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করি, কেননা হস্ত দ্বারা যেমন ধন গ্রহণ করা যায় সেইরূপ শ্রদ্ধারই দ্বারা সদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারা যায়। বস্তু-তত্ত্বগ্রহণে ইন্দ্রিয় যেমন প্রধান, সদ্ধর্ম্ম-গ্রহণে

শ্রদ্ধাও তেমনি প্রধান, এই জন্য শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়-স্বরূপ। শ্রদ্ধা দ্বারা স্থৈর্য্যলাভ করিতে পারা যায় বলিয়া শ্রদ্ধা বলে। দারিদ্র্যকে উপশমিত করে এই জন্য শ্রদ্ধা ধন। শ্রদ্ধা ধর্ম্মকে রক্ষা করে বলিয়া তাহা ঈষিকা (অস্ত্র-বিশেষ)। নন্দ, শ্রদ্ধা অতি দুর্লভ, এই জন্য আমি ইহাকে রত্ন বলি। শ্রদ্ধাই মঙ্গলের মূল কারণ, এই জন্য আমি ইহার নাম দিয়াছি বীজ, এবং পাপকে প্রবাহিত করিয়া পবিত্রতা সম্পাদন করে বলিয়া আমি শ্রদ্ধাকে নদী বলিয়া থাকি। অতএব তুমি তোমার এই শ্রদ্ধাঙ্কুরকে বর্দ্ধিত কর; মূলের বৃদ্ধিতে যেমন পাদপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শ্রদ্ধার বৃদ্ধিতে ধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যাহার দৃষ্টি ব্যাকুল, চিত্ত যাহার দুর্ব্বল, তাহার শ্রদ্ধা কোন কার্য্যে আসে না। যতক্ষণ তত্ত্বকে দর্শন বা শ্রবণ করা না যায়, ততক্ষণ শ্রদ্ধা স্থিরা ও বলবতী হয় না; তত্ত্বদর্শন হইলে নিগৃহীতেন্দ্রিয় ব্যক্তির শ্রদ্ধাবৃক্ষ সফল ও আশ্রয় হইয়া উঠে।'

১৩

এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া নন্দ আনন্দে আপনাকে অমৃত-পরিচিত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, এবং বুদ্ধ তাঁহার শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে মঙ্গললাভের ক্রমনির্দ্দেশপূর্ব্বক পুনর্ব্বার উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, তাঁহাকে চরিত্রবান্ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে, দৃঢ়ব্রত হইতে হইবে। পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া যেমন সমস্ত কার্য্য হয়, সেইরূপ শীলকে আশ্রয় করিয়াই সমস্ত মঙ্গলক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই বলিয়া তিনি শীলের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া দেখাইলেন যে, শীলসম্পন্ন না হইলে মোক্ষলাভ করিতে পারা যায় না।

"শীলং হি শরণং সৌম্য কান্তার ইব দৈশিকঃ।
মিত্রং বন্ধুশ্চ রক্ষা চ ধনঞ্চ বলমেব চ॥"

'হে সৌম্য, কান্তারে পথ-উপদেশকের ন্যায় শীলই শরণ, এবং তাহাই মিত্র ও বন্ধু, এবং একমাত্র ধন, বল ও রক্ষা।'

এইরূপে তিনি তাঁহাকে শীল শোধন করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন :—সৌম্য, তুমি সর্ব্বদা সচেতন ভাবে থাকিবে। ইন্দ্রিয় সমূহ স্বভাবতই চপল। বিষয় হইতে ইহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণকে যেরূপ ভয় করা উচিত, সেরূপ ভয় শত্রু, বা বজ্র, বা ভুজঙ্গকেও করিতে হয় না। শত্রু সমূহ হয় ত কখন পীড়া প্রদান না করিতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ সকলকেই এবং সব সময়েই পীড়া প্রদান করিয়া থাকে। শত্রু প্রভৃতি কর্ত্তৃক নিহত হইলে কেহ নরকে গমন করে না, কিন্তু চপল ইন্দ্রিয়সমূহ লোককে বধ করিয়া নরকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। কামরূপ ব্যাধ সঙ্কল্পবিষদিগ্ধ ইন্দ্রিয়ময় শরসমূহ দ্বারা মানব-হরিণগণকে বিদ্ধ করিতেছে, আর তাহারা কতক নিহত হইয়া কতক বা ক্ষত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে। অতএব সতর্কতারূপ বর্ম্ম ধারণ-পূর্ব্বক ধৈর্য্য-কার্ম্মুক হস্তে নিয়ম-রণাঙ্গনে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে নিবারিত কর। ইন্দ্রিয়সমূহ রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি স্ব স্ব বিষয়কে অবশ্যই গ্রহণ করিবে কিন্তু সেই বিষয়সমূহকে শুভাশুভের নিমিত্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে

না, বা কোন বিশেষ ভাবও কল্পনা করিতে হইবে না। চক্ষুর দ্বারা কোন বস্তুর আকার বা রূপ দর্শন করা যায় সত্য, কিন্তু সেই আকার বা রূপ দর্শন করিয়া ঐ বস্তুকে স্ত্রী বা পুরুষ বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে না, কেবল একটি পদার্থমাত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে ইহাই স্থির করিতে হইবে। যদি বা স্ত্রী পুরুষ বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহার কেশ-দন্ত প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্গ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবে, এবং তাহাতেই বুঝিতে পারিবে যে, তাহা শুভ নহে। পৃথিবী প্রভৃতি যে ভূতকে দর্শন করিয়া, তাহাকে কেবল সেই ভূত বলিয়াই জানিবে, তাহা হইতে তাহার কোন ধর্ম্ম অপনীত করিবে না, বা তাহাতে অপর কিছু আরোপিতও করিবে না। ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহকে এইরূপ দর্শন করিলে তৎসমুদয়ে তোমার আসক্তি বা দ্বেষ উৎপন্ন হইবে না। মধুরভাষী অথচ কলুষিতচিত্ত শত্রু যেমন মিত্রজনোচিত বাক্য দ্বারা লোককে বিনাশ করিয়া থাকে, আসক্তিও সেইরূপ প্রিয়রূপ দর্শন করাইয়া এই জগৎকে বিনষ্ট করিতেছে। বিষয়সমূহে দ্বেষ উৎপন্ন হইলেও লোকে ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। চপলেন্দ্রিয় জগৎ শীত ও উষ্ণের ন্যায় রাগ ও দ্বেষ পীড়িত হইয়া সুখলাভ করিতে পারে না, শ্রেয়ঃলাভ করিতে পারে না। যতক্ষণ চিত্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে কল্পনা করিতে প্রবৃত্ত না হয়, ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়ে গমন করিলেও ততক্ষণ আসক্ত হয় না। ইন্ধন ও বায়ুর যোগে যেমন অগ্নি জ্বলিত হইয়া উঠে, বিষয় ও কল্পনার যোগেও সেইরূপ ক্লেশ-অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। বিষয়ে বস্তুত যাহা নাই তাহা কল্পনা করিয়া লোকে বদ্ধ হয়, আর তাহাকেই কেবল (পৃথিবী প্রভৃতি) ভূতরূপে দর্শন করিয়া মুক্ত হইয়া থাকে। একই রূপকে দর্শন করিয়া একজন তাহাতে অনুরক্ত হয়, একজন আনন্দিত হয়, একজন উদাসীন থাকে, এবং অপর একজন ঘৃণা বোধ করে। অতএব বন্ধ বা মুক্তির কারণ বিষয় নহে; কল্পনা বিশেষেই লোকের আসক্তি হয়, অথবা হয় না। অতএব পরম যত্নে ইন্দ্রিয়কে সংযত করিবে; ইন্দ্রিয়সমূহ সুরক্ষিত না হইলে দুঃখ ও জন্মের কারণ হইয়া থাকে। অতএব এ বিষয়ে তুমি প্রমত্ত থাকিও না।'

১৪

তিনি পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন—'ধ্যান ও অনাময়ের জন্য ভোজন সম্বন্ধে তোমার যেন মাত্রাবোধ থাকে, তুমি পরিমিত ভোজন করিবে।' এই বলিয়া তিনি অতিরিক্ত ও অত্যল্প ভোজনের দোষ সবিস্তরে বর্ণনা করিয়া পরিমিত ভোজনের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন—'তুলা যেমন অতি গুরুভারে অবনত ও লঘুভারে উন্নত এবং সমভারে সমান ভাবে অবস্থান করে, ভোজন ও শরীরের সম্বন্ধেও নিয়মের সেইরূপ। ব্রণ উৎপন্ন হইলে লোকে যেমন চিকিৎসার জন্য আলেপন ব্যবহার করে, মুমুক্ষু ব্যক্তি সেইরূপ ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য আহার গ্রহণ করিবে। পতনোন্মুখ গৃহকে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য যেমন স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়, শরীরকে ধারণ করিবার জন্য সেইরূপ ভোজন করা হইয়া থাকে। প্রবল জলপ্রবাহকেই উত্তীর্ণ হইবার

জন্য যেমন লোকে প্লবকে (ভেলা) বন্ধন বা আশ্রয় করে, এবং তাহা প্লবের প্রতি স্নেহ জন্য নহে, সেইরূপ বিজ্ঞগণ দুঃখপ্রবাহকেই উত্তীর্ণ হইবার জন্য উপকরণসমূহে শরীরকে ধারণ করিয়া থাকেন, শরীরের প্রতি স্নেহ হেতু নহে। শত্রুর পীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া লোকে যেমন তাহাকে তাহার অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করে, এবং তাহা তাহার শত্রুর প্রতি ভক্তি বা অনুরাগ নহে, যোগাচারী ব্যক্তিও সেইরূপ কেবল ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য—অনুরাগ বা ভক্তি জন্য নহে—শরীরকে আহার প্রদান করিয়া থাকে।'

অনন্তর তিনি বলিলেন যে, দিবাভাগ চিত্তের ধারণায় অতিবাহিত করিয়া নিদ্রা-ত্যাগ পূর্ব্বক রাত্রিকেও অতিবাহিত করিতে হইবে। কি প্রকারে জাগরণ করিতে পারা যায়, তিনি তাহারও উপদেশ করিলেন। সমগ্র রাত্রিই যে জাগরণ করিতে হইবে তাহা নহে। ত্রিযামা রজনীর প্রথম যাম বিহিত কার্য্যে অতিবাহিত করিয়া শরীরের বিশ্রামের জন্য শয়ন করিতে হইবে, এবং তৃতীয় যামে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার চিত্তশুদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস করিতে হইবে। সমস্ত কার্য্যেই 'স্মৃতি' অর্থাৎ সতর্কতা বা প্রবোধ রাখিতে হইবে—শরীর, মন ও বাক্যের যখন যে কার্য্য উপস্থিত হয় তাহা যেন ঠিক সেইরূপেই মনে করিতে পারা যায়, (যেমন, যদি বিচরণ করা যায়, তবে সেই সময়ে মনে করিতে হইবে যে, আমি বিচরণ করিতেছি)। দ্বারে দ্বারাধ্যক্ষ অবস্থান করিলে নগর যেমন সুরক্ষিত থাকে, শত্রুগণ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ স্মৃতি যদি উপস্থিত থাকে তাহা হইলে দোষসমূহ আর পীড়া প্রদান করিতে পারে না। স্মৃতি অপগত হইলে তাহার অমৃতও বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু স্মৃতি উপস্থিত থাকিলে সেই অমৃত তাহার হস্তগত হইয়া থাকে। স্মৃতি না থাকিলে উদার ন্যায় থাকে না, উদার ন্যায়ের অভাব হইলে সৎপথ বিনষ্ট হয়, সৎপথের বিনাশে অমৃতের বিনাশ, এবং অমৃতের বিনাশ হইলে দুঃখ হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না। অতএব যদি বিচরণ করা যায় তবে মনে করিতে হইবে যে, আমি বিচরণ করিতেছি, যদি দণ্ডায়মান থাকা যায়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে, আমি দণ্ডায়মান আছি। এইরূপেই সর্ব্বদা স্মৃতি উপস্থিত করিতে হইবে।

যোগের অনুকূল নিঃশব্দ স্থান আশ্রয় করিতে হইবে। চিত্ত সংযত না হয় এবং রাগও প্রবল থাকে, সেই অবস্থায় বিবিক্ত স্থান অবলম্বন না করিলে সৎপথ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহার তত্ত্বদর্শন হয় নাই, সে বিচিত্র বিষয়পূর্ণ স্থানে অবস্থিত করিলে, চিত্তকে সহজে নিবৃত্ত করিতে পারা যায় না। বায়ু দ্বারা প্রেরিত না হইলে অগ্নি যেমন প্রশান্ত হইয়া আসে, সেইরূপ বিবিক্ত স্থানে অক্ষুব্ধ চিত্ত অল্প প্রয়াসেই শান্তিলাভ করিয়া থাকে।

যিনি যাহা　　তাহাই　　করেন, যাহা হয় তাহাই পরিধান করেন এবং কোন এক নির্জ্জন স্থানে বাস করিতে আরাম বোধ করেন, যিনি শান্তি সুখের রস জানিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং যিনি কণ্টকের ন্যায় পরের

সংসর্গকে ত্যাগ করেন তিনিই কৃতার্থ বলিয়া জানিতে হইবে, তিনিই স্বর্গরাজ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুখ ভোগ করিতে পারেন।

১৫

অনন্তর তিনি চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন ও বিরুদ্ধ চিন্তার অপনোদনের জন্য নন্দকে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন:—'তুমি যে-কোন বিবিক্ত স্থানে পর্য্যঙ্ক-আসনে উপবিষ্ট হইয়া দেহকে ঋজু ভাবে রাখিবে, এবং নাসাগ্র, ললাট, বা ভ্রূযুগলের মধ্যে চপল চিত্তকে কোন এক আলম্বন-নিষ্ঠ করিয়া স্থাপন করিবে। যদি মনের মধ্যে কামভোগের বিতর্ক উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বসনলগ্ন রেণুর ন্যায় তখনই তাহা ঝাড়িয়া ফেলিবে। কামভোগ-বাসনা পরিত্যাগ করিলেও ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় তাহার শেষ থাকিয়া যাইতে পারে, অতএব জলের দ্বারা অগ্নির ন্যায় ভাবনার দ্বারা তাহাকে প্রশান্ত করিতে হইবে; কেননা বীজ হইতে অঙ্কুরের ন্যায় পুনর্ব্বার তাহা হইতেই কামসমূহ উৎপন্ন হইতে পারে। এই কামসমূহ অনুসন্ধানের সময় দুঃখ উৎপাদন করে, রক্ষা করিলেও ইহারা শান্তির জন্য হয় না, ভ্রম হইলে পরম শোকের কারণ হয়, এবং প্রাপ্ত হইলেও তৃপ্তি উৎপাদন করে না। অতএব তুমি ইহাদের কথা মনে করিও না।

'মণি দ্বারা যেমন মলিন জলকে পরিষ্কৃত করা যায়, সেইরূপ চিত্তে দ্রোহ বা হিংসা-বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে তাহার বিপক্ষভূত মৈত্রী ও করুণার দ্বারা তাহাকে নির্ম্মল করিয়া লইবে। মন যদি দোষযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহা দ্বারা অপর লোকের পীড়া হইতে পারে, না-ও পারে, কিন্তু তাহা নিজে নিজেই এবং তৎক্ষণই দগ্ধ হইতে থাকে।

'মনে যে যে বিষয়ের বিতর্ক উপস্থিত হয়, পুনঃ পুনঃ আলোচনায় সেই সেই বিষয়েই আসক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব অকল্যাণকে পরিত্যাগ করিয়া কল্যাণকে ধ্যান করিবে। অকল্যাণ বিতর্কসমূহ হৃদয়ে সঞ্চিত হইলে তাহা নিজের ও পরের উভয়েরই অনর্থ উৎপাদন করে। কর্ম্মসমূহের মধ্যে চিত্ত যদি বিক্ষিপ্ত হয়, তবে তাহাও ভাল, কিন্তু হে সৌম্য, তুমি অকল্যাণ বিতর্ক করিও না। নিঃশ্রেয়স-সাধক ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া যদি কেহ অশুভ চিন্তা করে, তাহা হইলে তাহার রত্নদ্বীপে গমন করিয়া রত্নের পরিবর্ত্তে লোষ্ট্রসমূহ আহরণ করা হয়, মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি শুভ পরিত্যাগপূর্ব্বক অশুভ সেবন করে, তাহা হইলে তাহার হিমালয়ে গমন করিয়া ঔষধ-সেবনের পরিবর্ত্তে বিষ পান হইয়া থাকে। অতএব কোন অশুভ বিতর্ক উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিপক্ষ বিতর্কের দ্বারা তাহাকে দূরে ক্ষেপণ করিবে।

'জ্ঞাতিবান্ধববর্গের হানি বৃদ্ধির চিন্তা উপস্থিত হইলে সংসারের স্বভাব পরীক্ষা করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবে। লোক নিজ নিজ কর্ম্মে সংসারে আকৃষ্ট হয়; এখানে কে সাধারণ এবং কে বা আত্মীয়? লোক মোহবশত অপর লোকের প্রতি আসক্ত হয়। সায়ংকালে বিহঙ্গমবর্গের সমাগমের ন্যায় সংসারে জনগণের সংসর্গ হইয়া থাকে। পান্থেরা পথিমধ্যে যেমন বহুবিধ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া যায়,

জ্ঞাতিজনের সমাগমও এই প্রকারই হইয়া থাকে। ভবিষ্যতে আমাকে পোষণ করিবে এই মনে করিয়া মাতা পুত্রকে লালন পালন করেন, এবং পুত্রও তাঁহাকে এই মনে করিয়া সেবা করে যে, ইনি আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। জ্ঞাতিকেও অহিতকর এবং অজ্ঞাতিকেও হিতকর দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব লোক কার্য্যবশত স্নেহ প্রদর্শন বা ছেদন করে। তোমার যে প্রিয় বান্ধব জন পরলোকে রহিয়াছে, সে তোমার কি করিতেছে, এবং তুমিই বা তাহার কি করিতেছ? অতএব জ্ঞাতিজন-বিতর্কে চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করিও না।

'হয় ত তোমার মনে এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, অমুক দেশ উত্তম ও অমুক দেশ অধম। হে সৌম্য, তুমি এ বিতর্কও পরিত্যাগ করিবে। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু লোকের মহৎ ভয় উৎপাদন করে, এমন কোন দেশ নাই যেখানে এই মহৎ ভয় নাই। শরীর যেখানে যায় দুঃখও সেই স্থানে গমন করে। দেশ সুভিক্ষ ও রমণীয় হইলেও তাহাকে কুদেশ বলিয়া মনে করা উচিত, কেননা জরা প্রভৃতি ক্লেশে সেখানেও দগ্ধ হইতে হয়। সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদাই যখন সকলের দুঃখ লাগিয়া থাকে, তখন সেই দেশের প্রতি অভিলাষ বা আসক্তি করা উচিত নহে তোমার এই অভিলাষ ও আসক্তি নিবৃত্ত হইলেই তুমি দেখিতে পাইবে যে, এই জীবলোক জ্বলিত হইতেছে।

তোমার যদি কখন অমরণ-সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হয়, তবে ব্যাধির ন্যায় তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়া, জীবনের সম্বন্ধে এক মুহূর্ত্তও বিশ্বাস করিবে না। বিশ্বাস-ঘাতক কাল ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। লোক যে এই প্রত্যক্ষ নিশ্বাস-প্রশ্বাস করিয়া জীবিত রহিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য। জীবনের কোন বিশ্বাস নাই। অসি উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান শত্রুর ন্যায় কালকে কে বিশ্বাস করিতে পারে—ইহা ত গর্ভ হইতেই হনন করিবার ইচ্ছায় লোককে অনুসরণ করিতেছে। শ্রুতবান্ বা বলবান্ হইলেও কোন লোক যমকে জয় করিতে পারে না, কেহ পারে নাই, এবং কেহ পারিবেও না। অতএব চঞ্চল আয়ুতে বিশ্বাস করিও না।

'অতএব এই সমস্ত বিতর্কের পরিত্যাগের জন্য সংক্ষেপত তুমি প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। ধূলিসমাচ্ছন্ন সুবর্ণ পাইবার ইচ্ছায় লোক যেমন প্রথমে স্থূল ধূলিসমূহকে ধৌত করিয়া তাহার পর বিশুদ্ধির জন্য সূক্ষ্ম ধূলিসমূহকেও ধৌত করিয়া থাকে, এবং তাহার পর বিশুদ্ধ স্বর্ণ-অবয়ব সমূহ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মুক্তির জন্য যুক্তচিত্ত হইয়া প্রথমে স্থূল দোষ সমূহ পরিত্যাগ করিয়া তাহার পর বিশুদ্ধির জন্য সূক্ষ্ম দোষসমূহকেও পরিত্যাগ করিতে হয় এবং তাহার পর বিশুদ্ধ ধর্ম্মাঙ্গসমূহ লাভ করিতে পারা যায়, ও মন বিশুদ্ধ হইয়া উঠে। কর্ম্মকার যেমন বিশুদ্ধ সুবর্ণকে নানাবিধ অলঙ্কার-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত করিয়া থাকে, ভিক্ষুও সেইরূপ বিশুদ্ধ চিত্তকে অসাধারণ জ্ঞানসমূহে যথেচ্ছ নিযুক্ত করিতে পারে।'

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী

সার এবং সারের আবশ্যকতা ও ব্যবহার প্রণালী

জীবনধারণ জন্য প্রাণিগণের আহারের প্রয়োজন হয়। আহার্য্য বস্তু নানাবিধ। ভাত, ডা'ল, দুগ্ধ, মাংস, মৎস্য, শাক-সবজী, রুটী ও ফল-মূল প্রভৃতি আহার করিয়া আমরা জীবনধারণ করিয়া থাকি। উদ্ভিদ-কুলের জীবনধারণ জন্যও আহারের প্রয়োজন হয়। প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যু আছে। উদ্ভিদগণও এই স্বাভাবিক নিয়মের অধীন। প্রাণীর ন্যায় ইহাদেরও জীবন আছে। জীবনধারণ জন্য ইহাদেরও খাদ্যের প্রয়োজন হয়। ইহাদের দেহ যে যে উপাদানে গঠিত, উহার অধিকাংশই ইহারা ভূমি ও বায়ু হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উদ্ভিদকুল প্রতিনিয়ত ভূমিতে সঞ্চিত স্বাভাবিক সার গ্রহণ করিতেছে। কাজেই ভূমিতে স্বতই উহার অভাব হইয়া থাকে। সার দ্বারা ঐ অভাব পূরণ না করিলে ভূমি অতিশয় দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সেইজন্যই ভূমিতে উহার কোন উপাদানের অভাব হইলেই সার দ্বারা উহার পূরণ করিতে হয়। এই অভাব পূরণ জন্যই সার ব্যবহারের আবশ্যকতা হয়। সারই উদ্ভিদের খাদ্য।

উদ্ভিদ-দেহের জন্য অল্প বা অধিক পরিমাণে অম্লজান (Oxygen), অঙ্গারজান (Carbon), উদজান (Hydrogen), যবক্ষারজান বা শোরাজান (Nitrogen), পোটাশ (Potash), ফস্ফোরিক এসিড্ (Phosphoric acid), ও অত্যল্পপ রিমাণে চূণ (Lime) ও ম্যাগ্নিসিয়া (Magnesia), নামক পদার্থের প্রয়োজন হয়। ইহাই ইহাদের খাদ্য। সুতরাং যে সারে এই সকল পদার্থ বিদ্যমান আছে উহাই ভূমিতে প্রয়োগ করার আবশ্যক হয়। পক্ষান্তরে, কোন ভূমিতে ইহাদের কোনটীর অস্তিত্ব ও অপরের অভাব থাকিলে, যেটীর অভাব আছে সেইটীই প্রয়োগ করিতে হয়।

সকল উদ্ভিদের জন্যই যে একইরূপ সারের প্রয়োজন হয় তাহা নহে। উদ্ভিদের স্বভাব বিশেষে উহার জন্য যে সারের প্রয়োজন তাহাই প্রয়োগ করিতে হয়। স্থূলতঃ ভূমির অবস্থা ও গাছের স্বভাব বিবেচনায় সার নির্ব্বাচন করার আবশ্যক হয়। যথা—শিম্বীধারী উদ্ভিদের জন্য নাইট্রোজেন-প্রধান সার আবশ্যক। ভূমিতে উহার অভাব হইলে ঐ সার প্রয়োগ করিতে হইবে।

সারের ভূমিতে একরূপ জীবাণুর (Bacteria) অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয় ইহারাই ভূমি-স্থিত যবক্ষারজানকে নাইট্রেট (nitrate) আকারে পরিণত করিয়া উহাকে উদ্ভিদের আহার যোগ্য করে। যবক্ষারজান নাইট্রেট আকারে পরিণত হইলেই সহজে দ্রবীভূত হয় এবং উহা দ্রব হইলেই উদ্ভিদের আহার যোগ্য হয়।

ভূমিতে দ্বিবিধ জীবাণু দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এক জাতীয় জীবাণু এমোনিয়াকে (Ammonia) নাইট্রাইটস্ (Nitrites) আকারে ও অন্যরূপ জীবাণু নাইট্রাইটস্কে

(Nitrites) নাইট্রেট্ (Nitrate) আকারে পরিণত করে। এই সকল জীবাণু অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন কদাচিৎ দৃষ্টি-গোচর হয়। এই উভয়বিধ জীবাণুর একে অন্যের কার্য্য সাধন করিতে অক্ষম। এই জীবাণুগণ বায়ু হইতেও নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহারা বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া উদ্ভিদের মূলে ও কাণ্ডে সঞ্চিত রাখে। কোন কোন উদ্ভিদে ইহার দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। শণ ও ধঞ্চে প্রভৃতি উদ্ভিদের মূলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটি (nodules) দৃষ্টিগোচর হয় উহাই জীবাণু কর্ত্তৃক সংগৃহীত নাইট্রোজেন। উহা অগ্নিতে দগ্ধ করিলে একরূপ তীব্র গন্ধ অনুভব করা যায়। এই জাতীয় উদ্ভিদের সবুজ সার (Green Manure) ভূমির পক্ষে বিশেষ উপকারী। অধুনা বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই সকল জীবাণু সংগ্রহ করিয়া উহাদের চাষ করা হইতেছে। উহা এইক্ষণ বাজারে খরিদ করিতে পাওয়া যায়। উহা দ্বারা ভূমির টীকা (inoculation of the soil) দেওয়া হইতেছে। উহারা নাইট্রো-ব্যাক্টেরাইন্ (Nitro-bacterine) ও নাইট্রোজিন (Nitrogen) নামে পরিচিত। মৎকৃত সারতত্ত্ব নামক পুস্তকে সার সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্তব্য। এস্থলে সংক্ষেপে সচরাচর ব্যবহার্য্য কয়েকটী সারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সার সাধারণতঃ দ্বিবিধ। জৈবিক (organic) ও অজৈবিক বা ধাতব inorganic or mineral)। উদ্ভিজ্জ (Vegetable) ও জান্তব সার (animal manure) মাত্রই জৈবিক সার ও লৌহ (iron), ম্যাগনিসিয়া (Magnesia), সোডা (Sodium), পোটাস্ (Potassium) প্রভৃতি ধাতব (metalic or inorganic) সার। উভয় বিধ সার মধ্যে কোন কোনটী মৌলিক ও কোন কোনটী যৌগিক। যৌগিক সার মাত্রই কৃত্রিম (artificial) তদ্ভিন্ন উদ্ভিদ বিশেষের জন্য যে সার প্রস্তুত হয় উহাকে বিশেষ সার (Special manure) কহে।

১। গোময় (Cowdung) গোময় ও গোশালার আবর্জ্জনাই সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট সার। ইহা পচাইয়া যে সার প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গোময়-ভস্ম (Cowdung ashes) ও তরল গোময়ও সার স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গোময়-ভস্ম সারের পক্ষে তত উপযোগী নহে। বাস্তবিক উহা সারের কার্য্য করিতে অক্ষম। মৃত্তিকার উৎকর্ষ সাধন জন্য ইহার ব্যবহার হয়। বালি ও আঠাল মৃত্তিকার আঁশ ভাঙ্গিবার পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। কোন কোন কীটের উপদ্রব নিবারণ জন্যও ইহার ব্যবহার হয়। তরল গোময়ও কোন কোন অবস্থায় বিশেষ সারের কার্য্য করিয়া থাকে। গোময়ের ন্যায় উৎকৃষ্ট সার আর নাই। গোময় গর্ত্তে মজুত করিয়া সময় সময় উহা খোঁচাইয়া উলট পালট করিয়া দিতে হয়। বৃষ্টির জল দ্বারা উহা ধৌত হইলে অধিকাংশ সময়েই উহার সারাংশ নষ্ট হয়। তজ্জন্য গোময়ের স্তূপের উপরে ছায়লা করিয়া দেওয়া সঙ্গত। দেড় হইতে দুই বৎসর মধ্যে গোময় বিশেষরূপে পচিয়া থাকে। ইহা পচিলে শাক-সবজী ও মাঠজ ফসলের পক্ষে বিশেষ উপকারী হয়। ফল-মূলের ও অন্যান্য গাছের পক্ষেও

ইহা কম উপকারী নহে। গোময় ক্ষেত্রে ছিটাইয়া বা গাছের গোড়ায় দিয়া ব্যবহার করা যায়। গাছের গোড়া খোঁচাইয়া উহার চারিদিগের মৃত্তিকা উস্কাইয়া দিয়া উহাতে এই সার ব্যবহার করিতে হয়। সময় সময় জল দিলে উহা ক্রমে দ্রব হইয়া উদ্ভিদের আহারযোগ্য হয়। কোন কোন উদ্ভিদের জন্য সদ্য গোময় গুলিয়াও ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। গোময়ের তরল সার কোন কোন ফুল গাছের জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরাতন গোময় ব্যবহারের পূর্ব্বে উহা অত্যুষ্ণ জল দ্বারা ধৌত করা প্রয়োজন। কেননা পুরাতন জান্তব সার মাত্রেই অধিকাংশ সময়ে উদ্ভিদের অনিষ্টকারী কীটাদির আবাস-স্থান হয়। গরম জলে ঐরূপ সার ধৌত করিয়া লইলে উষ্ণতা দ্বারা ঐ সকল কীট মরিয়া যায়। গোমূত্রও উৎকৃষ্ট সার। গোমূত্র-মিশ্রিত গোময় সকল ফসলের পক্ষেই বিশেষ উপকারী।

অন্যান্য পশুর বিষ্ঠা (Dung of other animals)

ছাগ-বিষ্ঠা, ভেড়ার-বিষ্ঠা, ঘোড়ার-বিষ্ঠা, কপোত-বিষ্ঠা, কুক্কুট-বিষ্ঠা, ও মনুষ্য-বিষ্ঠা, প্রভৃতিও সার স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উদ্ভিদবিশেষে ইহাদের ব্যবহার হইয়া থাকে। এই সকল সার সকল উদ্ভিদের পক্ষেই উপকারী নহে। ইহাদের প্রত্যেকের গুণ ও ব্যবহার-প্রণালী স্বতন্ত্র রূপ।

রক্ত, মাংস ও অস্থি
(Blood, flesh and bone)

জীবের রক্ত, মাংস ও অস্থি প্রভৃতিও সার স্বরূপে ব্যবহার হয়। এই সকল সার নানা আকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৎস্য পচাইয়া যে সার প্রাপ্ত হওয়া যায় উহাও কোন কোন উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

উদ্ভিজ্জ সার ও সবুজ সার
(Vegetable and green manure)

উদ্ভিজ্জাদি পচাইয়াও উহা হইতে উৎকৃষ্ট সার প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহাও অধিকাংশ উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। উহাই উদ্ভিদের স্বাভাবিক খাদ্য। কেননা অধিকাংশ সময়েই উদ্ভিদের পত্র, মূল ও ডাল-পালা প্রভৃতি ভূমিতে পচিয়া উহা স্বভাবতঃই উদ্ভিদের খাদ্য হয়। কোন কোন সজীব সবজীকে চাষ দিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশাইয়া দিয়া ভূমিতে সবুজ সার (Green manure) প্রদান করা হয়। উহাও উৎকৃষ্ট সার।

পাতার সার (Leaf mould)

উদ্ভিদের পাতা পচাইয়া উহা হইতেও উৎকৃষ্ট সার প্রাপ্ত হওয়া যায়। উদ্ভিদের পাতা সংগ্রহ করিয়া কোন গর্ত্তে পচাইয়া পাতার সার প্রস্তুত করিতে হয়। প্রায় এক বৎসরে উহা পচে। উহা পচিয়া গুড়ার মত হইলে ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে। ইহাও অধিকাংশ উদ্ভিদের পক্ষে উপকারী হয়।

ঘাসযুক্ত দোয়াশ ও দগ্ধমৃত্তিকা
(Turfy loam and burnt soil)

ঘাস-মিশ্রিত মৃত্তিকার চাপড়া বা চাপ উঠাইয়া কোন স্থানে মজুত রাখিবার পরে তৎস্থিত ঘাসাদি পচিয়া গেলে উহাও সার স্বরূপে ব্যবহার করা যায়। উহাও উদ্ভিদের পক্ষে উপকারী খাদ্য। আবার উহা পোড়াইয়া লইলে উহাও উৎকৃষ্ট সার হয়। সাধারণ পোড়া মৃত্তিকাও কোন কোন

উদ্ভিদের পক্ষে সারের কার্য্য করে। পাত্রে যে সকল উদ্ভিদের চাষ হয় উহাদের পক্ষে দগ্ধ মৃত্তিকা বিশেষ উপকারী।

খইল সার
(Oilcake Manure)

সর্ষপ, রেড়ী, মূলা, শালগম, ও কপি প্রভৃতির বীজের খইলও উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট খাদ্য। কোন কোন উদ্ভিদের পক্ষে উহা অতিশয় উপকারী। খইল মৃত্তিকাতে গর্ত্ত করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়া তদুপরি মৃত্তিকায় চাপ দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। ২০ দিন হইতে এক মাস মধ্যে উহা পচিয়া যায়। ঢাকিয়া না দিলে পচা খইল হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ বহির্গত হয়। খইল পচিবার পরে উহা গর্ত্ত হইতে উঠাইয়া শুষ্ক করিতে হয়। খইল শুষ্ক করিয়া উহার গুড়া সার স্বরূপে ব্যবহার করা হয়। তরুণ খইলের দাহিকাশক্তি প্রবল। সেইজন্য উহা পচাইয়া লইতে হয়। তরুণ খইল জলে গুলিয়াও কোন কোন গাছ ব্যবহার করা হয়। পান, ইক্ষু ও পটল প্রভৃতি গাছের জন্য তরুণ খইলের ব্যবহার হয়। সর্ষপ খইলেরই দাহিকা শক্তি আরও প্রবল।

আবর্জ্জনা (Sweepings)

বাড়ীর, বাগানের ও রাস্তার আবর্জ্জনা হইতেও উৎকৃষ্ট সার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবর্জ্জনা ভালরূপে পচিলেই সার রূপে ব্যবহার হইবার যোগ্য হয়। আবর্জ্জনা কোন গর্ত্তে বা এক স্থানে স্তূপ করিয়া রাখিতে হয়। উহা প্রায় এক বৎসরে পচিয়া ব্যবহারের উপযোগী হয়।

নীলের সিটী। (Indigo refuse.)

নীলের সিটীও উৎকৃষ্ট সার। উহা শাক-সবজীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। নীল গাছ পচাইয়া উহা হইতে নীল বাহির করিয়া নিলে উহার গাছ ও ডালপালা যাহা অবশিষ্ট থাকে উহা একস্থানে স্তূপ করিয়া রাখিলে ২।৩ বৎসর উহা পচিয়া সাররূপে পরিণত হয়। নীলের সার শাক-সবজী, তামাক ও সর্ষপ প্রভৃতির পক্ষে বিশেষ উপকারী।

গুড়ের মাৎ ও ভাটী খোলায় মদের ছাক
(Treacle or Distillery refuse)

গুড়ের মাৎ ও ভাটীখোলার মদের ছাকও সার স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। উহা পচিলেও উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট খাদ্য হয়। ইহা পাতার সার ও সবজী সার সহিত মিশ্রিত করিয়া শাক-সবজীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করিলে ঐ ক্ষেত্র হইতে আশাতীত ফললাভ করা যায়। সবজী চাষের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

স্যুট (Soot)

কাষ্ঠ ও কয়লা প্রভৃতি পোড়াইলে উহার ধোঁয়া হইতে কৃষ্ণবর্ণ গুড়া গুড়া একরূপ পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাকেই স্যুট বা ঝুল কহে। ইহাও সার স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা মূলজ বা উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ উপকারী, ইহা দ্বারা ভূমির কেঁচো প্রভৃতি কীট নষ্ট হয়। ইহা টবের গাছের পক্ষেও বিশেষ উপকারী।

আস্তাবলের আবর্জ্জনা
(Stable sweepings)

ইহাও পচিলে উৎকৃষ্ট সার হয়। ইহা ভালরূপে পচিতে প্রায় ২ বৎসর লাগিয়া থাকে। ইহা ভালরূপে না পচিলে উদ্ভিদের অপকার সাধন করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ।

আধুনিক মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ সন্তানগণ

[এই প্রবন্ধে পরলোকগত মারাঠা কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীরগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। লেখক মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে সি, আই, ই মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত "ভারত-সেবক-সমিতি"র সদস্য। তিনি ১০।১২ বৎসর বয়স্ক বাঙ্গালী বালকগণকে আধুনিক মহারাষ্ট্রের পরিচয় দিবার জন্য একখানি পুস্তিকা রচনা করিতেছেন। প্রবন্ধটি সেই পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়। এই বিবরণটুকু সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু কেবল শিশুগণের উপযোগী কেন, অনেক প্রবীণ বাঙ্গালীরও জ্ঞাতব্য। আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ সম্বন্ধে এত অজ্ঞ যে, এই যৎসামান্য পরিচয়েও কথঞ্চিৎ উপকার হইবে মনে করি। বিশেষ আক্ষেপের বিষয়, মহারাষ্ট্র সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা বঙ্গসাহিত্যে একেবারেই হয় নাই। অথচ আমরা 'ভারতবর্ষ', 'ভারতবাসী' 'জাতীয় মহাসমিতি' ইত্যাদি শব্দে নাচিয়া উঠি। আশা করি, আমরা জড়ত্ব ভাঙ্গিয়া পরস্পরকে চিনিবার আয়োজন করিতে বিলম্ব করিব না।]

১। পরশুরাম বল্লাল গোড়বোলে

কবি—ইনি আধুনিক মারাঠি সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম প্রসিদ্ধ লেখক। ইনি কতিপয় সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেন।

২। জগন্নাথ নানা শঙ্করশেট মুকুটে

(১) বিদ্যোৎসাহী, (২) বিদ্যানুরাগী, (৩) দাতা, (৪) রাজনীতিবিদ। ইনি বালক ও বালিকাদিগের জন্য পৃথক বিদ্যালয়, দাতব্য ঔষধালয়, ধর্ম্মশালার স্থাপয়িতা, 'বম্বে এসোসিয়েসনে'র সংস্থাপক, ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য।

৩। পুরুষোত্তম বাবা কেঙ্করে

(১) রাজনীতিবিদ, (২) দাতা। ইঁহার আন্দোলনের ফলে পর্ত্তুগীজরাজ্য গোয়ার রাজনৈতিক সভায় হিন্দুগণ প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকার পান। ইনি দুর্ভিক্ষের সময় লক্ষ টাকার শস্য অল্পমূল্যে ও বিনামূল্যে বিতরণ করেন।

৪। দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গ তর্খড়কর

(১) গ্রন্থকার (২) শিক্ষক (৩) ধর্ম্ম সংস্কারক। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "উপক্রমণিকা"

ও "কৌমুদী" ব্যাকরণের ন্যায় দাদোবাকৃত-"ব্যাকরণ" মহারাষ্ট্রের বিদ্যালয়ে প্রসিদ্ধ। ইনি অন্যান্য পাঠ্য পুস্তকও লিখিয়াছেন। ইনি উত্তম শিক্ষক ছিলেন, পরে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। 'প্রার্থনা'-সভার পূর্ব্বে যে সভা পরমহংস-সভা বলিয়া খ্যাতি লাভ করে, সে সভা ইঁহাদ্বারা স্থাপিত হয়।

৫। কেরো লক্ষ্মণ ছত্রে

(১) আদর্শ শিক্ষক, (২) বিদ্যানুরাগী। ইনি গণিত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ৫০৲ টাকা বেতনের শিক্ষকতা হইতে আরম্ভ করিয়া পুণা কলেজের গণিতের অধ্যাপক হন এবং হাজার বার শ টাকা বেতন পান। ইনি আদর্শ শিক্ষক ছিলেন।

৬। জোতিরাও গোবিন্দরাও ফুলে

(১) বিদ্যোৎসাহী (২) সমাজ-সংস্কারক। ইনি জাতিতে ফুলমালী। ইনি স্ত্রীশিক্ষা ও অন্তজ জাতির (মাহারদিগের) জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ও দক্ষতার সহিত তাহার পরিচালন করেন। ভ্রূণহত্যা নিবারণের জন্য স্বব্যয়ে প্রসূতি-আগার স্থাপন করেন। ইনি বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও অন্তজ জাতির উন্নতি বিষয়ে অনেক চেষ্টা করেন।

৭। গণেশ বাসুদেব জোষী

স্বদেশী বস্তুর ব্যবহার বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম প্রচারক। ইনি পুণার প্রসিদ্ধ 'সার্ব্বজনিক সভা'র সংস্থাপক ও স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারের বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম প্রচারক। নিজে স্বদেশী ছাড়া অন্য বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না। ইনি সাধারণতঃ "সার্ব্বজনিক কাকা" বলিয়া অভিহিত হইতেন।

৮। তাংজাওর মাধবরাও

(১) রাষ্ট্রনীতিবিদ, (২) দক্ষ রাজপুরুষ। ইনি ট্রাভাঙ্কোর ও ইন্দোর রাজ্যে দেওয়ানের এবং বড়োদায় দেওয়ান ও রেজেন্টের কার্য্য দক্ষতার সহিত করেন। এই তিন রাজ্যে বিশেষতঃ বড়োদা ও ট্রাভাঙ্কোরে ইঁহার সুশাসনকালে অনেক উন্নতি সাধিত ও সুবিধি প্রবর্ত্তিত হয়। ইনি মান্দ্রাজের প্রথম কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিত্ব করেন। ইনি মহারাষ্ট্র দেশীয় ব্রাহ্মণ। কিন্তু ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বহুকাল পূর্ব্বে মান্দ্রাজ অঞ্চলে গিয়া বাস করিতেছিলেন। সেই প্রদেশেই ইঁহার জন্ম হয়। ইনি রাজা স্যার টি মাধবরাও নামে সুপরিচিত।

৯। হাইম স্যামুএল কেহামকর

(১) বিদ্যোৎসাহী (২) পরোপকারী। ইনি জাতিতে ইস্রাইল। চাকুরি ইঁহার উপজীবিকা ছিল। সাধারণের সাহায্যে স্বজাতীয় ইস্রাইলদিগের উপকারের জন্য ইনি এক সমিতি স্থাপন করেন এবং প্রায় চারি লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া তাহাদের জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর ইনি এই বিদ্যালয়ের কার্য্যে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

১০। বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক

(১) বিদ্যানুরাগী (২) প্রাদেশিক ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, (৩) গ্রন্থকার। বিদ্যাবত্তা ও বিদ্যানুরাগের জন্য ইঁহার খ্যাতি ছিল; বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য ও কলা বিভাগের প্রধান ডীনের পদে ইনি প্রথম ভারতবাসী মনোনীত হয়েন। প্রাদেশিক ও

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় যোগ্যতার সহিত কার্য্য করেন। মারাঠি সাহিত্যে সুলেখক ছিলেন।

১১। বামন আবাজী মোড়ক

(১) শিক্ষক (২) বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম চারিজন বি এ উপাধিধারীর অন্যতম —ইনি অনেক বিদ্যালয়ে দক্ষতার সহিত প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়া অবশেষে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ হাইস্কুল আমাদের কলিকাতার হিন্দুস্কুলের ন্যায় বোম্বে প্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উচ্চ বিদ্যালয়। হিন্দু-স্কুলের খ্যাতনামা প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ন্যায় ইনি সুশিক্ষক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহাঁর পূর্ব্বে কোন ভারতবাসী এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন নাই।

১২। মহাদেব মোরেশ্বর কুণ্ঠে

(১) শিক্ষক (২) কবি। ইনি শৈশবে দরিদ্র ছিলেন এবং 'মাধুকরী' করিয়া বিদ্যাভ্যাস করেন। ইনি কোল্‌হাপুর ও পুণার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য যোগ্যতার সহিত করেন। ইহাঁর রচিত "রাজা শিবাজী" কাব্য সুপ্রসিদ্ধ।

কলিকাতার হিন্দুস্কুল ও হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় ভোলানাথ পাল ও স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সহিত শিক্ষকরূপে মোড়ক ও কুণ্ঠে এই দুই ব্যক্তিরই তুলনা হইতে পারে।

১৩। বিনায়ক জনার্দ্দন কীর্ত্তনে

(১) মারাঠি সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম নাট্যকার। ইনি ইন্দোরে প্রথমে রাজকুমারের শিক্ষক ও পরে দেওয়ানের কার্য্য করেন। নয় বৎসর মাত্র বয়সে এক প্রবন্ধ লিখিয়া ইহাঁর যথেষ্ট খ্যাতি হয়। 'জয়পাল' নাটক ইহাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক।

১৪। শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত

(১) বিদ্যানুরাগী (২) গ্রন্থকার। সংস্কৃত ও জার্ম্মান ভাষায় ইহাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল; ইনি "বেদার্থ যত্না" নামক এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেসে প্রতিনিধি করিয়া বোম্বে গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে পাঠাইয়া দেন। ইনি বিবিধ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

১৫। বদ্রুদ্দিন তয়্যাবজী

(১) বিচারপতি (২) স্বদেশসেবক (৩) রাজনীতিবিদ (৪) ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। ইনি বোম্বাই অঞ্চলের খ্যাতনামা দেশভক্ত ও সর্ব্বপ্রথম দেশীয় ব্যারিষ্টারদিগের অন্যতম। ইনি ব্যারিষ্টারি কার্য্যে যথেষ্ট যোগ্যতা দেখান। সকল প্রকার দেশ-হিতকর কার্য্যে, বিশেষতঃ রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যে যোগ দেন, এবং সকল কার্য্যে সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। ইনি মাদ্রাজের প্রথম কংগ্রেসে সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, পরে হাইকোর্টের বিচারপতির কার্য্য দক্ষতা ও ন্যায়নিষ্ঠার সহিত করেন।

১৬। শামরাও বিঠ্‌ঠল কায়কানী

(১) উকিল (২) বিদ্যোৎসাহী (৩) গ্রন্থকার। ইনি বোম্বাই হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা উকিল ছিলেন এবং বিবিধ লোকহিতকর কার্য্য করেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের ও বিদ্যার্থী ছাত্রদিগের ইনি

পরম সহায় ছিলেন। কানাড়ি ভাষায় অনেক গ্রন্থ ইনি রচনা করেন।

১৭। মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে

(১) নেতা (২) সমাজ-সংস্কারক (৩) রাজনীতিবিদ (৪) ভারতীয় অর্থশাস্ত্র-বিশারদ (৫) ধর্ম্মসংস্কারক (৬) বিচারপতি (৭) বিদ্যোৎসাহী (৮) গ্রন্থকার (৯) চিন্তাশীল। ইনি আধুনিক ভারতবর্ষীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতাদিগের মধ্যে অন্যতম। সমাজ সংস্কার, ধর্ম্ম-সংস্কার প্রভৃতি বিবিধ দেশহিতকর কার্য্যের প্রবর্ত্তক ও অগ্রণী ছিলেন। ভারতবর্ষীয় সামাজিক সম্মিলন (Indian Social Conference) ইহাঁর উদ্যোগে প্রবর্ত্তিত হয়। রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকার দরুণ যদিও প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসে যোগ দিতে পারিতেন না, তত্রাচ সর্ব্বদা পরামর্শ প্রভৃতি দ্বারা ইহার সহায়তা করিতেন। ভারতবর্ষীয় অর্থশাস্ত্র বিষয়ে ইহাঁর সবিশেষ জ্ঞান ছিল এবং ঐ বিষয়ে ইহাঁর পুস্তক এখনও প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। পুণায় ইনি "বসন্ত ব্যাখ্যান মালা" নামে লোকশিক্ষার জন্য সাধারণ বক্তৃতার প্রচলন ও স্ত্রীলোকদিগের জন্য উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করেন। ইনি প্রার্থনাসমাজের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্য ছিলেন এবং ইহাকে পুনর্জীবিত করেন। ইহাঁর মহারাষ্ট্র-শক্তির উত্থান (Rise of the Marhatta Powers) ও ভারতবর্ষীয় অর্থশাস্ত্র (Indian Economics) গ্রন্থদ্বয় সুপরিচিত। রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রমেশচন্দ্র দত্ত, দয়ানন্দ সরস্বতী ও দাদাভাই নৌরোজীর সহিত আধুনিক কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া ইহাঁর নামের উল্লেখ হয়। চিন্তাশীল ও ধীরবুদ্ধি বলিয়া ইহাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল।

১৮। রবিবর্ম্মা

চিত্রকর। ইনি সুনিপুণ চিত্রকর ছিলেন। ইহাঁর চিত্র সকল পাশ্চাত্য চিত্র-শিল্পের পদ্ধতি অনুসারে চিত্রিত। ইনি অনেক পৌরাণিক চিত্র চিত্রিত করিয়া যশস্বী হন। ইনি তৈলচিত্রে ও প্রতিরূপচিত্রণে সুদক্ষ ছিলেন। জর্ম্মণী হইতে দক্ষ শিল্পী আনাইয়া রঙ্গিন চিত্র ছাপাইবার ছাপাখানা স্থাপন করিয়া ইনি নিজের চিত্রের বহুল প্রচার সাধন করেন। আমাদের বাঙ্গালায় যেমন শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাচ্য প্রথায় চিত্রকলার পুনঃ প্রবর্ত্তনের নেতা, সেইরূপ রবিবর্ম্মা পাশ্চাত্য প্রথার অনুকরণকারীদিগের নেতা। বাঙ্গালার বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিও রবিবর্ম্মার ন্যায় পাশ্চাত্য প্রথার অনুসরণ করেন।

১৯। কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলঙ্গ

(১) বিচারপতি (২) বিদ্যানুরাগী (৩) বিদ্যোৎসাহী (৪) বক্তা (৫) দেশহিতৈষী। আমাদের দেশের স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ মিত্রের ন্যায় ইনি অতি অল্প বয়সে হাইকোর্টের জজ হয়েন এবং তাঁহার মত মেধাবী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন ও তাঁহার মত অকালে পরলোক গমন করেন। ইনি বিবিধ দেশহিতকর কার্য্যে বিশেষতঃ রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতেন এবং বোম্বে অঞ্চলে প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েসন বা কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট কার্য্যে সর্ব্বদা অগ্রণী ছিলেন। ইহার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং ঐ পুস্তকের ইনি যে ইংরাজী অনুবাদ করেন তাহা সুপ্রসিদ্ধ। সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রে ইহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় ইনি বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম এতদ্দেশীয় ভাইস্‌চ্যান্সলর হন। ইনি অনেক বিদ্যার্থীকে সাহায্য করিতেন।

২০। বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপলুনকর

(১) প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার (২) সম্পাদক। ইনি প্রসিদ্ধ মারাঠি লেখক; ইহার "নিবন্ধমালা" (প্রবন্ধমালা) মারাঠি সাহিত্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। ইনি প্রসিদ্ধ মারাঠি সংবাদপত্র "কেশরী" ও ইংরাজী সংবাদপত্র "মারাঠা" প্রবর্ত্তন করেন। পুণার বিখ্যাত

"নিউ ইংলিশ স্কুল" "চিত্রশালা" ইত্যাদি স্থাপন করেন। "নিউ ইংলিশ স্কুল"এর ক্রমবিস্তারের ফলে সুপ্রসিদ্ধ ফার্গুসন কলেজ স্থাপিত হয়। ইহাকে মহারাষ্ট্রের আধুনিক উন্নতিমূলক আন্দোলনের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। ইনি অতি সুলেখক ছিলেন এবং ইহার লেখার ফলে সমগ্র মহারাষ্ট্রে নব ভাবের উন্মেষ দেখা যায়। কতক অংশে আমাদের দেশের বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত ইহাঁর তুলনা করা যায়। "সুশিক্ষিতের লক্ষণ—লোক-শিক্ষা ও লোক-সেবা" ইহা ইহাঁর উপদেশ। ইহাঁর প্রচেষ্টার ফলে মারাঠি সাহিত্য ও মারাঠি ইতিহাসের সেবায় সাধারণের মন আকৃষ্ট হয়।

২১। গোপাল গণেশ আগরকর

(১) কলেজের অধ্যক্ষ (২) আদর্শ শিক্ষক (৩) সমাজ-সংস্কারক (৪) সম্পাদক। ইনি মহারাষ্ট্রের একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন; ছাত্রদিগকে কেবল পাঠ্য বিষয়ে উপদেশ দিয়া ইনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, তাহাদের চিত্তের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের জন্যও সবিশেষ যত্ন লইতেন। লোক-শিক্ষার প্রসারেই দেশের উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে ইহাই ইনি মনে করিতেন, এবং এই মনে করিয়াই নিউ ইংলিশ স্কুল স্থাপনে বিশেষ উদ্যোগী হ'ন ও তৎকার্য্যে সমূহ সাহায্য করেন। ইনি ফার্গুসন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।" "কেশরী" পত্রের প্রথম সম্পাদকের কার্য্য ইনি করেন এবং সমাজ-সংস্কার বিষয়ে মতদ্বৈধ হওয়ায় "কেশরী" পরিত্যাগ করিয়া "সুধারক" (অর্থাৎ "সংস্কারক") পত্র প্রবর্ত্তন করেন এবং বিশেষ যোগ্যতার সহিত তাহার পরিচালন করেন। ইনি সুলেখক ছিলেন ইহাঁর লিখিত পুস্তকাবলী আধুনিক মারাঠি সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। মহারাষ্ট্রে সমাজ-সংস্কার বিষয়ে যে কিছু পরিবর্ত্তন তাহার মূল কারণ প্রিন্সিপাল আগরকারের চেষ্টাসম্ভূত বলা যাইতে পারে। কতক অংশে আমাদের স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকারের সহিত ইহাঁর তুলনা করা যাইতে পারে।

২২। বামন শিবরাম আপ্টে

(১) কলেজের অধ্যক্ষ (২) সুশিক্ষক (৩) গ্রন্থকার। ইনিও একজন সুশিক্ষক ও আগরকারের সমসাময়িক লোক ছিলেন। ইনি যদিও নিউ ইংলিশ স্কুল স্থাপনকারীদিগের মধ্যে ছিলেন না, তত্রাচ ইহাঁর বিদ্যাবত্তা ও গুণের জন্য শীঘ্রই শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হন। ইনি ফার্গুসন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং ইহাঁর যত্ন ও সুবন্দোবস্তের ফলে উক্ত কলেজ ও স্কুল দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। ইনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ডেকান এডুকেশনল সোসাইটীর সদস্য ছিলেন ও সেই সমিতির কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁর সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান সুপ্রসিদ্ধ।

২৩। আনন্দীবাই জোশী

(১) ডাক্তার (২) প্রথম হিন্দু মহিলা এম, ডি। বিবাহের পর ইহাঁর স্বামী ইহাঁকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা হইয়া আমেরিকায় যান এবং সেখানে তিন বৎসর পরে এম, ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসালয়ে কার্য্য পান। কিন্তু ইনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে অকালে পরলোক গমন করেন।

শ্রীঅমূল্যকুমার বসু।

ভৈরবী

মালদহ জাতীয়-শিক্ষাসমিতি কর্তৃক সংগৃহীত

ndia Press, Calcutta.

ভৈরবী মূর্ত্তির পরিচয়*

চৈত্র মাসের 'গৃহস্থে' 'ভৈরবী' মূর্ত্তির একটি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত বহু দেবদেবীর ছায়াচিত্রের অন্যতম।

মালদহ জেলার অন্তর্গত কলিগ্রাম জাতীয় বিদ্যালয়ের নিকটবর্ত্তী ভক্তিপুর বা ভগবতীপুর নামক স্থানে একটি সুবৃহৎ পাষাণ-মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। স্থানীয় জনগণ উক্ত মূর্ত্তিটিকে 'ভৈরবী' মূর্ত্তি বলিয়া পূজা প্রদান করিয়া আসিতেছে। বাস্তবিক উহা 'ভৈরবী' মূর্ত্তি কি 'মহাভৈরব-ভৈরবী' মূর্ত্তি তাহা আমরা বলিতেছি না। দেশের জনগণের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা উহার নাম 'ভৈরবী' মূর্ত্তি বলিয়াছি। মূর্ত্তি সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই, কারণ মূর্ত্তিটি একটি জটিল তান্ত্রিক মূর্ত্তি। অল্পায়াসে উক্ত মূর্ত্তিটির পরিচয় ব্যক্ত করা দুরূহ, সুতরাং আমরা যথাসময়ে উক্ত মূর্ত্তির পরিচয় পত্রস্থ করিব মনে করিয়া অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলাম। মূর্ত্তি বিবৃতির মত কঠিন কার্য্য ঐতিহাসিক গবেষণার মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই এইরূপ আমাদের বিশ্বাস। সুতরাং হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা যথা ইচ্ছা নামকরণের পক্ষপাতী নহি।

বৈশাখ মাসের 'গৃহস্থে' শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্, এ মহাশয় এই মূর্ত্তির ছায়াচিত্র মাত্র দেখিয়া উহার এক নূতন নামকরণ করিয়াছেন। আমরা এই মূর্ত্তির বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। ইহাকে ভৈরবী মূর্ত্তি নাম দিলে দোষ হয় এরূপ আমরা মনে করি না।

মূর্ত্তিটি কৃষ্ণবর্ণ কষ্টিপ্রস্তর জাতীয় প্রস্তরে খোদিত। দীর্ঘ ৪' ৪", প্রস্থ ২' ৩", স্থূলতায় ৬" মাত্র।

মূল দেবতা—শিব ও শক্তির মিলন-রূপ।

মূল মূর্ত্তিদ্বয়ের সর্ব্বনিম্নস্থ অংশের মধ্যভাগে একটি জটিল মূর্ত্তি-সমষ্টি। ঐ জটিল মূর্ত্তির সর্ব্ব নিম্নে 'কারণাম্বুধি' মধ্য হইতে সমৃণাল প্রস্ফুটিত কমল উদ্গত হইয়াছে। পদ্মমৃণাল-বেষ্টনে "মহানাগ" বা "বাসুকী" ফণা বিস্তারপূর্ব্বক বিদ্যমান আছেন। মহানাগের মস্তকোপরি "বিকশিত পদ্ম," উক্ত পদ্মাসনোপরি "মহাকূর্ম্ম" (হংস নহে) বিরাজ করিতেছেন। মহাকূর্ম্মোপরি একটি সালঙ্কারা নারীমূর্ত্তি (ধরিত্রীদেবী) নতজানু ও উপবিষ্টা রহিয়াছেন। দুই হস্ত, বামহস্তে "লীলা-কমল" ধৃত এবং দক্ষিণ হস্ত বক্ষদেশে বিন্যস্ত (অথবা বামকরে ত্রিশূল, দক্ষিণ করে "কারণ"পূর্ণ নরকপালসহ বক্ষস্থলে সংবদ্ধ)

এই জটিল মূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে তিনটি মূর্ত্তি। উক্ত তিন মূর্ত্তির দক্ষিণের দুইটি সালঙ্কারা নারী মূর্ত্তি যুক্তকরে নতজানু হইয়া উপবিষ্ট। উহাদের দক্ষিণে একটি পুরুষমূর্ত্তি (কুল-ভৈরব) পদ্মাসনোপরি উপবিষ্ট দ্বিভুজ—বামকরে ত্রিশূল, দক্ষিণ কর 'কারণ'-পূর্ণ নরকপাল ধারণ পূর্ব্বক বক্ষস্থলে বিন্যস্ত। এই মূর্ত্তিত্রয়ের মধ্যস্থটি ক্ষুদ্র। দুই পার্শ্বের মূর্ত্তি মধ্যস্থমূর্ত্তি হইতে বৃহৎ।

জটিল মূর্ত্তির বাম পার্শ্বে চারিটি নারী-মূর্ত্তি। ক্ষুদ্র। কোন প্রকার আসন নাই, নতজানু ও যুক্তকরে উপবিষ্ট। সর্ব্ব বাম ভাগের মূর্ত্তিটি সালঙ্কারা নারী-মূর্ত্তি (কুল ভৈরবী), পদ্মাসনোপরি উপবিষ্ট—বামহস্তে ত্রিশূল এবং দক্ষিণহস্ত 'কারণ'পূর্ণ নরকপালসহ বক্ষস্থলে সংবদ্ধ।

মূল শিব-শক্তির মূর্ত্তির পাদপীঠস্থ মূর্ত্তি-সমষ্টি ঐ প্রকারে খোদিত রহিয়াছে।

* এই মূর্ত্তিটি রক্ষা করিবার জন্য ৺রাধেশচন্দ্র উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের মালদহ অধিবেশনকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন।

মূল মূর্ত্তিদ্বয়ের পরিচয় দানের পূর্ব্বে অন্য মূর্ত্তিগুলির পরিচয় প্রদান করিলাম।

শিব-মূর্ত্তির দক্ষিণ অধঃভাগে—পদ্মাসনোপরি উপবিষ্ট দ্বিভুজা নারীমূর্ত্তি। বামকরে ত্রিশূল, দক্ষিণকর কারণপূর্ণ নরকপাল ধারণ পূর্ব্বক বক্ষস্থলে সংবদ্ধ রহিয়াছে।

শক্তি-মূর্ত্তির বামাধঃভাগে উক্ত প্রকার পদ্মাসনোপরি নারীমূর্ত্তি।

শিবমূর্ত্তির দক্ষিণভাগে উর্দ্ধ দ্বিতীয় করবাল-ধৃত হস্ত। পার্শ্বে পদ্মাসনোপরি ত্রিশূলাদি হস্ত বিশিষ্ট নারীমূর্ত্তি।

শক্তিমূর্ত্তির শিরোমুকুটের বামভাগে পদ্মাসনোপরি পূর্ব্বোক্ত নারীমূর্ত্তি।

শিব-শক্তির মস্তকোপরি "কীর্ত্তিমুখ", উক্ত কীর্ত্তিমুখের উভয় পার্শ্বে পূর্ব্বোক্ত নারীমূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছে।

কীর্ত্তিমুখের উর্দ্ধ দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে মালা-হস্তে দুইটি "গন্ধর্ব্ব"। দুইটি গন্ধর্ব্ব মূর্ত্তির মধ্য ও উর্দ্ধভাগে পূর্ব্বোক্ত নারীমূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে।

মূল শিব-শক্তি-মূর্ত্তি

মূল পদ্মাসনের উপরে দুইটি শয়ান মূর্ত্তি, দক্ষিণস্থ মূর্ত্তিটি বামপার্শ্বভাগে শায়িত এবং বামহস্তোপরি মস্তক বিন্যস্ত। উহা পুরুষমূর্ত্তি (শব, বা শিব-প্রেত)। "শিব-প্রেত" মূর্ত্তির বামে উক্ত মূর্ত্তি অপেক্ষা ক্ষুদ্র নারীশবমূর্ত্তি—"শিব-প্রেত"বং শয়ানা রহিয়াছেন। ইহাই "পুরুষ" সংসর্গ বিরহিত "প্রকৃতি' বা সচ্চিদানন্দ পরম শিবের সহিত আত্মসংযোগ বিরহিতা "পরমাশক্তি"।

শিব-শবের কটিদেশের উপরে অর্দ্ধোপবিষ্ট শিবমূর্ত্তি। দক্ষিণ-পদ শিব-শব নিম্নস্থ ক্ষুদ্র প্রস্ফুটিত শতদলোপরে বিন্যস্ত। বামোরুপরি মহাশক্তি উপবিষ্ট। তাঁহার বাম চরণ শিব-বাম-উরু পরেই সংবদ্ধ, বামচরণ শবরূপা শিবা পৃষ্ঠদেশে সংস্থিত রহিয়াছে।

শিব—দশহস্ত, চতুরানন (একটি মস্তক পশ্চাতে অদৃশ্য) জটাজুট বিমণ্ডিত ত্রিনেত্র। মস্তকোর্দ্ধে সকুণ্ডল নারী-শির (সম্ভবতঃ—চৈতন্যরূপিণী তেজোরূপা "মহাকালী" মুখ—শাস্ত্রে "গিরিমুখ" বা 'আনন্দ কানন' বলিয়া নির্দ্দেশ আছে—উহাই সূর্য্যাদি সর্ব্ব দেব-তেজোময় "অমৃত"ময়ী শক্তি-পন্থা—শিব এ স্থলে "কেবলানন্দ"—আদিনাথ ভৈরব-মহাকালভৈরব)

দশহস্ত—দক্ষিণের সর্ব্বনিম্নহস্ত বর (অভয়-মুদ্রা) ক্রমান্বয়ে ত্রিশূল বজ্র, ঋষ্টি, সর্ব্বোপরিস্থ হস্তে সুধাপূর্ণ মহাশঙ্খপাত্র বক্ষস্থলে সংবদ্ধ।

বাম সর্ব্বনিম্নস্থ—ধনু, পাশ (?) চর্ম্ম, গদা, ও সর্ব্বোপরিস্থ হস্ত শক্তির কণ্ঠে বেষ্টনপূর্ব্বক বাম স্তনাগ্রে সংবদ্ধ।

শক্তি—শিবমূর্ত্তির বামোরুপরে উপবিষ্ট, দক্ষিণপদ শিবের বাম উরুপরে সংবদ্ধ, বামপদ স্ত্রীশব-পৃষ্ঠে সংবদ্ধ।

দক্ষিণ সর্ব্বনিম্ন কর—বর (অভয় মুদ্রা)। শিব হস্তে ধৃত অস্ত্রাদি অনুরূপ অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা শোভিত। সর্ব্ব-উপরিস্থ হস্ত সুধাপূর্ণ মহাশঙ্খ পাত্র বক্ষস্থলে বিন্যস্ত।

বাম হস্ত—শিববৎ, কেবল সর্ব্বোর্দ্ধ হস্ত বাম কটিদেশ সন্নিকটে বিন্যস্ত। উহাদ্বারা সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্র ধারণ করিয়া থাকেন (বিদ্যা-রাজ্ঞী—অনিরুদ্ধ সরস্বতী ভাবশুদ্ধ মহাবিদ্যা মন্ত্রপূর্ণ পুস্তক)

এই পাষাণ মূর্ত্তিটি অতিশয় জটিল ভাবময়ী কল্পনা প্রসূত। ইহা তান্ত্রিক মূর্ত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই।

"হরিশঙ্কর" মূর্ত্তি নামে একটি চতুর্ম্মুখ, ত্রিনেত্র বিংশভুজবিশিষ্ট মহাবিষ্ণু বা মহা-রুদ্রের মূর্ত্তি কল্পিত হইয়া থাকে। চতুর্ম্মুখ শিব শাস্ত্র-সম্মত। অনেকে ব্রহ্মলিঙ্গ বলিয়া থাকে। এ মূর্ত্তিটি তদনুরূপ নহে। ইহা গৌরীশঙ্করের যুগল মূর্ত্তি হইলেও মূর্ত্তিটি প্রকৃত পক্ষে বড়ই সমস্যাপূর্ণ।

"শূলরাজ আদিনাথ মহাকাল ভৈরব ভৈরবী" মূর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই এই মূর্ত্তিটি তদনুরূপই হইতে

পারে। রুদ্র শিব যোগশাস্ত্রে ভৈরব বেশে বিদ্যমান আছেন দেখা যায়। অধিকাংশ রুদ্রও পঞ্চবদন, দশহস্ত বিশিষ্ট, এই "ভৈরবী" মূর্ত্তিটি সম্বন্ধে আরও একটু সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা এই যে "বীরাচারী" কর্ত্তৃক 'কুলাচার' প্রথার "কুলরস" দ্বারা অর্চ্চিত হইত।

বীরব্যক্তি কার্য্য-সিদ্ধির জন্য কর্ম্মের আদিতে "রতি, বাণী, রমা, জ্যেষ্ঠা, মাতঙ্গী, কুল-কামিনী, দুর্গা ও ভদ্রকালীর পূজা করিবেন। রাজকামী, অর্থলিপ্সু, কীর্ত্তিকামী ও ঐশ্বর্য্যার্থী প্রভৃতি সাধকগণ রুদ্ররূপী মহাভৈরব মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু সেগুলির মধ্যে শাক্তগণ যুগল মূর্ত্তিরই প্রাধান্য স্বীকার করেন। কুলাচারপরায়ণ বীর ব্যক্তিগণ "শক্তিচক্র" সাধনার পক্ষপাতী। এই মূর্ত্তিটিও একটি চক্র এবং শক্তি প্রাধান্যে চিহ্নিত, এবং ৮ বা ৯টি শক্তিচক্রে পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন।

যোগ-নিদ্রাগত মহাকাল শম্ভুর সহিত যোগিনীগণ রতিতে সমাসক্ত। যোগিনীগণের প্রত্যেকেরই হস্তে সুরাপূর্ণ পাত্র এবং তাঁহারা মূল শিবশক্তিকে পরিবেষ্টন করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। মদমত্তা যোগিনীগণ উক্ত ভৈরব শম্ভুর অনুগমন করিয়াছেন।

পরমাত্ম শিবরূপ ভৈরব পরমা শক্তি ভৈরবীর সহিত আত্ম সংযোগ করিয়াছেন—উহারই নামান্তর "মৈথুন"। এইরূপ পুরুষ ও প্রকৃতি সম্মিলনে বিশ্ববিকাশ হইয়াছে। এই প্রকার আত্মসংযোগ না হইলে শিব ও শক্তি উভয়েই নিশ্চেষ্ট থাকেন। সুতরাং পৃথক শবাসন দুইটিতেই (পুং ও স্ত্রী) শিব-শক্তির শব-রূপত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। উভয়ে যেমন সংযুক্ত হইয়াছেন অমনি ক্রীয়াশীল হইয়াছেন। কিন্তু এই শিব-শক্তি মহান্ তেজোময়, রুদ্রের "ইচ্ছাশক্তি"ই আদ্যাশক্তি।

এই 'ভৈরবী' মূর্ত্তি আধ্যাত্মিক ভাবময়, মহাযোগাসনে উপবিষ্ট যোগমূর্ত্তি। শিব ও শক্তি যোগবলে একাত্মগত কুলকুণ্ডলিনীর সহিত মিলনের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। কুলকুণ্ডলিনীর সহিত মিলন হইলে "বিন্দু" হইতে যে অত্যুত্তম "সুধাধারা" বিগলিত হয় যোগিবেশে ও যোগিনী-বেশে তাহাই পান করিতেছেন। এই প্রকার পানকে "মহাপান" বলে এবং ইহাই "কুলযোগ"। কুলযোগে যে মৈথুনের কথা আছে, এক্ষণে মহাভৈরব পরমাশক্তির সহিত আত্মসংযোগ করিয়া সেই মৈথুনের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। মূর্ত্তিটি স্ত্রী বা শক্তিপ্রাধান্য বশতঃ উহা শক্তি বা নারীমূর্ত্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারে। শিবমূর্ত্তি বিদ্যমান থাকিলেও উহা শক্তিমূর্ত্তি।

"ভৈরবী চক্রের" অন্তর্গত কোন বীরাচারী কুলাচার-প্রথায় চক্র-সাধন-পরায়ণ হইয়া এই মূর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন, এই শক্তি-প্রধান তান্ত্রিক মূর্ত্তি যিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তিনিও যুগলরূপে এই কার্য্য করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার কল্পনা "রাজ্যলাভ" ছিল কি না তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু মূর্ত্তিটির প্রতিষ্ঠা ও পূজায় কোন প্রকার মহৎ কামনা বিদ্যমান ছিল ইহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায়। সংকল্প ভৈরবের নামেই হইয়া থাকিবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ইহা নেপালী প্রথায় নির্ম্মিত মূর্ত্তি নহে। আর একটি কথা এই নেপালেই যে দেবতাগণের হস্ত বৃদ্ধি হইয়াছে ইহা উপকথা মাত্র। তন্ত্র মধ্যে, এমন কি বৈষ্ণব সাহিত্যে অনেক অলৌকিক মূর্ত্তির পরিচয় বিদ্যমান আছে। ভবিষ্যতে "দেবদেবীগণের স্বরূপ নির্ণয়" প্রবন্ধে বহু মূর্ত্তির আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীকৃষ্ণচরণ সরকার,
শ্রীহরিদাস পালিত।

মফঃস্বলের বাণী

১। জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে

জন সাধারণের উৎসাহ

'অদ্য অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় ঝালকাঠী জাতীয় বিদ্যালয়গৃহে ছাত্রদিগের পুরস্কারবিতরণসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে বরিশাল হইতে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকমার দত্ত, উপেন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ সেন, দুর্গামোহন সেন, পিরোজপুর হইতে বাবু কৈলাসচন্দ্র দাস, বসন্তকুমার ঘোষ ও আশুতোষ ঘোষ উকিলগণ আগমন করিয়াছিলেন। অদ্য কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম, এ ও বিনয়কুমার সরকার এম, এ আগমন করিয়াছেন। এদদুপলক্ষে জাতীয় বিদ্যালয়ের গৃহ সুচারুরূপে সজ্জিত হইয়াছিল। সুখের কথা এই সজ্জার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলির ন্যায় ছাত্রগণকে বাজারের জিনিষ আনয়ন করিতে হয় নাই। তাহাদেরই চিত্রিত চিত্রসমূহ, তাহাদের নির্ম্মিত কাষ্ঠাসন, তাহাদের সৃষ্ট বহুবিধ কারুকার্য্যশোভিত সরঞ্জাম এই সজ্জার সহায়তা করিয়াছিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন জমিদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রাথমিক বক্তৃতার পরে ছাত্রগণকে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

তৎপর বাবু রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জাতীয় শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বক্তৃতা প্রদান করেন। কেমন করিয়া ইংলণ্ডে প্রাচীন শিক্ষানীতি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া নিত্য নব বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে এবং ভারতবর্ষে প্রথম প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে—তাই অন্যান্য সংস্কারের সঙ্গে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও আবশ্যক হইয়াছে। ইত্যাদি। অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রাণস্পর্শী ওজস্বিনী ভাষায় ঝালকাঠীর মহাজনগণকে লক্ষ্য করিয়া ঝালকাঠী স্কুলের আবশ্যকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। কেমন করিয়া নিস্ফলতার মধ্যে সফলতার বীজ উপ্ত থাকে—সহস্র ফুল ঝরিয়া কেমন একটী ফলে পরিণত হয়—কেমনে বহুসংখ্যক জাতীয় বিদ্যালয় উঠিয়া যাওয়া সত্ত্বে ঝালকাঠী স্কুলের উপকারিতা, আবশ্যকতা ও গৌরব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে—কিভাবে বাসণ্ডার পুরোমহিলাগণ স্বীয় গাত্রালঙ্কার প্রদান করিয়া এই ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন—কেমন করিয়া হেমন্তকুমার, রজনীকান্ত প্রভৃতি শিক্ষকবর্গ ত্যাগের অতুলনীয় আদর্শ প্রদর্শন করিয়া বিন্দু বিন্দু রক্ত দানে এই স্কুলকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন তাহা মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণন করেন—তারপর তিনি ঝালকাঠীর মহাজনগণকে পুনরায় সভাসমক্ষে এই স্কুলের রক্ষাকল্পে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে আহ্বান করেন—আর যখন একজনের পর একজন মহাজন সভাক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া সেই প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন—যখন বাবু উপেন্দ্রনাথ পালের পশ্চাতে বাবু লোকেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ও তৎপশ্চাতে বাবু নীলাম্বর সাহা, ও ক্রমে বাবু রসিকলাল পাল, বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষ, বাবু দুর্গাকুমার মাড়োয়ারী, হরবিলাস সাহা পক্ষে বাবু যামিনীকুমার গুহ, বাবু রাসবিহারী রায়, বাবু শ্যামলাল সাহা প্রভৃতি প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিলেন তখন অনেক কঠিন প্রাণ ভাঙ্গিয়া অশ্রুধারা বহির্গত হইয়াছিল—অশ্বিনীকুমারও আর বক্তৃতা করিতে পারিলেন না—তিনি গদগদকণ্ঠে বলিলেন আজ আমরা এ দৃশ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছি—আশা করি আজিকার এই প্রতিশ্রুতি ঝালকাঠী জাতীয়

বিদ্যালয়কে সুপ্রতিষ্ঠ করিবে। বাস্তবিক স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল উৎসাহের পরে এমন দৃশ্য শীঘ্র দৃষ্ট হয় নাই।"

বরিশাল হিতৈষী

২। যশোহর স্বদেশী-ভাণ্ডার

"যশোহর স্বদেশী-ভাণ্ডারের ১৩১৮ সালের কার্য্যবিবরণী আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এই বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১৩১১ সালে এই ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়া গত ৮ বৎসরে ৯২ হাজার ৭ শত ১৫ টাকা ৮/১২॥০ মূল্যের স্বদেশী দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়াছে। এক যশোহরে ৮ বৎসরের মধ্যে ৯২ হাজার ৭ শত টাকার স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয় হওয়া খুব প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। তবে এই সঙ্গে ইহাও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে যশোহরের লোক ধারে হাতী পাইলেও কিনিতে পারেন। কারণ গত ১৩১৮ সালে উক্ত ভাণ্ডারে ১১ হাজার ৫ শত ৯৪ টাকা ৵১৭৷৷০ গণ্ডা মূল্যের মাল বিক্রয় হইয়াছে; তন্মধ্যে ৫ হাজার ৭ শত ৩৪৷৷৵০ আনার মাল ধারে বিক্রীত হইয়াছে। এত অধিক ধারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা বন্ধ না হইলে ভাণ্ডারের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে না। বিবরণীতে ইহাও প্রকাশ যে, ভাণ্ডার বাকীদারগণের নামে ডিক্রি করিয়াছেন। মামলা মোকদ্দমায় বড় বড় ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া যায়। ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষের ধারে বিক্রয়ের দিকে বিশেষ কড়াকড়ি ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

যাহা হউক, এইরূপ ধারে বিক্রয় করিয়াও তাহার উপর মামলা মোকদ্দমার ব্যয় করিয়া ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষ আলোচ্য বৎসরে অংশীদারগণকে শত করা ৫৲ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা বিশেষ সন্তোষজনক এবং ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্য-কুশলতার পরিচায়ক।

নগদ মূল্যে বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষগণ খরিদদারগণকে টাকা প্রতি এক পয়সা হিসাবে ব্যাজ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে নগদ ক্রয় করিবার পক্ষে লোকের প্রবৃত্তি হইবে সন্দেহ নাই। এই ভাণ্ডারের মূলধন ১০ হাজার টাকা। তন্মধ্যে আলোচ্য বৎসর পর্য্যন্ত ৭ হাজার ৮ শত টাকার অংশ বিক্রীত হইয়াছে। এখনও প্রতি অংশ ১০৲ হিসাবে ২২০টি অংশ বিক্রীত হইতে বাকী আছে। ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষ এবার যেরূপ ভাবে ডিভিডেণ্ড দিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাতে ইহার অংশ ক্রয় করিলে লাভের আশা আছে। ইহাতে একদিকে যেমন লাভ, অপরদিকে তেমনি স্বদেশী দ্রব্য প্রচারে সাহায্য করা হইবে। সুতরাং স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই এই বিষয়ে লক্ষ্য করা উচিত।

আলোচ্য বৎসর ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষ শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে ডিভিডেণ্ড দিয়াছেন। গত ৭ বৎসরের প্রতি বৎসরে কি হিসাবে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছিল, ভাণ্ডারের বার্ষিক বিবরণীতে তাহার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। রিপোর্টে গত ৮ বৎসরের বার্ষিক মাল বিক্রয়ের যে হিসাব প্রদর্শিত হইয়াছে, উহার একাংশে, প্রদত্ত ডিভিডেণ্ডের উল্লেখ থাকিলে সহজেই এই কারবার কিরূপ লাভজনক তাহা লোকে বুঝিতে পারে। আশা করি, ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।"

পল্লীবার্ত্তা

৩। হিন্দুর প্রাণদাতা মুসলমান

"বিগত ১৭ই বৈশাখ বুধবার রামপুর বোয়ালিয়া সহরের নিকটবর্ত্তী বিলসিমলা, হেতমখাঁ ও কাদিরগঞ্জ প্রভৃতি গ্রাম প্রবল অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হইয়াছে।

পল্লীরক্ষার্থ অসংখ্য লোক অগ্রসর হইল; গভর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্রের সুপারিণ্টেণ্ড বাবু হরকুমার গুহ লোকজন সহ অগ্নি নির্ব্বাণার্থ প্রাণপণ যত্ন করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। সকলের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

এ সময় বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই জলাভাব ও জলকষ্ট উপস্থিত হয়। এক গ্রামের লোক

অন্যগ্রাম হইতে জল আনিয়া প্রাণরক্ষা করে। এই অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে এক কৃষকপত্নী একখানি মাটির কোঠাঘরে তিনটি শিশুসন্তানকে শোয়াইয়া রাখিয়া গ্রামান্তরে জল আনয়নার্থ গমন করিয়াছিল; তাহার পতিও বাড়ীতে ছিল না। পল্লীতে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইলে, প্রতিবেশিনী অন্য এক কৃষকপত্নী, আগুন হইতে গৃহসম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে, প্রতিবেশীর উপকার-কামনায় বাহির হইতে ঐ কোঠার দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল; প্রতিবেশীর প্রাণাধিক ধন কয়টি যে ঘরের মধ্যে নিদ্রিত ছিল, সে তাহা জানিত না। কৃষকপত্নী জলসহ ফিরিয়া আসিয়া দেখে সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তাহাদিগের কোঠাঘরের চারিদিকে খরের ঘরগুলি দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে। সে আকুলপ্রাণে চীৎকার পূর্ব্বক, কে আছ, আমার শিশুদিগের প্রাণ বাঁচাও বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই অগ্রসর হইতে সাহস পাইল না। অন্যে দূরে থাকুক, শিশুদিগের পিতা আসিয়াও পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে থাকিল, শিশুদিগের প্রাণরক্ষার কোনই পথ করিতে সাহসী হইল না। যে স্নেহ সন্তানের জন্য সাক্ষাৎ মৃত্যুকেও অকিঞ্চিৎকরজ্ঞানে অবজ্ঞা করিতে চির অভ্যস্ত, সেই মাতৃস্নেহ, পিতৃবাৎসল্যও আজিকার প্রবল অনলের সম্মুখে পরাস্ত হইল, তাহারা ভীতিবিমূঢ়চিত্তে, কি করিবে, কোন পথে যাইবে, কিছুই যেন স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না।

এই সময় ভগবৎপ্রেরিতের ন্যায় কোথা হইতে এক মুসলমান যুবক সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল; যুবকের নাম কোরবান। কেহ তাহাকে কোন কথা বলে নাই, সেও কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিল না; সে অমনি নির্ভয়ে দৃক্পাত শূন্যভাবে সেই অনলবেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মহাবেগে অনলব্যূহ ভেদ করিয়া কোঠাঘরের নিকটে উপস্থিত হইল এবং মাটীর কোঠার একটা জানালা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক অজ্ঞান অবস্থায় তিনটি শিশুকে বাহির করিয়া আনিল। এই হৃদয়বান্ সাহসী যুবক, মুহূর্ত্তের তরে প্রাণের মমতা ভুলিয়া গিয়াছিল, প্রচণ্ড অনল উত্তাপে যে তাহার শরীর ঝলসিয়া যাইতেছিল, তাহাও তাহার বোধ ছিল না। স্থানীয় সরকারী হাসপাতালের আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় ঔষধাদি লইয়া সদলবলে সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তৎকৃত ঐকান্তিক যত্নচেষ্টা ও সময়োচিত শুশ্রূষায় শিশু কয়টির জীবনরক্ষা হইয়াছে; মুসলমান যুবকটীরও জ্বালার প্রশমন এবং স্বাস্থ্যলাভ ঘটিয়াছে। যে পরের প্রাণরক্ষার্থ আপন প্রাণের মমতা ত্যাগ করিতে পারে, ভগবান্ তাহাকে রক্ষা করেন। এই যুবকের সাহসিকতা ও আত্ম-ত্যাগের কাহিনী সর্ব্বত্র প্রচারিত, এবং সর্ব্বত্র এই শ্রেণীর আত্মত্যাগের উপযুক্ত গৌরব ও পুরস্কার হউক, সজ্জন মাত্রেরই ইহা অভিলষিত।”

ঢাকাপ্রকাশ

৪। মহিলাসমাজে জাগরণ

“পাবনা মহিলাসম্মিলনীর উদ্যোগে একটি শুভ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। যাহাতে এতদ্দেশীয় সর্ব্বশ্রেণীর মহিলাগণের মধ্যে শিল্প ও কারুকার্য্যের উৎসাহ জন্মে ও তাহাদের অবসর সময়ে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যাদি বিক্রয় হইয়া ধনাগম হইতে পারে তজ্জন্য পাবনা মহিলা-সম্মিলনীর উদ্যোগে “মহিলা এজেন্সি” বলিয়া একটি দোকান খোলা হইতেছে। উক্ত সম্মিলনীর অনুরোধক্রমে সরকারি উকিল শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার নিকট মহিলাদের প্রেরিত শিল্প দ্রব্যাদি উপস্থিত হইলে উহা বিক্রয়ের যথোচিত ব্যবস্থা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

এক সময়ে এতদ্দেশীয় মহিলারা চরকার সাহায্যে সূতকাটা ও অন্যান্য শিল্পকার্য্যে বেশ দু’পয়সা উপার্জ্জন করিত। তাহাতে অনেক দুঃস্থ পরিবারের ভরণ-পোষণের বিশেষ

সাহায্য হইত। কালক্রমে চরকার ব্যবহার উঠিয়া যাওয়ায় এবং হস্তজাত শিল্পের অনাদর ও তাহার বিক্রয়ের অসুবিধায় অনেক পরিবারের ধনাগমের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। মহিলা-সম্মিলনীর উদ্যোগে এই অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর হইলে আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিব। এই এজেন্সিতে যাঁহারা যে সকল শিল্পদ্রব্য উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন তাঁহারা যেন তাঁহাদের প্রেরিত দ্রব্যের সহিত মূল্যের উল্লেখ করেন। মূল্য অসঙ্গত না হয় তৎপ্রতি যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।

মহিলা-সম্মিলনী সর্ব্বসাধারণকে অবগত করিতেছেন যে আগামী শীতকালে এখানে একটি মহিলাদিগের শিল্প ও কারুকার্য্যের প্রদর্শনী খোলা হইবে। তাহাতে যাঁহাদের প্রস্তুত দ্রব্য উৎকৃষ্ট হইবে তাঁহারা পুরস্কার পাইবেন এবং যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহাদের প্রদর্শিত দ্রব্য বিক্রয় করা যাইবে। প্রদর্শনীর দিন এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, শীঘ্রই স্থির হইবে।"

স্বরাজ

৫। পূর্ব্ববঙ্গে 'স্বদেশী'র পরিণাম

"১৯১১-১২ সনের যে বঙ্গীয় শাসন-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে উক্ত বৎসর পূর্ব্ববঙ্গে অর্থাৎ ঢাকা, রাজসাহী, চট্টগ্রাম এই তিন বিভাগে শিল্প-বাণিজ্যানুশীলনের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা এই তথ্যের আলোচনা করিলে কতক পরিমাণে বুঝিতে পারিব, স্বদেশী আন্দোলনের ফলে শিল্পবাণিজ্যের দিকে লোকের যে সানুরাগ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, ব্যবহার্য্যদ্রব্যজাত বহুল পরিমাণে দেশ মধ্যে উৎপন্ন করিয়া ধনাগমের পন্থা সুবিস্তৃত করার দিকে দেশবাসীর যে চিন্তা ও চেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছিল,—তাহার গতি পরিণতির কি চিত্র আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে। আমাদের নিকট অবস্থা তাদৃশ আশাজনক উৎসাহসূচক বলিয়া বোধ হইতেছে না। অবশ্য, আমরা শিল্পানুষ্ঠানের স্রোত মন্দীভূত হইয়াছে বলিয়া কাহারও মনে নৈরাশ্য জাগাইয়া তুলিতে ইচ্ছা করি না বা কাহাকেও কর্ম্মবিমুখ হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে বলি না। আমরা সংক্ষেপে পূর্ব্বোক্ত বিবরণীর মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি। ঢাকা বিভাগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে,— স্বদেশী আন্দোলন যে উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা ১৯১১-১২ সনে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বৎসর কলে উৎপন্ন কাপড়ই বাজার অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ঢাকাতে যে ট্যানারির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা গতাসু হইয়াছে, এদিকে নারায়ণগঞ্জের লৌহ কারখানাও সংশয়জনক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। উক্ত বৎসর সাবান নির্ম্মাণের ব্যবসা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও হীন ভাবে চলিতেছে। ময়মনসিংহ জিলায় শিল্প দ্রব্যোৎপাদনার্থ যে যে অনুষ্ঠানের অভ্যুত্থান হইয়াছিল তাহার কোনটিতেই কোন উন্নতি লক্ষণ দেখা যায় নাই। আবার এই বৎসরেই বরিশালের স্বদেশী সু-কোম্পানী নামক জুতার কারবারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। 'বয়কট' আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর জিলায় বুতাম, নিব, কলমের ডাট ও শিশুদিগের খাদ্য প্রস্তুত করার অনুষ্ঠান আরব্ধ হইয়াছিল, এই সকল গুলিই ধ্বংসের পথে পা বাড়াইয়াছে। ফরিদপুর হইতে বিস্তর পরিমাণে গুড় অন্যত্র রপ্তানি হয়, উক্ত বৎসর ঐ ব্যবসায়েরও প্রসার ঘটে নাই। অবশ্য, ঢাকার শঙ্খশিল্পের কার্য্যোন্নতিস্রোত অব্যাহত রহিয়াছে। ১৯১০ সনে ঢাকা বিভাগে ৬৭টি কারখানায় কার্য্য চলিয়াছিল, কিন্তু আলোচ্য বর্ষে ৫৬টিতে কার্য্য হইয়াছে, ইহার ৫০টিই পাটব্যবসায়সংসৃষ্ট। এই গেল ঢাকা বিভাগের কথা। রাজসাহী বিভাগের বিবরণ এইরূপ— রাজসাহীতে যে রেশম শিল্পের কারখানা আছে তাহা অবনতির পথে প্রহিত। ১৯১০ সনে

মোট ৪৩২৫১ পাউণ্ড পরিমিত রেশম উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু আলোচ্য বর্ষে হইয়াছে মাত্র ২২৪০২ পাউণ্ড। এই অবনতি ঘটিল কেন? ইহার দুইটি কারণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে, প্রথমতঃ রেশম পোকাতে পীড়া উপস্থিত হইয়াছিল, দ্বিতীয়তঃ রেশমের গুটী উৎপাদন অপেক্ষা পাটের চাষ অধিক লাভজনক বলিয়া কৃষকগণ শেষোক্ত ব্যবসায়ই অবলম্বন করিয়াছে। উক্ত বৎসর মালদহে একটি রেশমের কারবার উঠিয়া গিয়াছে। ১৯০৮।৯ সনে রঙ্গপুরে একটি তামাকের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই কারখানা আলোচ্য বৎসর শতকরা আড়াই টাকা লাভ প্রদর্শন করিয়াছে, কিন্তু এই সাফল্য স্থায়ী হইবে কি না এখনও বলা যায় না। পাবনার তন্তুবায়গণ কর্ত্তৃক তাঁতে নির্ম্মিত কার্পাসবস্ত্র অত্যন্ত আদর লাভ করিয়াছে। ১৯১০ সনে পাবনাতে ট্যানিং কোম্পানি নামক চর্ম্ম-সংস্কারের একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখন পর্য্যন্তও ইহার কার্য্যে তেমন কিছু উন্নতি লক্ষিত হয় নাই। পাবনাতে দুইটি মোজার কারবার আছে, তথাকার উৎপন্ন দ্রব্যের বিস্তর কাটতি। আলোচ্য বৎসর রাজসাহী বিভাগে ১৪টি কুঠীতে বাণিজ্য কারবার সঙ্কলিত হইয়াছে, ইহার ১১টি পাটব্যবসায়সংসৃষ্ট। অতঃপর চট্টগ্রাম বিভাগের কথা। আলোচ্য বৎসর এই বিভাগে সোডা-লেমনেডাদি প্রস্তুত করার ১৪টি কারখানা ছিল, তৎপূর্ব্ব বৎসর ৮টি ছিল। এই বৎসরও সীতাকুণ্ডে তৈল সংগ্রহার্থ পাহাড় বেধ করার কার্য্য চলিয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। 'নিত্যানন্দ কটন ফ্যাক্টরি' এবং 'সালিমার আইরণ ওয়ার্কস্' নামক কারখানাদ্বয়ের কার্য্য সম্বৎসর ভরিয়া চলিয়াছে। চট্টগ্রামে একটি চাউল প্রস্তুত করার কল প্রতিষ্ঠিত আছে, উক্ত বৎসর এই কলে কার্য্য হয় নাই, কারণ তুষশূন্য না করিয়াই ধান বিদেশে রপ্তানি করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসর চাঁদপুরের তৈলের কলে ১৯০০০ মণ তৈল উৎপন্ন হইয়াছে, পূর্ব্ব বৎসর ১৭৫০০ মণ হইয়াছিল। এই বিভাগের প্রায় জিলাতেই গৃহনির্ম্মিত কার্পাসবস্ত্রব্যবসায়ের পতন আরম্ভ হইয়াছে।"

বিশ্ববার্ত্তা

পরিশিষ্ট

পিতৃগাথাস্তথৈবাত্র গীয়ন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
যা গীতাঃ পিতৃভিঃ পূর্ব্বমৈলস্যাসন্মহীপতেঃ ॥ ৩০ ॥
কদা নঃ সন্ততাবগ্র্যঃ কস্যচিদ্ভবিতা সুতঃ।
যো যোগিভুক্তশেষান্নৈর্ভুবি পিণ্ডং প্রদাস্যতি ॥ ৩১
গয়ায়ামথবা পিণ্ডং খড়্গমাংসং মহাহবিঃ।
কালশাকং তিলাঢ্যং বা কৃষরং মাস-তৃপ্তয়ে ॥ ৩২ ॥
বৈশ্বদেব্যঞ্চ সৌম্যঞ্চ খড়্গামাংসং পরং হবিঃ।
বিষাণবর্জ্জ্যখড়্গাপ্ত্যামাসূর্য্যঞ্চাশ্নুবামহে * ॥ ৩৩ ॥
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধং ত্রয়োদশ্যাং মঘাসু চ যথাবিধি।
মধুসর্পিঃসমাযুক্তং পায়সং দক্ষিণায়নে ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মবাদিগণ করেন কীর্ত্তন
পিতৃগাথা এ সময়,
এই পিতৃগাথা অতি পুণ্য কথা
গান-যোগ্য সুনিশ্চয়।
অতি পূর্ব্বকালে ঐল মহীপালে
উদ্দেশিয়ে পিতৃগণ
সেই গাথা গান করি' তৃপ্ত-প্রাণ;
সে গাথা কর শ্রবণ—৩০।

"কবে হ'বে হেন সুদিন উদয়
জন্মিবেক বংশে সুযোগ্য তনয়
যে জন শ্রাদ্ধেতে করিবে নিশ্চয়
যোগ্য যোগিগণে সদা নিমন্ত্রণ।
যোগিভুক্তশেষ অন্ন ল'য়ে করে
ভূমে পিণ্ড দিবে প্রফুল্ল অন্তরে,
তৃপ্ত হ'য়ে মোরা রব চির তরে
ধন্য হ'বে সেই কুলের পাবন। ৩১
কিম্বা গয়াধামে করিয়া গমন
মহাহবিঃ খড়্গীমাংস আয়োজন
কালশাক, আর কৃষরা গ্রহণ
করিয়া, তিলাঢ্য করিবে সকল,

পরেতে, মাসেক তৃপ্তির কারণে
হেন পিণ্ড দিবে শ্রদ্ধা যুক্ত মনে
পা'ব তৃপ্তি মোরা সে পিণ্ড গ্রহণে
আনন্দে ভাসিব সবে অবিরল। ৩২
সৌম্য বৈশ্বদেব কার্য্যে সুনিশ্চয়
গণ্ডারের মাংস, অতি শুদ্ধ হয়,
শ্রেষ্ঠ হবিঃ সেই জানিবে নিশ্চয়
তুল্য তা'র আর নাহিক ধরায়;
শৃঙ্গহীন যেই খড়্গী, মাংস তা'র
পিতৃগণে হয় পবিত্র আহার
যাবৎ তপন ঘুচায় আঁধার
ততকাল তৃপ্ত হইব তাহায়। ৩৩।
শুন, পুত্র, মঘাযুক্ত ত্রয়োদশী যবে,
যথা বিধি শ্রাদ্ধ কার্য্য করিবেক তবে।
দক্ষিণ অয়নে সদা করিয়া যতন
করি' মধুসর্পিঃযুক্ত পায়স গ্রহণ
যথাবিধি পিতৃকার্য্য করিবে তাহায়
সর্ব্বশুভ পা'বে তাহে কহিনু তোমায়। ৩৪।

* বিষাণবর্জ্জা যে খড়্গাস্তন্মাংসং প্রার্থয়ামহে ইতি বা পাঠঃ

তস্মাৎ স 'পূজয়েদ্ভক্ত্যা স্বপিতৄন্ পুত্র মানবঃ।
কামানভীপ্সন্ সকলান্ পাপাচ্চাত্মবিমোচনম্॥ ৩৫॥
বসূন্ রুদ্রাংস্তথাদিত্যান্ নক্ষত্রগ্রহতারকাঃ।
প্রীণয়ন্তি মনুষ্যাণাং পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ॥ ৩৬॥
আয়ুঃ প্রজ্ঞাং ধনং বিদ্যাং স্বর্গং মোক্ষং সুখানি চ।
প্রযচ্ছন্তি তথা রাজ্যং পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ॥ ৩৭॥
এতৎ তে কথিতং পুত্র শ্রাদ্ধকর্ম্ম যথোদিতম্।
কাম্যানাং শ্রূয়তাং বৎস শ্রাদ্ধানাং তিথিকীর্ত্তনম্॥ ৩৮॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মদালসোপাখ্যানেঽলর্কানুশাসনে
শ্রাদ্ধকল্পোনাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

এইরূপে পিতৃগণে পূজা করি' নরে
অশেষ কামনা লভে প্রফুল্ল অন্তরে।
সর্ব্ব পাপ হ'তে মুক্ত হয় সুনিশ্চয়
শাস্ত্র বাক্য, ইথে কিছু নাহিক সংশয়। ৩৫
বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্য সকল
গ্রহগণ আর সে নক্ষত্র তারাদল,
পিতৃগণ তৃপ্তিতে সবার তৃপ্তি হয়
শাস্ত্রের বচন ইথে নাহিক সংশয়। ৩৬।

আয়ু, প্রজা, ধন, বিদ্যা, স্বর্গ, মোক্ষ আর
সর্ব্ব সুখ সুনিশ্চয় লাভ হ'বে তা'র।
পিতৃগণ শ্রাদ্ধে তৃপ্ত হন যাঁ'র প্রতি,
রাজ্যলাভ তাঁহার দুর্লভ নহে অতি। ৩৭।
শ্রাদ্ধ-কর্ম্ম যথাশাস্ত্র
করিনু বর্ণন,
এবে কাম্য-শ্রাদ্ধ-তিথি,
করহ শ্রবণ। ৩৮।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে ঋতধ্বজচরিতান্তর্গত মদালসা উপাখ্যানে
অলর্কের প্রতি শ্রাদ্ধকল্প কথন নামক
দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

মদালসোবাচ ।

প্রতিপদ্ধনলাভায় দ্বিতীয়া দ্বিপদপ্রদা ।
বরার্থিনী তৃতীয়া তু চতুর্থী শত্রুনাশিনী ॥ ১ ॥
শ্রিয়ং প্রাপ্নোতি পঞ্চম্যাং ষষ্ঠ্যাং পূজ্যো ভবেন্নরঃ ।
গণাধিপত্যং সপ্তম্যামষ্টম্যাং বুদ্ধিমুত্তমাম্‌ ॥ ২ ॥
স্ত্রিয়ো নবম্যাং প্রাপ্নোতি দশম্যাং পূর্ণকামতাম্‌ ।
বেদাংস্তথাপ্নুয়াৎ সর্ব্বানেকাদশ্যাং ক্রিয়াপরঃ ॥ ৩ ॥
দ্বাদশ্যাং জয়লাভঞ্চ প্রাপ্নোতি পিতৃপূজকঃ ।
প্রজাং মেধাং পশূন্‌ বৃদ্ধিং স্বাতন্ত্র্যং পুষ্টিমুত্তমাম্‌ ॥ ৪ ॥
দীর্ঘমায়ুস্তথৈশ্বর্য্যং কুর্ব্বাণস্তু ত্রয়োদশীম্‌ ।
অবাপ্নোতি ন সন্দেহো শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাপরো নরঃ ॥ ৫ ॥
যথাসম্ভাবিতান্নেন শ্রদ্ধাসম্পৎসমন্বিতঃ ।
যুবানঃ পিতরো যস্য মৃতাঃ শস্ত্রেণ বা হতাঃ ।
তেন কার্য্যং চতুর্দ্দশ্যাং তেষাং প্রীতিমভীপ্সতা ॥ ৬ ॥

বলিলেন মদালসা—"শুন বাছাধন,
প্রতিতিথি শ্রাদ্ধফল করিব বর্ণন ।
প্রতিপদে ধন লাভ হয় সুনিশ্চয়
দ্বিতীয়ায় দ্বিপদ-সহায় লাভ হয় ।
তৃতীয়ায় বরলাভ শাস্ত্রের লিখন,
চতুর্থীতে শত্রুনাশ শুন বাছাধন । ১ ।
পঞ্চমীতে লক্ষ্মীলাভ শাস্ত্রে এই কয়
ষষ্ঠীতে হইবে সর্ব্বপূজ্য সুনিশ্চয় ।
গণাধিপ হয় সপ্তমীতে শ্রাদ্ধ ফলে,
অষ্টমীতে শুদ্ধবুদ্ধি শাস্ত্রে এই বলে । ২ ।
নবমীতে শ্রাদ্ধফলে নারী লাভ হয়,
দশমীতে পূর্ণকাম শাস্ত্রে এই কয় ;
একাদশী তিথিতে করিলে শ্রাদ্ধ কর্ম্ম
সর্ব্ববেদ লাভ হয় বুঝে বেদ-মর্ম্ম । ৩ ।
দ্বাদশীতে জয় লাভ শাস্ত্রের লিখন
প্রজা আর পশুলাভ হয় অগণন ।
মেধা বৃদ্ধি হয় তার পুষ্টিলাভ হয়
শাস্ত্রের বচন ইথে নাহিক সংশয় । ৪ ।
ত্রয়োদশী তিথিতে যে জন শ্রাদ্ধ করে
দীর্ঘ আয়ু চিরৈশ্বর্য্য বাঁধা তা'র ঘরে । ৫ ।
যৌবন সময়ে মৃত যার পিতৃগণ
কিম্বা শস্ত্র হত হ'য়ে ত্যজিল জীবন,
চতুর্দ্দশী সময়ে তা'দের প্রীতি তরে ।
যথাযোগ্য অন্নে শ্রাদ্ধ করিবেক নরে । ৬ ।

শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্নমাবাস্যাং যত্নেন পুরুষঃ শুচিঃ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি স্বর্গঞ্চানন্ত্যমশ্নুতে ॥ ৭ ॥
কৃত্তিকাসু পিতৃনর্চ্চ্যন্ স্বর্গমাপ্নোতি মানবঃ।
অপত্যকামো রোহিণ্যাং সৌম্যে চৌজস্বিতাং লভেৎ ॥ ৮ ॥
শৌর্য্যমার্দ্রাসু চাপ্নোতি ক্ষেত্রাদি চ পুনর্ব্বসৌ ॥ ৯ ॥
পুষ্টিং পুষ্যে সদাভ্যর্চ্চ্য আশ্লেষাসু বরান্ সুতান্।
মঘাসু স্বজনশ্রেষ্ঠ্যং সৌভাগ্যং ফল্গুনীষু চ ॥ ১০ ॥
প্রদানশীলো ভবতি সাপত্যশ্চোত্তরাসু বৈ।
প্রয়াতি শ্রেষ্ঠতাং সৎসু হস্তে শ্রাদ্ধপ্রদো নরঃ ॥ ১১ ॥
রূপযুক্তশ্চ চিত্রাসু তথাপত্যান্যবাপ্নুয়াৎ।
বাণিজ্যলাভদা স্বাতির্বিশাখা পুত্রকামদা ॥ ১২ ॥
কুর্ব্বন্তশ্চানুরাধাসু লভন্তে চক্রবর্ত্তিতাম্।
আধিপত্যঞ্চ জ্যেষ্ঠাসু মূলে চারোগ্যমুত্তমম্ ॥ ১৩ ॥

অমা-কালে নিরন্তর হইয়া তৎপর
যত্নে যেই করে শ্রাদ্ধ শুচি সেই নর।
সকল কামনা তার পূরে সুনিশ্চয়
অন্তেতে অনন্ত স্বর্গ শাস্ত্রে এই কয়। ৭।
কৃত্তিকায় পিতৃগণে করিলে অর্চন।
স্বর্গলাভ করে নরে শাস্ত্রের লিখন। ৮।
অপত্য কামনা যার সে জন নিশ্চয়
রোহিণীতে শ্রাদ্ধ করি লব্ধকাম হয়।
মৃগশিরা নক্ষত্রেতে শ্রাদ্ধ যেবা করে
ওজস্বিতা সেই জন লভয়ে সত্বরে।
আর্দ্রাতে করিলে শ্রাদ্ধ শৌর্য্য লাভ হয়,
পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে ক্ষেত্রাদি সুনিশ্চয়। ৯।
পুষ্যাযোগে শ্রাদ্ধফলে পুষ্টিলাভ হয়
অশ্লেষায় শ্রেষ্ঠ পুত্র লভয়ে নিশ্চয়।
মঘায় স্বজন মাঝে প্রাধান্য নিশ্চয়,
পূর্ব্বফল্গুনীতে সে সৌভাগ্যলাভ হয়। ১০।

উত্তরফল্গুনীযোগে শ্রাদ্ধ করে যেই
দানশীল আর পুত্রবান হয় সেই।
হস্তাযোগে যেই নর যত্নে শ্রাদ্ধ করে
নিশ্চয় শ্রেষ্ঠতা সেই লভিবেক পরে। ১১।
চিত্রায় করেন শ্রাদ্ধ যেই মহাশয়
রূপ লাভ আর তাঁ'র পুত্রলাভ হয়।
স্বাতি যোগে শ্রাদ্ধ কার্য্য করে যেই জন
বাণিজ্যেতে লাভ তার শাস্ত্রের বচন।
বিশাখায় শ্রাদ্ধফলে পুত্র লাভ হয়,
অশেষ কামনা তার সিদ্ধ সুনিশ্চয়। ১২।
অনুরাধা যোগে শ্রাদ্ধ করিবারে পায়
চক্রবর্ত্তী হ'বে সেই এই ত ধরায়।
জ্যেষ্ঠায় করিলে শ্রাদ্ধ আধিপত্য লাভ,
মূলায় করিলে শ্রাদ্ধ রোগের অভাব। ১৩

আষাঢ়াসু যশঃপ্রাপ্তিরুত্তরাসু বিশোকতাম।
শ্রবণে চ শুভান্ লোকান্ ধনিষ্ঠাসু ধনং মহৎ॥ ১৪
বেদবিত্ত্বমভিজিতি ভিষক্‌সিদ্ধিস্তু বারুণে।
অজাবিকং প্রোষ্ঠপদে বিন্দেদ্গাবাংস্তথোত্তরে॥ ১৫॥
রেবতীষু তথা কুপ্যমশ্বিনীষু তুরঙ্গমান্।
শ্রাদ্ধং কুর্ব্বংস্তথাপ্নোতি ভরণীষ্বায়ুরুত্তমম্।
তস্মাৎ কাম্যানি কুর্ব্বীত ঋক্ষেষ্বেতেষু তত্ত্ববিৎ॥ ১৬

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে মদালসোপাখ্যানেঽলর্কানুশাসনে
কাম্যশ্রাদ্ধফলকথনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পূর্ব্বাষাঢ়া যোগে শ্রাদ্ধ করে যেইজন,
যশোলাভ হয় তা'র শাস্ত্রের লিখন।
উত্তর-আষাঢ়া যোগে শ্রাদ্ধ যদি করে
শোকহীন রহে সেই অবনী ভিতরে।
শ্রবণায় সর্ব্ব-শুভ-লোক লাভ হয়,
ধনিষ্ঠায় ধনবৃদ্ধি শাস্ত্রের নির্ণয়। ১৪।
অভিজিতে শ্রাদ্ধফলে বেদাভিজ্ঞ হয়,
ভৈষজ্যেতে সিদ্ধি·শতভিষায় নিশ্চয়।
পূর্ব্ব-ভাদ্রপদে মেষ ছাগ লাভে নর
উত্তরাতে পদাতিক পায় নিরন্তর। ১৫।
রেবতীতে কুপ্য লাভ শাস্ত্রের বচন,
অশ্বিনীতে অশ্বলাভ শুন বাছাধন।
ভরণীর যোগে শ্রাদ্ধ করে যেই নর,
দীর্ঘ আয়ু লভে সেই অবনী ভিতর। ১৬।
এই সে কারণে সদা তত্ত্ববিৎ জন,
যথাকালে কাম্য শ্রাদ্ধ করিবে যাজন।" ১৭।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে ঋতধ্বজচরিতান্তর্গত মদালসা উপাখ্যানে
কাম্যশ্রাদ্ধ ফল কথন নামক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মদালসোবাচ।

এবং পুত্র গৃহস্থেন দেবতাঃ পিতরস্তথা।
সম্পূজ্যা হব্য-কব্যাভ্যামন্নেনাতিথি-বান্ধবাঃ॥ ১॥
ভূতানি ভৃত্যাঃ সকলাঃ পশু-পক্ষি-পিপীলিকাঃ।
ভিক্ষবো যাচমানাশ্চ যে চান্যে বসতা গৃহে॥ ২॥
সদাচারবতা তাত সাধুনা গৃহমেধিনা।
পাপং ভুঙ্ক্তে সমুল্লঙ্ঘ্য নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াঃ॥ ৩॥

অলর্ক উবাচ।

কথিতং মে ত্বয়া মাতনিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ যৎ।
নিত্যনৈমিত্তিকঞ্চৈব ত্রিবিধং কর্ম্ম পৌরুষম্॥ ৪॥
সদাচারমহং শ্রোতুমিচ্ছামি কুলনন্দিনি।
যৎ কুর্ব্বন্ সুখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ॥ ৫॥

বলিলেন মদালসা,—"শুন, বাছাধন,
সাধু গৃহী সদা সদাচার পরায়ণ
দেব আর পিতৃগণে হব্য কব্য দানে
পূজিবেন সতত সন্তুষ্ট রহি' প্রাণে
অতিথি, বান্ধব আর যত ভূতগণে
ভৃত্যগণে, পশু-পক্ষি-পিপীলিকাগণে
বাঞ্ছাকারী ভিক্ষুকেরে করিয়া যতন
অন্নদানে তুষিবেন গৃহাগত জন। ১।২।
সদাচার পরায়ণ সাধু গৃহীজন,
নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া না করে লঙ্ঘন,
কর্ত্তব্যের উল্লঙ্ঘনে বহু পাপ হয়
সে পাপের ফল বৎস ভীষণ নিরয়।" ৩।
বলেন অলর্ক—"মা গো, শুনিনু সকল
নিত্য আর নৈমিত্তিক কর্ম্মের যে ফল;
নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করেছ বর্ণন,
ত্রিবিধ পৌরুষ কর্ম্ম করেছি শ্রবণ। ৪।
গো কুলনন্দিনী, এবে বাসনা অন্তরে
সদাচার তত্ত্ব শুনি তোমার গোচরে;
যেই সদাচার নরে করিলে পালন
ইহামুত্র সুখভাগী শাস্ত্রের লিখন। ৫।

মদালসোবাচ ।

গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচারপরিপালনম্ ।
ন হ্যাচারবিহীনস্য সুখমত্র পরত্র বা ॥ ৬ ॥
যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে ।
ভবন্তি যঃ সদাচারং সমুল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে ॥ ৭ ॥
দুরাচারো হি পুরুষো নেহায়ুর্বিন্দতে মহৎ ।
কার্য্যো যত্নঃ সদাচারে আচারো হন্ত্যলক্ষণম্ ॥ ৮ ॥
তস্য স্বরূপং বক্ষ্যামি সদাচারস্য পুত্রক ।
সমাহিতমনাঃ শ্রুত্বা তথৈব পরিপালয় ॥ ৯ ॥
ত্রিবর্গসাধনে যত্নঃ কর্ত্তব্যো গৃহমেধিনা ।
তৎসংসিদ্ধৌ গৃহস্থস্য সিদ্ধিরত্র পরত্র চ ॥ ১০ ॥
পাদেনার্থস্য পারত্র্যং কুর্য্যাৎ সঞ্চয়মাত্মবান্ ।
অর্দ্ধেন চাত্মভরণং নিত্যনৈমিত্তিকান্বিতম্ ॥ ১১ ॥
পাদঞ্চাত্মার্থমায়স্য মূলভূতং বিবর্দ্ধয়েৎ ।
এবমাচরতঃ পুত্র অর্থঃ সাফল্যমর্হতি ॥ ১২ ॥

মদালসা বলে—"বাপ, বলিব তোমায়,
সদাচারতত্ত্ব যাহা শুনিতে জুয়ায় ।
গৃহস্থের উচিত সে আচার পালন
আচার বিহীন সুখ না পায় কখন । ৬ ।
সদাচার পরিহরি' সংসার মাঝারে
যজ্ঞ দান তপ যদি করে বারে বারে,
সেই যজ্ঞাদিতে নহে মঙ্গল কখন
ইহে তা'র কষ্ট, পরে নিরয় গমন । ৭ ।
দুরাচার জন, দীর্ঘজীবন না পায়
অল্প কালে দেহ ছাড়ি যমালয়ে যায়,
সেই হেতু যতনে আচর' সদাচার
সর্ব্ব অলক্ষণ নাশ হইবে তোমার । ৮ ।
সদাচার স্বরূপ বলিব এইবার
এক মনে শুন বাপ বচন আমার । ৯ ।

গৃহীর উচিত, যত্ন ত্রিবর্গ সাধনে,
তাহে সিদ্ধ হ'লে সুখ পায় ত্রিভুবনে । ১০ ।
আত্মবান হবে, সদা করিবে যতন,
ন্যায়পথে যথাশক্তি করিতে অর্জ্জন,
অর্জিত ধনের পাদ করিয়া রক্ষণ
পারত্রিক কার্য্য তাহে কর আচরণ ।
অর্দ্ধাংশেতে নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সনে
আত্মাদি পোষণ সদা করিবে যতনে । ১১ ।
অবশিষ্ট পাদ-অর্থ করি' মূলধন
বৃদ্ধির কারণে সদা করিবে যোজন ।
যেই গৃহী এইরূপ করে আচরণ
সর্ব্বদা সাফল্য লাভ করে সেই জন । ১২ ।

তদ্বৎ পাপনিষেধার্থং ধর্ম্মঃ কার্য্যো বিপশ্চিতা।
পরত্রার্থং তথৈবান্যঃ কামোঽত্রৈব ফলপ্রদঃ ॥ ১৩ ॥
প্রত্যবায়ভয়াৎ কামস্তথান্যশ্চাবিরোধবান্।
দ্বিধা কামোঽপি গদিতস্ত্রিবর্গস্যাবিরোধতঃ ॥ ১৪ ॥
পরস্পরানুবন্ধাংশ্চ সর্ব্বানেতান্ বিচিন্তয়েৎ।
বিপরীতানুবন্ধাংশ্চ ধর্ম্মাদীংস্তান্ শৃণুষ্ব মে ॥ ১৫ ॥
ধর্ম্মো ধর্ম্মানুবন্ধার্থো ধর্ম্মো নাত্মার্থবাধকঃ।
উভাভ্যাঞ্চ দ্বিধা কামস্তেন তৌ চ দ্বিধা পুনঃ ॥ ১৬।
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চাপি চিন্তয়েৎ।
কার্য্যক্লেশাংশ্চ তন্মুলান্ বেদতত্ত্বার্থমেব চ ॥ ১৭ ॥
উত্থায়াবশ্যকং কৃত্বা কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ।
সমুত্থায় তথাচম্য প্রাঙ্মুখো নিয়তঃ শুচিঃ ॥ ১৮ ॥

পাপ দূর করিবারে ধর্ম্মের সঞ্চয়
প্রাজ্ঞজনে করে সদা কহিনু নিশ্চয়।
পরকাল তরে হয় ধর্ম্মের অর্জ্জন
সেই সে নিষ্কাম ধর্ম্ম শুন বাছাধন।
কাম্য যাহা ইহ লোকে ফলবান হয়
সংসারীর দুই চাই কহিনু নিশ্চয়। ১৩।
প্রত্যবায় ভয়ে হয় কাম্যের সাধন,
নিষ্কাম সে পারত্রিক সুখের কারণ।
ত্রিবর্গের এক কাম, দুইরূপ হয়,
কাম্য ও নিষ্কাম ভেদ জানিহ নিশ্চয়
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ নিশ্চয়
অনুবন্ধ যুক্ত, অনুবন্ধহীন হয়। ১৪।
পরস্পর অনুবন্ধ আছে এই তিনে,
স্থির চিত্তে এই তত্ত্ব বুঝ দিনে দিনে,
বিপরীত অনুবন্ধ আছে যে প্রকার
ধর্ম্মাদির বলি, শুন, নিকটে আমার। ১৫।
ধর্ম্ম, ধর্ম্ম-অনুবন্ধযুক্ত অর্থ আর
আত্মার্থের বাধক না হইবে তোমার।
কাম্য ধর্ম্ম, কাম্য অর্থ দুইরূপ হয়
ধর্ম্ম্য অর্থ ধর্ম্ম্য কাম দ্বিবিধ নিশ্চয়
অর্থ অনুকুল ধর্ম্ম কাম সুনিশ্চয়
ত্রিবর্গের দ্বিধা রূপ নাহিক সংশয়। ১৬।
গৃহী ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ত্যজিবে নিদ্রাসুখ
ধর্ম্ম অর্থ চিন্তিবেন হইয়া প্রাঙ্মুখ।
ধর্ম্ম অর্থ অর্জনের কার্য্য—ক্লেশ তা'র
চিন্তিবেন আর বেদতত্ত্বার্থের সার। ১৭।
শয্যাত্যজি' আবশ্যক শৌচকার্য্য করি',
সমাহিত হ'য়ে বসি' আসন উপরি
পূর্ব্বমুখে শুদ্ধভাবে করি' আচমন
কর্ত্তব্য কার্য্যের তরে নিয়োজিবে মন।
থাকিতে নক্ষত্র পূর্ব্ব-সন্ধ্যা আচরিবে
অস্তোন্মুখ দিবাকরে পশ্চিমা সাধিবে।
বিশেষ আপৎ বিনা ইহার ব্যত্যয়,
শাস্ত্রমতে কোনোদিন কর্ত্তব্য না হয়। ১৮

ভাবোন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের জাহ্নবীতীর দিয়া শ্রীনিত্যানন্দের সহিত শান্তিপুর গমন

"বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্ম্মতত্ত্ব" গ্রন্থ হইতে গৃহীত

India Press, C

"ভারতবাসী 'জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়' বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না—পরজাতি-বিদ্বেষ এবং পরজাতি-পীড়ন তাঁহার স্বজাতি-বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অপর একটি মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন—
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

ভূদেব

৪র্থ খণ্ড | ৪র্থ বর্ষ
শ্রাবণ, ১৩২০
১০ম সংখ্যা

আলোচনা

১। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ

'বিশ্ববিদ্যালয় কাহাকে বলে?'। আমেরিকার সুবিখ্যাত ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি সেদিন এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন—"প্রকাণ্ড একটা কলেজে নানা বিষয় শিখাইলেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুত হইল না। সাধারণ স্কুল-কলেজে যত বিষয় শিখান হয় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জিনিষ শিখান হইয়া থাকে সত্য। কিন্তু বড় বড় বাড়ী ঘর, অধিকসংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষক, এবং বহু বিষয়ে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মুখ্য ও প্রধান লক্ষণ নয়। 'জন্স্ হপকিন্স্'কে লোকেরা বিশ্ববিদ্যালয় বলিত যখন তাহাতে কেবলমাত্র ছয়জন অধ্যাপক দুইশত জন ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন। যে শিক্ষালয়ের কর্ম্ম, চিন্তা ও সাধনা সমস্ত সুধীজগতে সমাদৃত হয় তাহাকেই প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায়। আমেরিকার কলেজ ও বিদ্যালয়গুলি যেদিন সমগ্র বিশ্বে

তাহাদের চিন্তাপ্রণালী ও কর্ম্মপ্রণালীর প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল, সেইদিন হইতেই আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।”

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রকৃত তত্ত্ব মনে রাখিবেন তাঁহারা ‘বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ’কে একটা যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয় আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ কেবল সাত বৎসর মাত্র কার্য্য করিয়াছেন। এখনও ইহাঁদের কার্য্যের হিসাব ও পরীক্ষা লইবার সময় আসে নাই। তথাপি এই কয় বৎসরের মধ্যে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, অধ্যাপক এবং ছাত্রগণ যে আদর্শে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন, তাহা কেবল বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র ভারতে, এবং ভারতবর্ষের বাহিরেও বিশাল পণ্ডিত-সমাজে ভারতবাসীর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। চক্ষু খুলিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব বঙ্গে জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তন ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে কত নূতন নূতন সমস্যা আনিয়া দিয়াছে এবং কত নূতন দিকে শিক্ষাপ্রণালীর গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। আমরা জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সফলতা সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করিব। সম্প্রতি দু’একটা জাতীয় শিক্ষা-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের বিবরণ দিতেছি।

কলিকাতার ইংরাজী দৈনিক “ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে’ প্রকাশ—বিগত বৈশাখ মাসে কলিকাতা ‘পঞ্চবটী ভিলা’তে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের পারিতোষিক বিতরণোৎসব-সভার অধিবেশন হইয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্পাদকগণ যে বিবরণী পাঠ করেন তাহা মোটের উপর সন্তোষজনক। রেক্টর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি, এস্, সি (লণ্ডন) এফ্, জি, এস্, এম্, আর্, এ, এস্, তাঁহার অভিভাষণে পরিষদের অভাব ও বর্ত্তমান অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রধান কথা এই—“পরিষদ যে অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছে, তাহাতে আমাদের আশা আছে একদিন ইহা উন্নতিলাভ করিবেই। যদিও বর্ত্তমানে আমরা ইহার কৃতকার্য্যতার অধিক লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না, তথাপি আমাদের নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহিনী শক্তির প্রভাবে দেশের এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, যে শিক্ষা পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ বা অনুরূপ নহে তাহা আমাদের দেশবাসী কর্ত্তৃক আদৃত হয় না।” অতঃপর তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার তুলনা করিয়া বলেন যে, “হিন্দুসভ্যতা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বিহনে আজও বাঁচিয়া আছে। তাহা পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এই সভ্যতা আমাদের দেশীয় শিল্পকলার বিনাশ ও প্রাচীন শিক্ষাদর্শের খর্ব্বতা সাধন করিয়া হিন্দুসভ্যতায় অনৈক্য ও অশান্তির ভাব আনয়ন করিয়াছে। সুতরাং আমাদের সনাতন সাম্যভাব ফিরাইয়া আনিবার জন্য দেশীয় শিল্পের পুনরুন্নতি ও প্রাচীন শিক্ষার পুনঃপ্রবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে।” তিনি আরও বলেন শিল্পশিক্ষায় পরিষদ যথেষ্ট কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, এবং যদিও গভর্ণমেণ্ট একটি সুসজ্জিত শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হওয়ায় আমাদের কয়েকজন

বঙ্গে জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠাতা এবং দেশীয় শিল্প
ও ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তনে মুক্তহস্ত

ময়মনসিংহের দানবীর
জমীদার
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

India Press, Calcutta

পৃষ্ঠপোষক পরিষদের সাহায্যদানে অস্বীকার করিয়াছেন, তথাপি এরূপ আরও দুই একটা বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা আছে।

অবশেষে জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও অকৃত্রিম বন্ধু শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন হইতে যে বক্তৃতা দেন নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে।

"পরিষদ বাস্তবিকই ভয়ানক সঙ্কট অবস্থা অতিক্রম করিয়া এই নিরাপদ স্থানে আসিয়াছে। এখন আশা করি যে ইহা আর বিপদে পড়িবে না। অবশ্য পরিষদের সভ্যবৃন্দ বিস্মৃত হইবেন না যে তাঁহারা কিরূপ বিপদসঙ্কুল অবস্থাতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন ও তখন দেশে কি তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। তখন যে ঘটনাবলীর উপর তাঁহাদের কিছুমাত্র হাত ছিল না সেই সমুদয়ই তাঁহাদিগকে এই বিপদের মেঘান্ধকারে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাঁহারা লোকের সন্দেহ ভাজন হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা কখনও গুপ্ত এবং অপ্রকাশ্য জীবন যাপন করিতেন না। তাঁহাদের কার্য্য-বিবরণী, কার্য্যপ্রণালী সবই সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল, তাঁহাদের কেহই সন্দেহজনক কোন কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন না। যদিও পরিষদের কাজ প্রথমাবস্থায় একযোগে অষ্টাদশটি শাখা-বিদ্যালয়ের সহিত আরব্ধ হইয়াছিল ও এক্ষণে তাহার আটটি মাত্র অবশিষ্ট আছে, তত্রাচ আমি হতাশ হই নাই। এখনও ইহার কতকগুলি শাখা সুন্দররূপে কার্য্য পরিচালনা করিতেছে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতি'; এই সমিতি অতি সুন্দর গৌরবজনক কাজ করিতেছেন। পরিষদ স্পষ্টই প্রমাণ করিয়াছেন যে রাজনীতির সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই; ইহা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান।

যে সমস্ত ছাত্র বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের বৃত্তি পাইয়া আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি স্থানের সর্ব্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে তাহারা চরিত্র ও বুদ্ধির দ্বারা সেই দূর দেশেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। সেই সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদিগের ছাত্রগণ সম্বন্ধে সন্তোষপ্রদ সংবাদ পাঠাইয়াছেন। অধিকন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যে বারজন ছাত্র পাঞ্জাবের গত শিল্প পরীক্ষাতে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার তিনটি মাত্র ছাত্র ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে দুইজন এই পরিষদ হইতে গিয়াছিল তাহাদের উভয়ই উত্তীর্ণ হইয়াছে। এখানকার একটি ছাত্র অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিদ্যায় পরাজিত করিয়া ভারতগবর্মেণ্টের ভূতত্ত্ববিভাগে ৫০৲ টাকা বেতনের একটি পদ অধিকার করিয়াছে। এই সমস্ত পরিষদের গৌরবের কথা। বাস্তবিক পরিষদ অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেছেন। ভূতত্ত্ব-বিভাগ ও রঞ্জন-বিভাগের কার্য্য বন্ধ হওয়া বড়ই দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু এই দুই বিভাগে শিক্ষিত ছাত্রদের চাকুরীর আশাও খুব কম; সুতরাং আমি মুদ্রণ-বিভাগ খুলিয়া তাহাতে উপযুক্ত কম্পোজিটর প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করি।

প্রাচীন যুগে আমরা উচ্চতর সভ্যতা লাভ করিয়াছিলাম ও ইহা আমাদের গৌরবের

বিষয় ছিল, এই সমস্ত কিম্বদন্তী এখন ভুলিয়া যাওয়াই ভাল। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিকেই খুব উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পক্ষাঘাতে যাহার শরীর অবসন্ন তাহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও দৃষ্টি-শক্তির তীক্ষ্ণতায় লাভ কি? অবশ্য এই অপ্রীতিকর দৃষ্টান্তের উল্লেখ করায় আমি আপনাদের নিকট অপরাধী। যাই হোক, আমার ইচ্ছা আমাদের এই প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হউক।"

*
* *

২। বঙ্গে জাতীয় শিক্ষা

সম্প্রতি বরিশালের ঝালকাঠী জাতীয় বিদ্যালয়ের বিগত দুই বৎসরের কার্য্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে শিক্ষাসম্বন্ধে কতকগুলি গভীর কথা আলোচিত আছে। এতদ্ব্যতীত বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়, কার্য্য-পরিচালনা, শিক্ষাপ্রণালী ইত্যাদি বিষয় সুবিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে। অধিকন্তু সমগ্র বঙ্গের জাতীয় শিক্ষার চিত্র তাহা হইতে কথঞ্চিৎ পাওয়া যায়। আমরা তাহা হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"স্রোতস্বতী যেমন জলরাশি সাগরের দিকে লইয়া যায়, তেমনি গ্রাম্য নিম্নশ্রেণীর পাঠশালাসমূহ উচ্চাঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্র সরবরাহ করিয়া দেয়। জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে! কিন্তু নিম্নশ্রেণীস্থ বালকদিগের শিক্ষার জন্য আজ পর্য্যন্তও পাঠশালাদি স্থাপনের কোন ব্যবস্থা করেন নাই, আমার মনে হয় ছাত্রাভাবের ইহাও একটি প্রধান কারণ। বলিতে কি আজ পর্য্যন্ত যতগুলি জাতীয় বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে অধিকাংশই ছাত্রাভাবে, অর্থাভাবে নহে। আমরা আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমাদের স্কুল-কমিটির দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে বর্ত্তমান বর্ষে দুইটি পাঠশালা স্থাপন করিয়া পরিচালিত করিতেছেন।

বানেশ্বরপুর—ঝালকাঠীর অনতিদূরে এই গণ্ডগ্রামটি অবস্থিত। অধিবাসী তাবৎ মুসলমান, আমাদের স্কুলকমিটীর মাননীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ও উপদেশে গত ১৯১১ সনের ডিসেম্বর মাসে এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়া আমাদের স্কুলের শাখারূপে কার্য্য করিতেছে। বর্ত্তমানে ছাত্র-সংখ্যা ৪৮ জন, শ্রীযুক্ত মুন্সি আইনদ্দি মহোদয়ের ঐকান্তিক চেষ্টা না থাকিলে এই বিদ্যালয়টির এত উন্নতি সাধিত হইত না। আমরা এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিচালক ব্যক্তিবৃন্দকে ধন্যবাদ দিতেছি।

চৈতন্য বিদ্যালয়—এই বিদ্যালয় ঝালকাঠী বন্দরে শ্রীযুক্ত বলভদাস মোহান্তের আখড়ায় অবস্থিত। বর্ত্তমান ছাত্র-সংখ্যা ২৫ জন। উক্ত মোহান্ত মহাশয়ের যত্নে ও সাহায্যে দিন দিন বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধিত হইতেছে।

এ ভিন্ন এই বৎসরের প্রারম্ভে আরও ৪।৫টি পাঠশালা আমাদের কমিটির অধীনে পরিচালিত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। এইরূপ ভাবে পাঠশালা স্থাপন জন্য কলিকাতার কাউন্সিল মাসিক কিছু কিছু সাহায্য প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।"

বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের
প্রধানতম কর্ণধার,
শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ও আদর্শ গৃহস্থ

শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

India Press, Calcutta

জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণের **অন্নসংস্থান** সম্বন্ধে প্রকাশ :—

"বন্ধুগণ, জাতীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় কি, তাহা কি আর যুক্তিদ্বারা বুঝাইতে হইবে? আপনারা বিশ্বাস করুন ইহারা "উদ্যোগী পুরুষসিংহ" হইবে। ইহাদিগকে যে ক্ষেত্রেই ফেলিয়া দেন না কেন, ইহারা আপন পথ খুঁজিয়া নিতে সক্ষম হইবে। তাহারা কাহারও গলগ্রহ হইবে না, অথবা ভবঘুরে সাজিয়া ভ্রমণ করিবে না। আপনারা কি জানেন না ন্যাশন্যাল কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ কেহই নিষ্কর্ম্মা-ভাবে বসিয়া নাই? তাহারা প্রত্যেকেই ভাল ভাল কাজে নিযুক্ত আছে; অনেকে আশাতিরিক্ত অর্থোপার্জ্জন করতঃ নিজের ও পরিজনের সুখের কারণ হইয়াছে। কেহ কেহ মাসিক ১০০৲।১২৫৲ উপায় করিয়া থাকেন।

জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান উপার্জ্জন করা উচিত। অধ্যয়নকালে অর্থ-চিন্তা প্রবল করিলে প্রকৃত বিদ্যালাভে ব্যাঘাত জন্মে। এ কথা সম্পূর্ণ-সত্য হইলেও সেরূপভাবে বিদ্যোপার্জ্জনকারী লোকের সংখ্যা অতীব বিরল। অতএব উপার্জ্জন সমস্যাটি সর্ব্বাগ্রে ভঞ্জন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ছাত্রগণের অভিভাবকেরা অনেক সময়েই সে চিন্তা করিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়েন। বাস্তবিক তাঁহাদের হতাশ হইবার কোনই কারণ দেখিতেছিনা। কেননা ন্যাশন্যাল কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত কাহাকেই নিষ্কর্ম্মাভাবে কাহারও দ্বারস্থ হইতে দেখা যায় না।

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ জাতীয়-শিক্ষা-প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এ বিভাগে কার্য্য করিবার জন্য বহু সংখ্যক লোকের আবশ্যক। বস্তুতঃ দেশে উপযুক্ত শিক্ষকের নিতান্তই অভাব। যাঁহারা শিক্ষাকার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁহারাই ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন। পরিষদের অধীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণের মধ্যে এ যাবত প্রায় ৪০ জন উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য আমেরিকা, জাপান, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে গমন করিয়াছেন, এবং সকলেই স্ব স্ব স্থানে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া অধ্যাপকের প্রশংসালাভ করিয়াছেন। ইঁহারা ফিরিয়া আসিলে শিক্ষাবিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। ইঁহাদের কেহ 'পরিষদে'র খরচে, কেহ 'মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতি'র খরচে, কেহ 'বিজ্ঞান-সমিতি'র খরচে গিয়াছেন। অপরেরা নিজের বা আত্মীয়গণের খরচে গিয়াছেন।

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের ছাত্রগণ পবিত্র শিক্ষকতা কার্য্যে, সাহিত্যালোচনা, গ্রন্থ-রচনা, সংবাদপত্র-সম্পাদন, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং উন্নত প্রণালীর কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন। আবার চাকরী করিতে হইলে তাহার পথও উন্মুক্ত রহিয়াছে। রেল কোং, জাহাজ কোং, চা-বাগান, কাপড়ের কল, পাটের কল ইত্যাদি, এবং ইন্সিওরেন্স কোং, সমবায়-সমিতি প্রভৃতি সর্ব্বত্রই ইহাদের প্রবেশাধিকার আছে।

অনেকের বিশ্বাস যে এখানকার ছাত্রেরা সরকারী চাকরী পায় না, ইহাও ভুলধারণা।

আমি জানি সরকারী ডাকবিভাগ, যাদুঘর, সরকারী বিদ্যালয় প্রভৃতিতে ইহারা কাজ পাইয়াছে। ন্যাশন্যাল কলেজের একজন ছাত্র ৫০ টাকা বেতনে যাদুঘরের কাজ পাইয়াছেন, আর একজন ৬০ টাকা বেতনে এক Technological schoolএ Assistant Head masterএর পদ পাইয়াছেন, আর একজন ১০০৲ টাকা বেতনে এক Insurance Co.র Secretaryর পদে আছেন, ইত্যাদি আরও অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে পারি। এমন কি ঝালকাঠী জাতীয় বিদ্যালয়ের টেক্‌নিক্যাল বিভাগের একটি ছাত্র ৪০ টাকা বেতনে Port Trust officeএ এবং আর একটি ৪০ টাকা বেতনে District Boardএ কাজ পাইয়াছে। আসল কথা যোগ্যতা চাই। যোগ্য ব্যক্তির আদর সর্ব্বত্রই আছে।"

১৯১১ এবং ১৯১২ এই দুই বৎসরে ঝালকাঠী জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য ১২০০০৲ বার হাজার টাকা খরচ করা হইয়াছে। বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ বিদ্যালয়-পরিদর্শন সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট নহেন। রিপোর্ট হইতে এ বিষয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত হইল :—

"গত দুই বৎসরে আমাদের কার্য্য-কলাপ পরিদর্শন করিতে, ছাত্র ও স্কুল-পরিচালক মেম্বরদিগকে উৎসাহিত করিতে অনেক সদাশয় মহাত্মারই শুভাগমন হইয়াছে। তন্মধ্যে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্ এটর্ণি এট ল, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্য এবং গৌরীপুরের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম্, এ, কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রফেসার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্, এ, দেশগৌরব শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত এম্, এ, বি, এল্, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুহ এম্, এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বিখ্যাত বক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, বরিশালহিতৈষী পত্রিকার এডিটার এবং খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"

* *

৩। ব্যক্তিগত চরিত্রগঠন

পরার্থে জীবন পূত মন্দাকিনী-প্রবাহ; ইহা সমাজের প্রতি অঙ্গে সেই পবিত্র ধারা ঢালিয়া দেয়। কোন স্বার্থ নাই, কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, কি যেন এক অদৃশ্য শক্তির টানে প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠে, দেশের দিকে, সমাজের দিকে ছুটিয়া যায়। আমাদের এই প্রবাহকে পরিপুষ্ট করিতে হইবে, এই নিঃস্বার্থ জীবনকে বিষময় জ্বালা হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

কিন্তু প্রথমেই এক ভীষণ সমস্যা। একদল রাজনীতিবিদ্ সম্প্রদায় নেতৃগণের বাহিরকার সমাজ-গত জীবনকে তাঁহাদের ভিতরকার ব্যক্তিগত চরিত্র হইতে পৃথক করিয়া থাকেন। তাঁহারা এইরূপে জীবনকে দুই কৃত্রিম ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলেন। তাঁহারা মনে করেন এই দুই পৃথক কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষ পরস্পর-বিরুদ্ধ চরিত্রের পরিচয় প্রদান করিতে পারে। তাঁহারা রাজনীতি-বিশারদ পণ্ডিতগণের ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করেন না।

বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষাপরিষদের
সভাপতি এবং পৃষ্ঠপোষক

স্বাধীনচেতা
শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ

India Press, Calcutta.

কেবলমাত্র সামাজিক ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি করিতে উপদেশ দেন। তাঁহারা এমন কি ধর্ম্মকেও এইরূপ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। এইরূপ ভাব ইউরোপের কোন কোন মণ্ডলীতে দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং আমাদের মধ্যেও অনেকে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

ইহা স্পষ্টই মনে রাখিতে হইবে যে, নৈতিক চরিত্রহীন ব্যক্তি কখনও পরসেবারূপ পবিত্র কর্ম্ম করিবার অধিকারী হইতে পারে না। সে কখনই জনগণের নেতা বা চালকরূপে গণ্য হইতে পারে না, প্রকৃতপক্ষে সে তাহাদের সর্ব্বনাশই সাধন করিয়া থাকে। জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য আন্দোলন কখনই মিথ্যাবাদী ও কপটের দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে না। কেবলমাত্র কতকগুলি রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক বিশিষ্ট মতবাদ বুঝিতে পারিলেই হইবে না, আমারা মানুষ চাই, কোন সম্প্রদায় চাই না। কোনও চরিত্রহীন ব্যক্তিকে যেন সমাজে সম্মান দেওয়া না হয়; সে রাষ্ট্রনীতিবিশারদ হইতে পারে, পণ্ডিত বক্তা হইতে পারে, এবং কূটনীতিসমূহের মীমাংসা করিতে পারে; কিন্তু চরিত্রহীনের পক্ষে এই সমস্তই বৃথা। আমাদের সেবা-ধর্ম্মের আন্দোলনের মধ্যে যেন কোনরূপ অধর্ম্ম প্রবেশ না করে।

এই মূল তত্ত্ব যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। অদূরদর্শী এবং অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই কার্য্য অপেক্ষা কথায়ই বেশী বিশ্বাস করে। চরিত্রহীন কখনই পতিতকে উদ্ধার করিতে পারে না, মূকমুখে ভাষাও দিতে পারে না, শুষ্ক হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিতে পারে না। একমাত্র ধর্ম্মই দুর্ব্বলের বল এবং নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। ইহা হইতেই প্রকৃত শক্তি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ত্যাগ কর, সমস্ত পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতির নীরস বাগাড়ম্বর বিপদে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আমাদের মধ্যে অনেকে বর্ত্তমান অস্বাভাবিক শিক্ষা-পদ্ধতির ফলে জাতীয়তাভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা মনে করে ধর্ম্ম ব্যতীত কোন জাতি বাঁচিয়া থাকিতে পারে এবং উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে পারে!

চরমপন্থী বা মধ্যপন্থীবাদই দেশকে উদ্ধার করিতে পারে না, ইহা গভীর জাতীয় জীবন-সমুদ্রের ফেন মাত্র। চরিত্র মতামতের অনেক উচ্চে; চরিত্র ব্যতীত মতামতেরও কোন মূল্য নাই। ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় জীবন সম্বন্ধে বাদ-বিতণ্ডা বা সিদ্ধান্ত করিতে পারি না বলিয়াই যে আমাদের এই দুর্দ্দশা তাহা নহে। আমরা বিবেকের শক্তি হারাইয়াছি এবং পার্থিব অকিঞ্চিৎকর স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছি। বৈরাগ্যের বাণী আর কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না—আমরা জাগিয়াও নিদ্রা যাইতেছি, পাশ্চাত্য মোহে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমাদের হৃদয় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, বিবেক শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাই প্রকৃত ব্যাধি। বুদ্ধিবলের অভাব নাই, চরিত্রবলেরই অভাব। রাষ্ট্রনীতির গভীর গবেষণা চরিত্র-হীনতার আবরণ স্বরূপ হইতে পারে না। পবিত্রতা এবং উদারতাই মানুষকে মানুষ করিয়া তোলে, জাতিকে উন্নত করিতে পারে এবং সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একটা তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

ব্যক্তিগত চরিত্রই আন্তরিকতার পরিচয় স্থল। যে ব্যক্তিগত জীবনে মিথ্যা কথা বলে, সে সামাজিক জীবনে মিথ্যা কথা না বলিয়া পারে না। সে যখন সভামঞ্চে বক্তৃতা করিতে উঠে, অথবা সংবাদপত্রে লেখনী ধারণ করে, তখন সে ঠিক আর একটি মানুষ হইয়া যায় না। কারণ মানুষের মানসিক ও নৈতিক শক্তিগুলি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে গ্রথিত, সে কতকগুলি পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণসমূহের জোড়াতালি দেওয়া একটা নির্জ্জীব কল মাত্র নহে।

ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত দোষই আত্ম-সংযমের অভাব ও সামাজিক দায়িত্ববোধের অভাব বই আর কিছুই নহে। ব্যক্তিগত জীবনের দোষেই মানুষ সমাজের বিরুদ্ধে পাপাচরণ করিয়া থাকে। সমাজের সহিত ব্যক্তিগত জীবনের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে সমাজকে বাঁচাইতে হইলে, ইহার উন্নতিসাধন করিতে হইলে, ব্যক্তিগত জীবনকে সংযত, নির্ম্মল ও পবিত্র করিতে হইবে, দায়িত্ববোধ জাগাইয়া তুলিতে হইবে। লক্ষ লক্ষ লোকের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে, তাহাদের মঙ্গল-কামনা করিতে, এবং দূরদৃষ্টি বলে ভবিষ্যৎ যুগেও যাহাতে কোন অশান্তি উৎপন্ন হইতে না পারে তদ্বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিতে হইলে এইরূপ চরিত্রবান্ কর্ম্মবীরের আবশ্যক।

যখন একটা জাতি বহুদিনের ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করে, তখন সমাজে নূতন নূতন নীতি, চিন্তা ও কর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। মানুষগুলি একে একে সম্পূর্ণ পরি-বর্ত্তিত হইয়া যায়। তাহারা নূতন নূতন সত্যের আবিষ্কার করে, তাহারা উচ্চ আদর্শ এবং লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত হয়, সেই উচ্চতর এবং পবিত্রতর জীবনের স্পন্দন ও শক্তি অনুভব করে; সমাজের প্রত্যেক লোক একটা উচ্চতর কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হয়। ফলতঃ তাহারা ক্রমশঃ সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনেও উন্নতিলাভ করিতে থাকে। পতিত জাতি বলিলে কি বুঝি? সে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি স্বার্থপর, কাপুরুষ, অজ্ঞ ও অলস ইহাই কি বুঝা যায় না? কোন জাতি গার্হস্থ্য জীবনে অবনত হইয়া কি সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে উন্নত হইতে পারে? ব্যক্তিগত জীবনে প্রতারক হইয়া সমাজের জন্য কেহ কি নিঃস্বার্থভাবে ও নির্ভীকচিত্তে কাজ করিতে পারে? মহান্ আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ আমাদের দেশে নূতন জিনিষ হইয়া পড়িয়াছে, আমরা আমাদের পূর্ব্ব কাহিনী সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছি।

রাজনৈতিক কর্ম্ম একটা ফলবিশেষ, চরিত্রবলই ইহার মূলে। কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে একটা কিছু গড়িয়া তোলা যায় না। এই চারিত্রনীতি সামাজিক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎসরূপে বিরাজিত থাকিয়া সর্ব্বত্র জীবনীশক্তি সঞ্চার করিয়া দেয়। সুতরাং ইহাই জাতির প্রাণ। সাহিত্য, রাষ্ট্র, ব্যবসায়, বাণিজ্য এবং গার্হস্থ্য জীবন সকলই চরিত্রের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। ইহার উন্নতিই সমাজের ঐক্যবন্ধন দৃঢ় করিবে এবং বিশৃঙ্খলতা দূর করিবে।

আধুনিক বঙ্গীয় বিদ্যাজগতের বিক্রমাদিত্য এবং জাতীয়
শিক্ষাপরিষদের পৃষ্ঠপোষক

কাশিমবাজারের মাননীয়

মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

"অবিরত দানে রত, নিরাকাঙ্ক্ষ প্রতিদানে"

India Press, Calcutta.
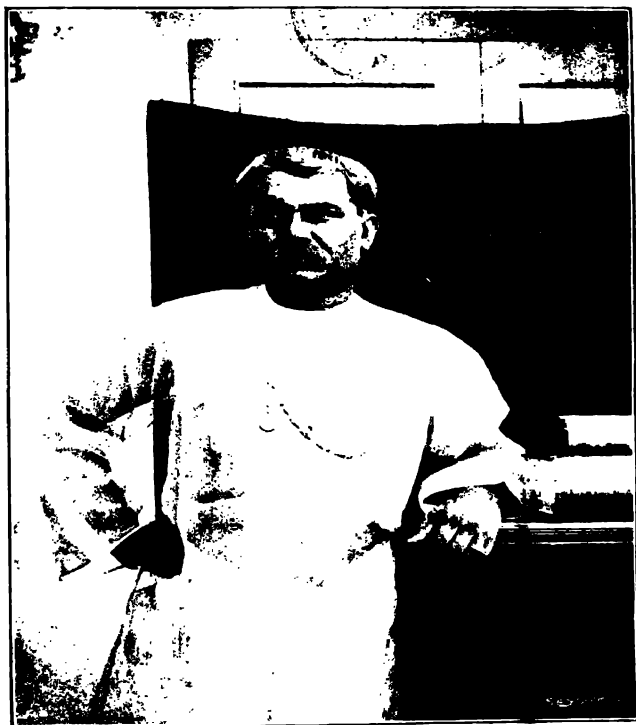
৪। সাধক রামপ্রসাদের মাতৃপূজা

সামঞ্জকে বাদ দিলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয় কি? এই ব্যক্তিত্ব পারিপার্শ্বিক ভাব, ঘটনা ও দৃশ্যসমূহ দ্বারাই গঠিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে সমাজও ব্যক্তিগত চরিত্রের ভাব সমূহ দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। আবার এক জাতির বিকাশের সহিত অপর জাতিসমূহের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেক মানুষ নিজ চিন্তা ও বাক্য দ্বারা সমস্ত মনুষ্য-সমাজের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিতেছে এবং মনুষ্য-সমাজও প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই সম্বন্ধ অতীব গভীর। একজনের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় আর একজনের উন্নতি অবনতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ।

এই সংসারের কোনও দুইটি মানুষই সর্ব্ববিষয়ে এক ভাবের ভাবুক নহে, এক পথের পথিক নহে। মতদ্বৈধ থাকিবেই। এক পিতার পাঁচটি সন্তান, সকলেই কি এক ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে? একই আদর্শে শিক্ষিত দীক্ষিত হইবে ও একইরূপে জীবনের লক্ষ্য স্থির করিবে? একই ভাবে কি জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না, প্রত্যেকেই শিক্ষা দ্বারা নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের বিকাশ করিবে। প্রত্যেকেই বিভিন্ন উপায়ে নিজের আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহ উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে, বিভিন্ন ভাবের ভাবুক হইবে, বিভিন্ন ভাবে জীবন গঠিত করিবে। ইহাতে, স্মরণ রাখিতে হইবে, ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধের শিথিলতা হয় না, সে দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন হয় না, সে সম্বন্ধ চিরকালই অটুট থাকে। হইতে পারে এক ভাই শৈব, এক ভাই বৈষ্ণব, এক ভাবই বৌদ্ধ, এক ভাই খৃষ্টান ও এক ভাই মুসলমান। তাই বলিয়া তাহারা কি ভাই নহে, তাহারা কি একই মায়ের সন্তান নহে, একই স্তন্যদুগ্ধে প্রতিপালিত নহে, একই ক্রোড়ে বর্দ্ধিত নহে এবং একই মায়ের আদর ও যত্নে পুষ্ট হয় নাই কি? এ সম্বন্ধ ঘুচিবার নহে, ঘুচিবেও না। আমরা ভুলিবার চেষ্টা করিতে পারি কিন্তু শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে যে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, উহাই আমাদিগের ঐক্য স্মরণ করিয়াই দিবে ও দিতেছে।

যদি এক পরিবারের ভিতরই এইরূপ বিচিত্রতা ও বিভিন্নতা থাকিতে পারে তবে সমাজে ও জাতিতে যে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক বৈচিত্র্য ও পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? তাহারাও একই জননীর অঙ্কে শায়িত, একই জননীর বায়ুতে জীবিত ও অন্ন-জলে প্রতিপালিত এবং একই জাতীয়তায় অনুপ্রাণিত। ভক্ত-প্রবর রামপ্রসাদ ভাবে বিভোর হইয়া গাহিয়াছিলেন—

> শয়নে প্রণাম জ্ঞান—নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান
> নগর ফের মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মাকে
> কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে
> আহার কর মনে কর আহুতি দেই শ্যামা মাকে।

আমরা যখন শয়ন করি তখন মাকে যেন সর্ব্বাঙ্গে প্রণাম করিতেছি। মা আমাদের এত নিকটে যে আমরা তাঁর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছি, নিদ্রাতেও মাকেই স্মরণ করিতেছি, তাঁরই ধ্যান করিতেছি, তাঁর স্নেহ যেন কত ভাবে কত

ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। আমরা সেই ভাব-গঙ্গায় অবগাহন করিয়া পূত পবিত্র হইতেছি। আমরা যখন নগরের অলিতে গলিতে, গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় পথে ঘাটে, বনে বনে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরি তখন বাস্তবিক মাকেই প্রদক্ষিণ করিতেছি, তাঁরই চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া, নাচিয়া নাচিয়া গাহিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছি। আমরা মায়ের সত্তা উর্দ্ধে নিম্নে চতুর্দ্দিকে উপলব্ধি করিতেছি। ভক্তের এই ভাব গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে, একাগ্র হইতে একাগ্রতর হইতেছে। তখন নিজের অবশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নিজের সত্তাটুকু ভুল হইতে লাগিল। তখন ঘটে ঘটে, পটে পটে, সর্ব্বত্র মাকেই দেখিতে লাগিলেন—সেই আনন্দঘন মূর্ত্তি এমন কি আহার করিতেও মনে হইতে লাগিল মাকেই আহার করাইতেছেন।

মানুষ মানুষকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। প্রাণে প্রাণে যে টান, হৃদয়ে হৃদয়ে যে প্রেম—ইহার অস্তিত্ব ও প্রভাব কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। সাধারণ অবস্থায় কেবল ক্ষুদ্র স্বার্থের আবরণে আবৃত বলিয়া—ফল্গুনদীর বালুরাশিতে আচ্ছাদিত বলিয়া—সেই অন্তঃসলিলপ্রবাহ সাধারণ দৃষ্টশক্তির অগোচর—; কিন্তু এই পবিত্র প্রবাহ চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে, অনন্তকাল থাকিবে। সাধনায় অগ্রসর হইলে ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ অভ্যাস করিলে আবরণ সরিয়া যাইতে থাকিবে—বালুরাশি এক পার্শ্বে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইবে। অবশেষে মানুষের জন্য আপনার সত্তাটুকু চলিয়া যাইবে, আমিত্বটুকু ঘুচিয়া যাইবে, ত্যাগ সম্পূর্ণ হইবে, আবরণ চলিয়া যাইবে, বালুকারাশি সরিয়া যাইবে। তখন কুলু কুলু বেগে সেই পূত প্রবাহ, মানুষে মানুষে প্রতি জীবে জীবে প্রবাহিত হইতে থাকিবে, ভেদাভেদ চলিয়া যাইবে, মানুষ ধন্য হইবে। ভক্তকবি রামপ্রসাদ এই ভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

জাতীয় জীবনের সাধনাও এই ভাবেই সিদ্ধি লাভ করিবে। এই দুইয়ের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, কেবল কালের ব্যবধান, যুগধর্ম্মের পার্থক্য। মানুষ মানুষকে আর অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবে না, মানুষের মত দেখিবে, নিজ হইতে অভিন্ন বলিয়া বোধ করিবে, নিজের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে রত্নরাজির সন্ধান পাইবে, অনন্ত শক্তির সন্ধান পাইবে। আত্মপ্রত্যয় জন্মিবে, আত্মনির্ভরশীলতা জাগিয়া উঠিবে, পরের জন্য নিজের সমস্ত কর্ম্ম, চেষ্টা ও চিন্তা সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিবার প্রবল আকাঙ্খা হৃদয়কে উদ্বেলিত করিবে। ত্যাগের মন্ত্র জীবনকে পরিচালিত করিবে, নিজেকে অপরের মধ্যে মিশাইয়া ফেলিতে সাধ হইবে, তখন জীবনের ও সমাজের প্রত্যেক অঙ্গে মায়ের মূর্ত্তি প্রকট হইবে। তখন মানুষকে আর শুধু দেহ পিণ্ড বলিয়া বোধ হইবে না, তাহারই ভিতরে সর্ব্বত্র একই সত্তার উপলব্ধি হইবে, এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ইহারই ইঙ্গিতে সকলে উঠিতে বসিতে ভাবিতে ও কার্য্য করিতে, চলিতে ও ফিরিতে শিক্ষা করিবে। সকলেই অল্পাধিক এই ভাবের সাড়া দিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন্ প্রাণ এই আধ্যাত্মিকতায় বিভোর হইয়া উঠিয়াছে, কাহার প্রাণ রামপ্রসাদের ন্যায়

জাতীয় শিক্ষা ও সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক ও পৃষ্ঠপোষক

দার্শনিক

শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

India Press, Calcutta.

কাঁদিয়া উঠিয়াছে, কাহার প্রাণে এই বৈরাগ্যের উৎকণ্ঠা আসিয়াছে? একনিষ্ঠ হইয়া ঐকান্তিক ভাবে ধর্ম্ম জীবনে অগ্রসর হউন। জাগতিক শক্তি পদানত, সিদ্ধি করতল গত। সমাজের মধ্যে এই ধর্ম্মপ্রাণতার প্রভাব চাই, এ ধর্ম্ম-জীবনের পথিক ও ভাবুক চাই। সেই ধর্ম্মবীরগণই ভবিষ্যৎ সমাজ নিয়ন্ত্রিত করিবার যন্ত্র স্বরূপ হইবেন।

* *
*

৫। চীনের ভবিষ্যৎ

শ্রীযুক্ত সনৎ সেন স্বায়ত্ত-শাসনাধীন চীনের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া নিম্নলিখিত আশার বাণী প্রচার করিয়াছেন :—

"আজ চীনের অবস্থা আগেকার অপেক্ষা যথেষ্ট উন্নত। দেশে একতার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে; আগেকার মত গোল-মাল বা বিশৃঙ্খলতা নাই, দেশের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও বিদেশে যাতায়তের পথের বেশ সুবিধা হইয়াছে; এই সব কারণেই আমাদের ঐক্যবন্ধন দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে। এখন দেশের কোন জায়গায় যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে সকলেই জানিতে পারে, এবং সব দেশটাও কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে সব খবর রাখিতেছে।

রাষ্ট্রবিপ্লবের পর হইতেই প্রায় এক হাজার দৈনিক কাগজ চলিতেছে; আগে মোটে ৪০ কি ৫০ খানা ছিল; এবং কয়েক বৎসর আগে আরও কম ছিল, তাহাও কেবল মাত্র কয়েকটি বন্দরেই আবদ্ধ ছিল। টেলিগ্রাফের তার সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, শরীরের ভিতর রক্তসঞ্চালনের ন্যায় দেশের পল্লীতে পল্লীতেও সব খবর যাইতেছে।

আফিঙ্গের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যেরূপ একটি আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে বোধ হয় চীনের ঐক্যবন্ধন দৃঢ়তর হইয়াছে। আগেকার দিনে এখনকার মত সহানুভূতি ও সফলতার সঙ্গে এরূপ একটি আন্দোলন কখনই সম্ভবপর হইত না। দেশের জাতীয় আন্দোলনের অহ্বানে সমগ্র চীনবাসী আজ সাড়া দিতেছে।

চীনবাসীরা বিদ্যালাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, প্রত্যেক বালকই যে যেমন পারিতেছে অমনি স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া যাইতেছে; কাজেই জোর করিয়া আর বিদ্যা শিখাইবার কোন দরকার নাই। বিদ্যাশিক্ষা দেশের মধ্যে বন্যার মত ছুটিয়া চলিয়াছে, এখন সর্ব্বসাধারণের জন্য কি প্রণালীতে স্কুলের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে তাই আমাদের ভাবিতে হইবে।

চীনবাসীদের আর্থিক অবস্থা আজ অনেক উন্নত হইয়াছে। তাহারা কৃষি বিদ্যা ভাল করিয়া বুঝিতে শিখিতেছে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। আগেকার অপেক্ষা দেশে স্বচ্ছলতার মাত্রাও বাড়িতেছে। গত দুই বৎসরের মধ্যেই যদিও গবর্ণমেণ্টের দারিদ্র্য ঘুচে নাই, কিন্তু লোকেদের আর্থিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল হইতেছে।

রাষ্ট্রনীতি বিষয়েও চীনের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং আমার মনে হয় লোকগুলিকে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী শিক্ষা দিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে পারিলে চীন একটা পরাক্রান্ত জাতি হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা শান্তিতে থাকিতে চাই, অন্য রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা বাধ্য না হইলে আমাদের যুদ্ধ বিগ্রহ করিবার ইচ্ছা

নাই। পাশ্চাত্য জাতিই যুদ্ধ বিগ্রহের সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহারা না করিলে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। চীনের অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না।

আমি চীন ও জাপানের মধ্যে বন্ধুতা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছি। বড়ই সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে, চীনের সহিত জাপানের যে সখ্যনীতি আবশ্যক তাহা অধিকাংশ জাপানীরাই বুঝিতে পারিয়াছে। এই উভয় দেশের পক্ষে এবং সমস্ত পৃথিবীর পক্ষে এইরূপ ভাবই মঙ্গলজনক। চীন স্বতন্ত্র ভাবেই উন্নতিসাধন করিতে চায়।

অন্যান্য জাতি চীনকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিবে কিনা, এ সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে, বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি একমত না হইলে এটা হইতে পারে না এবং ইহার কারণও আর কিছুই নয়। কোন কোন রাষ্ট্রশক্তি নূতন গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিতে চান না, 'দেখেন যে, এই সুযোগে কিছু রাজ্যলাভ হয় কি না। রুষিয়া চীনের পরিবর্ত্তে মঙ্গোলিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে ও অন্যান্য রাষ্ট্রশক্তিকেও এই মতে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত চীনের স্বাধীনতা বিঘোষিত না হইবে, ততদিন মঙ্গোলিয়া সম্বন্ধে কোন রাষ্ট্রশক্তি কিছু বলিতে পারিবে না। অত্যাচারী রাষ্ট্রশক্তি চীনে যা খুসী তাই করিতে পারে, এইরূপ ভাবিয়া তাহারা চীনের অঙ্গচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছে। যখন সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি একমত হবে তখনই এইরূপ সম্ভব, কিন্তু অনেকে দেরী করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। ইংলণ্ড তিব্বতের অবস্থার দিকে চাহিয়া আছে বলিয়া বোধ হয়; ফরাসীরা রুষিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে। জার্ম্মানী আমাদের দিকে অনুকূল বলিয়া মনে হয়, মার্কিনও জাপানের মতেই মত দিবে।

এই জাতি-সঙ্ঘাতের ফলে যে চীনের জাতীয় আন্দোলন বিশেষ বাধা পাইবে বা পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িবে তাহা আমার মনে হয় না। বরং চীনের সমস্ত জায়গায় আমূল সংস্কার হইবে, শৃঙ্খলা বিধান হইবে এবং উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে, ইহাই আমার আশা।"

৬। হিন্দু স্বাস্থ্যবিজ্ঞান

মীরাট হইতে শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু মহাশয় স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম পাঠাইয়াছেন। আমরা তাঁহার পত্র নিম্নে প্রকাশ করিলাম :—

"আমার গুরুজনদিগকে সুস্থকায় থাকিবার নিমিত্ত যে সকল আচার প্রত্যহ পালন করিতে দেখিয়াছি, তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কতকগুলি বর্ত্তমান ভগ্নস্বাস্থ্য বঙ্গীয় যুবকদিগের অবগতির জন্য এই পত্রিকাতে প্রকাশ করিতেছি। আশা যে নব্যসম্প্রদায় ঐ সকল আচারে যত্নবান্ হইবেন।

১। রাত্রৌ দধি দিবাস্বপ্নং পরিবর্জয়েৎ।

২। অত্যম্বুপানং কঠিনাশনঞ্চ পরিবর্জয়েৎ।

৩। সূর্য্যোদয়ে হ্যস্তময়েপি শায়িনং বিমুঞ্চতি
শ্রীরপি চক্রপাণিনং।

৪। শিরঃ সুধৌতং চরণৌ সুমার্জ্জিতৌ
অনগ্নশায়িত্বমধাল্পভোজনং
চিরপ্রনষ্টাং শ্রিয়মানয়ন্তি।

৫। নিত্যংছেদস্তৃণানাং ধরণিবিলিখনং
পাদয়োরল্পপূজা
দন্তানামপ্যশৌচংমলিনবসনতা
রুক্ষতামূর্দ্ধজানাম্।
দ্বে সন্ধ্যে চাপি নিদ্রা বিবসনশয়নং
গ্রাসহাসাতিরেকঃ
স্বাঙ্গে পীঠে চ বাদ্যং নিধনমুপনয়েৎ
কেশবস্যাপিলক্ষ্মীং॥

গারুড়ে—১১৪ অধ্যায়। ২৫-৩৭ শ্লোক।

৬। নীরপূর্ণমুখো ধৌতি ক্ষিপ্তজলেন
যোক্ষিণী
প্রভাতে নেত্ররোগৈশ্চ নিত্যং
সর্ব্বৈঃ প্রমুচ্যতে॥

গারুড়ে—১৭৭ অধ্যায়। ১৩ শ্লোক।

উপরি লিখিত বচনগুলি সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীর মুখস্থ থাকা উচিত। বাহুল্য ভয়ে আরও কতকগুলি উক্ত গারুড় পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করি নাই। এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীরা পুরাণের নামেই চটেন—কিন্তু এই কথাগুলির যাথার্থ্য ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়ার পর উপলব্ধি হইয়াছে বলিয়া আমি সকলকে অনুরোধ করিতে পারি যে পুরাণ-কথিত বলিয়া অবহেলা করিও না। কথাগুলি স্পষ্ট বিধায় আর ভাষা করিয়া দিলাম না।

এই সকল আচার গুলি সাধারণতঃ প্রচলিত হইবার পর তবে পুরাণকারেরা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, অতএব এই কারণ আমাদিগের ও অবশ্য প্রতিপাল্য, উপেক্ষার বা ঘৃণার যোগ্য নহে।

গৃহ্য সূত্রগুলিতে ভোজনসূত্র দেওয়া আছে, তাহাও আমাদিগের নিতান্ত প্রতিপাল্য। অবজ্ঞা করিয়া নানারূপ ক্লেশ ও রোগ ভোগ করিতে হয়। যেমন প্রচলিত কথায় বলে যে "গোলামবণ্টা বাজ্‌লো—দাও তো এক খাব্‌লা তেল—মাথায় দিতে দিতে দুটো ডুব দিয়েই মাথা পুঁছ্‌তে পুঁছ্‌তে এসে গ্রাস কতক অন্ন যেমন তেমন করিয়া গলাধঃকরণ করিয়া চাপকান কোট গায় দিতে দিতে দৌড়।" ফল—রোগ, আয়ুক্ষয় ও অকাল মৃত্যু।

৭। ন সন্ধ্যয়োরশ্নীয়াৎ
ন মধ্যাহ্নে—নার্দ্ধরাত্রে
নার্দ্রশিরা নার্দ্রবাসা ন পাণৌ ন
সর্ব্বভোজী স্যাৎ
কিঞ্চিদ্ভোজ্যং পরিত্যজেৎ।

মাথার চুল ভিজে থাক্‌তে আহার করিতে নাই সেই জন্য স্নানের পর সন্ধ্যা করিবার নিয়ম অথবা স্নান করিয়া রৌদ্রে পাইচারি করিয়া মাথার চুল শুখানো উচিত।

৮। সেইরূপ "নার্দ্রপাদঃ স্বপেৎ"। ভিজে পা লইয়া শয়ন করিবে না বা ঘুমাইবে না।

ভিজে চুলে ঘুমাইলে বড় একটা ক্ষতি নাই ভিজে পায় আহার করা বরং উচিত।

৯। অভ্যঙ্গমাচরেন্নিত্যং সর্ব্বেষঙ্গেষু পুষ্টিদং
শিরঃশ্রবণপাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ॥
মূর্দ্ধ্ন্যভ্যঙ্গাৎ কর্ণয়োঃ শীতমাহুঃ।
কর্ণাভ্যঙ্গাৎ পাদয়োরেবমেব॥
পাদাভ্যঙ্গো নেত্র রোগান্ হরেচ্চ।
নেত্রাভ্যঙ্গাদ্দন্তরোগশ্চ নশ্যেৎ॥

১০। উষ্ণাম্বুনাঽধঃকায়স্য পরিষেকো
বলাবহঃ।
তেনৈব চোত্তমাঙ্গস্য বলহৃৎ তেনচক্ষুষাং॥
শিরঃস্নানমচক্ষুষ্যং অত্যুষ্ণেনাম্বুনা সদা।
যঃসদামলকৈঃ স্নানং করোতি স বিনিশ্চিতং।
বলীপলিত নির্ম্মুক্তো জীবেদ্বর্ষশতং নরঃ॥

১১। যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং যামযুগ্মং ন
লংঘয়েৎ।

১২। জলপাত্রং তু তাম্রস্য তদভাবে মৃদো হিতং।

১৩। ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং লবণাদ্রকভক্ষণং।
অগ্নিসন্দীপকং রুচ্যং জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনং॥

১৪। ফলান্যাদৌ সমশ্নীয়াৎ ভোজন সময়ে।

১৫। অত্যম্বুপানান্ন বিপচ্যতেঽন্নং নীরম্বু-পানাচ্চ স এব দোষঃ।
তস্মান্নরো বহ্নিবিবর্দ্ধনায় মুহুর্মুহুর্বারি পিবেদভূরি॥

১৬। ভুক্তস্যাদৌ জলং পীতং কার্য্যমন্দাগ্নি-দোষ কৃৎ।
মধ্যেঽগ্নিদীপনং শ্রেষ্ঠং অন্তেস্থৌল্যকফপ্রদঃ॥

১৭। আচম্য জলযুক্তাভ্যাং পাণিভ্যাং চক্ষুষীস্পৃশেৎ।

১৮। ভুক্ত্বা পাণিতলে গৃষ্ট্বা চক্ষুষোর্যদি দীয়তে।
জাতরোগা বিনশ্যন্তি তিমিরাণি তথৈব চ।

১৯। ভুক্ত্বা শতপদং গচ্ছেৎ শনৈস্তেন তু জায়তে।
অন্নসংঘাতশৈথিল্যং গ্রীবা জানু কটীসুখং॥

২০। ভুক্ত্বোপবিশতস্তুন্দং শয়ানস্য বলংভবেৎ।
আয়ুশ্চংক্রমমাণস্য মৃত্যুর্ধাবতি ধাবতঃ॥

২১। ব্যায়ামং চ ব্যবায়ং চ ধাবনং পানমেব চ।
যুদ্ধং গীতং চ পাঠং চ মুহূর্ত্তং ভুক্তবান্ ত্যজেৎ॥

২২। নোর্দ্ধজানুশ্চিরং তিষ্ঠেৎ।

২৩। রাত্রৌ তু ভোজনং কুর্য্যাৎ প্রথম প্রহরান্তরে।

২৪। সবিতুরুদয়কালে প্রসৃতীঃ সলিলস্য পিবেদষ্টৌ।
রোগজরা পরিমুক্তো জীবেদ্বৎসরশতং সাগ্রং।

২৫। অনুদিনং ত্বনুদিতে রবিমণ্ডলে
পিবতি তোয়ং অনুজ্ঝিত মূত্রবিট্।
অনিলপিত্ত কফানল দোষহৃৎ শতসমা
রমতে তরুণীশতং॥

এক্ষণে কতকগুলি সামান্য পাচকচূর্ণ ও ব্যায়াম সংকেত বলিতেছি।

প্রাচ্যাম্বা দক্ষিণায়াম্বা শিরঃকৃত্বা স্বপেদ্‌গৃহী।
অন্নং বিদগ্ধং হি নরস্য শীঘ্রং শীতাম্বুনা বৈ পরিপাকমেতি।
তদ্ধ্যস্য শৈত্যেন নিহন্তি পিত্তমাক্লেদিভাবাচ্চ নয়ত্যধস্তাৎ॥
বিদহ্যতে যস্যতুভুক্তমাত্রে দহ্যেত হৃৎ কণ্ঠগলঞ্চযস্য।
দ্রাক্ষাভয়াং মাক্ষিকসম্প্রযুক্তাং লীঢ্বাভয়াম্বা স সুখং লভেত॥
ভবেদজীর্ণংপ্রতি যস্য শঙ্কা স্নিগ্ধস্য জন্তোর্বলিনোঽন্নকালে।
প্রাতঃ স শুণ্ঠ্যোমভয়াম ভুক্তীত সম্প্রাশ্য হিতংহিতার্থী॥

সুশ্রুত। সূত্রস্থান। ৪৬। ৭৭

গবংঘৃতং ক্ষৌদ্র সৈন্ধবদাড়িমামলকমিত্যেষ বর্গঃ
সর্ব্বপ্রাণিনাং সমান্যতঃ পথ্যতমঃ।
তথা ব্রহ্মচর্য্যনিবাতশয়নৌ ষ্ণোদক নিশা স্বপ্নব্যায়ামাশ্চ একান্ততঃ পথ্যতমাঃ।

সুশ্রুত। সূত্রস্থান। ২০। ২

* *
*

৭। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষবৃক্ষ

ধন-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ভাব ও আদর্শ, এবং দ্রব্যোৎপাদনের বিভিন্ন প্রণালী ও পদ্ধতি লইয়া ভারতে একটা বিপুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। শত শত যুগের ধীর ক্রমবিকাশের

ফলে ভারতের সমাজসংগঠন যে ভাবে যে পদ্ধতিতে সংসাধিত হইয়াছে তাহা আজ পাশ্চাত্য জীবনযাপন প্রণালী ও অর্থোৎপাদন পদ্ধতির সংস্পর্শে আসিয়া উপস্থিত। এই উভয়েরমধ্যে একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে একদিকে যেমন কতিপয় ধনী মহাজন বিপুল ধনের অধিকারী হইয়া বিলাস সাগরে মগ্ন রহিয়াছে, অপর দিকে তেমনি সহস্র সহস্র দারিদ্র্য-প্রপীড়িত অনাহারক্লিষ্ট শ্রমজীবিগণ অন্নের জন্য হাহাকার করিয়া মরিতেছে। এই ভয়াবহ বৈষম্য সমাজে একটা চির অশান্তি আনয়ন করিয়াছে।

কিন্তু ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতে পাইব। দেখিতে পাইব জাতিভেদ ও একান্ন-পরিবার পদ্ধতি প্রভৃতি ভারতের প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজ-শরীরে সমানভাবে অর্থপ্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া দিতেছে, সদ্ভাবও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জাগাইয়া দিতেছে এবং সমাজে শান্তির ধারা প্রবাহিত করিতেছে। পাশ্চাত্য অর্থোপাৎদন প্রণালী স্বার্থপরতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। এক্ষণে ইহা সমাজের অনিষ্টপ্রদ ও স্বায়ত্তশাসনতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ব্যক্তির স্বাধীনতাকে উচ্ছৃঙ্খলতাতে পরিণত করিয়া সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। সুতরাং ভারতবর্ষের সমাজ যে ঐগুলিকে প্রতিরোধ করিতেছে তাহা বিচিত্র নহে। আজকাল এমন কি ইউরোপের ধনবিজ্ঞানবিৎ ও সমাজবিজ্ঞানবিৎ মনস্বী পণ্ডিতগণও ইহার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। যখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই তাঁহাদের নিজ সমাজের অনুষ্ঠান সমূহের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন তখন ভারতের কি সেই অনুষ্ঠান গুলির পুনরাবৃত্তি করা উচিত? পাশ্চাত্য সমাজের বিষবৃক্ষগুলি ভারতের সমাজে রোপণ করা কি উচিত? ভারত কি পাশ্চাত্য দেশের অর্থোৎপাদন রীতিগুলি অনুসরণ করিতে যাইয়া তাহার সমাজে ধর্ম্মঘট, শ্রমজীবি-দলন প্রভৃতি সামাজিক সঙ্কটগুলি আনয়ণ করিবে? ভারতের বৈষয়িক জীবনে এখনও সাম্যনীতির প্রভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে, ভারত কি তাহার সমাজের সনাতন ঐক্য, প্রেম এবং মনুষ্যত্বের প্রতিমর্য্যাদা ধ্বংস করিবার জন্য পাশ্চাত্য অনুষ্ঠানগুলি অন্ধ এবং মূঢ়ভাবে অনুকরণ করিবে? ভারত কি তাহার বহু শতাব্দীর ক্রমবিকাশের পরিণামভূত আর্থিক ও বৈষয়িক জীবনের নিজস্ব প্রণালী ও পদ্ধতিগুলি আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে না?

বৈষয়িক অবনতি হইতে রক্ষা পাওয়াই এখন ভারতের সমস্যা। অর্থোপাদনের প্রাচীন অনুষ্ঠানগুলির কালোপযোগী পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইলে কোন্ প্রণালী অবলম্বন করা উচিত? দেশের পল্লীগ্রামগুলি আজ পরিত্যক্ত ও বিগতশ্রী গ্রামাকৃষির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর শোভা ও সৌন্দর্য্য হ্রাস পাইয়াছে। আমাদের জাতীয় শিল্প নষ্ট হইয়াছে পরনির্ভরতা শিরায় প্রবেশ করিয়াছে। বিদেশীয় দ্রব্যসম্ভার প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইতেছে এবং জীবন ধারণ অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। বৈষয়িক জীবনে আমরা কতদূর পরমুখাপেক্ষী হইয়াছি

তাহা আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্য সমূহের তালিকা ও মূল্যাঙ্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

* *
*

৮। বৈষয়িক জীবনে "সংরক্ষণ-নীতি" অবলম্বন

যদি প্রধান প্রধান আমদানী দ্রব্যের তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করি—দেখিতে পাইব এগুলির আমদানী (এবং আধুনিক কালে অত্যাবশ্যক হইলেও) একেবারে যে প্রতিরোধ করা যায় না তাহা নহে। এই দ্রব্যগুলির মূল উপাদান আমাদের দেশেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু উপাদানগুলি বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায়। আবার কল কারখানায় সুন্দর সুন্দর জিনিষে পরিণত হইয়া এ দেশেই ফিরিয়া আসে। এই প্রণালীতে দ্বিবিধ উপায়ে দেশের ক্ষতি হইয়া থাকে। প্রথমতঃ বিদেশীয় মহাজন ও শ্রমজীবিগণ ব্যবসায়ের লাভ ও পারিশ্রমিক পায়; এদেশের কলকারখানায় প্রস্তত হইলে দেশের শ্রমজীবি গণের অন্নকষ্ট দূর হইতে পারিত। দ্বিতীয়তঃ বিদেশীয় জাহাজে আমদানি হয় বলিয়া আমাদিগকে মাশুল দিতে হয়। এদেশে ঐ দ্রব্য প্রস্তত হইলে মাশুল লাগিত না, দ্রব্যের মূল্য কম হইত। আমাদের প্রকৃতিদেবী সকল বিষয়েই অনুকূল। অথচ আমরা বৈষয়িক জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়ের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে অক্ষম। আমাদের সাধারণ কারিগর ও শিল্পিগণ কুটীরে বসিয়া সামান্য মূলধন ও অল্পসংখ্যক যন্ত্রাদি লইয়াই কার্য্য করিয়া থাকে, যাহাতে বহুলপরিমাণে বিক্রয় হইতে পারে তাহার কোন সুব্যবস্থাই নাই। পক্ষন্তরে পাশ্চাত্য ব্যবসায়িগণ প্রভূত মূলধন লইয়া সুবিশাল যন্ত্রাদি ও বাষ্পীয় বা তাড়িৎ শক্তির সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিয়া থাকে এবং ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়া থাকে। এইরূপে ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলি গ্রাস করিয়া পাশ্চাত্য কারখানাগুলি আমাদের বিপনী সমূহ আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং পাশ্চাত্যের মত আমাদেরও যে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছে ইহা আমাদের দেশে সর্ব্ববাদী সম্মত। বিদেশ হইতে আমদানী না হইয়া যাহাতে ভারতীয় কল কারখানায় দ্রব্যাদি প্রস্তত হইতে পারে এবং এই জন্য যাহাতে প্রচুর মূলধন সংগৃহীত এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে বুদ্ধি ও কর্ম্ম-কুশলতার বিকাশ হইতে পারে তাহার সত্যতা ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত দ্বৈধ নহে। শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার একটা প্রবল আকাঙ্খা জাগিয়া উঠিয়াছে, দেশের বিভিন্ন প্রদেশে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, এবং উপযুক্ত যুবক দিগকে নানা প্রকার ব্যবহারিক বিজ্ঞানে শিক্ষিত করিবার জন্য বিদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিল্পশালায় বা কলকারখানায় ছাত্র শিক্ষানবিশরূপে প্রেরণ করা হইতেছে। যাহাতে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারতীয় কলকারখানাগুলি বিশেষ উন্নতি লাভ করে এবং পাশ্চাত্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয় তজ্জন্য ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় "সংরক্ষণ-নীতির" পক্ষপাতী।

আমাদের দেশে শিল্প ও বাণিজ্য অপরিণত ও অপরিপক্ক ব্যবসায় বুদ্ধি বিশিষ্ট লোকের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এজন্য সকলেই গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "সংরক্ষণ নীতি" অবলম্বনের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি না করিলে এবং স্বদেশী উৎপন্ন দ্রব্য খারাপ হইলেও অধিক মূল্যে ক্রয় না করিলে দেশীয় শিল্পোন্নতি একবারেই অসম্ভব।

৯। ভারতের সনাতন "কুটীর-শিল্প"

ভারতে কৃষি-শিল্পের জন্য প্রাণের একটা আকাঙ্খা জাগিয়াছে সত্য, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কোন্ কোন্ কৃষি ও শিল্প এ দেশে প্রবর্ত্তিত ও সংরক্ষিত হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে কাহারও সিদ্ধান্ত স্পষ্টরূপে জানা যায় না। ইউরোপীয় শিল্প ও কল-কারখানা এতদিন যে সমস্ত দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়াছে, দেশে এইরূপ দু' একটা কল প্রতিষ্ঠিত হইলেই সকল প্রকারের লোক ইহা আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে, একবার ভাবিয়া দেখে না ভারতের দেশজাত কুটীর-শিল্পের সহিত ইহার সংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে কি না। মনে করে "ভারতের কুটীর-শিল্প মধ্যযুগেরই ব্যবস্থা বিশেষ, আধুনিক যুগে তাহার প্রচলন অসম্ভব এবং ভবিষ্যতেও ইহার কোন স্থান নাই। আজ হউক অথবা কালই হউক, কল কারখানাই ইহাদের স্থানগুলি অধিকার করিবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; অতএব কুটীর-শিল্পের বিলোপ যখন অবশ্যম্ভাবী তখন ইউরোপীয় শিল্পের পরিবর্ত্তে ভারতের কল কারখানা ও শিল্প যাহাতে সেই স্থান অধিকার করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা কি শ্রেয়স্কর নহে?"

এখন এমন সময় আসিয়াছে যে এই সমস্যা আমাদিগকে গভীর ভাবে ভাবিতে হইবে। ভারতে ভবিষ্যৎ যুগে কুটীর-শিল্প কোন্ স্থান অধিকার করিবে? আধুনিক কল কারখানা অইহার স্থান ধিকার করিবে ইহাই কি ধ্রুব সত্য? ইহাই কি বাঞ্ছনীয়? আমাদের কৃষি ও শিল্প জীবনে এমন কি অবস্থা বা চিহ্ন লক্ষ্য করিলাম যাহাতে মনে করিতে পারি ভারতের কৃষি শিল্প গুলির উন্নতির জন্য কল-কারখানা অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য? দেশের সর্ব্বত্র-বিক্ষিপ্তভাবে এখন যে সমস্ত কুটীর-শিল্প বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া, বিনাশ সাধন করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় কি প্রত্যেক কলকারখানাই আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে? আমাদের কৃষিশিল্পের অর্থনীতিসঙ্গত কিরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত তাহাও ভাবিবার বিষয়।

১০। আধুনিক কল-কারখানা

এমন অনেক অবস্থা আছে যাহাতে শিল্পগুলি কেন্দ্রীভূত করা অত্যাবশ্যক। বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যবসায়ের হিসাবে এই কেন্দ্রী-করণের সুযোগ ও সুবিধা এত বেশী যে হস্ত-চালিত গৃহশিল্প কল কারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় কিছুতেই বাঁচিতে পারে না। এইরূপে কলে অতি বৃহৎ বৃহৎ ধাতব পদার্থসমূহ ব্যবহার্য্য দ্রব্যাকারে পরিণত করিতে হইলে প্রভূত পরিমাণে আবশ্যকীয়

যন্ত্রাদি, বহুলোকের পরিশ্রম এবং বিস্তৃত কারখানার প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। খনি সম্বন্ধীয়, লৌহ সম্বন্ধীয় এবং জাহাজ ও নৌশিল্প-বিষয়ক কারখানাগুলি এই শ্রেণীরই অন্তর্ভূক্ত। বর্ত্তমান অবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পে ও ব্যবসায়ে শক্তি, কার্য্যকুশলতা ও পরিশ্রম সমস্তই বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। বৃহৎ বৃহৎ কারখানায় প্রচুর পরিমাণে দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইবার ফলে জীবনে অনেক সুযোগ ও সুবিধা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু অবস্থাবিশেষে ইহাও যেমন প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র শিল্পও তেমনি আবশ্যক।

একই প্রকারের বস্তু প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইলে এবং মানুষের দেহ রক্ষার অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলি সর্ব্বত্র বহুপরিমাণে সরবরাহ করিতে হইলে—কল কারখানার প্রচলন অপরিহার্য্য। একই জিনিষের ঠিক একই আকার ও আয়তন এবং একই বর্ণের বহুপরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে যন্ত্রের শক্তি হস্তচালিত শক্তিকে পরাভূত করিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মানুষের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত প্রভৃতি স্বাভাবিক দৈহিক অভাবগুলি সকলেরই সমান;—এই সমস্ত অভাব মোচনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক যে সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে তাহার গুণগত পার্থক্যও নিতান্ত অল্প। একজনের নিত্য প্রয়োজনীয় দৈহিক অভাবগুলির সহিত আর একজনের অভাবের বিশেষ পার্থক্য নাই; কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি ভোগলালসা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাব-রসাত্মক, বুদ্ধি বিষয়ক, মানসিক এবং নীতিবিষয়ক অভাব সৃষ্ট হইতে থাকে। এই শ্রেণীর নৈতিক অভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একের ব্যক্তিত্ব বিশিষ্টরূপে অপর হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। এইরূপে মানুষের অভাবসমূহ যখন নীচ হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর হয়, মানুষের কৃত্রিম অভাব যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখনই মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে, তখনই ব্যক্তিগত জীবনেও বিশেষ বিশেষ অভাবগুলি মোচন করিবার জন্য হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। একমাত্র শিল্পকলাই এই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিতে সক্ষম। খুব উন্নত সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে তাহার সাধারণ দৈহিক ও মানসিক অভাবগুলি প্রায়ই এক রকমের, বিশেষ প্রভেদ কিছুই নাই, সুতরাং কল কারখানাজাত দ্রব্যের দ্বারা এই অভাব পূরণ হইতে পারে। যে সমস্ত কৃষিশিল্পাদি মানুষের সর্ব্বপ্রধান অভাবগুলি দূর করিয়া দেয়—অন্ন, বস্ত্র, প্রভৃতি দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করে সেগুলি যে এই কল-কারখানার প্রাধান্য থাকিবে তাহা যেন স্বতই মনে উদয় হয় এবং যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

১১। আমাদের কয়েকটি শিল্প ও ব্যবসায়

ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদির উন্নতির বিষয় অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে তুলা ও পাট, কয়লা ও স্বর্ণখনি এবং কেরোসিন তৈলের কলকারখানায় ভারতে বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৯০১ সালে ১৯৭টি তুলার কল ছিল এবং তাহাতে উনিশ ক্রোড় টাকা মূলধন

খাটিত। ১৯০৮ সালে ২৩২ কারখানা এবং ৩৯ ক্রোড় মূলধন হইয়াছে। পাটের কলের সংখ্যাও ১৯০১ হইতে ১৯০৮ সালের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৩৬ হইতে ৫২টিতে পরিণত হইয়াছে এবং মূলধনও ৪·৩ ক্রোড় হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৬·৭৫ ক্রোড়ে পরিণত হইয়াছে। কয়লার ব্যবসায় অসাধারণরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে, সমস্ত ভারতে ১৯০১ সালে খনি হইতে উত্তোলিত দ্রব্যসমষ্টি ৬·৬ লক্ষ ছিল কিন্তু ১৯০৮ সালে তৎস্থলে ১২·৭৬ লক্ষ হইয়াছে। কেরোসিন তৈলের ব্যবসায়ও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, ১৯০১ সালে খনি হইতে নিষ্কাষিত ৫০ লক্ষ গ্যালন স্থলে ১৯০৮ সালে ১৭৬·৬ লক্ষ গ্যালন হইয়াছে। আমাদের আরও কয়েকটি কারখানা আছে; তন্মধ্যে কতকগুলি সামান্যভাবে চলিতেছে—আর কতকগুলি মৃতপ্রায়। আমরা চিনি, তৈল, কাগজ, পশম ও রেশমের কারখানায় খুব অল্পই অগ্রসর হইতে পারিয়াছি; কাচ, চর্ম্ম, ছত্র, কলম ইত্যাদি এবং ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যের কলকারখানায় কিছুই অগ্রসর হইতে পারি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

ভারতে খনিজ ব্যবসায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে বিক্ষিপ্তভাবে নানা স্থানে সংবদ্ধ ছিল। আজ তাহা ইউরোপে বৃহদাকারে প্রতিষ্ঠিত এবং সুবিধাজনক রাসায়নিক প্রক্রিয়া কর্তৃক পরিচালিত কলকারখানার সংঘর্ষে বিলুপ্ত। এইরূপে পাশ্চাত্য রসায়নবিৎ গন্ধক-দ্রাবক (sulphuric acid) ও ক্ষার পদার্থসমূহ (alkali) খুব অল্প মূল্যে প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করিতে পারে এবং দেশের মধ্যে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রেল পথের সাহায্যে ও বহির্দ্দেশে বাণিজ্যের সুবিধা জাহাজের মাশুলের অল্পতায় স্বীয় স্বীয় দেশোৎপন্ন ফটকিরি, বিবিধ ক্ষার-যুক্ত মিশ্র পদার্থসমূহ, তুঁতিয়া, হীরাকস্, সীসক, ইস্পাত এবং লৌহ প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ দূরদেশে প্রেরণ করিয়া থাকে এবং যবক্ষার, সোডা, সোহাগা প্রভৃতি বহুল পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করিয়া থাকে। আমাদের খনিজ ও ধাতব পদার্থসমূহের ব্যবসায়ের ভবিষ্যতে আশা ও সম্ভাবনা যথেষ্ট রহিয়াছে। তাতার লৌহ কারখানা খনিজ বিদ্যা এবং ধাতু বিদ্যায় এক নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়াছে, এবং ইহাই ভবিষ্যতে প্রচুর ফল প্রসব করিবে। ইস্পাতের পাত প্রস্তুত হইতে থাকিলেই বাণিজ্য পোত নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবে এবং এই ভারতই যে কালে প্রাচ্য ভূখণ্ডের লৌহনির্ম্মাণের বিপুল কারখানারূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? বৃহদাকার কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, প্রচুর মূলধনের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে এবং প্রভূত শ্রমশক্তি প্রয়োগ করিতে পারিলে এই সমস্তই সম্ভব।

বৃহদাকার খনিজ ও ধাতব পদার্থের কারখানার কথা ছাড়িয়া তুলা ও পাট এই দুইটি অত্যাবশ্যক পদার্থের বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে ইহারা উন্নতির পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝা যাইবে যে ইহার সহিত দেশীয় গৃহ-শিল্পের কিছুমাত্র প্রতিযোগিতা নাই বরং গৃহ-শিল্পের সাহায্যে ইহা নানা প্রকারে পুষ্টি লাভ করিতেছে। কারখানায় যে সমস্ত বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা দেশীয় তাঁতে অতি সামান্য পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া

থাকে। দেশীয় তাঁতে কেবলমাত্র স্বতন্ত্র এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয় এরূপ বলা যাইতে পারে।

যদিও বিদেশ হইতে বস্ত্র আমদানি হইতেছে তথাপি আশা করা যায় স্বদেশী তাঁতের উন্নতি হইলেই এই আমদানি বন্ধ হইবার অনেকটা সম্ভাবনা থাকিবে। পাটের কলেরও সহিত গৃহ-শিল্পের কোন প্রতিযোগিতা নাই। গৃহ-শিল্পে অধিকাংশই মোটা কম্বল, গালিচা, শতরঞ্চ, প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাটের ব্যবসায়ের একটা বিশেষ সুবিধা এই যে ভারতে পট্টসূত্রে নির্ম্মিত বস্ত্রাদির একচেটিয়া ব্যবসায় এবং ইউরোপীয় পরিশ্রম ও মূলধন দ্বারাই সর্ব্বত্র পরিচালিত হইতেছে।

ভারতে কয়েকটি মাত্র চিনির কারখানা আছে; কোনটিরই অবস্থা সুবিধাজনক নহে। ভারতে আধুনিক রকমের চিনির কারখানা কৃতকার্য্যতার সহিত প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নানা প্রকার বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। উপযুক্ত মূল্যে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু সংগ্রহ করা দুষ্কর। সমগ্র দেশে উৎপন্ন ইক্ষুর অর্দ্ধেকাংশ যুক্ত প্রদেশে উৎপন্ন হয় অন্যান্য প্রদেশে ইক্ষুর ক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত নহে। বৃহদাকার কারখানা প্রতিষ্ঠা করা এজন্য যুক্তিসঙ্গত নহে।

অপর দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার অনেক সুবিধা এবং স্বাধীনতাও রহিয়াছে। অন্ধ্র দেশে বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রে গুড়ের আমদানি অপেক্ষা কাটতি (ব্যয়) অনেক বেশী; সুতরাং তথাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানাগুলিই বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন। যুক্ত-প্রদেশের পরেই বঙ্গদেশে অধিক পরিমাণে ইক্ষু উৎপন্ন হইয়া থাকে; কতকগুলি চিনির কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য কিন্তু সকলগুলির অবস্থাই অল্পাধিক শোচনীয়। বৃহৎ কারখানা উপযুক্ত পরিমাণে ইক্ষু সরবরাহের অভাবে বিদেশীয় প্রতিযোগিতার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিতেছে না। সুতরাং চিনি তৈয়ারী করিবার জন্য কেন্দ্রীভূত বৃহৎ কারখানার সৃষ্টি করিলে চলিবে না, সুচিন্তিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে সময়োপযোগী ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং এই জন্য সমস্ত চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে।

চর্ম্মের কারখানায় ব্যবসায়ের হিসাবে নানা প্রকার সুবিধা আছে। কাঁচা চামড়া উপযুক্ত মূল্যে ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে এবং চর্ম্ম সংস্কারের পক্ষেও বিদ্যুৎশক্তি (electricity) বিশেষ ফলপ্রদ হইবে। এইরূপ বৃহদায়তন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে ভবিষ্যৎ যুগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলি জীর্ণ চর্ম্মদ্রব্য সংস্কার, সৌখীন দ্রব্যপ্রস্তুত করণ, পুস্তক বাঁধাই প্রভৃতি কার্য্যেই সংবদ্ধ থাকিবে। চর্ম্মের কারখানার মত, তৈলের কল, ময়দার কল, কার্পাস বীজ বহিষ্করণের কল, পশমী বস্ত্রের কল, মদ্যপ্রস্তুত করণ, কাগজের কল প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ব্যবসায়ে কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা খুব বেশী। এই সমস্ত ব্যবসায়ে আমরা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। কাঁচ প্রস্তুতের জন্য প্রতিষ্ঠিত কারখানা স্থায়ী হইতে পারে নাই। ইউরোপের মধ্যে কেবল মাত্র বেলজিয়াম ও বোহিমিয়া এই দুইটি স্থানে এবং জাপানে কাঁচ প্রস্তুতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানাগুলি বাঁচিয়া

রহিয়াছে এমন কি দেশের সর্ব্বত্র কাঁচের জিনিষ সরবাহ করিতেছে। দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের পদ্ধতি অনুসারে ক্ষুদ্র আকারে কাঁচের কারখানা আরম্ভ করিবারও একটা প্রস্তাব চলিতেছে।

* *
*

১২। ব্যবসায়-"ধুরন্ধরে"র আবশ্যকতা

বৃহদাকারের কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিবার সুবিধা এবং অসুবিধার বিষয় আলোচনা করিলাম। এক্ষণে আমাদের দেশে ঐরূপ কারখানা কৃতকার্য্যতার সহিত স্থাপিত করিতে পারেন এরূপ উদ্যোক্তা ও ধুরন্ধরগণের বিশেষ অভাব। কিন্তু যুবকদিগকে শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকটি মাত্র বিদ্যালয় আছে; তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যেরই চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে, অন্যদিকে যাহাতে লক্ষ্য হয় সেরূপভাবে আদৌ শিক্ষিত হয় না। এইকারণে আমাদের মধ্যবিত্ত লোক সকল সাধারণতঃ শিক্ষকতা, ওকালতী এবং গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিয়া থায়; বিজ্ঞানে, ব্যবসায়ে ও যন্ত্রবিদ্যায় ক্বচিৎ পারদর্শী হইয়া থাকে। আমাদের বৈষয়িক অভাবসমূহ দূর করিবার জন্য আমাদের দেশে এরূপ বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রণালীর ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহার ফলে যুবকগণ ব্যবসায়ের কূট সমস্যা সমূহ মীমাংসা করিবে, সমস্ত বিষয়ে শৃঙ্খলা বিধান করিবে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশের দ্রব্য-সম্ভারের সদ্ব্যবহার করিবে। দেশে এ পর্য্যন্ত এরূপ কোন শিক্ষা-প্রণালী উদ্ভাবিত হয় নাই। কাজেই বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আমাদের ছাত্রদিগকে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থানে পাঠাইতে হইবে, ছাত্রদিগকে ব্যবসায় ও শিল্পের দিকে বিশেষ আগ্রহান্বিত করিতে হইবে, বিদেশে যাইবার পূর্ব্বে ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানাগুলি নিজে পরিদর্শন করিতে হইবে এবং এরূপ ভাবে শিক্ষিত করিতে হইবে যাহাতে এদেশে কৃতকার্য্যতালাভ করিবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। এইরূপে যখন তাহারা ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত হইবে তাহাদিগকে কার্য্য অনুসন্ধানের জন্য কাঁদিয়া হতাশ হইতে হইবে না। কাজেই মানুষ খুঁজিয়া লইবে, মানুষ কাজের অন্বেষণে ব্যগ্র হইবে না।

বিদেশের কলে এবং কারখানায় শিক্ষা-নবিশরূপে কার্য্য করিয়া যাহাতে ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জন্মে সে বিষয়েই প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে কাজের লোক হইতে হইলে, ব্যবসায়-পরিচালনে ধুরন্ধর হইতে হইলে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক ও পারিভাষিক জ্ঞান থাকিলে চলিবে না, পরন্তু ব্যবহারিক জ্ঞান ও কার্য্যদক্ষতার বিশেষ প্রয়োজন। এই ব্যবহারিক জ্ঞান ও কার্য্য-কুশলতার অভাবেই ভারতে সমস্ত ব্যবসায়েরই দুরবস্থা। যদি আমাদের ধুরন্ধরগণ বিদেশে অবস্থানকালে বৈজ্ঞানিক কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক কার্য্যক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষা করিতেন তবে বিগত দশ বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কল কারখানাগুলির এই দুর্দ্দশা হইত না।

* *
*

১৩। বাণিজ্য-শিক্ষা

কৃষি ও শিল্প শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য শিক্ষা-প্রণালীও প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। তাহাতে মহাজন, দালাল, মুৎসুদ্দিকারক ও কার্য্যকারকরূপে শিক্ষিত হইয়া বহুলোক উৎপাদক ও গ্রাহকগণের মধ্যস্থিত ভাবে ব্যবসায় ও বাণিজ্যের কার্য্য বহুপরিমাণে নানাস্থানে বিস্তার করিবেন। তাঁহারা নানাস্থানের বাজার দরের সংবাদ রাখিবেন এবং কোথায় কোন জিনিষের আবশ্যকতা বেশী এবং কোন জিনিষের কোথায় কাট্‌তি কম ইত্যাদি সমস্ত তথ্যই সংগ্রহ করিবেন। এই বিষয়ে আজ কাল ভারতীয় বণিকদিগকে ইউরোপীয় বণিকদের কার্য্যকারকগণের কথার উপরেই সর্ব্বদা নির্ভর করিতে হয় এবং ইহারাও নিজেদের স্বার্থের জন্য অনেক সময়ই প্রতারণা অবলম্বন করিয়া থাকে; ইহা আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। ভারতের যুবকদিগকে এই সমস্ত অভাব দূর করিবার জন্য পুরুষ পরম্পরাগত কুসংস্কারের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া শারীরিক পরিশ্রমকেও সম্মানের চক্ষে দেখিতে হইবে এবং ইউরোপীয় বাণিজ্যের কার্য্যকারকগণের স্থান অধিকার করিবার জন্য উপযুক্তরূপে শিক্ষিত হইতে হইবে। সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে যাহাদের এখনও সংস্কার গঠিত হয় নাই তাহাদেরও এ বিষয়ে নৈরাশ্যের কিছুই নাই, ভারতেই ঐরূপ শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে। যতদিন পর্য্যন্ত জন-সাধারণের মধ্যে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ ব্যবসায় বাণিজ্যে উদ্যোগী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহারা ব্যবসায়ী, বণিক্ ও মহাজন হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন। বর্ত্তমানে জগতে কারিগর অপেক্ষা বণিকদিগের আদর কোন অংশেই কম নহে। কেহ কেহ এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে মার্কিন ও জার্ম্মাণেরা যেতাহাদের দেশ হইতে বিদেশী দ্রব্য দূর করিতে সমর্থ হইতেছে তাহা কেবল তাহাদের দ্রব্যসম্ভার উৎকৃষ্টতর বলিয়া নহে। বরং বিদেশসমূহের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠতর সংযোগ, সকল দেশের বাজারসমূহে দ্রব্যবিশেষের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান, বৈষয়িক তথ্যসংগ্রহ বিভাগের প্রতিষ্ঠা এবং সর্ব্বোপরি ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান ও পরিচালনের ক্ষমতাই তাহাদের শ্রেষ্ঠতার মূল উপাদান। ভারতে এইরূপে শিক্ষার বিস্তৃত ক্ষেত্র রহিয়াছে কিন্তু আমরা এখনও ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি নাই এবং সমাদর করিতেও শিক্ষা করি নাই। দূরবর্ত্তী স্থানের বাজারদর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কতকগুলি নিরক্ষর বণিকগণই দেশের বিস্তৃত অন্তর্বাণিজ্যের পরিচালনা করিতেছে। তাহারা আধুনিক বিজ্ঞাপন-প্রথা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং ভিন্ন ভিন্ন রুচির লোকদিগের সহিত ব্যবসায় চালাইতেও অনুপযুক্ত। পক্ষান্তরে বহির্বাণিজ্য সমস্তই বিদেশীয় হস্তে ন্যস্ত; তাহারাই লাভের অধিকাংশ গ্রাস করিয়া থাকে। এখন আমরা চাই—আমাদের শিক্ষিত এবং উপযুক্ত যুবকগণই তাহাদের স্থান অধিকার করুক, সম্পন্ন হউক, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বাজার

দরও বিবিধ তথ্য অবগত হউক এবং দেশে ও বিদেশে কোথায় কোন্ জিনিষের অভাব বা বিক্রয়াধিক্য তৎসম্বন্ধে আমাদের কারিগর ও শিল্পীদিগকে উপদেশ দান করুক বাণিজ্যাদির বিবরণী, কৃষিবিভাগের খতিয়ান এবং কল কারখানা ও ব্যবসায় সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ পাঠ করিতে হইবে ও অভিজ্ঞতাগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। তাহাদিগকে অল্পমূল্যে দ্রব্য সরবরাহ, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের প্রয়োজনাধিক্য প্রভৃতি অনুসন্ধান করিবার জন্য স্বয়ং প্রদেশের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে প্রত্যেক জেলায় জেলায়, আড়ঙ্গে আড়ঙ্গে ও হাটে হাটে অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহারাই এই সমস্ত জিনিষ চালান করিবার সহজ উপায় নির্দ্ধারণ করিবে। তাহারাই নানা স্থানে বাণিজ্য-কেন্দ্র ও শাখা বিভাগ স্থাপন করিবে, যৌথকারবার ও অর্থসমবায় (ব্যাঙ্ক) প্রতিষ্ঠা করিবে, টাকার বাজারের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবে, আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিবে এবং দূরদৃষ্টিবলে ভবিষ্যতে দেশে কি পরিমাণ শস্য ও কলকারখানাজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতে পারে তৎসম্বন্ধে বিচার করিবে। এইরূপে ভারতে ব্যবসায়ী এবং বণিক জাতির সৃষ্টি হইবে। তাহারাই পৃথিবীর পরস্পর পরস্পরের উপর আধিপত্য প্রয়াসী সমস্ত বণিকজাতির সহিত সংঘর্ষ হইতে ভারতকে রক্ষা করিবে এবং এ বিষয়ে ভারতের নেতৃস্থান অধিকার করিবে।

* *

১৪। অবস্থা ও ব্যবস্থা

এ সমস্ত ভবিষ্যতের আশা। আমাদের সম্মুখে এখন কতকগুলি সমস্যা রহিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই মীমাংসা করা প্রয়োজন। শিল্পবিজ্ঞান ও ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বিদ্যালয়গুলিকে কি প্রণালীতে ব্যবহার করিতে পারিলে ভবিষ্যতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে? একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা নিতান্ত অল্প এবং ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈজ্ঞানিক কৌশল, কার্য্যক্ষমতা ও ব্যবসায় বাণিজ্যে অসমসাহসিকতা, এবং মূলধনের অভাবেই কলকারখানা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারিতেছে না। বড় অর্থ অনেক সময় স্তূপের অথবা সিন্দুকের শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়া থাকে মাত্র। ভারতে স্থাপিত অধিকাংশ কারখানাই সামান্য মূলধনে আরব্ধ হইয়াছে এবং ইহার পরিণাম যে ভয়াবহ তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র; অল্পমূল্যে পুরাতন কল ও যন্ত্রাদি ক্রীত হইয়া থাকে এবং এইরূপে মিতব্যয়ী হইতে যাইয়া যন্ত্রের কার্য্যসম্পাদিকা শক্তিকে হারাইয়া থাকি। অল্পসময়ের মধ্যেই অধিক পরিমাণে লভ্যাংশের জন্য চতুর্দ্দিক হইতে ধ্বনি উত্থিত হইয়া থাকে এবং উপযুক্ত পরিচালনা হইতে বঞ্চিত হই; এই বিষয়ে ভবিষ্যতে ক্ষতির জন্য সংস্থান এবং দূরদর্শিতাই যে কৃতকার্য্যতালাভ করিবার মূলসূত্র তাহা আমরা ভুলিয়া যাই।

বর্ত্তমান অবস্থায় যাহাদের সামান্য রকমের শিল্পনৈপুণ্য ও কার্য্যক্ষমতা আছে তাহাদের

সামান্য মূলধনেই যাহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিতে পারে তদ্বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, এবং এরূপ অনুষ্ঠান আরম্ভ করিতে হইবে যাহাতে ক্ষতির কোন সম্ভাবনা না থাকে; কারণ ব্যবসায় ও শিল্পের প্রারম্ভে একবার ক্ষতি হইলে তাহা সমস্ত দেশব্যাপী একটা নৈরাশ্যের ভাব সঞ্চার করিয়া দেয় এবং শিল্প ও কারখানার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের পথে কণ্টক বিকীর্ণ করিয়া দেয়। সুতরাং বৃহদাকারের কারখানা প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে আমাদের বর্ত্তমান মূলধন, পরিশ্রম ও কার্য্যকুশলতা প্রয়োগ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়গুলি পরিচালিত করিতে পারিলেই আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব এরূপ আশা করিতে পারি। লোহার কারখানা, কাঁচের কারবার, বস্ত্রবয়ণ এবং রঞ্জিতকরণ, কাগজের কল, ক্ষারযুক্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণ (Alkali works) প্রভৃতি অনুষ্ঠান আরম্ভ করা বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী নহে; বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে ছুরি, কাঁচি, পেরেক, ছাঁচে ঢালাইকরণ এবং কপাট লাগান প্রভৃতি লৌহ কারখানার সামান্য সামান্য কাজগুলি আরম্ভ করা যাইতে পারে। বোতল, বলয়, এবং ভগ্ন কাঁচের জিনিষ হইতে নানাপ্রকার সাধারণ ব্যবহৃত দ্রব্যসমূহ প্রস্তুত করা যাইতে পারে, সূত্র প্রস্তুত ও হস্তচালিত বস্ত্রসমূহের উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে; আলকাতরা, ভাতে রং (aniline), নীল ও অন্যান্য দেশী রং দ্বারা ছিটের কাপড়, রঞ্জিত বস্ত্র, সূত্র ও রেশম প্রস্তুত করা যাইতে পারে; পীস্‌বোর্ট (Paste board) ও (Card board) প্রস্তুত করা যাইতে পারে; সোডা, সোরা প্রভৃতিও সহজে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এইরূপে সাধারণ জিনিষগুলি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করা যাইতে পারে। এখন বেশী চাকচিক্যের দিকে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই বরং যাহাতে অল্পমূল্যে প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। অল্পমূল্যতা এবং প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ,—ভারতে এই দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কারখানায় দ্রব্যাদি উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান মূলধন, উদ্যোগ, উৎসাহ এবং কর্ম্মক্ষমতা উল্লিখিত কার্য্যসমূহে নিয়োগ করিতে পারিলেই—ভবিষ্যতের আশা।

১৫। মারাঠী সাহিত্য-সম্মিলন

মহারাষ্ট্রেও মারাঠী সাহিত্য-সেবিগণের সম্মিলন হইয়া থাকে। এই সম্মিলনের অনুষ্ঠান প্রতি বৎসর হয় না। ১৯১২ সালে অষ্টম সম্মিলন হইয়াছে তাহার তিন বৎসর পূর্ব্বে ১৯০৯ সালে আর একটা সম্মিলন হইয়াছিল। সেই সম্মিলন বড়োদায় অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে বঙ্গদেশ হইতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার প্রতিনিধি স্বরূপ গিয়াছিলেন। এবার-কার সম্মিলন বিরার প্রদেশের অকোলা নগরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন মহারাষ্ট্রের সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ আপ্‌টে বাঙ্গালী সমাজের পক্ষ হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

অকোলার সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। বিনয় বাবুর সাহিত্য-সংরক্ষণ প্রস্তাব এই সম্মিলন উপলক্ষ্যে মারাঠীতে অনূদিত হইয়াছিল। সম্মিলনের সভাপতি আপ্‌টে মহাশয় এই মারাঠী অনুবাদের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন।

মারাঠী সম্মিলনে অনেক অতি প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হয়। বহু সুচিন্তিত ঐতিহাসিক ও ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধ পঠিত হইয়া থাকে। সেই সকলের সহিত উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালীর পরিচিত থাকা কর্ত্তব্য। আমরা মনে করি—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে হিন্দী মারাঠী, তামিল প্রভৃতি ভাষা অবশ্য শিক্ষনীয় বিষয় সমূহের মধ্যে পরিগণিত হওয়া আবশ্যক। মারাঠী ভাষার সাহায্যে ভারতবর্ষের বিচিত্র ইতিহাস-কথা প্রকাশিত হইতেছে। বাঙ্গালার ইতিহাস, সমাজ, ভাষা, ধর্ম্ম ও সাহিত্যের আলোচনাকে সম্পূর্ণ করিতে হইলে আমাদিগকে মারাঠী ঐতিহাসিকগণের আবিষ্কৃত তথ্য সমূহের সংবাদ রাখিতে হইবে। এজন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত বাঙ্গালী সাহিত্যসেবিগণের যোগসাধন অতীব আবশ্যক।

* *

১৬। সর্পদংশনের প্রতীকার *

বাঁকুড়া হইতে শ্রীযুক্ত ফকিরেশ্বর সেন সর্পদংশনের কয়েকটা ঔষধের তালিকা পাঠাইয়াছেন। সাধারণ গাছ গাছড়া হইতে সেইগুলি সংগৃহীত হইতে পারে। তাহার ফলও তিনি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম :—

১। শ্বেত করবীর মূল বা শিকড় (উহা বিষাক্ত)। পূর্ণমাত্রা এক সিকি (ওজন) প্রথম অবস্থায় বেশী খাওয়ান খারাপ। প্রথম অবস্থায় শ্বেত করবীর শিকড় বাটিয়া ৵৹ আনা (ওজন) করিয়া যতটুকু রস হইবে ততটুকু খাওয়াইতে হইবে। অথবা ৴৹ আনা ওজন রস খাওয়াইলেই যথেষ্ট হইবে।

২। কার্পাস পাতার রস—রোগী যে কোন অবস্থাতেই থাকনা কেন কার্পাস পাতার রস একপোয়া মাত্রায় খাওয়াইতে হয় (বিষ নয়)। যত খাওয়াইতে পারা যায় ক্রমান্বয়ে খাওয়াইতে হয়।

৩। ঈশ্বর মূল বা শিকড়—ঈশ্বরের শিকড় বাঁটিয়া তাহার রস দুই তোলা মাত্রায় খাওয়াইতে হয়।

৪। বিশল্যকরণী বা আয়া পান—বিশল্যকরণী বা আয়া পানের পাতার রস একতোলা মাত্রায় খাওয়াইতে হয়।

* *
*

১৭। খুলনায় পল্লী-পরিষদ

পল্লীর উন্নতি বিধানের জন্য নানা স্থানে নানা চেষ্টা হইতেছে। সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষাল এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় 'খুল্‌নাবাসী' পত্রিকায় আজগড়া গ্রামের পল্লী-

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

* ঔষধগুলি প্রয়োগ করিবার কালীন একটির পর আর একটি প্রয়োগ করিবে না। এক একটি ঔষধ প্রত্যেক তিন তিন ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিতে হইবে। ঔষধগুলি এখানে কোন এক ভদ্রসন্তানের নিকট হইতে প্রাপ্ত ও তাঁহার অনুমতিক্রমে আমি সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ প্রচারে প্রয়াসী হইয়াছি। উহাতে অনেকের জীবন রক্ষা হইয়াছে।

পরিষদের কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমাদের শিক্ষিত জনগণ স্ব স্ব গ্রামের উন্নতি বিধান করিতে পারেন। নিম্নে বিবরণী উদ্ধৃত হইল :—

সমিতি স্থাপন ও তাহার উদ্দেশ্য—গত ১৩১৫ সাল আশ্বিন মাসে ইং ১৯০৮ অক্টোবর মাসে "আন্দুগড়া পল্লীপরিষদ" নামে একটি পল্লী-সমিতির প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমিতির উদ্দেশ্য গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান করা অর্থাৎ আন্দুগড়ার গ্রাম্য রাস্তাগুলির সংস্কার ও জল-নিকাশের সুব্যবস্থা, জঙ্গল পরিষ্কার করা ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। সমিতি বর্ত্তমানে ৫ম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

সমিতির বর্ত্তমান কার্য্যক্ষেত্র—আন্দুগড়া অতি বিস্তীর্ণ গ্রাম—ইহা তিন ভাগে বিভক্ত; যথা—বিপ্র আন্দুগড়া, রুস্তম আন্দুগড়া ও ডর আন্দুগড়া। বর্ত্তমান পরিষদের কার্য্য বিপ্র-আন্দুগড়ায় সীমাবদ্ধ।

সমিতির প্রথম চারি বৎসরের কার্য্য-বিবরণী :—(১) সমিতি বিপ্র আন্দুগড়ার রাস্তাগুলির পরিমাণ ও নামকরণ করিয়াছে। লোকাল বোর্ডের ১টি রাস্তা ব্যতীত গ্রামে আরও ২১টি ছোট বড় রাস্তা আছে। তাহাদের সংস্কারে সমিতি প্রথমতঃ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ পূর্ব্বপুরুষগণের বা জীবিত বিশিষ্ট লোকগণের নামানুসারে রাস্তাগুলির নামকরণ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা যোগ্যপুরুষগণের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন ও রাস্তার প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধন এই উভয় কার্য্য হইবে। পরিষদের অন্তর্গত রাস্তাগুলির নাম ও পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। শ্যামসুন্দর রোড—৫০০ হা দীর্ঘ × ৭ হা প্রস্থ
২। নারায়ণ রোড—৪৮০ × ৬
৩। রঘুনাথ রোড ৪০০ × ৪½
৪। রাজীব রোড ৩৯০ × ৭
৫। সিদ্ধান্ত রোড—৩৪০ × ৫
৬। মহেশচন্দ্র রোড—২৬০ × ৬
৭। পুরোহিত বাটী রোড ২২০—৫½
৮। চাটার্জ্জির রোড—২২০ × ৭
৯। বিদ্যাসাগর রোড—২১০ × ৭½
১০। ষষ্ঠী খাঁর রোড—২০০ × ৮
১১। হরসিত রোড—১৮০ × ৯
১২। চৌধুরীর লেন—১৩০ × ৫½
১৩। শ্রীমন্তর লেন—১২০ × ৪½
১৪। মঠস্ লেন—১০৬ × ৪
১৫। মুক্তীশ্বর লেন—১০০ × ৪½
১৬। নন্দকুমার রোড—৮৫ × ৪½
১৭। কাব্যরত্ন রোড—৮০ × ৫
১৮। মধুসূদন রোড—৭০ × ৫
১৯। কৈলাসচন্দ্র রোড—৩০ × ৮
২০। প্রিয় সোম রোড—৪০ × ৬½
২১। ঘোষের লেন—৪০ × ৪

(২) সমিতি গত আশ্বিন মাসে বিপ্র আন্দুগড়ার লোক-সংখ্যা, গবাদি পশু-সংখ্যা ও গৃহ-সংখ্যা গণনা করিয়াছেন—তাহার আংশিক ফল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গ্রামের জাতি ও লোকসংখ্যা :—গ্রামে ৫টি জাতি বাস করে; যথা (১) ব্রাহ্মণ (২) কায়স্থ (৩) বর্ণবিপ্র (৪) নমঃশূদ্র ও (৫) মুসলমান।

লোক সংখ্যা যথা—

ব্রাহ্মণ	পুরুষ	২৪৩	স্ত্রী	২৩২	মোট	৪৭৫
কায়স্থ	"	১০৫	"	১১০	"	২১৫
বর্ণবিপ্র	"	৮	"	৯	"	১৭
নমঃশূদ্র	"	৪৫	"	৪২	"	৮৭
মুসলমান	"	২৭	"	২৯	"	৫৬
মোট	পুরুষ	৭২৮	স্ত্রী	৪২২	মোট	৮৫০

উক্ত লোকের মধ্যে বিধবা ৮৪ জন ও মৃতদার ১৬ জন। ২৯৪ জন পুরুষ ও ১০০ জন স্ত্রীলোক লেখাপড়া জানেন। স্কুলে যাইবার বয়সের বালকের সংখ্যা ১৯৯ ও বালিকার সংখ্যা ৯৭; তন্মধ্যে ১১০ জন বালক ও ৩০ জন মাত্র বালিকা স্কুলে যায়। গ্রামে ৬০ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়সের পুরুষের সংখ্যা ২২ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা ২৩ জন মাত্র।

(৩) গত আশ্বিন মাস হইতে সমিতি গ্রামের জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি ও বিবাহের একটি তালিকা রাখিতেছেন। গত আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত ১ বৎসরে ১১টি পুত্র ও ১৩টি কন্যা মোট ২৪ জন জন্মিয়াছে। আর ৯ জন পুরুষ ও ৮ জন স্ত্রীলোক মোট ১৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ৯টি ছেলের ও ৬টি কন্যার বিবাহ হইয়াছে। আর ২৩ জন পুরুষ ও ১১ জন স্ত্রীলোক মোট ৩৪ জন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে।

গত পৌষ মাসে দিল্লী দরবার সময়ে গ্রামে কলেরা আরম্ভ হয়। ১৯ জন লোক আক্রান্ত হয় তন্মধ্যে ৬ জন মারা যায়। অন্যান্য লোক জ্বরবিকারে ও রক্তামাশয় প্রভৃতিতে মারা গিয়াছে।

(৪) রাস্তা-সংস্কারাদি :—সমিতির যত্ন ও চেষ্টায় নারায়ণ রোড বিস্তার লাভ করিয়াছে। উক্ত রোড সংকীর্ণ হইয়া দুর্গম হইয়া পড়িয়াছিল। উক্ত কার্য্যের জন্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষাল, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষাল, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ ঘোষাল মহাশয়গণ বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র, কারণ তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে রাস্তার বিস্তৃতির জন্য বাড়ীর উপরের জমি ছাড়িয়া না দিলে নারায়ণ রোড কখনও এত সুবিস্তৃত হইত না। গত বর্ষে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয়ের চেষ্টায় নারায়ণ রোডের কতক অংশে মাটির কাজ হইয়াছিল, কিন্তু রাস্তাটি এখনও সুগম হয় নাই।

সমিতির উদ্যোগে রাজীব রোড ও একবার সংস্কৃত হইয়াছে। উক্ত কার্য্যের জন্য শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত সীতানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাইচরণ ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষাল প্রভৃতি সকলে বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

সমিতির নিবেদন :—আমরা আমাদের ক্ষুদ্র পল্লী-সমিতির বিগত চারি বৎসরের কার্য্যবিবরণী সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। পানীয় জলের ও পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা জঙ্গল পরিষ্কার ও রাস্তা মেরামত প্রভৃতি কার্য্য অর্থাভাবে আরম্ভ করিবার সুবিধা হইতেছে না। যুক্ত প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণরের পল্লী-সংস্কারের উদ্যোগ দেখিয়া আসাম গভর্ণমেণ্টও গত জুন মাসে বিভাগীয় কমিশনারগণকে পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় বিধানে উদ্‌যোগী করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সহৃদয় গভর্ণর লর্ড কারমাইকেলের সকরুণ দৃষ্টি পল্লীর দরিদ্র প্রজাবর্গের স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। গত ৯ই অক্টোবর দার্জ্জিলিং শৈলে বঙ্গেশ্বর বঙ্গের পল্লীর পানীয় জল সরবরাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সরকারী ও বে-সরকারী সভ্যগণকে লইয়া একটি সভা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত শুভ চিহ্ন দেখিয়া মনে হইতেছে, সত্বর পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যের

উন্নতি কল্পে প্রত্যেক লোকাল বোর্ডের হস্তে কিছু কিছু অর্থ প্রদত্ত হইবে ও স্থানে স্থানে নূতন Village Union লোকাল বোর্ডের সাহায্যে স্থাপিত হইবে। আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে আমাদের বর্ত্তমান পল্লী-পরিষদকে লোকাল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে একটি Village Unionএ পরিণত করা হউক। আজগড়া গ্রাম তিন মাইলের উপর দীর্ঘ, উহার সহিত পার্শ্ববর্ত্তী দুই একটি গ্রাম লইয়া একটি Union সুন্দররূপে চলিতে পারে এবং Unionএর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া পল্লীবাসীরা কয়েক বৎসর হইতে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। গ্রামবাসীরা আজ ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় চালাইয়া আসিতেছেন এবং গ্রামে পোষ্টাফিস বাজার প্রভৃতি রহিয়াছে। আমরা আশা করি, সহৃদয় লোকাল বোর্ড আমাদের ন্যায়-সঙ্গত প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া গ্রামবাসিগণের ধন্যবাদের পাত্র হইবেন। এ বিষয়ে লোকাল বোর্ডের নিকট স্বতন্ত্র দরখাস্ত প্রেরিত হইল।

১৮। প্রাচীন ভারতের কৃষিবিদ্যা

'সুরমা' পত্রিকায় হিন্দুর বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় জ্ঞান সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা কৃষিকর্ম্মে ব্যাপৃত, তাঁহারা বৃক্ষপোষণ সম্বন্ধে অনেক কথা হিন্দুশাস্ত্রকারগণের নিকট শিখিতে পারেন। নমুনা দিতেছি।

সকল প্রকার পুষ্পের সৌরভ দীর্ঘ-কাল স্থায়ী করিবার প্রক্রিয়া ঃ—

যস্য কস্যাপি পুষ্পস্য সৌরভেনাধিবাসিতান্।
মৃত্তিকা সকলান্ মূলে বৃক্ষাণাং বহুলান্ ক্ষিপেৎ।
কুষ্ঠপত্র মুরা মুস্তা তগরোশীরচূর্ণ কৈঃ।
মিশ্রিতেনাম্ভসা সেকান্মাসং সৌরভসম্ভবঃ।

যে কোনও পুষ্পবৃক্ষের মূলে যে কোনও পুষ্পের সুগন্ধে আমোদিত মৃত্তিকাচূর্ণ বহুপরিমাণে ক্ষেপণ করিয়া তাহাতে কুড়, তেজপাতা, মুরামাংসী, মুথা, তগর ও বীরণমূলের চূর্ণ-মিশ্রিত জল সেচন করিলে সেই বৃক্ষে পুষ্পের গন্ধ এক মাসকাল স্থায়ী হইবে।

মহাকবি কালিদাস মেঘদূতকাব্যে স্বর্গের সেই অলকাপুরীর সমৃদ্ধিবর্ণনা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,—সেই অলকা!

"যত্রোন্মত্ত-ভ্রমরমুখরা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ"

যেখানে,—উন্মত্তভ্রমরকুলের মধুর গুঞ্জনে মুখরিতা নলিনী, নিত্যই পদ্মযুক্ত, সেই নগরীই ধনপতির দিব্য রাজধানী অলকা।

ভারতের কৃষিতত্ত্ববিদ্ মহর্ষিগণ এই পৃথিবীরাজ্যে স্বর্গসম্পৎ আনয়ন করিয়াছেন, এখানে পদ্মিনীকে উন্মত্তভ্রমরমুখরিত নিত্যপদ্ম যুক্ত করিবার বিজ্ঞান-সম্মত উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—

শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে,—

কুল্মাষ দন্তিদন্তানাং চূর্ণযুক্‌পঙ্কসম্ভবা।
প্রত্যহং পুষ্পিতাম্ভোজমণ্ডিতা পদ্মিনী ভবেৎ॥

অর্দ্ধসিদ্ধ চণক, গোধূম, মাসকলাই ও হস্তি-দন্তের চূর্ণ মিশ্রিত কর্দ্দমে পদ্ম রোপণ করিলে, সেই নলিনী, প্রত্যহই (হেমন্তবর্ষা বারমাস) প্রস্ফুটিত পদ্মের শোভায় সুশোভিত হইয়া থাকে।

সকল প্রকার বৃক্ষের পুষ্টিকর সাধারণ ব্যবস্থা ঃ—

(১)

সিদ্ধার্থ কদলীদলানি শফরী বিট্ কোল-মার্জ্জারয়োরেতেষাং সমভাগমাজ্যসহিতং চূর্ণং, তরুভ্যো হিতম্। দত্তং ধূমবিলেপনোপচরণে রাপ্যায়নং, রোগহৃৎ শাখাপল্লবয়ত্যলং মধুকর-ব্যালোলপুষ্পচ্ছদাঃ ॥

শ্বেত সর্ষপ কদলীপত্র পুটিমাছ এবং শূকর ও মার্জ্জারের বিষ্ঠার চূর্ণ সমভাগ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া বৃক্ষের মূলে সার দিলে এবং ঐ সকল দ্রব্যের লেপও ধূপ দিলে, বৃক্ষ সুস্থ, সবল ও নীরোগ হয় এবং এই সারপুষ্ট বৃক্ষের শাখা-সমূহ বহুতর পত্রপুষ্পে সুশোভিত হয়, পুষ্প-গুলি এতই সৌরভযুক্ত হয় যে, সর্ব্বদা মধু-করকুলের চরণতাড়নে আন্দোলিত হইতে থাকে। এই সার সকলবৃক্ষের পক্ষেই উপকারী।

(২)

অঙ্কোলকাথতোয়েন মিশ্রিতং ঘৃতমাক্ষিকম্।
বসাকিটিতুরঙ্গানামেতৈঃ সিক্তা মহীরুহাঃ ॥
সিদ্ধার্থকফলোপেতাঃ সর্ব্বদা ফলশোভিতা।
জায়ন্তে পত্রপুষ্পাঢ্যা সচ্ছায়া রোগবর্জ্জিতাঃ।

অঙ্কোলের ক্কাথজলে মিশ্রিত ঘৃত ও মাক্ষিক শ্বেত সর্ষপ এবং ঘোড়া ও শূকরের বসার সার দিলে সেই বৃক্ষ পত্রপুষ্পদ্বারা সুশোভিত ও ছায়াযুক্ত এবং রোগশূন্য হইয়া থাকে।

(৩)

যষ্টিমধুক-পুষ্পানি সিতা কুষ্ঠং অমাক্ষিকং।
নিঃক্ষিপ্য গুলিকাং কৃত্বা মূলে সর্ব্বত্র নিঃক্ষিপেৎ ॥
দুগ্ধসেকঞ্চ বৃক্ষস্য যস্ত কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
ফলং সুনিশ্চিতং তস্য মধুরং জায়তে স্ফুটং ॥

যষ্টি মধুর পুষ্প, চিনি, কুড় ও মধু একত্র মিশাইয়া গুলিকা করিয়া বৃক্ষের মূলে নিক্ষেপ করিবে, তাহার উপর দুগ্ধ সেচন করিলে অবশ্যই সেই বৃক্ষের ফল সুমিষ্ট হইবে।

পূর্ব্বকালে এইরূপ লোকাতীত কৃষিতত্ত্ব ভারতীয় সুধীসমাজে কেমন সরলভাবে আলোচিত হইত, তাহা ভাবিলেও পুলকিত হইতে হয়।

(১)

বৌদ্ধদর্শনে উদাহরণস্থলে একস্থলে লিখিত আছে—

কার্পাসের বীজ আলতার রসে ভিজাইয়া রোপণ করিলে সেই বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষে রক্ত কার্পাস ফলিতে থাকিবে।

(২)

পাতঞ্জলদর্শনের একস্থানে লিখিত আছে,—বেত্রবীজ অৰ্দ্ধদগ্ধ করিয়া রোপণ করিলে, তাহা হইতে কদলীকাণ্ডের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

কৃষিতত্ত্ববিদ্ মহাত্মাগণ এই সকল শাস্ত্রীয় তত্ত্বের পরীক্ষা করিতে পারেন।

১৯। অধ্যাপক রাধাকমল

বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাবিভাগের চাকরী করিয়া মানুষ সাধারণতঃ নিষ্কর্ম্মাভাবে কাল কাটায়। দশের কথা ভাবিবার বা দেশের জন্য কর্ম্ম করিবার চেষ্টা করে না। এমন কি এজন্য প্রবৃত্তি লুপ্ত হইয়া যায়। এমত অবস্থায় যে দু একজন শিক্ষক বা অধ্যাপক পাচটা

লোক হিত বিষয়ক কর্ম্মে নিজকে নিয়োজিত করিতে পারেন তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করা কর্ত্তব্য। আজ আমরা মুর্শিদাবাদ কৃষ্ণনাথ-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্, এ মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা করিতেছি।

অধ্যাপক রাধাকমল বাইশ বৎসরের বালক। কিন্তু "বয়সে কি করে বাপু, গুণ যদি থাকে"। "তথাহি সর্ব্বে তস্যাসন্ পরার্থৈক ফলা গুণাঃ"। তাঁহার সকল কর্ম্মেরই একমাত্র লক্ষ্য পরোপকার সাধন।

নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সাহিত্য ও শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। পল্লীর স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের জন্য তিনি প্রচারকের কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন। দরিদ্র জন সাধারণ ও কৃষিজীবীদিগকে আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রদানের জন্য তিনি সমবেত প্রণালীতে ঋণ দানের নিয়ম কয়েকটি গ্রামে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। পুস্তক, যন্ত্র, ঔষধ, ছবি, মেডেল প্রভৃতি বহুবিধ পুরস্কার বিতরণ দ্বারা তিনি মুচী, মেথর, দর্জ্জি, গোয়ালা, তাঁতী, জোলাদিগের সন্তানগণের মধ্যে শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিতেছেন। এই সকল কার্য্যের জন্য তিনি তাঁহার আয়ের প্রায় সমস্তই প্রতি মাসে খরচ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত তিনি দেশের ধনবৃদ্ধির উপায় আলোচনা করিয়া নানা সদ্‌গ্রন্থ ইংরাজী ও বাঙ্গালায় লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন। ভারতের কুটীরশিল্প বিষয়ক তাঁহার এক খানি গ্রন্থ বিলাতে প্রকাশিত হইতেছে। "আমাদের দারিদ্র্য" নামক একখানি বাঙ্গলা গ্রন্থ শীঘ্রই বাহির হইবে। 'মডার্ণ রিভিউ', 'হিন্দুস্থান রিভিউ,' 'ইণ্ডিয়ান্ রিভিউ', 'কলেজিয়ান' প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন ইংরাজী পত্রিকায় তাঁহার রচনাবলী প্রায়ই দেখা যায়। আমরা সুখী হইলাম যে ইতিমধ্যেই তাঁহার চরিত্রবত্তা, কর্ম্ম কুশলতা এবং পাণ্ডিত্যের সমাদর আরব্ধ হইয়াছে। স্থানীয় জন সাধারণ এবং গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারিগণ তাঁহার উদ্যোগের সহায়ক হইতেছেন। লাগিয়া পড়িয়া থাকিলে যথা সময়ে সকলেরই সাহায্য পাওয়া যায়।

২০। চাতরা ভক্তাশ্রম

গত ১৩০৯ সালের ৬ই চৈত্র তারিখে কতিপয় ভক্তের উৎসাহ ও শ্রীমৎ শিবনারায়ণ পরমহংসদেবের পবিত্র পদার্পনে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষ্য শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার এবং রাজা শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল গোস্বামী মহোদয়ের ও অপরাপর ভক্তমণ্ডলীর ত্যাগ স্বীকার ও উদ্যমের ফলেই এই আশ্রমটী অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছে। ইঁহাদের কার্য্যে স্থানীয় লোক মাত্রেরই সহানুভূতি প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই আশ্রমের দ্বারা বহু উপায় হীন বালক বালিকা, অনাথা, অন্ধ আতুর প্রভৃতি সাহায্য-প্রাপ্ত হইতেছে।

(১) আশ্রমের উদ্দেশ্য সকল শ্রেণীর নিরাশ্রয়, দুঃস্থ জনগণের সেবাস্থান, নিঃসহায়া বিধবা, অনাথ বালকবালিকা, অসমর্থ বৃদ্ধ বৃদ্ধা, অন্ধ খঞ্জ ও আতুর প্রভৃতি নিঃসহায় দরিদ্র নারায়ণগণকে মাসিক চাউল, বস্ত্র ও জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী অন্যান্য দ্রব্যাদি সাহায্য;

দেশী ও বিদেশীয় নিরাশ্রয় অসমর্থ, পীড়িত ব্যক্তিবর্গকে আশ্রমবাটীতে রাখিয়া চিকিৎসা, ঔষধ ও পথ্যাদির সাহায্য এবং দরিদ্র ও অনাথ মৃত হত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় সাহায্য প্রদান।

(২) পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকবালিকা-গণকে পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয়ের বেতনাদি সাহায্য এবং প্রয়োজন ও অবস্থানুসারে আশ্রমে রাখিয়া প্রতিপালন।

(৩) আর্য্যশিক্ষা ও সৎচিকিৎসা প্রদান ভক্তাশ্রম উপরিউক্ত অভাব বিমোচনের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্নসহকারে গত দশ বৎসর ধরিয়া ব্রতী হইয়া বর্ত্তমানে একটি বিষম পরীক্ষার অন্তরালে উপস্থিত হইয়াছে, কারণ দেশে ক্রমশঃই দুঃস্থগণের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, প্রতিদিন কত যে অন্নকষ্ট-প্রপীড়িত রোগগ্রস্থ নিঃসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও আতুরগণের কাতরোক্তি ও অনাথ-বালকগণের দুর্দ্দশা-কাহিনী আশ্রমে আসিয়া পৌছিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আশ্রম আর্থিক অভাব-প্রযুক্ত সেই সকল দুঃসহ যন্ত্রনাভারের লাঘব করিতে অক্ষম। তাই আজ আশ্রমবাসী ভক্ত, সেবক ও সন্নাসিগণ দেশের গন্যমান্য বদান রাজা, মহারাজা শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর ও পণ্ডিত-মণ্ডলীর এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া প্রার্থনা জানাইতেছে যে, যাহাতে মনুষ্য-সমাজ মধ্যে এইরূপ বীভৎস ও হৃদয় বিদারক যন্ত্রনার লাঘব হয় তজ্জন্য সকলে কৃপা দৃষ্টি করিবেন। আশ্রমের মহদুদ্দেশ্য ও কার্য্যের গুরুভার ধনবান শিক্ষিত, বিজ্ঞ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ উৎসাহশীল স্বধর্ম্মপরায়ণ ভদ্র মহোদয়গণ গ্রহণ না করিলে আর কে করিবে?

মনুষ্যসমাজের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সার্ব্ব-ভৌমিক ভ্রাতৃভাব। ইহারই সম্বর্দ্ধন ব্যতীত কখনও মানব-সমাজে উন্নতি ও কল্যাণকর কর্ম্মের উৎকর্ষ-সাধন হইতে পারে না। আর মানব-সমাজের মধ্যে যদি এইরূপ ভালবাসার অনুষ্ঠান না থাকে, তবে তাহাকে মানব-সমাজ না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীভগবানের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব মনুষ্যমণ্ডলী তাহাদের মধ্যে স্বজাতি-প্রেম যদি অনুভব না করে তবে দীনহীন দুর্দ্দশাগ্রস্ত অন্নক্লিষ্ট পিতা-মাতা, ভাইভগ্নি ও পুত্র-কলত্রস্বরূপ অনাথ অনাথিনীগণ কাহার মুখ চাহিয়া বাঁচিয়া থাকিবে? কত অনাথিনী কেহ পীড়িত অবস্থায় কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে—কেহ অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে—কেহ নির্জ্জনে লোকলজ্জা ও মানের খাতিরে আত্ম-হত্যা করিতেছে—কেহ খাদ্যাভাবে জাতিকূল লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া সতীত্ব ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতেছে। কত অনাথ বালক অশিক্ষিতভাবে বয়োবৃদ্ধি সহকারে জীবিকার কোন সদুপায় না করিতে পারিয়া কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কুকর্ম্মে রত ও সেই বীজ সমাজ-ক্ষেত্রে বপন করিয়া বসুমতীকে কলঙ্কিত করিতেছে। সমাজের এই সকল কলঙ্ক অপনোদন করিতে হইলে বহুল স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন।

ভিক্ষাই আশ্রমের সম্বল—ভিক্ষা ভিন্ন অন্য সম্বল নাই। এই ভিক্ষার দ্বারা আশ্রম ১০ বৎসরকাল কার্য্যক্ষেত্রে উন্নীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কতিপয় মহাত্মা ব্যক্তির সাহায্যে আশ্রমটি দ্বিতল পর্য্যন্ত গাথুনী হইয়া অর্থাভাবে

কার্য্যটি বন্ধ হইয়াছে। উক্ত দ্বিতল গৃহটিকে আশ্রমের কার্য্যোপযোগী করিতে হইলে প্রায় সহস্রাধিক টাকার প্রয়োজন। যাঁহারা স্বদেশের কল্যাণ প্রার্থনা করেন—যাঁহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মানুরাগ আছে—যাঁহারা শ্রীভগবানের পূজা করিতে ইচ্ছুক—যাঁহারা সৎসঙ্গ প্রয়াসী—যাঁহারা ভাবীবংশধরগণকে মনুষ্য নামে অভিহিত করিতে চান—যাঁহারা দুঃস্থ নিঃস্ব অভাব প্রপীড়িত 'দরিদ্র নারায়ণ' গণের মর্ম্ম-পীড়া হৃদয়ে অনুভব করেন, আশ্রমের সেবক, ভক্ত ও সন্ন্যাসিগণ আজ তাঁহাদের দ্বারে ভিক্ষার্থী। ভিক্ষাঝুলি পূর্ণ হইলে মহৎ-কার্য্যের সহায়তা করা হইবে। যাঁহারা যাহা কিছু দিতে ইচ্ছা করেন—উক্ত আশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। কার্য্যাধ্যক্ষ চাতরা ভক্তাশ্রম, শ্রীরামপুর পোঃ (জেলা হুগলী)।

২১। ৺ সঙ্গীতজ্ঞ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আর ইহলোকে নাই। গত ২১এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে তিনি পুত্র পৌত্র পরিজন ও বঙ্গবাসীকে কাঁদাইয়া অনন্তলোকে চলিয়া-গিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশায় বঙ্গদেশ সঙ্গীতাদি সুর সম্বন্ধে অত্যুচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। সঙ্গীতাদি সম্বন্ধে তিনিই বঙ্গের প্রধান সন্দেহ-নিরাকরণ-কর্ত্তা ছিলেন। দেশ-বিদেশ হইতে যেমনি সঙ্গীতজ্ঞ আসুন না কেন, তিনিই তাঁহাকে নতমস্তকে গুরুজ্ঞান করিতেন। মহেন্দ্র বাবু সঙ্গীত ও স্বরসম্বন্ধে একখানি অতি সুন্দর অমূল্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি পুস্তকটি মুদ্রিত করিবার সুযোগ পান নাই। এই পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

ভারতীয় মুসলমান সম্রাটগণের সাহিত্যসেবা ও শিক্ষাবিস্তার

দাস বংশ

ঘোর রাজবংশের সিংহাসনে পরবর্ত্তীকালে দাস বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুতবুদ্দিন তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা নিশাপুরের কোন বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেখানে তিনি পারশী ও আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্যলাভ করেন এবং বিজ্ঞানের কোন কোন বিভাগেও জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। শেষে যখন তিনি ভারতের শাসনকর্ত্তার পদ লাভ করেন, তখন তাঁহার সাহিত্যানুরাগ ও পাণ্ডিত্য সর্ব্বজনবিদিত ছিল। তাঁহার শিক্ষানুরাগের ফলে, মধ্যযুগের ইউরোপীয় গির্জ্জাসমূহের ন্যায় তৎপ্রতিষ্ঠিত শতাধিক মস্‌জিদ ধর্ম্ম ও বিদ্যার কেন্দ্রস্থান হওয়ায় ইস্‌লামিক সাহিত্য ও জ্ঞান উত্তরোত্তর উন্নত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সকল প্রকার সদনুষ্ঠানের মধ্যে, হিন্দুদেবদেবীর মন্দির ধ্বংস এবং তাহাদিগের পরিবর্ত্তে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ তাঁহার অমানুষিক অত্যাচারের নিদর্শন রহিয়াছে।

বক্তিয়ার খিলজি কুতবুদ্দিনের দুষ্কর্ম্ম অনুকরণ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি বিহারের বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করেন। উহার পুস্তকালয় সে সময়ে সুন্দর গ্রন্থসমূহের দ্বারা সজ্জিত ছিল, অনেক বৌদ্ধছাত্র এবং সন্ন্যাসীও সেখানে অবস্থান করিতেন। বক্তিয়ারের নিষ্ঠুরতা হইতে কোন বিদ্যার্থীই রক্ষা পায় নাই। বঙ্গের তাৎকালিক রাজধানী ও বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান স্থান নদীয়া বিহার-ধ্বংসের পর বিধ্বস্ত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরে বক্তিয়ার দেশের বিভিন্ন স্থানে মস্‌জিদ, উচ্চ বিদ্যালয় ও মকতব প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইসলামিক সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার পূর্ব্বকৃত অত্যাচারের ক্ষতিপূরণ হইয়াছে।

পরবর্ত্তী সুলতান আলতামাস তাঁহার রাজনৈতিক ব্যাপারে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন, সাহিত্যের উন্নতির জন্য তাঁহার চিন্তার অবসর ছিল না। কিন্তু তাঁহার সময়েও দিল্লীতে বিদ্বজ্জনের সমাবেশ ছিল। যে সময় চেঙ্গিস খাঁ বোখারা নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন, সে সময়ে সেখানকার প্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনিক আমার রুহানি প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিয়া দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন। দিল্লীর রাজ-সভা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল, তথায় অবস্থান কালে তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক নাসিরুদ্দিনও সেই সময়ে আলতামসের সভায় সম্মান এবং উৎসাহ লাভ করিতেছিলেন। অধিকন্তু সুলতান যে বাগদাদের খলিপের উজীর জ্ঞানী ও বিদ্বান ফক্কর উলমুক আসামীকে রাজমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা আরও জানিতে পারি এই সুলতানের প্রতিষ্ঠিত একটি মাদ্রাসা

প্রায় ১০০ বৎসর পরে সুলতান ফিরোজ সা তোগলকের সময়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এবং ফিরোজ সাহ ঐ স্থানে একটি অট্টালিকা পুনর্নির্ম্মাণ করতঃ উহাকে চন্দন কাষ্ঠের দ্বারে শোভিত করিয়া নিজ সাহিত্যানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। অবশেষে আলতামাস তৎ-পুত্র মামুদের শিক্ষাকল্পে বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার শিক্ষায় অনুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন।

তৎপর আলতামাসের প্রতিভাশালিনী কন্যা সুলতানা রিজিয়া রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে রাষ্ট্রকার্য্যের উন্নতি হয়। সুলতানা রিজিয়া ভারতীয় অন্যান্য শাসনকর্ত্রীদিগের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ফেরিস্তা লিখিয়াছেন যে, তিনি কোরাণে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং উক্ত গ্রন্থ সদুচ্চারণ করিয়া পাঠ করিতে পারিতেন।

পরবর্ত্তী দুইজন সম্রাট বৈরাম এবং মসাউদের রাজত্বকালে শিক্ষা-প্রচারকল্পে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কার্য্য হয় নাই। ঐ সময়ে তবাকি নসিরি-গ্রন্থের গ্রন্থকার সিরাজ বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ইনি নসিরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং ঐ বিদ্যালয়ের জন্য দানাদির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়া ছিলেন।

তৎপরবর্ত্তী সুলতান নসীরুদ্দিন সাহিত্য-জগতে বিশেষ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং একজন পণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহার সুদীর্ঘ বিংশতি বৎসর ব্যাপী রাজত্বকালে শিক্ষাপ্রচার-কার্য্যের জন্য বহুবিধ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় চরিত্রবান লোক সম্রাটগণের মধ্যে অতি বিরল; তিনি সম্রাট হইয়াও ছাত্র এবং সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতেন; তাঁহার খেয়াল ছিল—তিনি স্বহস্ত লিখিত পুস্তকাদির বিক্রয়লব্ধ মূল্যে স্বীয় অন্নবস্ত্রাভাব মোচন করিবেন। তিনি কোরাণের অতি সুন্দর একখানি প্রতিলিপি নিজ হস্তে প্রস্তুত করেন; প্রায় শত বর্ষ পরে যখন ইবঁ বতুতা ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন কাজি কমলুদ্দিন তাঁহাকে এই প্রতিলিপি দেখান। তিনি স্বয়ং যেরূপ পণ্ডিত ছিলেন, পণ্ডিতগণকেও সেরূপ বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন এবং তাঁহাদিগের জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া বিদ্যানুরাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। শেষে তিনি পারস্য সাহিত্যে অনুরক্ত হন এবং ঐ ভাষারও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁহারই সময়ে সুবিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ 'তবাকাতি নসিরি' লিখিত হয়, সুলতানের নামানুসারেই উহার নামকরণ হয়।

নসিরুদ্দিনের পরবর্ত্তী সুলতান বুলবনও সাহিত্যের পরম বন্ধু ছিলেন; তাঁহার সভাগৃহ সর্ব্বদাই জ্ঞানবান এবং পণ্ডিতগণের সদালাপে মুখরিত ছিল। ইহা তৎকালীন ভারতের এবং তন্নিকটবর্ত্তী রাজ্যের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার সহিত আংশিক রূপে সংশ্লিষ্ট আছে বলিয়া মনে হয়। এই সময়েই চেঙ্গিস খাঁ খোরাসান এবং অন্যান্য রাজ্যে তাঁহার বিদ্বেষানল প্রজ্জলিত করিয়াছিলেন; এবং ইহার ফলে ১৫ জনেরও অধিক রাজন্যবর্গ দিল্লিনগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বুলবনও তাঁহাদের প্রত্যেককে মর্য্যাদা এবং পদোপযুক্ত প্রাসাদাদি প্রদান করিয়াছিলেন; যখনই নিজের রাজত্বের কথা উঠিত, তখনই বুলবন ইঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়া স্বীয় গরিমা

প্রকাশ করিতেন। এই সকল রাজগণের অনুচরদিগের মধ্যে এসিয়ার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও জ্ঞানী লোক অনেক ছিলেন। সুতরাং তৎকালে প্রাচ্যজগতে ভারত-সুলতানের সভাগৃহই যুগপৎ শিক্ষা এবং সম্পদের একমাত্র কেন্দ্র হইয়াছিল।

এই সময়ে সাহিত্যিকগণ-কর্তৃক দিল্লী-নগরীতে এক মধুচক্র নির্ম্মিত হইয়াছিল; তথায় নিত্যই সাহিত্য-মধু ক্ষরিত হইতেছিল। সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ মহম্মদ অতিশয় প্রতিভাবান ছিলেন এবং সাহিত্য-চর্চ্চায় বিশেষ অনুরক্ত হন। তিনি নিজেই বিভিন্ন বিখ্যাত লেখকের গ্রন্থ হইতে নানাবিধ কবিতা সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তক সঙ্কলন করেন। এই পুস্তকে বিংশতি সহস্র সুললিত উৎকৃষ্ট শ্লোক সমাবিষ্ট হইয়াছে।

এই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন যুবরাজ সাহিত্য-পরিষদ গঠনের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। প্রসিদ্ধ কবি আমির খসরু যুবরাজের শিক্ষাগুরু ছিলেন, তিনি যুবরাজের সাহিত্য-পরিষৎ-সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। রাজপ্রাসাদেই এই সভার সভ্য-গণের সমাবেশ হইত।

সুলতানের দ্বিতীয় পুত্র খুবা-খান-রেজেরা একটি পরিষদ গঠন করেন; ইহা সঙ্গীত-পরিষদ। এখানে নৃত্য, গীত, বাদ্য, নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী এবং গল্পগুজব হইত। সঙ্গীতে অভিজ্ঞ লোকেরাই এই পরিষদের সভ্য হইয়াছিলেন এবং যুবরাজের প্রাসাদেই ইহার অধিবেশন হইত।

ওমরাহগণও সুলতানের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। দিল্লীনগরীর বিভিন্ন স্থানে বহুল পরিষদ গঠিত হইতে লাগিল। এইরূপে সুলতান দেশে বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদের এক নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়া দেশের প্রভূত উপকার সাধন করেন।

রাজসভার এইরূপ উন্নত রুচি খ্যাতি প্রতি-পত্তি কেবল যুবরাজ মহম্মদের বিদ্যানুরাগিতা ও বিদ্যোৎসাহিতার প্রভাবেই সংসাধিত হইয়া-ছিল। দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও গুণিগণ সর্ব্বদাই এই যুবরাজের সভায় গমনাগমন করিতেন। তাঁহার অনুচরগণ তাঁহাকে সা নামা, দেওয়ানী সানাই, দেওয়ানী খাকানী, এবং সৈখ নিজামির কামসা পড়াইয়া শুনাইত। তাঁহার সমক্ষে পণ্ডিতগণ ঐ সকল কবিগণের কাব্য ও রসের আলোচনা শুনিতেন।

যুবরাজের শিক্ষক আমীর খসরু ব্যতীত তাঁহার আরও বহু পণ্ডিত তাঁহার সহচর ছিলেন। তন্মধ্যে আমীর হাসান একজন প্রধান কবি। যুবরাজ এই কবিদ্বয়কে পুরস্কৃত করিয়া সন্তোষ লাভ করিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে বহু সম্পত্তি ও বার্ষিক প্রদান করিয়াছিলেন।

নাসিরুদ্দিন যেরূপ উৎসাহ সহকারে বিদ্বন্-মণ্ডলীকে তাঁহার সভায় নিমন্ত্রণ করিতেন ও সাধ্যানুসারে তাঁহাদের আদর আপ্যায়িত ও যত্ন করিতেন তাহাতেই তাঁহার অসাধারণ বিদ্যানুরাগিতার ও বিদ্যোৎসাহিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

লাহোরে সৈখ উত্মান তারমুজির সহিত সুলতানের সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু তিনি তাঁহাকে বহু অনুনয় উপরোধ করিয়া ও প্রভূত উপঢৌকন দিয়াও তাঁহার জন্মভূমি তুরাণ হইতে দিল্লীতে আনয়ন করিতে

সমর্থ হন নাই। সিরাজ হইতে প্রসিদ্ধ পারসিক কবি সাদিকে আনয়ন করিবার জন্য তিনি দুইবার যাতায়াত খরচ ও বহুল উপঢৌকন সহ দূত প্রেরণ করেন। তিনি তাঁহার জন্য মুলতানে একটি খারকা (দরগা বা আশ্রম) প্রস্তুত ও তাহার ব্যয়-ভার বহনের জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রামও দান করিতে চাহিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্য নিবন্ধন কবিশ্রেষ্ঠ দিল্লীতে আগমন করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু তিনি উভয়বারই তাঁহার রচিত কবিতা নিজ হস্তে লিখিয়া পাঠান ও দিল্লীতে আগমন করিতে সমর্থ না হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার সভার পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ আমীর খসরুর প্রতিভার গুণকীর্ত্তন করিয়া পাঠান।

সুলতান বিদ্বান ব্যক্তিগণের সংসর্গ অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এমন কি যুদ্ধযাত্রায়ও তিনি বিদ্বান ব্যক্তিগণকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। এইরূপে এক যুদ্ধেই যুবরাজ নিহত হন ও খুস্রু বন্দী হন। সাহিত্য জগতের প্রতি বল্বনের অনুরাগও নিতান্ত কম ছিল না। সুলতান যুবরাজ মহম্মদকে উপদেশ দিতে গিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে জানা যায় তিনি বিদ্বজ্জনকে সম্মান করিতেন এবং তাঁহাদের জ্ঞান উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিলে শাসন ও পালনের যে বিশেষ সুবিধা হয় তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন "প্রতিভা-বান্, বিদ্বান্ ও সাহসী ব্যক্তিগণকে সর্ব্বপ্রযত্নে অন্বেষণ করিয়া আনিবে, এবং প্রীতি, ভালবাসা ও দয়া-দাক্ষিণ্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিয়া রাষ্ট্রকার্য্যে তাঁহাদিগের নিকট মন্ত্রণা গ্রহণ করিতে হইবে।"

বঙ্গদেশ জয়ের পর দিল্লীতে আগমন করিয়া তিনি পণ্ডিতগণের যেরূপ সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা করেন তাহাতেই তাঁহার মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়। দিল্লী হইতে তিনবর্ষ অনুপস্থিতি সময়ে ফকরুদ্দিন কোতোয়াল বহু চতুরতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত দিল্লীর শান্তি রক্ষা করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে উপহার ও উপাধি প্রদানপূর্ব্বক সম্মানিত করিয়াই বিদ্বজ্জনের আলয়ে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকেও বিবিধ উপহার প্রদান করেন।

সুলতান বলবনের বিংশবর্ষব্যাপী সুদীর্ঘ রাজত্ব সময়ে বহু বিদ্বান ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত পণ্ডিতগণ ব্যতীতও তাঁহার সভায় সৈখ সুকারজাঙ্গ, সৈখ বাহাদুদ্দিন ও তাহার পুত্র গজনীর সৈখ বাহারুদ্দিন আরিফ, ধার্ম্মিক দার্শনিক বিদ্বান কুতবুদ্দিন, বকতিয়ার কাকি, সিদ্ধি মৌলা, এবং সাহিত্য-বিজ্ঞানের বিভিন্ন অংশে পারদর্শী অন্যান্য পণ্ডিতগণ সেই সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

সুলতানের প্রযত্নে শীঘ্রই দিল্লীনগরী সাহিত্য-চর্চ্চার ও বিদ্বন্মণ্ডলীর প্রধান কেন্দ্র-স্থান হইয়া উঠিল। এই সময়ে দিল্লীনগরী সাহিত্য-জগতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। আমীর খসরু প্রকৃতই বলিয়া-ছিলেন যে এই সময়ে দিল্লীনগরীর বিদ্যার প্রভায় এসিয়ার সর্ব্বপ্রধান বিদ্যার কেন্দ্র বোখরা হীনপ্রভ।

পরবর্ত্তী সুলতান কৈকোবাদ দুই বৎসর সিংহাসনে আরূঢ় থাকিয়া এই অল্প সময়ের মধ্যে সাহিত্যের উন্নতিরোধ করিয়াছিলেন।

প্রায় এই সময়েই আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত সিদ্ধি মাওলা দিল্লীতে একটি বিদ্যালয় ও একটি দরিদ্রাবাস স্থাপন করেন। এতৎ সম্বন্ধে আমরা পরে আরও বলিব।

সম্রাট্ নিজে দুশ্চরিত্র ছিলেন, এবং সাহিত্যক্ষেত্রে কুরুচির উৎসাহ দিতেন। প্রজাবৃন্দও রাজার মতন দুশ্চরিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার ফলে সাহিত্যচর্চ্চা লোপ পাইতে লাগিল, বিলাসিতা এবং চরিত্রহীনতার প্রভাবে সাহিত্যজগৎ অন্ধকার হইয়া উঠিল।

এই দুশ্চরিত্র সুলতানের রাজত্বকালে শিক্ষা ক্রমশঃ অধোগামী হইতে লাগিল। বাল্যকালে কঠোর শাসনের ভিতর থাকিয়া বিবিধ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াও এবং সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিবিধ প্রলোভনে পড়িয়া ইন্দ্রিয়-পরবশ হইয়া পড়েন। ফলতঃ তাঁহার সমুদয় মন্ত্রী, যুবক সভ্যগণ, অনুচরবর্গ এবং বন্ধুগণ, শিক্ষিত অশিক্ষিত উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহার অনুকরণে মদ্যপানাদি বিবিধ ব্যসনে আসক্ত হইয়া পড়িল।

খিলিজি রাজবংশ

নূতন রাজবংশ প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকেই নূতনের প্রাদুর্ভাব হইল। সাহিত্য ও শিক্ষা-ক্ষেত্রেও নূতন শক্তি প্রকাশিত হইল। সুলতান জালালুদ্দিন স্বয়ং একজন সাহিত্যিক ছিলেন এবং তিনি গুণিগণের যথোচিত আদর ও সম্মান করিতেন। সুতরাং তাঁহার সভায়ও নানা প্রকার গুণিগণের সমাবেশ হইল। তাঁহার সহচরগণও উন্নত রুচি সৎসাহস ও ব্যঙ্গকৌতুকের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি দেশের তাৎকালিক বিদ্বান্‌গণকে তাঁহার দলে প্রায়ই গ্রহণ করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে আমীর খসরু, তাজুদ্দিন ইরাকী, খাজা হাসান, মভিদ দেওয়ানা, আমীর-আর্‌সলান কুলামি, যাখতিয়ারুদ্দিন তাঘি, বাকি খুতিয়ার প্রভৃতিগণই তাহাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাব্য এবং ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের জন্য প্রসিদ্ধ।

তাঁহার সভায় ইতিহাস কাব্য ও বিজ্ঞানের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতবিদ্যারও প্রভূত চর্চ্চা হইত। স্বকণ্ঠ আমীর খাস্‌সা এবং হামিদ রাজার সুমধুর গীতের সহিত মহম্মদ সা হুকৃতি, ফাতু সা, নাসির খাঁ, বেরোজ প্রভৃতি সুনিপুণ বাদকগণের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সুললিত ঝঙ্কারে প্রায়ই তাঁহার মহাসভা স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইত।

সভাসমিতিতে এমন কি সর্ব্বপ্রকার উৎসব-আমোদেই আমীর খসরু তাঁহার রচিত কবিতা আবৃত্তি ও তাঁহার রচিত গীত গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন। সম্রাটও প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে পুরস্কার প্রদান করিতেন।

জালালুদ্দিন রাজত্বকালে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্য্য করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি রাজকীয় সুবৃহৎ পুস্তকালয়ে পুস্তকাধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি করিয়া তথায় উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিতেন। এই পদ অতি সম্মানার্হ এবং লাভজনকও বটে। আমির খসরুর প্রতি ইহার ভার অর্পিত হয়। আমির খসরু একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন এবং পূর্ব্ব হইতেই তিনি জালালুদ্দিন খিলিজির সাহায্য পাইয়া আসিতেছিলেন। কৈকোবাদের রাজত্ব

কালেই জালালুদ্দিন তাহাকে বৃত্তি প্রদান করেন, এবং 'আরজি মামলিক' পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১২০০৲ বারশত টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন। জালালুদ্দিন স্থলতান হইয়া আমিরকে উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার স্থযোগ প্রাপ্ত হইলেন; তিনি তাঁহাকে রাজকীয় গ্রন্থাধ্যক্ষ ও কোরাণের রক্ষক নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করিলেন, তাঁহার বংশমর্য্যাদা বৃদ্ধি করিলেন, এবং রাজপরিবার ও সম্ভ্রান্ত পারিষদগণোপযুক্ত শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

কিন্তু বিধাতৃচক্রে জালালুদ্দিনের বিমল কীর্ত্তিচন্দ্রমায় কলঙ্করেখা পতিত হইল; তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সিদ্দি মওলাকে হত্যা করিলেন। মওলা বুলবনের রাজত্ব কালে দিল্লীনগরীতে সর্ব্বপ্রথমে এক শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন এবং ইঁহার জ্ঞানবত্তাও অসাধারণ ছিল। ইঁহার দানশীলতাও বিশেষ স্থপরিচিত। ইনি নানাস্থানে অনেক ছত্র খুলিয়াছিলেন; তথায় প্রত্যহ নানাস্থানের অনেক ফকির, পথিক ও গরীব দুঃখী আহার পাইত। সেখানে যে কেহই যাউক না কেন কেহই বিমুখ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিত না। তৎকালে তাঁহার দানধর্ম্ম উপকথার ন্যায় বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক যুবরাজ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। যুবরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র খান-ই-খানানও প্রত্যহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং আপনাকে সিদ্দির পুত্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন। কিন্তু অবশেষে তিনি স্থলতানের বিরুদ্ধে তাঁহার শিষ্যবর্গের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন সন্দেহ করিয়া হত্যা করা হইল।

জালালুদ্দিনের পরবর্ত্তী সম্রাট আলাউদ্দিন সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি অতি অশিক্ষিত ছিলেন, লিপিতে কিম্বা পড়িতে পর্য্যন্ত জানিতেন না। অধিকন্তু তিনি এরূপ উদ্ধত এবং স্বেচ্ছাচারী ছিলেন যে পণ্ডিতগণ তাঁহার সভায় উপস্থিত হইতে কুণ্ঠিত হইতেন এবং তিনি উপস্থিত থাকিলে রসনা সংযত করিয়া থাকিতেন। আলাউদ্দিন নিজেও যেমন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তাঁহার পুত্রগণকেও তদ্রূপ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিলেন। তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী খিজির খাঁ এবং অপর পুত্রগণের শাসনের জন্য কোনও উপযুক্ত জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ লোক নিযুক্ত করেন নাই; অধিকন্তু পুত্রগণের জ্ঞান পরিপক্ক না হইতেই তাঁহাদিগকে শিক্ষাগার হইতে আনয়ন করিলেন এবং ধনসম্পদের অধিকারী করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা নানারূপ কুকার্য্যে অর্থ এবং পদের অপব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু আলাউদ্দিন শীঘ্রই তাঁহার অজ্ঞতা নিবন্ধন বিভিন্ন অভাব ও অস্থবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে নিজে কিছু পড়িতে আরম্ভ করিয়া শীঘ্রই পারশ্য ভাষায় কিঞ্চিৎ অধিকারলাভ করিলেন। স্থতরাং তিনি এখন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের নামের সহিত পরিচিত হইলেন। পত্রের শিরোনামা পড়িতে এখন আর তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইত না।

পণ্ডিতগণের শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বাদানুবাদের মর্ম্মগ্রহণোপযোগী শিক্ষালাভ করিয়াই তিনি তাঁহার সভায় পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে শাস্ত্র-বিচার ও বিভিন্ন-বিদ্যার আলোচনা করিতে বলিতেন। এখন হইতে তিনি তাৎকালিক্ পণ্ডিতগণকে বিশেষতঃ কাজী মাওলানা কারাণী এবং কাজী মঘিসুদ্দিনকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এই পণ্ডিতদ্বয়কে তিনি তাঁহাকে আইনের ব্যাখ্যা শুনাইবার জন্য নিযুক্ত করেন। আইনের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অনেক সময় তিনি তাহা নিজের পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের সহিত মিশাইয়া রোমাঞ্চিত হইতেন। সুলতান সর্ব্বদাই একগুঁয়ে এবং অত্যাচারী ছিলেন। সুতরাং যাঁহারা তাঁহার প্রকৃত চরিত্র অবগত ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞানের পরিচয় দিতে যাইয়া কখন সম্রাটের জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিতে সাহস করিতেন না। শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহার জ্ঞানলাভের পর স্বভাবেরও কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, এবং তিনি বিদ্বানগণের আদর ও সম্মান করিতে শিখিয়াছিলেন। অন্ততঃ আমরা তাহার একটি প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রাপ্ত হই—সম্রাটের পাষাণ হৃদয়ও একবার জ্ঞানের নির্ম্মল জ্যোতিতে নমনীয় ও বিশুদ্ধ হইয়াছিল—তিনি কাজী মঘিসুদ্দিনকে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য ১০০০৲ ও সুবর্ণ বিমণ্ডিত বহু কারুকার্য্য-খচিত বস্ত্র দান করিয়াছিলেন।

কিন্তু যে সকল সাহিত্যসেবী রাজানুগ্রহ লাভ করিয়া সৌভাগ্যবান হইতে পারিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সকলেরই যে প্রভূত বিদ্যা তাহা নহে। অনেকে সুলতানের শুভ-দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন বলিয়াই আদর লাভ করিয়াছিলেন। যদিও ফিরিস্তাতে দেখিতে পাই যে "সুলতান সকল প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি-গণকেই আদর ও সম্মান করিতেন" কিন্তু আমাদিগকে ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে যাঁহারা সমর ও রাজনীতি এবং শাসন-বিভাগে, কেবলমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রে নহে, প্রতিভা প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন সম্রাট তাঁহাদিগকে আদর করিতেন। তাই বারণি বলিয়াছেন :—"তিনি (আলাউদ্দিন) নিজে বিদ্বান ছিলেন না এবং কখনও বিদ্বানের সহবাসও করিতেন না।" বোধ হয় এই কথাটা অতিরঞ্জিত। যাহা হউক আমরা অন্য একজন ঐতিহাসিকের মতের সহিত তুলনা করিলে প্রকৃত সত্য বুঝিতে পারিব। তিনি বলেন :—

"আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে দিল্লীনগরী সর্ব্ববিধ প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও বিদ্বানগণের কেন্দ্রস্থল ছিল। সম্রাট তাঁহাদিগকে উৎসাহ সহানুভূতি বা অনুকম্পা প্রদানের পরিবর্ত্তে তাচ্ছিল্য ভাবে দেখিলেও সেই যুগে বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের প্রভাব পূর্ব্ববৎই বর্ত্তমান ছিল।"

প্রকৃত পক্ষে তিনি শিক্ষা ও বিদ্যার প্রতি কেবলমাত্র নিরপেক্ষ থাকিয়া নয়, প্রকৃত পক্ষে বিরুদ্ধতাচরণ করিয়াই তাহাদের অনিষ্ট সাধনে চেষ্টিত ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় ১২৯৯ অব্দে রিনতাম্বর দুর্গ অধিকারের পর সুলতান বিদ্রোহ দমন করিতে মনস্থ করিয়া প্রজাগণের সম্পত্তির উপর কটাক্ষপাত করেন। দেবোত্তর চাকরাণ ও অন্যান্য প্রকারে প্রজাদিগকে যে সকল জমি পূর্ব্বের

রাজগণ দান করিয়াছিলেন সুলতান তৎসমুদয়ই হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। সুলতানের এইরূপ অন্যায় অত্যাচার থাকা সত্বেও আমরা ফিরিস্তাতে দেখিতে পাই প্রাসাদ, মস্‌জিদ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্নানাগার দুর্গস প্রভৃতি নানা প্রকার সার্ব্বজনের মঙ্গলকর প্রতিষ্ঠান সকল ইন্দ্রজালের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। এই সময়ের ন্যায় অন্য কোন সময়েই নানা দেশ হইতে আগত পণ্ডিত মণ্ডলীর এরূপ সমাবেশ হয় নাই। এই সময় অর্দ্ধশত বিভিন্ন বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

যে সকল পণ্ডিতগণ সেই সময়ে দীল্লিতে প্রাদুর্ভূত হইয়া অথবা অন্যদেশ হইতে শুভাগমন করিয়াও রাজপোষকতা লাভে বঞ্চিত ছিলেন, তাহাদের নাম উল্লেখ না করিয়া ফিরিস্তার মতে যাঁহারা রাজানুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের নামই পূর্ব্বে উল্লেখ করা গেল। ইহাদের মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত কবি-সম্রাট্ আমীর খসরু; হিন্দুস্থানের 'সাদি' আমীর হাসান; সুদ্রুদ্দিন আলী; ফক্‌রুদ্দিন খোয়াস; হামিদুদ্দিন রাজা; মাওলেন আরিফ; আব্দুল হাকিম; সাহাবুদ্দিন সদর নিসিন, প্রভৃতিগণই প্রধান। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন ঐতিহাসিক ও রাজকীয় বৃত্তি পাইতেন।

সুলতান আলাউদ্দিনের প্রধান মন্ত্রী সামস্-উল-মুল্ক একজন অতি বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তৎসাময়িক বহুসংখ্যক পণ্ডিতই তাঁহার শিষ্য ছিলেন। সম্রাট তাঁহার উপদেশানুযায়ী কাজ করিলে ভারত এবং সম্রাট উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হইত।

তৎসময়ে প্রাদুর্ভূত কবি দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে যাঁহারা রাজানুগ্রহলাভে বঞ্চিত ছিলেন তাঁহাদের কেবল মাত্র প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণেরই নাম করা যাইতেছে:—সেখ নিজামুদ্দিন আওলিয়া, সৈয়দ তাজুদ্দিন, সৈয়দ রুকুনুদ্দিন এবং সৈয়দ মাঘিসুদ্দিন ও মনতুজিবুদ্দিন ভ্রাতৃদ্বয়—ইহারা সকলেই ধার্ম্মিক ও বিদ্বান ছিলেন। দীল্লির প্রসিদ্ধ দার্শনিক মৌলানা মৌয়াযানউদ্দিন এবং আইনকর্ত্তা ও প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণের বিচিত্র গ্রন্থের টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ উমরাণীও এই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

ধার্ম্মিক লোকগণের তত্ত্বাবধানে দার্শনিক ঈশ্বরবাদেরও প্রভূত আলোচনা হইত। সুতরাং নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির আদরও বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল;—কোটা আলক্লাব, আহিয়া আলালুম এবং তাহার অনুবাদ, আরাফ এবং কাস্‌ফাল মহাযাব, শার্ টারফ্, রাসালা কাশিরী, মারসাদ আল-আবাদ ইত্যাদি।

বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের উন্মুক্ত দানে বিদ্যাচর্চ্চার প্রসার বর্দ্ধিত হইয়াছিল। নহিটার ধনিগণ বহু পণ্ডিত ও নানা দেশ হইতে আগত ছাত্রবৃন্দের সমুদয় ব্যয় বহন করিতেন। কার্দ্দিজের সম্ভ্রান্ত বংশীয় সৈয়দ যাজু এবং সৈয়দ আলী, সম্ভ্রান্ত তাঞ্জার বংশীয় মায়উদ্দিন, তাজুদ্দিন, জালাল, জামাল এবং আলী ও বিদ্যোৎসাহিতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। বায়েনার আমীরগণও কম বিদ্যানুরাগী ছিলেন না।

বারুণি বলেন এই সময়ে দীল্লিতে যে সকল পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহারা বোখরা, সমরখন্দ, বাগদাদ, কাইরো, দামাস্কাস,

ইস্পাহান এবং তাব্রিজের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইতিহাস (বাদি এবং বায়ান), ন্যায়শাস্ত্র (আস্থল-ই-ফিকোয়া), ধর্ম্মতত্ত্ব (আসাল-ই-দিন), ব্যাকরণ (মু) কোরাণের ব্যাখ্যা (বা তাফসের) প্রভৃতি বিবিধ বিষয়জ্ঞ বহু পণ্ডিত তৎসময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

বারণী এতদ্ব্যতীত দিল্লীর অন্যান্য পণ্ডিতগণের নামও উল্লেখ করিয়াছেন :—

(১) কাজি ফখ্রুদ্দিন নাকুয়ালা,
(২) কাজি সরফুদ্দিন সরবাহী
(৩) মৌলন নাসিরুদ্দিন ঘানি,
(৪) মৌলন তাজুদ্দিন মোকদাম
(৫) মৌলন জাহিরউদ্দিন লাঙ্গ,
(৬) কাজি মাঘিস্থদ্দিন বিয়ানা
(৭) মৌলন রুকুহুদ্দিন সন্নামি,
(৮) মৌলন তাজুদ্দিন কালাহি
(৯) মৌলন জাহিরুদ্দিন ভাক্রি,
(১০) কাজি মাহিউদ্দিন কাশ্নি,
(১১) মৌলন কমলুদ্দিন কুলি,
(১২) মৌলন জিয়াউদ্দিন পাহিলি,
(১৩) মৌলন মুনাজুদ্দিন কোয়াবনি,
(১৪) মৌলন নিজমুউদ্দিন কালাহি,
(১৫) মৌলন নাসিরুদ্দিন করহ,
(১৬) মৌলন নাসিরুদ্দিন সাবালি,
(১৭) মৌলন আলাউদ্দিন তাজর,
(১৮) মৌলন করিমুদ্দিন জাওহারী,
(১৯) মৌলন হাজত মুলতানি কোয়াদিম,
(২০) মৌলন হামিহুদ্দিন মুখলাস,
(২১) মৌলন বারহানুদ্দিন ভাকৃরি,
(২২) মৌলন আফ্তা খারুদ্দিন বারনি,
(২৩) মৌলন হাসামুদ্দিন স্থরথ,
(২৪) মৌলন অহিউদ্দিন ঘুন্না,
(২৫) মৌলন আলাউদ্দিন কারুফ,
(২৬) মৌলন হাসামুদ্দিন ইবন সাদি ;
(২৭) মৌলন হামিহুদ্দিন বালিয়ালি,
(২৮) মৌলন সাহাবুদ্দিন মুলতানি।
(২৯) মৌলন ফখরুদ্দিন হান্সি,
(৩০) মৌলন ফখরুদ্দিন সাফুয়াকুইল্
(৩১) মৌলন স্থলাহুদ্দিন সাতকি,
(৩২) কাজি জাইনুদ্দিন নাকুয়ালা,
(৩৩) তজিউদ্দিন রাজি,
(৩৪) মৌলন আলাউদ্দিন স্থদ্রউল সারিফা,
(৩৫) মৌলন মিরান্ আরিকনা,
(৩৬) নাজিবুদ্দিন সাবি,
(৩৭) মৌলন সামস্থদ্দিন টাম,
(৩৮) মৌলন সাদ্রু দ্দন গণ্ডক,
(৩৯) মৌলন আলাউদ্দিন লাহোরী,
(৪০) মৌলন সামস্থদ্দিন বাহি,
(৪১) কাজি সামস্থদ্দিম গজরুনি,
(৪২) মৌলন সাদ্রুদ্দিন টাবি
(৪৩) মৌলন মৈনুদ্দিন লূলি,
(৪৪) আক্তা খারুদ্দিন পাজি,
(৪৫) মৌলন মাজিউদ্দিন আম্বেলি,
(৪৬) মৌলন নাজমুদ্দিন ইণ্ডা।
(৪৭) মৌলন আলিমুদ্দিন।
(৪৮) জামালুদ্দিন সাতিবি।
(৪৯) আলাউদ্দিন মাকৃড়ি ও
(৫০) খোজা জিকি।

শেষোক্ত তিনজন কোরাণে স্থপণ্ডিত ছিলেন। এই সময় দিল্লীতে হিন্দু কথকদিগের মত অনেক বিখ্যাত মুজাকরামিজ ছিলেন—যেমন মৌলন ইমাহুদ্দিন হাসান। তাঁহারা সাপ্তাহিক তাজকির সম্পন্ন করিতেন এবং জনসাধারণ

তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত দলে দলে আগমন করিত। এই উৎসব সম্পাদকগণের মধ্যে মৌলন হামিদ, ও মৌলন লতিফ ও তাঁহাদের পুত্রগণ, মৌলন জিয়াউদ্দিন সুনামি ও মৌলন সাহাবুদ্দিন খালিলি বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন।

আমীর আর্শলন্ বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং কাবিরুদ্দিন বিখ্যাত বাগ্মী ও সৎসাহিত্যে বিশেষ সুপণ্ডিত ছিলেন।

বারুণি তৎরচিত ফতেনামার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন, তবে এই মাত্র দোষ দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার পুস্তকে আলাউদ্দিনের কালিমারঞ্জিত চরিত্রের আদৌ উল্লেখ করা হয় নাই।

চিকিৎসাবিদ্যায় মৌলন বাদ্রুদ্দিন দামাস্কুই, মৌলিন সাদ্রুদ্দিন, যেওয়ানি তাদিব, আলিমুদ্দিন প্রভৃতি বিখ্যাত ছিলেন।

বারুণি তাৎকালিক আরও কয়েক জন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা, রাজকবি এবং সঙ্গীতজ্ঞদিগের নাম করিয়াছেন।

যদিও সে সময় অনেকানেক বিখ্যাত পণ্ডিতগণের আবির্ভাব হইয়াছিল, তথাপি ঐতিহাসিকের যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, আলাউদ্দিন তাঁহাদের গুণের সম্বর্দ্ধনা করেন নাই।

ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে সম্রাট পণ্ডিতগণের অভ্যুত্থান ভাল বাসিতেন না এবং বহু জিনিষের অনিষ্ট করিয়া তাহাতে কালিমা লেপন করিয়াছেন, তাঁহার রাজত্ব-কাহিনীই ভারতীয় মুসলমানগণের সাহিত্যেতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায় হইয়া রহিয়াছে।

আলাউদ্দিনের রাজত্বে আমরা আরও একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই। মহম্মদ ঘোরীর ভারত আগমনের পর প্রায় একশত বৎসর অতীত হইল। ইতিমধ্যে ভারতে হিন্দু মুসলমানে রক্ত ও ভাষার আন্তর্জাতিক মিশ্রণ সংঘটিত হইতে চলিয়াছে। আলাউদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার মিহির খাঁর সহিত গুজরাটরাজকন্যা দেওয়াল দেবীর বিবাহ ও তৎসম্বন্ধে আমীর খসরুর রচিত কবিতাতে ইহা সহজেই উপলব্ধি হয়। এই সময় হিন্দু মুসলমানে জাতিবিরোধ বহুল পরিমাণে শিথিল হইয়াছিল। সুতরাং ভাষার মিশ্রণ যে তাহার বহুপূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

আলাউদ্দিনের পরবর্ত্তী সম্রাট মোবারক খিলিজির রাজত্ব কালে আমরা আবার সাহিত্যের অধঃপতন দেখিতে পাই। তাঁহার অধিকাংশ কার্য্যেই অলস কাইকোবাদের কার্য্যাবলীর পুনরনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লীতে মোবারক ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও চরিত্রহীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই প্রকার হীনচরিত্র সম্রাটের নিকট বিদ্যানুরাগিতা ও বিদ্যোৎসাহিতা আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু তাঁহার রাজ্য সময়েও একটি বিশেষ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। আলাউদ্দিন খিলিজি যে সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন, মোবারক তৎসমুদয় প্রত্যর্পণ করিয়া শিক্ষার বিভিন্ন কেন্দ্র ও অনুষ্ঠানগুলিকে পুনর্জ্জীবন দান করিয়াছিলেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল্।

সৌন্দরনন্দ *

সমাপ্ত)

১৬

তিনি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—'এইরূপে চিত্তের ধারণা দ্বারা চতুর্বিধ ধ্যান লাভ হইলে যোগী পঞ্চবিধ অভিজ্ঞা * অসাধারণ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, এবং কামাদি তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য চেষ্টা করে। যোগী ইহাতে দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ, এবং দুঃখনিরোধের পথ এই চতুর্বিধ আর্য্য সত্যকে বিশেষ রূপে জানিতে পারে এবং ভাবনা দ্বারা সমস্ত তৃষ্ণাকে অভিভূত করে। সে ইহাতেই শান্তি প্রাপ্ত হয়, আর তাহাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। লোকে এই আর্য্যসত্যচতুষ্টয় না জানায়, এবং ইহাতে প্রবেশ না করায় সংসার দোলায় আরোহণ করিয়া জন্ম হইতে জন্মান্তর পরিগ্রহ করে। অন্ন উৎকৃষ্টই হউক বা অপকৃষ্টই হউক, বিষমিশ্রিত হইলে তাহা যেমন বিনাশের জন্য হইয়া থাকে, পোষণের জন্য নহে; সেই রূপ জন্ম উৎকৃষ্ট যোনিতেই হউক বা তির্য্যগ্‌যোনিতে হউক তাহা দুঃখের জন্য হইয়া থাকে, সুখের জন্য নহে। জলের তরলতা, ভূমির কঠিনতা, বায়ুর চঞ্চলতা, এবং অগ্নির উষ্ণতা যেমন-স্বভাব, শরীর ও চিত্তের দুঃখও সেইরূপ-স্বভাব। প্রত্যক্ষভূত বর্ত্তমান অগ্নিকে উষ্ণ দেখিয়া যেমন অতীত ও ভবিষ্যৎ অগ্নিকেও উষ্ণ বলিয়া অনুমান করা যায়, সেইরূপ বর্ত্তমান জন্মের দুঃখ দেখিয়া অতীত ও ভবিষ্যৎ জন্মেরও দুঃখ অনুমান করিতে হয়। যে যে স্থানে নাম ও রূপ আছে, দুঃখ সেই সেই স্থানে থাকে, নাম রূপ ছাড়া দুঃখ কখন থাকে নাই, থাকে না, এবং থাকিবেও না। হে সৌম্য, তৃষ্ণা প্রভৃতি দোষই জন্মের কারণ, অতএব তোমার যদি দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সেই দোষ সমূহকে ছেদন কর। কারণের ক্ষয় হইলেই কার্য্যের ক্ষয় হইতে হয়; এবং তাহা হইলেই—

"দুঃখক্ষয়ো হেতুপরিক্ষয়াচ্চ
শান্তং শিবং সাক্ষিকুরুষ্বধর্ম্মং।
তৃষ্ণাবিরাগং লয়নং নিরোধং
সনাতনং ত্রাণমহার্য্যমার্য্যম্॥
যস্মিন্ন জাতির্ন জরান মৃত্যুর্ন
ব্যাধয়ো নাপ্রিয়সম্প্রয়োগঃ।
নেচ্ছা বিপন্ন প্রিয়বিপ্রয়োগঃ
ক্ষমং পদং নৈষ্ঠিকমচ্যুতংতৎ॥
দীপো যথা নির্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিংগচ্ছতি নান্তরিক্ষং।
দিশং ন কাঞ্চিদ্ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতিশান্তিং॥
এবং কৃতী নির্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষং
দিশং ন কাঞ্চিদ্ বিদিশং
ন কাঞ্চিৎ ক্লেশক্ষয়াৎ কেবল
মেতি শান্তিম্ ১৬-২৬-২৯।

* "অভিজ্ঞা"=ঋদ্ধি বা বিভূতি-জ্ঞান, পূর্ব্বজন্মস্মরণ. পরচিত্তজ্ঞান, দিব্য চক্ষু ও দিব্য কর্ণ। এই কয়টিকে 'পঞ্চ অভিজ্ঞা' বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি ও আস্রবক্ষয় জ্ঞান, এই কয়টির নাম ষট্ অভিজ্ঞা। এই সমস্ত গুণ অর্হতের থাকে, এই জন্য বুদ্ধের অপর নাম 'ষড়ভিজ্ঞ।'

দুঃখের কারণের ক্ষয়ে দুঃখের ক্ষয় হইবে এবং তুমি শান্ত ও শিবস্বরূপ ধর্ম্মকে সাক্ষাৎ করিতে পারিবে। ইহাতে সমস্ত তৃষ্ণার ক্ষয় হয়, রাগদ্বেষাদি সমস্ত ক্লেশের লয় হয়, ও সমস্ত দুঃখের নিরোধ হয়, ইহা সনাতন আর্য্য ও রক্ষা, ইহাকে (কোন স্থান হইতে) সংগ্রহ করিতে হয় না ; ইহাতে জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, ব্যাধি নাই এবং অপ্রিয়ের সহিত সংযোগ ও প্রিয়ের সহিত বিয়োগও নাই ; ইহাতে কোন ইচ্ছা নাই, এবং কোন বিপদও নাই ; ইহা নৈষ্টিক অচ্যুত ও যোগ্য পদ। দীপ নির্ব্বাণ হইলে যেমন তাহা পৃথিবীতেও যায় না, অন্তরীক্ষেও যায় না, এবং কোন দিক্ বা বিদিকেও গমন করে না, পরন্তু তৈল ক্ষয় হওয়ায় কেবল শান্তি প্রাপ্ত হইয়া যায় ; বিচক্ষণ ব্যক্তিও সেইরূপ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে পৃথিবীতেও যায় না, অন্তরীক্ষেও যায় না, এবং কোন দিক্ বা বিদিকেও যায় না, পরন্তু (রাগ দ্বেষ ও মোহ এই তিন) ক্লেশের ক্ষয় হওয়ায় কেবল শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

'এই শান্তিলাভ করিবার জন্য (আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ' নামে) যে পথ আছে, তাহা প্রজ্ঞা, শীল ও প্রশম (সমাধি) এই তিন ভাগে বিভক্ত, যথাবিধি ভাবনা করিয়া এই পথ অনুসরণ পূর্ব্বক চলিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই দুঃখের হেতুভূত দোষসমূহ বিনষ্ট হইলে সেই অনন্ত শিব পদকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ধৃতি, আর্জ্জব, হ্রী, অপ্রমাদ, নির্জ্জনতা, অল্পেচ্ছতা, তুষ্টি, অসঙ্গতা, লোকের (মঙ্গলের জন্য) প্রীতি ও ক্ষমা এই সমস্ত সেই পথেরই সহায়তা করে।

যে ব্যক্তি ব্যাধি, ব্যাধির কারণ ও ব্যাধি-ক্ষয়কে জানে, সে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্যে আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে ; এইরূপ যে ব্যক্তি দুঃখ, দুঃখ-কারণ ও দুঃখ নিরোধকে যথাযথভাবে জানে, সে হিতৈষীমিত্রের সাহায্যে (পূর্ব্বোক্ত) উদার পথ অবলম্বন করিয়া শান্তিলাভ করে।

মস্তক জ্বলিত হইতেছে! বস্ত্রে আগুন ধরিয়া উঠিয়াছে! সত্য তত্ত্ব বুঝিবার জন্য অভিলাষ কর। জগৎ এই সত্যকেই দেখিতে না পাইয়া দগ্ধ হইতেছে, এবং হইবে। এই যে নাম-রূপ-বিশিষ্ট জগৎ দেখা যাইতেছে, যখনই ইহাকে কেহ দর্শন করিবে, তখনই মনে করিতে হইবে যে, ইহার ক্ষয় আছে ; তাহা হইলেই সম্যক্ দর্শন করা হইবে ; সম্যক্ দর্শন হইলে তাহাতে নির্বেদ উপস্থিত হইবে ; তাহার প্রতি যে আনন্দ তাহাও তাহাতে বিনষ্ট হইয়া যাইবে ; আনন্দ বিনষ্ট হইলে তাহার প্রতি আসক্তিও বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এই আনন্দ ও আসক্তি হইতে বিমুক্তি লাভ করিলে চিত্ত বিমুক্ত হয়, এবং তাহা হইলে আর তাহার কোন কর্ত্তব্য থাকে না।

'ক্লেশের উচ্ছেদ করিতে হইবে, এবং তজ্জন্য যে উপায় ও কার্য্য করিতে হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বৎস জাত হইবার পূর্ব্বেই যদি কেহ গাভী দোহন করে, অথবা বৎস জাত হইলেও যদি মোহ-বশত তাহার শৃঙ্গকে দোহন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে যেমন দুগ্ধ লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ যদিও যোগ অবশ্য অনুষ্ঠেয়, তাহা হইলেও অকালে বা অনুপায়ে-অকৌশলে

অনুষ্ঠান করিলে তাহা গুণের জন্য হয় না, বরং অনর্থই উৎপাদন করিয়া থাকে। যত্ন করিলেও আর্দ্র কাষ্ঠ হইতে অগ্নি পাওয়া যায় না, এবং কাষ্ঠ শুষ্ক হইলেও, ফেলিয়া দিলে তাহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয় না। অতএব যথাযথরূপে দেশ, কাল, যোগের মাত্রা ও তাহার কৌশল পরীক্ষা করিয়া, এবং নিজের বলাবল অবধারণ করিয়া প্রযত্ন করিবে, তাহার বিরুদ্ধে কিছু করিবে না।'

অতঃপর চিত্তের কোন্ অবস্থায় মৈত্রী প্রভৃতি ভাবনা করিতে হইবে, কোন্ সময়েই বা করিতে হইবে না, এবং কিরূপেই বা করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সবিস্তার উপদেশ প্রদান করিয়া তিনি পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন—জীবনেচ্ছু ব্যক্তি যেমন ক্ষুধার্থ হইলেও বিষমিশ্রিত অন্ন ভোজন করে না, বিচক্ষণ ব্যক্তিও সেইরূপ দোষাবহ মনে করিয়া অশুভ নিমিত্ত সমূহ পরিত্যাগ করেন। দোষকে যে ব্যক্তি দোষ বলিয়া জানে না, তাহাকে কেহ তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না; অপর পক্ষে যে ব্যক্তি গুণকে গুণ বলিয়া জানে নিষেধ করিলেও সে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। অসৎ বিতর্কসমূহকে নিক্ষেপ করিলেও যদি তাহার লেশমাত্রও থাকিয়া যায় তাহা হইলে সেই সময় অধ্যয়ন প্রভৃতি অপর কোন কার্য্য করিয়া তাহা ভুলিয়া যাইতে হইবে, শয়ন বা শারীরিক পরিশ্রমও করিতে হইবে যেরূপেই হউক, যাহাতে অনর্থ প্রাপ্তি হয়, এরূপ অসৎ নিমিত্তকে কিছুতেই চিন্তা করিবে না। দন্তের উপর দন্ত স্থাপন করিয়া, জিহ্বার দ্বারা তালুর অগ্রভাগকে নিপীড়িত করিয়া, এবং চিত্তেরই দ্বারা চিত্তকে পরিগৃহীত করিয়া তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বনে গমন করিয়া মোহমুক্ত হইয়া লোক সুস্থচিত্ত হয়, তাহার আর মোহ হয় না; ইহাতে কোন আশ্চর্য্য নাই, কিন্তু শুভাশুভ নিমিত্তসমূহে আক্ষিপ্ত হইলেও যাহার চিত্ত ক্ষোভপ্রাপ্ত হয় না, সেই ব্যক্তিই ধীর। অতএব কৌণ্ডিন্য, তিষ্য ও অনুরুদ্ধ প্রভৃতি যেরূপ যোগবিধিতে যেরূপ উৎসাহ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ কর। তাহা হইতেই তাঁহারা যে পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তুমিও তাহা প্রাপ্ত হইবে। দ্রব্যের আস্বাদ কটু হইতে পারে, কিন্তু প্রয়োগ করিলে তাহার পরিণাম মধুর হয়, সেইরূপ পরিশ্রম হেতু বীর্য্য (উৎসাহ) কটু বোধ হয়, কিন্তু অর্থসিদ্ধিতে তাহার পরিণাম মধুর হইয়া থাকে। বীর্য্যই কার্য্যের মূল, বীর্য্য ভিন্ন সিদ্ধি নাই, বীর্য্য হইতেই সমস্ত সম্পৎ উদিত হইয়া থাকে, এবং নির্বীর্য্যতাতেই সমস্ত পাপের উৎপত্তি হয়।

> অনিক্ষিপ্তোৎসাহো যদি খনতি গাং বারি লভতে,
> প্রসক্তং ব্যামথ্নন্ জ্বলনমরণিভ্যাং জনয়তি
> প্রযুক্তা যোগে তু ধ্রুবমুপলভন্তে শ্রমফলং
> দ্রুতং নিত্যং যান্ত্যো গিরিমপি হি ভিন্দন্তি সরিতঃ॥
>
> ১৬.৯৭

উৎসাহ পরিত্যাগ না করিয়া যদি কেহ পৃথিবীকে খনন করে, তাহা হইলে সে বারিলাভ করিয়া থাকে; এবং সংসক্ত অরণিদ্বয় বিঘর্ষিত করিলে অগ্নি উৎপাদন করিতে পারে। যোগবিধিতেও এইরূপ ব্যাপৃত হইলে নিশ্চয়ই শ্রমের ফল লাভ করিতে পারা যায়।

নদীসমূহ প্রতিদিন ধাবিত হইয়া পর্ব্বতকেও ভেদ করিতে পারে!”

১৭

নন্দ এই প্রকারে উপদেশ লাভ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে গুরুকে প্রণামপূর্ব্বক ক্লেশ বিনাশের জন্য বনে গমন করিলেন। সেখানে এক স্বচ্ছোদকা স্রোতস্বতীর তীরদেশে তরু-রাজিশোভিত শস্পদল-সমাবৃত শান্ত স্থান অবলোকন করিয়া তিনি তাহাই পরিগ্রহ করিলেন, এবং সেই তটিনীর সলিলে পাদশৌচ সম্পাদন করিয়া এক পবিত্র বৃক্ষমূলে মুক্তির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া পর্য্যঙ্কবন্ধনে উপবেশন করিলেন, এবং প্রযত হইয়া যথাযথভাবে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমত তাঁহার চিত্তে কামবুদ্ধি উদিত হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি তখনই তাহা দূরে ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। অকুশল বিতর্কসমূহ আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তিনিও তাহাদের বিনাশের জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করিলেন। রাজা যেমন নগর নির্ম্মাণ করিয়া, দণ্ড বিধান করিয়া, মিত্রসমূহ সংগ্রহ করিয়া ও শত্রুসমূহকে পীড়ন করিয়া অপূর্ব্ব পৃথিবীকে লাভ করিতে পারে, যোগীরও সেইরূপ সমস্ত হইয়া থাকে; মন তাহার নগর, জ্ঞানবিধি দণ্ড, গুণসমূহ মিত্র, দোষসমূহ শত্রু, এবং বিমুক্তি তাহার পৃথিবী। তিনি ক্রমশ শান্ত হইতে লাগিলেন, এবং মনকে সংযত করিয়া ফেলিলেন। তিনি তখন সারতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছায় সংসারের সরূপ অরূপ সমস্ত পদার্থকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন তিনি দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলেন তাহা অশুচি তাহা অনিত্য; অতএব তাহা দুঃখপ্রদ —দুঃখ; এবং এই জন্যই তাহা তাঁহার আত্মা নহে; তিনি তাহা নহেন, তাহা অনাত্মা। তাহার কোন আত্মা বা স্বভাব নাই; তাহা নিরাত্মক, নিঃস্বভাব। তিনি আর্য্য পথে বিচরণ করিয়া এইরূপে সমস্তকেই অনিত্য দুঃখ, অনাত্মা ও শূন্য বলিয়া স্থির করিতে লাগিলেন, এবং বিশুদ্ধশীল-ব্রতরূপ বাহনে অধিরূঢ় হইয়া, স্মৃতিরূপ বর্ম্ম বন্ধন করিয়া ও সতর্কতারূপ চাপ গ্রহণ করিয়া চিত্তরূপ সংগ্রামক্ষেত্রে ক্লেশ শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সজ্জিত হইলেন। বোধি-লাভের কারণস্বরূপ অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োগে তিনি ক্লেশচমূকে শনৈঃ শনৈঃ ক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহার চতুর্বিধ আর্য্য সত্যে বিস্পষ্ট জ্ঞানের উদয় হইল, সন্দেহ নিবৃত্ত হইয়া গেল, কুমতজাল অপগত হইল, এবং-জ্ঞান-জনিত প্রীতির অনুভব হইতে লাগিল। গুরুর প্রতি তাঁহার চিত্তের প্রসাদ আরও বাড়িয়া উঠিল। শুভাবহ উপদেশে রোগমুক্ত হইলে রোগী যেমন চিকিৎসকের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া এবং তাঁহার মৈত্রী ও শাস্ত্রজ্ঞতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করে, তিনিও সেইরূপ গুরুর মৈত্রী ও সর্ব্বজ্ঞতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। কোন বিষয়ে কাম বা রাগ উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে শুভ ভাবনা দ্বারা বিনষ্ট করিলেন; কাহারো প্রতি দ্বেষ উৎপন্ন হইলে মৈত্রী ভাবনা দ্বারা তাহা নিরস্ত করিলেন। অনন্তর তিনি যোগাভ্যাস করিতে করিতে উত্তরোত্তর উচ্চতর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যান আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। প্রথম ধ্যানে

ধ্যানকারীর ধ্যেয় বস্তু সম্বন্ধে বিতর্ক, বিচার, প্রীতি ও সুখ এই সমস্তই থাকে; দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্ক ও বিচারের লোপ হইয়া যায়, কেবল প্রীতি ও সুখ থাকে; তৃতীয় ধ্যানে কেবল সুখানুভব মাত্র থাকে, এবং চতুর্থ ধ্যানে সুখ-দুঃখ কিছুরই অনুভব থাকে না। এইরূপে তাঁহার সমস্ত বন্ধন অপগত হইল, তিনি অর্হত্বলাভ করিলেন; সমস্ত ভয়-শোক অপগত হইল। তাঁহাকে তখন অপর এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি তখন তাঁহার সেই অগ্রজ ও উপদেশকের উপদেশেই যে ঐ অবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছেন তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলেন, এবং ভাবিলেন :—

'আমার কিছু প্রিয় বা অপ্রিয় নাই, আমার কোন বিরোধ বা অনুরোধ নাই। শীতাতপ হইতে মুক্ত হওয়ার ন্যায় আমি ঐ উভয় হইতেই সদ্য মুক্ত হইয়াছি। কোন মহাভয় হইতে মঙ্গলকে, মহাবন্ধন হইতে বিমুক্তিকে ভীষণ অন্ধকার হইতে আলোককে, অথবা রোগ হইতে আরোগ্যকে কিংবা দুর্ভিক্ষ হইতে সুভিক্ষকে লাভ করিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ যে বুদ্ধের প্রভাবে আমি পরম শান্তিকে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি!'

১৮

অনন্তর

"কষায়বাসাঃ কনকাবদাতস্ততঃ স মূর্দ্ধা
গুরবে প্রণেমে।
বাতেরিতঃ পল্লবতাম্ররাগ পুষ্পোজ্জলন-
শ্রীরিব কর্ণিকারঃ ॥"
১৮-১।

পবন-সঞ্চালিত পল্লবলোহিত পুষ্পোজ্জল কর্ণিকার দ্রুমের ন্যায় কাষায়বসনধারী কনকগৌর নন্দ মস্তক অবনত করিয়া গুরুকে প্রণাম করিলেন, এবং কার্য্য সিদ্ধির কথা নিবেদন করিয়া কহিলেন—'ভগবন্ আপনি আমার হৃদয়ের শল্যকে উৎপাটন করিয়াছেন, আমার সমস্ত সংশয় অপগত হইয়াছে আপনার অনুশাসনে আমি সৎপথে আগমন করিয়াছি। আমি দর্পনিবন্ধন পূর্ব্বে যে কামবিষ পান করিয়াছিলাম, আপনি আপনার বচন ঔষধ দ্বারা তাহা বিনষ্ট করিয়াছেন। আমার জন্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা কর্ত্তব্য ছিল তাহা করা হইয়াছে; আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি।' নন্দ এইরূপে নিজের তাৎকালিক অবস্থা নিবেদন করিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

মুনি তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন 'বৎস তুমি উত্থিত হও, প্রণাম করিবার প্রয়োজন নাই। এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে আমায় যেরূপ প্রণাম করা হয়, অর্চ্চনা করিলে সেরূপ নহে। আজ তুমি পরম শৌচপ্রাপ্ত হইয়াছ, আজ তোমার শরীর, মন ও বাক্য পবিত্র। তোমার গর্ভশয্যা অপগত হইয়াছে। হে আর্য্যবৃত্ত, অদ্য তোমার শাস্ত্রজ্ঞান যথার্থ হইয়াছে। মারসেনাকে পরাভব করিয়া অদ্য তুমি যথার্থ রণশাস্ত্রশূর হইয়াছ। উত্থিত রাগাগ্নিকে নির্ব্বাপিত করায় অদ্য তুমি বিগতদাহ হইয়া সুখে শয়ন করিতে পারিবে। পূর্ব্বে তুমি চিত্তমদে উন্মত্ত হইয়াছিলে, কিন্তু আজ তৃষ্ণার বিরাম হওয়ায় তুমি যথার্থ সমৃদ্ধ হইয়াছ। অদ্য তুমি যথার্থভাবে বলিতে পার যে, নরপতি শুদ্ধোদন তোমার

পিতা। পূর্ব্বে আমার অভিলাষ ছিল যে, কবে আমি নন্দকে অরণ্যচারী ভিক্ষাব্রত দর্শন করিব; অদ্য আমার সেই অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। 'আমার যেন দুঃখ না হয়, আমার যেন সুখই হয়' এই মনে করিয়া, লোকসমূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু সুখ-দুঃখ কি তাহা তাহারা যথাযথরূপে জানে না। তুমি আজ সেই তত্ত্ব লাভ করিয়াছ।'

নন্দ তাঁহার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া স্তুতিনিন্দা-নিরপেক্ষ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন :—ভগবন্, আপনি আমার প্রতি বিশেষভাবে অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছেন,' আমি কামপঙ্কে নিমগ্ন ছিলাম, আপনার অনুকম্পাতেই এখন আমি নিষ্কাম হইয়া সংসার ভয় হইতে রক্ষালাভ করিয়াছি। আমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, দোষসমূহকে নিবৃত্ত করিয়া, এবং শান্তিকে প্রাপ্ত হইয়া এখন সেই পূর্ব্ব আশ্রম বা সেই স্ত্রী, অথবা সেই অপ্সরাকে মনে করিতেছি না। যেমন পরম উপাদেয় হইলেও সুধাপায়ী দেবগণের অন্নের দিকে চিত্ত গমন করে না, আমারও সেইরূপ এই শান্তি সুখ ভোগ করিয়া কামসুখের দিকে অভিলাষ হয় না। দুর্ব্বুদ্ধি যেমন রত্নাকর সমুদ্রে আগমন করিয়া রত্নসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসৎ মণিসমূহ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়, লোকেও সেইরূপ উত্তম বোধি-সুখ পরিত্যাগ করিয়া কামসুখের জন্য পরিশ্রম করিয়া থাকে। ভগবন্, জীবের প্রতি আপনার অদ্ভুত অনুকম্পা; আপনি ধ্যানসুখ পরিত্যাগ করিয়া অন্যের দুঃখ শান্তির জন্য কষ্ট করিয়া থাকেন। আপনি আমাকে যে করুণা করিয়াছেন, তাহার পরিবর্ত্তে আমি কি করিতে পারি। ঊর্মিমালা-সঙ্কুলিত মহার্ণবগত নৌকার ন্যায় আপনি আমাকে ভবার্ণব হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

নন্দের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীঘন (বুদ্ধ) বলিতে আরম্ভ করিলেন—সৌম্য, মহাবণিক্ কোন মার্গ-উপদেশকের উপদেশ অনুসারে ধনরত্নসহ কান্তার অতিক্রম করিলে যেরূপ সেই মার্গ-উপদেশকের কার্য্য উল্লেখ করিয়া থাকে, তুমিও সেইরূপ করিতেছ। তোমার চিত্ত রজ ও তম হইতে বিমুক্ত হইয়াছে; এ কৃতজ্ঞতা তোমার অনুরূপ। আমার প্রতি তোমার প্রসন্নভাব দেখিয়া আবার তোমাকে কিছু বলিবার জন্য ইচ্ছা করিতেছি। তুমি কৃতকার্য্য হইয়াছ, তোমার অপর কোন অণুমাত্রও করণীয় নাই। অতএব হে সৌম্য, তুমি এখন হইতে দুঃখ-পতিত লোকগণকে উদ্ধার করিয়া পরিভ্রমণ কর। জীবেরা অন্ধকারের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তুমি তাহাদের নিকট দীপ জ্বালিয়া ধারণ কর। সকলে তোমার ধর্ম্ম উপদেশ শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করুক, এবং লোকেরা তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলুক যে, 'যে পূর্ব্বে সংসার-ভোগাসক্ত ছিল সে এখন একি আশ্চর্য্য করিতেছে!' আমাদের বধূও তোমার এই সমস্ত ভাব জানিতে পারিয়া তোমারই অনুসরণ করিবে, এবং স্ত্রীজনমণ্ডলে বৈরাগ্যকথার প্রচার করিবে।'

নন্দ পরম কারুণিক গুরুর আদেশ ও চরণ যুগল মস্তকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রশান্তহৃদয়ে গমন করিলেন, এবং সেই আদেশ প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

রামায়ণে লোকশিক্ষা

(১)

বাল্মীকির ভারতবর্ষ

যে সময় এই বর্ত্তমান সুজলা সুফলা ভারত-ভূমিতে আর্য্যগণের পরিমার্জ্জিত সভ্যতা সম্যকরূপে বিস্তার লাভ করে নাই; যখন আর্য্য ও অনার্য্য সংঘর্ষণে মহাযুদ্ধাদি সংঘটিত হইত, সেই সময় মহামুনি বাল্মীকি তদীয় রামায়ণ মহাগ্রন্থে সমাজধর্ম্মের সমুজ্জল প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া জনসাধারণের বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি, স্বীয় প্রতিভাবলে, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্মনীতি, ও সমাজ-নীতি প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করিয়া লোকশিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। রামায়ণে রাজা সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের প্রতিনিধি-স্বরূপ, প্রকৃতি-পুঞ্জের রক্ষাকর্ত্তা ও সুখশান্তির বিধাতা। বাস্তবিক মহাত্মা মনু বলিয়াছেন, "জগৎ রাজশূন্য হইলে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল লোক সবল লোকের ভয়ে সর্ব্বদা বিচলিত হইয়া থাকে; সেই জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা সমগ্র চরাচর রক্ষার জন্য ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ এই অষ্ট দিকপালের সারাংশ গ্রহণ করতঃ রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন। রাজা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিবেন; দস্যুতস্কর ও নানা প্রকার অশান্তি দূর করতঃ রাষ্ট্রের শান্তিবিধানে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবেন।

মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি, কোশলরাজ মহানুভব দশরথের রাষ্ট্রশাসন প্রণালী সুনিপুণ ভাবে স্বীয় মহাকাব্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা হইতে আমরা অবগত হই :—

তিনি স্বীয় প্রতাপ অপ্রতিহত রাখিবার জন্য যথেচ্ছভাবে কোন কার্য্যই সম্পন্ন করিতেন না। তাঁহার ইঙ্গিতজ্ঞ হিতকারী আট জন অমাত্য ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদা শুচিসংযতচিত্ত এবং রাষ্ট্রকার্য্যে নিপুণ ছিলেন। ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও অর্থবিৎ সুমন্ত্র এই আটটি প্রধান অমাত্য ছিলেন। বশিষ্ঠ ও বামদেব রাজার প্রধান কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। ইহা ব্যতীত অন্যান্য ঋষিগণের পরামর্শানুসারে রাষ্ট্রকার্য্য নির্ব্বাহ হইত। কার্য্যনির্ব্বাহক মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গ যথেষ্ট পরিমাণে তেজঃসম্পন্ন ও ক্ষমাশীল ছিলেন। ক্রোধ বা দুরভিসন্ধির বশীভূত ইহাঁরা মিথ্যা কথা কিম্বা প্রবঞ্চনা করিতেন না। ইহারা ব্যবহার-কার্য্যে নিপুণ ছিলেন। এই সকল মন্ত্রিগণ দোষীর বলাবল বিবেচনা করতঃ দণ্ডপ্রদান করিতেন। রাষ্ট্রের কোষবৃদ্ধি ও সৈন্য-সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যে ইহাঁদের বিলক্ষণ পটুত্ব ছিল। নিরপরাধ শত্রুর প্রতি হিংসা প্রকাশ করা অতিশয় ঘৃণার বিষয় ছিল। এই সকল অমাত্যবর্গ সকলেই নির্ম্মলবুদ্ধি ও এক-মতাবলম্বী ছিলেন। স্বরাষ্ট্রে কিম্বা পর-রাষ্ট্রে তাঁহাদের যশোমহিমা ঘোষিত হইত এবং বুদ্ধিমান বলিয়া সর্ব্বত্র প্রথিত ছিলেন। ইহাঁরা সন্ধিবিগ্রহ কার্য্যে নিপুণ এবং প্রকৃত সৌহৃদ্যের আস্পদ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। মহাত্মা দশরথ ঈদৃশ নীতিপরায়ণ ও গুণবান

অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পৃথিবী শাসন করিতেন। তিনি দূত কর্ত্তৃক পরতত্ত্ব বিদিত হইয়া ন্যায়ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন করিতেন। তাঁহার রাজ্যে অধর্ম্মের লেশ মাত্র প্রবেশ করিতে পারিত না।

আমরা আরও দেখিতে পাই, "ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা উন্নতিশীল ছিল এবং ভারতের স্বাধীন রাজন্যবর্গ স্বীয় স্বীয় প্রকৃতি-পুঞ্জের শিক্ষা, ধর্ম্ম ও সামাজিক কর্ম্মের প্রথা প্রভৃতি সংস্কার করিবার নিমিত্ত আন্দোলন করিতেন। সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনের উন্নতিই সমস্ত রাজগণের প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল। সর্ব্বপ্রকার রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে রাজা এবং রাজামাত্য সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন। এতদ্ভিন্ন সমাজের, জাতির ও ব্যক্তিমাত্রেরই মঙ্গল কামনায় তাঁহাদের শক্তি প্রযুক্ত হইত। যখন মাংসলোলুপ কানন- কিম্বা পর্ব্বত-নিবাসী অসভ্য অনার্য্যগণ মুনিদিগের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইত, সেই সময় রাজা স্বয়ং ধনুহস্তে রক্ষা করিতেন। রাজা রাষ্ট্রের শান্তি ও ধর্ম্মকার্য্য রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রয়াসী ছিলেন। ধর্ম্মের আন্দোলনে ও সামাজিক ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ শক্তি-ক্রমে কাজ করিবার অবসর দেওয়া হইত। ব্যক্তিত্ববিকাশ ও স্বাতন্ত্র্যোপলব্ধি ব্যক্তি-মাত্রেরই বিশেষ লক্ষ্য ছিল। পার্থিব জীবনের বিচিত্র মতভেদ, অনৈক্য, প্রভৃতির অবতারণা দ্বারা মহামুনি, প্রকৃত সত্যের ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন। প্রকৃত ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী পতন ইত্যাদি মহাতত্ত্বের প্রচার করিয়া তিনি জগতের আদর্শ শিক্ষকের কার্য্য পূর্ণমাত্রায় সফল করিয়াছেন।

এইরূপে পুণ্যাত্মা বাল্মীকি তদীয় হৃদয়ের স্বর্গীয় মহত্ত্ব, রামায়ণরূপ মহামুকুরে প্রতি-ফলিত করিয়া জনসাধারণের হৃদয়ে অজস্র শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছেন। অপিচ, তিনি এই গ্রন্থে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব, রাজ্যশাসনপ্রণালী, স্বদেশ-প্রেম প্রভৃতি ও তৎসাময়িক ইতিবৃত্তসমূহ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিবার জন্য প্রথম উদ্যোগী হইয়াছিলেন। যে সময় এদেশ কুসংস্কারাপন্ন ছিল, যে সময় সাধারণ লোক শিক্ষার কোন প্রকৃষ্ট উপায় ছিল না; সেই সময় এই চরিত্রব্রত মহাত্মা বাল্মীকি সাধারণের মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিবার জন্য ধর্ম্মার্থযুক্ত ও লোকহিতকর এই মহাকাব্যের অবতারণা করিয়া জনসাধারণের ভক্তিভাজন হইয়াছেন।

মহামুনি বাল্মীকি তদীয় মহাকাব্যে সর্ব্ব-প্রকার ধর্ম্ম ও স্বার্থত্যাগের নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি কাব্য-খানিকে তৎসাময়িক প্রসিদ্ধ কোশল রাজ্যের অধীশ্বর দশরথ ও রামচন্দ্রের জীবনী এবং দেশের রীতি-নীতি প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপাদানে গঠিত করিয়াছেন। তিনি ভাবিয়া-ছিলেন, ইতিহাস সমাজের সকল অবস্থান্তরের মধ্যে ভগবানের অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া থাকে, এবং ইতিহাস অতীত ঘটনাবলী বক্ষে ধারণ করিয়া ঐশী শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। এই ইতিহাস সাম্রাজ্যের উন্নতি-অবনতির বিবরণের সহিত জগতের মহাসত্যের ক্রমবিকাশ মানব চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া দেয়। এই ইতিহাস কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য

নির্দ্ধারণ করতঃ মানবকে, ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে শক্তি প্রদান করে এবং ভগবানের সহিত মানুষের নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করে; ফলতঃ মানুষ বিশ্বনিয়ন্তার অভিলাষের সহিত একমত হইয়া দেশের ও সমাজের মঙ্গলজনক কার্য্যাবলীতে সহায়তা করিতে সক্ষম হয়। অতএব তিনি ইতিহাসকে ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া মানবের অন্তর্জগতের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম প্রভৃতির উল্লেখের সহিত বাহ্যজগতের ইতিবৃত্ত বর্ণনায় ত্রুটী করেন নাই। জনসাধারণ বহু শতাব্দী হইতে জ্ঞান-চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থের সার্থকতা উপলব্ধি করিতেছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিবে।

কে বলে প্রাচীন ও পৌরাণিক ভারতের ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ পরশুরামের একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়করণ, রামচন্দ্র ও অর্জ্জুনের দিগ্বিজয় প্রভৃতি কাহিনী উৎকট বা অলৌকিক কল্পনায় উপন্যাসের অঙ্গীভূত করিয়াছেন? কে বলে ভারতের ইতিবৃত্ত নাই? আমরা দেখিতে পাই, মহামুনি বাল্মীকি মহারাজা দশরথ ও রামচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত ধারাবাহিক ক্রমে লিপিবদ্ধ করিয়া, ভারতের পৌরাণিক জ্ঞান, শিক্ষা, ধর্ম্মভাব, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি অক্ষুণ্ণ না হউক, সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। যাহা পাঠ করিলে, মানবমাত্রই ইহলোক বিস্মৃত হইয়া 'দেব চরিত পাঠ করিতেছে', এরূপ মনে ভাবিয়া ভক্তিতে ও বিস্ময়ে পরিপ্লুত হইয়া থাকে; যাহা পাঠ করিলে ভারতবাসী আপনাকে দেব পরিবারের একজন মনে করিতে থাকে; যাহা পাঠ করিলে পাঠকের মনে পবিত্রতা, আনন্দ ও বিস্ময়ের যুগপৎ উদয় হয়, যাহা পাঠ করিলে 'প্রকৃত ঘটনার অভিনয় দেখিতেছি' মনে হয়, যাহাতে অবিশ্বাস ও অলৌকিকতার আভাস পর্য্যন্ত মনে উদয় হয় না, তাহা প্রাণহীন কল্পনা মনে করা কোন মতে যুক্তিযুক্ত মনে করিতে পারি না। আমরা বলিব বাল্মীকির গ্রন্থ ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র,—নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান সহায়।

আমরা দেখিতে পাই রাজ্য বিধ্বস্ত হয়, অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু চিন্তা অবিনশ্বর। মহামুনি বাল্মীকি বুঝিয়াছিলেন—অতীত ঘটনা পাঠ করিলে মানবের সচ্চিন্তা ও স্বদেশানুরাগ বর্দ্ধিত হয়। তাই তিনি রামায়ণে ঐতিহাসিক বর্ণনায় মানবীয় শক্তিসমূহ উদ্বোধনের উপযোগী আদর্শ, জলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই মহাকাব্যখানিতে বাল্মীকি অতিশয় সুন্দর ভাবে তৎকালীন সভ্য ও অসভ্য দেশ সমূহের ভৌগোলিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি সীতান্বেষণে নিযুক্ত বানরমণ্ডলীকে, রামচন্দ্রের প্রিয়-সুহৃদ সুগ্রীব উপদেশচ্ছলে সমস্ত ভারত কেন?—ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের, পাহাড় পর্ব্বত, বিল ঝীল, নদনদী, বন বনান্তরের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বানরদিগকে বলিয়াছিলেন "তোমরা সহস্র শিখরযুক্ত, বিবিধ পুষ্পশোভিত তরুলতাপরিপূর্ণ বিন্ধ্য-পর্ব্বত, মহাভুজঙ্গমগণ-নিষেবিত মনোহর নর্ম্মদা, গোদাবরী, কৃষ্ণা নদী, মেকল উৎকল, দশার্ণদেশীয় নগর সকল, আব্রবন্তী, অবন্তী, বিদর্ভ, ঋষ্টিক, মাহিষ্টক, প্রভৃতি দেশ দেখিতে পাইবে।" অন্যত্র দেখিতে পাই "তুরকী,

জাপান, জটাপুর, অবন্তী, অঙ্গলেপাপুরীদ্বয় ও আলক্ষিত বন সকল বিশাল রাজ্য ও বিশাল বাণিজ্যস্থান দর্শন করিবে। তথায় সিন্ধুনদ ও সাগরসঙ্গমস্থলে শতশৃঙ্গশালী সোমগিরি নামে এক মহান পর্ব্বত আছে। তথায় রম্যপ্রস্থ দেশে সিংহ নামক পক্ষসমূহ বাস করে, তাহারা তিমি মৎস্য ও হাতী সকলকে নখে ধারণ-পূর্ব্বক আপন নীড়ে তুলিয়া ভক্ষণ করে।" ইত্যাদি দেশ বর্ণনায়ও বাল্মীকি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ভারতবর্ষের দক্ষিণ-দিকস্থিত লঙ্কাদ্বীপের বিষয় বর্ণনা করিতে যাইয়া দিগ্বিজয়ী রাবণের বংশের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিতে ক্রুটী করেন নাই। কিন্তু সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময়ে মহাকবি কাব্যের প্রাণ সজীব রাখিয়াছেন। অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী কবিবর বাল্মীকিই কবিতার প্রথম স্রষ্টা, তিনি করুণ-রসের এক অবতারস্বরূপ ছিলেন। পক্ষান্তরে তাঁহার রচিত কাব্যখানি জাগতিক ইতি-হাসেরও এক প্রসিদ্ধ পর্ব্ব স্বরূপ। তাঁহার অভ্যুদয়ে সাহিত্য-জগতে এক অলৌকিক সৌন্দর্য্যের প্রচার হইয়াছে।

মহামুনি বাল্মীকি স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি তাঁহার কাব্যে প্রতিভাবলে, প্রাণ বিনিময়ে কি রূপে স্বদেশ রক্ষা করিতে হয়, তাহা চিত্রিত করিয়া প্রাচীন ভারতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লঙ্কার গৌরব রক্ষার জন্য, লঙ্কার বীরগণের আত্মবিসর্জ্জন রূপ মহাব্রত সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বদেশ রক্ষার জন্য লঙ্কার বীরগণ কেমন দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছিলেন!

যে বাল্মীকি স্বদেশ-প্রেমে, বীর পরাক্রমে পরিপূর্ণ ছিলেন, যে বাল্মীকি অপত্য স্নেহ, দাম্পত্য প্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, ধর্ম্মনিষ্ঠার অনন্ত প্রস্রবণ; যে বাল্মীকি ত্যাগস্বীকারের অদ্বিতীয় প্রথম উপদেষ্টা, যে বাল্মীকি হৃদয় ভগবদ্ভক্তি ও বীরত্বের ধীরত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার, তাঁহার সর্ব্বতোমুখিনী প্রতিভার কথঞ্চিৎ আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

(২)

হনুমান চরিত

বাল্মীকির হৃদয় কিরূপ গভীর ও উন্নত প্রেমের উৎস; এবং নিষ্কাম কর্ত্তব্যবুদ্ধি কিরূপে অহেতুকী ভক্তির পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, তাহাই যেন সুস্পষ্টভাবে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য, মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি, সুনির্ম্মল ভক্তির তুলিতে অনার্য্য হনুমানের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অনার্য্যজাতির অকর্ষিত অনুর্ব্বর হৃদয়ে ভক্তিকুসুম প্রস্ফুটিত করাইয়া মহামুনি ভগবদ্দাস্যভাব ও অহেতুকী ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। বাল্মীকি-রচিত হনুমান যেমন ভাবে তদ্গত তেমনই কার্য্যে তৎপর। প্রভুর কার্য্য সম্পাদনে স্বীয় দেহ মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রণে, বনে, পর্ব্বতে, সাগরে প্রত্যেক কার্য্যে হনুমানের অত্যাশ্চর্য্য পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি হনুমান সুগ্রীবের কেবল আজ্ঞা-বাহক ভৃত্য নহেন, রাষ্ট্র ও সমাজনীতিজ্ঞ সচিব ও নিঃস্বার্থ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন।

কপিরাজ বালির ভয়ে ত্রাসিত হইয়া সুগ্রীব যখন উন্নত গিরিশৃঙ্গ, উত্তাল তরঙ্গ-পরিপূর্ণ সাগরস্থিত দ্বীপসমূহে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন; নিরাশ হৃদয়ে, ক্ষুৎপিপাসা-পরিম্লান চিত্তে যখন তিনি সহচর হনুমানের

প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেন, তখনই তিনি হনুমানকে হিমাদ্রির ন্যায় অচল অটল দেখিতেন। হনুমানের বীরত্বব্যঞ্জক মুখমণ্ডলে ক্ষণকালের জন্যও নৈরাশ্যের কালিমা লক্ষিত হয় নাই। সর্ব্বকার্য্যপারদর্শী হনুমানই প্রথমতঃ রামলক্ষণের নিকট উপস্থিত হইয়া সখ্যস্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

হনুমান স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। বিপৎকালে ধৈর্য্য ও তেজ তাঁহার সহ-চর ছিল। যখন সীতান্বেষণে অঙ্গদ-প্রমুখ কপিসেনাগণ বহির্গত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে সীতার সন্ধান পাইল না, নিতান্ত ভগ্নহৃদয়ে সুগ্রীবের প্রাণদণ্ডের ভয়ে ত্রাসিত হইয়াছিল,— যখন অঙ্গদ সমুদয় বানরগণকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন এবং ফলমূলপরিপূর্ণ রম্য পর্ব্বত-উপত্যকায় বাস করিতে বানরবৃন্দকে সম্মত করিয়া-ছিলেন; সেই সময় সূক্ষ্মদর্শী হনুমান নিঃশঙ্ক-ভাবে বলিয়াছিলেন—"যুবরাজ, আমি স্থির-চিত্তে বলিতেছি আপনাদের এরূপ সংকল্প পরিত্যাগ করুন। যে স্থান আপনারা নিরাপদ ও সুগ্রীবের অগম্য বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহা রামানুজ লক্ষণের নিকট অতিশয় সুগম ও অকিঞ্চিৎকর সন্দেহ নাই। এইরূপ আত্মকলহ কেবল স্বজাতিধ্বংসের মূলীভূত কারণ মাত্র। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবানের সহিত বিবাদ করিয়া কখনও সুখে থাকিতে পারে না। অতএব আসুন আমরা পুনরায় সীতা অন্বেষণে বহির্গত হই, প্রভুর আদিষ্ট কার্য্যের সফলতায় যত্নবান হই, পরম পিতা পরমেশ্বরই আমাদিগকে সহায়তা করিবেন। আর যদি প্রভুর আদেশ প্রতিপালনে ত্রুটীপূর্ব্বক নিশ্চেষ্টভাবে পর্ব্বতগুহায় অবস্থান করেন, তাহা হইলে জানিবেন রাজাজ্ঞা অবহেলারূপ পাপের দণ্ড অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।" এইরূপ সদ্বাক্য দ্বারা হনুমান উত্তেজিত ও পরিশ্রান্ত বানরমণ্ডলীকে পুনরায় কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত করাইলেন। হনুমান এইরূপে স্বীয় প্রভুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ব্যক্তিদিগকে কৌশলে সদুপদেশ দ্বারা কর্ত্তব্য পথে আনয়ন করিতেন।

হনুমান প্রভুর বিপদে স্থিরভাবে কর্ত্তব্য বুদ্ধির উদ্দীপন করিয়া দিতেন। সুগ্রীব রাজা-সন গ্রহণ করিলে পর, যখন বিলাসের উপ-ভোগে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখনও এই কর্ম্মবীর হনুমান প্রভুর হিতসাধনার্থ লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। বর্ষা অতিবাহিত হইতে না হইতেই প্রভুভক্ত হনুমান রামচন্দ্রের সহিত প্রভুর প্রতিশ্রুতির বিষয় মনে করিয়া দিয়া-ছিলেন এবং সমগ্র বানর সেনাদিগকে রাম-কার্য্য সম্পাদনার্থ একত্রিত করিয়া-ছিলেন। কিষ্কিন্ধ্যার বিলাসহিল্লোল বীরবর হনুমানের চক্ষু মুহূর্ত্তের জন্য আচ্ছন্ন করে নাই।

কর্ত্তব্যব্রতপালনকারী হনুমান গুণগ্রাহী রামচন্দ্রের প্রথম দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিলেন, সুতরাং শ্রীরামের অভিজ্ঞানরূপ অঙ্গুরী, রামচন্দ্র হনুমানের হস্তে দিয়া বলিয়াছিলেন, "হনুমান নিশ্চয়ই এই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবে।"

যখন সীতা অন্বেষণে আদিষ্ট সৈন্যগণ বহু-স্থান পর্য্যটন করিয়াও সীতার অনুসন্ধান করিতে পারিল না; কঠোর পার্ব্বত্যদেশ

পরিভ্রমণ করতঃ তরঙ্গময়ী বারিধির সৈকত-দেশে দণ্ডায়মান হইয়া ভয় বিহ্বল হৃদয়ে আত্মহত্যারূপ মহাপাপের সহায়তায় অগ্রসর হইয়াছিল; যখন সম্পাতির নিকট সীতার লঙ্কায় অবস্থান সংবাদ বিদিত হইয়া অনন্ত মহাসমুদ্রের ফেনিল তরঙ্গ দেখিতে দেখিতে তাহারা ভীত হইয়া পড়িল; কেমন করিয়া এই অসীম জলধি অতিক্রম করতঃ সীতান্বেষণে লঙ্কায় প্রবেশ করিবে; এইরূপে চিন্তা করিয়া যখন সেনাপতিগণ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন এই প্রভুভক্ত হনুমান বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া, অনন্ত জলরাশির গভীর কল্লোল ও ফেনিল তরঙ্গরাশির ভৈরব আবর্ত্তনের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘনে প্রস্তুত হইলেন। কর্ত্তব্যপালনরূপ মহাব্রতধারী হনুমান ভগবৎ প্রসাদ লাভ করতঃ সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হইলেন।

রাক্ষস রক্ষিত দুর্গম লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইয়াই পর্ব্বতশৃঙ্গস্থিত ও দুর্গাদির দ্বারা সংরক্ষিত রক্ষরাজধানীর দুর্গম ভূমি অবলোকনে হনুমান দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে ইহাই ভাবিয়াছিলেন যে, "যে লঙ্কা দেবগণেরও অগম্য, এই স্থানে রামচন্দ্র উপস্থিত হইয়া কিরূপে সীতা উদ্ধার করিবেন?"

অধ্যবসায়শীল হনুমান লঙ্কার সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী দেখিয়া ভাবিলেন: সীতা নিশ্চয় কোন রম্য অট্টালিকায় বাস করিবেন। ইহা মনে করিয়া হনুমান রাত্রিযোগে অতিশয় সন্তর্পণে রাবণের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন— রক্ষরাজ রাবণ উজ্জ্বল মণিমুক্তাখচিত বিচিত্র খট্টায় প্রসুপ্ত। হনুমান রাবণমূর্ত্তি দেখিবা মাত্রই কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। দিগ্বিজয়ী বিরাট মূর্ত্তি দর্শনে হনুমানের নির্ভীক হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার অদ্বিতীয় কর্ত্তব্য-বুদ্ধি তাহার প্রভু-আজ্ঞা পালনে উত্তেজিত করিয়াছিল।

সুবিজ্ঞ সচিব কিরূপ কৌশলে রাজ-আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে, বাল্মীকি হনুমানের চরিত্রে তাহাই পরিষ্কার ভাবে দেখাইয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি হনুমান ছদ্মবেশে রাত্রিকালে লঙ্কার রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে সীতার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রতিমুহূর্ত্তে এক একটি স্বর্ণ-প্রতিমার তুল্য নিরুপমা ললনা দেখিয়া, এই কি সীতা? এইরূপ মনে করিয়া যেই আনন্দে শ্রীরামের বার্ত্তা জানাইবেন মনে করিলেন, অমনি রমণীবৃন্দের বিলাসভোগ দর্শন করিয়া মনে ভাবিলেন পতিবিরহিতা সাধ্বী রমণী এরূপ স্থিরভাবে নিদ্রিত থাকিতে পারে না, অতএব ইহার মধ্যে সেই রঘুকুললক্ষ্মী সীতাদেবী নাই। ক্রমে ক্রমে হনুমান রাবণের সমস্ত পুরী অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন কোথায়ও সীতা নাই। হনুমান তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। হায় সীতা দেবী কি রাবণকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছেন বলিয়া আশ্রয়চ্যুত লতিকার ন্যায় রথ হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন? অথবা দুরাত্মা রাবণের অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আত্মহত্যা করিয়া সতীত্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন? যে সকল বানরবাহিনী হনুমানের মুখে সীতার সংবাদ শুনিবার জন্য অম্বুনিধির সৈকত ভূমিতে উৎকণ্ঠিত অবস্থায় অবস্থান করিতেছে, তাহাদের নিকট তিনি

কি বলিবেন ? যতই দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, ততই হনুমানের মনে নৈরাশ্যের মলিন ছায়া আসিয়া পতিত হইতে লাগিল। হনুমান নিতান্ত উৎকণ্ঠা-পূরিত-হৃদয়ে বন হইতে বনান্তরে সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, অধ্যবসায়ের চিরসহচরী আশা যেন ক্রমে তাহার হৃদয়ে স্থানাধিকার করিতে লাগিল, আবার যেন পরক্ষণেই "সীতা নাই" এরূপ ভাব মনে উদিত হইয়া হনুমানের হৃদয় অবসন্ন হইতে লাগিল। তিনি ক্ষণে ক্ষণে মনে করিতে লাগিলেন "রাবণই সীতাকে বধ করিয়াছে, অতএব রাবণকে বধ করিয়া তাহার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিব।" আবার ভাবিলেন "যদি সীতাকেই না পাই ; তাহা হইলে জীবন রাখিব না, চিতারোহণে প্রাণত্যাগ করিব।" আবার ভাবিলেন "আত্মহত্যা মহাপাপ ; আত্মহত্যাকারীর দেহ কীট ও শ্বাপদগণ ভক্ষণ করিয়া থাকে ; অতএব আমি বনে বনে ভ্রমণ করতঃ বান-প্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিব।" আবার ভাবি-লেন "আমি এরূপ নিরাশায় ব্যাকুল হইলে শ্রীরামের আশাও বিফল হইবে। আমার কর্ত্তব্যসাধনের উপর বহু ব্যক্তির ভাবী সুখশান্তি নির্ভর করিতেছে, অতএব নিশ্চেষ্ট ভাবে বানপ্রস্থ অবলম্বন করা সঙ্গত নয়। অতএব এস্থানেই নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া অবস্থান করিব।" এইরূপ স্থির করিয়া হনুমান যখন স্থিরচিত্তে ধ্যানস্থ হইলেন তখন, তাহার নির্ম্মলচিত্তে হঠাৎ অশোকবনের শ্যামল স্নিগ্ধ পল্লবের বিষয় উপস্থিত হইল।

এ স্থলে দেখিতে হইবে হনুমান কিরূপে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। এখানে হনুমান কেবল আজ্ঞাবহ ভৃত্য বা রাজ-অনুচর সচিব নহেন। এ ক্ষেত্রে হনুমান পরম ধার্ম্মিক ও জিতেন্দ্রিয়। হনুমান রাবণের পুরীতে প্রবেশ করিয়াই মনে করিয়াছিলেন "হায় অন্তঃপুর দর্শন করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিলাম, আজ নিশ্চিতই আমি ধর্ম্মচ্যুত হইলাম।" কিন্তু হনুমান আত্মশুদ্ধির জন্য হৃদয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুঁজিয়া দেখিলেন, তাঁহার অন্তর কলঙ্ক-কালিমায় বিন্দুমাত্রও মলিন হয় নাই। তিলমাত্রও তাঁহার চিত্তবিকার ঘটে নাই। সততই তাঁহার মন সৎসঙ্কল্পে দৃঢ়। সীতান্বেষণ করিতে হইলে এরূপ অন্তঃপুর প্রবেশ ব্যতীত কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। ইত্যাদি ভাবিয়া হনুমান মনস্থির করিলেন। অশোকবনে উপস্থিত হইয়া হনুমান শিংশপা-বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখিলেন—অদূরে দিবাবসানে ম্লানমুখী পদ্মিনীর ন্যায় অশ্রুপূর্ণ নয়নে ধরাতলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এক রমণী মূর্ত্তি মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে-ছেন। আর্য্যনারীর অপূর্ব্বদেহে কৌষেয় বাস, দীনা তপস্বিনী বিরহবিস্ফারিত বদন-মণ্ডল দেখিয়া হনুমান মনে করিলেন এই সীতাদেবী হনুমান কি প্রকারে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিবেন তাহা ভাবিতে লাগিলেন। "আমি যদি হঠাৎ সীতার সহিত সাক্ষাৎ করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি ভীতা হইবেন। আর যদি আমি রামানুচর বলিয়া চেরীগণ বুঝিতে পারে তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তে অনর্থ ঘটাইবে সন্দেহ নাই।" ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে চেরীগণ যখন কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিল এবং

সীতাও উপবেশন-ক্লেশ প্রশমনার্থ অশোক-তরুর শাখা অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; তখন হনুমান বৃক্ষ হইতে মৃদু মধুর-স্বরে শ্রীরামচন্দ্রের ইতিবৃত্ত বলিতে লাগিলেন। যখন বিষাদ নিমগ্না সীতাদেবী বৃক্ষান্তরাল হইতে রাম-কথা শুনিতে পাইয়া অতি ব্যগ্রভাবে বৃক্ষের দিকে তাকাইলেন তখন এই প্রভুভক্ত হনুমান কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীরামের অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয় সীতাদেবীকে অর্পণ করিলেন। হনুমানের নিকট রামকথা শ্রবণে, সীতাদেবী কিঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেন। হনুমানও সীতার নিকট হইতে চূড়ামণি অভিজ্ঞানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া প্রত্যা-বর্ত্তন করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে দূতশ্রেষ্ঠ হনুমান রাবণের সৈন্যবল, সভা ও বুদ্ধিবল বুঝিবার জন্য এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। যদিও এ সম্বন্ধে রাম কিম্বা সুগ্রীব কোন আদেশ দেন নাই, তথাপি অমাত্য-প্রধান হনুমান লঙ্কার বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা কিছুতে শ্রেয় মনে করিলেন না!

বাল্মীকি-রচিত হনুমান-চরিত্র আমরা যখনই আলোচনা করি তখনই দেখিতে পাই; হনুমান পরোপকার সাধনের জন্য নিজকে মহাসঙ্কটে পতিত করিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই, হনুমান ত্রিভুবন-বিজেতা রাবণের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ভীক হৃদয়ে নিতান্ত বিজ্ঞের ন্যায় ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা রাবণকে কর্ত্তব্যপথ প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াও তিনি অচল অটলভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া-ছিলেন। অবশেষে যদিও বিভীষণের উপ-দেশে অন্য প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তথাপি হনুমান সৎপথ পরিত্যাগ করেন নাই।

যখন আমরা হনুমানকে যে ভাবে দেখি না কেন; তিনি সততই প্রিয়দর্শন ছিলেন। তাঁহার মৃদু ব্যবহারে অন্যান্য কপিগণ তাঁহার অনুগত থাকিত। যখন হনুমান সীতার অভিজ্ঞান লইয়া লঙ্কা হইতে সাগর পার হইয়া সীতার সংবাদ শুনিতে ব্যগ্র বানর-মণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখনই বিষাদের কুয়াসায় সমাচ্ছন্ন বানরগণের হৃদয় আনন্দরূপ দিনমণির নির্ম্মল আলোকে আলোকিত হইয়াছিল। তাহারা মহানন্দে সমবেত হইয়া হনুমানকে অভ্যর্থনা করিল; এবং হনুমানের ঈদৃশ মহাশক্তি সন্দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইল। অঙ্গদ প্রমুখ বানরদলের আনন্দোচ্ছ্বাসে অম্বুনিধির উপকূলভাগ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নৈরাশ্যের ঘোর হিমানী অতিক্রম করিয়া তাহারা যেন বসন্তের নবীন উচ্ছ্বাসে মধুরভাব ধারণ করিল। সমস্ত বানরমণ্ডলী পুলকে নৃত্য করিতে করিতে মধুবনে প্রবেশ করতঃ মধুফল ভক্ষণ করিতে লাগিল। হনুমানও আত্মপ্রসাদরূপ নির্ম্মল আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া একদিনের জন্য তাহাদের সহিত মধুফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

কর্ত্তব্যপরায়ণ মহাপুরুষগণ ন্যায়ানুমোদিত কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিলে, মনে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদ্রেক হয় তাহাই মহামুনি এস্থানে চিত্রিত করিয়াছেন। প্রভুভক্ত হনুমানকে আমরা যে ভাবেই দেখি না কেন, সর্ব্বত্র, সর্ব্বসময়ে আমরা দেখিতে পাই হনুমান নৈরাশ্যের ভয়ঙ্কর তিমিরে আশার

আলো প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন; ভীষণ অশান্তির মধ্য দিয়া বিমল শান্তি আনয়ন করিয়াছেন। অশোককাননে সীতা যখন হতাশ অবস্থায় নৈরাশ্য-সাগরে নিমজ্জিতা ছিলেন; তখন এই রাজভক্ত হনুমান অতি-কষ্টে আশা-ভেলকরূপ শ্রীরামের সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক সীতাদেবীকে মগ্ন অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতার সংবাদ গ্রহণে ব্যাকুল অবস্থায় বিরহ-বিষাদে খিন্ন হইয়া যুথভ্রষ্ট কুঞ্জরের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্তভাবে দিনযাপন করিতেন; তখন এই হনুমান সীতার অভিজ্ঞানরূপ চূড়ামণি প্রদর্শন করাইয়া প্রভুকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। আমরা আবার দেখিয়াছি অসামান্য কার্য্য সম্পাদন করিতে তাঁহার যথেষ্ট শক্তি ছিল এবং সেই শক্তি কার্য্য সাধনে নিয়োজিত করিতে তিনি অযাচিতভাবে দণ্ডায়মান হইতেন। রাবণের শক্তিবাণে লক্ষ্মণ সংজ্ঞা-শূন্য হইলে, তৎপ্রশমনার্থ যখন ঔষধ আনয়ন করা আবশ্যক হইল, তখন ঔষধ সুদূরস্থিত গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে আনিতে হইবে সুতরাং বহু আয়াসের প্রয়োজন এবং অতিশয় অল্প সময়ে তাহা সংগৃহীত না হইলে লক্ষ্মণের জীবন সংশয় হইবে—ইত্যাদি চিন্তা করিয়া সকল ব্যক্তিই ঔষধ আনয়নে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র এই হনুমান সেই ঔষধ আনয়ন পূর্ব্বক রামের নিরাশ হৃদয় আশাবারির কলনাদে মুপরিত করিয়াছিলেন। অনশন ক্লিষ্ট জটাচীরধারী ভরত যখন চতুর্দ্দশ বর্ষ অতীত হইলেও রাম দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন না দেখিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন, প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন; সেই সময়ে এই সুপণ্ডিত হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের আগমনরূপ সুবার্ত্তা প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার হতাশ হৃদয়ে শান্তি বিধান করিয়াছিলেন।

শ্রীহর্ষনাথ দাস মজুমদার।

সামাজিক তথ্যসংগ্রহ

[প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এস্, সি মহাশয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের জীবন-যাপন-প্রণালী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহার 'নিবেদন' আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। সেই নিবেদনের দু'একটি উত্তর আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কাঁটালপাড়ার শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ মহাশয় নিম্ন লিখিত বিবরণটুকু পাঠাইয়াছেন। তাঁহার পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

"ভট্টপল্লীর মহামহোপাধ্যায় ৺হলধর তর্ক-চূড়ামণির নাম তালিকাভুক্ত করা বিশেষ আবশ্যক।

তর্কচূড়ামণি এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীশিব চন্দ্র সার্ব্বভৌম ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথ-নাথ তর্কভূষণ মহোদয়ত্রয়ের জীবনী প্রয়োজন হইলে পাঠান যাইতে পারে। আবশ্যক হইলে লিখিয়া পাঠাইবেন।]

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য

পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর বশিষ্ঠবংশীয়-গণকে ঠাকুরগোষ্ঠী বলে। ইহারাই ভাট-পাড়ার ঠাকুর, ইঁহাদের আদিপুরুষ নারায়ণ ঠাকুর সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণ এই বংশের শিষ্য। অশূদ্র-যাজী, আচারবান্, মৎস্যমাংসত্যাগী বলিয়া সমাজে ইঁহাদের সম্ভ্রম অধিক। এই বংশের প্রধান উপজীবিকা শিষ্য। এই বংশের সকলেরই কিছু ধন ও সম্পত্তি আছে। পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীতে মেলবন্ধন নাই, কুলীন, ভঙ্গ, শ্রোত্রিয়, বংশজ এ সমস্ত কিছু নাই।

ন্যায়রত্ন মহাশয় ভট্টপল্লীস্থ বশিষ্ঠগোত্র-সম্ভূত পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। উপ-বীত হইয়া কখনও মৎস্য, মাংস ভক্ষণ করেন নাই, বিলাতি লবণ, বিলাতি চিনি এবং শূদ্রের দোকানে মিষ্টান্ন খাওয়া অভ্যাস নাই।

ইনিই গভর্মেন্টের প্রথম "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ইনি নিয়মিত ৭।৮ জন ছাত্রকে অন্নদান করিয়া ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমানে কাশীধামে থাকিয়া সাধ্যমত ছাত্র পড়াইয়া থাকেন, সেখানে প্রতিগ্রহ করেন না। ইঁহার শিষ্যের সংখ্যা প্রায় ২০০। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায়ে—ভট্টপল্লী থাকা কালে——একটি আয় ছিল। হাতুয়ার মহারাজা ইহাকে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা মাসহারা দিয়া কাশীধামে বাস করান।

এই বংশীয়ের মধ্যে অধিকাংশ রাম-মন্ত্রোপাসক বৈষ্ণব। কতক শাক্ত, কতক শৈব, কতক বা পঞ্চমন্ত্রোপাসক। ন্যায়রত্ন মহাশয় রামমন্ত্রোপাসক। শিষ্যগণের মধ্যে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সমস্ত মন্ত্রোপাসকই আছে। বাটীতে দুর্গা-পূজাদি হইয়া থাকে। শালগ্রাম শিলা ও মন্দিরস্থ প্রতিষ্ঠিত শিবাদির প্রাত্যহিক অর্চ্চনাদি হইয়া থাকে। সন্ধ্যা, আহ্নিক, শিবাদিপূজা প্রত্যহই করিয়া থাকেন। "শ্রীশ্রীদুর্গা" নাম না লিখিয়া কোন কাগজেই ইনি লেখেন না। সর্ব্বপ্রকারেই আনুষ্ঠানিক হিন্দু। একমাত্র পুত্র হরকুমার শাস্ত্রীর মৃত্যুর সামান্য পূর্ব্বেও সন্ধ্যাহ্নিক পূজায় বসিয়াছিলেন। তন্ত্রের অনুশাসনে মন্ত্রাদি গ্রহণ করেন ও মন্ত্রাদি দিয়া থাকেন। ইঁহাদের গৃহে নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি, পুরাণ, জ্যোতিষ, কাব্য, সাহিত্য, ব্যাকরণ, সকল প্রকার পুঁথিই আছে। বেদ, উপনিষৎ, বেদান্তাদি পুঁথি সাধারণতঃ কাহারও গৃহে পাওয়া যায় না।

বিবাহ একটি। আন্দাজ ১৯।২০ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। বর্ত্তমানে ইনি বিপত্নীক। পুত্র নাই। কন্যা, দৌহিত্র আছে। পত্নীসত্বে পুনরায় বিবাহ করা এ বংশীয়ের রীতি নাই।

বর্ত্তমান বয়স ৮৫ বৎসর। ভারতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক। আকার দীর্ঘ, বর্ণ গৌর, বাহু আজানুলম্বিত, ললাট দীর্ঘ। ইঁহার আকৃতি এরূপ অসাধারণ যে, দৃষ্টি-মাত্রেই অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া প্রতীতি হয়।

অদ্বৈতবাদ খণ্ডন, মায়াবাদ, দীধিতি ক্রম্যূনতাবাদ প্রভৃতি কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ ইঁহার প্রণীত। মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম প্রভৃতি দেশপ্রসিদ্ধ বহু অধ্যাপক ইঁহার ছাত্র। সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত হরিহর

ভট্টাচার্য্য বর্ত্তমানে ইঁহারই নিকট অধ্যয়ন করেন।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য

ইনি পাশ্চাত্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। গৌতম গোত্রে ইঁহার জন্ম। বশিষ্ঠ গোত্রের সহিত কুটুম্বিতাসূত্রে ভট্টপল্লীতে ইঁহাদিগের বাস।

কুলীন, ভঙ্গ, শ্রোত্রিয়, মেল বন্ধনাদি নাই।

ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ শাক্ত ছিলেন ; ইনি শৈব। বাটীতে দুর্গা, কালী, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা, প্রভৃতি পূজা হইয়া থাকে ; নারায়ণের দোল, রাস প্রভৃতিও হয়। বাটীতে প্রত্যহ নারায়ণ পূজা ও মন্দিরস্থ প্রতিষ্ঠিত শিবার্চ্চনা হইয়া থাকে। শিষ্যগণের মধ্যে শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি আছে। ইনি আনুষ্ঠানিক হিন্দু। সন্ধ্যাহ্নিক পূজাদি না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। যথাসময়ে সন্ধ্যা করিবার চেষ্টা করেন, মধ্যে মধ্যে বেদপাঠ করিতেও দেখিয়াছি। তন্ত্র-নিয়মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন ও দীক্ষা দান করিয়া থাকেন। বামাচারী বা পশ্বাচারী প্রভৃতি নহেন। শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানে অত্যধিক শ্রদ্ধাবান্ ও কর্ম্মী। ইনি নির্ভীক ও তেজস্বী—প্রকৃত একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ; অধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপদাপন্ন হইতে কুণ্ঠিত নহেন। 'ব্রাহ্মণ-সভা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। "ব্রাহ্মণ-সমাজ" পত্রিকা ইঁহারই অধ্যবসায়ে বাহির হইতেছে।

উপনয়নের পর হইতে মৎস্য, মাংস ত্যাগ করিয়াছেন। উপনীত হইবার পরই বালক পুত্রগণকে মৎস্য মাংস ছাড়াইয়াছেন। মৌন হইয়া ভক্ষণ করিয়া থাকেন। শূদ্রের দোকানের মিঠাই, বিলাতি লবণ বা চিনি এ সমস্ত অখাদ্য বলিয়াই ধারণা।

উপজীবিকা কিছু বিষয়, কিছু শিষ্য। ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বিদায়েও একটি আয় আছে। 'বঙ্গবাসী'র শাস্ত্রপ্রচার কার্য্যে ইনিই ৺যোগেন বাবুর একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। উন-বিংশতি সংহিতা, অষ্টাদশ পুরাণ, অষ্টাদশ উপপুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত, হরিবংশ প্রভৃতির অনুবাদ করিয়া সংস্কৃতের জ্ঞানভাণ্ডার সাধারণের সমক্ষে খুলিয়া দিয়াছেন। এ কারণে সমস্ত বাঙ্গালা ইঁহার নিকট ঋণী।

৬।৭ জন ছাত্রকে অন্ন দিয়া অধ্যাপনা করেন। উপনিষৎ, ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি তাবৎ গ্রন্থই পড়িয়া থাকেন। সর্ব্ব-সাকুল্যে ইঁহার শিষ্য ২০০ হইবে। বর্ত্তমানে বিষয় আশয়ও যথেষ্ট করিয়াছেন।

গৃহে ন্যায়, স্মৃতি, পুরাণ, জ্যোতিষ, কাব্য, ব্যাকরণ প্রভৃতির পুঁথি আছে। ইনি অলৌকিক মেধাসম্পন্ন ও প্রতিভাশালী। 'বঙ্গবাসী'র শাস্ত্র-প্রচার কার্য্যে যাবতীয় সংস্কৃত পুঁথি আলোচনা করিয়া বর্ত্তমানে সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্। চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের পর ইঁহার আর দ্বিতীয় নাই। সর্ব্বপ্রকার প্রশ্নের সদুত্তর দিতে, সকল প্রকার বিরোধের সমন্বয় করিতে, সমস্ত শাস্ত্রোক্ত কূটের সিদ্ধান্ত করিতে ইঁহার সমকক্ষ পণ্ডিত আর নাই।

বিবাহ তিনটি। প্রথম বিবাহ ইঁহার ১৫ বৎসর বয়সে হয়। বিবাহের কিছুদিন পরেই প্রথমা পত্নীর মৃত্যু ঘটে। তারপর দ্বিতীয় বিবাহ। এই বিবাহের পুত্র কন্যা আছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীজীব কাব্যতীর্থ মেধাবী ও

বুদ্ধিমান্। বঙ্গবাসী পত্রিকায় ইনি মধ্যে মধ্যে লিখিয়াছেন। "ব্রাহ্মণ-সমাজ" মাসিকপত্রে বর্ত্তমানে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ৩৭ বৎসর বয়সে তৃতীয় বার বিবাহ হয়। এক বৎসর হইল তর্করত্ন মহাশয়ের মুমূর্ষু অবস্থাকালীন সেই তৃতীয়া পত্নী প্রাণত্যাগ করেন। বর্ত্তমানে ইনি বিপত্নীক। এক্ষণে বয়স ৪৯ বৎসর হইবে।

ইনি শাস্ত্রের অনুবাদ ব্যতীত বৈশেষিক দর্শন, সাংখ্য-দর্শন প্রভৃতির সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়াছেন ও তাহার অর্থ বাঙ্গালায় বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। শিববিজয় কাব্য, অমরচরিত নাটক ইঁহার প্রণীত। অধুনা ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের শক্তিপক্ষে সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

ইনি সুপ্রসিদ্ধ 'জন্মভূমি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। নবজীবনে পূর্ব্বে লিখিতেন। ইঁহার ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বহুপ্রবন্ধ বঙ্গবাসীতে বাহির হইয়াছে। এক্ষণে "ব্রাহ্মণ-সমাজ" পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখিয়া দেশবাসীর জ্ঞানচর্চ্চার বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

ইনি এমত নিষ্ঠাবান যে, যখন ভ্রমে পড়িয়া গভর্মেণ্ট ইঁহাকে বোমার মামলায় আসামী করিয়া হাজতে দেন, তখন ইনি দুই দিন উপবাস করিয়াছিলেন, পরে সন্ধ্যাহ্নিক পূজা করিয়া স্বপাক অন্ন খাইয়াছিলেন, তবুও জেলের অন্ন ভক্ষণ করেন নাই। আলি-পুরের জেলখানাকে যেন আশ্রম করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ দুই চারি জন অক্লান্ত কর্ম্মী ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিলে দেশের অনেক কার্য্য হয়।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

দুগ্ধের উপাদান

পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে দুগ্ধ অন্যতম। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমরা এই খাদ্য ব্যবহার করি। আমাদের শাস্ত্রে এই সকল কারণে দুগ্ধকে অমৃত এবং গাভীকে ভগবতী বলা হইয়াছে। আজ এই প্রবন্ধে আমরা দুগ্ধের উপাদান সম্বন্ধে একটু বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করিব।

সাধারণতঃ আমরা দুই প্রকার দুগ্ধ ব্যবহার করিয়া থাকি; মাতৃস্তনের দুগ্ধ ও গোদুগ্ধ। এই কারণে আমরা আমাদের আলোচনা এই দুই প্রকার দুগ্ধেই আবদ্ধ রাখিব।

দুগ্ধের উপাদান :—

জল, তিন প্রকার অন্নসার (Proteid) যথা Caseinogen, lact-albumin, lacto-glo-bulin, দুই প্রকার শ্বেতসার (carbo-hydrates) যথা দুগ্ধশর্করা বা lactose, animal gum ও স্নেহই প্রধান। ইহা ছাড়া দুগ্ধে urea creatine, createnine, hypoxanthine, lecithein, বীজপুরায় বা citric acid বহু প্রকার লবণ ও বায়ু বর্ত্তমান থাকে। যথাস্থানে আমরা ইহাদের স্বধর্ম্মের আলোচনা করিব।

উপাদানের তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে খাদ্যে যে যে বস্তুর প্রয়োজন দুগ্ধে সবগুলিই বর্ত্তমান আছে। একারণে দুগ্ধ খাদ্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। শরীরের পুষ্টির জন্য যাহা যাহা আবশ্যক দুগ্ধে সবই আছে।

দুগ্ধের সাধারণ ধর্ম্ম :—

অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা যদি এক ফোঁটা দুগ্ধ পরীক্ষা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে এক প্রকার জলীয় পদার্থের উপর অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোল দানা বা কণিকা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এই ক্ষুদ্র দানাগুলি স্নেহ ও অন্নসারের কণিকা। ইহাদের অস্তিত্বেই দুগ্ধকে সাদা দেখায়, এই জলীয় পদার্থের নাম milk plasm, আর ক্ষুদ্র কণাগুলিকে milk-globules বা দুগ্ধ-কণিকা বলা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র সমন্বিত মৃত্তিকা ভাণ্ডের সাহায্যে পরিস্রবণ (filter) করিয়া লইলে অতি সহজে জলীয় পদার্থ হইতে দুগ্ধ-কণাকে পৃথক করা যাইতে পারে।

জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০০০ ধরিলে মনুষ্য দুগ্ধের ১০৩৪ এবং গোদুগ্ধে ১০২৮ হয়। গুরুত্ব হিসাবে দুই প্রকার দুগ্ধের পার্থক্য অল্পই। "মাখম" বা "মাটা" তুলিয়া লইলে দুগ্ধের গুরুত্ব অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যায়।

পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে দুগ্ধের স্নেহকণার (Fat-globules) উপর Caseinogen নামক অন্নসারের একটি আবরণ থাকে। সেই কারণে স্নেহ কণাগুলি পরস্পরের সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। এই আবরণের নাম haptogen membrane. Haptogen-membrane মতবাদী সম্প্রদায় তাঁহাদের মতের প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত দুইটি উপপত্তির (fact) উল্লেখ করিতেন :—

১ম। মৃৎপাত্রের সাহায্যে ক্ষারিত (filtered) দুগ্ধে স্নেহ ও Caseinogen এর কোন অস্তিত্বই পাওয়া যায় না।

২য়। দুগ্ধ-কণিকা (milk-globules) উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পরীক্ষা করিলেও স্নেহ-কণিকায় Caseinogenএর অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

কিন্তু Quincke প্রমুখ প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ এই ধারণার মূলে সজোরে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি প্রমাণ করিলেন যে দুগ্ধ ও রক্ত মৃৎপাত্রের সাহায্যে ক্ষারিত হইলে এইরূপ অন্নসার বিবর্জ্জিত হইয়া পড়ে। তাহার কারণ এই যে অন্নসারের অণুগুলি (molecules) আকৃতিতে এত বড় যে মৃৎপাত্রের ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাহিরে আসিতে পারে না। দুগ্ধকণিকাকে ধৌত করিয়া স্নেহ-কণিকা হইতে অন্নসার-কণিকার পৃথককরণ কোনও প্রকারে সম্ভবপর নহে, কাজেই ধৌত করণের পরও Caseinogenএর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। Quinckeএর মত যে কণিকার উপর কোনপ্রকার আবরণ বা ঝিল্লী (membrane) নাই। দ্রব caseinogen দ্বারা এই স্নেহ-কণিকাগুলি মণ্ডিত থাকে।

দুগ্ধে দুগ্ধশর্করা (lactose) বর্ত্তমান থাকায় অতি অল্পেই ইহা গাঁজিয়া উঠিয়া দুগ্ধাম্ল বা lactic acidএ পরিণত হয়, ফলে দুগ্ধ অম্ল হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ আমরা দুগ্ধে ক্ষার-প্রতিক্রিয়া (alkaline re-action) পাইয়া থাকি। দুগ্ধে acid phosphate

অধিক থাকিলে সাধারণ নিয়মানুসারে litmus paper লাল এবং alkaline phosphate-এর আধিক্য হইলে নীল রং ধারণ করিয়া থাকে; দুগ্ধে এই দুইটি লবণের সকল সময়ই ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। এই কারণে দুগ্ধে কখনও বা ক্ষার-প্রতিক্রিয়া কখনও বা অম্ল-প্রতিক্রিয়া পাইয়া থাকি। তবে মনুষ্যদুগ্ধে প্রায়ই ক্ষার অপেক্ষাকৃত অধিকমাত্রায় থাকে।

দুগ্ধ ফুটান বা "জ্বাল দেওয়ার" কার্য্যকারিতা :—

দুগ্ধ ফুটাইলে ইহার উপরে একটি "সর" পড়ে। Lact-albumin নামক অন্নসার জাতীয় দ্রব্যের জমাটবন্ধনেই এই সরের উৎপত্তি। ইহার সহিত অল্পমাত্রায় Caseinogen এবং স্নেহও জড়িত হইয়া জমিয়া পড়ে। বোধ হয় বায়ুর প্রভাবেই এগুলি জমিয়া সরের আকৃতি ধারণ করে।

দুগ্ধ ফুটাইলে প্রধানতঃ দুইটি উপকার পাওয়া যায়—(১) ইহাতে সকলপ্রকার বীজাণু (mico-organism) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কাজেই অতি অল্পেই অনেক রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। এখানে বলা আবশ্যক দুগ্ধের সাহায্যে বহুপ্রকার রোগের বীজ মানবদেহে সংক্রামিত হয়। Typhoid, cholera, বিশেষতঃ শিশুগণের মারাত্মক রোগ diptheria প্রভৃতির বীজ দুগ্ধের সাহায্যে মানবদেহে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। (২) পাচকরসে (gastric juice) দুগ্ধ-পচনের জন্য rennet নামক একপ্রকার দ্রব্য আছে। দুগ্ধ ইহার সংস্পর্শে আসিলে চাপ বাঁধিয়া যায়। "কাঁচা" দুগ্ধে rennet দিলে চাপ অত্যন্ত নিরেট হয় এবং যাহাদের পরিপাকশক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প তাহাদের পরিপাকে ব্যঘাত ঘটিতে পারে। কিন্তু "ফুটান" দুগ্ধে অনেক "পেঁজা তুলার" ন্যায় চাপ বাঁধিয়া থাকে (flocculent)। এইরূপ হইবার কারণ আছে ফুটাইবার সময় দ্রব Calcium লবণের কিয়দংশ Tri-calcium phosphate রূপে অধঃক্ষিপ্ত (precipitated) হইয়া থাকে।

মনুষ্য দুগ্ধ :—

স্ত্রীলোকের প্রসবের কিছুদিন পূর্ব্বেই হরিদ্রাবর্ণের "আটাল" একপ্রকার জলীয় পদার্থ নির্গত হইতে দেখা যায়। ইহাকে Colostrum বলা হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এক ফোঁটা Colostrum পরীক্ষা করিলে স্নেহ-কণিকা ছাড়া কতকগুলি অপেক্ষাকৃত বড় amaboid cells দেখা যায়। এগুলিকে Colostrum Corpuscles বলা হইয়া থাকে। দুগ্ধে Colostrum Corpuscles থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে ইহা অনৈসর্গিক উপায়ে লব্ধ। এই Colostrum কণিকাগুলি কাহারও মতে Luecocytes, কাহারও মতে ইহা Epithelial cells. এই Colostrum কণিকাগুলি স্নেহ কণিকা খাইয়া থাকে, এ কারণে ইহাদের দেহের মধ্যে স্নেহ কণিকা দেখা যায়। প্রসবের তিন চারি দিবস পরেই স্তন হইতে colostrum নিঃসৃত হইয়া থাকে।

Colostrum বিশ্লেষণ করিয়া Clemm যে ফল পাইয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

উপাদান	প্রসবের ৪ সপ্তাহ পূর্ব্বে ১	প্রসবের ৪ সপ্তাহ পূর্ব্বে ২	ঐ ১৭ দিন পূর্ব্বে	ঐ ৯ দিন পূর্ব্বে	ঐ ২৪ ঘণ্টা পর	ঐ ২ দিন পরে
জলীয় পদার্থ	৯৪·৫২	৮৫·২	৮৫·১৭	৮৫·৮৫	৮৪·৩৮	৬৬·৭৯
কঠিন পদার্থ (মোট)	৫·৪৮	১৪·৮	১৪·৮৩	১৪·১৫	১৫·৬২	১৩·২১
Casein	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	২·১৮
Albumin and globulin	২·৮৮	৬·৯	৭·৪৮	৮·০৭	নাই	নাই
স্নেহজাতীয় দ্রব্য	০·৭১	৪·১	৩·০২	২·১৫	নাই	৪·৮৬
দুগ্ধশর্করা বা lactose	১·৭৩	৩·৯	৪·৩৭	৪·৬৪	নাই	৬·১০
লবণাদি	০·৪৪	০·৪৪	০·৪৫	০·৫৪	০·৫১	নাই

এক্ষণে Colostrumএর কথা ছাড়িয়া স্বাভাবিক দুগ্ধের উপাদানের আলোচনা করা যাউক। এস্থলে আমরা তিনজন বিখ্যাত বিশ্লেষকের পরীক্ষার ফল উদ্ধৃত করিব।

বিশ্লেষক	জল	অন্নসার	স্নেহ	দুগ্ধশর্করা lactose	লবণ	বক্তব্য
Clemm	৮৮·৫৮	৩·৬৯	৩·৫৩	৪·৩	০·১৭	প্রসবের ৯ দিবস পরে
	৯০·৭৮	২·৯১	৩·৩৪	৩·১৫	০·১৯	প্রসবের ১২ দিবস পরে
Tiddy	৮৬·২৭	২·৯৫	৫·৩৭	৫·১১	০·২২	
Heiffer	৮৯·২৯	১·৬	৩·২	৫·৮	০·১১	২০ হইতে ৩০ বৎসরের স্ত্রীলোক
	৮৯·০৬	১·৭২	২·৯	৬·০	০·	৩০ হইতে ৪০ বৎসরের স্ত্রীলোক

এই বিশ্লেষণ তালিকা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে মনুষ্য দুগ্ধে অন্নসারের ভাগ অল্প এবং দুগ্ধ শর্করার (lactose) ভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক। কতকগুলি পারিপার্শ্বিক কারণে বাহ্যিক প্রকৃতিতে দুগ্ধের উপাদানের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। খাদ্য ইহাদের মধ্যে অন্যতম।

মনুষ্য দুগ্ধে লবণের পরিমাণ :—

Bunge প্রতি হাজার ভাগে নিম্নলিখিত লবণের ভাগ নির্ণয় করিয়াছেন।

K2o—·৭৮০ Mgo —·০৬৪
Na2o—·২৩২ Fe2°3—·০০৪
Cao—·৩২৮ P 2°5—·৪৭০
Cl —·৪৩৮

ঐ বায়ুর পরিমাণ

অম্লজান— ১·০৭c·c হইতে ১৪৪c·c

আঙ্গারাম্ল বায়ু— ২·৩৫০c. হইতে ২·৮৭c·c.

সোরাজান — ৩৮১

গোদুগ্ধ :—

গোদুগ্ধে Colostrum :—ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক—১০৪৭—১০৮০। নিম্নে ইহার উপাদানের বিশ্লেষণ তালিকা দেওয়া গেল।

উপাদান	১	২	প্রসব হইবা মাত্র	প্রসবের পাঁচ দিন পর
জলীয় পদার্থ	৭৮·৭	৭৪·৭	৭৭·—৭২·৭	৮৫·[illegible]
Casein	৭·৩	৪·০৫	১৪·৯—২০·১	৪·[illegible]
Albumin and globulin	৭·৫	১৩·৬		
স্নেহ	৪·০	৩·৬	২·৪২—৬·৩	৫·১৮
দুগ্ধ শর্করা lactose	১·৫	২·৭	১·০২—২·৮৬	৪·৫৭
লবণাদি	১·০	১·৬	১·১—১·২	·১৬
মোট কঠিন পদার্থ	২২·৩	২৫·৩	২২·৪—২৭·৪	১৪·৩৭

স্বাভাবিক গোদুগ্ধের উপাদান :—

জলীয় পদার্থ—৮৪·২৮

মোট কঠিন পদার্থ—১৫.৭২

Caseinogen—৩·৫৭

Albumin—০·৭৫

স্নেহ—৬·৪৭

দুগ্ধশর্করা—৪·৩৪

লবণাদি—০·৬৩

দুগ্ধ হইতে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান খাদ্যের বিশ্লেষণ তালিকা।

উপাদান	দুগ্ধ	"মাটা" তোলা দুগ্ধ	সর	মাখন	ঘোল
জল	৮৭·১৭	৯০·৬৬	৬২·৫১	৯০·২৭	৯৩·২৪
মোট কঠিন দ্রব্য	১২·৮৩	৯·৪৪	৩৭·৯৯	৯·৬৩	৬·৭৬
Caseinogen Albumin	৩·০২ ০·৫২	৩·১১	৩·৬১	৪·০৬	০·৮৫
স্নেহ	৩·৬৯	০·৭৪	৩৩·৭৫	০·১৩	০·২৩
দুগ্ধশর্করা লবণাদি	৪·৮৮	৪·৭৫	১·৫২	৩·৭৩	৪·৭
Lactic acid	০·৭১	০·৭৪	০·৬১	০·৬৭	০·৬৫
বা দুগ্ধাম্ল	নাই	নাই	নাই	০·১৪	০·৩২

Soldner গোদুগ্ধের প্রতি শতভাগে নিম্নলিখিত লবণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

K_2O—০·১৭২

Na_2O—০·০৫১

CaO—০·১৯৮

MgO—০·০২

P_2O_5—০·১৮২

Cl—০·০৯৮

গোদুগ্ধে অতি অল্প অম্লজান ও সোরাজান এবং শতকরা ১০—১৫ ভাগ অঙ্গারাম্ল আছে।

বিশ্লেষণ তালিকা হইতে গোদুগ্ধ ও মনুষ্য-দুগ্ধের তুলনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে গোদুগ্ধে অন্নসার, স্নেহ ও লবণের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক এবং শর্করার মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম।

দুগ্ধে শ্বেতসার ও তাহার স্বধর্ম্ম

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে দুগ্ধে শ্বেতসারের মধ্যে Lactose বা দুগ্ধশর্করাই প্রধান। অন্যান্য শর্করার অপেক্ষা ইহা অধিক দ্রবণীয় এবং ইহার মিষ্টতাও অপেক্ষাকৃত অল্প। ইহার উপর yeastএর কার্য্যকারিতা অল্প, কাজেই ইহা গাঁজিয়া উঠে না, তবে অন্যান্য Schizo mycetes এর প্রভাবে ইহা অতি অল্পই গাঁজিয়া উঠিয়া lactic acid বা দুগ্ধাম্লে পরিণত হয়।

দুগ্ধজাতীয় স্নেহের স্বধর্ম্ম

স্নেহের গুরুত্ব ৯৪৯—৯৯৬। ইহাতে Palmitin Stearin and olein নামক অম্লই প্রধান। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অম্লেরও অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

সার শতকরা ১৪—৪৪ ভাগ স্নেহ থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মাখমে স্নেহ ব্যতীত Caseinogen and lactose বা দুগ্ধশর্করা অল্প পরিমাণে থাকে। গোদুগ্ধলব্ধ মাখমে শতকরা ৬৮ Stearin and palmitin ৩০ ভাগ olein ও ২ ভাগ দুগ্ধজাতীয় বিশেষ বিশেষ স্নেহ থাকে। ইহারা ৩১°—৩৪° ডিগ্রি তাপে গলিয়া থাকে। বায়ুসংযোগে মাখম একটু "টকিয়া" যায় এবং একটু দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। ইহার প্রধান কারণ যে দুগ্ধশর্করা (lactose) দুগ্ধাম্লে (lactic acid) পরিণত হয়।

মনুষ্যদুগ্ধেও Palmitic Stearin Oleic অম্ল Glycerineএর সহিত মিলিত অবস্থায় থাকে। ৩৪° ডিগ্রি উত্তাপে ইহা গলিয়া যায় এবং ২০° ডিগ্রিতে চাপ বাঁধে। ইহার গুরুত্ব ৯৬৬

দুগ্ধে অম্লসার ও তাহার স্বধর্ম্ম

দুগ্ধে প্রধানতঃ Caseinogen নামক অম্লসারই অধিক পরিমাণে অবস্থিত। Rennet নামক ফিণের (Ferment) সাহায্যে ইহা casein বা "পনিরে" পরিণত হয়। ইহাতে lact-albumin ও lacto-globutin নামক আরও দুইটি অম্লাসার আছে। দুগ্ধশর্করা দুগ্ধাম্লে পরিণত হইলে পাত্রে caseinogen অধঃনিক্ষিপ্ত (precepitated) হইয়া থাকে। ইহা কিন্তু casein হয় না। কখনও কখনও বায়ুতাড়িত বীজাণু দুগ্ধের উপর ঠিক Rennet এর ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। Rennet গোদুগ্ধের সহিত মিশিয়া Caseinogenকে casein পরিণত করিয়া নিরেট চাপ বাঁধিয়া ফেলে আর দুগ্ধের অবশিষ্টাংশ ঘোলরূপে পড়িয়া থাকে। ঘোলে দুগ্ধশর্করা ও অপর দুইটি অম্লসার পড়িয়া থাকে। মনুষ্য দুগ্ধের উপর Rennet এর কার্য্যকারিতা একটু ভিন্ন প্রকারের। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এখানে নিরেট চাপ না বাঁধিয়া "পেঁজা তুলার" ন্যায় চাপ বাঁধে গোদুগ্ধ "জাল" দিয়া লইলে বা চুণের জল, সোডার জল বা বার্লি মিশাইয়া লইলে নিরেট চাপ বাঁধে না। Chittenden গোদুগ্ধলব্ধ caseinogen এর বিশ্লেষণ করিয়া প্রতি শতভাগে অঙ্গারসার (carbon)—৫৩·৫ উদজান (Hydrogen) ৭·০৭ সোরজান—১২·৯১ গন্ধক ০·৮২ ও অম্লজান—২২·০৪ ভাগ পাইয়াছেন।

মনুষ্যদুগ্ধের caseinogen গোদুগ্ধের caseinogen হইতে একটু পৃথক। Rennet এর কার্য্যকারিতা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

তাহা ছাড়া অম্ল বা লবণের সাহায্যে এই caseinogen এর সহজে অধঃক্ষেপণ (precepitation) হয় না। এই অধঃক্ষেপণ আবার অধিক মাত্রায় পাচক রসে (gastric juice) দ্রবণীয়। Wroblesk বিশ্লেষণ দ্বতিক করিয়া দেখিয়াছেন প্রতি শতভাগে অঙ্গার-সার—৫২·২৪, দৈজান—৭·৩১, সোরজান—১৪·৯ দীপক দ্রব্য (Phosphorus)—·৬৮ গন্ধক—১·১১৭ অম্লজান ২৩·৬৬ ভাগ আছে। গোদুগ্ধের caseinogen হইতে ইহা অনেকাংশে ভিন্ন। ইহাতে Phosphorus আছে গোদুগ্ধে ইহা pseudo-nwelin রূপে অবস্থিত।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

জীবনের কর্ত্তব্য

মানবজীবনের কর্ত্তব্য বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা এক কথায় প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। এই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই আদিকাল হইতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনীষিগণ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির আলোচনায় নিযুক্ত। বাগ্মী বক্তৃতা করেন, ধর্ম্মপ্রচারক উপদেশ দান করেন, কবি বাহ্যপ্রকৃতির অন্তরালে বিশ্বাত্মাকে ইঙ্গিত করেন, লেখক গ্রন্থ প্রকাশ করেন—মানব-সমাজকে তাহাদের কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করিবার জন্যই। সুদূর অতীতের সত্যযুগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভগবান্ বরাহ, বামন, নৃসিংহ, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ, ঈশা, মহম্মদ, খৃষ্ট, কৃষ্ণ ইত্যাদি কতরূপ পরিগ্রহ করিয়াই মানবকে তাহাদের কর্ত্তব্য বুঝাইবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা কতপ্রকার লীলার অভিনয় করতঃ কত উপদেশ বিতরণ করিয়াই অন্ধমানবকে তাহাদের কর্ত্তব্য বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা—সেই অনন্ত জ্ঞানের অনন্ত উপদেশ।

বিশ্বের পরিবর্ত্তন-শীলতা

হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, মহম্মদীয়, যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্র অন্বেষণ কর, দেখিতে পাইবে, তাহাতে মানবের কর্ত্তব্যবিধান ভিন্ন বস্তুতঃ অন্য কিছুই নাই। প্রকৃতি নিত্য পরিবর্ত্তন ক্রমে কার্য্যকারণ পরম্পরায় মানবের মহৎ কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছে, জড় ও চেতন ক্রমবিকাশের পথে নিত্য অগ্রসর হইতেছে। একটু চিন্তা করিয়া পরম্পরা বিচার করিলে দেখা যায়, বাহ্যপ্রকৃতি একটা বিসম আবর্ত্তে নিত্য আবর্ত্তিত হইতেছে। নূতন ক্রমশঃ পুরাতনত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, আর পুরাতন ক্রমশঃ নূতনত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, এইজন্যই প্রকৃতি চিরনবীনা। গলিত পত্র পুরাতনত্ব প্রাপ্ত হইয়া মাটীতে মিশিতেছে, পরক্ষণেই আবার নবীনভাবে উদ্ভিদ্‌দেহের উপাদান স্বরূপ হইতেছে। স্রোতস্বতীর তটভূমি স্রোতাঘাতে ভগ্ন হইয়া স্থানান্তরে নূতন দ্বীপের নূতন কলেবরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। জীবজগতে জীবগণ বাল্য, যৌবন, জরা, মৃত্যু ইত্যাদি অবস্থার পর পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্য-যৌবনের নূতন অভিনয় করিতেছে। উদ্ভিদ্দেহ জীবদেহে প্রবেশ করিয়া তাহার উপাদানে পরিণত হইতেছে; আবার সেই

জীবদেহই মাটীতে মিশিয়া উদ্ভিদ্দেহে তাহার আহারীয়রূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। উত্তাপের অতিমাত্র বিকীরণে গ্রহগুলি ক্রমে শীতলত্ব প্রাপ্ত হইয়া জড়পিণ্ডে পরিণত হইতেছে; আবার তাহাই ধূমকেতুর সংঘর্ষে বা পরস্পরের ঘর্ষণে বাষ্পময় দেহ ধারণ করিয়া নূতন গ্রহের উপাদন নির্ম্মাণ করিতেছে। আমাদের সনাতন হিন্দুশাস্ত্র পরজন্মবাদী। তাহাতে এই চিরপরিবর্ত্তন কথিত হইয়াছে।—"জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।"

ডারউইন প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষিগণও এই জাগতিক মহাপরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া ক্রমবিকাশ বর্ণনা করেন। যেমন পৃথিবী নিত্য আহ্নিকগতিক্রমে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশঃ কক্ষপথে অগ্রসর হইতে থাকে, সেইরূপ প্রকৃতিও নিত্য অস্থির, স্বীয় অবস্থার পরিবর্ত্তনক্রমে বিকাশের পথে অগ্রসর হইতেছে। এই পরিবর্ত্তন ও বিকাশই আমরা নিয়ত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। জগদীশ্বরের ইচ্ছা এই দুইটি কার্য্য দ্বারাই পরিব্যক্ত হইতেছে। তাঁহার ইচ্ছা বা আদেশের অনুসরণ করাই যদি মানবের কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে ইহাদ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, ক্রম-বিবর্ত্তনে পূর্ণবিকাশ লাভ করাই মানবের একমাত্র লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যপথে নিত্য অগ্রসর হওয়াই মানবের কর্ত্তব্য। ক্রম-বিবর্ত্তনে উন্নীত হইয়া মানব-জীবনেই জীব বিকাশের শেষ সোপানে আশ্রয় লয়। এই মানবজীবনে জীব দুইটি মহতী শক্তিপ্রাপ্ত হয়:—প্রতিভা ও প্রেম। এই প্রতিভা ও প্রেমের পূর্ণপরিচালনায় মানবের পূর্ণবিকাশ ঘটে। প্রাচ্য মোক্ষ বা নির্বৃত্তি ইহারই নামান্তর। পশ্চাৎ এ কথাটি আরও সুস্পষ্ট বুঝিতে প্রয়াস পাইব। এক্ষণে দেখা যাউক বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক কর্ত্তব্যের পরিণতি কোথায়।

সম্প্রদায়ভেদে মানবের কর্ত্তব্যবোধ স্থূলতঃ বিভিন্ন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে

আমরা দেখিতে পাই—ধর্ম্মসম্প্রদায়ে—বৈরাগীর বৈরাগ্যলাভ, শাক্তের সার্ষ্টি *, বৈষ্ণবের প্রেমভক্তিপ্রাপ্তি, বৌদ্ধের অহিংসা ও বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি, যোগীর আত্মদর্শন বা মোক্ষ, তাহাদের স্ব স্ব শাস্ত্র-বিহিত কর্ত্তব্য। জাতিভেদে,—ব্রাহ্মণের বেদচর্চ্চা, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধবিদ্যা, বৈশ্যের কৃষি, শূদ্রের সেবা, ইত্যাদিও বিহিত কর্ত্তব্য।

বয়োভেদে—বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্যে, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্যাশ্রমোক্ত কার্য্যগুলিও অবশ্য করণীয়।

ব্যক্তিভেদে—শিষ্যের গুরুভক্তি, গুরুর শিষ্যকে বিকাশ বা উন্নতি পথে পরিচালিত করা, ভৃত্যের আদেশপালন, মায়ের সন্তান-বাৎসল্য, সন্তানের পিতৃমাতৃসেবা ও ভক্তি, ছাত্রের অধ্যয়ন, শিক্ষকের অধ্যাপনা, যোদ্ধার যুদ্ধচর্চ্চা, নাবিকের নৌ-চালন ইত্যাদিও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সহজ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানবের কর্ত্তব্য বিভিন্ন; কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাব পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র

* ঈশ্বরের তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী হওয়া, মুক্তিবিশেষ।

মানব জাতিকে সাম্যভাবে অবলোকন করিলে তাহাদের মহান্ কর্ত্তব্য অভিন্ন বলিয়াই পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত পক্ষে এই সার্ব্বভৌমিকত্বই চিরসত্য অবিনশ্বর পদার্থ। জগদীশ্বরের রাজ্যে ভেদ নাই, তুমি আমি ভিন্ন নই। তবে যেমন অসংখ্য নদী নালা বিভিন্ন পথে আগমন করত এক মহাসমুদ্রেই বিলীন হয়, অসংখ্য সম্প্রদায়ের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যও ভিন্ন ভিন্ন পথে আসিয়া একই মহৎ কর্ত্তব্যে বিলীন হইতেছে। মানবজীবনের কর্ত্তব্য বলিলে আমাদিগকে সেই মহান্ কর্ত্তব্যই বুঝিতে হইবে। এক্ষণে সংক্ষেপে উপরোক্ত বাক্যটির সত্যতানির্ণয়ে প্রয়াস পাইব।

আমরা দেখিতে পাই, সম্প্রদায়ভেদে বৈরাগীর বৈরাগ্য, শাক্তের সাষ্টি, বৈষ্ণবের প্রেমভক্তি বস্তুতঃ অভিন্ন। সম্যক পরিণতিতে বৈরাগ্যও যাহা, যোগীর আত্মদর্শনও তাহাই। বৈষ্ণবের প্রেমভক্তি ইত্যাদিও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাহা হইতে ভিন্ন নয়। এ সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন আবশ্যক বোধ করি না। তাহা হইলে প্রসঙ্গান্তরের আলোচনায় ব্যাপৃত হইতে হয়।

তৎপর—বাল্যের ব্রহ্মচর্য্য ও অধ্যয়ন, যৌবন-প্রৌঢ়ের নিষ্কাম কর্ম্মযোগে অধিকারী হইবারই শিক্ষা। আবার এই নিষ্কাম কর্ম্ম চর্চ্চাও মানবকে নিবৃত্তি পথে অগ্রসর করে।—'ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।' (নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত নিষ্ক্রিয়ভাবের উৎপত্তি হয় না অর্থাৎ জ্ঞান লাভ হয় না।) এইরূপ বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্যও মোক্ষ বা নিবৃত্তি লাভের সোপান মাত্র। তবে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য একই মহান্ কর্ত্তব্য পথে মানবকে অগ্রসর করে।

অতঃপর ব্যক্তিভেদে যে সমস্ত বিহিত আছে, তাহারও সম্যক্ অনুশীলনে মানব একই পরিণতি লাভ করে। দেবকী এক ভাবের চর্চ্চায় কৃষ্ণকে লাভ করিলেন। অর্জ্জুন অন্য ভাবের অনুশীলনে সেই কৃষ্ণকেই লাভ করিলেন। একমাত্র কৃষ্ণলাভ কর্ত্তব্যই উভয়ে বিভিন্ন অভিনয় দ্বারা নির্ব্বাহ করিলেন। অর্জ্জুন জ্ঞাতিহনন করিয়া যে কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিলেন, যোগী যোগচর্চ্চায় তদধিক কোন কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিতেছেন না। আমি গোলাকারকৃষ্ণ, শালগ্রাম শিলায় যাহার পদে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমিও বিরাট-মূর্ত্তি দশভুজা গৌরীপদে তাহারই পদে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছ। তুমি ছাত্র—অধ্যয়ন করিয়া যে কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছ, অন্যে অধ্যাপনাদ্বারাও সেই কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছে। এ গুলি প্রত্যক্ষে বিভিন্ন, কিন্তু পরোক্ষে অভিন্ন। কাজেই এতদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে,—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যগুলি যথাযথ সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে মানব তদ্দ্বারা তাহার মহান্ কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে পারে। কাজেই এগুলি মানুষের কর্ত্তব্য।

আকাঙ্ক্ষার স্বভাব

এক্ষণে আমরা মানবের একটি প্রকৃতিগত ধর্ম্ম হইতে তাহাদের কর্ত্তব্য নির্ণয়ে প্রয়াস পাইব। আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি মানবের একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বর্ত্তমানে ইহার দুই প্রকার ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর বিচারকগণ

বলেন ;—উহা বড়ই মন্দ। অবিদ্যাশ্রিত কামনাপূর্ণ মানবেরই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। এই বলিয়া তাঁহারা আকাঙ্ক্ষাকে কখন বা রাক্ষস কখন বা হুতাশন, আর সেই আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ মানবগুলিকে মহাপাপী, হেয়, বদ্ধ, অধোগমনশীল ইত্যাদি আখ্যা দিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতে থাকেন। তাঁহারা আরও বলেন,—আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিই সুখ, এবং তদ্বিপরীতই দুঃখ। অন্য শ্রেণীর বিচারকগণ বলেন—আকাঙ্ক্ষাটা স্বাভাবিক। অতৃপ্তি ইহারই ধর্ম্ম। ইহা তোমার আমার সৃষ্ট একটা কৃত্রিম নেশা নয়।

আমরা এই শেষোক্ত মতটিরই প্রাধান্য স্বীকার করি। তুমি যাহাকে ঈশ্বর বল, আমি যাহাকে প্রকৃতি-পুরুষ বলি, অন্যে যাহাকে সদৃশপরিণাম বিসদৃশপরিণাম, উদ্ভব-শক্তি-গূঢ়শক্তি ইত্যাদি কোন কিছু একটা স্বীকার করেন, এ আকাঙ্ক্ষাটা এবং তাহার অতৃপ্তি ধর্ম্মটা তাহা হইতে উৎপন্ন বা তাহা হইতে অভিন্ন। জগদীশ্বরের ইচ্ছাই বল, আর সৃষ্টি-স্থিতি রক্ষা করিবার জন্যই বল, এটার অবশ্য কোন প্রয়োজন আছে।

আকাঙ্ক্ষার স্বভাব—মানবকে উত্তেজনা দ্বারা নিত্য পূর্ণবিকাশের পথে অগ্রসর করা; এবং যতক্ষণ তাহার বিরাট উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, ততক্ষণ মুহুর্মুহুঃ অতৃপ্তির কশাঘাত করতঃ আলস্য ভঙ্গ করা। তোমার যাহা প্রয়োজন, তাহা পাইতেছ না, যাহা তোমার জীবনের কর্ত্তব্য তাহা করিতেছ না, দেখিয়াই আকাঙ্ক্ষা নিত্য তোমার বুকের ভিতর দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তিই সুখ এবং তদ্বিপরীতই দুঃখ, ইহা সত্য। কিন্তু এস্থলে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি পূর্ণতা দ্বারা বুঝিতে হইবে। ধ্বংস নহে। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা ব্যতীত ধ্বংস হইবার নয়। এইজন্যই একটি রৌপ্যচক্রে আমার অর্থের, একটি কথা শিক্ষা করায় তোমার জ্ঞানলাভের, বা একটি সুপক্ক কমলালেবুতে শিশুর আকাঙ্ক্ষা একেবারে নিবিয়া যায় না। ইহার অনন্ত ক্ষুধা অনন্ত ব্যতিরেকে পূর্ণ হইবার নয়। শান্ত জড়পিণ্ড ইহার উদরে নিক্ষেপ করিলে এ ক্ষুধা দূর হইবে কেন? তবে যদি কেবল গায় ভস্ম মাখ, সে স্বতন্ত্র কথা। জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে বা নিবৃত্ত হইবে। সুখ বা অপবর্গও লাভ হইবে। আর যতক্ষণ পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ অতৃপ্তির দুঃখ ভুগিবে। আকাঙ্ক্ষা কি তবে মন্দ? এই আকাঙ্ক্ষা তোমাকে প্রকৃতির অন্তরালে বিশ্বাত্মাকে খুঁজিয়া লইতে পরামর্শ দিতেছে না কি?

সৃষ্টিতত্ত্ব

তবে দেখা যায়, আকাঙ্ক্ষার স্বভাব দ্বারাও মানবের কর্ত্তব্য সূচিত হইতেছে। এক্ষণ আমরা সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় মানবের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে কিঞ্চিৎ প্রয়াস পাইব। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতের বিভিন্নতা থাকিলেও প্রত্যেকেই জাগতিক মৌলিক উপাদানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, এবং উক্ত উপাদান কোন অভাবনীয়-শক্তির প্রভাবে এই ব্যক্ত জগত নির্ম্মাণ করিতেছে ইহাও তাহাদের স্বীকার্য্য।

সাংখ্যযোগে দৃষ্ট হয় ;—গূঢ়, অব্যক্ত ও অলিঙ্গ প্রকৃতি হইতে মহতের উৎপত্তি এবং

মহৎ হইতে অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রের উদ্‌ভব হয়। উক্ত অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র ক্রমে জীবজগৎ ও জড়জগৎ উৎপত্তির দুইটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ শাখা। ইহাদের একদিকে অহঙ্কার হইতে ক্রমে একাদশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন) জীবের সৃষ্টি, এবং অন্য দিকে পঞ্চ তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) হইতে অগ্নি, জল, পৃথিবী, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূত হইতে দ্রব্যের উদ্‌ভব হইয়াছে।

প্রকৃতি সত্ত্ব-রজঃ-তম এই ত্রিগুণবিশিষ্টা এবং মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি ও তদুৎপন্ন অহঙ্কারও এই ত্রিগুণযুক্ত। আবার দেখা যায় অব্যক্ত প্রকৃতি, মহৎ ও অহঙ্কার ইত্যাদি রূপান্তরিত হইয়া ক্রমে ব্যক্ততার দিকে আসিতেছে। ইহাতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই অব্যক্ত প্রকৃতি আর এই সাম্যাবস্থার ধ্বংসই ব্যক্ত জগৎ। তবে দেখা যায় এই পরিদৃশ্যমান জগৎ গূঢ়, অব্যক্ত অলিঙ্গ ও অবিনাশী প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। প্রকৃতির অলিঙ্গত্ব, অরূপত্ব, সত্ত্ব-রজঃ-তম এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার ভাব। পুরুষ প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া শক্তির উদ্বোধন করতঃ গুণত্রয়ের এই সাম্যাবস্থা বিনাশ করিলে সৃষ্টির সূচনা আরম্ভ হয়। এই সাম্যাবস্থার পরিবর্ত্তন সৃষ্টি, আর বৈষম্যাবস্থা হইতে সৃষ্ট জগৎ নিত্য সাম্যাবস্থার পথে অগ্রসর হইতেছে বলিয়াই জগত পরিবর্ত্তন-শীল। একটা উদ্‌ভব-শক্তি ও একটি গূঢ় বা লয়-শক্তি নিত্য একে অন্যে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যখন উদ্‌ভব-শক্তি বা গুণত্রয়ের বৈষম্যাবস্থা অপেক্ষা গূঢ়-শক্তি বা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা অধিকতর কার্য্যকরী হইবে, তখনই সৃষ্টি বিষয়ের পথে অগ্রসর হইবে। উৎপত্তি অপেক্ষা ধ্বংসশক্তির ক্রিয়া অধিক হইলেই প্রলয়ের সূচনা, এবং এই উদ্‌ভব-শক্তি ধ্বংস-শক্তিতে বিলীন হইলেই সৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া সেই অরূপ, অলিঙ্গ ও অব্যক্ত প্রকৃতি মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সংক্ষেপে এ কথাটি বলিয়া গিয়াছেন :—

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥"

তবে দেখা যায় এইরূপ একটা ক্রমিক আবর্ত্তন ধারণাতীত কল্পনাতীত কাল আবর্ত্তিত হইবে অথবা বিলয় হইবে। কবে কি যে হইবে, তাহা মনুষ্য-বুদ্ধির অনায়ত্ত।

এইক্ষণ ইহা দ্বারা মানবের কোন কর্ত্তব্য সূচিত হইতেছে, তাহাই আমাদের দেখা কর্ত্তব্য।

যাহারা পাশা খেলেন, তাহারা অবশ্যই জানেন যে, পাশার গুটি সমগ্র ঘরগুলি পরিভ্রমণ করিয়া যত শীঘ্র মধ্যের ব্রহ্ম লোকটিকে আশ্রয় লয়, ততই লাভ। অনেক বাজি খেলিলে গুটিগুলি ব্রহ্মলোক হইতে আবার কিন্তু মর্ত্যলোকে ভ্রমণ করে, আবার ব্রহ্মলোকে যায়। খেলা যতক্ষণ ভঙ্গ না হয়, ততক্ষণ গুটিগুলির এই প্রকার আবর্ত্তনই চলিতে থাকে। আধুনিক গোলকধাম খেলাটাও ইহার বেশ দৃষ্টান্ত। কখন কখন গুটি দীর্ঘ প্রমোশন পায়, আবার কখন কখন পাকাগুটি একেবারে কাঁচিয়া যায়। খেলাতে জয়ী হওয়ার যে রীতি, জীবনে জয়ী হওয়ারও সেই রীতি। কোটী কোটী জীবদেহ পরি-ভ্রমণ করিয়া জীবাত্মা মানবদেহে প্রবেশ

করে, তখন পাকা গুটি দানের দোষে অর্থাৎ কার্য্যদোষে যাহাতে কাঁচিয়া না যায়, পরন্তু যাহাতে অচিরে গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারে, তাহাই মানবের কর্ত্তব্য।

এই স্থানে কর্ম্মকাণ্ডের কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। কর্ম্মফল ভোগ এবং কর্ম্মফল সৃষ্টি করিবার জন্যই দেহ-ধারণ। দেহী ব্যতীত কর্ম্মফল ভোগ হয় না এবং অভিনব কর্ম্মপ্রবাহ সৃষ্টিও হইতে পারে না। এই জন্যই জীব কর্ম্মাধীন এবং জীবন কর্ম্মময়। জীবের এই প্রকার কর্ম্মপ্রবাহ ব্যতীত সৃষ্টি রক্ষিত হয় না। যেমন পাশার দান না দিলে খেলা চলে না। কাজেই জীবনে মানবকে এমনভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে যে যেন অধঃপতিত হইতে না হয়, পরন্তু ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইতে পারা যায়। এই কর্ম্মানুষ্ঠানই শ্রীভগবান্-কথিত নিষ্কাম-কর্ম্ম এবং এই প্রকার নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠানই মানব জীবনের কর্ত্তব্য।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥

মানবের ব্যষ্টি-ও সমষ্টি-গত কর্ত্তব্য

ইতঃপূর্ব্বে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে আমরা মানবজীবনের লক্ষ্য অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি, এবং যে কার্য্যদ্বারা সেই উচ্চতম লক্ষ্যে পৌছিতে পারা যায়, তাহাই যে মানবের সমষ্টি ও ব্যষ্টিগত কর্ত্তব্য ইহাও আমাদের একপ্রকার ধারণা জন্মিয়াছে। এইক্ষণ দেখিতে হইবে যে, সমাজ আমাদিগকে যে কার্য্য করিতে আদেশ দেয় বা বাধ্য করে, তাহা প্রকৃতপক্ষে আমাদের কর্ত্তব্য কি না; এবং সমাজের অধীন থাকিয়া সামাজিক সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানই যদি পালন করা যায়, তবে তাহাতে মানবের গন্তব্য পথের প্রতিকূলে কোন কর্ম্মফল উৎপাদিত হওয়া সম্ভবপর কি না। উচ্চতম সভ্যজাতি হইতে নিম্নতম অসভ্যজাতি পর্য্যন্ত বিভিন্ন সমাজে সামাজিক আচার-ব্যবহারের অনেক ভেদ পরিলক্ষিত হয়। এক সমাজ অন্য সমাজের অনেক আচার-ব্যবহারের পক্ষপাতী নহেন। আবার সকলেই নিজ নিজ সমাজের কার্য্যাদি যুক্তিতর্কের সাহায্যে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ইহার মধ্যে কোন্‌টি সত্য এবং করণীয়, কোন্‌টিই বা পরিত্যাজ্য, যদ্দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত করিবার ক্ষমতা জন্মে, তাহা লাভ করাও মানবের কর্ত্তব্য। ইহারই নাম জ্ঞান।

একশ্রেণীর লোকগণ বলেন;—বিশ্বাসই মূল। লক্ষ্যের দিকে অবিচলিত দৃষ্টি রাখিয়া যে পথেই দৌড়াইয়া ছুট না কেন, লক্ষ্যে পৌছিতে পারিবে। কিন্তু কথাটা কেমন লাগে। আমি হয়তঃ অন্ধকার রাত্রিতে দূরস্থিত আলোক লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইয়া ছুটিয়াছি, পথের দিকে আর লক্ষ্য করিতেছি না। সম্মুখে নদী নালা পড়িল—নৌকার অন্বেষণ করিলাম না, সাঁতারও দিলাম না, কেবল দৌড়িলাম; এইক্ষণ আমি নদী দেখি নাই বা নদী সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নাই বলিয়াই যে নদীতে ডুবিব না, এমন কথা ত বিশ্বাস করিতে পারি না। পূর্ব্বে মাতা অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই প্রথম সন্তান গঙ্গা-সাগরে নিক্ষেপ করিতেন। জাপানীরাও দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই স্বর্গগত সম্রাটের অনুগমন করেন। এবংবিধ কার্য্যে দৃঢ়বিশ্বাস

থাকিলেই যে বধাদি জন্য বা আত্মহত্যা জন্য মানবের অধঃপতন ঘটিবে না, তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। শাস্ত্রে যে প্রজ্ঞাপরাধ (ধীধৃতিস্মৃতি বিভ্রষ্টঃ কর্ম্ম যৎ কুরুতেঽশুভম্ প্রজ্ঞাপরাধং তং বিদ্যাৎ) কথিত আছে, তাহা কি ? না জানিয়া বিষপান করিলে কি মৃত্যু হয় না ?

বিশ্বাস বা ধারণা বিচারের কঠোর পরীক্ষা ব্যতীত বিশুদ্ধ হয় না। বেদান্তশাস্ত্রবর্ণিত অধ্যাস বা অধ্যারোপ (বস্তুনো বস্ত্বন্তরারোপঃ। অসর্পভূতরজ্জৌ সর্পারোপবৎ) এবম্প্রকার ভ্রমমূলক জ্ঞানমাত্রই। অজ্ঞানতাহেতু অসত্যকে সত্য বলিয়া অতিসহজেই আমাদের মনে স্বভাবতঃ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতে পারে। কিন্তু এই প্রকার বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে তাহাতে নিশ্চয়ই পতন সম্ভাবনা সন্দেহ নাই। কাজেই জ্ঞানলাভ করা মানবের আদি কর্ত্তব্য।

সুদূর অতীতে যখন ক্রমে বেদের সুতীক্ষ্ণ আলোক অবিদ্যাশ্রিত মানবের হৃদয়কন্দরে প্রবেশলাভ করিতে সক্ষম হইতেছিল না, যখন মানব ক্রমে মিথ্যাজ্ঞানের মোহে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছিল, সেই সময় হইতেই প্রাচ্য মনস্বিগণ ক্রমে দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়া নিজ নিজ মতের সমর্থন করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় হইতে বর্ত্তমান কালের সাধু সন্ন্যাসী প্রচারকগণ পর্য্যন্তও কতিপয় শিষ্য সংগ্রহ করিয়া এক একটা নূতন সম্প্রদায় গঠিত করিতেছেন এবং এক এক মতের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে মানবজীবনের কর্ত্তব্য বিধান বিষয়ে কত যে বিভিন্ন পন্থা ও তাহার শাখাপ্রশাখা আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ইহার মধ্যে কোন্‌টি জ্যেষ্ঠ কোন্‌টি কনিষ্ঠ, কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, কোন্‌টিই বা অপকৃষ্ট, তাহাও নির্ণয় করা সহজ নয়। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন, আমি একটি নূতন পন্থা সৃষ্টিকারী উন্নত জীব নই, অথবা একটা পন্থা আবিষ্কার করিয়া লইয়া জীবনের কর্ত্তব্য বিধান করা আমার প্রবন্ধ অবতারণার উদ্দেশ্য নয়। ফল কথা,— বহুদিনের কতগুলি চিন্তাস্রোত আমার ভ্রান্তিটাকে ক্রমশঃ বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। এটা সেই ভ্রান্তিমূলক প্রলাপ মাত্র।

আমরা দেখিতে পাই, সেই অতীতকালে মানবের অধঃপতনের সূচনা হইতেই 'গুরু'র সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। উর্দ্ধ হইতে পতিত বস্তুর প্রতি মাধ্যাকর্ষণের বল যেমন ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, অধঃপতিত মানবের গুরুর সংখ্যা অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে তেমনই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। আর ভিন্ন ভিন্ন গুরুর পরিচালনায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্টি হইতেছে। ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বুঝিতেছি যে, উপাসনা-ক্ষেত্রে পূর্ব্বে মানব স্বাবলম্ব ছিল, আর এখন ক্রমে সেই ধ্যান-ধারণায় অশক্ত হইয়া মূর্ত্তিপূজায় মনোনিবেশ করিয়াছে। এক্ষেত্রে মানব নিজের বলে নিজে দাঁড়াইতে পারিতেছে না, পরকে আশ্রয় করিতেছে। কিন্তু আচার-ব্যবহারে স্বাধীনতা ক্রমশঃই বাড়িতেছে, সমষ্টিগত কর্ত্তব্য ক্রমেই ব্যষ্টিগত হইয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমানে শিক্ষিত বলিলে যাহাদিগকে বুঝায়, তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বমতের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছেন। এই

দুইটি গতি কিন্তু পরস্পর বিপরীতমুখী। সমষ্টিগত পন্থা লুপ্ত হইয়া বিভিন্ন মানবের বিভিন্ন বিধানানুযায়ী কর্ত্তব্যপথের সৃষ্টি হইলে মানবের স্বাবলম্বন-শক্তির আধিক্য বুঝায় না কি? কিন্তু এই প্রকার স্বাবলম্বন-শক্তির অনুমোদিত কার্য্যে পূর্ব্বোক্ত 'প্রজ্ঞাপরাধ' জন্মিতে পারে কি না, তাহা কিন্তু আমরা জ্ঞানের অপূর্ণতাহেতু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার মনে হয়, যে দুর্ব্বল জাতি অজ্ঞানতার আধিক্যহেতু উপাসনাক্ষেত্রে স্বাবলম্বন-শূন্য হইয়া ধ্যান-ধারণায় অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে, আহারাচারে ও অন্যান্য কর্ত্তব্যবিধানে তাহাদের স্বাধীনতা অন্ধতামূলক সন্দেহ নাই।

উদ্দেশ্য ও অনুষ্ঠান

সে যাহা হউক, এ অবস্থায় সংক্ষেপতঃ একটি বিধান আছে বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানে নিয়োজিত হইবার পূর্ব্বে মানবকে অনুষ্ঠান ও উদ্দেশ্যের লঘুত্ব-গুরুত্ব লক্ষ্য করা উচিত। উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান পন্থা, আর উদ্দেশ্য গন্তব্যস্থান। সুতরাং পূর্ণবিকাশই যদি মানবের উদ্দেশ্য থাকে, তবে যে কোন প্রকার অনুষ্ঠান সেই উদ্দেশ্যের অনুকূল হয়, তৎসমস্তই মানবের করণীয়। অতএব অনুষ্ঠানটি উদ্দেশ্যের অনুকূল কি না, তাহাই প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি নির্ণয়ের ইহাই একমাত্র উপায়।

অনেক অবান্তর কথায় প্রবন্ধ-বিস্তৃতি ঘটিতেছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কার্য্যাবলীর দোষগুণ বিচার করিয়া একটা কর্ত্তব্যের বিস্তৃত তালিকা নির্দ্ধারণ করা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, আর অসম্পূর্ণ জ্ঞান লইয়া প্রবন্ধ লেখকের এবংবিধ চেষ্টা করা দুঃসাহস। তবে চঞ্চলমতি বালকগণ স্বীয় হৃদয়োদ্ভূত বিভিন্ন ভাব ও অভিযোগ সমূহ অভিভাবকের নিকট ব্যক্ত করিয়া যে আনন্দ ও উপদেশ লাভ করে, আমি স্বীয় ভাবভারগ্রস্ত হৃদয়ের মীমাংসাহীন এলোমেলো অবস্থাটা আপনাদিগকে প্রদর্শন করত তদ্রূপ তৃপ্তি ও উপদেশ লাভ করিতে পারিব, ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধ অবতারণার উদ্দেশ্য।

উপসংহারে কেবল স্বীয় হৃদয়নিহিত একটি ভাব পাঠকগণের সমক্ষে ব্যক্ত করিয়াই বিদায় গ্রহণ করিব। মানব যে স্থান হইতে আসিয়াছে, আবর্ত্তের নিবৃত্তিতে আবার সেই স্থানেই ফিরিয়া যাইবে। পূর্ব্বাপর আলোচনায় আমরা এই একমাত্র সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি। জাগতিক আবর্ত্তনে আমরা কোথা হইতে কোথায় ছুটিয়া যাইতেছি, তাহা ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বিভিন্ন সমাজ আমাদিগকে যে উপদেশ দিতেছে, তাহা করণীয় কি না স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কোন্ পথ ছাড়িয়া কোন পথ অবলম্বন করিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। এইরূপ সঙ্কটময় অবস্থায় পতিত মানবের ভগবৎ-কৃপা-ভিক্ষা ভিন্ন আর কর্ত্তব্য কি? যিনি অচিন্ত্য-শক্তিবলে জগত নির্ম্মাণ করিতেছেন, ধ্বংস করিতেছেন, যাঁহার ইচ্ছা-শক্তিতে নিয়ন্ত্রিত হইয়া এই জড় ও জীবজগৎ অনন্তকাল আবর্ত্তিত হইতেছে, সেই শরণ্য, বরেণ্য, অনন্ত, অবিনশ্বর মহাপুরুষে আত্ম-সমর্পণ এবং তাঁহারই কৃপা-ভিক্ষা ভিন্ন দুর্ব্বল

মানবের আর কোন সুগম পন্থা নাই। তোমার কর্ত্তব্য তুমিই করিয়া যাও; আমি তোমারই ইঙ্গিতে হাসিয়া কাঁদিয়া তোমাতেই বিলীন হই, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় তোমারই বাসনা-স্রোতে গা ঢালিয়া দেই, তুমি যথা ইচ্ছা লইয়া যাও। ইহাই তোমার উপদেশ এবং ইহাই আমার কর্ত্তব্য।—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

গৌড়-রাষ্ট্রে পদাতিক মদনের মন্ত্রিত্বলাভ

("সেক শুভোদয়া"-অবলম্বনে)

মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের ধনুর্বিদ্যা প্রদর্শন

একদা প্রাতঃকালে মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেনদেব অমাত্যগণ পরিবৃত হইয়া যথেচ্ছসুখে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে শ্রীমান্ শাহজালাল তব্‌রেজি গাত্রোত্থান করিয়া রাজসম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন—"কলিকালে আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুল্য—আপনার ন্যায় রাজা দৃষ্ট হয় না, আপনি ঈশ্বরানুগ্রহে শব্দভেদী বিদ্যালাভ করিয়াছেন এবং ইহার সেবা করিয়া আপনি সকল লোকের পূজ্য হইয়াছেন; পাশ্চাত্য-দেশেও আপনার ন্যায় ব্যক্তি দৃষ্ট হয় নাই। আপনি "গঙ্গাতীরং গত্বা আত্মনো ধনুর্বিদ্যাং দর্শয়।"* আপনার ধনুর্বিদ্যা দেখান। তাহা হইলে আপনার শৌর্য্য লোকসমাজে অধিকতর বিখ্যাত হইয়া পড়িবে এবং আপনি যে বর্ত্তমানকালে একমাত্র ধানুষ্ক তাহা বীরগণের গোচরীভূত হইবে।" মহাত্মা সেকের আশীষ-বচন শ্রবণে, মহারাজ অমাত্যগণ ও সৈন্য-সামন্তবর্গকে সজ্জিত হইতে আদেশ করিয়া মহাধনু হস্তে গাত্রোত্থান করিলেন এবং অমাত্য ও সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া গঙ্গাতীরে শুভাগমন করিলেন। মহাত্মা পরমধার্ম্মিক সেক সসম্মানে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন।

শৌণ্ডিক বধূর কর্ণপত্ররন্ধ্র-ভেদ

নগরবাসী জনগণ মহারাজের ধনুর্বিদ্যা সন্দর্শন মানসে দলে দলে গঙ্গাতীরে গমন পূর্ব্বক প্রশস্ত প্রান্তরে সমবেত হইল। সৈন্যগণ যথাস্থানে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইলে, মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব দেখিলেন জনৈক শৌণ্ডিক বধূ গঙ্গাস্নানপূর্ব্বক কলসী কক্ষে আগমন করিতেছে, তাহার কর্ণে "কর্ণয়োত্তান-পত্র" নামক কর্ণভূষণ বস্ত্রাবৃত থাকিয়াও মৃদুমন্দ ধ্বনি বিস্তার করিতেছে—সেই ক্ষুদ্র শব্দ লক্ষ্য করিয়া মহাধনু হইতে ক্ষুদ্র একটি শর নিক্ষেপ করিবামাত্র উহা কর্ণপত্ররন্ধ্র ভেদ করিয়া চলিয়া গেল।

* সেক শুভোদয়া হইতে অবিকল উদ্ধৃত

মাগধগণ কর্ত্তৃক রাজস্তব

সমাগত জনসঙ্ঘ হইতে 'ধন্য ধন্য' রব উত্থিত হইল। মাগধভাটগণ মহারাজের প্রশংসা-সূচক গাথা গান করিতে আরম্ভ করিল এবং বারম্বার বলিতে লাগিল "আর্য্যা। স্বস্ত্যস্ত্ত পাণ্ডু-বিষয়ে শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন মহাবীর কর্ণরন্ধ্রে ভেজে তীর।"*

পদাতিক মদনের ব্যঙ্গগাথা

ভাটগণের স্তুতিবাদে এবং জনগণের ধন্য ধন্য রবে যখন ক্রীড়াভূমি মুখরিত হইতেছিল সেই সময়ে 'মদন' নামক একজন পদাতিক বলিতে লাগিল যে—"রাজা কি বড় বীর অভ্যাসের কারণে 'ভেজে তীর !'* মদন পদাতিকের বারংবার এই কথা শ্রবণে সমাগত জনগণ মধ্যে কেহ কেহ মদনকে এই প্রকার শব্দ উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিলেও মদন ঐ প্রকারে রাজনিন্দা করিতে বিরত হইল না।

মদনের বিপদ

মদনের হিতাকাঙ্ক্ষিগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিল—"হে মূঢ় কি বলিতেছ, আপনার মৃত্যু আপনি আহ্বান করিতেছ ? তোমার কথা একজনের কর্ণ হইতে অপর কর্ণে গমন করিতে করিতে রাজ-কর্ণে শীঘ্র প্রবিষ্ট হইবে—তোমার নিকট অবস্থান করাও দোষাবহ—আমাদের বিপদ সম্ভব হইয়া উঠিতেছে, তুমি এই কুবাক্য বলিতে বিরত হও।" মদন অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং বারংবার উক্ত বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে উচ্চকণ্ঠে বলিল—"আমি উমাপতিধর মন্ত্রীর পদাতিক, আমার শঙ্কা কি ?" ক্রমে মদনের রাজনিন্দাবাদ মহারাজের কর্ণে গুপ্তচরগণ উপস্থাপিত করিলে, মহারাজ জনৈক সেবককে উমাপতিধর মন্ত্রীকে আনয়নার্থ আদেশ করিলেন। মন্ত্রী রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিলেন। রাজা ক্রোধের বশীভূত হইয়া মন্ত্রীকে বলিলেন, "তোমার পদাতিক কি বলিতেছে, অবগত হইয়াছ কি ?"

রাজমন্ত্রীর বিপদ

মন্ত্রী বলিলেন—"এক্ষণে আপনার প্রত্যাগমনের সময় হইয়াছে—যথাসময়ে ইহার বিচার করিব।" রাজা মন্ত্রীর কটীদেশ ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিলেন এবং সেককে নিকটে দর্শন করিয়া বলিলেন—"আপনি দুষ্ট মন্ত্রীর পক্ষে কোন কথা বলিবেন না। এই দুরাত্মা মন্ত্রীর সাক্ষাতে উহার একজন সামান্য পদাতিক আমার নিন্দা করিতেছে, তত্রাচ মন্ত্রী উহাকে নিবারণ করে নাই। এ প্রকার দুষ্ট মন্ত্রীর শিরশ্ছেদন কর্ত্তব্য, যে কেহ ইহার হত্যাব্যাপারে বাধাপ্রদান করিতে উদ্যত হইবে তাহারও মন্দ হইবে।" এই প্রকার বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে একজন সেবককে আদেশ করিলেন "এই দুষ্ট মন্ত্রীর শিরশ্ছেদন-কার্য্য সম্পাদন কর।" মন্ত্রী কোন প্রকার বাক্য উচ্চারণ না করিয়া অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিলেন।

সেক-বাক্য

অতঃপর মহাত্মা সেক রাজ সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন—"হে রাজন, এ কি প্রকার দৃশ্য উপস্থিত হইল, পরকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অপবাদ হেতু

* সেক শুভোদয়া হইতে অবিকল উদ্ধৃত

অপর ব্যক্তিকে দণ্ডিত করিয়া আপনার কি সুখ বোধ হইবে? অগ্রে মদনের ব্যবহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তৎপরে শাস্তির উপযুক্ত পাত্রকে দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করুন।" মহারাজ ধার্ম্মিক সেককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনি ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত নহেন কি? এই দুষ্টই আপনাকে বিস-প্রয়োগ দ্বারা হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল!"

সেকোপদেশ

সেক বলিলেন—"মহারাজ সে ত আপনারই কল্যাণ কামনার্থে উক্ত কার্য্য করিয়াছিল! দেখুন ভৃত্যের অপরাধে প্রভুর দণ্ড বিধান করিতেছেন, ইহা স্মরণ রাখিবেন। আপনার ভৃত্য এই মন্ত্রী, আপনি মন্ত্রীর প্রভু, সুতরাং এ পক্ষেও সূক্ষ্ম বিচার করিবার প্রয়োজন আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে।"

মদন ও সেক

অতঃপর পণ্ডিত সেক, মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ওহে মন্ত্রি! তোমার সেবক মদনকে আনয়ন কর।" পদাতিকগণ-পরিবেষ্টিত মদন রাজসমীপে আনীত হইল। এক জন পদাতিক রাজসম্ভাষণ করিয়া বলিল—"এই সেই মদন নামক পদাতিক, এই ব্যক্তিই সেই গাথা গান করিতেছিল।" পদাতিক মদন রাজসম্ভাসণ না করিয়া পূর্ব্বগাথা গান করিল। সেক বলিলেন—"ওহে মদন তুমিই কি এই গাথা গান করিতেছিলে?" মদন নির্ভয়ে বলিল—"আমিই এই গাথা গান করিয়াছি, আমার নামই মদন।" সেক পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কত বেতন পাইয়া থাক?" মদন বলিল—"যজ্জোটিক নিত্যাক্ষক কপর্দ্দকং প্রাপ্তং।"* সেক বলিলেন—"উত্তম, তুমি কোন্ কার্য্য কর?" উত্তর হইল—"আমি ধানুষ্কী।" সেক বলিলেন—"বেশ, তোমার বেতনের কথাও অবগত হইলাম, তুমি একজন ধানুষ্ক তাহাও অবগত হইলাম—এক্ষণে তোমার গুণের কিছু পরিচয় দাও দেখি? ওহে মদন তোমার চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ কর, কত মহা মহা ধানুষ্ক বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইহাঁরা বহুগুণশালী তুমি অল্পগুণশালী বলিয়া যদি উপেক্ষিত হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমার গুণের পরিচয় দ্বারা মহৎ হইতে চেষ্টা কর।"

মদনের ধনুর্বিদ্যার পরিচয়

মদন নম্র বচনে সেককে সম্বোধন করিয়া বলিল "হে ধার্ম্মিক! আমি স্বল্পজীবী, আমি গুরু কার্য্যদ্বারা আমার গুণ অবশ্য প্রদর্শন করিব।" সেক বলিলেন, "উত্তম, উত্তম, এক্ষণে কি আবশ্যক?" মদন বলিল "চতুর্হস্ত প্রমাণ পাটখণ্ড প্রদান করুন।" সেবকগণ তাহা আনয়ন করিল। মদন বলিল, "উহা গঙ্গাজল মধ্যে স্থাপন করুন।" তাহাই হইল, তৎপরে মদন "সপ্তাধিক শতদ্বয়ং"* শর প্রার্থনা করিবামাত্র প্রাপ্ত হইল। ধনুক-সাহায্যে উক্ত শরগুলি যেস্থানে পাটখণ্ড নিমজ্জিত রহিয়াছে, তথায় নিক্ষেপ করিলে উক্ত পাটখণ্ড একটি বিচিত্র ময়ূররূপে গঙ্গাজলে ভাসিয়া উঠিল। মদন যে পদাতিক দলভুক্ত ছিল সেই দলভুক্ত পদাতিকগণ মদনের মহৎ জয় ঘোষণা করিল।

মদনের লাঠি-ক্রীড়া

সেক বলিলেন—"দেখ মদন অদ্য হইতে তোমার দশগণ্ডা কড়ি দৈনিক বেতন ধার্য্য

* সেক শুভোদয়া হইতে অবিকল উদ্ধৃত।

হইল। যদি তোমার অন্য কোন গুণ বিদ্যমান থাকে তাহা দেখাও।" মদন বলিল—"সপ্তহস্তি নত মমাগ্রে স্থিরতাং। পুনরপি হস্তিবাহকঃ শস্ত্রপাণির্ভূত্বা অবতিষ্ঠন্তু। পৃষ্ঠে সব্যে দক্ষিণে ক্রোড়ে চ সংপ্রাপ্তে সর্ব্বে হস্ত যথাশক্ত্যা ময়া চূর্ণমণ্ডিত লগুড় সমানীয় তান্ ঘাতয়ামি।" * আরও দেখুন যে যাহাকে হত্যা করিতে পারে উভয়ের মধ্যে তাহার যেন ত্রুটী না হয়। এই প্রকার কৌতুক সময়ে যদ্যপি আমি মৃত্যুমুখে পতিত হই, তাহা হইলে মহারাজের হৃদ্গত শল্য উৎপাটিত হইবে। এক্ষণে যাহার যত বিক্রম প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিও না। মদন চূর্ণমণ্ডিত লাঠি চালনা করিল।

মদনের জয়

অপর সকলে মদনকে বধকামনায় অস্ত্র চালনা করিল, অল্পকাল মধ্যে দেখা গেল মদনের লাঠিস্থিত চূর্ণের দ্বারা বিপক্ষগণের দেহ চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে 'ধন্য ধন্য' রব উত্থিত হইল। সেক বলিলেন—"মদন স্থির হও, তোমার মাসিক বেতন এক পণ ধার্য্য হইল। এক্ষণে যদি তোমার অন্য কোন গুণ থাকে দেখাও—বেতন বৃদ্ধি হইবে।"

মদনের অলৌকিক কার্য্য

মদন বলিল—"অক্টকোপরি বিদ্ধাল স্থীয়তাং দক্ষিনা পঞ্চ বামে চতুঃ পশ্চাত্ত্রয়মালী, ততোহং সমপদোকৃত্বা একৈক শরেণ সর্ব্বানপি ভেদয়ামাস।" * এই প্রকার অলৌকিক কার্য্য সন্দর্শনে সমাগত জনগণ মদনের জয় ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিল এবং বীরগণ মদন উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিল 'একমাত্র মদনই এই রাজ্যের মধ্যে ধানুষ্ক'। মদনের এই প্রকার প্রশংসা শ্রবণে মহারাজ মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ভীত হইলেন।

মদনের রাজ-সম্মান

সেক বলিলেন, "আমি বর্ত্তমানে আপনার কোন প্রকার ভয়ের কারণ নাই, আপনি সুস্থ হউন। ধানুষ্ক মদন পদাতিককে রাজপ্রসাদ প্রদান করুন।" রাজা বলিলেন, "মদনকে কি দিব!" সেক বলিলেন, "কতকগুলি মুদ্রা প্রদত্ত হউক।" মহারাজ মদনকে যথেষ্ট মুদ্রা প্রদান করিয়া নিজ কণ্ঠস্থিত সুবর্ণচম্পকহার মদনের গলে পরাইয়া দিলেন।

সেকের মহত্ত্ব

সেক পুনশ্চ মদনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওহে মদন, তোমার গৃহে কি পিতা মাতা বিদ্যমান আছেন?" মদন উত্তর করিল "কেহই নাই।" তাহার পর মহাত্মা সেক মহারাজ ও অমাত্যগণকে সম্বোধন করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"অমাত্যগণ সহ মহারাজ শ্রবণ করুন, মদনের ন্যায় গুণবান বীরের পূজা যে প্রকারে করিতে হয় তাহা আমি করিতেছি, আমার এই মহৎ কার্য্যে কেহ বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না, আমার এই মহৎ কার্য্যে কাহার বাধা দিবার শক্তিও নাই।"

বীরপূজা

"বীরের পূজা বীর ব্যতীত কাহারও করিবার অধিকার নাই। মদন, আমার নিকট

* সেক শুভোদয়া হইতে অবিকল উদ্ধৃত।

আইস। তোমার দ্বারাই আমি গৌড়ভূমিতে বীর-পূজার অনুষ্ঠান করিব! বীরের সম্মান অতি উচ্চ, অতি পবিত্র।"

পদাতিক মদনের রাজমন্ত্রিত্বলাভ

এই বলিয়া ধার্ম্মিক সেক মন্ত্রীর পরিচ্ছদে, মন্ত্রীর ভূষণে মদনের দেহ সজ্জিত করিয়া দিলেন—মহারাজ লক্ষ্মণসেন মদনের কণ্ঠে মণিময় রত্নহার পরাইয়া দিলেন। কটীদেশে স্বর্ণমণ্ডিত অসিফলক লম্বিত হইল, প্রধান সেনাপতির মুকুটে মদনের কৃষ্ণ কেশদাম অৰ্দ্ধাবরিত হইয়া শোভা পাইল। মদন সেনাপতিত্বে ও মন্ত্রিপদে বৃত হইলেন—পবিত্র জাহ্নবীতীরে গৌড়নগরোপকণ্ঠে গৌড়ীয় বীরের পূজা সমাপ্ত হইল। সুমধুর বাদ্যভাণ্ড বাদিত হইল, নৰ্ত্তকী নৃত্য করিল, ভট্টগণ মদনের জয়গান সহ রাজা ও সেকের মহিমা কীৰ্ত্তন করিতে করিতে সৈন্যগণ সহ রাজ-প্রাসাদে গমন করিলেন।

পরিশিষ্ট

পদাতিক মদন মন্ত্রিত্বলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমগ্র নামটি প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। যদি সেক শুভোদয়ার কথা সত্য হয়, তাহা হইলে সেনরাজগণের মন্ত্রিতালিকায় একজন মন্ত্রীর নাম বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। মন্ত্রী মদনের অপরাপর কাহিনী লিখিত হইতেছে। সুতরাং এ স্থলে আর পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন দেখিলাম না। 'মদনাবতী' শীর্ষক অধ্যায়ে মদনের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইবে।

শ্রীকৃষ্ণচরণ সরকার,
জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি, মালদহ।

কবি আলাওল *

মুসলমান মহাকবি সুপ্রসিদ্ধ "পদ্মাবতী"-রচয়িতা সৈয়দ আলাওল সাহেব এখন সকলের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার কাব্য-সুধাপানে কাব্যামোদিগণ যেমন বিভোর, কাব্যরস-পিপাসু অশিক্ষিত জনগণও (শিক্ষিত পাঠকের মুখে) তাঁহার সুমধুর কবিত্ব রসাস্বাদনে তেমনই আগ্রহান্বিত। তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ এবং প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার আবির্ভাবে বঙ্গসাহিত্য সমধিক উপকৃত এবং মুসলমান-সমাজ বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অদ্যাপি তাঁহার বিস্মৃত-জীবনের কোন খবর আমরা জানি না এবং তাহা জানিবার জন্য এ পর্য্যন্ত আমাদের দ্বারা কোন চেষ্টাই হয় নাই। তাঁহার রচিত কাব্যাদি হইতে তৎসম্বন্ধে যে সামান্য কথাগুলি জানিতে পারা যায়, তাহাই মাত্র লোকসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় মাতৃভূমির সুসন্তানের জীবনী সংগ্রহে আমাদের এই যত্ন-শৈথিল্য নিতান্ত ক্ষোভ ও লজ্জার কথা, সন্দেহ নাই। হিন্দু মুসলমান সকলেরই তদীয় জীবনবৃত্ত-সংগ্রহে যত্নশীল হওয়া একান্ত কৰ্ত্তব্য। তৎপ্রতি বঙ্গসাহিত্য-সেবিগণের মনোযোগ আকর্ষণই

* 'জ্যোতিঃ' হইতে উদ্ধৃত

অন্তকার এই প্রবন্ধাবতারণার প্রধান উদ্দেশ্য।

এ পর্য্যন্ত আলাওলের পাঁচখানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৎসমুদয়ের নাম এই,—(১) পদ্মাবতী (২) সয়ফল মুল্লুক ও বদিয়ুজ্জামাল; (৩) সেকান্দর নামা; (৪) সপ্তপয়কর এবং (৫) তোহফা। শেষোক্ত গ্রন্থখানি মুসলমান-শাস্ত্রসম্বন্ধীয় এবং অবশিষ্ট সবগুলি সুন্দর কাব্য গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত তিনি বৈষ্ণব পদ ও সুকবি দৌলত কাজী বিরচিত "লোর চন্দ্রানী,—সতী ময়নাবতী" পুঁথির শেষাংশও রচনা করিয়া গিয়াছেন। ৫ম গ্রন্থখানি ভিন্ন অপর সবগুলি এখন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

আলাওল প্রাচীন গৌড়ের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ জালালপুর নামক স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তখন এই ফতেয়াবাদে মজলিস কুতুব নামধেয় জনৈক রাজা রাজত্ব করিতেন। আলাওলের পিতা তাঁহার অমাত্য ছিলেন। স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" এই ফতেয়াবাদকে ফরিদপুরের অন্তর্গত জালালাবাদ পরগণায় স্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মজলিস কুতুবকে তিনি সমসের কুতুব নামে পরিচিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এরূপ সিদ্ধান্তের অনুকূলে তিনি কোন প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই।

কবি আলাওল রোসাঙ্গের রাজদরবারেই সারা জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তখন শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা নামক বৌদ্ধ নরপতি রোসাঙ্গের রাজসিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। আলাওলের কাব্যাদি পাঠে জানা যায়, তখন রোসাঙ্গের রাজদরবারে মুসলমান ওমরাহদের বড়ই প্রাদুর্ভাব ছিল। মাগন ঠাকুর (মুসলমান), সৈয়দ মুছা, ছোলেমান, সৈয়দ মহম্মদ খান, লস্কর উজীর, আসরফ খান, সৈয়দ ছউদ সাহ, মজলিস নবরাজ প্রভৃতি নামধেয় ওমরাহগণ এই রাজদরবারেই উচ্চ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও অনুরোধেই আলাওল তাঁহার কাব্যাদি রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত মহাত্মাগণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন কথাই জানা যায় নাই।

মৌলবী হামিদুল্লা নামক জনৈক ব্যক্তি পদ্মাবতী প্রভৃতির প্রকাশক। তিনি আধুনিক কালের লোক—সম্প্রতি পরলোকগত। তাঁহার বাড়ী কোথায় জানি না। উক্ত মৌলবী এবং তাঁহার লোকান্তর গমনে তদীয় পুত্র পদ্মাবতীর বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন,—"আমার পিতা শ্রী৺মৌলবী হামিদুল্লা সাহেব গ্রন্থকর্ত্তা সাহেবের পুত্র শ্রীছৈয়দ নুরদ্দিন হইতে (পদ্মাবতীর স্বত্ব) খরিদ করিয়া * * * ইতি সন ১৩০১ সাল তাং ৮ই চৈত্র।" এই ছৈয়দ নুরদ্দিন কে এবং কোথাকার লোক তাহা জানিতে পারিলে আলাওল সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, আলাওল সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান কোন লোকের পুত্র অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কিরূপে জীবিত থাকিতে পারে, তাহা বুঝা আমাদের বুদ্ধিতে কুলায় না। বিশেষতঃ আলাওলের কোন পুত্র ছিল কি না অদ্যাপি জানা যায় নাই।

চট্টগ্রাম সদর হইতে ৮ মাইল উত্তরে 'পশ্চিম জোবরা' নামক গ্রামে "আলাওলের দীঘি" নামে এক প্রকাণ্ড জলাশয় আজিও উহার প্রতিষ্ঠাতার নাম ঘোষণা করিতেছে। এই দীঘির উত্তর পারের বহির্ভাগে এক ইষ্টক-নির্ম্মিত মসজিদের ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। কেহ কেহ উক্ত দীঘি ও মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা আলাওলকে আমাদের কবি আলাওল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত কদল-পুর গ্রামে "লস্কর উজীরের দীঘি" নামক এক সুবৃহৎ জলাশয় আছে। এই দীঘি পূর্ব্বোক্ত লস্কর উজীর আসরফ খাঁর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত হয়।

আলাওলের সারা জীবন রোসাঙ্গে অতি-বাহিত হইয়াছিল, তাহা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু তাঁহার ইহ লীলার অবসান কোথায় ও কখন ঘটিয়াছিল এবং তাঁহার সর্ব্বশেষ আশ্রয়-স্থল সমাধি কোথায়, স্বার্থপর জগৎ তাহার কোন খবর রাখে নাই। লোক মুখে শুনা যায়, আলাওল আকিয়াবে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন এবং সেখানেই তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। ইহাও শ্রুতিগোচর হয় যে, রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুরের এক ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশ আপনা-দিগকে আলাওলের দৌহিত্র-বংশ বলিয়া পরিচিত করেন। চট্টগ্রামের অপর এক স্থানে এক বংশ আপনাদিগকে "আলাওলের বংশ" বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, এরূপও শুনা গিয়াছে। তৎসম্বন্ধে আজও আমরা কোন বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই নাই।

সুলতান সাহ সুজা সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া আরাকান-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আলাওল লিখিয়া-ছেন, তিনিও সাহ সুজার সঙ্গে আরাকানে আগমন করিয়াছিলেন। আরাকান-পতির কোপে পতিত হইয়া এখানে আলাওলকে কারারুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। রাজ-সভায় মুসলমান ওমরাহদের কল্যাণে পরে তিনি কারামুক্ত হন।

রোসাঙ্গের অবস্থানসম্বন্ধে আলাওল লিখিয়াছেন—

"কর্ণফুলী নদী পূর্ব্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতরী॥"

এই রোসাঙ্গ রাজ্য ও নগর কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহার সীমাই বা কি ছিল এবং তখন কর্ণফুলী নদীর গতিপথও বা কোথায় ছিল, এ সকল বিষয় আজও সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। কর্ণফুলী নদীর পূর্ব্বে রোসাঙ্গ নগর থাকার কোন চিহ্ন অধুনা পরিদৃষ্ট হয় না। আলাওল এক পুঁথিতে লিখিয়াছেন,—

"রচিলুম বহুল গ্রন্থ নানা আলাঝালা।
বৃদ্ধকালে ঈশ্বর ভাবেতে রৈলা ভালা॥"

এতদুক্তি হইতে জানা যায়, তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; অথচ তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ছয়খানি গ্রন্থ ব্যতীত আর কোন গ্রন্থ আজও পাওয়া যায় নাই।

আলাওল নিম্নোদ্ধৃতরূপে তাঁহার কাব্যা-দির রচনা-কাল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—

(১) "সপ্ত পয়করের" শেষে প্রদত্ত।

"মুসলমানী সন কহি শুন গুণিগণ।
চন্দ্র যুগ কলানিধি গ্রহের স্থাপন॥
ইছুপী সনের কথা কহিয়ে বিচারি।

ইন্দুপৃষ্ঠে বস শূন্য শেষে দিয়া চারি ॥
কহিতে বাঙ্গালা সন মনে বিমর্ষিয়া।
দধিসুত শেষে যুগ চন্দ্রে চন্দ্র দিয়া ॥
মঘী সন কহি মনান্তরে করি ভীত।
চন্দ্রাপারে চন্দ্র ঋতু পৃষ্ঠে তার নিতমিত ?"

(৪র্থ পংক্তির 'বস' শব্দ সম্ভবতঃ ভুল। উহা হয়তঃ রস বা বসু হইবে।)

(২) "লোর চন্দ্রানী—সতী ময়নাবতীর" শেষে প্রদত্ত।

"মুসলমানী শক সংখ্যা শুন গুণিগণ।
অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধিমন্ত জন ॥
সিন্ধু শূন্য দেখিয়া অপর (বা আপন)
দুই দিগে।
শুক্র (বা সুত) কলানিধিরে রাখিলা
বামভাগে ॥
মগধের সনের শুনহ বিবরণ।
যুগে শূন্য মধ্যে যুগ বামে দুর্গাঙ্কন
(বা মৃগাঙ্কন)
শ্রাবণের বসু দিন আশ্বিনে রুদ্রাঙ্গ।
তদন্তরে লেখি পুস্তক করিলাম সাঙ্গ ॥"

(৩) "তোহফার" শেষে প্রদত্ত।

(ক) "সিন্ধু শত গ্রহদশ সন বাণাধিক।
রচিলা ইউছুফ গদা তোহফা মাণিক ॥
দুইশত অষ্টোত্তর সত্তর রহিল।
আলিমে পাইল মর্ম্ম আমে না পাইল ॥
এবে আমলোক সবে গ্রন্থ বুঝিবার।
কহি শুন উপদেশ হৈল যে প্রকার ॥"

(আলিম—জ্ঞানী লোক, আমলোক—
সাধারণ লোক)

(খ) "সপ্ত শত একাশী বয়েত কৈল সার।
রবিউল আখের দশদিন সোমবার ॥"

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ সকলের পাঠ ছাপা গ্রন্থে যেমন আছে, তেমনই দেওয়া গেল। এই পাঠের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে।

আলাওল সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিতে পারা যায়, উপরে সংক্ষেপে তাহার প্রায় সমস্তই উল্লেখ করা গিয়াছে। চেষ্টা করিলে ঐ সকল বিষয়ের কোন কোনটার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ অসম্ভব বোধ হয় না। বাঙ্গালার লেখকগণকে আমরা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য সসম্ভ্রমে অনুরোধ করিতেছি। আলোচনার সুবিধার্থে আলাওল সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি নিম্নে বিশদ্‌ভাবে প্রদর্শিত হইল। পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেরই এই সকল বিষয়ের কোন না কোন একটা সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর জ্ঞান থাকা সম্ভব। যিনি যাহা জানেন অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বা আমার নিকট লিখিয়া পাঠাইলে বিশেষ উপকৃত ও বাধিত হইব। আলাওলের মত মহাকবির প্রতি এরূপ উপেক্ষা-প্রদর্শন আমাদের গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক নহে। জাতীয় সাহিত্যের খাতিরে তাঁহারা একটু কষ্ট স্বীকারে কুণ্ঠিত হইবেন না, এরূপ আশা করা অন্যায় নহে।

জ্ঞাতব্য বিষয়ের তালিকা :—

১। আলাওলের জীবনী-ঘটিত কোন কথা, ছড়া, গল্প, প্রবাদ ইত্যাদি।

২। প্রবন্ধোক্ত ছয়খানি গ্রন্থ ব্যতীত তাঁহার আর কোন গ্রন্থ আছে কি না? থাকিলে তাহার বা তাহাদের নাম কি ?

৩। পদ্মাবতীর প্রকাশক মৌলবী হামিদুল্লার এবং তৎকর্ত্তৃক আলাওলের পুত্র বলিয়া কথিত সৈয়দ নুরদ্দিনের বাড়ী

কোথায়? সৈয়দ মুরদ্দিনের কোন বংশ আছে কি না?

৪। আলাওলের জন্মভূমি বলিয়া উল্লিখিত গৌড়ের ফতেয়াবাদ কোন্ জেলায় অবস্থিত? এই ফতেয়াবাদের অন্তর্গত জালালপুর নামক কোন স্থান আছে কি না? বর্ত্তমানে ঐ সকল স্থানের নাম কি?

৫। উক্ত ফতেয়াবাদের রাজা মজলিস কুতুব বা সমসের কুতুব সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ।

৬। আলাওলের পিতার নাম কি? তিনি কোথায় লোকান্তরিত হইয়াছিলেন? তাঁহার কবর কোথায়?

৭। রোসাঙ্গ রাজ্যের সীমা কতদূর ছিল? রোসাঙ্গ নগর কোথায় অবস্থিত ও উহার সীমা কি ছিল? এখন রোসাঙ্গ কোন্ স্থানকে বলে?

৮। রোসাঙ্গাধিপতি শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার বিশেষ বিবরণ।

৯ রোসাঙ্গ-রাজের অমাত্য এই প্রবন্ধোক্ত মাগন ঠাকুর, সৈয়দ মুছা প্রভৃতির বিশেস বিবরণ।

১০। সুলতান সাহ সুজার সহিত রোসাঙ্গ বা আরাকানপতির মনোমালিন্যের বিশেষ বৃত্তান্ত। উক্ত আরাকান-রাজার নাম কি?

১১। প্রাগুক্ত "পশ্চিম জোবরা" গ্রাম-স্থিত আলাওলের দীঘি ও মসজিদ কবি আলাওলের কি না?

১২। লস্কর উজীর আসরফ খাঁর বিশেষ বৃত্তান্ত। পূর্ব্বোক্ত কদলপুর গ্রামের "লস্কর উজীরের দীঘি" উক্ত আসরফ খাঁর প্রতিষ্ঠিত কি না? উহার নিকট যে প্রাচীন পাকা মসজিদ ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় দণ্ডায়মান-রহিয়াছে, তাহার স্থাপয়িতা কে?

১৩। চট্টগ্রাম সুলতানপুর গ্রামে আলাওলের কোন দৌহিত্র-বংশ আছে কি না? যদি থাকে উহা যে কবি আলাওলেরই দৌহিত্র-বংশ, তাহার প্রমাণ কি? আলাওলের দুহিতার নাম কি?

১৪। চট্টগ্রামের কোন স্থানে "আলাওলের বংশ" বলিয়া কোন বংশ আছে কি না? যদি থাকে, তাহা কোথায় এবং কোন্ আলাওলের বংশ?

১৫। পূর্ব্বে কর্ণফুলী নদী কোন্ স্থান দিয়া প্রবাহিত হইত? উহার ক্রমিক গতি-পরিবর্ত্তন কিরূপ?

১৬। আলাওল তাঁহার কাব্যাদির শেষে পুঁথি-রচনার যে সনাদির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রকৃত পাঠ ও অর্থ নিরূপণ।

১৭। আলাওলের রচিত কোন গীত বা পদ আছে কি না? থাকিলে, তাহা।

১৮। আলাওল সম্বন্ধে অপর কোন জ্ঞাতব্য কথা।

আমার এই সবিনয় নিবেদন অরণ্য-রোদনে পরিণত না হয়, পরিশেষে বাঙ্গালার সাহিত্যিক-বর্গের নিকট ইহাই প্রার্থনা করি। বলা বাহুল্য, আমি নিতান্ত আশাপূর্ণ নয়নে তাঁহাদের অনুগ্রহের দিকে চাহিয়া থাকিব।

শ্রীআবদুল করিম।

মালদহের কবি ও গায়কগণ

[এই প্রবন্ধের কিয়দংশ আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পুরা কাহিনী সংগ্রহ বা প্রাচীন ইতিহাসের অনুসন্ধানমূলক কোন তথ্য নাই। ইহা বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজের সাহিত্য-চিত্রের একটি অংশবিশেষ। লেখক কয়েকজন আধুনিক কবি, গায়ক ও নর্ত্তককে বাঙ্গালার সাহিত্যসংসারে পরিচিত করিতে প্রয়াসী। আমাদের বিশ্বাস বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলায় জনসাধারণের মধ্যে বহু উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যসেবী, কবি, লেখক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রকর, পরিহাস-রসিক আছেন। তাঁহারা বঙ্গের সারস্বতক্ষেত্রে যথার্থ গুণী ব্যক্তিগণের সঙ্গে সহচর বা অনুচরভাবে আসন পাইবার যোগ্য। যাহারা এই সকল শিল্পকলাবিৎ ব্যক্তিদিগকে বাঙ্গালীর নিকট পরিচিত করিয়া দিতেছেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের 'লোক'-সংখ্যা বাড়াইবারই আয়োজন করিতেছেন।

দুঃখের কথা—উচ্চশিক্ষার মোহে পড়িয়া আমরা দেশের জনসাধারণ হইতে দূরে সরিয়া আসিতেছি। কেতাবী শিক্ষার ফোড়ন অথবা বি, এ, এম্ এন্, সি, উপাধির আড়ম্বর না দেখিলে আমরা কোন লোককে গুণী, শক্তিমান্ বা গণ্যমান্য মনে করিতে লজ্জা বোধ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হইয়া আমরা শিখিয়াছি—পাশ্চাত্য কবি ল্যাঙ্গলাণ্ড অশিক্ষিত দরিদ্রের দুঃখ সাধারণের অসাধু অমার্জ্জিত ভাষায় প্রকাশ করিয়া ইংরাজসমাজে অমর হইয়াছেন। কৃষক কবি বার্ণস্ ভাঙ্গা ভাষায় গান গাহিয়া প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, লোকসমাজে দরিদ্র নারায়ণের কথা প্রচার করিয়া জনগণের হৃদয়ে কত নূতন আশা নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিয়াছেন, গ্রে, কলিন্স্ প্রভৃতি কবিগণ কাব্যে জনসাধারণের জীবন চিত্রিত করিয়া সাহিত্য-জগতে বিপুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা এই সকল অর্দ্ধশিক্ষিত ও অনুন্নত ব্যক্তির কবিত্বশক্তি, ভাবুকতা, চিন্তার স্বাভাবিকতা ও নির্ভীকতা, হৃদয়ের সরলতা, স্বদেশ-প্রীতি, অদম্য উৎসাহ এবং পবিত্র মানবসেবার প্রবৃত্তি ইত্যাদি নানাবিধ সদগুণের পরিচয় পাইয়া পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া থাকি। ইহারই নাম উচ্চ শিক্ষা! কিন্তু আমাদের চরণনিম্নে "উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা" যে কত সহস্র উদার-হৃদয়, সরল-স্বভাব নৈসর্গিক-কবিত্বময় ব্যক্তির চিত্ত প্রকৃত বিশ্বপ্রেমে ও স্বজাতি-প্রীতিতে পুলকিত করিতেছে, তাহার সংবাদ রাখি না। আমাদের ঘরের উপর দিয়া যে ভাব-গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে—তাহার পুণ্য-প্রবাহে যে কত শত মানব-হৃদয় উর্ব্বর হইয়া জগতের সনাতন সত্যকে অঙ্কুরিত করিতেছে তাহাও সর্ব্বদা বুঝিতে পারি না। দেশের এই সকল অমর আত্মাকে আমরা অর্দ্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত অথবা ইংরাজিতে অনভিজ্ঞ বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিয়াছি! ইহাকে বলে চিত্ত-সম্মোহন।

পূর্ব্বে আমরা ইহজগতের তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত বিবেচনা করি নাই। এজন্য কত শত রাম-প্রসাদ চণ্ডীদাসকে হারাইয়া আমরা অনুন্নত জাতির বংশধর ভাবে লজ্জায় জীবন যাপন করিতেছি। আজ পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া পাশ্চাত্য সমাজকেই মাথায় রাখিতে শিখিতেছি। এইরূপে আবার কত নূতন নূতন রামপ্রসাদ চণ্ডীদাসকে নীরব রাখিয়া দরিদ্র হইতে বসিয়াছি—কে জানে?

শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণ, বাঙ্গালার জনসাধারণের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। দেখিবেন বহু গ্রে, কলিন্স্, বার্ণস্ আপনাদের নিভৃত পল্লী কুঞ্জে নীরবে বাগ্‌দেবীর আরাধনা করিতেছেন। দেখিবেন তাঁহাদের কেহ কেহ ব্যবসায়ে ও জাতিতে কামার বা নাপিত, কেহ হয়ত জোলা, কেহ বা সামান্য মিস্ত্রী, কেহ বা দর্জ্জি। কিন্তু হিন্দুই হউন বা মুসলমানই হউন, জেলেই হউন বা ধোপাই হউন, এখনও তাঁহারা নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে গ্রে, কলিন্স, বার্ণসের ন্যায় সহস্র সহস্র নর-নারীকে তাঁহাদের কাব্যনাট্য-হাস্যের দ্বারা কখনও কাঁদাইতেছেন, কখনও হাসাইতেছেন, কখনও তীব্র

সমালোচনার দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতেছেন, কখনও উৎকট বৈরাগ্যের কথা শুনাইয়া সংসারে পরমানন্দের ধারা ঢালিয়া দিতেছেন। তাঁহাদের প্রভাব বড় কম নহে। তাঁহাদের প্রভাব ক্ষণিকও নহে। তাঁহাদের মৃত্যুর বহু কাল পর পর্য্যন্ত তাঁহারা লোকের হৃদয়ে জীবিত থাকেন। তাঁহাদের জীবদ্দশায়ও অনেকে অসংখ্য নরনারীর মুখে মুখে ঘুরিয়া থাকেন। আমাদের আধুনিক তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে এইরূপ "নরকুলে ধন্য" কয়জন লোক জন্মিতেছেন বা জন্মিতে পারিবেন বলিতে পারি না। অশিক্ষিত জনসাধারণের সমাজে এইরূপ 'অমর' কবি বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলায় এখনও জন্মিতেছেন—এই কথা বুঝিতে পারা ও জানিতে পারা কি কম আশার কথা ?

যাঁহারা বঙ্গসমাজের বিভিন্ন স্থান হইতে এইরূপ শক্তিমান্ পুরুষগণকে লোক সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারিবেন, তাঁহাদের নিকট আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিতে বাধ্য। আমাদের সাহিত্য-সংসারের লোক-বল শীঘ্রই বাড়িবে আমরা এরূপ বিশ্বাস করিতেছি। কারণ আজকাল দু'একজন করিয়া উচ্চশিক্ষিত মহাত্মারা জনসাধারণের ভাবুকতা, সাহিত্য-শক্তি ও ধর্ম্মভাবের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। চট্টগ্রামের বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে "পল্লীসেবকে"র লেখক প্রচার করিয়াছেন :—"যেখানে কৃষক লাঙ্গল ঠেলিতে ঠেলিতে গান ধরিয়াছে, 'মন তুমি কৃষি-কাজ জান না, এমন মানবজমি রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা' ; যেখানে তাঁতী কাপড় বুনিতে বুনিতে গাহিতেছে 'ওহে হর, এই ভবেতে তাঁত বুনা কাজ খুব ভালই জান' ; যেখানে মাঝি নদীর স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া উদাস প্রাণে গাহিতেছে, 'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাহিতে পারি না'—তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদের অকপট হৃদয়ের ভক্তি এবং প্রেমের গভীরতা বুঝিতে হইবে। তাহাদের নিকট সরলতা, ভক্তি ও তন্ময়তা শিখিতে হইবে। গম্ভীরার গান, ভাটিয়াল গান, বিসহরির গান, রাধা-কৃষ্ণ ও হরগৌরী সম্বন্ধীয় গান ইত্যাদি সকল প্রকার হৃদয়োচ্ছ্বাসগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইবে।]

আমাদের বঙ্গকবিতায় এখন সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের বড় মাত্রাধিক্য দেখা যাইতেছে। কবিতার সমগ্রতায় ভাবের গভীরত্ব তত দেখা যায় না, কিন্তু তাহার এক একটি পদে শিল্পকুশলতার পরিচয় আছে। যে বৃহৎ ভাবুকতা জাতির মধ্যে স্বাস্থ্য ও শক্তি আনয়ন করে, আধুনিক কবিতায় তাহার প্রাবল্য কম। অনেকে বলেন, সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ অবস্থা হইতে পারে, কেননা সূক্ষ্মশিল্প সভ্যতার একটা প্রকাণ্ড নিদর্শন। তবে যে দেশ সাগু বালি হজম করিতে সক্ষম নহে, সে দেশের পক্ষে, আমরা মনে করি, সূক্ষ্ম শিল্প কেবলমাত্র দৌর্ব্বল্য-বিধায়ক বিলাসিতার উপকরণ—সভ্যতা কেবলমাত্র বাবুগিরির নামান্তর !

ফল কথা, আমরা এখন—এই বর্ত্তমান যুগে—কবিতার মধ্যে জাতি-গঠনোপযোগী সবলতা দেখিতে চাই। আমাদের মধ্যে ভাবুকতা ঢালিয়া কে কতখানি ভাবের দৈন্য ঘুচাইতেছে, আমাদের আত্মবোধকে কতখানি জাগাইতেছে, তাহাই জানিতে চাই। আমাদের এখন সূক্ষ্মশিল্প দেখিবার অবসর কোথায় ?

কিন্তু শিক্ষিত সাহিত্যিকেরা আমাদের সে অভাব ঘুচাইতে বেশী মনোযোগী নহেন, অশিক্ষিত গ্রাম্য সাহিত্যিকেরা সেই অভাব কতকটা মোচন করিতেছেন। তাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত নহেন। তাঁহারা সংবাদপত্রের সাহায্যে নিজের ভাবুকতা প্রচার করেন না। কিন্তু গ্রাম্যভাষায় নিরক্ষর পল্লীবাসীর সম্মুখে গানে তাঁহাদের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজের

সম্বন্ধে, সমাজের সম্বন্ধে, ধর্ম্মের সম্বন্ধে, কর্ম্মের সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা, নূতন মত প্রচার করেন। বাস্তবিকই তাঁহাদের প্রতিভা কৃষক-কবি বার্ণসের অনুযায়ী। বার্ণস্ তাঁহার কুটীর হইতে বিশ্বকে নিরীক্ষণ করিতেন, সমাজের নানা কথা ভাবিতেন, প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতেন, শত শত দিক হইতে মনুষ্য-জীবনকে স্পর্শ করিতেন, মানুষের যেটি ভাল, সেটিকে সাদরে অভিবাদন করিয়া, যেটি মন্দ, সেটিকে বিদ্রূপের তিরস্কারে বহিষ্কৃত করিতেন—যাহা কিছু দেখিতেন, তাহাই ঘরের ভাষায়, নিপুণভাবে তেজের সহিত ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার সেই চির প্রসিদ্ধ—তাঁহার সেই চির সত্য—

"The rank is but the guinea's stamp,
The man's the gowd for a' that."

ব্যথা-বিক্ষত রক্তাপ্লুত হৃদয়ের বাণী। সমাজ নিষ্ঠুর পীড়নে ব্যক্তিত্বকে খর্ব্ব করিতেছে—পদমর্য্যাদা, ধনৈশ্বর্য্য সকলের উপরে জয়ধ্বজা তুলিয়াছে—মনুষ্যোচিত সৎপ্রবৃত্তিগুলি পদদলিত। প্রকৃত দ্রষ্টা বার্ণসের প্রাণ কাঁদিবে না কেন? তিনি তাই মানুষকে বিশেষ কোন চিহ্নের মধ্যে রাখিতে চাহেন নাই। তিনি তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন—অন্ধ আচার-ব্যবহার হইতে মুক্তি—পদমর্য্যাদার শৃঙ্খল হইতে মুক্তি—ধনগৌরব হইতে মুক্তি—দাসত্ব হইতে মুক্তি! আর একদিন—সে বহুকাল পরে—মার্কিণের দীর্ঘ শষ্পাচ্ছন্ন প্রান্তর হইতে বার্ণসের মত আর একজন কবি মানুষের এই মুক্তির গান গাহিয়াছেন—

"I am an acme of things accomplished, and I an encloser of things to be.

All forces have been steadily employed to complete and delight me,

Now on this spot I stand with my robust soul."

যাঁহারা যথার্থ দেশবাসীর প্রাণের কবি—বন্ধনমুক্ত মানুষের কবি—গণনেতৃত্বের বীর্য্যবান্ গায়ক, তাঁহাদেরই মুখের বাণী, তাঁহাদেরই প্রাণের রোদন, তাঁহাদেরই আশা-আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদেশের সর্ব্ব লোকের শাশ্বত ধন। যুগে যুগে কত দেশে কত শিক্ষিত অশিক্ষিত কবি সেই ধন বক্ষে করিয়া ফিরিতেছেন।

তাই আমরা যখন সেই ধন মালদহের—শুধু মালদহের কেন, বাঙ্গালার অনেক জেলার—অশিক্ষিত কবিদিগের মধ্যে দেখিতে পাই, তখন আমাদের আনন্দের সীমা থাকে না। অবশ্য শিক্ষার সৌকর্য্য, ভাষার সাধুত্ব প্রভৃতি উচ্চ সাহিত্যের বিশেষত্বগুলি তাঁহাদের গানে খুঁজিতে গেলে ব্যর্থমনোরথ হইতে হয়—কিন্তু স্বাস্থ্যপ্রদ ভাবুকতা তাঁহাদের গানে যথেষ্ট। সুতরাং আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সেই প্রয়োজন বোধেই পূর্ব্বে আমরা কতগুলি কবির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আজ পাঠকবৃন্দের সম্মুখে আরও কতগুলি কবিকে আনয়ন করিলাম।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় হালদার

টাঁপাজানি গ্রামে ১২৮৮ সালে ইঁহার জন্ম। পিতার নিতান্ত "আদুরে" পুত্র হওয়ায় লেখা-পড়া ইনি বেশী কিছুই শিখিতে পারেন নাই। তবে ছোট বেলা হইতেই ইঁহার সঙ্গীতের উপর আকর্ষণ থাকায় সেতার, বেহালা প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্র বাজাইতে বেশ পটুত্ব লাভ করিয়াছেন, এবং নিজে সঙ্গীত রচনা করিয়া নানাস্থানে তাহা প্রচার করিয়াছেন। ইঁহার একটি বালক-সঙ্গীতের দল ছিল। সেই দলে অভিনীত শ্রীরাধার গোষ্ঠবিহার, কংশের ধনুর্ষজ্ঞ, শুম্ভসংহার প্রভৃতি পালা ইঁহার রচিত। এতদ্ব্যতীত গম্ভীরার গান-রচনায় ইঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি।

কিছু দিন কৃষ্ণনগরে থাকিয়া মাটীর পুতুল তৈয়ারী, অঙ্কনবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতিও ইনি শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

এক্ষণে ইনি কবিরাজী করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছেন। ইঁহার পিতা একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ, অশীতিপর বৃদ্ধ—এখনও জীবিত। তাঁহারই নিকটে ইনি কবিরাজী শিখিয়াছেন। নিজের উদ্ভাবনী শক্তিবলে মাটী দিয়া নানারূপ চুয়ানযন্ত্র তৈয়ারী করত নানারকম আরক, নির্য্যাস প্রভৃতিও ইনি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। সম্প্রতি "নাটা"র বীজ হইতে ইনি "স্বদেশী কুইনাইন" প্রস্তুত করিয়াছেন। পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর প্রভৃতিতে তাহা বিশেষ ফলপ্রদ। বহু বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা তাহা পরীক্ষিত হইয়াছে। ইনি নিজের উদ্ভাবিত পদার্থগুলি দেখাইয়া মালদহ ও মুর্শীদাবাদ প্রদর্শনী হইতে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি মেডেল, প্রশংসা-পত্র প্রভৃতিও পাইয়াছেন। নিজে ভিষক ও কবি, অতএব স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে ইনি যে গানগুলি প্রচার করিয়াছেন, সেগুলি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শুনা যায়, তাঁহার গানে লিখিত মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিয়া অনেক রোগী রোগমুক্ত হইয়াছে। গম্ভীরার প্রধান উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা—তাহা এই গান-গুলি দ্বারা সাধিত হইয়াছে, ইহাই পরম সন্তোষের বিষয়।

স্বাস্থ্য-রক্ষা পালা

বন্দনা

(গম্ভীরার সুর)

ওহে ববম্‌ ভোলা, খায়্যা সিদ্ধি ঘোলা
দেশের হালচাল গোলা দেখ্‌লা না॥
হল সর্ব্বনাশ, ওহে কৃত্তিবাস,
তবু কি নেশার ঘোর ছুটল না॥

১। দিনে দিনে দেশ হল স্বাস্থ্যহীন,
তুমি দেখ্যা শুন্যা বস্যা পারছ দিন,
প্রতি ঘরে ঘরে, ম্যালেরিয়া জ্বরে,
গেল ছারে খারে কিছুত রাখ্‌লে না।

২। লাওয়া ঢাকনা যা ছিল দুটা একটা
ডাক্তার কব্‌রাজ গণে, নিয়া গেল সাপটা,
কুইনাইন খাতে খাতে জিভ উঠিল হাঁকটা,
স্বদেশী কুইনাইন আস্যাও ত দিছ না॥

৩। আর একটি কথা জানাছি শিব ঠাকুর
জল কষ্টের ঠেলায় আকুড় বাকুড়,
পারি ডোভার জলে থাচ্ছি পোকা মাকুর,
নদীর খালের জলে করছে পাটরা ধুনা॥

৪। কাহকে করছ লাট, কাহকে করছ রাজা,
কাহকে দিচ্ছ পুরি, কাহকে দিচ্ছ ভাজা,
আবার কাহকে করছ তাজা, কাহকে দিচ্ছ সাজা,
তোমার মজা বুঝ্যা উঠ্‌তে কেহ ত পারছে না॥

৫। দিনে দিনে টান, করিলে চা'ল ধান,
শুখিয়া শুখিয়া কেন মারছ মোদের প্রাণ,
বলে মৃত্যুঞ্জয়, ওহে মৃত্যুঞ্জয়,
মৃত্যুর জন্য কেন করছ বিবেচনা॥

১। কবি
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস,

২। নর্ত্তক
শ্রীযুক্ত রাধারমণ বারিক

India Pr alcutta

হালচাল—দেশের অবস্থা ; নিন্—নিদ্রা
লাওয়া ঢাকনা=তৈজস পত্র
সাপটা=শেষ করিয়া
হাকটা=বমি বমি করা
আস্তা=আনয়ন করিয়া
আকুড় বাকুড়=ধর ফর
পাটরা ধুনা=সর্ব্বস্বান্ত

অর্থাৎ শিব ঠাকুর সিদ্ধি খাইয়া নেশায় ভোর, তিনি দেশের অবস্থা কিছুই দেখিতেছেন না। দেশ দিনে দিনে স্বাস্থ্যহীন হইয়া গেল, ডাক্তার কবিরাজ লোকগুলাকে ক্রমেই নিঃস্ব করিয়া ফেলিতেছে, চারিদিকে জলকষ্ট, অন্নকষ্ট। এ সময়ে শিবের নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে। তিনি কাহাকে রাজা করিতেছেন, কাহাকেও দরিদ্র করিতেছেন, কাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছেন, কাহাকেও মৃতপ্রায় রাখিতেছেন, তাঁহার লীলা বুঝা নিতান্তই শক্ত।

একজন শিব সাজিয়া আসরে আসেন, বন্দনাটি তাঁহার সম্মুখে গীত হয়। তখন শিব ঠাকুর তঁাহাদিগকে বলেন, "তোমরা নিজের দোষে কষ্ট পাইতেছ, আমি কি করিব! যাহা মানুষের করণীয়, তোমরা তাহা কর না, তাই আমার বড় দুঃখ হয়। তবে তোমরা মালদহবাসী, আমাকে বড়ই অন্তরঙ্গ মনে কর। তোমরা কেহ আমাকে মামা, কেহ চাচা, কেহ দাদা বলিয়া ডাক, তোমরা তোমাদের কত প্রিয় জিনিষ আমাকে উপহার দাও, আমি তোমাদিগকে কিছু উপদেশ না দিয়া থাকিতে পারি না।" এই বলিয়া শিব ঠাকুর স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দেন।

তারপর মালদহবাসী ও শিবের মধ্যে গানে কতগুলি কথাবার্ত্তা হয়। নিম্নে তাহা দেওয়া গেল—

গীত

(গম্ভীরার সুর)

মালদহ বাসী—
বেশ ভোলানাথ বাজাচ্চ গাল।
একবার দেখলা নাথ দেশের হাল চাল ॥

শিবঠাকুর—
ভাবচ কি আর মালদহবাসী।
নিজের গলায় নিজে দিয়া ফাঁসী ॥ (নানাহে)

মা :—ভাবছি বসা দিবা নিশি, দেশে লাগল ঘুণ
ম্যালেরিয়া ওলাওঠা বার মাসে ধুনছে বেধুন,
পান্তা ভাতে মিলে না নুন, ডাক্তারের মুখে জলছে আগুন, হাতে নাইখ এক রা, কেমনে জুটবে মুরিওপরা খাতে, খাতে সাবু দানা, হয়া গেন্ম তানা তানা, (ভাই) ওহে নানা, আর যা ব না,
কুইনাইন খায়্যা বাহিতে হাল ॥

শি :—ঘুণ লাগাচে নিজের গুণে শিবের দিচ্ছ দোষ
(বাবারে) খাবার জন্যে খার খাচিচ
স্বাস্থ্যের জন্য করচ আপশোষ, (আবার)
দুনিয়ার যত হিন্দুর মরা গাঙ্গের কূলে যাচ্ছে গাবা, শুনা শিয়াল পণ্ডিতগণে,
খাঙ্গলা খুঙ্গলা, মুখানে টানে, যদি কাকে ফুকে,
সেই জল কারু পাটে ঢুকে (ভাই) তবে এক রাত্রিতে, ভারহাতিতে দেখতে পায় সে কালশশী ॥

মা :—কেমনে হবে স্বাস্থ্যরক্ষা বল্যা দাও শিবঠাকুর
(নানাহে) ঘর বসন্তের কোৎ ঘয়াতে পড়া করছি আকুর বাকুর, তার উপর শালার চুলকানি, সারা দিনে চন্ চনি, কত ফুটকুনি, কত ফুটকুনি, হচে আমদানি রপ্তানি,
আর এক বারাম হয়াছে লয়া টের পায়ছি গয়া যায়া (ভাই), ২।৩টা সাহেব আসা ধরল পাসা, পেলেগরূপী মানুষের কাল ॥

শি :—শিব ঠাকুরের কথা যদি শুন পল্লি-বাসি (নানাহে)
তবে কি আর অল্প বয়সে ধরে তোদের সর্দ্দি কাসি, হয়া তোরা কামে মুগ্ধ, মদের সঙ্গে খাবি দুগ্ধ, হলে সর্দ্দি স্বরভঙ্গ, তোরা ছারবি না স্ত্রীসঙ্গ,
বাড়ীর কাছে লাগিয়া জঙ্গল, খুজবা তোমরা

দেশের মঙ্গল (ভাই) গোয়ালে পাসন্দ,
ডোভাতে দামস, লাগিয়া দেখ্‌বা আয়না আর্সি ॥

মা :—আর পড়াছি জল কষ্টে পাড়াগাঁয়ের লোকে
(নানা হে) এক দিন মাঠের মাঝে ছাতু সানা,
থাকা গেনু প্যাটের ভোকে পূর্ব্ব বঙ্গে গেনু শুনা,
জমিদারগণে পথের পুক্কা, দিছে গ্রামে গ্রামে
তারা আপন আপন নামে, আমাদের দেশে
আছে রাজা, তা'রা করা তুলছে মুসরী ভুঙ্গা,
(ভাই) দেখা প্রজার কান্না, কর্‌ছে ধিন্না ধিন্না
ধিন্না দিতেছে তাল ॥

শি:—জলকষ্ট আমি নষ্ট করা দিতে পারি, (নানা হে)
আগে এগ্রিমেণ্টটি লেখা পড়া করা নিব
রেজেষ্টারী, জলে দিব না ধুতে ছুতারা হাঁড়ি,
পচা বকরির নাড়ী ভূড়ি,
আর আমিলা পাটুয়ার যাগ,
যাতে আছে কলেরার ভাগ,
শিব ঠাকুরের আছে জানা,
আছে একজিবিষণের টাকা জমা
(ভাই) সেই টাকা আনা (জলের) পথের পুক্কা,
লাগিয়া দিব ভাসা বাসি।

হালচাল=চাল চলন, দেশের অবস্থা,
ধুনছে=রগ্‌রাচ্ছে, কষ্ট দিচ্ছে
বেধুন=অত্যন্ত
ভ্যানা, ভ্যানা=শুদরি নাকড়ার মত
গাঙ্গের কুলে=নদীর ধারে
থাঙ্গলা থুঙ্গলা=ধুইয়া, পরিষ্কার করিয়া
ড্যার হাতি=কলেরা
পাঙ্গস্‌=পচা গোবর
দামস=দাম, পচাদল,
ছুতারা=অছোৎ
আমিলা পাটুয়া=কোষ্টা পাট
যাগ=পচান করা,
একরা=এক কড়া কড়ি
কোৎঘরা=পারদখানা
পথের=পুকুর
পুক্কা=খোদিয়া

অর্থাৎ মালদহবাসীরা জানাইতেছে তাহারা একে দরিদ্র, তার উপর ম্যালেরিয়া ওলাউঠা জ্বরবসন্ত চুলকানি প্রভৃতির প্রাদুর্ভাবে বিধ্বস্ত। ডাক্তারের পয়সা যোগাইতে হয়রাণ হইয়া পড়িতেছে। দেশে নিতান্ত জলকষ্ট—ধনী লোকের কেহই জলের অভাব মোচন করিতে অগ্রসর হইতেছেন না। শিব ঠাকুর বলিতেছেন, "তোমরা নিজের দোষে অনেক সময় কষ্ট পাইতেছ। খাইবার জলে ক্ষার কাচিতেছ, মরা ফেলিতেছ, পাট পচাইতেছ; সে জল খাইলে কলেরা হইবে না কেন? তারপর বাড়ীর নিকটে জঙ্গল রাখিয়া তোমাদের দেশের মঙ্গল কি প্রকারে চাও? তোমরা গোয়ালঘরে পচা গোবর, ডোবাতে পানা, কিন্তু এ সব তোমরা কিছুই লক্ষ্য কর না—কেহ দেখাইয়া দিলে তবে তোমরা দেখ। আর তোমাদের সংযমের দিকটা একেবারেই নাই। কিন্তু তোমরা যদি নিজের হিত চাও, তবে এই সকল দিকে মনোযোগী হও। তোমাদের জলকষ্ট আর থাকিবে না—মালদহ-প্রদর্শনীর তহবিলে টাকা জমা আছে, তাহা দিয়া তোমাদের জলাভাব ঘুচাইব। কিন্তু সাবধান জলে কখনও মরা জন্তুর নাড়ী-ভুঁড়ী ফেলিতে পারিবে না, পাট জাগাইতে পারিবে না, কিম্বা অন্য কোনরূপে ময়লা করিতে পারিবে না।"

তারপর শিব ঠাকুরের কথা শেষ হইতে না হইতেই একজন মণ্ডল প্রবেশ করিল। সে শিব ঠাকুরের কাছে কতগুলি মুষ্টিযোগ শুনিতে চায়। তাহার সঙ্গে শিব ঠাকুরের মুষ্টিযোগের আলাপ হইতেছে—

গীত।

মণ্ডল—শিবঠাকুরের সিদ্ধি ঝোলার কথা রেখ মনে।
কুকুর শিয়াল কামরা দিলে লোকে ফুকে সিঙ্গা (নানাহে)

শিব—সিঙ্গা কেন ফুকবে লোকে থাকতে থুপি ঝিঙ্গা। (নইলে মারবে কেন) (২১ গণ্ডা গোলমরিচ দিয়া খাওয়াইতে হয়)

মাঃ—যদি কেহ আফিং খায়া হয়া যায় বেবশ। (নানাহে)

শিঃ—তবে সঙ্গে সঙ্গে খাইয়া দিবা ঢোলকানের পাতার রস। (কাক মাচি)

মাঃ—যদি কেহ সর্পাঘাতে করে টাঙ্গর ভাঙ্গর।

শিঃ—মাথা চিরা বসিয়া দিবা মরিচ কেলে কোধর (আগে বড়িমার তেল খাইয়া দিবা, নচেৎ শেষ দশাতে কেলে কোধর, (বাঘনখির) শিকড় পূর্ব্বদিকের মাথা চিরা রক্তের সহিত মরিচ যোগে বসিয়া দিবা)

মাঃ—সূতিকা বারামে যদি কেহ হয় দুর্ব্বল।

শিঃ—দহি দিয়া খাইয়া দিবা লতাদহি গলগল।

মাঃ—শুক্রকের বারামে যদি কেহ করে ধরফর।

শিঃ—আটার কলা দিয়া খাইয়া দিবা রক্তচিতার জর।

মাঃ—যদি কেহ পাথ্‌রি আটকা হয়া যায় বেকল।

শিঃ—৩।৭ বার খাইয়া দিবা তিসি ভিজা জল॥

মাঃ। একশিরা বারামে যদি থাকে কিছু ফুলা।

শিঃ—ভাল করা লাগিয়া দিবা শ্বেত মাহাকালের শিকর তুলা॥

থুপি ঝিঙ্গা—ঝিঙ্গাজাতীয় লতা গাছ

ঢোলকান—কাকমাচি

কেলে কোধর—কালিয় লতা, বাঘনখি, ইহার কাটা হয়, ফল মহাকালের মত পাকিলে লাল হয়, বিস্তর পাওয়া যায়

রক্তচিতা—অভাবে শ্বেত চিতাও হয় (মেহ রোগের অব্যর্থ ঔষধ)

উল্লিখিত গানটি গাহিবার সময় শিব ঠাকুর মণ্ডল ও শ্রোতৃবৃন্দকে সমস্তগুলি গাছ-গাছড়া দেখাইয়া দেন। গম্ভীরা-মণ্ডপে আমোদের সঙ্গে শিক্ষার পরিবেশন চলে, চারিদিকের কৌতূহল-দৃষ্টি শিবের দিকে আকৃষ্ট হয়—"demonstration" দৃশ্যটি বাস্তবিকই বড় মনোরম হইয়া উঠে।

তারপর একজন পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্‌ ও কয়েকটি রোগী আসরে আগমন করে। শিব ঠাকুর চিকিৎসককে ঐ রোগীগুলি পরীক্ষা করিতে বলেন। চিকিৎসক পরীক্ষায় সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে না। শিব ঠাকুর তাহাকে বুঝাইয়া বলেন, "তোমরা এ দেশের সঙ্গে খুব মিশিতে চেষ্টা কর—ইহার জল-বায়ু, আহার্য্য, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি ভাল করিয়া বুঝ—তাহা হইলে এ দেশের রোগ ও তাহার আরোগ্য-প্রণালী ভাল করিয়া ধরিতে পারিবে।" একজন ভক্ত তখন সকলকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত গানটি ধরে—

শিবের কথা মনে রাখ ভাই!
বলছে কবিবাজ মৃত্যুঞ্জয়॥

১। টোটকা টাটকা, মোটামোটি ২।৪টা যা বলা যায়।
স্বাস্থ্যরক্ষার আদি কারণ, ইন্দ্রিয় সংযম,
সকালে যে রঙ্গ মাতে তারে হয় অকালে মরণ,
মনের খুঁটি শক্ত থাকলে তুফানে কি করবে ছাই॥

২। দেশের দশা দেখ্যা শিব ঠাকুর,
নিন্দা করছে পঞ্চ মুখে, তারা মানুষ কি কুকুর,
মানিস না খাওয়াখাওয়া, করছিস সভ্য,
মদ্য পানে লিভার ক্ষয়॥

৩। আর এক কথা বলছে সদাশিব,
অবিশ্বাসের রঞ্জু কষ্ট পাচ্ছে কতেক জীব,
বিশ্বাস করা থাকলে দব, বিষে অমৃত উঠ্যা যায়॥

এই গানটির সঙ্গেই পালাটি সমাপ্ত হয়।

উল্লিখিত গানগুলি কবিত্ব-হিসাবে দীন হইলেও ভাবের ও শিক্ষার দিক হইতে যথেষ্ট আদরণীয়। মনে রাখিতে হইবে নিরক্ষর পল্লীবাসীর সম্মুখে ঐ গুলি গীত হয়। ভাব

ও ভাষার গাম্ভীর্য্য থাকিলে উহাদের কোনই সার্থকতা থাকে না। চাষার ভাষায় গানের মধ্য দিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে অশিক্ষিতেরা জ্ঞানলাভ করে। বিজ্ঞ চিকিৎসকের বিজ্ঞ বক্তৃতায় যাহা না করিতে পারে, এই গানে তাহা অনায়াসে সাধিত হয়। এই পন্থাই আমাদের দেশের সনাতন Free Education এর পন্থা। এই পন্থা ধরিয়াই এ দেশে ধর্ম্ম শিক্ষা হইয়া আসিতেছে, এবং এই পন্থা ধরিয়াই মালদহে আজ নানাবিষয়িনী শিক্ষা "বর্ণমালা"জ্ঞানশূন্য লোকদিগের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত গদাধর দাস

ইঁহার নিবাস গণিপুরে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। পলুপোষা ইঁহাদের ব্যবসা। লেখাপড়া তত জানেন না। কিন্তু ইঁহার কবিত্বশক্তি ও সঙ্গীত-জ্ঞান প্রশংসনীয়। বিনয়-নম্র ও অতিথি-সেবা-পরায়ণ বলিয়া দেশে ইঁহার খ্যাতি আছে।

ইঁহার গম্ভীরাদলে যে সমস্ত লোক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কবিতা বা গান-রচনায় বেশ পটু। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের দলপতির জীবিতাবস্থায় নিজেদের নাম প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত, তজ্জন্য তাঁহাদের সম্বন্ধে এখন কিছুই বলা হইল না। কালে তাঁহাদের নাম জেলায় প্রখ্যাত হইবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কবি গদাধর "জমিদার ও প্রজা" সম্বন্ধে একটা পালা রচনা করিয়া গম্ভীরায় গাহিয়াছেন। সকলেরই তাহা বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। নিম্নে তাহা না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রথমতঃ যথারীতি শিবের বন্দনা হয়, তৎপরে চাষী প্রজাদের মেয়েরা জমিদারের অত্যাচারের কথা গানে ব্যক্ত করে। বলা বাহুল্য, এই অভিনয়টিকে সাহিত্যহিসাবেই শ্রোতৃমণ্ডলী উপভোগ করিয়াছিলেন। কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কটাক্ষ নাই।

গণিপুর বোলবাই সমিতির গম্ভীরা সঙ্গীত

(চাষী প্রজাদের মেয়েদের গান)

দিদি! কি করিব, কুণ্ঠে যাব, ভেবে ঠিকানা না পাই, হল কুল মান রাখা দায়, জমিদারের জ্বালায়, প্রাণ জ্বলে যায়, চল্ এ দ্যাশ ছাড়্যা পালাই।

বহিন কহিব আর কি, নাই কিছু বাকী, একি বিষম দায়, বুঝি আর রক্ষা নাই, সেই ভাবনাতে ঘুম হয় না রাতে কি করি উপায়।

দিদি হাহাকার উঠ্যাছে, মহাটান পড়্যাছে, বাঁচব কেমন করা্যা, ছিল যত গোচর জমি পড়্যা, করলে বন্দোবস্ত, মাঠ সমস্ত, কুণ্ঠে চরবে বলদ গাই (কেমনে বাঁচবে বলদ গাই)।

বহিন! ঢুক্যা ঘরে, জোরজুলুম ক্যারে, লুলছে খাশি পাটা, তাদের এমনি বুকের পাটা, কাহরু ভাঙ্গছে আম, কাহরু কাটছে ধান, সভাই ভাবছে বসা তাই।

কুণ্ঠে—কোথায়; কাহরু কাহার; সভাই—সবাই।

অর্থাৎ জমিদারের জ্বালায় প্রাণ অস্থির, কুলমান রক্ষা করা দায়, কি করি, কোথায় যাই। এদেশ ছাড়িয়া না পলাইয়া গেলে বুঝি আর রক্ষা নাই। এদিকে দেশে মহাটান পড়েছে, চারিদিকে হাহাকার, তার উপর জমিদার পতিত গোচর-জমি সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া লইল, এখন বলদ গাই কোথায়ই বা চরে? আর কি করিয়াই বা বাঁচে? জমিদার কাহারও আম, কাহারও ধান, কাহারও খাশী পাঁঠা জোর জুলুম করিয়া লইয়া যাইতেছে। এখন তাই সকলেরই বিষম ভাবনা—কেমন করিয়া জমিদারের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়?

এ গানটির সুর বড় করুণ, অত্যাচার-পীড়িতের মর্ম্মবেদনার উপযুক্ত প্রকাশক। গানটির পদবিন্যাস, অত্যাচারের যথাযথ বর্ণনা বড়ই সুন্দর।

এই গানটি হইবার পরে কয়েকজন অত্যাচারিত পলিয়া প্রজা গাঁয়ের মোড়লের কাছে পরামর্শ লইতে আসে। তাহাদের গান—

(বাঙ্গাল প্রজাদের গীত)

মোরঘে কপালটাৎ এই লেখা ছিলুহে মোড়ল বাবা।
লুট্যা পুট্যা লিছু ধানটা কিসোক মোরা বাঁচমুহে।
ছুয়া পুয়াক কি গিলামু কিরুপায় করিমুহে।
বলদ বাছুরটা নিয়া যাছু ভুঁই ভিটা কি করমুহে।
যেপতি তেপতি চলা যামু এপতি নি রহিমু হে।
একটা রূপায় দিব হছে তোর সল্লাটা নিমুহে।

মোরঘে—মোদের। কপালটাৎ—অদৃষ্টে। লিছু—লইতেছে। কিসোক—কেমনে। ছুয়া পুয়াক—ছেলে পিলেকে। রূপায়—উপায়। যাছু—যাইতেছে। যেপতি—তেপতি যেখানে সেখানে। এপতি—এখানে। দিবাহছে—দিতে হচ্ছে।

অর্থাৎ হে মোড়ল বাবা, আমাদের কপালে কি শেষে এই লেখা ছিল! জমিদার আমাদের ধান লুটিয়া লইয়া গেল, আমরা বাঁচিব কি প্রকারে? ছেলেমেয়েদিগকেই বা খাওয়াইব কি? আমাদের বলদ বাছুর সব লইয়া গেল, আমরা এখন ভুঁই ভিটা দিয়া কি করিব? যেখানে আমাদের চোখ যায়, সেই খানেই আমাদের এখন যাওয়া কর্ত্তব্য—আর এখানে থাকা উচিত নহে। যাহা হৌক, মোড়ল বাবা, আমাদের একটা পরামর্শ দিতে হইতেছে।

পলিয়ারা তাহাদের সেই অর্দ্ধমুণ্ডিত মস্তকে, নেংটী পরিয়া, হুঁকা হাতে এমন খেদের সহিত গানটা করে যে, চোখের জল না পড়িয়া থাকে না।

গানটা শেষ হইতে না হইতেই জমিদারের পেয়াদা আসিয়া বলে, "কি, জমিদারের নিন্দা করছিস্, তোদের, দেখ্‌ছি, ভারী বুকের পাটা! চল বেটারা জমিদারের কাছে—তোদের সব চালাকি ঘুচিয়ে দিচ্ছি।"

এই বলিয়া পেয়াদা নিরীহ প্রজাদিগকে ধরিয়া টানাটানি করিতে থাকে, তখন প্রজারা গান ধরে—

গম্ভীরার সুর

(বাঙ্গালদের গীত)

দোষটা কি মোর কহেন দেখি
কিশোক করছেন টানাটানি।
মোর কাট্যা নিযাছেন ধানটা,
এখন নিবেন বুঝি মোর জানটা,
কারগটাও নিছে বাকি মুইত যামুনি।
মোরঘে ছাড়া দেন এবার তোরা,
মিছা করছেন ঝগড়া,
জমিদারের নিন্দা মোরা কিছুই করিনি।
আনিল খাসি পাঁটা দু যোড়া,
তাও নিয়া গেছেন তোরা,
এহন মোরা খামু কি করা, রূপায় দেখিনি।

কিশোক—কি জন্য, এহন—এখন।
খাহিল—ছিল। কারগ—খাজনা। নিছে—নাই।

অর্থাৎ আমাদের দোষটা কি—কি জন্য এমন টানাটানি করিতেছেন? আমাদের ধান কাটিয়া লইয়া গিয়াছেন, এখন বুঝি আমাদের জানটা লইবেন? তারপর আমাদের খাজনা ত বরাবর বাকী লিখিয়াই যাইতেছেন—আমরা যাইব না। বৃথা কলহ করিতেছেন, আমাদিগকে ছাড়িয়া দিন। আমরা জমিদারের কোন নিন্দাই করি নাই। দুই যোড়া খাসী পাঁঠা ছিল, তাও ত আপনারা লইয়া গিয়াছেন, এখন আমরা কি করিয়া খাইব, তার উপায় দেখিতেছি না।

স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের নীলদর্পণে তোরাপ খাঁ ও আরও কয়েকজন প্রজার এইরূপ রোদন শুনিয়া যাঁহারা চোখের জল ফেলিয়াছেন, তাঁহারা গম্ভীরায় এই নিরীহ প্রজাদের বিলাপ শুনিলে নিশ্চিতই চোখের জল ফেলিবেন, এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

পেয়াদা ছাড়িল না, প্রজাদের কয়েকজনকে ধরিয়া লইয়া গেল। জমিদার তাহাদিগকে গারদে দিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে জমিদারের মনে প্রতিক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি স্বগত খেদ করিয়া বলিতেছেন, "কই সুখ ত পাচ্ছি না--তৃপ্তির ত শেষ দেখছি না। আকাঙ্ক্ষাও প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। এত নূতন নূতন তৃপ্তির পথ আবিষ্কার করছি, প্রজাদের নিকট হতে কত উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করছি, কিন্তু কোন কিছুতেই শান্তি ত পাচ্ছি না। কেবলই অশান্তি—কেবলই অশান্তি।"

এই সময়ে কয়েকজন নির্ভীক এবং ভদ্র প্রজা জমিদারের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছেন, জমিদারের মুখের উপর তাঁহার অত্যাচারের সমালোচনা করিবেন, ইহাতে যাহা তাঁহাদের হয় হইবে। তাঁহাদের গান—

(প্রজাদের গীত)

ও বাবু জমিদার, এতুই অত্যাচার,
প্রজার প্রতি বারবার কর না।
প্রাণে বাচব না ঈশ্বর সইবে না অত্যাচার
জানাই দুঃখের কথা, তুমি মাতা পিতা,
তোমা বই প্রজা কিছু জানে না।
অন্যায় আচরণে, পুত্রবৎ প্রজার প্রাণে,
দিলে ব্যথা শান্তি পাবে না
বাবুগিরি প্রজার অর্থে. ইমারত প্রজার রক্তে,
হচ্ছে নানা মত্ত দেখ না ;
বলছি আমরা যথার্থ, কর আপন স্বার্থ ;
প্রজার স্বার্থে লক্ষ্য রাখ না।
যত গাড়ি ঘোড়া, প্রজার হাড়ে গড়া,
প্রজা হচ্ছে সারা বাঁচে না ;
কর্ত্তব্য অর্থ দ্বারা, প্রজা পালন করা,
তাত তোমার দ্বারা দেখি না।
খাজনা বৃদ্ধি করছ, ব্রহ্মোত্তর উড়াচ্ছ,
দেবোত্তর শিবোত্তর রাখছ না,
(কিন্তু) প্রজাকে দেখ না চেয়ে, অজস্র টাকা দিয়ে,
উপাধি কিনতে তো ছারছো না।
বিলের জল বাষ্প হয়া, মেঘ হয় আকাশে যায়া,
দরকার হলে জল হয়া পড়ে থাকে না,
আকাশে তেমনি প্রজার দ্বারা,
উচ্চে উঠেন বাবুরা, বিপদে প্রজা রক্ষা করে না।
দয়া কর প্রজার প্রতি, করিবে নিনতি,
করিবে তব কীর্ত্তি ঘোষণা,
রইবে সদ্ভাব ভক্তি, দেশে আসবে শান্তি,
মনের অশান্তি তোমার থাকবে না।

অর্থাৎ হে জমিদার, তুমি প্রজার প্রতি বারবার এরূপ অত্যাচার আর করিও না, তাহা হইলে প্রজারা প্রাণে বাঁচিবে না, এবং ঈশ্বরও এ অত্যাচার সহ্য করিবেন না। তুমি প্রজাদের মাতা পিতা, তোমা ভিন্ন প্রজারা আর কাহাকেও জানে না, তুমি পুত্রবৎ তাহাদিগের প্রাণে ব্যথা দিলে, নিজে কখনও শান্তি পাইবে না। তুমি ত জান, তোমার যত বাবুগিরী সকলই প্রজার অর্থে সাধিত, তোমার এই ইমারত প্রজার রক্তে নির্ম্মিত, তোমার গাড়ী-ঘোড়া, প্রজার হাড় দিয়া গঠিত! তুমি নিজের স্বার্থের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়াছ, প্রজার স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করিতেছ না! তুমি আজ

কি প্রকারে ধনী হইয়াছ, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? ঐ দেখ বিলের জল বাষ্প হইয়া মেঘ হইয়াছে। মেঘ আকাশে—বহু উচ্চে থাকে, কিন্তু যখন আবার সেই খাল বিল মাঠের দরকার হয়, তখন মেঘ জল হইয়া নীচে পড়ে—উৰ্দ্ধে আর থাকে না। এই নিরীহ প্রজাদের টাকা একত্র হইয়াই তোমাকে ধনী, উচ্চ পদবীতে ভূষিত করিয়াছে। তুমি ইহাদেরই ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, শিবোত্তর উড়াইয়া, ইহাদেরই টাকা দিয়া উপাধি কিনিতেছ। কিন্তু মেঘ যেমন জল হইয়া আকাশ হইতে নামিয়া আসে, তুমি তেমনি একবার প্রজার নিকটে নামিয়া আইস, একবার ইহাদের সহিত সহানুভূতি দেখাও। তাহা হইলেই প্রজাদের ভক্তি, সদ্ভাব, প্রীতি বজায় থাকিবে, দেশে শান্তি আসিবে, তোমার কীর্ত্তিও চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইবে।

গানটি যে চরম ভাবুকতার নিদর্শন, তাহা প্রত্যেক পাঠকই স্বীকার করিবেন। ইহার কবিত্ব, উপমা সমস্তই উচ্চ সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাইতে পারে। মনে পড়ে মিস্ মেরী করেলী কোন একখানা উপন্যাসে বড়-লোকদের মোটর গাড়ীগুলার মধ্যে প্রজাদের হাড় খুঁজিয়াছিলেন। আজ অশিক্ষিত একজন গ্রাম্য কবিও তাঁহারই মত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। চিন্তাজগতে এক শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে এরূপ সাদৃশ্য আশ্চর্য্যজনক নহে। মেঘের সঙ্গে ধনীদিগের তুলনায়ও কবির কবিত্ব ও চিন্তাশীলতা স্পষ্ট অনুভব করা যায়। আমরা গানটির ভাবার্থ দিয়াছি, পাঠকবৃন্দ ইহার মধ্যে একবার ডুবিয়া দেখিবেন।

ভদ্র প্রজাদের এই তীব্র সমালোচনায় জমিদারের মন ফিরিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আজ হইতে আর আমি অত্যাচার করিব না।" সমস্ত প্রজাকে এক এক করিয়া আলিঙ্গন দিয়া তিনি প্রত্যেকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন অত্যাচারমুক্ত সমস্ত প্রজারা গান করিল—

(মিলন গীত)

এস ভাই সকলে মনের আনন্দে
করি শিব-গুণ গান,
হল দেশেতে আজ পূর্ণ
শান্তি রাজ্য স্থাপন।
রাজায় প্রজায় মিলন হল,
অশান্তি ঘুচে গেল,
এক [illegible] হল
জুড়াইল প্রাণ সবার।
[illegible] শৃঙ্খলা ভাব,
আজ শুভ দিন ঈশ্বর প্রভাবে,
[illegible] সবে
রাজকার্য্যে জীবন দান।
[illegible] ভাবে, কর কাজ সেই ভাবে ভবে,
মাতিয়ে ধর্ম্মের উৎসবে, উড়াও ধর্ম্মের নিশান (রাজো)।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস

ইহার নিবাস মালদহ সহরের মকদুম-পাড়ায়। বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর। উচ্চ প্রাইমারী পর্য্যন্ত ইহার স্কুলের বিদ্যা। বর্ত্তমানে ইনি একজন প্রসিদ্ধ মোক্তারের মুহুরী। বাঙ্গালা সংবাদপত্রাদি নিয়মমত পাঠ করিয়া ইনি দেশের অনেক খবর রাখেন। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের অনেক পুস্তকাদি পড়িয়া ইনি জ্ঞান লাভ করিয়াছে। বহুদিন হইতেই ইনি গম্ভীরার গান রচনা করিয়া আসিতেছেন। ইহাঁর সুরবোধ তালবোধ বেশ আছে। উত্তম বেহালা-বাদক বলিয়াও ইহাঁর খ্যাতি।

গম্ভীরার গান যে কেবলমাত্র আমোদের জন্য নহে—ইহা যে লোকশিক্ষার একটি সুন্দর উপায় এ কথা কবি শরচ্চন্দ্র অনেকদিন হইতেই বুঝিয়াছেন, এবং বুঝিয়াছেন বলিয়াই গম্ভীরার গান প্রচার করা ইহাঁর জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইতেছে।

ইহাঁর বহু গান আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা ক্রমে ক্রমে সেগুলি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

অশিক্ষিতদিগের বিদ্যাশিক্ষা কল্পে ইনি একটি পালা রচনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে পালাটি উদ্ধৃত করিলাম।—

বন্দনা

(গম্ভীরার সুর)

মকদুমপুর বোলবাই সমিতি

হরগৌরী বন্দনা।

[ভাব্‌বার কথা]

হামরা পুজবো কেমন কোরা হে
মনের ভাব গিয়াছে বিগর্যা (১)
তাই ধর্ম্মে মতি কর্ম্মে মতি,
যায় বুঝি সব উড়্যা। (হে)

১। তোকে ভেবে গাজা সিদ্ধি খোর,
দেশটা হলো ঘোর নেশাখোর;
ওহে শিব হে! এই ভাবে কি
পুজতে হামরা করি এই গম্ভীর্যা। (হে)

২। মারছে কসে নেসাতে দম,
মুখে বলছে শিব বম্ বম্ ব্যোমকেশ হে!
তোকে এই ভাবেতে (১)
ভেবে সবাই হলো আলস্যা কুড্যা হে।

৩। তুই কুচনীদের পিরিতের পাতনা (২)
এ কথা বলতে লাজ লাগে না
বক্তি ভালক হে! যার বিষনজরে পড়ে
মদন ভস্ম হ'লো পুড়্যা (৩) হে।

৪। গম্ভীরায় বসে শ্রীগৌরাঙ্গ,
দেখেছিল তোর ভাব তরঙ্গ, গোপীন্দ্র হে!
এখন গম্ভীরা করে করছি আমোদ
হামরা তিন দিন ভোর্যা (৪) হে॥

৫। গৌরবাসীর ছিল আশা,
তোর ভাব ভাবা আর বাণিজ্য ব্যবসা,
বুড়া ঈশান হে! এখন ভাবের সনে অভাব
এনে কাঁদছে মলুক জুড়্যা হে।

৬। মা হামাদের গিরিবালা,
যার রূপে গুণে ভুবন আলা, সর্ব্বমঙ্গলা।
এখন পেয়ে শুঁড়ীর পানি,
মুখে বলি মা ভবানী বুদ্ধা জিনগানি
খোর্যা (৫) হে॥

মায়ের ছেলে বীর ষড়ানন, যার ভয়ে
কাঁপতো তিন ভুবন, ভুবন মোহিনী গো
এখন ফুল বাবুটা সাজ্যা কার্ত্তিক
আসছে কোচা ছাড়্যা (৬) হে॥

আর এক ছেলে গণেশ সিদ্ধিদাতা,
যিনি শুভ কর্ম্মে সিদ্ধি দাতা,
হে বিধাতা! তার বাপকে খাইয়ে
সিদ্ধির পাতা, দিচ্ছি আসল সিদ্ধি
(৭) তাড়্যা হে।

তোর এক মেয়ে বীণাপানি, আরেক লক্ষ্মী
ঠাকুরাণী, সড় রঙ্গিণী!
তাদের গুণের কথায় চোখের পাতায়,
সলিল আসে ভর্যা হে॥

দু বহিনে সল্লা করে, গিয়াছে এ সাগর পারে,
দ্যাক দু চোক ভোরে (তারা বলছেন)
মিলন তরি তৈয়ার হলে আসবেন তাতে চোড়্যা (৮)

দু বেটিকে কোলে পেলে মার চেহারা যাবে
ফিরা্যা (৯) হে॥

দাস কয় অভাব যখন এসেছে ঘরে,
ভাব তখন আসছে পরে, দাস চিন্তা করে,
তোরা ভক্তি মন্ত্রে ভাব সাধন করলে
যাবে আবার সব শুধর্যা (১০) হে॥

(১) পরিবর্ত্তন হইয়া। (২) "তুঁই কুচনীদের পিরিতের পাতনা" শিবের সহিত যেন কুচজাতীয় স্ত্রীলোকদিগের কোনরূপ লাম্পট্যালাপ আছে, গম্ভীরায় কখন কখন এরূপ ভাবের বন্দনা শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়া উপরোক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। (৩) পুড়িয়া। (৪) ভাবিয়া। (৫) ধরিয়া। (৬) ছাড়িয়া (৭) সাধনা দ্বারা যাহা লাভ হয়। (৮) চড়িয়া। (৯) ফিরিয়া। (১০) সংশোধন হইয়া।

অর্থাৎ আমাদের মনের ভাব সব বিগড়াইয়া গিয়াছে, তাই ধর্ম্মে কর্ম্মে আমাদের মতি নাই। দেবাদিদেব মহাদেবকে আমরা সিদ্ধিখোর বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছি, কারণ আমরা নিজে সিদ্ধিখোর কি না! এদিকে নেশাতে দম দিতেছি, আর মুখে বম্ বম্ বলিতেছি। এইরূপ করিয়াই ত আমরা অলস হইয়া যাইতেছি। শিবকে লম্পট বলিতেও আমাদের লজ্জা হয় না—যাঁহার নয়নাগ্নিতে মদন ভস্ম হইয়া গিয়াছিল, তিনিই কামমুগ্ধ! হায়রে দুর্দ্দশা! আমাদের গম্ভীরায় শিবকে আমরা এতদিন এই ভাবে পূজিয়া আসিতেছি। তাহাতে আমাদের এই গম্ভীরাই অপবিত্র হইয়া যাইতেছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই গম্ভীরা কেবল বৃথা অশ্লীল আমোদের জন্য নহে—এই গম্ভীরায় বসিয়াই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শিবের ভাব-তরঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন! গম্ভীরা বড় পবিত্র। গৌড়বাসী এই শিবের কাথা ভাবিত আর বাণিজ্য, ব্যবসা প্রভৃতি করিত। কিন্তু এখন সেই ভাবের ঘরে অভাব আসিয়া জুটিয়াছে!

কেবলমাত্র শিবকেই আমরা ছোট করিয়াছি, তাহা নহে। আমাদের জননী গিরিবালা—যিনি সর্ব্বমঙ্গলা, তাঁহাকেও আমরা "শুঁড়ির পাণি"র মধ্যে দেখি আর "মা ভবানী" বলিয়া ডাকি। মায়ের ছেলে বীর ষড়ানন, যাঁহার ভয়ে তিন ভুবন কাঁপিত, তাঁহাকে আমরা ফুলবাবু সাজাইয়াছি! মায়ের আর এক ছেলে সিদ্ধিদাতা গণেশ, যিনি সমস্ত শুভকর্ম্মে সিদ্ধিদাতা, তাঁহাকেও আমরা আদর করি না। মায়ের এক মেয়ে বীণাপাণি, আর এক মেয়ে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, যিনি বড় রঙ্গিণী—বড় চঞ্চল তাঁহারা দুই জন পরামর্শ করিয়া ঐ সাগর পারে চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের মিলনতরী প্রস্তুত হইলে তবে তাঁহারা তাহাতে চড়িয়া আসিবেন, এবং তাঁহারা আসিলে মায়ের চেহারা ফিরিয়া যাইবে!

কবি বলিতেছেন, "অভাব যখন ঘরে আসিয়াছে, তখন চিন্তা করিয়া দেখ, ভাবও পরে আসিতেছে। আমরা যদি ভক্তিমন্ত্রে ভাব সাধন করি, তবে আর সব শুধরাইয়া যাইবে!"

গম্ভীরায় বহুদিন পর্য্যন্ত শিবের বন্দনা অনেক সময় বড় কুরুচিপূর্ণ ছিল। কবি বলিতেছেন আমরাই খারাপ হইয়াছি। তাই ঐরূপ কুরুচিপূর্ণ বন্দনা আমাদের নিকট হইতে বাহির হয়! সত্য কথা। ভক্ত আছে বলিয়াই ভগবান আছেন। রবিবাবু বলিয়াছেন,—

"তাইতে প্রভু যেথায় এল নেমে
তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে,
মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে,
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।"

ভক্তের দুর্দ্দশায় ভগবান দুর্দ্দশাপন্ন। শিবভক্তেরা চরিত্রহীন হইয়াছে, তাই শিবকেও চরিত্রহীন করিয়া দেখিতেছে। কবি শরচ্চন্দ্রের তাহা সহ্য হয় নাই। তাই তিনি

শিবকে বড় করিয়া দেখিয়াছেন। এই ধরণের বন্দনা গম্ভীরায় সম্পূর্ণ নূতন, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার আর একটি নূতনত্ব এই যে—গম্ভীরায় কেবল মাত্র শিবের বন্দনা হয়, কিন্তু তাঁহার পরিবারবর্গের কোন কথা থাকে না। এই বন্দনায় তাঁহাদের কথাও আছে। কবির উক্তি—লক্ষ্মী সরস্বতী এখন বিদেশে—সাগর পারে, তাঁহাদের দুই জনকে পুনর্ব্বার কোলে পাইলে মার চেহারা ফিরিয়া যাইবে। হায় তাঁহারা কবে এদেশে ফিরিয়া আসিবেন! কবে আমাদের মিলনতরী গঠিত হইবে!

বন্দনার পরে কয়েকটি লোক চাষা সাজিয়া আসরে আসে, এবং তাহাদের দুর্দ্দশার কথা গানে ব্যক্ত করে—

গীত

(গম্ভীরার সুর)

চাষাগণের গীত

কেমনে জুটবে দানা বলে দেনা একনা ভাই!
(ঘুচবে তেনা) হামরা খাটা খাটা হনু সারা
উপায় কিছু নাহি পাই।

১। আকাশে ধরাছে টান, ক্ষ্যাতেতে ফলেনি ধান,
আর থাকবে না হামাদের মান, প্রাণ বাঁচান হলো দায়।

২। বাপ দাদা কত কোরা, শিখায়েছে হাতে ধরা,
কোয়াচে হাল চাষটা করলে পরে ভাত কাপড়ের অভাব নাই [দেখছি এখন যে তার উলটা হয়]।

৩। আজকালকার লেখ পড়া, যার মতলব চাকরী করা, বাবা পিস্তু কোরা আগা গোড়া হামাদের শিখায়নি ভাই॥

৪। গোরবাসীর শুনেছি গুণ, কিনতো তারা শুধু নুন,
আর ভাত কাপড় মসলা চুণ, নিত নিজে কোরা সবাই।

৫। হামাদের ধার দেনা, জীবনে আর ঘুচবে না,
কি উপায় গেলে জানা, জানটা হামাদের বাঁচাই।

একনা—একটুকু; তেনা—ছিন্ন বস্ত্র; ঘিনর—ঘৃণা।

অর্থাৎ আমাদের দানা কেমন করিয়া জোটে, নেংটী কেমন করিয়া ছুটে, একবার বলিয়া দাও ত। আমরা খাটিয়া খাটিয়া সারা হইলাম। আকাশে টান ধরিয়াছে। ক্ষেতে ধান ফলে নাই, আমাদের মান প্রাণ কিছুই বাঁচে না। বাপ দাদা হাতে ধরিয়া আমাদের হাল চাষের কায শিখাইয়াছিল, বলিয়াছিল, ভাত কাপড়ের অভাব হইবে না। কিন্তু এখন তাহার উল্টা দেখিতেছি—হাল-চাষ করিয়াও ভাল মত ফসল পাইতেছি না। আজকালকার লেখাপড়ার মতলব কেবল মাত্র চাকরী করা, সেই জন্য ঘৃণা করিয়া বাপ দাদারা আমাদিগকে লেখা শিখায় নাই। আমরা শুনিয়াছি এই গৌড়বাসীরা কেবলমাত্র লবণ কিনিত, আর ভাত কাপড় মসলা চূণ সমস্তই নিজেরা করিয়া লইত। কিন্তু এখন তাহাদের সে ক্ষমতা নাই, এখন প্রায় সকল জিনিসই কিনিতে হয়। আমাদের এখন এমনই দুর্ভাগ্য যে আমাদের ঋণ আর জীবনে ঘুচে না, মহাজনের দেনা চিরদিন ধরিয়াই শোধিতে হয়। কি উপায় জানিলে এখন আমাদের প্রাণ বাঁচে, তাই একবার বলিয়া দাও ত।

দরিদ্র চাষাদের বর্ত্তমান অবস্থা কি, তাহা এই গানটায় বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। তাহারা অশিক্ষিত দরিদ্র, কৃষির উন্নতি নানা কারণে করিতে পারিতেছে না—তার উপর জমিদার মহাজনের দাদনের জ্বালায় মৃতপ্রায়। তাহাদিগের প্রাণের রোদন কেহই শুনিতে চাহে না, কিন্তু তাহারা সকলেরই দ্বারে দ্বারে

নিজের কাহিনী কহিয়া থাকে। তাহারাই দেশের মূল, এ কথা জানিয়াও কেহ তাহাদিগকে ছুটি মিষ্ট কথা বলে না। ইহাকেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

চাষাদের দুঃখ শুনিয়া একজন বিজ্ঞ ঠাকুর তাহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। চাষারা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি নিজকে মূর্খ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন—

(গম্ভীরার স্বর)

গণক ঠাকুরের প্রবেশ

গীত

থাম থাম থাম রে তোরা ডাকছিস কেন খুলে বল না,
সামুদ্রিক আর জ্যোতিষ শাস্ত্র আছে আমার সব ত জানা।

১। বিদ্যার কি দিব পরিচয়,
বিদ্যা আমার বর্ণ পরিচয় ;
গুপ্ত প্রেস আর পি. এম. বাকচী
আমাদের জুটায় ভাই দানা।

২। ধন্য রাজা বিক্রমাদিত্য,
জানতেন তিনি বিদ্যার মাহাত্ম্য,
নব রত্ন তাঁর সভাতে
পেত কত সোনা দানা
(বরাহ মিহির জ্যোতিষ পণ্ডিত
পেত কত সোনা দানা)
(তাই আমাদের দয়াল রাজা পণ্ডিত-
বৃত্তি দিয়েছেন ভাই যাচ্ছে শোনা।)

৩। শুনে আমার জ্যোতিষ বচন,
গৃহস্থেরা খুসি হয় এমন
বিদায় চাইলে একটি পয়সার
বেশী দিতে চাহে না।
বেশী কিছু চাইলে পরে নিয়ে উঠে দাদানা।

লাদানা—লাঠী

চাষারা ত তাঁহার কথা শুনিয়া হাসিয়া খুন। তাঁহার সঙ্গে চাষাদের খুব আলাপাদি হইতেছে, এমন সময়ে একটি চাষার ছোট ছেলে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং গান ধরে ·

গীত

(গম্ভীরার স্বর)

বাবা গরু চড়াতে আমরা আর তো যাব না।
জমিদারের মোড়ল আসা করা দিলে মানা ॥

১। ধরেছে গাই বলদ বকনা,
ছোড়াতে গিয়া খাইনু বকনা,
জলদী করে এসে বাবা ছোড়িয়া লে একনা ॥

২। পড়তি জমি যত ছিল,
দিনে দিনে আবাদ হ'লো
কুনঠে গরু চড়বে বল পাই না ঠিকানা ॥

৩। আমাদের গরু চড়াতে,
দিবে না আর ঘাস পতিতে,
ভোজান গরু হবে কি
আর খাবা পোয়াল শুকনা ॥

ঠাকুর বজায় রাখতে নিজের স্বার্থ,
সবাই কেবল চায় ভাই অর্থ,
গরু খাবা অর্থের মত সামর্থ্য ভেবে দেখ না।

পড়তি—পতিত : কুনঠে—কোথায় ; পোয়াল—বিচালী, খড় :

অর্থাৎ বাবা, আর আমরা গরু চরাইতে যাইব না, জমিদারের মোড়ল আসিয়া আমাদিগকে মানা করিয়া দিয়াছে। আমাদের বলদ বাছুর সব ধরিয়া লইয়াছে। ছাড়াইতে যাইয়া আমরা গালি খাইলাম। এখন তুমি শীঘ্র আসিয়া সেগুলিকে ছাড়াইয়া আন। পতিত জমি যাহা ছিল, সবই ত দিনে দিনে আবাদ হইয়া যাইতেছে, এখন গরু চরিবে কোথায়, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। ঘাস পতিতে আমাদের গরু চরাইতে নিষেধ করিয়াছে, এখন গরু খড় বিচালী খাইয়া

কেমন করিয়া সবল হইবে! ঠাকুর তখন বলেন, "গরু যে আমাদের স্বাস্থ্য ও অর্থের মূল, এ কথা কেহ ভেবে দেখে না, সকলেই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্থ চায়।"

কবি চাষার এই ছেলেটির মুখ দিয়া জমিদারের নিষ্ঠুরতা বুঝাইয়া দিতেছেন। ইঙ্গিতটি বড়ই তীব্র—বড়ই উপযুক্ত।

ইহার পরেই চাষার বড় ছেলেটি আসিয়া উপস্থিত হয়। সে দেশের নৈতিক অধঃপতন কিরূপ হইতেছে গানে তাহার সাক্ষী দিতেছে—

গীত

(গম্ভীরার সুর)

হামি বলবো কি আর সরে না বাক্,
হামাক করেছে অবাক্।
মালধো জেলার নেসাখোররা
লাগিয়াছে ভাই হামাক তাক্।

১। এতকুনা এ মালধো জেলা,
আর নেসা খাবার বেলা,
এর সঙ্গে পারে কে ভালা,
ইতর ভদ্দর যায় না চেনা,
জুটছে গিয়া ঝাঁকে ঝাঁক।

২। গাঁজা গুলি বোতলের খাঁটী,
সারলে সাবেক ভিটা মাটী,
খায়্যা এ সব ছাই মাটী,
নেসা গুণে সোনার দেশটা পুড়্যা
দ্যাখেক হ্যলো খাক।

৩। দ্যাশের অনেক ধনী মহাজন,
তাহাদের হলো অধঃপতন,
সার ক্যরে এই নেসা ধন,
তাদের চাহ্যা হ্যলো মাটী
যাদের জুটে না নুন ভাত শাক্।

৪। হামি মিচ্ছা কোহবো না,
সত্যি চাপিয়া রাখবো না,
যা কিছু আছে ভাই জানা,
আবগারীর রিপোর্ট দেখলে
হ্যয়ে যাবে গুমর ফাঁক।

এতকুনা—এতটুকু।

মালদহ জেলার নেশাখোররা আমাকে তাক লাগাইয়াছে। আমি আর কি বলিব—আমার মুখে কথা সরিতেছে না। এতটুকু মালদহ জেলা—নেশা করিবার সময় ইহার সঙ্গে কেহ পারে না। এখানে ইতর ভদ্র চেনা যায় না, সকলেই এক মধুচক্রে ঝাঁকে ঝাঁকে যাইয়া পড়িতেছে। গাঁজা, গুলি, বোতলের খাঁটি, দেশের সাবেক ভিটা-মাটি সব উৎসন্ন দিতেছে। দেশের ধনী মহাজন অনেকেরই অধঃপতন হইয়াছে, এবং তাহাদিগকে দেখিয়া সেই সব লোক মাটি হইয়া গেল, যাহাদের নুন ভাত শাক জোটে না। আমাদের কথা কণামাত্রও অসত্য নহে—আবগারীর রিপোর্ট দেখিলে সব ঠিক পাওয়া যাইবে।

গানটির মধ্যে একদিকে যেমন তীব্র কটাক্ষ অন্যদিকে তেমনি অশ্রুবিন্দু। ভদ্রলোকদের কুদৃষ্টান্তে ইতর লোকগুলি মারা যাইতেছে, ইহা দেশের নিষ্ঠুর সত্য। কবি একটি পালার মধ্যে দেখাইতেছেন চাষীদের দুর্দ্দশার কারণ বহুবিধ।

ছেলেদের এই সব কথা শুনিয়া চাষা অত্যন্ত ব্যগ্রচিত্তে ঠাকুরকে ধরিয়া বসিল—তাঁহার নিকট হইতে একটা কিছু সদুপদেশ সে লইবেই। ঠাকুরের হাব ভাব দেখিয়া সে বুঝিতে পারিয়াছে, তাঁহার মূর্খতা কেবল ভাণ মাত্র। তখন উভয়ের মধ্যে কথোপকথন চলিল—

গীত

(গম্ভীরার সুর)

ঠাকুর ও চাষা

চাষা—বল্যাদে একনা, করিস্ না প্যাকনা, (১)
কামনে ঘুচবে দুখ ঠাকুর হে।

ঠাকুর—থাকবে না কাঙাত (২),
জুটবে তোদের ভাত
শুনেক তোরা কথা। হামার রে

চা—জলদী (৩) কোর‍্যা বলেক, ঠাকুর করিস না দেরী,
হে ঠাকুর, হামার ঘরে হলে দানা খাব প্যাট ভরি,
হামরা দশ জনা, পাইনাকো দানা,
দিনে দিনে হমু ফতুর (৪) হে।

ঠাঃ—হালে হালে (৫) একনা কোর‍্যা ধর লেখা পড়া
(রে চাষা) ধনে ধনে দেখবিতোদের হবে ঘর ভরা,
তোদের হবে গোলা ভরা,
শিক্ষা জীবনের মূল,
সে কাজে কোর‍্যা ভুল,
(তোদের) চোখের জল হ'লো শুধু সার রে।

চাঃ—লেখা পড়া হামরা ঠাকুর করতে পারবো না
হে ঠাকুর শিখতে পারবো না, রোদ বাতাস
কুটুম চটালে হামরা বাঁচবো না (জানে)
দেখছি চোকে চোকে, ইস্কুল চাষার পক্ষে
বাবুগিরির গুরুঠাকুর হে ॥

ঠাঃ—তামান দিন (৬) খুট্যা খুট্যা সাজের বেলা
(রে চাষা) সবাই মিলা তোরা একটা খুলেক
পাঠশালা, (গাঁয়ে) মদ গাঁজা গুলি, ছুটবে
বদখেলী, দেশের কৃষির করবি উদ্ধার রে।

চাঃ—কুনঠে পাব টাকা কড়ি পাই না ঠিকানা
(হে ঠাকুর) লেখা পড়া শিখবো কি জুটে না
দানা, পাছার ছুটে না তেনা, শিখবো কেমনে
ভাবুক দশ জনে, যারা দ্যাশে চালাক চতুরে হে।

ঠাঃ—সাবেক রীতি এত দিনে জেনেছে সবাই রে
(চাষা) তোদের শিক্ষা বিনা দ্যাশের নাই
কোন উপায়, বিনা পয়সাতে, শিখাবে রাতে,
এমন লোক হচ্ছে তৈয়ার আবার রে।

চাঃ—বিদ্যা শিখ্যা হামাদের কি উপকার (রে
ঠাকুর) হাল চাষের কামে বলেক লাগবে কি
দরকার, (বিদ্যা) চোখেতে দেখা, লেই
হামরা শিখ্যা, উবজাই ধান কলাই মটর
মুসুর হে ॥

ঠাঃ—নয়া রকম যে সব চাষ হচ্ছে বিদেশে (রে চাষা)
সে সব খবর তোদের কাছে আসবে বল কিসে,
ধর লেখা পড়া পাবি তার গোরা,
চাষার কাজের তখন বুঝবি সার রে।

চা—প্রাণের কথা বলছি খাকর শুনেক জি তোরা
(হে ঠাকুর) (কতক) জমিদার আর মহাজনে
দিলে সব সারা, হামাদের নিলে সব কাড়্যা,
যত জুরে কায়দা, হামাদের পায়্যা হায়দা, (৭)
আইন কলে পিবা করচে চুরহে।

ঠাঃ—বিদ্যা শিখ্যা তোরা যদি হস চালাক বান্দা
দেখবি তখন তোদের কাছে খাটবে না ফান্দা,
মুখেতে পড়বে ছাই, দুর হবে আফৎ বালাই,
গরম জলে কত মরবে "চোর" রে।

চাঃ—তোমার কথায় ঠাকুর হামার ঘুচলো ধাঁধা
আজ, লেখা পড়া শিখছি ভাল হবে চাষের কাজ,
হিন্দু মছলমান, হবো সব সমান (দাস কয়)
এক কামে নামলে তখ হবে দুরহে!

(১) রহস্য (২) অনকষ্ট (৩) তাড়াতাড়ি (৪)
নিঃস্ব (৫) ক্রমশঃ (৬) সমস্ত দিন (৭) বোকা।

অর্থাৎ চাষা বলিতেছে, "ঠাকুর আমাদের সঙ্গে আর রহস্য করিও না, আমাদের দুঃখ কিসে ঘুচিবে, তাই একবার বলিয়া দাও। আমরা দানা অভাবে ফতুর হইয়া গেলাম। কিন্তু আমাদের ঘরে দানা থাকিলে তোমরাও খাইতে পাইবে।"

ঠাকুর বলিতেছেন, "তোরা আস্তে আস্তে লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ কর, তোদের ধনধান্যের ভাবনা থাকিবে না। তোরা কি জানিস্ না শিক্ষাই জীবনের মূল? সে কাযে ভুল করিয়া তোদের চোখের জল সার হইতেছে।" কিন্তু চাষা লেখাপড়া শিখিতে চাহে না। সে বলে, রোদ বাতাসই তাহাদের কুটুম্ব, লেখা পড়া শিখিতে গিয়া তাহাদিগকে বাবু সাজিতে হইবে, কেননা স্কুল যে বাবুগিরির গুরুঠাকুর! এবং বাবু সাজিলে রোদ বাতাস আর সহ্য হইবে না—কুটুম্ব চটিয়া যাইবে। ঠাকুর বলেন, সমস্ত দিন খাটিয়া রাত্রিকালে গ্রামে একটা

পাঠশালা খোল এবং তাহাতে পড়িতে আরম্ভ কর। তাহা হইলে অনেকটা সময় ভাল কাজে নিযুক্ত থাকায় মদ গাঁজা গুলি প্রভৃতি বদখেয়ালী ছুটিয়া যাইবে। কিন্তু চাষার টাকার অভাব, সে পাঠশালা খুলিবেই বা কি প্রকারে, এবং তথায় মাহিয়ানাই বা দিবে কি প্রকারে? ঠাকুর বলেন, ভয় নাই, তোদের কোন পয়সা লাগিবে না। বিনা পয়সায় পড়াইবার মত লোক দেশে আবার তৈয়ারী হইতেছে। চাষার কিন্তু একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল, সে বলিল, "ঠাকুর, বিদ্যা শিখিয়া আমাদের কি উপকার হইবে বল ত? আমাদের হাল-চাষের কাজে বিদ্যার কোন দরকার আছে কি? আমরা চোখে দেখিয়া কাণে শুনিয়া সব শিখিয়া লই—এবং সময় মত ফসল জন্মাই।" ঠাকুর বলেন, "আজ কাল বিদেশে নূতন নূতন রকম চাষ হইতেছে, নূতন নূতন সার আবিষ্কৃত হইতেছে। লেখা পড়া না জানিলে, সে সব খবর তোরা কি প্রকারে পাইবি? লেখা পড়া কর, তখন চাষের কাজের সার বুঝিতে পারিবি।" চাষা বলিতেছে, "আমরা এমনই দুর্ভাগ্য, জমিদার এবং মহাজনে আমাদের দফা শেষ করিল। ধোকা দাইয়া কৌশলে আমাদিগকে আইনের কলে পিসিয়া চূর্ণ করিতেছে।"

ঠাকুর বলিতেছেন, "লেখা পড়া শিক্ষায় তোরা যদি চালাক হইতে পারিস, দেখবি, তোদের কাছে কাহারও কোন ফন্দী খাটিবে না। গরম জলে যেমন ছারপোকা মরে, তেমনি তোদের দুষমনও বিনষ্ট হইবে।"

ঠাকুরের কথায় চাষার ধাঁধা ঘুচিল। সে বুঝিল—লেখা পড়া শিখিলে তাহার চাষের কাযেরই উন্নতি হইবে। তাহার আশা হইল হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে লেখা পড়া শিখিয়া এই চাষের কাযে যোগ দিলে তাহাদের দুঃখ শীঘ্রই দূর হইবে।

গানটিতে চাষার চোখ ফুটাইবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছে, তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ইহাকেই সবল ও স্বাস্থ্যপ্রদ ভাবুকতা বলে। নিরক্ষর চাষার সম্মুখে তাহারই ভাষায় তাহার বিপন্মুক্তির কথা এত স্পষ্ট করিয়া বলিলে শত শত শিক্ষিতের বক্তৃতা অপেক্ষা বেশী ফলদায়ক হয়, ইহা সহজেই অনুমেয়। কবি উচ্ছৃঙ্খল ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া কোন কথাই বলেন নাই। প্রত্যেকটি কথা বেশ যুক্তিপূর্ণ—বেশ ওজন করা। কবির চিন্তাশীলতা এবং পাণ্ডিত্য আছে, তাহা গানটিতে বেশ ধরা যায়। তারপর তাঁহার বিপুল optimism—আশাবাদ—তাহার কথা না বলিলেও চলে।

কবি শরচ্চন্দ্রের গম্ভীরা-দলে শ্রীযুক্ত রাধারমণ বারিক (পরামাণিক) সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহাঁর সঙ্গীত এবং নৃত্যজ্ঞান মালদহে প্রসিদ্ধ। গত মাসের গৃহস্থে শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত দাস মহাশয়কে একজন প্রসিদ্ধ নৃত্যবিদ্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। নৃত্যের ক্ষেত্রে রাধারমণ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহাঁর নৃত্য রমণীকান্তের নৃত্য হইতে একেবারে স্বতন্ত্র—নানাভঙ্গীময়—মৌলিকতাপূর্ণ। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের মালদহ অধিবেশনে ইনি একখানি ছড়ি হাতে করিয়া শিবের বন্দনা গাহিবার সময় দেহটাকে নানাভাবে বাঁকাইয়া

তাদের সঙ্গে এমন সুন্দর নৃত্য ও গান করিয়াছিলেন যে সভার সমস্ত শ্রোতৃবৃন্দ ইহাঁকে ধন্য ধন্য না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তৎসভায় উপস্থিত অনেকেরই বোধ হয় এখনও ইহার সেই ভাব ও তৎসঙ্গে ইহাঁর দ্বারা গীত সেই গানটা মনে আছে—

"বাবাই ধন্ ভাই লাগ্যাছে, বুড়া ক্যান্ বা দোর‍্যা আয়াছে।" ইত্যাদি।

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী।

সার এবং সারের আবশ্যকতা ও ব্যবহার-প্রণালী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লডু আঁশ (Ladoo Fibre)

ইহা একরূপ শৈবাল (moss) বিশেষ। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ইহা জন্মে। অধুনা ইহা অর্ণব-পোত দ্বারা দেশ-বিদেশে নীত হইতেছে। ইহাও সার স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। পাত্রে পোষিত গাছের পক্ষে ইহা বিশেষ সার। কখন কখন মৃত্তিকা ভিন্ন কেবল এই সারেই গাছ রোপণ, রক্ষণ ও উহার পরিবর্দ্ধন-কার্য্য চলে। এই সারে বা সারমিশ্রিত মৃত্তিকায় উপ্ত গাছ অচিরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ তেজস্বিতা লাভ করে।

নারিকেলের ছোবা ও আঁশের ধূলা (Cocanut fibre and its dust)

নারিকেলের ছোবা এবং উহার গুড়াও পচিলে উৎকৃষ্ট সার হয়। অতি নিকৃষ্ট বালি বা আঠাল মৃত্তিকায় ইহার সার মিশাইয়া লইলে উহা উৎকৃষ্ট হালকা মৃত্তিকায় পরিণত হয়। উহাতে অনবরত জল পড়িলেও কঠিনতা লাভ করে না। নারিকেলের ছোবা ও উহার গুড়ায় সার মিশ্রিত মৃত্তিকায় উপ্ত বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয় এই সার অর্কিড্ (orchid) অর্থাৎ পরাঙ্গপুষ্ট উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ সারের কার্য্য করে। নারিকেলের মালা (shell) পচিলেও সারের কার্য্য করে। উহা ছোবা ও ছোবার গুড়া অপেক্ষা গুণে নিকৃষ্ট এবং পচিতে ২।৩ বৎসর সময় লাগিয়া থাকে। নারিকেলের ছোবা ও গুড়া এক কি দেড় বৎসরেই পচিয়া থাকে। মৃত্তিকার নীচে রাখিলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই ইহা পচে।

প্রাচীন ইমারতের ভগ্নাবশেষ (Debris of old buildings)

প্রাচীন ইমারতের মশলা-মিশ্রিত ইষ্টক ও সুরকী প্রভৃতিও কোন কোন উদ্ভিদের পক্ষে উপকারী সার। পলই বা ফার্ণ (Fern) ভৌম অর্কিড্ (Terrestrial orchid) এই সার মিশ্রিত মৃত্তিকায় বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করে। তদ্ভিন্ন বট, পাকুড় (অশ্বত্থ) ও আসাম বা ইণ্ডিয়া রবার (India Rubber) প্রভৃতি গাছের বীজ হইতে চাড়া উৎপাদন পক্ষে ইহা বিশেষ সহায়।

কাষ্ঠ-ভস্ম (wood ashes) কাষ্ঠভস্ম-সার স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা উৎকৃষ্ট সার নহে। অতি সতর্কতার সহিত ইহার ব্যবহার করিতে হয়। ইহার দ্বারা কর্দ্দম বা আঠাল মৃত্তিকাকে হালকা মৃত্তিকায় পরিণত করা যায়। গো-বিষ্ঠার ভস্মের ন্যায় ইহার বালি ও আঠাল মৃত্তিকায় আঁশ ভাঙ্গিবার শক্তি আছে। কাষ্ঠ-ভস্মে সোডা (Soda Sodium) ও পোটাসের (Potash Potasium) ভাগ আছে। ভস্ম মাত্রই অন্য পদার্থের সংযোগে উদ্ভিদের পক্ষে উপকারী হয়। কোন মৃত্তিকায় কাষ্ঠ-ভস্ম অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইলে কখন কখন ইহা দ্বারা উপকার সাধিত না হইয়া অপকারই সাধিত হয়। মৃত্তিকার স্বভাব বিবেচনায় ইহার পরিমাণ ধার্য্য করিতে হয়। এই সকল ব্যবহারে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

প্রস্তর কয়লার ভস্ম (Coal ashes)

কোন কোন স্থলে ইহাও সার স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাতে সালফেট্-অব লাইম্ (Sulphate of lime) নামক পদার্থের ভাগ বিদ্যমান থাকায় ইহা দ্বারা কর্দ্দম মৃত্তিকার আঁশ সহজে ভাঙ্গিয়া থাকে। শিম্বিধারী উদ্ভিদের পক্ষে ইহা উপকারী সার।

কাঠের কয়লা (Charcoal)

ইহা নিজে স্বাধীনভাবে সময়ে কার্য্য করিতে অক্ষম। ইহার শোধকশক্তি প্রবল। ইহার গুড়া পাত্রে পোষিত গাছের গোড়ায় সারের সহিত ব্যবহার করিলে, সারজাত এমোনিয়া (ammonia) নামক পদার্থের যে ভাগ বাষ্পাকারে ক্ষয় পায় উহা কাঠের কয়লার ভস্ম কর্তৃক শোধিত হইয়া পাত্রেই রক্ষিত হয়। সুতরাং ইহা সাক্ষাৎ ভাবে সারের কার্য্য করিতে সক্ষম না হইলেও পরোক্ষ ভাবে উপকারী হয়। ইহা দ্বারা বালি ও আঠাল মৃত্তিকায় আঁশ ভাঙ্গে।

অস্থি-সার (Bone manure)

অস্থি-সার নানা আকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা উদ্যানজ ও মাঠজ এই উভয় বিধ ফসলের পক্ষেই উপকারী। ইহা অতি লঘুগতিতে পচিয়া আসে। সেই জন্য কখন কখন কৃত্রিম উপায়ে ইহাকে পচাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। অম্ল-সংযোগে ইহাকে সহজে পচাইতে পারা যায়। গন্ধক-দ্রাবক (Sulpharic acid) ও আম্লী প্রভৃতি অম্লবস্তুর সংযোগে ইহা অল্প সময়ে পচিয়া থাকে।

ইহা নানা আকারে বাজারে বিক্রয় হয়। অস্থির গুড়া (Bone meal), অস্থিচূর্ণ (Bone dust), দ্রব অস্থি (dissolved bone) ও স্ফুটিত অস্থি (Fermented bone) ইত্যাদি আকারে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অস্থি-কয়লা ও অস্থিভস্ম তত উপকারী সার নহে। অস্থিসার ও অস্থি-কয়লা অর্কিড (orchid) অর্থাৎ পরাঙ্গপুষ্ট উদ্ভিদের পক্ষে উপকারী সার বলিয়া উহা পাত্রে রক্ষিত অর্কিডে ব্যবহার করা হয়। ফল-গাছের পক্ষে অস্থিসার বিশেষ উপকারী। ইহাতে ফস্ফোরাস (Phosphorous) নামক পদার্থের অস্তিত্ব থাকায় ইহাকে ফস্ফেটিক (Phosphatic) সারও বলা যাইতে পারে। ফস্ফোরাসে একরূপ প্রস্ফুরক পদার্থ আছে, উহা পীত বর্ণ। উহা অন্ধকারে আলো প্রদান করে এবং বায়ুর সংযোগে সহজেই জ্বলিয়া

উঠে। এদেশে শ্মশান-ভূমিতে কখন কখন ইহার অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। লোকে উহাকে ভূতের আগুন কহে।

গোয়ানো (Guano)

গোয়ানো নামে একরূপ সার আজকাল বিদেশ হইতে এদেশে আমদানী হইতেছে। নানাবিধ গোয়ানো দৃষ্টিগোচর হয়। মৎস্য-গোয়ানো (Fish guano), পেরুভিয়ান গোয়ানো (Peruvian guano) ও ইক্‌থেমিক্ গোয়ানো (Ichthemic guano) প্রভৃতিই সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাতে এমোনিয়া (ammonia), নাইট্রোজেন (Nitrogen) ও ফস্ফেটের (Phosphate) ভাগ থাকায় ইহা প্রায় অধিকাংশ উদ্ভিদের পক্ষেই বিশেষ উপকারী হয়। বৃহদাকার বৃক্ষের জন্য ইহা ব্যবহার করিতে হইলে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয়। নচেৎ ইহা ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ হয় না। গোয়ানোর ব্যবহার ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

ধাতব সার (Mineral manure)

ধাতব সার মধ্যে চূণ (lime), লবণ (Chloride of sodium salt), পোটাস (Potassium), ম্যাগনিসিয়া (Magnesia) নাইট্রেট অব সোডা (Nitrate of Soda) ও সোরা (Saltpetre, Nitrate of potash) প্রভৃতিই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের দ্বারা ও ইহাদের সহিত অন্য কতিপয় সারের সংযোগে নানাবিধ কৃত্রিম (artificial) ও বিশেষ (special) সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে নাইট্রোজেন (Nitrogenous), ফস্ফেট্ (Phosphatic) ও নাইট্রেট অব পোটাস (Nitrate of potash)-প্রধান সারের সংখ্যাই অধিক এবং ইহা প্রায় সকল প্রকার উদ্ভিদের পক্ষেই বিশেষ আবশ্যকীয়। কেননা উদ্ভিদ ভূমি হইতে স্বভাবতঃই নাইট্রোজেন (nitrogen), ফস্ফোরিক এসিড (Phosphoric acid) ও পোটাস (Potash) গ্রহণ করিয়া থাকে। যে সারে এই তিন পদার্থ বিদ্যমান আছে উহাই উৎকৃষ্ট সার।

কৃত্রিম সার মধ্যে নিম্নলিখিত সার সকলের নাম উল্লেখযোগ্য।

কেইনিট (Kainit), সুপার ফস্ফেট (Super phosphate), ব্যাসিক স্লেগ্ (Bassic slag) ও সালফেট অব্ এমোনিয়া (Sulphate of ammonia) প্রভৃতি।

মনুষ্য ও অন্য জন্তুর বিষ্ঠা, অস্থি, মাংস, রক্ত, সোরা ও নানাবিধ খইল প্রভৃতি নাইট্রোজেন-প্রধান সার। ফস্ফেট-প্রধান সারে ফস্ফোরিক এসিড (Phosphoric acid) থাকে। সুপার ফস্ফেট (Superphosphate) একটি ফস্ফেট-প্রধান সার ও কেইনিট্ (Kainit) পোটাস-প্রধান সার।

নাইট্রোজেন-প্রধান সারে উদ্ভিদ সতেজ হয়। ইহা উদ্ভিদের পত্রের বৃদ্ধি ও চাকচিক্য সম্পাদন করে এবং ইহা দ্বারা উদ্ভিদ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ফলপ্রদানকারী (শিম্বিধারী) সবজী গাছের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। কিন্তু ফলপ্রদানকারী বৃক্ষের পক্ষে ইহা উপকারী নহে। এই সময় স্বীয় উদ্ভিদের পাতার বৃদ্ধি ও তেজস্বিতা সম্পাদিত হওয়ায় ইহা ফলের আধিক্য বর্দ্ধন করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু বৃক্ষ ফলিবার পূর্ব্বে এই সার বৃক্ষে ব্যবহার করিলে আংশিক উপকার সাধিত হইয়া থাকে। ফল আবশ্যক মত

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে আর এই সার ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। জল মিশ্রিত করিয়া ইহার তেজ কমাইয়া কখন কখন ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ফস্ফেট-প্রধান সারে বীজ উৎপন্ন করে। ইহা দ্বারা ইহার পরিমাণের ও গুণের বৃদ্ধি হয়। অস্থি-সারেই ফস্ফেটের ভাগ অধিক। পোটাস-প্রধান সার দ্বারা ফলের উন্নতি সাধিত হয়। ইহার দ্বারা শ্বেতসার (starch) মিষ্টতা লাভ করে এবং ফলের স্বাদ বৃদ্ধি হয়। ফলের গাছের উন্নতি সাধন জন্য পোটাস-প্রধান সার বিশেষ প্রয়োজনীয়।

চূণ (Lime)—ইহা উদ্ভিদের পক্ষে আবশ্যকীয় খাদ্য। উদ্ভিদদেহে স্বভাবতঃই ইহার অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। চূণ কোন না কোন আকারে স্বভাবতঃই ভূমিতে বিদ্যমান থাকে। উহা অধিকাংশ সময়ে উদ্ভিদের জীবনধারণ পক্ষে যথেষ্ট হয়। সুতরাং কেবল সারের জন্য কদাচিৎ ভূমিতে চূণ ব্যবহার করার আবশ্যক হয়। চূণ দ্বারা ভূমিস্থিত জৈবিক (organic) এবং অজৈবিক (inorganic) পদার্থ পচিয়া থাকে। ঐ সকল পদার্থ না পচিলে উদ্ভিদের আহারযোগ্য হয় না। সুতরাং চূণ প্রকারান্তরে উদ্ভিদের আহার্য্য পদার্থ, উহার আহারোপযোগী করার সহায়তা করে। চূণ দ্বারা ভূমির অম্লত্ব বিদূরিত হয় এবং ইহা দ্বারা গুরু কর্দ্দম মৃত্তিকার অংশ পচিয়া উহা লঘু বা হালকা মৃত্তিকাতে পরিণত হয়। উহা হালকা না হইলে উহাতে জল, বায়ু ও আলো প্রবেশ করিতে পারে না। চূণ উদ্যানজ ও মাঠজ ফসলের ও গোচারণ-ভূমির পক্ষে বিশেষ উপকারী। চূণ দ্বারা উদ্ভিদের উদ্ভিজ্জরোগ (Fangus disease) ও ফসলের অনিষ্টকারী ভূমিস্থিত কীটাদিও বিনষ্ট হয়। ইহার ব্যবহার করিতে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকার প্রয়োজন। কেননা ভূমির অবস্থা বিবেচনায় ইহার ব্যবহার করিতে হয়। অতিরিক্ত চূণ ব্যবহারে কখন কখন ফসলের অপকারও সাধিত হইয়া থাকে। চূণ দ্বিবিধ—কলি (quicklime) ও ভূষা (slaked lime)। কলিচূণকে বায়ুতে রাখিলেই উহা ভূষা চূণে পরিণত হয়। চূণ জলে গুলিয়া ভূমিতে ব্যবহার করিতে হয়।

লবণ (Chloride of sodium salt)—উদ্ভিদ দেহে অত্যল্প পরিমাণে ইহার অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণ লবণে সোডা (soda) ও ক্লোরাইন (Chlorine) নামক পদার্থের ভাগ আছে। লবণ সকল উদ্ভিদের পক্ষেই উপযোগী সার নহে। কোন কোন উদ্ভিদের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপকারী। নারিকেলের পক্ষে ইহা অতিশয় উপকারী সার। শতমূলী (Asparagus Beet) ও বিট (Beet) নামক উদ্ভিদের পক্ষেও ইহা উপকারী। সমুদ্রতীরবর্ত্তী ভূমিতে যে সকল উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে, উহাদের পক্ষেও ইহা উপকারী। চূণের ন্যায় ইহারও গুরু কর্দ্দম মৃত্তিকাকে পচাইবার শক্তি আছে। ইহা দ্বারা ভূমিস্থিত চূণ, ম্যাগনিসিয়া (Magnesia) ও পোটাস (Potash) ইত্যাদি পদার্থ সকল পচিয়া থাকে। ইহা দ্বারা ফস্ফোরিক এসিড্ (Phosphoric acid) ও সিলিসিক (Silicic) এসিড্ সকল অম্লের ক্রিয়ার সহায়তা হয় ও ইহা ভূমির আর্দ্রতা রক্ষা করে।

পোটাস (Potassium, Potash)—ইহা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ভূমিতে বিদ্যমান থাকে। ইহা উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ উপকারী সার। ফল-গাছের পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যকীয় সার। ইহা দ্বারাই শ্বেত-সার (starch) শর্করায় (sugar) পরিণত হয়। বালি ও কঙ্করময় ভূমির আঁশ ভাঙ্গিবার পক্ষে ইহা বিশেষ সহায়। ইহা সারের জন্য স্বাধীনভাবে কম ব্যবহার হয়। সাধারণতঃ অন্য সারের সহিত মিশ্রিত করিয়াই ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা ভূমিতে স্বভাবতঃই সুলভ।

ম্যাগনেসিয়া (Magnesia)—উদ্ভিদ-দেহে ইহারও অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা দ্বারা উদ্ভিদের বৃদ্ধির কার্য্য সাধিত হয়। ইহা স্বাধীনভাবে উদ্ভিদের খাদ্যের কার্য্য করিতে সক্ষম।

নাইট্রেট অব্ সোডা (Nitrate of Soda)—ইহাতে নাইট্রোজেনের ভাগ অধিক। নাইট্রেট থাকায় ইহা অতি দ্রুতগতিতে উদ্ভিদের উপকার সাধন করে। ইহা উদ্ভিদের পক্ষে অতিশয় উপকারী খাদ্য, উদ্ভিদ ইহাকে অতি সহজে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। ইহা প্রকারান্তরে সোরার (Salt-petre) কার্য্য করে। ইহাতে নাইট্রোজেনের ভাগ অধিক থাকায় ইহা উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইহা সহজে দ্রবণীয় (soluble)। মাঠজ ও মূলজ ফসলের পক্ষে ইহা বিশেষ কার্য্যকর। ইহা বার মাস সমভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সোরা (Saltpetre, Nitrate of potash or nitre)—পোটাস (Potash) ও নাইট্রিক এসিডের (Nitric acid) সংযোগে ইহা উৎপন্ন হয়। ইহা অতি তেজস্কর সার। ইহাতে নাইট্রোজেন ও পোটাস উভয়ই বিদ্যমান থাকে। ইহা দ্বারা উদ্ভিদের কালোৎপত্তির কার্য্য সাধিত হয়। ইহাও ভূমিতে স্বভাবতঃ সুলভ। সুতরাং ইহা ভূমিতে অধিক মাত্রায় বা পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিলে ফসলের উপকার না হইয়া কখন কখন অপকার সাধিত হয়। শিম্বী ও অন্যান্য কতকগুলি শাক-সব্জীর পক্ষে ইহা অতিশয় উপকারী সার।

কেইনিট (Kainit)—ইহা সালফেট্ অব পোটাস (Sulphate of Potash) ও ও ম্যাগ্নেসিয়ার (Magnesia) যোগে প্রস্তুত হয়। ইহা পোটাস-প্রধান সার মধ্যে উৎকৃষ্ট। ইহা অধিকাংশ ফসলের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

সুপার ফস্ফেট (Super Phosphate)—ফস্ফেট-প্রধান সার মধ্যে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা অস্থিসার ফস্ফেট (phosphate) ও গন্ধকাম্ল (Sulphuric acid) দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহাও অধিকাংশ ফসলের পক্ষেই উপকারী।

বেসিক স্লাগ (Basic Slag)—ইহা ইস্পাতের (Steel) কারখানা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। লোহার খনিতে লোহার সহিত যে ফস্ফোরাস (Phosphorus) সংযুক্ত থাকে, ইস্পাত (steel) প্রস্তুতকালে উহা বিযুক্ত করিলেই এই স্লাগ (slag) প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার গুড়ার নামই বেসিক স্লাগ (Basic slag)। ইহাও সার স্বরূপে ব্যবহৃত হয়।

সাল্‌ফেট্‌ অব্‌ এমোনিয়া (Sulphate of ammonia)—ইহাতে এমোনিয়ার (ammonia) তুল্য নাইট্রোজেনের ভাগ প্রায় দ্বিগুণ। ইহা এমোনিয়াযুক্ত লবণ বিশেষ। ইহা অতি তেজস্কর সার। ইহা প্রায় সকল প্রকার ফসলের পক্ষেই উপকারী। পাত্রে রক্ষিত গাছের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহাকে জলে গুলিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

তরল সার (Liquid manure)—সার মাত্রই তরল না হইলে কঠিন অবস্থায় উদ্ভিদের খাদ্য হয় না। সেই জন্য কঠিন সার অপেক্ষা তরল সার দ্বারা সত্বর উদ্ভিদের পুষ্টিকারিতা সাধিত হয়। কঠিন সার ভূমিতে ও গাছের গোড়ায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু বৃষ্টির জল দ্বারা বা প্রকারান্তরে তরলতা প্রাপ্ত না হইলে উদ্ভিদ উহাকে খাদ্যস্বরূপে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। এখানে যে তরল সারের কথা বলা হইতেছে, তাহা অন্যরূপ। জন্তুর বিষ্ঠা পচিলে উদ্ভিদের পুষ্টিকারী খাদ্য হয়। কিন্তু ঐরূপ সারের অভাব হইলে তাজা বিষ্ঠা জলে ২।১ দিন পচাইয়া রাখিয়া পরে উহা গুলিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। ঘোটকাদি কোন কোন পশুর তাজা বিষ্ঠা অতিশয় তেজস্কর বলিয়া উহা স্বাভাবিক অবস্থায় উত্তমরূপে না পচিলে ব্যবহারযোগ্য হয় না। কিন্তু ঐরূপ জন্তুর বিষ্ঠাও জলে পচাইয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। তরল সার সকল সময়ই ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু সকল প্রকার উদ্ভিদের পক্ষে উহা উপকারী নহে। তরল সার ব্যবহারে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা চাই। কেননা পরিমাণমত লইয়া আবশ্যকমত ইহাকে তরল করিয়া ইহার তেজ কমাইয়া লইয়া তৎপর ব্যবহার করিতে হয়। ইহা অধিক ঘন হইলে উদ্ভিদের মূলে বায়ু, আলো ও উত্তাপ প্রবেশের পথরোধ হইতে পারে। হয় তো অতিশয় ঘন বলিয়া উদ্ভিদের মূলে পঁহুছিতে পারে না ইহা অধিক ব্যবহারে ভূমিতে অম্লত্ব বৃদ্ধি পায়। ইহা পরিমাণ বুঝিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে অতি দ্রুতগতিতে উদ্ভিদের বিশেষ উপকার সাধিত হয়। এবং উহা সত্বরে সবল ও সতেজ হইয়া আশানুরূপ ফল প্রদান করে। ভূমিতে অধিক পরিমাণে সার ব্যবহার করিয়া উহার অধিক উৎকর্ষ সাধন করিলে গাছের, পত্রের ও কাষ্ঠের অধিক উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু ঐ গাছ আশাপ্রদ ফুল ও ফল প্রদানে পরাঙ্মুখ হয়। গাছের, পুষ্পের বা পত্রের উন্নতি সাধন করিতে হইলে উহার পুষ্প ও পত্রমুকুল বহির্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণে সার ব্যবহার করিতে হইবে। তাহা হইলে ফুলের বর্ণের উৎকর্ষ সাধিত হইবে। পাত্রে রক্ষিত গাছের পক্ষে তরল সার বিশেষ উপকারী। গোলাপ প্রভৃতি গুল্মজাতীয় ফুলগাছের ও গোলদাদি ও ডালিয়া প্রভৃতি গাছের পক্ষেও তরল সার উপকারী; উদ্ভিদের সুস্থতার সময় ইহা ব্যবহার করা সঙ্গত। ফলের স্বাদ ও আকার বৃদ্ধির জন্যও ফলগাছে ইহার ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু পুষ্প-মুকুল উদ্গমের পূর্ব্বে বা পরে ইহা ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। কেননা তদবস্থায় কেবল ফুলের উৎকর্ষই সাধিত হইবে, ফল নিকৃষ্ট হইবে। ফল গঠিত হইবার পরে ফল গাছের গোড়ায়

ইহার ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু তেজাল সার ব্যবহার বা অধিক পরিমাণে উহার ব্যবহারে ফলের উৎকর্ষ সাধিত না হইয়া পত্রের উৎকর্ষই সাধিত হয়। ফল গাছের গোড়ায় ব্যবহার করিতে হইলে গাছের গোড়ার মাটী পরিমাণমত কোবাইয়া উহাতে সার প্রয়োগ করিতে হইবে। ফল পরিপক্ক হইতে আরম্ভ করিলে আর সার ব্যবহার সঙ্গত নহে। কেননা তাহা হইলে ফলের আয়তনই বৃদ্ধি হইবে মাত্র, উহা সুস্বাদু হইবে না। উহাতে জলের ভাগ অধিক হইবে। সপ্তাহে এক হইতে দুই কি তিন বার এই সব ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহাকে জলে গুলিয়া দুর্ব্বল করিয়া ব্যবহার না করিলে যে উদ্ভিদে উহা ব্যবহার করিবে ঐ উদ্ভিদ সুফল প্রদান করিবে না। তরল সারে ফলের মিষ্টাস্বাদের ও ফুলের বর্ণের চাকৃচিক্যের হ্রাস হয়। ইহা শাকসবজী ও ঘাসের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

সাবানের জল (Soap seed)—ইহাতে সোডা, পোটাস ও তৈলের ভাগ থাকায় ইহাও কোন কোন সময় উদ্ভিদের পক্ষে উপকারী হয়। সাবান-জল দ্বারা পাত্রস্থ উদ্ভিদের পত্রাদি ধৌত করিলে উহার দ্বিবিধ উপকার সাধিত হয়। ইহা দ্বারা পত্রসংলগ্ন ধূলি বালি পারিষ্কার হয়। এবং তজ্জন্যই পত্রের বর্ণের চাকৃচিক্য ও সতেজতা বৃদ্ধি হয়। উদ্ভিদপত্র সচ্ছিদ্র, নর দেহে যেরূপে লোমকূপ সকল অবস্থিত থাকে, উদ্ভিদপত্রেও ঐরূপ বহুসংখ্যক ছিদ্র থাকে, মনুষ্য-দেহে ময়লা আটকাইলে পীড়া হয়, উদ্ভিদপত্রে ময়লা আটকাইলে উহারও পীড়া হয়। ছিদ্র সকল ময়লা দ্বারা বন্ধ হইলে উদ্ভিদের শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া বন্ধ হয়। অধিকন্তু আলো ও বায়ু পত্রের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্য সাবান-জল দ্বারা মাঝে মাঝে পাত্রস্থ উদ্ভিদের পাতা ধৌত করিতে হয়। বৃহৎ বৃক্ষের পাতা এইরূপে ধৌত করা সম্ভব নহে। উহাদের ডাল পালা উচ্চ স্থানে অবস্থিত থাকায় উহাদের পাতায় অল্প পরিমাণ ধূলি বালি লাগিয়া থাকে। পাত্রস্থ উদ্ভিদ ভূপৃষ্ঠের অব্যবহিত উপরে অবস্থিত থাকায় উহাদের পাতায় সর্ব্বদাই ধূলি বালি লাগিয়া থাকে। এই জন্য সময় সময় ইহাদের পাতা সাবান-জল দ্বারা পরিষ্কার করিলে উহাদের ছিদ্র সকল পরিষ্কার থাকে। সাবান-জল দ্বারা উদ্ভিদের অনিষ্টকারী কীটাদিও বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা ছাতা পোকা (Mealy bug), মাকড়সা (Spider) উদ্ভিজ্জাত রোগ (Fungus disease) ও ছাতা-রোগ (Mildew) ইত্যাদি বিনষ্ট হয়। প্রতিদিন আমরা যে সাবান ব্যবহার করি উহার জল গামলা, চাড়ি বা গর্ত্তে সংগ্রহ করিয়া রাখিলে উহাই নিজ নিজ বাগানের গাছের পাতা পরিষ্কার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। সাবান-জল দ্বারা গাছের পাতা ধৌত করিয়া পরিষ্কার নেকড়া বা চর্ম্ম, কি স্পঞ্জ (Sponge) দ্বারা উহা মুছাইয়া দিতে হয়। পাত্রস্থিত গাছের পাতা এইরূপে মাঝে মাঝে ধৌত না করিলে উহা অসুস্থ, রুগ্ন ও অপরিষ্কার হয়। সাবানে পোটাস ও সোডার ভাগ থাকায় উহার জল গাছের গোড়ায় পড়িলে উহা আংশিক সারের কার্য্যও করিয়া থাকে।

নাইট্রোজেন সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা

উদ্ভিদের পরিপোষক যত পদার্থ আছে—তন্মধ্যে নাইট্রোজেনই সর্ব্বপ্রধান। উদ্ভিদ-জীবনের জন্য জল, বায়ু, উত্তাপ ও আলোক যেমন অত্যাবশ্যক, নাইট্রোজেনও (যবক্ষারজান) তদ্রূপ আবশ্যক, ইহার অভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি, পরিপুষ্টি ও পূর্ণ বিকাশ হয় না। ইহা দ্বারাই উদ্ভিদের মূল, পত্র, কাষ্ঠ, ও বীজের গঠন হয়। ইহা জৈবিক পদার্থ (organic matter)। নাইট্রোজেন কৃষিজ ফসলের এল্‌বুমিন (Albumin) অর্থাৎ বীজের গর্ভকোষের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আঠার ন্যায় যে শ্বেত পদার্থ বিদ্যমান থাকে তাহা গঠন করে। এই এলবুমিনই বীজের মূল পদার্থ। মূল দ্বারা নাইট্রোজেন গ্রহণ না করিলে উদ্ভিদের সম্পূর্ণ অঙ্গ গঠিত হয় না। ফসলের পক্ষে নাইট্রোজেনই সর্ব্ব প্রধান সহায়। ভূমিতে স্বভাবতঃ যে নাইট্রোজেন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ফসল কর্ত্তৃক নিঃশেষিত হইলেই তাহাতে পুনরায় নাইট্রোজেন প্রয়োগ করিতে হয়। শুষ্ক হাল্‌কা মাটীতে অল্প পরিমাণ ফস্ফোরিক এসিড্ (Phosphoric acid) এবং অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন ও পোটাসের আবশ্যক হয়। পক্ষান্তরে ভারি (heavy) অথচ আর্দ্র মাটিতে অধিক পরিমাণে ফস্ফোরিক এসিড্ থাকা চাই। জান্তব পদার্থে নাইট্রোজেন স্বভাবতঃই বিদ্যমান আছে। উহা পচিলেই তদন্তর্গত নাইট্রোজেন হইতে এমোনিয়ার উৎপত্তি হয়। এমোনিয়া নাইট্রোজেন-জাত পদার্থ। নাইট্রোজেনের পরিমাণানুসারে এমোনিয়ার পরিমাণও ধার্য্য হয়। ১৪ পাউণ্ড নাইট্রোজেন পচিয়া ১৭ পাউণ্ড এমোনিয়া উৎপন্ন করে। অর্থাৎ ১০০ ভাগ নাইট্রোজেনকে এমোনিয়াতে পরিবর্ত্তন করিতে হইলে,

$$\frac{\text{১০০ ভাগ নাইট্রোজেন} \times \text{১৭}}{\text{১৪}} = \text{এমোনিয়া এবং}$$

$$\frac{\text{৬০০ ভাগ এমোনিয়া} \times \text{১৪}}{\text{১৭}} = \text{নাইট্রোজেন}$$

উৎপন্ন হয়।

ভূমিতে স্বভাবতঃ যে পরিমাণ উদ্ভিদের আহার্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সহজে নিঃশেষিত হয় না। জল, বৃষ্টি ও শিশিরের আকারে এবং বায়ুস্থিত কার্ব্বলিক এসিড্ বাষ্পাকারে বিদ্যমান থাকিয়া অহরহঃ উদ্ভিদের স্বাভাবিক খাদ্য যোগাইতেছে। উহারা উদ্ভিদ-দেহের তন্তুর (tissues) অধিকাংশই সৃষ্টি করিয়া থাকে। অনাবৃষ্টির সময় ব্যতীত অন্য সময়ে এই স্বাভাবিক আহার্য্যের অভাব ঘটে না। কিন্তু আর্দ্রতা (জল) ও কার্ব্বলিক এসিড্ অন্য পদার্থের সংযোগ ভিন্ন উপকারী হয় না। এই সকল পদার্থ ভূমিতেই বিদ্যমান আছে। উহারা নাইট্রোজেন ও ধাতব পদার্থ। কোন কোন উদ্ভিদ প্রকারান্তরে বায়ুস্থিত নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। বায়ুরাশি হইতে প্রতিনিয়তই নাইট্রোজেন মৃত্তিকায় সঞ্চিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদেরা তাহা গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ দেহের পুষ্টিসাধন করিতেছে। পক্ষান্তরে উদ্ভিদের মূল ও পত্রাদি ভূমিতে পচিয়া, গৃহীত নাইট্রোজেন ভূমিকেই প্রত্যর্পণ করিতেছে। এইরূপে প্রকৃতি প্রতিনিয়ত ভূমিতে নাইট্রোজেনের সমতা রক্ষা না করিলে আমরা ভূমি হইতে একবারের অধিক ফসল পাইতে সমর্থ হইতাম না। কিন্তু প্রকৃতিদত্ত নাইট্রোজেন কোন

কোন সময় ফসলের পক্ষে যথেষ্ট নহে বলিয়া, ভূমিতে সার দেওয়ার প্রয়োজন হয়। অধিকন্তু নাইট্রোজেন ভিন্ন ভূমি হইতে ধাতব ও লবণাক্ত পদার্থ সকল একবার ফসল কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে, উহা আর প্রত্যর্পিত হয় না বলিয়াই কৃত্রিম উপায়ে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হয়।

অধিকাংশ ফসলের পক্ষেই নাইট্রোজেন বিশেষ উপকারী সার। ছেঁই বা শুটী বিশিষ্ট ফসল (Leguminous crops) অর্থাৎ সীম, মটর ও ছোলা, বা তদ্রূপ অন্য ফসলের পক্ষে নাইট্রোজেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারী। উহারা ভূমি এবং বায়ু হইতে স্বভাবতঃ স্বাধীনভাবে এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নাইট্রোজেন প্রাপ্ত হইতেছে। ইহারা ভূমিকে আবার তাহা প্রত্যর্পণ করিতেছে। এই স্বাভাবিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়া চলিলে ভূমি হইতে আশানুরূপ ফসল লাভ করা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে ভূমিতে নাইট্রোজেন প্রদান করিতে হয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে, পৃথিবীর সকল দেশের ও সকল জাতির অগ্রবর্ত্তী আমেরিকাবাসী কৃষিতত্ত্বজ্ঞ জনৈক পণ্ডিত এই নাইট্রোজেনের গুণ, উহার উৎপত্তি এবং রক্ষার আশ্চর্য্য উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই উপায়ে অতি অল্প ব্যয়ে ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। বর্ত্তমান সময়ে যে উপায়ে নাইট্রোজেন সংগৃহীত ও ভূমিতে ব্যবহৃত হইতেছে, এস্থলে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বায়ুতে স্বভাবতঃ যে নাইট্রোজেন বিদ্যমান আছে, আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহা সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারাই ভূমির টীকা (inocculation of the soil) দেওয়া হইতেছে। যে ভূমিতে এইরূপে টীকা দেওয়া হয়, তাহাতে স্বাভাবিক ফসলের অপেক্ষা ন্যূনাধিক দ্বিগুণ ফসল জন্মিয়া থাকে। কিরূপে নাইট্রোজেন সংগৃহীত হয় এবং কিরূপেই বা ভূমির টীকা দেওয়া হয়, নিম্নে তাহা বিবৃত হইল।

কৃষিজ ফসলের পক্ষে নাইট্রিক এসিড্ (Nitric acid) অত্যাবশ্যক। নাইট্রিক এসিডজাত নাইট্রেট (nitrate) উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট আহার্য্য। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে জৈবিক নাইট্রোজেন ভূমিস্থিত জীবাণু (microbes) দ্বারা নাইট্রিক এসিড্ আকারে পরিণত হয়। মিঃ মাইকোএনের মতে, কোন কোন ভূমির উপরিস্থ ১৫ গ্রেইন মৃত্তিকাতে, প্রায় সর্ব্বদা ৭৫০০০০, কোন স্থানের মৃত্তিকাতে ১৩০০০০০০ এবং ২১০০০০০ জীবাণু দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এই সকল জীবাণু ভূমিতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকাতে উহাদের দ্বারা প্রতিনিয়ত বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগৃহীত হইয়া ভূমিতে প্রদত্ত হইতেছে। ফলে ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তিও সেইজন্য অনেকাংশে রক্ষিত হইতেছে। আমেরিকায় কৃত্রিম উপায়ে এই সকল জীবাণু (Bacteria) সংগৃহীত হইয়া তাহা বিক্রীত হইতেছে। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ডাক্তার মুর (Dr. Moore) বৈজ্ঞানিক উপায়ে নাইট্রোজেন-হীন একরূপ তরল পদার্থ (Solution) প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে এই সকল জীবাণু সংগৃহীত হয়।

তৎপর, এই তরল পদার্থ তুলাতে ছিটাইয়া দিয়া, তাহা শুষ্ক করিয়া, ঐ শুষ্ক তুলাতেই জীবাণুগণ রক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপে জীবাণু সকল রক্ষিত হইয়া, উহা দীর্ঘকাল প্রচ্ছন্ন জৈব-শক্তি (dormant) ও অকার্য্যক্ষম (inactive) অবস্থায় থাকে। জীবাণুগণ যে সলিউসনে (Solution—তরল পদার্থ) রক্ষিত হয়, তাহাতে ঐ সকল জীবাণুর আহারোপযোগী খাদ্যও রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত করিয়া প্রদত্ত হয়। রক্ষিত জীবাণপূর্ণ তুলা উক্ত সলিউসনে আবশ্যক মত ভিজাইলে জীবাণু সকল পুনরায় সজীবতা প্রাপ্ত হইয়া আরও বহুসংখ্যক নূতন জীবাণুর (Bacteria) উৎপত্তি করে। এই সলিউসনে বীজ ভিজাইয়া রোপণ করিলেও ঐ বীজ হইতে উৎপন্ন গাছের মূলে বহুসংখ্যক গুটাই (nodules) সৃষ্টি হয়, এই সকল গুটাই নাইট্রো-ব্যাক্টারিয়া (Nitro-Bacteria) জাত নাইট্রোজেন। উক্ত জীবাণু সকল উদ্ভিদের বর্দ্ধন ও পরিপুষ্টি-ক্রিয়ার সাধন করিয়া, ভূমিতে নাইট্রোজেন বৃদ্ধি করে। ইহা ভূমিতে ব্যবহার করা কষ্টকর নহে। বীজকে ইহার সলিউসনে ভিজাইলে তাহাতে বীজের টীকা (inocculation of the seed) দেওয়া হয়। ঐ বীজ ভূমিতে উপ্ত হইলে উহাকে ভূমির টীকা (inocculation of the soil) দেওয়া বলে। এইরূপে বীজের ও ভূমির উর্ব্বরতা সাধন করিলে, ঐ ভূমি হইতে দ্বিগুণ পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। অথচ ইহা ব্যয়সাধ্য নহে। আমেরিকার ৫ একর অর্থাৎ ১৫ বিঘা জমির জন্য ন্যূনাধিক ১৫৲ টাকায় এই সার প্রাপ্ত হওয়া যায়। এদেশে উহার ত্রিগুণের অধিক অর্থাৎ প্রতি বিঘায় ৩৲ টাকার অধিক ব্যয় কখনই পড়িতে পারে না।

কোন কোন গাছে যে বড় বড় গুটী দৃষ্টিগোচর হয়, উহাও জীবাণু কর্ত্তৃক সংগৃহীত নাইট্রোজেনের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইক্ষণ ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে উদ্ভিদমাত্রেরই জীবনধারণ পক্ষে নাইট্রোজেন প্রধান উপাদান। নাইট্রোজেন স্বভাবতঃই ভূমিতে উৎপন্ন হয়। উহা বায়ুতেও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বায়ুস্থিত নাইট্রোজেন জীবাণু দ্বারা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কোন কোন উদ্ভিদে এই সকল জীবাণু স্বভাবতঃই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। এই সকল উদ্ভিদের মূলে গুটী লক্ষিত হয়। জীবাণু সকল বায়ু হইতে যে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে, উহা ঐ সকল গুটীতে মজুত থাকে। উদ্ভিদেরা নাইট্রোজেন হইতে আপনাদের খাদ্যাংশ গ্রহণ করে। অবশিষ্টাংশ ভূমিতে রক্ষিত হইয়া ভাবী ফসলের উন্নতি সাধন করে। শণ, ধঞ্চে, অতসী প্রভৃতি উদ্ভিদের মূলে এইরূপ গুটী দৃষ্টিগোচর হয়। এইজন্য এই সকল উদ্ভিদ দ্বারা সবুজ সারের (green manure) কার্য্যও সাধিত হইয়া থাকে।

এই প্রবন্ধে সার সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব লিখিত হইল, উহার আনুষঙ্গিকরূপে পশু-খাদ্য (Feeding stuff) সম্বন্ধেও কয়েকটী কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। কেননা পশু-খাদ্যের উপরেই জন্তুর সারের গুণ অনেকাংশে নির্ভর করে। পশু-খাদ্যের সহিত সারের গুণের নিতান্ত নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে।

গোশালাজাত ও উদ্ভিজ্জ সারই এ দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও সর্ব্বত্র সুলভ। ইহারা কৃত্রিম সার, বিশেষ সার ও ধাতব সারের ন্যায় মূল্যবান নহে। এই সার অনায়াসে ও অল্প ব্যয়ে এ দেশের সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং গোশালাজাত ও উদ্ভিজ্জ সারকে স্বাভাবিক সার বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এই দ্বিবিধ সার মধ্যে গোশালাজাত সারই মূল্যে সুলভ অথচ গুণে অত্যুৎকৃষ্ট। ইহা পশ্বাদির মল-মূত্রাদি হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সকল পশুর মল ও মূত্রাদির গুণ একরূপ নহে। কারণ পশ্বাদির আহার্য্য বস্তুর গুণের তারতম্যানুসারেই উহাদের মল ও মূত্রের গুণের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। গো-বিষ্ঠা ঘোটক বিষ্ঠা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সার। আবার কেবল ঘাস খাইয়া যে গরু জীবনধারণ করে, উহার গোবর হইতে যে গরু ঘাস ও খইল খাইয়া থাকে তাহার গোবর আরও উৎকৃষ্ট, সুতরাং পশু-খাদ্যের উপর মলের গুণ যে অনেকাংশেই নির্ভর করিয়া থাকে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এ দেশের কৃষকেরা গোশালাজাত সারই ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু কিরূপে এই সারের উপকারিতা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই জন্যই এ স্থলে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা আলোচিত হইল।

গৃহপালিত পশুর সংবর্দ্ধন, পুষ্টিসাধন এবং জীবনরক্ষার জন্য (১) নাইট্রোজেন-হীন (non-nitrogenous) এবং (২) নাইট্রোজেন-যুক্ত (nitrogenous) এই দ্বিবিধ খাদ্যই আবশ্যক হয়। নাট্রোজেন-হীন খাদ্যে পশু-দেহের উষ্ণতা রক্ষিত এবং চর্ব্বির উৎপত্তি হইয়া থাকে। শ্বেতসার (starch), আঠা (gum or mercilage), শর্করা (sugar) এবং তৈল (oil) এই কয়েকটীই নাইট্রোজেন পদার্থ। পক্ষান্তরে, নাইট্রোজেন, অঙ্গার (Carbon), উদজান (Hydrogen) ও অম্লজান (Oxygen) প্রভৃতি নাইট্রোজেন শ্রেণীর (Nitrogenous group) অন্তর্গত। শরীরের উষ্ণতা বা উত্তাপ-রক্ষক পদার্থের অভাব হইলে নাইট্রোজেন-প্রধান খাদ্যে সেই অভাব পূরণ হইতে পারে।

খাদ্য হইতে রক্তের উৎপত্তি হয়। রক্তের দ্বারা শরীরের উষ্ণতা রক্ষিত হইয়া থাকে। ফুস্‌ফুসের (lungs) শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াই (Respiration) শরীরের উষ্ণতা রক্ষার প্রধান উপায়। খাদ্যে শ্বেতসার, আঠা ও শর্করার ভাগ থাকায় ইহাদের দ্বারাই উষ্ণতার সৃষ্টি হয়। উক্ত ত্রিবিধ পদার্থের অভাব হইলে খাদ্যের তৈলাক্ত পদার্থ দ্বারাও উষ্ণতা সৃষ্টির কার্য্য সাধিত হইতে পারে।

শরীরের উষ্ণতা রক্ষিত হইলে, শরীর সবল ও কর্ম্মঠ থাকে। উষ্ণতার হ্রাস ঘটিলে, শরীর রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত যে সকল খাদ্যে উষ্ণতা রক্ষিত হইতে পারে, তাহাই ব্যবহার করিতে হয়। সাধারণ ঘাস ও খড় খাইয়া যে সকল পশু জীবনধারণ করে উহাদিগকে নাইট্রোজেন-প্রধান খাদ্য দিলে, উহাদের মল হইতে উৎকৃষ্ট সার প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধিকন্তু বলকারী খাদ্য ভক্ষণ করাতে পশুগুলি দীর্ঘজীবী, সবল ও কর্ম্মঠ হইতে পারে। পক্ষান্তরে, বলকারী খাদ্য দ্বারা পশু সত্বরেই স্থূলকায় (fattened) হইয়া

থাকে। স্থূলকায় হইলে, জীবনধারণ ও শরীরের উষ্ণতা রক্ষার জন্য অধিক আহারের প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ স্থূলকায় পশুগুলি অধিক পরিমাণেই আহার করিয়া থাকে। অধিক আহার করাতে উহাদের মল-মূত্রের পরিমাণও অধিক হয়। ফলে নাইট্রোজেন-প্রধান খাদ্য দেওয়াতে পশু ও পশুপালক উভয়েরই বিশেষ উপকার সাধিত হয়। ঘাস ও খড়ের সহিত শস্য ও খইল খাওয়াইয়াই পশুকে স্থূলকায় ও বলবান করিতে পারা যায়। গমের ভূষি ও সর্ষপ খইল নাইট্রোজেন-প্রধান খাদ্য, তদ্ভিন্ন অন্যান্য শস্যের ভূষিও উপকারী। ধানের কুড়াও মন্দ খাদ্য নহে। জলের সহিত খড় ও ভূষি প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া দিলে তাহা যেরূপ সুখাদ্য, সেইরূপ পুষ্টিকরও হয়। এইরূপ খাদ্যজাত সারে অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকে এবং তদ্দ্বারা শস্যের এলবুমিন গঠিত হয়। দূর্ব্বাঘাস পশুর পক্ষে বিশেষ সুখাদ্য; ইহা হইতেও নাইট্রোজেন প্রাপ্ত হওয়া যায়। পশুকে খইল ও লবণ মিশ্রিত দূর্ব্বাঘাস খাওয়াইলে তাহার বিষ্ঠা হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন ও এলবুমিন সৃষ্টিকারী পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধানের খড় ২।৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া তাহা রৌদ্রের উত্তাপে উষ্ণ করিয়া লইলে এবং তাহাতে লবণ ও খইল অথবা গুড়ের মাত (Treacle) মিশ্রিত করিয়া দিলে, উহা গৃহপালিত পশুর অতি প্রিয় খাদ্য হয়। এই খাদ্য ভক্ষণকারী পশুর বিষ্ঠা হইতেও উৎকৃষ্ট সার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ খাদ্য সূর্য্যোত্তাপে উষ্ণ করিলে, ফোটন-ক্রিয়া (fermentation) দ্বারা উহাতে নাইট্রোজেনের সৃষ্টি হয়। তদবস্থায় উহা পশুকে খাওয়াইলে, তাহার বিষ্ঠাতে নাইট্রোজেনের ভাগ অধিক থাকে। স্যাৎসেতে (moist) স্থানের মোটা ঘাস (সাধারণতঃ ইহাকে জলী ঘাসী কহে) বা জলজ-ঘাস খাওয়াইলে পশুবিষ্ঠা হইতে অপেক্ষাকৃত কম নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। পশু-বিষ্ঠাজাত ঘাস পশুগণ কদাচিৎ খাইয়া থাকে। কারণ পশুমাত্রেই উহা খাইতে ভাল বাসে না। কিন্তু পশু-বিষ্ঠাজাত ঘাসের সহিত খইল, লবণ, ভূষি অথবা গুড়ের মাত্ মিশাইয়া দিলে পশুগণ আগ্রহের সহিত তাহা ভক্ষণ করে। এই খাদ্যজাত বিষ্ঠাও নাইট্রোজেন-প্রধান। কেবল জলীঘাস ও তদ্রূপ অন্যান্য ঘাস খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইলে তজ্জাত সার উৎকৃষ্ট হয় না। কারণ উহা দ্বারা অতি অল্প পরিমাণে এলবুমিন সৃষ্টি হইয়া থাকে। জলী ঘাসের খাদ্য দ্বারা পশুর মাংস ও মাংসপেশী অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। শালগম, মূলা, বিট, ওলকপি, গাজোর, শাক ও নানারূপ আলু ও বাঁধাকপি প্রভৃতিও পশুখাদ্য। এই সকল খাদ্যজাত পশুবিষ্ঠাও জলী ঘাসের ন্যায় এলবুমিন্ সৃষ্টির পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে। জলীয় খাদ্যে শর্করাদির ভাগ বৃদ্ধি করে সত্য; কিন্তু উহাতে নাইট্রোজেনের ভাগ কম থাকে। মূলা ও শালগম ইত্যাদিতে জলের ভাগ অধিক থাকে বলিয়াই তাহাতে নাইট্রোজেনের ভাগ কম হয়। মূলা, শালগম প্রভৃতি অথবা তদ্রূপ অন্যান্য খাদ্য শুষ্ক করিয়া লইয়া, সেই শুষ্ক খাদ্যের সহিত খইল, গুড়ের মাত্, শস্যের ভূষি ও জল মিশ্রিত করিয়া দিলে

তাহাতে গোবিষ্ঠাজাত সারের গুণের বৃদ্ধি হয়।

শর্করা, শ্বেতসার, গঁদ (mucilage) ও তৈলযুক্ত খাদ্য দ্বারা পশুর দৈহিক উষ্ণতা রক্ষিত, চর্ব্বির সৃষ্টি এবং চলচ্ছক্তি (motion) বর্দ্ধিত হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু যাহাতে এলবুমিনের সৃষ্টি হয়, খাদ্যের সহিত এমন পদার্থের ব্যবহার না করিলে পশুবিষ্ঠাজাত সার অকর্ম্মণ্য হয়। সাধারণতঃ খড় মাত্রই আঁশ-প্রধান; উহা পশুখাদ্যের পক্ষে উপযোগী হইলেও, অন্যান্য বস্তুর সংযোগ ব্যতীত তত উপকারী হয় না। যে খাদ্যজাত সার উদ্ভিদের এলবুমিন সৃষ্টির সহায়তা করে উহাই উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য। এইরূপ খাদ্য দ্বারা পশুর মাংসপেশী, অস্থি ও মাংসপেশীর বন্ধনীর (tendon) সৃষ্টি ও বৎস্যোৎপত্তির (Production of calves) সহায়তা ঘটে এবং দুগ্ধের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে সকল ঘাসে শর্করার ভাগ অধিক তাহা খাইলেও পশুর দুগ্ধের পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়। এই সকল ঘাস স্বভাবতঃ মিষ্ট। যে ঘাসে জলের ভাগ কম তাহা খাওয়াইলে ঘন বা গাঢ় দুগ্ধ পাওয়া যায়।

বাঁশ ও অন্যান্য গাছের পাতাও অনেক সময় পশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে পশুর খাদ্যের অভাব ঘটিলেই, বৃক্ষ-পত্র দ্বারা এই অভাব পূরণ করা হয়। বৃক্ষ-পত্রও পশুর মন্দ খাদ্য নহে। বৃক্ষ-পত্রে ধাতব পদার্থের ভাগ অধিক থাকায় বৃক্ষপত্রভোজী পশুর বিষ্ঠা হইতে উৎকৃষ্ট সার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গবাদি পশু কোন কোন জাতীয় ঘাস খাইতে ভাল বাসে না। কাজেই ঐ জাতীয় ঘাস উহাদের খাদ্যোপযোগী নহে। কিন্তু ছাগাদি পশু প্রায় সকল প্রকার ঘাস ও বৃক্ষ-পত্র খাইয়া থাকে। সাধারণ কথায় বলে "ছাগ বিষের আড়াই পাতা খায়" অর্থাৎ বিষাক্ত উদ্ভিদের পত্রও ছাগের অভক্ষ্য নহে। আড়াই পাতার অর্থ অত্যল্প পরিমাণ, খাদ্যের অভাব ঘটিলে ছাগাদি পশু অত্যল্প পরিমাণে বিষাক্ত-গাছের পাতা খাইয়াও জীবন ধারণ করিতে সক্ষম। এদেশে আরও একটি কথা প্রচলিত আছে। যথা "ছাগলে কি না খায় আর পাগলে কি না কয়।" অর্থাৎ ছাগলে প্রায় সকল প্রকার উদ্ভিদেরই পত্র, ফল ও মূল খাইয়া থাকে। সুতরাং ছাগাদি পশুর খাদ্যের অভাব কখনই ঘটে না। গৃহ-পালিত পশুর মধ্যে অধিকাংশ সময়েই গবাদি পশুর খাদ্যের অভাব হইয়া থাকে। সুতরাং উহাদের খাদ্য সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে আলোচিত হইল।

পশুখাদ্যের অভাব হইলে গোলঞ্চ লতার পাতা ও কাণ্ড টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া খইল ও গুড়ের সহিত সহ গরুকে খাইতে দেওয়া হয়। ইহাও গবাদি পশুর পক্ষে অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য। গোলঞ্চ লতা ভক্ষণ করিলে গবাদি পশুর দুগ্ধের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। নিম্নে আরও কতিপয় প্রধান খাদ্যের গুণ বর্ণিত হইল।

১। তুলাবীজ ও চীনাবাদামের খইল—এই উভয় প্রকার খাদ্যই গবাদি পশুর পুষ্টিকর খাদ্য। চীনাবাদামের খইলজাত বিষ্ঠা দ্বারা এলবুমিন বৃদ্ধি হয়। ইহাতে শতকরা ৪৫ হইতে ৫০ ভাগ এলবুমিন সৃষ্টি করে।

২। মসিনা ও রেপ খইল—এই সকল খইলের দ্বারাও শতকরা ২৫ হইতে ৩৫ ভাগ এলবুমিন প্রস্তুত হয়।

৩। মটর ও সীম জাতীয় ফসল—এই খাদ্যজাত সারে শতকরা ২০ হইতে ২৫ ভাগ এলবুমিন প্রস্তুত হয়।

৪ গম, যব, ভুট্টা, কাওন ও চিনা—এই খাদ্যজাত সার দ্বারা ১০ হইতে ১৫ ভাগ এলবুমিন প্রস্তুত হয়।

৫। সর্ষপ খইল—এই খাদ্যজাত সারদ্বারা ৪৫ ভাগ হইতে ৫০ ভাগ এলবুমিন প্রস্তুত হয়।

৬। ধান—ইহাতে তুষের ভাগ অধিক বলিয়া এই খাদ্য এলবুমিন সৃষ্টির পক্ষে তত উপযোগী নহে।

তৈলপ্রদ শস্যের খইলই এলবুমিন সৃষ্টির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যে ঘাসে নাইট্রোজেন ও এমোনিয়ার ভাগ অধিক, তাহাই এলবুমিন সৃষ্টির বিশেষ সহায়তা করে। সেই জন্যই এবম্বিধ পশু-খাদ্যই পশুর পক্ষেও উপকারী এবং কৃষকের পক্ষেও লাভজনক। পশ্বাদির আহার্য্যবস্তু মাত্রেই দ্বিবিধ কার্য্য সাধিত হয়। প্রথমতঃ ইহাতে পশুর জীবনধারণের সহায়তা করে অর্থাৎ পশুর জীবনধারণ জন্য উহাদের যে অংশের প্রয়োজন হয়, তাহা রক্ত মাংস অস্থি ও চর্ব্বি-আকারে পশুদেহে অবস্থিতি করে। দ্বিতীয়তঃ অনাবশ্যক অংশ মলরূপে বহির্গত হইয়া উদ্ভিদের আহার্য্য পদার্থে পরিণত হয়। সুতরাং যে বস্তু দ্বারা এই উভয়বিধ কার্য্যই সুসাধিত হইতে পারে তাহাই অত্যুৎকৃষ্ট পশুখাদ্য।

নাইট্রোজেনযুক্ত ঘাসে এলবুমিন্‌, ছানা (casien) ও রক্তস্থ ফাইব্রিন (Fibrin) নামক পদার্থ থাকে। ইহারা দেহের ক্ষয়কার্য্যের প্রতিরোধক অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা শরীরের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের পূরণ (Repair of the waste of the body) হয় এবং ইহারা পেশীবর্দ্ধন কার্য্যের সহায়। প্রাণী মাত্রেরই গতির সহিত প্রতিমুহূর্ত্তেই শারীরিক যন্ত্র সকল পরিচালিত ও আংশিক ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। নাইট্রোজেন-প্রধান খাদ্য দ্বারাই এই ক্ষয় পূরণ হইয়া থাকে। ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ পূরণ করিয়া খাদ্যের যে সারাংশ অবশিষ্ট থাকে তাহাতেই মাংস-পেশীর সৃষ্টি হয়। খাদ্যে ধাতব পদার্থও আছে। ইহা দ্বারা দেহের কঙ্কাল (Skeleton) সৃষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পশুর দ্বারা অধিক কার্য্য করাইয়া লইলে, তাহাদিগকে নাইট্রোজেনযুক্ত ও নাইট্রোজেনহীন এই উভয়বিধ খাদ্যই দিতে হইবে। খাদ্যের সহিত পশুর শক্তির নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পশুকে যেরূপ খাদ্য দিবে, তাহাদের মল-মূত্রাদি হইতে সেইরূপ সারই পাইবে। অধিক পরিমাণে দুগ্ধ পাইতে বাসনা করিলে, গাভীকে আবশ্যকমত দুগ্ধোৎপাদক খাদ্য দিতে হয়। কোন পশু হইতে অধিক পরিমাণে মাংস পাইতে হইলে উহাকে মাংসবর্দ্ধক খাদ্য দিতে হইবে। কোন পশুর চর্ব্বির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিলে উহাকে চর্ব্বিবর্দ্ধক খাদ্যই অধিক পরিমাণে দিতে হয়। খাদ্যের তারতম্যানুসারে সারেরও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। গোশালাজাত বা প্রাণীজ সার মাত্রেরই খাদ্যের সহিত নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই রহিয়াছে। সুতরাং কৃষকের পক্ষে কৃষিকার্য্যোপযোগী পশুখাদ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। খাদ্যের উপরেই যে পশুর শ্রমশক্তি ও সারের উপকারিতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে, তাহাও বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। পশুবিষ্ঠাজাত সারের মধ্যে বলদ ও ষাঁড়ের বিষ্ঠাই বিশেষ উপকারী।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ।
এফ্‌, আর, এইচ্‌, এস্‌, লণ্ডন।

মফঃস্বলের বাণী

[পাবনার 'স্বরাজ', শিলচরের 'সুরমা', বাখরগঞ্জের 'বরিশাল হিতৈষী' এবং চট্টগ্রামের 'জ্যোতিঃ' এই কয়খানি সাপ্তাহিক পত্র সুন্দররূপে সম্পাদিত হইতেছে। 'মেদিনীপুর-হিতৈষী' 'এডুকেশন গেজেট' এবং ঢাকার 'বিশ্ববার্ত্তা'ও উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালার সপ্তাহিক সম্পাদকগণ নিজ নিজ পত্রিকায় ইহাদের আলোচনা-প্রণালী অবলম্বন করিলে লোকের যথেষ্ট উপকার হয়। মাসিকের পাঠকগণকেও এইগুলি পাঠ করিবার সুযোগ খুঁজিয়া লইতে অনুরোধ করিতেছি। তাহা হইলে তাহারা দেশের চিন্তা ও কর্ম্ম সহজে বুঝিতে পারিবেন।]

১। লোকসাহিত্যের পরিপুষ্টি

গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় সিঙ্গাতলার বাসলাতলাতে গোসাই গম্ভীরার বিতরণ-কার্য্য মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর সস্ত্রীক ও পুলিস সাহেব বাহাদুর, হাকিম, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ ও সহরের অন্যান্য যাবতীয় ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর একটি অভ্যর্থনা-সঙ্গীত হয়। তারপর শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ লাহিড়ী মহাশয় গম্ভীরার বার্ষিক-বিবরণী পাঠ করেন। কুমুদ বাবুর রিপোর্ট যারপরনাই সুন্দর ও উপদেশপূর্ণ হইয়াছিল। তৎপর ডাক্তার নলিনীকান্ত বসু মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ অথচ সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর বাবু প্রসন্নকুমার রাহা, উকীল মহাশয়, পূর্ব্বোক্ত বক্তাদিগের অনুসরণ করিয়া দু'চার কথা বলেন ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। বর্ত্তমান বৎসরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১। সুফী রহমান—প্রথম মেডেল ১টা
২। শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস—মেডেল ১টা
৩। শ্রীগোপালচন্দ্র দাস—ঐ ১টা
৪। শ্রীহরিমোহন কুণ্ডু—ঐ ১টা
৫। শ্রীশশিভূষণ সাহা—কাপড় ১ খানা
৬। শ্রীরাখালচন্দ্র দাস— ঐ ১ খানা
৭। শ্রীমনোমোহন সাহা—ছাতা ১টা
৮। শ্রীবৈদ্যনাথ সাহা— ঐ ১টা
৯। শ্রীবাদলচন্দ্র দাস—গেঞ্জি ১টা
১০। শ্রীবসন্তকুমার সাহা—ঐ ১টা

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয় কয়টি মেডেল এখানে বিতরণ জন্য পাঠাইয়াছেন। গত বৎসর জাতীয় বিদ্যালয়ে যে সকল দলের গান হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত ভাবে মেডেলগুলি দেওয়া যাইতেছে—

১। শ্রীগোপালচন্দ্র দাস—মেডেল ১টা
২। মহম্মদ সুফী, কুতুবপুর বোলবাই, ঐ—১টা
৩। মহম্মদ সুফী, ইংরেজবাজার বোলবাই—ঐ ১টা
৪। শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস—মেডেল ১টা

পুরস্কার বিতরণ শেষ হইলে পর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। সর্ব্বশেষে দুইটি গম্ভীরার গান হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

মকদুমপুর গোঁসাই গম্ভীরা কার্য্য-বিবরণী—
১৩২০ সাল

পৃথিবীতে আমরা মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি—সেইজন্য আমাদের চিত্তের আনন্দ-ধারা নানা আকারে ব্যক্ত হইতে চায়—এবং সেইরূপেই আমাদের স্বাস্থ্যের পরিপূর্ণতার পরিচয় প্রদান করে। যে আমোদ মনকে চঞ্চল করিয়া তুলে, কিন্তু সবল করে না, সে আমোদ পশুর জন্য, তাহা মানুষের পরিত্যাজ্য। যে আনন্দ চাঞ্চল্যের ভিতর দিয়া মনে শক্তি সঞ্চার করে, সেই আনন্দই মানুষের এবং তাহাই উৎসবে অভিব্যক্ত হইয়া জাতীয় সম্পদরূপে পরিগণিত হয়। তাই কোন জাতির মধ্যে এই উৎসবের হ্রাস দেখা দিলেই বিশেষ আশঙ্কার কথা মনে করিতে হইবে।

এই গম্ভীরা-উৎসব মালদহবাসীর জীবনের পরিচয়। ইহার বোলবাই গান লোক-শিক্ষার দিক হইতে বিশেষ আদৃত। বঙ্গদেশে এরূপ অনুষ্ঠান আর নাই, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মালদহের এই উৎসব কিন্তু মধ্যে কিছুদিন ম্লান হইতেছিল। তবে ভগবানের কৃপায় আমাদের আশা হইতেছে বুঝি উৎসবটি আবার ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

গত বৎসর আমাদের গম্ভীরা-মণ্ডপে প্রায় ১৫।১৬ দল বোলবাই গান হয়, কিন্তু অধিকাংশ গানই গম্ভীরার বিশেষত্ব বর্জ্জিত ও উদ্দেশ্যহীন ছিল। তবে যে কয়টি দল গম্ভীরার বিশেষত্ব রাখিতে পারিয়াছিল, তাহাদিগের সকলকেই আমরা মেডেল দিয়াছিলাম। গত বৎসর শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র

দাসের মহেশপুর বোলবাইসমিতি প্রতিযোগিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। কিন্তু বহু মেডেল দিলে মেডেলের গৌরব চলিয়া যায়—সেইজন্য এ বৎসর আমরা তিনটি মেডেল দিব স্থির করিয়া উপযুক্ত সময়ে "মালদহ-সমাচারে" বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম। বিজ্ঞাপনে অনেক কথা ছিল, আমরা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।—"গম্ভীরার গানে গম্ভীরার সুর, গম্ভীরার হাবভাব, ভিন্ন ভিন্ন পল্লীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভাষা, তন্মধ্যে সাহিত্য-ইতিহাস-চর্চ্চা, আধুনিক সমাজের অবস্থা, বাৎসরিক বিবরণ, দেশের কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া রং তামাসা সহ উচ্চভাবে গীত রচনা করিবার জন্য গীত-রচয়িতাগণকে বিশেষ অনুরোধ করা যাইতেছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের ২রা ৩রা ৪ঠা তারিখে সাধারণ গম্ভীরা হইয়া কেবল স্বতন্ত্ররূপে বোলবাইগানের প্রতিযোগিতার জন্য ৫ই ৬ই জ্যৈষ্ঠ দিন ধার্য্য করা গেল। গম্ভীরার মুখা নাচের সংখ্যা ক্রমশঃই কম হইয়া যাইতেছে। গম্ভীরার নাচের মধ্যে কালী, চামুণ্ডা, নরসিংহ, বুড়া বুড়ী, পরী ইত্যাদি নাচের বিশেষভাবে বিশেষত্ব আছে। তাহাতে নর্ত্তকের তাল মানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, এ বৎসর উপরোক্ত নাচগুলি সম্বন্ধেও বিবেচনা করিয়া পুরস্কার দেওয়া যাইবে।" দ্বিতীয় বারে যে বিজ্ঞাপন দেই তাহাতে প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক বোলবাই-সমিতিদিগকে ২০শে বৈশাখের মধ্যে গান পাঠাইতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। যাঁহারা গান পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কোন দিন গান গাহিতে আসিতে হইবে, তাহা জানাইয়াছিলাম। তদনুসারে শ্রীমান্ গদাধর দাস, রাধামাধব দাস, শরচ্চন্দ্র দাস, ডোমনচন্দ্র ঘোষ এবং কবিরাজ মৃত্যুঞ্জয় হালদারদিগের বোলবাই-সমিতির গান ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ এবং শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র দাস, হরিমোহন কুণ্ডু, শরচ্চন্দ্র দাস ও মহম্মদ সুফীর বোলবাই-সমিতির গান ৫ই জ্যৈষ্ঠ ধার্য্য হইয়াছিল।

গানগুলির পরীক্ষা করিবার জন্য নিম্নলিখিত সুধীবৃন্দকে অনুরোধ করা হয়—

(১) শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, (২) শ্রীযুক্ত কালীপদ চট্টোপাধ্যায়, (৩) পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, (৪) শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর বসাক, (৫) ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত বসু, (৬) মৌলবী আবদুল গণি।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় গানের সময় এখানে আসিয়া পৌছিতে পারেন নাই। তবে তিনি গানের রচনা দেখিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর বসাক, ডাক্তার নলিনীকান্ত বসু এবং মৌলবী আবদুল গণি ভিন্ন অন্যান্য পরীক্ষকগণ প্রায় সমস্ত দলের গান শুনেন নাই। সেই জন্য শ্রীযুক্ত আদিত্যনাথ মৈত্র এবং শ্রীযুক্ত রাম নৃসিংহ গোস্বামী কাব্যতীর্থ মহাশয়দ্বয়কে অতিরিক্ত পরীক্ষকরূপে গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষকগণ নিজের নিজের মতে প্রত্যেক বোলবাই দলকে নম্বর দেন এবং তার পর সকলে বৈঠক করিয়া নিজের নিজের নম্বর সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহাদের আলোচনায় যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত মন্তব্যে প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে দিয়াছেন।

পরীক্ষকদিগের মন্তব্য

১। (ক) কুতুবপুর বোলবাই-সমিতির শিবের বন্দনাটি কবিত্বে পরিপূর্ণ। একটি সংক্ষিপ্ত শিব-বন্দনার গানে দেশের পূর্ব্ব অবস্থা বর্ত্তমান অবস্থা অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এ গানটিতে এত ভাবের অবতারণা করা হইয়াছে যে, উহার সমালোচনা করিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। একটি শিব-বন্দনার গানে পদকর্ত্তা দেশের দুর্দ্দশার অবস্থা এমত সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন এবং সর্ব্বস্ব গেলেও ধর্ম্মকে ধরিয়া আনিবার কথা এমত কৌশলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ঐ গানটি শ্রবণ করিয়া অনেকেই একান্ত মোহিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্যান্য গানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(খ) ইংরেজ রাজার বোলাই-সমিতি কর্ত্তৃক দেশের হিতার্থে শিল্প ও কৃষি শিক্ষার্থ বিদেশে যাওয়ার আবশ্যকতা অতি সুন্দররূপে অভিনয়ে প্রদর্শিত হইয়াছে।

২। মকদুমপুর বোলবাই-সমিতির শিবের বন্দনাটি সম্পূর্ণ নূতনভাবে রচিত হইয়াছিল, আমাদের পরমারাধ্য দেবতা মহাদেবকে লোকে সিদ্ধিখোর, গাঁজাখোর, লম্পটভাবে আপনাদের মনের মত গড়িয়া লইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মহাদেব যোগী, ঋষি ও নির্ব্বিকার। ইহা বুঝাইবার জন্যই পদকর্ত্তা বন্দনার পদটি রচনা করিয়াছিলেন, আমরা মনে করি, পদকর্ত্তার সেই অভিলাষ সফল হইয়াছে। লক্ষ্মী সরস্বতীর সাগর পারে যাওয়ার উক্তিটি বড়ই শ্রুতিসুখকর হইয়াছিল। চাষা বালকের উক্তিমূলক গান দুইটিও অতি সুন্দরভাবে রচিত হইয়াছিল। রচনায় কবিত্ব আছে। এই দলের নর্ত্তক রাধারমণ বারিক নৃত্যবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী।

৩। মহেশপুরের বোলবাই-সমিতির শিব-বন্দনার গানটি রাগ-রাগিণী ও মনোহর নৃত্য-ভঙ্গির সহিত গীত হইয়াছিল। উহার রচনাতেও যথেষ্ট কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু গ্রাম্য শব্দের কিছু বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। বিধবা বিবাহের উক্তি প্রত্যুক্তি বড়ই শ্রুতিসুখকর হইয়াছিল। এই দলের নর্ত্তক রমণীকান্ত দাস নৃত্যবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী।

৪। সাহাপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিমোহন কুণ্ডের রচিত শিবের বন্দনার সঙ্গীতটি বিলক্ষণ কবিত্ব-পরিপূর্ণ, উহা কিঞ্চিৎ সহজ ভাবের ভাষায় রচিত হইলে আরও প্রশংসার বিষয় হইত। সাহাপুর বোলবাই-সমিতির কৃষি-বিষয়ের উপদেশ-জনক বোলবাই গানটি বড়ই শ্রুতিমধুর হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পালাটায় অনেক অবান্তর কথা আছে এবং চাষীদের মুখে সাধু ভাষার প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত হয় নাই। অনেকগুলি গানের সুরেও তাঁহারা গ[illegible] বিশেষত্ব রাখেন নাই।

৫। গণিপুর বোলবাই-সমিতির শিবের বন্দনার বোলবাই গানটি সাধারণ ভাবে রচিত। উক্ত সমিতির জমিদারের অত্যাচার বিষয়ক সঙ্গীত কয়টি হৃদয়স্পর্শী কবিত্বের নিদর্শন। কিন্তু গায়কদিগের দোষে গানগুলি তেমন সুন্দরভাবে গীত হয় নাই।

৬। মৃত্যুঞ্জয় হালদারের শিবের বন্দনা-গানটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশগুলি প্রসংসার যোগ্য। কিন্তু তাঁহার কৃতকার্য্যতার সম্পূর্ণ নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

৭। রাধামাধব দাস, ডোমনচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির নৃত্য-গীতাদিও প্রশংসার যোগ্য, এবার যে ভাবে গম্ভীরাসম্বন্ধে যত্ন লওয়া হইয়াছে, এই ভাবে কিছুদিন চেষ্টা করিলে সময়ে গম্ভীরার আরও উন্নতি আশা করা যাইতে পারে।

৮। উল্লিখিত দলগুলির গান শুনিয়া আমরা যেরূপ নম্বর দিয়াছি, তাহাতে মহম্মদ সুফী প্রথম গোপাল ও শরচ্চন্দ্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

ফল কথা এবার যতগুলি দল প্রতি-যোগিতায় গান করিতে আসিয়াছিলেন সকল গুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবং প্রত্যেকে যে নম্বর পাইয়াছেন তাহার মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নহে।

আমরা পরীক্ষকদিগের বিচার অনুসারে ও তাঁহাদের অনুরোধে তিনটি মেডেলের স্থানে চারিটি মেডেল দিতেছি।

মালদহ-সমাচার।

২। আমাদের দেশ

আমাদের 'দেশ' কোন্‌টি? সে কি সেই সারিসারি বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত, অসংখ্য সৌধরাজিসুশোভিত, অনবযানসমাচ্ছন্ন, নিত্য নৃত্যগানমুখরিত প্রাসাদনগরী? যে স্থানে অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবেশী পরস্পরকে

জানে না, যে স্থানে দারিদ্র্যের সহিত ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্র সহানুভূতি নাই, যে স্থানের সকল জিনিষই বাহিরে চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে, সেই কি আমাদের বাংলাদেশ? না, তাহা নহে। আমাদের প্রকৃত দেশ সেখানে—যেথায় জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে নরনারী কাদা ছাঁকিয়া নিদারুণ পিপাসা নিবারণ করে, যে স্থানে দুইবেলা মোটাভাত খাইতে পাইলে লোকে পরমভাগ্য মনে করে, যে স্থানে অত্যাচার, অবিচার, দারিদ্র্য, রোগ, শোক দ্বারা লোকে নিয়ত নিষ্পেষিত হইলেও তাহাকে "প্রাক্তন কর্ম্মফল" সংস্কারে অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করা অনাবশ্যক মনে করে যে স্থানের স্রোতস্বতী ও "দীঘি-পুষ্করিণী" এককালে সমভাবে সকল লোকের স্বাস্থ্যবিধান করিত, তাহাই ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীর আবাসস্থান হইয়া দেশের লোকের রক্ত শোষণ করিতেছে, বিদ্যালয়ে শিক্ষার ভবিষ্যৎ উচ্চ উদ্দেশ্য যেখানে কৃষিপল্লী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দরিদ্র জনসমাজের সহিত একত্র বাসের সম্বন্ধ পরিত্যাগ দ্বারা "সভ্য" সমাজভুক্ত হওয়া। এই দুর্ভাগ্য দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া যিনিই নেতৃত্ব করিতে চাহিবেন, তাঁহাকে শুশ্রূষাকারীর ন্যায় ঔষধ-পথ্য, শক্তি-সামর্থ্য লইয়া সেই রুগ্ন জনসমাজের পার্শ্বে আসিয়া পরিপূর্ণ সহানুভূতি ও কৃতপ্রতিজ্ঞার সহিত বসিতে হইবে। সর্ব্বোপরি তাঁহাকে এই দরিদ্র জনসমাজের সহিত দেশের ধনী সম্প্রদায়ের কর্ম্মক্ষেত্র ও স্বার্থকে একত্র করিতে হইবে। এই দুর্গতিগ্রস্ত দেশে সকলের একতা সাধন যাঁহার ক্ষমতায়ত্ত, তিনিই দেশের যথার্থ নায়কের উপযুক্ত, নতুবা অন্য কোন বিদ্যাবুদ্ধি বা প্রতিভা ক্ষমতা দ্বারা তিনি কদাপি এদেশের প্রতিনিধিত্ব করিতে সক্ষম হইবেন না।

স্বরাজ।

৩। বাঙ্গালীর জার্ম্মেণীতে চাকরী

শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাস জিনোদপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র দাস মহাশয়ের পুত্র। সে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম মান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ে বিশেষ ছাত্রভাবে রসায়ন অধ্যয়ন করিয়াছিল। তৎপর শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত প্রভৃতি মহানুভব মহোদয়গণের সাহায্যে জার্ম্মেণীতে ফলিত রসায়ন অধ্যয়ন করিবার জন্য যায়। শ্রীমান্ অতি কষ্টে তথায় চারি বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া ফলিত রসায়নে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ, ডি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বিগত ১লা জুন হইতে ২০০৲ টাকা মাহিয়ানায় জার্ম্মেণীর এক প্রসিদ্ধ রাসায়নিক কারখানায় নিযুক্ত হইয়াছে। এত কষ্টের পর তাহার এই সফলতায় ত্রিপুরাবাসী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। আমরা তাহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

ত্রিপুরা-হিতৈষী।

৪। বিক্রমপুরে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশনের উৎসব

"পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুরাগী ও ভক্ত কতিপয় বিক্রমপুরবাসী সজ্জনের সমবেত উৎসাহ ও চেষ্টায় গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ রবিবার বিক্রমপুরান্তর্গত বিদগাঁ-গ্রামে একটি রামকৃষ্ণ ভক্ত-সম্মিলন ও আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণাশ্রিত বিদগাঁ-নিবাসী চিরকুমারব্রতাবলম্বী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী এবং কলমা-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ভূপতিচন্দ্র দাশগুপ্ত মহোদয়দ্বয়ই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাসগুপ্ত প্রভৃতি দৃঢ়কর্ম্মা মহোদয়গণের নেতৃত্বে স্থানীয় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের সেবকগণ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের নিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা প্রশংসার্হ। উৎসবের পূর্ব্বদিন যে সকল ভিন্নগ্রামবাসী সেবক বিদগাঁ-গ্রামে সম্মিলিত হন তাঁহাদিগের পরিচর্য্যার জন্য

আধুনিক ভারতে নবযুগের প্রবর্ত্তক

স্বামী বিবেকানন্দ

"তুই যদি একা ঐ ভাবে চরিত্রগঠন কত্তে পারিস,
তাহলে তোর দেখাদেখি হাজার লোক ঐরূপ কত্তে শিখবে।"

India Press, Calcutta

বিদগাঁ-গ্রামবাসী জনসাধারণ অতীব ব্যগ্র ছিলেন। বিদগাঁ-গ্রামবাসীদের অতিথি-সৎকার প্রশংসনীয়।

উৎসব-ক্ষেত্রের উত্তর প্রান্তে ঠাকুরের মন্দির। মন্দিরের সম্মুখে একটি বৃহদাকার কীর্ত্তন-মণ্ডপ। মণ্ডপের পশ্চিমধারে মহিলাদের বসিবার স্থান। উৎসব-ক্ষেত্রের দক্ষিণ প্রান্তে জলঘর এবং বিবিধ দোকান ঘর। পূর্ব্বে তোরণ। তোরণের সম্মুখে সপল্লব পূর্ণকুম্ভ। তাহারই এক পার্শ্বে 'উদ্বোধন'-গ্রন্থাবলী ও রামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজির নানা রকমের ছবির দোকান। তাহার সম্মুখে কলমা-হরিসভা কর্ত্তৃক স্থাপিত "নিবেদিতা-স্মৃতি-ভাণ্ডারে"র জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতেছিল। সমগ্র উৎসব-ক্ষেত্রটি, বিশেষতঃ মন্দির ও মণ্ডপটি নানাবিধ পত্র, পুষ্প, লতা ও পতাকায় সুসজ্জিত হইয়াছিল।

উৎসবের পূর্ব্ব দিন (৩রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার) ঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ ভক্ত পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ সেবানিষ্ঠ ব্রহ্মচারী রামচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া বিদগাঁ-গ্রামে উপস্থিত হন। তাঁহার আগমনে সেবকবৃন্দের মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার হয়। মহোল্লাসে সকলেই ঘন ঘন জয়ধ্বনি দিতে লাগিলেন।

শনিবারের রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই অনেক ভক্ত উৎসব-ক্ষেত্রে মিলিত হইয়া "শ্রীগুরু মহারাজ কি জয়" "স্বামীজি মহারাজ কি জয়" এইরূপ জয়ধ্বনি করিতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে জয়ঢাক বাদিত হইতে থাকে। ঐ ধ্বনি শ্রবণে জাগরিত হইয়া অনেক গ্রামবাসী উৎসবক্ষেত্রে সমবেত হন। তৎপর ঊষা-কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। স্থানীয় ও বিভিন্ন গ্রাম হইতে আগত বিভিন্ন কীর্ত্তনের দল কীর্ত্তন করিতে করিতে এবং মহোল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে করিতে গ্রামবাসীদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। সূর্য্যোদয় হইলে পর স্বামীজিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া, কীর্ত্তন ও জয়ধ্বনি করিতে করিতে সকলে নদী-তীরে উপস্থিত হন। তথায় বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন কীর্ত্তনের দল ক্রমশঃ সমবেত হয় এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কীর্ত্তনাদি হয়। কীর্ত্তন শেষ হইলে পর সমাগত ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে স্বামীজি কিছু উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম এই :—"আমাদের ঠাকুর সকলকে বলিতেন, 'ভগবানের উপর নির্ভর কর'। তাঁর এ কথাটি যদি আমরা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি, তবে আমরা ধন্য হইয়া যাইব। সংসারে ভয়ই হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যুর হাত এড়াইতে হইলে নির্ভীক হইতে হইবে, ভয় দূর করিতে হইবে। এই ভয় দূর করিবার উপায় হচ্ছে ভগবানকে আপনার জন মনে করিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করা। ভগবানকে যে আপনার জন মনে করিতে পারে তাঁহার আর ভয় নাই—তার মৃত্যুও নাই। একজন ইংরেজ নির্ভয়ে দেশ-বিদেশ বনজঙ্গল ঘুরিয়া আসে। কারণ সে জানে তাহার পশ্চাতে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য সমস্ত বৃটিশ রাজশক্তি রহিয়াছে। সে সমস্ত বৃটিশ রাজ-শক্তিকে আপনার মনে করিতে পারিয়াছে বলিয়াই সে নির্ভীক। সেইরূপ আমরাও যদি অভয় ও আনন্দের আকর ভগবানকে আপনার জন মনে করিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারি, তবে আর আমাদের ভয় নাই। আমরা অমরের সন্তান, আমাদের আবার ভয় কি ? আমরা অভীঃ, তাই আমরা অমর। ইহাই ঠাকুরের উপদেশ। আমরা যেন তাঁহার এই উপদেশটি হৃদয়ে হৃদয়ে বোধ করিতে পারি এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারি।"

স্বামীজির উপদেশ প্রদান শেষ হইলে পর সকলে নদীতে স্নান সমাপনপূর্ব্বক উৎসব-ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কীর্ত্তন-মণ্ডপে সর্ব্বদাই কীর্ত্তন চলিতেছিল। স্থানীয় পাটিয়াল ও অন্যান্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মহানন্দে কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন।

দু' প্রহরে ঢাক ঢোল প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য সহযোগে পূজা আরম্ভ হয়। স্বামী প্রেমানন্দ

অনুগ্রহপরবশ হইয়া নিজেই পূজাকার্য্য সম্পন্ন করেন। উপস্থিত বহুলোক স্ব স্ব ব্যয়ে ভোগ প্রদান করিয়াছিলেন। পূজান্তে প্রসাদ-বিতরণ আরম্ভ হয়।

পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে পানিহাটির মহোৎসবের অনুকরণে সকলেই স্ব স্ব ব্যয়ে ভোগ প্রদান ও প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সেই বিরাট জনমণ্ডলীর ঘনীভূত ভাবাবেগে মুগ্ধ হইয়া স্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার কাপড়িয়া ও শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ পাল মহোদয়দ্বয় নিজেদের ব্যয়ে সমাগত জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করিবার বন্দোবস্ত করেন। তাঁহাদের এই মহদ্দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া একজন পান-ব্যবসায়ী বিনামূল্যে সকলকে পান বিতরণ করেন। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ পাল মহাশয়ও বিনামূল্যে পান ও বাতাসা বিতরণ করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। উৎসবের কতিপয় দিবস পূর্ব্বে উৎসবের উদ্যোক্তৃগণের ২০০৲ টাকার প্রয়োজন হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রামের ভদ্রসম্প্রদায় হইতে কিছুতেই এই টাকার যোগাড় হয় না। তখন স্থানীয় "জুগী"-সম্প্রদায়ভুক্ত এক গৃহস্থ নিজ তহবিল এবং পরিবারভুক্ত ছেলে, মেয়ে, বৌ প্রভৃতির তহবিল শূন্য করিয়া, কোনওরূপ দলিল-পত্র না লইয়া, ঐ টাকার যোগাড় করিয়া দেয়।

প্রসাদ বিতরণ শেষ হইলে পর মুন্সীগঞ্জের প্রসিদ্ধ "রামকৃষ্ণসঙ্গীত-সম্প্রদায়ে"র কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। উক্ত সম্প্রদায়ের পরিচালক শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত রাইমোহন গোস্বামী ভ্রাতৃদ্বয়ের গানে সমবেত সমস্ত জনমণ্ডলী সবিশেষ তৃপ্ত হন। উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত অল্পবয়স্ক কয়েকটি বালক স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের সম্মুখে আসিয়া "জয় জয় রামকৃষ্ণ গুণধাম" এই গানটি এমন সুন্দর ভাবে গাহিয়াছিল যে, স্বামী মুগ্ধ হইয়া ঠাকুরের আসন হইতে কয়েকটি মালা আনাইয়া বালকদের কণ্ঠে নিজ হস্তে পরাইয়া দেন।

কীর্ত্তন শেষ হইলে পর আরতি ও সায়ংকালীন ভোগ হয় এবং তৎপর ভক্তগণ নিজ নিজ ইচ্ছা মত গান করিতে ও স্তোত্রাদি পাঠ করিতে থাকেন।

উৎসবক্ষেত্রে অন্যূন পাঁচ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। স্বর্ণগ্রাম, ধোপরাপাশা, টঙ্গীবাড়ী, বালিগাঁ, গারুগাঁ, পাঁচগাঁ, চিত্রকরা, আউটসাহী, রাজাবাড়ী, বাহেরটক, বজ্রযোগিনী, ভরাকর, কলমা, নাশীরা, বহর, তেলীরবাগ, গাউপাড়া, সিলিমপুর, সোনারঙ্গ, বানারী, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, আরিয়ল, আমতলা প্রভৃতি স্থান হইতে বহু লোক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন এম্-এ, ভরাকরবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত উমাপ্রসন্ন মল্লিক, কলমাবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত কামিনীরঞ্জন দাশগুপ্ত, রাজাবাড়ীর প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কুণ্ড প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে উৎসবক্ষেত্রে দেখা গিয়াছিল।"

বিশ্ববার্ত্তা।

৫। কৃষি-বিবরণী

গত ১৯১১-১৯১২ সনে ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্যে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে, ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিষয়ক পরামর্শদাতা মিঃ বার্ণার্ড কভেণ্ট্রি তৎসম্বন্ধে এক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে উক্ত রিপোর্টের সার সঙ্কলিত হইল :—

ইক্ষু

ইক্ষুর চাষ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বর্ষে মান্দ্রাজে একটি কৃষিক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন যে, এ দেশজাত ইক্ষু-রসে শর্করার অংশ বড়ই কম। ভারতবর্ষে একমণ চিনি প্রস্তুত করিতে ১৫৲।১৬৲ মণ ইক্ষুদণ্ডের প্রয়োজন হয়, কিন্তু অন্যান্য দেশে ১০৲ মণ ইক্ষুদণ্ড হইতে একমণ চিনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং এ দেশে চিনি উৎপাদনের ব্যয় অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বেশী পড়ে। চিনি

দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দির

স্বর্গীয়া রাণী রাসমণির অক্ষয় কীর্ত্তি

১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত

'শ্রীদক্ষিণেশ্বর' গ্রন্থ হইতে গৃহীত

India Press, Calcutta

উৎপাদনের এই অতিরিক্ত ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য নানাবিধ পরীক্ষা হইতেছে। তাহাতে আশা হয়, সত্বরই এ দেশে অধিকতর শর্করাযুক্ত ইক্ষুর চাষ প্রবর্ত্তিত হইবে। এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর ৯০ রকম ইক্ষু মান্দ্রাজের পরীক্ষাক্ষেত্রে সংগৃহীত হইয়াছে।

চীনাবাদাম

১৯০৫-১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এ দেশে প্রায় আড়াই লক্ষ বিঘা জমিতে চীনাবাদাম আবাদ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে সেই স্থলে ১২ লক্ষ বিঘা জমিতে উহার আবাদ হইয়াছে। কৃষি-বিভাগের পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাদামেরও আবাদ বৃদ্ধি হইয়াছে। মান্দ্রাজ বোম্বাইয়ের ত কথাই নাই, মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় নামক জেলায় প্রচুর পরিমাণে চীনাবাদাম উৎপন্ন হইতেছে। যুক্তপ্রদেশে ইহার চাষ পূর্ব্বে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। এক্ষণে তথায় ২০,০০০ হাজার একর জমিতে বাদামের চাষ হইতেছে। ব্রহ্মদেশে ১,৪০,০০০ একর জমিতে এই বাদাম চাষ করা হইতেছে।

খর্জ্জুর-শর্করা

অনেকেই অবগত নহেন যে, এ দেশে খেজুর-রস হইতে প্রতি বৎসর প্রায় এক কোটী পঁয়ত্রিশ লক্ষ মণ শর্করা উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, খেজুর-রসকে গুড়ে পরিণত না করিয়া একেবারেই শ্বেতবর্ণের শর্করায় পরিণত করা যাইতে পারে। খেজুর-রসে শতকরা ৮-১০ ভাগ চিনি বর্ত্তমান। আমেরিকাতে মেপল বৃক্ষের রস হইতে চিনি প্রস্তুত হইতেছে, উহাতে শতকরা ৩ ভাগ মাত্র শর্করা বর্ত্তমান। সুতরাং মেপল রস হইতে প্রাপ্ত চিনি অপেক্ষা যে খেজুর রসজাত চিনি শস্তা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে প্রণালীতে খেজুর-রস হইতে চিনি প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে উহার মূল্য হ্রাস হওয়া অসম্ভব।

তামাক

পুষা আদর্শ-কৃষিক্ষেত্রে মিঃ ওমিসেল হাওয়ার্ড নানাপ্রকার তামাকের চাষ করিয়াছেন। তদ্দারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, চেষ্টা করিলে দেশীয় বীজ হইতেও উৎকৃষ্ট তামাক উৎপন্ন করা যাইতে পারে। এ দেশীয় তামাকের দোষ এই যে, উহার পাতা অতিশয় পুরু এবং বর্ণ অনুজ্জ্বল। সেই নিমিত্তই উহা দ্বারা চুরুট প্রভৃতি প্রস্তুত হয় না। মিঃ হাওয়ার্ডের কৃষিক্ষেত্রে যে তামাক উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পাতা অনতিস্থূল এবং তাহার বর্ণ উজ্জ্বল পীত। রঙ্গপুর জেলার বুড়ীরহাট নামক স্থানে বিদেশী তামাকের আবাদ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উপযুক্ত পরিমাণ সার ব্যবহার করিলে এবং প্রশস্ত গুদাম তৈয়ার করিয়া তন্মধ্যে তামাক শুকাইতে পারিলে চুরুট এবং সিগারেটের উপযোগী তামাক এ দেশেও উৎপন্ন হইতে পারে। বুড়ীরহাট কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট ১৭ মণ তামাক ১৫০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল। সুতরাং উপযুক্তরূপ যত্ন ও অর্থ ব্যয় করিলে যে এ দেশেও অন্যান্য দেশের ন্যায় তামাক উৎপন্ন করা যাইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তুলা

বোম্বাই প্রদেশে গত বর্ষে ২০,০০০ একর বা প্রায় ৬০,০০০ হাজার বিঘা জমিতে উন্নত শ্রেণীর তুলার বীজ বপন করা হয়। গত বৎসরের কার্পাসের চাষে যে বীজ পাওয়া যাইবে, তদ্দারা পরিণামে বিশ লক্ষ একর বা ৭০ লক্ষ বিঘা জমিতে তুলার চাষ করা যাইতে পারিবে। মান্দ্রাজের অন্তর্গত তিনেভেলি জেলায় করুনগণি নামক উৎকৃষ্ট তুলার বীজ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তৎফলে উক্ত তুলার আবাদ মান্দ্রাজ অঞ্চলে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। মান্দ্রাজে কাম্বোডিয়া শ্রেণীর তুলারও আবাদ বহুল পরিমাণে করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে মান্দ্রাজ প্রদেশে অনুমান দেড় কোটী টাকা

মূল্যের কাম্বোডিয়া তুলা উৎপন্ন হইবে। গত দুই বৎসরে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে পূর্ব্বাপেক্ষা ছয় লক্ষ একর অধিক জমিতে তুলার আবাদ করা হয়। বর্ত্তমান সনে আরও তিন লক্ষ একর জমিতে নূতন করিয়া তুলার চাষ করা হইয়াছে।

মধ্য প্রদেশে বরি নামক তুলার আবাদ করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর কার্পাস-বৃক্ষের বিশেষ গুণ এই যে, ইহা "উইল্ট" নামক পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয় না। মধ্য প্রদেশের কৃষকগণ এই তুলার আবাদ করিয়া প্রচুর লাভ করিয়াছে।

যুক্ত প্রদেশে শ্বেতবর্ণের পুষ্পবিশিষ্ট একপ্রকার কার্পাসের চাষ হইতেছে। ইহাতে অপরাপর শ্রেণীর অপেক্ষা শতকরা উনিশ ভাগ তুলা বেশী উৎপন্ন হইয়া থাকে। গত বর্ষে দুই হাজার একর জমিতে এই তুলার বীজ বপন করা হয়। বর্ত্তমান বর্ষে বিশ হাজার একর জমিতে ঐ তুলার আবাদ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পঞ্জাব অঞ্চলেও তুলার চাষ বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। নবখনিত পয়ঃপ্রণালী সন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বহুল পরিমাণে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তুলার চাষ হইবে বলিয়া অনুমান হইতেছে। মিঃ কর্ভেণ্ট্রি বলেন যে, কেবল উচ্চশ্রেণীর তুলার আবাদের প্রতি লক্ষ্য করিলে চলিবে না। কেননা উহাতে তেমন অর্থাগম হয় না। যে যে শ্রেণীর কার্পাস বৃক্ষ হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয় এবং যে সকল বৃক্ষ অধিক পরিমাণে শীতাতপসহিষ্ণু, সেই শ্রেণীর তুলার আবাদই প্রশস্ত। সূক্ষ্ম এবং দীর্ঘতন্তুবিশিষ্ট তুলার বৃক্ষগুলি অনাবৃষ্টি হইলে প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সুতরাং উহার আবাদ তাদৃশ লাভজনক নহে। কর্ভেণ্ট্রি মহোদয়ের মতে যে শ্রেণীর বৃক্ষ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইয়া থাকে, কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের তাহারই আবাদ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে এ দেশে যে শ্রেণীর তুলা জন্মিত, এক্ষণে আর তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা তুলার চাষ আবাদের সাফল্য বা বিফলতা নির্দ্ধারিত করা যায় না। উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের দ্বারা আবাদের সফলতা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে সূক্ষ্ম আঁশযুক্ত তুলার আবাদ কম হইলেও তুলার চাষ করিয়া এদেশীয় কৃষকবৃন্দ মোটের উপর লাভবান হইতেছে, কারণ উৎপন্ন তুলার পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। পুষা কৃষিক্ষেত্রে মিঃ হাওয়ার্ড ও হাওয়ার্ড-পত্নী উভয়ের তত্ত্বাবধানে গমের চাষ সম্বন্ধে সম্যক্ পরীক্ষা হইতেছে। এ পর্য্যন্ত তথায় গমের চাষ করিয়া অতি সন্তোষজনক ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে যে, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শস্যের চাষে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ কম হইয়া থাকে। কিন্তু গমের পক্ষে তাহা নহে। মিঃ ও মিসেস্ হাওয়ার্ডের পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে অপকৃষ্ট গম যে পরিমাণ উৎপন্ন হয়, উৎকৃষ্ট গম তদপেক্ষা কম হয় না। বিহার প্রদেশে ১৫০০ একর জমিতে মিঃ ও মিসেস্ হাওয়ার্ডের আবিষ্কৃত এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গম বপন করা হয়। তাহাতে অতি সন্তোষজনক ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহাতে আশা হইতেছে যে ১৯১২-১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ১০,০০০ হাজার হইতে ১৫,০০০ হাজার একর জমিতে ঐ শ্রেণীর গম আবাদ করা হইবে।

তৈল-শস্য

সরিসা, তিল প্রভৃতি তৈল-শস্য এ দেশে বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু এই সকল শস্যের উৎকর্ষ সাধনে কৃষি-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টা করেন নাই। ঢাকা অঞ্চলে গবর্ণমেণ্ট-কৃষিবিভাগের মিঃ হেক্টর রাই, তিল প্রভৃতি বীজ লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন, তদ্ব্যতীত আর কোথাও এ বিষয়ে বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বর্ষে প্রায় ২৪ কোটী মুদ্রা মূল্যের তৈল-শস্য বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

পল্লীবার্ত্তা

পরিশিষ্ট।

=১২·৩৭২ ; গত মাস সংখ্যা ৫ ; তা'র দশাংশ ·৫ ; যোগ ক'রে হলো ১২·৯ কলা ; ক্ষেপ ২৮১ অংশ ১৩ কলার সঙ্গে যোগ ক'রে হলো ২৮১ অংশ ২৫·৯ কলা নীচাংশাদি। দিনাদি রবিকেন্দ্র ১৭২·৩৩১ + ক্ষেপ ৫·৩৭ = ১৭৭·৭ তা'র চতুর্থাংশ ৪৪·৪, তদনুসারে—

৪৪ খণ্ডা = + ০।২৩·১
৪৫ ,, = + ০।১৫·৫
অন্তর = ৭·৬
·৪ গুণ করিয়া
০।৩·০৪ কলা মন্দ-ফল

রবি কেন্দ্রাংশাদি = ১৬৯।৫০·৯
রবি নীচাংশাদি = ২৮১।২৫·৯
,, মন্দ ফল = ০।৩·০
তিনের সমষ্টি ৪৫১।১৯·৮ রবিস্ফুট
— ৩৬০
৯১।১৯·৮

অতএব সায়ন রবিস্ফুট = ৩।১।১৯·৯ বা ২০ কলা। এ নিয়ম বুঝেছি, এখন আমাদের দেশীয় শাস্ত্রানুসারে নির্ণয় প্রণালী বলুন।

গুরুদেব। কোন গ্রন্থ অনুসারে?

আমি। শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারেই দেখিয়ে দিন, অপর সব এর পর দেখবো।

গুরুদেব। বেশ কথা আমাদের দেশে কিন্তু, ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে গণন প্রণালীর তারতম্য আছে। অষ্টাদশ জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তকারের সকলেরই মত ভিন্ন। দেশ ও কাল ভেদে এই সকল মতের কোনও না কোনটি গ্রাহ্য। কিন্তু স্মৃতির মধ্যে যেমন মনুর প্রধান্য ; জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তের মধ্যে তেমনি শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তই গ্রাহ্য। অতএব প্রধানতঃ শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত অবলম্বন ক'রে এবং আনুসঙ্গিক ভাবে অন্যান্য গ্রন্থের কথার অবতারণা ক'রে আমি আমাদের দেশের সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ বল্‌চি, বেশ মনোযোগ দিয়ে অভ্যাস করবার জন্য যত্ন কর। বর্ত্তমান কল্পের নাম শ্বেতবরাহকল্প। এই কল্পের সসন্ধি ছয় মন্বন্তর অতীত হ'য়ে বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তবিংশতি মহাযুগ অতীত হ'য়েছে, যথা—

"কল্পাদস্মাচ্চ মনবঃ ষড়্ ব্যতীতাঃ সসন্ধয়ঃ।
বৈবস্বতস্য চ মনোর্যুগানাং ত্রিঘনো গতঃ॥" ১।২২॥

আমি।—আপনি বল্লেন এই কল্পটির নাম শ্বেতবরাহকল্প। অন্যান্য কল্পের নাম বলুন।

গুরুদেব। অন্যান্য কল্পের সঙ্গে আমাদের জ্যোতিষের কোন সম্বন্ধ নাই। পুরাণাদিতে সেই সব কল্প ও মন্বন্তরের নাম আছে। প্রথমতঃ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের নাম বল্‌চি—(১) স্বায়ম্ভুব (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত, (৮) বৈবস্বত সাবর্ণি, (৯) দক্ষসাবর্ণি, (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি, (১১) ধর্ম্মসাবর্ণি, (১২) রুদ্রসাবর্ণি, (১৩) দেবসাবর্ণি, (১৪) ইন্দ্রসাবর্ণি।

"যুগানাং সপ্ততিঃ সৈকা মন্বন্তরমিহোচ্যতে।
কৃতাব্দসংখ্যা তস্যান্তে সন্ধিঃ প্রোক্তো জলপ্লবঃ ॥" ১।১৮ ॥

এক মনুর অধিকার কালের নাম মন্বন্তর। উহার পরিমাণ ৭১ যুগ বা ৩০৬৭২০০০০ বৎসর ; তৎপরে কৃতযুগ পরিমাণ বর্ষ অর্থাৎ ১৭২৮০০০ বৎসর সেই মন্বন্তর-সন্ধি।

"সসন্ধয়স্তে মনবঃ কল্পেজ্ঞেয়াশ্চতুর্দ্দশঃ।
কৃত প্রমাণঃ কল্পাদৌ সন্ধি পঞ্চদশঃ স্মৃতঃ ॥" ১।১৯ ॥

এই রূপ চৌদ্দ মন্বন্তর ও কল্পের আদিতে কৃত-প্রমাণ সন্ধি সুতরাং চৌদ্দ মন্বন্তর আর পনর সন্ধিতে এক কল্প। এখন দেখ ১৭২৮০০০ × ১৫ = $\frac{\text{মহাযুগ}}{১০}$ × ৪ × ১৫ = ৬ মহাযুগ। কেন না

"যুগস্য দশমো ভাগশ্চতুস্ত্রিদ্যেকসংগুণ।
ক্রমাৎ কৃতযুগাদীনাং——

আর ১৪ মন্বন্তর = ১৪ × ৭১ = ৯৯৪ মহাযুগ। সুতরাং কল্প = ১০০০ মহাযুগ।

ইত্থং যুগ সহস্রেণ ভূতসংহারকারকঃ।
কল্পো ব্রাহ্মমহঃ প্রোক্তং শর্ব্বরী তস্য তাবতী ॥

সুতরাং এক কল্প দিন, আর কল্প রাত্রি। এই দ্বিকল্পপরিমিত কালকে কোন কোন পুরাণে এক নামে অভিহিত করা হইয়াছে, কেহ কেহ বা প্রতিকল্পের স্বতন্ত্র নাম নির্দ্দেশ ক'রেছেন—সে সকল জান্‌বার আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই এবং আমি জানিও না। তবে ভারতকোষ নামক অভিধানে ঐ দ্বিকল্প পরিমিত কালকে ব্রহ্মার এক এক তিথি বোলে নির্দ্দেশ ক'রে, যে নাম দেওয়া হয়েছে তা বল্‌চি, যদি প্রয়োজন বোধ কর লিখে রাখ্‌তে পার। প্রথম শ্বেতবরাহ কল্প এটি ব্রহ্মার শুক্লাপ্রতিপদ, (২) নীললোহিত, দ্বিতীয়া; (৩) বামদেব তৃতীয়া, (৪) গাথান্তর চতুর্থী, (৫) রৌরব পঞ্চমী, (৬) প্রাণ ষষ্ঠী, (৭) বৃহৎ সপ্তমী, (৮) কন্দর্প অষ্টমী, (৯) সত্য নবমী, (১০) ঈশান দশমী, (১১) ধ্যান একাদশী, (১২) সারস্বত দ্বাদশী, (১৩) উদান ত্রয়োদশী, (১৪) গারুড় চতুর্দ্দশী, (১৫) কৌর্ম্ম পূর্ণিমা, (১৬) নারসিংহ কৃষ্ণাপ্রতিপদ, (১৭) সমাধি দ্বিতীয়া, (১৮) আগ্নেয় তৃতীয়া, (১৯) বিষ্ণুজ চতুর্থী, (২০) সৌর পঞ্চমী, (২১) সোম ষষ্ঠী, (২২) ভাবন সপ্তমী, (২৩) সুপুমালী অষ্টমী, (২৪) বৈকুণ্ঠ নবমী, (২৫) আর্চিষ দশমী, (২৬) বল্মী একাদশী, (২৭) বৈরাজ দ্বাদশী, (২৮) গৌরী ত্রয়োদশী, (২৯) মাহেশ্বর চতুর্দ্দশী, (৩০) পিতৃ অমাবস্যা। এই ত্রিশ দিনে বা তিথিতে ব্রহ্মার একমাস, এইরূপ বার মাসে এক বৎসর এবং শতবর্ষকাল ব্রহ্মার পরমায়ু। বর্ত্তমান সময়ে ব্রহ্মার পঞ্চাশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হ'য়ে একান্ন বৎসরের প্রথম দিনের বা কল্পের সসন্ধি ছয় মনু অতীত হ'য়েছে সপ্তম অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরের ২৭ মহাযুগ অতীত হ'য়ে অষ্টাবিংশ যুগের, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর শেষ হ'য়ে বর্ত্তমান সন ১৩১৯ সালে কলির ৫০১৩ বৎসর অতীত হ'য়েছে।

আমি। কেউ কেউ কিন্তু যুগাদির পরিমাণ প্রভৃতি অন্যরূপ বলেন।

গুরুদেব। তা জানি একদিন আমার নিকট গৈরিকধারী একজন সাধু * এসে বলেছিলেন যে শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তের "ত্রিংশৎকৃত্য যুগে ভানাং" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যাইবে যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির পর দ্বাপর আরম্ভ হ'য়েছে তার পর ত্রেতা তার পর সত্যযুগ হ'বে। তিনি ব'ল্লেন যে কলিযুগের পর একেবারে সত্যযুগ হওয়া সম্ভব নয়।

আমি। আপনি কি বল্লেন?

গুরুদেব। আমি অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ অসম্ভব ব'লে কিছুই বল্লাম না।

আমি। কোন প্রমাণ নাই?

গুরুদেব। প্রমাণ যে নাই এমন নয়। ভেবে দেখ প্রাতঃকালের পর ক্রমে সূর্য্য পূর্ব্বদিক হ'তে পশ্চিমদিকে অস্ত হ'বার পর রাত্রি হয়, রাত্রির পর আবার সূর্য্য পূর্ব্বদিকে এসে প্রভাতই হয় উষার পর আবার রাত্রি হ'য়ে সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশে সূর্য্যোদয় হয় না, আলোর পর অন্ধকার, অন্ধকারের পর আলো সুতরাং কলির পর সত্যাদির পুনরাবর্ত্তনই সম্ভব ও শাস্ত্রসিদ্ধ, আমাদের কোন গ্রন্থেই কলির পর দ্বাপরের পুনরাগমন কথা লেখা নাই।

আমি। আর তাঁ'রা যে বলেন ঐ দৈব পরিমাণটাই মানব পরিমাণ।

গুরুদেব। না বাবা, আমি তা বল্‌বো না। যে দেশের শাস্ত্র যা বলেন, সেই দেশের লোক তাই মানুক, আমার তা'তে আপত্তি নাই। আমাদের সকল শাস্ত্র অধ্যাত্মরহস্যযুক্ত হ'লেও, এ সকল বিষয়ে আপত্তি কর্‌বার কোনও হেতু দেখি না। মনে কর—

"গ্রহর্ক্ষদেবদৈত্যাদি সৃজতোঽস্য চরাচরম্।
কৃতাদ্রিবেদা দিব্যাব্দাঃ শতঘ্না বেধসো গতাঃ" ॥১।২৪॥

এই বাক্য দ্বারা বুঝতে পার্‌চি, যে ভগবানের বহু হ'বার ইচ্ছার পর, বিশ্বগঠন কার্য্য আরম্ভ হ'লো, তাঁ'র শক্তিগণ এত দিন প্রসুপ্ত ছিলেন এখন ক্ষুব্ধা হ'লেন—বিশ্বগঠন ক্রমে চল্‌তে লাগ্‌লো,—ক্রমে সুদীর্ঘকালে এই গ্রহর্ক্ষদেবদৈত্যাদি পরিপূরিত সৌরজগতের বিকাশ হ'লো। সে গঠন কার্য্য পূর্ণ হ'তে—এই বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হ'তে যে "কৃতাদ্রি-বেদাঃ দিব্যাব্দাঃ শতঘ্নাঃ" অর্থাৎ ৪৭৪০০ দিব্যবর্ষ অর্থাৎ মানুষ পরিমাণে ১৭০৬৪০০০ বর্ষ অতীত হ'য়েছিল এ কথা অবিশ্বাস করবার হেতু কিছুই নাই। এই পৃথিবীতে আমাদের বর্ত্তমান সময়ের জীব হ'তে স্বতন্ত্র ও বৃহদাকার জীব ছিল তা'র প্রমাণ আবিষ্কৃত হ'য়েছে। সে সব লুপ্ত হ'য়েছে—কেবল তা'দের চিহ্ন আছে, তা'র পূর্ব্বে যা ছিল—যা'র চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হ'য়েছে—সে সকল কথা পুরাণাদিতে উল্লিখিত দেখে কবিকল্পনা ব'লে অবিশ্বাস করবার

---

* শ্রদ্ধাস্পদ মদীয় জ্যোতিষাচার্য্য শ্রীমৎবিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয়ের নিকট ঐরূপ একজন আসিয়া ঐরূপ বিতর্ক করিয়াছিলেন। এবং দেখিতে পাই অনেক বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহার মতের পোষকতা করেন; কিন্তু এ সকল বিষয়ে শাস্ত্রের প্রকৃষ্ট অর্থই আমাদের শিরোধার্য। ইহা যে অসম্ভব এমন কোন প্রমাণ নাই।

হেতু কি? ও কথা থাক্ বাপ। যা'র বিশ্বাস কর্ত্তে প্রবৃত্তি না হয় না করুক—তা'তে ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই। ঐ সময়ের পর হ'তে শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে গ্রহের গতির গণনা আরম্ভ হ'য়েছে। যথা—

"কল্পাদস্মাচ্চ মনবঃ ষড়্ব্যতীতা সসন্ধয়ঃ।
বৈবস্বতস্য চ মনোর্যুগানাং ত্রিঘনো গতঃ ॥ ১। ১২ ॥
অষ্টাবিংশাদ্যুগাদস্মাদ্যাতমেতৎ কৃতং যুগং।
অতঃ কালং প্রসংখ্যায় সংখ্যামেকত্র পিণ্ডয়েৎ ॥ ১। ২৩ ॥

এই কল্পের আদি থেকে কাল সংখ্যা ক'র্‌তে হ'বে—

অর্থাৎ ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর = ৪৩২০০০০ × ৭১; সুতরাং ছয় মন্বন্তরে ৪২৬০ × ৪৩-২০০০০ বর্ষ। কৃতযুগের পরিমাণ ৪৩২০০০ × ৪ বর্ষ সুতরাং ছয় সন্ধি ও কল্পের আদি সন্ধি— ৭ × ৪ × ৪৩২০০০ বর্ষ। সপ্তম (বৈবস্বত) মন্বন্তরের ২৭ মহাযুগ = ২৭০ × ৪৩২০০০ বর্ষ। অষ্টাবিংশ মহাযুগের দ্বাপরান্ত পর্য্যন্ত = ৯ × ৪৩২০০০ বর্ষ এবং বর্ত্তমান (১৩১৯ সালে) কলিযুগের অতীত বর্ষ ৫০১৩, এই সমুদায় একত্রিত ক'ল্লে হ'বে—

ছয় মন্বন্তর	=	৪২৬০ × ৪৩২০০০ বর্ষ
+ সাত সন্ধি	=	২৮ × ৪৩২০০০ "
+ ২০ মহাযুগ	=	২৭০ × ৪৩২০০০ "
+ ২৮শের দ্বাপরান্ত পর্য্যন্ত	=	৯ × ৪৩২০০০ "
+ ১৩১৯ সন পর্য্যন্ত কলির	=	৫০১৩ "

= বর্ত্তমান সৃষ্টি হইতে অতীত (৪৫৬৭ × ৪৩২০০০) + ৫০১৩, = ১৯৭২৯৪৯০১৩ বর্ষ

এর মধ্যে সৃষ্টি হ'তে অতীত হ'য়েছে ১৭০৬৪০০০ বর্ষ বাকী ভূসৃষ্টির পর অতীত বর্ষ সমষ্টি হ'চ্চে ১৯৫৫৮৮৫০১৩ বর্ষ। এই সময় সূর্য্যাদি গ্রহ সব মেষের আদিতে অর্থাৎ অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম বিন্দুতে ছিল। ঐ স্থানে পুনরাগমনের নাম ভগণ। ভ = নক্ষত্র এবং গণ = সমষ্টি, অর্থাৎ সাতাইশ নক্ষত্র ভ্রমণকাল। ভগণের বার ভাগের এক ভাগের নাম রাশি, রাশির ত্রিশ ভাগের এক ভাগের নাম অংশ, (বা ভাগ) অংশের ষাইট ভাগের এক ভাগের নাম কলা, কলার ষাইট ভাগের এক ভাগের নাম বিকলা। যথা—

"বিকলানাং কলা ষষ্ট্যা তৎষষ্ট্যা ভাগ উচ্যতে ॥
তত্ত্রিংশতা ভবেদ্রাশির্ভগণো দ্বাদশৈব তে ॥" ১।২৮ ॥

এক মহাযুগে সূর্য্য, বুধ ও শুক্রের মধ্য এবং মঙ্গল শনি ও বৃহস্পতির শীঘ্রোচ্চ ৪৩২০০০০ ভগণ। এবং চন্দ্রের মধ্য ভগণ ৫৭৭৫৩৩৩৬ মঙ্গলের মধ্য ২২৯৬৮৩২, বৃহস্পতির মধ্য ৩৬৪২২০ ও শনির মধ্য ১৪৬৫৬৮ ভগণ আর বুধের শীঘ্র ১৭৯৩৭০৬০ শুক্রের শীঘ্র ৭০২২৩৭৬ ভগণ। যথা—

"যুগে সূর্য্যজ্ঞশুক্রাণাং খচতুষ্করদার্ণবাঃ।
কুজার্কিগুরুশীঘ্রাণাং ভগণাঃ পূর্ব্বযায়িনাম্ ॥২৯॥
ইন্দোরসাগ্নিত্রিত্রীষুসপ্তভূধরমার্গণাঃ।
দস্রত্র্যষ্টরসাঙ্কাক্ষিলোচনানি কুজস্যতু ॥৩০॥
বুধশীঘ্রস্য শূন্যর্ত্তুখাদ্রিত্র্যঙ্কনবেন্দবঃ।
বৃহস্পতেঃ খদস্রাক্ষিবেদষড়্‌বহ্নয়স্তথা ॥৩১॥
সিতশীঘ্রস্য ষট্‌সপ্তত্রিযমাশ্বিখভূধরাঃ।
শনের্ভুজঙ্গষট্‌পঞ্চরসবেদনিশাকরাঃ ॥"৩২ ॥

আমি। শ্লোকগুলি শুনতে বেশ; কিন্তু অঙ্ক নির্ণয় করা হয় কি ক'রে?

গুরুদেব। ছেলেবেলা একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ পড়েছিলে কি?

আমি। আজ্ঞা হাঁ!

গুরুদেব। তা'র অর্থ কি?

আমি। এক বই চন্দ্র নাই সুতরাং চন্দ্র বল্লে এক বুঝবো। পক্ষ বললে দুই বুঝবো।

গুরুদেব। জ্যোতিষাদি গণিত বিষয়ক গ্রন্থ শ্লোকনিবদ্ধ করবার সুবিধার জন্য প্রায়শঃ ঐ পন্থা অবলম্বিত হ'য়েছে। সচরাচর যে যে শব্দ দ্বারা যে যে অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট হয় তার একটা তালিকা এই—

১—ভূ (পৃথ্বীবাচক মাত্রই), ইন্দু (চন্দ্রবাচক মাত্রই), রূপ, স্বরূপ, ইলা,
২=যম, (যুগ্মবাচক মাত্রই), নেত্র (চক্ষুবাচক মাত্রই) পক্ষ, অশ্বি, দস্র, ভুজ (হস্তবাচক মাত্রই)
৩—অগ্নিবাচক শব্দসমূহ, গুণ, রাম, শিবনেত্র, শিখী,
৪—বেদ ও বেদবাচক শব্দ, অব্ধি ও সমুদ্রবাচক শব্দ, যুগ, ঋতু,
৫—বাণ ও তদ্বাচক শব্দ, মার্গণ, অক্ষ, বিষয়,
৬—ঋতু, তর্ক, রস, কাল, অঙ্গ।
৭=নগ (পর্ব্বত বাচক) মুনিবাচক, তুরঙ্গ (অশ্ববাচক)
৮—হস্তিবাচক, সর্পবাচক, বসু,
৯—নন্দ, গো, অঙ্ক, গ্রহ ও ছিদ্রবাচক শব্দ, খগ, (গ্রহবাচক)
০—খ ও অন্যান্য আকাশ বাচক শব্দ, অভ্র ও দিব্।

এই গুলি দ্বারা "অঙ্কস্য বামাগতি" এই নিয়মানুসারে সমস্ত অঙ্কই নির্দ্দিষ্ট হয়। যেমন পূর্ব্বে বলিচি "ইন্দো রসাগ্নিত্রিত্রীষুসপ্তভূধরমার্গণা" এখানে রস—৬ অগ্নি—৩ ত্রি—৩, ত্রি—৩, ইষু=৫, সপ্ত—৭, ভূধর—৭, মার্গণ—৫ সুতরাং বামগতিতে ৫৭৭৫৩৩৩৬ চন্দ্রের ভগণ হ'লো।

আমি। মার্গণ শব্দের অর্থ কি ?

গুরুদেব। এখানে বাণ।

আমি। এই সব নাম পা'ব কোথা ?

গুরুদেব। অভিধানে পা'বে। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি শব্দ দ্বার বৃহত্তর অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট হয় যেমন—দিকবাচক শব্দ সমূহ দ্বারা দশ, রুদ্রবাচক শব্দ দ্বারা একাদশ, আদিত্য (সূর্য্য) বাচক ও রাশিবাচক শব্দ দ্বারা দ্বাদশ, বিশ্বশব্দ দ্বারা ত্রয়োদশ, ইন্দ্রবাচক ও মনু শব্দ দ্বারা চতুর্দ্দশ, তিথি শব্দ দ্বারা পঞ্চদশ, ভূপ ও অষ্টি শব্দ দ্বারা ষোড়শ, ঘন ও অত্যষ্টি শব্দদ্বারা সপ্তদশ, নখশব্দ দ্বারা বিংশ, জিন ও সিদ্ধ শব্দের দ্বারা চতুর্বিংশ, তত্ত্ব শব্দের দ্বারা পঞ্চবিংশ, ঋক্ষ প্রভৃতি নক্ষত্রবাচক শব্দ দ্বারা সপ্তবিংশ, দিনবাচক শব্দদ্বারা ত্রিংশ, দন্তবাচক শব্দদ্বারা দ্বাত্রিংশ দেবতাবাচক শব্দদ্বারা ত্রয়স্ত্রিংশ, তান ও বায়ুবাচক শব্দ দ্বারা উনপঞ্চাশৎ বুঝায়, শ্লোকমধ্যে এই সকল শব্দ বা কোন ও বৃহত্তর অঙ্ক নাম দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হ'লে তা'কে তদবস্থাতেই রাখতে হ'বে, যেমন উপরে "খচতুষ্করদার্ণবা" দ্বারা খচতুষ্ক (০০০০) চারি শূন্য রদ (৩২) ও অর্ণব ৪, এখানে চারের পরে বত্রিশ রাখতে হ'বে সুতরাং ৪৩২০০০০ বুঝতে হ'বে। বুঝলে ত ?

আমি। আজ্ঞা, বুঝলাম; তবে প্রত্যেক শব্দের প্রতিশব্দগুলি পাবার কোন সহজ উপায় নাই কি ?

গুরুদেব। অমরকোষ প্রভৃতি শ্লোকনিবদ্ধ অভিধান হ'তে শব্দের প্রতিশব্দগুলি মুখস্থ করতে পা'র। এতদ্ব্যতীত, গ্রহগুলির প্রতিশব্দও কণ্ঠস্থ করলে ভাল হয়। হৃত, উদ্ধৃত, শেষিত, শিষ্ট ও আপ্ত শব্দ দ্বারা বিভাজিত; হত, আহত শব্দদ্বারা গুণিত; হীন ও বিবর শব্দে বিযুক্ত; আঢ্যাদি শব্দ দ্বারা যুক্ত এবং কৃত শব্দদ্বারা বর্গ বুঝতে হ'বে।"

আমি। কৃত শব্দে ত ৪ চা'র বল্লেন ?

গুরুদেব। স্থলবিশেষে বর্গ অর্থে ব্যবহৃতও হয়। বহু শব্দের নানা অর্থ আছে। প্রয়োগের স্থল দেখে অর্থ হয়।

আমি। হাঁ প্রায় সব ভাষাতেই বোধ হয় ও রকম আছে।

গুরুদেব। হাঁ! এখন দেখ সূর্য্যের মধ্যগতি পেলাম, এক মহাযুগে ৪৩২০০০০ ভগণ, সুতরাং এক বর্ষে এক ভগণ। ভগণ বল্লে কি বুঝবে ?

আমি। ৩৬০ অংশ, বা বার রাশি।

গুরুদেব। বেশ। এখন দেখ বার রাশিতে সূর্য্যের ভ্রমণজনিত বার মাস হয়েছে, যেমন—মেষে বৈশাখ, বৃষে জ্যৈষ্ঠ, মিথুনে আষাঢ় ইত্যাদি।

আমি। হাঁ তা জানি। কিন্তু ঐ সকল নামের কারণ কি ? নক্ষত্রগুলির নাম শুনে বোধ হয় অশ্বিনী থেকে আশ্বিন কৃত্তিকা থেকে কার্ত্তিক ইত্যাদি নাম হ'য়েছে, অথচ দেখ্‌চি সূর্য্য যখন অশ্বিনীতে প্রবেশ কর্চ্ছেন তখন বৈশাখ আরম্ভ হয়।

গুরুদেব। মাসগুলি চন্দ্রের গতি অনুসারে ঐরূপ নাম যুক্ত হ'য়েছে। নামগুলি চান্দ্র। মুখ্য চান্দ্র মাসের পূর্ণিমাগুলি যে নক্ষত্রে শেষ হতো তাহার দ্বারাই মাসের নাম হয়েছে।

যেমন, মুখ্য চান্দ্র বৈশাখী পূর্ণিমা, বিশাখায় ইত্যাদি। সকল সময়,—এখন আর ঐ ঐ নক্ষত্রে পূর্ণিমা নাও পেতে পার, কিন্তু নক্ষত্রটি সন্নিহিত থাক্‌বেই তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

আমি। আচ্ছা, কতকগুলা পুরাতন পাঁজী দেখ্‌লেই ওটা বোঝা যা'বে। তার পর স্ফুট নির্ণয়ের কথা বলুন।

গুরুদেব। হাঁ, বলচি। এখন বুঝলে এক এক রাশি ভোগ কর্‌তে সূর্য্যের এক এক মাস হয়। রাশিচক্র, আর বিষুবতের অবস্থান পরস্পর তির্য্যক্‌ ব'লে রাশি ভোগের কাল সমান হ'তে পারে না এ জন্য মাসের পরিমাণ স্বতন্ত্র, তা পূর্ব্বেই ব'লেছি (৪০পৃ)। কিন্তু প্রত্যেক মাসেই রবির ৩০ অংশ ভোগ হয় সুতরাং প্রাত্যহিক গতির মান যে সমান নয় তা বুঝতে পার্‌চো। এখন দেখ,—বর্ষ পরিমাণ দিয়ে ৩৬০ অংশকে ভাগ দিলে সূর্য্যের গড়পড়তা যে দৈনিক গতি পাওয়া যা'বে—তা'র নাম দৈনিক মধ্যগতি।

আমি। ভাগ দিয়ে দেখি, কত হয়।

গুরুদেব। কস্‌তে পার। কিন্তু বর্ষ পরিমাণ যে সকল গ্রন্থে সমান নয় এ কথাটা স্মরণ আছে ত?

আমি। হাঁ! তা স্মরণ আছে। আমি ৩৬৫.২৫৯ দিনে বছর ধ'রে কসি।

গুরুদেব। তা'তে কত ফল হ'বে জান না কি? এই ত একটু আগে ক'সে (৭৮পৃঃ), টেবিল করেছ।

আমি। শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত মতেও কি ওই হ'বে?

গুরুদেব শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে রবির মধ্যগতি ৫৯ কলা ৮ ১৭ অনুকলা। তবে কার্য্য-সৌকর্য্যার্থে যদি টেবিল ক'ত্তে চাও তা'হ'লে, শ্রীসূর্য্য-সিদ্ধান্তানুসারে বর্ষ নির্ণয় ক'রে নাও।

আমি। কি রূপে?

গুরুদেব। গ্রহগণের এক মহাযুগে, মধ্য ভগণাদি ব'লেছি, কেবল চন্দ্রোচ্চ আর পাতের বলি নাই, এই বার সে দু'টিও বলি—

"চন্দ্রোচ্চস্যাগ্নিশূন্যাশ্বিবসুসর্পার্ণবা যুগে।
বামং পাতস্য বস্বগ্নিযমাশ্বিশিখিদস্রকাঃ ॥ ১।৩৩ ॥

এখন বল দেখি চন্দ্রোচ্চ আর চন্দ্রপাতের অঙ্ক কত হ'লো?

আমি। অগ্নি = ৩, শূন্য = ০, অশ্বি = ২, বসু = ৮, সর্প = ৮, অর্ণব = ৪, সুতরাং চন্দ্রোচ্চ = ৪৮৮২০৩ এবং পাতের বসু = ৮, অগ্নি = ৩, যম = ২, অশ্বি = ২, শিখি = ৩, অগ্নি = ৩, দস্র = অশ্বি = ২ সুতরাং চন্দ্রপাতের গতি ২৩২২৩৮; "বামং" কি?

গুরুদেব। চন্দ্রপাতের গতি বক্র। এখন নক্ষত্র ভগণ শুন—

"ভানামষ্টাক্ষিবস্বদ্রিত্রিদ্বিদ্ব্যষ্টশরেন্দবঃ।
ভোদয়া ভগণৈঃ স্বৈঃ স্বৈরূনাঃ স্বস্বোদয়ো যুগে" ॥ ১।৩৪ ॥

একটি নক্ষত্র আজ যেখানে দেখ্‌চো কাল সেখানে আস্‌লেই এক ভগণ হ'লো, নিরক্ষদেশের এই ভগণকেই নাক্ষত্র ভগণ বলে। এক মহাযুগে, নাক্ষত্র ভগণ সংখ্যা অষ্ট = ৮

অক্ষি = ২, বসু = ৮, অদ্রি = ৮, ত্রি, দ্বি, দ্বি, অষ্ট, শর = ৫, ইন্দু = ১ অর্থাৎ। ১৫৮২২৩৭৮২৮; একে নাক্ষত্রদিনও বলা যায়। এই নক্ষত্র দিন থেকে প্রত্যেকের ভগণ বাদ দিলে উদয় সংখ্যা হ'বে। তবে সূর্য্যের এক মহাযুগে উদয় সংখ্যা কত হ'লো?

আমি। ১৫৮২২৩৭৮২৮—৪৩২০০০০ = ১৫৭৭৯১৭৮২৮ বার, তবেই ৪৩২০০০০ দিয়ে ভাগ দিলে এক বছরের উদয় সংখ্যা বা দিন পরিমাণ বাহির হ'বে।

ভাগ দিই—

```
৪৩২)১৫৭৭৯১৭৮২৮(৩৬৫·২৫৮৭৫৬৪৮১
     ১২৯৬
     ----
      ২৮১৯
      ২৫৯২
      ----
       ২২৭১
       ২১৬০
       ----
        ১১১৭
         ৮৬৪
        ----
         ২৫৩৮
         ২১৬০
         ----
          ৩৭৮২
          ৩৪৫৬
          ----
           ৩২৬৮
           ৩০২৪
           ----
            ২৪৪০
            ২১৬০
            ----
             ২৮০০
             ২৫৯২
             ----
              ২০৮০
              ১৭২৮
              ----
               ৩৫২০
               ৩৪৫৬
               ----
                 ৬৪০
                 ৪৩২
                 ---
                 ২০৮
```

এই অঙ্কটা যে আর একবার ক'সেছি।

গুরুদেব। অন্য রকমে। আমি তোমায় ১।১৫।৩১।৩১।২৪ দিনাদিকে দাশমিক করতে বলেছিলাম, সুতরাং বুঝলে শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে বর্ষ পরিমাণ ৩৬৫ দিন, ১৫দণ্ড, ৩১ পল ইত্যাদি; এবং অঙ্কটিকে সংক্ষিপ্ত করে ৩৬৫·২৫৯ ক'রে নিলে সূর্য্যের মধ্য গতি যা পূর্ব্বে নির্ণয় করেছ তাইই হ'লো কি বল?

আমি। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীগুরুদেব! দেখ, একটা কথা বলি। অনর্থক আমার খাতা দেখে শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত সম্মত সমস্ত টেবিল গুলা কাপী করার চেয়ে, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে তিন খণ্ড ফলিত জ্যোতিষ নামক গ্রন্থ বা'র ক'রেছেন তার প্রথম খণ্ডে এই সব টেবিল

পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং সনক্ষত্রাং পশ্চিমাং সদিবাকরাম্।
উপাসীত যথান্যায়ং নৈনাং জহ্যাদনাপদি ॥ ১৯ ॥
অসৎপ্রলাপমনৃতং বাক্‌পারুষ্যঞ্চ বর্জয়েৎ।
অসচ্ছাস্ত্রমসদ্বাদমসৎসেবাঞ্চ পুত্রক ॥ ২০ ॥
সায়ং প্রাতস্তথা হোমং কুর্ব্বীত নিয়তাত্মবান্।
নোদয়াস্তমনে বিম্বমুদীক্ষেত বিবস্বতঃ ॥ ২১ ॥
কেশপ্রসাধনাদর্শ-দর্শনং দন্তধাবনম্।
পূর্ব্বাহ্ণ এব কুর্ব্বীত দেবতানাঞ্চ তর্পণম্ ॥ ২২ ॥
গ্রামাবসথতীর্থানাং ক্ষেত্রাণাঞ্চৈব বর্ত্মনি।
বিণ্মূত্রং নানুতিষ্ঠেত ন কৃষ্টে ন চ গোব্রজে ॥ ২৩ ॥
নগ্নাং পরস্ত্রিয়ং নেক্ষেন্ন পশ্যেদাত্মনঃ শকৃৎ।
উদক্যা দর্শনং স্পর্শো বর্জ্জ্যং সম্ভাষণং তথা ॥ ২৪ ॥
নাপ্সু মূত্রং পুরীষং বা নিষ্ঠীবং বা সমাচরেৎ।
নাধিতিষ্ঠেচ্ছকৃন্মূত্র-কেশ-ভস্ম-কপালিকাঃ ॥ ২৫ ॥
তুষাঙ্গারাস্থিচূর্ণানি রজোবস্ত্রাদিকানি চ।
নাধিতিষ্ঠেত্তথা প্রাজ্ঞঃ পথি চৈব তথা ভুবি ॥ ২৬ ॥

অসৎ আলাপ আর প্রলাপ কথন,
অমৃত ভাষণ আর পরুষ বচন,
অসৎ-শাস্ত্রের চর্চ্চা অসদ্বাদ আর
অসতের সেবা—কর যত্নে পরিহার। ২০।
আত্মবান হ'য়ে সদা প্রাতে সন্ধ্যাকালে
নিত্য-হোম সাধিবে সংযত যথাকালে।
উদয় সময়ে কিম্বা অস্তের সময়
সূর্য্যবিম্বদরশন যুক্তিযুক্ত নয়। ২১।
কেশ প্রসাধন আর আদর্শ-দর্শন,
দন্তের ধাবন আর দেবের যজন,
তর্পণাদি কার্য্য যত পূর্ব্বাহ্ণের হয়,
কাল অতিক্রম করি' করা যোগ্য নয়। ২২।
গ্রাম্যবাস-পথে, তীর্থে, ক্ষেত্রমাঝে আর,
পথে, কৃষ্ট-স্থানে আর গোব্রজমাঝার,
এ সকল স্থানে মূত্র পুরীষ নিশ্চয়
ত্যাগ করা কভু নাহি যুক্তিযুক্ত হয়। ২৩।
নগ্না পরনারী নাহি করিবে দর্শন,
আপন পুরীষ না করিবে দরশন।
ঋতুমতী রমণীরে দর্শন, স্পর্শন,
অথবা তাঁহারে না করিবে সম্ভাষণ। ২৪।
জল-মাঝে বিষ্ঠামূত্র আর নিষ্ঠীবন
ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত নহে কদাচন।
মল-মূত্র কেশ-ভস্ম-কপাল সে আর
তুষ-অস্থি-রজঃ-বস্ত্র-মৃত্তিকা-অঙ্গার
এ সবার উপরে অথবা পথোপরে
কভু নাহি বসিবেন গৃহবাসী নরে। ২৫-২৬।

পিতৃ-দেব-মনুষ্যাণাং ভূতানাঞ্চ তথার্চ্চনম্।
কৃত্বা বিভবতঃ পশ্চাদ্‌গৃহস্থো ভোক্তুমর্হতি ॥ ২৭ ॥
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি স্বাচান্তো বাগ্‌যতঃ শুচিঃ।
ভুঞ্জীতান্নঞ্চ তচ্চিত্তো হ্যন্তর্জ্জানুঃ সদা নরঃ ॥ ২৮ ॥
উপঘাতাদৃতে দোষং নান্যস্যোদীরয়েদ্বুধঃ।
প্রত্যক্ষং লবণং বর্জ্জ্যমন্নমত্যুষ্ণমেব চ ॥ ২৯ ॥
ন গচ্ছন্ন চ তিষ্ঠন্ বৈ বিণ্মূত্রোৎসর্গমাত্মবান্।
কুর্ব্বীত নৈব চাচামন্ যৎ কিঞ্চিদপি ভক্ষয়েৎ ॥ ৩০ ॥
উচ্ছিষ্টো নালপেৎ কিঞ্চিৎ স্বাধ্যায়ঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
গাং ব্রাহ্মণং তথা চাগ্নিং স্বমূর্দ্ধানঞ্চ ন স্পৃশেৎ ॥ ৩১ ॥
ন চ পশ্যেদ্রবিং নেন্দুং ন নক্ষত্রাণি কামতঃ।
ভিন্নাসনং তথা শয্যাং ভাজনঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩২ ॥
গুরূণামাসনং দেয়মভ্যুত্থানাদিসৎকৃতম্।
অনুকূলং তথালাপমভিবাদনপূর্ব্বকম্।
তথানুগমনং কুর্য্যাৎ প্রতিকূলং ন সংলপেৎ ॥ ৩৩ ॥

পিতৃ-দেব-নরগণে আর ভূতগণে
যথাশক্তি পূজি' গৃহী বসিবে ভোজনে। ২৭।
পূর্ব্ব কিম্বা উত্তরেতে সম্মুখ করিয়া
আচমন করি' পরে বাগ্‌যত হইয়া,
শুচি অন্তর্জানু হ'য়ে, তদ্গত অন্তরে
ভোজন করিবে সদা গৃহবাসী নরে। ২৮।
উপঘাত বিনা দোষ না বলিবে কার,
প্রত্যক্ষ লবণ ত্যজ অত্যুষ্ণান্ন আর। ২৯।
গমন সময়ে কিম্বা দাঁড়ায়ে কোথায়,
মলমূত্র ত্যাগ করা কভু না জুয়ায়।
আহারের পরেতে করিয়া আচমন,
তিলমাত্র পুনঃ নাহি করিবে ভোজন। ৩০।
উচ্ছিষ্ট সময়ে না করিবে আলাপন,
উচ্ছিষ্ট না করিবেক বেদ অধ্যয়ন,
গো-ব্রাহ্মণ, অগ্নি আর আপনা'র শির
উচ্ছিষ্ট সময়ে স্পর্শ না করে সুধীর। ৩১।
উচ্ছিষ্ট শরীরে চন্দ্র সূর্য্য না দেখিবে
অথবা নক্ষত্রে দৃষ্টি দান না করিবে।
ভগ্নাসন, ভগ্নশয্যা, ভগ্ন পাত্র আর
সর্ব্বথা সবার ত্যাজ্য জেনো ইহা সার। ৩২।
অভ্যুত্থান করিবেক গুরু দরশনে,
আসন করিবে দান পরম যতনে।
স্বাগতাদি অন্য যেবা উচিত সৎকার,
যতনে করিবে যেবা যোগ্য হয় তা'র,
করিবে অভিবাদন বিনয় করিয়া
অনুকূলালাপ পরে করিবে বসিয়া।
করিবে অনুগমন গমন সময়,
প্রতিকূল বাক্য বলা কভু যোগ্য নয়। ৩৩।

নৈকবস্ত্রশ্চ ভুঞ্জীত ন কুর্য্যাদ্দেবতার্চ্চনম্ ।
ন গর্হয়েদ্দ্বিজান্ নাগ্নৌ মেহং কুর্ব্বীত বুদ্ধিমান ॥ ৩৪ ॥

ন স্নায়ীত নরো নগ্নো ন শয়ীত কদাচন ।
ন পাণিভ্যামুভাভ্যাঞ্চ কণ্ডুয়েত শিরস্তথা ॥ ৩৫ ॥

ন চাভীক্ষ্ণং শিরঃস্নানং কার্য্যং নিষ্কারণং নরৈঃ ।
শিরঃস্নাতশ্চ তৈলেন নাঙ্গং কিঞ্চিদপি স্পৃশেৎ ॥ ৩৬

অনধ্যায়েষু সর্ব্বেষু স্বাধ্যায়ঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ।
ব্রাহ্মণানল-গো-সূর্য্যান্ ন মেহেত কদাচন ॥ ৩৭ ॥

উদঙ্মুখো দিবা রাত্রাবুৎসর্গঃ দক্ষিণামুখঃ ।
আবাধাসু যথাকামং কুর্য্যান্মূত্র-পুরীষয়োঃ ॥ ৩৮ ॥

দুষ্কৃতং ন গুরোর্ব্রূয়াৎ ক্রুদ্ধঞ্চৈনং প্রসাদয়েৎ ।
পরিবাদং ন শৃণুয়াদন্যেষামপি কুর্ব্বতাম্ ॥ ৩৯ ॥

এক বস্ত্রে কভু নাহি করিবে ভোজন,
এক বস্ত্রে না করিবে দেবতা অর্চন ।
দ্বিজে কভু না বলিবে পরুষ বচন,
মূত্র না ত্যজিবে অনলেতে কদাচন । ৩৪ ।
স্নান না করিবে নগ্ন বুদ্ধিমান জন
নগ্ন হয়ে কভু নাহি করিবে শয়ন ।
দুই করে এককালে ভ্রমেও কখন
না করিবে আপন মস্তক কণ্ডুয়ন । ৩৫ ।
না দিবে মস্তকে জল বিনা কারণেতে,
শিরে জল দিয়া তৈল না দিবে অঙ্গেতে । ৩৬ ।
সর্ব্ব অনধ্যায়ে ত্যজ বেদের পঠন,
অনধ্যায় বর্জ্য সদা শাস্ত্রের লিখন ।
ব্রাহ্মণ, অনল, ধেনু, আর সূর্য্য পানে
অনুচিত মূত্র ত্যাগ শাস্ত্রের বিধানে । ৩৭ ।

দিবায় উত্তর মুখে, নিশাকালে আর
দক্ষিণ মুখেতে বিধি কহিলাম সার ।
আবরিত স্থানে সদা নিজ ইচ্ছা মতে
মল-মূত্র-ত্যাগ শ্রেয়ঃ লিখিত শাস্ত্রেতে । ৩৮ ।
গুরুর দুষ্কৃত কিছু করিলে শ্রবণ,
জীবন গেলেও না করিবে উচ্চারণ ।
ক্রুদ্ধ হ'লে গুরুজন, বিনয় বচনে
অচিরে করিবে শান্ত পরম যতনে ।
নিন্দা যদি তাঁহাদের হয় কোন খানে
সে স্থান করিবে ত্যাগ সদা সাবধানে ।
শুধু তাঁহাদের নয়,—অন্যের নিন্দন
কখনো কাহারো নয় উচিত শ্রবণ । ৩৯ ।

পন্থা দেয়ো ব্রাহ্মণানাং রাজ্ঞো দুঃখাতুরস্য চ।
বিদ্যাধিকস্য গুর্ব্বিণ্যা ভারার্ত্তস্য যবীয়সঃ ॥ ৪০ ॥
মূকান্ধবধিরাণাঞ্চ মত্তস্যোন্মত্তকস্য চ।
পুংশ্চল্যাঃ কৃতবৈরস্য বালস্য পতিতস্য চ ॥ ৪১ ॥
দেবালয়ং চৈত্যতরুং তথৈব চ চতুষ্পথম্।
বিদ্যাধিকং গুরুং দেবং বুধঃ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥ ৪২ ॥
উপানদ্বস্ত্রমাল্যাদি ধৃতমন্যৈর্ন ধারয়েৎ।
উপবীতমলঙ্কারং করকঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ।
প্রশস্তানি চ কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণা দীর্ঘজীবিনঃ ॥ ৪৩ ॥
চতুর্দ্দশ্যাং তথাষ্টম্যাং পঞ্চদশ্যাঞ্চ পর্ব্বসু।
তৈলাভ্যঙ্গং তথা ভোগং যোষিতশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৪ ॥
ন ক্ষিপ্তপাদজঙ্ঘশ্চ প্রাজ্ঞস্তিষ্ঠেৎ কদাচন।
ন চাপি বিক্ষিপেৎ পাদৌ পাদং পাদেন নাক্রমেৎ ॥ ৪৫ ॥

বিপ্র, রাজা কিম্বা কোন দুঃখাতুর জন,
বিদ্বান্, গুর্ব্বিনী আর ভারাতুরগণ,
যুবা, মূক, অন্ধ, আর বধির যে নর,
মত্ত, ক্ষিপ্ত, বারনারী, কৃত-বৈর-পর,
বালক, পতিত জনে করিলে দর্শন
পথ পার্শ্বে গিয়ে পথ করিবে অর্পণ। ৪০-৪১।
দেবালয়, চৈত্য-তরু, চতুষ্পথ আর,
বিদ্যাধিক জন আর গুরু সারাৎসার,
দেবতা দর্শন হলে গমন সময়,
বুদ্ধিমান প্রদক্ষিণ করেন নিশ্চয়। ৪২।
অপরের পাদুকা, বসন, মাল্য আর
অঙ্গেতে ধারণ নহে উচিত কাহার
অপরের উপবীত আর যে ভূষণ,
কমণ্ডলু কভু নাহি করিবে গ্রহণ।
যে হেতু শাস্ত্রের বাক্য এই ত নিশ্চয়;
প্রশস্ত কার্য্যের ফলে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। ৪৩।
চতুর্দ্দশী অষ্টমী সে পঞ্চদশী * আর,
পর্ব্বদিনে বর্জ্জনীয় কার্য্য বলি সার।
তৈলাভ্যঙ্গ দেহে আর রমণীরমণ
কভু নাহি করিবেন বুদ্ধিমান জন। ৪৪।
প্রাজ্ঞজন জঙ্ঘাপদ করিয়া বিস্তার
রহিবেন নাহি কভু শাস্ত্রবাক্য সার।
পাদের বিক্ষেপ না করিবে কদাচন
পদে না করিবে কারো পদ আক্রমণ। ৪৫।

* পঞ্চদশী=অমাবস্যা ও পূর্ণিমা।

মর্ম্মাভিঘাতমাক্রোশং পৈশুন্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ।
দম্ভাভিমানতীক্ষ্ণানি ন কুর্ব্বীত বিচক্ষণঃ ॥ ৪৬ ॥
মূর্খোন্মত্তব্যসনিনো বিরূপান্ মায়িনস্তথা ।
ন্যূনাঙ্গাংশ্চাধিকাংশ্চ নোপহাসৈর্বিদূষয়েৎ * ॥ ৪৭ ॥
পরস্য দণ্ডং নোদ্যচ্ছেচ্ছিক্ষার্থং পুত্র-শিষ্যয়োঃ ।
তদ্বন্নোপবিশেৎ প্রাজ্ঞঃ পাদেনাক্রম্য চাসনম্ ॥ ৪৮ ॥
সংযাবং কৃসরং মাংসং নাত্মার্থমুপসাধয়েৎ ।
সায়ং প্রাতশ্চ ভোক্তব্যং কৃত্বা চাতিথিপূজনম্ ॥ ৪৯ ॥
উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা বাগ্যতো দন্তধাবনম্ ।
কুর্ব্বীত সততং বৎস বর্জ্জয়েদ্বর্জ্জ্যবীরুধঃ ॥ ৫০ ॥
নোদক্শিরাঃ স্বপেজ্জাতু ন চ প্রত্যক্শিরা নরঃ ।
শিরস্যগস্ত্যমাস্থায় শয়ীতাথ পুরন্দরম্ ॥ ৫১ ॥

মর্ম্মাঘাত না করিবে, ত্যজিবে আক্রোশ
পৈশুন্য ত্যজিবে না খুঁজিবে কারো দোষ ।
ত্যজিবে যতনে সদা দম্ভ অভিমান ।
তীক্ষ্ণস্বরে ব্যথিত না কর কারো প্রাণ । ৪৬ ।
মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিপন্ন, বিরূপ জন আর
মায়াবী, হীনাঙ্গ কি অধিক অঙ্গ যা'র
হেন জনে উপহাস কভু না করিবে
কিম্বা তা'রে দোষ বলি' কভু না দুষিবে । ৪৭ ।
পরে দণ্ড না করিবে কিম্বা শিক্ষা তরে,
পুত্রে শিষ্যে না দণ্ডিবে কঠিন অন্তরে ।
পদতল আসনেতে করিয়া অর্পণ,
কভু নাহি বসিবেন বুদ্ধিমান জন । ৪৮ ।

নিজের ভোজন তরে করিয়া যতন,
সংযাব, কৃশরা, মাংস না কর রন্ধন ।
প্রাতে অপরাহ্ণে করি' অতিথি পূজন,
পরে যথা-উপযুক্ত করিবে ভোজন । ৪৯ ।
বসি সদা প্রাঙ্মুখে কি উদঙ্মুখ হ'য়ে
করিবে ধাবন দন্ত, সদা মৌন হ'য়ে ।
দন্ত ধাবনের কালে দন্তকাষ্ঠ তরে
কাষ্ঠ লবে, বর্জ্য যত বৃক্ষ ত্যাগ ক'রে । ৫০ ।
হইয়া উত্তর-শিরা না কর শয়ন
অথবা পশ্চিমে শির করিয়া স্থাপন ।
দক্ষিণে বা পূর্ব্বভাগে মস্তক রাখিয়া
শয়ন করিবে সদা সংযত হইয়া । ৫১ ।

* নো হসেন্ন চ দূষয়েদিতি ক্বচিৎ পাঠঃ

ন তু গন্ধবতীষপ্সু স্নায়ীত ন তথা নিশি।
উপরাগে পরং স্নানমৃতে দিন মুদাহৃতম্ ॥ ৫২ ॥
অপমৃজ্যান্ন চাস্নাতো গাত্রাণ্যম্বরপাণিভিঃ।
ন চাপি ধূনয়েৎ কেশান্ বাসসী ন চ ধুনয়েৎ।
নানুলেপনমাদদ্যাদস্নাতঃ কর্হিচিদ্বুধঃ * ॥ ৫৩ ॥
ন চাপি রক্তবাসাঃ স্যাচ্চিত্রাসিতধরোঽপি বা।
ন চ কুর্য্যাদ্বিপর্য্যাসং বাসসোর্নাপি ভূষণে।
বর্জ্জ্যঞ্চবিদশং বস্ত্রমত্যন্তোপহতঞ্চ যৎ ॥ ৫৪ ॥
কেশকীটাবপন্নঞ্চ ক্ষুণ্ণং শ্বভিরবেক্ষিতম্।
অবলীঢ়াবপন্নঞ্চ সারোদ্ধরণদূষিতম্ ॥ ৫৫ ॥
পৃষ্ঠমাংসং বৃথামাংসং বর্জ্জ্যমাংসঞ্চ পুত্রক।
ন ভক্ষয়ীত সততং প্রত্যক্ষলবণানি চ ॥ ৫৬ ॥
বর্জ্জ্যং চিরোষিতং পুত্র ভক্তং পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
পিষ্টশাকেক্ষুপয়সাং বিকারা নৃপনন্দন ॥ ৫৭ ॥

দুর্গন্ধ সলিলে কিম্বা রাত্রিকালে আর
কভু না করিবে স্নান শাস্ত্রাদেশ সার।
উপরাগে রাত্রিযোগে স্নানে দোষ নাই,
শাস্ত্র অনুসারে কার্য্য করিবে সদাই। ৫২।
স্নান করি', করে কিম্বা অঙ্গের বসনে,
দেহের মার্জ্জন ত্যাগ করিবে যতনে।
স্নান-অন্তে আর্দ্র কেশ আর্দ্র বস্ত্র আর
ধূনিত না কর এই শাস্ত্রবাক্য সার
স্নান না করিয়া কভু বিচক্ষণ জন,
গন্ধানুলেপন নাহি করিবে গ্রহণ। ৫৩।
রক্তবাস, চিত্রবাস, অসিত অম্বর
কদাপি না পরিবেন বুদ্ধিমান নর।
বস্ত্র উত্তরীয় আর অঙ্গ বিভূষণ
বিপরীত ভাবে নাহি করিবে ধারণ।
দশাহীন, জীর্ণ আর ছিন্ন বস্ত্রচয়
অঙ্গেতে ধারণ করা কভু যোগ্য নয়। ৫৪।
কেশ-কীট-যুক্ত আর ক্ষুণ্ণ অন্ন চয়
কুক্কুরের অবেক্ষিত স্পৃষ্ট যেবা হয়,
সারোদ্ধার দুষ্ট অন্ন, পৃষ্ঠমাংস আর
বৃথামাংস বর্জ্জ্যমাংস ত্যজ্য জেনো সার;
প্রত্যক্ষ-লবণ নাহি করিবে ভক্ষণ
শাস্ত্রের শাসন এই শুন বাছাধন। ৫৫-৫৬।
চিরোষিত অন্ন কিম্বা পর্য্যুষিত আর
ভোজনেতে ত্যজ্য ইহা জানিও সবার।
পিষ্টকাদি, শাক, ইক্ষুদণ্ড, দুগ্ধ আর,
কভু না ভুঞ্জিবে বৎস, এদের বিকার। ৫৭।

* স্নাতকঃ কচিদিতি বা পাঠঃ।

তথা মাংসবিকারাশ্চ তে চ বর্জ্জ্যাশ্চিরোষিতাঃ।
উদয়াস্তমনে ভানোঃ শয়নঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৮ ॥
নাস্নাতো নৈব সংবিষ্টো ন চৈবান্যমনা নরঃ।
ন চৈব শয়নে নোর্ব্ব্যামুপবিষ্টো ন শব্দবৎ ॥ ৫৯ ॥
ন চৈকবস্ত্রো ন বদন্ প্রেক্ষতামপ্রদায় চ।
ভুঞ্জীত পুরুষঃ স্নাতঃ সায়ং প্রাতর্যথাবিধি ॥ ৬০ ॥
পরদারা ন গন্তব্যাঃ পুরুষেণ বিপশ্চিতা।
ইষ্টাপূর্ত্তায়ুষাং হন্ত্রী পরদারগতির্নৃণাম্ ॥ ৬১ ॥
ন হীদৃশমনায়ুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।
যাদৃশং পুরুষস্যেহ পরদারাভিমর্ষণম্ ॥ ৬২ ॥
দেবার্চ্চনাগ্নিকার্য্যাণি তথা গুর্ব্বভিবাদনম্।
কুর্ব্বীত সম্যগাচম্য তদ্বদন্নভুজিক্রিয়াম্ ॥ ৬৩ ॥
অফেনাভিরগন্ধাভিরদ্ভিরচ্ছাভিরাদরাৎ।
আচামেৎ পুত্র পুণ্যাভিঃ প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা ॥ ৬৪ ॥

মাংসের বিকার যত করিবে বর্জন,
চিরোষিত মাংস নাহি করিবে ভক্ষণ।
তপন-উদয় আর অস্তের সময়
শয়ন, সবার পক্ষে সদা ত্যজ্য হয়। ৫৮।
স্নান অন্তে কদাপি না করিবে শয়ন,
উপবিষ্ট হ'য়ে নিদ্রা না যা'বে কখন।
শয্যার উপর সুখে করিয়া শয়ন
চিন্তা নাহি করিবেক হয়ে অন্য মন।
সশব্দে শয্যায় কভু না কর শয়ন
ভূমে, শয্যাতলে, নাহি বসিবে কখন। ৫৯
এক বস্ত্রে কভু নাহি ভোজন করিবে,
ভোজনের কালে কভু কথা না কহিবে।
সম্মুখে দেখি'ছে যা'রা তা'দের না দিয়া,
ভোজন না করিবেক—স্নান না করিয়া।
প্রাতে আর অপরাহ্নে করিবেক স্নান
তার পরে আহার করিবে মতিমান। ৬০।
কভু নাহি পর নারী করিবে গমন
বিশেষি এ কথা জানে বিপশ্চিত জন।
পরদারাগমনে আয়ুর হয় ক্ষয়,
নষ্ট হয় ইষ্টাপূর্ত্ত পুণ্য সমুদয়। ৬১।
পরদারাভিমর্ষণ নরের যেমন
আয়ুক্ষয়কর আর না দেখি এমন। ৬২।
দেবার্চন, অগ্নিকার্য্য, গুর্ব্বভিবাদন
সর্ব্বথা উচিত সদা শুন বাছাধন।
সম্যকাচমন করি করিবে আহার
অন্ন-গ্রহণের বিধি এই জেনো সার। ৬৩।
অফেন নির্ম্মল আর গন্ধহীন জল
গ্রহণ করিয়া, পরে হ'য়ে অচঞ্চল
পূর্ব্ব কি উত্তর মুখে সেই পুণ্য জলে
করিবেক আচমন বসি' শুদ্ধ স্থলে। ৬৪।

অন্তর্জ্জলাদাবসথাদ্বল্মীকান্মুষিকস্থলাৎ।
কৃতশৌচাবশিষ্টাচ্চ বর্জ্জয়েৎ পঞ্চ বৈ মৃদঃ॥ ৬৫॥
প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ সমভ্যুক্ষ্য সমাহিতঃ।
অন্তর্জ্জানুস্তথাচামেৎ ত্রিশ্চতুর্ব্বা পিবেদপঃ॥ ৬৬॥
পরিমৃজ্য দ্বিরাস্যান্তং খানি মূর্দ্ধানমেব চ।
সম্যগাচম্য তোয়েন ক্রিয়াং কুর্ব্বীত বৈ শুচিঃ॥ ৬৭॥
দেবতানামৃষীণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চৈব যত্নতঃ।
সমাহিতমনা ভূত্বা কুর্ব্বীত সততং নরঃ॥ ৬৮॥
ক্ষুত্বা নিষ্ঠীব্য বাসশ্চ পরিধায়াচমেদ্‌বুধঃ।
ক্ষুতেঽবলীঢ়ে বান্তে চ তথা নিষ্ঠীবনাদিষু॥ ৬৯॥
কুর্য্যাদাচমনং স্পর্শং গোপৃষ্ঠস্যার্কদর্শনম্।
কুর্ব্বীতালম্বনঞ্চাপি দক্ষিণশ্রবণস্য বৈ॥ ৭০॥
যথাবিভবতো হ্যেতৎ পূর্ব্বাভাবে ততঃ পরম্।
অবিদ্যমানে পূর্ব্বোক্তে উত্তর প্রাপ্তিরিষ্যতে॥ ৭১॥

জল-মধ্য হ'তে, বাস-গৃহ হ'তে আর,
বল্মীকের স্তূপ হ'তে করিয়া উদ্ধার,
মূষিকের বিবর হইতে কিম্বা আর,
শৌচ-অবশেষ যেবা থাকে মৃত্তিকার,
এই পঞ্চবিধ বর্জ্য মৃত্তিকা নিশ্চয়
কদাচিৎ কোন কার্য্যে কভু গ্রাহ্য নয়। ৬৫।
মুখ আর পদদ্বয় করি প্রক্ষালন
সম্যক প্রকারে করিবেক অভ্যুক্ষণ।
পরে অন্তর্জানু হ'য়ে তিন বার আর
করিবেক আচমন কিম্বা চারি বার। ৬৬।
মুখপ্রান্ত দুই বার করিয়া মার্জন
মুখের বিবরে বারি করিবে অর্পণ।
মস্তক ইন্দ্রিয়দ্বার মার্জন করিয়া,
সম্যক প্রকারে পরে আচান্ত হইয়া,
পবিত্র ভাবেতে সুখে করিয়া আসন
ক্রিয়া অনুষ্ঠানে রত হ'বে নরগণ। ৬৭।
দেব-কর্ম্ম, ঋষিকর্ম্ম, পিতৃকর্ম্ম আর,
সমাহিত মনে করা উচিত সবার। ৬৮।
বস্ত্র ত্যাগ করি, আর ক্ষুৎনিষ্ঠীবন
ত্যাগ করি, করিবেক পুনঃ আচমন। ৬৯।
ক্ষুৎ, অবলেহন, বমন, নিষ্ঠীবন,
ত্যাগ অন্তে করিবেক পুনরাচমন।
গোপৃষ্ঠ*স্পর্শন আর অর্ক দরশন
আপন দক্ষিণ কর্ণ করিবে স্পর্শন। ৭০।
এ সবার মাঝে পূর্ব্বাভাবে পর হয়।
সর্ব্ব কার্য্যে এই বিধি জানিবে নিশ্চয়। ৭১।

*গো=পৃথিবী+পৃষ্ঠ; অর্থাৎ ভূতল স্পর্শ করিবে

"ভারতবাসী 'জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়' বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না—পরজাতি-বিদ্বেষ এবং পরজাতি-পীড়ন তাঁহার স্বজাতি-বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অপর একটি মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন—
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

ভূদেব

৪র্থ খণ্ড ৪র্থ বর্ষ	ভাদ্র, ১৩২০	১১শ সংখ্যা

আলোচনা

ভারতের আদর্শ

আদর্শই জীবনের গতি-নির্দ্ধারক। কাহারও আদর্শ ধর্ম্ম, কাহারও বা রাষ্ট্র। এই দুই আদর্শেই মানব-সমাজ পরিচালিত। একটি সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্যের, মায়া-মোহের, অনিত্যতার উপলব্ধি করিয়া এক সত্য সনাতন পরম পুরুষের সত্তায় আপনাকে বিলীন করিতে, এবং অপরটি পার্থিব শক্তি দ্বারা সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্য ও নানা প্রকার অভাব মোচন করিতে যত্নশীল। একটি সংসারের সকলকে আপন বলিয়া বিশ্বকে আপন করিয়া লইতে সদাই ব্যস্ত—নিজ সত্তা বিশ্বের হিতে নিমজ্জনেই ইহার সমাপ্তি—অন্যটির নিজত্বকে জগতের সম্মুখে বিশিষ্টভাবে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত রাখাই উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমানযুগে এখন এই দুই আদর্শেরই বিরোধ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অনতিভবিষ্যতে সংঘর্ষের হেতু। ইহাই উদারকে অনুদার, বিস্তীর্ণকে সঙ্কীর্ণ, সরলকে বক্র, অহিংসুককে হিংসাপরতন্ত্র করিয়া তুলিতেছে—ইহাই ভেদ-

জ্ঞানের সৃষ্টি করিতেছে। ফলে এখন ধর্ম্মকে অধর্ম্মের নিকট হীনপ্রভ হইতে হইতেছে—নৈতিক বল যেন পাশবিক বলের আশ্রয়ীভূত—পাশবিক বলের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া যেন আপনার স্নিগ্ধ মধুর সৌম্যমূর্ত্তি প্রকাশে অক্ষম। তাই যেন প্রাচ্য প্রতীচ্যের পাশবিক শক্তির শিষ্যত্ব গ্রহণে উৎসুক। জগতের গতি যেন সংহারের ও ধ্বংসের দিকে ছুটিয়াছে। ইহাই যেন বর্ত্তমান যুগের উপাস্য দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কালীর করাল মূর্ত্তির বিকট বিকাশে যেন দিক বিকাশিত, মহাকালের রুদ্রমূর্ত্তিই যেন জগতের অভীপ্সিত, চণ্ড মুণ্ড বধই যেন বাঞ্ছনীয় হইয়াছে। এখন যেন শব-আরাধনাই সকলের একমাত্র মূলমন্ত্র হইয়াছে। তাহা না হইলে যে জাপান আজ কত শতাব্দী ধরিয়া "অহিংসা পরম ধর্ম্ম"—এই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া আসিয়াছে, যে চীন কনফিউসিয়াসের সেবা ব্রতে দীক্ষিত হইয়া আপনাকে পরিচিত করিয়াছে, জগতের নিকট তাহাদের সম্মান ছিল না, স্থান ছিল না। আর যে মুহূর্ত্তে শত শত প্রাণ উৎসর্গীকৃত হইল, নির্ম্মম কঠোর হস্তে দয়া-দাক্ষিণ্য, মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসার তন্ত্রীগুলি ছিন্ন হইল, যে মুহূর্ত্তে সংহারে সিদ্ধহস্ত হইল, তখনই তাহার যশ-গানে দিক্ মুখরিত হইতে চলিল, জাপান তখন মনুষ্যপদবাচ্য হইল। জাপান তখন প্রাচ্যের প্রতিষ্ঠা স্থাপনে অগ্রণী বলিয়া বহু সম্মানে সম্মানিত।

ভারত, তোমার নিকট এখন মহা সমস্যা উপস্থিত। তুমি এখন পার্থিব অপমান, ঘৃণা, লজ্জা প্রভৃতির দৃষ্টান্তস্থল। এক দিকে তোমার দুঃখ ও ক্ষোভ, অন্য দিকে তোমার দ্বারে তোমার নিজস্ব বিনাশের উত্তেজনা। তুমি যত ও যে পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন জাতি হইতে ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াছ, তত বিষয়ে অন্য কেহ করে নাই—তবুও তুমি জগতের নিকট এখনও পূজ্য, এখনও গুরু। তোমার যতই হীন, দীন, জীর্ণ, শীর্ণ, কঙ্কালবিশিষ্ট মূর্ত্তি হউক না কেন, তুমি এখনও জগতের অন্তরঙ্গ প্রদেশের রাজা—তুমিই সম্রাট্। তোমার এই রাজত্বের সম্মান অতি উচ্চে—অতি মূল্যবান। এই অশান্তির, বিবাদ-বিসম্বাদের, দ্বেষ-হিংসার, পরশ্রীকাতরতার যখন শেষ হইবে তুমিই তখন তোমার সেই চিরশান্তিময়ী মূর্ত্তি জগতের নিকট উপহার দিবে। ইহাই তোমার অস্তিত্বের আবশ্যকতা। ইহাই তোমার সনাতন ধর্ম্মের বিজয় গৌরব। ইহাই পাশবিক বলের নৈতিক বলের নিকট পরাজয়। তুমি এই জন্যই জীবিত আছ—এই জন্যই জীবিত থাকিবে—তোমার দুঃখ কি? তুমি কোন্ যুগে কোন্ সময়ে না স্বাধীন? তুমি যে সর্ব্বপ্রকার মতদ্বৈধের সমন্বয়-কর্ত্তা—তোমার এখানে সবাই আশ্রয় পাইয়াছে ও পাইবে—ইহাই তোমার সনাতন ধর্ম্মের বিশ্বজনীন প্রেমের পরাকাষ্ঠা। তুমি চিরদিন সহ্য করিয়াছ—এখনও করিতেছ—ভবিষ্যতে করিবে—তুমি ক্ষমা-গুণে পাশবিক বলকে পরাজয় করিবে—শুম্ভনিশুম্ভ-বধ-কর্ত্রী, অসুর-বিনাশিনী, খর্পরধারিণী, শবমুণ্ডমালিনী, দিগম্বরা, উন্মাদিনী মহাকালারূঢ়া মহাকালীর ভীমা-রূপই কি মায়ের একটি মাত্র মূর্ত্তি? তিনি যে দশমহাবিদ্যারূপে দশ মূর্ত্তিতে

বিরাজিতা। মায়ের ছিন্নমস্তা মূর্ত্তিই কি ভারতের চিরন্তন উপাস্য হইবে, না তাহার নিকট স্বার্থ বলি যে সনাতন ধর্ম্ম।

ভারতে চিরদিনই ত্যাগের উদাহরণ। ভারত কখনও ভোগের জন্য লালায়িত হয় নাই, এইজন্য এখানে বাহ্যতঃ প্রভেদ থাকিলেও সকলেই একমাত্র মুক্তিকেই আশ্রয় করিয়া কর্ম্মকেন্দ্র বিস্তৃত করিয়াছেন—তাই হিন্দু-মুসলমানে, হিন্দু-খৃষ্টানে ভিন্ন দেশের ন্যায় বৈরিভাব নাই। ইহা দুর্ব্বলতার চিহ্ন নহে—সবলতারই চিহ্ন। শক্তিমান না হইলে বিভিন্ন শক্তিকে নিজের করিয়া লওয়া কাহার সাধ্য?

এতদিন যে শক্তি ভিন্ন আদর্শে পরিচালিত হইয়াছে, এখন আবার দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় অভাব ও অভিযোগের তাড়নায় তাহাই হয় ত অন্য আদর্শে পরিচালিত হইবে—জগৎ তখনও দেখিবে যে ভারত ভোগের জন্য কোন কাজ করিবে না—জগতকে শান্তি দিবার জন্য—যুগ-ধর্ম্মের সৃষ্টির জন্য—নিজের প্রসার বৃদ্ধির জন্য—জগতের হিতের কারণ নিজের সর্ব্বস্ব বলি দিবে। এ শিক্ষাই হিন্দুর শিক্ষা, এ দীক্ষা হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মের দীক্ষা, অপর কিছুই ভারতে আশ্রয় পাইবে না।

ইহাতে কোন স্বার্থসিদ্ধি হইবে না—কোন বিশেষ লাভের আশা নাই, তবে শক্তির স্ফূর্ত্তি হইবে মাত্র—আজ যে অখ্যাতি দুর্নাম দেশে বিদেশে দৃঢ়বদ্ধমূল হইতে চলিয়াছে—তাহারই সমূলউৎপাটন হইবে। আজ যে জাগরণে দিক মুখরিত, তাহাতে যে ভারতও চলিতে পারে—ভারত যে পঙ্গু নয়—ভারত যে হীনবীর্য্য নয়—শৌর্য্যে বীর্য্যে বুদ্ধি-কৌশলে জগতের কোন জাতি অপেক্ষা ন্যূন নহে ইহাই প্রমাণ হইবে মাত্র—ভারত যে অনুবিধায় কি বিচ্ছিন্ন হইয়াও—কি বিভেদ সত্ত্বেও কি অসম্ভব সম্ভব করিতে পারে তাহারই দৃষ্টান্তস্থল হইবে মাত্র—ভারতের অন্য কোন লাভ নাই—কারণ চিরদিনই ভারত পার্থিব লাভালাভের বহু ঊর্দ্ধে।

* *
*

বাঙ্গালার সমাজেতিহাসের উপকরণ

বাঙ্গালী জাতি চিরকাল একটানা একভাবে গড়িয়া উঠে নাই। বাঙ্গালীর সমাজ, সভ্যতা, সাহিত্য, ধর্ম্মভাব সকলই নানা জাতির চিহ্ন, নানা প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের শক্তিপুঞ্জ সমাজ-গঠনে সহায়তা করিয়াছে। এসিয়ার বিভিন্ন দেশবাসীর চিন্তা এবং কর্ম্মও বঙ্গদেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাঙ্গালীর সাহিত্য, ধর্ম্ম, কলা, শিল্প এবং বিদ্যাও বাঙ্গালার বাহিরে বিস্তৃত হইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সমাজ গঠনে উপকরণ যোগাইয়াছে, এবং বঙ্গের সভ্যতা নেপাল, তিব্বত, চীন, ব্রহ্ম, যবদ্বীপ, জাপান প্রভৃতি দেশের উপর নিজ বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-নাথ বসু, শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত প্রভৃতি

মনীষিগণ তাঁহাদের ভাষাবিষয়ক, সমাজ-বিষয়ক, ধর্ম্মবিষয়ক, পুঁথিবিষয়ক প্রবন্ধ-গ্রন্থাদির দ্বারা আমাদিগকে এইরূপ ইঙ্গিত দিয়া আসিতেছেন।

আমরা এই কথা মনে রাখি না। এজন্য বাঙ্গালার আধুনিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি, কায়দাকানুনগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। তাহার কারণ আছে। আজকালকার বাঙ্গালাদেশের চতুঃসীমা দেখিয়া সাধারণতঃ আমরা অতীত বঙ্গের রাষ্ট্রীয় সীমাগুলির ধারণা করিতে পারি না। বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় সীমা অতীত কালে অসংখ্যবার অসংখ্য উপায়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বঙ্গে রাষ্ট্রীয় জগতের কেন্দ্রস্থল নানা জনপদে স্থানান্তরিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে বহু রাজধানী একই যুগে নানা স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, এবং যুগে যুগে স্ব-স্বপ্রধান রাষ্ট্রশক্তি অভ্যুদয় লাভ করিয়াছে। তাহার ফলে আজ যেখানে সমাজের, ধর্ম্মের, বিদ্যা ও শিল্পের উৎস, কাল সেখানে তাহার ধ্বংসাবশেষ মাত্র বিদ্যমান। সভ্যতা-গঙ্গা কোন্ এক অজানা পথের ভিতর দিয়া সম্পূর্ণ নূতন নূতন স্থানকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিতে চলিয়াছে।

আধুনিক বাঙ্গালী জাতিকে বুঝিতে হইলে, আধুনিক হিন্দুসমাজের বিচিত্র বিধি-নিষেধের প্রকৃত তথ্য জানিতে হইলে বাঙ্গালার অতীত যুগের রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিতে হইবে। আধুনিক বাঙ্গালায় ভৌগোলিক সীমা মাত্রে অনুসন্ধান আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। বঙ্গ, বাঙ্গালা, বঙ্গপ্রদেশ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ-গুলির মোহ ছাড়িতে হইবে। তাহার পরিবর্ত্তে নূতন নূতন নামে নূতন নূতন জনপদে বাঙ্গালীর শক্তি, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর সভ্যতার পরিচয় পাইতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। কেবলমাত্র মামুলি যুগবিভাগ অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে চলিবে না। বৈদিক যুগ, হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ ইত্যাদি শব্দের অধীনতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহার পরিবর্ত্তে বিচিত্র জাতি-সংঘর্ষ, বিচিত্র শক্তি-সমন্বয়, বিচিত্র রক্ত-সংমিশ্রণ, বিচিত্র কর্ম্মপ্রবর্ত্তনের বিবরণ বাহির করিতে হইবে।

কিন্তু এতদিন বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের দিকে আমাদের বেশী লোকের দৃষ্টি পড়ে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাসের আলোচনায় সাহিত্যসেবিগণ বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না। আজকাল বঙ্গে জাতীয় জাগরণের যে সকল শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্যে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে অর্থব্যয়, সময়ব্যয়, কষ্টস্বীকার, স্বার্থত্যাগ ও আন্তরিকতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য এক্ষণে নানা পরিষৎ ও সমিতির সাহায্যে শতগুণ প্রসার লাভ করিয়াছে বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। কলিকাতায় বঙ্গদেশস্থ জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ, রঙ্গপুরের সাহিত্য-পরিষৎ, মালদহের জাতীয়শিক্ষা-সমিতি, রাজশাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি, বীরভূমের সাহিত্য-পরিষৎ, ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ, শ্রীহট্ট সাহিত্য-সমিতি, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন, উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন, পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন, সুরমা সাহিত্য-সম্মিলন

ইত্যাদি নানা কর্ম্মকেন্দ্রে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অনুসন্ধান-কার্য্য চলিতেছে। যাঁহারা বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের আলোচনায় বিশেষ ভাবে মনসংযোগ করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রভৃতি লেখকগণ আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফলসমূহ এখনও স্থিরসিদ্ধান্ত-রূপে গ্রহণীয় হয় নাই। তাঁহাদের সকলের মধ্যে অনেক বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। ইঁহাদের সকলেই যে সকল স্থলে অকাট্য যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছেন তাহা নহে। ব্যক্তিগত প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা, পরস্পর তাচ্ছীল্যভাব, অহম্মন্যতা, ইত্যাদি সাহিত্যসেবিসুলভ দুর্ব্বলতা ন্যূনাধিক পরিমাণে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে, এ কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। কিন্তু আমরা দেশের দিক্ হইতে, দেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের দিক্ হইতে, সমাজের প্রাচীন তথ্যাবিষ্কারের দিক্ হইতে অনেক বিষয়ে লাভবান্ হইয়াছি। ইঁহাদের গবেষণায় আমরা নূতন কথা ভাবিতে অভ্যস্ত হইতেছি, অশ্রুতপূর্ব্ব, অবিশ্বাস্য ঘটনার সংবাদ পাইতেছি, অলীককাহিনী-স্বরূপ নানা কথা শুনিতেছি। মোটের উপর, একটা অনুসন্ধিৎসা, বিবিদীষা, ঐতিহাসিক সাহিত্যে কৌতূহল, যাহা আছে তাহাতেই না থাকা ইত্যাদি উন্নতির নানা কারণ আমাদের সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

বাঙ্গালীর যে একটা রাষ্ট্রীয় ইতিহাস আছে, অন্ততঃ এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। বাঙ্গালার অতীত যুগে নানাস্থানে রাষ্ট্রীয় শক্তির বিকাশলাভ হইয়াছে, তাহা সন্দেহ করিবার আর কারণ নাই। গত কয়েক বৎসরের সাময়িক পত্রিকাগুলির পাতা উল্টাইলেই এই বিশ্বাস জন্মিবে। তাম্রশাসন, পুঁথিপাঠ, মুদ্রাতত্ত্ব, মূর্ত্তির বিবরণ, রাঢ়-অনুসন্ধান, কামরূপ-অনুসন্ধান, গৌড়ভ্রমণ, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান, ইত্যাদি বিবিধ আলোচনার ফলে বাঙ্গালার জেলাগুলির অতীত রাষ্ট্রীয় মূল্য নির্দ্ধারিত হইতেছে। বাঙ্গালীর রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের কয়েক অধ্যায় কথঞ্চিৎ উন্মুক্ত হইতে থাকিলেই আমাদের সমাজের কাজ-কর্ম্ম, সৌজন্য-শিষ্টাচার, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সকলই আয়ত্ত হইবে। জেলায় জেলায়, প্রদেশে প্রদেশে, দেশে বিদেশে কখন আমাদের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা বুঝিবার পূর্ব্বে আমরা আমাদের ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প সম্যক্-রূপে বুঝিতে পারিব না।

* * *

প্রাচীন বাঙ্গালায় বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র

শ্রাবণ মাসের 'সাহিত্যে' তিনটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনটিই বাঙ্গালাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমা-পরিবর্ত্তনবিষয়ক। প্রথম প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রাঢ়, মেদিনীপুর, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের পরস্পর সম্বন্ধ কোন্ যুগে কিরূপ ছিল তাহার বিবরণ

সংগ্রহ করিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম, এ খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, বিক্রমপুর প্রভৃতি জনপদের প্রাচীন ইতিহাসের এক অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়াছেন। তৃতীয় প্রবন্ধে 'গৌড়রাজমালা'-লেখক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ও গোয়ালপাড়া জেলার অধিবাসিগণের স্বাধীনতার যুগের একটা চিত্র দিয়াছেন। এই প্রবন্ধত্রয়ে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্নকালের কয়েকটা রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।

অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিবৃত হইয়াছে:—

(১) অশোকের পিতৃপিতামহের শাসন সময়ে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ এক রাষ্ট্রভুক্ত ছিল। মেগাস্থিনিস ও প্লিনির বর্ণনানুসারে গঙ্গাসাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত কলিঙ্গ নামে এবং 'গঙ্গারিডি-কলিঙ্গি' একটি যুক্তরাজ্যরূপে পরিচিত ছিল। (২) অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ে অঙ্গ-বঙ্গ-বিজয়ও অনুমিত হয়। কারণ "কতকগুলি কারণে মনে হয়, তৎকালে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ হয় ত একটি যুক্তরাজ্যরূপে পরিচিত ছিল।" (৩) খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহামেঘবাহন খারবেল কলিঙ্গ হইতে দিগ্বিজয় আরম্ভ করেন। তাহার ফলে 'রাষ্ট্রীকগণ' অনুগত হইয়া তাঁহার মগধ আক্রমণে সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা অঙ্গ-বঙ্গেও তাঁহার প্রভাব স্বীকৃত হইয়া থাকিতে পারে। খারবেল জৈনধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন। অঙ্গ-বঙ্গে জৈনপ্রভাবের বহু নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে। (৪) তিব্বতীয় বৌদ্ধসাহিত্যনিহিত একটি জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ মনে করেন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে "কলিঙ্গ-রাজ্য আন্ধ্রসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং অঙ্গ-বঙ্গেও তাহার প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।" (৫) খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কলিঙ্গ কিয়ৎকালের জন্য গৌড়াধিপ শশাঙ্কের করতলগত হইয়াছিল। তখনও ইতিহাস-বিখ্যাত পালরাজগণের গৌড়ীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হয় নাই। (৬) খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ধর্ম্মপালদেব উৎকল অতিক্রম করিয়া আধুনিক কলিঙ্গের শেষসীমা পর্য্যন্ত "দুষ্টদমন" করিয়াছেন বলিয়াই প্রতিভাত হয়। তিনি কলিঙ্গে "মাৎস্য ন্যায়" দূরীভূত করিয়া সুশাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের তিরোভাবের পর উৎকল একবার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনের চেষ্টা করিয়াছিল। সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তাঁহার পুত্র দেবপালদেবও দিগ্বিজয়ী ছিলেন। তিনি "উৎকল-কুলকে উৎকিলিত করিয়াছিলেন।" "ধর্ম্মপালদেবের ও দেবপালদেবের প্রায় শত-বর্ষব্যাপী শাসনকাল গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গৌরবের কাল।" "এই যুগের কলিঙ্গের কথা অঙ্গ-বঙ্গ-কথার সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে।" "কলিঙ্গ অঙ্গ-বঙ্গেরই কণ্ঠলগ্ন ছিল; গৌড়েশ্বরগণের প্রবল প্রতাপ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে তুল্য ভাবেই বর্ত্তমান ছিল। ভাষায়, সাহিত্যে, শিল্পে, তাহার প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলিঙ্গের শেষ সীমা পর্য্যন্ত এখনও বাণিজ্য-কুশল গৌড়ীয় বৈশ্যগণের বংশধরগণ পূর্ব্বস্মৃতি সঞ্জীবিত রাখিতেছে।" বাঙ্গালীর কলিঙ্গ-বিজয়ের জনশ্রুতি বঙ্গদেশে একেবারে অপরিচিত ছিল না। তাহা এক সময়ে পল্লীতে পল্লীতে গীত

মধ্যযুগে বাঙ্গালীর গৌড়ীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আবিষ্কারক
ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

মানসী হইতে গৃহীত

India Press, Calcutta.

হইত। ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের লাউসেনের আখ্যায়িকায় তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

যাঁহারা প্রাচীন পুঁথির আলোচনা করেন, তাঁহারা মৈত্রেয় মহাশয়ের এই উক্তি-সমর্থনোপযোগী অনেক নূতন তথ্য দিতে পারিবেন আশা করি। যাঁহারা বাঙ্গালীর ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সামাজিক অনুষ্ঠান, উৎসব-আমোদ, পূজাপদ্ধতি ইত্যাদির বর্ত্তমান অবস্থা এবং প্রাচীন যুগ হইতে ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারাও বৌদ্ধ-জৈন-হিন্দু-মুসলমান-যুগে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণের সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত 'আদ্যের গম্ভীরা'-গ্রন্থে উড়িয়া জাতির সহিত বাঙ্গালীর সংযোগ ও ঐক্যের কিছু কিছু ইঙ্গিত করিয়াছেন। উৎকলের 'সাহীযাত্রা'-উৎসবের বিবরণে তিনি গৌড়ীয় গম্ভীরা এবং রাঢ়ীয় গাজনের এক-গোষ্ঠীভুক্ত উৎসবের পরিচয় দিয়াছেন। এই দিকে অনুসন্ধান বাড়াইয়া দিলে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-সংমিশ্রণের অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে। যাহা হউক, মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রবন্ধে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের আরও দুইটি কথা জানা যায়। (৭) একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্র চোল প্রবল যুদ্ধে দুর্গম ওড়বিষয় পদানত করিয়া কোশলনাড়ু, তন্দবুত্তি, তক্কণ লাড়ম্ ও বঙ্গাল দেশ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন। (৮) খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে গঙ্গাবংশ দীর্ঘকাল কলিঙ্গের সঙ্গে উৎকল—কখনও কখনও বঙ্গভূমির দক্ষিণ পশ্চিমাংশ অধিকারভুক্ত করিয়া প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

মৈত্রেয় মহাশয়ের অধিকাংশ তথ্যই অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল অনুমানের ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষজ্ঞগণ ভবিষ্যতে বিচার করিয়া দেখিবেন। কিন্তু এই সমুদয় হইতে বর্ত্তমানে আমরা অন্ততঃ এইটুকু ধারণা করিতে পারি যে, বাঙ্গালীকে বুঝিতে হইলে উড়িয়া জাতি এবং এমন কি আন্ধ্রপ্রদেশের দ্রাবিড় জাতিকে বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালার সমাজে, ধর্ম্মে, সাহিত্যে, শিল্পে দক্ষিণ ভারতের অনেক প্রভাব স্তরে স্তরে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া রহিয়াছে।

মৈত্রেয় মহাশয় বাঙ্গালীর ইতিহাস যেখানে শেষ করিয়াছেন, অধ্যাপক বসাক মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রায় সেই খানেই আরম্ভ। তাঁহার ঐতিহাসিক অনুমানসমূহ বাঙ্গালার খৃষ্টীয় দ্বাদশশতাব্দীর কিয়দংশ লইয়া ব্যাপৃত। তিনি গৌড়ীয় পাল-সাম্রাজ্যের অবসান কালের এক চিত্র দিয়াছেন। নিম্নলিখিত কথাগুলি তাঁহার বক্তব্য—(১) রামপালের পর কুমারপালদেব 'বরেন্দ্রী'তে রাজ্যশাসন করিতেন, তাঁহার সময়ে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের নানা স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কোন কোন বিদ্রোহ দমন করা হইয়াছিল, কতকগুলি দমন করিতে পারা যায় নাই। (২) এই সময়ে 'বঙ্গে' (বিক্রমপুর রাজধানী) বর্ম্মরাজগণের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। (৩) অপর দিকে এই সময়েই বিজয়সেন পাল-সাম্রাজ্যের দুরবস্থা ও দুর্ব্বলতা দেখিয়া বরেন্দ্রীতে রাজ্যস্থাপনের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। (৪) কুমারপালের প্রধান সচিব ও সেনাপতি দক্ষিণ বঙ্গের বিদ্রোহ দমন করেন, কিন্তু তিনি স্বয়ংই কামরূপে তিগ্মদেবকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিয়া

স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। (৫) এই সুযোগে পালরাজগণের ও বর্ম্মরাজগণের দুর্ব্বলতা দেখিয়া 'চন্দ্রদ্বীপে'র (খুলনা, বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরে) শ্রীচন্দ্রদেব 'বঙ্গে'র রাজধানী বিক্রমপুর অধিকার পূর্ব্বক স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। শ্রীচন্দ্রদেব বৌদ্ধ ছিলেন। (৬) ইহার কিছু কাল পরে বিজয় সেন বরেন্দ্রীতে পালরাজগণের ধ্বংসবিধান করিয়া বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রদেবের বৌদ্ধরাজ্য অধিকার করেন।

বসাক মহাশয়ের প্রবন্ধে বাঙ্গালায় এক সঙ্গে চারিটি রাজধানীর অস্তিত্ব অবগত হওয়া গেল—গৌড়, বিক্রমপুর, চন্দ্রদ্বীপ ও কামরূপ। রাষ্ট্রের প্রভাব সমাজের উপর বড় কম নহে। এই কারণে এই চারি স্বস্বপ্রধান রাষ্ট্রে জনসাধারণের আর্থিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি সকল প্রকার উৎকর্ষ নিশ্চয়ই স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হইয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গালায় সভ্যতার চারিটি কেন্দ্র অর্থাৎ চারিটি 'সমাজ' যুগপৎ গড়িয়া উঠিতেছিল। বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাস বুঝিতে হইলে এই কথা মনে রাখিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাঙ্গালীর ইতিহাসের ঠিক পরবর্ত্তী যুগের কিয়দংশ বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই—(১) খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দের প্রাক্‌কালে রাঢ় ও বরেন্দ্র মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। (২) তাহার কিয়ৎকাল পরে অহোমেরা পূর্ব্বোক্ত কামরূপ (এখনকার আসাম) দখল করেন। (৩) ফলতঃ উত্তরবঙ্গের একটি ক্ষুদ্র জনপদ, পশ্চিম কামরূপ (জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর ও গোয়ালপাড়া জেলা) ত্রয়োদশ শতাব্দে দুইটি নূতন প্রবল জাতির আক্রমণ হইতে এই জনপদের অধিবাসীবৃন্দকে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইয়াছে। ইঁহাদের আত্মরক্ষা-কাহিনী আলোচনা করিলে "ইতিহাসজ্ঞের নিকট রাজপুত, মারাঠা ও শিখ যেরূপ পূজা পাইয়া আসিতেছেন, ইহাদিগকেও সেইরূপ পূজা দিতে প্রবৃত্তি হয়।" এই প্রদেশ সেন ও রাজবংশী এই দুই জাতির বাসস্থান—ইহারা আকারে, আচারে ও ভাষায় বাঙ্গালী। "সুতরাং পশ্চিম কামরূপবাসীর গৌরবে রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গদেশ-বাসীর গৌরবান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।"

আমরা এই তিনটি প্রবন্ধ হইতেই বহু অংশ উদ্ধৃত করিলাম। অনেক স্থলেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লেখকগণ চলিয়াছেন। কিন্তু নিঃসন্দেহে এই ধারণা জন্মিবে যে বাঙ্গালা দেশের মাটির উপর বাঙ্গালী জাতির অভ্যন্তরে যুগে যুগে অসংখ্য পরস্পর-বিচ্ছিন্ন রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে, এবং বিভিন্ন রাজধানী-স্থাপনের ফলে বাঙ্গালীর বিদ্যা, কৌশল, শিল্প, সাহিত্য ও ধর্ম্ম নানা কেন্দ্রে নানাভাবে বিকাশলাভ করিয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে বিভিন্ন 'সমাজ' গড়িয়া উঠিয়াছে।

এক অবস্থায় যে স্থান কোন রাষ্ট্রের সীমান্তপ্রদেশ মাত্র, অপর অবস্থায় তাহাই হয় ত এক নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রের কেন্দ্র। এক সময়ে যাহা রাজধানী, অপর সময়ে তাহা হয় ত সীমান্ত প্রদেশ। বাঙ্গালীর সভ্যতার ইতিহাস-লেখকগণ এই কথা বিশেষভাবে মনে রাখিবেন। তাহা না হইলে বাঙ্গালী জাতি কত বিচিত্র শক্তি-সমাবেশে গড়িয়া উঠিয়াছে

তাহা বুঝা যাইবে না। আজকালকার অবস্থা দেখিয়া প্রাচীন বাঙ্গালীর গতিবিধি, কাজকর্ম্ম, চলাফেরা, কৌশল-নৈপুণ্য, রাস্তা-ঘাট, কিছুই অনুমান করা সম্ভব নহে। সভ্যতার স্রোত কখন কোথায় কোন্ পথে কিরূপভাবে প্রবাহিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে বাঙ্গালী জাতির রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের অসংখ্য পরিবর্ত্তনগুলি তন্ন তন্ন করিয়া বাহির করিতে হইবে। তাহার জন্য চীন, তিব্বত, নেপাল, আসাম, ব্রহ্মদেশ, যুক্তপ্রদেশ, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, মহারাষ্ট্র—এই সকল স্থান বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইবে। বাঙ্গালার যাঁহারা ইতিহাস লিখিবেন, তাঁহাদিগকে এই সকল দেশে ভ্রমণ করিতে হইবে, জীবন যাপন করিতে হইবে, তাহাদের ভাষা আয়ত্ত করিতে হইবে, তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া তাহাদের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং জাতীয় জীবনের গূঢ় কথাগুলি অবধারণ করিতে হইবে।

* *
*

আধুনিক হিন্দুস্থানের প্রতিষ্ঠানসমূহ

শিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালাদেশের খবরই বেশী রাখেন না—বাঙ্গালাদেশের বাহিরের কথা ত দূরের কথা। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লোকেরা তীর্থগমন করিত। তাহাতে ভারতবর্ষের আচার-ব্যবহার, সৌজন্য-শিষ্টাচার, সামাজিক অবস্থা, ইত্যাদি সকল বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ হইত। আজকাল রেলগাড়ী, খবরের কাগজ, কংগ্রেস, সম্মিলন হইয়াছে; যাতায়াতের, মেশামেশির সুবিধা বাড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের কূপমণ্ডুকত্ব সত্য সত্যই কমিয়াছে মনে হয় না। আমরা নানা স্থানে যাই বটে, কিন্তু চোখ দিয়া সেই সকল স্থান দেখি না—হৃদয় দিয়া সেখানকার লোকজনের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাই না। আমরা এবার বিহার ও যুক্তপ্রদেশ সম্বন্ধে কয়েকটা মোটা কথা প্রকাশ করিতেছি। তাহাতে পাঠকগণ সমসাময়িক হিন্দুস্থানবাসীর জীবন কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন।

শিক্ষা ও সাহিত্যসম্বন্ধীয়

১। (ক) এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিদ্যালয়সমূহ :—

যুক্তপ্রদেশ ব্যতীত নাগপুর, গোয়ালিয়র, জয়পুর, ইন্দোর, যোধপুর প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের কয়েকটি কলেজ এবং কতকগুলি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। সর্ব্বসমেত ইহার অধীন ৩২টি সাধারণ কলেজ, ১৪।১৫টি শিল্প-বিজ্ঞান ও ব্যবসাসম্বন্ধীয় কলেজ এবং ১৯৩টি হাইস্কুল আছে। ইহা ছাড়া বহু মাইনর স্কুল, প্রাইমারী স্কুল এবং বয়ন প্রভৃতি অন্যান্য শিক্ষার স্কুল আছে। উল্লিখিত স্কুল-কলেজ-সমূহের মধ্যে যেগুলি সাধারণ লোকের পরিচালিত, তন্মধ্যে এলাহাবাদের 'কায়স্থ-পাঠশালা' কায়স্থগণের শিক্ষাবিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। পরলোকগত মুন্সি কালীপ্রসাদের সাতলক্ষ টাকা দানে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহা প্রথমে একটি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল, এক্ষণে কলেজে পরিণত হইয়াছে।

যুক্ত প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ৭১৮টি বড় বড় বালিকা-বিদ্যালয় আছে। যথা:— (১) দেরাডুন গবর্ণমেণ্ট হাই; (২) আর্য্যকন্যা-পাঠশালা, এলাহাবাদ; (৩) গৌরীকন্যা-পাঠশালা, এলাহাবাদ; (৪) ক্রস্ ওয়েট্স্ বালিকা-বিদ্যালয়, এলাহাবাদ; (৫) বাঙ্গালী বালিকা-বিদ্যালয়, এলাহাবাদ; (৬) হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয়, বেণারস; (৭) টেহরি বালিকা-বিদ্যালয়, গড়ওয়াল; এই বিদ্যালয়টি গড়ওয়াল ষ্টেটের সাহায্যে তত্রত্য জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত। ইহা ব্যতীত লক্ষ্ণৌ, কাণপুর ইত্যাদি নগরে অনেক মাধ্যমিক ও নিম্নশিক্ষার বালিকা-বিদ্যালয় আছে।

ইউরোপীয়ান্ বালিকাদের উচ্চশিক্ষার নিমিত্ত 'ইউরোপীয়ান্ গারল্স্ হাই' নামে একটি বিদ্যালয় আছে। সম্প্রতি ইহাতে বি, এ ক্লাস খোলা হইয়াছে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজসমূহের মধ্যে এলাহাবাদে দুইটি ট্রেণিং কলেজ আছে।

(খ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিদ্যালয়সমূহ।

বিহারের স্কুল-কলেজসমূহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। এখানে পাটনায় ২টি, ভাগলপুরে ১টি, মজঃফরপুরে ও মুঙ্গেরে ২টি, এই পাঁচটি সাধারণ কলেজ এবং বাঁকিপুরে ১টি আইন কলেজ, ১টি ট্রেণিং কলেজ, ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ও ১টি মেডিক্যাল স্কুল; পুষায় ১টি কৃষিকলেজ এবং ভাগলপুরে ১টি কৃষিস্কুল আছে। এতদ্ব্যতীত ৪১টি হাইস্কুল, অনেকগুলি মাইনর ও প্রাইমারী স্কুল এবং বয়ন প্রভৃতি অন্যান্য শিক্ষার স্কুল আছে। হিন্দুস্থানে বয়ন-বিদ্যালয়গুলির স্থাপনায় এখানকার বয়নকার্য্য ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বজীবন লাভ করিতেছে।

২। 'গুরুকুলাশ্রম', কন্খল। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর 'আর্য্যসমাজ' কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত অবৈতনিক বিদ্যালয়। প্রায় ১২ বৎসর হইল হরিদ্বারের সন্নিহিত কন্খলে 'গুরুকুলাশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরে উহার ন্যায় বৃন্দাবনেও 'গুরুকুলাশ্রম' স্থাপিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ভারতীয় আর্য্যগণ দিন দিন ধর্ম্মে অনাস্থ ও শাস্ত্রোক্তক্রিয়াকাণ্ডহীন হইয়া যাইতেছে দেখিয়া বাল্যকাল হইতেই ছাত্রগণকে শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য-পালনে এবং হোম, সন্ধ্যা, আহ্নিক ইত্যাদি বেদোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ত্তব্যসমূহে অনুরক্ত করাই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। গুরুকুলের বিশেষত্ব—(১) ইহা ভারতীয় শিক্ষাদান-পদ্ধতির আদর্শে গঠিত, (২) হিন্দু-সাহিত্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগী, (৩) অবৈতনিক।

হরিদ্বারের 'ঋষিকুল' এবং গড়ওয়ালের 'ভ্রাতৃমণ্ডল' ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান।

'ঋষিকুল'—সনাতন হিন্দুদিগের বিদ্যালয়। বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণকে ব্রহ্মচর্য্য-পালন এবং অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম্মে অনুরক্ত করা ইহার উদ্দেশ্য।

'ভ্রাতৃমণ্ডল'—উদ্দেশ্য সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষাপ্রচার। শিক্ষাপ্রচারকল্পে ইহার পরিচালিত বিদ্যালয়ে জাতিনির্ব্বিশেষে সকল ধর্ম্মীয় বালককে শিক্ষাপ্রদান করা হয় এবং উপযুক্ত ছাত্রগণের উচ্চশিক্ষার্থ বৃত্তিপ্রদান করা হয়।

পঞ্চনদের

"আর্য্যসমাজ"-প্রতিষ্ঠাতা

স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী

India Press, Calcutta.

৩। নাগরী-অক্ষর-প্রচার এবং হিন্দী সাহিত্যের আলোচনার জন্য এলাহাবাদ, বেণারস, কাণপুর, আগ্রা, ভাগলপুর ইত্যাদি নানাস্থানে সমিতি আছে। তন্মধ্যে কাশীর 'নাগরী-প্রচারিণী সভা' এবং এলাহাবাদের 'নাগরী-প্রবর্দ্ধিণী সভা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গদেশের সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় ইহাদের কোন সুগঠিত প্রতিষ্ঠান এখনও হয় নাই। তবে এ বিষয়ে তাঁহাদের যে প্রকার গভীর চেষ্টা দেখা যাইতেছে, তাহাতে শীঘ্রই ঐরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের আশা করা যায়। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিবিধান যেমন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের লক্ষ্য, হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিবিধান এবং বিভিন্ন স্থানে নাগরী-অক্ষর-প্রচার সেইরূপ ঐ সকল সভার উদ্দেশ্য। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এই আন্দোলনের ধুরন্ধর। 'আর্য্য-সমাজ' এবং এলাহাবাদের 'ইণ্ডিয়ান প্রেস' হিন্দী সাহিত্যের প্রচারকল্পে অনেক সহায়তা করিতেছে। এই প্রেস হইতে অনেকগুলি হিন্দীপত্রিকা এই উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইতেছে।

৪। ইটাবার 'সরস্বতী-বিদ্যাপীঠ' এবং এলাহাবাদের 'পাণিনি-আফিস' সাহিত্যসম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান। হিন্দু সাহিত্যের সংরক্ষণ ও প্রচারকল্পে ইহারা প্রতিষ্ঠিত।

৫। কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা ও ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট ও জন-সাধারণের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ :—

(১) 'প্রেম মহাবিদ্যালয়' (বৃন্দাবন)—ইহার প্রতিষ্ঠাতা হাতরাসের জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রপ্রতাপ সিংহ। শিল্পশিক্ষার নিমিত্ত ইনি সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া ১৯০৯ সালে এই জাতীয় শিল্প-সাহিত্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বিদ্যালয়টি অবৈতনিক এবং শিক্ষাকার্য্য যথাসম্ভব মাতৃভাষার সাহায্যে হইতেছে। এখানে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ শিখান হয়—(ক) সূত্রধরের কাজ, (খ) কর্ম্মকারের কাজ, (গ) কুম্ভকারের কাজ, (ঘ) কার্পেট বুনানের কাজ, (ঙ) ব্যবসা ও বাণিজ্য, (চ) জরিপ, (ছ) অঙ্কন, (জ) রসায়ন-বিজ্ঞান, (ঝ) অঙ্ক-শাস্ত্র, (ঞ) ইতিহাস-ভূগোল।

(২) 'টমসন কলেজ' (রুরকি)।

গবর্ণমেণ্ট-পরিচালিত ভারতের সর্ব্বপ্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এখানে তাড়িতে বয়নসম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা চলিতেছে।

(৩) লক্ষ্ণৌ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইনষ্টিটিউট।

(৪) কাণপুর টেকনোলজিক্যাল স্কুল।

(৫) কাণপুর কৃষিকলেজ।

(৬) বেরিলি শিল্প-বিদ্যালয়।

(৭) লক্ষ্ণৌ মেডিক্যাল কলেজ।

(৮) আগ্রা মেডিক্যাল স্কুল।

(৯) পুসা (দ্বারবঙ্গ) কৃষি-কলেজ। কৃষি-বিষয়ক অনুসন্ধান ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

(১০) ভাগলপুর জেলায় সাবোরে কৃষি-বিদ্যালয়।

(১১) 'পাটনা টেম্পল মেডিক্যাল স্কুল', বাঁকিপুর

(১২) বাঁকিপুর ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল।

(১৩) আইন-শিক্ষার জন্য এলাহাবাদে 'ইউনিভারসিটী স্কুল অব্ ল'। (অপর ৫টি কলেজে আইন-শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে)।

(১৪) বিহারে আইন-শিক্ষার জন্য বাঁকিপুরে 'পাটনা ল কলেজ'।

৬। হিন্দুস্থানে লক্ষ্ণৌ, মথুরা এবং জয়পুর এই তিনটি স্থানে মিউজিয়ম্ আছে। ইহাদের প্রথম দুইটি গবর্ণমেণ্টের এবং শেষোক্তটি জয়পুরের মহারাজার।

এখানে বঙ্গদেশের বিদেশ-প্রেরণ-পরিষদের ন্যায় কোন প্রতিষ্ঠান নাই, তবে গবর্ণমেণ্ট প্রতিবৎসর একটি যোগ্য ছাত্রকে ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কাগজ প্রস্তুতকরণ শিক্ষার নিমিত্ত বাৎসরিক ১৫০ পাউণ্ড হারে দুই বৎসরের জন্য বৃত্তি দিয়া ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রসমূহ

১। ‘সরস্বতী’	হিন্দী মাসিক	এলাহাবাদ	সম্পাদক	পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী
২। ‘পণ্ডিত’	সংস্কৃত মাসিক	ঐ	”	মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা
৩। ‘অভ্যুদয়’	হিন্দী সাপ্তাহিক	ঐ	”	পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়
৪। ‘মর্য্যাদা’	হিন্দী মাসিক	ঐ	”	ঐ
৫। ‘প্রেম’	হিন্দী দাশাহিক	বৃন্দাবন	”	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রপ্রতাপ সিংহ
৬। ‘হিন্দুস্থানী’	উর্দ্দু সাপ্তাহিক	লক্ষ্ণৌ	”	শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা
৭। ‘লীডার’	ইংরাজী দৈনিক	এলাহাবাদ	”	সি ওয়াই, চিন্তামণি
৮। ‘হিন্দুস্থান রিভিউ’	ইংরাজী মাসিক	ঐ	”	শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ
৯। ‘লক্ষ্ণৌ এডভোকেট’	ইংরাজী সাপ্তাহিক	লক্ষ্ণৌ	”	শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা
১০। ‘ভেডিক ম্যাগাজিন’	ইংরাজী মাসিক	হরিদ্বার	”	অধ্যাপক রামদেব

ধর্ম্ম ও সমাজসম্বন্ধীয়

‘মঠ-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত হিন্দুস্থানে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আন্দোলনের ফলে যে সকল সমিতি বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এবং সকলগুলিই হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার ও প্রচার-উপলক্ষে হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

১। ‘আর্য্য-সমাজ’—ইহার প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। প্রায় ৪০ বৎসর হইল পঞ্জাবে এই সমাজ গঠিত হয়। এই স্থানে ইহার প্রভাবও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বর্ত্তমানে হিন্দুস্থানেও ইহা খুব সমাদর লাভ করিতেছে এবং বঙ্গে, কলিকাতা ইত্যাদি ভারতের বড় বড় সহরে ‘আর্য্য-সমাজ’ বিস্তৃত

হইতেছে। সনাতন হিন্দুগণ হইতে ইঁহাদের প্রভেদ এই যে ইঁহারা জাতিভেদ ও মূর্ত্তিপূজা মানেন না। কেবল বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দেও শাস্ত্রী এবং মহাত্মা মুন্সিরাম হিন্দুস্থানে আর্য্য-সমাজের নেতা।

২। ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল——নিষ্ঠাবান হিন্দুগণের সমিতি। কাশীতে স্থাপিত। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার দ্বারা পতনোন্মুখ হিন্দুসমাজকে পূর্ব্বগৌরবে স্থাপিত করাই ইহার উদ্দেশ্য। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু নিষ্ঠাবান হিন্দু এই সমিতির পৃষ্ঠপোষক। স্বামী জ্ঞানানন্দ ইহার সভাপতি।

৩। 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মিশন'—কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন ও হরিদ্বারে এই সমিতি আছে। হিন্দুধর্ম্মের প্রচার ইঁহাদের উদ্দেশ্য। পরোপকারই ধর্ম্মের মূল ইহাই ইঁহাদের মত। বঙ্গদেশে বেলুড়ে ইঁহাদের প্রধান আশ্রম বা মঠ আছে। এতদ্ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানে—যথা আলমোরার নিকটস্থ মায়াবতী, কাশী ও মান্দ্রাজে—মঠ আছে। সুদূর আমেরিকাতেও 'বিবেকানন্দ-মিশন' গঠিত হইয়াছে এবং হিন্দু-ধর্ম্ম প্রচার হইতেছে।

৪। থিয়সফিক্যাল সোসাইটী (যোগনীতি-প্রচার-সমিতি)—ইংরাজ রমণী আনি বেশান্ত ইহার প্রতিষ্ঠাত্রী। ইঁহার অনেক শিষ্য ও শিষ্যা আছেন। যোগদর্শনের নীতি-প্রচারই ইঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। একমাত্র তদনুযায়ী কর্ম্মকেই ইঁহারা ধর্ম্ম মনে করেন। রায় বাহাদুর শ্যামসুন্দর লাল প্রমুখ এখানকার অনেক শিক্ষিত লোক এই সমাজভুক্ত। কলিকাতাতেও এই সমিতি আছে।

বর্ত্তমান সময়ে এই প্রদেশে সমাজ সংস্কার উপলক্ষে যতগুলি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই হিন্দুগণের—(১) পতিত জাতির উদ্ধার সাধন, (২) স্ব স্ব জাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, (৩) আচারবর্জ্জন ইত্যাদি স্বজাতির নানাপ্রকার মঙ্গল সাধনই উহাদের উদ্দেশ্য। যেমন—

মৈথিল সভা—মৈথিল ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগের কু-আচারবর্জ্জন, নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মকর্ম্মের প্রতি স্বজাতির বিশেষভাবে মনোযোগ-আকর্ষণ, শাস্ত্রালোচনার স্পৃহাবর্দ্ধন, অসহায় ও দরিদ্র বালকগণের শিক্ষালাভের ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি বহুবিধ সদুদ্দেশ্যে এই সভার সৃষ্টি করিয়াছেন। দ্বারবঙ্গের মহারাজা স্যার রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর ইহার নেতা। বঙ্গদেশীয় মৈথিলগণের সহিত এই সভার সংস্রব আছে।

কায়স্থ-সভা—কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্বপ্রতিপাদন এবং উপবীত গ্রহণের প্রচলন করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

বানিয়া-সমিতি—বানিয়া জাতির বৈশ্যত্ব-প্রতিপাদন ও উপবীত গ্রহণ ইহার উদ্দেশ্য। বঙ্গদেশেও এই সমিতি আছে। ইঁহারা পরস্পর সংস্রবযুক্ত। এই সকল ছাড়া আগড়ওয়ালা প্রভৃতি অন্যান্য জাতির এই একই প্রকার আন্দোলন ও সভাসমিতি আছে।

শিল্প-বাণিজ্যসম্বন্ধীয়

যুক্তপ্রদেশে বেণারস, মথুরা, মির্জ্জাপুর, অযোধ্যা, মোরাদাবাদ, লক্ষ্ণৌ এবং ফরক্কাবাদ সর্ব্বাপেক্ষা ব্যবসা-প্রধান স্থান। কাণপুরে কলের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। এই প্রদেশে

তামা, পিতল ও কাঁসার কাজ খুব বেশী পরিমাণে হইয়া থাকে। বিহারে সাহাবাদ জেলার পিতল ও কাঁসার কাজ উল্লেখ-যোগ্য। যুক্তপ্রদেশে ইক্ষুর চাষ অত্যাধিক পরিমাণে হয়। সমস্ত ভারতে যে পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়, তাহার অর্দ্ধাংশ পরিমাণ কেবল এই যুক্তপ্রদেশেরই অন্তর্গত।

উপরিলিখিত ব্যবসা-প্রধান স্থান কয়টির শিল্পজাত দ্রব্যের মোটামুটি বিবরণ দেওয়া গেল।

বেণারস—এখানকার ধাতু-শিল্পের দ্রব্যাদি সাধারণতঃ তিন প্রকার। (১) পূজা পার্ব্বণে ব্যবহার্য্য পাত্রাদি; কোশাকুশি, পঞ্চপ্রদীপ, কাঁসর ঘণ্টা প্রভৃতি পূজোপকরণ; নানা-প্রকার পিতলমূর্ত্তি; পিতলের কবাট। (২) খোদাই ও ঢালাই দ্রব্য। যেমন বুটা তোলা পিতলের থালা। (৩) ইউরোপীয় ধরণে নির্ম্মিত রেকাব, থালা, বাটি ইত্যাদি। কাশীর ঘটিও প্রসিদ্ধ। তীর্থযাত্রিগণ এই ঘটির খুব সমাদর করিয়া থাকেন। কাশীর 'শাড়ি' এবং অন্যান্য রেশমী দ্রব্যও বেশ প্রসিদ্ধ।

মথুরায়—(১) তামা ও পিতলের ছোট ছোট দেবদেবীর মূর্ত্তি। (২) 'বাসুদেব কাটোরা'। মথুরাযাত্রীরা এই বাটি আদরের সহিত ক্রয় করে।

মির্জ্জাপুরে—'লোটা', 'থালিয়া', 'বাটুয়া' ইত্যাদি।

মোরাদাবাদে—বার্ণিশের কাজ, টিন ও লাক্ষার জিনিষ।

লক্ষ্ণৌ—খাসদান, পানদান, (বদ্‌না), ডেগচি প্রভৃতি।

ফরক্কাবাদে—মুসলমানের ব্যবহার্য্য থালা, বাসন ইত্যাদি।

ঝাঁসি ও ললিতপুরে—পিতলের জন্তু প্রভৃতি।

আলিগড়ে—পিতলের উৎকৃষ্ট তালা-চাবি। এখানকার 'পোষ্টাল ওয়ার্কসপ' প্রসিদ্ধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান।

নিম্নে হিন্দুস্থানের শিল্প-বাণিজ্যসম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান প্রধান কতকগুলির নাম উল্লেখ করা গেল।

শিল্প-বিষয়ক—

কাপড়ের কল—আগ্রায় আগ্রা স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্; মির্জ্জাপুরে শ্রীগঙ্গাজি কটন মিলস্; মোরাদাবাদে মোরাদাবাদ স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্; কাণপুরে কাণপুর কটন মিলস্, মুইর মিলস্, ভিক্টোরিয়া মিলস্ কোম্পানি।

কার্পেটের কারখানা—মির্জ্জাপুরে লালতা প্রসাদ এণ্ড ব্রাদার্স ফ্যাক্টরী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ এণ্ড কো ফ্যাক্টরী ইত্যাদি ৫টি কারখানা আছে। বেনারসে—কার্পেট ফ্যাক্টরী; আগ্রায়—আগ্রা কার্পেট ফ্যাক্টরী। মির্জ্জা-পুরই কার্পেটের জন্য বিশেষ খ্যাত। গয়া, ভাগলপুর, পাটনা, সাহাবাদ ও মজঃফরপুরেও কার্পেট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

চর্ম্মের কারখানা—কাণপুরে কাণপুর লেদারওয়ার্কস্, নর্থওয়েষ্ট ট্যানারি কোং, ইণ্ডিয়ান লেদার ফ্যাক্টরী, কাণপুর ইত্যাদি আটটি বড় বড় কারখানা আছে। আগ্রায় —গোয়ালিয়র ট্যানারি, সিন্ধিয়া লেদার ফ্যাক্টরী। প্রতাপগড়ে—রামপুর লেদার ফ্যাক্টরী এবং কলকক্কর লেদার ফ্যাক্টরী। বিহার দানাপুর এবং বাঁকিপুরে জুতার কারখানা আছে।

কাগজের কল—লক্ষ্ণৌএ আপার ইণ্ডিয়া কাউপার পেপার মিলস্। কিছুদিন হইল এখানে এক প্রকার ঘাস হইতে কাগজ প্রস্তুতের জন্য চারি লক্ষ টাকা মূলধনে আর একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই প্রকার বেণারস, মির্জ্জাপুর, মজঃফরনগর, মিরাট, এলাহাবাদ ও কাণপুরে ময়দার কল আছে।

অযোধ্যা, দেরাদুন, ফিরোজাবাদ (আগ্রা), পাটনা ও ভাগলপুরে কাচের কারখানা আছে।

দেরাদুন, লক্ষ্ণৌ ও বস্তীতে চাউলের কল আছে।

এলাহাবাদ ও কাণপুরে চিনির কল আছে। গাজীপুর জেলায় প্রচুর চিনি প্রস্তুত হয়। এই চিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

কাণপুর, দেরাদুন, ফৈজাবাদ, মিরাট, লক্ষ্ণৌ ও বস্তীতে তেলের কল আছে।

আগ্রা, চুনার, মিরাট, মির্জ্জাপুর ও গয়ায় পাথরের কারখানা আছে।

গয়া, মিরাট, বেণারস, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, মজঃফরপুর ও মুরাদপুরে (বাঁকিপুর) চীনামাটী ও কাচের কারখানা আছে।

মিরাট, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, এলাহাবাদ ও দানাপুরে কালীর কারখানা আছে।

মিরাট ও কাণপুরে ফিতার কারখানা আছে।

মুঙ্গেরের পেনিন্‌সুলার টোব্যাকো কোম্পানি; কাণপুরের উলেন মিল কোম্পানি এবং কৈসার সোপ ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোম্পানি; মিরাটের নর্থওয়েষ্ট সোপ কোম্পানি প্রভৃতিও শিল্পবিষয়ক প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান।

ব্যবসায়-বিষয়ক :—

নানাস্থানে ব্যাঙ্ক, লোন অফিস এবং বীমা কোম্পানি আছে। যেমন ব্যাঙ্ক অব আপার ইণ্ডিয়া, মিরাট. পিপলস্ ইণ্ডিয়ান কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ।

কৃষি-বিষয়ক :—নানা স্থানে নার্সারি বা উদ্ভিদ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দেরাদুন সীডষ্টোর এণ্ড নার্সারি (দেরাদুন), কৃষ্ণনার্শারি (মজঃফরপুর), ইউনিয়ন নার্সারি (দ্বারবঙ্গ) বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহারা উৎকৃষ্ট চারা ও বীজ সরবরাহ করিয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহের জন্য আলিগড় জেলায়, কাণপুরে এবং বাঁদায় একটি করিয়া এক্সপেরিমেণ্টাল ফারম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দুগ্ধ সরবরাহের জন্য বেণারস, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, ঝাঁসি, বেরিলি, আলিগড় ও ফতেগড়ে ফারম আছে।

আমেরিকায় গণিত-শিক্ষা

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমেরিকার বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

"চিকাগোয় থাকতে সেখানকার একটী ভালো বিদ্যালয় দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। সেখানে দেখবার জিনিষ ঢের আছে। কিন্তু তাদের সে সমস্ত বহুব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা দেখে আমাদের পক্ষে বিশেষ লাভ নাই। কেবল,

অঙ্ক শেখবার একটা যা প্রণালী দেখলুম সেইটে তোমাকে লিখচি। এরা ক্লাসে একটা খেলার মত করে—সেটা হচ্চে Banking। তাতে পুরোপুরি ব্যাঙ্কের কাজের সমস্ত অভিনয় হয়। চেক বই, ভাউচার, হিসাবপত্র সবই আছে। ছেলেদের কারো বা চিনির ব্যবসা, কারো বা চামড়ার—সেই উপলক্ষে ব্যাঙ্কের সঙ্গে তাদের লেনা-দেনা এবং তার লাভ-লোকসান ও সুদের হিসাব ঠিক দস্তুর মত রাখতে হচ্চে। এতে অঙ্ক জিনিষটাকে এরা গোড়া থেকেই সত্য ভাবে দেখতে পায়। ছেলেরা খুব আমোদের সঙ্গে এই খেলা খেলচে। তোমার মনে আছে কি না বলতে পারিনে, কিন্তু আমি বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের বিদ্যালয়ের অঙ্কের ক্লাসে এই দোকান রাখার খেলা চালাবার চেষ্টা করেছিলুম। গণিত-শাস্ত্রে আমার বিদ্যার পরিমাণ গণনায় অতি যৎসামান্য বলেই আমি এ জিনিষটাকে খাড়া করে তুলতে পারলুম না—কোন জিনিষ নূতন প্রণালীতে গড়ে তোলবার শক্তি ছিল না—এই জন্যে এটা ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু অঙ্ক জিনিষটা কি এবং তার ভুল জিনিষটা যে কেবল নম্বর কাটার জিনিষ নয়, সেটা যে যথার্থ ক্ষতির কারণ, এটা খেলাচ্ছলে ছেলেদের দেখিয়ে দিলে সেটা ওদের মনে গাঁথা হয়ে যায়। ছোট ছোট কাপড়ের বস্তায় বালি পুরে অনায়াসে এই খেলার আয়োজন করা যেতে পারে—অবশ্য খাতা পত্র ঠিক দস্তুরমত রাখতে শেখাতে হয়। এই জিনিষটাতে ওদের হাত দুরস্ত হলে প্রত্যেক ঘরেই আমরা বিদ্যালয়ের ডিপজিটের কাজ স্বতন্ত্র করে চালাতে পারি। প্রথমটা এটা গড়ে তুলতে একটু ভাবতে এবং খাটতে হয়, কিন্তু তারপর কলের মত চলে যাবে।

আতার বীচি ও তেঁতুলের বীচি দিয়ে টাকা-পয়সার কাজ চালাতে পার—কাগজ কেটে কতকগুলি নোটও তৈরি করে নিতে পার—এতে ওদের আমোদও হবে শিক্ষাও হবে। এই জিনিষটা একটু ভেবে দেখো। এদেরই স্কুলে এই জিনিষটার নূতন প্রবর্ত্তন হয়েছে—আমরা এদের অনেক আগে এই প্রণালীর কথা চিন্তা করেছি। কিন্তু আমরা বাঁধা রাস্তার বাইরে কিছুই করতে পারলুম না—আর এরা অনায়াসে এগিয়ে যাচ্চে—এইটে দেখে আমার মনে দুঃখ বোধ হল।”

পাঁচ ছয় বৎসর হইল অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় গণিত-শিক্ষা সম্বন্ধে যে প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—“সচরাচর যে প্রণালীতে গণিত-শাস্ত্রে শিক্ষা-প্রদান করা হইয়া থাকে তাহাতে ছাত্রকে কতকগুলি সংজ্ঞাহীন নির্জ্জীব সংখ্যা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয়। সংখ্যা, রাশি ও সাঙ্কেতিক চিহ্নসমূহ এবং পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি সমস্তই কেবলমাত্র কাগজ বা বোর্ড-গত প্রাণ হইয়া থাকে। এই সমুদায় তথ্য জীবন্ত সত্যের ন্যায় মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে না। মানুষের জীবনের সহিত এই সকল জিনিষের সম্বন্ধ বিশেষ স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় না। এই জন্য এই সকল পদার্থ মৃত ও অচেতন বিবেচিত হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে বিশেষ কোন দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য শিক্ষক

মহাশয় অথবা গণিতকার কোন চিত্র বা প্রকৃত ঘটনার সাহায্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহাতে প্রতিপাদ্য বিষয়টি কথঞ্চিৎ সজীবতা লাভ করে। কিন্তু কেবল তাহার সাহায্যে গণিত শাস্ত্রের অনুশীলনের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয় না, এবং প্রকৃত অনুরাগ জন্মে না।

এই জন্য এক নূতন প্রণালী এই পুস্তকে অবলম্বিত হইয়াছে। তাহা দ্বারা মানুষের প্রতিদিনকার জীবনের বৈষয়িক কার্য্যকলাপের মধ্যে গণিত-শাস্ত্রকে আনয়ন করিয়া সরস করিয়া তোলা হইবে। প্রতিদিন প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিকে বহু পদার্থের পরিমাণ গ্রহণ করিতে হয়; বহু জিনিস ওজন করিতে হয়। এই নিত্য ব্যবহার্য্য পরিমেয় পদার্থসমূহের প্রতি ছাত্রের দৃষ্টি নিক্ষেপ করাইতে হইবে। দিন, ক্ষণ, লোক, স্থান, গৃহ, ধন, পশু প্রভৃতি পদার্থের পরিমাণ মানুষ আবহমানকাল গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। এই সকল শিল্প-বাণিজ্য এবং বিষয়-সম্পত্তির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সহিত গণনা ও পরিমাণ-শাস্ত্র ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সেই সকল বিষয়সমূহের সহিত সম্যক পরিচিত হইলেই গণিত শাস্ত্রে রসগ্রাহিতা জন্মে। নতুবা ভিত্তিহীন অলীক সংখ্যাতত্ত্ব শুষ্ক, দুরূহ ও ভীতিজনক বোধ হয়।

এই পরিমেয় পদার্থসমূহের পরিমাণ লইয়া অসংখ্য প্রকার প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে। এই সকল প্রশ্নের বিষয় অবগত হইতে হইবে। লাভ-ক্ষতি, আদান-প্রদান, ঋণ-গ্রহণ, ঋণদান, ক্রয়-বিক্রয়, বিভাগ, বিনিময় প্রভৃতি পরিমাণমূলক নানাবিধ বৈষয়িক ব্যাপার মানব-জীবনের বিচিত্রতা সম্পাদন করে, এই সকল ঘটনা অর্থনীতি-শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। এই সমুদয় কার্য্য-কলাপই মানব-জীবনের প্রধান অংশ। প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে এই সকল কার্য্যের বিবরণ গ্রহণ করা আবশ্যক। যত ক্ষেত্রে ও যে যে স্থলে পরিমাণ গ্রহণের আবশ্যকতা হইয়া থাকে——সেই সকল ক্ষেত্রের প্রশ্নের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

মানব-জীবনের সামাজিক কার্য্যাবলীর মধ্যে ধনসম্পত্তি ও শিল্প-বাণিজ্য লইয়া নানাপ্রকার কারবার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অধিকাংশই অতি জটিল, দুরূহ, দুর্ব্বোধ্য ও সমস্যাপূর্ণ। সমবেত ব্যবসায়, যৌথকারবার, ব্যাঙ্কিং, রাজস্বের আদান-প্রদান, সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয়, অন্তর্দ্দেশিক ও বহির্দ্দেশিক বাণিজ্য, ঋণ-দান, ঋণ-গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য-সমূহ অতিশয় কঠিন ও বিচক্ষণতার সহিত বিবেচ্য। কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বৈষয়িক ব্যাপারসমূহের মধ্যে কতকগুলি প্রশ্ন অবশ্য সহজ ও অল্পায়াসসাধ্য। কেবল মাত্র সেইগুলি আয়ত্ত করিতে পারিলেই গণিতে উৎকর্ষ লাভ হইতে পারে। সুতরাং যে সমস্যাসমূহ মীমাংসা করিবার জন্য বহুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে হয়, সেই সমুদয় আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তৎপরিবর্ত্তে শিক্ষার্থীকে সর্ব্ববিধ সমস্যার সরল সুবোধ্য দৃষ্টান্তসমূহই আলোচনা করিতে হইবে।

রাশি, সংখ্যা বা কোন সঙ্কেত ব্যবহারের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হইবে না। মুখে মুখে গণিতের সর্ব্ববিধ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। গণিত-শাস্ত্রে প্রকৃত প্রবেশ লাভ করিবার জন্য এবং বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত জটিল রাশি বা বৃহৎ সংখ্যা ব্যবহারের বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। অতি-সরল এবং ক্ষুদ্রতম রাশি ব্যবহার করিয়াই, এবং সঙ্কেত-চিহ্নের পরিমাণ ও জটিলতা বৃদ্ধি না করিয়াও মানুষের সর্ব্ববিধ পরিমেয় পদার্থসমূহের এবং পরিমাণ-গ্রহণকার্য্যের ধারণা করা যায়। অতি জটিল প্রশ্নও এই উপায়ে সরল হইয়া পড়ে। কঠিন কঠিন অঙ্ক করিতে পারাই গণিতে বুৎপত্তির লক্ষণ নহে। অনেক সময়ে একেবারে না বুঝিয়াও কেবলমাত্র সূত্র প্রয়োগ করিয়াই কঠিন প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

সুতরাং এরূপ প্রশ্ন করা উচিত যাহাতে বৃহৎ বৃহৎ রাশির অথবা জটিল সংখ্যার

প্রয়োগ না করিতে হয়। অতি ক্ষুদ্র রাশি ব্যবহার করিয়াই সমগ্র গণনা-শাস্ত্র সমাপ্ত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ধারণা-শক্তিকে সাহায্য করিবার জন্য শিক্ষার্থীর সম্মুখে বস্তু ধারণা করা বিধেয়। চিত্রাঙ্কনাদি উপায় অবলম্বন করিয়া শিক্ষাদান করাই গণিত-শিক্ষার প্রকৃষ্ট প্রণালী।

এইরূপে জীবনের নানাবিধ কর্ম্মের মধ্যে গণিতের প্রতিপাদ্য বিষয়টি আয়ত্ত হইলে পর শিক্ষার্থীর মানসক্ষেত্রে বীজগণিত, পাটীগণিত ও জ্যামিতি স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া বুদ্ধিশক্তি-বিকাশের সহায়তা করিতে পারিবে।"

এই প্রণালী কতকগুলি স্কুলেও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং এই অনুসারে শিক্ষাও দেওয়া হইতেছে; কিন্তু বিনয় বাবুর এই পদ্ধতি কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছে তাহা আমরা জানি না।

রবি বাবুও "জিনিষটাকে খাড়া করে তুল্‌তে" পারেন নাই, "নূতন প্রণালীতে গড়ে তোলবার" শক্তি নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। অন্যান্য দেশে লোকেরা সকল বিষয়েই সফলতা প্রাপ্ত হয়। আমরা প্রায় কোন কাজেই সার্থকতা লাভ করিতে পারি না। আমাদের অপদার্থতাই কি ইহার একমাত্র কারণ?

* *
*

বাঙ্গালা ভাষায় দ্রাবিড়ী উপাদান

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এক অধিবেশনে প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার এম, এ, বি এল্ এম, আর এ এস্ মহাশয় যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"প্রচলিত ধর্ম্ম-বিশ্বাস, সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতির উৎপত্তি এবং বিনাশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সমগ্র ভারতবর্ষের সভ্যতা আর্য্য এবং দ্রাবিড়ী সভ্যতার মিশ্রণে বিকাশ লাভ করিয়াছে। আর্য্য সভ্যতার বিস্তারের পূর্ব্বে যে সকল দ্রাবিড় জাতি বঙ্গদেশে বাস করিত, তাহাদের ভাষা এখন বাঙ্গালা। আন্ধ্র-দেশের রাজারা এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজাধিরাজ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং তখন নিশ্চয়ই সমগ্র আর্য্যভাষার উপর তাঁহাদের ভাষার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তখন আন্ধ্রভাষায় রচিত "বৃহৎকথা" লোপ না হইলে, এ বিষয়ের অনেক তথ্য পাওয়া যাইত। তমলুকে তামিলভাষীদের বাস ছিল, এমত মতবাদ আছে, এই সকল সূত্রে এক সময়ে তামিল, তেলগু ভাষা বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎপরে তিনি বলেন, অনেক দ্রাবিড়জাতীয় শব্দ সংস্কৃত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় স্থান পাইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি বলেন,—তেলগু "গোর্‌রা মু" হইতে গুজরাটী "খোড়ো' তৎপরে সংস্কৃত স্ফটিক হইয়াছে মলয়ালম্ প্রদেশের পর্ব্বতবাচী "মলৈ" হইতে সংস্কৃত মলয় বাতাস ও মলয়পর্ব্বত পাওয়া গিয়াছে। পাণ্ড্য জাতির কুলদেবতা "মীন" হইতে, কন্ধদিগের মৎস্যবাচী "মীন" ও কর্ণাটের মৎস্যবাচী "মীন্থ" শব্দ হইতে "মান' অবতারের নাম হইয়াছে, তামিলের "করপ্পু" কর্পূর হইয়াছে. ইত্যাদি।" তৎপরে তিনি যে সকল বিভিন্ন দ্রাবিড় ভাষার শব্দমালা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে বাঙ্গালায় চলিতেছে, তাহার এক দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। তৎপরে উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন "বঙ্গভাষায় প্রচলিত দেশী শব্দগুলির কাল্পনিক সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি গড়িয়া না লইয়া, যদি যত্নে দেশী শব্দকোষ সংগ্রহ করা হয়, তবে প্রতিবেশী জাতির ভাষা শিক্ষা করিয়া যথার্থ ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা করা উচিত।

আয়ুর্ব্বেদের যশোগৌরব

"সম্প্রতি বিলাতের "রয়াল সোসাইটি অব্ মেডিসিন" নামক প্রসিদ্ধ চিকিৎসাসমিতির

এক অধিবেশন হয়। তাহাতে ওয়েলস প্রদেশস্থ মেণ্ডিপ হিলের স্বাস্থ্যাগারের প্রধান চিকিৎসক ডাক্তার সি মুথ্ হিন্দুদিগের আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, অতি প্রাচীন সময়ে হিন্দুদিগের সভ্যতা উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জ্ঞান উন্মেষিত ও বিকশিত হইতে আরম্ভ হয়। অতি প্রাচীনতম জাতি সকলের মধ্যে হিন্দুরাই সর্ব্ব প্রথমে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির পথ প্রসরতর করেন। ইঁহারাই প্রথমে খনিজ দ্রব্যাদি, বিশেষতঃ পারদ, ধাতু ঔষধার্থে ব্যবহার করেন। বহু শতাব্দী পূর্ব্বেও ইঁহারা রোগ-বীজাণুতত্ব, শরীরে রক্ত-সঞ্চালন ও বসন্তের টীকা দিবার প্রণালী অবগত ছিলেন। সর্প-দংশন চিকিৎসায়ও ইঁহারা সিদ্ধহস্ত ছিলেন, আলেকজেণ্ডার সর্প-চিকিৎসকগণের অদ্ভুত চিকিৎসা-সাফল্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। অস্ত্র-চিকিৎসাতেও ইঁহারা বিশেষ সুনিপুণ ছিলেন, তাঁহারা যে কেবল ভাঙ্গা হাড় জোড়া দিতে পারিতেন তাহা নহে, মস্তকে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া অংশবিশেষের অস্থি কর্ত্তন করিয়া রোগের কারণ অনুসন্ধান করিতেন, গুরুতর অস্ত্রপ্রচারের সময় বোধশক্তিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিতেন, এবং আবশ্যক হইলে হস্তপদাদিও কর্ত্তন করিয়া ফেলিতেন। ডাঃ মুথ্ তৎপরে বলেন—বুদ্ধদেবের অন্তর্দ্ধানের পর হইতে অস্ত্র-চিকিৎসার প্রচার কমিয়া, ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা-প্রণালী অধিকতর উন্নতি লাভ করে। এই সময় স্থানে স্থানে চিকিৎসালয়-সংস্থাপন ও উহাতে আবশ্যকীয় ঔষধ সকল ও উপদেশপূর্ণ ব্যবহার-প্রণালী সংরক্ষিত করিয়া উহা উপযুক্ত চিকিৎসক-দিগের তত্বাবধানে রাখা হইত। কিন্তু বুদ্ধ-দেবের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষে নানা প্রকারের চিকিৎসা-বিদ্যালয় ছিল। আরব-বাসীরা হিন্দুদিগের নিকট হইতেই চিকিৎসা ও ঔষধ প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা করিয়া ইউরোপে ইহা প্রচার করেন। সুতরাং চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা-লাভের জন্য পাশ্চাত্য জাতি হিন্দুদিগের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী।"

—আনন্দবাজার

দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্য

পরলোকগত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রবর্ত্তিত কলিকাতা "সাহিত্য সভার" এক মাসিক অধিবেশনে সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্ মহাশয় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাব্যজীবন-সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"কিছু কাল হইতে আমাদের জাতীয় আদর্শ পাশ্চাত্য আদর্শের সহিত সংঘর্ষিত হইতেছে। তাহার ফলে আমাদের সাহিত্যে, সমাজে এবং ধর্ম্মে এক বিরাট বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। এক পক্ষ বলিতেছেন যে, আমাদের জাতীয় আদর্শ আমাদের জাতীয় অভ্যুত্থানের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী অপর পক্ষ আবার ইহার ঠিক বিপরীত কথা বলিতেছেন। এই দুই বিপরীতগামী সভ্যতার সংঘর্ষণে পণ্ডিত, গোঁড়া, নব্য হিন্দু, ব্রাহ্ম, বিলাতফেরত প্রভৃতি দলের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রত্যেক দলই সমাজে, ধর্ম্মে, সাহিত্যে প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতেছে না। সকল দলই অল্পাধিক পরিমাণে উদ্যমহীন, মনুষ্যত্বহীন, এবং ন্যাকামি, জ্যেঠামি, ভণ্ডামি, লোকামি প্রভৃতি নানা-প্রকার "মি"তে পরিপূর্ণ। এই "মি"কে লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল কখন ব্যঙ্গ করিয়াছেন, কখন রঙ্গ করিয়াছেন, কখন হাসাইয়াছেন, কখন কাঁদাইয়াছেন। এক একটি গানে প্রত্যেক দলের ন্যাকামি, ভণ্ডামি প্রভৃতিকে তিনি চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছেন। এবং এইরূপ দেখানর ফলে, দেশ হইতে অনেক ন্যাকামি ভণ্ডামি বিতাড়িত হইয়াছে। এই সকল গান অনেক স্থলেই হাস্যরসাত্মক।

আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের প্রয়োজন কেবল দন্তরুচিকৌমুদীর বিকাশ দেখাইবার জন্য। কিন্তু ইহা নিতান্ত অসার বিশ্বাস।

বর্ণনীয় পদার্থকে প্রভূত পরিমাণে বিকৃত করিয়া আঁকিলে সহজেই যে হাসি আসে, সে এক প্রকারের হাসি। সে হাসি স্নায়ুবিশেষের উত্তেজনা দ্বারা উৎপন্ন হয়। ইহার সহিত বুদ্ধির, ভাবের বা হৃদয়ের কোনও সম্বন্ধ নাই, এবং ইহার অবতারণার জন্য বিশেষ কোনও কবিত্বশক্তির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অপর একপ্রকার হাসি আছে, যাহা আমাদের স্নায়বিক উত্তেজনা অতিক্রম করিয়া বুদ্ধিবৃত্তির এবং হিতাহিতজ্ঞানের মূল হইতে নিঃসৃত হয়। হাসির ন্যায় কান্না, লজ্জা, ঘৃণা, বিরক্তি, ক্রোধ প্রভৃতিও এই মূল হইতে নিঃসৃত হয়। মন হইতে এই সকলের উদ্ভব হয় বলিয়া মনে ইহাদের অনুভূতি হইয়া থাকে। এই অনুভূতি এবং বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে আমরা একটা জিনিষের সহিত আর একটার তুলনায় বিচার করি। আমরা এরূপ অভ্যাসের দাস এবং চিরন্তন প্রথা বা সংস্কারের এরূপ পক্ষপাতী যে, আমাদের জীবনের কোনও একটি ঘটনার সামান্য একটু ব্যতিক্রম হইলে, আমরা একেবারে অভিভূত বা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ি এবং হাসিয়াই হউক বা কাঁদিয়াই হউক আমাদের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকি।

আরও দেখা যায় যে, আমাদের সকলেরই কোন না কোনরূপ ব্যক্তিগত গাম্ভীর্য্য আছে। এই গাম্ভীর্য্য আমাদের ব্যক্তিগত বুদ্ধিবৃত্তি, অনুভূতি এবং সংস্কারের উপর নির্ভর করে। ইহাদের ইতরবিশেষ হইতে গাম্ভীর্য্যেরও ইতরবিশেষ হইতে দেখা যায়। এই ব্যক্তিগত গাম্ভীর্য্য একটু শিথিল করিয়া দিলেই হাসির, এবং ইহা ছাড়াইয়া আরও উপরে উঠিলেই কান্নার উদ্ভব হয়।

এক্ষণে দেখা গেল যে, হাসি ও কান্না, এই দুই পরস্পরবিরুদ্ধ ভাব, একই জিনিষ রূপান্তরিত হইয়া একই কারণ হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। এ হাসিতে অসারতা মাত্র নাই। ইহা স্বাভাবিক, সম্পূর্ণ এবং গাম্ভীর্য্যমূলক। ইহা ভাঁড়ামি এবং ব্যঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এবং ইহার অবতারণার জন্য বিশেষ কবিত্বশক্তির প্রয়োজন হয়। এই হাস্যরসের সার্থকতা, কবির কল্পনা এবং সহানুভূতির উপর নির্ভর করে। এই হাস্যরসের ভিতর দিয়া যে কবি যতটা করুণ রস ফুটাইতে পারেন, সেই কবি ততটা উচ্চ স্থানের অধিকারী হন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই রসে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইলেও, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহাদের অপেক্ষা কম কৃতিত্ব দেখান নাই। এই রস তাঁহার হৃদয়ের সারল্যে, মাধুর্য্যে এবং কারুণ্যে স্বতঃ প্রবাহিত এবং অবারিত। ইহা বিশুদ্ধ, প্রীতিপ্রফুল্ল এবং অসূয়া-ক্রোধ-সম্পর্কশূন্য। অশ্লীল-হাবভাবসমন্বিত গ্রাম্য দাদামহাশয়ী রসিকতার পরিবর্ত্তে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশুদ্ধ হাস্যরসের এক যুগ আনয়ন করিয়াছেন। যে মনীষী আমাদের এই একঘেয়ে, দারিদ্র্যদলিত জীবন কৌতুকের আবরণে আবৃত করিয়া আমাদের কৌতুকনেত্র উন্মোচনে সমর্থ এবং আমাদিগকে হাসিবার, হাসাইবার এবং হাসি উপভোগ করিবার শক্তি দিতে সমর্থ, তিনি আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র।

আমেরিকায় হিন্দুস্থান-সমিতি

ভারতবর্ষের লোকেরা প্রথম যখন বিদেশে যাইতে আরম্ভ করিল, তখন বিলাত ভিন্ন আর কোথায়ও কেহ যাইত না। যাইবার উদ্দেশ্য ছিল—চাকুরী অথবা ব্যারিষ্টারীর জন্য শিক্ষালাভ। ক্রমশঃ শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, ব্যবসায়, ঔষধপ্রস্তুত-করণ ইত্যাদি নানা উপায়ে স্বাধীন অন্ন অর্জ্জনের উপায় বাহির করিবার জন্য আমাদের উৎসাহী ছাত্রবৃন্দ বিদেশে ছুটিয়াছে। এখন কেবল বিলাতই আমাদের বিদেশ-গমনের কেন্দ্র নয়। জাপান, আমেরিকা, জার্ম্মাণি—প্রধানতঃ এই তিনটি নূতন দেশে আমাদের গতিবিধি সম্প্রতি বাড়িয়াছে। এখন আমরা নানা দেশের

কার্য্য-প্রণালী ও চিন্তা-প্রণালীর অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি। আমাদের আমেরিকাবাসী ছাত্রগণ নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা পাঠকগণকে তাহার পরিচয় দিতেছি।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রায় দেড় শত ছাত্র আজকাল আমেরিকার যুক্তরাজ্যে শিক্ষালাভ করিতেছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যেই ছাত্র-সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়েকজন দায়িত্বজ্ঞানশীল ছাত্র এই সকল ছাত্রগণের শিক্ষাসম্বন্ধে যত্ন লইবার জন্য, আমেরিকায় তাঁহাদের শিক্ষা ও বিদ্যাবত্তার সম্বন্ধে খাঁটি খবর ভারতে পাঠাইবার জন্য এবং ভারতীয় ছাত্রগণকে এ দেশে আসিতে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের উদ্যোগে গত বৎসর আমেরিকার যুক্তরাজ্যে 'হিন্দুস্থান-সমিতি' (Hindustan Association) সংগঠিত হইয়াছে। ভারতের শিক্ষাপ্রচারক, দেশহিতৈষী ও সম্পাদকগণ তাঁহাদের এই উদ্দেশ্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ও জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ অনুষ্ঠানের প্রচার করিলে তাঁহাদিগকে সাহায্য করা হইবে। ইতিপূর্ব্বেই এই দেশের ভিন্ন-স্থানের প্রায় ১০০ জনের অধিক ছাত্র এই সমিতির সদস্যরূপে কর্ম্ম করিতেছেন, কালে সমুদায় ছাত্রগণই ইহার সভ্য হইবেন আশা করিতে পারি। তাঁহারা কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুরকে এই সমিতির সভ্যরূপে পাইয়া-ছেন। ইহাও আমাদের খুব সৌভাগ্য যে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ সভা-পতি, প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী, মন্ত্রী ও সম্পাদকগণ 'হিন্দুস্থান-সমিতি'র সভ্য হইয়া আমাদের ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট যত্ন লইতেছেন।

যাঁহারা পথপ্রদর্শকরূপে বিদেশে গিয়াছেন, তাঁহাদের দায়িত্ব অনেক বেশী। যাহাতে ছাত্রজীবনের একনিষ্ঠা, বিদ্যাবত্তা এবং চরিত্রবলের দ্বারা আমাদের এই জন্মভূমির গৌরব রক্ষা করিতে পারেন, সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে সচেষ্ট থাকিতে হইবে। এই ভাব ও এই আন্তরিকতাই হিন্দুস্থান-সমিতির প্রেরণাস্বরূপ হইলে দেশের মঙ্গল। এই যুক্ত-রাজ্যের ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই স্বাবলম্বী। তাহাদিগকে নানাপ্রকার বিরুদ্ধ অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে, কিন্তু অনেকেই এই কঠোর জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করিতেছেন, ইহাই তাঁহাদের পক্ষে কল্যাণ-জনক ও আশাপ্রদ। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই চরিত্রে এবং বুদ্ধিমত্তায় ভারতের সাধারণশ্রেণীভুক্ত; তাঁহারা এই বিদেশী ছাত্রদের সহিত সমকক্ষতা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা সন্তুষ্ট নহি। আমরা যোগ্যতর হইতে চাই, আমরা মহত্তর কর্ম্ম করিতে চাই। আমরা জীবনের উদারতা প্রত্যক্ষ করিতে চাই, কর্ম্ম পরিস্ফুট দেখিতে চাই এবং অন্তরের শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তিগুলি এবং চিন্তাসমূহ দেশকালোপযোগী প্রবল প্রচেষ্টার সহিত মিলিত করিতে চাই, ইহাই আমাদের আদর্শরূপে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে। আমাদের ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ দুর্ব্বলতা ও অকৃতকার্য্যতার পরিচয় দিয়াছেন। ছাত্রদের মধ্যে দুই একজন এরূপও দেখা গিয়াছে যে প্রবল দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া আমেরিকার বিদ্যালয়ের সামান্য সফলতাকেই দেশের পত্রিকার সাহায্যে বিশিষ্টরূপে ও অসাধারণভাবে বিজ্ঞাপিত করিয়া অতি সহজে নাম ও যশ লাভে প্রয়াসী হইয়াছে। কেহ কেহ এত নির্লজ্জ যে তাহাদের নামের পশ্চাতে একটা অলীক উপাধি (ডিগ্রী) ও অলীক বিশ্ববিদ্যালয়ের একরূপ একটি উপাধি (ডিগ্রী) বসাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে নাই। এরূপ কাজ ছাত্রদের অনুপযুক্ত ও নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। এই নবগঠিত সমিতির সাহায্যে আমাদের ছাত্রদের ক্রিয়াকলাপ, ক্রমোন্নতি ও গুণগ্রামসমূহ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইলে সেরূপ ছাত্রদিগকে দমন করিতে এবং তাহা-দিগকে সাবধান করিতে পারা যাইবে।

এই সমিতি হইতে "হিন্দুস্থানী ছাত্র" (The Hindusthani Student) নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্র বাহির হইবে। আয়ের

ব্যবস্থা হইলেই ভবিষ্যতে মাসিক প্রকাশিত করিবার আয়োজনও হইতে পারে। এই পত্রিকায় আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়সকল তথাকার সুযোগ ও সুবিধাসমূহ এবং আমাদের ছাত্রগণের কার্য্যকলাপ ও শিক্ষাদিসম্বন্ধে খাঁটি খবর প্রকাশিত হইবে। এ পর্য্যন্ত যত খবর ভারতের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃক লিখিত; সুতরাং বিভিন্ন প্রদেশের সমুদায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান না থাকায় তাহার অধিকাংশই আংশিক সত্য কোন কোনটী বা ভুল। এই "হিন্দুস্থানী ছাত্রে"র সাহায্যে এদেশে আসিতে ইচ্ছুক ছাত্রগণকে আবশ্যকীয় যাবতীয় সংবাদ প্রদান করিতে পারা যাইবে আশা করি। ভারতে ছাত্রদের পক্ষে ইহার চাঁদা (Subscription) এক টাকা; মিঃ কে, সি, দাস, ১নং এণ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা—এই ঠিকানায় চাঁদা পাঠাইতে হইবে; আমাদের ছাত্রদের মধ্যেই ইহার অধিক গ্রাহক দেখিতে চাই। ভারতের সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণ, ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের মাসিক সাপ্তাহিক ইংরাজী ও বাঙ্গালা পত্রিকা-গুলি পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন, ইহা তাঁহাদের নিকট আমাদের অনুরোধ।

হিন্দুস্থান-সমিতি নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে ভারতের ছাত্রগণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন—

(১) আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রায় কুড়িটি প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে। পৃথিবীর যত শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে সাহিত্য, শিল্প, ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব, যন্ত্রবিদ্যা, চিকিৎসা, অস্ত্র-প্রয়োগ, কৃষিবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, ইহারা তাহাদেরই সমকক্ষ। যন্ত্রাগার এবং পুস্তকাগারসমূহ এরূপ সম্পূর্ণ এবং সুসজ্জিত যে ইউরোপের কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়সমূহেই তদ্রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য এরূপ অনেক স্কুল ও কলেজ আছে যাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচেই হইতে পারে।

২। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট-গণ এখানে বিজ্ঞান-শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন। বিজ্ঞানাগারে যন্ত্র-ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত হইবেন এবং অনেক নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনের ক্ষমতা জন্মিবে। ভারতে এরূপ সুযোগ অসম্ভব এবং ইউরোপে অত্যধিক অর্থব্যয় দ্বারাই সম্ভব। এখান হইতে গ্রাজুয়েট হইলে নানাস্থানে, যন্ত্রাগারে, রসায়নাগারে এবং কারখানায় সহকারীরূপে বেশ লাভজনক কর্ম্ম পাওয় যাইতে পারে। আমাদের অনেক ছাত্র এরূপভাবে কর্ম্ম করিতেছেন, এই ভাবে তাঁহারা যে কেবল প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন তাহা নহে, যথেষ্ট অর্থও উপার্জ্জন করিতে পারেন।

৩। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা ভারতের সভ্যতা, ভারতের সাহিত্য, শিল্প ও ইতিহাস ধারাবাহিকরূপে শিক্ষা করিয়াছেন, এরূপ গ্রাজুয়েটগণ এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ও বক্তা হইতে পারেন এবং এইরূপে স্বদেশের ও এদেশের কল্যাণসাধন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

৪। অন্ততঃ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ না করিয়া কাহারও পক্ষে আমেরিকা আসা উচিত নহে; ইহার পরেও দুই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালরূপে পড়াশুনা চালাইতে হইলে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ করিয়া আসিতে হয়, অন্ততঃ এই পর্য্যন্ত বিদ্যা থাকা চাই। সংচরিত্র, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং সবল দেহ না থাকিলে আসিতে আমরা কাহাকেও উপদেশ দিই না।

৫। এখানে সর্ব্বত্রই স্বাবলম্বনের সুবিধা আছে;—কিন্তু একই সময়ে কাজ করা ও কলেজে যাওয়া কষ্টজনক, তাহা হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে। এখানে যাহাদের অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, উৎসাহ আছে এবং ঐকান্তিকতা আছে তাহারাই কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। আমাদের স্বাবলম্বী ছাত্রদের মধ্যেও অধিকাংশই কৃতকার্য্য হইয়াছে। কাহারও কাহারও চেষ্টা অবশ্য বিফলও হইয়াছে।

সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী ছাত্রদের জীবন অতিশয় কঠোর ; তাহাদিগকে সকল প্রকার দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে ; কিন্তু যখন নিজের চেষ্টায় ও উদ্যোগে মানুষ হইবে, কর্ম্মে সফলতা লাভ করিবে, তখন যে আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হইবে তাহা পূর্ব্বের কষ্টকে ভুলাইয়া দিবে এবং সেই কঠোরতাকে বর্ত্তমান আনন্দের নিদান বলিয়াই প্রতীতি জন্মাইয়া দিবে ; ফলতঃ তাহার শ্রম সার্থক হইল মনে করিবে।

৬। যাহারা স্বাবলম্বী হইতে ইচ্ছুক, তাহাদের ভারতবর্ষ ছাড়িয়া আসিবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের কার্য্যকরী জ্ঞান থাকা আবশ্যক,—যথা ছুতার মিস্ত্রির কাজ, জরীপ, নক্সা, রাজমিস্ত্রির অথবা পলস্তারার কাজ। আমেরিকায় এই সব কাজে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করা যায়।

৭। কোন ছাত্র অথবা আলস্য-পরতন্ত্র ব্যক্তির বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যতিরেকে এখানে আসা উচিত নহে ; কারণ তাহাদিগকে অনাহারেই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। আমেরিকার জীবন অত সহজ ও সরল নহে, প্রত্যুত কঠোর ঘাত-প্রতিঘাত-পূর্ণ। তাহাদিগকে ভারতবর্ষের মতই খুব বিবেচনার সহিত কঠোর কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে, কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে এই পার্থক্য যে এখানে ঐরূপ ভাবে কাজ করিলে নিজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস জন্মিবে এবং কার্য্যে উৎসাহ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইবে।

৮। স্বাবলম্বীই হউক আর যাহাই হউক, আমেরিকা পৌঁছিয়া অন্তত ৩৫০—৪০০৲ সম্বল থাকা চাই। কারণ জাহাজ হইতে নামিবার পূর্ব্বেই বিদেশ-গমনাগমনসংক্রান্ত আফিসের কর্ম্মচারীকে (Immigration officer) ১৫০৲ দেড় শত টাকা দেখাইতে হইবে, তবেই তথায় নামিতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত আরও ৪।৫ মাসের খরচের টাকা অন্ততঃ সঙ্গে থাকা চাই। নানা প্রকার ঝঞ্ঝাটের হাত হইতে এড়াইবার জন্য আমরা নিউইয়র্কে (New York) অথবা সিয়াটলে (Seattle) অবতরণ করিতে উপদেশ দেই। ষ্টীমারসংক্রান্ত নিয়মাবলী কলিকাতা এবং বোম্বাইয়ের আফিসে পাওয়া যাইতে পারে। ছাত্রদিগকে তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট সঙ্গে করিয়া আনা উচিত এবং শেষে যে কলেজে যে যে বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহাও থাকা দরকার। যদি কোন ছাত্র আমাদের সমিতির কর্ম্মচারিগণকে পূর্ব্বে তাহার পৌঁছিবার তারিখ ও ষ্টীমারের নাম জানান এবং কোথায় নামিবেন তাহাও স্পষ্ট উল্লেখ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা জাহাজ হইতে নামিবার সময়ে সাক্ষাৎ করিয়া যতদূর সম্ভব সাহায্য করিতে পারেন। আমেরিকার মানচিত্র একটু ভাল করিয়া জানা থাকিলে অনেক উপকারে আসে।

৯। আমেরিকায় শিক্ষার্থী ভারতের ছাত্রগণকে সাহায্য করাই আমাদের এই সমিতির একটি উদ্দেশ্য। আমাদের অভিজ্ঞতার ফল যাহাতে তাঁহারাও লাভ করিতে পারেন, উহাই প্রধান লক্ষ্য। উপযুক্ত এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছাত্রগণ যেন দলে দলে এখানে আসে, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা, কারণ এখানকার স্কুল ও কলেজে আমাদের ছাত্রদের জন্য সহস্র সহস্র স্থান পড়িয়া রহিয়াছে। আমাদের সমিতির সম্পাদক মহাশয় আমেরিকায় শিক্ষাসম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ আনন্দের সহিত সকলকে জানাইবেন। কিন্তু অনুসন্ধানকারিগণকে দুইটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি—(১) আমাদের সময় অল্প ও মূল্যবান্, কেহ যেন বৃথা কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য কিছু না লেখেন এবং (২) আমেরিকার সমস্ত চিঠিতেই আড়াই আনা মাশুল লাগিয়া থাকে; সুতরাং উত্তরপ্রার্থী হইলে আড়াই আনার টিকিট সঙ্গে দিয়া দিবেন, তবেই পত্রের উত্তর পাইবেন। সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য ছাত্রগণ আমাদের প্রতিনিধি কে, সি, দাসের নিকট ১নং এণ্টনিবাগান লেন কলিকাতা—এই ঠিকানায় লিখিলেই সমস্ত জানিতে পারিবেন ; উত্তরের জন্য টিকিট দিয়া দিবেন।

আমরা ছাত্রগণকে তাঁহার নিকট যাইয়া সাক্ষাৎ করিতে উপদেশ দেই; কারণ তাঁহার আমেরিকার বিভিন্ন স্থানের ছয় বৎসরের অভিজ্ঞতা ছাত্রদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে বলিয়া মনে করি।

'হিন্দুস্থান-সমিতি' আরও জানাইয়াছেন:—

"আমাদের সমিতির এখনও এমন অবস্থা হয় নাই যে, কাহাকেও অর্থ সাহায্য করিতে পারে; সুতরাং এরূপ সাহায্যের জন্য কেহ অনুরোধ করিবেন না। এই সমিতি আমেরিকার হিন্দুস্থানী ছাত্রগণের দ্বারাই গঠিত ও পরিচালিত; ভারতের কোন রাজা বা ধনী লোকের সাহায্য বা সহানুভূতি আমাদের নাই। আমেরিকায় চীন ও ফিলিপাইন দেশী ছাত্রদের ন্যায় আমাদের সংখ্যা ও গবর্ণমেণ্ট-বৃত্তির কোন সুবিধাই নাই। আমাদের সভাগণের মধ্যে অধিকাংশই স্বাবলম্বী, সুতরাং তাহারা নিজের শক্তি ও চেষ্টা দ্বারা যাহা কিছু পারেন তাহাই করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের অর্থ নাই বটে, কিন্তু শক্তি-সামর্থ্য আছে, উৎসাহ আছে, নিজেদের উপর বিশ্বাস আছে এবং দেশবাসিগণের সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা আছে। দেশবাসিগণের নিকট কোন সাহায্য প্রার্থনা করা আমরা উচিত মনে করি না; তবে যদি কেহ আমাদের এই কার্য্যের জন্য সহায়তা করিতে ইচ্ছুক হন, এরূপ দান অতি সামান্য হইলেও আমাদের সম্পাদক বা ধনাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইবে।"

পরিশেষে সমিতির সম্পাদক ভারতীয় ছাত্রগণকে আমেরিকায় আহ্বান করিতেছেন—"এই ছয় বৎসর আমেরিকায় থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে ইহা বুঝিতে পারিয়াছি যে ভারতের গ্রাজুয়েট ও ছাত্রগণের বহুমূল্য সময় কেবলমাত্র জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য বৃথা ব্যয় করা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। আমেরিকা আজ তাহার শ্রেষ্ঠ দান লইয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। এখানে কার্য্যকরী বিদ্যায় ও ব্যবসায়ে দক্ষ ও ধুরন্ধর হইবার অসংখ্য সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। এখানে একটা নূতন জীবনের প্রেরণা অনুভব করিবে এবং আমাদের এই জন্মভূমির সনাতন আদর্শকে স্থায়ী ও উজ্জ্বল করিবার উপযোগী নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা জাগিয়া উঠিবে।"

'হিন্দুস্থান-সমিতি'র সভ্যগণ যদি বিদেশে হিন্দুর প্রভাব রক্ষা ও বিস্তার করিতে পারেন, তাহা হইলে জননী জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিবেন। আর যদি তাঁহারা দেশের বর্ত্তমান অবস্থা না বুঝিয়া যাহা তাহা অনুকরণ করিতে শিক্ষা করেন, তাহা হইলে ভস্মে ঘৃতাহুতি দেওয়া হইবে। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহারা সংযম, চরিত্রবত্তা এবং দূরদর্শিতার সাহায্যে বিদেশে জীবন যাপন করিতে পারিবেন এবং জগতে হিন্দুর কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার অন্যতম উপায় স্বরূপ হইবেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা *

[এই প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্ম্মের কয়েকটি প্রসিদ্ধ মূল বিষয় আলোচনা করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা—অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্ম কিসে প্রতিষ্ঠিত, তাহার কোথা হইতে উৎপত্তি—ইহাই নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের নিম্নলিখিত কথাগুলি আলোচিত হইয়াছে—

১। আর্য্যসত্য-চতুষ্টয়—

(ক) দুঃখ,

(খ) দুঃখের কারণ,

(গ) দুঃখের নিরোধ,

(ঘ) দুঃখ-নিরোধের উপায় বা পথ।

(১) বৌদ্ধধর্ম্মের গোড়ার কথা 'দুঃখ-বাদ'। ইহা ভারতীয় সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের সাধারণ কথা। বৌদ্ধধর্ম্মের ইহাতে বিশেষত্ব নাই।

(২) দুঃখের বিশ্লেষণ—জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি। ইহাও বুদ্ধদেবের স্বয়ং চিন্তিত নহে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাচীন সাহিত্য উপনিষৎ (ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ইত্যাদি) গীতায় সুস্পষ্টভাবে তাহা দেখা যায়।

(৩) আর্য্যসত্য-চতুষ্টয়-নামে চারিটি মূল সূত্রের উল্লেখও বুদ্ধদেবের নিজের উদ্ভাবিত নহে; (ক) চিকিৎসা, ও (খ) যোগশাস্ত্র হইতে তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

২। বুদ্ধদেব 'মজ্‌ঝিমা-পটিপদা' বা মধ্য-পথের আবিষ্কার করিয়াছেন, প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু বস্তুত তাঁহাকে সে গৌরব দিতে পারা যায় না। বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে সামান্যতঃ, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় বিশেষরূপে, তাহার নির্দ্দেশ দেখিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেই তাহার মূল স্বীকার করিতে হয়।

৩। 'অনিত্য', 'দুঃখ' ও 'অনাত্ম'—বুদ্ধদেবই এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন বলা হয়, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। তাঁহার বহুপূর্ব্বে দর্শনশাস্ত্রসমূহে তাহা আলোচিত হইয়া গিয়াছে। 'অশুচি'-বাদ বা 'অশুচি-ভাবনা'ও তাঁহার উদ্ভাবিত নহে, যোগ দর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত সূত্রই ইহা প্রতিপাদন করিয়া দেয়।

৪। বুদ্ধদেব সমস্ত ক্লেশের মূলরূপে অবিদ্যাকেই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাও আমাদের প্রায় সমস্ত দর্শনের, বিশেষতঃ বেদান্তের সাধারণ উক্তি। অবিদ্যার প্রকার সম্বন্ধে ভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র।

৫। বুদ্ধদেব তৃষ্ণাক্ষয়কেই নির্ব্বাণ বলিয়াছেন। তৃষ্ণাক্ষয় ও কাম বা বাসনাক্ষয় একই কথা। ইহাও তাঁহার নূতন কথা নহে। প্রাচীন উপনিষৎ প্রভৃতিতেই ইহা দেখা যায়।

৬। বৈদিক যাগযজ্ঞের ও বেদের অপ্রামাণ্যকে বুদ্ধদেব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এ চিন্তাও তাঁহার নবীন নহে। বৈদিক সাহিত্য হইতেই এই চিন্তার এই ভাবের উন্মেষ ও ক্রমশঃ তাহার পরিপুষ্টি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মেও দেখিতে পাওয়া যায়।

৭। দ্রব্যযজ্ঞাদি অপেক্ষা প্রজ্ঞাযজ্ঞ বা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেব ইহা প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে তাঁহার পূর্ব্বেই ইহার প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়।

৮। বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বরবাদ স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার কোন নূতনত্ব নাই। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মীমাংসা ও সাংখ্যদর্শনে তাহা আলোচিত হইয়া গিয়াছে।

৯। কর্ম্মবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের একটি বিশেষত্ব বলিয়া অনেকে উল্লেখ করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে ইহা ত অতি প্রসিদ্ধ, এবং উপনিষৎ প্রভৃতিতে তাহার ভূরি প্রমাণ আছে।

১০। মৈত্রী ভাবনা প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্মে প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইহাদেরও মূল ও পরিপুষ্টি বৈদিক সাহিত্য হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে দেখা যায়।

এই সমস্ত আলোচনা করিলে বলিতে হয় বৌদ্ধধর্ম্মের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেই ইহা

* উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের দিনাজপুর অধিবেশনে পঠিত, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০।

প্রতিষ্ঠিত, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম হইতেই ইহার উৎপত্তি। মূল বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া যেমন পৌরাণিক ধর্ম্ম হইয়াছে, বৌদ্ধধর্ম্মও সেইরূপ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মেরই একটা স্বতন্ত্র প্রকাশ বা আকার মাত্র।

এই আলোচনায় যে চিকিৎসা ও যোগশাস্ত্রের অনুকরণে আর্য্যসত্য-চতুষ্টয়ের নির্দ্দেশ, এবং অবিদ্যাই যে সর্ব্বদুঃখের মূল এবং ইহার সহিত যোগশাস্ত্রের উক্তির সহিত যে সামঞ্জস্য আছে, তাহা Kernএর Manual of Buddhism হইতে গৃহীত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন সমস্তই লেখকের নিজের চিন্তা।]

আর্য্য-সত্যচতুষ্টয়

বুদ্ধদেব কি প্রকারে কি চিন্তা করিয়া সমস্ত রাজভোগবিলাস পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তাহা বৌদ্ধ সংহিত্য-সমূহে কবির ভাষায় নানা সাজ-সজ্জায় নানা ভূষণ-অলঙ্কারে বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত বর্জ্জন করিয়া যদি তাহার স্বরূপটি উন্মুক্ত করিয়া দর্শন করা যায়, তাহা হইলে জানা যাইবে যে, তাহা এই জগতের দুঃখ ভিন্ন আর কিছু নহে। এই দুঃখের স্বরূপ প্রধানতঃ জরা, ব্যাধি ও মরণ, এবং জন্ম হইতেই এই ত্রিবিধ দুঃখ উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহাও দুঃখের অন্তর্গত। সংসারে এই যে দুঃখ রহিয়াছে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না, ইহা প্রত্যক্ষ পরম সত্য। এই জন্য বুদ্ধদেব ইহার নাম 'আর্য্যসত্য' দিয়া বলিয়াছেন—

"ইদং খো পন ভিক্খবে দুক্খং অরিযসচ্চং। জাতিপি দুক্খা, জরাপি দুক্খা, ব্যাধিপি দুক্খা, মরণম্পি দুক্খং,...।"

মহাবগগ, ১-৬-১৯।

ভিক্ষুগণ, এই যে দুঃখ, ইহা একটি আর্য্য-সত্য—পরম সত্য। জন্মও দুঃখ, জরাও দুঃখ, ব্যাধিও দুঃখ, মরণও দুঃখ,...।

বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় কথা হইতেছে—এই দুঃখের কোন একটি কারণ আছে, কারণ না থাকিলে এ দুঃখের উৎপত্তি হইতে পারে না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, এবং সেইজন্য দুঃখের কারণও একটি আর্য্যসত্য। তাঁহার তৃতীয় কথা হইতেছে—এই দুঃখের নিরোধ বা নিবৃত্তি হয়; ইহাও একটি আর্য্যসত্য। তাঁহার চতুর্থ কথা—এই দুঃখনিরোধের পথ বা উপায় আছে, এবং ইহাও আর একটি আর্য্যসত্য।

দুঃখ-বাদ

বুদ্ধদেব স্বকীয় ধর্ম্মচিন্তায় যে স্থান হইতে যাত্রা করিয়াছেন, তাহাতে কোন বিলক্ষণত্ব বা নূতনত্ব নাই। দুঃখ-বাদ ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রসমূহের সাধারণ কথা। ইহা প্রমাণ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না, কেননা ইহা সকলের জানা কথা। তবুও একটা উল্লেখ করা যাউক। সাঙ্খ্য-দর্শনের মূলের কথা ইহাই। কেমন করিয়া দুঃখনিবৃত্তি হইবে সাঙ্খ্যদর্শন তাহাই বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।*

দুঃখের বিশ্লেষণ—জন্মমৃত্যু-জরাব্যাধি ও ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র

বুদ্ধদেব জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিরূপে ঐ দুঃখের বিশ্লেষণ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা বলিতে পারি না যে, তিনিই ঐ বিশ্লেষণের

* বাচস্পতিমিশ্র সাঙ্খ্যকারিকার প্রথম কারিকার ব্যাখ্যায় এই কথাটি অতি পরিস্ফুটভাবে বলিয়াছেন। দ্রষ্টব্য—যোগদর্শন ভাষ্য ২-১৫।

প্রথম কর্ত্তা; কারণ তাঁহার বহুপূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণ্যগ্রন্থসমূহে তাহার ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। নিম্নে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত হইতেছে:—

"ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকঃ"—
ছান্দোগ্য, ৪৮-৪-১।

"ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং"—
ছান্দোগ্য, ৭-২৬-২।

"জরাং মৃত্যুমত্যেতি"—
বৃহদারণ্যক, ৩-৫-১।

"ন জরয়া বিভেতি"—কঠ, ১-১২।

"ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ"—
শ্বেতাশ্বতর, ২-১২।

"জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্"—
গীতা, ১৩-৯।

"জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে"—
গীতা, ১৪-২০।

সর্ব্বশেষে গীতা হইতে উদ্ধৃত পঙ্ক্তি দুইটির সহিত বুদ্ধদেবের উক্তির কোন ভেদ নাই।

ইহা দ্বারা বুঝা যাইবে, বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব হইতেই বিশ্বের যে মহতী চিন্তা ভারতের ভাবুকগণের হৃদয়ে যেরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাঁহারা জগতের জন্মমৃত্যু-জরাব্যাধিরূপ দুঃখ দর্শন করিয়া তাহার অপনোদনের জন্য যেরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, বুদ্ধেরও হৃদয়ে, তাহা সেইরূপ উদিত হইয়াছিল। তাঁহাদের উভয়েরই চিন্তার প্রথম সোপানে এইরূপে কোন ভেদ ছিল না।

আর্য্যসত্য-চতুষ্টয়ের মূল—চিকিৎসা ও যোগশাস্ত্র

আমরা দেখিয়াছি বুদ্ধদেব "আর্য্যসত্য-নাম দিয়া তাঁহার ধর্ম্মের চারিটি মূলসূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধের উপায় বা পথ। এ বিষয়েও তাঁহার নূতনত্ব দেখা যায় না। চিকিৎসা-বিদ্যায় যাহা প্রসিদ্ধ ছিল, তাহাই তিনি অধ্যাত্মবিদ্যায় গ্রহণ করিয়াছেন। চিকিৎসা-শাস্ত্রকে চারিভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা—রোগ, রোগের হেতু, আরোগ্য (অর্থাৎ রোগের ক্ষয়) ও ঔষধ (অর্থাৎ রোগক্ষয়ের উপায়)। যোগশাস্ত্রও এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে, তাহারও চারিটি মূলসূত্র:—সংসার, সংসারের হেতু, মোক্ষ (অর্থাৎ সংসার হইতে মুক্তি) ও (সেই) মোক্ষের উপায়। পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্যকার ব্যাসদেব (২-১৫) এই কথাগুলি নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

"যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহং—রোগঃ, রোগহেতুঃ, আরোগ্যং, ভৈষজ্যমিতি, এবমিদমপি শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমেব; তদ্যথা—সংসারঃ, সংসারহেতুঃ, মোক্ষঃ, মোক্ষোপায় ইতি। তত্র দুঃখবহুলঃ সংসারো হেয়ঃ, প্রধান পুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ, সংযোগস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানং হানোপায়ঃ সম্যগ্ দর্শনম্।"*

মধ্যম পথ

বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্মসাধনায় "মজ্ঝিমা পটিপদা" অর্থাৎ মধ্যম পথ আবিষ্কার করিয়াছেন প্রসিদ্ধি আছে। তিনি বলিয়াছেন (মহাবগ্‌গ, ১-৬-১৭) দুইটি অন্ত অর্থাৎ শেষ-কোটি আছে, একটি "কামেসু কামসুখল্লিকানুযোগো" অর্থাৎ বিষয়োপভোগে লী

* Kern's Manual of Buddhism.

হইয়া নিযুক্ত থাকা, আর অপরটি "অত্তকিলমথানুযোগো" অর্থাৎ কৃচ্ছ্র সাধনা দ্বারা আত্মাকে ক্লান্ত করিতে নিযুক্ত থাকা। এই দুই কোটিই পরিত্যাগ করিয়া ইহাদের মধ্য পথ অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ ভোগ-বিলাসেও আসক্ত হইয়া থাকিতে হইবে না, আবার কঠোর অনিদ্রা অনাহার ইত্যাদি কৃচ্ছ্র সাধনা করিয়া আত্মাকে কষ্টও দিতে হইবে না। ইহার মাঝা-মাঝি চলিতে হইবে। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় সাহিত্যেই ঐ উভয়বিধ ভাবের উল্লেখ বহু স্থানে বর্ণিত রহিয়াছে। তৎসমুদয়ের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। আমাদিগকে এখানে ইহাই দেখিতে হইবে যে, এই যে "মধ্যম পথের" বার্ত্তা, তাহা কি বুদ্ধদেবই ভারতের সাধনা-ক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছেন, অথবা তাঁহার পূর্ব্বেই ঐ বাণী প্রচারিত হইয়াছিল, তিনি যুক্তিযুক্ত বোধে তাহাই শিষ্যদের নিকট পুনর্ব্বার ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র? আমাদের বোধ হয় দ্বিতীয় পক্ষই সঙ্গত। বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে (৭-২৩, ২৪) আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটী পঙ্‌ক্তি দেখিতে পাই—

বৌদ্ধায়নধর্ম্মসূত্র

"আহিতাগ্নিরনড্বাংশ্চ ব্রহ্মচারী চ তে ত্রয়ঃ।
অশ্নন্ত এব সিধ্যন্তি নৈষাং সিদ্ধিরনশ্নতঃ॥
গৃহস্থো ব্রহ্মচারী বা যোঽনশ্নংস্তু তপশ্চরেৎ।
প্রাণাগ্নিহোত্রলোপেন অবকীর্ণী ভবেৎ তু সঃ॥'

এই শ্লোক দুইটি অনশনে তপশ্চর্য্যার বিরুদ্ধে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৭ ৫,৬) উক্ত হইয়াছে—

গীতা

"অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥"
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥"

ইহার একটু পরেই (১৭-১৯) আবার উক্ত হইয়াছে—

"মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্॥"

উপবাসাদি দ্বারা আত্মপীড়ায় তপশ্চর্য্যা যে নিন্দনীয় তাহা ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। তবে কিরূপে সাধনা করিতে হইবে? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এ বিষয়ে নীরব নহে; যাহা বলিবার তাহা বলা হইয়াছে (৬-১৬,১৭)—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥"

ইহাই ত মধ্যমপথ। আহারাদি অতিরিক্ত করা আর না করা, ইহাদের মাঝামাঝি চলিলেই যোগ হয়। বুদ্ধদেবের উক্তির সহিত ইহার কোন পার্থক্য নাই। গীতার আবির্ভাব বুদ্ধের অনেক পূর্ব্বে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব বলিতে হয় বৌদ্ধধর্ম্মের এই মধ্যপথের বার্ত্তা নবীন নহে।

অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা

বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের আর একটি প্রসিদ্ধ তত্ত্ব এই যে, তিনি এই দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুকেই "অনিত্য," "দুঃখ" ও "অনাত্মা" বলিয়াছেন। সে সম্বন্ধে তাঁহার

উপদেশ এইরূপ,—তিনি ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন (মহাবগ্‌গ, ১-৬-৪২) :—

"ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর, রূপ * নিত্য কি অনিত্য ।"

"ভগবন্‌ (ভদন্ত), অনিত্য ।

"আচ্ছা, যাহা অনিত্য, তাহা দুঃখ না সুখ, (অর্থাৎ তাহা দুঃখকর না সুখকর) ?"

"দুঃখ ।"

"আচ্ছা, যাহা অনিত্য ও দুঃখ, এবং বিবিধরূপে পরিণাম বা পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হওয়াই যাহার স্বভাব, তৎসম্বন্ধে এরূপ মনে করা কি সঙ্গত যে, 'ইহা আমার,' 'ইহা আমি', 'ইহা আমার আত্মা' ?"

"না ভগবন্‌ ।"

তিনি আরও বলিয়াছেন, (মহাবগ্‌গ ১-৬-৩৮):—

"ভিক্ষুগণ, রূপ অনাত্মা (অর্থাৎ রূপ আত্মা নহে)। হে ভিক্ষুগণ, রূপ যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে ইহা পীড়ার জন্য হইত না, এবং ইহার নিকটে আমাদের এই সঙ্কল্প পূর্ণ হইত যে, 'আমার সম্বন্ধে রূপ এই প্রকার হউক, অথবা যেন এই প্রকার না হয়'। কিন্তু হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু রূপ আত্মা নহে, সেইজন্য ইহা পীড়ার জন্য হয়, এবং ইহার নিকটে আমাদের এই সঙ্কল্প পূর্ণ হয় না যে, 'রূপ এই প্রকার হউক, বা যেন এই প্রকার না হয়' ।"

এই যে, "অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা"র কথা, ইহাও বুদ্ধদেবের নিজের চিন্তাপ্রসূত নহে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের ইহা একটি সাধারণ উক্তি। প্রায় সমস্ত দর্শনেই এই জগৎ-প্রপঞ্চকে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা বলা হইয়াছে। যাহারা অবিদ্যাগ্রস্ত তাহারাই ইহাকে নিত্য, সুখ ও আত্মা বলিয়া মনে করে, এবং তাহাতে তাহাদের কষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে পাতঞ্জল-দর্শনে (২-৫) যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা এই :—

"অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যাশুচি-
সুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা ।"

অনিত্যে নিত্যবুদ্ধি, অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, দুঃখে সুখবুদ্ধি ও অনাত্মায় আত্মবুদ্ধির নাম অবিদ্যা। †

অশুচি

পাতঞ্জলদর্শনে এখানে একটি অতিরিক্ত "অশুচি"র কথা দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম তাহাও গ্রহণ করিয়াছে। বৌদ্ধগণের "অশুচিভাবনা" বা "কায়গতা সতি" (কায়গতা স্মৃতি) অতি প্রসিদ্ধ।

* 'রূপ' শব্দে এখানে 'রূপস্কন্ধ' অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূত, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহ। রূপস্কন্ধবৎ অন্যান্য স্কন্ধকেও এইরূপ অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা বুঝিতে হইবে।

† এ স্থলে আমরা এই সূত্রটির ভাষ্য হইতে উদ্ধৃত করিব—

অনিত্যে কার্য্যে নিত্যখ্যাতিঃ তদ্‌যথা ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবা সচন্দ্রতারকা দ্যৌঃ, অমৃতা দিবৌকস ইতি। তথা অশুচৌ পরমবীভৎসে কায়ে......শুচিখ্যাতির্দৃশ্যতে— নবেব শশাঙ্কলেখা কমনীয়েয়ং কন্যা, মধ্বমৃতাবয়বনির্ম্মিতেব চন্দ্রং ভিত্ত্বেব নিঃসৃতা...। ভবতি চৈবমশুচৌ শুচিবিপর্য্যাস প্রত্যয়ঃ ...তথা দুঃখে সুখখ্যাতিং বক্ষ্যতি..."দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ" (২-১৫)...তথা অনাত্মনি আত্মখ্যাতিঃ বাহ্যোপকরণেষু চেতনাচেতনেষু ভোগাধিষ্ঠানে বা শরীরে পুরুষোপকরণে বা মনসি অনাত্মন্যাত্মখ্যাতিরিতি।"

অবিদ্যা

বুদ্ধদেব "অবিদ্যা"কে সর্ব্ববিধ দুঃখের 'নিদান' বা মূলকারণ বলিয়াছেন। মূল অবিদ্যা হইতেই অবান্তর কারণপরম্পরায় ক্রমশঃ "এতস্স কেবলস্স দুক্খক্খন্ধস্স সমুদয়ো হোতি" (মহাবগ্গ, ১-১-২)—এই সমগ্র দুঃখরাশির সমুদ্ভব হয়, এবং অবিদ্যার নিরোধেই ক্রমশঃ সমস্ত দুঃখরাশির নিরোধ হইয়া থাকে। ইহাও আমাদের দর্শনশাস্ত্রের * বিশেষতঃ বেদান্তের গোড়ার কথা। অবিদ্যার প্রকার-ভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র।

নির্ব্বাণ—তৃষ্ণাক্ষয়

বুদ্ধদেব বলিয়াছেন কাম বা তৃষ্ণার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগেই দুঃখের নিরোধ হয়, এবং এই তৃষ্ণার ক্ষয়েরই নাম নির্ব্বাণ। এইজন্য নির্ব্বাণের একটি নাম "তণ্হক্ষয়" (তৃষ্ণাক্ষয়), এবং আর একটি নাম "অনালয়"। আলয়-শব্দের অর্থ কাম বা তৃষ্ণা, অতএব "অনালয়" বলিতে তৃষ্ণার অভাব বা তৃষ্ণাক্ষয়ই বুঝিতে হয়। বুদ্ধদেবের এ চিন্তাও নূতন নহে। তাঁহার বহুপূর্ব্ব হইতেই ভারতে এই তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রমাণ-স্বরূপ দুই একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে :—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য
হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম
সমশ্নুতে॥
বৃহদারণ্যক, ৪-৪-৭ ; কঠ, ৬-১৪।

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি
নিঃস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥"
গীতা, ২-৭১।

হিন্দুশাস্ত্রের আদি-মধ্য-অন্ত সর্ব্বত্রই এই বাণী অতি প্রাচীনকাল হইতেই উদ্ঘোষিত হইয়া আসিতেছে, এ কথা অতি প্রসিদ্ধ।

বৈদিক যাগযজ্ঞ ও বেদের প্রামাণ্য

বুদ্ধদেব হিংসাশ্রিত বৈদিক যাগযজ্ঞকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন (কূটদন্তসুত্ত, দীঘ ৫-১৮), এবং বেদের প্রামাণ্যও তিনি স্বীকার করেন না (অম্বট্‌ঠসুত্ত, তেবিজ্জসুত্ত)। কিন্তু এ বিষয়েও তাঁহার বাণী নূতন নহে, তাঁহাকে প্রথম বলা যাইতে পারে না। ইহার বহুপূর্ব্বে সাঙ্খ্যদর্শনকার মহর্ষি কপিল তীব্রযুক্তি-প্রভাবে বৈদিক কর্ম্মসমূহকে নিন্দা করিয়া দুঃখ হইতে সর্ব্বতোভাবে নিষ্কৃতিলাভের বিভিন্ন পন্থার অন্বেষণ করিয়াছেন। বৈদিক কর্ম্মসমূহকে হেয় বলিয়া প্রতিপাদন করায় বেদেরও প্রামাণ্য তাঁহার নিকটে হেয় হইয়াছে। তবে স্থানে স্থানে তিনি নিজের সিদ্ধান্তকে বৈদিক বাক্যের দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। ইহাতে বুঝিতে হয় কপিল কর্ম্মকাণ্ড-অংশেই বেদকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, জ্ঞানকাণ্ড-অংশে নহে। † আমরা দেখিতে

* "তদস্য মহতো দুঃখসমুদয়স্য প্রভববীজমবিদ্যা।"—পাতঞ্জলদর্শন-ব্যাসভাষ্য, ২-১৫।
"এষা চতুষ্পদা ভবত্যবিদ্যা মূলমস্য ক্লেশসন্তানস্য কর্ম্মাশয়স্য চ বিপাকস্য।" ঐ, ২-৫।

† এই বিষয়টি আমার "ভারতীয় নাস্তিক দর্শনের ইতিবৃত্ত" নামক সন্দর্ভে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে (চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি কোম্পানী প্রকাশিত 'অনুসন্ধান' গ্রন্থ ২৫-২৭)।

পাই মহর্ষি কপিলেরও পূর্ব্বে বৈদিক কর্ম্ম-সমূহের প্রতি লোকে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। মুণ্ডক-উপনিষদে (১-২০৭) উক্ত হইয়াছে—

"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টা-
দশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরা-
মৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥"

যাহাদের মধ্যে নিকৃষ্ট কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, সেই অষ্টাদশজনযুক্ত (ঋত্বিক্ ১৬+যজমান +১+যজমানপত্নী ১=১৮) যজ্ঞরূপ প্লবসমূহ অদৃঢ়। যে সকল মূঢ় ইহাকে শ্রেয়ঃ বলিয়া অভিনন্দন করে, তাহারা পুনর্ব্বার জরা ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

বৈদিক কর্ম্মের নিন্দাসূচক আরো অনেক শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়, অনাবশ্যক মনে করিয়া এখানে অধিক উদ্ধৃত হইল না। বেদবাদিগণ অবশ্যই এই সমস্ত কর্ম্মনিন্দার একটা সমাধান করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও, এই সমস্ত বাক্যে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সকল কর্ম্মবিধির উপর সেই সময়ের কতকগুলি লোকের আস্থা ছিল না। এই অশ্রদ্ধাভাবের ছায়া ঋগ্বেদেও পাওয়া যায় (১০-৮২-৭):—

"ন তং বিদাথ য ইমা জজান
অন্যদ্ যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতাজল্প্যা
অসুতৃপ উকৃথশাসশ্চরন্তি॥"

কে এই প্রজাসমূহকে সৃষ্টি করিল তাঁহাকে ইঁহারা জানেন না, তাঁহার সহিত যে বিচিত্র ভেদ আছে, নীহারের দ্বারা ইহারা আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন এবং স্তোত্র উচ্চারণ করিয়া কেবল ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করিতে করিতে বিচরণ করিতেছেন।

বৈদিক কর্ম্মসমূহ লক্ষ্য করিয়াই আমাদের শাস্ত্রে স্থানে স্থানে বেদের নিন্দাও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই কয়টি পঙ্‌ক্তি সকলেই জানেন—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥ ২-৪২
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন ২-৪৫।

বৈদিক সাহিত্যেরই দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতিপাদন করিতে পারা যায় যে, যে স্থলে যজ্ঞে পশুবধ করা হইত, সেই স্থলে পশুর পরিবর্ত্তে পুরোডাশ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে, অথচ পশুবধ না করার জন্য ফলের কোন হানি হয় না। * বৈদিক সাহিত্যে স্পষ্ট একটা ধারা দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্ম্মবিধি হিংসাবর্জ্জিত হইয়া ক্রমশই সাত্ত্বিক হইয়া উঠিতেছে। পরবর্ত্তী সাহিত্যে ত এই ভাব অতিপরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। † এখানে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি:—

"দ্রব্যযজ্ঞৈর্যক্ষ্যমাণং দৃষ্ট্বা ভূতানি বিভ্যতি।
এষ মাকরুণো হন্যাদতজ্জ্ঞোহ্যসুতৃব্ ধ্রুবম্॥"
৭-১৫-১০।

জ্ঞান-যজ্ঞ

দীঘনিকায়ের অন্তর্গত কূটদন্তসুত্তে (দীঘ, ৫-১৮) রাজা মহাবিজিতের যজ্ঞ বর্ণনা করিয়া বুদ্ধদেব বলিতেছেন—"হে ব্রাহ্মণ, সেই যজ্ঞে গোবধ হয় নাই, ছাগবধ হয়

* "পশুই বা এষ আলভ্যতে যৎ পুরোডাশঃ—শতপথ ব্রাহ্মণ, ১-২-১-৫—৭।
† বঙ্গদর্শনে আমার লিখিত "দেবোপহারের ক্রমোৎকর্ষ" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

নাই, মেষবধ হয় নাই, কুক্কুটবধ হয় নাই, শূকরবধ হয় নাই, এবং অন্যান্য প্রাণিহত্যাও হয় নাই। আবার যূপের জন্য বৃক্ষ ছেদন করা হয় নাই, বা আসনের জন্য কুশও ছেদন করা হয় নাই। সেখানে ভৃত্য, কিঙ্কর ও কর্ম্মকরদিগকে দণ্ডের দ্বারা তর্জ্জনও করিতে হয় নাই, এবং ভয়ও দেখাইতে হয় নাই, তাহারা অশ্রুমুখ হইয়া রোদন করিতে করিতে কার্য্য করে নাই, যাহা তাহারা ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহা করিয়াছিল, এবং যাহা ইচ্ছা করে নাই, তাহা করে নাই। সেই যজ্ঞ, ঘৃত তৈল নবনীত ও দধি মধু গুড়েরই দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল।' বুদ্ধদেব এইরূপে হিংসাশ্রিত যজ্ঞ অপেক্ষা অহিংসাশ্রিত যজ্ঞের উপাদেয়তা বর্ণনা করিয়া উত্তরোত্তর দানাদিরূপ উৎকৃষ্ট যজ্ঞসমূহ দেখাইয়া শেষে বলিয়াছেন যে, শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞারূপ যজ্ঞই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং মহাফলপ্রদ। ব্রাহ্মণ কূটদন্ত মহাযজ্ঞ করিবার জন্য বহু পশু সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ভগবানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট যজ্ঞের কথা শুনিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন—"আমি আপনার শরণ লইলাম, আমি এই সপ্তশত বৃষ, সপ্তশত বৎসতর, সপ্তশত বৎসতরী, সপ্তশত ছাগ এবং সপ্তশত মেষ মোচন করাইয়া দিতেছি, আমি ইহাদিগকে জীবন প্রদান করিলাম, ইহারা হরিদ্বর্ণ তৃণ ভক্ষণ করুক ও শীতল জল পান করুক। শীতল পবনে ইহাদের শরীর শীতল হউক!

বুদ্ধদেব বিবিধ যজ্ঞের কথা বলিয়া শেষে শীল-সমাধি প্রজ্ঞাযজ্ঞের কথা বলিয়াছেন। শীল হইলে সমাধি ও সমাধি হইলে প্রজ্ঞা লাভ হয়। এইরূপে প্রজ্ঞাযজ্ঞই তাঁহার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। তাঁহার এই কথাটিকেও আমরা নূতন বলিতে পারি না। বুদ্ধদেব যেমন প্রথমতঃ দ্রব্যযজ্ঞের কথা আরম্ভ করিয়া শেষে প্রজ্ঞাযজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও তাহা সেইরূপ উক্ত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি পঙ্‌ক্তি (৪-২৮, ৩২,৩৩) ইহা সমর্থন করিবে :—

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥"

* * *

"এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥"

এই প্রসঙ্গেই ইহার পরে উক্ত হইয়াছে (৪-৩৮,৩৯) :—

"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।"
"জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, বলা বাহুল্য, তাহার মূল উৎস উপনিষৎসমূহে রহিয়াছে।

অনীশ্বরবাদ

বৌদ্ধধর্ম্ম অনীশ্বর। ঈশ্বরোপাসনা না করিলেও মুক্তি পাওয়া যায়, নির্ব্বাণ হইয়া থাকে। ঈশ্বর থাকুন বা নাই থাকুন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। বৌদ্ধধর্ম্মে এই যে, ঈশ্বরের অস্বীকার, তাহাও বুদ্ধদেবের স্বকীয় চিন্তায় হয় নাই। সাঙ্খ্য ও মীমাংসা-দর্শন তাহা পূর্ব্ব হইতেই গাহিয়া আসিতে-ছিলেন।

কর্ম্মবাদ

বৌদ্ধধর্ম্মের কর্ম্মবাদটিকে অনেকে ইহার বিশেষত্ব দেখাইতে গিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। সেটি এই :—

"কম্মস্সকোম্হি কম্মদায়াদো কম্মযোনি কম্মবন্ধু কম্মপটিসরণো, যং কম্মং করিস্সামি কল্যাণং বা পাপকং বা তস্স দায়াদো ভবিস্সামি।"

এই বাক্যটি অঙ্গুত্তরনিকায়, নেত্তিপকরণ, ইত্যাদি বহুস্থানেই আছে। ইহার অর্থ—কর্ম্মই আমার নিজের, আমি কর্ম্মের অর্থাৎ কর্ম্মফলের উত্তরাধিকারী, কর্ম্মই আমার উৎপত্তির কারণ, কর্ম্মই আমার বন্ধু, কর্ম্মই আমার শরণ, কল্যাণ হউক বা পাপ হউক, যে কর্ম্ম করিব, তাহারই আমি উত্তরাধিকারী হইব, তাহারই আমাকে ফলভোগ করিতে হইবে।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে ত এ কর্ম্মবাদ অতিপ্রসিদ্ধ, বৈদিক কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন" (বৃহদা, ৩-২-১৩; ৪-৪-৫), "লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ" (গীতা, ৩-৯) ইত্যাদি কথা সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে সকলেরই জানা।

মৈত্রী প্রভৃতি ভাবনা

সমস্ত ভূতকে মিত্রের ন্যায় চিন্তা করার নাম মৈত্রী ভাবনা। বৌদ্ধধর্ম্মে ইহা সুপ্রসিদ্ধ ও অতিরমণীয়। কিন্তু ইহাও বুদ্ধের নিজোদ্ভাবিত নহে। বেদের সংহিতার সময় হইতে এই ভাব ভারতের ভাবুকবৃন্দের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। ঋষি বলিতেছেন (বাজসনেয়িসংহিতা)— "মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।" সংহিতার পর হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে ও সাহিত্যে এই ভাব আরও বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। "প্রবাসী"তে প্রকাশিত "বিশ্বমৈত্রী" নামক প্রবন্ধে এ কথাটি আমি সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বৌদ্ধধর্ম্মে মুদিতা, করুণা ও উপেক্ষা নামে আরও কয়টি ভাবনা আছে। এই ভাবনাগুলিও বুদ্ধদেবের নিজের উদ্ভাবিত নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেই ইহাদের উদ্ভব হইয়াছিল। এ স্থলে সংক্ষেপে পাতঞ্জল-দর্শনের এই সূত্রটি (১-৩৩) উদ্ধৃত করিতে পারা যায় :—

"মৈত্রী-করুণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।"

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে

এইরূপ আরো অনেক বিষয় দেখাইতে পারা যায় যাহা পূর্ব্বপ্রচলিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম হইতে বুদ্ধদেব গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা এ কথা বলা হইতেছে না যে, বৌদ্ধধর্ম্ম ভাল কি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ভাল। সে কথা স্বতন্ত্র। আমি এখানে ইহাই বলিতে যাইতেছি যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কোথায়? কিসের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? আমি বলিব সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেই ইহার প্রতিষ্ঠা, তাহাতেই ইহা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। "ভারতের ধর্ম্মচিন্তা-তটিনী-সংহিতা পর্ব্বতশ্রেণী হইতে আত্মলাভ করিয়া ব্রাহ্মণনামক উপলমালায় স্খলিত হইতে হইতে, প্রসারলাভ করিতে করিতে যখন আরণ্যক-উপনিষদ্ নামক গম্ভীর কন্দর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত, তখন তাহার জলোচ্ছ্বাস

প্রবল ও বেগ সুভীষণ। তাহা কল কল শব্দে চারিদিক্ মুখরিত করিয়া, দুই কূল প্লাবিত করিয়া, প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে—বহুদূর চলিয়াছে। তাহার পর ধারাভেদ হইল; এক ধারা ছিল, তখন তাহা ধারাত্রিতয়ে পরিণত হইল। তিন ধারা তিন বিভিন্ন দিকে প্রধাবিত হইল। বিভিন্ন প্রকৃতির সংসর্গে তাহাদের প্রকৃতিও বিভিন্ন হইয়া উঠিল। এজন্য তাহাদের নামও বিভিন্ন হইল। প্রধান ধারার পূর্ব্ব নামই থাকিল, তাহা ব্রাহ্মণ্য বলিয়া খ্যাত, অপর দুই ধারার একটির নাম বৌদ্ধ, অপরটির নাম জৈন।"* ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বৌদ্ধধর্ম্ম হঠাৎ আকাশ হইতে নিপতিত বা সমুদ্র হইতে উৎপতিত হয় নাই। যে ধর্ম্ম-চিন্তা পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল, গৌতম বুদ্ধকে পাইয়া তাহারই একটি স্বতন্ত্র প্রকাশ হইয়াছে মাত্র,—তাহা একটি বিভিন্ন আকার গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। বলা বাহুল্য, এই প্রকাশে বা বিভিন্ন আকার-গ্রহণে চিন্তাপ্রবাহ বিপুলভাবে সহায়তা করিয়াছে। ইহাও বলা বাহুল্য যে, যদি সেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-প্রবাহের অবস্থার মধ্যে বুদ্ধদেব পতিত না হইতেন, তাঁহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি সেইরূপ না হইত, তাহা হইলে বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মমতকে আমরা যেরূপ দেখিতেছি, সেইরূপ দেখিতে পাইতাম না। যেমন প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মই নানা অবস্থার মধ্যে পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইতে হইতে পৌরাণিক ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে, এবং বহুভেদবিশিষ্ট হইলেও ইহাকে আমরা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মেরই অঙ্কে স্থান প্রদান করিয়া থাকি, বৌদ্ধধর্ম্মও সেইরূপ ঐ মূল ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিভিন্ন পরিবর্ত্তন, এবং ইহাকেও আমাদের ন্যায়তঃ তাহারই অঙ্কে স্থান প্রদান করা উচিত।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী।

জার্ম্মাণ পণ্ডিত হিকেলের মতবাদ

যে যাহা যতদূর জানে তাহাই শিখাইতে পারে। গ্রীসের সোফিষ্টগণ, এপিকুরিয়ানগণ, প্লেটোনিষ্টগণ যতদূর জানিতেন তাহাই জগৎকে শিখাইতেন। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত লোকশিক্ষা-প্রণালী পণ্ডিতগণের আপনাদের জ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহারা যাহা মানিতেন না তাহা কখনই শিক্ষাদান করিতেন না। কিন্তু ইউরোপের মধ্যযুগের লোকশিক্ষার ভার প্রধানতঃ পাদরি জেস্থটগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এজন্য দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে তাঁহাদের শিক্ষার বিরোধ ঘটিয়াছিল। ডেকার্টে, স্পিনোজা প্রভৃতি দার্শনিকগণ যে সব মত প্রচার করিয়াছিলেন, জন-সাধারণের মধ্যে সে মত প্রচলিত হইতে পারে নাই। পাদরিগণ পোপের ও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জনসাধারণকে তত্ত্বজ্ঞানীর ধ্যানলব্ধ অমৃত হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের অত্যাচারে যাহা

* শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রীর মাধ্যমিক দর্শন (গৃহস্থ, মাঘ ১৩১৯)।

ধ্রুব স্থূল প্রত্যক্ষ সত্য—বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কৃত সত্য—তাহাও শিক্ষাক্ষেত্রের ত্রিসীমায় পৌঁছিতে পাইত না। বরং যাঁহারা সেই সব তত্ত্ব উচ্চারণ করিয়াছেন তাঁহারা ইহাদের পাশবিক অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। গ্যালিলিওকে জীবনের অধিকাংশ কাল বন্দী অবস্থায় কাটাইতে হয়, স্পিনোজাকে অখ্যাত অজ্ঞাত অবস্থায় অতি দীনভাবে জীবন যাপন করিতে হয়।

কিন্তু সত্য কখনও চিরদিন পরাজিত থাকিতে পারে না। "সত্যমেব জয়তে" সত্যের জয় হইবেই। সেই জন্য ক্রমশঃ চিন্তার স্বাধীনতা দেখা দিল। ফরাসি রাষ্ট্র-বিপ্লব এই স্বাধীন চিন্তারই ফল এবং তাহারই ভীষণ আঘাতের দ্বারা নব্য ইউরোপের মন ধর্ম্মধ্বজীদের মতবাদের শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল এবং চতুর্দ্দিকে নবজাত শিশুর নব স্বাধীনতানুভবের ন্যায় আনন্দে চতুর্দ্দিকে হস্তপদাদি সঞ্চালন করিয়া পুরাতনকে আঘাতের পর আঘাত করিয়া ধূলিসাৎ করিতেছিল। তখনকার জ্ঞানে বিজ্ঞানে মন্ত্রণাসভায় বক্তৃতামঞ্চে সর্ব্বত্রই কেবল একই ধ্বনি—ধ্বংসের জয়! মৃত্যুর জয়! ভবিষ্যৎ জগতের জন্য স্থান কর! এমন কি সেই সময়কার লোকশিক্ষা-রঙ্গভূমির প্রধান-নায়ক রুষো চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন—"Do just the opposite of what has been done and you will do right." অর্থাৎ "চিরগত প্রথার বিপরীতাচরণ কর, তাহা হইলে কর্ত্তব্য করা হইবে।"

কিন্তু অশান্তি এবং পাগলামি ক্ষণিকের, শান্তিই চিরদিনের। তত্ত্বানুসন্ধান কখনই চিরদিন পাগলামির মধ্যে থাকিতে পারে না। তাই সে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা এখন শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে; কিন্তু যিনি আসিবার পূর্ব্বে ইউরোপীয় জগৎ এক প্রকার আপনাকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছে, তিনি আসিয়াছেন। চিন্তার স্বাধীনতার জয় হইয়াছে এবং পরীক্ষামূলক জ্ঞানের আলোক রাজাসনে ইউরোপের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছে।

যখন পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয় তখন সে নানাদিক হইতে আপনার শক্তি প্রকাশ করে। নব জাগরণের পর হইতে ইউরোপীয় চিন্তা যে ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করে, লোকশিক্ষার প্রণালীও সেইভাবে অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বে পাদরিগণ ও জেসুইটগণের হাতেই প্রধানতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষার ভার ছিল। তাঁহারা আপনাদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যেরূপ শিক্ষা দিতেন তাহাই জনসাধারণ শিক্ষা করিত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তখনও এতদূর বিশাল হয় নাই যাহাতে জনসাধারণে তাহাতে বিদ্যালাভ করিতে পারে। পূর্ব্বকালে গ্রীস ও রোমে উন্মুক্ত প্রান্তরে বক্তৃতা দেওয়ার প্রথা ছিল। এজন্য জনসাধারণেও কতকটা জ্ঞানিগণের জ্ঞানের অংশ লাভ করিতে সমর্থ হইত। তাহার পর বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের আমদরবারী প্রথায় মধ্যযুগে লোকশিক্ষা নিতান্ত ভাগ্যবানের ভাগ্যেই ঘটিত।

পরে ক্রমশঃ ক্রমশঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ও শিক্ষাকেন্দ্রের প্রসার ও সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকশিক্ষার সুবিধাও প্রসারিত হইতে

লাগিল। কিন্তু তথাপি এই সকল শিক্ষা-কেন্দ্রে, চিন্তার স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে ফুটিতে পায় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমশঃ নানামতের দ্বারা কণ্টকিত হইয়া সাম্প্রদায়িক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরেও বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া চিন্তার স্বাধীনতাকে অনেকটা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

বাস্তবিক পক্ষে বিজ্ঞান ঊনবিংশ শতাব্দীর শিশু, সেইজন্য সে এতদিন আপনার উন্নতি লইয়াই ব্যস্ত ছিল। জনসাধারণ বিজ্ঞানের উন্নতির ফলভোগ করিতেছিল বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা আপনাদের আবিষ্কৃত সত্যানুসারে লোকশিক্ষার ব্যবস্থায় তত মনোনিবেশ করেন নাই। রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বিজ্ঞানোন্নতির বাহ্যফল জনসাধারণে এতদিন ভোগ করিতেছিল বটে; কিন্তু মানবের সামাজিক, রাজনৈতিক, লোক-ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, চরিত্রনৈতিক, দার্শনিক প্রভৃতি উচ্চতর ব্যাপারগুলির উপর বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়াগুলি কি কার্য্য করিয়াছে ও করিতেছে তাহার বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি এতদিন পতিত হয় নাই। লোকশিক্ষা প্রায় সেই পুরাতন অবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া জীবতত্ত্ববিৎ ওয়ালেস দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"Compared with our astounding progress in physical science and its practical application, our system of government, administration, justice, and of national education, and our entire social and moral organisation remain in a state of barbarism." "বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি সত্ত্বেও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে, বিচারকার্য্য বিষয়ে, লোকশিক্ষা, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি প্রভৃতি মানব-জীবনের সমস্ত উচ্চতর ব্যাপারে নব ইউরোপ এখনও সেই প্রাচীন বর্ব্বরতার মধ্যেই রহিয়াছে।"

বর্ত্তমান প্রবন্ধে লোকশিক্ষা বিষয়ে যে মহাত্মার মতামত আলোচিত হইবে, তিনি জর্ম্মান্‌দেশের একজন প্রধান জীবনতত্ত্ববিদ্। কিন্তু তিনি কেবল মাত্র বিজ্ঞানালোচনায় কালক্ষেপ না করিয়া যাহাতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-গুলি এবং উহারা মানবের নৈতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের উপর কি কার্য্য করিয়াছে এবং করিতে পারে, এই সকল কথা লইয়া বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনার মতগুলি যাহাতে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া সাধারণের জীবনের উপর কার্য্য করে তাহারই চেষ্টায় ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের নানাস্থানে জনসমাজের মধ্যে বক্তৃতা করিয়াছেন।

এই সমস্ত বক্তৃতার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, কেবল বৈজ্ঞানিক সত্যানুসারে মানবের সমস্ত জীবন নৈতিক, সামাজিক, ব্যবহারিক (legal), রাষ্ট্রনৈতিক প্রভৃতি যাবতীয় বৃহৎ ব্যাপারে, কোন্ নিয়মানুসারে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত এ বিষয়ে সাধারণের মধ্যে অনুসন্ধিৎসার জাগরণ ও বিজ্ঞানের সারসত্যগুলি প্রচার করা। তাঁহার মতে বৈজ্ঞানিকগণ আপনাদের অনুসন্ধানের ও পরীক্ষার কোটরে আপনাদিগকে মানবসমাজবহির্ভূত অন্য জগতের জীব করিয়া রাখিয়া অত্যন্ত

অন্যায় কার্য্য করিতেছেন। সাধারণের প্রতি তাঁহাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা তাঁহারা বিজ্ঞানের আলোকের মধ্যে আপনাদিগকে অধিষ্ঠিত রাখিয়া চতুর্দ্দিকস্থ কুশিক্ষাসম্ভূত অজ্ঞান ও দুঃখের বিষয়ে উদাসীন রহিয়াছেন। মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য বিষয়ে যে সমস্ত অবৈজ্ঞানিক ধারণা সাধারণের মধ্যে রহিয়াছে এবং যে সমস্ত ভুল ধারণা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি এবং ধর্ম্মমন্দির দ্বারা কতকটা স্বার্থসিদ্ধি কতকটা বা অজ্ঞতার দরুণ পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার প্রয়োজন হইয়াছে। এই জন্য হিকেল এবং তন্মতাবলম্বী বহু পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানালোচনার নিঃসঙ্গত্ব পরিত্যাগ করিয়া লোকশিক্ষকের পদে ব্রতী হইয়াছেন। এবং তাঁহাদের চেষ্টায় বৈজ্ঞানিক প্রচারকগণ সাধারণ সভা, বিশ্ববিদ্যালয়গৃহ প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছেন।

তাঁহাদের চেষ্টায় বহুস্থানে বর্ত্তমান ইউরোপের লোকশিক্ষাকেন্দ্রে লোকশিক্ষা বিষয়ে নানারূপ বাক্‌বিতণ্ডা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। লোকশিক্ষা কোন্ আদর্শ অনুসারে হইবে তাহাই লইয়া মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক দার্শনিকগণ হিকেলের মতের পরিপোষক। কিন্তু সেই সঙ্গে কেল্‌ভিন, মর্‌গ্যান, লজ্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার মতের বিরোধী। তথাপি হিকেলের বৈজ্ঞানিকশিক্ষা-প্রচার জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইটালি, স্পেন, হলাণ্ড, রুষিয়া, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া প্রভৃতি দেশে বিদ্যুৎবেগে প্রবেশলাভ করিতেছে। এমন কি জোসেফ ম্যাকবি বলেন যে, তিনি হিকেল ও তাঁহার মতের বিষয়ে ওয়েলস্ ও স্কটলণ্ডের অতি সামান্য পল্লীতে বক্তৃতা করিবার সময় এত অধিক শ্রোতা পাইয়াছিলেন যে আর কোন গুরুতর বিষয়ে এত বড় জনতা হয় কি না সন্দেহ।

যাহাই হউক, যাহার লোকশিক্ষা সম্বন্ধে মতামত লইয়া ইউরোপে এত বড় গোলযোগ চলিতেছে সেই মতের বিষয়ে আমাদেরও আলোচনা করা উচিত। বঙ্গজীবনে সর্ব্ববিষয়ে নবযুগের আরম্ভের সঙ্গে লোকশিক্ষা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে। সেই প্রয়োজন বোধের ফলেই সাহিত্য-পরিষৎ, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ প্রভৃতির জন্ম। এবং সেইজন্য লোকশিক্ষা সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ মতামতের আলোচনার প্রয়োজন। আমাদের জনসাধারণকে কি ভাবে শিক্ষিত করিতে হইবে, কি ভাবে শিক্ষা দিলে আমাদের জাতীয় সভ্যতা জগতের সভ্যতার মধ্যে আপন স্থান করিয়া লইতে পারিবে এই বিষয়ে চিন্তা করা আলোচনা করা আমাদের বৈজ্ঞানিক দার্শনিক সাহিত্যিক রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক সকলেরই প্রয়োজন হইয়াছে। এখন কি আমরা ইউরোপের লোকশিক্ষাবিষয়ক নূতন মতগুলিকে বরণ করিয়া লইব, না সেই পুরাতন সাম্প্রদায়িক শিক্ষাকে পুনর্জীবিত করিব? এখন কি আমরা নূতনকে বরণ করিয়া বলিব "হে দুর্দ্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন নিষ্ঠুর নূতন

সহজ প্রবল '

জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দ্দিকে

বাহিরায় ফল—

পুরাতন-পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ,—
প্রণমি তোমারে !"

অথবা এখনও আমাদের প্রাণে
"গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্ব্বশেষ গান।"

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে নূতন যাহা তাহা সম্পূর্ণ নূতন নহে এবং যাহা পুরাতন তাহাও সম্পূর্ণ অতীত হইবার নহে। নূতনের মধ্যে পুরাতনকে পাইতেই হইবে। নূতন যাহা তাহাই পুরাতন হয় এবং আপন নির্দ্দিষ্ট কালে তাহাই আবার নূতন বেশে নূতন মহিমায় জাগিয়া উঠে। কেবল মাঝে মাঝে সকলকেই বলিতে হয়—

"ভেঙ্গে দাও তবে আজিকার সভা
আন নব রূপ আন নব শোভা
নূতন করিয়া লহ আর বার
চির পুরাতন মোরে।"

কিন্তু তথাপি নূতনের সহিত সম্পূর্ণ পরিচয় চাই, তাই আমাদের এই প্রবন্ধের অবতারণা। নূতনের সহিত সাবধানে পরিচিত না হইলে পাছে কোন দিন সে সহসা আপনার পরিপূর্ণ বলে আমাদের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া সম্পূর্ণভাবে সমস্ত ওলট পালট করিয়া দিবে এই ভয়েও অন্ততঃ তাহার সহিত মুখোমুখী হইয়া দাঁড়ান উচিত। সেইজন্য হিকেল প্রভৃতি নব্যতন্ত্রের নূতন শিক্ষার বিষয় আলোচনার অবতারণা করিয়াছি।

তাঁহার লোকশিক্ষা বিষয়ের মত বলিবার পূর্ব্বে কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁহার মতের কথা আলোচনা করিব। কারণ সেই বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলির মতের উপরই তাঁহার লোকশিক্ষাবিষয়ক মতটি প্রতিষ্ঠিত।

হিকেল প্রধানতঃ একজন জীবতত্ত্ববিৎ (Biologist)। ডারুইনের ক্রমবিকাশতত্ত্বের উপর তাঁহার বিশ্বরচনা সম্বন্ধে দার্শনিক মতটি প্রতিষ্ঠিত। তিনি বিশ্বের মূলকারণের নাম দিয়াছেন—substance। এই substance-এর দুই অংশ—জড় (matter) ও শক্তি (energy)। জড়ের ও শক্তির অবিনশ্বরত্বের উপর তাঁহার বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠিত। জড় ও শক্তি পরস্পরের মধ্যে কার্য্য করিয়া বিশ্বরচনা করিয়াছে। এই মতটি যদিও আংশিক ভাবে অতি প্রাচীন, কিন্তু এতদিন কেবল প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদের অসম্পূর্ণ পরীক্ষা ও পরিদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে বহু বৈজ্ঞানিকগণের ভূয়োদর্শনের ফলে উহা এক প্রকার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাণ্ট ও লাপ্লেসে ক্রমবিকাশানুসারে বাহ্য-জগতের প্রকাশ সম্বন্ধে এক মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে মুলার এবং শোয়ানের জীবকোস ও জীবাণু হইতে ক্রমবিকাশানুসারে জীবের প্রকাশ হয়। হিকেল এই মত সংগ্রহ করিয়া একমাত্র জগদ্ব্যাপী বস্তুতত্ত্বের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া এক প্রকার নূতন "একমেবাদ্বিতীয়ং" তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীবের আত্মা ও চৈতন্যও জীবকোসের সূক্ষ্ম চৈতন্যেরই অভিব্যক্তি। তাঁহার "জীবকোসাত্মবাদ" নামক মতের দ্বারা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে ক্রমবিকাশ নিয়মানুসারে উচ্চতর জীবের এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যের সমস্ত মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তি সমুদয় প্রকাশিত

হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে প্রাথমিক জীবের (Unicellular Protozoa এককোষী জীবাণুর) মধ্যে যে চৈতন্যের ক্রিয়া দেখা যায় তাহাই উচ্চতর জন্তুর মানসিক অভিব্যক্তি ও জড়ের রাসায়নিক কার্য্যকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে।"

তাঁহার এই জীব-জড়জগতের মতের উপর তাঁহার মানবজীবনের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মতগুলি প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেন যে এতাবৎ-কাল মানুষ আপনার বিষয়ে যে সমস্ত অবৈজ্ঞানিক ধারণা লইয়া কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, তাহারই ফলে আধুনিক ইউরোপের নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের এত দুর্দ্দশা। আধুনিক ইউরোপীয় মনীষীগণের মতের সঙ্গে লোকশিক্ষার সামঞ্জস্যের অভাবই এইরূপ অবস্থার কারণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপে তিনি বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকগণের মতের ও লোকশিক্ষার অনৈক্য কয়েকটি বিষয়ে প্রকাশ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

(১) প্রথমেই ধরা যাক—ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার এবং অন্যান্য দার্শনিকগণের ও বৈজ্ঞানিকগণের মত। হিকেল এক এবং অনাদি অনন্ত পরমকারণ স্বীকার করেন; তিনি সেই পরমকারণের নাম দিয়াছেন পরাবস্তু। এই পরাবস্তুর মধ্যেই জড় ও শক্তি একীভূত অবস্থায় আছে। অর্থাৎ এই পরাবস্তু, শক্তি সমন্বিত থাকায়, সর্ব্বদাই চঞ্চল ও পরিণতিশীল। এই চঞ্চলতা ও পরিণতিশীলতার জন্যই সেই পরমকারণ জগতে পরিণত হইয়াছে। হিকেল তাঁহার মতকে স্পিনোজার "জগৎই ঈশ্বর" এই মতের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—"We adhere firmly to the pure, unequivocal monism of Spinoza: Matter or infinitely extended substance and spirit (or energy) or sensitive and thinking substance, are the two fundamental attributes or principal properties of the all embracing divine essence of the world, the universal substance. অর্থাৎ আমরা স্পিনোজার বিশুদ্ধ ও পরিস্ফুট একত্ববাদের পক্ষপাতী, জড় অর্থাৎ অনন্ত-ব্যাপী বস্তু (substance) এবং শক্তি অর্থাৎ অনুভূতি ও বোধশক্তিপূর্ণ বস্তু (substance) এই দুইটিই হইতেছে সেই পরম কারণের সেই সর্ব্বব্যাপী বস্তুর দুইটি প্রাথমিক গুণ।"*

হিকেল বলেন সেই পরম বস্তু হইতে এবং তাহার আভ্যন্তরিক গুণের জন্যই জগৎ-সৃষ্টি। জগৎ-সৃষ্টি ব্যাপারে কোন বিজ্ঞাত

* হিকেলের substance এবং উপনিষদের "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" মতটার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। তন্ত্রের "পরাপ্রকৃতি"র সঙ্গেও ইহার তত গরমিল নাই। পরাপ্রকৃতি ইচ্ছাময়ী চঞ্চলা অর্থাৎ লীলাময়ী. কিন্তু সেই সঙ্গে "পুরুষ" বা দ্রষ্টা স্বীকার থাকার দরুণ এইখানেই প্রভেদ রহিয়াছে। ব্রহ্মবস্তুতে জগৎ ও চৈতন্যের একত্ব (monism) থাকার দরুণ তাহার সহিত বৈজ্ঞানিক monism এর তত প্রভেদ নাই। ব্রহ্ম জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম, উপদান ও কর্ত্তা, মুখ্য ও গৌণ উভয়বিধ কারণ Substance ও তাই। কিন্তু উপনিষদে ব্রহ্মের ইচ্ছাকে স্বীকার করা হইয়াছে. ("স ঈক্ষত ইমান্ লোকান্ অসৃজা ইতি।" ঐতরেয়োপনিষদ।) কিন্তু বৈজ্ঞানিক একত্ববাদ (monism) সেইখানে substance এর কেবলমাত্র চঞ্চলতা ও পরিণামশীলতা স্বীকার করিয়া সৃষ্টি ব্যাখ্যা করিয়াছে। ইচ্ছা নামক মানসিক ব্যাপারকে ইহাদের মনোবিজ্ঞানে

চেষ্টা (conscious activity) বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারে নাই। জগৎসৃষ্টি ব্যাপারের উদ্দেশ্য (Teleology) ও তাহার আনুসঙ্গিক বিজ্ঞাত চেষ্টা এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের জ্ঞানগম্য হয় নাই। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের কতকটা এই মত। তিনি বলেন "জগৎস্রষ্টা যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তিনি ইচ্ছা করিয়াও কোন একটা উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া জগৎসৃষ্টি করেন নাই। তিনি আপন গুণে বাধ্য হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।" হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের মতও তাহাই। তাঁহার মতে সেই "সেই অজ্ঞেয় কারণ (the unknowable) কেন এবং কি উদ্দেশ্যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। যিনি জগৎসৃষ্টির মধ্যে উদ্দেশ্যকে দেখিতে পান তাঁহার সেই সৃষ্টি অপূর্ণ বৈজ্ঞানিকতা ও দার্শনিকতা হইতে উৎপন্ন।"

হিকেল বলেন যে, জীবতত্ত্বের মধ্যে যিনি একবার প্রবেশ করিয়াছেন তিনি জীবগণের পরস্পরের মারামারি কাটাকাটি দেখিয়া কখনই একজন পরম কারুণিক মহান্ মানবাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন না। *

তিনি বলেন আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়ের মধ্যে কেহই সেই পুরাতন মানবাকার ঈশ্বর এবং ঈশ্বর-বাক্যের উপর স্থাপিত ধর্ম্মমতগুলির উপর আস্থা রাখেন না। অথচ লোকশিক্ষা, সামাজিক ব্যাপার, রাষ্ট্রীয় ব্যাপার প্রভৃতি সমস্ত উচ্চতর প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সেই পুরাতন মতই কার্য্য করিতেছে। হিকেল বলেন যে এইরূপ মত ও কার্য্যের অনৈক্য যে কেবল ভুলমাত্র তাহা নহে, ইহা অন্যায় ও কুসংস্কারের পরিপোষক। ইহারই ফলে, ইউরোপের জনসাধারণ এখনও

(Psychology) স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরই instinct-এর এক প্রকার অভিব্যক্তি বিশেষ বলিয়া উহাকেও নিয়মাধীন করিয়া ফেলা হইয়াছে। জগতে নিয়মাতিরিক্ত (beyond law) অনিয়মাধীন ইচ্ছার ক্রিয়া দেখা যায় না, অতএব "যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে" এরূপ ইচ্ছা স্বীকার করার প্রয়োজন নাই, হিকেল প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের ইহাই মত। বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদে ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্যবস্তুই স্বীকৃত হয় নাই—অন্য সমস্তই মায়া মিথ্যা। শাঙ্কর বৈদান্তিকের মধ্যে "সংক্ষেপ শারীরকবাদীরা আবার দুইপ্রকার ব্রহ্ম স্বীকার করেন। একজন অজ্ঞেয় আর একজন জ্ঞেয়। যিনি অজ্ঞেয় তিনি জগতের উপাদান করেন এবং যিনি জ্ঞেয় তিনিই ব্রহ্মসূত্রের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের লক্ষ্য। Herbert Spencer-এর the unknown and the unknowable-ও সেইরূপ বস্তু।

* বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই ভীষণ সত্যের কথা আমাদের শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়। দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে আত্মীয় বিরহ শোক নিবারণার্থে যে সব কথা বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটি শ্লোক এই :

অহস্তানি সহস্তানাং অপদানি চতুষ্পদাং।
ফল্গুনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনং ॥ ৪২।

কিন্তু তাহার পরই তিনি বলিতেছেন :—

তদিদং ভগবান্ রাজন্নেক আত্মাত্মনাং স্বদৃক।
অন্তরোঽনন্তরো ভাতি পশ্যত মায়য়োরুধা ॥ ৪৩ ॥

কি আশ্চর্য্য যে ভীষণ মৃত্যু ও হিংসার লীলা দেখিয়া নব্য বৈজ্ঞানিক ইউরোপ ঈশ্বরের অনস্তিত্বে বিশ্বাসবান। সেই ভোক্তা এবং ভোগ্যের দৃশ্য দেখিয়া আর্য্যঋষি বলিতেছেন—

"অহস্ত সহস্ত রূপ এই জগৎ, সেই ভগবানেরই স্বরূপ, তাঁহা হইতে পৃথক নহে, তিনিও একমাত্র, অনেক নহেন, ভোক্তাদিগের আত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামীস্বরূপ, অতএব তিনিই অন্তর্বহির্ভোক্তা এবং ভোগ্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। এবং মায়াশক্তি দ্বারা দেবতির্য্যগাদি দেহরূপে বহুধা হয়েন, তাঁহাকে অবলোকন কর ॥"

[শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১ স্ক ১৩ অঃ ৪২। ৪৩ শ্লোক—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের অনুবাদ]

সর্ব্ব বিষয়ে অন্ধকারে থাকিয়া অত্যাচার ও অবিচার প্রাপ্ত হইতেছে।

(২) ধর্ম্মসম্বন্ধে এই মত পোষণ করিয়া হিকেল বর্ত্তমান ইউরোপের ধর্ম্মাধিকরণের বিচার সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার বিষয় সংক্ষেপে বলিতে হইলে এই কথা বলিতে হয় যে তাঁহার মতে বিচার-বিভাগের অবস্থা, বর্ত্তমান ইউরোপের মানব ও জগৎ সম্বন্ধে যে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক ধারণা হইয়াছে, তাহার সহিত মিলে না। তাঁহার মতে এই অসামঞ্জস্যের কারণ দুইটি :—(ক) একটি কারণ নির্জ্জীব ভাবে আইন শিক্ষা ; (খ) দ্বিতীয় কারণ মানুষের জৈবিক ও মানসিক ক্রিয়ার বিষয়ে অজ্ঞতা।

তাঁহার মতে মানব নিজের বিষয়ে যে সমস্ত ভুল ও অহংকৃত ধারণা রাখে তাহারই ফলে জগতে এত অন্যায় অবিচার। জীবতত্ত্ব ও বস্তুতত্ত্ব বিষয়ে আইনজ্ঞগণের ও বিচারকগণের জ্ঞানের অগভীরতা হইতেই অনেক স্থলে বিচার-বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। এবং তাহারই ফলে যাঁহারা আইন-প্রণেতা তাঁহারাও ভুল করেন। যথেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্টের কথা ছাড়িয়া দিয়া ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি রাজ্যের বিচার-বিভাগেও এই দুর্দ্দশা। হিকেল বলেন "Most of our students of jurisprudence have no acquaintance with Anthropology, Psychology and the doctrine of Evolution the very first requisite for a correct estimate of human nature" অর্থাৎ আমাদের আইন-শিক্ষার্থিগণের মধ্যে কেহই মানব-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং ক্রমবিকাশ-তত্ত্বের বিষয় কিছুই জানেন না। অথচ ঐ গুলিই মানবপ্রকৃতি বুঝিবার জন্য প্রথম প্রয়োজন।"

(৩) রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে আধুনিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গবর্ণমেণ্টগুলির সেই অবস্থা এবং তাহাও সেই একই কারণসম্ভূত। হিকেলের মতে "We can only arrive at a correct knowledge of the structure and life of the social body, the state, through a scientific knowledge of the structure and life of the individuals who compose it and the cells of which they are in their turn composed :—

অর্থাৎ "রাষ্ট্র বা সমাজ-দেহ বিষয়ের জ্ঞান ব্যক্তিবিষয়ক জ্ঞান সম্ভূত ; কারণ ব্যক্তি-সমষ্টিই হইতেছে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক দেহ। ব্যক্তি আবার জীবকোষ-সমষ্টি বা জীবকোষ-সমাজ। অতএব রাষ্ট্রবিজ্ঞান জীববিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই ঠিক হয়।" মানবের আত্মাবিষয়ে কতকগুলি অবৈজ্ঞানিক ধারণা প্রচলিত আছে। ধর্ম্মসংঘের এই অজ্ঞতার সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিকগণের স্বার্থান্ধতা জড়িত। তাহার ফলে রাষ্ট্রে ও সমাজে ভ্রমাত্মক কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ জীবকোষ সমাজের মধ্যে যে স্বার্থ ও পরার্থের সামঞ্জস্য, নিয়মবদ্ধতা এবং বহু হইয়াও একত্বের মধ্যে অবস্থিতি দৃষ্ট হয় তাহাই ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বভাব। তাহার বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি কার্য্য করে সে নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া ধ্বংসের পথেই গমন করে। সমাজ-দেহের বা রাষ্ট্রের পক্ষেও

সেই নিয়মই খাটিবে। অতএব রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা, জীববিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া, জনসমাজে প্রচারিত হওয়া উচিত, নতুবা স্বভাবের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া সমাজদেহ ধ্বংসের দিকেই যাইবে।

(৪) চরিত্রনীতি সম্বন্ধেও হিকেলের মত তাঁহার জীবতত্ত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবদেহের কোন এক অংশ বিকৃত হইলে সেই দেহ যেমন প্রথমে সেই বিকৃতিকে সুধরাইয়া লইতে চেষ্টা করে এবং নিতান্ত অপরাগ হইলে যেমন সেই বিকৃত অংশকে সমস্ত শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূর করিয়া দেয়, সেইরূপ ব্যক্তিসমষ্টি বা সমাজও সমাজোল্লঙ্ঘনকারীকে প্রথমে নানাপ্রকারে সুধরাইয়া লইবার চেষ্টা করিবে এবং শেষে অপারগ হইলে, তাহাকে সমাজদেহ হইতে "অঙ্গুলীবোরগক্ষতা" সর্পদষ্ট অঙ্গুলির ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। মনুষ্যের সৎকার্য্যের প্রবৃত্তি তাহার আভ্যন্তরিক স্বভাবের উপর নির্ভর করে। মানুষ যে জীবকোষের সমষ্টি সেই জীবকোষের সমষ্টির মধ্যে যে স্বার্থ ও পরার্থের সামঞ্জস্য আছে, তাহার অভিব্যক্তিই ক্রমবিকাশ-বাদানুসারে মানুষের স্বভাবানুযায়ী কার্য্য। যে সেই স্বভাবের ব্যতিক্রম করিবে, সে-ই সমাজ-দেহের প্রকৃত ক্রমোন্নতিমূলক গতির বিরোধী হইয়া দাঁড়াইবে; সেই জন্য সমাজ তাহাকে শাস্তি দিয়া এবং প্রয়োজন হইলে তাহাকে বর্জ্জন করিয়া স্বীয় দেহ রক্ষা করিবে। মানুষকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য স্বর্গাপবর্গাদির লোভ দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ তাহা কেবল গোঁজামিল। মিথ্যা স্তোক বাক্যে পরিণামে সুফল না হইবারই কথা। মানুষ সৎকার্য্য করিবে আপনার বিষয় সঠিক জ্ঞান লাভ হইলে, নহিলে তাহাকে যতই লোভ দেখান হউক না কেন বা যতই ভয় দেখান হউক না কেন, সে যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে।* আপনার আভ্যন্তরীণ সদ্‌বুদ্ধির ও পরার্থপরতার উদ্বোধনই চরিত্রনীতির এক মাত্র কার্য্য, ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে উহাই মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। সৎপ্রবৃত্তির জন্য নানারূপ অতীন্দ্রিয় আদর্শ খাড়া করার কোন প্রয়োজন নাই। উহা "ছেলে ভুলান"র মত উচ্চতর জীব মানবের পক্ষে অযোগ্য। ধর্ম্মমতের স্বর্গ নরক বা অন্যান্য অতীন্দ্রিয় আদর্শ সম্মুখে থাকিলেও আধুনিক ইউরোপের নৈতিক অবস্থা এখন পর্য্যন্ত সেই প্রাথমিক বর্ব্বরতার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। মানুষ আপনার আভ্যন্তরিক ও বাহিক অবস্থানুসারেই এত কাল সদসৎ উভয় প্রকারে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। অতএব তাহার জৈবিক পরার্থপরতা ও সকলের সঙ্গে আপনার স্বার্থের একতার অভিব্যক্তি যে কার্য্যের দ্বারা হয়, কেবল মাত্র আপনার সুখ-দুঃখের দ্বারা চালিত না হইয়া পরের সুখ-দুঃখের সঙ্গে আপনার সুখ-দুঃখের একতা

* গীতার নিষ্কাম কর্ম্মবাদের সঙ্গে এই মতের অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ গীতা ৬।১।

অর্থাৎ "যিনি কর্ম্মফল নিরপেক্ষ হইয়া (অর্থাৎ আপনার সুখ বা দুঃখ উভয় বিষয়ে চিন্তা না করিয়া কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী; তাঁহাকে কখনই নিরগ্নি বা ক্রিয়াশূন্য বলা যায় না।"

বুঝিতে পারা যায়, আধুনিক চরিত্রনীতি সেই অনুসারেই হইবে, এবং তাহা হইলে জীবের জৈবিক নিয়মানুরূপ হওয়ার দরুণ তাহা মানব-জীবনের ক্রমোন্নতির সহায় হইবে। জ্ঞানই মানুষকে উদ্ধার করিবে, উন্নতির পথে লইয়া যাইবে, লোভ বা ভয় নহে। মানুষ আপন চেষ্টায় ভাল না হইলে, বড় বড় কথা আওড়াইয়া তাহাকে টানিয়া তুলিতে যাওয়া বৃথা। *

(৫) এই প্রাণ-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত চরিত্র-নীতি অনুসারে লোকশিক্ষা হইলে অন্য কোনরূপ ধর্ম্মমতের প্রয়োজন নাই। মানবের সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য স্বার্থ ও পরার্থের সামঞ্জস্য করিলেই চলিবে। চিরস্বর্গ বা চিরনরক, মৃত্যুর পর চির জীবন বা জন্মজন্মান্তরে নানা সুখ দুঃখ এই সব অবৈজ্ঞানিক মতের উপর যে ধর্ম্ম স্থাপিত বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ আলোকপাতে তাহা থাকিবে না। লোকধর্ম্ম কেবল বৈজ্ঞানিক একত্বের উপর স্থাপিত হইয়া মানবচিত্তকে প্রকৃতির বিশাল মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে, এবং মানবের চিত্তে মহান ও অনন্তের প্রতি যে আকর্ষণ আছে তাহা ও প্রকৃতির অনন্ত ও অফুরন্ত ভাণ্ডারে যে সৌন্দর্য্যের সমাবেশ আছে তাহাই উপভোগ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবে। হিকেল বলেন যে তাঁহার এই ধর্ম্মবাদ বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে যে বিচ্ছেদ রহিয়া গিয়াছে তাহাই সংযোজিত করিয়া মানবের ক্রম-বিকাশের সাহায্য করিবে।

এই ত গেল হিকেলের মত। ইহার মতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও প্রতিবাদ করার স্থান ইহা নহে। ইউরোপেও ইহার মত সকল বৈজ্ঞানিকই যে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে। কেল্‌ভিন, লজ্‌ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণই ইহার মতের বিরোধী। তথাপি স্পেন্সার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দার্শনিক এবং বহু বৈজ্ঞানিকগণ এই মতের পরিপোষণ করিয়াছেন। এখন ইহার বৈজ্ঞানিক মতের কথা ছাড়িয়া দিয়া লোকশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যাহা আলোচনা করিয়াছেন ও মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই বিষয় কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করি।

হিকেলের লোকশিক্ষা বিষয়ে প্রধান কথা এই যে তিনি বলেন শিক্ষিত লোকের মতের সঙ্গে লোকশিক্ষার সামঞ্জস্য নাই। স্বার্থান্ধ হইয়া কিম্বা আলস্যের দরুণ কেহই আপন মতানুসারে লোকশিক্ষার পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিতে রাজী নহেন। এরূপ হওয়া অত্যন্ত অন্যায়। জানিব এক, বুঝিব এক, মানিব এক; কিন্তু কার্য্যের সময় সব উল্টা। তাহা কেন হয়?

আমাদের প্রশ্নও তাহাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ইউরোপের বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম্মমত বা লোকশিক্ষার মত বা চরিত্রনৈতিক মত

* গীতাতেও এই মতেরই পোষকতা দৃষ্ট হয়;

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ গীতা ৬।৫

অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু; অতএব আপনিই আপনাকে উদ্ধার করিবে; অবসন্ন করিবে না।"

অদৃষ্ট ও দৈববাদী আমাদের এই শ্লোক স্বর্ণ অক্ষরে লিখিয়া প্রতিদিনের কার্য্যের সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া উচিত।

বা দার্শনিক মত গ্রহণ করি আর নাই করি, লোকশিক্ষার বিষয়ে আমাদের মতের ও কার্য্যের সামঞ্জস্য রাখা উচিত। যদি বিজ্ঞান-বলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম উড়াইয়া দেওয়াই সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে লোক-শিক্ষাও সেই অনুসারে হউক আপত্তি নাই। আর যদি বলি জাগতিক ব্যাপারের মূলসূত্র বিজ্ঞানের বাহিরে ধর্ম্মের মধ্যে আছে; সেখানে বিজ্ঞানের প্রবেশ নিষেধ, তাহা হইলে লোক-শিক্ষা কোন্ পথে অগ্রসর হইলে ভাল হইবে তাহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। লোক-ধর্ম্ম ও দার্শনিক ধর্ম্মের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য প্রভেদ রাখিয়া বসিয়া থাকিলে একদিন না একদিন লোক-ধর্ম্ম দার্শনিক মতবাদের যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিয়া যজ্ঞভঙ্গপূর্ব্বক যজমানের মুণ্ড ছিঁড়িয়া তাহাতে ছাগমুণ্ড বসাইয়া দিবে।

বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদই হউক বা পতঞ্জলির ঈশ্বরবাদই হউক আমাদের লোকধর্ম্ম ও দার্শনিক ধর্ম্মের মধ্যে এই যে বিভেদ তাহা অন্যায় ও কুফলের জনক। যেমন করিয়াই হউক লোকশিক্ষার মধ্যে ধীরে ধীরে যথার্থ মতকে প্রবেশ করাইয়া তাহাদের ক্রমোন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইবে, স্বার্থ, মতভেদ, ভয় প্রভৃতিকে দূর করিয়া মতের ও কার্য্যের একতার দিকে অগ্রসর হইতেই হইবে। নতুবা আমাদের

"জ্ঞানে বাধা কর্ম্মে বাধা গতিপথে বাধা
আচারে বিচারে বাধা"—

চিরদিনের জন্য থাকিয়া যাইবে। শাঙ্কর বেদান্তের মায়াবাদই যদি সত্য হয়, তবে আমাদের মধ্যে পাঁজিপুঁথি, মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়ফুক, তিথিতত্ত্ব, অযাত্রা প্রভৃতি অদ্ভুত মতের এত দৌরাত্ম্য কেন? ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদই যদি আমাদের শেষ কথা হয় তাহা হইলেই বা উহারা কেন?

আমাদের একমাত্র কথা এই যে আমাদের বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক বা যে কোন মতই হউক একটিকে স্থির করিয়া লইয়া আমাদের সমস্ত কর্ম্ম সেই একের দিকে চালিত করিতে হইবে। আমাদের লোক-শিক্ষা-পরিষৎ, আমাদের সাহিত্য-পরিষৎ, আমাদের শিল্প-পরিষৎ সমস্তই সেই একের দিকে চলুক। আমরা সেই মহান্ একত্বের দিকে চাহিয়া কবির ভাষায় বলি—

"রে মৃত ভারত!
শুধু সেই এক আছে নাহি অন্য পথ।"

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট বি, এল্।

বাঙ্গালীর শিল্প ও ব্যবসায়

অত্যল্প পরিশ্রমে কিরূপে অধিক পরিমাণে অভাব মোচন হইতে পারে, এই চিন্তায় মানব এখন সদাই ব্যস্ত—ভাল-মন্দের বিচার করিবারও যেন অবসর নাই—কোন প্রকারে অভাব মোচন হইলেই হয়; সুতরাং কলা-বিদ্যার ক্রমশঃ দিন দিন অধোগতি হইতেছে। এখন শিল্পী শিল্প-চাতুর্য্য প্রদর্শনে তৎপর নহে, ভাস্কর কারুকার্য্যে অমনোযোগী, স্থপতি স্থাপত্য-বিদ্যায় আপনার কলা-বিদ্যার পরিচয় দেখাইতে না পারিলে লজ্জিত হয় না।

ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ধুরন্ধর এবং বঙ্গীয় স্বদেশী
আন্দোলনের পরিচালক
জগদ্বিখ্যাত বাগ্মিবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

India Press, Calcutta

ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত।

বর্ত্তমানে অভাব-মোচন-ক্ষমতাই উৎকর্ষের স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার ফলে সর্ব্বত্র কল-কারখানার সৃষ্টি হইয়াছে।

এই কল-কারখানায় মানবের বৃত্তিগুলি পশুভাবাপন্ন হইতেছে—মনের প্রফুল্লতা যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সকলেই যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে কর্ম্মে আসক্তি প্রকাশ করিতেছে, সুতরাং কার্য্যে প্রকৃত উৎসাহ ও উদ্যমের অভাব বেশ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ইহাতে মানব-সমাজ উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তরে যে অধোগমন করিতেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কলকারখানায় দ্রব্যের মূল্যের ন্যূনতা, বস্তুর আধিক্য, এবং পরিশ্রমের লাঘব হওয়ায় সমাজের শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের কষ্টের ও দুঃখ-দারিদ্র্যের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। বিশেষতঃ যে দেশের স্ত্রীলোক ঘরের বাহির হয় না তাহাদের পক্ষে দেশীয় তাঁত ইত্যাদিই উপযোগী; যে সকল প্রায় অকর্ম্মণ্য লোক বা বালক কলকারখানায় কাজ করিতে অসমর্থ তাহাদিগের পক্ষে দেশীয় উপায়গুলি অতি লাভজনক ছিল, সুতরাং দারিদ্র্যের প্রকোপ এত অধিক পরিমাণে উপলব্ধি হইত না। অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের অবস্থা-বিপর্য্যয়ে যে ভাগ্যের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঢাকার মসলিন না এতদিন জগৎ-বিখ্যাত ছিল, তোমার কালিকোবস্ত্র না কত বিদেশী বণিককে এদেশে আনয়ন করিয়াছে, তখন তোমার কলকারখানা কোথায় ছিল? তখন তোমার ত কোন অভাব ছিল না, তোমার ঐশ্বর্য্য তখন জগতের প্রবাদবচনে প্রচলিত ছিল, তোমার পণ্য তখন জগতের পণ্য, তোমার বাণিজ্যই তখন জগতের বাণিজ্য ছিল। আর এখন তোমার সন্তানগণ বিদেশের বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করে, বিদেশের বাজারে সর্ব্বপ্রকারে বিক্রীত। তোমারই ঐশ্বর্য্যের সন্ধানে দিগ্‌দেশের কত না ধন-লোলুপ বীরাঙ্গনা ও বীরগণ এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। মহারাণী সেমিরেমিস, মহা-প্রতাপ সাইরস্ ডেরায়ুস্ ঐশ্বর্য্য লোভেই না তোমাতে প্রবেশ করিয়াছিল—মহাবীর আলেকজাণ্ডারও সদলবলে সেই পথের পথিক হইয়াছিল; তাই বলিতেছিলাম—কালের কি বিচিত্র গতি—সময়ের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!

কালের যখন পরিবর্ত্তন হইতেছে—মা অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার যখন শূন্য, দুর্ভিক্ষের প্রকোপ যখন সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত, লক্ষ্মীর বরপুত্র যখন লক্ষ্মীছাড়া, মা যখন দিগ্‌বসনা, তখন কলকারখানা ভাল কি মন্দ তাহা এখন কিছুকাল আর ভাবিবার সময় নাই। দেশে যে উপায়েই হউক ধনাগমের পন্থা বাড়াইবার আবশ্যক। আশাও আছে, এদেশ কখনই ভোগে অভিভূত হইবে না—ত্যাগই এদেশের মূলমন্ত্র। সুতরাং অন্য দেশের কলকারখানা-জনিত ব্যাধি এদেশকে আক্রমণ করিতে পারিবে না ইহা স্থির। এখন নিজেদের বিলাসিতা প্রভৃতি অভাবের যত বেশী হ্রাস হইবে দেশের ততই মঙ্গল।

দেশের যে অবস্থা উপস্থিত—তাহাতে বর্ত্তমানে কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্য ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ইহা একদিকে যেমন গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় স্থির করিবে অন্যদিকে সেইরূপ কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা রক্ষা করিবে। ডাক্তারী ওকালতী চাকরী যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর না কেন সকল

দিকই অন্ধকারে পরিপূর্ণ; পরন্তু লোকের সংখ্যাধিক্যবশতঃ সংসার প্রতিপালনে অক্ষমতা, অসন্তোষ ও অশান্তির সৃষ্টি করিবে। তজ্জন্য ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডফ্‌রিণের সময়ে তদানীন্তন হোম সেক্রেটারী মেকডোনেল সাহেব বর্ত্তমানের লর্ড মেডেলটন ইহার আবশ্যকতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া বড়ই দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন যে, দেশের লোক যখন এ বিষয়ে উদাসীন তখন গবর্ণমেণ্টকেই সর্ব্ববিষয়ের প্রথম প্রবর্ত্তকের ন্যায় শিল্পবিষয়েও প্রথম প্রবর্ত্তক হইতে হইবে। শিল্প যে শিক্ষার প্রধান অঙ্গ তখন কি জনসাধারণ, কি জননায়ক, কি গবর্ণমেণ্ট সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ক্রমে দুর্ভিক্ষের অত্যাচারে, দারিদ্র্যের পেষণে সকলকেই এ বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইতেছে। বিদ্বান্ বুদ্ধিমান পরিশ্রমী চরিত্রবান যতই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে ততই ইহার উন্নতি আশা করা যায়। গবর্ণমেণ্ট সাধারণ শিক্ষার পথ কথঞ্চিৎ উন্মুক্ত করিয়াই নিজের কর্ত্তব্য এখন আর শেষ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাকে যে কারণেই হউক দেশের অন্ন-সংস্থানের উপযোগী শিক্ষা দিতেই হইতেছে। এই প্রতিযোগিতার দিনে এখন আর মামুলি চাকরী, ওকালতী প্রভৃতি প্রথাগুলিতে চলিবে না, দেশবাসী ইহাও বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। সাধারণ শিক্ষায় স্মরণ-শক্তিরই বিশেষ পরিচালনা হয় সত্য, কিন্তু ব্যবসায়িক শিক্ষায় পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশক্তির পরিচালনায় নব নব পন্থা ও সুযোগের সৃষ্টি করিয়া নিজের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়া মানব একদিকে যেমন বিমল আনন্দ উপভোগ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়, অন্যদিকে সেইরূপ স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের পন্থাও সুগম করে। দেশবাসী মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

বারাণসী শিল্প-সমিতিতে সার টমাস হোলাণ্ড যে সমীচিন উপদেশ দিয়াছেন তাহা সকলেরই বিশেষ প্রণিধানের বিষয়, বঙ্গের যুবকবৃন্দের এদিকে বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। যদি নিজেদের মান-মর্য্যাদা রক্ষা করিবার বাসনা থাকে, যদি স্বাধীনজীবিকার আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতই জাগিয়া থাকে, যদি আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্ন থাকে, যদি স্বদেশীকে প্রকৃত স্বদেশীভাবে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

"আমাদিগকে শিল্প বিষয়ে বহুল পরিমাণে ছাত্রবৃত্তির আশা করিতে হইবে, ছাত্রবৃন্দের প্রবৃত্তি ভিন্ন পথে চালিত হওয়া আবশ্যক, দেশের প্রকৃত উপকারে শিল্প ও ব্যবসা যত উপকার করিবে, সংবাদ-পত্রের সম্পাদকতা বা উকিলের কূটবুদ্ধি তত উপকার করিতে পারিবে না। যতদিন পর্য্যন্ত যুবকবৃন্দের আশা ও আকাঙ্ক্ষা আইন ও সাহিত্য-শিক্ষার ন্যায় শিল্প ও বাণিজ্যে নিয়োজিত না হইবে, ততদিন স্বদেশী মাত্র কথার কথা ভাবে থাকিবে—ইহা কার্য্যে পরিণত হইবার কোন আশা নাই। "We want more than Govt. provision for technical Scholarships, we want a reformation in the taste of our students, we want them to learn that the man with technical dexterity is of more

use to the country than the writings of Editorials or the skilful cross-examination......But until we find the chemical, metallurgical and mechanical workshops as attractive to our high caste students as the class rooms of law and literature now are, *the cry of Swadeshi*, no matter how worthy the spirit it embodies, will remain but an empty word."

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ২৮শে মার্চ্চ তারিখে ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড মিণ্টো এই ব্যবহারিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এখনও বোধ হয় অনেকের মনে আছে :—

"Technical institution in other countries is growing apace, competition has forced it upon us. We must not lag behind. The success of modern industries and the preservation of indigenous industries is becoming every day more and more dependent upon scientific and technical knowledge and if the resources of India are to be developed by the people of India, such devolopment must depend largely upon local enterprise, upon the instrument of Indian money and upon the recognition of the absolute necessity of expert training!

ইহাতেই বুঝিবেন দেশের উপর কি দায়িত্ব, কি কর্ত্তব্য ন্যস্ত। দেশ আপনার আবশ্যকতা আপনি না বুঝিলে, আপনার চেষ্টা আপনি না করিলে, আপনার রক্ষার উপায় আপনি উদ্ভাবন না করিলে অন্যের উপদেশ বা মতে কত ফল দিবে? দেশে এখন বড়োদার 'কলা-ভবনে'র ন্যায় শিল্পবিদ্যালয় আবশ্যক, বাঙ্গালোরের Indian Institute of Science এর ন্যায় বিজ্ঞান-শিক্ষালয়ের প্রয়োজন, বম্বের Victoria Jubilee Technical Institute এর ন্যায় শিল্প-শিক্ষার কেন্দ্র গঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দেশে অর্থের অভাব নাই, রাজা মহারাজা সামান্য ফাঁকা নামের খাতিরে কত অর্থই না ব্যয় করিতেছেন, বিবাহের ব্যয়, বিলাসিতার ব্যয় এখন ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে—দানবীর তাতার ন্যায় লোক কি বাঙ্গালায় দেখা দিবেন না, বোম্বের ভিক্টোরিয়া শিল্পাগারের ন্যায় শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়া বঙ্গের ধনী-সমাজ কি পরোপকারিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল হইবেন না? বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের সামান্য সামান্য অতি প্রাথমিক বিষয় শিক্ষার্থে যুবকবৃন্দের প্রবাসে কি না কষ্ট স্বীকার করিতে হইতেছে—অপরদিকে পিতামাতার অর্থ বা দেশবাসীর সাহায্য কতই না ব্যয়িত হইতেছে—এই প্রাথমিক শিক্ষা কি এখানে সম্ভব নয়? যে অর্থ বিদেশে একজনের জন্য ব্যয় হইতেছে তাহাতে স্বদেশে কত লোকের যে উপকার করিতে পারে তদ্বিষয়ে কি সমবেত চেষ্টার আবশ্যকতা নাই? বাঙ্গালার "জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের" প্রবর্ত্তিত শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার আয়োজনকে সফল করিয়া

তোলা কি শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য নয়?

অবশ্য বর্ত্তমান সময়ে যে নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে তাহার শুভ চিহ্নসমূহ চারিদিকে দেখা যাইতেছে। নূতন নূতন ভাব ও শক্তির আবির্ভাব ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে।

ইহারই ফলে কত নূতন নূতন কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত। ইহারই ফলে নব নব শিক্ষা-প্রণালীর সৃষ্টি। ইহারই ফলে সাহিত্যের বৈচিত্র্য, কলার বিকাশ। এবং ইহারই ফলে দেশে নানা শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য এবং কৃষির উন্নতির জন্য বিচিত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখা দিয়াছে। দেশে ধনোপার্জ্জনের সেই প্রাচীন পন্থা চাকরী করাই এখন কেবল অনুসৃত হয় না। নানারূপ স্বাধীন পন্থা দেশ এখন অবলম্বন করিয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব বঙ্গদেশের কোথায় কিরূপভাবে স্বাধীন অন্ন আহরণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রথমতঃ স্বদেশী শিল্পের কি উন্নতি হইয়াছে তাহার একটি বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহাও সম্পূর্ণ নহে—বঙ্গের জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় যে কত শিল্প-প্রদর্শনী হইতেছে, কত প্রসিদ্ধ গ্রামে যে কত প্রকার নবশিল্পের উদ্ভব হইয়াছে তাহার সংখ্যা কে করে? এ বিষয়ে বঙ্গ সাহিত্য-পরিষদের এবং জাতীয় শিক্ষ-পরিষদের ন্যায়, কেন্দ্রস্থলে একটি শিল্পকলার ও জাতীয় শিল্প-পরিষদের আবশ্যকতা সকলেই অনুভব করিতেছেন। গতবৎসর স্বদেশী মেলায় দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এরূপ একটি "স্বদেশী বাজার" প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন ও প্রচলন বৃদ্ধি করিবার জন্য, স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য, যাঁহারা নানা প্রকার স্বদেশী দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন, অথচ অর্থাভাব-প্রযুক্ত কার্য্যে সুচারুরূপে সফলতা লাভ করিতে পারিতেছেন না তাঁহাদিগকে অর্থসাহায্যের বন্দোবস্ত জন্য, এবং বাজারে যাহাতে একই দরে সর্ব্বত্র জিনিস বিক্রয় হয় তজ্জন্য একটি স্থায়ী কর্ম্মকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান ষ্টোরস্, শ্রমজীবিসমবায়, মাতৃভাণ্ডার, গাঙ্গুলি ব্রাদার্স ও কমলালয় প্রভৃতি দোকানের স্বত্বাধিকারিগণের সহিত আলাপে বুঝা যাইতেছে যে (১) স্বদেশী দ্রব্য একস্থানে কেন্দ্রীভূত করিয়া একটি স্থায়ী বাজার প্রতিষ্ঠার অভাবে, (২) মূলধনের অনটনে ও (৩) সততার অভাবেই স্বদেশী শিল্প আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারিতেছে না। এক কলিকাতা মহানগরীতে যে স্বদেশী মেলা হইয়াছিল তাহাতে ১৯১১ সালে ১৫ হাজার লোক মেলা দেখিতে আসিয়াছিলেন—গত বৎসর দর্শক-সংখ্যা ৭২ হাজার হইয়াছিল। ১৯১১ সালে ৩৫০০ মহিলার আগমন হইয়াছিল গত বৎসর ১৩০০০ মহিলা আসিয়াছিলেন। ১৯১১ সালে ১১৩ টা দোকান বসিয়াছিল, গত বৎসর দোকানের সংখ্যা ২৩৪ হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান হয় যে স্বদেশী শিল্প অতি অল্প দিনের মধ্যে বাঙ্গালার লুপ্ত গৌরব উদ্ধারে সমর্থ হইবে। এবৎসর খুলনা, কুড়িগ্রাম, মালদহ, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে শিল্পপ্রদর্শিনী

হইয়াছিল। অনাবশ্যক আমোদ-আহ্লাদে সাধারণের অর্থ ব্যয় না করিয়া এইরূপ শিল্পপ্রদর্শনী যতই বৃদ্ধি পাইবে দেশের ততই মঙ্গল হইবে—দেশ ততই ঐশ্বর্য্যশালী হইবে। কর্ম্মকার ও কারিকরদিগের অভাব-অভিযোগ, অসুবিধা-অনটন প্রভৃতির দিকে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলে তাঁহারাও বুঝিবেন যে শিক্ষিত সমাজ তাঁহাদের উন্নতিকল্পে যত্নশীল। তাহাদিগকে বহুল পরিমাণে যে প্রকারেই হউক উৎসাহিত করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে অগ্রিম টাকা দিবারও প্রয়োজন হইতে পারে।

বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থায় সমাজ যখন এ বিষয়ে নিদ্রিত বা অর্দ্ধজাগরিত, দেশ যখন অজ্ঞানতার কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন, তখন আমরা কি বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় গ্রামের বা মহকুমার বা জেলার নূতন নূতন শিল্পের সংবাদ প্রভৃতি আশা করিতে পারি না? উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণই যে বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের আশা-ভরসা-স্থল—তাঁহাদিগকে নানাবিধ সংবাদের, নানাবিধ তথ্যের আধার হইয়া শিক্ষার কেন্দ্রস্থল হইতে হইবে, তাঁহারাই যে লোকশিক্ষা বিস্তারের জীবন্ত উপায়স্বরূপ।

গত বৎসর কলিকাতায় যে 'স্বদেশী মেলা' হইয়াছিল, তাহাতে যত প্রকার দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার যথাসম্ভব একটি তালিকা দেওয়া হইল। কলিকাতাই ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল—সুতরাং ইহা হইতে কতক পরিমাণে অনুমান করিতে পারিবেন যে বঙ্গের নানাস্থানে এই গত ৮ বৎসরে স্বদেশী শিল্পের কি উন্নতি হইয়াছে। বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক এ দিকে সত্য ও পূর্ণভাবে চালিত হইলে যে কি করিতে পারে তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইবে। স্বদেশী আন্দোলনের পর কলিকাতার বাস্তা আজকাল স্বদেশী দোকানে পূর্ণ, ইহার সংখ্যা করা অতীব দুষ্কর—ইহাতে যে লোকে স্বাধীনভাবে অন্ন সংস্থান করিতেছে সে চিন্তায়ও মনে শান্তি আসে, বল আসে।

কল—আমেরিকার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিজ হস্তে প্রস্তুত একটি মটোর এঞ্জিন। এই যন্ত্রের দ্বারা মটোর নৌকা, মটোর গাড়ী চালান যাইতে পারে। ইহা দ্বারা ক্ষুদ্র বৃহৎ কল সমুদয় চলিতে পারে।

বানার্জ্জির কল—খিদিরপুরের ৩৮ নং রামকমল মুখার্জ্জির ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক রকম নলের কূপ প্রস্তুত করিয়াছেন। মূল্য প্রথম শ্রেণী ১৫০৲ দ্বিতীয় শ্রেণী ৬০৲। ইহাদ্বারা ভূগর্ভের নির্ম্মল জল তোলা যায়।

সোনা-পরীক্ষার কল—শ্রীযুক্ত শ্যামলাল শেঠ এই কল প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সোনার খাদ জানা যায়।

বরণ কোম্পানির—(১) ক্ষেত্রে জল সেচনের কল, (২) গম ছোলা প্রভৃতি পেষণের কল, ধান ঝাড়া কল

মাটির ঘটি কলসী প্রভৃতি নানাবিধ জিনিস।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ—জল তোলা কল, লাঙ্গল, নানা প্রকার ধান ও অন্যান্য শস্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

রন্ধনের চুলা—১। শ্রীযুক্ত ডাক্তর ইন্দুমাধব মল্লিকের "ইকমিক" নামক প্রসিদ্ধ চুলায়

ভাত, ডা'ল, মাংস ইত্যাদি রন্ধন করা যায়। ২। দ্রৌপদী চুলা—মূল্য ৪০৲ টাকা, একেবারে ৭।৮ জনের উপযুক্ত তিন প্রকার দ্রব্য রন্ধন হয়।

জুতা ও চর্ম্ম নির্ম্মিত দ্রব্য—ন্যাশন্যাল ট্যানারির জুতা। চামড়া কখনও ছিঁড়ে না। ৪।৪॥০ টাকা মূল্য।

দেশলাই—টালিগঞ্জের "বন্দে মাতরম্" দেশলাই। পয়সায় ৩টি বিক্রয় হইতেছে।

কলম—শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ গুপ্ত মহাশয় বেলিয়াঘাটায় নিব ও পেন-হোল্ডারের কারখানা খুলিয়াছেন। তাঁহার কলম অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

পেনসিল—জাপান-প্রত্যাগত শান্তিপদ গুপ্ত মহাশয়ের মানিকতলার পেনসিলের কারখানার পেনসিল অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। (দেশলাইর কারখানার পেনসিলও মন্দ নয়)।

মোমবাতি—জাপান-প্রত্যাগত নগেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের 'মনোরমা ক্যাণ্ডেল' বাতি অনেকক্ষণ জ্বলে—মূল্য বিলাতী অপেক্ষা বেশী নহে।

নিব—১। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত ইউ ঘোষের নিব অতি সুন্দর হইয়াছে। ২। বউবাজারের গোকুল চন্দ্র ঘোষ।

কালি—১। প্রেসিডেন্সী কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী ও শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ভূষণ ভাদুড়ীর বেঙ্গল "মিসলেনী" কোম্পানী। ইহাতে লিখিবার কালি, ষ্টাইলো গ্রাফিক কালি, কালির বড়ি, জুতার কালি, ক্রিম, বস্ত্রে দাগ দিবার কালি, রবার ষ্ট্যাম্পের কালি, আতর, গোলাপ জল, পুষ্পসার প্রস্তুত হইতেছে। ইঁহারা কৃষ্ণনগরে ১৬০ বিঘা জমি লইয়া ফুলের বাগান করিয়াছেন। সেই বাগানের ফুল হইতে বেলা, চামেলির সার প্রস্তুত হইতেছে। ২। এ, এন, রায়, হেরিসনরোডের রায় ব্রাদার্স, সাধা ব্রাদার্স, ওরিয়েণ্টাল ইণ্ডাষ্ট্রী।

কলের কাপড়—১। গণেশ ক্লথ মিল। জাপান প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত এস, সি, রায় ইহার তত্ত্বাবধায়ক। ২। রামকৃষ্ণ মিল। ৩। মোহিনী মিল, কুষ্টিয়া।

তাঁতের কাপড়—ঢাকা, টাঙ্গাইল, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের কাপড়। [খুলনা সাতক্ষীরার কাপড় একসময়ে খুব বিখ্যাত ছিল। এখন কি তাহার কোন চিহ্নও নাই?]

চিরুণী ও ব্রুস—১। যশোহরের চিরুণী অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ২। বালির শ্রীযুক্ত শান্তিপ্রসাদ ঘোষ শিং-চিরুণী প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ফল ও মাছ—মজফরপুরের আম, লিচু ও আনারস; আমেরিকা প্রত্যাগত অনাথবন্ধু সরকার ফল-রক্ষণ-প্রণালী শিক্ষা করিয়া এই কারখানা পরিচালনা করিতেছেন। ২। কালিঘাটের শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার, ও দিগেন্দ্রচন্দ্র সেন গুপ্ত, ফল ও ভেটকি প্রভৃতি মৎস্য কৌটায় আবদ্ধ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ৩। পাইওনিয়ার কণ্ডিমেণ্ট কোম্পানির নানা প্রকার চাটনি। ইংলণ্ড-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দত্ত ইহার অধ্যক্ষ।

বোতাম—জাপান ও জর্ম্মাণি হইতে প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় ও সি, সি, মিত্র ১৫৯।১ বহুবাজারে এক কারখানা খুলিয়াছেন।

সাবান—১। ন্যাশন্যাল সোপ। ২। ওরিয়েণ্ট্যাল সোপ—ফ্রান্স-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত জে, এন, চক্রবর্ত্তী ইহার নির্ম্মাতা। ৩। বেঙ্গল সোপ।

ছাপার কালি—জাপান-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু ছাপার কালি প্রস্তুত করিতেছেন।

মোম-বাতিদান—১। ন্যাশন্যাল কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত হর্ষনাথ মুখোপাধ্যায় হাইড্রলিক ক্যাণ্ডেল ষ্ট্যাণ্ড প্রস্তুত করিয়াছেন। ২। 'ব্যানার্জ্জির কুপ' নির্ম্মাতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এক রকম বাতিদান প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাদের গুণ এই যে বাতি জলে ডুবিয়া থাকাতে শীঘ্র গলিয়া যায় না।

ঔষধ ইত্যাদি—১। বেঙ্গল কেমিকাল ও ফারমাসিউটিকাল ওয়ার্কস। ২। ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসুর ঔষধের নানা প্রকার বড়ি দেখিবার জিনিস।

চীনা মাটির জিনিস—জাপান-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেব পরিচালিত কারখানার চীনা মাটির পুতুল, ও তৈজসপত্র প্রশংসার জিনিস।

হাতীর দাঁতের দ্রব্য—শ্রীভগবান দাস, শ্রীকণ্ঠ লস্কর, গিরীন্দ্রনাথ বসু, ঘোষ দস্তিদার কোম্পানি।

কাঁচের দ্রব্য—স্বদেশী গ্লাস ওয়ার্কসের নির্ম্মিত চিমনি, গ্লাস, লণ্ঠন, বাটী প্রভৃতি দেখিবার জিনিস।

মোজা ও গেঞ্জি—১। পাবনা ও বেলেঘাটা। ২। রামতনু বসুর লেনে স্থিত সিমলা হোসিয়ারি মোজা।

ছুরী কাঁচি—১। কাঞ্চন নগরের ছুরী ও কাঁচি প্রসিদ্ধ। ২। শ্যামপুরের। ৩। খান কোম্পানী।

লোহার সিন্দুক ও তালা—দাস কোম্পানী ও দাস ঘোষ কোম্পানীর লোহার সিন্দুক ও তালা দেখিবার জিনিস।

চুড়ি—৬৭।২ সুকিয়া ষ্ট্রীটের কারখানার চুড়ি অতি মনোহর।

রেশমী বস্ত্র—বহরমপুর প্রভৃতি স্থানের অনেক কাপড় আসিয়াছিল।

রং—কলিকাতা পেইণ্টস্ ওয়ার্কস্, জোড়াবাগান কলিকাতা।

খটিচূর্ণ—১। মাণিকতলা ষ্ট্রীটের 'ইষ্ট বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্কস'। ২। ঢাকা ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী। ৩। খেংরাপটির বেঙ্গল খটিফ্যাক্টরী।

সুবর্ণবনের খঙ্গর কর্ণওয়ালিশষ্ট্রীটে সারদাদাস ইহার প্রস্তুতকারক।

সেফ্‌টি পিন্ বরাহনগরের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ দা বেশ সুন্দর প্রস্তুত করিতেছেন।

বোতাম—চন্দননগরের শ্রীযুক্ত পি, সি, শেঠ প্রস্তুতকারক।

পিতলের তালা—দত্তপুকুর, শ্রীধর কারখানার তালা।

জুতার কালি—কোন্নগরের শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন, শিকদার বাগানের শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রক্ষিত ও ভিনাস কেমিকেল ওয়ার্কস জুতার কালি, ব্লকো প্রস্তুত করিতেছেন।

চিঠি রাখিবার ফাইল—হ্যারিসন রোডের শ্রীযুত রাজকুমার সেনের চিঠির ফাইল সুন্দর হইয়াছে।

ক্রস—সত্য নারায়ণ কোম্পানির।

হারমোনিয়াম্—মণ্ডল কোম্পানি।

লোহার সিঁড়ি—হাওড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি।

চিঠীর কাগজ—এস, চৌধুরি।

জরিপের যন্ত্র—এঁড়িয়াদহের এন, এন, নিয়োগী।

এলুমিনিয়ামের বাসন—ক্যানিং ষ্ট্রীটের জীবন লাল কোম্পানি মান্দ্রাজী বাসন আনিয়া বিক্রয় করিতেছেন।

এনামেল—বিদেশ-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত এস, রায় নিজের হাতে এনামেল তৈয়ার করিতেছেন।

তাড়িতযন্ত্র—ন্যাশন্যাল কলেজের ছাত্রগণ ১০।১২ রকম তাড়িত-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

মৃণ্ময়-মূর্ত্তি—বিডন ষ্ট্রীটের একাডেমী অব্ স্কালপচার।

শাঁখার বালা—১। ঢাকার আর, সি, নন্দী। ২। পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেনের বাবু শচীকুমার দত্ত।

মণিব্যাগ—এস, সি বসু এণ্ড সন্স্ ১ নং মিরজাফরের লেন।

বিসকুট—কে, সি, বসুর বিসকুট প্রসিদ্ধ। পি, শেঠ কোম্পানির জেম্ বিসকুট।

তেল ও টুথ পাউডার—রসারোড।

দেশে জন-সাধারণ ও সরকার উভয়ের সমবেত বা পৃথক চেষ্টায় ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য যে সকল সদনুষ্ঠান হইয়াছে, সাধারণের অবগতির জন্য তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। ইহাদ্বারা সকলে বুঝিতে পারিবেন যে দেশ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া নাই, বরং শিল্পশিক্ষার যাহাতে উন্নতি হয় তদ্বিষয়ে অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কেবলমাত্র নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যপ্রস্তুত করাই ব্যবহারিক শিল্পের কার্য্য নহে—দেশের কৃষিবিভাগ, বন বিভাগ, সমস্তই ইহার অন্তর্গত। দেশে কর্ম্মী পুরুষের অভাব নাই—সাধারণ লোকের এ বিষয়ে ইচ্ছা ও আন্তরিকতার অভাবেই এ দিকে কোন সুফল ফলিতেছে না।

ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ—শিবপুর, হাওড়া।

বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অন্তর্গত

(১) বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট।

(২) বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ—কলিকাতা।

গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল—কলিকাতা। মহিষাদল টেক্‌নিকাল ইনষ্টিটিউট—মেদিনীপুর।

বর্দ্ধমান টেক্‌নিকাল ইনষ্টিটিউট—বর্দ্ধমান।

অক্‌সফোর্ড মিশন ইন্‌ডস্ট্রীয়াল স্কুল—কলিকাতা।

ভিক্টোরিয়া স্কুল—কারসিয়াং দাৰ্জ্জিলিঙ্গ।

মহিলা শিল্প-সমিতি—কলিকাতা।

পশমের রং করিবার ও বুনিবার বিদ্যালয়—কালিগঞ্জ।

মুসলমান অরফ্যানদিগের স্কুল—কলিকাতা।

কোড়েয়া শিল্প-বিদ্যালয়—কলিকাতা।

কলিকাতা অরফ্যানেজ—কলিকাতা।

প্রেসিডেন্সিবিভাগ—কেওড়াপুকুর সূত্রধর-বিদ্যালয়; খুলনা শিল্পবিদ্যালয়; বহরমপুর নৈশবিদ্যালয়ের শিল্পবিভাগ; সরগাছি (মুরশিদাবাদ) শিল্প-বিদ্যালয়—হাট ছাপরার মধ্য ইংরাজী স্কুল (কৃষ্ণনগর)।

বর্দ্ধমান বিভাগ রাণীগঞ্জের নিকট খোরস্থলি—এখানে সূত্রধরের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়।

বাঁকুড়া—এখানে সূত্রধরের কার্য্য, বেতের কার্য্য, জুতা প্রস্তুতের ও হাতে তাঁত চালানের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়।

বিধবা ও বালিকাদিগের জন্য বরাহনগরের মিশনারি স্কুল—এখানে কার্পেট্ বুনন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

কলিকাতার ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল, জুবিলী আর্ট স্কুল—এখানে অঙ্কন, এনগ্রেভিং, মোল্ডিং, লিথোগ্রাফি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

গবর্ণমেণ্টের কমারসিয়াল স্কুল—(১) ৩০৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা; (২) ঢাকা; (৩) পাবনা।

বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন জেলায় যতগুলি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং তাহাদের মধ্যে যতগুলি এখনও জীবিত আছে তাহাদের প্রত্যেকটিতেই প্রাথমিক শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কর্ম্মকারের কার্য্য, কাদামাটির কাজ, বুনন, কার্ডবোর্ডের কাজ, সূত্রধরের কর্ম্ম, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। প্রায় প্রত্যেক স্থানেই বৎসর বৎসর জাতীয় শিক্ষার প্রদর্শণী উপলক্ষে অভিভাবকগণ এবং জনসাধারণ ছাত্রদিগের হাতের কাজ দেখিয়াছেন। সাধারণ সাহিত্য শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞান ও শিল্প-শিক্ষার যোগ ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে কোথায়ও অনুষ্ঠিত হয় নাই। এইরূপ জাতীয় বিদ্যালয়ের শিল্পবিভাগে ময়মনসিংহ, ঢাকা, ঝালকাটি, (বরিশাল) চাঁদপুর, কুমিল্লা, সানিহাটী (ঢাকা), রঙ্গপুর, দিনাজপুর, যশোহর, খুলনা, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানের ছাত্রগণ শিক্ষা পাইয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ের এবং কলিকাতার বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ ও টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের সমবেত শিল্প-ও বিজ্ঞান-প্রদর্শনী কলিকাতায় দুই তিন বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন কলিকাতা ও ঢাকায় আরও অনেক শিল্প-শিক্ষার স্কুল খোলা হইয়াছে। আসানউল্লা ইন্‌জিনিয়ারিং স্কুল—ঢাকা। কালিকিশোর টেক্‌নিক্যাল স্কুল—ময়মন্‌সিংহ। ইলিয়ট বনমালি টেক্‌নিক্যাল স্কুল—পাবনা। ডায়মণ্ড জুবিলী ইনষ্টিটিউট্—রামপুর বোয়ালিয়া। ইলিয়ট আরটিজান স্কুল—কুমিল্লা। বরিশাল টেক্‌নিক্যাল স্কুল—বরিশাল। বেলি গোবিন্দলাল টেক্‌নিক্যাল স্কুল—রঙ্গপুর। রেলওয়ে ওয়ার্কসপ—পাহারতলি (চট্টগ্রাম) ভিক্‌টরিয়া টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট—চট্টগ্রাম। মালদহ বুনন বিদ্যালয়—মালদহ।

এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি সাধারণ স্কুলের সহিত 'বি' এবং 'সি' ক্লাস খুলিয়াছেন—ইহাতে শিল্পবিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয়গুলির তালিকা—মেদিনাপুর, খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, রঙ্গপুর, পাবনা, রাজশাহী, কুমিল্লা।

বঙ্গের কোন্ স্থান কোন্ জিনিসের জন্য প্রসিদ্ধ ও কোথায় কি কি দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহা অনেকেই অবগত নন্। এজন্য প্রচারকদিগকে বা ব্যবসায়ীদিগকে নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। অধিকন্তু বর্ত্তমানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি যখন এদিকে পড়িয়াছে তখন কোন্ স্থানে পূর্ব্বে কি কি ব্যবসা প্রচলিত ছিল এ সংবাদ রাখা একান্ত আবশ্যক; সেই সেই স্থানে পুনরায় চেষ্টা করিলে হয় ত মৃত বা অর্দ্ধমৃত শিল্পের কেন্দ্রগুলি

পুনরায় জীবিত হইতে পারে। এ উভয় কারণে আমরা যথাসাধ্য একটি তালিকা সংগ্রহ করিয়াছি। এইরূপ একটি নির্ভুল তালিকা যাহাতে প্রস্তুত হইতে পারে তদ্বিষয়ে দেশবাসীর বিশেষতঃ উদ্যমশীল যুবক-সম্প্রদায়ের সাহায্য আমরা ভিক্ষা করিতেছি। তাঁহারা তাঁহাদিগের স্বীয় স্বীয় জেলার বা মহকুমার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রস্তুত করিলে বিশেষ উপকার হয়—দেশেরও একটি মহৎ উপকার সাধিত হয়। ইহাতে তাঁহাদের ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

খুলনা

বাণিজ্য দ্রব্য—১। তেঁতুল, নারিকেল, খেজুর-গুড়, বাঁশ, শিমুলতুলা, ও মৎস্যের কারবার বেশ চলিতে পারে। ২। সুন্দরবন হইতে কাঠ চালান দিয়া অনেকে লাভবান হইতেছেন। ৩। কালিগঞ্জের দা, ছুরী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ৪। পরামন্দকাটির (কালিগঞ্জ) মহিষের শিংএর ছড়ী, সিন্দুর-চুবড়ী ও কৌটায় এই স্থান বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। ৫। সাতক্ষীরার ধুলিহরের সূক্ষ্ম বস্ত্র এক সময়ে অতি প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমানে বাক্‌সার কাপড় ও ইলিহার মশারি ইহার নিদর্শন দিতেছে। এখানকার কুম্ভকারদিগের দ্রব্য অতি প্রসিদ্ধ। ৬। সোণার মাদুলি এ জেলায় যেরূপ হয় এরূপ আর কোথাও হয় না। ৭। মাদুর এখানে যেরূপ হয় সেরূপ আর কোথাও হয় না। ৮। পূর্ব্বে এ জেলা হইতে শামুকের চূণ ও জম্বুকের চূণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইত। ৯। এখানে গরুর হাড় সংগ্রহ করিয়া চালান দিতে পারিলে লাভ হইতে পারে।

খুলনায় একটি লোন-কোম্পানী আছে। স্বদেশী-ভাণ্ডার প্রভৃতি কয়েকটি ভাণ্ডার খুলনা ও সাতক্ষীরায় স্থাপিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ বন্দর ও ব্যবসা-স্থান—খুলনা, দৌলতপুর, ফুলতলা, আলাইপুর, কপিলমুনি, চালনা, জলমা, ডুমুরিয়া, কুরিরহাট, সুরখালি, বড়দল, পাটকলঘাটা, কালিগঞ্জ, কলারোয়া, দেবহাট্টা, বসন্তপুর, আশাশুনি, লওয়াবেকি। ধুলিহরের হাটে অধিক পরিমাণে গরু বিক্রয় হয়।

প্রসিদ্ধ মেলা—নূন নগরের মেলা, সাতক্ষীরার রথের বাজার।

ব্যবহারিক বিদ্যালয়—(১) একটী বিদ্যালয় আছে। (২) জেলা স্কুলের সহিত "বি" ক্লাস খোলা হইয়াছে। (৩) একটী জাতীয় বিদ্যালয় ছিল, সহানুভূতির অভাবে বর্ত্তমানে কালের কবলে বিলীন হইয়া এখন গৃহগুলিই উহার স্থায়িত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা—খুলনায় নদীর সংখ্যা বেশী, সুতরাং (১) নৌকাই প্রধান অবলম্বন; (২) গরুর গাড়ী।

বন-বিভাগ—সুন্দরবন থাকায় এখানে বন-বিভাগের দুইটি বড় বড় আফিস আছে।

খুলনা কৃষিপ্রধান জেলা—এখানে কৃষি-বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজন।

যশোহর

বাণিজ্য-দ্রব্য—(১) মাদুর, ঝুড়ি, ঝিনেদহের গরুর গাড়ীর চাকা, সোণা-রূপার অলঙ্কার, খেজুর-গুড় ও চিনি প্রভৃতি। (২) বাসডাঙ্গায় মাটির যেরূপ হাড়ী কলসী প্রস্তুত হয় এরূপ আর কোথাও হয় না। (৩) যশোহরের নিকটে ডাওরাখালির লোহার

দা, ছুরী, কাঁচি প্রভৃতি বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের যশোহরের প্রদর্শনীতে ইহার নমুনা দেওয়া হইয়াছিল। (৪) জগন্নাথপুরের সংলগ্ন কেশবপুরের নিকট মূলগ্রামের কাঁসার জিনিস-পত্র উল্লেখযোগ্য। (৫) সিঙ্গিপাশা ও নৌহাটার তাঁতের মোটা ও 'চিকন' কাপড় ও মশারি উল্লেখ-যোগ্য। (৬) যশোহরের নীলের ইতিহাস পড়িবার জিনিস।

কল-কারখানা—(১) জাপান-প্রত্যাগত মন্মথ ঘোষের উৎসাহে ও পরিদর্শনে এখানে ১৯০৯ সালে একটি বোতাম ও চিরুণির কারখানা খোলা হইয়াছে। (২) যশোহরের তাহেরপুর, কোটচাঁদপুর, কেশবপুরের চিনি প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানে তাহেরপুরে একটি চিনির কারবার খোলা হইয়াছে। চিনির কারবারের ইতিহাস বেশ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ।

(i) Sir James Westland's Report on the District of Jessore (1874) এবং (ii) Two articles by N. N. Banerjee entitled "the Date Sugar" and "Manufacture of Date Sugar" পড়িতে অনুরোধ করি।

লোন-কোম্পানি—দুইটি লোন-কোম্পানি বেশ সুন্দর ভাবে চলিতেছে।

ব্যবহারিক বিদ্যালয়—এখানে একটি জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাহাতে শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

প্রসিদ্ধ বন্দর ও ব্যবসায়-স্থান—কোট-চাঁদপুর, ত্রিমুহনী, চৌগাছা, তাহেরপুর।

প্রসিদ্ধ মেলা—হাড়য়ার মেলা, বাদুড়ের বাজার প্রভৃতি।

স্বদেশী কোম্পানি—যশোহর ও মাগুরার 'ষ্টিম নেভিগেসন কোম্পানি' প্রসিদ্ধ।

নদীয়া

বাণিজ্য-দ্রব্য—(১) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শান্তিপুর তাঁতের কাপড়ের জন্য প্রধান স্থান ছিল। বর্ত্তমানেও শান্তিপুরের কাপড় ইহার পূর্ব্বস্মৃতি কতক রক্ষা করিতেছে। (২) নবদ্বীপ ও মেহেরপুরের কাঁসার বাসন। (৩) কৃষ্ণ-নগরের পুতুল প্রভৃতি চিরপ্রসিদ্ধ, ইউরোপীয় প্রদর্শনীতে ইহা পুরস্কার পাইয়াছে। (৪) নদীয়ার নীলেই 'নীলদর্পণে'র সৃষ্টি। ইহা ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ। (৫) পাট।

কলকারখানা কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল। এখানে সুন্দর কাপড় প্রস্তুত হয়।

ব্যবহারিক বিদ্যালয়—(১) শান্তিপুরে একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। (২) চাসরার শিল্প-বিদ্যালয়।

বাণিজ্য-প্রধান স্থান—শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, কুমারখালি, হরিনারায়ণপুর, মেহেরপুর ও কৃষ্ণনগর।

প্রধান মেলা—(১) নবেম্বর ও ফেব্রুয়ারী মাসে নবদ্বীপের মেলা। (২) নবেম্বরে শান্তিপুরের মেলা। (৩) জানুয়ারী মাসে ফলিয়ার মেলা। (৪) মার্চ্চ মাসে ঘোষপাড়ার মেলা।

ঢাকা

বাণিজ্য-দ্রব্য—১। ঢাকার মসলিন চির-প্রসিদ্ধ। ২। কাশিদা ও ঝাপান কাপড় আফগানিস্থান, পারস্য, আরব প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হয়। ৩। ঢাকার শাঁখা ৪। ঢাকার

সোণার কাজ অতি সুন্দর। ৫। আজকাল ঢাকার পাট প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিতেছে।

এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের যে সমুদায় তথ্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

বর্দ্ধমান

এখানকার কয়লাই প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য। রাণিগঞ্জের পটারি ওয়ার্কস ও কাগজের কলই প্রসিদ্ধ। মান্দ্রাজ ও বোম্বে প্রভৃতি স্থানে বাগতিকরা ও মেমারির তসরের বেশ আদর আছে। কাটোয়া হইতে যে এক-প্রকার সিল্ক প্রস্তুত হয় উহা মান্দ্রাজে রপ্তানি হয়।

পূর্ব্বস্থলী, কালনা ও মনেশ্বর প্রভৃতি স্থানে এখনও সূতার কাপড় প্রস্তুত হয়।

বাঁকুড়া

বাঁকুড়ার তসর ও রেশমের কাপড় এখনও বিখ্যাত। বিষ্ণুপুর কেবল তামাকের জন্য বিখ্যাত নহে। এখানকার তামাক মণ ৫৲ হইতে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। রাজগ্রাম, জয়পুর প্রভৃতি স্থানের সাড়ী ও ধুপছায়া বিখ্যাত। সোনামুখীর তসরের ধুতি ও সাড়ীর এখনও সম্মান আছে। সোনামুখীতে গালার কারবার বেশ সুন্দর ভাবে চলিতেছে। বাঁকুড়ার কাঁসা ও তামার ঘড়া অতি প্রসিদ্ধ। শাসপুরের ছুরী, কাঁচি, চাকু, খুর প্রভৃতি কলিকাতার বাজারে বেশ নাম করিয়াছে। বাকুড়া, বিষ্ণুপুর ও পত্রেশ্বর প্রভৃতি স্থানের শাঁখ ও শাঁখার জিনিস মন্দ নয়।

মেদিনীপুর

মেদিনীপুরের সাবাং, কাশিজোড় ও নাড়াজোলের কাঠির মাদুর কলিকাতার বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে ইহা দেখিতে অতি সুন্দর।

ঘাটাল ও খারেশ্বরে কারবার যেরূপ ভাবে চলিতেছে এরূপ বঙ্গের সর্ব্বত্র পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহারা ষ্ট্রেট-সেটলমেণ্ট হইতে টিন ও জাপান হইতে তামা আনিয়া থাকেন। এই স্থানের অধিবাসী ৯০০০ লোকের মধ্যে প্রায় ৪০০০ লোক এই ব্যবসায়ে খাটিতেছে। দিন রাত কেবল কাঁসার শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না।

ঘাটালের হাড়ীর কলিকাতায় খুব আদর।

বীরভূম

বাণিজ্য-দ্রব্য—১। এই দেশ প্রধানতঃ খনিজ-প্রধান। এখানকার মাটিই লৌহময়। এখানে লৌহ, কয়লা, লাইমষ্টোন, গ্রানাইট ও স্যাণ্ডষ্টোন প্রভৃতি খনিজ ধাতু পাওয়া যায়। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে এখানকার মহম্মদ বাজারে "আয়রন্ ওয়ার্কস্ কোম্পানি" নামে এক কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়—পরে উহা নানারূপে নানা হস্তগত হইয়া বর্ত্তমানে লোপ পাইয়াছে। ২। দোবরাজপুর থানার অধীন আরাংএ আজিও কয়লার খনি আছে। ৩। রামপুর-হাট ও নলহাটি, বক্রেশ্বর ও দোবরাজপুরে আজিও পাথর দৃষ্ট হয়। ৪। চুণ। ৫। গাস্তুটিয়ার নিকট রেশমের কার্য্য ও এলাম বাজারের গালার কারখানা বহুপূর্ব্বে ইংরেজ কোম্পানির দ্বারা পরিচালিত হইত। যদিও এখানে রেশম অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন

হয়, তথাপি ইহাই এখানকার প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। গামুটিয়াতে বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানি ছিল। রামপুরহাটের অধীন বাস্বা, বিষ্ণুপুর, মারগ্রামের বিশেষতঃ বাস্বা-বিষ্ণুপুরের রেশম প্রসিদ্ধ। খাসরু-নামক জিনিস অতি প্রসিদ্ধ, এমন কি বৎসরে ৫০০ মণ প্রস্তুত হয়। গামুটিয়ায় ও ভদ্রাপুরে এবং কারখাতে রেশমের সূতা প্রস্তুত হয়। ৬। বীরসিংহপুর, কালিপুর, কারিধা, এলাম-বাজার ও তাঁতিপাড়ায় তসরের কাজ চলিতেছে। ৭। গালার চুড়ি, দোয়াত, নানাবিধ খেলনা প্রভৃতি জিনিস প্রস্তুত হয়। গুরিরা এই কার্য্য করে। ৮। আলতা। ৯। এলামবাজার, টিকের পপিয়া, হাজরাটপুর, প্রভৃতি স্থানে কাঁসা ও তামার কাজ বেশ সুন্দর হয়। ১০। মুড়ির একপ্রকার কুঁচি (Bowls) অতি প্রসিদ্ধ। লক্ষ্মীপুর বা লক্‌পুরে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা দেখিতে অতি সুন্দর। ১১। ডুবরাজপুরের তাঁতি প্রসিদ্ধ। ১২। কারিদার শাঁখা। ১৩। এলামপুর ও সুরপুর প্রভৃতি স্থানে নীলের বড় বড় কুঠি ছিল, এখন উহা লোপ পাইয়াছে।

হাবড়া

বঙ্গদেশে এই জেলার যত লোক ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে এত আর কোন স্থানে নয়। শতকরা ২৬ জন কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে। প্রায় ৭০,০০০ লোক কেবল বিভিন্ন কলকারখানায় কাজ করে।

১। তাঁত—বাটোর এক সময়ে সাত-গাঁয়ের প্রধান বাণিজ্য-স্থান ছিল। এখন ডোমজুর সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। তদ্ভিন্ন জগৎবল্লভপুর, কানানাই, আমতা, বাগনান প্রভৃতি স্থানে কাপড় প্রস্তুত হয়। নাবোসার্ন বর্ত্তমানে সূক্ষ্ম কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে এখানকার লোক শ্রীরামপুরের তাঁত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

২। সুন্দর কারুকার্য্য-সম্বলিত "চিকন" কাপড় সম্ভ্রান্ত মুসলমান স্ত্রীলোকগণ ডুমজুর ও জগৎবল্লভপুরে যেরূপ করে—এরূপ আর কোথাও হয় না।

৩। চণ্ডীপুরের খেলনা ও পাটিহালের হাঁড়ী উল্লেখযোগ্য।

৪। পূর্ব্বে এখানেই "তুলোট" কাগজ প্রস্তুত হইত, বর্ত্তমানে ইহা প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হওয়ায় উঠিয়া গিয়াছে।

৫। বেতের ঝুড়ি, চেয়ার, দোলনা প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর জিনিস এখানে বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হয়। ইহা বেন্টিক ষ্ট্রীটের চীনাদিগের জিনিস অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।

কলকারখানা—প্রায় ৫৬টি ফ্যাক্টরি আছে।

বাণিজ্যপ্রধান স্থান—১। রামকৃষ্ণপুরের মঙ্গলবারের হাটের কথা সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। এখানে যত তাঁতের কাপড় আমদানি হয় তত বোধ হয় বঙ্গের আর কোথাও হয় না। ২। উলুবেড়িয়ার হাটে গরু ও লাঙ্গল খুব অধিক পরিমাণে আমদানি হয়।

হুগলি

মুসলমান রাজত্বে সাতগাঁর পরেই হুগলি পশ্চিম বঙ্গের প্রধান বাণিজ্য-স্থান ছিল।

এখানকার "শ্রীরামপুরের কাগজ" আজিও অনেকের মনে আছে—পরে উহা বালির কলের সহিত মিলিত হইয়া সেখান হইতে "বালির কাগজ" বাহির হইতে থাকে।

কলকারখানা—(১) মহেশের বঙ্গলক্ষ্মী-কটনমিল। (২) কোন্নগরের "ভিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্"। (৩) শ্রীরামপুরের তাঁত।

দেশী কাগজ—নিয়লা ও পাণ্ডুয়ার নিকট মহানাদে, বালি-দেওয়ানগঞ্জে এক প্রকার দেশী কাগজ প্রস্তুত হয়। উহা কলিকাতায় হিসাবী খাতার জন্য বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহার মূল্য শতকরা ১০৲ টাকা।

চিকন কাজ—ধনিয়াখালি ও চণ্ডীতলার সম্ভ্রান্ত মুসলমান রমণীরা কাগজে নকসা আঁকিয়া পরে কাপড়ে যে এক প্রকার সুন্দর কারুকার্য্যপূর্ণ জিনিস প্রস্তুত করেন, তাহা ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় হয়।

প্রধান স্থান—ত্রিবেণী এককালে অতি বিখ্যাত স্থান ছিল। দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গের এক সময়ে রাজধানী ছিল। এইখানে এক সময়ে "সাতগাঁয়ের নেপ" পাওয়া যাইত। বর্ত্তমানে ফরাসডাঙ্গার কাপড় জেলার নাম রক্ষা করিতেছে।

রংপুর

রংপুরে তামাকের কারখানা ১৯০১ খৃষ্টাব্দে খোলা হইয়াছে। এখানকার পিরপায়া নামক সতরঞ্চ অতি প্রসিদ্ধ। কুড়িগ্রামের অধীন পাঙ্গা নামক স্থানে হাতীর দাঁতের কাজ অতি সুন্দর হয়। কুড়িগ্রামের কাঁসার কাজও মন্দ নহে। নিলফামারির অধীনে লোমনাতির পিতলের বেশ নাম। ডোমার ও সৈদপুরে কল-কারখানা আছে। নিলফামারির অধীন দারওয়ালির মেলা উল্লেখযোগ্য।

বগুড়া

১। বেঙ্গল ষ্টোর্স—সত্বাধিকারী—শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সেন। কেবলমাত্র বস্ত্র বিক্রয় হইয়া থাকে। কলিকাতা হইতে যে সমস্ত জামা আসিয়া থাকে তাহা সম্পূর্ণরূপে স্বদেশী বস্ত্রে প্রস্তুত হয় কি না তাহা বলা দুষ্কর। এতকাল একভাবে চলিয়া আসিতেছে।

২। স্বদেশী ষ্টোর—সত্বাধিকারী—শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বসু ভ্রাতৃগণ। বস্ত্র ব্যবসায়। এই বিপণি সম্বন্ধেও পূর্ব্বকথা প্রযোজ্য।

৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বকসী ভ্রাতৃগণের স্বদেশী দোকান—বস্ত্র ও নানাপ্রকার সৌখীন দ্রব্য, কাগজ, কলম, কালি ইত্যাদি। একরূপ চলিতেছে।

৪। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্বদেশী দোকান। ঐ প্রকার।

৫। শ্রীযুক্ত ধরণীকিশোর ধরের স্বদেশী দোকান। ঐ প্রকার, অবস্থা ভাল নয়।

৬। সোডা লেমনেডের কল

৭। ষ্টিম-পরিচালিত সোডাওয়াটারের কল। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য।

৮। ষ্টীলট্রাঙ্ক—অক্ষয়কুমার চন্দ। এখনও করিতেছে।

৯। শ্রীসতীশচন্দ্র কুণ্ডু, কাঞ্চনপুর—কাগজ দিয়া নানাপ্রকারের খেলনা, ফল ইত্যাদি এবং সুন্দররূপে প্রাণীর হাড়, মস্তকের খুলী ইত্যাদি প্রস্তুত করেন।

১০। আয়েতুল্যা আকন্দ—সুন্দর কারু-কার্য্য-সমন্বিত যষ্টি ও কলমদান।

উপসংহার

শিল্পের উন্নতি-সাধনে উদ্যমী ও উৎসাহী ব্যক্তিদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

(১) আমাদের মূলধন তত অধিক নাই।

(২) আমরা বেশ বিলাসী হইয়া পড়িয়াছি।

(৩) আমাদের প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়তা নাই।

(৪) আমাদের সততা বা সাধুতার কথঞ্চিৎ অভাব।

(৫) আমাদের রাজরাজড়ারা নিজেদের প্রজাদিগের নির্ম্মিত শিল্প-দ্রব্য ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে অনিচ্ছুক।

(৬) আমাদের জিনিসপত্র রপ্তানি-আমদানির উপায়—যথা রেল ষ্টীমার—আমাদের নহে, এখানে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে।

(৭) দেশে হাটবাজার, মেলা-উৎসব প্রভৃতির অভাব নাই। সেখানে নিঃস্বার্থে স্বদেশী দ্রব্যের বাজার বসাইতে হইবে—গ্রামে গ্রামে ভদ্র অভদ্র বিবেচনা না করিয়া ফেরিওয়ালাদিগের ন্যায় মাথায় মোট করিয়া স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন করিতে হইবে।

(৮) কোথায় কোন্ জিনিস প্রস্তুত হয়, কি মূল্য ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ স্বদেশ-সেবকের প্রয়োজন হইবে—তাঁহারা হার প্রচারক হইবেন।

(৯) সামান্য সামান্য ২।১০৲ টাকা মূলধন লইয়া ছোটখাট কারবার খুলিবার প্রবৃত্তি জন্মাইতে হইবে।

(১০) স্বদেশী দ্রব্য অনেক সময়ে বিনা জামিনে বা বিনা মূল্যে কেবল প্রচলনের জন্য বিশ্বাসী কর্ম্মীদিগকে দিতে হইবে—ইহাতে লোকসান হইলে হইতে পারে।

(১১) স্বদেশী শিল্পের উপকারিতা এবং স্বদেশী শিল্পে লোকের পূর্ব্বে কেন অন্নসংস্থান হইত ইত্যাদি বিষয়ে ছোট ছোট পুস্তক সংকলন আবশ্যক। ইহা বিনামূল্যে বিতরণ করার প্রয়োজন।

(১২) স্বদেশীর বাজার যাহাতে বিলাসিতার দ্রব্যে পরিপূর্ণ না হয় তদ্বিষয়ে সতত দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন কারণ দেশ প্রথমতঃ বিলাসিতায় পরিপূর্ণ, দ্বিতীয়তঃ বিলাসিতার দ্রব্য যত অধিক হইবে—মূল্যও তত কম হইবে সুতরাং প্রচলনও বেশী হইবে। যাহাতে স্থায়ী ও আবশ্যক জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে।

(১৩) পূর্ব্বে দেশে তসর ও রেশমের কাপড় অধিক প্রচলিত ছিল—তসর ও রেশমের কাপড় একদিকে যেমন পবিত্র অন্যদিকে সেইরূপ অধিককাল স্থায়ী। এখন যে পরিমাণ কাপড় আবশ্যক হয় ও তাহাতে যত খরচ হয়—তাহার তুলনায় রেশমী ও তসরের কাপড় বোধ হয় অধিকতর উপযোগী।

(১৪) কার্য্যের বাহ্যাড়ম্বর অপেক্ষা প্রকৃত ফলের পরিচয়ে অধিক উপকার দর্শে, সুতরাং বাহিরের জাঁকজমক যত কমে ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে ততই মঙ্গল। ধীর স্থির নিঃশব্দ কার্য্য করাই ব্যবসায়ীর কর্ত্তব্য।

(১৫) আমাদের পৈত্রিক ব্যবসায়ে দক্ষহস্ত শিল্পী ও কারিকরগণ বর্ত্তমানে ভিন্ন দেশের

সহিত প্রতিযোগিতায় কেন সফল হইতে পারিতেছে না—তাহার একমাত্র কারণ কি ব্যবসায়ে বাধা না নিজেদের মৌলিকতার অভাব? আমরা আজকাল যাহা করিতেছি প্রায়ই যেন সব পরের অনুকরণ মাত্র।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

পল্লীসমাজের আদর্শ শিক্ষা-প্রণালী

কিছু কাল হইতে একখানি শিক্ষা-বিষয়ক ইংরাজী পাক্ষিকপত্র সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, দেশে ক্রমশঃ স্বায়ত্ত-শিক্ষার আদর বাড়িতেছে। বে-সরকারী শিক্ষা-প্রণালীগুলির প্রতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের বাহিরেই নূতন নূতন শিক্ষা-প্রণালীর পরীক্ষা হইয়া থাকে—এতদিন আমাদের এই ধারণা ছিল। এখন দেখিতেছি ভারতবর্ষেও নানা স্থানে নানা ভাবে আমাদের চিন্তাবীরগণ নূতন নূতন শিক্ষা-প্রণালী উদ্ভাবন করিতেছেন এবং স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিয়া ধীরসংযতভাবে পরীক্ষার ফল অপেক্ষা করিতেছেন। এই সকল শিক্ষা-সংস্কারকের প্রয়াস প্রথম প্রথম যথোচিত সম্মানিত হইত না; কিন্তু অনেকদিনের অধ্যবসায়ের ফলে তাঁহাদের কেহ কেহ জনসাধারণের এবং শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমাদের শিক্ষাজগতে ইহা অতি সুসংবাদ। গবর্ণমেণ্ট-পরিচালিত শিক্ষাপদ্ধতিই যে ভারতবর্ষের পক্ষে এক মাত্র আদর্শ শিক্ষা-পদ্ধতি—এরূপ ধারণা আর বেশী লোকের নাই।

সেদিন হরিদ্বারের গুরুকুল পরিদর্শন করিয়া যুক্তপ্রদেশের সহৃদয় শাসনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত স্যার জেম্‌স্ মেষ্টন বাহাদুরও এই সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শিক্ষালয়টির সকল ব্যবস্থাই প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার উক্তিতে সকল স্থানেরই স্বাধীন শিক্ষা-পদ্ধতিগুলির মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন:—"সরকারী কাগজ-পত্রে গুরুকুলকে অতি ভয়ানক অনর্থের মূলরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে আসিয়া স্বচক্ষে দেখিলাম যে, এই ভীষণ বনের মধ্যে একদল কর্ত্তব্যপরায়ণ সন্ন্যাসী প্রাচীন ঋষিদিগের রীত্যনুসারে নূতন বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদান কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। এই কার্য্যের জন্য তাঁহারা কিছুমাত্র অর্থ প্রত্যাশা করেন না। এখানকার ছাত্রগণ বেশ সুস্থ সবল সুশীল রাজভক্ত সত্যবাদী এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ।"

এইরূপ শিক্ষালয় ভারতবর্ষে যত বেশী প্রতিষ্ঠিত হয় ততই মঙ্গল। এই সকল শিক্ষালয়ের আদর্শ আজকাল আমাদের নিকট নূতন হইয়া পড়িয়াছে—এজন্য জনসাধারণ এবং এমন কি শিক্ষিত ব্যক্তিগণও এগুলির আবশ্যকতা সহজে বুঝিতে পারেন না। এই কারণে দেশের ভিতর এই সমুদায়ের সফলতা সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়া বড় কঠিন।

কিন্তু ভারতবাসীর এখন যে অবস্থা তাহাতে বহুকাল পর্য্যন্ত আমাদিগকে কতকগুলি বিফল অথবা অর্দ্ধসফল প্রয়াস করিতে হইবে। আমরা আমাদের জাতীয় আদর্শ হইতে এত নিম্নে পড়িয়াছি এবং জীবন-সংগ্রাম দিন দিন এত

বাড়িতেছে যে, নূতন উচ্চতর আদর্শ লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে বহুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। আমাদের স্বায়ত্ত-শিক্ষা-প্রণালীর আবিষ্কারক ও প্রবর্ত্তকেরা বড় শীঘ্র সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তাঁহাদের শিক্ষালয়ে অভিভাবকগণের পূর্ণ ও সস্নেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করা সহজ-সাধ্য নয়। ছাত্রাভাবে তাঁহাদিগকে অনেক দিন নীরবে শিক্ষা-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে। এইরূপে কতিপয় কর্ম্মবীর সহিষ্ণুতার সহিত শিক্ষাসংস্কারের কর্ম্মে লাগিয়া থাকিলে ভবিষ্যতে সমগ্র সমাজ তাঁহাদের আদর্শ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইতে পারে।

সুতরাং ভারতবাসীদিগের নব নব শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে আমরা সফলতা বা বিফলতার বিচার করিতে ইচ্ছা করি না। বর্ত্তমানে আমরা কর্ম্মের জন্যই কর্ম্ম দেখিতে চাই। ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখি না। যদি কর্ম্ম করিতে করিতে কাহারও ভাগ্যে কথঞ্চিৎ সফলতা আসিয়া জুটে, ভালই। আর যদি পদে পদে বাধা-বিপত্তি-বিঘ্ন আসিয়া কর্ম্ম পণ্ড করিয়া দেয় তাহাতেও ক্ষতি নাই। সকল কর্ম্মেরই প্রারম্ভে এইরূপ নৈরাশ্যের কারণ উপস্থিত হয়। শিক্ষাসংস্কারকগণের তাহা ভুলিলে চলিবে না। আমাদের ভাবী বংশধরেরা শিক্ষাসংস্কারকগণের এই বিফল প্রয়াসগুলিকে সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবে।

সম্প্রতি বাঙ্গালাদেশের এক অতি নিভৃত পল্লীগ্রাম হইতে একটি স্বায়ত্ত-শিক্ষাপদ্ধতির বিবরণী আমাদের ইংরাজী পত্রিকায় প্রকাশ ও সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া 'কলোজিয়ানে' দিয়াছি। কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় বঙ্গভাষায় ইহার সর্ব্বাধিক প্রচার আবশ্যক। একটি পল্লীতে বিদ্যালয়ের সংশ্রবে থাকিয়া শিক্ষক ও ছাত্রগণ কত উপায়ে সমাজের হিতসাধন করিতে পারেন এই শিক্ষালয় হইতে পাঠকগণ তাহার ইঙ্গিত পাইবেন। যতদূর বুঝিতে পারিতেছি এই শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাতারা কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষ হইতে কোনরূপ উৎসাহ বা সাহায্য পান নাই, বরং নূতন কর্ম্মের যত বাধা-বিঘ্ন আছে সকলগুলিই তাঁহাদের ভাগ্যে জুটিয়াছে। প্রায় ৬।৭ বৎসর ধরিয়া তাঁহারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং রোগীদিগকে ঔষধ, বস্ত্র ও পথ্যাদান, সাধারণে শিক্ষা ও সাহিত্য-প্রচার, পল্লীতে পল্লীতে নূতন শাকসব্জী ও কৃষিজাত দ্রব্যের প্রচলন, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এবং মৌলিক সাহিত্যালোচনা প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা শিক্ষার অভিনব উচ্চ আদর্শ 'হাতে কলমে' প্রচার করিয়াছেন।

এই বিদ্যালয়টি মালদহ জেলার উত্তরাংশে কলিগ্রাম জনপদে অবস্থিত। বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধীনে যে সময়ে বাঙ্গালার জেলায় জেলায় নূতন প্রণালীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল সেই সময়ে মালদহ জেলায়ও একটি জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি গঠিত হয়। ইহার অধীনে জেলার মধ্যে নানা স্থানে অনেকগুলি বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। কলিগ্রামের শিক্ষালয়টি তাহাদের অন্যতম।

বঙ্গে জাতীয় শিক্ষা কেন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, বাঙ্গালার শিক্ষার আন্দোলনে,

সাহিত্যের জাগরণে, শিল্পের প্রতিষ্ঠায়, স্বার্থত্যাগ প্রবৃত্তির উদ্বোধনে, ও সমাজ-সেবার প্রচেষ্টায় বাঙ্গালার জাতীয় বিদ্যালয়গুলি ভিন্ন ভিন্ন জেলায় কি কি কার্য্য করিয়াছে, তাহা ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকগণ বুঝা পড়া করিয়া দেখিবেন। আমরা বর্ত্তমানের জীব—বর্ত্তমান কালে দেখিতে পাইতেছি যে, দেশের মধ্যে স্বাধীন ভাবে অন্ন সংস্থান করিবার পন্থা বেশী নাই। অথচ জাতীয় বিদ্যালয়ের শিল্পবিভাগগুলি অত্যল্প কালের ভিতর নূতন নূতন জীবিকা আবিষ্কার করিয়া দিতে অক্ষম। এজন্য স্বায়ত্ত-শিক্ষালয়ের ছাত্রগণের সংসারযাত্রা সম্বন্ধে আশা বড় কম। কাজেই এই শিক্ষালয়গুলির আদর্শ ও লক্ষ্য অনেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট হইলেও, ইহাদের ছাত্রগণের চরিত্র ও বিদ্যা অন্যান্য ছাত্র অপেক্ষা কোন অংশে হীন না হইলেও ইহারা সমাজে টিকিতে পারিল না। অনেকগুলিই উঠিয়া গিয়াছে, কয়েকটি মাত্র বিদ্যমান আছে। তাহাদের মধ্যে মালদহের শিক্ষা-সমিতি একটি। ইহাও টিকিবে কি না সন্দেহ করিলে অন্যায় হইবে না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আমরা কর্ম্ম চাই, চেষ্টা দেখিতে ইচ্ছা করি, অধ্যবসায়ের পরিচয় পাইলেই সুখী হই,—সফলতা সার্থকতার ধার ধারি না। জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তকগণ মানুষের জীবনযাপন সম্বন্ধে অতি উচ্চ আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন। সমগ্রদেশব্যাপী এরূপ একটা বিরাট আন্দোলন চালাইবার সময় এখনও আসে নাই। সমগ্র বঙ্গে এইরূপ কেবল একটি মাত্র ক্ষুদ্র 'জাতীয় শিক্ষালয়' চলিলেও চলিতে পারে। যাহা হউক, আমরা কলিগ্রামের শিক্ষালয়টির কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। এই আদর্শে নানা পল্লীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিলে বঙ্গের পল্লী-সমাজ শীঘ্রই উন্নত হইবে। পল্লীগ্রামের উন্নতির আর কোন উপায় নাই।

এই বিদ্যালয়ের সমুদায় কার্য্য, মালদহ জাতীয়-শিক্ষাসমিতির সুযোগ্য সম্পাদক, পরোপকারী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বি, এল মহাশয়ের আদেশ অনুসারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। পরিচালন-ভার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ সরকার তত্ত্বাবধায়ক ও সহকারী সম্পাদকের উপর বিন্যস্ত রহিয়াছে। বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের আদেশ উক্ত সহকারী সম্পাদক মহাশয় প্রদান করেন ও পরে সমিতির সম্পাদক মহাশয়কে বিজ্ঞাপিত করা হয়।

এই দুইজন স্বার্থত্যাগী কর্ম্মী পুরুষ ব্যতীত আরও কয়েকজন শিক্ষাপ্রচারকের যত্নে কলিগ্রামে সর্ব্বতোমুখিনী শিক্ষা এ পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কলিগ্রাম জনসাধারণের নেতৃস্থানীয়, বিবিধ সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র লাহিড়ী এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাঁহারা হরিদাস বাবুর "গম্ভীরা" গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহাকে কেবল মাত্র প্রত্নতত্ত্ববিৎরূপে জানেন না; তাঁহারা আনুষঙ্গিক ভাবে ইহার আজীবন পল্লীসেবা, পরোপকার ও স্বদেশানুরাগের পরিচয় পাইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি জাতীয় শিক্ষাপ্রচারে নিজের জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন। পল্লীসেবক হরিদাস এক নূতন ক্ষেত্রে তাঁহার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়া যে

ফল দেখাইয়াছেন তাহাতেও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই আনন্দিত হইবেন।

সন ১৩১৫ সালে কলিগ্রাম জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ের নিজের একটি বৃহৎ ইষ্টক নির্ম্মিত একতল গৃহ আছে। একখণ্ড নিষ্কর ভূখণ্ডের উপরে এই বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মিত। বিদ্যালয়টি পল্লী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে এবং উন্নত ভূখণ্ডোপরি প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথঞ্চিৎ স্বাস্থ্যপ্রদ। বিদ্যালয়ের চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত বায়ু ও আলোকের কোন বাধা নাই।

বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ মধ্যেই খেড়োঘর দুইখানি নির্ম্মিত হইয়াছে, উহার একখানি ছাত্রাবাস-রূপে এবং একখানি রন্ধনশালারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ছাত্রাবাস সন্নিকটে বিদ্যালয়ের একটি কূপ আছে। কতিপয় শিক্ষক ও ছাত্র বিদ্যালয়-গৃহেই অবস্থান করেন।

পুস্তকালয়

বিদ্যালয় মধ্যেই একটি পুস্তকাগার আছে। বৎসরে বৎসরে পুস্তক-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। বর্ত্তমানে যতগুলি পুস্তক রহিয়াছে, তন্মধ্যে কতিপয় পুস্তক মালদহ জেলার কৃতবিদ্য ছাত্রগণ এই বিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন। বিজ্ঞান-বিষয়ক অধিকাংশ মূল্যবান পুস্তকই মালদহের অধ্যাপকগণ দান করিয়াছেন। গ্রামবাসীর নিকট হইতেও কয়েকখানি পাওয়া গিয়াছে। প্রতিবৎসর বিদ্যালয়ের তহবিল হইতে অত্যাবশ্যক পুস্তকগুলি ক্রয় করা হয়। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ সরকার মহাশয় ইতিহাস বিষয়ক ৬০৲ টাকার পুস্তক প্রদান করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণও অনেকগুলি মূল্যবান পুস্তক প্রদান করিয়া পুস্তকাগারের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। দুইটি বৃহৎ আলমারী পুস্তকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বহু পুস্তক একটি আলমারী অভাবে একত্রে স্তূপাকারে জমা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি জেলার মানচিত্র অধ্যাপকগণ নিজ ব্যয়ে ক্রয় করিয়াছেন।

কারখানা

বিদ্যালয় গৃহের বারান্দায় কারখানার কার্য্য হইয়া থাকে। সূত্রধরের কর্ম্মশিক্ষা দেওয়াই কারখানার উদ্দেশ্য। এই কারখানার জন্য প্রায় ২০০৲ টাকা মূল্যের যন্ত্রাদি দান-স্বরূপ পাওয়া গিয়াছিল। বিদ্যালয়ের প্রারম্ভে ও গতবর্ষে এই বিভাগে কিছু কিছু কাজ হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে এই কার্য্য প্রায় স্থগিত আছে। সামান্যমাত্র মেরামতের কার্য্য অধ্যাপক ও ছাত্রগণ করিয়া থাকেন।

অনাথ-আশ্রম

ভাদ্র, আশ্বিন মাসে এতদঞ্চলে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ অত্যধিক হয়। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ পল্লী-পর্য্যবেক্ষণ কালে দেখিতে পান—বিনা ঔষধে অনেক দরিদ্রের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং অধ্যাপকগণ প্রথমে গবর্ণমেণ্টের কুইনাইন ট্যাবলেট যথেষ্ট পরিমাণে ক্রয় করিয়া পীড়িত দরিদ্রগণকে বিতরণ করিয়া সুফল লাভ করেন।

অধিকাংশ দরিদ্র কৃষক-শিশু উপযুক্ত বস্ত্রাভাবে ও ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল। অধ্যাপক ও ছাত্রগণ ইহা দর্শনে কাতর হইয়া পড়েন।

অধ্যাপকগণ আপন আপন বস্ত্র, কম্বল দান করেন। বিদ্যালয়ের সহকারী সম্পাদক পীড়িত শিশুগণের যথেষ্ট সাহায্য করেন, গ্রামের মহাজন শ্রীযুক্ত জগবন্ধু সরকার মহাশয় কিছু নগদ টাকা এবং কয়েকটি পুরাতন জামা প্রদান করেন। অধ্যাপক, ছাত্র, সহকারী সম্পাদক ও জগবন্ধু বাবুর দানে, কয়েক ডজন গেঞ্জি ও মোজা ক্রয় করা হয়। অধ্যাপকগণ উপযুক্ত পাত্র অনুসারে মোজা ও গেঞ্জি দান করিয়া অনেকগুলি পীড়িত শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক ও ছাত্রগণ গ্রামবাসী ধনিগণের নিকট ছিন্ন বস্ত্র, জামা প্রভৃতি ভিক্ষা করিয়া তাহা নিজ হস্তে সেলাই ও ধৌত করিয়া অনেকগুলি অনাথা রমণীর লজ্জা নিবারণ ও সহায়হীন দরিদ্র বৃদ্ধগণের শীত নিবারণ করিতে সমর্থ হয়েন।

যখন দেখা গেল কেবলমাত্র কুইনাইন বিতরণে দরিদ্রগণকে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা করা অসম্ভব, তখন তাঁহারা নিজব্যয়ে গ্রাম্য-চিকিৎসালয় হইতে কয়েক শিশি ঔষধ ক্রয় করিয়া, ফিবার মিকশ্চার, কুইনাইন মিকশ্চার দিবার ব্যবস্থা করিয়া বিদ্যালয়-গৃহেই একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন। সহকারী সম্পাদক মহাশয় এই মহৎ কার্য্যে উদ্যোগী হন। তাঁহারই ঐকান্তিক যত্নে ও সাহায্যে কলিকাতা হইতে প্রায় একশত টাকা মূল্যের ঔষধ ও ডাক্তারখানার অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করা হয়। পরোপকারী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় এই সেবাকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রধান স্তম্ভস্বরূপ।

এই উপায়ে অনাথ-আশ্রমের ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠা হইল। এই অনাথ-আশ্রমের "দাতব্য চিকিৎসালয়"-বিভাগে আজ পর্য্যন্ত ২০০০এর অধিক রোগীর নাম রেজিষ্টারীভুক্ত হইয়াছে। এই অনাথ-আশ্রমের সেবকগণ দরিদ্রকে বস্ত্র, পথ্য এবং ঔষধাদি বিনামূল্যে প্রদান করিয়া থাকেন। অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলী এই কার্য্যে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকেন। পরোপকারই যে জীবনের মহান্ ব্রত তাহা এই অনাথ-আশ্রমেই যে দৃষ্ট হয় তাহা নহে। অধ্যাপক ও ছাত্রগণ সকল অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই ত্যাগ, সেবা ও পরোপকার শিক্ষা করেন।

এই 'চিকিৎসা-বিভাগ' হইতে রোগিগণের রোগ-উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান, এবং রোগ নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া অধ্যাপক ও ছাত্রগণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি আপনা আপনি শিক্ষা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। সুতরাং শারীরবিদ্যা পাঠের ফল এই অনাথ-আশ্রম হইতে অনায়াসে পাওয়া যায়।

এইরূপে অধ্যাপকগণকে কম্পাউণ্ডারের কার্য্যে সাহায্য করিতে করিতে কয়েকজন ছাত্র-এপ্রেন্টিস চিকিৎসা শাস্ত্রে কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

পানীয় জলাশয় প্রতিষ্ঠা

অনাথ-আশ্রমের সেবকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, একমাত্র বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবেই এতদঞ্চলে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, রক্তামাশয় প্রভৃতি রোগ মধ্যে মধ্যে প্রবল হইয়া বহু পল্লীবাসী নর-নারীর জীবন হরণ করিতেছে, এজন্য তাঁহারা কেবলমাত্র

কলিগ্রাম জাতীয় বিদ্যালয়ের অনাথ আশ্রম

[গত বৎসর এই আশ্রম হইতে ২০০০এর অধিক দুঃস্থ ব্যক্তিকে ঔষধ দান করা হইয়াছে]
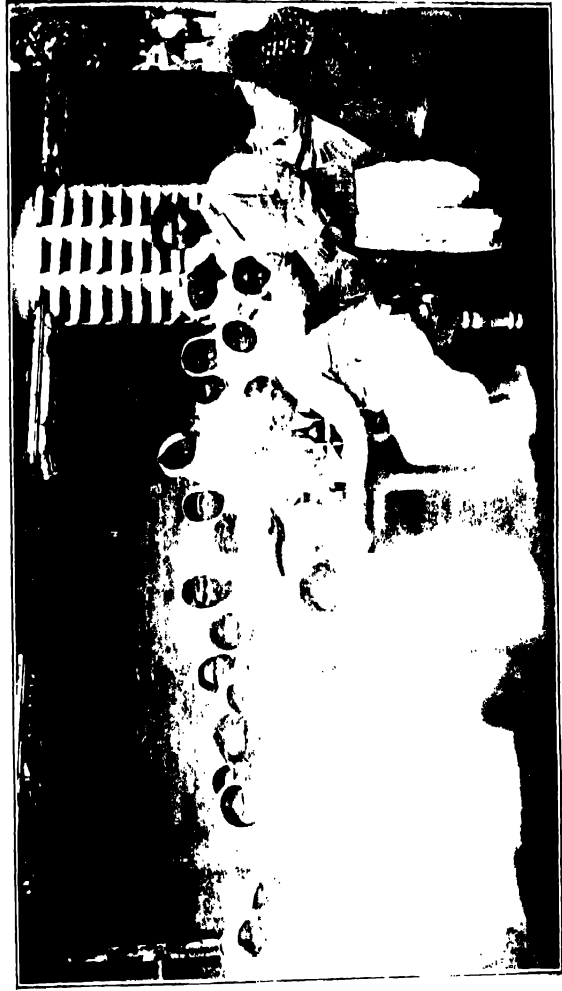
Emerald Press, Calcutta.

পানীয় জলের জন্য একটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের ব্যবস্থার জন্য উৎসাহী হইয়াছেন। পল্লীবাসীরাও এই কার্য্যে যোগ দিতেছেন। শীঘ্র একটি পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার পূর্ব্বক কেবল পানীয় জলের জন্য উহা সংরক্ষিত হইবে এবং উহার পাড়ে উদ্ভিদ-উদ্যান প্রতিষ্ঠিত হইবে। উক্ত উদ্ভিদ-উদ্যান মধ্যে এদেশে প্রচলিত বন্য ভেষজ সযত্নে রক্ষা করা হইবে।

দেশীয় ভেষজের গুণ-পরীক্ষা

অধ্যাপকগণ দাতব্য ঔষধালয়ে কর্ম্ম করিতে করিতে প্রায়ই দেখিতে পাইলেন অনেক রোগী নানাপ্রকার বন্য গাছ-গাছড়া ঔষধ রূপে ব্যবহার করিতেছে এবং তদ্দ্বারা মধ্যে মধ্যে সুন্দর সুফল লাভ করিতেছে। তখন অধ্যাপকগণের দৃষ্টি গ্রাম্য ভেষজের প্রতি আকৃষ্ট হইল। অনুসন্ধান দ্বারা তাঁহারা অবগত হইলেন যে, দাদ, আমাশয়, মাথাধরা, কামলা (জণ্ডিস্) প্রভৃতি রোগে পল্লীবাসী কয়েক প্রকার উদ্ভিদ প্রলেপ ও পানীয়রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। সুতরাং উক্ত ভেষজ-গুণপূর্ণ উদ্ভিদের যথার্থ গুণ পরীক্ষার জন্য তাঁহারা আয়োজন করিলেন।

এদেশে একরকম বন্য কণ্টক-লতার নাম "গাহাকাঠ"। এই কাঠ কুচি কুচি করিয়া এদেশের সর্ব্বসাধারণ রাত্রে চিনি বা মিছরীর সহিত ভিজাইয়া রাখে এবং প্রাতে ছাঁকিয়া পান করে। এই প্রকার কয়েক দিন করিলেই কামলা রোগ আরোগ্য হইতে দেখা যায়। অধ্যাপকগণ গাহাকাঠের টিংচার ও পাউডার রূপে উক্ত ব্যাধিতে প্রয়োগ পূর্ব্বক পরীক্ষা করিতেছেন। এই প্রকারের কতিপয় ভেষজ-গুণপূর্ণ উদ্ভিদের পরীক্ষাকার্য্য চলিতেছে।

কৃষি-বিভাগ

'আরোহ-পদ্ধতি'মূলক শিক্ষা-প্রণালী অনুসারে এই বিদ্যালয়ে উদ্ভিদ-বিদ্যা, কৃষি-বিদ্যা, শারীর-বিজ্ঞান, প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতির কার্য্যকরী শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। এই সমুদায় শিক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক পাঠ করিতে হয় না।

উদ্ভিদ-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয়-সংলগ্ন উদ্যানে বিবিধ বন্য এবং উদ্যানজাত উদ্ভিদের সমাবেশ করা হইয়াছে। অধ্যাপক ও ছাত্রগণ উদ্যানজাত উদ্ভিদ সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং মূল, পত্র, পুষ্প, ফল সম্বন্ধে গবেষণা-কালে উদ্যানে অবস্থানপূর্ব্বক উদ্ভিদের অংশবিশেষ লইয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন। উদ্ভিদের অংশগুলি ব্যবচ্ছেদ দ্বারা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

এই প্রকার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য উদ্ভিদের ব্যবহার ও কৃষিবিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে। বিভিন্ন উদ্ভিদের গন্ধ, স্বাদ, আকার ও গঠন-প্রণালীর কৌশল ছাত্রগণকেই বলিতে হয়। প্রত্যেক উদ্ভিদ আমাদের কি কি প্রয়োজনে লাগে এবং কোন্ কোন্ উদ্ভিদের কোন্ কোন্ অংশ সচরাচর কি কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তাহা ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথমতঃ চিরপরিচিত উদ্ভিদ লইয়াই শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ হয়। পরিচিত উদ্ভিদের সাদৃশ্য দর্শনে ছাত্রগণই স্বয়ং স্বাধীনভাবে শ্রেণীবিভাগ করিতে অভ্যস্ত হয়।

মূল, ফল, পুষ্প হইতে বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিবার শিক্ষা-প্রণালী

উদ্ভিদ-শাস্ত্রের অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদের মূল, ফল, পুষ্প হইতে কোন্ ব্যবহার্য্য

দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে বা হইতে পারে তাহা গল্পচ্ছলে শিক্ষা দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। যথা—

মূল হইতে—এরারুট প্রস্তুত করিবার প্রণালী এবং কাসাভা হইতে 'আটা' (ময়দা) প্রস্তুত করিবার প্রণালী।

ফল হইতে—মোরব্বা, জেলী, সিরাপ, আচার, ফল শুষ্ক করিবার প্রণালী এবং ফল-সংরক্ষণ-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়।

পুষ্প হইতে—জল, মোরব্বা, আতর, এসেন্স প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখান হয়। পলাশ, শেফালী, কুসুম প্রভৃতি পুষ্প হইতে বর্ণ নিষ্কাশন করা হয়।

নূতন বৎসরে আমের আচার, মোরব্বা, আমচুর, আমসত্ত্ব ও আম-সংরক্ষণ প্রণালী কার্য্যকরী ভাবে শিক্ষা দিবার আয়োজন হইতেছে।

কোন্ কোন্ উদ্ভিদের চাষ করিতে পারিলে যথেষ্ট লাভের সম্ভব তাহাও শিক্ষা দেওয়া হয়। আলু, আখ, মাটবাদামের চাষ এদেশে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে।

ফসলের পোকা

কৃষি ও উদ্ভিদ-বিদ্যার সহিত প্রাণী-বিদ্যার কি সম্বন্ধ তাহা দেখাইবার জন্য বিবিধ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ফসল বুনিলে সচরাচর দেখা যায় বহুবিধ ফড়িং, পোকা ও প্রজাপতি জাতীয় প্রাণী ফসলের যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়া থাকে। সুতরাং কৃষি ও উদ্ভিদ-বিদ্যা শিক্ষার সহিত এতাদৃশ ফসলের অনিষ্টকারী প্রাণীর বিষয় শিক্ষাও একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই প্রকার শিক্ষা দিবার জন্য পরলোকগত নৃত্যগোপাল মুখার্জী ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের ফসলের পোকা বিষয়ক পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

অধ্যাপকগণের সহিত ছাত্রগণ বনভ্রমণ দ্বারা উদ্ভিদের পর্য্যায় আলোচনা করিয়া থাকে। অনেকগুলি অরকিড্ ও বিবিধ লতাগুল্ম বিদ্যালয়ের সংলগ্ন বারান্দায় ও পুষ্পোদ্যানে রক্ষিত হইয়াছে। নূতন নূতন বন্য উদ্ভিদের নামকরণও হইতেছে। ছাত্রগণ ফুল, ফল, পাতা প্রভৃতি উদ্ভিদাঙ্গ ব্যবচ্ছেদ দ্বারা শিক্ষা করে। ছাত্রগণ নিজ হস্তে উদ্ভিদ প্রতিপালন করিতে শিক্ষা করিতেছে। জল-সেচন, বীজবপন, ও উদ্ভিদ বিশেষের অবস্থান-স্থান নির্ণয়, রোপণ, বপন ও সংরক্ষণ শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। উদ্ভিদ-বিদ্যা শিক্ষার সহিত বিদ্যালয়-সংলগ্ন ক্ষেত্রে বহুবিধ সময়োপযোগী শাক, মূল, ফল ইত্যাদির চাষ চলিতেছে। কি প্রণালী অবলম্বনে কোন কোন আহার্য্য শাক, মূল ফলাদির চাষ করিতে হয় তাহা অধ্যাপকগণ ও ছাত্রগণ একত্রে কার্য্য করিয়া শিক্ষা করেন।

প্রত্যেক ছাত্রকে দুই বর্গ হাত ভূখণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে। প্রত্যেককে উক্ত ক্ষেত্র কোদালি দিয়া খুঁড়িয়া, আলি দিয়া, জলসেচন করিয়া বীজ বপন ও চারা রোপণ করিতে হয়। উদ্ভিদবিদ্যাকে ব্যবহারোপযোগী শিক্ষায় পরিণত করিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ছাত্রগণের মধ্যে যে যে কৃতিত্ব দেখাইতে পারে তাহাদিগকে পুরস্কার ও পদক দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিভিন্ন জেলার বীজ বপন পূর্ব্বক এই আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

দেশীয় বিবিধ বীজসংগ্রহ, উহাদের বপন ও রোপণ-প্রণালী

সকল প্রকার বীজ-সংগ্রহ, বীজ রক্ষা শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয়স্থ উদ্যানাংশের বারান্দায় বিবিধ বীজ শিশিতে করিয়া রাখা হইয়াছে। কোন্ প্রকার উদ্ভিদের শ্রেণীভেদে কোন্ প্রকার বীজ উৎপন্ন হয়, কোন্ প্রকার বীজ উৎকৃষ্ট, কোন্ প্রকার বীজ নিকৃষ্ট, কোন্ কোন্ সময়ে সেই সব বীজ অঙ্কুরোৎপাদনের জন্য বপন করিতে হইবে তাহাও শিক্ষা দেওয়া হয়।

কোন্ উদ্ভিদে কোন্ প্রকার সার প্রদান করিতে হয় তাহাও শিক্ষা দিবার চেষ্টা থাকে। কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্র ছাত্রদিগকে পাঠ করিতে ও দুর্ব্বোধ্য অংশ বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

জগতে উদ্ভিদ-বিদ্যাবিষয়ক বহু নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কৃত হইতেছে। তাহার ফলে অব্যবহার্য্য অখাদ্য উদ্ভিদ-সমূহ ক্রমশঃ আমাদের ব্যবহারের উপযোগী ও খাদ্য মধ্যে পরিগণিত হইতেছে। আমাদের দেশে বন্য অব্যবহার্য্য উদ্ভিদের মধ্যে কোন কোনটি আমাদের ব্যবহারে আসিতে পারে এই উদ্দেশ্যে বিবিধ উদ্ভিদের অনুসন্ধান চলিতেছে। এই বিদ্যালয়ে বিবিধ বন্য উদ্ভিদের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও বিনাশের ধারা অবগত হইবার জন্য সবিশেষ উদ্যম ও যত্ন লওয়া হইয়া থাকে।

ফুল ও ফলের আকারগত ও উপাদানগত পরিবর্ত্তনের যে কৌশল, তাহা ক্রমশঃ শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হইবে। বহুবিধ ফসলের পোকার ফ্রেমে-বাধান চিত্র, শিশিতে এলকোহল-রক্ষিত পোকা এবং প্রজাপতি জাতীয় প্রাণী দেখান হয়। উদ্যানস্থ উদ্ভিদ-গুলির কোন্ কোন্ পোকাদ্বারা কি অনিষ্ট হইতেছে তাহা কার্য্যকরী ভাবে দেখাইয়া আলোচনা করিবার সুযোগ প্রদান করা হয়। এই প্রকার শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত পুস্তক ও চিত্রাদি অধ্যাপকগণ নিজব্যয়ে ক্রয় করিয়াছেন।

এই কৃষি উদ্যান সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা এ স্থলে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই উদ্যানে সময়োপযোগী নানাপ্রকার তরী-তরকারি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র উদ্যান হইতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে এমন কি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের গৃহে গৃহে বীজ ও চারাগাছ সমূহ বিতরিত হইয়াছে, এবং নূতন নূতন নিত্য ব্যবহার্য্য তরকারী উৎপন্ন করিতে সকলকে উৎসাহিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নিজে একটু পরিশ্রম করিলেই নিজের বাড়ীতে নানাপ্রকার শাক-সব্জী সকলেই অনায়াসে উৎপন্ন করিতে পারে। গ্রামের সকলকে ইহার উপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা হইতেছে। অনেক বাড়ীতে নূতন নূতন শাকসব্জী ইতিমধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ইহাই আনন্দের বিষয়।

মূলা, শালগম, বেগুন, সিম প্রভৃতি তরকারী যথেষ্ট পরিমাণে এখানে উৎপন্ন হইয়াছিল, গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে সেই সমস্ত তরকারী বিতরিত ও উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। সাধারণ গৃহস্থেরা এই উপায়ে গৃহস্থালী খরচ কত কমাইতে পারেন, অথচ বার মাসে তের তরকারী স্বচ্ছন্দে খাইয়া সুখে দিন কাটাইতে পারেন—এ বিষয়ে

কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ জীবনই আমাদের আদর্শ।

প্রাণী-বিদ্যা

প্রাণীবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য অধ্যাপকগণকে স্বতন্ত্রভাবে উৎকৃষ্ট পুস্তক ও বিবিধ সংবাদ-পত্র পাঠ করিতে হয়। গো, মেষ, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতি নিয়ত ব্যবহার্য্য পশুগুলির পালন ও রক্ষণ শিক্ষার সহিত উহাদের মলমূত্র যে কৃষিকার্য্যের প্রধান সহায় ও সার তাহা তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। গোময় ও গোমূত্রাদি হইতে সার প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। দুগ্ধের বিবিধ প্রকারে ব্যবহার এবং চর্ম্ম, অস্থি, খুর, শৃঙ্গ, রক্ত প্রভৃতি বর্ত্তমান কালে কোন্ কোন্ শিল্প-কর্ম্মে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা বলা হয়। মানবের পীড়াকালে যে সকল এলোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করা হয়, পশুগণের পক্ষেও তাহা কার্য্যকরী ইত্যাদি বিষয় শিখান হয়।

বিজ্ঞান-শিক্ষার সরঞ্জাম

বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণের জন্য পদার্থবিদ্যা রসায়নাদি বিজ্ঞানশিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। বিজ্ঞানাগারে প্রায় ২০০৲ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে। যদিও যন্ত্রাদি যৎসামান্য, কিন্তু প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষা ইহার দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। রসায়ন ও পদার্থবিদ্যাবিষয়ক শিক্ষা বিজ্ঞানাগারেই সম্পন্ন হয়। ফলিত রসায়ন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীতে নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিস সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়, ক্রমে উচ্চ শ্রেণীতে অনায়াসলভ্য পদার্থ এবং তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। পদার্থ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে নিম্নশ্রেণীতে ছাত্রগণ পদার্থের সাধারণ ধর্ম্ম এবং ক্রমে ক্রমে উচ্চ শ্রেণীতে Mechanics, Hydrostatics এবং তাপ ও আলো প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের 'Steps to a University' বা 'শিক্ষাসোপান' নামক পাঠ্যতালিকা অনুসারে সকল প্রকার বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা-কার্য্য চলিতেছে। কোন পুস্তকের সাহায্য না লইয়া সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষকেরা স্বচেষ্টায় পুস্তিকা তৈয়ারী করিয়া লয়েন।

(ক) রসায়ন—বিদ্যালয়-গৃহের এক অংশে ক্ষুদ্র রসায়নাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ সেই গৃহে, রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকের নিকট, উক্ত শাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞান পরীক্ষাদ্বারা শিক্ষা করিয়া থাকে। ছাত্রগণের রসায়ন-বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্ন চাক্ষুষ ভাবে উক্ত অধ্যাপকের নিকট মীমাংসিত হইয়া থাকে।

(খ) পদার্থবিদ্যা—পদার্থ-বিদ্যাবিষয়ক কতিপয় যন্ত্রাদি ও উপাদান রসায়নাগারের মধ্যেই এক পার্শ্বে সজ্জিত রহিয়াছে। ছাত্রগণ উক্ত গৃহে অবস্থান করিয়া পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা লাভ করিতেছে।

(গ) শারীরবিদ্যা—অধিকাংশ ছাত্রগণকেই শারীরবিদ্যায় একটু আধটু জ্ঞান লাভ করিতেই হয়। শারীরবিদ্যার অধ্যাপক চিত্র অঙ্কন, ছাত্রদের দৈহিক গঠন ও সঙ্কালন দ্বারা উপদেশ দিয়া থাকেন। শরীরের প্রত্যেক যন্ত্রের কার্য্য-প্রণালীর উল্লেখ করা হয়; পিত্ত, লালা, মূত্র ইত্যাদির পরীক্ষা এবং দেহে তাহাদের কার্য্যপ্রণালীর বিষয় উল্লেখ করা

হয়। এই উপায়ে শিক্ষকগণ সুস্থাবস্থায় দেহ-যন্ত্রের একটা কার্য্য-প্রণালী ছাত্রদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। এই সুত্রাবলম্বনে তাহাদিগকে "শরীর-পালন" বিষয়ক আবশ্যক উপদেশও প্রদত্ত হইয়া থাকে এবং শারীরবিদ্যা, শরীরপালন দ্বারা স্বাস্থ্য যে উন্নত হয় তাহার ধারণা ছাত্রগণের হৃদয়ে দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত করিবার প্রয়াসও চলিতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শারীরবিদ্যার সহিত শরীরপালন-শাস্ত্রের কীদৃশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাও দেখান হইয়া থাকে। কলিগ্রাম জাতীয় বিদ্যালয়ের একাংশে "অনাথাশ্রম" নামক কার্য্যালয়-গৃহে প্রতিদিন প্রাতে ও বিদ্যালয়ের ছুটির পর (অপরাহ্নে) দরিদ্রগণকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ হইয়া থাকে। অধ্যাপক ও ছাত্রগণ সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া ঔষধ বিতরণ এবং রোগনির্ণয়সহ রোগোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে শারীর-বিদ্যা ও শরীরপালনের শিক্ষা কার্য্যকরী-ভাবে শিক্ষা করিতেছেন।

ভূগোলশিক্ষায় 'আরোহ-পদ্ধতি'

ভূগোল ও মানচিত্র-প্রদর্শন শিক্ষার পূর্ব্বেই প্রত্যেক ছাত্রকে তাহাদের গ্রাম পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা গ্রামের সংস্থান, কয়টি পাড়া, কয়টি রাস্তা, কতকগুলি খাল-বিল আছে তাহা জানিতে হয়; নিজ নিজ গ্রামে, ডাক্তার-খানা, পোষ্টাফিষ, হাট, বাজার, দোকান সম্বন্ধে স্থান নির্দ্দেশ করিতে হয়, এবং গ্রামের এক খানি করিয়া মানচিত্র অঙ্কন পূর্ব্বক নিজ নিজ বাসভবন হইতে কোন্ কোন্ দিকে কোন্ কোন্ পাড়া ইত্যাদির অবস্থান নির্দ্দেশ করিতে হয়। তৎপরে নিজ গ্রাম হইতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির অবস্থান ও দিক নির্ণয় করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। কোন্ কোন্ পথে কোন্ কোন্ গ্রামে গমনাগমনের সুবিধা এবং কোন্ পথ সরল কোন্‌টি দীর্ঘ তাহা শিখান হয়। কোন পথে গাড়ী চলে কোন্ পথে চলে না, বা কোন পথে কেবল গো ও অশ্ব দ্বারা মালপত্র আমদানি বা রপ্তানি হয় তাহা ছাত্রগণকে অনুসন্ধান করিতে হয়। কোন্ কোন্ গ্রামে হাট, বাজার, দোকান আছে, কোন্ কোন্ গ্রামে নাই এবং যে গ্রামে হাট, বাজার, দোকান নাই, তাহারা কোন্ কোন্ গ্রাম হইতে বা কোন্ কোন্ গ্রামে গিয়া কোন্ কোন্ দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় করে তাহা শিখান হয়। তৎপরে নিজ নিজ পল্লী ও পারিপার্শ্বিক পল্লীগুলি কোন্ থানার অধীন এবং সেই থানার অধীনে কতগুলি গ্রাম ও পল্লী আছে, কতগুলি পথ আছে, কোন নদী আছে কি না, থাকিলে সেই নদী-পথে কোন্ কোন্ গ্রামে গমনাগমন করা যায় তাহাও শিখান হয়। নিজ গ্রামে কি কি কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য দ্রব্য আছে তাহা কোথায় বিক্রয় হয় এবং কি প্রকারে বিক্রয় হয় তাহাও শিখান হয়। এইরূপ ভূগোল শিক্ষায় বিদ্যা-লয়ের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক (সম্প্রতি আমেরিকায় উচ্চশিক্ষার্থী) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর "মালদহ জেলার বিবরণ" পুস্তিকার সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

এই প্রকারে মালদহ জেলার থানা, নদী, পথ, বিল, খাল সম্বন্ধে জ্ঞান-প্রদানের সহিত মানচিত্র অঙ্কন করান হয়। সমগ্র জেলার চতুঃসীমা, নদী, পথ, হাট, বাজার

সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়া থাকে। নদী-পথে সমগ্র মালদহ ভ্রমণ এবং স্থলপথে সমগ্র মালদহ ভ্রমণ সম্বন্ধে সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞানদানের পর, নিজ গ্রাম হইতে মালদহ সদরে গমনের যতগুলি পথের, ও নদীর সুবিধা আছে তাহা শিখান হয়। কোন্ কোন্ পথের পার্শ্বে বা নদীর ধারে কতকগুলি গ্রাম, বাজার, হাট আছে তাহা দেখাইয়া কোথায় ধান, চাউল, কোথায় পাট ইত্যাদির ক্রয় বিক্রয় হয়, কোথায় কোন্ কোন্ ফসল যথেষ্ট উৎপন্ন হয় এবং তাহা কোথায় কি প্রকার বিক্রয়ের সুবিধা আছে তাহার সংবাদও দেওয়া হয়।

জেলার থানা, আদালত, রেজিষ্টরি অফিস-গুলি সম্বন্ধে ও মুনসেফ, জজ, কালেক্টর, ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, মিউনিসিপালিটি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে অন্যান্য জেলাগুলির বিবরণ দিয়া ছাত্রগণকে সমগ্র বঙ্গদেশের সহিত পরিচিত করান হয়। কোন জেলায় গমনাগমনের জন্য রেলওয়ে বা নদী-পথেই সুবিধা তাহাও আলোচনা করা হয়। ভূগোল শিক্ষায় বাঙ্গালাদেশ ও ভারতবর্ষেরই প্রাধান্য থাকে; এবং কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কেই নদনদী, বনজঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়। কেবলমাত্র কতকগুলি নির্জ্জীব নাম মুখস্থ করান হয় না।

ভূগোল-পাঠের সহিত গোলক দ্বারা পৃথিবীর আকার ও গতি, দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস ও বৎসর সম্বন্ধে জ্ঞান দান করাও হয়; সূর্য্য ও চন্দ্র, তাহাদের দূরত্ব, আকার, গতি, জোয়ারভাটা, সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণের কারণ, নীহারিকা কি? এবং গ্রহ ও নক্ষত্র সম্বন্ধে স্থূলজ্ঞান প্রদান করতঃ ভূবিজ্ঞান সমাপ্ত করা হয়।

গণিত

গণিত শিক্ষার জন্য, কড়ি, কাঁইবিচি প্রথমে ব্যবহার করিয়া সংখ্যা সম্বন্ধে জ্ঞানদান করা হয়। এ বিদ্যালয়ে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ইত্যাদি শিক্ষা সাধারণ বিদ্যালয়ের ন্যায় হয় না। কতকগুলি নীরস সংখ্যার উল্লেখ করিয়া যোগ বিয়োগ শিক্ষা দিবার রীতি এখানে প্রচলিত নাই। টাকা-পয়সা, গরু-বাছুর, থালা-বাসন প্রভৃতি বস্তুর উল্লেখ করিয়া যোগ বিয়োগাদি শিখান হয়। ব্যবসায়, বাণিজ্য, দোকানদারী, গৃহস্থালী, লোক-গণনা, কেনাবেচা, ধার দেওয়া, ধার লওয়া প্রভৃতি ব্যাপারের সম্পর্কেই গণিত-শাস্ত্রের অঙ্ক কষান হয়।

বিঘা, কাঠা ইত্যাদি দ্বারা নিকটবর্ত্তী জমি মাপিয়া তাহা হইতে যোগ-বিয়োগ, কাঠাকালি, বিঘাকালি শিখান হয়। দুগ্ধ, তেল, চা'ল, ডা'ল, মাপ দ্বারা হিসাব শিখান হয়।

ভাষা ও সাহিত্য

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের শিক্ষা-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষা শিখান হইয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীতে কোন পাঠ্য পুস্তক পাঠ করিবার রীতি প্রচলিত নাই। অধ্যাপকগণ মুখে মুখে শিক্ষা দিয়া থাকেন। কোন ছাত্রকে কোন পুস্তক মুখস্থ করান হয় না। উর্দ্ধতন শ্রেণীতে পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও পদ্য আবৃত্তি ব্যতীত ব্যাকরণ বা অন্য কিছু মুখস্থ করিতে দেওয়া হয় না। এজন্য অধ্যাপকগণকে

যথেষ্ট কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। অধ্যাপকগণই ছাত্রগণের পাঠ্যপুস্তকরূপে কার্য্য করেন।

ইতিহাস

কোন ছাত্রকেই ইতিহাস মুখস্থ করিতে দেওয়া হয় না। কতকগুলি সন, তারিখ, রাজার নাম ও ঘটনা-সমষ্টি শিক্ষা প্রকৃত ইতিহাস শিক্ষা নহে। ইতিহাসের মধ্য দিয়া জাতির সামাজিক পতন উত্থান ধর্ম্মের ক্রম-বিকাশ, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের পতন-উত্থানের ধারা শিক্ষা দেওয়া হয়। কখন কোন্ কোন্ জাতির সহিত মিশিয়া জাতি, সমাজ ও ধর্ম্মের কীদৃশ গঠন হইয়াছে, কোন্ কোন্ নৈসর্গিক কারণে ভাব-স্রোত কোন্ পথে প্রবাহিত হইয়াছে, আবার কোন কোন্ রাষ্ট্রীয়বিপ্লবে জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ, সভ্যতার কি প্রকার উন্নতি বা অবনতি হইয়াছে তাহা শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা, রাজ্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করা হয়।

ধর্ম্মের, সমাজের ও দেশের বর্ত্তমান অবস্থা এবং রাজ্য-শাসনের নিয়মাদি শিক্ষা দিয়া তৎপরে অতীত কালের ইতিহাস শিক্ষা প্রদান করা হয়। অতীতের ঐতিহাসিক ঘটনা এক্ষণে বর্ত্তমান নাই, কেবল ভাব ও ভাব পরিজ্ঞাপক চিহ্ন অবলম্বনই অতীতের ইতিহাস। বর্ত্তমান ঘটনা কিছুদিন পরে বা ঘটনার পরে বর্ত্তমান থাকে না—কেবল ইহার ভাবস্রোত মাত্র বিদ্যমান থাকে। সেই ভাবস্রোতের একটা ক্রমিক পতন-উত্থানের ধারা মাত্র বিদ্যমান থাকে—উহাই ইতিহাসের ধারা। এই ভাব-ধারা অবলম্বনে বর্ত্তমানের ইতিহাস হইতে অতীতের ইতিহাসের দিকে ছাত্রগণের চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত জাতীয় ইতিহাসের ধারা কি প্রকারে গঠিত হয় তাহাও শিক্ষা দেওয়া হয়। উচ্চ শ্রেণীতে 'গৌড়ের ইতিহাস,' 'গম্ভীরা' ও 'গৌড়-রাজমালা' ইত্যাদি গ্রন্থের সাহায্যে হিন্দু-রাজত্বের বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, কিন্তু ছাত্রদিগকে উক্ত তিনখানি ইতিহাসের মধ্যে কোনখানিই পাঠ করিতে দেওয়া হয় না। অধ্যাপকগণ মৌখিক উপদেশ ও নোট লিখাইয়া দিয়া ইতিহাস-শিক্ষা সমাধা করিতেছেন।

উর্দ্দু ও হিন্দী

কলিগ্রাম জাতীয় বিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটি উর্দ্দু ও হিন্দী শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একজন উপযুক্ত মৌলবী উর্দ্দু ও হিন্দী শিক্ষা দিয়া থাকেন। মুসলমান ও হিন্দু বালকগণ শিক্ষা করে। প্রত্যেক মুসলমান ছাত্রকে উর্দ্দু ও হিন্দী শিক্ষার জন্য এক ঘণ্টা করিয়া প্রতিদিন সময় প্রদত্ত হইয়াছে। মুসলমান বালকগণ জাতীয় বিদ্যালয়ের সকল প্রকার শিক্ষার সহিত উর্দ্দু ও হিন্দী শিক্ষা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দু বালকদিগকেও মাতৃভাষা ব্যতীত দুইটি ভাষা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেকগুলি হিন্দু বালক উর্দ্দু ও হিন্দী শিক্ষা করিতেছে।

হিন্দু ও মুসলমান বালকদিগকে উর্দ্দু ও হিন্দী পাঠ্য পুস্তক দান করা হইয়াছে। মৌলবী সাহেব বালকদিগের সহিত হিন্দী ভাষায় বাক্যালাপ করিয়া থাকেন।

বালিকা-বিদ্যালয়

অধ্যাপকগণ ১৩১৬ সালের ফাল্গুন মাসে এই বিদ্যালয়ে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রেশম-বিজ্ঞানে পারদর্শী জাপান-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে এ সম্বন্ধে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রী-সংখ্যা কমিতে থাকে। তাহার পরে ইহা একবারে উঠিয়া যায়। পুনরায় ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সহকারী সম্পাদক কৃষ্ণ বাবু ও শিক্ষক রামগোপাল বাবুর যথেষ্ট অর্থ-ব্যয়ে বালিকাগণকে পুতুল, পুস্তক, শ্লেট, কাগজ, কলম, পেন্‌সিল, পশম প্রভৃতি দান করিতে হইয়াছে। প্রত্যেককে পাঠ্য পুস্তক প্রদান করা হইয়াছে এবং প্রতি সপ্তাহে কাগজ পেন্‌সিল প্রদান করা হয়।

মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বি, এল্, মহাশয় প্রত্যেক ছাত্রীকে মূল্যবান পুস্তক, কাগজ, কলম, পেন্‌সিল ইত্যাদি পারিতোষিক রূপে প্রদান করিয়া ছাত্রীগণকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। প্রতি মাসে ছাত্রীগণকে বিবিধ পুস্তক এবং কাগজ পেন্‌সিল প্রদান করা হয়।

শিক্ষাপ্রণালী

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্, এ, মহাশয়ের পরামর্শানুসারে বালিকাগণকে শিক্ষা দান করা হয়। পরলোকগত রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় বালিকাগণের শিক্ষাদানের যে প্রকার ধারা স্থির করিয়াছিলেন সেই প্রকার শিক্ষার আদর্শ গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে শেঠ মহাশয়ের স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত লিখিত 'মালদহের রাধেশচন্দ্র' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল—"স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার উদার মত ছিল বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়েদের স্বাধীনতা প্রদানে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তিনি বাঙ্গালীর মেয়েদিগকে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দানের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

* * * *

"রমণীকুলকে বঙ্গীয় সংসারের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী শিক্ষা প্রদান করা তিনি কর্ত্তব্য মনে করিতেন। সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যের উপযুক্ত করিয়া স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা করাই তাঁহার আন্তরিক প্রয়াস ছিল। সন্তান-প্রতিপালন, স্বাস্থ্যসংরক্ষণ, ভক্তি ও বিনয় শিক্ষাসহকারে কতিপয় প্রচলিত কুসংস্কার বর্জ্জন করাই তাঁহার মতে প্রকৃত স্ত্রী-শিক্ষার অঙ্গ। প্রথমে সংসারী হইবার উপযুক্ত শিক্ষা, তৎপরে শরীরপালন সম্বন্ধীয় নিয়ম, সন্তান-প্রতিপালন এবং অর্থনীতি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ, শেষে ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠে অধিকারিণী হইলেই, স্ত্রীজাতির যথেষ্ট হইল তিনি বিবেচনা করিতেন। রমণীরা হিন্দুধর্ম্ম-তত্ত্ব এবং লীলাবতী, খনা, সীতা, সাবিত্রী ও বেহুলা প্রভৃতির জীবনচরিত পাঠ করে, ইহাতে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না। একান্নভুক্ত পরিবারের মধ্যে যাহাতে বিবাদ উপস্থিত না হয়, একান্নভুক্ত পরিবার-সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত।"

অবৈতনিক শ্রমজীবি-বিদ্যালয়

মালদহ জাতীয়-শিক্ষাসমিতির চেষ্টায় ১৩১৪ সনের শ্রাবণ মাসে মালদহ সহরে একটি

কলিগ্রাম জাতীয় বালিকা বিদ্যালয়

India Press, Calcutta.
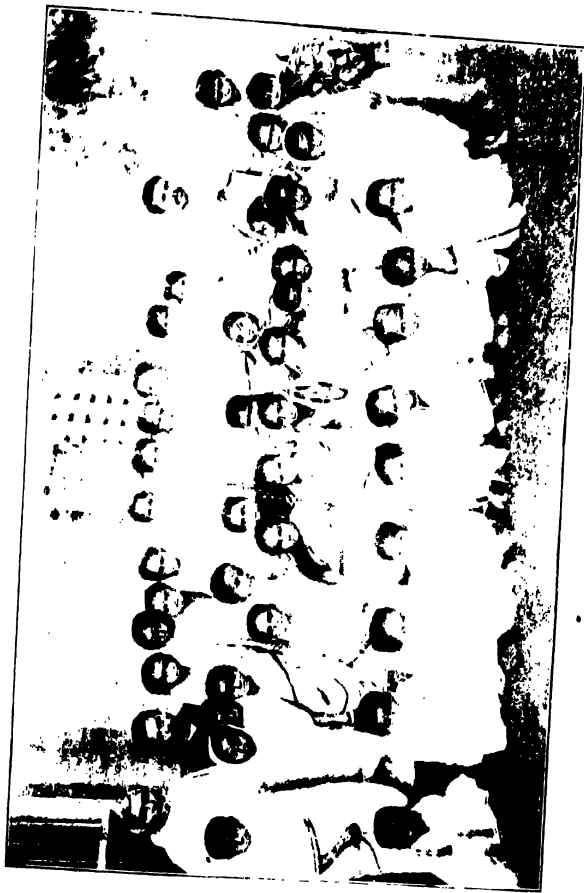
অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কলিগ্রাম জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ কলিগ্রামেও একটি অবৈতনিক শ্রমজীবী-নৈশ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অনেকগুলি শ্রমজীবী উৎসাহের সহিত এই শিক্ষায় যোগদান করে। কিন্তু প্রথমে পল্লীবাসী ধনিগণ এই মহৎ কার্য্যে বাধা প্রদান করেন। লেখাপড়া শিখিলে শ্রমজীবীর বেতন বৃদ্ধি হইবে এবং শ্রমজীবী অপ্রাপ্য হইবে ইহাই তাঁহাদের ধারণা ছিল। এই কারণে ধনিগণের চেষ্টায় নৈশ বিদ্যালয় উঠিয়া যায়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত শ্রমজীবীর বেতন হ্রাস অপেক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইতেছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান কালে বিদ্যাশিক্ষাই যে মজুরী-বৃদ্ধির কারণ ঐ ধারণা আর তাঁহাদের নাই।

কলিগ্রাম জাতীয় বিদ্যালয়ে অনেকগুলি শ্রমজীবীর সন্তান অধ্যয়ন করিয়া থাকে। তাঁহারা প্রাতঃকাল হইতে দিবা ৯টা এবং রাত্রি ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত পাঠ ও মৌখিক শিক্ষা পাইয়া থাকে। এই প্রকার শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের সংস্থাপন করায় বিশেষ ফললাভ হইয়াছে। উদ্ভিদ-বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি হইতে মৌখিক উপদেশ দান করা হয়।

অধ্যাপকগণ তাহাদিগকে বীজ-বিতরণ, ঔষধ-বিতরণ, সেবা, প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্ঠান দ্বারা ত্যাগ-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া থাকেন। উত্তরোত্তর অবৈতনিক শ্রমজীবী-বিদ্যালয়ে বয়স্ক যুবকগণ যোগদান করিতেছে। শ্রমজীবীর সংখ্যাধিক্য দর্শনে কলিগ্রাম জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে একটি খড়োঘর প্রস্তুত হইতেছে। শীঘ্রই নূতন গৃহ সজ্জিত করিয়া তাহাদের শিক্ষার নূতন বন্দোবস্ত আরম্ভ হইবে। ইতিমধ্যেই বিদ্যালয়ের সহকারী সম্পাদক ও অধ্যাপকগণ একটি মূল্যবান্ উচ্চশ্রেণীর "ম্যাজিক ল্যাম্প" ক্রয় করিয়াছেন।

এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গৃহীত :—

(১) গো-পালন ও কৃষিবিষয়ক উন্নতিকল্পে যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহার বিধান করা; (২) পল্লী-ভ্রমণ কালে শ্রমজীবিগণকে সাধারণ কৃষিক্ষেত্রের বর্ত্তমান চাষ-আবাদ দেখাইয়া সেই ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া কৃষির উন্নতি, নূতন কৃষির উপদেশ, ফসলের অনিষ্টকারী পোকা সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করা; (৩) আখ, আলু, তামাক প্রভৃতি চাষের উন্নতিকল্পে যাহা করা প্রয়োজন তাহাও করা; (৪) ভিন্ন ভিন্ন সারের উপকারিতা সম্বন্ধে চাক্ষুষ প্রমাণসহ শিক্ষাদান করা।

একজন মিস্ত্রী ও একজন কুম্ভকার দ্বারা শিল্প-শিক্ষা প্রদত্ত হইবার বন্দোবস্ত হইতেছে।

শ্রমজীবিগণকে ও তাহাদের পরিবারবর্গকে পীড়ার হস্ত হইতে রক্ষার জন্য অনাথ-আশ্রমের চিকিৎসালয়-বিভাগের সেবকগণ প্রাণপণে সেবা করিয়া থাকেন। তাহাদের জন্য দিবারাত্র সকল সময় ঔষধালয় উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে।

আমোদ ও ব্যায়াম

কলিগ্রাম জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ একত্রে আমোদ, আহ্লাদ ও ব্যায়াম করিয়া থাকেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে ছোট বড় দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া দুইটি ফুটবল খেলার দল গঠন করা হইয়াছে। তাহাদের সহিত অধ্যাপকগণ যোগদান করিয়াছেন।

কেবল মাত্র এক প্রকার খেলা শিক্ষা দেওয়া হয় না। ধারাবাহিকভাবে—কপাটী, দৌড়, লম্ফ, সন্তরণ, ভারবহন কোদালি ও নিড়ানী দ্বারা ভূমিখনন, বেড়াবাঁধা, কাঠকাটা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। (সকল ছাত্রকেই যোগদান করিতে হয়)।

সকল অধ্যাপক ও ছাত্র মধ্যে মধ্যে সমবেত হইয়া এবং উৎসবাদি ব্যপদেশে—সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী, ও হিন্দী কবিতা-আবৃত্তি শিক্ষা করেন। স্তোত্র এবং নূতন নূতন গম্ভীরা-সঙ্গীত রচনা ও শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছে। হাত ধরাধরি ভাবে মণ্ডলাকার-নৃত্য এবং বিভিন্ন ভাব-ভঙ্গী সহ অভিনয় শিক্ষা দেওয়া হয়। (মুসলমান বালকগণ ইচ্ছা করিলে যোগদান করিতে পারে, অন্যান্য সকল ছাত্রকে যোগদান করিতে হয়।

সাধারণ পাঠাগার

কলিগ্রাম জাতীয় বিদ্যালয়-গৃহের চিত্র-শোভিত বারান্দায় বর্ত্তমান কালের সুপরিচিত মাসিক পত্র, সাপ্তাহিক এবং দৈনিক পত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবিগণের গ্রন্থও কিছু কিছু সযত্নে রক্ষিত হয়। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে পাঠাগারে বসিয়া পাঠ করিতে পারেন। বসিবার বন্দোবস্ত আছে। রাত্রে আলোক প্রদান করা হয়। এ পর্য্যন্ত শতাধিক পাঠক-সংখ্যা হইয়াছে।

পল্লীবাসীর কোন আত্মীয় পাঠাগার দর্শনার্থ আগমন করিলে—অবস্থা বুঝিয়া মালদহ জাতীয়-শিক্ষাসমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিচিত্র গ্রন্থাবলীর মধ্যে কোন একখানি দুই-খানি বা সমগ্র একপ্রস্থ পাঠার্থে উপহার প্রদত্ত হইয়া থাকে। কোন কোন শিক্ষিত দর্শককে একযোগে ৫।৬৲ টাকা মূল্যের এক প্রস্থ পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে। এ প্রকার দানের পরিমাণও কম নহে। বহু পল্লীতে যাঁহারা পাঠ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে বিবিধ পুস্তক দান করা হইয়াছে। এই উপায়ে পাঠকের সংখ্যা আশাতীত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। উপস্থিত ৪।৫ ক্রোশ দূর হইতে শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান এই পাঠাগারে আগমন করিয়া পুস্তক প্রার্থনা করিয়া সফল-মনোরথ হইয়া থাকেন।

সাধারণ পাঠকগণ পুস্তক ও পত্রিকা পাঠান্তে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রক্ষা করেন না। সেই জন্য পুস্তকাদির সজ্জা শৃঙ্খলাভঙ্গ হইয়া যায়। এই শৃঙ্খলা পুনঃ সংস্থাপনের জন্য ছাত্র-পরিচালকগণ কার্য্য করেন, এবং ধূলাঝাড়া ও নূতন সংবাদ-পত্রগুলি পৃথক্‌ভাবে স্থাপনাদির ব্যবস্থা করেন।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও ফটো-গ্রাফি বিভাগ

কলিগ্রাম জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণের 'ফটোগ্রাফি' শিক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক যন্ত্রাদিসহ একটি ফটোগ্রাফিক যন্ত্র ১০০৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে পল্লী-পর্য্যবেক্ষণ ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধানলব্ধ অনেকগুলি ছায়াচিত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

অধ্যাপকগণ ও উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ এই বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন।

বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর ছাত্রগণ ও অধ্যাপকগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পৃথক পৃথক ভাবে পল্লী পর্য্যবেক্ষণ করেন। পল্লীভ্রমণ কালে পল্লীবাসীর সংখ্যা, অবস্থা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, শিক্ষা ও অভাব এবং পশুগণের অবস্থা ও কীট-পতঙ্গের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করা হয়। পল্লী-পর্য্যবেক্ষণের সহিত প্রচলিত পুরাতন পল্লী-কাহিনী সংগ্রহ করা হয় এবং উক্ত কাহিনীর সাহায্যে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের যথেষ্ট সাহায্য হইয়া থাকে।

অধ্যাপকগণ বিদ্যালয়ের অবকাশ দিবসে, একত্রে দলবদ্ধ ভাবে, মালদহের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিভ্রমণ ও তথ্যসংগ্রহে চেষ্টা করেন। ছায়া-চিত্র গ্রহণ ও প্রাচীন স্থানের মানচিত্র অঙ্কন করা হয়। প্রত্যেক ঐতিহাসিক অভিযানে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ অধ্যাপকগণের সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইয়া অধ্যাপকগণের অনুসন্ধানকার্য্যের সাহায্য করিয়া থাকে। ইতিমধ্যেই ভক্তিপুর বা ভগবতীপুর, গৌড়হাণ্ড, কাণ্ডারণ, বঙ্গপাল শম্ভুনগর, বীরস্থল, হাতীণ্ডা প্রভৃতি প্রাচীন স্থানসমূহ পরিদর্শন করিয়া তৎতৎ স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

প্রত্যেক ছাত্রকে অনুসন্ধানের পর একটি প্রবন্ধ রচনা করিতে হয়। অধ্যাপকগণ তাহার ভালমন্দ বিচার পূর্ব্বক ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের সহিত রচনা-কৌশল শিক্ষা দিয়া থাকেন। প্রত্যেক অধ্যাপক আপন আপন বিষয়ীভূত অংশ লইয়া অনুসন্ধান-লব্ধ জ্ঞান হইতে প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধগুলির দোষগুণ-বিচার সকল অধ্যাপকগণ একত্রে করেন। পরে উহা পত্রিকাদিতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়। এই ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-বিভাগের উৎকর্ষ বিধানের জন্য সাহিত্যালোচনা বিভাগ হইতে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সাহিত্যালোচনা-বিভাগ

বিদ্যালয়ের সকল অধ্যাপকগণকেই সাহিত্যালোচনা বিভাগে যোগদান করিতে হয়। উপযুক্ত ছাত্রদিগকেও এই বিভাগে যোগদান করিবার অবসর প্রদান করা হয়। প্রত্যেক অধ্যাপক আপনাপন অধ্যাপনার বিষয়ীভূত অংশ লইয়া চর্চ্চা করেন এবং অপরাপর অধ্যাপকগণের নিকট নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। প্রত্যেক অধ্যাপককে জ্ঞানপ্রদ প্রবন্ধ লিখিতে হয়। সেই প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিচার অধ্যাপকগণই তর্কবিতর্কচ্ছলে করিয়া থাকেন। প্রত্যেক অধ্যাপককেই জ্ঞানের আদান প্রদান করিতে হয়।

এই বিভাগে সংগৃহীত প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ পাঠের ব্যবস্থা আছে এবং প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করা হয়। প্রাচীন মুদ্রা সম্বন্ধে পাঠোদ্ধার এবং তদ্দ্বারা প্রবন্ধ রচনা এবং তাম্রশাসন ও শিলালিপি, ছায়াচিত্র বা প্রতিলিপি হইতে পাঠোদ্ধার ও শিলালিপি এবং তাম্রশাসনের অক্ষর-পরিচয় শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

এই বিভাগ হইতে প্রাচীন শিলালিপি এবং তাম্রশাসন-লিপির অক্ষর দ্বারা, যাহাতে সাধারণে সহজে প্রাচীন লিপি পাঠে সমর্থ হয় এমত প্রকার "বর্ণ-পরিচয়" পুস্তক রচিত

হইতেছে। বহু তাম্রশাসন-লিপি ও শিলা-লিপির প্রতিলিপি অক্ষর কাটিয়া "বর্ণ-পরিচয়" প্রস্তুত হইতেছে। বহুবিধ প্রস্তর-মূর্ত্তির ছায়াচিত্র সহ 'মূর্ত্তি-পরিচয়' লিখিত হইতেছে। বহু প্রস্তর ও তাম্রশাসন, লিপিচিত্র সাহিত্যালোচনা-বিভাগের ভিতগাত্রে লম্বিত রাখা হইয়াছে। বহু প্রকার প্রাচীন মূর্ত্তির ছায়াচিত্রও বিলম্বিত হইয়াছে।

শিক্ষা-প্রণালী

আরোহপদ্ধতিমূলক শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে এই বিদ্যালয়ের সকল প্রকার শিক্ষাকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে সকল প্রকার শিক্ষা প্রদত্ত হয়। সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দ্দু ও ইংরাজি ভাষা দ্বিতীয় ভাষার মধ্যে গণ্য।

প্রতিদিন অধ্যাপনার পর ছাত্রগণের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। সাপ্তাহিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। লিখিত পরীক্ষা অপেক্ষা মৌখিক পরীক্ষাই বেশী গ্রহণ করা হয়। অধ্যাপকগণ আপনাপন অধ্যাপনার বিষয় প্রতিদিন নোট বহিতে লিখিয়া থাকেন। বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল সাপ্তাহিক পরীক্ষার ফল দৃষ্টে ঠিক করা হয়। কোন কারণবশতঃ বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলে ছাত্রগণের সাপ্তাহিক পরীক্ষার ফলদৃষ্টে তাহার যোগ্যতা নির্দ্ধারিত হয়।

কৃতি ছাত্রগণের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদত্ত হয়। আবৃত্তিকার্য্যে যে বালক দক্ষতা দেখায় তাহারও স্বতন্ত্র পারিতোষিক আছে। মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বি, এল্ মহাশয় স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করিয়া থাকেন। এই পারিতোষিক বিতরণ ব্যপদেশে বিদ্যালয়-গৃহে আনন্দ-উৎসবের আয়োজন হয় এবং গ্রামবাসী সর্ব্বসাধারণকে আনন্দ উৎসবে যোগদানার্থ আহ্বান করা হয়। এতদ্ব্যতীত মালদহ জাতীয়-শিক্ষাসমিতির অধীনস্থ সমুদায় বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে নিমন্ত্রণ করা হয়।

পারিতোষিক বিতরণের দিবস বিদ্যালয়-গৃহ সুসজ্জিত করিয়া যথাসাধ্য প্রদর্শনী খোলা হয়। পারিতোষিক বিতরণ ব্যপদেশে বিদ্যালয়-গৃহে একটি সভাগৃহ সজ্জিত করা হয়। তথায় নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত মহোদয়-গণের উপবেশনের সুন্দর বন্দোবস্ত করা হয়। সভার একজন প্রেসিডেণ্ট থাকেন; একজন সভাপতি-পদে বৃত হন। যথাযোগ্য পুষ্প মালায় ও ভক্তিভাবে সভাপতি মহাশয়কে সজ্জিত করা হয়। সম্পাদক, সভাপতি মহাশয়গণ বক্তৃতা করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করা হয়।

সভারম্ভে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ দ্বারা সঙ্গীত হয়। সভাভঙ্গের পূর্ব্বে পুনর্ব্বার সঙ্গীত, আবৃত্তি, নৃত্য ও অভিনয়-কার্য্য সম্পন্ন হয়। সাধারণের জন্য জলযোগেরও বন্দোবস্ত করা হয়।

পারিতোষিক বিতরণ ব্যপদেশে এ বৎসর আশ্বিন মাসে বিদ্যালয়-গৃহ সজ্জিত হইয়াছিল—উদ্ভিদ-বিদ্যা ও রসায়ন-বিদ্যা সম্বন্ধে প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন—শ্রীযুক্ত গোপীমোহন রায় কাব্যতীর্থ। বিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিয়াছিলেন—বিদ্যা-

আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত কলিগ্রাম
জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণ

রাজেন, খগেন, নবীন, বানেশ্বর

India Press, Calcutta

লয়ের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্তমণীন্দ্র নাথ বসু বি, এ মহাশয়।

পারিতোষিকের সংখ্যা—গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, অভিনয় অতি সুন্দর ভাবে হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় ও প্রেসিডেণ্টের বক্তৃতা অতি-হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, অভিনয়াদির শিক্ষক ছিলেন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-নাথ চৌধুরী মহাশয়।

ছাত্র-শিক্ষক

এই বিদ্যালয়ে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণকে শিক্ষকতার কার্য্য করিতে হয়। মালদহ জাতীয়-শিক্ষাসমিতি এক সঙ্গে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে আর একটা নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কলিগ্রামের ছাত্র-শিক্ষকগণের মধ্যে চারি জন গত দুই বৎসর হইতে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা সেখান হইতে নানা বিষয়ে উচ্চ অঙ্গের প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠান। সেই সকল রচনা এখানকার ইংরাজী ও বাঙ্গালা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোন কোন প্রবন্ধ "কলেজিয়ান" পত্রিকায়ও স্থান দিয়াছি। এতদ্ব্যতীত এই ছাত্রগণ তাঁহাদের যোগ্যতা, অধ্যবসায় ও বিদ্যানুরাগের অন্যবিধ পরিচয়ও দিয়াছেন। তাঁহারা যে সকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন সেই সকল স্থানের অধ্যাপকগণ এই ছাত্র-শিক্ষকদিগের নিয়মিত পাঠ-চর্চ্চায় বিশেষ আনন্দিত। সেই সকল শিক্ষালয়ে দৈনিক পরীক্ষা গ্রহণের রীতি আছে। প্রতিদিনই লেখাপড়ার হিসাব লওয়া হয়। কাজেই কোন ছাত্র একদিন নিয়ম ভঙ্গ করিলে অথবা অমনোযোগী হইলে পরদিন তাহাকে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হয়। অন্যান্য ছাত্রগণের সঙ্গে তাহাকে অগ্রসর হইবার অধিকার দেওয়া হয় না। আমেরিকাবাসী কলিগ্রামের শিক্ষক মহাশয়গণ গত দুই বৎসর ধরিয়া দৈনিক বিদ্যাভ্যাস ও দৈনিক পরীক্ষা-প্রণালীর নিয়মে কৃতিত্বের সহিত অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহাদের ত্রৈমাসিক, যাণ্মাসিক ও বাৎসরিক পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্র ও ফল আমরা দেখিয়াছি। সকল বিভাগেই তাঁহাদের সফলতা লক্ষ্য করিয়াছি। 'কলেজিয়ান' পত্রিকায় ভারতবর্ষের বিদেশগত ছাত্রদিগের লেখাপড়ার ফলাফল প্রায় প্রতি মাসেই প্রকাশিত হয়। জাপান-গত, জার্ম্মাণি-গত, ইংলণ্ড গত এবং আমেরিকা-গত অন্যান্য ছাত্রদের তুলনায় কলিগ্রাম বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণের কার্য্যফল কোন অংশেই হীন নহে। সুতরাং কলিগ্রামের শিক্ষালয়ে সাধারণতঃ কিরূপ অধ্যাপক শিক্ষকতা করেন তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।

ইঁহাদের সম্বন্ধে ছয় বৎসর পূর্ব্বে জাতীয়-শিক্ষাসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ প্রথম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে লিখিয়া-ছিলেন :—"ইঁহাদের শিক্ষালাভের প্রধান উদ্দেশ্য মালদহ জেলার মধ্যে জাতীয় শিক্ষার বিস্তার করা। ইঁহারা সকলেই খাঁটি মালদহ-বাসী—মালদহ জেলার প্রত্যেকের আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। এক বৎসরে মালদহ জেলা হইতে কখনও কোন দিন বিদ্যাচর্চ্চা ও জ্ঞানানুশীলনের জন্য এক সঙ্গে পাঁচ জন ছাত্র বাঙ্গালা দেশের প্রধান নগরী কলিকাতার

কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই বৎসর এক কালে পাঁচজন ছাত্র শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে শিক্ষালাভের জন্য কলিকাতায় গমন করিতেছেন। ইহা মালদহ-সমাজের এক নূতন দৃশ্য—মালদহের শিক্ষা-জগতে এক নূতন ঘটনা। ইঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে মালদহে জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তক হইলেন। তাঁহাদের বিষয় মালদহবাসী প্রত্যেকেরই স্মরণ রাখা উচিত।"

আমাদের বিশ্বাস হইতেছে ইঁহারা বাস্তবিকই লোক সমাজে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। সম্পাদক মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবে। প্রসঙ্গক্রমে এই উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিতে পারা যায় মালদহ জেলায় সাধারণ উচ্চ শিক্ষার অবস্থা কত অবনত ছিল এবং জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে এখানে কত নূতন নূতন দিকে উন্নতি হইয়াছে।

ধর্ম্ম-শিক্ষা

বিদ্যালয়ের প্রত্যেক কার্য্য ও শিক্ষা-প্রণালীর মধ্য দিয়া ত্যাগ, সেবা ও পরোপকার-ব্রত মুখ্য ও গৌণভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। স্বতন্ত্রভাবে ও নীতি ধর্ম্ম-শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। 'ত্যাগবলং পরং বলম্'—এই উপদেশই চরমরূপে গৃহীত হয়। নানা লোকহিত-বিধায়ক কর্ম্মের সাহায্যে চরিত্রগঠন আয়োজন ব্যতীত কোন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিবার বা নৈতিক বক্তৃতা প্রদান করা হয় না।

আমরা এই ক্ষুদ্র শিক্ষালয়টির শিক্ষা ও কার্য্য-প্রণালীর সুবিস্তৃত আলোচনা করিলাম। এইরূপ বিদ্যালয় ভারতবর্ষের আর কোথায়ও আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। তথাপি ৬।৭ বৎসরের মধ্যে কখনও সকল বিভাগে সর্ব্বসমেত ২৫০ ছাত্র-ছাত্রীর অধিক শিক্ষার্থীর সমাগম হয় নাই। উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দ এই প্রতিষ্ঠানটিকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন! এমন কি কয়েকবার এই বিদ্যালয়কে ধ্বংস করিবার জন্য নানারূপ চেষ্টাও হইয়াছে। সম্প্রতি কয়েকজন গ্রামবাসী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট আবেদন করেন যে, জাতীয় বিদ্যালয় তুলিয়া দিয়া সেই গৃহে মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠিত হউক এই উপলক্ষে কতিপয় গ্রামবাসীর সহীও গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ধনী-দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান মিলিয়া একখানি দরখাস্ত লিখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রদান করেন। তাহাতে এখানকার অধিকাংশ ব্যক্তিই জাতীয় বিদ্যালয় তুলিয়া দিতে অমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন জাতীয় বিদ্যালয়ে 'আমরা মাইনর স্কুল অপেক্ষা কম শিক্ষা পাইতেছি না। সুতরাং আমরা জাতীয় বিদ্যালয় তুলিয়া দিতে চাহি না।'

বঙ্গসমাজের যেরূপ অবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে "জাতীয় শিক্ষা" আর বেশী দিন বাঁচিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কিন্তু জাতীয় শিক্ষার পরিচালকগণের সেজন্য দুঃখিত হইবার কারণ নাই। তাঁহারা অসাধ্য সাধন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন—কাজেই স্বকীয় আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের উচ্চ আদর্শ, কার্য্যকরী শিক্ষা-প্রণালী, শিল্প-শিক্ষার আয়োজন, মাতৃভাষায় অনুরাগ বর্দ্ধন ও নিঃস্বার্থ জীবন যাপন বঙ্গদেশে এবং ভারতবর্ষে সকল বিষয়ে এক নবযুগ আনিয়াছে। তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। 'জাতীয় শিক্ষা'-প্রাপ্ত ছাত্রগণের

চরিত্রে আমরা অনেক সময়ে অশেষ সদ্গুণ লক্ষ্য করিয়াছি। তাহাদের চরিত্র এবং বিদ্যাবত্তাও সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। তাহারা বিদেশে ভারতবাসী ছাত্রবৃন্দের মনীষার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সকল ব্যাপারে মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির কর্ম্ম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অন্তর্গত একটি গ্রাম্য শিক্ষালয় বাঙ্গালায় শিক্ষাজগতে একটা নূতন আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে—ইহাও ইহাদের কম গৌরবের কথা নহে। কলিগ্রামের আদর্শ বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে আদৃত হইবে এবং শিক্ষাপ্রচারক মাত্রেই এই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে উৎসাহিত হইবেন—আমরা এই নৈরাশ্যের দিনেও এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দে এম্, এ,
বি, এস্, সি,
অধ্যাপক, রিপণ কলেজ, কলিকাতা
ও "কলেজিয়ান"-সম্পাদক।

শ্রীরাস-পঞ্চাধ্যায়ীতে নিবৃত্তিপক্ষ

[এই প্রবন্ধে লেখক ভাগবত-বর্ণিত রাসক্রীড়ার নিবৃত্তিপরত্ব দেখাইতেছেন। এজন্য ধনপতি সূরি-রচিত টীকার কিয়দংশ বঙ্গানুবাদ সহ উদ্ধৃত হইয়াছে। "বিষয় ভোগদ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, ভোগ হইতে কামনা-বৃদ্ধি হয়, কামনা হইতে দুঃখ জন্মে। গোপিকাগণ উৎকৃষ্ট ভোগলাভ করিয়াও সুখী হইতে পারেন নাই; অসাধারণ ভোগেও যে কামনার নিবৃত্তি হয় না, সাধারণ ভোগদ্বারা সেই কামনার নিবৃত্তি প্রত্যাশা বৃথা" এই প্রবন্ধের ইহাই সার মর্ম্ম।]

শুকদেব যে শ্রীমদ্ভাগবতের অমৃতময়ী কথা জগতে প্রচার করিয়াছেন, ভগবৎপ্রেমের বিচিত্র লীলা জগতকে শুনাইয়াছেন, যে প্রেমের অপূর্ব্ব ফল জগতের সমক্ষে ধারণ করিয়াছেন, তাহার কণামাত্র আস্বাদন করিয়াই অনেক ভক্ত মহাত্মাগণ অমর হইয়া রহিয়াছেন। মহাত্মা প্রেমিকগণের স্বভাব এই যে, তাঁহারা কোন উৎকৃষ্ট বস্তু নিজে উপভোগ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, যেরূপ ভাবে আস্বাদন করিয়া তাঁহারা পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন, সেইরূপে ভোগ্য বস্তুর আস্বাদন যাহাতে সাধারণ জীবেও করিতে পারে, তাহারও একটা সুগম পন্থা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। তাই, জ্ঞান-ভক্তির পরম রক্ষক, পরিব্রাজকাচার্য্য, শ্রীধর স্বামি-পাদ প্রভৃতি সাধুগণ, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করিয়া, আমাদের মত অন্ধজনগণের পক্ষে উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমদ্-ভাগবতের এমনই মাধুর্য্য যে, আজন্ম-পরিব্রাজক, পরমহংসাচার্য্য শ্রীশুকদেবকেও বলিতে হইয়াছে,—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃ
শ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতাঃ রাজর্ষে আখ্যানং
যদধীতবান্॥

শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক টীকাই রচিত হইয়াছিল; এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিতগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীধর স্বামি-কৃত ভাবার্থ-দীপিকা, সনাতন গোস্বামি-কৃত বৃহত্তোষিণী, জীব গোস্বামি-কৃত বৈষ্ণবতোষিণী ও ক্রম-সন্দর্ভ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সুদর্শন-কৃত শুকপক্ষীয়, তদনুগামী বীররাঘব-কৃত ভাগবত-চন্দ্রিকা, মধ্বানুগ বিজয়ধ্বজ-কৃত পদরত্নাবলী, বল্লভাচার্য্য-কৃত সুবোধিনী, বিশ্বনাথ-কৃত সারার্থদর্শিনী, অজ্ঞাতনাম-কৃত বিশুদ্ধরসদীপিকা, রামনারায়ণ-কৃত ভাব-ভাব-বিভাবিকা, নিম্বার্ক-মতানুগ শুকদেব-কৃত সিদ্ধান্তপ্রদীপ ও ধনপতি সূরি-কৃত গূঢ়ার্থদীপিকা।

এই সমস্ত টীকার মধ্যে শ্রীধর স্বামী ও বিজয়ধ্বজই প্রাচীন। শ্রীধরের মত অল্প-বিস্তর অনেকেই গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে শ্রীধর, সনাতন, জীব ও বিশ্বনাথের টীকাই প্রচলিত; অন্যগুলির অধ্যয়ন, অধ্যাপনা বা আলোচনা এদেশে নাই বলিলেই চলে। শ্রীধর স্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাগবততত্ত্ববিদ্ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সনাতন ও জীব গোস্বামী এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, চৈতন্য প্রভুর মতানুসারে ভক্তি, রস ও মাধুর্য্যের বিস্তার করিয়া গিয়াছেন বলিয়া, এবং তাঁহারা জন্ম ও কর্ম্ম দ্বারা বঙ্গভূমিকে গৌরবান্বিতা ও পবিত্রা করিয়াছেন বলিয়া, এদেশে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের বিষয় সময়ান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। অদ্যকার প্রবন্ধে ধনপতি সূরি-কৃত গূঢ়ার্থদীপিকা টীকার "নিবৃত্তি-পক্ষই" প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ীকে প্রাণরূপে সকলেই বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহা যে "নিবৃত্তিপরা" তাহাও সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এই নিবৃত্তিপরত্ব কেহ এক ভাবে কেহ বা অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; ফলতঃ শ্রীধরের আভাস কেহই পরিত্যাগ করেন নাই। অন্যান্য টীকাকারগণ যে প্রণালী ও প্রতিপাদ্য অবলম্বন পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ধনপতিও প্রায় তদনুরূপ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, পরিশেষে "নিবৃত্তিপক্ষ" বলিয়া আর একটি অনন্যসাধারণ ব্যাখ্যান করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। ইহার "আধ্যাত্মিক" নাম দেওয়া যাইতে পারে।

ধনপতি সূরি "নিবৃত্তি"-পক্ষ-ব্যাখ্যা ও ভূমিকা এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"অত্র ভক্তিশান্তিরসপ্রধানে শ্রীমদ্ভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রসঙ্গাৎ পরশাস্ত্রার্থ শৃঙ্গাররসমনুবদতা মুনীন্দ্রেন স্ব-সিদ্ধান্তোঽপি গূঢ়তয়া নির্দ্দিষ্টঃ। অতএব, "শৃঙ্গার-কথাপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি শ্রীধরস্বামিভিরপ্যুক্তং।"

"নিবৃত্তিমার্গসংসক্তচেতসাং বিদুষাং মুদে।
ব্যক্তীকরোম্যহং পক্ষমিমং কৃষ্ণ-প্রসাদতঃ।"

সবিশেষসুখং নিখিলমপি দুঃখসম্ভিন্নমেব—
"যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয়, ন তেষু রমতে বুধঃ॥"

ইতি ভগবদ্বাক্যাৎ অতো বিবেকবতা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাবির্ভাবাভিলাষুণা তৎপ্রতিবেশান্নিবৃত্তিরেব সর্ব্বোপায়ৈঃ সম্পাদ্যেতি ব্রহ্মারাত্র্যাবচ্ছিন্নকালপর্য্যন্তং তুচ্ছীকৃত কোটি-কন্দর্পবিগ্রহেণ ভগবতাপি রমমাণানাং

গোপাঙ্গনানাং দুঃখনিবৃত্তিস্তৃপ্তিশ্চ ন সম্পন্নেতি বর্ণয়তা ভগবতা মুনিনা সূচিতং তদুক্তং—
"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।" ইতি

এবংবিধ বিবেকোৎপত্তিযোগে ইহ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠান নিতান্ত-নির্ম্মলে স্বানুগ্রহপাত্রে অন্তঃকরণে শ্রুতিরূপ-স্বকান্তাভিরভিরন্তুং ভগবানপি মনশ্চক্রে। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" ইত্যাদিশ্রুত্যা ভগবদনুগ্রহাদেব শ্রুত্যর্থ-বিচারে প্রবৃত্তির্ভবতি নান্যথেতি ভাবঃ।

মর্ম্মার্থ—

"শ্রীমদ্ভাগবত পারমহংসী সংহিতা, ভক্তি ও শান্তিরস প্রধান হইলেও প্রসঙ্গতঃ পরশাস্ত্রার্থ শৃঙ্গাররস ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে (তথাপি) তিনি গূঢ়ভাবে ইহাতে নিজের সিদ্ধান্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্যই শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—"শৃঙ্গার-কথাচ্ছলে এই পঞ্চাধ্যায়ী বিশেষরূপে নিবৃত্তিপরা।"

নিবৃত্তিপরায়ণ বিদ্বান্‌গণের প্রীতির জন্য আমি এই পক্ষ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় প্রকাশিত করিতেছি।

সুখমাত্রই দুঃখসংমিশ্রিত,—"অর্জ্জুন, সংস্পর্শজ ভোগ মাত্রেই দুঃখোৎপাদক ও অনিত্য; এই জন্য, পণ্ডিতগণ তাহাতে অনুরক্ত হন না।" এই ভগবৎকথায় তাহা জানা যাইতেছে। এই নিমিত্ত বিবেকবান্ ও মুমুক্ষু জীবগণ সর্ব্বোপায়ে নিবৃত্তিই আশ্রয় করিবে। নিবৃত্তি ব্রহ্মেরই প্রতিবেশিনী। এই সকল বুঝাইবার জন্য ভগবান্ মুনি দেখাইয়াছেন যে, কন্দর্পের দর্পচূর্ণকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিতও ব্রহ্মরাত্রিকাল পর্য্যন্ত রমণ করিয়া গোপাঙ্গনাদের দুঃখ-নিবৃত্তি ও তৃপ্তি হয় নাই। * শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, কামনা উপভোগ দ্বারা উপশান্ত হয় না, অগ্নি যেরূপ ঘৃতাহুতিতে বর্দ্ধিত হয়, উহাও তদ্রূপ ভোগেতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।" এই প্রকার বিবিধ বিবেকোৎপত্তি যোগ উপস্থিত হইলে, ইহ জন্মেই হউক, বা জন্মান্তরেই হউক, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম-বর্জ্জন, নিত্য-নৈমিত্তিক-ক্রিয়া, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনার অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত যখন অতীব নির্ম্মল ও অনুগ্রহলাভের পাত্র হয়, তখনই উহা ভগবানের শ্রুতিরূপ কান্তাগণ সহ অভিরমণের উপযুক্ত। তিনি (অভাব-রহিত পূর্ণষড়ৈশ্বর্যশালী হইলেও) ভগবান্ হইয়াও (ভক্তানুগ্রহার্থ) শ্রুতিরূপ কান্তাগণের সহিত অভিরমণ করিতে মনন করিয়াছিলেন। 'ভগবান যাঁহাকে বরণ করেন তিনিই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন', ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অনুসারে ভগবানের অনুগ্রহেই শ্রুতির অর্থ-বিচারে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে, অন্যথা হয় না।

(এখানে পঞ্চাধ্যায়ের ১ম শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যাই উদ্ধৃত ও বিশদীকৃত হইতেছে।)

"ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্ল-মল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥"

* "ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতা।
অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়া॥"

ব্রহ্মরাত্রি উপাবৃত্ত হইলে, গোপীগণ বাসুদেব কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া অনিচ্ছার সহিত স্বগৃহে গমন করিলেন। ভা ১০।৩৩।৩৮।

শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা—ভগবানও সেই (প্রতিশ্রুত) শরৎকালের প্রফুল্লমল্লিকাযুক্ত রজনী সমুদায় অবলোকন করিয়া, যোগমায়াবলম্বনে ক্রীড়া করিতে সংকল্প করিলেন।

(নিবৃত্তি-পক্ষ)—"ভগবদনুগ্রহপাত্রতাং-বোধনায়াহ—তাঃ রাত্রীঃ=অসংখ্যাত জীব-জন্মসু অনুভূতাঃ অহঙ্কিত্তমনোবুদ্ধিরূপা অন্তঃকরণবৃত্তীঃ—রাত্রীঃ, অজ্ঞানরূপতমো-ব্যাপ্তত্বাদ্ আত্মতত্ত্বাবরণরূপত্বাদ্ রাত্রীসদৃশাঃ; সংপ্রতি শারদোৎফুল্ল-মল্লিকাঃ শরৎস্থানাপন্নেন ভগবদারাধন-লক্ষণেন নিষ্কামকর্ম্মণা অন্তঃ-করণশুদ্ধিসাধনেন ফুল্লা বিকশিতাঃ মালত্যাদি পুষ্পস্থানাপন্না শান্ত্যাদয়ো যাসু তাঃ বীক্ষ্য। "শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ শ্রদ্ধান্বিত আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ" ইতি শ্রুতেঃ। নমু, নির্গুণস্য জাতিগুণাদি শব্দপ্রবৃত্তি নিমিত্তরহিতস্য শ্রুতিপ্রতি-পাদ্যত্বাসম্ভবাৎ কথং ব্রহ্মণি তাসাং রমণ-মিত্যাশঙ্ক্যাহ যোগমায়া-মুপাশ্রিত ইতি। তথাচ, তন্নিরসনেন নির্ব্বিশেষব্রহ্মোপলক্ষণ-মেব তাসাং রমণমিতি ভাবঃ।"

মর্ম্মার্থঃ—

ভগবানের অনুগ্রহপাত্রতা জানাইবার জন্য বলা হইতেছে,—সেই সকল রাত্রি=অসংখ্য জন্মে অনুভূত অহং, চিত্ত, মন ও বুদ্ধি-রূপ অন্তঃকরণ-বৃত্তি। এই বৃত্তিগুলি অজ্ঞানান্ধ-কারে আচ্ছন্ন, সুতরাং আত্মতত্ত্বের আবরক, এইজন্য উহাদিগকে রাত্রি সদৃশ বলা হইয়াছে। সংপ্রতি ঐ রাত্রি শরৎ-উৎফুল্ল মল্লিকাযুক্ত। শরৎ=ভগবানের আরাধনার লক্ষণ—নিষ্কাম কর্ম্ম। ইহা নির্ম্মল কর্ম্ম, শরৎও নির্ম্মল-শুভ্র, তদ্দ্বারা (অন্তঃকরণ শুদ্ধ বা আলোকিত হইলে) তাহাতে মল্লিকাস্থানীয় শান্তি প্রভৃতি উৎফুল্ল অর্থাৎ বিকসিত=প্রকাশিত হয়। এইরূপ রাত্রি অবলোকন করিলেন। শ্রুতি বলিয়াছেন শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আত্মাতে আত্মাবলোকন করিবে। এতদনুসারেই মল্লিকার অর্থ শান্তি করা হইয়াছে। এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, তিনি নির্গুণ জাতিগুণাদিরহিত ও শব্দ-প্রবৃত্তিবর্জ্জিত। (সগুণ) শ্রুতি তাঁহাকে প্রতিপাদন করিতে পারে না, তবে কেমন করিয়া ব্রহ্মে শ্রুতিগণের রমণ হইতে পারে? *

এতদুত্তরে (মূলে) বলিতেছেন যোগ-মায়াকে আশ্রয় করিয়া—তাহা ব্রহ্ম নহে, তাহা ব্রহ্ম নহে, এইরূপ নেতি, নেতি বিচার দ্বারা যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। সুতরাং রমণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপলক্ষণ। ইহাই ভাবার্থ।

"যোগমায়ামুপাশ্রিত" এই অংশটুকুর সবিশেষ ব্যাখ্যা নিবৃত্তিপক্ষে নাই। সম্ভবতঃ ধনপতি তাহা লিখিয়া থাকিবেন, সংপ্রতি তাহা লুপ্ত হইয়াছে।

পঞ্চাধ্যায়ীর নিবৃত্তিপরতা স্বয়ং ব্যাসদেবও অন্য প্রকারে শেষ শ্লোকে বলিয়াছেন, যথা—

* এ সম্বন্ধে পরীক্ষিৎও প্রশ্ন করিয়াছেন—

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ।
কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে॥ ভা ১০।৮৭।১

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবধূগণের এই প্রকার লীলা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ বা বর্ণন করেন, তিনি অচিরে ধীরতা প্রাপ্ত হইয়া, ভগবানে পরমা ভক্তি লাভ করেন এবং হৃদয়ের ব্যাধিতুল্য কামকে শীঘ্রই পরিত্যাগ করেন।

ধনপতি ইহার টীকার নিবৃত্তি পক্ষে আর বিশেষ কিছু লিখেন নাই। অন্যান্য টীকাকারগণ যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইনিও সেইরূপ করিয়া, "তথা চ সর্ব্বানর্থ-নিবৃত্তি পরমানন্দ-প্রাপ্তিরূপ পরমপুরুষার্থ-ফলকোঽয়ং পঞ্চাধ্যায়াত্মকো গ্রন্থঃ পরমাদরেণ শ্রোতব্যঃ বর্ণয়িতব্যশ্চ ইতি, পরে—

শ্রুতি গোপাঙ্গনাভির্যঃ ক্রীড়তে সৎ-সুমানসে বনে তং ধনপত্যাখ্যো নৌমি কৃষ্ণং পরাৎপরং"* বলিয়া ব্যাখ্যা শেষ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যার মধ্যে "শ্রুতিরূপ স্বকান্তাভিঃ" এবং উপসংহার-শ্লোকে "শ্রুতিগোপাঙ্গনাভিঃ" দ্বারা ধনপতি শ্রুতিগণের গোপাঙ্গনাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহা পদ্মপুরাণেও উল্লিখিত হইয়াছে—

"গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা গোপকন্যকাঃ
দেবকন্যাশ্চ বিপ্রেন্দ্র ন মনুষ্যঃ কদাচন॥"

ধনপতি সূরি, নিবৃত্তিপক্ষ-ব্যাখ্যা লিখিলেও শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব ও গোপীবিলাসাদি অস্বীকার করেন নাই। ইহার প্রথম পক্ষের ব্যাখ্যাতে ত ইহা সবিশেষই উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষেও—

"তুচ্ছীকৃতকোটিকন্দর্পবিগ্রহেণ ভগবতাপি রমমাণানাং" ইত্যাদি দ্বারা ভগবানের অবতারত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রহ্ম, গোপাঙ্গনা ও শ্রুতির অভেদ-বর্ণনাই বোধ হয় তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন (শ্রীমদ্‌ভাগবতে)—

বদন্তি তং তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

তত্ত্ববিদ্‌গণ যে তত্ত্বকে অদ্বয়জ্ঞান কহেন, তাহাই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বলিয়া কথিত হয়। শ্রুতি ও গোপীর অভিন্নতাসমর্থক বচন পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকেশব গোস্বামী শাস্ত্ররত্ন।

মা

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

মা, বিশ্বজননী, সন্তান কি বলিয়া তোমার নিকট মনোবেদনা জানাইবে? এই সংসার-রূপ কারাগারে হস্তপদ বদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছ,

* যিনি সাধুগণের সুমানসরূপ বনে শ্রুতিরূপ গোপাঙ্গনাদের সহিত ক্রীড়া করেন, সেই পরাৎপর কৃষ্ণকে আমি ধনপতি প্রণাম করিতেছি।

কেমন করিয়া এ দুশ্ছেদ্য বন্ধন ছিন্ন করিব? যখন জননী-জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, তখন হইতেই মা তোমার বিশ্ববিমোহিনী অবিদ্যাশক্তি আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। তখন কিন্তু বন্ধন ছিল না। ক্রমে জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সব বন্ধন আসিয়া জুটিয়াছে। প্রথমে মাতা ও পিতার প্রতি যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা, তাহা তোমার বন্ধনের সূত্রপাত। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে কত প্রকারের বন্ধন আসিয়াছে। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বিষয়-বিভব এইরূপ শত বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া "কলুর চোক ঢাকা বলদের মত" এই সংসার-চক্রে অবিরত ঘুরাইতেছ। কবে ঘুচিবে? এই পুনঃ পুনঃ গতায়াত, এই কুলাল-চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ কবে সাঙ্গ হইবে? সাঙ্গ কি হইবে? কবে আবার স্নেহময়ী জননীরূপে এ দীন সন্তানকে ঐ অভয়কোলে স্থান দিবে?

আর যে পারি না মা! সহিতে সহিতে তাপ যে ক্রমে অসহ্য হইল মা! কবে এ জ্বালা জুড়াইবে? এ তাপের রাজ্য হইতে শান্তির আলয়ে কবে লইয়া যাবে মা? প্রবাসে পাঠাইয়া সন্তানের কথা কি একবারও মনে পড়ে না? একেবারে কি ভুলিয়া গিয়াছ? এই বিশাল বিশ্বরাজ্যের কোন্ ক্ষুদ্র প্রান্তে এ দীন সন্তান পড়িয়া আছে, তাহার প্রতি কি একবারও দৃষ্টি পড়ে না?

তা' পড়িবে কেন? তুমি পাষাণতনয়া কি না, তাই নিজেও পাষাণী। পাষাণে গড়া কঠিন প্রাণ কি সন্তানের তাপে গলে? তুমি বিশ্বপ্রসবিণী হইয়াও বিশ্বনাশিনী। এইজন্য মহাকাল তোমার পদাশ্রিত। এ তোমার কেমন খেলা মা? এই সন্তান প্রসব করিলে, দুই দণ্ড তাহাকে স্তন্যপান করাইলে, নাড়িলে, চাড়িলে, পরক্ষণে আবার বিশাল বদন মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করিলে। হ্যাঁ মা, সন্তান খাইতে প্রাণে মমতা হয় না? রাক্ষসীর আচার কি মা তোমার শোভা পায়? মহাবিষ্ণু হইতে আরম্ভ করিয়া অণু-পরমাণু পর্য্যন্ত সকলেরই ত প্রসূতি তুমি। সকলকেই কি এ অভাগার ন্যায় অন্ধ করিয়া রাখিয়াছ? সকলেই কি তোমার এই অচিন্ত্য মোহপাশে আবদ্ধ?

এ নয়ন কবে খুলিবে মা? অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন দৃষ্টিশূন্য এ নয়ন কবে তোমার কৃপা-জ্যোতি পাইয়া আবার দর্শনক্ষম হইবে। কবে তোমার অবিদ্যারূপা বিকৃতি ছাড়িয়া স্বরূপ গ্রহণে সক্ষম হইব? কেন মা এ সংসারমাঝে তোমার বিদ্যাশক্তি, পরাশক্তি না দিয়া, তোমার অবিদ্যা বা অপরা শক্তিকে প্রেরণ করিয়াছ? এই অবিদ্যার এমনি শক্তি, যে নশ্বর নিমেষমাত্র আয়ুষ্মান্ এই সৃষ্টি-বিকাশকে মানবের চক্ষে চিরস্থায়ী নিত্যবস্তুরূপে প্রতীয়মান করিতেছে। এই কিছুদিনের বাসস্থানকে চিরবাসগৃহ মনে করিয়া ইহার জন্যই মানব লালায়িত। কত বিপদ, কত মনোবেদনা, তথাপি এই মোহবশে ইহাতেই মগ্ন।

পরমহংসদেব ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন "যেমন উটের কাঁটা ঘাস খাওয়া।" উষ্ট্র যেরূপ কাঁটা ঘাস খাইতে খাইতে ওষ্ঠ কাটিয়া দরদরিত ধারে রক্তপাত হইলেও তাহা ত্যাগ করে না, সেই কাঁটা ঘাস তাহার এত মধুর লাগে, সেইরূপ সংসারী জীব এই অবিদ্যা-মায়ান্ধকারে দৃষ্টিহারা, সুতরাং পথভ্রান্ত

হইয়া, এই নশ্বর সততপরিবর্ত্তনশীল জগত-সংসারকে চিরস্থায়ী নিত্যবস্তু বলিয়া গ্রহণ করে।

আত্মীয়-বিনাশ, পুত্র ও পত্নীবিয়োগ, বিত্ত-নাশ, ইহা ত সংসারী জীবের নিত্য সহচর, তবুও বৈরাগ্য আসে না, অন্তর্দৃষ্টি হয় না। এত মনঃকষ্ট সহিয়াও উষ্ট্রবৃত্ত আমরা ইহাতেই মগ্ন থাকি।

কে ভুলাইয়া রাখে? কে নয়ন থাকিতেও অন্ধ করিয়া রাখিয়া দেয়? সে ত মা তোমার লীলা! তুমি স্বয়ং না আসিয়া তোমার সন্তানের নিকট সর্ব্বদাই বিমাতাকে ছাড়িয়া দাও। সপত্নী-পুত্রের উপর বিমাতার যে স্নেহ, তাহা জানিয়াও তোমার দয়া হয় না। দয়া কি হইবে না? তোমার কৃপা-কটাক্ষলাভে দীন সন্তানের চিরার্গলিত হৃদয়-দ্বার কি উন্মোচিত হইবে না? কতকাল এই মোহান্ধকারে নিমজ্জিত থাকিব? কে পথ দেখাইবে? তুমি দয়া না করিলে কে দয়া করিবে? পিতা যদি সন্তানের উপর কোন কারণে ক্রুদ্ধ হয়েন, মাতা পুত্রের হইয়া পিতার নিকট দু'কথা বলিলে, পিতার রাগ পড়ে। পিতা কুপিত হইলে, মার আশ্রয়ে সন্তান জুড়ায়, কিন্তু মা যদি বিরূপ হয়েন, গর্ভধারিণী হইয়া যদি বিমাতার আচার করেন, তবে সন্তান আর কাহার আশ্রয় পাইবে? কাহার ক্রোড়ে গিয়া জুড়াইবে? মা যার বিরূপা তাহার মৃত্যুই ভাল।

তাহাই হউক, লও মা, দীন সন্তানকে এ অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত কর, তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দাও। এত কি অপরাধী যে বারবার অকূল ভবসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া এত যন্ত্রণা দিতেছ? যতই যাতনা দাও, তোমাকে ডাকিতে ছাড়িব না। সন্তানকে মাতা প্রহার করিলে, সন্তান "মা" বলিয়াই চিৎকার করে। যতই তাড়না করিবে তত তোমাকেই ডাকিব, দেখি কত-দিনে দয়া হয়।

দয়া কি হবে না? এ অধম সন্তানের উষ্ণ অশ্রুজলে কি তোমার কঠিন পাষাণ প্রাণ বিগলিত হইবে না? না হয়, ক্ষতি নাই, যতদিন এখানে থাকিবে, কেবল তোমাকে ডাকিয়াই কাঁদিব, উপায় ত নাই। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যতদিন নিজের ভার গ্রহণে অক্ষম থাকে, সর্ব্ব বিষয়ে ততদিন মাতার উপর নির্ভর করে। আমি ত চির দুর্ব্বল, চিরকালই নিজ-ভারবহনাক্ষম, আমি আর কাহার উপর ভার দিব? তুমি বই আর আমার কে আছে? কথায় বলে "কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখন নয়," আমি কুসন্তান বলিয়া, তুমিও কি কুমাতা হইলে? অভাগার ভাগ্যদোষে কি অমৃতে গরল উঠিল? উঠুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু মা, সন্তানের এ অহরহঃ জ্বলন্ত তাপ দেখিয়াও কি তোমার দয়া হয় না? যাহা ইচ্ছা কর, তোমার মনে যা আছে, তা'ই কর, আমি উপায়হীন—তোমাকে ডাকিয়াই কাঁদিব ও শ্রীচরণে লুটাইব। দয়া কি হইবে না?

দয়া কর মা! দয়া করিয়া এ হতভাগ্য সন্তানকে দেখা দেও মা, দেখা দেও মা! যাঁহাকে দেখিবার জন্য এত আকুলি বিকুলি করিয়া তোমায় ডাকিতেছি, আমাকে দেখা দিয়া বল, তাঁহাকে দেখাইবে কি না? তুমি

দয়া না করিলে কোথায় তাঁহার উদ্দেশ পাইব? তুমি মা সমক্ষে দণ্ডায়মানা, আমার দৃষ্টিশক্তি আবরিত করিয়া রাখিয়াছ। পথ দেখাও মা! তুমি না পথ দেখাইলে, কে দেখাইয়া দিবে মা? আমার প্রাণনাথের সন্ধান আর কার কাছে পাইব? কে বলিয়া দিবে কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে আমার জীবনসর্ব্বস্ব লুক্কায়িত আছেন? তাঁহার বিরহে জগৎ-সংসার শূন্যময়, প্রাণ বিষময়, হৃদয় নৈরাশ্যময়, কোথায় আমার সে হৃদয়-ধন? কেন মা, লুকাইয়া রাখিয়াছ? পথ ছাড়, দেখাও—নহিলে প্রাণ থাকিবে না—ব্রজসুন্দরীগণকে যেরূপ দয়া করিয়াছিলে, সেইরূপে এ কাঙ্গালকে দয়া কর। বরদা হও।

"কাত্যায়নি মহামায়ে, মহাযোগিন্যধীশ্বরি
নন্দগোপসুতং দেবি, পতিং মে কুরু তে নমঃ॥"
শ্রীমদ্ভাগবত।

হ্যাঁ মা, তাঁহাদের বেলা দয়া করিয়াছ, তাঁহাদের চির অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছ, আর আমার ভাগ্যে কি হইবে না? জননীর এ পক্ষপাতিতা কি ভাল? সকলেরই ত প্রসূতি তুমি! সকলে যখন তোমার সন্তান, তখন এ কি ব্যবহার? হ্যাঁ মা, আমি কি তোমার সপত্নীপুত্র, তাই আমার উপর এত নিদয়া? আমি জানি ঠাকুর অবতীর্ণ হইবার অগ্রে তাঁহার কার্য্য সুসার করিবার নিমিত্ত তোমাকে পাঠাইয়াছিলেন, তুমি নিজেই ত দেবতাগণের স্তবের উত্তরে বলিয়াছ

"নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা"
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

তোমার হস্তে মা চাবি, চাবি খোল, দ্বার উন্মুক্ত কর, দয়া করিয়া আমার মোহ-কপাট উন্মোচিত কর, আমার নয়নে অনৈসর্গিক জ্যোতি উদ্ভাসিত হউক এবং সেই

"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরং"

দর্শন করিয়া জন্ম-কর্ম্ম সার্থক করি এবং ব্রজের একটি ক্ষুদ্র কীটাণু হইয়া স্থান পাই। তাহা হইলে নিত্যানন্দ ভোগ হইবে, আর জ্বালার সংসারে এ তাপ সহিতে হইবে না।

পথ ছাড়িয়া দিবে কি? যে আবরণে জ্ঞান-বুদ্ধি আবরিত করিয়া রাখিয়াছ, মা, দয়াময়ী, দয়া করিয়া অবিদ্যারূপ সে মোহাবরণ কি অপসারিত করিবে? এ দৃষ্টিহীন জড়চক্ষুকে কি দিব্যদৃষ্টি দিবে? দয়াও তোমার, আদরও তোমার। তুমি দয়াময়ীও বটে, নিদয়াও বটে। তুমি কখন দয়াময়ী কখন নিষ্ঠুরা পাষাণী। অভাগার ভাগ্যদোষে কি চিরকাল নিদয়া রহিবে। অধম বলিয়া, পতিত সন্তান বলিয়া কি একবারও দয়াময়ী হইবে না? পিতামাতার সন্তানের মধ্যে যদি কেহ অক্ষম হয়, তাঁহাদের স্নেহ সেই অধম সন্তানের উপরই ত অধিক হইয়া থাকে, কৃতী সন্তানের জন্য পিতামাতার তত ব্যাকুলতা থাকে না, কিন্তু যে অকৃতী অধম, তাহারই জন্য ত পিতা বিশেষতঃ মায়ের প্রাণ কাঁদে। একবার দয়া কর, অকৃতী অক্ষম দেখিয়া কৃপাদৃষ্টি কর, একবার নয়ন খুলিয়া দাও, একবার পথ ছাড়িয়া দাঁড়াও, আমার প্রাণনাথের উদ্দেশে ছুটি।

আশা ছিল তোমার কোলে উঠিয়া নাথের সন্নিধানে যাইব। তাহা ত হইল না, আশা ত পূরিল না, তবে পথ ছাড়িয়া দাও, আমি আর থাকিতে পারি না। বিরহানল ধূ ধূ জ্বলিতেছে, হৃদয়-মন তাহাতে ভস্মীভূত

হইবার উপক্রম। দাও মা, পথ ছাড়িয়া দাও, আমি যাই। জুড়াইতে যাই, এই তীব্র বিষজ্বালা জুড়াইতে প্রাণনাথের সকাশে যাই। সেই সুধানিস্যন্দী পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া, সেই অজস্র সুধা-প্রবাহে সিঞ্চিত হইয়া এই দুর্ব্বার বিরহ-তাপ শান্ত করি।

দয়া করিয়া এ দীনকে পথ ছাড়িয়া দিবে কি? শত বাঁধনে জড়াইয়া রাখিয়াছ, ছাড়াইতে চাহিলেও পারি না, যেন আরও জড়াইয়া পড়ি, একবার বন্ধন খুলিয়া দিবে কি? কোন্ দেশে, কোন্ রম্যস্থানে প্রাণারাম বিরাজিত, দেখিতে দিবে কি? সেই অপরূপ লীলালাবণ্যশালী মোহনরূপ দেখিয়া এই অনর্থক জীবন সার্থক করিতে দিবে কি? অন্ধের ন্যায় দৃষ্টিহীন করিয়া রাখিয়াছ, দাও মা নয়ন খুলিয়া দাও, আবরণ উন্মোচিত কর, আমি প্রাণ ভরিয়া রূপসুধা পান করি। আর সহিতে পারি না, শতবৃশ্চিক-দংশনের ন্যায় তীব্রজ্বালা দেহ-মন আচ্ছন্ন করিয়াছে। কোথায় জুড়াই? অমৃতসাগর বিনা, এ মরণাধিক যন্ত্রণা কিসে জুড়াই? সেই একমাত্র জুড়াইবার স্থান, দেখাইয়া দিবে কি? দাও মা দেখাইয়া দাও, এত কাতর হইয়া তোমায় ডাকিতেছি, তবু কি দয়া হইবে না? মা গো, বিমাতার ঘরে আর কতকাল রহিব? অযত্নে অযত্নে, ক্ষীণ শক্তি, দেহ কঙ্কালাবশিষ্ট, প্রাণ কণ্ঠাগত, এ কি আচরণ তোমার? যদি এত কষ্ট দিবে মনে ছিল, গর্ভেই বিনাশ কর নাই কেন? যদি গর্ভে স্থান দিয়াছ এ সাধ আমার পূর্ণ করিতে হইবে, এ অভাব মোচন করিতেই হ'বে। যে দিকে নয়ন ফিরাই, সব শূন্যময়, পূর্ণতা আনয়ন কর। এ অতৃপ্ত বাসনা লইয়া পৃথিবীতে থাকা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। তুমি মুখ তুলিয়া না চাহিলে, আর উপায় নাই। তুমি স্বীয় আবরণে সব আবরিত করিয়া রাখিয়াছ। তাই কি? না,—যেমন ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড তপনকে দৃষ্টির অন্তরালে লইয়া যায়, আমরা মনে করি মেঘ সূর্য্যকে আবরিত করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্য্য আবরিত নহে, আমাদের দৃষ্টি আবরিত, তাই সূর্য্যকে দেখিতে পাই না, সেইরূপ মা তুমি সম্মুখে এমন করিয়া বিমাতাকে স্থাপিত করিয়াছ যে, আমাদের দৃষ্টিশক্তি আবরিত করিয়া তিনি পরম বস্তুকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি বিমাতা, তাঁহার নিকট মনোবেদনা জানাইলে কোন ফল হইবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া, তোমার নিকট আসিয়াছি। তোমার সন্তান, তোমা অপেক্ষা আর কা'র প্রাণ সন্তানের দুঃখে অধিক কাঁদিবে? তাই মনে করিয়া তোমার নিকট এত কান্না, দয়া ও হ'ল না? যে পাষাণী সেই পাষাণীর ন্যায় স্থির, সন্তানের এত যাতনা দেখিয়াও অচল ভাবে বসিয়া রহিলে? তবে আর কার কাছে যাইব? কে আর দয়া করিবে? জননী অপেক্ষা আর কে সন্তানের উপর অধিক স্নেহময়ী হইবে? শুনিয়াছি না কি তুমিও বৈষ্ণবী! পিতামাতা তোমরা উভয়েই না কি কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। কাহারও মুখে হরিনাম শুনিলে না কি তুমি গলিয়া যাও, তবে কেন এ অকিঞ্চনকে সে সুখে বঞ্চিত কর? কেন এই মোহকূপে নিমজ্জিত করিয়া রাখ? দাও মা, দয়া করিয়া জ্ঞান-নয়ন খুলিয়া দাও। আর কতকাল এরূপে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া

রাখিবে ? দাও মা তোমার পরা শক্তি, তাহাই আশ্রয় করিয়া পরমধন লাভ করি। সে বিনা যে প্রাণ আর বাঁচে না! সব শুষ্ক, নীরস। বারি বিনা মীনের যে দশা, সেই প্রাণধন বিনা এ অভাগারও সেই দশা! ঘুচাও মা, এ দুর্দ্দিন ঘুচাইয়া সুদিন আনয়ন কর।

কি অবস্থায় যে দিন কাটিতেছে, কি আর বলিব ? যেন পথভ্রান্ত পথিক জুড়াইতে গিয়া প্রতপ্ত বালুকাময় মরু-ক্ষেত্রের আশ্রয় লইয়াছে। সে বিনা সংসার মরুভূমি! সেই অনন্ত প্রেমের উৎস। সে উৎস না রহিলে, কোথায় পাইব সেই মধুরতা, কোথায় পাইব সৌন্দর্য্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা ? দে মা, তাহাকে পাইলে সব পাইব। এই কুৎসিৎ পাপের আগার সংসার স্বর্গ হইবে। তোমার দয়া হইলে, যে দিকে নয়ন ফিরাইব, সেই দিকেই প্রাণারামের কমনীয় রূপ নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণ শীতল করিব। সেই অমল প্রেম-জ্যোতিতে ভাস্বর মোহন রূপ দর্শন করিয়া এ দাবদগ্ধ হৃদয় শান্ত করিব। সেই অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের সুধাবর্ষিণী কৌমুদী এ বিরহতাপ নির্ব্বাপিত করিবে। দয়া কি হইবে না ?

যে তোমাতে প্রপন্ন হয়, চিরকাল শুনিতেছি, তুমি তাহাকে রক্ষা কর। মহিসাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভ, প্রভৃতি দৈত্যগণের অত্যাচারে পরি-ক্লিষ্ট দেবগণ তোমার পূজা করিয়া শত্রু-সংহারে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমার রিপু কি দমিত হইবে না ? আমার অন্তঃশত্রু কি বিনষ্ট হইবে না ? এস মা, সেই "চামুণ্ডা মুণ্ডমথনা" বেশে আমার হৃদয়-রণ-ক্ষেত্রে আবির্ভূতা হও, আমার প্রবল, মদমত্তমাতঙ্গ-তুল্য ভীষণ শত্রু দমিত হউক। তুমি মা শরণাগত-প্রতিপালিনী, দীনহীন কাঙ্গাল সন্তানের হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা হও, তোমার প্রতাপে "সিংহরবে ধায় যথা করী" আমার শত্রু ভয়ে পলায়ন করুক, প্রাণে বিমল শান্তি বিরাজিত হউক।

মা গো,

"প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোকবাসীনামীড্যে লোকানাং
বরদা ভব ॥"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী। ১১শ অধ্যায়

দে মা, এই বর দে, যেন তোমার জোরে সব শত্রু পদদলিত করিয়া পরমে মিলিত হইতে পারি। জাগ মা, তুমি জাগিয়া এ অনাথ সন্তানকে উদ্বোধিত কর মা, আমি

"ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্"

সেই পরম পুরুষকে দর্শন করি ও প্রেম-বিহ্বলচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে বলি

"নমো রামায় কৃষ্ণায় বসুদেবসুতায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।

আর বঞ্চিত করিও না। তুমি চিরদিন দৈত্য-নাশিনী, আমার হৃদয়বিহারী দুর্দ্দম দৈত্যগণকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া সন্তানকে উদ্ধার কর। রিপুর ক্রূর কবল হইতে তুমি রক্ষা না করিলে আর কে রাখিবে ? শত্রু বড় প্রবল। আমাকে দুর্ব্বল দেখিয়া তাহারা সর্ব্বদাই উৎপীড়ন করে। আর পারি না মা, আর যুঝিতে পারি না, আমার শক্তির অতীত! তাহাদিগকে স্বশক্তিতে পরাজিত করিতে পারি না বলিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি।

বালকেরা পরস্পর কলহ করিয়া যদি কোন দুর্ব্বল বালককে প্রহার করে, সে কিছু

করিতে না পারিয়া বলে, "জানিস্, আমার মা আছে, মাকে বলিয়া দিব।" রিপুর তাড়নে চক্ষু রাঙ্গাইয়া যদি বলি "আমার মা আছে" তাহারা হাসে, শুনিয়াও শুনে না, মনে করে মা যে ছেলেকে বিমাতার করে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, সে ছেলের আবার জোর কি? সে ত চিরদুঃখী, তাকে কে ভয় করে? তাই বলি মা দয়া কর, তুমি দয়া করিলে আমার রিপু-ভয় বিদূরিত হইবে, তোমার অকৃতিসন্তান তোমার ক্রোড়ে স্থান পাইবে। অর্পিত বস্তুর আস্বাদে সংসারের কটু-কষায় সন্তান বিস্মৃত হইয়া, সে বিমল শান্তি তরঙ্গে ভাসিবে। মাগো, প্রসন্না হও,

"দেবি, প্রপন্নার্ত্তিহরে, প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য॥"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

পর্য্যটকের পত্র

(১৩১৯ ভাদ্রমাসের ৩১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর

সাধুদের মধ্যে দুইজন পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "বাঙ্গালী সাধুরা বিদ্বান ও ভাল লোক" এবং এইপ্রকার নানারূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আমি বাঙ্গালী, সুতরাং আমাকে বাসস্থান সম্বন্ধে সাহায্য করা তাঁহারা কর্ত্তব্য মনে করিলেন। আমার নিজের কোন গুণ না থাকিলেও তাঁহাদের মুখে বাঙ্গালী জাতির প্রশংসা শুনিয়া গৌরবান্বিত মনে করিলাম। একজন সাধু আমাকে তাড়াতাড়ি গঙ্গা হইতে স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন, ১১টা বাজিয়াছে, ছত্রের সময়ও হইয়া আসিয়াছে, তাঁহারা ছত্রে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে আমি আসিয়া পড়িয়াছিলাম, সুতরাং তাঁহাদের বিলম্ব হইতেছিল। আমি স্নান করিয়া আসিলে আমাকে সঙ্গে করিয়া ছত্রে লইয়া যাইবেন বলিয়া তিন জনেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি কাপড় চোপড় রাখিয়া স্নান করিতে গেলাম, যাইবার সময় একজন সাধু সাবধান করিয়া দিলেন যেন রাস্তা ভুল না হয়। অতি নিকটেই গঙ্গা, গঙ্গার স্রোত এরূপ প্রখর যে দাঁড়াইয়া স্নান করা অতি দুরূহ, তাহার উপর জলও বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা, কোনও প্রকারে স্নান সারিয়া লইলাম। তীরে উঠিয়া দেখি, যে সাধুটি রাস্তা ভুল হয় বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি আমাকে কুটীরে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন—পাছে আমি রাস্তা ভুলিয়া যাই। সাধুর এইরূপ সৌজন্যে বড়ই প্রীত হইলাম, কূপে গিয়া ভিজা কাপড় রৌদ্রে দিয়া সাধুদের সহিত ছত্রে চলিলাম, প্রথমেই পঞ্জাবী ছত্রে যাওয়া গেল, তথায় দেখি অসংখ্য গৈরিক বস্ত্রধারী সাধু আহার্য্য গ্রহণ করিতেছেন। এক জন পঞ্জাবী অতি বিনয় সহকারে এক এক করিয়া সকলকে আহার্য্য বিতরণ করিতেছেন। অনবরত মুখে "নারায়ণ," "কৃপানিধান," প্রভৃতি বাক্যদ্বারা সাধুদিগকে সম্বোধন করিতেছেন ও অতি ক্ষিপ্রতার সহিত আহার্য্য

প্রদান করিতেছেন ; প্রফুল্ল বদন, বিরক্তির লেশ মাত্র নাই, মুখ দিয়া যেন একটা পবিত্রতার জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। যে কার্য্য তিনি করিতেছেন তাহাতেই যেন তাঁহার অসীম প্রীতি।· পরে জানিতে পারিলাম —ইনি অবৈতনিক ভাবে ছত্রের কার্য্য করেন, সস্ত্রীক হৃষীকেশে থাকিয়া শাস্ত্রালোচনায় কালাতিপাত করেন। ছত্রের ম্যানেজারের সহিত ইনি অনেক সময়ে এক মত হইতে পারেন না, অনৈক্যের কারণ সাধুদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিনা বাক্যব্যয়ে দিয়া থাকেন, সাধুদিগের প্রতি কোনও রূঢ় ব্যবহার করিতে ইনি অক্ষম। এই অনৈক্যের জন্যই শেষে তাঁহাকে ছত্রের কার্য্যত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ছত্রে এরূপ অধিকসংখ্যক গৈরিক বেশধারী সাধুর সমাগম ও আহার্য্য বিতরণের সুবন্দোবস্ত দেখিয়া মনে অপূর্ব্ব প্রীতির সঞ্চার হইল। পুরাকালে মুনিঋষিগণের কথা মনে উদিত হইল, কিন্তু হায়! কোথায় সেই ভগবৎপ্রাণ ত্যাগিগণ, আর কোথায় আজকালকার তথাকথিত সাধুবৃন্দ!

পঞ্জাবী ছত্রে* যে আহার্য্য পাইলাম তাহাই আমার যথেষ্ট মনে হইল, সুতরাং আমার অন্য ছত্রে যাওয়ার প্রয়োজন হইল না। আহার্য্য লইয়া বাহিরে আসিয়া আমার সঙ্গের সাধুদিগকে দেখিতে পাইলাম না, জনতার মধ্যে তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন মনে করিয়া, আহার্য্যগুলির সৎকার করিবার জন্য গঙ্গাতীরে চলিলাম। সাধুদিগের নিকট পূর্ব্বেই জানিয়াছিলাম হৃষীকেশস্থ অধিকাংশ সাধুই গঙ্গাতীরে বসিয়া আহার করেন সুতরাং সেখানেই তাঁহাদের সহিত দেখা হইবে মনে করিলাম। গঙ্গাতীরে আসিয়া দেখি সাধুরা শিলাখণ্ডের উপর আহার্য্য রাখিয়া শিলাখণ্ডে উপবেশন পূর্ব্বক আহার করিতেছেন। বামহস্তের যষ্টিদ্বারা ঢিল, কাক তাড়াইতেছেন। "মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থা" আমিও তাঁহাদের পন্থানুসরণ করিলাম, কিছুক্ষণ পরে আমার সঙ্গী সাধুদিগকেও আসিতে দেখিলাম, তাঁহারা পঞ্জাবী ছত্রে আহার্য্য লইয়া অন্যান্য ছত্রে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের আহার শেষ হইলে এক সঙ্গে তাঁহাদের "কুপে" গেলাম। কুপে পঁহুছিয়া দেখি যে সাধুটি পথ হারাইয়া যাইব বলিয়া গঙ্গাতীর হইতে আমাকে আনিতে গিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার সঙ্কীর্ণ কুপের মধ্যে অতি যত্নের সহিত আমার বিশ্রামের জন্য তৃণ শয্যা প্রস্তুত করিয়াছেন। আমাকে তিনি বিশ্রাম করিতে বলিলেন ; আমিও কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। সাধুর সহিত গল্প হইতে লাগিল, সাধুর বিশ্বাস বাঙ্গালী সাধুরা নানারূপ অদ্ভুত বিদ্যায় পারদর্শী; যথা—মানুষকে ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি পশুতে পরিণত করা। এরূপ বিদ্যা আমি কিছু জানি কি না জিজ্ঞাসা করায় এ সমস্ত বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। তিনজন সাধুর মধ্যে কেহই শাস্ত্রের ধার ধারেন না, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে সৌজন্যের অভাব দেখিলাম না। কথায় কথায় নেপালী স্বামী অনন্তানন্দের আশ্রম কোথায় জানিয়া লইলাম। স্বামীজীর আশ্রম অতি নিকটেই, সন্ধ্যার সময়ে স্বামিজীর আশ্রমে গেলাম। কতিপয় সাধু কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া

* ছত্রের বিবরণ হৃষীকেশ অংশে বিস্তারিত দেওয়া হইয়াছে।

স্বামীজী একখানি মাদুরের উপর উপবিষ্ট আছেন। সমবেত সাধুরা নানারূপ শাস্ত্রীয় প্রশ্ন করিতেছেন, স্বামীজী প্রশ্নসমূহের যথাযথ সমাধান করিয়া দিতেছেন। বালসুলভ অজ্ঞতা পরিচায়ক অদ্ভুত প্রশ্নসমূহও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেছে, কিছুতেই বিরক্তি নাই, সকলের সমস্যাই সাধ্যমত ভঞ্জন করিয়া দিতেছেন স্বামীজীর সরল সৌম্য সহাস্য মূর্ত্তি দর্শনমাত্রেই তাঁহার প্রতি ভক্তির উদ্রেক হইল। আমি স্বামীজীকে অভিবাদন করিলাম, তিনিও আমাকে অভিবাদন করিয়া বসিতে বলিলেন। আমি কোথা হইতে আসিতেছি জিজ্ঞাসা, করিলেন, আমিও তাঁহার প্রশ্নের আনুপূর্ব্বিক উত্তর দিলাম, তাঁহার নিকট বেদান্ত-পাঠের অভিলাষও ব্যক্ত করিলাম। বেদান্ত-আলোচনার ইচ্ছা জানিয়া তিনি অতীব প্রীত হইলেন। বলা বাহুল্য, আমি বাঙ্গালী তিনি ইতিপূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন এবং সমবেত সাধু-দিগের নিকট বাঙ্গালী জাতির সদ্‌গুণাবলীর উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। আমি স্থায়ী বাসস্থান পাই নাই জানিয়া আমার একটি বাসস্থানের জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা অতীত হওয়া সত্ত্বেও রাত্রেই একজন নেপালী ব্রহ্মচারী যুবকের সহিত কিয়দ্দূরে অবস্থিত একটি সাধুর আশ্রমে আমাকে পাঠাইলেন, নেপালী যুবককে তথায় আমার স্থান করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে বলিয়া দিলেন। অন্ধকার রাত্রে নেপালী যুবকের সহিত পূর্ব্বোক্ত স্থানে গেলাম, কিন্তু তথাকার কুটীরে ৩।৪ জন সাধু বাস করিতেছেন, তথায় আমারও স্থান হওয়া সম্ভব নহে, কোনও প্রকারে সঙ্কুলন হইলেও এরূপ গোলমালের ভিতর বাস করা নিতান্ত অসুবিধাজনক মনে করিয়া যুবকের সহিত স্বামীজীর আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বামীজী অদ্যকার রাত্রি যেখানে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় পাইয়াছি সেই-খানেই যাপন করিতে বলিলেন। আগামী কল্যই আমার বাসস্থান ঠিক করিয়া দিবেন বলিলেন। স্বামীজীর আশ্রমে "বিচার সাগর" ও "তত্ত্বানুসন্ধান" নামক বেদান্ত পাঠ হইতেছে—আমার নিকট উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের কোনওখানি নাই জানিয়া সমবেত সাধুদিগের মধ্যে একজনকে উক্ত গ্রন্থ দুইখানি আমাকে কল্যই সংগ্রহ করিয়া দিতে বলিলেন। এইরূপে পাঠের গ্রন্থও স্বামিজী আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে কখনও এই মহাত্মার সহিত পরিচয় নাই, অথচ কত স্নেহ, কত যত্ন, ইঁহারাই প্রকৃত সাধুপদবাচ্য, ইঁহাদের আত্মপর জ্ঞান নাই। বিদেশে, অপরিচিত স্থানে একজন মহাত্মার পুত্রবৎ ব্যবহারে মনে কিরূপ শান্তিলাভ করিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কখনই সম্ভব নহে। অনেক রাত্রি হইয়া আসিল, স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া পূর্ব্বকথিত পঞ্জাবীদের কুটীরে ফিরিলাম। অতি প্রত্যূষেই "বিচার-সাগর"-গ্রন্থের পাঠ আরম্ভ হয়, সুতরাং আগামী কল্য অতি প্রত্যূষেই প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া তাঁহার কুটীরে আসিয়া পাঠে যথা সময়ে যোগদান করিতে স্বামিজী বারংবার বলিয়া দিলেন।

আমি অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করতঃ কন্‌কনে শীতের মধ্যে আপাদমস্তক আবৃত করিয়াই প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া

স্বামিজীর কুটিরে আসিলাম। অন্যান্য সাধুরা আসেন নাই, একে একে সকলে আসিতে লাগিলেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গ্রন্থপাঠ আরম্ভ হইল। হরিদ্বারের ন্যায় এখানেও বেলা ৭ টার পূর্ব্বে সূর্য্যদেবের দর্শন লাভ করা যায় না। স্বামীজী পাঠ্য বিষয়গুলি অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইতে লাগিলেন। সাধুদিগের সংস্কৃত ভাষা এমন কি তাঁহাদের মাতৃভাষা হিন্দীতেও ব্যুৎপত্তি না থাকাতে সামান্য বিষয়গুলিও স্বামীজীকে বারংবার বুঝাইতে হইতেছে দেখিলাম। একটি সামান্য সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যাতেই ১৫ মিনিটের অধিক সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। স্বামীজীর কিছুতেই বিরক্তি নাই। প্রায় সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত বিচার-সাগর পাঠ হইল। পাঠ-সমাপনান্তে স্বামীজী আমাকে "বিচার-সাগর" ও "তত্ত্বানুসন্ধান" গ্রন্থ দুইখানি দিলেন। স্বামীজীর আশ্রমের নিকটেই একটি অতি সঙ্কীর্ণ "কূপ" আমার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। "কূপটী" অতি সঙ্কীর্ণ, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সাড়ে তিন হাত ও উচ্চে আড়াই হাত হইবে। প্রবেশ, দ্বার এরূপ সঙ্কীর্ণ যে হামাগুড়ি দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। কূপটীর আয়তন এরূপ যে, স্বল্পায়তন দেহবিশিষ্ট ব্যক্তির কোন-প্রকারে সঙ্কুলন হইতে পারে। ইহার উপর কূপটী অতি জীর্ণ, গত বৎসর বন্যার জল ইহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আপাততঃ এই কূপেই আশ্রয় লওয়া স্থির করিলাম। ভিজা বালির উপর কতকগুলি কুশ বিছাইয়া তাহার উপর কম্বল বিস্তৃত করিয়া আসন ও শয্যা উভয়ই প্রস্তুত করিয়া লইলাম। বেলা আন্দাজ ১০ টার সময়ে গঙ্গাস্নান করিয়া ছত্রে যাওয়া গেল। পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় গঙ্গাতীরে আহার সমাধা করিয়া কূপে আসিয়া একটু শয়ন করিলাম। তন্দ্রার আবেগ হইয়াছে, এমন সময়ে দেখি স্বামীজী "তত্ত্বানুসন্ধান" পাঠের জন্য আমাকে ডাকিতে একজন সাধুকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। অতি সত্বর পুস্তক লইয়া স্বামীজীর আশ্রমে গেলাম। সমস্ত সাধুই উপস্থিত হইয়াছেন, আমি উপস্থিত না হওয়ায় এখনও পাঠ আরম্ভ হয় নাই। স্বামীজীর যত্নে অত্যন্ত মুগ্ধ হইলাম। আন্দাজ বেলা ৩ টার সময় পাঠ শেষ হইল। পাঠান্তে স্বামিজী অতি স্নেহপূর্ণ বচনে আমাকে বেদান্ত আলোচনা করিতে উপদেশ দিলেন। এবং আহার করিয়াই তাঁহার কুটীরে আসিয়া পাঠারম্ভ পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিতে আদেশ করিলেন। বৈকালে একটু বেড়াইয়া আসিলাম। প্রদীপ জ্বালিবার কোনও বন্দোবস্ত নাই ; তৈল, প্রদীপ উভয়েরই অভাব, সুতরাং অন্ধকারেই কিছুক্ষণ কাটাইয়া শয়ন করিলাম। নিদ্রা আসিল বটে, কিন্তু গাঢ় নিদ্রা হইল না, অসম্ভব শীতে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। গাত্রবস্ত্র যাহা আছে তাহা এখানকার শীতের পক্ষে যথেষ্ট নহে। বারংবার নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে লাগিল। শরীরকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া কোনওরূপে রাত্রিটা অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। অতি প্রত্যূষে প্রাতঃ-কৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক স্বামীজীর নিকট পাঠ করিতে গেলাম। এইরূপে দিবসে শাস্ত্রা-লোচনায় এবং রাত্রে শীতে ও অনিদ্রায় চারি পাঁচ দিন অতিবাহিত করিলাম। একটা উপযুক্ত বাসস্থানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। নেপালী স্বামীজীর আশ্রম হইতে

কিছুদূরে গঙ্গাতীরে কয়েকজন পঞ্জাবী সাধু বাস করেন। তাঁহাদের একটা "কূপ" খালি ছিল, সেটাতে আমাকে তাঁহারা বাসের অনুমতি প্রদান করিলেন, কূপটী বেশ প্রশস্ত দেখিয়া তথায়ই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পড়াশুনা নিয়মিতভাবে চলিতে লাগিল। অতিদূর দেশে একমাত্র ভগবানকে সম্বল করিয়া আসিয়াছি। তাঁহার কৃপায় সমস্তই নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইতেছে। কিছুরই অপ্রতুল নাই, হইবেই বা কেন! বিশ্বজননীর রাজ্যে সন্তানের কখনও কোন বিষয়ের অপ্রতুলতা সম্ভব নহে। আমরা তাঁহার উপর সর্ব্বান্তঃকরণে নির্ভর করিতে পারি না, অভাব-অভিযোগের মাত্রা বাড়াইয়া দিই, তাই আমাদের এত অশান্তি। ভগবান বলিয়াছেন—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ
পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং
বহাম্যহং॥"

যাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন তাঁহাদিগের শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহার সংস্থান ও রক্ষণ তিনিই করিয়া থাকেন।

আমি কনখলে যে তিন জন বিবেকানন্দ মিশনের সন্ন্যাসীদের কথা শুনিয়া আসিয়াছিলাম তাঁহারা হৃষীকেশে আসিলেন, তাঁহাদের সহিত পরিচয় হইল। ইঁহারা দেরাদূন প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, তথায় এ প্রদেশস্থ কোনও এক খ্যাতনামা সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহারা কিছুদিন ছিলেন, তাঁহাদের সহিত একজন বাঙ্গালী ব্রহ্মচারীও আসিয়াছেন। ব্রহ্মচারীর সহিত দেরাদূনেই সন্ন্যাসীদের পরিচয় হইয়াছে জানিতে পারিলাম। সন্ন্যাসীদিগের নাম যোগানন্দ, জ্ঞানানন্দ ও উমানন্দ; ইঁহারা সকলেই শিক্ষিত ও প্রকৃত বৈরাগ্যসম্পন্ন। যোগানন্দ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত যুবক, শাস্ত্রেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। দূরদেশে বাঙ্গালীর সহিত পরিচয় লাভ করিয়া বড়ই শান্তি পাইলাম। ব্রহ্মচারী আমারই কূপে আশ্রয় লইলেন। কূপটা বড় ছিল, সুতরাং স্থানাভাব জনিত কোন অসুবিধা হইল না। সন্ন্যাসীরা তাঁহাদের পূর্ব্বনির্ম্মিত কূপগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য যে সমস্ত সাধুরা আপাততঃ তাঁহাদের কূপগুলি অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহারা অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। যোগানন্দ ও উমানন্দ স্বামী অনন্তানন্দের নিকট "বিচার-সাগর" পাঠ করিতেন। ১২।১৩ দিবস হৃষীকেশে অবস্থানের পর যোগানন্দ ও উমানন্দ হৃষীকেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। জ্ঞানানন্দ হৃষীকেশে থাকিয়া বেদান্ত আলোচনা করিতে লাগিলেন। যোগানন্দ ও উমানন্দের সম্মতিক্রমে আমিও ব্রহ্মচারী তাঁহাদের পরিত্যক্ত কূপে আশ্রয় লইলাম। আমরা তিন জনেই একস্থানে বাস করিতে লাগিলাম। জ্ঞানানন্দ ও আমি স্বামীজীর নিকট যথাযথ সময়ে পাঠ করিতে যাইতাম। অবশিষ্ট সময় আমরা শাস্ত্রালোচনায় নিত্যকার্য্যে অতিবাহিত করিলাম। ব্রহ্মচারী বাচাল ও আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন, সুতরাং সময়ে সময়ে কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। যাহা হউক বেশ আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ফাল্গুন মাস অতীত হইয়া আসিল;

এই সময়ে কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমস্থ আমার ব্রহ্মচারী বন্ধুটি হৃষীকেশে আসিলেন। তাঁহার সহিত শাস্ত্রালোচনায় বড়ই সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। এই দূর প্রদেশে পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া কি এক অপার আনন্দ উপভোগ করিতাম তাহা বর্ণনাতীত। সংসারের যাবতীয় কোলাহল শূন্য কলনিনাদিনী গঙ্গার তীরে উপলখণ্ডে উপবেশন করিয়া কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাবেই না অনুপ্রাণিত হইতাম! সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছেন, পশ্চিমগগন রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, কলুষনাশিনী গঙ্গা তরতরবেগে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছেন; প্রকৃতির এই সমস্ত অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া আত্মহারা হইতাম, মনে মনে বিশ্বপাতাকে হৃদয়ের অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতাম।

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়।

সুপুর

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল-পথের বোলপুর ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ ব্যবধানে পশ্চিমদিকে অজয় নদ-সেবিত মনোহর সমতল ভূমির উপর সুপুর নামক প্রাচীন গ্রাম। গ্রামের চতুষ্পার্শ্ব লতাগুল্ম ও বৃক্ষের সমাবেশে এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। পশ্চিমে তালবৃক্ষ-সমাকীর্ণ বহু স্বচ্ছসলিল সরোবর-শোভিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর। দক্ষিণে অজয়ের শীতল স্রোত পূতসলিলা জাহ্নবীর সহিত সম্মিলন-মানসে মন্থর গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্বে এবং উত্তরে এখন কোন উল্লেখযোগ্য সীমা-নির্দ্দেশক চিহ্ন নাই। বর্ত্তমান সময়ে এই গ্রামে বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের বাস দৃষ্ট হয়।

প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে সুপুর বঙ্গভূমির মধ্যে অতি স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল, কিন্তু তাহার পর হইতে ম্যালেরিয়া-প্রসাদে এই স্থানের জলবায়ু এরূপ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে যে নানাবিধ সংক্রামক পীড়ার উৎপাতে অনেক বংশের নিঃশেষ বিলোপ ঘটিয়াছে।

কিরূপে এই গ্রামের নাম সুপুর হইল এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতার নাম কি, তাহা অভ্রান্তরূপে নিরূপণ করা দুরূহ। তবে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে আমরা যে স্বপুরের উল্লেখ দেখিতে পাই, অনেকে সুপুরকে সেই স্বপুরের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমান করেন। আমরা যথাস্থলে ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইব।

একশত সত্তর বৎসরের অধিক হইবে তদানীন্তন বঙ্গের প্রধান শত্রু মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণ যখন সমগ্র বঙ্গভূমি বিধ্বস্ত করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই সময়ে এই গ্রামে আনন্দচাঁদ গোস্বামী নামক একজন মহাপণ্ডিত বাস করিতেন। তিনি একজন পবিত্র-চেতা ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে জীবনযাপন করিতেন। ব্রত উপবাস এবং দেবার্চ্চনা তাঁহার জীবনের প্রধানতম কার্য্য ছিল। মহাবিপদে পতিত হইলেও তিনি অধীর বা অব্যবহিতচিত্ত না হইয়া সমাহিতচিত্তে সহিষ্ণুতাবলম্বনপূর্ব্বক

তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াস পাইতেন। তিনি বলিষ্ঠ ও দৃঢ়কায় ছিলেন। তাঁহার বর্ণ এত সুন্দর ও গৌর ছিল যে, প্রবাদ আছে কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার সময়ে তাঁহার স্বচ্ছ গলনালী মধ্যে তাহা দৃষ্টিগোচর হইত। গোস্বামী প্রভুর অনেক শিষ্যসেবক ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। তৎকালীয় বৈষ্ণবগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং বর্ত্তমানেও সে বিশ্বাস বদ্ধমূল আছে যে আনন্দচাঁদ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রী৺ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অবতার বিশেষ। গোস্বামীপ্রভু শিষ্য ও ভক্তগণের নিকট যে প্রণামী পাইতেন তাহাতে তাঁহার বিশেষ আয় হইত। এতদ্ভিন্ন আয়ত্তাধীন কোন ভক্ত উত্তরাধিকারীশূন্য হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মৃতব্যক্তির যাবতীয় সম্পত্তি তাঁহার অধিকারভুক্ত হইত।

মহারাষ্ট্রীয় অত্যাচারের সময় একদা রজনীকালে বহু ভয়বিহ্বল নরনারী কোলাহল করিতে করিতে গোস্বামী প্রভুর ভবনে আগমনপূর্ব্বক তদীয় সিংহদ্বারে সমবেত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তিনি আর্ত্তগণের কোলাহলে জাগরিত হইয়া তাহাদিগের নিকট আগমন করিলে তাহারা কাতরস্বরে নিবেদন করিল, "প্রভো, লুণ্ঠনপরায়ণ বর্গীগণের অত্যাচারে কয়েকমাস পূর্ব্বে গ্রামবাসিগণের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে। অদ্য রাত্রে তাহারা পুনরায় আগমন করিয়াছে। দিবাগমে গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া অগ্নি-সংযোগে সমস্ত গ্রাম ভস্মে পরিণত করিবে। তাহাতেও নিস্তার নাই, স্ত্রী-কন্যাগণের সতীত্ব-রত্নও অপহৃত হইবে, তাই আমরা ব্যাকুল হইয়া প্রতিকার-আশায় আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আমরা নিরুপায়, আপনিই আমাদের আশ্রয়-স্থল। যাহাতে আমরা এই ভীষণ বিপদ হইতে উদ্ধার পাই তাহার বিহিত উপায় নির্দ্ধারণ করুন।"

এতচ্ছ্রবণে গোস্বামী প্রভু কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বর্গীগণকে বাধা দিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন এবং সমবেত বিপন্ন গ্রামবাসিগণকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা করিলেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয় দমনার্থে যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দুইটি কিম্বদন্তী আছে। প্রথমটি এই—

অশ্বসঙ্গী বর্গীসৈন্য কষ্টসহিষ্ণু টাট্টু ঘোড়ায় আরোহণপূর্ব্বক আক্রমণ করিতে আসিত। রাত্রিকালের সুযোগে গোপনে সেই সকল অশ্বকে খঞ্জ করা হইল। শত শত গ্রামবাসী বাঁশ কাটিয়া তাহাতে লাঠি প্রস্তুত করিল এবং প্রজ্জ্বলিত মশাল হস্তে মহারাষ্ট্রীয় শিবিরের সম্মুখীন হইল। আনন্দচাঁদ এই সকল প্রজার নেতার স্বরূপ অগ্রগামী হইয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। অকস্মাৎ এইরূপ অসংখ্য সুসজ্জিত জন-সমাবেশ-দর্শনে দস্যুগণ বিচলিত হইয়া উঠিল। বাঙ্গালী গোস্বামীর এই প্রকার সাহসিকতায় মহারাষ্ট্রীয় দলপতি মুগ্ধ হইয়া গোস্বামী প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। গোস্বামী প্রভুও নির্ভয়ে কতিপয় বিশ্বাসী সঙ্গী সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই সম্মিলনের পর বর্গীগণ আর কোনরূপ অত্যাচার না করিয়া সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় জনশ্রুতি অনুসারে আমরা অবগত হই যে, প্রাচীন কালে সুপুরে একটি দুর্গ ছিল। অদ্যাপি সেই দুর্গ বা গড়ের প্রাকার দেখিতে পাওয়া যায়। আনন্দচাঁদ মহারাষ্ট্রীয়গণকে বিধ্বস্ত করিবার মানসে গ্রামবাসিগণকে গড়ের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া স্বয়ং এক শ্বেতাশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক একই সময়ে গড়ের চারিটি সিংহদ্বারে উপস্থিত ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার সকল দ্বারে তাঁহাকে বিদ্যমান দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং অবশেষে গোস্বামী প্রভুর প্রতি মহারাষ্ট্রীয় দস্যুপতির এরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিয়াছিল যে ভবিষ্যতে সুপুর গ্রামে যাহাতে আর বর্গীর অত্যাচার না হয়, তজ্জন্য তিনি একটী ছাড়পত্র লিখিয়া দেন।

গোস্বামী প্রভুর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে আর একটি গল্প আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। বীরভূম জেলায় কুষ্টিকুড়ী নামক একটি গ্রাম আছে। তথায় একজন পরম ধার্ম্মিক মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী জমীদার হজরৎ বাস করিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে নানারূপ আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় দিতেন, তাঁহার একটি পদ খঞ্জ ছিল। একদা তিনি ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আনন্দচাঁদ গোস্বামীকে দর্শন করিতে যান, তৎকালে গোস্বামী জীর্ণ একটী ভগ্ন প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি হজরৎ জমিদারকে আসিতে দেখিয়া উক্ত প্রাচীর চালিত করতঃ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং বাটির মধ্য হইতে হজরৎকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হজরৎ সাহেব তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। যাহা হউক্ নানা সদালাপের পর তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করতঃ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি গোস্বামী জীউর অমানুষিক শক্তির কথা আপন পারিষদবর্গকে বলিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন ধর্ম্মান্ধ গোঁড়া মুসলমান এই আশ্চর্য্য কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া স্বয়ং পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। এতদর্থে তিনি একটি পাত্রে গোমাংস রক্ষা করতঃ তাহা বস্ত্রাবৃত করিয়া উপঢৌকন স্বরূপ প্রভুজীউর নিকট লইয়া গেলেন।• কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি সংযতে আবরণ-বস্ত্র অপসারিত করিবার আদেশ প্রদান করিলে তাহা প্রতিপালিত হইবার পর দেখা গেল যে গোমাংসের পরিবর্ত্তে সেই পাত্রে অসংখ্য বিকসিত রক্তকমল শোভা পাইতেছে এবং তিনিও তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া তদীয় আঘ্রাণ লইতে লাগিলেন। তখন মুসলমান তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বারম্বার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

গোস্বামী প্রভুর দৈবশক্তি বিষয়ে আরও নানাবিধ গল্প লোকমুখে প্রচারিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহার বর্ণনায় ক্ষান্ত থাকিলাম। এতদ্বারা ইহাই সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে তিনি চতুষ্পার্শ্ববাসী লোক সমূহের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। এক্ষণে আমরা এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের জন্মকাল নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব।

আমরা ইতিপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তদ্বারা বুঝা যায় যে মহারাষ্ট্রীয়গণের বঙ্গদেশ আক্রমণ কালে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। ইহা ১৭০ বৎসরেরও অধিক কালের কথা। এই সময় যখন তিনি স্থানীয় অত্যাচার নিবারণে বদ্ধ

পরিকর হন, তখন সম্ভবতঃ তাঁহার যুবা বয়স। এই হিসাবে গণনা করিয়া দেখিলে তাঁহার জন্মকাল সন দ্বাদশ শতাব্দী অথবা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অনুমিত হয়। কিম্বদন্তীও এই অনুমান সমর্থন করিতেছে। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী ব্রতনিষ্ঠ ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের জীবন সচরাচর দীর্ঘ হইয়া থাকে; প্রাচীন দলিলাদি দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে সন ১২০৯ সালেও তিনি জীবিত ছিলেন। অতএব যদি অনুমান করা যায় যে ১২২০ সালের মধ্যে তিনি জীবন-লীলা সংবরণ করিয়াছিলেন, তবে তাহা অসঙ্গত হইবে না। যদিও তাঁহার মৃত্যুকাল অবধারণ করিবার অপর কোন উপায় নাই, তথাপি স্থানীয় লোকের অনুমানও উপরোক্ত রূপ। শুনা যায় গোস্বামী প্রভুর পূর্ব্বপুরুষগণ সামান্য অবস্থাপন্ন ছিলেন। তিনি নিজ ক্ষমতায় যথেষ্ট বিষয়বৈভব উপার্জ্জন করেন, অদ্যাবধি সেই সকল ঐশ্বর্য্যের চিহ্নস্বরূপ পুষ্করিণী ও উদ্যান-শোভিত সুবিশাল অট্টালিকা অসংস্কৃত ও জীর্ণাবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়া নিত্য পরিবর্ত্তন-শীল কালের সর্ব্বগ্রাসিনী শক্তির কথঞ্চিৎ আভাস দিতেছে। লোকে আনন্দচাঁদকে যোগিনীসিদ্ধ বলিত, জনসাধারণের বিশ্বাস যে এতদ্দ্বারা তিনি দৈব বল লাভ করতঃ অলৌকিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার জীবনেতিহাস সম্বন্ধে আর অধিক কিছু জানিবার সম্ভাবনা নাই। ইহা আমাদিগের ইতিহাস বা জীবনী-প্রণয়ন বিষয়ে পুরুষানুক্রমিক প্রবৃত্তির অভাবের কথা মাত্র। এইরূপে আমাদিগের জাতীয় ইতিহাসের কত রত্ন যে বিস্মৃতির অতলস্পর্শ তলে লুক্কায়িত আছে তাহা কে নির্ণয় করিবে? আনন্দচাঁদের কোন বংশধর বিদ্যমান নাই। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার জনৈক জ্ঞাতির দৌহিত্র তদীয় বাটীতে বাস করিতেছেন। গোস্বামী-প্রতিষ্ঠিত শ্যাম-রায়ের সেবা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্যের প্রপিতামহের খুল্লতাত ব্রজকিশোর ভট্টাচার্য্য শক্তি-মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল। আনন্দচাঁদের সমসাময়িক ব্রজকিশোর প্রতিষ্ঠিত কালী ও শিব-মন্দির অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। আনন্দচাঁদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন, এই জন্য অনুমান হয় যে ব্রজকিশোর তাঁহা অপেক্ষা বড় ছিলেন।

এক্ষণে আমরা সুপুরের পুরাতন তত্ত্ব যতটুকু অবগত হওয়া যায় ও ইহা বর্ত্তমান সুপুরে পরিণত হইয়াছে কি না তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। এ বিষয়ে আমাদিগকে প্রবাদ ও পৌরাণিক ঘটনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে। দুই একটি প্রবাদমূলক চিহ্ন ব্যতীত অপর কোন উপকরণ নাই যদ্দ্বারা আমরা অভ্রান্তরূপে সত্যতত্ত্বে উপনীত হইতে পারি। পুরাণবর্ণিত ঘটনাসমূহ যে নিরবচ্ছিন্ন সত্য—এ কথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। যখন পুরাণাদি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিত হইয়াও প্রক্ষেপাদি নানা কারণ-বশতঃ ঘটনাবলী এরূপ বিকৃত আকার প্রাপ্ত হয়, তখন বহুকালাবধি বংশানুক্রমে প্রাপ্ত প্রবাদ মধ্যে ভস্মস্তূপাবৃত বহ্নিবৎ আবর্জ্জন-সংবৃত অবিকৃত সত্যের আবিষ্কার কতদূর সম্ভবনীয় তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গ বিবেচনা

করিবেন। তবে প্রবাদ বা পুরাণ-বর্ণিত ঘটনার মূলে যে কিঞ্চিৎ সত্য নিহিত আছে তাহা সাধারণতঃ স্বীকৃত হয়।

'মার্কণ্ডেয়'-পুরাণান্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্য হইতে আমরা অবগত হই যে, পুরাকালে সুরথ নামে কলিঙ্গদেশের কোন প্রসিদ্ধ ভূপতি সমগ্র ক্ষিতিমণ্ডলে নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করতঃ রাজধানী স্বপুরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতেন।* কেবল কর্ণাট তাঁহার হস্তগত হয় নাই। অতঃপর কর্ণাটবিজয়মানসে কোলাবিধ্বংসী জাতীয় কর্ণাটাধিপতির বিরুদ্ধে তিনি সৈন্য পরিচালনা করিলেন। কিন্তু তদানীন্তন কর্ণাটেশ্বর অম্বিকাদেবীর প্রতি আন্তরিক ভক্তিমান থাকা হেতু দেবী তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রসন্না ছিলেন। দেবীর অনুগ্রহ-বশতঃ সুরথ কর্ণাটবিজয়ে বিফলমনোরথ হইয়া রাজধানী স্বপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময় ভাগ্যলক্ষ্মীও তাঁহার প্রতি অপ্রসন্না হইলেন। তাঁহার হীনবল দর্শনে শত্রুগণ মস্তকোত্তোলন করিতে লাগিল; এমন কি, রাজকর্ম্মচারীবর্গও তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিল। ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া তিনি রাজ্য ত্যাগপূর্ব্বক নানাদেশ পরিভ্রমণ করতঃ অবশেষে মেধস্ মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। পরে তিনি উক্ত মুনির সাক্ষাৎ-লাভে কৃতার্থ হইয়া তাঁহার নিকট নিজ দুর্ভাগ্যের বিষয় নিবেদন করিলে মুনিবর তাঁহাকে অম্বিকা-অর্চ্চনায় মনোনিবেশ করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। এই উপদেশ অনুসারে অভীষ্ট লাভের আশায় তিনি মহামায়ার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে সিদ্ধিলাভ করেন এবং অবশেষে ভবানীর কৃপায় স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। রাজ্যলাভের পর উক্ত মুনিবরের উপদেশে তিনি অকাল-বোধন দ্বারা দুর্গাপূজার আয়োজন করেন, এই পূজায় লক্ষ বলি প্রদানের ব্যবস্থা হয়। কথিত হয়—বিদ্রোহী ও শত্রুগণ এই বলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। যে স্থানে এই বলি রক্ষিত হইয়াছিল তাহা 'বলিপুর' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই পূজায় চণ্ডিকাদেবী সন্তুষ্ট হইয়া সুরথকে বরদানে ইচ্ছুক হইলে সুরথ কর্ণাটের জয়লক্ষ্মী ভিক্ষা করেন। তাহাতে দেবী আজ্ঞা করেন যে যুদ্ধকালে সাতদিন শুদ্ধরূপে চণ্ডীপাঠ করিতে পারিলে কর্ণাট-জয় সহজসাধ্য হইবে। পরে সুরথ তাঁহার আজ্ঞানুমত কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়া কর্ণাট জয় করেন।

এক্ষণে আমরা এই আখ্যায়িকা হইতে দুইটি নাম প্রাপ্ত হই; একটি সুপুর, অপরটি বলিপুর। জনশ্রুতি এই যে বর্ত্তমান সুপুরই প্রাচীন স্বপুরের পরিবর্ত্তিত নাম এবং সুপুরের নিকটবর্ত্তী বোলপুর পুরাতন বলি-পুরের অপভ্রংশ। এই দুই স্থানের সান্নিধ্য নিবন্ধন আখ্যায়িকার সামঞ্জস্যে কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। এতদ্ব্যতীত সুপুর গ্রামের উত্তরে চারিক্রোশ দূরে ডুমরা নামে শালতরু সমাচ্ছন্ন যে একটি সুবৃহৎ অরণ্যানি দৃষ্ট হয়, কথিত হয় যে এই অরণ্যানি মধ্যে পূর্ব্বকথিত মেধস্ মুনির আশ্রম ছিল। তথায় বাঘড়াই চণ্ডী নামে চণ্ডিকাদেবীর

* 'ততঃ স্বপুরমায়াতো নিজদেশাধিপো ভবেৎ'—ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

একটি মূর্ত্তি অদ্যাবধি বিরাজিতা আছেন। প্রবাদ এই যে এই দেবী উক্ত মুনি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিতা হন। ডুমরাবনের অদূরে একটি শীর্ণকলেবরা সরিৎ প্রবাহিত হয়। জল-স্রোতে উক্ত সরিতের তটভূমি ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে আজ কয়েক বৎসর হইল একটা বৃহৎ তাম্রাধার বহির্গত হইয়াছে, তাহা দেখিতে প্রায় আধুনিক ডেকের মত। এ স্থলে আমাদের ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে বর্ত্তমানকালে, চট্টগ্রামের অন্তর্গত সারোয়াতলী গ্রামের সন্নিহিত পর্ব্বতের সানুদেশস্থিত স্থান বিশেষ মেধস্ মুনির আশ্রম বলিয়া ঘোষিত হইতেছে এবং তথায় মন্দিরাদি নির্ম্মাণ জন্য অর্থেরও সংগ্রহ হইতেছে। *

এই ত গেল এক পক্ষের মত। অপর পক্ষ বলেন যে মুপুররাজ সুরথ কলিঙ্গাধিপতি মহারাজ সুরথ নহেন। ইনি স্বনামখ্যাত সম্বৎ-প্রবর্ত্তক, উজ্জয়িনী-পতি বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরথাদিত্য। এই সুরথাদিত্যও কলিঙ্গাধিপতি মহারাজ সুরথের ন্যায় লক্ষ বলি প্রদান করতঃ চণ্ডিকাদেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় যে বিক্রমাদিত্য নামে যে কোন আখ্যানে লোকে সম্বৎ-প্রবর্ত্তক শকারি বিক্রমাদিত্যকে নির্দ্দেশ করিতে ভালবাসে, সম্ভব অসম্ভব বিচার করিয়া দেখে না। এস্থলেও এইরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা ও বিশ্বাস। কেন তাহা বলিতেছি। বিক্রমাদিত্য নামে বহু-সংখ্যক নৃপতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করতঃ রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। আমরা মুকুন্দ রামের কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতে অবগত হই যে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মঙ্গলকোটের নিকটবর্ত্তী ও অজয়-নদের উপকূলস্থ উজ্জয়িনী বা উজানী নামক স্থানে বিক্রমাদিত্য নামে একজন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। যদিও কোন গ্রন্থে সুরথাদিত্য নামে তাহার কোন ভ্রাতুষ্পুত্র থাকার বিষয় লিখিত নাই, অথবা আমরা এরূপ কোন গ্রন্থ দেখি নাই, তথাপি উজানী ও মুপুর এই দুই স্থানের নৈকট্য নিবন্ধন, উক্ত সুরথাদিত্য যে এই বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতুষ্পুত্র এই মত অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয়। কোন যুক্তির বলে আমরা শত শত ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী-নগরাধিপতি লোকবিশ্রুত বিক্রমাদিত্যকে এই সুরথাদিত্যের খুল্লতাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইব? এতদ্ব্যতীত যেমন কবিকঙ্কণের বিক্রমাদিত্যের সুরথাদিত্য নামে ভ্রাতুষ্পুত্র থাকার বিষয় কোন গ্রন্থে দেখা যায় না, তদ্রূপ বত্রিশ সিংহাসনের বিক্রমাদিত্যের সুরথ নামে যে কোন ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল তাহাও আমরা কোন পুস্তক হইতে অবগত হই না।

মুপুর-রাজকে লইয়া প্রবাদের মধ্যে মতভেদ দেখা গেল। এই স্থানেই মতভেদের শেষ হয় নাই, এখনও তৃতীয় পক্ষ বর্ত্তমান। মুপুর-নিবাসী গুরুলাল গুপ্ত লিখিয়াছেন †

*........."তীর্থস্থান লইয়া এরূপ বৈষম্য অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ আমাদের প্রাচীনকালের ইতিহাসের অভাব। সেই জন্য বলিতে পারি না যে ডুমরাবনই মেধস্ মুনির আশ্রম, না নবাবিষ্কৃত সারোয়া-তলী গ্রামের সন্নিহিত স্থানটি মেধস্ আশ্রমতীর্থ। তবে ডুমরাবন যে কোন তাপসের আশ্রম ছিল। তাহাতে সন্দেহ নাই।"—সুলভ সমাচার ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১১।

† Vide Rural Speeches by Gurulal Gupta, P. 70.

যে সুপুরে সুরথ নামে একজন পরাক্রান্ত হিন্দু জমীদার বাস করিতেন। যৌবনে তিনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ, উচ্ছৃঙ্খল ও পশু-স্বভাব ছিলেন। কিন্তু কোন দেবীর কৃপায় তাঁহার এরূপ কদর্য্যস্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। শুনা যায় যে তিনি একদিন রজনীকালে স্বপ্নযোগে নরকের ভীষণ বিভৎস দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন যে তিনি যে সকল নরনারী হত্যা করিয়া পাপরাশি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাদের প্রেতাত্মাসমূহ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইয়াছে, তখন সুরথ ভয়াকুলচিত্তে শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাগলের ন্যায় ইতস্ততঃ পলায়নপর হইলেন। তথাপি দেখিলেন যে সেই ভীষণ প্রেতমূর্ত্তি সকল প্রতিহিংসা সাধন জন্য তীব্র কটাক্ষে তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তখন অনন্যোপায় হইয়া সুপুরাধিপতি ধরণীপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন এবং অনুতাপে আত্মহারা হইয়া নারায়ণী স্মরণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দেবীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইলে তিনি অম্বিকার কৃপায় সর্ব্বপাপমুক্ত হইলেন। তৎপরে উক্ত লেখক মহাশয় সুরথের চণ্ডীপূজা ও বলি-প্রদানাদি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পুরাণ-বর্ণিত ঘটনার অনুরূপ।

উপরোক্ত আখ্যায়িকা-ত্রয় মধ্যে গল্পাংশে কোন পার্থক্য না থাকিলেও সুপুর বা সুপুর-পতিকে লইয়াই যত মতভেদ। নামে প্রভেদ নাই, পরিচয়েই প্রভেদ দৃষ্ট হ । এরূপ মতভেদ বর্ত্তমান থাকিলেও এতটুকু স্বীকার করিতে হইবে যে কোন সময়ে সুপুর একটি বহুজনাকীর্ণ, সমৃদ্ধিশালী, দুর্গশোভিত এবং প্রাকার-বেষ্টিত নগর ছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই প্রাকারের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। গ্রামের পূর্ব্বোত্তর কোণে রায়ান নামক পুষ্করিণীর দক্ষিণ তীরে সুপুর-রাজের বাটীর ভগ্নাবশেষও এ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। * এই স্থানে কেহ কেহ অর্থ ও বহুমূল্য দ্রব্য পাইয়াছেন। গ্রামের বাহিরে উত্তর-পশ্চিমাংশে তৎপ্রতিষ্ঠিত 'সুরথেশ্বর' নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। কথিত হয় কালাপাহাড় উহা ভগ্ন করিয়া দেয়। শুনা যায় যে এই মন্দির সুপুরের মথুর হাজরা ও উক্ত গ্রামের নিকটবর্ত্তী মীর্জাপুর নিবাসী মাণিক দাস বৈষ্ণব কর্ত্তৃক অনুমান ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে।

গ্রামের পশ্চিমাংশে দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। সেখানে মহানবমীর দিন বহুবিধ বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে। গ্রামের উত্তর ও পশ্চিমে 'গড়ের বাগান' নামক দুইটী উদ্যান বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে ঐ সকল স্থানে গড় ছিল এবং উহা সুপুরপতি সুরথ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত এই গ্রামে একটি 'যক' নামক প্রাচীন সরোবর দেখিতে পাওয়া যায়। এই

* A few years ago a number of diggers while excavating a tank near the supposed site of the palace of Surat Raja, unearthed flight of steps, greatly delapidated and injured by time. Specimens of small hard bricks, pieces of cornice, fragments of commemorating pillars may be found in every place attesting the fact that there lived in this village a wealthy chief etc., P. 70, Rural Speeches by Gurulal Gupta.

সরোবর সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। আমরা সে বিষয়ের সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার না করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া ক্ষান্ত হইব মাত্র।

ঈশ্বর রায় এবং ভগবান রায় নামক দুইজন বহুদর্শী চিকিৎসক কোন সময়ে এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। উক্ত ভগবান রায়ের ৬ষ্ঠ পুরুষ নানারূপ অত্যাচার করিয়া প্রভূত ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় মৃত্যুকালে তিনি আপন ধনরাশি যকের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া যান। * নির্জ্জন প্রান্তরে অবস্থিত সেই সরোবরের মসীকৃষ্ণ অম্বুরাশি সাধারণের ভীতি উৎপাদন করিয়া থাকে। প্রাচীন ব্যক্তিগণও এই ভূতরাজ সম্বন্ধে নানারূপ বিস্ময়জনক ও আতঙ্কোৎপাদক গল্পের উল্লেখ করিয়া থাকেন।

সুপুর সম্বন্ধে উল্লিখিত রূপ বৃত্তান্ত ব্যতীত ইহার ধারাবাহিক ইতিহাস জ্ঞাত হইবার কোন উপায় নাই। রাইপুর স্বপুরান্তর্গত পল্লীবিশেষ। আমরা এই স্থানের বর্ত্তমান ইতিহাস সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

এই স্থানে উত্তররাঢ়ীয় বাৎস্যগোত্রজ সিংহ-পরিবার মধ্যে কায়স্থ-কুলধ্বজ স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বর্ত্তমান কালে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ২৪শে মার্চ্চ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। বহুকাল পূর্ব্বে সত্যপ্রসন্নের আদিপুরুষ মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দি গ্রামের আদিম নিবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা নামক গ্রামে বসতি স্থানান্তরিত করেন। সেই স্থানে সিংহ পরিবার-প্রতিষ্ঠিত সিংহদিঘী নামক এক সুবৃহৎ সরসী ও বাসগৃহের ভগ্নাবশেষ এখনও পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কখন এই চন্দ্রকোণা গ্রামে আগমন করিয়া তথায় কতদিন বাস করিয়াছিলেন, তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইবার উপায় নাই।

বীরভূমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অভ্যুদয় কালে পরবর্ত্তী পুরুষ লালচাঁদ সিংহ, ব্যবসায়ানুরোধে চন্দ্রকোণার বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, রাইপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার সঙ্গে প্রায় সহস্রাধিক তন্তুবায়ও আগমন করিয়াছিল। এই তন্তুবায়গণ যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত করিত তাহা তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সুরুলস্থ কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট মিঃ চিপের † নিকট বিক্রয় করিতেন। এই সুরুল গ্রাম রাইপুরের সন্নিকটে অবস্থিত।

লালচাঁদের পুত্র শ্যামকিশোর, এই ব্যবসার দ্বারা আপন অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধন করতঃ নগর-রাজের নিকট হইতে

---

* শুনিতে পাওয়া যায় যে প্রাচীনকালে অর্থশালী ব্যক্তির উত্তরাধিকারী না থাকিলে তিনি মৃত্তিকার নিম্নে একটি প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে তাঁহার অর্জ্জিত অর্থ রাখিতেন। পরে একটি অনাথ বালক ক্রয় করিয়া সেই প্রকোষ্ঠে তাঁহাকে আবদ্ধ করতঃ বহির্গমনের সমস্ত পথ রুদ্ধ করিয়া দিতেন। ক্রমে বালক অবসন্ন হইয়া অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ইহার নাম যক বা যক্ষ দেওয়া। এই শব্দ যক্ষ শব্দের অপভ্রংশ।

† ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে John Cheap নামক বঙ্গীয় Civil Service ভুক্ত একজন সাহেব বোলপুরের দুই মাইল পশ্চিমে সুরুল নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত কুঠীতে সর্ব্বপ্রথম Commercial Resident হইয়া আইসেন।

সেনভূম পরগণার জমিদারী-স্বত্ব ক্রয় করেন। তিনি যে এক উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করান বর্ত্তমানে সিংহ-পরিবার তাহাতেই বাস করেন।

শ্যামকিশোরের তিন পুত্র—জগমোহন, ভুবনমোহন ও মনোমোহন। জগমোহনের বিদ্যাবুদ্ধি অতীব প্রখর ছিল। তিনি স্বয়ং নিজ জমিদারী তত্ত্বাবধান করিয়া তাহার অধিকতর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

ভুবনমোহনের ছয় পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ প্রতাপনারায়ণ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অভিষিক্ত হইয়া অতি সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করেন। কনিষ্ঠ রায় চন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুরও উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে কলিকাতার ষ্ট্যাম্প কালেক্টার ও একসাইজ কালেক্টার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

প্রতাপনারায়ণের সুযোগ্য পুত্র হেমেন্দ্র-নাথ সিংহ বি, এ মহাশয় সাহিত্য-সমাজে বিশেষ পরিচিত।

মনোমোহনের তিন পুত্র—নীলকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ ও সীতিকণ্ঠ। নীলকণ্ঠের পুত্র রুদ্রপ্রসন্ন, গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত-বিভাগে কার্য্য করিতেন। ইঁহার পুত্র রজনীকান্ত কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ছিলেন।

শ্রীকণ্ঠের পুত্র সন্তান ছিল না। সীতিকণ্ঠের চারিপুত্র—রমাপ্রসন্ন, নরেন্দ্রপ্রসন্ন, দেবেন্দ্রপ্রসন্ন ও সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন। রমাপ্রসন্ন সিউড়ী কোর্টে গবর্ণমেণ্টের উকীল ছিলেন এবং হেতমপুর রাজষ্টেটের যাবতীয় মোকদ্দমা-কার্য্যের ভার তাঁহার উপর অর্পিত ছিল। তিনি দানশীল, সরলহৃদয় ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। চারুচন্দ্র, প্রফুল্ল, শরচ্চন্দ্র ও অনুকূল নামে তাঁহার চারি পুত্র।

চারুচন্দ্র সম্প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর লীগাল এড্‌ভাইজার পদে অধি-ষ্ঠিত আছেন। প্রফুল্লচন্দ্র হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। অপর দুইটী পুত্র গৃহেই অবস্থিতি করেন।

নরেন্দ্রপ্রসন্ন এম্‌, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকেল কলেজে ইংরাজী চিকিৎসা-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করতঃ এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন উপাধি প্রাপ্ত হয়েন এবং স্বগ্রামে কিছুদিন চিকিৎসা করেন উক্ত চিকিৎসা-শাস্ত্রে অধিক-তর পারদর্শী হইবার নিমিত্ত ভ্রাতা সত্যেন্দ্র-প্রসন্নের সহিত বিলাত যাত্রা করেন। তথায় এল্‌ এম্‌ এস্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারত-গবর্ণমেণ্টের অধীনে সিভিল সার্জ্জন নিযুক্ত হয়েন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রপ্রসন্ন কোন কারণ বশতঃ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমান মহিম কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন কালে ১৯ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে মারা যান।

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বীরভূম জেলা স্কুলে বাবু শিবচন্দ্র সোম হেড্‌ মাষ্টারের সময় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মহাতা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মিত্রের কন্যা শ্রীমতী গোবিন্দমোহিনী দাসীর পাণি-গ্রহণ করেন, এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বিলাত গমন করতঃ বারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কলিকাতা হাই-কোর্টে উক্ত কার্য্যে ব্রতী হয়েন। তিনি এই কার্য্যে এতদূর প্রশংসাভাজন হইয়া উঠেন যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহাকে অস্থায়ীভাবে

এডভোকেট জেনারল নিযুক্ত করেন এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি উক্ত পদে স্থায়ী হন। তদনন্তর ভারত-সম্রাট তাঁহাকে ল মেম্বারের সম্মানিত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ভারতবাসীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে এই পদ লাভ করেন। কিন্তু এই পদ গ্রহণ করার জন্য তাঁহার বিশেষ আর্থিক ক্ষতি হওয়ায় তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি এক্ষণে পুনরায় ব্যারিষ্টারী-কার্য্যে ব্রতী হইয়া হাইকোর্টের ব্যারিষ্টারগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ-স্থান অধিকার করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে বীরভূমের পূর্ব্বগৌরব বিস্মৃতির অন্ধকারময় গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের গুণবত্তার জন্য অনেক দিনের পর পুনরায় বীরভূমের মুখোজ্জ্বল হইয়াছে।

কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী,
হেতমপুর।

"বৈষ্ণব সাহিত্যে" সৈয়দ মর্ত্তুজা

(প্রতিবাদ)

বিগত ১৩১৪ সালের কার্ত্তিক মাসে কাশিমবাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয় "বৈষ্ণব সাহিত্য"-নামধেয় এক সুদীর্ঘ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। * উক্ত প্রবন্ধের "মুসলমান বৈষ্ণবকবি"-শীর্ষক অংশে সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান বৈষ্ণবকবি সৈয়দ মর্ত্তুজা সম্বন্ধে যে কথাগুলি উক্ত হইয়াছে সত্যের অনুরোধে আমাকে তৎসম্পর্কে এখানে কয়েকটি কথা বলিতে হইতেছে। কথাগুলি বঙ্গীয় সাহিত্যজগতের গোচরীভূত না করিলে একদিকে সত্যের অপলাপ করা হয় এবং অন্যদিকে সাধারণের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল থাকিয়া যায়। আমার বক্তব্য বিশদ করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রে উক্ত প্রবন্ধ-লেখকের কথাগুলি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি লিখিয়াছেন :—

"সুবিখ্যাত 'পদকল্পতরু'-গ্রন্থে সৈয়দ মর্ত্তুজার কতিপয় গান দৃষ্ট হয়। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর-সন্নিহিত বালিয়াঘাটায় সৈয়দ মর্ত্তুজার জন্ম হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বেরেলী জেলায় (তাঁহার) পূর্ব্বপুরুষের বাস ছিল। জনশ্রুতি যে ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। জঙ্গীপুরের নিকট চড়কা নামক স্থানে রাজাক সাহেবের শিষ্য হইয়া তত্রত্য সুতীর নিকট ছাপঘাটিতে (তিনি) এক আস্তানা করেন। অদ্যাপি তথায় তাঁহার সমাধি আছে। ব্রজসুন্দর বাবু শ্রীহট্ট হইতে মর্ত্তুজার অনেক পদ প্রাপ্ত হইয়া সেই পদ-কর্ত্তাকে এই মর্ত্তুজা বলিতে সংশয়াপন্ন

* ১৩১৪ সালে কাশিমবাজার হইতে প্রকাশিত "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সম্পূর্ণ কার্য্যবিবরণী"তে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

হইয়াছেন। ‘পদকল্পতরু’র সংগ্রাহক বৈষ্ণবদাস মুর্শিদাবাদের লোক। তিনি যে মর্ত্তুজার পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তিনি এই জঙ্গীপুরজাত বলিয়াই বিশ্বাস হয়। কারণ উভয়ের বাস এক জেলায়। শ্রীহট্টের মর্ত্তুজা যে ইনি নহেন, তাহাও বলা যায় না। ফকির লোকের নানাদেশে বিশেষতঃ মুসলমান-প্রধান শ্রীহট্টে গমন অসম্ভব নহে। হয় ত শ্রীহট্টে রচিত পদাবলী বৈষ্ণবদাসের অগোচর ছিল।”

পাঠকগণ দেখিতেছেন, প্রবন্ধ-লেখক উদ্ধৃত অংশে বালিয়াঘাটার সৈয়দ মর্ত্তুজাকে এবং শ্রীহট্টে যাঁহার পদাবলী আবিষ্কৃত বলিয়া কথিত, সেই সৈয়দ মর্ত্তুজাকে অভিন্ন ব্যক্তি রূপেই সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। দুই মর্ত্তুজা অভিন্ন বা ভিন্ন ব্যক্তি হউন, তজ্জন্য কাহারো মাথা ব্যথা হওয়ার কথা নহে। কিন্তু লেখক মহাশয় শুধু নাম-সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াই অদ্যাপি অমীমাংসিত একটা ঐতিহ্য কথার এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে গেলেন, ইহাই আপত্তির বিষয়। শুধু অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া তিনি যদি প্রমাণ-বলে অ-পন সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীভূত করিতে পারিতেন, তবে তাঁহার কথাগুলি সাহিত্যরাজ্যে উচ্চ মূল্যে বিকাইত, সন্দেহ নাই। ইহা দিবালোকবৎ সুস্পষ্ট যে, উপস্থিত ক্ষেত্রে, তিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ অনুমান ভিন্ন কোন প্রমাণ-প্রয়োগে সক্ষম হন নাই। সুতরাং এরূপ অবস্থায় তাঁহার মীমাংসা নিঃসন্দেহরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত কি না, তাহা সুধীগণেরই বিবেচ্য।

আরো একটা কথা আছে। ইহাকে লেখকের ভ্রম বলিব, না অন্য কিছু বলিব, বুঝিতে পারি না। “ব্রজসুন্দর বাবু শ্রীহট্ট হইতে মর্ত্তুজার অনেক পদ প্রাপ্ত হইয়া সেই পদ-কর্ত্তাকে এই মর্ত্তুজা বলিতে সংশয়াপন্ন হইয়াছেন”—তাঁহার এই উক্তি করিবার উদ্দেশ্য আমরা আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। ব্রজসুন্দর বাবুর গ্রন্থখানি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, তাহাতে তাঁহার (ব্রজসুন্দর বাবুর) “শ্রীহট্ট হইতে পদপ্রাপ্তির” কোন উল্লেখই ত দেখিতেছি না। * লেখক মহাশয় কোথা হইতে এবং কি কারণে এরূপ একটা অনুতবাদ সংগ্রহ ও সাধারণ্যে প্রচার করিলেন, তাহা জানিবার জন্য মনে স্বতঃই একটা ঔৎসুক্য জন্মিতেছে। প্রবন্ধকারের এই উক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নে আমি মুসলমান বৈষ্ণবকবিদিগের বঙ্গীয়-সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠালাভের বৃত্তান্তটুকু পাঠকগণের গোচরীভূত করিতেছি।

সকলেই জানেন যে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক পদাবলী-রচয়িতা মুসলমান কবিবৃন্দই সাহিত্যিকগণের নিকট “মুসলমান বৈষ্ণবকবি” নামে পরিচিত হইয়াছেন। নদীয়া-মেহেরপুরের জমিদার অধুনা পরলোকগত বাবু রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম মুসলমান কবিগণের পদাবলী সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন। তাঁহার গ্রন্থে নয় জন কবির পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহাতে সৈয়দ মর্ত্তুজার ৪টি মাত্র পদ প্রকাশিত হয়।

---

* ব্রজসুন্দর বাবুর সম্পাদিত “মুসলমান বৈষ্ণব-কবি—সৈয়দ মর্ত্তুজা” দ্রষ্টব্য।

স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" ১১ জন মুসলমান বৈষ্ণবকবির নামোল্লেখ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার এতদ্বিষয়ক উপকরণরাশি প্রধানতঃ প্রাগুক্ত রমণী বাবুর গ্রন্থ ও মল্লিখিত প্রবন্ধরাজি হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

এই ক্ষুদ্রশক্তি সাহিত্য-সেবকের গবেষণা ও চেষ্টাবলে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৪০ জন মুসলমান বৈষ্ণবকবি আবিষ্কৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের সকলের অল্পবিস্তর বিবরণ ও পদাবলী ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশ করা গিয়াছে। রমণীবাবু ও আমার চেষ্টায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-জগৎ এখন অন্যূন ৪৫ জনেরও অধিক মুসলমান বৈষ্ণবকবির আবির্ভাব-সংবাদ জানিতে পারিয়াছেন।

রমণী বাবু সৈয়দ মর্ত্তুজার রচিত ৪টি মাত্র পদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। সে কথা আগেই বলিয়াছি। মৎ-কর্ত্তৃক সৈয়দ মর্ত্তুজার ১৯টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। রমণী বাবুর প্রকাশিত পদগুলি "পদ-কল্পতরু" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। এই সকল পদের মধ্যে একটিও আমি চট্টগ্রামে পাই নাই। কিন্তু আমার সংগৃহীত পদগুলি সমস্তই চট্টগ্রাম জেলাতে পাওয়া গিয়াছে।

বলিয়া রাখা আবশ্যক, রমণী বাবুর প্রকাশিত পদগুলির মধ্যে যেমন একটিও চট্টগ্রামে পাওয়া যায় নাই, আমার আবিষ্কৃত পদগুলির মধ্যেও তেমন একটিও চট্টগ্রাম ভিন্ন অন্য কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া অদ্যাপি শ্রুতিগোচর হয় নাই। সুতরাং প্রমাণান্তর অভাবে ইহা যে রমণী বাবুর ও আমার আবিষ্কৃত সৈয়দ মর্ত্তুজার অভিন্নতা-কল্পনার সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহা সহজেই অনুমেয়।

রাজসাহীর সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল সরস্বতী মহাশয় আমার সংগৃহীত মুসলমান বৈষ্ণবকবিগণের পদাবলী আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া সেগুলি "মুসলমান বৈষ্ণবকবি" নামে পৃথক পৃথক খণ্ডে প্রকাশিত করেন। তিনি যে আমার নিকট হইতে শুধু পদাবলীই চাহিয়া লইয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকগুলির ভূমিকাদিও আমিই লিখিয়া দিয়াছিলাম। বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের (যিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রকাশিত প্রবন্ধরাজি হইতে অনেক উপকরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" এই অকিঞ্চনের নামটা পর্য্যন্ত একটু উল্লেখ করার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই) অনুসৃত পন্থাবলম্বন না করিয়া সরস্বতী মহাশয় তদীয় গ্রন্থরাজিতে অকুণ্ঠিতচিত্তে আমার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করত আপনার মহানুভবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।• এরূপ অবস্থায় স্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকা সত্ত্বেও সমালোচ্য প্রবন্ধ লেখক মহাশয় কোন্ ভিত্তি অবলম্বন করিয়া সৈয়দ মর্ত্তুজার অনেক পদ "শ্রীহট্টে" প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া একটা কল্পিত কথার প্রচার করিতে সাহসী হইলেন, সে বিষয়ে তিনি সাধারণের নিকট কৈফিয়ত দিতে ন্যায়তঃ বাধ্য।

প্রাগুক্তরূপ মর্ত্তুজা-নামধেয় কবিদ্বয় অভিন্ন বলিয়া প্রমাণিত হউন, তাহাতে কোন

ক্ষোভের বা আপত্তির কথা কিছুই নাই। কিন্তু যতদিন তাঁহাদের অভিন্নতা অবিসংবাদিতরূপে সপ্রমাণ না হয়, ততদিন আমরা একজনকে মুর্শিদাবাদবাসী এবং আর একজনকে চট্টগ্রামবাসী না বলিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহাদিগকে বিভিন্ন ব্যক্তি বলিবার বিপক্ষে যদি উপযুক্ত প্রমাণাভাব ঘটে, তবে এক জনকে যে চট্টগ্রামবাসী বলিতেই হইবে, তাহাতে আর কথা কি? আগেই বলিয়াছি, সৈয়দ মর্ত্তুজার যে সকল পদ চট্টগ্রামে পাওয়া গিয়াছে, অদ্যাপি তাহার একটিও অন্য কোথাও পাওয়া যায় নাই। মুর্শিদাবাদবাসী একজন কবির কীর্ত্তি এতদূরবর্ত্তী চট্টগ্রামে প্রচারিত হইল, অথচ তাঁহার জন্মস্থান-সান্নিধ্যে হইল না, ইহা কি কিছু বিচিত্র কথা নয়! সৈয়দ মর্ত্তুজাকে লইয়া যদি কিছু গৌরব করিবার থাকে, তবে তাহা কেবল মুর্শিদাবাদ এবং চট্টগ্রামই করিতে পারে, শ্রীহট্টের তাহাতে কোনই দাবি থাকিতে পারে না।

আবদুল করিম।

মফঃস্বলের বাণী

১। পল্লীসেবার অন্তরায়।

পল্লীসেবার পথে একটি প্রতিবন্ধক বর্ত্তমান সময়ে উপস্থিত হইয়াছে, যাহার অস্তিত্ব এমন কি সম্ভবনীয়তা পর্য্যন্ত পূর্ব্বে কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। সেটি দেশময় অশান্তি এবং সেই অশান্তি হেতু দেশবাসীর প্রতি, বিশেষতঃ দেশহিতে রত, উদ্যমশীল ও আত্মত্যাগী ব্যক্তিগণের প্রতি রাজকীয় কর্ত্তৃপক্ষের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ও তদনুরূপ কার্য্যাবলী। কতিপয় বৎসর ধরিয়া দেশে উত্তরোত্তর যে সকল দুর্ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের অন্তরে হয় তো এরূপ সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে যে দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই বর্ত্তমান রাজশক্তির প্রতি বিরাগভাবাপন্ন। এরূপ ধারণা যে নিতান্ত অমূলক, দেশের যথার্থ বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান রাজশক্তির অমঙ্গল কামনা মনে পোষণ করা দূরে থাকুক, ইহার স্থায়িত্ব এবং ইহার কার্য্য-প্রণালীর কালোপযোগী বিবর্ত্তন এবং উৎকর্ষ সাধনকেই যে দেশের বর্ত্তমান ও ভাবী উন্নতির একমাত্র উপায়রূপে গণ্য করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। মুষ্টিমেয় বিপথগামী ব্যক্তির কার্য্যফলে যে আমাদের রাজপুরুষগণ দেশের মঙ্গলপ্রার্থী উৎসাহসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রকেই সন্দেহের চক্ষে দেখিবেন এবং তাহার ফলে দেশের যথার্থ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠাননিচয় ব্যাহত এবং সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে, তাহা অবশ্যই গভীর আক্ষেপের বিষয় কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হইলেও এক্ষেত্রে আমরা দোষী করিব কাহাকে? আমরা জানি, কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে দেশের উন্নতিকামী উদ্যমশীল ব্যক্তিগণ দেশবাসীর নিকট যেরূপ, রাজ পুরুষগণের নিকট ততোধিক সমাদর ও সম্মান লাভ করিতেন। দেশের উন্নতিকর সকল কার্য্যে রাজপুরুষগণ তাঁহাদের সহায়তা ও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

তাঁহারাও রাজপুরুষগণের নিকট এইরূপ উৎসাহ লাভ করিয়া সমগ্র হৃদয়-মনের সহিত দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিতেন। আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ এখন সে ভাবের ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, এখন আর দেশসেবার পথ পূর্ব্ববৎ কুসুমসমাকীর্ণ নহে। এখন পদে পদে বাধা, বিঘ্ন এবং বিড়ম্বনা ঘটিবার সম্ভাবনা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কর্ত্তব্যপথ পূর্ব্বাপেক্ষা জটিল ও দুর্গম হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া, আমরা কি দেশের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যপালনে বিরত থাকিব? "সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়"। এই মহাবাক্যটি আবার হৃদয়কন্দরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। সাধু ইচ্ছা মানুষকে দুর্জ্জয় সাহসে সাহসী করে। সেই সাহস অবলম্বন করিয়া আমরা চলিব। মন্দবুদ্ধি যাহার অন্তরে, ভীরু তাহার প্রকৃতি। সে একপদ অগ্রসর হয়, আর এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখে, কেহ কিছু দেখিতেছে কিম্বা বলিতেছে কি না। কিন্তু নির্ম্মলচিত্ত, সাধু ব্যক্তি অবিচলিতভাবে আপনার গন্তব্যপথে চলিয়া যান। যথার্থ পল্লীহিত-সাধনে যাহাদের দেহ-মন উৎসর্গীকৃত, কোন প্রকার পার্থিব ভয়-ভাবনা তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না, ইহা সুনিশ্চিত। তবে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় শুধু নিজে অন্তরে সাধুভাব পোষণ করাই যথেষ্ট নহে; সরলচিত্ত, সাধু ব্যক্তিকেও এমন ভাবে তাঁহার জীবন এবং কার্য্য নিয়মিত করিতে হইবে, যাহাতে তদ্বিষয়ে কাহারও অন্তরে কোন প্রকার সংশয় বা সন্দেহ উপস্থিত হইতে না পারে। পল্লী-সেবায় যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যাবলী, তাঁহাদের উদ্দেশ্য এবং তাহার সাধন-প্রণালী, সম্পাদিত কার্য্য এবং তাহার ফলাফল সতত সর্ব্বসাধারণের নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত করিবেন। শুধু তাহাই নহে, রাজকীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকটও তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং কার্য্যপ্রণালী প্রভৃতি যথাযথরূপে প্রকটিত হওয়া আবশ্যক। যদি তাঁহারা সমবেত কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ পল্লীভূমে কোনরূপ সমিতি বা মণ্ডলী সংস্থাপিত করেন, তবে তাঁহাদের নেতৃস্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে উর্দ্ধতন রাজপুরুষগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে আপনাদের উদ্দেশ্য এবং কার্য্যপ্রণালী সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দিবেন।

জ্যোতিঃ।

২। আসামের বনবিভাগ

ইদানী আসামপ্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধারণ স্বার্থের বিবিধ বিষয়ে আলোচনা ও সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এমন কি পুলিশ-বিভাগ পর্য্যন্ত যে বিভাগের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বসিয়াছে, সেই শোচনীয় অবস্থাপন্ন বনবিভাগের কোন কথাই ব্যবস্থাপক সভায় কেন যে আলোচিত হইতেছে না তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ঐ বিভাগের নিম্নকর্ম্মচারিগণের বিবেচনার দোষে স্বত্বদখলীস্থান হইতে বন-জাত-দ্রব্য আনিয়া গরীব গৃহস্থগণের ঘর করিয়া থাকা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ বিনা অভিযোগে কি বিনা সংবাদে পুলিশ-কর্ম্মচারীর পর্য্যন্ত কোন অপরাধীকে ধৃত করিবার বিধান নাই। কিন্তু Assam

Forest Regulationএর অষ্টম অধ্যায়ের ৬৩ ধারার বিধান নিরীহ কৃষিজীবিসম্প্রদায়ের চিরন্তন স্বত্ব-পরিচালনে বিষম বাধা প্রদান করিতেছে। এই ৬৩ ধারার বিধানকে বন-বিভাগের নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণ এক অব্যর্থ অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেছে। অস্থাবর সম্পত্তি কোন ব্যক্তির অধিকারে পাওয়া গেলে উপযুক্ত প্রমাণের দ্বারা ঐ সম্পত্তিতে অন্যের স্বত্ব সাব্যস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা দখল-কারের স্বত্ব বলিয়া অনুমান করিবার বিধি-প্রমাণ আইনে আছে, কিন্তু আরণ্যবিধির ৬৩ ধারা এই অনুমানকে উল্টাইয়া দিয়া দখল-কারের স্কন্ধে স্বত্ব প্রমাণের সকল ভার চাপাইয়া দেওয়ায় হতভাগ্য নিরক্ষর কৃষিজীবি-সম্প্রদায় অতীব বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। নিজের স্বত্বভূমি হইতে ছন বাঁশ আনিয়াও বনকর্ম্মচারিগণের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় নাই। পথে ঘাটে বাজারে ছনবাঁশবাহী সাধারণ লোক বনকর্ম্মচারীকর্ত্তৃক ধৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। দুঃখের বিষয় আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এ সকল অত্যাচারের প্রতীকার পাওয়া সহজ নহে। যে উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট Indian Forest Codeএ Forest policy বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, বন-কর্ম্মচারিগণের অন্যায় কার্য্যমূলে সম্পূর্ণরূপে সে উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইতেছে।

ইংরেজ-সিভিলিয়ান হইতে পুলিশের কনে্ষ্টবল পর্য্যন্ত সকলেরই কার্য্যকাল ও নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পরি-বর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বনবিভাগে এই বিধি প্রচলিত নাই কেন? বনবিভাগের কর্ম্মচারিগণ নিজ ইচ্ছানুসারে দীর্ঘকাল এক-স্থানে রাজত্ব করিয়া যাইতেছেন, তথাপি এ সকল বিষয়ের কোন আলোচনা না হওয়ার কারণ কি?

প্রচীন কালের সস্তা দরের ফরেষ্ট স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া, ২০৲ টাকা বেতনের Forester কি ৪০৲। ৫০৲ টাকা বেতনের Deputy Ranger কি Ranger পর্য্যন্ত আসামে E. A. C.র পদ লাভ করিয়া, কেহ কেহ জেলার বনবিভাগে আজীবন কাজ করিয়া গিয়াছেন। Conservator officeএ যাহা-দের আত্মীয়স্বজন আছেন, বিদায় লইলে কি জানি যদি তাহাদের রাজ্যচ্যুতি হয়, এই ভয়ে বিদায় পর্য্যন্ত না লইয়া তাঁহারা দীর্ঘকাল এক-স্থানে রাজত্ব করিতেছেন।

আমাদের মাননীয় শ্রীযুত চিফ্-কমিশনার সাহেব সেদিন Indian Civil Serviceএর সম্বন্ধে যে Note লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"Lastly, it is essential that if Indians are appointed to superior posts they should, generally speaking, be inhabitants of the province, because an Indian of another province, will be regarded by the inhabitants of the province, concerned, almost as much a foreigner as a European. * * * This defect has, however, in my opinion, been of less consequence than the defective method of recruiting Indians to the superior service."

শ্রীহট্টের বনবিভাগের প্রতি এই Note

বর্ণে বর্ণে খাটিতেছে। আসামের বনবিভাগের Conservator office ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী লোকের দ্বারা পরিপূর্ণ না হইলে আসামের এক মাত্র Superior officer তারাকিশোর বাবুর মত উপযুক্ত লোকের Extra Deputyর পদে থাকিয়া অবসরগ্রহণ করিবার কথা ছিল। তাহা হইলে Conservator সাহেবের তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কাহাকে ঐ পদে উন্নীত করিবার সুবিধা হইতে পারিত। আমরা Subordinate forest service হইতে E. A. C. কি District forest officerএর পদে কাহাকে Promotion দেওয়ার পক্ষপাতী নই। E. A. C.র separate courseএর প্রবর্ত্তনের উপক্রম দেখিয়াই কি ১৫।২০ বৎসর যাবৎ যে ব্যক্তি Rangerএর কাজ করিয়াছে, তাহার দাবী উপেক্ষা করিয়া ৫ বৎসর যাবৎ যে ব্যক্তি Rangerএর কাজ করিতেছে, তাহাকে তাড়াতাড়ি E. A. C.র পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। যাহাকে এত ব্যস্ততার সহিত অন্যের ন্যায়সঙ্গত দাবী উপেক্ষা করিয়া E. A. C. করা হইল, ইনি কে স্বতঃই এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে। এ কারণ তাহার একটু পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন। Conservator officeএর ভূতপূর্ব্ব একচ্ছত্রাধিপতি নদীয়াজেলাবাসী কার্ত্তিক বাবুর পুত্র প্রবোধ চাটার্জ্জিই এই নূতন E. A. C. বর্ত্তমান চিফ-কমিশনার সাহেবের শাসন সময়ে বনবিভাগে এইপ্রকার অরাজকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? বনবিভাগে E. A. C.র পদে বর্ত্তমানে একটিও আসাম প্রদেশের লোক নাই কেন? বনবিভাগের ছাত্রবৃত্তির যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে তাহাতে লেখা আছে—"All the Assam scholarships are intended for the bonafide natives of Assam. But application from others will also be considered."

এই নোটিশে বেশ একটু ফাঁক আছে, আমরা বলি আসামের ছাত্রগণকে প্রবেশাধিকার না দিবার জন্যই ইচ্ছা করিয়া কি "Aplications from others will also be considered" এর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

তারপর দুই সার্কেলের কনসারভেটার আফিসের কোন আফিসে সুরমা উপত্যকার একটি লোকও নাই, ইতিপূর্ব্বেও ছিল না। ইহার অর্থ কি?

ইদানীং আসাম উপত্যকায় শ্রীযুক্ত কমিশনার সাহেবের প্রবল চেষ্টায় জনকয়েক লোক ঐ বিভাগের নিম্ন গ্রেডে নিযুক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতে ঐ উপত্যকায় ২।১ জন মাত্র Typist ঐ বিভাগে কাজ করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আসাম প্রদেশের বনবিভাগের প্রধান প্রধান পদগুলি নদীয়া, হুগলী ও চব্বিশপরগণাবাসীর একচেটিয়া হইয়া রহিয়াছে কেন? অবস্থাদৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই প্রদেশের লোকের ঐ সমস্ত পদে কোন দাবী-দাওয়া নাই।

হুগলীনিবাসী যে একটি লোক ৫।৬ বৎসর যাবৎ ৬০—৮০ টাকা বেতনে Sub-protemtour clerkএর পদে নিযুক্ত ছিল, কিছুদিন হয় একজন প্রাচীন ও সুদক্ষ লোকের দাবী উপেক্ষা করিয়া এই নূতন যুবককে ১৫০৲—২০০৲ টাকা বেতনে Eastern circle-

এর Superintendentএর পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। Superintendentকে officerদের confidential case নিয়া সর্ব্বদাই নাড়া চাড়া করিতে হয়। এমতাবস্থায় অল্পবয়স্ক একজন বিদেশী junior লোককে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হইল কেন? পরিণতবয়স্ক কোন ব্যক্তিকে এই পদে নিযুক্ত করা হইলে কি জানি যদি অনতিবিলম্বে ঐ পদ শূন্য হইয়া পড়ে এবং আসামবাসী এই কেল্লার ভিতর প্রবেশ করিয়া বহুদিনের একচেটিয়া বন্দোবস্ত ভাঙ্গিয়া দেয়।

এই ভাবী অনিষ্টের পথ বন্ধ করিয়া রাখার অভিসন্ধি মূলেই, উপরোক্ত অভিনব নিয়োগের বন্দোবস্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। এ প্রদেশের উর্দ্ধপদস্থ সাহেবগণও এ সকল বিষয় তলাইয়া দেখিতে ইচ্ছুক বলিয়া বোধ হয় না।

মাননীয় আর্কডেল আর্ল সাহেবের সময়ে, আসাম প্রদেশে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রজাসাধারণ তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতি শ্রদ্ধাস্পদ রাজপ্রতিনিধির মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলেই তাহার একটা প্রতীকার হইতেছে। এ কারণ আমরা বিনীত ভাবে উপরোক্ত বিষয় সকলের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি কৃপা বিতরণে আমাদের নিম্নলিখিত প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া দিয়া এ দেশবাসীর ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেন।

১। এদেশবাসী সদ্‌বংশজাত উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে E. A. C.র trainingএর জন্য গ্রহণ করা হউক।

২। অন্যান্য বিভাগের ন্যায় Provincial Subordinate forest officerদের কার্য্যকাল ও পরিবর্ত্তনের নিয়ম প্রবর্ত্তন করা হউক।

৩। বনবিভাগের সমস্ত Executive and ministerial কর্ম্মচারীদের সংখ্যার অনুপাতে পশ্চিম বঙ্গের কতজন লোক ঐ বিভাগে কাজ করিতেছে তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হউক।

৪। Domiciled in Assam' বলিয়া ভিন্নদেশবাসী যে সকল ব্যক্তি সরকারী কাজে নিযুক্ত হইয়াছে ও হইতেছে তাহারা প্রকৃতপক্ষে domiciled পদবাচ্য কি না তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হউক।

৫। রাজস্বের অনুপাত অনুসারে conservator circleএ সুরমা উপত্যকার লোককে লওয়া হউক।

৬। Forest regulationএর উপরোক্ত বিধি যাহাতে বনকর্ম্মচারীর হাতে অত্যাচারের যন্ত্রস্বরূপ না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হউক।

৭। অধিবাসিগণ unclassed state forest হইতে ছন, বাঁশ, ইকড় জ্বালানীকাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্যাদি যাহাতে বিনা বাধায় পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হউক।

সুরমা।

৩। শ্রাদ্ধে সদনুষ্ঠান

যশোহর-কালিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র সেন, শ্রীযুত মহেন্দ্রচন্দ্র সেন এবং শ্রীযুত সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন প্রভৃতি মহাশয়গণ সম্ভ্রান্তবংশীয়,—প্রতিষ্ঠা প্রচুর। সম্প্রতি ইঁহারা

মহাসমারোহে ইঁহাদের পরলোকগত জননীর আদ্যশ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। দানসাগর শ্রাদ্ধ হইয়াছিল। শ্রাদ্ধে ইঁহারা অশ্ব, নৌকা, স্প্রিংএর পালঙ্ক, শ্বেত-প্রস্তরের তিনটি ষোড়শ, মজবুত এবং সুন্দর রৌপ্যের থালা প্রভৃতি দান করিয়াছিলেন। ভট্টপল্লী, চুঁচুড়া, নবদ্বীপ, খুলনা এবং যশোহরের খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ বিদায় পাইয়াছিলেন। পাঁচ হাজার লোক ফলার করিয়াছেন; ছয় শত ব্রাহ্মণ দুই টাকা করিয়া ভোজন-দক্ষিণা পাইয়াছেন। এই শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে শ্রীযুত নগেন্দ্র বাবু প্রভৃতি যশোহর জেলাবোর্ডের হাতে তিন শত টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে প্রতি বৎসর যশোহর জেলার যে কোন জলকষ্টযুক্ত স্থানে একটি কূপ কাটাইয়া দেওয়া হইবে। ইঁহাদের ৺মাতার নামে এই কূপের নাম হইবে রুক্মিণী-গুপ্তা কূপ। অপিচ ইঁহারা আরও দুই শত টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তে দান করিয়াছেন। এই টাকা হইতে গবর্ণমেণ্ট যশোহর জেলা-বোর্ডের পছন্দমত কালিয়া এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের মধ্যে যে কোন স্থানে পাঁচ বিঘা জমি খরিদ করিয়া দিবেন। এই জমি গোচারণের মাঠে পরিণত হইবে। কালিয়া প্রভৃতি গ্রামের গরু সকল এই গোচরমাঠে চরিতে পারিবে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু প্রভৃতির মাতা গো-জাতিকে বড়ই যত্ন করিতেন; সেই স্মৃতিরক্ষাকল্পেই এই ব্যবস্থা।

বিশ্ববার্ত্তা।

৪। ভারতে নারী-মাহাত্ম্য

হিন্দুরই উক্তি—"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" হিন্দু অনুষ্ঠাত্রী জগন্মাতার প্রীতিকামী হইয়া কুমারী-পূজা ও সধবা-পূজা করিয়া থাকেন। হিন্দু পাঁটা কাটেন, পাঁটি কাটেন না। রমণীর প্রতি সম্মানেই এ দেশের লোক সুভদ্র এবং তাহাদের সকল মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল। এ দেশে পাতিব্রত্যে সতী, সাবিত্রী, সীতা, বঙ্গবালা বেহুলা জগতে অতুলনীয়া; বিদ্যাবত্তায় গার্গী, মৈত্রেয়ী, সুলভা, খনা, লীলাবতী রমণীর আদর্শ। গৃহিণীপণায় দ্রৌপদী, দময়ন্তী, রত্নাবতী, বিদুলা নারী-শীর্ষস্থানীয়া; দুর্গাবতী, রঙ্গমতী, অহল্যাবাই, পদ্মাবতী, রাণী ভবানী স্বদেশানুরাগ, ধর্ম্মজ্ঞান ও অন্যান্য সদ্‌গুণে বিভূষিতা নারীরত্নরাজি ইতিহাসে অনুপমা। এ দেশের নারী মৃত পতির সহিত হাসিতে হাসিতে জীবন্তদেহে জলন্ত চিতায় আত্মসমর্পণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না; অথবা চিরব্রহ্মচারিণী নিষ্কাম-ব্রতধারিণী পরম-যোগিনীরূপে আমরণ পতিচরণ, সেই জগৎপতির শ্রীপাদপদ্মসহ অভিন্নজ্ঞানে, হৃৎপদ্মে অহর্নিশি অর্চ্চনা করিতেন।

আয্যশাস্ত্র বলেন—

"নাস্তি ভার্য্যা সমো বন্ধুঃ
নাস্তি ভার্য্যা-সমা গতিঃ।
নাস্তি ভার্য্যাসমো লোকঃ
সহায়ো ধর্ম্মসংগ্রহে॥"

এইজন্যই অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী "সহধর্ম্মিণীর" সহিত ধর্ম্মাচরণের বিধি—"সস্ত্রীকো ধর্ম্ম-মাচরেৎ।" দৃঢ় শাস্ত্রোক্তি—

"যাবন্নবিন্দতে জায়াস্তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।"

এ দেশের কুলাঙ্গনাগণ কুলধর্ম্মপালনে, গুরুজনসেবনে, দেব-দ্বিজ-গো-অতিথি-পূজনে, দীন, দুঃখী, অন্ধ, আতুর প্রভৃতির দুঃখ-

মোচনে, অবস্থাহীন জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রতিবেশীর যথাসাধ্য সাহায্যকরণে, সতত স্বার্থত্যাগিনী ও মুক্তহস্তা ছিলেন; কি পতিসেবায়, কি সন্তান-পালনে ও রুগ্ন সন্তানাদির চিকিৎসা-বিধানে, বিবিধ গার্হস্থ্য শিল্পকার্য্য সম্পাদনে, সাধারণতঃ সর্ব্ববিধ গৃহকার্য্যে—বিশেষতঃ শুচিতাসহ রন্ধনকার্য্যে আদর্শোত্তমা ছিলেন। এখনও গৃহে গৃহে হিন্দুনারী অধঃপতিত ভারত-সন্তানের পারিবারিক জীবন জগতে অতুলনীয় করিয়া রাখিয়াছেন। প্রত্যক্ষ-দেবতা মাতা, জায়া ছায়া-স্বরূপিণী।

"স্বসা মূর্ত্তিমতী প্রীতিদুহিতা চিত্তপুত্তলিঃ।"

এ কথা আজও ভারতবাসীই বলিতে পারেন।

হিন্দু পত্রিকা।

৫। ৺রামকেলী মেলা

এতদঞ্চলে রামকেলীর মেলাই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। প্রতি বৎসর নানা দেশ বিদেশ হইতে এই মেলায় বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। মুসলমানদিগের আমল হইতেই রামকেলী বৈষ্ণবদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান এবং 'গুপ্ত বৃন্দাবন' নামে প্রসিদ্ধ। মেলার সময় এই তীর্থ স্থানটি এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া থাকে। দুই দিনের মধ্যেই জনশূন্য স্থানসমূহ লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়ে; ব্যবসায়িগণ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সাজাইয়া বসিয়া আছে; ক্রেতাগণ তৈজসপত্র সংগ্রহে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে; যাত্রীবৃন্দ বিগ্রহদর্শনার্থে ছুটাছুটী করিতেছে; আর অদূরে বৈষ্ণবগণের প্রাণ-মাতোয়ারা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে দিগদিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বেকার মত রামকেলীর সেরূপ পবিত্র ভাব, পুণ্য চিত্র, সাধু দৃশ্য আর নাই। সেখানে ক্রমশঃই এখন ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের, আচারের নামে অনাচারের কুৎসিত অভিনয় হইতেছে। বেশ্যাগণই এই ধর্ম্ম-মেলার পবিত্রতার মূল প্রতিবন্ধক। মেলার সময় তাহারা চারিদিক হইতে দলে দলে উপস্থিত হইয়া আগন্তুক নিরীহ দর্শক ও যাত্রিগণের শারীরিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছিল।

আমাদের সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার কঠোর আদেশের দ্বারা বেশ্যাগণের পক্ষে মেলায় যাইয়া কলুষিত বৃত্তি অবলম্বন করিবার পন্থা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে এ বিষয় লইয়া অনেকেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই সফলকাম হন নাই। এ বিষয় লইয়া আজ আমরা নয় বৎসর ধরিয়া লেখালেখি করিতেছিলাম, এ বৎসর আমাদের সহযোগী 'গৌড়দূত'ও এ বিষয়ে যথেষ্ট লেখালেখি করিয়াছেন। আজ বহুদিন পরে আমাদের উভয়ের লেখা সার্থক হইয়াছে দেখিয়া আমাদের আর আনন্দের সীমা নাই।

অনেকের মতে, মেলায় বেশ্যার গতিরোধ হওয়ায় এবার মেলা তেমন ভালরূপ জমকায় নাই। যদি তাহাই হয়, তবে মেলারই বা প্রয়োজন কি? যদি বেশ্যা ও বেশ্যাসেবী ব্যতীত ধর্ম্মসংক্রান্ত মেলা না জমে, তবে সে মেলা জাহান্নমে যাউক না কেন! যত দিন ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিক থাকিবে, ততদিন মেলার অস্তিত্ব থাকিবেই। যদি কখন ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের অভাব হয়, তখন সে মেলাকে অধর্ম্ম দিয়া পুষিয়া এবং বেশ্যার দ্বারা জীবিত রাখিয়া লাভ কি? কিন্তু আমাদের মতে, বেশ্যার অভাবে নয়, ভয়ানক জল কাদার জন্যই এবার মেলা ভালরূপ জমকায় নাই। নতুবা বৈষ্ণবদিগের ভাবের খনি সেই গুপ্ত বৃন্দাবন আর সেই নন্দদুলালের মনোমুগ্ধকর সুরসাল লীলা-মাধুর্য্য শীঘ্র লোপ পাইবার নহে।

মেলার বিস্তৃত বিবরণ

গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির দিবস হইতে আরম্ভ হইয়া মেলা তিন দিবস কাল স্থায়ী হয়। কিন্তু দোকান পসারী বহু পূর্ব্ব হইতে আসিয়া মেলা ভগ্ন হওয়ার পর ৭।৮ দিবস পর্য্যন্ত থাকিয়াও বিক্রয়াদি করে।

দোকান

কম্বল, পাটী, পাথরের ও কাঁসা-পিত্তলের বাসন, বাক্স, মিঠাই, মণিহারী, জুতা প্রভৃতির দোকান বসিয়াছিল।

আমোদ প্রমোদ

নাগরদোলা, বায়স্কোপ ও বাজী প্রভৃতি।

জনসংখ্যা

বৈষ্ণবের সংখ্যাই বেশী। মেলার চতুঃ-পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বিশেষতঃ "বারদুয়ারী" মসজিদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে এই সমস্ত স্থানে লোকসমূহ আড্ডা করিয়াছিল।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোচ ও পলিয়ার সংখ্যাই খুব বেশী।

গত সংক্রান্তির দিবস সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া বৃষ্টি হইয়াছিল। পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের চাপরাসী লোকদিগকে বারদুয়ারীতে ঢুকিতে দিতেছিল না; পরে স্থানীয় পুলিশের কথায় ঢুকিতে দেয়। ঐ সকল যাত্রিগণ বারদুয়ারীতে স্থান না পাইলে যার পর নাই কষ্ট ভোগ করিত।

বারবনিতা

এবার মেলায় বারবনিতাদিগকে একেবারেই স্থান দেওয়া হয় নাই। দেশ বিদেশ হইতে বহুতর বেশ্যা আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

দাতব্য চিকিৎসালয়

এবার মেলায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় বসিয়াছিল। কিন্তু ঔষধ-পত্রাদি বড় কেহ লয় নাই। সংক্রামক পীড়ার সংবাদও কোন স্থান হইতে শোনা যায় নাই।

মহোৎসব

মোহন্তের আখড়াতে প্রত্যহই মহোৎসব হইয়াছিল। বৈষ্ণবগণ প্রত্যহ তথায় পরি-তোষ পূর্ব্বক আহারাদি করিয়াছিল। এই মহোৎসব-ব্যাপার অতি মহৎ কার্য্য।

লোক সংখ্যা কম

এ বৎসর মেলায় তেমন লোক-সমাগম হয় নাই। অতিরিক্ত বৃষ্টিই প্রধান কারণ।

কতকগুলি অসৎ প্রকৃতির লোকে রটনা করিয়া বেড়াইতেছে যে বেশ্যা না আসার জন্য লোক-সংখ্যা কম হইয়াছে। এই সকল উক্তির মূলে আদৌ কোন সত্য নিহিত নাই।

জিনিসপত্র কম বিক্রয়

এবার মেলায় জিনিসপত্র যারপর নাই কম বিক্রয় হইয়াছে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে লোক-সংখ্যা কম হওয়ার জন্য বিক্রয় কম হইয়াছে। দোকানদারগণ যার পর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

গাড়োয়ানদিগের ক্ষতি

এ বৎসর গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদিগের যারপর নাই ক্ষতি হইয়াছে। গাড়োয়ান-দিগের ভাড়া এক প্রকার হয়টে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যহ বহু গাড়ী মেলার নিকট এবং টাউনের সিঙ্গাতলার নিকট ভাড়ার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া-ছিল।

মালদহ সমাচার।

৬। দুগ্ধজীবী মহাত্মা যাদব ঘোষ

গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ পাবনার প্রসিদ্ধ দুগ্ধজীবী যাদবচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স প্রায় অশীতিবর্ষ পূর্ণ হইয়াছিল। এই ব্যক্তির সমগ্রজীবন পরোপকারে আত্মীয়-স্বজনের দুঃখ নিবারণে এবং সহরের বহুসংখ্যক লোকের ঋণ পরিশোধ না করা নীতির অত্যাচার সহ্য করিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। কাহারও পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধ হয় না, যাদব ঘোষকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন আমার এই কার্য্যে দধি দুগ্ধ ক্ষীর ঘৃত প্রভৃতি যাহা লাগিবে তাহা তোমাকে সরবরাহ করিতে হইবে, অদ্য বায়না ১০্ দশ টাকা দিলাম। শ্রাদ্ধের পর মিটাইয়া দিব। যাদব ঘোষ তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত সরবরাহ করিল, কিন্তু শ্রাদ্ধের পর আর তাহার সহিত কোনও সম্পর্ক থাকিল না। আজকাল করিয়া হিসাবটি তামাদি করিয়া দিলেন। এইরূপ অমুকের পুত্রের বিবাহ, অমুকের কন্যার বিবাহ ইত্যাদিতে বেচারা এইরূপ নিয়ত প্রতারিত হইত। যাদব ঘোষ যাহাদের নিকট একবার প্রতারিত হইয়াছেন তাহাদের প্রতি যেরূপ ভাব ছিল নবাগত প্রার্থিগণের উপরও তাহার সেইরূপ ভাব চির বিরাজ করিত। তাঁহার

মুখে কখনও কাহারও নিন্দা শুনা যাইত না।

ভদ্রসমাজে এইরূপ, কৃষীজীবী সমাজেও যাদব ঘোষের অসাধারণ প্রভাব ছিল। বৈশাখ মাস বৃষ্টিপাত হইয়া কৃষকের ক্ষেত্র ধান্যরোপণযোগ্য হইয়াছে, কিন্তু তাহার হাল-গরু নাই; জমিতে বীজ দিবার সংস্থান নাই; সমস্ত বৎসর কি খাইয়া অতিবাহিত করিবে; পুত্র কলত্রাদিরই বা কি অবস্থা হইবে ভাবিয়া কৃষক আকুল। অশ্রুপূর্ণলোচনে আপন দুঃখ-কাহিনী লইয়া যাদব ঘোষের নিকট উপস্থিত। শুনিয়া অশ্রুজলে যাদবেরও নয়নদ্বয় পরিপূর্ণ হইল, তিনি কৃষকের হস্তধারণ করিয়া তুলিয়া সান্ত্বনা করিলেন "ভয় নাই ভগবান আছেন।" তৎক্ষণাৎ যাদব তাঁহার আর ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কৃষকের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলেন। যাদব যাহার সহায়, তাহার ভাবনা কি? যাদব বন্ধু-বান্ধবের প্রতি অতি সদয়, অমায়িক ও স্নেহবান ছিলেন। অহঙ্কার কাহাকে বলে জানিতেন না। কি বিশিষ্ট ভদ্রলোক, কি সমান্য বস্ত্রখণ্ডপরিহিত কৃষক, যাদব সকলকেই একরূপ চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার দয়া কখনও সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বচ্ছসলিলা মন্দাকিণীর ন্যায় কি শস্যপূর্ণ উর্ব্বরক্ষেত্র কি বালুকা-কঙ্করের উষর ভূমি সকলের উপর দিয়া সমভাবে প্রবাহিত হইত! সামান্য পরিচ্ছদ ধারণ, সামান্য গৃহে বাস, অতি সামান্য আহারে নিয়ত সন্তুষ্টচিত্তে থাকিতেন। এই নীরব সাধককে স্থানীয় "উচ্চ শ্রেণীর" লোকেরা চিনিতে পারে নাই। তিনি স্বজাতির মধ্যে অন্ততঃ ১০।১২টি লোকের বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার ঋণে আবদ্ধ কত লোককে মৃত্যুকালে অকাতরে ঋণদায় হইতে মুক্তি দিয়াছেন, কত পিতৃমাতৃ-দায়গ্রস্ত লোককে অকাতরে সাহায্য করিয়াছেন। দায়গ্রস্ত লোক দেখিলে দিক্‌বিদিক্ বিবেচনা না করিয়া যাহা সংস্থান থাকিত তাহাই তাহাকে দান করিয়া বসিতেন। যাদব ঘোষ পাবনা সহরের বহুভদ্র, বহু দরিদ্র লোকের সহিত কারবার করিতেন। সমস্ত দেনাপাওনা তাঁহার মুখে থাকিত। অসাধারণ স্মরণ শক্তিবলে সামান্য 'টাব' হইতে গ্রাহককে সমস্ত হিসাব বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার অভাবে তাঁহার গ্রাহকগণ তাঁহার শ্রাদ্ধের জন্য তাঁহার নিরাশ্রয় পুত্র-গণের গ্রাসাচ্ছাদন জন্য সৎপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া একটি পয়সাও দিতেছেন না! যাদবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স ১৩।১৪ বৎসর হইবে। অপর দুইটি নিতান্ত শিশু। এক্ষণে ইহাদের ভরণপোষণ এই সকল গ্রাহকের সততার উপর নির্ভর করিতেছে। আমরা অবগত আছি যাদরের প্রায় ২৫০০০৲ হাজার টাকা লোকের নিকট অনাদায়ী অবস্থায় পড়িয়া আছে।

যাদবের পিতা ৺গোপালচন্দ্র ঘোষ অসাধারণ পরোপকারী ও পরসেবাকুশল ছিলেন। তিনি একটি কলেরার রোগীর সুশ্রূষা করিতে গিয়া উক্ত রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। যাদব অধিকতর রূপে পিতৃগুণ অধিকার করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর যাদব পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করেন। যাদব ঘোষ যেমন পরিশ্রমী তেমনই অসাধারণ অধ্যবসায়ী ছিলেন। প্রথম বয়সে ইঁহার শরীরেও অসাধারণ বল ছিল। কথিত আছে ইনি বহুদূর হইতে প্রত্যহ ৪৴ চারিমণ ছানা বাঁকের উভয় দিকে বহন করিয়া আনিতেন। শ্রমসহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও সাধুতা তাঁহার উন্নতির মূল কারণ হইয়াছিল।

সুরাজ।

৭। বাঙ্গালীর ষ্টীমার

ফরিদপুরের অন্তর্গত কেন্দুয়ানিবাসী মেসার্স আর বসু এণ্ড সন্স মাদারীপুর হইতে ফতেপুর পর্য্যন্ত ষ্টীমার চালাইতেছেন। ত্রিপুরা কৃষ্ণনগরনিবাসী প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ রায় ভৈরব হইতে গোয়ালনগর পর্য্যন্ত দৈনিক ষ্টিমার চালাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

এডুকেশন গেজেট।

পরিশিষ্ট।

পা'বে। তবে যেখানে ছাপার ভুল আছে, সে গুলা শুদ্ধ ক'রে নিলে, তা দিয়ে অনায়াসেই কাজ চল্‌বে। অনর্থক কাপী কর্‌তে যে কষ্ট হ'বে,—সময় যা'বে—তা'র পর ভুল হ'বারও সম্ভাবনা অনেক, তা'র চেয়ে দেড় টাকা ব্যয় ক'রে একখানা প্রথম খণ্ড ফলিত-জ্যোতিষ ক্রয় করাই সুবিধা। তা'তে শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তসম্মত সিদ্ধান্তরহস্যানুসারে, গ্রহস্ফুট ও তিথ্যাদি আনয়ন-প্রণালী প্রভৃতি আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে লগ্নস্ফুটাদি এবং তৃতীয় খণ্ডে শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তাদি মতে স্ফুটসাধন-প্রণালী আছে।

আমি। আপনার আদেশ মত আমি ঐ তিন খানি গ্রন্থ সত্বরেই সংগ্রহ কর্‌বো। এখন জিজ্ঞাস্য এই, ঐরূপেই ত অন্যান্য গ্রহের মধ্যগতি নির্ণয় করা যা'বে?

গুরুদেব। নিশ্চয়ই। তুমি অবসর মত ঐ গুলি ক'সে ঠিক ক'রো। তবে ঠিক হ'লো কি না দেখ্‌বার জন্য লিখে রাখো—

গ্রহ		ভগণ কাল				দৈনিক মধ্যগতি
সূর্য্য	দিনাদি	৩৬৫ । ১৫ । ৩১	ইত্যাদি	মধ্য	অংশাদি	০ । ৫৯ । ৮ । ১০
মঙ্গল	„	৬৮৬ । ৫৯ । ৫০	„	„	„	০ । ৩১ । ২৬ । ২৮
বুধ	„	৮৭ । ৫৮ । ১০	„	শীঘ্র	„	৪ । ৫ । ৩২ । ২১
গুরু	„	৪৩৩১ । ১৯ । ১৪	„	মধ্য	„	০ । ৪ । ৫৯ । ৯
শুক্র	„	২২৪ । ৪১ । ৫৪	„	শীঘ্র	„	১ । ৩৬ । ৭ । ৪৪
শনি	„	১০৭৬৫ । ৪৬ । ২৩	„	মধ্য	„	০ । ২ । ০ । ২৩
চন্দ্রের সৌর	„	২৭ । ১৯ । ১৮	„	„	„	১৩ । ১০ । ৩৪ । ৫২
„ নাক্ষত্র	„	২৯ । ৩১ । ৫০	„	„	„	১২ । ১১ । ২৬ । ৪২
চন্দ্র-পাত	„	৬৭৯৪ । ২৩ । ৫৯	„	„	„	০ । ৩ । ১০ । ৪৫
চন্দ্রমন্দোচ্চ	„	৩২৩২ । ৫ । ৩৭	„	„	„	০ । ৬ । ৪০ । ৫৯

আমি। চন্দ্রের সৌর ও নাক্ষত্র দু'রকম ভগণ কেন?

গুরুদেব। চন্দ্রের সমগ্র রাশিচক্র পরিভ্রমণকে নাক্ষত্র আর সূর্য্যের সহিত একবার মিলন থেকে পুনরায় অনুরূপ মিলন-কালকে সৌর ভগণ বলে। রেবতী ত্যাগের পর পুনরায় রেবতী ত্যাগ কাল পর্য্যন্ত ২৭ দিনাদি অতীত হয়, কিন্তু চৈত্রের অমাবাস্যান্ত হ'তে বৈশাখের অমাবাস্যান্ত কাল ২৯ দিনাদি। এইরূপে মধ্যগতি যা নির্ণীত হলো, তা'কে অভীষ্ট দিন সংখ্যা দিয়ে গুণ কল্লে, তত্তদিনের গতি পাওয়া যা'বে।

আমি। আমার কিন্তু আর একটা জিজ্ঞাস্য আছে, আপনি সূর্য্যের ও মঙ্গলের মধ্যগতি লিখে বুধের শীঘ্রগতি লিখেছেন, আর চন্দ্রপাত না হয় বুঝ্‌লাম রাহু কিন্তু চন্দ্রমন্দোচ্চটা ব্যাপার কি?

গুরুদেব। এ কটা না বুঝে ছাড়বে না? তবে শোনো। গ্রহকক্ষার যে অংশ পৃথিবী হ'তে দূরতম তা'রি নাম শীঘ্রোচ্চ। এখানে গ্রহের গতি দ্রুত হয়। আর বুধ ও শুক্র, সূর্য্যের

ও পৃথিবীর মধ্যে ব'লে ঐ গ্রহদ্বয়ের মধ্যগতি সূর্য্যসদৃশ কিন্তু শীঘ্রগতি স্বতন্ত্র। কিন্তু অপর গ্রহগুলি সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে না থাকায়, তা'দের শীঘ্রগতিই সূর্য্য সদৃশ সুতরাং মধ্যগতি স্বতন্ত্র লিখিত হ'য়েছে। এ বিষয়টি বেশ ভাল করে বোঝাতে হ'লে চিত্র ব্যতীত সুগম হওয়া সম্ভব নয়, এজন্য আর এক দিন মনে ক'রে জিজ্ঞাসা করো, ভাল কোরে বুঝিয়ে দিব। গ্রহের আর এক প্রকার গতি আছে তার নাম মন্দ গতি বা মন্দোচ্চ গতি। চন্দ্রের মন্দোচ্চ গতি স্বতন্ত্র ভাবে দিয়েছি কারণ—চন্দ্রের মন্দোচ্চের গতি এক মহাযুগে ৪৮৮,২০৩ ভগণ, কিন্তু সূর্য্যাদির পক্ষে—

"প্রাগ্গতেঃ সূর্য্য-মন্দস্য কল্পে সপ্তাষ্টবহ্নয়ঃ।
কৌজস্য বেদখযমা, বৌধস্যাষ্টর্ত্তুবহ্নয়ঃ॥
খখরন্ধ্রাণি জৈবস্য শৌক্রস্যার্থগুণেষবঃ।
গোহগ্নয়ঃ শনিমন্দস্য পাতানামথ বামতঃ॥
মনুদস্রাস্তু কৌজস্য বৌধস্যাষ্টাষ্টসাগরাঃ।
কৃতাদ্রিচন্দ্রা জৈবস্য ত্রিখাঙ্কাশ্চ ভৃগোস্তথা॥
শনিপাতস্য ভগণা কল্পে যমরসর্ত্তবঃ॥"

অর্থাৎ এক কল্পে সূর্য্যমন্দোচ্চের ভগণ ৩৮৭, মঙ্গল মন্দোচ্চের ২০৪, বুধের ৩৬৮, বৃহস্পতির ৯০০, শুক্রের ৫৩৫, শনির ৩৯ এগুলি দক্ষিণাবর্ত্তে, কিন্তু পাতগুলির বামগতি। মঙ্গলপাতের কল্পে ২১৪, বুধের ৪৮৮, বৃহস্পতির ১৭৪, শুক্রের ৯০৩ ও শনির ৬৬২, সুতরাং এই গুলির বার্ষিক গতি সামান্য।

শ্রীসূর্য্য সিদ্ধান্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে কল্পের আদি হ'তে, অর্থাৎ পৃথিবীর আরম্ভকাল থেকে বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ যুগের সত্যযুগশেষপর্য্যন্ত ১৯৫৩৭২০০০০ সৌর বর্ষ অতীত হ'য়েছে। এখন তুমি প্রতিগ্রহের গতি ও ভগণ-কাল অবগত হ'য়েছ সুতরাং মেষের প্রথমাংশ হ'তে কে কত মধ্যগতিতে গমন করেছে নির্ণয় করতে পার। তারপর বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত নির্ণয় করাও বিশেষ গুরুতর ব্যাপার নয়।

আমি। গুরুতর নয় কেমন করে? এত গুণ ভাগ করা—কত ভুল হ'বার সম্ভাবনা।

গুরুদেব। তা নিশ্চয়। তথাপি নির্ণয় করা আশ্চর্য্য নয়। পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ কোনও সন্নিহিত বর্ষের মধ্যগতি নির্ণয় ক'রে গ্রন্থে দিয়েছেন এবং তৎপরে অভীষ্ট কাল পর্য্যন্ত গতিনির্ণয়ের টেবিল করে রেখেছেন। আজকাল আবার অত কষ্টও করবার দরকার হয় না। এদেশে অনেক পঞ্জিকাতেই প্রাত্যহিক স্ফুট দেওয়া আছে আর ইংলণ্ড প্রভৃতিতে অনেক গ্রহস্ফুট পঞ্জিকা আছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী রাফেল প্রণীত পঞ্জী খ্রীঃ ১৮০০ অব্দ হ'তে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরেরই কিনতে পাওয়া যায় সুতরাং কষ্ট ক'রে গ্রহস্ফুট করবার প্রয়োজন দেখা যায় না।

আমি। যদি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগের কোনও বৎসরের দরকার হয় ?

গুরুদেব। অতি সহজেই ক'রে নিতে পার। জ্যোতিষাচার্য্য সিফেরিয়েল (Sepherial) নির্ণয় ক'রেছেন উরেনস গ্রহ ৮৩ বৎসর পরে পূর্ব্বস্থান অপেক্ষা ৭০ কলা অগ্রবর্ত্তী হন, যেমন ১৫৬৪ অব্দের ৪ঠা মে ধনুর ৭ অংশ ৪০ কলায় এবং ১৬৩৮ অব্দের ঐ তারিখে ধনুর ৮ অংশ ২০ কলা ইত্যাদি। শনৈশ্চরের পুনরাবর্ত্তন উনষাইট বর্ষে; কেবল ১ অংশ ৪৫ কলা অগ্রগামী হন। বৃহস্পতি তিরাশি বর্ষ পরে পূর্ব্বস্থানেই আসেন। মঙ্গল উনাশী বর্ষে পূর্ব্বস্থানের ১ অংশ অগ্রগামী হন কিন্তু বুধ ঐ কাল পরে পূর্ব্বস্থানেই আসেন। শুক্র আট বর্ষ পরে প্রায়শঃ পূর্ব্বস্থানে আসেন কিন্তু ঠিক নয়। চন্দ্রের কথা পূর্ব্বেই বলেছি, উনিশবর্ষের পর পূর্ব্ব অংশাদিতেই অমাবস্যা হয় তবে পূর্ব্ব সময়ের এক ঘণ্টা অগ্রে ঘটে, সুতরাং তাহা হইতে স্ফুট নির্ণয় দুর্ঘট নহে। তা' ব'লে যে শাস্ত্রের আলোচনা করতে হ'বে না এমন কথা বলছি না। শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তখানি বেশ ভাল করেই অধ্যয়ন করা উচিত।

আমি। তবে আমি আগে একখানা শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত আর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ফলিত জ্যোতিষ তিনখণ্ড সংগ্রহ করি, তা'র পর ভাল ক'রে ঐ গ্রন্থগুলি বুঝিয়ে দেবেন। আপাততঃ আমায় পঞ্জিকার সাহায্যে সূক্ষ্মভাবে কোষ্ঠী প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিন।

গুরুদেব। সে কথা মন্দ নয়। কিন্তু কসা কি ইংরাজী পঞ্জিকা অবলম্বনে হ'বে না দেশীয় পঞ্জিকা অনুসারে ?

আমি। দু রকমই দেখিয়ে দিন। কিন্তু এখানে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো। আপনি বলেছেন যে আপনি ইংরাজী পাঁজিই কোষ্ঠীতে ব্যবহার করেন; কেন ?

গুরুদেব। সে কথাও আগে বলেছি। সহজে কসা যায় আর অপেক্ষাকৃত নির্ভুল হয়।

আমি। দেশীতে ভ্রম কোথা থেকে এলো ?

গুরুদেব। শ্রীযুক্ত রাঘবানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত অবলম্বনে যথাসাধ্য সূক্ষ্ম ক'রে টেবিল করেছেন সত্য, কিন্তু শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তের স্ফুট নির্ণয়ার্থ যে জ্যাখণ্ড আছে, তাহা নিতান্ত সূক্ষ্ম নয়, তার পর সেই খণ্ডা অবলম্বনে চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে খণ্ডা ও সূত্র করেছেন, তা'তে অনেক স্থূল হ'য়ে গেছে, কাজেই ঠিক শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তানুগত ফল পাওয়া যায় না। এর পর যখন শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত পড়বে তখন সে সব ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিব। আপাততঃ একখানা পঞ্জিকা অবলম্বন ক'রে, বিবিধ উপায়ে কস্‌লে যে তারতম্য হ'বে তা দেখতে পাবে।

আমি। তবে কোনও দিনের জন্য উভয়বিধ পঞ্জিকাই অবলম্বন করা যাক।

গুরুদেব। সেই ভাল।

লগ্ন নির্ণয়াধ্যায়।

গুরুদেব। লগ্ন নির্ণয় করতে হ'লে কোনও একটি সময় ও কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানের প্রয়োজন। মনে কর বর্ত্তমান ১৩২০ সালের, ১৭ই আষাঢ়, বেলা ২টা ৩৫ মিনিটের সময়, কলিকাতায়, লাহোরে, মান্দ্রাজে ও মেলবোর্ণে এক একটি বালক জন্মেছে, তা'দের লগ্ন করতে হ'লে, প্রথমতঃ তত্তদ্দেশীয় লগ্নখণ্ডা প্রস্তুত ক'র্ত্তে হ'বে। তজ্জন্য প্রথমতঃ ঐ সকল স্থানের পলভা নির্ণয় ক'রে, চরখণ্ডা প্রস্তুত করা চাই। পলভ নির্ণয় জন্য, তত্তদ্দেশের অক্ষ চাই। পলভ কারে বলে ও কিরূপে নির্ণয় করতে হয় তার একটি উপায় ইতিপূর্ব্বে (৩৭পৃ) বলে দিচি, এখন গণিতের সাহায্যে অক্ষ হ'তে কিরূপে ফল পাওয়া যায় তা বলছি। ১২ × ট্যান. অক্ষাংশ = পলভ। যেমন কলিকাতার স্থান বিশেষে অক্ষাংশ ২২।৩৩ চেম্বার্স প্রণীত সারিণীগ্রন্থে-(Mathematical Tables)-র ৩১১ পৃষ্ঠায় ২২°-৩৩-র স্বাভাবিক ট্যান = ·৪১৫২৩৬৩

∴ ·৪১৫২৩৬৩ × ১২

= ৪·৯৮২৮৩৫৬ অঙ্গুল

বা ৪ অঙ্গুল ৫৯ ব্যঙ্গুল (৫৮·৯৭···)

সেইরূপ লাহোরের অক্ষাংশাদি ৩১°-৩৪ উ

ট্যান ৩১°-৩৪′ = ·৬১৪৪০২৪

∴ ·৬১৪৪০২৪ × ১২

= ৭ অঙ্গুল ২২ ব্যঙ্গুল।

মান্দ্রাজের অক্ষাংশাদি ১৩°-৪′ উ

ট্যান ১৩°-৪′ = ·২৩২০৯৪১

∴ ·২৩২০৯৪১ × ১২

= ২অঙ্গুল ৪৭ ব্যঙ্গুল।

এবং মেলবোর্ণের অক্ষাংশাদি ৩৭।৫০ দ.

ট্যান ৩৭।৫০ = ·৭৭৬৬১১৮

∴ ·৭৭৬৬ × ১২

= ৯ অঙ্গুল ১৯ ব্যঙ্গুল।

এইবার দেখ, আমরা পেলাম—

স্থান	দেশান্তর	অক্ষাংশাদি	পলভ		
কলিকাতা	৮৮°।২৫′ পূ	২২°।৩৩′ উ	প্রায়	৫	অঙ্গুল
লাহোর	৭৪ । ২১ পূ	৩১ । ৩৪উ	„	৭	„
মান্দ্রাজ	৮০ । ১৭ পূ	১৩ । ৪ উ	„	৩	„
মেল বোর্ণ	১৪৪ । ৫৯ পূ	৩৭ । ৫০দ	„	৯	„

আমি। প্রায় ব'লে কম বেশী ক'রে নিলেন কেন?

গুরুদেব। যে গৃহে জাতক ভূমিষ্ঠ হয়, অক্ষাংশাদি তাহার সন্নিহিত বই ত নয়, সুতরাং সন্নিহিত পলভ নিয়ে চর আনয়ন করলে ভুল হ'বে মনে করি না—তুমি ইচ্ছা কর অঙ্গুল ব্যঙ্গুল ল'য়ে কাজ ক'ত্তে পার।

আমি। চর-নির্ণয় সঙ্কেত কি?

গুরুদেব। বিদগ্ধতোষণী গ্রন্থে আছে—

দশ নাগা দিশো নিঘ্নাঃ স্বদেশবিষুবোদ্ভবঃ।
অন্ত্যস্ত্র্যাপ্তশ্চরার্দ্ধং স্যান্মেষাদীনাং ক্রমোৎক্রমাৎ॥"

অর্থাৎ স্বদেশীয় বিষুবচ্ছায়া বা পলভা ১০, ৮, ও দশ দিয়ে গুণ ক'রে, শেষের অঙ্কটির ৩ ভাগের একভাগ গ্রহণ করলে যা হ'বে সেই তিনটিই ক্রমোৎ ক্রমে মেষাদির চরার্দ্ধ পল হ'বে। যেমন কলিকাতার ছায়া ৫ অঙ্গুল; তা'কে দশ গুণ করলে হ'লো ৫০, আট গুণ করলে হলো ৪০, এবং ৫০ ÷ ৩ = ১৬।৪০; শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে লিখিত আছে মেষের উদয় পরিমাণ কাল ১৬৭০ প্রাণ বৃষের ১৭৯৫ ও মিথুনের ১৯৩৫ এবং ক্রমোৎক্রমে ইহাই কর্কটাদির লঙ্কোদয় কাল। এখন জান ত ৬ প্রাণে এক পল সুতরাং ঐ অঙ্কগুলিকে ছয় ভাগ করিলে পল হইবে যথা—

	লঙ্কোদয় প্রাণ	÷	৬	=	লঙ্কোদয় পলাদি	±	কলিকাতার চরার্দ্ধ	=	প্রাচীন লগ্ন
মেষ	১৬৭০	÷	৬	=	২৭৮।২০ বা ২৭৮	−	৫০। ০	=	২২৮
বৃষ	১৭৯৫	÷	৬	=	২৯৯।১০ ,, ২৯৯	−	৪০। ০	=	২৫৯
মিথুন	১৯৩৫	÷	৬	=	৩২২।৩০ ,, ৩২৩	−	১৬।৪০	=	৩০৬
কর্কট	১৯৩৫	÷	৬	=	৩১২।৩০ ,, ৩২৩	+	১৬।৪০	=	৩৪০
সিংহ	১৭৯৫	÷	৬	=	২৯৯।১০ ,, ২৯৯	+	৪০। ০	=	৩৩৯
কন্যা	১৬৭০	÷	৬	=	২৭৮।২০ ,, ২৭৮	+	৫০। ০	=	৩২৮
তুলা	১৬৭০	÷	৬	=	২৭৮।২০ ,, ২৭৮	+	৫০। ০	=	৩২৮
বৃশ্চিক	১৭৯৫	÷	৬	=	২৯৯।১০ ,, ২৯৯	+	৪০। ০	=	৩৩৯
ধনু	১৯৩৫	÷	৬	=	৩২২।৩০ ,, ৩২৩	+	১৬।৪০	=	৩৪০
মকর	১৯৩৫	÷	৬	=	৩২২।৩০ ,, ৩২৩	−	১৬।৪০	=	৩০৬
কুম্ভ	১৭৯৫	÷	৬	=	২৯৯।১০ ,, ২৯৯	−	৪০। ০	=	২৫৯
মীন	১৬৭০	÷	৬	=	২৭৮।২০ ২৭৮	−	৫০। ০	=	২২৮

এই লগ্নমান থেকে লগ্ন-সাধন-খণ্ডা ক'রে, সায়ন সূর্য্যের সাহায্যে লগ্ন নির্ণয় করতে পার অথবা তাৎকালিক অয়নাংশশুদ্ধ লগ্নমান নির্ণয় ক'রে, নিরয়ণ সূর্য্য সাহায্যে লগ্ন নির্ণয় করতে পার।

আমি। উদাহরণ কটার একটা আপনি আদ্যোপান্ত দেখিয়ে দিন আমি বাকি কটা কস্‌বো।

গুরুদেব। বেশ কথা—এই কলিকাতারটাই আমি কসি। প্রথমতঃ স্বদেশীয় লগ্নখণ্ডা এইরূপে প্রস্তুত করতে হ'বে—

অক্ষ ২২°-৩৩′ সন্নিহিত দেশ সমূহের লগ্নখণ্ডা।

রাশি		অংশ (মেষারম্ভ হইতে)	লগ্নমান (মেষারম্ভ হইতে)	ভোগ্য
১	মেষ	৩০	২২৮	২৫৯
২	বৃষ	৬০	৪৮৭	৩০৬
৩	মিথুন	৯০	৭৯৩	৩৪০
৪	কর্কট	১২০	১১৩৩	৩৩৯
৫	সিংহ	১৫০	১৪৭২	৩২৮
৬	কন্যা	১৮০	১৮০০	৩২৮
৭	তুলা	২১০	২১২৮	৩৩৯
৮	বৃশ্চিক	২৪০	২৪৬৭	৩৪০
৯	ধনু	২৭০	২৮০৭	৩০৬
১০	মকর	৩০০	৩১১৩	২৫৯
১১	কুম্ভ	৩৩০	৩৩৭২	২২৮
১২	মীন	৩৬০	৩৬০০	২২৮

এই লগ্নখণ্ডা ২২°-৩৩′ অক্ষাংশ স্থিত ও সন্নিহিত দেশ সমূহের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারবে। এখন দেখ ১৩২০ সালের ১৭ই আষাঢ় বেলা ২টা ৩৫ মিনিটের সময় লগ্ন করতে হ'বে। ঐ দিন মঙ্গলবার খ্রীঃ ১৯১৩ অব্দের ১লা জুলাই। পি. এম. বাগচীর পাঁজীতে লেখা আছে সূর্য্যোদয় ৫টা ২০ মি. ৪০ সেকেণ্ড সময়ে ;—

∴ ১২।০ — ৫।২০।৪০ + ২।৩৫
= ৯।১৪।২০ ঘণ্টাদি
× ২॥
১৮।২৮।৪০
৪।৩৭।১০
দণ্ডাদি ২৩। ৫।৫০
৬০
১৩৮৬ পল

১৮ই আষাঢ় সূর্য্যস্ফুটরাশ্যাদি ২।১৬।৪০।৪১
১৭ই আষাঢ় " ২।১৫।৪৩।৫০

৬০ দণ্ডে গতি = ০।০।৫৬।৫১

৬০ : ২৩।৬ :: ৫৬।৫১ : কত?

$$= \frac{২৩ \text{ দণ্ড } ৬ \text{ পল} \times ৫৬ \text{ কলা } ৫১ \text{ বিকলা}}{৬০ \text{ দণ্ড}}$$

$$= \frac{১৩৮৬ \times ৫৬ \text{ কালা } ৫১ \text{ বিকলা}}{৩৬০০}$$

= ২১ কলা ৫৩ বিকলা

১৭ই আষাঢ়ের ঔদয়িক রবি ২। ১৫। ৪৩। ৫০
+ ২৩ দণ্ড ৬ পলের গতি ২১। ৫৩
= তৎকালিক রবি ২। ১৬। ৫ ৪৩
+ অয়নাংশাদি ০। ২১। ৪৭। ৩৫
= সায়ন রবি = ৩। ৭। ৫২ ২৮

আমি। আপনার এ অয়নাংশ চৈত্র না রৈবত?

গুরুদেব। এ শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তসম্মত রৈবত। এখন দেখ [illegible] রাশি ৩ অর্থাৎ মেষ হইতে মিথুনের শেষ পর্য্যন্ত ৭৯৩ পল, তার পাশে কর্কটের ৩০ অংশের গতি ৩৪০ পল ভোগ্য। এখন কস—

৩০ অংশ যেতে যদি ৩৬০ পল সময় লাগে তবে ৭ অংশ [illegible] কলা যেতে কত পল অতীত হবে?

৩০ : ৩৬০ :: ৭।২৩ : কত?

$$= \frac{৩৬ \times ৭।২৩}{৩}$$

= কিঞ্চিদধিক ৮৯ পল

∴ সূর্য্যস্ফুটের গতি = ৭৯৩ + ৮৯ = ৮৮২ পল এখন দেখ,

তৎকাল সূর্য্য লব্ধ ৮৮২ পল
+ উদয় হইতে ইষ্টকাল পর্য্যন্ত ১৩৮৬ পল
২২৬৮ পল

সুতরাং মেষারম্ভ হইতে সূর্য্য যতদূর এবং সূর্য্য হ'তে লগ্ন যত দূর এ উভয়ের যোগে মেষারম্ভ থেকে লগ্নের দূরত্ব পেলাম ২২৬৮ পল; এখন খণ্ডায় দেখ মেষারম্ভ হইতে তুলার শেষ পর্য্যন্ত ২১২৮ পল—

∴ ২২৬৮
− ২১২৮ = ৭ রাশি

১৪০ বশ্চিকের ভুক্ত

বৃশ্চিকের ভোগ্য = ৩৩৯

৩৩৯ : ১৩২ :: ৩০ : কত ?

$$\frac{১৩২ \times ৩০}{৩৩৯}$$

প্রায় ১১ অংশ ৪০ কলা।

সায়ন লগ্ন = ৭।১১।৪০ রাশ্যাদি

অয়নাংশ ০।২১।৪৭

= নিরয়ণ লগ্ন ৬।১৯।৩৫

এইবার অয়নাংশ শুদ্ধ লগ্নমান নির্ণয় ক'রে তদ্দ্বারা একেবারে নিরয়ণ লগ্ন নির্ণয় ক'রে দেখা'চ্ছি। তার সূত্র এই—

"লগ্নং লগ্নান্তরং কৃত্বা অয়নাংশৈঃ প্রপূরয়েৎ।
খানলৈর্হরতে ভাগং মিশ্রয়িত্বা দিনে দিনে॥"

এতদনুসারে—

মেষ	=	২২৮ + {(২৫৯ − ২২৮) × ২২ ÷ ৩০}	বা ২৩	= ২৫১
বৃষ	=	২৫৯ + {(৩০৬ − ২৫৯) × ২২ ÷ ৩০}	বা ৩৪	= ২৯৩
মিথুন	=	৩০৬ + {(৩৪০ − ৩০৬) × ২২ ÷ ৩০}	বা ২৪	= ৩৩০
কর্কট	=	৩৪০ − {(৩৪০ − ৩৩৯) × ২২ ÷ ৩০}	বা ১	= ৩৩৯
সিংহ	=	৩৩৯ − {(৩৩৯ − ৩২৮) × ২২ ÷ ৩০}	বা ৮	= ৩৩১
কন্যা	=	৩২৮ +	০	= ৩২৮
তুলা	=	৩২৮ + {(৩৩৯ − ৩২৮) × ২২ ÷ ৩০}	বা ৮	= ৩৩৬
বৃশ্চিক	=	৩৩৯ − {(৩৪০ − ৩৩৯) × ২২ ÷ ৩০}	বা ১	= ৩৪০
ধনু	=	৩৪০ − {(৩৪০ − ৩০৬) × ২২ ÷ ৩০}	বা ২৪	= ৩১৬
মকর	=	৩০৬ − {(৩০৬ − ২৫৯) × ২২ ÷ ৩০}	বা ৩৪	= ২৭২
কুম্ভ	=	২৫৯ − {(২৫৯ − ২২৮) × ২২ ÷ ৩০}	বা ২৩	= ২৩৬
মীন	=	২২৮ −	০	= ২২৮
মোট	=	৩৬০০ পল		= ৩৬০০ পল

আমি। এবার কসবার সময় ২২ অয়নাংশ ধরলেন, এতে কিছু ব্যতিক্রম হবে না ?

গুরুদেব। স্থূল ক'ল্লেই ফল স্থূল হয়। আমি কসবার সুবিধার জন্যই করলাম। যদি এই মতে লগ্ন করবার প্রয়োজন হয়, তা'হলেই অয়নাংশ শুদ্ধ লগ্ন খণ্ডা ক'র্ব্বার প্রয়োজন হবে। প্রাচীন লগ্ন ও সায়ন সূর্য্য দিয়ে কসাই সহজ; কারণ এক এক অঙ্কের খণ্ডা করে রাখ্‌লে, চিরদিনই তা দিয়ে চল্‌বে। অয়নাংশশুদ্ধ লগ্নখণ্ডা তাৎকালিক ক'রে নিতে হয়। কেবল ফল যে সমান হয় এই দেখাবার জন্যই একবার কসে দেখালাম। দেখ—

ন কুর্য্যাদ্দন্তসঙ্ঘর্ষং নাত্মনো দেহতাড়নম্।
স্বপ্নাধ্যয়নভোজ্যানি সন্ধ্যয়োশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
সন্ধ্যায়াং মৈথুনং চাপি তথা পন্থানমেব চ ॥ ৭২ ॥
পূর্ব্বাহ্নে তাত দেবানাং মনুষ্যাণাঞ্চ মধ্যমে।
ভক্ত্যা তথাপরাহ্নে চ কুর্ব্বীত পিতৃপূজনম্ ॥ ৭৩ ॥
শিরঃস্নাতশ্চ কুর্ব্বীত দৈবং পৈত্র্যমথাপি বা।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি শ্মশ্রুকর্ম্ম চ কারয়েৎ ॥ ৭৪ ॥
ব্যঙ্গিনীং বর্জ্জয়েৎ কন্যাং কুলজামপি রোগিণীম্।
বিকৃতাং পিঙ্গলাঞ্চৈব বাচালাং সর্ব্বদূষিতাম্ ॥ ৭৫ ॥
অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতাম্।
তাদৃশীমুদ্বহেৎ কন্যাং শ্রেয়ঃকামো নরঃ সদা ॥ ৭৬ ॥
উদ্বহেৎ পিতৃমাত্রোশ্চ সপ্তমীং পঞ্চমীং তথা।
রক্ষেদ্দারান্ ত্যজেদীর্ষাং দিবা চ স্বপ্নমৈথুনে ॥ ৭৭ ॥

দন্তে দন্তে কভু নাহি করিবে ঘর্ষণ,
নিজ দেহে আঘাত না কর কদাচন ;
প্রাতঃ-সায়ং-সন্ধ্যাকালে শয়ন সে আর
অধ্যয়ন ভোজন উচিত নহে কার।
না করিবে মৈথুন সে পর্য্যটন আর,
শাস্ত্র-মাঝে এই বিধি কহিলাম সার। ৭২।
পূর্ব্বাহ্নে, দেবতা, মধ্যে মানব অর্চ্চন,
অপরাহ্নে পিতৃগণে করিবে পূজন। ৭৩।
শিরঃস্নান করি পরে সংযত হইয়া,
পিতৃকার্য্য দেবকার্য্য করিবে বসিয়া।
পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে বসিয়া কখন,
শ্মশ্রুকর্ম্ম করিবে সতত বাছাধন। ৭৪।
সৎকুলজা কন্যা যদি অঙ্গহীনা হয়
রোগিণী, বিকৃতা যদি ত্যজিবে নিশ্চয়।
পিঙ্গলবরণা কিম্বা বাচালা যে বালা,
তারে না ত্যজিলে ভাগ্যে ঘটে বহু জ্বালা।
সর্ব্বদোষ বর্ত্তমান দেহ মাঝে যা'র,
গ্রহণ উচিত নহে কভু সে কন্যার। ৭৫।
নিজ শ্রেয়ঃ কামনা করেন যেই জন
তাঁ'র যোগ্যা যেই বালা করহ শ্রবণ,—
অবিকল অঙ্গ আর সৌম্য নাম যা'র,
সর্ব্ব সুলক্ষণা বালা গ্রাহ্যা জেনো সার। ৭৬।
সপ্তমী পঞ্চমী যেবা পিতার মাতার
হেন কন্যা বিবাহের যোগ্যা জেনো সার।
পত্নীকে করিবে রক্ষা পরম যতনে
কভু নাহি রাখিবেন ঈর্ষাভাব মনে।
দিবসে শয়ন, নিদ্রা, মৈথুন সে আর
সকলেরই ত্যজ্য ইহা, মনে জেনো সার। ৭৭।

পরোপতাপকং কর্ম্ম জন্তুপীড়াঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
উদক্যা সর্ব্ববর্ণানাং বর্জ্জ্যা রাত্রিচতুষ্টয়ম্ ॥ ৭৮ ॥
স্ত্রীজন্মপরিহারার্থং পঞ্চমীমপি বর্জ্জয়েৎ।
ততঃ ষষ্ঠ্যাং ব্রজেদ্রাত্র্যাং শ্রেষ্ঠা যুগ্মাসু পুত্রক ॥ ৭৯ ॥
পর্ব্বাণি বর্জয়েন্নিত্যমৃতুকালেঽপি যোষিতঃ।
তস্মান্নিত্যং নরো গচ্ছেচ্ছেষযুগ্মাসু পুত্রক ॥ ৮০ ॥
যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু।
তস্মাদ্‌যুগ্মাসু পুত্রার্থী সংবিশেত সদা নরঃ।
বিধর্ম্মিণোঽহ্নিপূর্ব্বাখ্যে সন্ধ্যাকালে চ ষণ্ডকাঃ ॥ ৮১ ॥
ক্ষুরকর্ম্মণি বান্তে চ স্ত্রীসম্ভোগে চ পুত্রক।
স্নায়ীত চেলবান প্রাজ্ঞঃ কটভূমিমুপেত্য চ ॥ ৮২ ॥
দেব-বেদ-দ্বিজাতীনাং সাধুসভ্যমহাত্মনাম্।
গুরোঃ পতিব্রতানাঞ্চ তথা যজ্ঞতপস্বিনাম্ ॥ ৮৩ ॥
পরীবাদং ন কুর্ব্বীত পরিহাসঞ্চ পুত্রক।
কুর্ব্বতামবিনীতানাং ন শ্রোতব্যং কথঞ্চন ॥ ৮৪ ॥

যেই কার্য্যে অপরের হইবে পীড়ন,
হেন কার্য্য সযতনে করিবে বর্জ্জন।
যেই কার্য্য করিলে জীবের পীড়া হয়
সেই কার্য্য হ'তে দূরে থাকিবে নিশ্চয়।
রজঃস্বলা নারী সঙ্গ করিবে বর্জ্জন
চারি রাত্রি দূরেতে রাখিবে সর্ব্বজন। ৭৮।
পঞ্চম নিশায় হ'লে গর্ভের উদয়
কন্যা জন্মে তাই তাহা ত্যাগ-যোগ্য হয়।
ষষ্ঠ আদি যুগ্ম রাত্রে করিবে গমন,
শ্রেষ্ঠ তাহা পুত্র হেতু শুন বাছাধন। ৭৯।
হেন কালে যদি কভু পর্ব্বকাল হয়
তাহাও জানিবে ত্যজ্য শাস্ত্রে হেন কয়;
যোগ্য যেই যুগ্মদিন, তাহে শুদ্ধচিতে
পুত্রার্থী মিলিত হ'বে পত্নির সহিতে। ৮০।

যুগ্ম রাত্রে পুত্র হয় অযুগ্মে নন্দিনী,
যুগ্মে যুক্ত হইবেন পুত্রকামী যিনি।
পূর্ব্বাহ্ণ-সঙ্গমে যে বিধর্ম্মী পুত্র হয়,
সায়ংকালে নপুংসক জানিবে নিশ্চয়। ৮১।
ক্ষৌরকর্ম্ম অবসানে, বমনান্তে আর
নারী-সঙ্গ-অন্তে, করি' শ্মশানে সৎকার,
পরিধেয় বস্ত্র সহ করিবেক স্নান
নহিলে না হ'বে শুদ্ধ, শুন মতিমান। ৮২।
দেব, বেদ, ব্রাহ্মণ, যে সাধুসত্বাধার,
মহাত্মা, শ্রীগুরু আদি গুরুজন আর,
পতিব্রতা, যজ্ঞশীল, তপঃপরায়ণ,
তা'সবার পরিবাদ না কর ঘোষণ;
পরিহাস না করিবে কভু তা'সবারে;
নিরন্তর পূজিবে যে হৃদয় মাঝারে।
হেন কর্ম্ম করে যদি অবিনীত জন
থাকি তথা সে কথা না করিবে শ্রবণ। ৮৩-৮৪।

দেবপিত্র্যাতিথেয়াশ্চ ক্রিয়াঃ কুর্ব্বীত বৈ বুধঃ ।
স্বাধ্যায়ঞ্চাপি কুর্ব্বীত যথাশক্ত্যা হ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ৮৫ ॥
নোৎকৃষ্টশয্যাসনয়োর্নাপকৃষ্টস্য চারুহেৎ ।
ন চামঙ্গল্যবেশঃ স্যান্ন চামঙ্গল্যবাগ্‌ভবেৎ ॥ ৮৬ ॥
ধবলাম্বরসংবীতঃ সিতপুষ্পবিভূষিতঃ ।
নোদ্ধতোন্মত্তমূঢ়শ্চ নাবিনীতৈশ্চ পণ্ডিতঃ ॥ ৮৭ ॥
গচ্ছেন্মৈত্রীং ন চাশীলৈর্ন চ চৌর্য্যাদিদূষিতৈঃ ।
ন চাতিব্যয়শীলৈশ্চ ন লুব্ধৈর্নাপি বৈরিভিঃ ॥ ৮৮ ॥
নানৃতৈকেস্তথা ক্রূরৈঃ সহাসীত কদাচন ।
ন বন্ধকীভির্ন ন্যূনৈর্বন্ধকীপতিভিস্তথা ॥ ৮৯ ॥
সার্দ্ধং ন বলিভিঃ কুর্য্যান্ন চ ন্যূনৈর্ন নিন্দিতৈঃ ।
ন সর্ব্বশঙ্কিভিনিত্যং ন চ দৈবপরৈর্নরৈঃ ॥ ৯০ ॥
কুর্ব্বীত সাধুভির্মৈত্রীং সদাচারাবলম্বিভিঃ ।
প্রাজ্ঞৈরপিশুনৈঃ শক্তৈঃ কর্ম্মণ্যুদ্যোগভাগিভিঃ ।
দেববিদ্যারতস্নাতৈঃ সহাসীত সদা বুধঃ ॥ ৯১ ॥

দেবগণ, পিতৃগণ, অতিথি সে আর
এঁদের পূজন কার্য্য উচিত সবার ।
যথা শক্তি স্বাধ্যায় করিবে আচরণ,
সবারি কর্ত্তব্য, এই শুন বাছাধন । ৮৫ ।
উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট যেবা জানিবে তোমার,
না বসিবে শয্যা বা আসনে কভু তা'র ।
অমঙ্গল্য বেশ কভু না কর ধারণ
অমঙ্গল্য বাক্য যত ত্যজ' বাছাধন । ৮৬ ।
শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিবে সতত
ধারণ করিবে অঙ্গে শুভ্রপুষ্প যত :
উদ্ধত, উন্মত্ত, মূঢ়, অবিনীত জন,
এ সবার সনে না রাখিবে আলাপন । ৮৭ ।
দুঃশীল, চৌর্য্যাদি দোষে দূষিত যে জন,
অতিব্যয়শালী সনে ত্যজ আলাপন ।
অতিশয় লোভী যেবা, কিম্বা শত্রুসনে
মিলন, অযোগ্য, ইহা রেখো সদা মনে । ৮৮ ।
মিথ্যাবাদী জন কিম্বা ক্রূরকর্ম্মা আর
এ সবার সনে না রাখিবে ব্যবহার ।
কভু না করিবে সঙ্গ বন্ধকীর সনে,
বন্ধকী পতির সঙ্গ ত্যজিবে যতনে । ৮৯ ।
নিজ হ'তে বলবান সঙ্গ না করিবে
দুর্ব্বলের নিন্দিতের সঙ্গ যে ত্যজিবে ।
সর্ব্বদা শঙ্কিত জন সঙ্গেতে কখন
সখ্যভাব না রাখিও শুন বাছাধন ।
দৈবের দোহাই দিয়া আলস্যে যে রত,
তা'র সঙ্গ সযতনে ত্যজিবে সতত । ৯০ ।
সদাচারী সাধুসনে মিত্রতা করিবে,
অপিশুন প্রজ্ঞাবানে মিত্র করি' ল'বে
শক্তিমান যাঁ'রা আর উদ্যোগী কর্ম্মেতে
মিত্রতা করিবে সদা তাঁ'দের সঙ্গেতে ।
বেদবিদ্যারত আর স্নাতক ব্রাহ্মণ
তাহাদের সঙ্গ কর করিয়া যতন । ৯১ ।

সুহৃদ্দীক্ষিত-ভূপাল-স্নাতক-শ্বশুরৈঃ সহ।
ঋত্বিগাদীন্ ষড়র্ঘার্হানর্চ্চয়েচ্চ গৃহাগতান্ ॥ ৯২ ॥
যথাবিভবতঃ পুত্র দ্বিজান্ সংবৎসরোষিতান্।
অর্চ্চয়েন্মধুপর্কেণ যথাকালমতন্দ্রিতঃ ॥ ৯৩ ॥
তিষ্ঠেচ্চ শাসনে তেষাং শ্রেয়স্কামো দ্বিজোত্তমঃ।
ন চ তান্ বিবদেদ্ধীমানাক্রুষ্টশ্চাপি তৈঃ সদা ॥ ৯৪
সম্যগ্‌গৃহার্চ্চনং কৃত্বা যথাস্থানমনুক্রমাৎ।
সম্পূজয়েৎ ততো বহ্নিং দদ্যাচ্চৈবাহুতীঃ ক্রমাৎ ॥ ৯৫
প্রথমাং ব্রহ্মণে দদ্যাৎ প্রজানাং পতয়ে ততঃ।
তৃতীয়াঞ্চৈব গুহ্যেভ্যঃ কশ্যপায় তথাপরাম্ ॥ ৯৬ ॥
ততোঽনুমতয়ে দত্ত্বা দদ্যাদ্‌গৃহবলিং ততঃ।
পূর্ব্বাখ্যাতং ময়া যত্তে নিত্যকর্ম্মক্রিয়াবিধৌ ॥ ৯৭ ।
বৈশ্বদেবং ততঃ কুর্য্যাদ্বলয়স্তত্র মে শৃণু।
যথাস্থানবিভাগস্তু দেবানুদ্দিশ্য বৈ পৃথক্ ॥ ৯৮ ॥

সুহৃৎ, দীক্ষিতজন, ভূমিপাল আর
স্নাতক, ঋত্বিক, যেবা শ্বশুর তোমার,
এই ছয় অর্ঘোচিত জানিবে নিশ্চয়
অর্ঘ দিয়ে পূজ, গৃহে পা'বে যে সময়। ৯২।
সংবৎসরোষিত কোন পাইলে ব্রাহ্মণ,
যথাশক্তি পূজ তাঁ'রে করিয়া যতন।
যথাকালে মধুপর্ক প্রদান করিয়া
পূজিবে যতনে সদা সংযত হইয়া। ৯৩।
শ্রেয়োলাভ বাসনা থাকিলে নিজ মনে
সর্ব্বদা থাকিবে, পুত্র এঁদের শাসনে।
যদি তাঁ'রা আক্রোশ করেন প্রদর্শন,
বিবাদ না করে তাহে বুদ্ধিমান জন। ৯৪।
যথাবিধি গৃহপূজা করি' সমাপন
যথাস্থানে করি' পরে অগ্নির স্থাপন,
যথারীতি পূজা আদি করিয়া তাঁহার
আহুতি করিবে দান এই বিধি সার। ৯৫।
প্রথম আহুতি দিবে ব্রহ্মার উদ্দেশে
প্রজাপতি উদ্দেশেতে দিয়া অবশেষে
গুহ্যগণ তরে দিবে তৃতীয় আহুতি,
কশ্যপে চতুর্থ দিবে হ'য়ে স্থিরমতি। ৯৬।
অনুমতি উদ্দেশে আহুতি তার পর,
গৃহবলি দিবে পরে সংযত অন্তর।
নিত্য কর্ম্ম ক্রিয়া বিধি বর্ণন সময়
গৃহবলি বিধি বলিয়াছি সমুদয়। ৯৭।
বৈশ্বদেব বলি পরে করিবে অর্পণ,
তাহার বিধান বলি শুন বাছাধন—
যথাস্থান বিভাগ করিয়া দেবগণে
পৃথক পৃথক দিবে অতীব যতনে। ৯৮।

পর্জ্জন্যাপোধরিত্রীণাং দদ্যাচ্চ মানকত্রয়ম্।
ততোধাতুবিধাতুশ্চ দদ্যাদ্দ্বারে গৃহস্য তু।
বায়বে চ প্রতিদিশং দিগ্‌ভ্যঃ প্রাচ্যাদিতঃ ক্রমাৎ ॥ ৯৯ ॥
ব্রহ্মণে চান্তরীক্ষায় সূর্য্যায় চ যথাক্রমম্।
বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো বিশ্বভূতেভ্য এব চ ॥ ১০০ ॥
উষসে ভূতপতয়ে দদ্যাচ্চোত্তরতস্ততঃ।
স্বধা নম ইতীত্যুক্ত্বা পিতৃভ্যশ্চাপি দক্ষিণে ॥ ১০১ ॥
কৃত্বাপসব্যং বায়ব্যাং যক্ষ্মৈতত্তেতি * ভাজনাৎ।
অন্নাবশেষমিচ্ছন্ বৈ তোয়ং দদ্যাদ্যথাবিধি ॥ ১০২ ॥
ততোঽন্নাগ্রং সমুদ্ধৃত্য হন্তকারোপকল্পনম্।
যথাবিধি যথান্যায়ং ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ ॥ ১০৩ ॥
কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণি তীর্থেন স্বেন স্বেন যথাবিধি।
দেবাদীনাং তথা কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মেণাচমনক্রিয়াম্ ॥ ১০৪ ॥
অঙ্গুষ্ঠোত্তরতো রেখা পাণের্যা দক্ষিণস্য তু।
এতদ্‌ব্রাহ্মমিতি খ্যাতং তীর্থমাচমনায় বৈ ॥ ১০৫ ॥

পরেতে পর্জ্জন্য, আপ, ধরিত্রী উদ্দেশে
বলিত্রয় অর্পণ করিয়া অবশেষে
ধাতা আর বিধাতার উদ্দেশ করিয়া,
গৃহদ্বারে দিবে বলি সংযত হইয়া ;
বায়ুর উদ্দেশে পরে করিয়া যতন
প্রাচ্যাদি দিকেতে বলি করিবে অর্পণ। ৯৯
ব্রহ্মা, অন্তরীক্ষ, সূর্য্য, বিশ্বেদেবগণ
বিশ্বভূত, উষা, ভূতপতির কারণ,
উত্তর হইতে বলি দিবে সযতনে
দক্ষিণেতে "স্বধা নমঃ" বলি পিতৃগণে। ১০০-১।
ভাজন হইতে অন্ন অবশেষে লয়ে
বায়ুকোণে অপসব্যে যত্নপর হয়ে
জলাধার হতে জল করিয়া গ্রহণ
"যক্ষ্মৈতত্তে" আদি মন্ত্রে করিবে অর্পণ।১০২।
অন্ন অগ্রভাগ পরে লইয়া যতনে
হন্তকাররূপে দান করিবে ব্রাহ্মণে। ১০৩।
কর্ম্ম সব স্ব স্ব তীর্থে করিবে সাধন,
কর্ম্মের যে বিধি তাহা না কর লঙ্ঘন।
ব্রাহ্মতীর্থে আচমন দেবাদির তরে,
অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা জানিহ অন্তরে। ১০৪।
দক্ষিণ পাণির অঙ্গুষ্ঠের উত্তরেতে
যেই রেখা বিদ্যমান ব্রাহ্মতীর্থ তা'তে।
সেই ব্রাহ্ম তীর্থেতে করিবে আচমন,
আচমনে এই বিধি শুন বাছাধন। ১০৫।

* তত্ত্ব স্বভাজনাদিতি বা পাঠঃ

তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োরন্তঃ পৈত্র্যং তীর্থমুদাহৃতম্।
পিতৃণাং তেন তোয়াদি দদ্যান্নান্দীমুখাদৃতে॥ ১০৬
অঙ্গুল্যগ্রে তথা দৈবং তেন দেবক্রিয়াবিধিঃ।
তীর্থং কনিষ্ঠিকামূলে কায়ং তেন প্রজাপতেঃ॥ ১০৭॥
এবমেভিঃ সদা তীর্থৈর্দেবানাং পিতৃভিঃ সহ।
সদা কার্য্যাণি কুর্ব্বীত নান্যতীর্থেন কর্হিচিৎ॥ ১০৮॥
ব্রাহ্মেণাচমনং শস্তং পিত্র্যং পৈত্র্যেণ সর্ব্বদা।
দেবতীর্থেন দেবানাং প্রাজাপত্যং নিজেন চ॥ ১০৯॥
নান্দীমুখানাং কুর্ব্বীত প্রাজ্ঞঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াম্।
প্রজাপত্যেন তীর্থেন যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রজাপতেঃ॥ ১১০
যুগপজ্জলমগ্নিঞ্চ বিভৃয়ান্ন বিচক্ষণঃ।
গুরুদেবান্ প্রতি তথা ন চ পাদৌ প্রসারয়েৎ॥ ১১১
নাচক্ষীত ধয়ন্তীং গাং জলং নাঞ্জলিনা পিবেৎ।
শৌচকালেষু সর্ব্বেষু গুরুষল্পেষু বা পুনঃ।
ন বিলম্বেত শৌচার্থং ন মুখেনানলং ধমেৎ॥ ১১২॥

তর্জ্জনী অঙ্গুষ্ঠ মাঝে যেই স্থল হয়
পিতৃতীর্থ বলি তারে শাস্ত্রমাঝে কয়,
পিতৃগণোদ্দেশে জল করিয়া গ্রহণ
এই তীর্থপথে তাহা করিবে অর্পণ।
নান্দীমুখ পিতৃগণ বিনা যত আর
সর্ব্ব পিতৃগণ পক্ষে এই পথ সার। ১০৬।
অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দৈবতীর্থ হয়,
দৈবকার্য্য তরে তাহা প্রয়োজ্য নিশ্চয়।
কনিষ্ঠার-মূল-তীর্থ "কায়" নাম তা'র
প্রজাপতি তরে হয় প্রয়োগ তাহার। ১০৭।
দেব-পিতৃ-কার্য্য কার্য্য যথা তীর্থে হয়
তীর্থ ব্যতিক্রম কভু যুক্তিযুক্ত নয়। ১০৮।
ব্রাহ্মতীর্থে আচমন করিবে সর্ব্বথা,
পিতৃতীর্থে পিতৃকার্য্য, না কর অন্যথা।
দেবতীর্থ দৈবকার্য্যে করিবে নিযোগ।
কায়তীর্থ প্রাজাপত্য কার্য্যে কর যোগ।১০৯।

নান্দীমুখগণের যে পিণ্ডোদক দান
কায়তীর্থে তাহাও করিবে মতিমান। ১১০।
এক কালে জল অগ্নি, বিচক্ষণ জন
ভ্রমেও কখন নাহি করিবে গ্রহণ।
আছেন যে দিকে, গুরু আর দেবগণ,
সেই দিকে নাহি কর পাদ প্রসারণ। ১১১।
যেই গাভী করিতেছে বৎসে স্তনদান
তাহারে তখন নাহি করহ আহ্বান।
অঞ্জলি বন্ধনে জল করিয়া গ্রহণ
জলপান বুদ্ধিমান না করে কখন। ১১১।
গুরু হৌক স্বল্প হৌক শৌচকার্য্য তরে
ব্যস্ত হয়ে সেই কার্য্য করিবে সত্বরে।—
ফুৎকার যোগেতে অগ্নি কভু না জ্বালিবে,
অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা, নিশ্চয় জানিবে। ১১২।

তত্র পুত্র ন বস্তব্যং যত্র নাস্তি চতুষ্টয়ম্ ।
ঋণপ্রদাতা বৈদ্যশ্চ শ্রোত্রিয়ঃ সজলা নদী ॥ ১১৩ ॥
জিতামিত্রো নৃপো যত্র বলবান্ ধর্ম্মতৎপরঃ ।
তত্র নিত্যং বসেৎ প্রাজ্ঞঃ কুতঃ কুনৃপতৌ সুখম্ ॥ ১১৪
যত্রাপ্রধৃষ্যো নৃপতির্যত্র শস্যবতী মহী ।
পৌরাঃ সুসংযতা যত্র সততং ন্যায়বর্ত্তিনঃ ।
যত্রামৎসরিণো লোকাস্তত্র বাস সুখোদয়ঃ ॥ ১১৫ ॥
যস্মিন্ কৃষীবলা রাষ্ট্রে প্রায়শো নাতিভোগিনঃ ।
যত্রৌষধান্যশেষাণি বসেৎ তত্র বিচক্ষণঃ ॥ ১১৬ ॥
তত্র পুত্র ন বস্তব্যং যত্রৈতৎ ত্রিতয়ং সদা ।
জিগীষুঃ পূর্ব্ববৈরশ্চ জনশ্চ সততোৎসবঃ ॥ ১১৭ ॥
বসেন্নিত্যং সুশীলেষু সহবাসিষু পণ্ডিতঃ ।
ইত্যেতৎ কথিতং পুত্র ময়া তে হিতকাম্যয়া ॥ ১১৮ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়ে মহাপুরাণে ঋতধ্বজচরিতে মদালসোপাখ্যানে
অলর্কানুশাসনে সদাচারো নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ঋণদাতা, বৈদ্য আর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ
জলপূর্ণা নদী যথা নাহি সুশোভন,
এই চারিহীন দেশে না করিবে বাস
সংসারীর হেন দেশে বিফল আয়াস । ১১৩ ।
বলবান, ধর্ম্মপর, শত্রুহীন রাজা
যেই দেশে, সেই দেশে সুখী সব প্রজা ।
প্রাজ্ঞজন সেই দেশে করিবেন বাস,
কুনৃপের রাজ্যে বাসে ঘটে সর্ব্বনাশ । ১১৪ ।
দুর্দ্ধর্ষ রাজার রাজা, মহী শস্যবতী,
পৌরজন সুসংযত ন্যায়াশ্রিত মতি,
যে দেশের লোক সব মৎসর বিহীন
সে দেশে থাকিলে সুখে রবে চিরদিন । ১১৬ ।

যে দেশে কৃষকগণ ভোগবাঞ্ছাহীন
অশেষ ঔষধ যথা জন্মে চিরদিন,
সেই সে সুযোগ্য দেশ—বিচক্ষণ জন
হেন দেশ ত্যাগ না করিবে কদাচন । ১১৭ ।
জিগীষু যথায়, যথা পূর্ব্ববৈর জন,
উৎসবে উন্মত্ত সদা যথা নরগণ
এ তিন যথায় তথা বুদ্ধিমান জন
না করিবে বাস কভু শুন বাছাধন । ১১৭ ।
সুশীল জনের সনে সদা প্রাজ্ঞ জন
করিবেন বাস এই শাস্ত্রের বচন ।
শুন পুত্র তব হিত কামনা করিয়া
সদাচার তত্ত্ব যে বলিনু বিবরিয়া । ১১৮ ।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে ঋতধ্বজচরিতান্তর্গত মদালসা উপাখ্যানে
অলর্কের প্রতি সদাচারানুশাসন নামক
চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়।

মদালসোবাচ।

অতঃ পরং শৃণুষ ত্বং বর্জ্জ্যাবর্জ্জ্যপ্রতিক্রিয়াম্।
ভোজ্যমন্নং পর্য্যুষিতং স্নেহাক্তং চিরসম্ভৃতম্ ॥ ১ ॥
অস্নেহাশ্চাপি গোধূম-যব গোরসবিক্রিয়াঃ।
শশকঃ কচ্ছপো গোধা শ্বাবিৎ খড়্গোঽথ পুত্রক।
ভক্ষ্যা হ্যেতে তথা বর্জ্জ্যৌ গ্রামশূকর-কুক্কুটৌ ॥ ২ ॥
পিতৃদেবাদিশেষশ্চ শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকাম্যয়া।
প্রোক্ষিতঞ্চৌষধার্থঞ্চ খাদন্ মাংসং ন দুষ্যতি ॥ ৩ ॥
শঙ্খাশ্মস্বর্ণরূপ্যাণাং রজ্জূনামথ বাসসাম্।
শাকমূলফলানাঞ্চ তথা বিদলচর্ম্মণাম্ ॥ ৪ ॥
মণি-বজ্র-প্রবালানাং তথা মুক্তাফলস্য চ।
গাত্রাণাঞ্চ মনুষ্যাণামম্বুনা শৌচমিষ্যতে ॥ ৫ ॥

বলিলেন মদালসা "শুন বাছাধন,
বর্জ্জ্যাবর্জ্জ্য প্রতিক্রিয়া বলিব এখন;
পর্য্যুষিত অন্ন আর স্নেহ পুরাতন
অস্নেহ গোধূম যব না কর ভোজন।
গোরস-বিকৃতি জাত দ্রব্য সমুদয়
নিশ্চয় জানিও বৎস কভু ভোজ্য নয়।
শশক, কচ্ছপ, গোধা সজারু গণ্ডার,
ইহাদের মাংস ভোজ্য জেনো বৎস সার।
গ্রাম্য যে শূকর আর কুক্কুট পালিত
ইহাদের মাংস ত্যাজ্য নাহি তাহে হিত। ১-২
যেই মাংস নিবেদিত পিতৃ-দেব-গণে
তা'র অবশেষ যোগ্য উচিত ভোজনে,
ব্রাহ্মণগণের তরে শুদ্ধ মাংস সেই,
দিবে সদা তাঁ'দের তাহাতে দোষ নেই।
যজ্ঞাদিতে প্রোক্ষিত যে মাংস যথাবিধি,
কিম্বা ঔষধির তরে—নহে ত অবিধি।
হেন স্থলে মাংস কেহ করিলে ভোজন
নিশ্চয় তাহাতে দোষ নহে কদাচন। ৩।
শঙ্খ, বা পাষাণ, স্বর্ণ, রৌপ্য, রজ্জু, আর,
বস্ত্র, শাক, মূল, ফল, বিদল-প্রকার,
চর্ম্ম, মণি, বজ্রগণ আর সে প্রবাল,
মুকুতা, মনুষ্য দেহ, হ'লে শুদ্ধি কাল,
কেবল বিমল জলে ধৌত করি ল'বে,
নিশ্চয় জানিও পুত্র তাহে শুদ্ধ হ'বে। ৪ ৫

শ্রী শ্রী দশভুজা

'তুই যদি একা ঐ ভাবে চরিত্র গঠন কত্তে পারিস,
তাহলে তোর দেখাদেখি হাজার লোক
ঐরূপ কত্তে শিখ্‌বে।"

বিবেকানন্দ

৪র্থ খণ্ড | আশ্বিন, ১৩২০ | ১২শ সংখ্যা
৪র্থ বর্ষ

আলোচনা

১। ইংলিশম্যানের কৈফিয়ৎ

কবিবর রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি" পাশ্চাত্য সাহিত্য-জগতে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে। তথাকার বহু সাহিত্যিক বহু পত্রিকায় রবিবাবুর প্রশংসা করিতেছেন। সম্প্রতি আমাদের ইংলিশম্যান 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি' পত্রিকায় লিখিত মিষ্টার আর্নেষ্ট রীস্ সাহেবের প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া রবিবাবুসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন।

যে কবি বিলাতে এত সমাদৃত হইলেন, সেই কবিকে ইংলিশম্যান-প্রমুখ এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলি কেন এতদিন চিনিতে পারেন নাই, তৎসম্বন্ধে ইংলিশম্যান এক কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। কৈফিয়ৎটার মর্ম্ম এই—

"রবীন্দ্রনাথ এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় তাঁহার গুণের পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গভাষা বাঙ্গালার বাহিরে অপরিচিত এবং সংস্কৃতের সংমিশ্রণে ও অন্যান্য নানাবিধ

কারণে ইহা এত জটিল যে বিদেশীরা বহুকাল এদেশে অবস্থিতি করিয়াও ইহা সম্যক অধিকার করিতে পারেন না। এ কথা ঠিক—শিক্ষিত বঙ্গবাসী বহুদিন হইতেই রবিবাবুকে দেশের প্রধানতম কবি বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কেহই অনুবাদের দ্বারা তাঁহার কাব্যকে বিদেশীর নিকটে পরিচিত করিবার ভার গ্রহণ করেন নাই। সেই জন্য তাঁহার নাম ও যশ যখনি শোনা গিয়াছে, তখনি বিদেশীরা সেটাকে প্রাচ্যের স্বভাবগত অত্যুক্তিবাদ মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন।”

আমরা কিন্তু এ কৈফিয়তে তত সন্তুষ্ট হইতে পারি না। আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, তাহার পরিপূরণের উপায়ও উদ্ভাবিত হইয়া থাকে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। রবিবাবুকে জানিবার ইচ্ছা থাকিলে বিদেশীরা রবিবাবুর সঙ্গে, শিক্ষিত বঙ্গবাসীর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া অনেক তথ্য অবগত হইতে পারিতেন। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, বিদেশীরা সাগরের ঐ পারেই তাঁহাদের উদারতা রাখিয়া এদেশে আগমন করেন। তাই এদেশে আসিয়া এদেশবাসীর গুণ তাঁহাদের চোখে পড়ে না। বিশেষত ভাষার উৎকট বিভিন্নতা যেখানে নাই—যেখানে এদেশবাসী বিদেশীর ভাষাতেই নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন, সেখানেও ত ভারতপ্রবাসী বিদেশিগণ ভারতবাসীদিগকে বড় প্রশংসার চোখে দেখেন না। অথচ সেই সব লোকই বিদেশে গেলে বিশেষ আদৃত, বিশেষ সম্মানিত হইয়া থাকেন।

ফল কথা, বিদেশীরা এদেশে আসিয়া যদি এদেশবাসীর মহত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, তবে বহু স্থলেই প্রশংসার্হ অনেক জিনিষ দেখিতে পান। তাহা করেন না বলিয়াই যত গোলযোগ ঘটে।

রবিবাবুর “স্বদেশী” কবিতাগুলি সম্বন্ধেও ইংলিশম্যান কিছু আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বঙ্গদেশের তথাকথিত নবযুগে যখন ঐ কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়, তখন রবিবাবুর প্রতিষ্ঠিত বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে বহু ভক্তের সমাগম হইত। তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার কবিতায় রাজদ্রোহের গন্ধ আছে মনে করেন। সেই জন্য উক্ত বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারীর পুত্রগণকে ছাত্ররূপে পাঠাইতে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়। কিন্তু ইংলিশম্যান মনে করেন, বাস্তবিক পক্ষে রবিবাবুর ঐ কবিতাগুলির মধ্যে রাজদ্রোহকর কোন কিছুই নাই—সেগুলি উচ্চ স্বদেশপ্রেমের চরমদৃষ্টান্ত। দুষ্ট ব্যক্তিরা সেইগুলিকে খারাপভাবে ব্যবহার করিতেছিল মাত্র!

আমরা সুখী হইলাম, আজ বিলাতের প্রশংসায় ইংলিশম্যানের মত ফিরিয়াছে। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি, রবিবাবুর ন্যায় অন্যান্য বহু দেশভক্তও ঐরূপ নির্দ্দোষ বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যদি বিদেশীরা নিজেদের সঙ্কীর্ণতা একটু পরিহার করিয়া তাঁহাদের মহত্ত্ব বুঝিতে যত্নবান হন।

২। বর্ত্তমান সমস্যা

আমাদের সমাজ যেন অবনতির চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিল—তাই সমাজের

জগৎ-প্রসিদ্ধ কবি

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর ?
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর ?
কিসের বা সুখ, ক'দিনের প্রাণ ?
ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম-গান,
অমর মরণ রক্ত-চরণ
নাচিছে সগৌরবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।"

('মানসী' হইতে সংগৃহীত)

India Press, Calcutta

যে অভাব বহু পূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বরে অব্যক্তভাবে প্রকাশ হইতেছিল, তাহাই যেন অতি প্রবল ভাবে অতি স্পষ্টভাবে—স্বদেশী আন্দোলনে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনে সমাজ যে একটা প্রকাণ্ড নাড়া চাড়া পাইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফলে এখন কি বৃদ্ধ, কি প্রৌঢ়, কি যুবা, কি বালক সকলেই দেশমুখী হইয়াছেন। এখন চিন্তাশীলের চিন্তা অন্তর্মুখীন, সমাজসংস্কারকের উদ্যম প্রাচীনপ্রথাগত, গায়ক পুরাকীর্ত্তি ও পুরাকাহিনীতে ব্যস্ত, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ লুপ্তোদ্ধারে যত্নশীল, ঐতিহাসিক কীট-দষ্ট-পুঁথির অনুসন্ধানে তৎপর, ভাবুক সমাজের ভাবনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন।

যাহা এতদিন অতি অশ্রদ্ধার, অতি ঘৃণার, অতি অনিচ্ছার, অতি অসম্মানের ছিল, তাহাই যেন আজ অতি শ্রদ্ধার, অতি আদরের, অতি সম্মানের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতদিনে জানি না ভগবানের কোন্ মন্ত্রবলে সমাজের মোহজাল ভাঙ্গিতে চলিয়াছে। এতদিনে যেন অসাড় দেশে একটা সাড়া দেখা গিয়াছে। এখন যেন সকলেই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, নামের খাতিরেই হউক, আর আন্তরিকতায়ই হউক, সমাজকে সকলের কর্ম্মক্ষেত্র করিয়াছেন। আজ তাই কি ধর্ম্মে, কি কর্ম্মে, কি আচারে, কি ব্যবহারে, কি চিন্তায়, কি গল্পে সকল দিকেই সমাজের কথা।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, যাত্রা, থিয়েটার, বক্তৃতা, সংবাদপত্র সকলেই আজ দেশের কথায় পূর্ণ। স্বদেশী আন্দোলনের যত সুফল কুফল হউক সমাজের মতি-গতি যে ইহাই মুখ্য লাভ।

যে বীজ বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রঙ্গলাল, বঙ্কিম, হেম, মাইকেল, নবীন প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ উপ্ত করিয়া গিয়াছেন, আজ তাহা অঙ্কুরিত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু আমাদের সম্মুখে কতকগুলি সমস্যা আসিয়া উপস্থিত। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমরা সেগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। এবার আমরা আমাদের কয়েকটি অভাবের উল্লেখ করিতেছি।

(ক) এখন সকলেই নিজ নিজ ব্যবসার পরিবর্ত্তে একমাত্র লেখনী-ব্যবসা ধরিতে চাহেন, ইহাই যত অনিষ্টের ও অনর্থের মূল। চাকরীর নেশা যেন এখনও ছুটিয়াও ছুটিতেছে না।

(খ) আজকালকার রেলষ্টীমারের গতায়াত সত্ত্বেও স্বধর্ম্মের আচারব্যবহারানুযায়ী চলা যায় কি না, ইহা ভাবিবার বিষয়। আহারের সহিত স্বাস্থ্যের যে কি অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা সকলেই অবগত আছেন। আহারই স্বাস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্যের মূলে। স্বাস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্যই স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ করে।

(গ) একদিকে যেমন আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ হইতেছে, অন্যদিকে সেইরূপ কোন্ ভিত্তিমূলে আশা বা আকাঙ্ক্ষা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন। সমাজে উপযুক্ত লোকের অভাব অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। একের অভাব অন্যে পূরণ করিতে পারে এরূপ লোক বিরল। একের প্রবর্ত্তিত

কার্য্য আবার অবর্ত্তমানে লুপ্ত হইতে থাকে ইহা বড়ই দুঃখের। সমাজে আজকাল সকলেই নূতনের পক্ষপাতী—পুরাতনগুলিও যে রক্ষা করিতে হইবে ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

(ঘ) সমাজের এক স্তরে যেমন চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের সুচিন্তিত পন্থা স্থিরীকরণের অভাব, অন্যদিকে সেইরূপ প্রচারক, সেবকের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। সমাজে লোকশিক্ষার অভাবের সহিত লোকশিক্ষকের অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি হইতেছে। এই লোকশিক্ষকগণই বর্ত্তমানের কর্ম্মী, ভবিষ্যতের নেতা—তাঁহাদের কার্য্য একদিকে যেমন পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতাসাপেক্ষ, অপরদিকে সেইরূপে নীতি ও চরিত্র-বলের জন্যও দৃষ্টান্তস্বরূপ। সমাজে এইরূপে দায়িত্বপূর্ণ লোকশিক্ষকের অভাব যত শীঘ্র পূরণ হইবে, সমাজ তত শীঘ্র উন্নত হইবে।

(ঙ) সমাজে এখন শিক্ষাদীক্ষায় নানা মুনির নানামত প্রচার হইতেছে, কোন্‌টি সমাজোপযোগী বা কোন্‌টি ভবিষ্যতে স্থায়িত্ব লাভে সমর্থ, তদ্বিষয়ে যতদূর সম্ভব একটা খাঁটি মত প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমান শিক্ষায় যে নানা অভাব আছে তাহা সকলেই অনুভব করিয়াছেন ও করিতেছেন; অপর দিকে নানা মুনির নানা মত, সমাজের প্রকৃত চালকও নেই, সুতরাং এরূপ উভয় সঙ্কটে কি কর্ত্তব্য ইহা সমস্যার বিষয় নয় কি?

অধিক কালের ঘুমঘোরের পর নূতন আলোকে সমাজ এখন সবে জাগ্রত, সুতরাং আলোকের উন্মাদিনী শক্তিতে সকলেই নূতন নূতন পথে অগ্রসর; আমরা ইহার পক্ষপাতী, তবে যিনি যে পথেই অগ্রসর হউন, সকলেরই যেন গন্তব্য ঠিক থাকে, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

* *

৩। স্বদেশী-সমালোচনা

বগুড়া হইতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, বি, এল্‌, মহাশয় লিখিয়াছেন:—

"দেশে স্বদেশী প্রচেষ্টায় যে এক শুভ উত্তেজনা আসিয়াছিল, তাহা দেশের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কল্যাণজনক হইলেও আমাদের চিরন্তন দুরদৃষ্টবশতঃ সে উত্তেজনা অতি অল্পকালস্থায়ী হইয়াছিল। সে উত্তেজনা আমাদিগের দৃঢ়চিত্ততা সম্পাদন করিতে পারে নাই বলিয়া অল্পকাল পরেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। যে সহিষ্ণুতা, যে ধৈর্য্য, যে অধ্যবসায় দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর অবশ্য প্রয়োজনীয়, তাহা লাভ করিবার শিক্ষা, সময় ও অবসর না পাওয়ায় দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই উহা লাভ করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ দেশ-হিতৈষণা যে আন্তরিকতা ব্যতীত লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে না, এ বোধ আমাদের ছিল কি না সন্দেহ। সেই কারণে স্বদেশী প্রচেষ্টাকে চিরজীবিত রাখিতে যে যে কার্য্য করার প্রয়োজন ছিল তাহা আমরা করি নাই। এই জন্য দেশে স্বদেশীর প্রভাব ও স্থিতির লাঘব এত শীঘ্র এত স্পষ্টতর ভাবে প্রতীয়মান হইতেছে। ইহাই সাধারণ ভাবে আমাদের স্বদেশী সঙ্কল্পকে হীনবল করিয়া ফেলিয়াছে।

আধুনিক ভারতে নবযুগের প্রবর্ত্তক

স্বামী বিবেকানন্দ

"তুই যদি একা ঐ ভাবে চরিত্র গঠন কত্তে পারিস,
তাহলে তোর দেখাদেখি হাজার লোক
ঐরূপ কত্তে শিখবে।"

India Press, Calcutta.

বসু হইতে সংগৃহীত

তার পর, স্বদেশী ব্যবসায় ও বিপণিবিশেষ কেন স্থায়িত্ব লাভ করিতে অসমর্থ হইয়াছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতেও বেশী গভীর চিন্তার প্রয়োজন নাই। আমাদের লঘু-চিত্ততার যে সমস্ত নিদর্শন সর্ব্বদাই দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাই আমাদিগের এই সমস্ত দুরদৃষ্টের অব্যবহিত কারণ;—সুদূর কারণের অনুসন্ধান নিষ্ফল, যাহা আমাদিগের আয়ত্তে তাহার ব্যবস্থা করিতে সম্পূর্ণ অপারগ হইয়া অনায়ত্তের বিষয় চিন্তা কি চেষ্টা নিষ্ফল প্রয়াসমাত্র।

প্রথমতঃ—এই ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অকৃত-কার্য্যতার প্রধান কারণ আমাদের ব্যবসায়-বুদ্ধিহীনতা। ক্ষণিক উত্তেজনায় মত্ত হইয়া ব্যবসায়-ক্ষেত্রের কোন শিক্ষা কোন জ্ঞান লাভ না করিয়া ব্যবসা করিতে যাওয়া এবং পদে পদে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—এবং সেই ক্ষতি সত্ত্বেও ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকা অর্থহীন, লঘুচিত্ত বঙ্গবাসীর পক্ষে অসম্ভব। তাই ব্যবসায়ের এই হীন দশা।

দ্বিতীয়তঃ—ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের বিলাসিতা। বিক্রেতা বিলাসী বলিয়া তাঁহার বিলাসদ্রব্যের ব্যয় সঙ্কুলান মানসে ক্রেতার নিকট যথেষ্ট অন্যায় মূল্য আদায় করিয়া থাকেন এবং ক্রেতাও বিলাসিতার উপযোগী স্বদেশী দ্রব্য অল্পমূল্যে পাইতে অপারগ হইয়া এবং অনেক সময় না পাইয়া ক্রমশঃ বিদেশী দ্রব্যের মোহে আকৃষ্ট হইয়াছেন। কাজেই স্বদেশী দ্রব্যের বিক্রয় কম হওয়ায় স্বদেশী বিপণি টিঁকিয়া থাকিতে পারিতেছে না

তৃতীয়তঃ—এই বিলাসিতা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ দিবার জন্য অনেক ভণ্ড ব্যবসায়ী স্বদেশী নাম দিয়া অম্লান বদনে বিদেশী দ্রব্য চালাইয়া থাকেন; এবং আমরা তাহা অবগত থাকিয়াও সেই ভণ্ডামির প্রশ্রয় দিবার জন্য সেই দ্রব্য খরিদ করিয়া অতীব কপটতার সহিত নিজেকে প্রকৃত স্বদেশী বলিয়া পরিচিত করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠা বোধ করি না। এই স্বদেশীর নামে বিদেশী দ্রব্য বিক্রয়-ব্যাপারও এই স্বদেশী ব্যবসায় লোপের পথ ক্রমশঃ প্রশস্ততর করিয়া তুলিতেছে।

চতুর্থতঃ—বিদেশী বিপুল বাণিজ্যস্রোতকে প্রতিহত করিতে এদেশেও যে অনেক প্রকারের যৌথ-ব্যবসায় অবলম্বন করার প্রয়োজন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অথচ দশজনে মিলিত হইয়া, অযথা প্রাধান্য লাভের মোহ কাটাইয়া কি ভাবে শেষ লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়, তাহার শিক্ষা ও সাধনা আমাদের নাই। সে কারণেও আমরা শীঘ্র ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছি না।

পঞ্চম—শিক্ষিত ভদ্রসন্তানেরা ব্যবসায়-সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া মাত্র গবর্ণেমেন্টের সন্দেহ-দৃষ্টি তাহাদের উপর পতিত হয়। সেই তীক্ষ্ণ-দৃষ্টির কঠোরতা বাড়াইবার জন্যও, অনেক স্বদেশী ব্যবসায় লোপ পাইতে আরম্ভ হইয়াছে।

৪। শ্রীহট্ট-রত্নমালা

'শ্রীহট্টের ইতিহাস'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অচ্যুত-চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় 'বিজয়া'তে শ্রীহট্টগৌরব-চিত্রাবলীর অবতারণা করিয়া-ছেন—আমরা ইহার যথেষ্ট সমাদর করি। তিনি অতীত গৌরবকাহিনীর

আলোচনা না করিয়া বর্ত্তমান যুগের জীবন্ত চিত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন। সুদূর অতীতের ঘটনাবলীকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা অনেকের পক্ষে কঠিন। সাধারণতঃ লোকেরা পুরাতন ঘটনাবলীকে গল্প বা কাহিনী মাত্র মনে করে—তাহার সহিত নিজেদের জীবনের তুলনা বা কোন সম্বন্ধ স্থাপন করা ত দূরের কথা। কিন্তু এই নূতন আলোচনা-প্রণালী উচ্চ সাহিত্যে স্থান পাইলে সর্ব্বসাধারণ বর্ত্তমান যুগের নানাবিধ আন্দোলনের বিচিত্র ও জটিল গতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। সকলে সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ চিন্তা ও কর্ম্মদ্বারা সমাজের জীবন গঠন করিতেছে। এইরূপ জীবন্ত শক্তিসমূহই ইতিহাসের উপকরণ। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এই প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক ইতিহাস-শিক্ষার যে পথ দেখাইয়াছেন, আমরা পূর্ব্বে তাহার সমালোচনা করিয়াছি। তাঁহার গ্রন্থে বাঙ্গালীজাতির প্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীরগণের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তত্ত্বনিধি মহাশয় আধুনিক শ্রীহট্টের কর্ম্মী পুরুষগণের জীবনী সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া লোকশিক্ষার সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীহট্টও উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা শ্রীহট্টের অনেক কথা তাঁহার নিকট শিখিলাম। তাঁহার প্রবন্ধের কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"শ্রীহট্টের গৌরব করিবার বিষয় নিতান্ত অল্প নহে। যে সকল মহাপুরুষ শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, যাঁহাদিগের জন্য শ্রীহট্টবাসিগণ গৌরব অনুভব করেন, তাঁহাদিগের সকলের কথা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বলা সম্ভবপর নহে। 'শ্রীহট্টের পাগলা ছেলে' (শ্রীগৌরাঙ্গ),—তাঁহার পরিকর শ্রীহট্টবাসী অদ্বৈতাচার্য্য, সত্যভানু, শ্রীবাস, পদকর্ত্তা মুরারি, যদুনাথ ও চন্দ্রশেখর প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতেছি না; 'শ্রীহট্টের কাণা ছেলে' (রঘুনাথ শিরোমণি,)—তাঁহার অনুবর্ত্তী রঘুদেব, কৃষ্ণরাম, জয়কৃষ্ণ ও হরিকান্ত প্রভৃতি শ্রীহট্টবাসী মনীষী ন্যায়নিবন্ধকারবর্গের কথাও কীর্ত্তন করিব না; যিনি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের ন্যায় অষ্টাবিংশতি "প্রদীপে"র প্রভায় শ্রীহট্টভূমি আলোকিত করিয়াছিলেন, শ্রীহট্টের অলঙ্কার সেই মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার এবং রামদেব, রামগোপাল, গোপালচন্দ্র প্রভৃতি স্মৃতিপ্রবন্ধ-প্রণেতাগণের কথাও বলিব না; কত নাম করিব, শ্রীহট্টের বহু জ্যোতিষী, বহুতর মহাতান্ত্রিক (তন্ত্র-সঙ্কলয়িতা,) বহু-সংখ্যক ভাষাগ্রন্থ-রচয়িতা, দ্বাদশাধিক পদ্ম-পুরাণ-প্রণেতা এবং অসংখ্য পদ-সঙ্গীত-কর্ত্তাগণের পরিচয় প্রদান করাও এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। (ভগবৎকৃপায় তাহা কোন গ্রন্থবিশেষের অঙ্গীভূত হইয়া প্রকাশ করার উদ্যোগ চলিতেছে।)

শ্রীহট্টের শতাধিক প্রাচীন গ্রন্থকার ব্যতীত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও প্রচারকবর্গ—দেশমান্য রাজ-কর্ম্মচারীসমূহ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সকলের পুরাতন কথাও বলিব না। এ প্রবন্ধে ছয় জন মাত্র অতি আধুনিক কর্ম্মী পুরুষের কথা কীর্ত্তন করিব। আধুনিক হইলেও ইঁহারা অতি গৌরবের পাত্র। চিত্রে তাঁহাদের প্রতিকৃতি পরিদৃষ্ট হইবে।

শ্রীহট্ট-গৌরব চিত্রাবলী

রাধানাথ চৌধুরী

রামকুমার নন্দী, রমাকান্ত রায়,

জয়গোবিন্দ সোম, রাজা গিরিশচন্দ্র রায়

প্যারীচরণ দাস।

India Press, Calcutta.

('বিজয়া' হইতে সংগৃহীত)

সর্ব্বোপরি যে মহাত্মার চিত্র, উহার নাম রাধানাথ চৌধুরী; সর্ব্বনিম্নে স্বর্গীয় প্যারীচরণ দাস। বামদিকে উপরে রামকুমার নন্দী মজুমদার ও নীচে জয়গোবিন্দ সোম। ডানদিকে উপরে রমাকান্ত রায় ও নীচে রাজা গিরিশচন্দ্র রায়।"

আমরা অচ্যুতবাবুর প্রবন্ধ হইতে রঙ্গপুরে 'জাতীয় শিক্ষা'র প্রবর্ত্তক স্বদেশ-সেবক রমাকান্ত রায়ের জীবনবৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিলাম :—

রমাকান্ত রায়—হবিগঞ্জের অন্তর্গত জলসুখা গ্রামে রমাকান্তের উদ্ভব। বিদ্যাশিক্ষা-ব্যপদেশে জাপানযাত্রী ভারতবাসী ছাত্রগণের পথপ্রদর্শকরূপেই যে কেবল তাঁহার প্রসিদ্ধি তাহা নহে, তাঁহার ন্যায় পরদুঃখকাতর, উদার ও অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগী অল্পই দৃষ্ট হয়।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রমাকান্তের জন্ম, বাল্যকালেই তাঁহার পিতৃমাতৃবিয়োগ ঘটে। প্রথমতঃ দেশে মধ্যইংরাজী স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি শ্রীহট্ট জেলাস্কুলে প্রবিষ্ট হন ও ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা সিটি কলেজে ভর্ত্তি হন; তথায় তিনি দুই বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন।

তিনি জাপানে গিয়া খনিজবিদ্যা অধ্যয়ন পূর্ব্বক খনি-তত্ত্বে ব্যুৎপন্ন হইয়া জাপানেই অল্প কিছুদিন কাজ করিয়াছিলেন। তথা হইতে আসিয়াই তিনি স্বদেশ-সেবায় নিযুক্ত হন, দেশের দারিদ্র্য-মুক্তির অভিপ্রায়ে তিনি চারি আনা ফণ্ডের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, প্রত্যেক সভ্য হইতে বার্ষিক চারি আনা লইয়া এই ধনভাণ্ডারের পরিপুষ্টির কল্পনা হয়।

রমাকান্ত কাশ্মীররাজ্যের খনিতত্ত্ববিদের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তথা হইতে ছুটি লইয়া দেশে আসেন; তখন স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হইতেছে; তিনি স্বাভিমত স্বদেশ-সেবায় আত্মপ্রাণ ঢালিয়া দেন। বলা বাহুল্য যে, ইহাতে তাঁহাকে কাশ্মীরের চাকরীটি ত্যাগ করিতে হয়। রমাকান্ত বেশী কথা কহিতেন না, কিন্তু প্রাণপণে কাজ করিতেন।

সস্তায় স্বদেশী কাপড় বিক্রয় করিতে হইবে, কলিকাতার একটি সভায় স্থিরীকৃত হইলে তদুদ্দেশ্যে হাবড়ার হাটে কতক কাপড় ক্রয় করা হয়। মুটে মজুরী লাগিয়া সেই কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি না হয়, এই জন্য তিনি স্বয়ং ঘাড়ে করিয়া হাবড়া হইতে কলিকাতায় কাপড় লইয়া আসিতেন। যুবকগণ তাঁহার এই উদাহরণে এরূপ উৎসাহিত হইয়াছিল যে, এইরূপ মুটের কার্য্য গৌরবজনক বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিল। এই সময়ে স্বীয় জীবিকায় জলাঞ্জলি দিয়া দেশের সেবায় যাঁহারা ব্রত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে রমাকান্তই প্রধান ছিলেন। তিনি এণ্টিসার্কুলার সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

রমাকান্ত বড়ই মুক্তহস্ত ছিলেন, জাপানে একটি ছাত্রকে তিনি প্রায় ৩০০ মুদ্রা শিক্ষার সাহায্যে দান করেন, সেই সময় ইহাই তাঁহার সম্বল ছিল। শিক্ষার্থী বিদেশগামী চারিজন ভারতীয় ছাত্রের পাথেয় ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছিলেন, পরে আমেরিকায় তাহাদের শিক্ষাব্যয়ের সাহায্যার্থ হাজারিবাগে আড়াই শত টাকা বেতনে একটি কর্ম্ম স্বীকার করেন। তিনি নিজে ব্যয়ের জন্য তাহা হইতে পঞ্চাশ টাকা রাখিয়া, বাকি দুইশত টাকা ছাত্রদের ব্যয়ের জন্য

প্রেরণ করিতেন। বিগত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে জ্বররোগে অকালে এই কর্ম্মবীরের মৃত্যু হয়।

অচ্যুত বাবু তাঁহার প্রবন্ধোল্লিখিত ছয়জন মহাত্মা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "শ্রীহট্টবাসিগণ তাঁহাদের গুণের কথা ভুলেন নাই, তাই তাঁহাদের চিত্র "শ্রীহট্টগৌরব-চিত্রাবলী" নামে তাঁহারা সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। শ্রীহট্টগৌরব-চিত্রাবলীর সহিত "শ্রীহট্টগৌরব-ফলকাবলী"ও শ্রীহট্টবাসীকর্ত্তৃক একত্রে রক্ষিত হইতেছে। ফলকের সংখ্যা বর্ত্তমানে দুইখানা মাত্র হইয়াছে,—একখানা বাণিয়াচঙ্গবাসী পণ্ডিত শিবচন্দ্র ন্যায়পঞ্চাননের নামে রক্ষিত। অন্য খানা বহুগ্রন্থ-প্রণেতা ইটার প্রধান পণ্ডিত রাজগোবিন্দ সার্ব্বভৌমের স্মৃতি-রক্ষার্থ সংস্থাপিত।"

এরূপ ফলক রক্ষা করিবার জন্য উৎসাহ ও চেষ্টা বাঙ্গালার নানাস্থানে দৃষ্ট হইতেছে। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সাহায্যে দিনাজপুর, রঙ্গপুর, মালদহ প্রভৃতি স্থানে এরূপ ফলক রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগের জীবন্ত মূর্ত্তিগুলি সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা অনেকের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে। ইতিমধ্যে এরূপ কয়েকটি জেলার ইতিহাস প্রকাশিতও হইয়াছে। 'নদীয়া-কাহিনী'তে তথাকার ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, চিন্তাবীরগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগ অবলম্বন করিয়া বিক্রমপুরের ইতিহাস, ঢাকার ইতিহাস, বগুড়ার ইতিহাস ইত্যাদি কয়েকখানা জেলার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। পরলোকগত ঐতিহাসিক রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় 'মালদহ-রত্নমালা' নামক গ্রন্থে এই অবলম্বন করিতেছিলেন। তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী 'ভূগোলশিক্ষা-প্রণালী'-গ্রন্থে আধুনিক মালদহের কয়েকজন প্রসিদ্ধ লোকের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। বীরভূমের শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় ধারাবাহিকভাবে "বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক" গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। তাহাতে বাঙ্গালার আধুনিক ও প্রাচীন সাহিত্যসেবিগণের জীবনবৃত্তান্ত জানা যায়। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার 'সৌরভে' পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের-সাহিত্য-সেবিগণ সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যবিবরণীতে রাজসাহী বিভাগের সকল জেলার সাহিত্যসেবিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বাহির হইয়াছে। বিভিন্ন জেলার এই সমস্ত উজ্জ্বল আদর্শের প্রভাবে লোকের কর্ম্মে উৎসাহ আসিবে, ত্যাগ ও উদারতার মহিমায় দেশ গৌরবান্বিত হইয়া উঠিবে।

* *
*

৫। বাঁকুড়া জেলায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় একটি প্রস্তরের উৎকীর্ণ লিপি প্রদর্শন করিয়া জানাইলেন, "স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ের জন্য যখন বাঁকুড়ায় ছিলাম, তখন সামান্য দূর পর্য্যন্ত যেটুকু বেড়াইতে পারিতাম, তাহারই মধ্যে পরিষৎ-সেবার কোন উপকরণ পাই কি না, তাহা খুঁজিতাম, আমি বাঁকুড়া সহরের উত্তরে

শ্রীহট্ট-গৌরব স্মৃতি ফলকাবলী

India Press. Calcutta.

(বিজয়, হইতে স গৃহীত)

গন্ধেশ্বরী নদীর অপর পারে দেড় মাইল দূরে ধিকনা গ্রামে ছিলাম, এই ধিকনার উত্তর-পূর্ব্বে দেড় মাইল দূরে একটি ইষ্টক দেউলের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাই, অনুসন্ধানে জানিতে পারি, কাশীনাথ সার্ব্বভৌম বাচস্পতি নামে কোন পণ্ডিত ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহাতে সীতারাম-বিগ্রহ স্থাপিত করেন। মন্দিরের পূর্ব্বদিকের প্রাচীরাংশ মন্দির-গম্বুজের গোড়া পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান আছে। উহা প্রাচীন লাল বাঙ্গলা ইটে গড়া, ইষ্টকে লোনা ধরে নাই। শুনিলাম, মন্দিরের কপাল-ফলক প্রস্তরখানি শ্রীযুক্ত কড়িরাম মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আছে। নিকটেই তাঁহার বাড়ী, সেখানে দেখিতে গেলাম। সেখানে এই প্রস্তরখানি দেখিতে পাই। ইহাতে নিম্নলিখিত উৎকীর্ণ লিপিটি প্রায় অক্ষত আকারে বর্ত্তমান আছে,—

"শাকে খবসুবাণেন্দৌ সীতারামে সমর্পিতং।
শ্রীশ্রীণে মন্দিরমিদং শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণা॥
শক ১৫৮০॥—

ইহার মধ্যে সমস্ত অক্ষরই আধুনিক বাঙ্গালার, কেবল, "৯" ও "র" কিছু পার্থক্য বিশিষ্ট, দ্বিতীয় চরণে শ্রীশ্রীণে পদের কোন অর্থ হয় না। অর্থের জন্য উহার "শ্রীশ্রীণে" পাঠ করিয়া "সীতরামে" পদের বিশেষণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ২৫৪ বৎসরের এই প্রস্তর লিপিখানি অযত্নে পড়িয়া আছে দেখিয়া, উহা আমি কড়িরাম মুখোপাধ্যায়ের নিকটে প্রার্থনা করি। তিনি পণ্ডিত কাশীনাথের বংশধরগণের আপত্তি করায়, আমি পরদিন কোলমুড়া গ্রামে কাশীনাথের বংশধরের নিকটে লোক পাঠাই, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সার্ব্বভৌম আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁহাকে সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেওয়াতে তিনি একখানি দানপত্র লিখিয়া উহা সাহিত্য-পরিষদে সযত্নে রক্ষার্থ দান করেন, শ্রীমান ব্রজেন্দ্রকুমার গোস্বামী মগরকাপুরে গিয়া পাথরখানি আনিয়া দেন। পাথরখানি আসিলে দেখিলাম ১৫৮০ শকের উৎকীর্ণ শিলালিপিটুকু ব্যতীত উহাতে আরও কৌতূহল-বর্দ্ধক বিষয় আছে। প্রস্তর-লিপিখানির পশ্চাদ্দিক্ দেখিয়া বুঝিলাম, প্রস্তরখানি আরও বেশী প্রাচীন ব্যাপারের নিদর্শন, উহা কোন দেবতার পাদপীঠের অর্দ্ধাংশ। যে টুকু আছে, তাহাতে পাদ-পীঠের আগমন-স্থানে দেবতার ও দেবতার সহচরের আগুলফ—পদাংশ বর্ত্তমান আছে এবং আসনের নিম্নে এক পত্রিকায় দুইটি বৃষভ-মূর্ত্তি এবং এক উপাসক মূর্ত্তি খোদিত আছে। অতঃপর আমি উহা পরিষদের জন্য লইয়া আসিয়াছি। একটি মাগধী-বুদ্ধমূর্ত্তির বজ্রাসনে উৎকীর্ণ কয়েকটি প্রাচীন অক্ষর ব্যতীত পরিষদের সংগৃহীত দ্রব্যাদি মধ্যে প্রস্তরলিপি আর নাই, সুতরাং এ খানিকে পরিষদের প্রস্তরলিপির প্রথম বলা যাইতে পারে।"

তৎপরে ব্যোমকেশ বাবু পণ্ডিত কাশীনাথের জীবন-চরিতসম্পর্কিত তদ্দেশপ্রচলিত সাতিনার অমানুষিক কিম্বদন্তীও উল্লেখ করেন। এবং বাকুড়া জেলায় প্রাচীন নিদর্শন যে আরও আছে, তাহার উল্লেখ করেন। একতেশ্বর শিবমন্দিরে তিনি খোঁদারাণী নামে পরিচিত, অনন্ত বাসুকী নামে পূজিত, ছোট বড় দুইখানি সর্পচ্ছদ ষড়্ভুজ বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তির বিবরণ দিয়া সেই মন্দিরের বিববণ বর্ণন করেন। তাঁহার অনুমান

সেখানে কোন বৌদ্ধমূর্ত্তি ছিল। এইরূপে উক্ত জেলার আরও দুই শরিকী প্রাচীন মন্দিরের কথাও বর্ণনা করেন।

তাহার পর ব্যোমকেশ বাবু শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত পুঁথিগুলি উপহার দিয়া বলিলেন, বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে এবং পরিষৎ-ভাণ্ডারে প্রাচীন পুঁথি যত সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ বাঁকুড়া জেলায় প্রাপ্ত, বাঁকুড়ায় বাঙ্গালা পুঁথি এখনও বহু স্থানে আছে এবং চেষ্টা করিলে, তাহা পরিষৎ-ভাণ্ডারে আনিয়া তুলিতে খুব বেশী বেগ পাইতে হয় না। যে পুঁথিগুলি আমি আনিয়াছি, ইহাতে দাস গোস্বামীর হংসদূতের প্রাচীন বঙ্গানুবাদ একখানি এবং মোহ-মোচন নামে একখানি নূতন গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

অতঃপর ব্যোমকেশ বাবু 'চৈতন্য-চরিতামৃত শ্লোক'-সংগ্রহ বিষয়ক প্রাচীন একখানি পুঁথির দুই পাতা দেখাইয়া বলিলেন, "পুঁথিখানির সন তারিখ জানা যায় না, কিন্তু ইহা বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত হইলেও দেখিতে ঠিক নাগরী অক্ষর বলিয়া মনে ধাঁধা লাগে। বর্ণমালার গঠনের ইতিহাসে এই আকারের অক্ষরের মূল্য আছে বলিয়া, আমি এই পাতা দুইটিও আনিয়াছি।"

অতঃপর শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় বি, এল্, মহাশয় বলিলেন, "ব্যোমকেশ বাবু যে পুঁথি ও প্রস্তর-ফলক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহার নিকট সকলেই কৃতজ্ঞ। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ হইতে আমরা অতি প্রাচীন কালের এক পল্লীগ্রামস্থ এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পরিচয় পাইলাম, তিনি আমাদের সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র।"

৬। কয়েকটি

আমাদের সাহিত্যে আজকাল ধনবিজ্ঞান, দেশের আর্থিক অবস্থা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা হইতেছে। এজন্য কতকগুলি বিশিষ্ট পত্রিকাও প্রকাশিত হইতেছে। আষাঢ়ের 'সাহিত্য-সংবাদে' কয়েকটা কাজের কথার উল্লেখ দেখিলাম। লেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মিত্র। আমরা নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অর্থ অভাব-পূরণের জন্য প্রয়োজন। এখন অভাব কয় প্রকার, তাহা বলা উচিত। যেমন দৃষ্টিক্ষুধা বলিয়া একপ্রকার মিথ্যা ক্ষুধা আছে—যাহার বশবর্ত্তী হইয়া আহার করিলে রোগোৎপত্তি হয়; সেইরূপ কাল্পনিক অভাবও আছে—যাহাকে দূর করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না, বরং দূর করিবার চেষ্টা করিলেই অনিষ্ট ঘটে। প্রকৃত অভাব কেবল মাত্র দুই প্রকারের আছে; প্রথম, স্বার্থের অভাব; দ্বিতীয়, পরার্থের অভাব। যাহারা নিতান্ত মানুষ, তাহাদের মধ্যে এই স্বার্থের অভাবই অধিক পরিলক্ষিত হয়, পরার্থের অভাব-অনুভূতির চিহ্নমাত্রও তাহাদের মধ্যে থাকে না। কিন্তু যাঁহাদিগকে আমরা দেবচরিত্রের লোক বলিয়া থাকি, তাঁহাদের মধ্যে আমরা উপরোক্ত দুই প্রকার অভাব-অনুভূতির এবং দুই প্রকার অভাব-মোচনের প্রক্রিয়া দেখিতে পাই। দুই প্রকার অভাব-মোচনের জন্য অর্থের প্রয়োজন—স্বার্থের জন্যও বটে, পরার্থের জন্যও বটে।

অভাব অনুভবের শক্তি বিকৃত না হইলে এবং স্বার্থে ও পরার্থে প্রতিকূল সংঘর্ষ না

ঘটিলে, সমাজের নিরাময়তা উপলব্ধি করিতে হইবে। সমাজ যদি অর্থের ব্যবহারে কোন-প্রকার মূর্খতার পরিচয় না দেয়, আমরা অত্যন্ত আশান্বিত হইব, সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি বিপরীত হয়, তাহার অধিক আক্ষেপের বিষয় কি হইতে পারে?

মানুষের সমস্ত চেতনা তাহার মধ্য হইতেই হইয়া থাকে; এই জন্য মানুষ "আমি আছি" সর্ব্বাগ্রে বুঝে এবং এই জন্য "অহঙ্কার" মানুষের পক্ষে এত সহজ। আর, এই জন্য স্বার্থের অভাব শীঘ্র বুঝিতে পারিবে বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। বর্ত্তমান সমাজে আমাদের স্বার্থযুক্ত অভাব-সম্বন্ধে এই কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইতে পারে;—

১। বিস্কুট ও রসনচূর আমাদের কতদূর প্রয়োজনীয়?

২। মাদক-দ্রব্য সকল আমাদের কি প্রয়োজন সাধন করে?

৩। বিলাতী আহারের কোনও আধিক অনিষ্টকারিতা আছে কি?

৪। ভোগবিলাসের সামগ্রী বৃদ্ধি পাইতেছে কি?

৫। আটপহরে বসন-ভূষণ কি ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িতেছে?

৬। আমাদের আমোদ-প্রমোদে কিরূপ ব্যয়-বাহুল্য হইতেছে?

৭। ক্রীড়াতে কি কোনও প্রকার খরচ আছে? সে খরচ না হইলে কি চলে না?

৮। আমাদের উৎসবগুলিতে কি কিছু অন্যায় ব্যয় করা হয়?

৯। আমাদের প্রয়োজনীয় কোন্ কোন্ বস্তুর প্রচলন উঠিয়া যাইতেছে? তুলাপোরা জামা এবং বালাপোষ ইত্যাদির রেওয়াজ কি এখন আছে? কাণঢাকা টুপি কি এখন সভ্যসমাজে চলে? বাঁশের মজবুত লাঠীর কি এখন কদর আছে? তালপাতার ছাতা এখন কি কেহ ব্যবহার করে? ইত্যাদি।

১০। আমাদের প্রয়োজনগুলি সত্যসত্যই সদ্গুণজাত না আমাদের দ্বারাই সৃষ্ট?

৭। অধ্যাপক রাধাকুমুদের ঐতিহাসিক গবেষণা

ভারতবর্ষ তাহার সমস্ত প্রদেশ, নদ নদী গিরি কান্তার লইয়া একটি দেশ, এ কথা ভারতের শাস্ত্রাদি নানা যুগে যুগে, ক্রিয়াকাণ্ডে, সন্ধ্যাবন্দনায় মনে রাখিয়াছে—পরিচয় দিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ঐক্য তাহাদের মন্মে মর্ম্মে গ্রথিত। ভারতবাসীর সেই ভৌগোলিক ঐক্য-ধারণার কথাই বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার মহাশয় একটি ইংরাজী প্রবন্ধে নানা যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। অমৃতবাজার পত্রিকা তাহার সমালোচনায় যাহা বলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

"আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে বৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা মৌলিক গবেষণা করাইবার ব্যবস্থা আছে। প্রতি বৎসর বহু পণ্ডিত ও অনুসন্ধানকারীরও সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়—কলিকাতা—হইতে আজ পর্য্যন্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের মত খুব বেশী ছাত্র বাহির হন নাই। অবশ্য অনেকেরই

বুদ্ধিমত্তা এবং অনুসন্ধান-কার্য্য রাধাকুমুদ বাবুর মতই প্রশংসনীয়। কিন্তু খুব কম লোকেই তাঁহাদের নৈপুণ্য উৎকৃষ্টতর উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ অতীতের মধ্য দিয়া আমাদের দেশকে এবং আমাদিগকে জানিবার প্রয়াস অনেকের নাই। কিন্তু তাঁহারাও এই উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান-কার্য্য চালাইতে পারেন।

অল্প দিন হইল অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভারতবাসীর সমুদ্রযাত্রা ও জাহাজ সম্বন্ধে তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ভারতবর্ষের প্রামাণ্য ইতিহাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। আজ আবার তিনি "ভারতবর্ষের ঐক্য" নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসেরই আর একটি দিক দেখাইয়াছেন। প্রবন্ধটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট গৃহে বহু লোকপূর্ণ সভাস্থলে পঠিত হয়। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন।

প্রবন্ধটি বাস্তবিকই বিশেষ চিন্তাপূর্ণ। ইহার মধ্যে লেখক ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য বহু কষ্টস্বীকার, ধৈর্য্য ও পরিশ্রমের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার জ্ঞানের বিস্তৃত পরিধি, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অতি সুন্দর ও গভীর ধারণা এবং রচনায় সাহিত্য-সম্পদের বাহুল্য দেখাইয়াছেন।

লেখক নিঃসংশয়রূপে যথাসম্ভব যোগ্যতার সহিত এই একটি প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছেন—

"প্রকৃতির সাহায্যে এবং অনুশীলনে, ঐতিহাসিক জ্ঞানে এবং ভৌগোলিক সংস্থানে, ধর্ম্মের কার্য্যকলাপে এবং রাষ্ট্রীয় আদর্শে ভারতবর্ষের জনগণ যুগে যুগে তাহাদের জন্মভূমির ঐক্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহারা তাহাদের জাতিগত ঐক্যকে অনুভব করিয়া তাহার সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন করিতে পারিয়াছে, এবং তাহা করিয়াই তাহারা জগৎ-সভ্যতার ইতিহাসে আপনার ভগবদ্দত্ত বাণী প্রচার ও পরিপূর্ণ করিয়াছে।"

'প্রবন্ধটিতে লেখকের বহু পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে সত্য; কিন্তু তাহা অপেক্ষা তাঁহার অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা বেশী প্রশংসনীয় মনে করি। সেই সব কারণেই অতীত আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়াছে। বিজ্ঞ সভাপতি মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন—"আমরা অতীতের মধ্য দিয়াই ভবিষ্যতের জন্য বর্ত্তমানে জীবন ধারণ করি।" অবশ্য "অতীত" শব্দটায় আমাদের অতীতই বুঝিতে হইবে, অন্য দেশের অতীত নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের অতীতকে আমরা দেখিতে পাই না। আমাদের দৃষ্টিশক্তি দুর্ব্বল—যাদুমন্ত্রে সম্মোহিত। পরকীয় সভ্যতার চাকচিক্যে আমাদের বুদ্ধিশক্তি লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, আমরা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান বিধ্বস্ত সভ্যতার মলিন দৃশ্য ভুলিয়া গৌরবের যুগ স্মরণে আনিতে সমর্থ নহি। সেই জন্য আমাদের এখন এমন শক্তিমান লোকের প্রয়োজন, যিনি তাঁহার বৈদ্যুতিক আলোক-রেখাপাতে আমাদের প্রকৃত ভারতবর্ষকে দেখাইয়া দিবেন। দেখাইয়া দিবেন, শত শত যুগের ধূলি-আবর্জ্জনা এবং ধ্বংসস্তূপের অন্তরালে ভারতবর্ষ তাহার সকল প্রকার মনোমদ ঐশ্বর্য্য-সম্পদ লইয়া বসিয়া আছে।'

* *
*

৮। অমৃতবাজার-পত্রিকার উপদেশ

এই উপলক্ষে "পত্রিকা" যাহা বলেন, তাহা সকলেরই চিন্তার বিষয়। তিনি নিম্নলিখিত উপায়ে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা চিত্রিত করিয়াছেন !

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, "ভারতবর্ষ, তুমি কখনই এক ছিলে না—বিবাদ-বিসম্বাদে, জাতি-বৈষম্যে, মত-বৈষম্যে বহুধা বিভক্ত হইয়া ছিলে।" মুগ্ধ ভারতবর্ষও তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছে, "হাঁ, সত্যই আমি কখন এক ছিলাম না।" পাশ্চাত্য সুধীরা বলিতেছেন, "ভারতবর্ষ, তোমার কখনই ব্যবসা, রাস্তা, শিক্ষা, সাধনা, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জাহাজ, হাঁসপাতাল অথবা কোনরূপ প্রয়োজনীয় জ্ঞান ছিল না।" ভারতবর্ষও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছে, "হাঁ, সত্যই এ সব আমার কখ ছিল না।"

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন, "ভারত, তোমার কখনই শক্তি বা উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা ছিল না, তুমি সব সময়ই দুর্ব্বল, অসহায় এবং খণ্ড ছিলে।" প্রত্যুত্তরে ভারতবর্ষও বলিতেছে, "হাঁ, অবশ্য, সব সময়ই আমি ঐরূপ ছিলাম, এমন কি উহা অপেক্ষাও খারাপ ছিলাম।" বিদেশীয় পণ্ডিতগণ ভারতের মুখে আলকাতরা মাখাইয়া সম্মুখে আয়না ধরিয়া বলিতেছেন, "দেখ, ভারত, তোমার মুখখানা কি চিরকালই খুব কালো নয়?" ভারতবর্ষ বলিতেছে, "হাঁ, সত্যই চিরকালই আমার ঐরূপ।" বিদেশীয়েরা বলিতেছেন, "ভারতবর্ষ, তুমি কোন দিনই জীবিত ছিলে না, চিরকালই মৃত—গলিত শব, এবং এখন পর্য্যন্তও তাহাই ই।" ভারতবর্ষও তাহাই স্বীকার করিয়া লইতেছে। পাশ্চাত্যেরা আরও বলিতেছেন, ভারত, তোমার অধিবাসিবৃন্দ সকলেই মূর্খ, নির্ব্বোধ। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞান বিদেশীয় জ্ঞানীদের নিকট হইতে শিখিয়া লও। তাহা না হইলে 'তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে'ই রহিয়া যাইবে। তোমার অতীতে এমন কিছুই নাই যাহার জন্য বিশেষ চিন্তা করা যাইতে পারে। তাই অন্যান্য দেশের অতীত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হও—মুখস্থ কর 'সেভেন ইয়ার্স ওয়ারে'র সমস্ত যুদ্ধগুলির তারিখ, পূজা কর ইতালীয় কবি, গ্রীসের ভাস্কর, ফ্রান্সের সূত্রধর, জর্ম্মাণির কর্ম্মকার। মুখস্থ কর প্ল্যাণ্টাজেনেট বংশের পূর্ব্ব পিতৃ-পিতামহদের নাম, মুখস্থ কর জুলুল্যাণ্ডের হ্রদ-নদী, আইসল্যাণ্ডের আগ্নেয়গিরি, উষ্ণোৎস—এই সকলের নাম। তাহা হইলেই বেশী ফল পাইবে।"

ভারতবর্ষও এই আদেশ অনুসারে এতদিন কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এখন এই চিত্তসম্মোহন বিদূরিত করা ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রকৃত সন্তানের কর্ত্তব্য। 'জাতীয়-শিক্ষাপরিষদে'র রাধাকুমুদ বাবু এবং তাঁহার কতিপয় সহকারী বন্ধু জ্ঞানের রাজ্য হইতে এই সম্মোহন-মন্ত্র বিতাড়িত করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন। আমাদের ইচ্ছা, বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ ছাত্রের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হৌক। কিন্তু হয়ত আমরা এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বড় বেশী দাবী করিতে বসিয়াছি! কেননা সেখানেই এমন সব

পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারিত হয়, যাহাতে আমাদের ছাত্রদের দৃষ্টিশক্তি অন্ধকার করিয়া ফেলে, এবং তাহাদের অন্তরে পাশ্চাত্য যাদুমন্ত্র আরও গভীর ভাবে কার্য্য করিতে অবসর পায়। এই সব বিদ্যালয়ের কাছেই স্বদেশ-প্রীতি একটা অভিসম্পাত এবং 'জাতীয় বিদ্যালয়' একটা প্রকাণ্ড বিভীষিকা!

আমরা আশা করি, অধ্যাপক মহাশয়ের এই প্রবন্ধটি বহু লোকেই পাঠ করিবেন—ইহা এপ্রিলের 'মডার্ণ রিভিউ' এবং আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সভার অন্যান্য বক্তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও বলিতেছি—ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষেরা যদি এই প্রবন্ধটি স্বতন্ত্র পুস্তিকায় ছাপাইয়া সকলের মধ্যে বিশেষতঃ ম্যাট্রিকুলেশন এবং কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে বিতরণ করেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। ছাত্রদের মনে ইতিমধ্যেই অনেক বিস প্রবেশ করিয়াছে। এখনই তাহাদিগকে বিষঘ্ন ঔষধ না দিলে আর চলিবে না।

* *
*

৯। ভারতের বৈষয়িক অবস্থা

বর্ত্তমানে আমরা যে অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহাতে কোন দিকে আমাদিগের ভবিষ্যৎ চেষ্টা পরিচালনা করা উচিত, সেই বিষয় গভীরভাবে আলোচনা করিতে হইবে। যদিও অধিকাংশ লোকই কৃষি-কর্ম্ম করিয়া থাকে, তথাপি বর্ত্তমানে অনেকগুলি শুভ লক্ষণ দেখা দিয়াছে, ধীর ভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্যগুলি জাগিয়া উঠিতেছে, নিষ্কর্ম্মার মধ্যে কর্ম্মপ্রাণতা বিকসিত হইতেছে, আলস্যকে পদদলিত করিয়া প্রচেষ্টা জয় লাভ করিতেছে, তমোভাবকে দূরীভূত করিয়া রজ গুণ প্রকটিত হইতেছে। যদি আমরা ইংলণ্ড বিশেষতঃ আমেরিকা ও জার্ম্মাণির বৈষয়িক ইতিহাসের বিষয় পর্য্যালোচনা করি, অথবা জাপানের অতি হীন অবস্থা হইতে এইরূপ উন্নতির বিষয় চিন্তা করি, আমাদের ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে আমূল সংস্কার ও প্রসার ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিবে। অন্যান্য জাতি অতি অল্পসংখ্যক লোক ও অতি সামান্য পরিমাণ (Raw material) কাঁচা দ্রব্য লইয়া ভারতের হাট-বাজারে আপন আপন আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। ইহা বাস্তবিকই দৈব বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হয়—যে ভারত একদিন সমগ্র পৃথিবীকে শাল, কার্পেট, বস্ত্র ও বিবিধ বহুমূল্য পদার্থ দ্বারা পালন করিত, আজ সেই ভারত কাঙ্গালবেশে পরের দ্বারে ভিক্ষায় রত; অশনে ভূষণে শয়নে, সর্ব্বদা পরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে! কিন্তু পূর্ব্বগৌরব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, পূর্ব্বকাহিনী এখনও বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া যায় নাই, সেই স্মৃতি এখনও জাগিয়া রহিয়াছে এবং কর্ম্মে প্রণোদিত করিতেছে, পূর্ব্ব-স্মৃতির উজ্জ্বল দীপ্তি বর্ত্তমান নৈরাশ্যের অন্ধকার দূর করিয়া দিবে; কেবলমাত্র সেই দিকে স্থির লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তবেই আমরা গৌরবকে মাথায় করিয়া লাঞ্ছনাকে পদদলিত করিতে পারিব, ক্ষীণ দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষমার মাহাত্ম্য জগতে ঘোষণা করিতে পারিব, তবেই আমরা ভিক্ষার ঝুলি ছাড়িয়া দাতার আসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব।

ভারত যদিও জাগরিত হইয়াছে, বৈষয়িক অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিতেছে—এবং মৃতপ্রায় ব্যবসায় ও শিল্পগুলিকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি প্রয়োগ করিতেছে, এখনও সম্মুখে কঠোর ও বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে সমস্ত পৃথিবীই আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে, প্রচুর পরিমাণ মূলধন লইয়া, "সংরক্ষণনীতি" প্রভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা রক্ষা করিতেছে।

ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষও গৃহ-শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু এখন সমস্তই প্রণষ্ট এবং ধূলায় পরিণত। হস্তচালিত তাঁত প্রাচীনকাহিনী বলিয়া মনে হইতেছে এবং পূর্ব্বভাবে ইহাদের উন্নতি-সাধনেও বিশেষ সফলতা লাভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায় না। যে সমস্ত ব্যবসায় পূর্ব্বে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তাহাদেরও সেই একই অবস্থা। চিনি, কাগজ, কাচ, রেশম ও লৌহ প্রভৃতি সেই পুরাতন ব্যবসায়গুলি কোথায়? পাশ্চাত্য প্রতি-দ্বন্দ্বিতার ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রভাবে প্রায় সমস্তই বিলুপ্ত ও নষ্টপ্রায়। অন্যান্য জাতি আমাদিগের অপেক্ষা অনেক পূর্ব্বেই এ বিষয়ে চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি প্রয়োগ করিয়া উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে, তাহারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে আধুনিক কল-কারখানার সাহায্যে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছে ও ক্রমশঃই নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার পূর্ব্বক পুরাতন পথ ত্যাগ করিয়া নূতন ও সহজ প্রণালী অবলম্বন করিতেছে। আমরা আধুনিক প্রণালীতে কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত করিলাম এবং কয়েক বৎসর যাবৎ বিদেশীয় দ্রব্যের সঙ্গে সফলতার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আসিলাম, কিন্তু ইতিমধ্যে তাহারা বৃক্ষের মজ্জা কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রধান উপাদান বলিয়া আবিষ্কার করিয়া সেই ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, আর আমরা এখনও সেই পূর্ব্ব প্রথাই বজায় রাখিয়া আসিতেছি। ইহাতে যে ব্যবসায়গুলি ক্রমশঃ লোপ পাইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? চিনির কারখানাসম্বন্ধেও সেই একই কথা। ইহাতে সাধারণতঃ মনে হইতে পারে যে, পাশ্চাত্যের সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় সফলতা লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু আমাদিগকে এই ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে এবং উৎসাহ, উদ্যোগ ও কর্ম্মপ্রবণতার সাহায্যে অগ্রসর হইতে হইবে। নতুবা নিজের উন্নতির মূলে নিজেই কুঠারাঘাত করিব, নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই সাধন করিব এবং নিজের মৃত্যু নিজেই ডাকিয়া আনিব। আমাদের ভবিষ্যৎ আপাতদৃষ্টিতে যতই অন্ধকার বলিয়া প্রতীত হউক না কেন, যতই ভীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হউক না কেন, দৃঢ় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে, সেই উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠ হইতে হইবে এবং কঠোরতার মধ্য দিয়াই আমাদের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

প্রাচীন শিল্প ও ব্যবসায়-বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র শিল্পী ও কারিগর কর্ম্মহীন হইয়া পড়িয়াছে। নূতন নূতন যাহাও আরব্ধ হইতেছে তাহাতে সকলের অন্ন-সংস্থান অসম্ভব। যে বৈষয়িক বিপ্লবের যুগ

চলিতেছে তাহাতে নানা প্রকার বাধা, বিঘ্ন ও দুর্ব্বিপাক অবশ্যম্ভাবী। লোকগুলি এখন অসহায় ও সম্বলহীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অনেকেই অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে, ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। আধুনিক সময়ে শ্রমজীবিগণের অভাব খুব বেশী সন্দেহ নাই এবং উপার্জ্জনও বেশ হইতেছে। সকল জিনিষেরই মূল্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারিশ্রমিক বৃদ্ধি হইয়াছে। বর্ত্তমান বৈষয়িক অবস্থার একটা বিশেষ লক্ষণ এই যে কেরাণী অপেক্ষাও একজন কুলি আজকাল বেশী উপার্জ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু গৃহশিল্প বিলোপ পাইয়াছে, শিল্পকেন্দ্র স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত শ্রমজীবিগণের অভাব সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইতেছে। মানুষগুলি পরিশ্রম-কাতর, একস্থান হইতে সহজে অন্য স্থানে যাইতে চাহে না, পুরাতন গণ্ডী পরিত্যাগ করিয়া নূতন ভাবে নিজস্ব স্থাপন করিতে নিতান্তই কুণ্ঠিত হইয়া থাকে।

এই জড়তাকে পদাঘাত করিয়া, সুষুপ্তিকে জয় করিয়া এই পরিবর্ত্তনের যুগ চলিয়া যাইবে, সকলই প্রচণ্ড চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে, সমস্তই নিজ নিজ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু এই উপস্থিত বিপদ ও বিঘ্ন হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে, শিল্প ও ব্যবসায়ের সুদূর প্রসার ব্যতীত আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। ইহা ছাড়া অবলম্বন করিবার আর কোন উপায় নাই। এখন কি প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, ভারতের বিশেষত্ব কি প্রকারে সংরক্ষিত হইবে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার কোন্ পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হইবে, তদ্বিষয়ের সম্যক আলোচনা ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই কথা যেন আমাদের মনে আঘাতের পর আঘাত করে, আমাদের তমোভাবাপন্ন শান্তি নষ্ট করিয়া দেয় এবং আমরা যেন গড্ডালিকাপ্রবাহ ছাড়িয়া সময়োপযোগী নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন ও পন্থার অনুসরণ করিয়া প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যত্বের উচ্চ সোপানে অধিরূঢ় হইতে পারি।

* *

১০। জনসাধারণের মনুষ্যত্ব

সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা শিক্ষার সুযোগ পাইয়াও স্ব স্ব সমাজে যে কল্যাণ সাধন করিতে পারিতেছেন না, দেখা যায়, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সম্পূর্ণ নিরক্ষর থাকিয়াও তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে। শিক্ষিতগণ বিদ্যুদ্ব্যজন ও বৈদ্যুতদীপ-পরিশোভিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সভা-সমিতি স্থাপন করিয়া, দীর্ঘ-দীর্ঘ সংকল্প প্রস্তাব করিয়া, ও সংবাদপত্রসমূহের লেখনী প্রভাবে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়া, বহুদিবসেও সমাজের যে সংস্কার করিতে সমর্থ না হন, নিরক্ষরগণ মলিন পর্ণশালায় একটি-মাত্র বৈঠক বসাইয়া নিমেষ মধ্যে তাহা অপেক্ষা অধিকতর কার্য্য করিতে পারে। ইহারা যাহা হিত বা অহিত বলিয়া ধারণা করে, তাহা গ্রহণ বা বর্জ্জন করিবেই, সে শক্তি তাহাদের আছে, সেইরূপ ঐক্যবন্ধন করিবার সামর্থ্য তাহাদের রহিয়াছে। ব্যক্তি-গত ক্ষতি হইলেও সমগ্র সমাজের মঙ্গলের জন্য তাহা তাহারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে;

অথবা অনিচ্ছা থাকিলেও সমগ্র সমাজের প্রভাবে তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। দশের নিকটে তাহারা অবনত। দশের কথা শুনিতে তাহারা বাধ্য। গণশক্তিকে না মানিয়া তাহাদের উপায় নাই। গণের নিকটে ব্যক্তিকে অবনত থাকিতে হইবে ইহা তাহাদের যুক্তিমূলক প্রাচীন সংস্কার। অপরপক্ষে সামাজিক কার্য্যকলাপে বর্ত্তমান শিক্ষিতসম্প্রদায় গণ অপেক্ষা ব্যক্তিগত প্রাধান্যের পক্ষপাতী, ইহারা ব্যক্তিগত প্রাধান্য-প্রার্থী হইয়া গণকে বিদলিত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন। গণের অপেক্ষা ব্যক্তিরই শুভাশুভের দিকে ইঁহাদের লক্ষ্য বেশী। গণের অধীন হইয়া থাকিতে ইঁহারা আদৌ অভিলাষ করেন না। এই জন্যই ইঁহাদের সমাজের বন্ধন শিথিল হইতে শিথিলতর হইয়া লোপোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, এবং সেই জন্যই ইচ্ছা থাকিলেও ইঁহাদের সমাজ-সংস্কার দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। কণ্ঠধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিলেও কাহারও মোহ-নিদ্রা অপগত হয় না। আমাদের জনসাধারণের চরিত্রবত্তার পরিচয় "ব্রাহ্মণ-সমাজ" পত্রিকা হইতে প্রদত্ত হইতেছে। পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে :—

"মালদহের উত্তরভাগে হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল প্রভৃতি অঞ্চলে কোচ জাতির অনেক বসতি আছে। ইহারা শতকরা ৯৯ জন নিরক্ষর হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাদের সমাজ-সংস্কার যেরূপ দ্রুতগতিতে ও যুক্তিযুক্তভাবে চলিয়াছে, তাহা শিক্ষিতাভিমানী ভদ্রমহোদয়-গণের সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আলাপ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে তাহারা যথেচ্ছ-রূপে খাম-খেয়ালীভাবে সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহারা ভাল-মন্দ, শুভাশুভ আলোচনা করিয়া যুক্তির অনুসরণে এই সমস্ত কার্য্য করিতেছে। পূর্ব্বে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক উৎসবেও তাহারা মদ্য পান করিত। বিবাহের ন্যায় বৃহৎ উৎসব উপস্থিত হইলে মদের বড় বড় জালায় গোশালা অথবা তাদৃশ কোন উপযুক্ত স্থান পূর্ণ করা হইত, আর সমাগত স্বজনকুটুম্ব কয় দিন আকণ্ঠ পান করিয়া আনন্দ লাভ করিত। এই ব্যাপারের পরিণাম যাহা স্বাভাবিক, বলা বাহুল্য, সেখানেও তাহার অন্যথা হইত না। মদের মত্ততায় কুটুম্বগণ প্রায়ই পরস্পর বাদ-বিসংবাদ ও কলহ-চীৎকার করিয়া পরস্পরের মাথা ফাটাইয়া দিত। তখন তাহারা সকলে মিলিত হইয়া স্থির করিল, আর তাহারা মদ্য পান করিবে না। মদ্যের জন্য যে অর্থ ব্যয় হইত, তাহাদ্বারা এখন হইতে 'চিনির সরবৎ' খাওয়াইতে হইবে। তাহারা যাহা ঠিক করিয়াছে, কার্য্যেও তাহা চলিতেছে; আর তাহারা উৎসবে মদ্যপান করে না।

অল্প দিন হইল আর একটি সংস্কার করিয়াছে। পূর্ব্বে কন্যার শুল্ক গ্রহণ ইহাদের সমাজে অত্যল্প পরিমাণ গৃহীত হইত, কিন্তু কালক্রমে তাহা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। ইহার কুপরিণাম অল্পদিনেই তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একজন কোচের সহিত সেদিন কথা-বার্ত্তা কহিয়া দেখিয়াছি, সে আমাদের প্রশ্নের উত্তরে বলিল, কন্যাশুল্কের পরিমাণ বাড়িয়া উঠায় দুইটি ভয়ানক অপকার দেখা গিয়াছিল। প্রথমতঃ—কোচেরা প্রায়ই

দরিদ্র, কোনরূপে কায়ক্লেশে কিছু উপার্জ্জন করিয়া তাহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এ অবস্থায় উচ্চ শুল্ক প্রদান করিয়া বিবাহ করা তাহাদের মধ্যে অনেকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে; ৪০।৫০ বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও কেহ কেহ বিবাহ করিতে পারিত না, একসঙ্গে তত টাকা সংগ্রহ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আবার যাহারা বিবাহ করে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশকেই টাকা কর্জ্জ করিতে হয়, ঐ টাকার সুদ-বহন ও সম্পূর্ণ পরিশোধ করিতে তাহাদের সমস্ত জীবন কাটিয়া যায় এবং কখন কখন বা তাহাতেও শোধ হয় না, পরবর্ত্তী সন্তানগণকে তাহার অংশ গ্রহণ করিতে হয়। আবার পুরুষেরা বিবাহ করিতে না পারায় নানারূপ অসৎ উপায়ে কামবৃত্তিকে চরিতার্থ করিত। দ্বিতীয়তঃ—অভিভাবক উচ্চ শুল্কের আশায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করায় কন্যাদের উপযুক্ত সময়ে বিবাহ হইত না, বহুকাল তাহাদিগকে পিতৃগৃহে থাকিতে হইত, এবং প্রায়ই অসৎ-প্রবৃত্তি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া নানারূপ পাপে প্রবর্ত্তিত হইত। যে কোচটির সহিত আমাদের আলাপ হইয়াছিল সে সম্পূর্ণ নিরক্ষর; কিন্তু তাহা হইলেও সে তাহাদের সমাজে কন্যাশুল্ক-গ্রহণের বিরুদ্ধে ঐরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহার উল্লিখিত যুক্তিদুইটি কিঞ্চিন্মাত্রও অতি-রঞ্জিত করা হয় নাই; সে যাহা বলিয়াছিল, তাহাই কেবল ভদ্রভাষায় লিখিত হইয়াছে।

সমাজের মণ্ডলেরা যখন কন্যাশুল্কের এইরূপ ভীষণ পরিণাম দেখিতে পাইল, তখনই তাহারা স্বজাতিবর্গকে সমবেত করিয়া স্থির করিল এখন হইতে কন্যাশুল্ক গ্রহণ না করাই প্রশংসনীয় সৎকার্য্য ব দয়া পরিগণিত হইবে; যতদূর পারা যায় কেহই তাহা না লইবার চেষ্টা করিবে; যা ার তাহা বর্জ্জন করা নিতান্ত অসুবিধা বোধ হইবে সে চব্বিশ টাকার অধিক গ্রহণ করিতে পারিবে না (পূর্ব্বে ১৫০ বা ততোধিক উঠিয়াছিল)। এখন হইতে কন্যাশুল্ক গ্রহণ করার পরিবর্ত্তে বরং বরকেই সম্মানসূচক কিছু দক্ষিণা দিতে হইবে, এবং ইহার পরিমাণ এক টাকা।

কোচেদের সমস্ত বিবাহ এখন এইরূপে সম্পন্ন হইতেছে। ভগবান্ তাহাদের শুভবুদ্ধি উত্তরোত্তর বর্দ্ধন করুন।

এখন যদি আমাদের নিজেদের দিকে দৃষ্টি-পাত করি, তাহা হইলে দেখিব আমাদের গতি বিপরীত। আমরা যাহা ত্যাগ করিতেছি, নিম্নশ্রেণীরা তাহা স্বাগত সম্ভাষণে গ্রহণ করিয়াছে, আর তাহারা যাহা বর্জ্জন করিতেছে, আমরা আলিঙ্গন করিতেছি। আমাদের যাহা সৎ ছিল, তাহা তাহারা লইতেছে, এবং তাহাদের যাহা অসৎ ছিল তাহা আমরা লইতেছি।

আজ যাঁহারা উচ্চ, ভদ্র, শিক্ষিত বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, উচ্চ সম্প্রদায়ে, উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, বর্ণ, শিক্ষা ও কৌলীন্যা-দির উল্লেখ করিয়া অভিমানে বক্ষঃস্থল স্ফীত করিয়া পরিভ্রমণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই, ব্যক্তিগত দূরের কথা, সামাজিক সংস্থানও এতদূর কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা বলিবার নহে। বহু স্থলে দেখিয়াছি ও অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি, মদ্যের

ব্যবস্থা না হইলে বিবাহাদি উৎসব সম্পূর্ণ হয় না। মহাপ্রভু বরযাত্রিগণের জন্য তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয়। মদ না দিলে তাঁহাদের অসন্তোষের সীমা থাকে না। এই ভৈরবপিশাচগণের মদ্যধারায় উপাসনা করিতে না পারিলে, দীন-দুর্ব্বল সাধক কন্যার পিতার আর রক্ষার উপায় নাই। সমাজান্তরের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-সমাজেরও মধ্যে এই ব্যাপার অবাধে প্রসার লাভ করিয়া উঠিয়াছে। এই সমাজেরই কোন কোন স্থানের ঘটনা লক্ষ্য করিয়া আমরা ইহা স্পষ্ট বলিতে সাহসী হইতেছি, কোন অসত্য কথা আরোপ করা হইতেছে না। যাঁহারা বলেন—

"সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ"।

তাঁহাদেরই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাঁহাদেরই নামে পরিচয় প্রদান করিয়া, তাঁহাদেরই উল্লেখে গর্ব্ব গৌরব অনুভব করিয়া, ব্রাহ্মণত্বের অভিমান করিয়া এই বীভৎস ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে ইঁহাদের ক্ষণকালেরও জন্য লজ্জায় বদনমণ্ডল লোহিত হইয়া উঠে না। হস্ত হইতে মদ্যপাত্র স্খলিত হইয়া পড়িয়া যায় না! ধিক্ ইঁহাদের শিক্ষায়! ধিক্ ইঁহাদের বংশাভিমানে! এবং শত শত ধিক্ ইঁহাদের ব্রাহ্মণ্যে! ব্রাহ্মণকে বলিতে হইবে, বুঝাইতে হইবে 'তুমি সুরা পান করিও না'! ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি থাকিতে পারে? ইহার জন্য সভা-সমিতিতে প্রস্তাব করিয়া, গ্রামে গ্রামে প্রচারক প্রেরণ করিয়া, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া আন্দোলন করিয়া বেড়াইতে হইবে, ইহা কোন যথার্থ ব্রাহ্মণ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। হায়! হায়! সমাজের এইরূপই অধঃপতন হইয়াছে! এই সময়ে ইঁহারা একবার ঐ নিকৃষ্ট কোচেদের সমাজের কথা মনে করিবেন কি? তাহাদের কন্যাশুল্ক-অপনয়নের কথাটা ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ ত অবশ্যই আমাদের হইবে না!"

১১। প্রাচীন ভারতে কামান-বন্দুক

আজ কাল নানা প্রমাণ দ্বারা হিন্দুজাতির বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় সভ্যতার চিত্র স্পষ্টীকৃত হইতেছে। "সাহিত্য-সংবাদ" পত্রিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে।

"কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের একটী মন্ত্রে সূর্ম্মী-যন্ত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে সূর্ম্মী-যন্ত্রকে কামান-যন্ত্র বলিয়াই অনুভূত হয়। সূর্ম্মী শব্দের অর্থ—"জলন্তী লৌহময়ী স্থূণা সূর্ম্মী।" সূর্ম্মীর মধ্য হইতে অর্থাৎ লৌহের নলের মধ্য দিয়া অগ্নিপিণ্ড নির্গত হইয়া শত্রু বিনাশ করে,—উক্ত বর্ণনায় তাহাই প্রতীত হয়। অথর্ব্ব-বেদের মন্ত্রে যে বর্ণনা দেখিতে পাই, তাহাতে লৌহ-নলের মধ্য হইতে জলন্ত সীসক পিণ্ড বাহির হইয়া শত্রুহনন করিতেছে, প্রমাণ পাই। বেদোক্ত সূর্ম্মী-যন্ত্রের সহিত "নালিক"নামক যুদ্ধাস্ত্রের সাদৃশ্য অনুভূত হয়। রামায়ণে, মহাভারতে এবং শুক্রনীতি-গ্রন্থে নালিক যন্ত্রের বর্ণনা আছে। শুক্রনীতির বর্ণনা পাঠ করিলে লঘুনালিক এবং দীর্ঘনালিকের পরিচয়ে তদুভয়কে বন্দুক ও কামান বুঝিতে পারা যায়। শ্লোকার্থে প্রতীত হয়,—"বৃহৎ ও ক্ষুদ্রভেদে নালিক যন্ত্র দুই প্রকার। ক্ষুদ্রনালিকের লক্ষণ এইরূপ,—

পঞ্চ বিতস্তি পরিমাণ (চারি হাত লম্বা) নাল বা নল (লৌহনির্ম্মিত), তাহার মূলে তির্য্যগ্‌দিকে (আড়ভাবে) একটী ছিদ্র, মূল ও অগ্রভাগে লক্ষ্য ঠিক করিবার জন্য তিলবিন্দু (মাছি) যন্ত্রে আঘাত পাইবা মাত্র অগ্নি নির্গত হয়, এরূপ প্রস্তরখণ্ড, সেইস্থানে অগ্নিচূর্ণের (বারুদের) আধারস্বরূপ একটী কর্ণ, উত্তম কাষ্ঠের উপাঙ্গ বা বুধ্ন অর্থাৎ ধরিবার মুঠ, এতদ্রূপ নালাস্ত্রের মধ্যগর্ত্তের পরিমাণ মধ্যমাঙ্গুলি অর্থাৎ তর্জ্জনী-নামক অঙ্গুলি প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ গর্ত্ত। তাহার মধ্যে অগ্নিচূর্ণ প্রোথিত করণের দৃঢ় শলাকা। এরূপ নালাস্ত্রের নাম লঘুনালিকা। এই লঘুনালিকা পদাতিক সৈন্য এবং অশ্বারোহী সৈন্যেরাই ব্যবহার করিবে। দীর্ঘনালিকের লক্ষণ এই যে, উহার ত্বক যত কঠিন হইবে, উহার আয়তন যত বড় হইবে, উহার গর্ত্ত যত স্থূল হইবে, তাহার গোলা যত বড় হইবে, সে ততই দূরভেদী হইবে। তাহার মূলদেশে কীলক বা ধরিবার মুঠ নাই, শকট ও উষ্ট্র প্রভৃতি দ্বারা তাহা সংবাহিত হয়। উহা উপযুক্তরূপে স্থাপিত হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে জয়প্রদ হয়।"

রামায়ণে লঙ্কার দুর্ভেদ্যতার বর্ণন-ব্যপদেশে মহাকবি বাল্মীকি যে শতঘ্নী যন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, কামান ভিন্ন তাহা অন্য কিছুই হইতে পারে না (রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড)। মৎস্যপুরাণে, সপ্তদশাধিক দ্বিশততমাধ্যায়ে রাজার দুর্গ-নির্ম্মাণের ও নগর-রক্ষার প্রণালী বিবৃত আছে। দুর্গের মধ্যে জল-দুর্গের বিবরণ পাঠ করিলে নৌ-বাহিনীর বিষয় উপলব্ধি হয়। দুর্গসমূহ শতঘ্নী, নালিক ও অপরাপর যন্ত্রসমূহ দ্বারা সুরক্ষিত হইত। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ শতঘ্নীকে কামান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু-আইনের আলোচনা প্রসঙ্গে হালহেড লিখিয়া গিয়াছেন,—"A cannon is called *Shataghnee* or the weapon that kills one hundred men at once." (Halhed's *Code* of *Gentoo Laws.*) তিনি আরও লিখিয়াছেন,—"Gun-powder has been known in China as well as in Hindusthan, far beyond all periods of investigation." মাসিডনাধিপতি মহাবীর আলেকজান্দার যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখনও ভারতবর্ষে কামান-বন্দুকের প্রচলন ছিল। এরিষ্টটলকে আলেকজান্দার এক পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে যুদ্ধের সময় ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্য হইতে তিনি ভয়ানক অগ্নিবর্ষণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক থেমিষ্টিয়াস্ লিখিয়া গিয়াছেন,—"বজ্র ও বিদ্যুতের সাহায্যে ব্রাহ্মণগণ দূর হইতে যুদ্ধ করিতেন।" আলেকজান্দারের যুদ্ধবর্ণন-প্রসঙ্গে ফিলাষ্ট্রেটস বলিয়া গিয়াছেন,—"বৈদেশিকগণ ভারতীয় সৈন্যগণকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে, তাঁহারা বজ্র ও অগ্নিময় ঘূর্ণিবায়ুর সাহায্যে আক্রমণকারীকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।" অধ্যাপক উইলসন বলেন,—'সে বজ্র আর কিছুই নয়। সে বজ্রের বর্ণনায় বুঝা যায়, ভারতে বারুদের ও কামান-বন্দুকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল।"

* *
*

১২। আন্ধ্র সম্মিলন

মাদ্রাজ প্রদেশের বাপৎলানগরে ইতিমধ্যে তেলেগু ভাষাভাষী আন্ধ্রদিগের একটা সম্মিলনের বৈঠক বসিয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয়-উন্নতি-সাধন। বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। অন্ধ্রদেশের অনেক বড় বড় লোক ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। যে আদর্শ সহ তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ তাহা অতি মহান্। ভারতের প্রদেশসমূহ একদিন স্ব স্ব স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ডের অধীনে এক বিশাল যুক্ত-সাম্রাজ্য গঠন করিবে, এই তাঁহাদের আশা।

যদি ফরাসী ও ব্রিটিশের একত্রে কানাডায় বাস সম্ভব, যদি বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বাস সম্ভব এবং যদি ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস্ প্রভৃতি স্বতন্ত্র রাজ্যগুলির এক 'ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডে'র শাসনাধীন হওয়া সম্ভব, তবে ভারতবর্ষে তামিল, তেলেগু, বাঙ্গালী, বিহারী, উড়িয়া, মারাঠা প্রভৃতি জাতির পক্ষে তাহা অসম্ভব হইবে কেন? তাঁহাদের মত, ভারতের প্রত্যেক জাতি তাহার প্রাদেশিক মহাসভায় (Parliament) নিজের ভাষা ব্যবহার করিবে, ইংরাজী কেবল রাজভাষা হইবে; সামরিক বিভাগ ও নৌবিভাগের ন্যায় রাজকীয় প্রতিষ্ঠানগুলি রাজার মহাসভার কর্তৃত্বাধীনে এবং অন্যান্য সমস্তই প্রাদেশিক সভার অধীনে থাকিবে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেরও এদিকে দৃষ্টি নিপতিত হওয়া আবশ্যক। "মডার্ণ রিভিউ" হইতে এই সম্মিলন-ইতিহাস এখানে আমরা অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।"

"সম্মিলন-মণ্ডপের শোভা অনির্ব্বচনীয়। এ পর্য্যন্ত জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের জন্য যতটা মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার কোনটিই সৌন্দর্য্যে ইহাপেক্ষা গরীয়ান্ নহে। সুন্দর রঙ্গিন্ কাগজ, নারিকেল পাতা, নানাপ্রকার ঊর্দ্ধলম্বিত দোদুল্যমান দ্রব্যাদিদ্বারা উহা সুন্দর রূপে পরিশোভিত হইয়াছিল। সপ্তবিংশতি সিংহদ্বারা পরিবেষ্টিত এই গৃহের প্রত্যেক দরজার শিরোদেশে কোন বিখ্যাত আন্ধ্র সম্রাট, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা বা কবির নাম সোনালী অক্ষরে সজ্জিত ও তাহার চারিদিকে তাঁহার গুণগীতি বৃত্তাকারে পরিকল্পিত ও চিত্রিত হইয়াছিল। এই সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় নামের মধ্যে প্রথম আন্ধ্র সম্রাট, আন্ধ্র বিষ্ণু, বিজয়নগর-বংশের আদি পুরুষ কৃষ্ণদেব রায়, কালিদাসের ন্যায় অমর আন্ধ্র কবি ও শেষ অন্ধ্ররাজ গণ্টুর, কৃষ্ণা প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতি বেঙ্কটাদ্রি নাইডু, বিখ্যাত কবি ও মহাভারত অনুবাদক নান্নয় ও তিক্কন, বেদবিদ্, টীকাকার ও প্রাচীন সমাজ-সংস্কারক বিদ্যারণ্য, অপষ্টম্ভ, শালিবাহন, ত্যাগয়, বেমন প্রভৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র সহর বাপৎলায় এমন দৃশ্য আর কোন দিন দেখা যায় নাই।

এই সভায় সুদূর নাগপুর ও হায়দরাবাদ প্রভৃতি তেলেগুদেশের সর্ব্বাংশ হইতেই প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। তামিল-ভাষাভাষী জেলা সকলের উপনিবিষ্ট তেলেগুগণও ক্ষান্ত ছিলেন না। যখন শোভা-যাত্রা করিয়া সভ্যগণ মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, প্রতিনিধি ও দর্শকগণে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। প্রায় দুইশত মহিলা তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট-স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। যখন সভাপতি

তাঁহার আসনে উপবিষ্ট হন, তখন সকলে 'বন্দে মাতরম্' ও 'অন্ধ্রমাতাকী জয়' রবে সভাতল প্রকম্পিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সভাপতি ও অন্যান্য কতিপয় ভদ্রলোকের গলদেশে মাল্যদান করা হইলে, মাসুলিপাটাম 'আন্ধ্র জাতীয় কলা-শালার' বালকগণের উপনিষদ-শ্লোকাবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। নানাধর্ম্মাবলম্বী লোকে নানা প্রার্থনাগীতি পাঠ করিলেন। অতঃপর আমাদের জাতীয় গীত বঙ্কিমচন্দ্রের সেই 'বন্দে মাতরম্' কলিকাতায় শিক্ষিত একজন আন্ধ্র যুবকের দ্বারা সুললিত স্বরে গীত হইল। গীতের সময় সকলের হৃদয় দেশহিতৈষণার ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পুষ্প বিতরিত হইতেছিল, সকলেই তাহা সাত্ত্বিক ধর্ম্মভাবে গ্রহণ করিলেন। মাননীয় মিঃ শর্ম্মা সভাপতি পদে বৃত হইলেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় শিক্ষা সম্বন্ধে সমধিক আলোচনা করিয়া মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার অনাদরের প্রতি সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলেন। আমাদের বাঙ্গালী শিক্ষাপ্রচারকগণের ন্যায় তিনিও বলেন, কেবল মাতৃভাষার সাহায্যে সাধারণ্যে অধিক শিক্ষাপ্রচার সম্ভব। তারপর তিনি তেলেগু-ভাষাভাষী জেলা সকলের জন্য একটা স্বতন্ত্রবিশ্ববিদ্যালয়, ভেলোর ও বেলারিতে একটা আর্ট কলেজ, ভিজাগাপাটামে মেডিক্যাল কলেজ, ধলেশ্বরমে এঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ও দেশের সর্ব্বত্র ব্যবসা, শিল্প ও কৃষিবিষয়ক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা সকলের নিকট প্রচার করিলেন। মাদ্রাজ প্রদেশে আন্ধ্র-জাতি কত নিম্নে অবস্থিত সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়া বলিলেন, শিক্ষাপ্রচারে মাতৃভাষাকে প্রথম ও ইংরাজীকে দ্বিতীয় স্থান দিলে তবে আমাদের জাতীয় উন্নতির পথ সুগম হইতে পারে।

এই সভায় অন্ধ্র-প্রদেশগঠন-বিষয়ক একটা প্রস্তাব হইয়াছিল। ইহাতে শুধু অন্ধ্র-প্রদেশ-গঠন নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে ভাষা-হিসাবে প্রদেশ-গঠন ও প্রত্যেক বিভাগকে প্রাদেশিকস্বাধীনতা-দানের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাবের ভারও নিহিত ছিল। বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষী লইয়া বঙ্গদেশ, উড়িয়া-ভাষা-ভাষী লইয়া উড়িষ্যা, হিন্দী-ভাষাভাষীদের লইয়া হিন্দুস্থান, মারাঠী-ভাষাভাষীদের লইয়া মহারাষ্ট্র, আন্ধ্রভাষীদের লইয়া অন্ধ্র-প্রদেশ এইরূপে ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশ গঠিত হউক এবং প্রত্যেক প্রদেশের সামরিক, বিচার, শাসন সমস্ত বিভাগের কর্ম্মে সেই দেশের লোক নিয়োজিত হউক, ইহাই সে প্রস্তাবের প্রকৃত মর্ম্ম। সভাপতি এই প্রস্তাবে বলিলেন, যতক্ষণ সাধারণের মত ইহার অনুকূল হইয়া স্বপ্রকাশ না হয় ততক্ষণ এ বিষয়ে আমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। পুনরায় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইলে সভাপতি সভা-ভঙ্গের আদেশ দিলেন। আগামী বর্ষে মাসলিপাটামে সম্মিলন হইবে স্থির হইল।

উক্ত সভায় ত্রয়োদশটি প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়, তন্মধ্যে দুই একটি আমরা পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি; ইহাতেই বুঝিবেন এই সম্মিলনের আদর্শ কত বড়। "এই সম্মিলন সসম্মানে সরকারের গোচর করিতেছেন যে

সরকার নর্দ্দার্ণ সরকারবাসী হিন্দুগণের সিপাহী-রূপে রাজসৈন্যদলে প্রবেশ নিষেধসূচক নিয়ম দ্বারা তাহাদিগকে রাজ্যরক্ষা ব্যাপারে ন্যায্য অংশ গ্রহণের যে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহা তাহাদের পক্ষে মঙ্গলদায়ক নহে; সুতরাং এই সভা অনুরোধ করেন যে ঐ নিষেধাজ্ঞা উচ্ছেদ করা হউক।"

"এই সম্মিলন এই মত প্রকাশ করিতেছেন যে, সম্পূর্ণ জাতীয় প্রণালীতে পরিচালিত মাসলিপাটামের জাতীয় বিদ্যামন্দির (National College), বেতপালের সারদা-নিকেতন, আন্ধ্র ভাষা-বৃদ্ধি-সঙ্ঘ, তেলেগু শিক্ষালয় (Telugu Academy) ও রাজমহেন্দ্রীর জাতীয় বিদ্যালয়কে বিবিধ প্রকারে উৎসাহিত করিতে সকলে যত্নবান হউন।"

"এই সভার মত যে, গোখেলের ভারতবর্ষীয় সেবক-সম্প্রদায়ের অনুকরণে 'আন্ধ্র সেবক-সঙ্ঘম্' নামে একটি সমিতি গঠিত হউক ও এই সভা সম্মিলনের কমিটিকে এই উদ্দেশ্যে একটি নিয়মাবলী (Scheme) প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করিতেছেন।"

* *
*

১৩। উপায় কি ?

মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের জীবন-সংগ্রাম যে ক্রমে কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিতেছে, এ কথা কাহাকেও বলিতে হইবে না। কেন এরূপ হইয়াছে তাহা বলিতেও বোধ হয় ত্রুটী করি নাই। আমরা লক্ষ্যহারা, দিশেহারা, পথহারা। তাই এই "হা অন্ন" রবে অন্নপূর্ণার পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের গগন নিনাদিত হইতেছে।

রণনিরত সৈনিকশ্রেণী সেনাপতির অভাবে যেমন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, কাণ্ডারী বিহনে তরণী যেরূপ নিজগতি স্থির করিতে পারে না, দিগদর্শন-যন্ত্র অভাবে অর্ণবপোত যেরূপ মহার্ণবে কূলের কিনারা করিতে সমর্থ হয় না, আমাদের জীবন-যাত্রাও সেইরূপ কাণ্ডারীবিহীন তরণীর ন্যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। আমরা কি ছিলাম কি হইয়াছি, এ কথা ভাবিবার সময়ও আমাদের হয় না। পাশ্চাত্যের প্রবল স্রোতে স্রোত-চালিত শৈবালের ন্যায় আমরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছি।

জড়জগতের আপাতরমণীয় সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধচিত্ত হইয়া আমরা আধ্যাত্মিকতার অমৃতময় রসাস্বাদন একেবারে বিস্মৃত হইয়াছি। পারত্রিকের সুখ ভুলিয়া ঐহিকের জন্য লালায়িত হইয়াছি, তাই আমাদের আদর্শ নীচ হইয়া পড়িয়াছে। লক্ষ লক্ষ পথের লোক যোজন দূরে গিয়াছে, পথ অন্ধকারের আবরণে আবৃত হইয়াছে।

যে আর্য্যমুনিঋষিগণ বৃক্ষের বল্কল পরিধান করিয়া, অরণ্যের ফলমূল ভক্ষণ করিয়া, সারাজীবন জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভের জন্য যত্নপরায়ণ থাকিতেন, যাঁহারা বহুশ্রমলব্ধ এই সত্য ও জ্ঞান অকাতরে নরনারীকে প্রদান করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞানে, সত্যে, ন্যায়ে ও ধর্ম্মে উন্নত করিতেন—যাঁহারা

বিলাস-লালসার প্রলোভন হইতে সর্ব্বদা নিরাসক্ত থাকিবার জন্য লোকালয় হইতে দূরে বাস করিতেন, আজ তাঁহাদের বংশধরেরা হ্যাট-কোট পরিয়া, খানা খাইয়া, গৃহিণীকে বিবি সাজাইয়া, বলে নাচাইয়া করমর্দ্দন করাইয়া আপনাদের ঐহিক জীবন ধন্য মনে করিতেছেন। যে ব্রাহ্মণ হিন্দুসমাজের আদর্শ ছিল, শীর্ষস্থানীয় ছিল, মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল, বৃহৎ হিন্দুসমাজরূপ সুরম্য প্রাসাদের স্তম্ভস্বরূপ ছিল, আজ তাঁহারা কোথায়? তাঁহারা সমাজের কোন্ স্থান অধিকার করিয়া কি কার্য্যে ব্রতী আছেন, তাহা একবার অনুসন্ধান করিতে হইবে কি? অনুসন্ধান করিতে হইবে না, পাঠক চোখের সামনে তাহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পারিবেন। সে দৃষ্টান্ত দেখিয়া কি আপনার চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইবে না?

পূর্ব্বকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া আধুনিক ঐতিহাসিক যুগের কথা বলি। শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস ইঁহারা কি সেই ঋষিকুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই? ইঁহারা যে আদর্শ দিয়াছিলেন তাহা কি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে?

অক্ষুণ্ণ থাকিবে কেমনে? অক্ষুণ্ণ রাখিবে কে? যে সর্ষপ দ্বারা ভূত বিতাড়িত করিতে হইবে তাহা যদি ভূতগ্রস্ত হয় তবে ভূত তাড়াইবে কে? ব্রাহ্মণ হিন্দুসমাজের আদর্শ, হিন্দুসমাজের চালক, হিন্দুসমাজের শাসক এবং সংস্কারক। সেই ব্রাহ্মণ যদি অধঃপতিত হয়, তবে সমাজের উন্নতি করিবে কে?

আদর্শ দেখাইবে কে—শিখাইবে কে? ব্রাহ্মণ আর্য্যসভ্যতার প্রথম হইতে—সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই পবিত্র কর্ত্তব্য ভার গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে, ব্রাহ্মণ এই পবিত্র কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে। এখন সে কর্ত্তব্য কে পালন করিবে? কাহার সে ক্ষমতা আছে?

আমরা জানি, ইহার অনেক অন্তরায় আছে। দেশ-কালপাত্র-ঘটিত অনেক বাধা-বিঘ্ন বর্ত্তমান। লোকের প্রবৃত্তি এবং শিক্ষার গতি—জড়ত্বের গৌরবাকাঙ্ক্ষা লাভ করিতেছে। আমরা জানি আধ্যাত্মিকতা এখন অভিভূত, জড়ত্বের গৌরব জয়যুক্ত। কিন্তু এই বাধা-বিঘ্ন দেখিয়া ভীত হইলে চলিবে না। ভীত হইলে—পশ্চাৎপদ হইলে দেশ অতল জলে ডুবিবে।

যদি বল জড়ত্বের উন্নতিতে জগৎ যদি উন্নত হয়, তবে ভারত কেন হইবে না? কেন হইবে না বলিব? হইবে না, তাহার কারণ ভারতের লক্ষ্য এবং জড়ত্ববাদী পাশ্চাত্য জগতের লক্ষ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভারতের লক্ষ্য অন্তর্মুখী—পাশ্চাত্যের লক্ষ্য বহির্ম্মুখী। ভারত ঈশ্বরের উপাসক—ভারত মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করে—অর্থের অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা জানে না। ভারতের সভ্যতা প্রধানতঃ ধর্ম্মনীতির উপর, আর পাশ্চাত্যের সভ্যতা অর্থনীতির উপর নিহিত। ভারত মর্ত্ত্যের জীবন-কালকে অনন্তের তুলনায় অতি তুচ্ছ সময় মনে করে, সুতরাং এই মর্ত্ত্যজীবনের উন্নতি বা অবনতিতে সে বিচলিত হয় না। তাহার লক্ষ্য অনন্তের দিকে। পাশ্চাত্য ইহজীবনের

উন্নতিকেই চরম উৎকর্ষ বলিয়া মনে করে। ভারতের জলবায়ু ভারতের চন্দ্রসূর্য্য ভারতের বৃক্ষলতা এ সভ্যতার বিরোধী।

কার্য্য যতই সুকঠিন হউক না কেন, সভ্যতার সেই পুরাতন আদর্শকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। তবে ভারতের উন্নতি হইবে, নচেৎ নহে। যদি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে এই ভারতের বক্ষে স্থান দিতে সংকল্প কর তবে হিতে বিপরীত হইবে।

ভগবান যুগে যুগে ভারতবর্ষকে সঙ্কটে রক্ষা করিয়াছেন। যখনই ভারতবাসী লক্ষ্যভ্রষ্ট পথভ্রষ্ট হইয়াছে তখনই এক এক জন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া অঙ্গুলি-সঙ্কেতে ভারতকে গন্তব্য পথে লইয়া গিয়াছেন। আমাদের মনে হয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঘোর সংঘর্ষ সময়ে—এই ঘোর সঙ্কট কালে, একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব আবশ্যক হইয়াছে, যিনি ভারতবাসীকে সুপথে লইয়া যাইতে সমর্থ হইবেন। আমরা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিয়া আশ্বস্ত হৃদয়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

উপরের আলোচনাটি আমরা 'জাগরণ' হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি।

আমরা মনে করি, যে জাতির অতীত গৌরব আছে, সে জাতি মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা অনুভব না করিলে, তাহার মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়া যায়।

ভারতবাসীর সুদৃঢ় মেরুদণ্ড আছে—সেই জন্য সে সহজে তাহা ভগ্ন হইতে দিবে না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

* *
*

১৪। পারস্যে ইউরোপ

পারস্য এবং তিব্বত দেশ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের কি ভাবে চলা উচিত, লর্ড মর্লী সাহেব লর্ড কর্জ্জন সাহেবের প্রশ্নোত্তরে তাহা জানাইয়াছেন। পারস্যদেশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সাতটি বিষয়ের দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য থাকিবে।—

(১) ইঙ্গ-রুশীয়দিগের মধ্যে যে চুক্তিটা হইয়া গিয়াছে, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে অক্ষুন্ন রাখা।

(২) পারস্যের স্বাধীনতা রক্ষা করা। অর্থ, শাসন অথবা রাষ্ট্রীয় দিক হইতে এই দেশ আক্রমণ করা, অথবা ইহার বিভাগ সাধনে যোগদান করা অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) পারস্যের মঙ্গল সাধনে চেষ্টা করা।

(৪) পারস্যে কোন রকম একটা নিয়ম-তন্ত্র শাসন খাড়া করা।

(৫) মধ্যে মধ্যে পরামর্শ অথবা যথাসাধ্য সাহায্য দানে পারস্যের অন্তর্ব্বিপ্লবাদি দূরীকরণে প্রয়াস পাওয়া।

(৬) পারস্যের দক্ষিণদিকের রাস্তাগুলি যাহাতে ভাল হয়, অর্থ দ্বারা তাহার বন্দোবস্ত করা।

(৭) ইংলণ্ড যাহাতে দক্ষিণ পারস্যে বাণিজ্য-ব্যাপারে লিপ্ত না হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখা।

লর্ড মর্লী সাহেব আর একটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে চাহিয়াছেন। সেটি এই—ইংলণ্ডের এমন কিছু আচরণ করা

উচিত নয়, যাহাতে ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণের চিত্ত ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। কারণ আজকাল সমস্ত দেশের যাবতীয় মুসলমানের মধ্যেই একটা ক্ষোভের চিহ্ন দেখা যাইতেছে, ইহা ভীষণ হইয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা। সুতরাং পারস্যের পুনঃ-সংগঠন-ব্যাপারে ইংলণ্ডের এমন কোন অপ্রীতিকর ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে, যাহাতে ভারতীয় মুসলমানগণের ক্ষোভ বৃদ্ধি পায়। সেরূপ করিলে হয় ত তাহারা খোলাখুলি ভাবে রাজবিদ্রোহী না হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু রাজভক্তি ও রাজ্যের জন্য মঙ্গলকামনা যে তাহাদের মন হইতে ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* *
*

১৫। তিব্বতে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতি

মধ্যে ঘোষণা হইয়াছিল, তিব্বত চীন-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। ইংলণ্ড এ বিষয়ে বিশেষভাবে আপত্তি করেন। মর্লী সাহেব জানাইয়াছেন এই ঘোষণা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। তিব্বতের অন্তঃশাসনব্যাপারে চীন হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এখনও অনেক বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই। শীঘ্রই মীমাংসা হইবার কথা। তবে ইংলণ্ডের ইচ্ছা নাই যে, তিব্বতের অন্তঃশাসনব্যাপারে তাঁহারাও কোন দিন হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহাদের ইচ্ছা তিব্বতের সঙ্গে যাহাতে বন্ধুত্ব রক্ষা হয়, এবং সীমান্তপ্রদেশে শান্তি থাকে, তাহার চেষ্টা করা। রুশ-গবর্ণমেণ্টও এই ইচ্ছার অনুমোদন করিয়াছেন।

* *
*

১৬। উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষা

বিলাতে 'ভারতীয় সভা'য় ও 'পাবলিক সারভিস্ কমিশনে'র সদস্য স্যর্ থিওডোর মরিসন্ 'ইণ্ডিয়া হাউসে' সম্প্রতি একটা বক্তৃতা দিয়াছেন। উহাতে তিনি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষার সাহায্যে সকল বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। অনেক ভারতীয় ছাত্র এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। স্যর্ থিওডোর বলেন "আমরা ভারতে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিব। ইংরাজী শিক্ষায় ভারতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মাতৃভাষায় এই শিক্ষা দেওয়া হইলে অতি শীঘ্র আরও সুফল লাভ করিতে পারিতাম। ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দেওয়াতে ঐ দেশের মাতৃভাষা পুষ্ট হইতে পারে নাই, ভারতবাসীদের মধ্যে যাঁহারা সুন্দর ও মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদেরও চিন্তাসমূহ বিদেশীয় ভাষার পুষ্টি সাধন করিতেছে। তাঁহাদের চিন্তার ফল ঐ দেশস্থ লোক বেশী ভোগ করিতে পারিতেছে না। ছাত্রেরাও অন্য ভাষায় তাহাদের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। ছাত্রেরা অন্যভাষায় তাহাদের ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া কতকটা ক্ষতি-

গ্রস্ত হইতেছে। বিশেষতঃ শব্দেরও একটা শক্তি আছে; ভিন্ন দেশীয় ভাষায় মনের ভাব সব সময় প্রকাশ করা যায় না। ভারতের বর্ত্তমান দ্বিভাষা-ব্যবহার-প্রণালীর বিনাশ সাধন করা দরকার। আমরা এখন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার নিজ ভাষাসমূহের গৌরব বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পাইব।"

* *
*

১৭। ভারত-সাম্রাজ্যের দশ বৎসর

সন ১৯১১-১২ ও তৎপূর্ব্ব দশ বৎসরে ভারতবর্ষের বৈষয়িক ও নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে বিলাতের সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ভারতের "অশান্তি" সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সারাংশ দেওয়া গেল।

"১৯১১ হইতে ১৯১২ সালের মধ্যে সংঘটিত ব্যাপারগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের "অশান্তি" উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু এই অশান্তির দুইটা দিক আছে। প্রথমতঃ ভালর দিক,—তাহাতে দেখা যায়, শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ একটা সাগ্রহ দৃষ্টি পড়িয়াছে। ১৯০৯ সালের প্রসিদ্ধ "রিফর্ম্মে" (লর্ড মর্লির সংস্কার-বিল) ভারতবাসীর প্রাণে ব্যবস্থাপক সভায় স্থানলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মন্দের দিক,—তাহাতে দেখা যায়, এই অশান্তি ষড়যন্ত্র ও ভয়াবহ রাষ্ট্রীয় আন্দোলন প্রভৃতির আকার ধরিয়া রাজবিদ্রোহকর কার্য্যের কারণ হইয়াছে।

বঙ্গবিভাগের বহু পূর্ব্বে রাজবিদ্রোহকর সমিতিগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যে সমস্ত লোক এই সব কার্য্য হইতে দূরে থাকিত, এই সমিতিগুলি বিগত দুই তিন বৎসরে তাহাদিগকেও আকর্ষণ করিয়াছে। এইরূপে তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ পাইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কথা এই—অপরিপক্কবুদ্ধি বালকদিগেরই ইহারা বেশী সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তবে নানা উপায় অবলম্বন দ্বারা এই অবস্থার অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখা যায়। ভারতবাসীকে রাজকার্য্যে যোগ দিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করায় এখন চরমপন্থী এবং মৃদুপন্থীদিগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে।"

*　*　*

১৮। রুশিয়া

আমাদের দেশবাসী রুশিয়া সম্বন্ধে খুব কমই খোঁজ রাখেন। ছেলেবেলায় ভূগোলে পড়া গিয়াছিল তথাকার সম্রাট্ (Czar) স্বেচ্ছাচারী। হয় ত এই ধারণা এখনও অনেকে পোষণ করেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে স্বেচ্ছাচারিত্বের দিন আর নাই। এখন রাজ্যপরিচালনব্যাপারে জনসাধারণের অধিকার অগ্রাহ্য করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

তাই রুশিয়াতেও আর এখন এই ভাবের বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। আমাদের কথার প্রমাণস্বরূপে রুশিয়ার রাজস্বসচিব মিষ্টার কোকোভট্স‌্প সাহেবের "বজেট"-বক্তৃতা উল্লেখ করা যায়। উক্ত বক্তৃতাটি আলোচনা করিয়া স্যার ডি, ম্যাকেঞ্জি সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার মর্ম্মার্থ প্রদান করিলাম।—

১৯০৬ সালে জাপান-যুদ্ধের কিছু পরেই সম্রাট কর্ত্তৃক রুশিয়ার জাতীয় মহাসমিতি (ডুমা) আহূত হয়। বিগত জাপানযুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত ভ্রম-ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছেন, এই জাতীয় সমিতির মনোনীত প্রতিনিধিবর্গ সেইগুলির নিন্দা করেন এবং ইংলণ্ডের আদর্শে একটি নিয়ম-তন্ত্র শাসন সংস্থাপন করিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের এই চেষ্টায় বাধা দিলে, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের প্রায় প্রতি প্রস্তাবেরই প্রতিকূলে চলিতে আরম্ভ করেন। মন্ত্রীসভার কোন কৈফিয়তই তাঁহারা শুনিতে চাহেন না, এবং অবশেষে কর্ত্তৃপক্ষকে ভয় দেখাইবার জন্য জনসাধারণের সহানুভূতিলাভে অগ্রসর হন। এইরূপ বিদ্রোহকর কার্য্যের ফলে এই সভা আড়াই মাসের বেশী স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। পরবর্ত্তী সমিতিও পূর্ব্বোক্তরূপে বিদ্রোহভাবাপন্ন হইয়া উঠে এবং ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যসম্পাদনে নিতান্তই অসমর্থ হইয়া পড়ে।

প্রধান মন্ত্রীর সাগ্রহ চেষ্টায় তৃতীয় বার জাতীয় মহাসমিতি আহূত হয়। কিন্তু এইবার সভ্য নির্ব্বাচনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত এবং সমিতির অবস্থিতিকালও দীর্ঘ করা হয়। এই সমিতিদ্বারা ব্যবস্থাপক সভার কিছু কিছু কার্য্য হইয়াছে, এবং সমিতির বৈঠকও পাঁচ বৎসর ধরিয়া নিয়মিতভাবে চলিয়া আসিয়াছে।

সাত বৎসরের চেষ্টায় এখন দেখা যাইতেছে, মহাসমিতি এবং গবর্ণমেণ্ট মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারিতেছেন। সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নিন্দুকের দল নীরব হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন বড় সহজে হয় নাই। উভয় দলের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ অনেক হইয়াছিল। বিবাদের মূল অর্থ-সংঘটিত। কে তাহার অধিকার পাইবে, ইহা লইয়াই গণ্ডগোল। তবে শুনা যায়, "বজেট" ব্যাপারে উভয়পক্ষ অনেকটা মিলিত হইয়াছেন। এই মিলনের বহুবিধ কারণ আছে। তন্মধ্যে প্রধান একটি এই যে, জাতীয় সমিতি মনে করেন, এইরূপে গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রথম প্রথম মিলিয়া মিশিয়া কাজ না করিলে, তাঁহাদের আশা নাই। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, তাঁহারা রাষ্ট্রীয় নীতিশিক্ষায় অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা এইরূপে আরও কিছুদিন চলিলে রাষ্ট্রকার্য্যে তাঁহাদের প্রভাব ক্রমশই বাড়িয়া যাইবে। বজেটব্যাপারে তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব যেমন দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রের অন্যান্য বিষয়েও তাঁহাদের সেইরূপ কর্ত্তৃত্ব বিস্তৃত হইয়া উঠিবে।

* * *

১৯। মহীশূরে শিল্প "সংরক্ষণ"—

দেশে শিল্প-বাণিজ্য যতই প্রসার লাভ করিবে, আর্থিক অবস্থার যতই উন্নতি হইবে, স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের নূতন নূতন পন্থা যতই উদ্ভাবিত হইবে, ততই দেশের দারিদ্র্য ঘুচিবে, স্বাধীন চিন্তার প্রবাহ ছুটিবে, মৌলিকতা অনুকরণের স্থান অধিকার করিবে, বস্তুতঃ প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবে। আপামর সাধারণের মধ্যে উন্নতির এইরূপ স্পৃহা যতই বলবতী হইবে ততই দেশের মঙ্গল। জনসাধারণের মধ্যে শুধু বক্তৃতা দ্বারা এই ভাব প্রচারিত হইবে না, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিবে না। স্বাধীন কর্ম্মের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে,—স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের নানা প্রকার কারখানা স্থাপন করিয়া সকলকে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে।

সম্প্রতি মহীশূর-রাজ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে পৃথক একটী বিভাগ খোলা হইয়াছে। ইহার পরিচালকের প্রধান উদ্দেশ্য জনসাধারণকে উপদেশ দ্বারাই হউক, টাকা কর্জ্জ দান করিয়া হউক, অথবা যে কোন প্রকারেই হউক—শিল্প ও ব্যবসায়ে প্রবর্ত্তিত করা। কলকারখানা-স্থাপন, মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, জলসরবরাহ ও দমকলের সাহায্যে ক্ষেত্রে জল-সিঞ্চন, চাউল প্রস্তুত করিবার কল প্রভৃতি নূতন নূতন শিল্প ও ব্যবসায়ে তাহাদিগকে প্রবর্ত্তিত করিবার ভারও তাঁহারা লইয়াছেন। যাঁহারা ব্যক্তিগত অথবা যৌথ-কারবার করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে যথাসম্ভব বিনামূল্যে অনুষ্ঠানপত্র, আনুমানিক হিসাব প্রভৃতি ব্যবসায়-বাণিজ্যে যাহা অত্যা-বশ্যক, তাহা সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মহীশূর রাজ্যের এবং অন্যান্য শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্রের জনসাধারণের অবস্থা, সংখ্যা, আয়-ব্যয়াদিসম্বন্ধীয় সঠিক তথ্যাবলী সংগ্রহ এবং বিশেষভাবে মহীশূরদেশজাত দ্রব্যাদির প্রসার বিষয়ে আলোচনা করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। শীঘ্রই একটি তথ্যসংগ্রহ-কার্য্যালয় ও শিল্পজাত কল-কারখানা ও জিনিষ-পত্রের একটী প্রদর্শনী স্থাপিত হইবে। বস্ত্র-বয়ন, ইক্ষু ও রেশম চাষের উন্নতির জন্য মহীশূর গবর্ণমেণ্ট উক্ত পরিচালকের তত্ত্বাবধানে পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন।

দেশের প্রত্যেক রাজন্যবর্গ এমন কি জমিদারগণ নিজেদের রাজ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় না করিলে, দারিদ্র্যদুঃখ-প্রপীড়িত প্রজাগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কল-কারখানা প্রভৃতি নানা শিল্প ও ব্যবসায়ের কেন্দ্র স্থাপন না করিলে, ভারতের আর্থিক উন্নতি অসম্ভব। মহীশূরের দৃষ্টান্ত যতই অনুসৃত হইবে ততই দেশের মঙ্গল।

* *
*

২০। ভারতবর্ষের একটি অঙ্গ—ব্রহ্মদেশ

কিছুদিন পূর্ব্বেও আমাদের স্কুলপাঠ্য ভূগোলে ব্রহ্মদেশ "দূরতর ভারতবর্ষ" (Farther India) বলিয়া লিখিত হইত। আমরা তাহা হইতে বুঝিতে পারিতাম, ব্রহ্মদেশ আমাদের পর নহে। কিন্তু আজ-কালকার ভূগোলে সেরূপ লেখা আর দেখা যায় না। ব্রহ্মদেশ যে বাস্তবিকই ভারতবর্ষের অংশ বিশেষ এ ধারণাও ছেলেদের মন হইতে লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। তবে ইতিহাস বড় মুখর। সে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে থাকিবে—ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষেরই একটা অঙ্গ। যে হিসাবে সিংহল তাহার আপন, সেই হিসাবে ব্রহ্মদেশকে সে আপন না ভাবিয়া থাকিতে পারে না। কেননা, জগতের মধ্যে যেটি প্রধানতম দান—ধর্ম্ম, ব্রহ্মদেশ তাহাই ভারতের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। তাহার সমাজ, সংস্কার, বিধি, নিয়ম সমস্তই প্রায় ভারতের প্রদত্ত। এমন কি তাহার নগর, গ্রাম, হ্রদ, নদী ভারতবর্ষীয় নাম ধারণ করিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এখনও শরবতী (Thar awaddy), এখনও হংসবতী (Hanthawaddy), এখনও অমরপুর, ইরাবতী প্রভৃতি নাম শ্রুত হওয়া যায়। অধিকন্তু ব্রহ্মবাসীদিগের মন্ত্র, উপাসনা, ধর্ম্মগ্রন্থ সমস্তই পালিভাষায় প্রচলিত। এখনও তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান—বোধ-গয়া। তাহাদের জীবনের মধ্যে যেটি পরম স্থান অধিকার করিয়া আছে, সেই স্থানেই ভারতের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। সেই আধ্যাত্মিক জগতেই ভারতের রাজত্ব। বিজিতকে দুর্ব্বল করিয়া ভারতবর্ষ তাহার জয়পতাকা উড্ডীন করিতে ভালবাসে নাই। রাষ্ট্রীয় মিলনক্ষেত্র তাহার কাছে তুচ্ছ। বিজিতকে আধ্যাত্মিক ঐক্য-ভূমিতে উন্নীত করাই ভারতবর্ষীয় জেতাদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল। ইহাই তাহার বিশেষত্ব। ভারতের এই বিশেষত্বের ফলেই দেখিতে পাই—বিজিত জেতাদিগকে আপন হইতেও আপনার বলিয়া ভাবে, কোথাও কোনরূপ হিংসা-দ্বেষের লেশমাত্র উত্থিত হয় না।

আমরা জনৈক বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, একজন প্রাচীন ইংরাজী-অনভিজ্ঞ ব্রহ্মবাসী তাঁহার নিকটে বুদ্ধদেবকে ব্রহ্মদেশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। বলিয়াছিল, "কপিলাওট্টু" (কপিলাবাস্তু) ব্রহ্মদেশেরই বিস্মৃত কোন জনপদ! বৃদ্ধটি বুদ্ধদেবকে পর ভাবিতেও কষ্ট পায়। তাহার এই কষ্টই আমাদের পূর্ব্বোক্ত কথাটি প্রমাণ করিতেছে।

অতএব কোন কোন বিষয়ে বৈষম্য থাকি-লেও ব্রহ্মবাসীকে আমরা ভারতবর্ষেরই আর একটি প্রদেশবাসী বলিয়া ধরিলে বিশেষ কোন অন্যায় হয় না। এবং ইহা ন্যায়সঙ্গত মনে করিয়াই পূর্ব্বকার ভূগোললেখকগণ ব্রহ্ম-দেশকে "দূরতর ভারতবর্ষ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। জানি না এখন তাহার ব্যত্যয় ঘটিতেছে কেন!

* *
*

২১। শ্রীশ্রীহরনাথ অনাথ-আশ্রম

পূর্ব্বে যখন আমাদের দেশে রেল ষ্টীমার প্রভৃতি ছিল না, তখন এক দেশ হইতে অন্য এক দেশে যাইতে বড়ই কষ্ট ভোগ করিতে হইত। কিন্তু এখন গমনাগমনের বড়ই সুবিধা, আমাদের পথের কষ্ট একেবারেই সহ্য করিতে হয় না।

তবে প্রতি বিষয়েরই ভাল ও মন্দ দুইটা দিক আছে। পূর্ব্বে তীর্থদর্শনঅভিলাষে প্রায় সব হিন্দুই কষ্টকে আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কেন না তাঁহারা জানিতেন, কষ্টসহিষ্ণুতা শিক্ষা করাও জীবনের একটা প্রধান কর্ত্তব্য। তারপর পথে চলিতে চলিতে কত-গ্রাম, নগর, নদ, নদী তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে হইত। তাহাতে দেশকে তাঁহারা ভালরূপে চিনিতে পারিতেন—দেশের সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ পাইত। কিন্তু এখন রেল ষ্টীমারের দৌলতে আমরা ক্রমেই পঙ্গু হইতেছি—দেশ বিষয়েও আমরা অজ্ঞ হইয়া যাইতেছি। উড়ো দেখায় কোন দিকেই আমাদের সম্পূর্ণ লাভ হইতেছে না। আগে পথের কষ্টনিবারণজন্য সদাশয় দানবীর ব্যক্তি-বর্গের দ্বারা স্থানে স্থানে পান্থশালা, বিশ্রামাগার, ধর্ম্মশালা প্রভৃতি স্থাপিত হইত। তাহাতে একদিকে ধর্ম্মের জন্য আন্তরিকতা অন্য দিকে অর্থের সদ্ব্যবহার উভয়ই হিন্দুদিগের বজায় থাকিত। এখন সেই রূপ দানশীলতাও লুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

আগে যাত্রীরা পথের কষ্ট ভোগ করিত বলিয়া সকলেরই সহানুভূতির পাত্র হইত। কিন্তু এখন পাণ্ডারা আর সেরূপ যত্ন ও সহানুভূতি দেখায় না। বিশেষতঃ যাতায়াতের সুবিধায় যাত্রীর সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে। পাণ্ডারা কাহারও প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেখাইবে কিরূপে?

তাই এখন তীর্থস্থলে গরীব যাত্রীদের বড় কষ্ট। ক্ষুধার কষ্ট—রোগের কষ্ট—বাসস্থানের কষ্ট।

কিন্তু এখনও হিন্দুর দেশে মহাপ্রাণের অভাব হয় নাই—এখনও সাধু মহাত্মাদিগের সকরুণ দৃষ্টি সর্ব্বদিকে জাগ্রত রহিয়াছে। মহাত্মা শ্রীশ্রীপাগল হরনাথের কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। তাঁহার অনুকম্পায় তদীয় ভক্তবৃন্দদ্বারা ৺পুরীধামে স্বর্গদ্বারে একটি আশ্রম নির্ম্মিত হইতেছে। আশ্রমটি সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। ঐ আশ্রমে দরিদ্র যাত্রিগণ বিনা অর্থব্যয়ে থাকিতে পাইবে। রোগগ্রস্ত হইলে তাহাদের উপযুক্ত চিকিৎসাদিরও বন্দোবস্ত করা হইবে, তজ্জন্য আশ্রমে একটি দাতব্য হাসপাতাল খোলা হইতেছে।

সাধু সঙ্কল্প বিপুল অর্থব্যয়ে সাধিত হইতে চলিয়াছে। ইহাপেক্ষা হিন্দুর গৌরবের কথা আর কি আছে?

আমরা আশা করি ভারতের প্রত্যেক প্রধান প্রধান তীর্থস্থানে এইরূপ সদনুষ্ঠানের অনুকরণ হইবে।

* *
*

২২। বাঙ্গালায় জলপ্লাবন

দামোদরের বিগত বন্যায় ভগবতী আবার চণ্ডী মূর্ত্তিতে বাঙ্গালায় দেখা দিয়াছেন।

সন্তানের মঙ্গলের জন্যই জননীর তাড়না। তাই দেখিতেছি একদিকে যেমন জীব-জন্তু, ঘরবাড়ী, তৈজসপত্র-আহার্য্যদ্রব্য প্রভৃতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর একদিকে তেমনি আর একটা জিনিষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে—সেটি আমাদের জড়তা, আলস্য-প্রিয়তা। মানুষের মধ্যে পরসেবার যে চিরন্তন প্রবৃত্তি সুপ্ত থাকে, তাহাই আজ দেশের চারিদিকে নবভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। আজ দেখা যাইতেছে কেহই অর্ত্তের রোদনে কর্ণপাত করিতে কুণ্ঠিত নহে—সকলেই আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়াছে, সকলেই সাধ্যমত বিপন্নের সাহায্য জন্য ব্যগ্রচিত্ত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অর্দ্ধোদয় যোগে আমরা এই পরদুঃখকাতরতা, এই পরসেবার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলাম। সেই সময়ে বুঝিতে পারিয়াছিলাম এ দেশ আর ক্ষুদ্র নহে—এ দেশ স্বার্থসঙ্কীর্ণতার জাল ছিন্ন করিতে পারিয়াছে। আর আজ এই ভীষণ বন্যার ফলে বুঝিতে পারিতেছি, দেশে মাতৃসেবার আকাঙ্ক্ষা কতখানি অগ্রসর হইয়াছে। আজ চারিদিক হইতেই সহানুভূতি, দানশীলতা, পরসেবানিষ্ঠার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে। বিপন্নের সাহায্যকল্পে বহু সম্প্রদায়, বহু সঙ্ঘ, বহু স্বেচ্ছাসেবক কার্য্য করিতেছেন। হিন্দু স্থানবাসিগণ কলিকাতা মাড়োয়ারীসম্প্রদায়, ও আর্য্য সমাজ, কলিকাতা ও বাঙ্গালার রামকৃষ্ণ মিশন, ব্রাহ্মসমাজ, নিঃস্ব-হিতৈষিণী, মুসলমানছাত্রসঙ্ঘ, কলিকাতার কেন্দ্রীয় সাহায্য-সমিতি প্রভৃতি বহু সাহায্য-সম্প্রদায় সেবাকর্ম্মে নিরত। এতদ্ভিন্ন আরও কত নূতন নূতন সাহায্যসম্প্রদায় গঠিত হইতেছে। কত শিক্ষক, কত ছাত্র, কত ডাক্তার, কত উকিল ব্যারিষ্টার স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য করিতেছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তাঁহারা কেহ খাদ্য, কেহ ঔষধ, কেহ কাপড়ের বস্তা মাথায় করিয়া আবক্ষ জলের মধ্য দিয়া চলিতেছেন—ভীষণ স্রোত, প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্ত, গর্জ্জনপর দামোদর, আজানু কর্দ্দম, আপতিত বৃক্ষরাশি, ভগ্নগৃহ, প্রাণ-ক্ষয়কর পূতিগন্ধ কোন দিকেই তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। বুঝি দেশবাসী তাঁহাদের শোণিতের বন্যায় এই বন্যা ভাসাইয়া দিতে অগ্রসর! এবার বাঙ্গালী জাতি দেশমাতা দুর্গার বোধন-কল্পে প্রাণ ভরিয়া গাহিতে থাক—

> "বারে বারে যত দুখ দিয়েছ
> মা দিতেছ তারা।
> সে সকলি দয়া তব জেনেছি
> মা দুঃখ হরা॥"

কৃষি

"কৃষির্ধন্যা কৃষির্মেধ্যা জন্তূনাং জীবনং কৃষিঃ।"

কৃষিই যে প্রাণিগণের জীবন, তাহা উপরোক্ত শাস্ত্রীয় বচন দ্বারাই সিদ্ধান্ত হইতেছে। কৃষিজ ফসল মাত্রই আমাদের অশন, বসন ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাইয়া থাকে। আমাদের রোগ-পীড়া হইলেও অধিকাংশ রোগনাশক ঔষধাদি কৃষিজাত দ্রব্য হইতেই প্রাপ্ত হইয়া থাকি। কর্ষণ শব্দের অর্থ লাঙ্গল দ্বারা বা প্রকারান্তরে ভূমি চাষ করা। যে চাষ করে তাহাকে কৃষক বা কৃষিজীবী কহে। সাধারণ ভাষায় কৃষককে চাষা বলে।

পাশ্চাত্য প্রদেশে চাষ-শব্দের অর্থ অতি বিস্তৃত। এদেশে চাষ-শব্দে ফসলের চাষই বুঝায়। কিন্তু সুদূরবর্ত্তী নূতন সভ্যতার আলোকে আলোকিত ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি দেশে পুকুরে ভেক ও মৎস্যাদির রক্ষা, মধুর জন্য মধুমক্ষিকার পালন, রেশমের জন্য রেশম-কীট পালন, মাংস ও ডিম্বের জন্য হংস ও কুক্কুটাদি পক্ষীর এবং মাংসের ও দুগ্ধের জন্য মেষ ও ছাগলাদি পশুর পালনকেও চাষ বলে। সুতরাং [illegible] বাধ্য হইয়া এই সকল কার্য্যকে ঐ সকল জন্তুর চাষ বলিয়াই অভিহিত করিলাম।

মাঠজাত ফসলের চাষের নাম কৃষিকার্য্য (agriculture)। উদ্যানজাত ফসলের চাষের নাম ঔদ্যানিক ফসলের চাষ (Horticulture)। পুষ্পের চাষ (Floriculture)ও ইহার অন্তর্গত। বনজ বৃক্ষের চাষের নাম বনবৃক্ষের চাষ (Arboriculture) ইত্যাদি। যাহারা এই সকল কার্য্য করিয়া থাকে তাহারাই চাষা। [illegible] নামটি শুনিতে বড়ই রুক্ষ। বর্ত্তমান [illegible] ব্যক্তিমাত্রের কর্ণে উহা [illegible] বিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু [illegible] চাষা নামে অলঙ্কৃত লোকেরাই [illegible] আমি রাজা, মহারাজা, নবাব, [illegible] বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর [illegible] পক্ষপাতী নহি। [illegible] কামকো [illegible] পঞ্চাশ বৎসর [illegible] এই অল্প সময়েই দেখিলাম শত শত [illegible] উপাধির জন্য [illegible] পৈতৃক সম্পত্তি [illegible] টাইটেল (title) [illegible] করিতে বিন্দুমাত্রও [illegible] তাহারা পরিণামে [illegible] অবশেষ রহিয়াছে পৈতৃক [illegible] ক্রমে [illegible] ছোটলাট স্যার (Sir B. Fuller) বাহাদুরের সহিত [illegible] কয়েকজন উপাধি-প্রার্থী জমিদারের [illegible] আলাপ হইয়াছিল। তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "[illegible] Babu I do not at all like those men who at the risk of their properties hanker after title." অর্থাৎ যে সকল লোক নিজের সম্পত্তি পণ

রাখিয়াও উপাধির জন্য লালায়িত, আমি তাহাদিগকে ভালবাসি না। যাঁহারা উপাধি প্রদান করেন তাঁহারা আমাদিগকে হয় ত পাগল বলিয়াই মনে করেন। কিন্তু "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ," লোকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ রুচি হইয়া থাকে। "বিধাত্রা লিখিতং মার্গং কো সমর্থোঽতিবর্ত্তিতুম্"—বিধাতা ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছেন তাহা কে খণ্ডাইতে পারিবে? যদি লোকের এইরূপ রুচি না হইয়া দেশহিতকর কার্য্যে রুচি হইত তাহা হইলে আর দেশের এ দুর্গতি হইত না। যদি তাহাদের চিত্ত উচ্চোপাধি লাভের জন্য ধাবিত না হইয়া, চাষা-নাম লাভের দিকে প্রসারিত হইত তাহা হইলে আর দেশে অন্নাভাব হইত না। প্রতি-বৎসর যে অর্থ উপাধিলাভের জন্য ব্যয়িত হইতেছে উহা কৃষি কার্য্যের উন্নতির জন্য প্রযুক্ত হইলে দেশের যে কি মহোপকার সাধিত হইত তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন।

৪৫ বৎসর অতীত হইল দেশে স্বদেশী আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। দেশের গণ্যমান্য সকল লোকেই স্বদেশব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। বহু আড়ম্বরে ব্রতের উদ্যোগপর্ব্বের আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু অতি অল্প সময়েই বা শৈশব কালেই ব্রত-সঙ্কল্প লয় পাইয়াছে। এ দেশে স্ত্রীলোকেরা নানা ব্রতের সঙ্কল্প করিয়া থাকেন। ঐ সকল ব্রত পালনের নির্দ্দিষ্ট সময় থাকে। ললিতা সপ্তমী, দূর্ব্বাষ্টমী ও অনন্ত চতুর্দ্দশী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের নানাবিধ ব্রত আছে। কোন একটি বিশেষ বিষয় কামনা করিয়া তাঁহারা ব্রত সঙ্কল্প করিয়া থাকেন। ললিতা সপ্তমীর সাত বৎসর, দূর্ব্বাষ্টমীর আট বৎসর ও অনন্ত চতুর্দ্দশীর চৌদ্দ বৎসর মিয়াদ থাকে। আমাদের স্বদেশ-সেবকদের ব্রতের কোন নির্দ্দিষ্ট সঙ্কল্প ছিল না। ব্রতের ফল হইয়াছে কয়েকদিন হৈচৈ ও অর্থনাশ, পরিশেষে কেহই ব্রত পালনে সক্ষম হয় নাই। তাহার কারণ এই গিরি আরোহণ করিতে হইলে উহার পাদদেশ হইতে ক্রমে উর্দ্ধে উত্থিত হইতে হইবে। লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক গিরিচূড়া আরোহণের আশা সন্তরণ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করার আশার ন্যায়। অল্প সময়ে অত্যুত্থানের আশা বৃথা। অত্যুত্থানই পতনের কারণ। "অত্যুত্থানং হি পতনায়।" হাতে হাতে আমরা ইহার বিষময় ফল ভোগ করিয়াছি। অপরদিকে অতি আড়ম্বরও নাশের মূলীভূত কারণ। আমাদের আড়ম্বরের ফল ঋষিশ্রাদ্ধের ফলবৎ হইয়াছে।

"অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘাড়ম্বরঃ।
দম্পত্যোঃ কলহশ্চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।"

আমরা অকার্য্যে যে আড়ম্বর দেখাইয়াছিলাম উহা কৃষিকার্য্যে বিনিয়োগ করিলে এতদিন দেশের মহোপকার সাধিত হইত, দেশের ধন বৃদ্ধি হইত। কৃষিই দেশের সম্পদ, কৃষিই দেশের উন্নতির প্রশস্ত পথ, কৃষিই দেশের ধনরক্ষার উপায় এবং কৃষিই দেশের মোক্ষ। কৃষিই আমেরিকা ও জাপানকে পৃথিবীর উন্নতস্তরে উঠাইয়া দিয়াছে। অন্য ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক, কিন্তু কৃষিকার্য্যে ক্ষতির সম্ভাবনা অতি কম। যদি আমাদের স্বদেশ-সেবকগণ ভ্রান্তপথে বিচরণ না করিয়া কৃষির উন্নতিবিধানকল্পে ব্রতী হইতেন,

তবে আমাদের ভবিষ্যৎ-পথ অতি সুগম হইত। অনেক সময়ে অনেকেই ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। মুনিগণও কোন কোন সময়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন দেখা যায়। সুতরাং আমাদের কার্য্যেও ভ্রম হইতে পারে। অতীত ঘটনা ভ্রমবৎ ঘটিয়াছে বলিয়া আমাদের দেশের উন্নতিবিধানকল্পে নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। ভবিষ্যতে যাহাতে দেশের দুঃখদারিদ্র্য-মোচনের উপায় বিধান করা যায়, সকলেরই সেই কার্য্যে সঙ্কল্প করা উচিত।

যতদিন না দেশে কৃষির উন্নতি সাধন হইবে, যতদিন না এ দেশজাত শস্যের বিনিময়ে বিদেশের অর্থ শোষিত হইবে, যতদিন দেশীয় শিল্পের পুনর্জ্জীবন লাভ না হইবে, ততদিন দেশের ইষ্টসিদ্ধির আশা বৃথা।

এই সুজলা সুফলা ভারতভূমি রত্নপ্রসূ। রত্নপ্রসূ মাতার বক্ষ দোহন করিলে অনায়াসে প্রভূত রত্নলাভের সম্ভাবনা। এ পথ ত্যাগ করিয়া কেন স্বদেশবাসী বিপথে গমন করিতেছ! যে দেশে সমস্ত পৃথিবীর জল-বায়ু, সমস্ত পৃথিবীর ভূমি বিদ্যমান রহিয়াছে, সে দেশে বাস করিয়াও তুমি কেন পথের ভিখারী, অন্নের কাঙ্গাল হইয়া দারিদ্র্য-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছ? যে দেশ পৃথিবীর সকল দেশের আদর্শ, যে দেশ সমস্ত পৃথিবীর রত্ন-প্রসবিত্রী ও সুখসম্পদ-দায়িনী, তুমি সেই দেশের সন্তান। তবে কেন তোমার দরিদ্রতা ও অন্নাভাব ঘুচিতেছে না? এ দোষ কাহার? তোমার না ভারতমাতার?

যে দেশের অধিবাসী ২০০ বৎসর পূর্ব্বে কোন দ্রব্যের জন্যই অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইত না, সে দেশের আজ এ দুর্দ্দশা কেন? ইহা কি তাহার কুলাঙ্গার সন্তানগণের জন্য নয়?

মনে ভাবিয়া দেখ আজ দেশের কি দুর্দ্দিন। এ দেশের ... লোক চাকরির জন্য লালায়িত। মাসিক ১০ টাকা বেতনের একটি চাকরির জন্য শত শত লোক প্রার্থীরূপে দণ্ডায়মান। যে দেশের লোকের শস্যশালা পর্ব্বত-পরিমাণ শস্যে পূর্ণ থাকিত, যে দেশের লোকের গো-শালা শত শত গাভীতে পূর্ণ থাকিত, যে দেশের লোকের ঘরে ঘরে জলাশয় বিরাজ করিত, সেই দেশের লোক আজ এক মুষ্টি অন্নের জন্য, এক পিয়ালা দুগ্ধের জন্য ও পানীয় জলের অভাবে ক্লিষ্ট। আমার জীবনেই আমি দেখিয়াছি পল্লীগ্রামের ঘরে ঘরে প্রচুর শস্য মজুত থাকিত। কোন প্রতিবেশীর অভাব হইলে, যাহার ঘরে শস্য আছে তিনি অভাবে পতিত ব্যক্তিকে দু'মণ পরিমাণ শস্য দিয়া তাহার অভাব মোচন করিতেন। এ দেশে পূর্ব্বে, বহুদিন পূর্ব্বে নয়, দুগ্ধ বিক্রয়ের রীতি ছিল না। আবশ্যকমত কোন ব্যক্তি তাহার প্রতিবেশীর নিকট হইতে তাহা পাইতেন। মৎস্যের অভাব হইলে বিল ঝিল ও নদী খাল প্রভৃতি জলাশয় হইতে নিজেই মৎস্য ধৃত করিয়া লইতেন। জালজীবী লোকের প্রতীক্ষা করিতেন না। আবশ্যক হইলে নিজের অথবা প্রতিবেশীর পুকুর হইতে ২।৪টি মৎস্য ধৃত করিয়া লইয়া নিজ কার্য্য সাধন করিতেন। ঐ সময়ের লোকে বলিত যাহার ক্ষেত্রের ধান, গাভীর দুগ্ধ ও পুকুরের মৎস্য আছে সেই পরম সুখী। রাত্রি প্রভাত হইলেই বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ঐ সময়ের

লোকদের খাদ্যদ্রব্যের জন্য ব্যস্ত হইতে হইত না। তাহারা ক্ষেত্রজাত সর্ষপের বিনিময়ে তৈল ও উহার বা অন্য শস্যের বিনিময়ে লবণ ও অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ করিত। বাটীর সীমান্ত স্থানে বা প্রাঙ্গণে ১০।২০টি কার্পাস গাছ থাকিত, উহার তুলার বা সূতার বিনিময়ে বস্ত্রের সংস্থান হইত, বাড়ীর বৃদ্ধাগণই সূত্র নির্ম্মাণ করিতেন। যুবতী মহিলাগণ রন্ধন ও অন্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের কোন বিষয়েই অভাব হইত না। তাহারা নিজ গাভীর দুগ্ধপান করিত। ঐ দুগ্ধ হইতে মাখন ও ঘৃত প্রস্তুত করিত। দুগ্ধের উদ্বৃত্তাংশের দ্বারা দধি প্রস্তুত করিত। প্রতিদিন তাহারা ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, মৎস্যের ঝোল, দাল ও অন্য নানাবিধ দ্রব্য আহার করিত। তাহারা প্রতিদিন দু'বেলা অনায়াসে ষোড়শোপচারে আহার করিত। আমাদের ভাগ্যে বহুকষ্টে এক বেলাও পঞ্চোপচারে আহার জোটে না। ঘৃত ও দুগ্ধের ন্যায় পুষ্টিকর ও রসনার তৃপ্তিকর খাদ্য আর কিছুই নাই। লোকে বলে "কি করিবে ছাগা মাছা, যদি থাকে আগা পাছা।" অর্থাৎ যদি ভোজনের প্রথম ঘৃত ও শেষে দুগ্ধ থাকে তবে ছাগ-মাংস (ছাগা) ও মৎস্য (মাছা) প্রভৃতি খাদ্যের প্রয়োজন কি? তাহাদের ঘরে ঘৃত ও দুগ্ধের অভাব ছিল না। অতিথি-সৎকার জন্য সকল দ্রব্যই তাহাদের ঘরে মজুত থাকিত। বর্ত্তমান সময়ের বাবুগণ বহু চেষ্টায়ও অকৃত্রিম দুগ্ধ ও ঘৃত একবার চক্ষে দেখিতেও সক্ষম হন না পূর্ব্ব পুরুষগণ নিজেরাই গরু চরাইতেন, গো-সেবা তাঁহাদের নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। গো-পালন ও গো-সেবাকে তাঁহারা ধর্ম্মাংশ বলিয়া মনে করিতেন। মহিলাগণও গো-সেবায় ব্যাপৃত থাকিতেন। ভাতের মাড় ও অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্যের পরিত্যক্তাংশ পুরমহিলাগণ কর্ত্তৃক গো-সেবায় প্রযুক্ত হইত। যদি বল সেকাল আর একালে বিশেষ তফাৎ আছে। আমি বলিব, না। এখনও হিমালয় আছে, কিন্তু দক্ষ রাজা নাই। গঙ্গা আছে, গঙ্গার মাহাত্ম্য জানে এমন লোকের অভাব। অযোধ্যা আছে, রামের অভাব। মথুরা আছে, কৃষ্ণের অভাব। সমুদ্র আছে, মন্থনকারীর অভাব। লঙ্কা আছে, রাবণের অভাব। ভরত নাই, ভারতবর্ষ আছে। ভারতবর্ষের ভূমি সুজলা সুফলা। ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জলবায়ুর শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। পৃথিবী যখন ঘোরতমসাচ্ছন্ন ছিল, তখন ইহার এক দেশের খবর অন্য দেশের লোকে অতি অল্পই জানিত। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে এখন পৃথিবীর সমস্ত দেশ পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এখন পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ হইতে তত্তৎদেশজাত ফসল, উদ্ভিদাদি ও জীব-জন্তু প্রভৃতি এদেশে আনিবার সুবিধা হইয়াছে। সুতরাং কি স্বদেশী, কি বিদেশী, —সকল দেশজাত ফসলই এখন এদেশের নানা স্থানে উৎপন্ন করা যাইতে পারে। তবে কেন দেশের লোকের অন্নকষ্ট দূর হইতেছে না? এই সমস্যার ভিতরে গূঢ়তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। অধুনা দেশের লোকের চিত্ত উচ্চশিক্ষার দিকে ধাবিত হইয়াছে। বি-এ ও এম্-এ পরীক্ষা পাশ করিয়া কেহ ব্যবহারজীব, কেহ হাকিম, কেহ ডাক্তার ও কেহ অন্য কোনরূপ উচ্চ চাকরি

লাভ করিয়া জীবন যাপন করিবেন এই সঙ্কল্প করিয়াই কলেজ হইতে বহির্গত হন। কিন্তু আজকাল এই সকল কার্য্য সুলভ ও কণ্টকহীন নহে। বহু অর্থব্যয় করিয়া প্রথমতঃ শিক্ষালাভ করিতে হইবে। তৎপর প্রতিযোগিতার ঘোর আবর্ত্তনে ঘুরিতে হইবে। তাহাতেই জীবনের অর্দ্ধ সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে। অভিভাবক-প্রদত্ত অর্থের আর পুনরুদ্ধার হইবার সময় থাকেনা। উচ্চশিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হয় উহা কৃষিকার্য্যে বিনিয়োগ করিলে, মূলধন অব্যাহত রাখিয়া অনায়াসে পরিবার-পোষণোপযোগী অর্থ উপার্জ্জন করা যাইতে পারে। আমি এ স্থানে এ কথা বলিতেছি না যে উচ্চশিক্ষা লাভের চেষ্টায় নিরত হওয়া উচিত। আমার মতে যাহার অর্থের সংস্থান আছে তিনি উচ্চ শিক্ষালাভ করুন। দরিদ্রসন্তান অল্পশিক্ষা লাভ করিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হউক। প্রতিযোগিতার উত্তাল তরঙ্গে গা ভাসাইয়া দিয়া ভাগ্য-পরীক্ষার চেষ্টা অপেক্ষা অনায়াস বা অল্পায়াস-লব্ধ অর্থ সংগ্রহ করার চেষ্টাই সঙ্গত।

উচ্চশিক্ষায় আমার একটু আপত্তিও আছে। কেননা "উপাধি ব্যাধিরেব চ"। উচ্চ শিক্ষার পরে উপাধিলাভ হইলে বর্ত্তমান সময়ের হিসাবে উহা ব্যাধিতুল্য হইবে। কেননা বি-এ, বা এম্‌এ পাশ করিয়া কেহ স্বহস্তে হল-চালন-কার্য্য স্বীকার করিতে রাজী হইবেন না। সুতরাং তাঁহার অবস্থা হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণের ন্যায় হইবে। যেহেতু ব্যবসায়ের ক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ। প্রতি বৎসর যে সকল ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, গবর্ণমেণ্ট জমীদার কি বণিক-সম্প্রদায় ইহাদের প্রত্যেককেই যে চাকরি দিতে পারিবেন ইহা সম্ভবপর নহে। ইউরোপ, জাপান ও আমেরিকা হইতে যে সকল ব্যক্তি নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া এদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের ক'জন লোক চাকরি লাভ করিয়াছেন? কয়েকটি লোক ভিন্ন অপর সকলেই ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় গতিহীন হইয়া ঘরে [illegible] রহিয়াছেন। আবার এদেশে থাকিয়া যাঁহারা ওকালতী, বারিষ্টারী, ডাক্তারী বা অন্য কোন কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদের কয়জনের অবস্থা ভাল? অনেককে পিতা, ভ্রাতা বা অন্য স্বজন-বান্ধব হইতে অর্থ আনিয়া কায়-ক্লেশে অশন বসন চালাইতে হইতেছে। আবার কেহ কেহ পেটের দায়ে দালালের (Tout) হস্ত-নিসৃত অর্থের দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিতে লজ্জা ও শঙ্কা বোধ করিতেছেন না। উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া এরূপ ঘৃণিত কার্য্য করা অপেক্ষা নিজ হস্তে লাঙ্গল চালাইয়া সদুপায়ে (by honest means) অর্থ উপার্জ্জন করাই বিধেয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন ডাক্তারগণ কিরূপে টাউট (tout) দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। ইহার উত্তরে আমি বলিব, আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি টাউনে ও মফঃস্বলে ডাক্তারনামধারী অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত কতকগুলি লোক আছে যাহারা ছলে ও কৌশলে রোগীকে হস্তগত করিয়া কথিত ডাক্তারগণকে ২।৩টি রোগী দিয়া থাকেন। এই সকল রোগী ইহাদের হস্তেই প্রতারিত হইয়া থাকে। দিন দিনই ব্যবসায়ের

আধিক্য বশতঃ প্রতিযোগিতার বৃদ্ধি হইতেছে। সুতরাং পেটের দায়ে বাধ্য হইয়া, তাঁহাদিগকে লজ্জাজনক কার্য্য করিতে হইতেছে সন্দেহ নাই। আজকালের সময় অতিমন্দ হইলেও উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া নীচ প্রবৃত্তি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে, ইহা সভ্যসমাজের অভিপ্রায় নহে। যদি প্রচুর অর্থ থাকে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া খাও। যদি অল্প অর্থ তোমার সঙ্গতি হয় কৃষি-কার্য্য অবলম্বন কর।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষি-কর্ম্মণি,
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়ান্নৈব চ নৈব চ।"

আর্য্যসন্তান হইয়া চাকরির জন্য লালায়িত কেন? পরের গোলামী করিতে এত অগ্রসর কেন?

আজকাল ব্যবসায়ী-মহলেও স্বদেশ-সেবক নাম দিয়া কোন কোন শিক্ষিত জুয়াচোর সরলপ্রাণ স্বদেশবাসীকে প্রতারিত করিতে কুণ্ঠিত হন না। কলিকাতার এক জন প্রসিদ্ধ ছাতি-ব্যবসায়ী "স্বদেশী ছাতি" নাম দিয়া বহু লোককে কয়েক বৎসর যাবৎ প্রতারিত করিতেছেন। রেলী ব্রাদার্সের ছাতি খরিদ করিয়া উহার মার্কা উঠাইয়া উহাতে "স্বদেশী ছাতি" এই দুইটি কথা বসাইয়া এইরূপে কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি জুয়াচুরি ব্যবসা করিতেছেন। স্বদেশীর চরম ফল এই কি?

আমরা আর্য্যজাতি বলিয়া পরিচিত হইতে বিশেষ অগ্রবর্ত্তী। আর্য্য-নামটি আমাদের জাতীয় অলঙ্কার। যদি আমরা প্রকৃতপক্ষে আর্য্যসন্তানই হই, তাহা হইলে স্বহস্তে হলচালন-কার্য্য আমাদের অঙ্গভূষণ কেন না হইবে? আমাদের শাস্ত্রাদি গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হয় যে আর্য্য-ঋষিগণও স্বহস্তে হল চালনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যিনি সাংসারিক সুখ ত্যাগ করিয়া জ্ঞানপথে গমন করিয়াছেন, যাঁহা হইতে বিদ্যা, সত্য, তপঃ ও শ্রুতি এই সকল সম্যক্‌রূপে নিরূপিত হয়, তিনিই ঋষি; অথবা যিনি স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহার নামই ঋষি। ঋষি সপ্তবিধ—শ্রুতর্ষি, কাণ্ডর্ষি, পরমর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষি। সুশ্রুতাদি শ্রুতর্ষি। জৈমিনি আদি কাণ্ডর্ষি। ভেলাদি পরমর্ষি। ব্যাস আদি মহর্ষি। বিশ্বামিত্র ও জনক রাজর্ষি। ইঁহারা রাজা হইয়াও ঋষির ন্যায় আচারবিশিষ্ট ছিলেন। বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। নারদ ও তুম্বুরু প্রভৃতি দেবর্ষি ছিলেন। এতদ্ভিন্ন পরাশর, শাতাতপ, যাজ্ঞবল্ক, মনু, হারীত, অত্রি প্রভৃতি বহু ঋষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজক ছিলেন। ইঁহারা দেবতুল্য পূজনীয় ছিলেন। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া নানা উপাধি দ্বারা ভূষিত হইয়াছি। আমরা পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণ অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত ও সম্মানী হইয়াছি কি? তাঁহাদের সময়ে পাশ্চাত্যশিক্ষার সমুজ্জ্বল রবি ভারতবর্ষকে আলোকিত করে নাই। অতএব কথিত ঋষিগণকে কি আমরা মূর্খ বলিব? এই সকল ঋষিগণের গুণ ও বিদ্যার আলোক সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া যাইয়া ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশকে আলোকিত করিয়াছে কি না-এবং ঐ সকল দেশের লোকও ইঁহাদিগকে দেবতুল্য বলিয়া মনে করে কি না সামান্য অনুসন্ধানে ইহা

উপলব্ধি করা যায়। কথিত ঋষিগণ মধ্যে অনেকেই স্বহস্তে হল চালনা করিতেন। ইহাদের মধ্যে জনক, বিশ্বামিত্র ও পরাশর বিখ্যাত আর্য্য-চাষা ছিলেন। 'সি' ধাতুর অর্থ ভূমি খনন করা। উহার উত্তর 'ক্ত' বা 'ত' প্রত্যয় যোগ করিয়া "সীতা" পদ সাধিত হইয়াছে। "হ্রস্ব ইকার" নিপাতনে সিদ্ধ হইয়া "দীর্ঘ ঈকারের" আকার ধারণ করিয়াছে। সীতা শব্দের অর্থ নাঙ্গল-চিহ্নিত রেখা বা ভাঁপর (furrow)। রাজর্ষি জনকের যজ্ঞভূমি কর্ষণকালে শ্রীরামপত্নী বৈদেহী ভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেইজন্য জানকীর নাম হইয়াছে সীতা।

"অথ যে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ।
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।"

অপর বচন—

"অযোনিজা পদ্মকরা বালার্কশতসন্নিভা।
সীতামুখে সমুৎপন্না বালভাবেন সুন্দরী।
সীতামুখোৎভবাৎ সীতা ইত্যস্যা নাম চাকরং।"

সুতরাং ই । অনায়াসেই উপলব্ধি হইতেছে যে জনক ঋষি ভূমি কর্ষণ করিতেন। মুনি-পুঙ্গব পরাশর প্রবীণ কৃষক ছিলেন। বিশ্বামিত্র কৃষিকার্য্য করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ-সহোদর বলদেব (বলরাম) স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করিতেন। সেইজন্য তাঁহার অন্য নাম হলধর। যদি জনক, পরাশর, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ ও শ্রীকৃষ্ণ-সহোদর বলদেব প্রভৃতি স্বহস্তে হল চালনা করিতে লজ্জা বোধ না করিয়া থাকেন, তবে তোমার আমার মত উপাধিধারী লোকের স্বহস্তে হল চালনা করিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ কি ইহা বলিতে পার?

যদি "অহং" ত্যাগ করিতে না পার, যদি আত্ম-সংযম করিতে শিক্ষা করা তোমার পক্ষে অসম্ভব হয়, তবে তোমার পরিণাম যে ভয়ানক আকার ধারণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পক্ষান্তরে যদি তুমি আর্য্যসন্তান হও, তবে স্বহস্তে হল চালনা করায় তোমার লজ্জা কি? আর্য্যগণ স্বহস্তে হল চালনা করিতেন, তোমার পূর্ব্বপুরুষ কৃষক ছিলেন, যদি তুমি তাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার কর তবে তুমি আর্য্যসন্তান নামের অধিকারী নহ। সংস্কৃত ভাষায় "ঋ" ধাতুর অর্থ গমন করা। "ঋ" ধাতুর উত্তর "য" (ঘ্যণ) প্রত্যয় যোগ করিয়া "আর্য্য" পদ সাধিত হইয়াছে। ইহার অর্থ সৎকুলোদ্ভব বা মাননীয় ব্যক্তি। সাধারণতঃ আর্য্য-শব্দে বৈশ্যকে বুঝায়। বৈশ্যের ব্যবসায় হাল চাষ। এক সময়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ আর্য্য ও অন্য জাতীয় ব্যক্তিগণ অর্য্য নামে অভিহিত হইত। কিন্তু কালক্রমে আর্য্য ও অর্য্য উভয়েই আর্য্য নামে অভিহিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ অর্য্য শব্দ হইতেই আর্য্য শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কৃষি-কার্য্যই বৈশ্যের প্রধান ব্যবসায়। "ঋ" ধাতু হইতেই "অর" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা হইতেই অর্য্য শব্দেরও উৎপত্তি হইয়াছে। "অর" শব্দের অর্থও "ঋ" ধাতুর ন্যায় গমন করা। কিন্তু সংস্কৃত ভিন্ন অন্যান্য আর্য্য ভাষায় "অর" শব্দটি হল ও কৃষি অর্থবাচক। পারসিক ভাষায় "ঐর্য্য" শব্দের অর্থ শ্রদ্ধাস্পদ। পারসিকদিগের আদিম অধিবাস ঐর্য্যানমূর্ব। তাঁহারা ঐ স্থান হইতে দক্ষিণে ও পশ্চিমে গিয়া তাঁহাদের অধিবাস স্থাপন করেন।

গ্রন্থকার ষ্ট্রাবো এই স্থানের নাম "অরিয়ানা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হেরডটাস্ ইহাকে আরি-আই ও হেলেনিকস্ আরিয়া নামে অভিহিত করিয়াছেন।

কোন কোন পারস্য শিল্পলিপিতে পারসিক সম্রাট দরায়ুধের নামের সহিত "অরিয়" শব্দ সংযুক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে পারসিক দেশের নাম "ইরান্"। ইরান্ শব্দের অর্থ সম্ভ্রান্ত ও অনিরান্ শব্দের অর্থ নীচ-কুলোদ্ভব।

আর্ম্মাণী ভাষায় অরি শব্দের অর্থ ইরান ও সাহসিক। ককেশস পর্ব্বতের উপত্যকা-ভূমিতে আর্য্যবংশীয় কতকলোক বাস করিত উহাদের নাম ছিল 'আয়রণ'। আর্য্যবংশীয়গণ প্রথমে এসিয়া খণ্ডের মধ্যভাগে তৎপর ক্রমে খোরাসানে, রুষদেশে, কৃষ্ণসাগরের উপকূলে ও থ্রেসদেশে বাস করিয়াছিলেন। থ্রেসের প্রাচীন নাম আরিয়া। আয়র্লণ্ড দ্বীপস্থ কেল্‌ট জাতীয় লোকেরা আর্য্যবংশীয় লোকেরই একটি প্রাচীন শাখা বলিয়া উক্ত হয়। ইহাদের প্রাচীন নাম এর বা এরি। ইহারা প্রাচীন নর্স ভাষায় ঈরায় ও এঙ্গলো-সেকসন্ ভাষায় ইরা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। আয়র্লণ্ডের প্রাচীন নাম ঈরিণ বা এয়রে। ইহা হইতেই সম্ভবতঃ এই দ্বীপের নাম আয়র্লণ্ড হইয়াছে। সম্ভবতঃ "অর" এই মূলজ শব্দটি হইতেই উপরোক্ত শব্দগুলি উদ্ভূত হইয়াছে। ঐ সকল দেশের লোকেরা কৃষিকার্য্য করিয়াই জীবন যাপন করিত। সুতরাং "অর্" এই হলবাচক শব্দটি এই সকল জাতির নামের সহিত যুক্ত হইয়া প্রায় একই-রূপ বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন নামের সৃষ্টি করিয়াছে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনুমান করেন ঈরাণ হইতেই আর্য্য জাতির এক শাখা ভারতবর্ষে ও অন্য শাখা ইউরোপে গমন করে। কেহ কেহ বলেন ভারতবর্ষের আর্য্যজাতি উত্তর কুরু হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ঈরাণই সেই উত্তর কুরু। উত্তর কুরুর স্ত্রীলোকদের মধ্যে বস্ত্র-পরিধানের রীতি ছিল না। ঈরাণ-রমণীদের মধ্যেও প্রাচীনকালে বস্ত্রপরিধানের রীতি ছিল না। সুতরাং ঈরাণকে উত্তর কুরু বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না। মহাভারতে ঈরিণ শব্দের উল্লেখ থাকা দৃষ্ট হয়। বালুকা-ময় জনশূন্য দেশের নাম ঈরিণ। তাহা হইলে ঈরিণ দেশকে আরব দেশ বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ইহাতেও অর বা আর শব্দের সংযোগ থাকা দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে ঈরিণ দেশ ছিল এ কথা ঠিক হইলে, ঈরিণ শব্দে রাজপুতানাকেই বুঝায়।

অমর সিংহের মতে বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানই আর্য্যাবর্ত্ত।

"আর্য্যাবর্ত্ত পুণ্যভূমির্মধ্যং বিন্ধ্যহিমালয়োঃ।"

সুতরাং ভারতবর্ষীয় আর্য্যদের বসতভূমিই এই স্থান বলিয়া অনুমান হয়। যাহা হউক, যে স্থানই এদেশের আর্য্যগণের আবাস-ভূমি হউক না কেন, আর্য্য-শব্দটি যে অর (ঋ ধাতু) নামক হল বা কৃষি শব্দের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোক মাত্রই প্রাচীন কালে আর্য্য নামে পরিচিত ছিল। আর্য্য শব্দটি যে বৈদিকযুগে সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম ঋক পাঠ করিলে অনায়াসে উপলব্ধি হয়। "ইন্দ্র! তুমি আর্য্যগণকে ও

দস্যুদিগকে বিশেষরূপে অবগত হও ইত্যাদি"। ইহা দ্বারা দেখা যায় যে ঋগ্বেদেও আর্য্য-জাতির উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদ-সংহিতায় সকল লোককে শূদ্র ও আর্য্য এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—

"তস্যাহং সর্ব্বং পশ্যামি যশ্চ শূদ্র উতার্য্যঃ।"

আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতায়ও ইহার উল্লেখ থাকা দৃষ্ট হয়। যথা—

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।
প্রিয় সর্ব্বস্যপশ্যত উত শূদ্র উতার্য্য।"

আবার কোন কোন গ্রন্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতিই আর্য্যজাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কাত্যায়ন-প্রণীত শ্রৌত সূত্রে উপরোক্ত তিন জাতিই আর্য্য নামে উক্ত হইয়াছে।

"শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণঃ আর্য্যাস্ত্রৈবর্ণিকঃ।

সুতরাং এই বচন দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে শূদ্রগণ আর্য্য নহে।

আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়া শূদ্রনামক আর্য্যজাতিবিশেষকে আপনাদের জাতিভুক্ত করিয়া লন। মনু-সংহিতায় হিন্দুদিগের আবাস-ভূমি আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্বে পূর্ব্ব সমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র; ইহার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগই আর্য্যাবর্ত্ত।

"আসমুদ্রাত্তু যে পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়ো রেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥

মনুর মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি দ্বিজাতি আর্য্যাবর্ত্ত রাজ্যের অধিকারী। শূদ্র নামক অনার্য্যজাতি ব্যবসায়ানুরোধে যথা তথা বাস করিবার উপযুক্ত।

"এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ। শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেৎ বৃত্তিকর্ষিতঃ।"

ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায়ও এরিয়ান্ (Aryan or Arian) শব্দে আর্য্যজাতিকে বুঝায়। আলেকজেন্দ্রিয়ার (Alexandria) অধীশ্বর এরিয়াসের (Arius) নামানুসারে এরিয়ান শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইনি যিশুখ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব স্বীকার করেন না, যাহারা তাঁহার মতাবলম্বী তাহারাই এরিয়ান বা আর্য্য। ইহারা ইণ্ডো-ইউরোপিয়ান (Indo-European) জাতি নামে পরিচিত। বইস্কেস (Basques), তুরকী (Turks), মাগায়ার্শ (Magyars), ফিনল্যাণ্ডের (Finns) অধিবাসি-গণ, আর্ম্মেনিয়ান, পারসীক, ও উত্তর হিন্দু-স্থানের অধিবাসী ভিন্ন অন্য সকল জাতিকেই আর্য্য নামে অভিহিত করেন। তাঁহাদের মতে সংস্কৃত, জেণ্ড (Zend), গ্রীক (Greek), ল্যাটীন (Latin), কেলটিক (Celtic), টিউটনিক (Teutonic), স্লেভনিক (Slavonic) ও লেটিক (Lettic) ভাষাই আর্য্যজাতির ভাষা। ইহারা প্রাচীন পারস্যের পূর্ব্বভাগের অধিবাসীদিগকেও আর্য্য নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রাচীন পারস্য ভাষায় আর্য্য (Ariya) এবং ঈরাণ (Iran) একই জাতিকে বুঝায়। পারস্য ভাষায়ও হাল্‌কে 'অর্' কহে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রায় সকল আর্য্য-নামধারী জাতির নামের আদিতে "অর্" শব্দ সংযুক্ত রহিয়াছে। এবং এই শব্দটি কৃষি-বাচক। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন আর্য্যজাতি মাত্রেরই ব্যবসা ছিল হল-চালনা। তবে কেন ভাই তোমরা স্বহস্তে হল চালনা করিতে কুণ্ঠিত হইবে? যেদিন হইতে তোমরা হলচালন করিতে শিখিবে—যে দিন তোমরা লজ্জা ও অহঙ্কার

ত্যাগ করিয়া হলচালন-কার্য্যে দীক্ষিত হইবে, সেইদিন হইতেই তোমাদের দুঃখ-দরিদ্রতা বিদূরিত হইবে।

ইউরোপ, জাপান ও আমেরিকার কৃষককুল উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও স্বহস্তে হলচালন করিতেছে। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বহস্তে হলচালন করিয়াছেন। তোমরা তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিতে বিমুখ কেন? যদি অহং ত্যাগ করিয়া, লজ্জা ত্যাগ করিয়া স্বাবলম্বন-নীতি শিক্ষার চেষ্টা কর, তবে তোমার দুঃখ জঞ্জাল কেন দূর হইবে না। উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা কাল কর্ত্তন না করিয়া যদি হলচালন দ্বারা অর্থশালী হইতে পার, তবে তাহাকে কেন তুচ্ছ করিবে? নিশ্চিত লক্ষ্মীকে পদাঘাতে দূর করিয়া কেন পরমুখাপেক্ষী হইবে? আমার কথা কয়েকটি হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া একবার কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ কর, দেখ তোমার শুভ হয় কি না। আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি না। মনের দুঃখে কয়েকটি কাজের কথা বলিলাম। উহা গ্রহণ করা না করা তোমার ইচ্ছাধীন। আমার কথা কয়েকটি অরণ্যে রোদনের ন্যায় না হইলেই সুখী হইব।

কৃষিকার্য্য দ্বারা ইউরোপ, আমেরিকা ও অসভ্য জাপান সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, ইহা অনেক দিনের কথা নহে। তোমার দেশ রত্নপূর্ণ, এখনও ইহার বিভিন্ন প্রদেশে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি পতিত রহিয়াছে। তুমি অনায়াসে ইহার সদ্ব্যবহার করিতে পার। যে অর্থ তোমার শিক্ষায় ব্যয়িত হইয়াছে, উহার অর্দ্ধভাগ মূলধন লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও। তোমার ইষ্টসিদ্ধি অবশ্যই হইবে

বিদেশী কৃষি-শিক্ষা দ্বারা তোমার অল্প সময়ে উপকার হইবে না। কার্য্যক্ষেত্রে বিদেশী বিদ্যার প্রয়োগ করিয়া ফললাভ করিতে তোমার জীবন অতিবাহিত হইবে। সুতরাং তোমার জীবনে বিদ্যালাভের ফল ভোগ করা অসম্ভব। তুমি স্বদেশী কৃষকের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। অচিরে ফললাভ করিবে।

> "বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
> নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
> ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
> মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

কৃষিসম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন দেশের ব্যবস্থা ভিন্ন রূপ। কেননা ঐ সকল দেশের জল-বায়ু ও ভূমির স্বভাব অনুসারেই তত্তৎদেশের কৃষিকার্য্য চলিয়া থাকে। এ দেশের ভূমি ও জল-বায়ুর সহিত ঐ সকল দেশের ভূমি ও জল-বায়ুর সাদৃশ্য একেবারে নাই। তবে প্রকৃতির মূলসূত্রগুলি শিক্ষা করা যাইতে পারে বটে। কিন্তু উহা এ দেশের জল-বায়ুর সহিত তুলনা করিয়া প্রয়োগ করিতে দীর্ঘ সময় লাগিবারই কথা। উহাপেক্ষা আমাদের পূর্ব্বপুরুষ, যে পথ অবলম্বন করিয়া অযত্নে পর্ব্বতপ্রমাণ শস্য উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন, আমাদের সেই পথ অবলম্বন করা সঙ্গত। সাধারণ কৃষকের নিকটে কৃষিকার্য্যের বীজমন্ত্র শিক্ষা কর। আবার তুমি যাহা শিখিয়াছ প্রবীণ হইয়া তুমি তাহা তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। সখের হিসাবে তোমার বীজমন্ত্র এ দেশের কৃষক শিখিতে পারে।

আমি গভর্ণমেণ্টের ২।৪টি কৃষিক্ষেত্রের সংবাদ রাখি। নূতন বৈজ্ঞানিক ধরণে ঐ

সকল কৃষিক্ষেত্রের কার্য্য জাপান ও আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত নূতন শিক্ষিত লোকদের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। এই কার্য্যে প্রচুর অর্থও ব্যয়িত হইতেছে। কোন বৎসরেই ব্যয়িত অর্থের ¼ ভাগও উৎপন্ন হয় না! এই সকল কৃষিক্ষেত্রের দ্বারা যে দেশের কোন উপকার হইতেছে তাহা আমার বিশ্বাস নাই। তবে এই সকল কৃষিক্ষেত্রে লাভ হইলেও ক্ষতি নাই, লোকসান হইলেও ক্ষতি নাই। কেননা লাগে টাকা দিবে গৌরী-সেন। লাভই কি আর লোকসানই বা কি। আজ ৫০ মণ দার্জ্জিলিং আলুর বীজ আনিতে হইবে। উহা আনিতে যাইবেন ডিপুটী ডাইরেক্টর বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তাঁহার দার্জ্জিলিং যাতায়াতের ব্যয় বা ভাতা হইবে অন্যূন শতাধিক টাকা। সুতরাং ঢাকের মূল্যে মনসা বিক্রয় কেন হইবে না। আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলে দার্জ্জিলিংএর জনৈক আলু-ব্যবসায়ীকে রেলে বীজ পাঠাইয়া দিয়া ও রেলের রসিদখানা ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইতে লিখিতাম। কাজেই ১০০৲ টাকা ভাতার কোন প্রয়োজন হইত না। এইরূপ নানা কার্য্যে গভর্ণমেণ্টের অর্থ ব্যয়িত হয়। কাজেই গড়ে গভর্ণমেণ্টের কৃষিক্ষেত্রে লাভ না হইয়া লোকসানই হইয়া থাকে। তদুপরি নূতন নূতন বাবুদের নূতন নূতন খামখেয়ালীর ফলেও লাভ না হইয়া লোকসানই হয়। আবার যদি কোন কৃষি-কার্য্যে দক্ষ প্রবীণ লোক কোন প্রকারে এই সকল কৃষিক্ষেত্রে ঢুকিতে পারেন, তবে নূতন বাবুরা কলে কৌশলে উপরিস্থ প্রবীণ কার্য্য-কারক সাহেবদের (European Officer) নিকট তাঁহার বিরুদ্ধ গুণ কীর্ত্তন করিয়া অচিরে তাঁহাকে অবসর লওয়াইয়া থাকেন। সাহেবেরা সিভিলিয়ান, তাঁহারা নূতন বাবুদের হাতে ঢাকের বাঁয়া। সুতরাং নূতন বাবুদের কার্য্যে তাঁহারা সম্মতি দিতে বাধ্য। সিভি-লিয়ান সাহেবেরা সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার সময় কৃষি কার্য্য শিখেন না। নূতন পদে আসিয়া কাজেই তাঁহাদিগকে এই বাবুদের হাতে যাইতে হয়। আবার তাঁহাদের কিছু শিক্ষা হইতে না হইতেই, পরিবর্ত্তনের (Transfer) সময় উপস্থিত হয়। এই তো হইল গবর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্রের পরিণাম। এই সকল কৃষিক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া লাভবান হইতে পারেন না।

আমার বিবেচনায় গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের কার্য্যনীতি গুলি ভ্রমাত্মক। কেননা এই সকল কার্য্য-পদ্ধতি যে সকল লোক দ্বারা চালিত হয়, কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদের বহুদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা অতিশয় কম। তাঁহারা বিদেশী কৃষিপদ্ধতি শিক্ষা করিয়াই এদেশে আগমন করেন। প্রথম অবস্থায় স্বদেশী কৃষিবিদ্যায় তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অতি অল্পই থাকে। এমন কি অনেকে ধানের গাছটি পর্য্যন্ত চিনেন না। বিদেশাগত কোন কোন ব্যক্তির উদ্ভিদ-বিদ্যায় এইরূপ জ্ঞানই হইয়া থাকে। আমেরিকায় কোন কোন স্থানে সি আইলেণ্ড তুলা (Sea Island Cotton) ও কের-লাইন ধান (caroline paddy) নামক শস্যের চাষ হইয়া থাকে। ঐ সকল স্থানের জল-বায়ু এই সকল ফসল জন্মিবার পক্ষে

বিশেষ অনুকূল। নূতন বাবুরা গভর্ণমেণ্টকেও উষর ভূমিতেও উহার চাষ করিবার উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কেননা তাঁহাদের যুক্তিতে সার প্রয়োগ দ্বারা ভূমির উৎকর্ষ-সাধনকার্য্য সাধিত হইলেই এদেশের ভূমিও ঐ সকল ফসল চাষের পক্ষে উপযোগী হইতে পারিবে। কিন্তু সার প্রয়োগ দ্বারা ভূমির ও জলবায়ুর স্বভাব পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব। এদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি অতি কম থাকে। বিদেশাগত নূতন বাবুদের পরামর্শে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্ট উপর শিলং কৃষিক্ষেত্রে জায়ফল, নিচু ও কলা প্রভৃতি চাষের চেষ্টায় ক্রমে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। ঢাকার কৃষিক্ষেত্রেও কোন কোন ফসলের চাষে এইরূপ ফলই হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত ঝগড়া করিয়া কোন কার্য্যে সফলকাম হওয়া যায় না; বিদেশী কৃষিবিদ্যায় ভূষিত ব্যক্তিগণের এ বিষয়ে জ্ঞান অতি অল্প। কাজেই এই সকল লোক চালিত গভর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্রে লাভ হইবার আশা কিসে হইবে। অবশ্যই বিদেশী কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া এদেশে আসিবার পরে দীর্ঘকাল এই সকল বাবুগণকে দেশী কৃষিশিক্ষার জন্য নিযুক্ত রাখিবার পরে তাঁহাদের দেশী কৃষির চাষ সম্বন্ধে জ্ঞান হইতে পারে, বহুদর্শিতা লাভের পরে তাঁহাদের বিদ্যা কার্য্যকরী হইতে পারে। ইহাকেই কার্য্যোপযোগী বিদ্যা কহে। এই জ্ঞানের সহিত বিদেশী বৈজ্ঞানিক কৃষির মূলমন্ত্র ঐক্য করিয়া প্রয়োগ করিলে ফললাভের আশা আছে। এই জ্ঞান লাভ করিতে দীর্ঘকালের প্রয়োজন হয়। হঠাৎ ইহা প্রয়োগ করিলে ফল না হইয়া কুফলই উৎপাদন করিয়া থাকে। সাইরেনসেষ্টার কলেজের কৃষি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেন মহাশয়ও আমার এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন। মৎপ্রণীত 'আলুর চাষ' নামক পুস্তকে তাঁহার মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। স্বদেশী চাষা ভায়া তাহার ক্ষেত্রে যে ফসলই রোপণ করুক না কেন, লাভ ভিন্ন তাহার লোকসান কদাচিৎ হয়। দৈব কারণ ভিন্ন প্রায়ই তাহার লোকসান হয় না। সে অনায়াসে প্রচুর ফসল অর্জ্জন করিয়া থাকে। আমার এই মহকুমায় ফজীল হাজী নামে একজন কৃষক আছে। সে এক জীবনে কৃষিকার্য্যের ব্যয় ও সাংসারিক খরচ বাদে লক্ষাধিক টাকা মজুদ করিয়াছে। তদ্ভিন্ন বহু টাক মূল্যের ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছে। তাহার স্বগ্রামে একটি স্কুল ও মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য সে একদিনে ৪০০০০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন মসজিদ নির্ম্মাণ, পুকুর খনন ও অন্যান্য লোকহিতকর কার্য্যে সে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছে। এই মহকুমার পাতিলাদহ পরগণায় বহু কৃষক কৃষিকার্য্যোৎপন্ন লাভের দ্বারা ১৫০০০।২০০০০ হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছে। এই মহকুমার নালিতাবাড়ী থানার বহু কৃষক কৃষিকার্য্য দ্বারা প্রচুর সম্পত্তি, হস্তী, অশ্ব ও মহিষ প্রভৃতি খরিদ করিয়াছে। স্বহস্তে হল চালনা করিয়া এ জেলায় বহু লোক প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। নিরক্ষর কৃষক যদি জাপান, আমেরিকা ও ইউরোপ না যাইয়া পূর্ব্ব

পুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কৃষিকার্য্য দ্বারা প্রভূত ধন-সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয়, তবে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়া অর্থ নাশ করিয়া সুদূরবর্ত্তী দেশে যাইবার কি প্রয়োজন ? জাপান ও আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আমাদের উপাধিধারী ভ্রাতাগণ কি কথিতরূপ অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন ? নিশ্চয়ই নয়।

বিদেশে কিরূপে কৃষিকর্ম্ম হইয়া থাকে তাহা জানার জন্য মনে ঔৎসুক্য জন্মে সন্দেহ নাই। যাঁহার অর্থ আছে তাঁহার এই ঔৎসুক্য নিবারণ করার জন্য বিদেশে যাওয়া কর্ত্তব্য। ভিক্ষালব্ধ অর্থের দ্বারা দূরদেশে যাইয়া এরূপ শিক্ষা লাভ করা আমি সঙ্গত বোধ করি না। বিদেশে যাইয়া যে শিক্ষা হয়, পুনা, সাবোর ও পুষা কলেজে অধ্যয়ন করিলে বোধ হয় আজকাল উহাপেক্ষা কৃষিকার্য্যে অল্প শিক্ষা ও অল্প জ্ঞানলাভ হয় না।

পূর্ত্তশিক্ষা, কলকারখানার কার্য্যশিক্ষা, খনিবিদ্যা-শিক্ষা ও শিল্প-শিক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য আছে, যাহা শিক্ষার জন্য আমাদিগের বিদেশে যাওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। এই প্রবন্ধে আমি উদ্দিষ্ট বিষয় ত্যাগ করিয়া অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি। পাঠক আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

বৈজ্ঞানিক ও দেশীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া কি ভাবে কৃষিকার্য্য করিলে লাভের সম্ভাবনা অধিক ভবিষ্যতে তদ্বিষয়ে এই পত্রিকার স্তম্ভে ২।৪টি প্রবন্ধ প্রকাশ করিব। তাহা হইলেই পাঠকগণ এই প্রবন্ধে আমার এতগুলি কথা বলিবার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ,
ময়মনসিংহ।

কঃ পন্থাঃ *

এই যুগ নূতনের যুগ। এই যুগের জ্ঞান নূতন, ধ্যান নূতন, সাধনা নূতন—সকলই নূতন। নূতন, পদ্মার স্রোতের মত, পুরাতনকে ভাসাইয়া লইয়া ছুটিয়াছে, কখন বা তাহার জীর্ণ অস্থিকে কাঠাম করিয়া নূতন চড়া গড়িয়া তুলিতেছে, কখন বা তাহাকে কোথায় নিয়া যে বিসর্জ্জন দিতেছে তাহার কূল-কিনারাও পাওয়া যাইতেছে না। যেই-রূপেই হউক কেহ আর পুরাতনকে আরামে ঘুমাইতে দিতেছে না, পুরাণকে পুরাণরূপে আর কেহ দেখিতে চায় না। কালো কেশের উপর শ্বেত বং চড়াইতে না চড়াইতে মানুষ তাহাকে কালো করিয়া দেওয়ার জন্য কত ব্যস্ত, দাত নড়িয়া উঠিতে না উঠিতে তাহার জন্য কত ব্যবস্থা। যখন এই যুগে আমাকে প্রাচীনের কথা কহিতে হইতেছে তখন যে আমাকে নূতন সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে যখন প্রাচীনের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তখন হিন্দুজাতির বর্ত্তমান অবস্থা

* চট্টল-ধর্ম্মমণ্ডলীর বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত

সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক বা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কেহ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—এখন হিন্দুজাতি কি ভাবে কোথায় আছে? আমি বলিব হিন্দুজাতি মরিয়া গিয়াছে। সে এখন আতিবাহিক দেহ আশ্রয় করিয়া "আকাশস্থ নিরালম্ব" ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পিতৃলোক উত্তীর্ণ হইতে কিম্বা মর্ত্তালোকে অবতীর্ণ হইতে পারিতেছে না। আছে—কেবল তাহার যন্ত্রণাদায়ক দারুণ ভোগস্পৃহা। তাহার দরকার হইয়াছে একটি পঞ্চভূতাত্মক বিরাট দেহ, রক্তমাংস ও ধমনীজড়িত এক খানা কাঠাম। দেহশূন্য অবস্থায় কেহ যুগযুগান্তর ঘুরিতে পারে না। আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই জাতি পুনরায় রক্তমাংসের দেহ গ্রহণ করিয়া নূতনের সহিত হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিবে, নচেৎ আজ তাহার মধ্যে এত ভোগবাসনার প্রবল স্রোত দেখিতে পাইতাম না। আজি যেই দিকেই দেখি না কেন,—কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, কি শিল্প, কি বাণিজ্য, কি সমাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি—সব দিকেই এই জাতির প্রবল বাসনাস্রোত গঙ্গার প্রবাহের মত মত্ত ঐরাবতের সহস্র বাধা তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তখন কি করিয়া বলিব এই জাতির জন্ম হইবে না। এই জাতি যে কেবল দারুণ ভোগস্পৃহা লইয়া মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদে বিধাতার শ্রবণ-জ্বালা উৎপাদন করিবে, তাহা কখনই হইতে পারে না।

এখন কথা হইতেছে—কোন্ দেহ তাহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে। কোন্ দেহ আশ্রয় করিলে তাহার ভোগবাসনাগুলিকে ষোড়শোপচারে সাজাইয়া বিশ্বেশ্বরের নৈবেদ্য-রূপে উপস্থিত করিতে পারিবে, তাঁহার অন্য সেবকের সহিত পূজামণ্ডপে আপন আসন বাছিয়া লইতে পারিবে। এই প্রশ্নটি অতি দুরূহ। তাহার সম্যক সদুত্তর দান মাদৃশ জনের পক্ষে এক রকম অসম্ভব। তবে যখন দাঁড়াইয়াছি তখন একটা কিছু বলিতে হইবে।

বিশ্বেশ্বরের বিপুল বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাই, সকল স্থানের আব্-হাওয়া এক নহে। দেশভেদে, শরীরের গঠন-ভেদ, ধ্যান-ভেদ, ধারণা-ভেদ এবং জীবিকা-ভেদ রহিয়াছে। এমন কি চন্দ্রে সূর্য্যে, শীতে বসন্তে, গ্রীষ্মে বর্ষায়ও বিশেষ পার্থক্য বর্ত্তমান। এক দেশের চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু—যাহা প্রাণীমাত্রেরই প্রাণধারণের পক্ষে একান্ত দরকার—তাহাও অন্য দেশের পক্ষে ঘোর যন্ত্রণাদায়ক, এমন কি মারাত্মক পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এখন বোধ হয় নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—সংসারে এমন কোন শিক্ষা নাই যাহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বজনপ্রিয় ও সর্ব্বজন-হিতকর হইবে। সমাজভেদে, প্রকৃতিভেদে শিক্ষাতেও যে ভেদ থাকিবে তাহা স্বাভাবিক, তাহার উপর কাহারো জোর-জবরদস্তী চলিবে না। সত্য এক হইতে পারে, সত্য রাজ্যে উপস্থিত হইবার পন্থা এক হইতে পারে না।

শিক্ষা কি? শিক্ষা অর্থ কি কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাট পার? এই যুগে এই অর্থ বটে। উচ্চশিক্ষিত বলিলে আমরা কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি-বর্গকেই বুঝিয়া থাকি, অন্য কাহারো কথা মনে কল্পনাও করিতে পারি না। বস্তুতঃ

শিক্ষার অর্থ তাহা নহে, শিক্ষা-শব্দের মধ্যেই একটি বহুব্যাপকভাব নিহিত আছে। মানুষের শান্তিসুখে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে, মনুষ্যত্ব ও সমাজ বজায় রাখিয়া চলিতে এবং ভগবানকে ও তাঁহার ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি করিতে যাহা যাহা দরকার তাহাতে সম্যক জ্ঞান লাভের নামই শিক্ষা।

আমাদের আর কিছু থাক বা না থাক, আমাদের আর কিছু কেহ স্বীকার করুক বা নাই করুক, আমরা যে জগতের একটি প্রাচীনতম জাতি তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। আমরা যদি প্রাচীনজাতি হই, তাহা হইলে আমাদের কি কোন প্রাচীন শিক্ষা ছিল না। শিক্ষা ব্যতিরেকে কোন জাতির খ্যাতি-প্রতিপত্তি তিষ্ঠিতে পারে না।

প্রকৃতিগত জাতীয়শিক্ষার ত্রুটী না ঘটিলে কখনও কোন জাতির অধঃপতন হইতে পারে না, এবং হইয়াছে বলিয়া শুনাও যায় নাই, জগত সমক্ষে আমরা এখন অধঃপতিত বা মৃত জাতি বলিয়াই পরিচিত, সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ হওয়ারও কারণ নাই—আমরা প্রকৃতই পতিত। সেই কথা যে না বুঝি, তার প্রতিকারের ইচ্ছাও যে কিছু না করি, এমন নয়; তবে আমরা উঠিতে পারিতেছি না কেন? ইহাই এখন ঘোর সমস্যা। কেহ কেহ বলেন হিন্দু জাতিটা যুগ যুগ ধরিয়া কেবল পরকালতত্ত্ব ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ইহকালটা একেবারেই মাটী করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা কর্ম্মবিজ্ঞানের কোন ধার ধারিতেন না, তাহা হইতেই এই নিষ্কর্ম্মা পতিতদলের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার কেহ বলেন হিন্দুদের কোন দিন কিছু ছিল না,—তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা ছিল না, জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল না—অসভ্য বর্ব্বর, তাহাদিগকে ২১ শতাব্দীর মধ্যে টানিয়া তুলিবে কাহার সাধ্য? বস্তুতঃই কি তাহা সার সত্য? সত্যই হউক আর অসত্যই হউক, আমরা কিন্তু তাহা নির্ভুল সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। আমরা পরের মুখে ঝাল । ইহা আমাদের দোষ নহে—ইহাই পতিত জাতির লক্ষণ। নিজকে নিজে ক্ষুদ্র অনুভব করিতে, নিজকে নিজে নগণ্য মনে করিতে একমাত্র পতিত জাতির দাবীই অগ্রগণ্য। ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে ডুবিয়া না গেলে কেহ কখনও মরিতে পারে না। যাহার আত্মসম্মান-জ্ঞান আছে, তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য, ধরণীর বক্ষ তাহার জন্য সদাই উন্মুক্ত, তাহাকে আসন দিতে বিশ্বমানব ব্যস্ত, কখন কখন ভয়ে সন্ত্রস্ত। আমাদের এই পাতিত্যের কারণ কি? আমাদের প্রাচীন জাতীয়-শিক্ষায় অনভিজ্ঞতাই ইহার মুখ্য কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমাদের কি ছিল, এবং আমরা তাহা কত দূরই বা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা যদি একবার জানিতে পারিতাম তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের অনেক ভ্রান্ত ধারণা ঘুচিয়া যাইত, আমাদের দুঃখদুর্গতিও অনেকাংশে ঘুচিয়া যাইত।

যেই জাতির প্রবল পরাক্রমে গ্রহ-নক্ষত্র পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে তিষ্ঠিতে পারে নাই, সমুদ্র তরঙ্গবক্ষে নিরাপদে ঘুমাইতে পারে নাই, যাহারা পাতালের শান্তি পর্য্যন্ত অব্যাহত রাখে নাই, কর্ম্মই যাহার ধর্ম্ম, কর্ম্মই যাহার যোগ, যাহার ভগবৎ বাক্য—

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ,
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ"

সেই জাতি যে নিষ্কর্ম্মা কর্ম্মবিজ্ঞানবর্জ্জিত ছিল, তাহা কেবল পতিত জাতি ভিন্ন আর কেহই ধারণা করিতে পারে না। তবে এখনকার কর্ম্মে আর তখনকার কর্ম্মে একটু প্রভেদ ছিল। তখনকার কর্ম্ম ধর্ম্মমূলক, আর এখনকার কর্ম্ম কেবল কর্ম্মমূলক, তখনকার কর্ম্ম ধর্ম্মের সঙ্গে মিলিত হইয়া কর্ম্মের সাধনাকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল। আর এখনকার কর্ম্ম ধর্ম্মবর্জ্জিত হওয়ায় তাহা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। তাই কর্ম্মে আগ্রহ না জন্মিয়া কর্ম্মের নামে ভীতির সঞ্চার হইতেছে, আর আমরা দিন দিন কর্ম্মবিমুখ হইয়া পড়িতেছি, এবং আমাদের আধ্যাত্মিকতার সহিত প্রতীচীর কর্ম্মবিজ্ঞান যোগ করিয়া কর্ম্মঠ হওয়ার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি।

যিনি পৈতৃক ধন-সম্পত্তির খবর রাখেন না, অথচ নিজেও কর্ম্মশীল নহেন, তাঁহার যেমন পিতার মৃত্যুর পর ধার ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না, আমাদেরও ঠিক সেই দশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধার করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি সংরক্ষণ কি বৃদ্ধি করিতে না পারিলে শেষে আত্মবিক্রয় করিতে হয়। আমরা এত নিষ্কর্ম্মা ও নিজের প্রতি এত আস্থাহীন যে আমাদের কিছু ছিল কি না তাহা একবার খুঁজিয়া দেখিতে ইচ্ছাও করি না। যখন কোন প্রতীচ্য পণ্ডিত আমাদের কোন লুপ্ত ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া মুগ্ধ নেত্রে বসিয়া আছেন দেখিতে পাই, তখনই আমরা ধরিতে পারি যে আমাদের ভাণ্ডারেও রত্ন আছে, তার আগে আর নহে। ইহা অপেক্ষা কোন জাতির আর কি শোচনীয় অধঃপতন হইতে পারে? তাই বলিতেছি আগে আমাদের প্রাচীনের দ্বারস্থ হইয়া দেখিতে হইবে —তাঁহাদের তহবীলে আমাদের জন্য কি কি মজুত আছে, তার পর অন্য চেষ্টা।

কেহ কেহ বলেন আমরা উন্নত জাতিকে আদর্শ করিয়া, উন্নত জাতির অনুকরণে উন্নত হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি, আমরা উন্নত হইব না কেন? উন্নত জাতি আমাদের আদর্শ সত্য, ভাল শস্যের বীজ সংগ্রহ করিলে কি হইবে, যদি তদনুরূপ ক্ষেত্র না থাকে। পশ্চিমের সব গাছ আমাদের দেশে জন্মায় না, জন্মিলেও আশানুরূপ ফল প্রদান করে না। এই দোষ বীজের বা ক্ষেত্রের কাহারও নহে —দোষ প্রকৃতির। প্রকৃতি তাহা পোষাইয়া উঠিতে পারে না। উদরকে ভাল আহার যোগাইলে কি হইবে, যদি তাহার হজম-শক্তি না থাকে। এই জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় সম্যক ফল লাভ করিতে পারিতেছি না। আমাদের ধর্ম্ম ও চরিত্রের দিকটা একেবারেই আঁধার থাকিয়া যাইতেছে। যাহার উপর মানুষের মনুষ্যত্ব নির্ভর করিতেছে, তাহার যদি ভাল চাষ না হয়, ভাল ফসল জন্মিবে কিসে? চরিত্র গঠনের জন্য আমাদের আর্য্য ঋষিরা যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আমরা এখন তাহার কোন দরকার বুঝিতেছি না। ব্রহ্মচর্য্যকে ব্রহ্মলোকে রপ্তানি করিয়া তৎপরিবর্ত্তে বিদেশী বিলাস-ব্যসনের আমদানী করিয়াছি। যাহা রোপণ করিলাম তাহা ক্ষেত্রোপযোগী হইল কি না দেখিলাম না। হিন্দুরা ধনের অভাবে কি কার্পণ্য

হেতু বিলাস-বর্জ্জিত ছিলেন তাহা নহে, তাঁহাদের যথেষ্ট ধন ছিল, ধনব্যয়ের পন্থাও সহস্রমুখী ছিল, তদুপরি "অর্থম্ অনর্থম্" বলিয়া ধারণাও ছিল। বিলাসিতা এই ক্ষেত্রের উপযোগী নহে বলিয়া তাঁহারা তাহার চাষে বিরত ছিলেন। এই দেশে বিলাসিতা অলসতা ও ইন্দ্রিয়প্রবণতা কোন সুফল সব করিতে পারে না। এই জন্যই হিন্দুরা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যেই ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম যোগ করিয়া দেশানুরূপ বিধান করিয়াছিলেন। ভারত-বর্ষের অতীত যুগের তুলনায় বর্ত্তমানে তাহাকে নিঃস্ব ও নিরন্ন অস্থিকঙ্কালসার দারিদ্র্যের করালমূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। সুতরাং এই যুগে যে আমাদের আরও কতদূর সংযত হইয়া চলা আবশ্যক, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইবার দরকার নাই।

কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আমরা এখন কি দেখিতেছি? দেখিতেছি—একটি ঘড়ি অন্ততঃ এক গাছি চেন, এক জোড়া চশমা এবং এক গাছি ছড়ি না হইলে সামান্য ৫৲ টাকা বেতনের একজন লোকেরও তৃপ্তি হইতেছে না। বিলাসিতার কি দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে! দেশ ভস্মীভূত হইবার আর বাকী কি? ঋষির আশ্রমে এই ভোগ-বিলাসের প্রবল বন্যা কোন রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া গেল, একটু নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিলেই তাহার কারণ খুঁজিয়া পাইবেন। ম্যান্‌চেষ্টারের কলের কাপড় যেমন দেশীয় বস্ত্রশিল্প একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিতেছে, তেমনি পাশ্চাত্য ভাবের খরস্রোতে আমাদের সনাতন ভাবগুলি একে-বারে ভাসিয়া গিয়াছে। দেশের এই দুর্দ্দশা কেন হইল? ইহা প্রাচীন শিক্ষার অভাবে। প্রাচীন শিক্ষার অভাবেই আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের মূলসূত্রটি ভুলিয়া গিয়াছি। কেবল আমরা ভুলিয়া গিয়াছি এমন নহে, আমাদের কুললক্ষ্মীগণকেও আমাদের পথে টানিয়া আনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। ভারতবর্ষের স্ত্রী-সমাজ বিধাতার একটা বিশিষ্ট দান। এমন পাকশালে পাচিকা, পরিবারে পরিচারিকা, গৃহে গৃহিণী, সমরে রণরঙ্গিণী, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে চিরসঙ্গিনী, অথচ অশনে উচ্ছিষ্টভোজী, ভূষণে শঙ্খবলয়া, এমন ত্যাগের মূর্ত্তি, এমন শান্তির মূর্ত্তি জগৎ আর দেখিয়াছে কি না জানি না। তবু আমাদের তাহাতে সাধ পূরিল না। আমরা এখন পাশ্চাত্য ছাঁচে আদর্শগৃহিণী প্রস্তুত করিতেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য আমরা খব ব্যস্ত। "না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।" আমরা এই কবি-বাক্য খব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, তাই এমন ভাবে স্ত্রী-সমাজ তৈয়ার করিতে প্রয়াসী হইয়াছি যেন শীঘ্র শীঘ্র আমাদের দরজা খিড়কী ভগ্ন করিয়া আমাদিগকে বেশ করিয়া জাগাইয়া দিতে পারে। স্ত্রী-শিক্ষার প্রথম সোপান মেয়েকে সুন্দর বিলাতি গাউন, সেমিজ ও জুতা পরাইয়া কোমল মুখখানাতে পাউডার মাখাইয়া স্কুলে পাঠান, আর দু'একটি চিঠি পত্র ও বিষবৃক্ষ পড়িতে পারিলেই শিক্ষা শেষ। তদ্ভিন্ন মেয়েকে কোন গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার কোন দরকার আছে বলিয়া মনেও করিতে পারি না। অবিদ্যা

তৈয়ার করিবার জন্তই যেন আমাদের বালিকা-বিদ্যালয়।

"ন গৃহ গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।"

যে দেশের গৃহস্থের এই জ্ঞান সেই দেশের কি এই শিক্ষা! ইহা কি শিক্ষা, না শিক্ষার ব্যভিচার? এই শিক্ষাতে কি গৃহিণী ও জননী তৈয়ার হইবে? আমাদিগকে গৃহিণী তৈয়ার করিতে হইলে মেয়েদের অস্থিমজ্জায় ধর্ম্মভাব, সংযমের ভাব, ত্যাগের ভাব প্রবিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। শিক্ষা কেবল বর্ণ-মালায় আবদ্ধ না রাখিয়া গৃহস্থের প্রত্যেক কর্ত্তব্যকর্ম্ম এক একটি গ্রন্থরূপে শিখাইতে হইবে। নচেৎ আমাদের স্ত্রী-শিক্ষা কল্যাণ-প্রসূ না হইয়া ঘোর অমঙ্গল সৃষ্টি করতঃ সমাজে হাহাকার তুলিয়া দিবে। অনুকরণ মন্দ নহে, যদি তাহাকে নিজস্ব করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অন্ধ অনুকরণের ফল বড় ভয়াবহ, আমরা অনুকরণ করিতে করিতে যদি একেবারে মূলহারা হইয়া যাই তাহা হইলে আমাদের অস্তিত্ব শীঘ্র লোপ পাইবে। আমরা হিন্দু, যদি হিন্দু থাকিয়া জগত সমক্ষে উন্নত বলিয়া পরিচয় দিতে পারি তাহাই গৌরবের কথা, এবং তাহাই প্রকৃত উন্নতি। আর যদি তাহা না করিয়া একটি অভিনব জাতি সৃষ্টি করিয়া বসি, পিতৃপিতামহের জাতি, ধর্ম্ম এবং নামটা পর্য্যন্ত অবাধে লুপ্ত করিয়া দিই, তাহাকে ব্যক্তিগত ভাবে কেহ কেহ উন্নতি বলিয়া মনে করিলেও তাহাতে হিন্দু জাতির কোন উন্নতি হইল না, বরং বিনাশ ও অধঃ-পতন হইল। এখন আমাদের উপায় কি? আমরা কি প্রকারে নিজ জাতীয়-জীবন বজায় রাখিয়া উন্নত হইতে পারি তাহার জন্য বিশেষ যত্নবান হওয়াই আমাদের এখন একমাত্র কর্ত্তব্য, নচেৎ আমাদের অস্তিত্ব থাকিবে না। হিন্দু জাতিকে বাঁচাইয়া তুলিতে হইলে প্রাচীন শিক্ষার অনুশীলনে ও অনুধাবনেই তাহা একমাত্র সম্ভব হইবে। আমাদিগকে নূতন প্রাসাদ গড়িতে হইবে সত্য, কিন্তু যাহা পুরাতন যুগ-যুগান্তের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াছে তাহাকেই ভিত্তি করিতে হইবে, নচেৎ অচিরাৎ ভূমিসাৎ হইবার আশঙ্কা পদে পদে বিদ্যমান থাকিবে। প্রাচীন শিক্ষার অনভিজ্ঞতার দরুণ আমাদিগের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক সর্ব্বপ্রকার অবনতি ঘটিতেছে। আমাদের ঋষিরা আমাদের প্রকৃতি ও ধাতুর অবস্থা বুঝিয়া আমাদের কল্যাণার্থে যে সব বিধি-বিধান করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া এমন লোকের বিধি-বিধানের প্রতি আস্থা স্থাপন করিতেছি, যাঁহাদের চন্দ্র-সূর্য্যের সহিত আমাদের চন্দ্র-সূর্য্যের দেখা নাই, যাঁহাদের সহিত আমাদের প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য একেবারে নাই।

প্রাচীন শিক্ষার অভাবে আরও একটি গুরুতর ক্ষতি এই হইয়াছে যে, আমাদের ধর্ম্ম কি, অধর্ম্ম কি, ন্যায় কি, অন্যায় কি তাহা বুঝিয়া উঠিবার সাধ্য নাই। এমন অনেক আচার এমন অনেক নীতি সমাজে প্রবেশ করিয়াছে যে তাহা মহামারীরূপে দিন দিন সমাজ ধ্বংস করিতেছে প্রত্যক্ষ করিতেছি, অথচ তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারিতেছি না। প্রাচীন শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া দেখিলে কোথাও তাহার

কোন নামগন্ধ পাইব কি না তাহাও সন্দেহস্থল, প্রাচীন শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতার দরুণ কত অধর্ম্মই আমাদের ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে, ধর্ম্ম আমাদিগকে ছাড়িয়া কত দূর-দূরান্তরে প্রস্থান করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের ধর্ম্ম এখন জ্ঞানের অভেদ্য বর্ম্ম দূরে পরিহার করিয়া হুঁকা ও হাঁড়ীতে প্রবেশ করতঃ কোনমতে আত্মরক্ষা করিতেছে। তাই আমি আমার দেশবৎসল মহাত্মাগণকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন প্রাচীন শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তাহা হইলে আমরা আমাদের প্রাচীন সম্পদগুলি যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া, তাহাতে প্রয়োজন মতে নূতন যুগের নূতন বল সংযোগ করিয়া নিশ্চয়ই সিদ্ধকাম হইতে পারিব।

প্রাচীনের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে হইলে আমাদের সংস্কৃত শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। কারণ ঋষিপ্রণীত সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এখন কথা—কি উপায়ে আমরা তাহা সহজলভ্য করিতে পারি? তাহা করিতে হইলে আমাদিগকে প্রতি জেলায় একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। তাহাতে যেন ধর্ম্মবিজ্ঞান, কর্ম্মবিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, সাহিত্য, ক্রিয়াকাণ্ড ইত্যাদি নিয়মমত শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে এবং গ্রামে গ্রামে তাহার কর্ত্তৃত্বাধীনে যেন সংস্কৃত টোল সংস্থাপিত হয়। ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ের সাহায্যে সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনূদিত হইবে, তাহাতে যেমন প্রাচীন গ্রন্থগুলি সকলের সহজবোধ্য হইবে, তেমন বঙ্গ-ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হইবে। আমার বিশ্বাস যদি কোন মহাত্মা এই কল্যাণকর অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে তাহাতে সকলের সহানুভূতি পাইবেন, আমি ধর্ম্ম-মণ্ডলীকে এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইতে অনুরোধ করিতেছি, তদ্দ্বারা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। প্রাচীন শিক্ষার বিস্তার না হইলে কখনও সমাজের উচ্ছৃঙ্খল ভাব নষ্ট হইবে না। আমাদের মনুষ্যত্বও ফিরিয়া আসিবে না।

এখন যাঁহারা প্রাচীন শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ব্রাহ্মণকে বাদ দিয়া প্রাচীন শিক্ষা সম্বন্ধে কোন কথা বলা অসম্ভব, প্রাচীন শাস্ত্রের অবনতির বিষয় চিন্তা করিলে প্রথমতঃ ব্রাহ্মণের কথাই মনে জাগে, কারণ ব্রাহ্মণেরাই তজ্জন্য প্রধানতঃ দায়ী। ব্রাহ্মণেরা যখন নিজ কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন দিয়া কেবল স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, সমস্ত কার্য্যে অর্থ উপার্জ্জনের পথ প্রসার করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণেতর বর্ণের উপর টেক্সের পর টেক্স ধার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন, অথচ জ্ঞানালোক দিতে নিবৃত্ত হইলেন, তখনই তাঁহাদের রাজ-সিংহাসন টলিয়া গেল। মাথা খারাপ হইলে যেমন অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজে আসে না, তেমনি ব্রাহ্মণের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাতির অধঃপতন হইল। ধর্ম্মবিজ্ঞান কি কর্ম্মবিজ্ঞান যিনি যাহাতে হাত দেন না কেন, যদি তাহার উন্নতির জন্য মন-প্রাণ সমর্পণ করেন তাহা হইলে তাহার সাধনা নিশ্চয় ফলবতী হয়, তাহার গৌরব-গরিমায় জগৎ মুগ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু তাহা না করিয়া যদি

তিনি তাহাকে কেবল জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়স্বরূপ ব্যবসায়ের হিসাবে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আপাততঃ কয়দিন তদ্দ্বারা পুত্র-পরিবারের ভরণ-পোষণ চলিতে পারে বটে, কিন্তু পরিণাম-ফল বড়ই খারাপ হইয়া দাঁড়ায়, শেষে "স্বখাদ সলিলে ডুবে মলাম শ্যামা" বলিয়া অনুশোচনা করিতে হয়। এখন এমন দিন আসিয়াছে, যাত্রায় নাটকে হাস্যরসের উদ্রেক করিয়া আসর জমাইতে হইলে ব্রাহ্মণ চাই, গল্প গুছাইতে হইলে ব্রাহ্মণ চাই, সং সাজাইতে হইলে ব্রাহ্মণ চাই, বস্তুতঃই এমন কাল পড়িয়াছে, যদি প্রাচীন শাস্ত্রের সহিত মিল করিয়া কেহ ব্রাহ্মণ খুঁজিতে বসেন তাহা হইলে "ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড়" হইয়া যাইবে; তাই হিন্দুদের ক্রিয়া-কাণ্ডে দর্ভময় ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে যজ্ঞসূত্রের বড়াই করিয়া ধরাকে সরা জ্ঞানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন দেখিতে পাই, কিন্তু এখন এমন একজন লোকও ত দেখি না যাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া একদিন জগত ধন্য হইয়াছিল। কি লজ্জা কি পরিতাপের কথা! যথেষ্ট দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু এই দোষ কাহার? শুধু কি ব্রাহ্মণের? যখন ব্রাহ্মণেরা নামিয়া পড়িতেছিলেন এবং ব্রাহ্মণেতর বর্ণ অজ্ঞান-আঁধারে ডুবিয়াছিল তখন ব্রাহ্মণের দোষ ছিল সত্য, কিন্তু যখন অপর বর্ণে শিক্ষার আলোক পড়িয়াছে, তখন আর কেবল ব্রাহ্মণকে দোষ দিলে চলিবে কেন? যিনি যেই ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন, ব্রাহ্মণ ছাড়া সমাজ চলে না, প্রত্যেক জাতিতে ব্রাহ্মণের একটি পদ আছে দেখা যায়। ব্রাহ্মণ পদটি একেবারে লুপ্ত করার জিনিষ নহে, যদি সমাজরক্ষার্থে অপর তিন বর্ণের দরকার থাকে, তবে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহা হইতেই সমাজে শান্তির স্রোত প্রবাহিত হয়। উপযুক্ত ব্রাহ্মণই সমাজকে গৌরবান্বিত করিতে পারেন। তবে তাহা লুপ্ত হইতে চলিল কেন? ইহার একমাত্র কারণ এতদিন ব্রাহ্মণেতর বর্ণেরা ব্রাহ্মণ চাহেন নাই, তাই ব্রাহ্মণ তৈয়ারও হয় নাই। ভক্তিতেই হউক, কি লোক-লজ্জাভয়েই হউক, কিংনিয়ম-রক্ষার্থেই হউক আমরা ত এখনও পূজা-পার্ব্বণ করিয়া থাকি, এবং ব্রাহ্মণ নামে এক জনকে কাজেও লাগাই। পূজাপার্ব্বণে আমরা চাই কি? আমরা চাই আমোদ-প্রমোদ, আমরা চাই গান-বাজনা, আমরা চাই ভোজন, আর বাহাদুরী, তাহা ত আমাদের যে কোন প্রকারে মিলিয়া থাকে। তবে দেবকর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ ব্রাহ্মণ মিলে না কেন? দর্ভময় ব্রাহ্মণ কেন? কারণ আমরা ব্রাহ্মণের দরকার বুঝি না ও ব্রাহ্মণ চাহি না। যখন অভাব নাই তখন আমদানীও নাই।

এখন কথা, কি উপায়ে ব্রাহ্মণ তৈয়ার হইবে? কেবল গালাগালি করিলে ব্রাহ্মণ তৈয়ার হইবে না। ফোটক কাটিতে কুঠারের ব্যবস্থা করিলে রোগীকে কখনও আরোগ্য করা যায় না। ভারতের ব্রাহ্মণের মত জগতে কোন মানুষের ভাগ্যে এত উচ্চ অঙ্গের সম্মান ঘটে নাই, কোন দেশে মানুষ দেবতা হইতে পারে নাই। তজ্জন্য তাঁহাকে সমাজের কাছে অনেক অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত, তাই তাঁহার গৌরব ছিল।

একগাছি সূত্র কাঁধে দিলে তখন ব্রাহ্মণ

হওয়া যাইত না, ব্যাকরণের ২।১টি সন্ধি কি মেঘদূতের ২।১টি শ্লোক আওড়াইতে শিখিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যাইত না, এখনকার টোলের উদ্দেশ্য সংস্কৃত-শিক্ষা, ব্রাহ্মণ তৈয়ার নহে। ব্রাহ্মণ তৈয়ারের কল স্বতন্ত্র। কোন টোলে প্রবেশ করিয়া দেখিলে ব্রাহ্মণের ছেলে পড়িতেছেন বলিয়া মনে হয় না, স্কুলের ছাত্রের ন্যায় টোলের ছাত্রেরাও ব্রহ্মচর্য্যকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, বিলাস-স্রোতে দুই দলই ভাসিয়া চলিয়াছেন; স্কুলে কিছু শাসন আছে, টোলে তাহাও নাই। ব্রাহ্মণ তৈয়ার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিয়া চরিত্র গঠন করিতে হইবে। যাহাতে ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণোচিত শিক্ষা পাইয়া নিজ নিজ গৌরব অনুভবের ক্ষমতা পান এবং ব্রাহ্মণেতর বর্ণেরাও ব্রাহ্মণ চিনিয়া লইতে ও তাহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহার প্রতিবিধান করা একান্ত দরকার। তাহাতে সমাজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে, ব্রাহ্মণেতর বর্ণকে দৃঢ়রূপে দাঁড়াইতে হইবে। যেই দিন যজমান বলিবেন, "পুরোহিত মহাশয় মন্ত্রের অর্থ ও উচ্চারণ না জানিলে তিনি তাঁহাকে দিয়া শ্রাদ্ধ করাইবেন না, বিষ্ণু-পূজার মন্ত্র না জানিলে তাঁহাকে ঠাকুর ঘরে পা দিতে দিবেন না, গুরু গুণসম্পন্ন না হইলে তাঁহা দ্বারা দীক্ষিত হইবেন না, এবং ব্রাহ্মণোচিত শিক্ষা ও সদাচার না থাকিলে তাঁহার চরণে প্রণাম করিবেন না।" তখন কাহার সাধ্য থাকিবে যে কেবল পিতৃপুরুষের উপবীতের দোহাই দিয়া যজমানের নিকট উপস্থিত হইবেন? সমাজের এই শাসন না হইলে ব্রাহ্মণ জন্মিবে না। ইহাতেও যাহার চৈতন্যোদয় না হয় তিনি ব্রাহ্মণত্বের দাবী ত্যাগ করিয়া সমাজকে মুক্ত করিতে পারেন, সমাজ তেমন ব্রাহ্মণ চায় না, তাহারা কেবল সমাজের বোঝা, শুধু তাহা নয় ব্রাহ্মণ নামেরও কলঙ্ক।

শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী।

সামাজিকতথ্য-সংগ্রহ

(২)

মহামহোপাধ্যায় হলধর তর্কচূড়ামণি

ইনি পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর বশিষ্ঠ-গোত্রসম্ভূত। আচারে, নিষ্ঠায়, চরিত্রে, পাণ্ডিত্যে আর পাণ্ডিত্যোচিতগুণে একজন আদর্শ পুরুষ। ইঁহাকে দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইত যে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতই সমাজের নেতা হইবার উপযুক্ত।

ইনি পিতার প্রথম পক্ষের সন্তান। কাজেই পিতার সহিত তেমন বনিবনাও ছিল না। ইহাতে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কোন দোষ ছিল না। ইনি পিতার সমস্ত সম্পত্তি হেলায় পরিত্যাগ করিয়া স্বাবলম্বনে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন।

ইঁহার সময়ে ভট্টপল্লী-সমাজ অতীব প্রভাবান্বিত। সদাচার-পদ্ধতির তখন কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। তর্কচূড়া-

মণি মহাশয় উপবীত হইয়াই মৎস্য-মাংস ত্যাগ করেন, সন্ধ্যা-পূজাদি কায়মনোবাক্যে অনুষ্ঠান করেন। কোনও রূপ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্য করিতে কেহ কখনও তাঁহাকে দেখে নাই। তিনি ভট্টপল্লীর নেতা ছিলেন। সকলেই তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত ছিল। ইঁহার নিন্দা করিবার কেহ ছিল না। ব্রাহ্মণ ছাত্রগণকে স্বগৃহে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন, নিঃস্বার্থ অধ্যাপনা, ব্রাহ্মণশিষ্যগণকে মন্ত্রদান ইঁহাদের বংশের ধর্ম্ম। ইনিও তাহাই করিতেন। ইঁহার গুণ, পাণ্ডিত্য, সদনুষ্ঠান দর্শনে বহু ব্রাহ্মণ পরিবার ইঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। কুপ্রতিগ্রহ, কুব্যবস্থাদানে ইঁহার ঘৃণা ছিল; বিলাসিতা, লোভ, দাম্ভিকতা ইঁহাতে ছিল না।

ইনি বৈষ্ণব, রামমন্ত্রোপাসক। শিষ্যগণ কেহ বৈষ্ণব, কেহ শাক্ত, কেহ শৈব, কেহ বা অন্যমন্ত্রাবলম্বী। ইঁহার সময়ে বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে নৈয়ায়িক। বলিতে গেলে বাঙ্গালা তখন নৈয়ায়িকের রাজ্য।

বিবাহ ত্রয়োদশ বৎসরে হয়। প্রথমা পত্নী সন্তানাদি হইবার পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন। তাহার পর ইনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। ইঁহারই পৌত্র শ্রীপঞ্চানন তর্কতীর্থ এক্ষণে ভট্টপল্লীর অন্যতম নৈয়ায়িক পণ্ডিত।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ছাত্র না হইলেও তাঁহারই যত্নে এত বড় পণ্ডিত হইয়াছেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বুদ্ধি-প্রাখর্য্য দেখিয়া, ভট্টপল্লীর গৌরব-রক্ষা ইঁহার দ্বারা হইবে ভাবিয়া ইঁহাকে হাতে করিয়া একপ্রকার তৈয়ারী করিয়াছেন। এরূপ নিঃস্বার্থ শ্রম কে করে?

ইনি বিচার-কালে সিংহ, অনেক পণ্ডিতই ইঁহার সম্মুখে ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতেন। অন্য সময়ে বালকের মত সরল। বিচারে পরাস্ত হইলে মনে বড় ক্ষোভ জন্মে, তজ্জন্য বিচারান্তে পরাজিত পণ্ডিতের নিকট হাতে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতেন। এই সৌজন্য-ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইতেন।

ইঁহার পাণ্ডিত্যের গৌরবসূচক দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ১ম ঘটনা—একবার একজন সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া ভট্টপল্লীতে আগমন করতঃ তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে একটি প্রশ্ন করেন; সেই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর কোথায়ও পান নাই। ইঁহার নিকট সেই উত্তর পাইয়া বলেন—"এইবার প্রকৃত পণ্ডিতের দর্শনলাভ করিলাম।"

২য় ঘটনা—একবার একজন সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসী পুরুষ ভট্টপল্লীতে আগমন করেন। তাঁহার সহিত বিচারে ভট্টপল্লীর তাবৎ পণ্ডিত পরাজিত হইলেন। সেদিন তর্কচূড়ামণি বাটী ছিলেন না। রাত্রে আসিয়া ব্যাপার শুনিলেন। সন্ন্যাসী বেদান্ততত্ত্বজ্ঞ। বাঙ্গালায় সে সময়ে বেদান্তচর্চ্চা একেবারেই ছিল না। এমন কি উপনিষৎ বেদান্তের পুঁথি পর্য্যন্ত কাহারও বাটীতে পাওয়া যাইত না। একজন বাঙ্গালী পণ্ডিতের সামান্য বেদান্ত-শাস্ত্র পড়া আছে বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল। তর্কচূড়ামণি মহাশয় তাঁহার নিকট যাইয়া সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বেদান্তের মতগুলি ভালরূপ আয়ত্ত করিয়া লইলেন।

বিচার আরম্ভ হইল। বেদান্তের মতগুলি লইয়া এমনভাবে তিনি বিচার আরম্ভ করিলেন, উপনিষদের শ্লোকগুলি এমনভাবে বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন; সন্ন্যাসী চমৎকৃত ও বিস্মিত! তর্কচূড়ামণি বলিলেন—"আমার ব্যাখ্যা কি জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের বিরুদ্ধ হইতেছে, তাহা হইলে আপনি শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করুন।" সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, "শঙ্করাচার্য্য ইহা অপেক্ষা আর কিছুই বলেন নাই।" আরও বলিলেন, "চূড়ামণি মহাশয়, আপনার নাম বিশেষ শুনিয়াছিলাম, আর আজ প্রত্যক্ষও করিলাম। আপনি বেদান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ, জানিলে আপনার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতাম না। আপনি প্রতারণা করিলেন যে, বেদান্ত আপনার দেখা নাই?" উত্তরে তর্কচূড়ামণি সবিনয়ে প্রকৃত ঘটনা বলেন। সন্ন্যাসী আপনার পরাজয় স্বীকার করিয়া তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে এরূপ পণ্ডিত আর জন্মিতেছে না। তিনি যেমন প্রকৃত নৈয়ায়িক, তদ্রূপ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন।

৫২ বৎসর বয়সে ইঁহার দেহত্যাগ হয়। ইনি ন্যায়শাস্ত্রসম্বন্ধীয় অনেক অনেক নূতন নূতন ফাঁকির উদ্ভাবন, পূর্ব্ব গবেষণাময় টিপ্পনীর রচনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সেগুলি রাখিয়া যান নাই। বলিয়াছিলেন যে, "জগদীশ, গদাধর প্রভৃতির ব্যাখ্যা থাকিতে আমার টিপ্পনী কে পড়িবে? কাজেই প্রচার নিরর্থক। আর যদি আমারই আদর হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের ক্ষতি হইবে, আমি যাঁহাদের কৃপায় মানুষ হইয়াছি, তাঁহাদের ক্ষতি করিতে পারি না; গুরু-হন্তার কার্য্য আমার দ্বারা হইবে না।" তবে মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহার কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সেই গুলিই আছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হয়তঃ সেগুলিও লোপ হইবে। তিনি বহুদিন দেহত্যাগ করিয়াছেন, আজিও তাঁহার যশঃসৌরভ দিগন্ত আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে।

৩

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য

ইনি ভট্টপল্লীর ঠাকুর গোষ্ঠীর একজন অলঙ্কারস্বরূপ। পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর বশিষ্ঠ-গোত্রে ইঁহার জন্ম। "জলদগ্নিতেজা" পিতার সন্তান। অত্যধিক বংশ বিস্তারের ফলে ভট্টপল্লীর ঠাকুরবংশীয়দিগের কাহারও কাহারও শিষ্য সংখ্যা অতি অল্প, বিষয়-সম্পত্তি যৎসামান্য হইয়া পড়িয়াছে; কাজেই স্ববৃত্তিস্থ থাকিয়া গ্রাসাচ্ছাদন চলে না। এই কারণে এই বংশীয়দের মধ্যে এক্ষণে বহু ব্যক্তি ইংরাজী পঠন ও অর্থোপার্জ্জনে মনোযোগী হইয়াছেন। সার্ব্বভৌম মহাশয়দিগের শিষ্য-বিষয়-সম্পত্তিতে তখন গ্রাসাচ্ছাদন চলিত না। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বৃদ্ধা জননী অতি কষ্টে নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়া ইঁহাকে পালন করেন। কখন ভিক্ষা করিয়া, কখন বা অর্দ্ধাশনে দিনপাত করিয়া কোন প্রকারে দু'টি অন্নের যোগাড় করিতেন।

উপনয়ন হইবার পরই ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ হয়। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাতকন্যার সহিত ইঁহার পরিণয় হয়। এমত অল্প বয়সে

বিবাহ পূর্ব্বে দেখা যাইত, এক্ষণে বড় দেখা যায় না। বাল্যকাল হইতেই সার্ব্বভৌম মহাশয় শান্ত নিরীহ প্রকৃতির ছিলেন। বিবাদ বিসম্বাদ করা অভ্যাস ছিল না। উপবীত হওয়ার পরই মৎস্য মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দেন, শূদ্রের দোকানে মিষ্টান্নাদিও খাইতেন না। বলাই বাহুল্য, এই বংশীয়দের মধ্যে মৎস্য-মাংস, কি শূদ্র-প্রস্তুত মিষ্টান্ন, কি বিলাতি লবণ শর্করা প্রভৃতি খাওয়ার রীতি নাই। অবশ্য এক্ষণে তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। যুগধর্ম্মের প্রভাব অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। সদাচার, বিলাসিতা-বর্জ্জন প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী তখন সকল ব্যক্তিতেই লক্ষিত হইত। সন্ধ্যাহ্নিক, প্রাতঃস্নান প্রভৃতি কর্ত্তব্যগুলি সকলেই পালন করিতেন। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সেই গুণের অসদ্ভাব ছিল না।

ইঁহারা রামমন্ত্রোপাসক বৈষ্ণব। কোন বৈষ্ণবসম্প্রদায় মধ্যে ইঁহারা নিবদ্ধ নহেন। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি শিষ্য আছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ১০।১১ বৎসর ন্যায়শাস্ত্র পাঠ সম্পন্ন করিয়া, ইঁহারই আগ্রহাতিশয্যে চতুষ্পাঠী খুলেন। এই অবস্থায় নিজ বাটীতে ছাত্রগণকে অন্নদান করিয়া, সাংসারিক জ্বালা-যন্ত্রণা তৃণজ্ঞান করিয়া, ছাত্র পড়ান যে কত মহত্ত্বের পরিচায়ক, ইহা কে ভাবেন? অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ কি অবস্থায় থাকিয়া, কি খাইয়া, কি ভাবে কাল যাপন করিয়া চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণকে অন্নদান ও অধ্যাপনা করেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইঁহার পত্নী আদর্শ সতীসাধ্বী। এইরূপ ভাবে দিন যাপন করিয়াও কখনও তিনি মুখভার করেন নাই। এমনও দিন গিয়াছে, এক পয়সার মুড়ি খাইয়া দিন রাত্রি কাটাইতে হইয়াছে; আবার কোন দিন তাহাও জুটে নাই। পতি সদাশিব; পড়ান লইয়াই ব্যস্ত, এ সবে লক্ষ্য ছিল না। লক্ষ্য এক অধ্যাপনা। মধ্যে মধ্যে বাপের বাড়ীতে তর্করত্ন মহাশয়ের পিতা তাঁহাকে খাওয়াইতেন, সাহায্যও করিতেন। আদর্শ পত্নী তাহাও অনেক সময়ে সবিনয়ে উপেক্ষা করতঃ পণ্ডিত গৃহিণীর পদবী লাভ করিয়াছিলেন। তর্করত্ন মহাশয়ের পিতা সার্ব্বভৌম-গৃহিণীকে বুঝাইতেন "পাগলী, দিন কতক কষ্ট পাও, পরে দেখিবে, তোমার স্বামী রূপার ঘড়া বিদায় আনিবে।" ঘটী বাটী বিক্রয় করিয়া দিনপাত প্রায়ই করিতে হইত। একদিন ইচ্ছা করিয়া আস্তাকুঁড়ে কাঁসার পাত্র ফেলিয়া দিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন "মা কাঁসার পাত্র অশুদ্ধ হইয়া গেল; কি করি, যাই বিক্রয় করিয়া আসি।" আপনারা উপবাস করিতেন, তথাপি ছাত্রগণকে কষ্ট দিতেন না।

মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজে চাকরী গ্রহণের জন্য আত্মীয় স্বজন অনুরোধ করিলে প্রথম ইনি গর্জ্জিয়া উঠেন, "কি চাকুরী করিব!" কিন্তু এরূপ দুঃখ মানুষ রক্তমাংসের শরীর লইয়া কতদিন সহ্য করিতে পারে! এই চাকরী গ্রহণে অনেক সুবিধা হইল। সাংসারিক অসচ্ছলতা ঘুচিল, অধ্যাপনার্থ বহু ছাত্র পাইলেন। অচিরেই সার্ব্বভৌম মহাশয়ের যশ ছাত্রগণের মুখে সমস্ত বাঙ্গালায় ছড়াইয়া পড়িল। পড়ান তাঁহার তপস্যা—তাহাতে যত্ন অপরিসীম। অধুনা সার্ব্বভৌম

মহাশয়ের ছাত্রে বাঙ্গালার নৈয়ায়িক সমাজ পরিপূর্ণ। শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীরামকৃষ্ণ ন্যায়-তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, শ্রীযামিনীনাথ তর্কতীর্থ প্রভৃতি ইঁহারই ন্যায়ের ছাত্র ছিলেন।

নব্যন্যায়ে ইঁহার শ্রম প্রগাঢ়, অভ্যাস অপরিসীম। হেত্বাভাসখণ্ডে এমন অভ্যাস আর কোন নৈয়ায়িকের নাই বলিলেই হয়। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্নের পর ইনিই শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক। সমগ্র অনুমান খণ্ড ইঁহার কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়।

বিবাহ একটি। ১২।১৩ বৎসর হইল পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে। বর্ত্তমানে বয়স ৭০ বৎসর অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছেন, তথাপি সমানভাবে অধ্যাপনা করিতেছেন, মূলাজোড়ে প্রত্যহ গমন, ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদায়ে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ এখনও করেন। এই বয়সে আবার ভট্টপল্লীতে স্বতন্ত্র একটি চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী আছেন।

ইনি ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি-পরীক্ষক ও সংস্কৃত বোর্ডের সদস্য। ইঁহার কবিতা-লিখনশক্তি বেশই আছে। তবে ন্যায়দর্শনের চাপে সে কবিত্ব দার্শনিকতাকে ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই।

বলিয়াছি—ইনি সরল প্রকৃতির মানুষ, সেকেলে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। এ কালের চাতুর্য্যময়ী বুদ্ধি, চাকচিক্যময়ী সভ্যতা, ধরণধারণ কিছুই নাই। ডবল ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা কন্যার বিবাহে আংশিক সমর্থন করিয়া স্বাক্ষর করেন। কাজটি ভাল কি মন্দ করিয়াছেন, তাহার বিচার এক্ষণে অপ্রাসঙ্গিক। ইহারই ফলে তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র ও শ্যালক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত বিচ্ছেদ ঘটে, ভট্টপল্লীতে সামাজিক গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। এই যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ হইল, এই বীজই এক্ষণে মহাতরুর আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার বিষাক্ত বাতাসে ভট্টপল্লী জরজর, ইহারই বিষময় ফলে সমস্ত গ্রামবাসী জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে। দলাদলি বাদ-বিসম্বাদ বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে; মোকদ্দমা আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে। তাহাতে ভট্টপল্লী সত্বরই শ্মশানের আকার ধারণ করিবে। 'নায়ক' ত গালাগালি দিয়া সারা সহর তোলপাড় করিয়া দিতেছে। এখনও সবে সন্ধ্যা—এখনও রাত্রি দেখা দেয় নাই, অন্ধকার তেমন ঘনাইয়া উঠে নাই, বজ্রের কড় কড় ধ্বনিতে শ্রবণ বধির হয় নাই। ভট্টপল্লীর এ দুর্দ্দশায় সমগ্র হিন্দুসমাজের ক্ষতি। ব্রাহ্মণ-সমাজের অধঃপতনের লক্ষণ। আপনাদের এই দুর্দ্দশার আশু প্রতিবিধান হইলেও রক্ষার উপায় হয়।

অত্রস্থ ভাইস-চেয়ারম্যান কর্ম্মবীর রায় শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য বাহাদুর এই বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাইবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহার চেষ্টা সিদ্ধ হউক।

বর্ত্তমানে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের অবস্থা অস্বচ্ছল নহে। বাটীতে দুর্গোৎসবাদি হইয়া থাকে। ইঁহার এক পুত্র শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য সংস্কৃতে এম্-এ উপাধি পাইয়াছেন। পিতার মুখ রক্ষা করুন, আমাদের কামনা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

ইনি স্বনামখ্যাত কাশীরাজের সভাপণ্ডিত ৺তারাচরণ তর্করত্নের পুত্র। দয়ানন্দ

স্বামীজীর সহিত বিচারে তর্করত্ন মহাশয়ের যশঃসৌরভ সমস্ত ভারতময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইনি সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা ও অনর্গল শ্লোক আবৃত্তি করিয়া যাইতে পারিতেন। কাশীধামে প্রতিপত্তিও অসামান্য ছিল। মনীষী প্রমথনাথ পিতার উপযুক্ত সন্তান। মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত। দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীপ্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন ইঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ইনিই এক্ষণে কাশীরাজ সভাপণ্ডিত।

প্রমথনাথ কাব্য-অলঙ্কারে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বিশুদ্ধানন্দ স্বামীজীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। স্বামীজী বলিতেন যে, "আমি দশ হাজার ছাত্র পড়াইয়াছি। প্রমথনাথের মত বুদ্ধিপ্রতিভাশালী ছাত্র পাই নাই।" এতদ্ব্যতীত ভট্টপল্লীর অন্যতম অলঙ্কার, 'বিদ্যোদয়'-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রীর নিকট সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ উপাধি পরীক্ষা দেন। নব্যন্যায়েও প্রমথনাথের ব্যুৎপত্তি আছে। এক্ষণে ইনি সংস্কৃত কলেজে ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক (নব্যস্মৃতির নামই ধর্ম্মশাস্ত্র)।

মনীষী প্রমথনাথ গত বৎসর মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। ইনি বাঙ্গালার একজন সুলেখক। শাক্যসিংহ, মণিভদ্র প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ ইঁহার রচিত। ইনি এক্ষণে "সমাজ" মাসিকপত্রে ব্রহ্মসূত্র শাঙ্করভাষ্যের অনুবাদ করিয়া দেশবাসীর জ্ঞানতৃষা মিটাইতেছেন। শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ কার্য্য মন্থরগতিতে চলিয়াছে।

ইনি ১৯বৎসর বয়সে শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সহোদরার পাণিগ্রহণ করেন। আবাল্যসাথী প্রাণের বন্ধুর সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন হইল। উভয়ের কর্ম্মভূমি স্বতন্ত্র। তর্করত্ন মহাশয় সম্পূর্ণ রক্ষণশীলদলের নেতা, প্রমথনাথ সংস্কারেচ্ছুক, কিঞ্চিৎ ইংরাজীভাবাপন্ন। ঘরে বসিয়া ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শনে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন।

ইংরাজী-ভাবাপন্ন বলিয়া আচারভ্রষ্ট স্বেচ্ছাচারপরায়ণ অখাদ্যভোজী নহেন। সন্ধ্যাহ্নিক পূজা প্রভৃতি ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত; ঠাকুর গোষ্ঠীর সন্তান।

বলা বাহুল্য—ইঁহারা পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর বশিষ্ঠগোত্রসম্ভূত, বামাদ্বৈত বৈষ্ণব। শিষ্য ভূসম্পত্তি যৎসামান্য তবে বর্ত্তমানে ইঁহার অবস্থা ভাল। চাকরীর আয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ও গ্রন্থবিক্রয়লব্ধ আয়—এই ত্রিবিধ আয়ে সংসার চলে। বালিগঞ্জে বাটী প্রস্তুত করিয়া সেই স্থানেই বসবাসের কল্পনা।

পত্নী বর্ত্তমান। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীবটুকনাথ কাব্যতীর্থ ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণনীয় ছাত্র। ভ্রাতুষ্পুত্রও সুযোগ্য, নাম শ্রীরামচন্দ্র কাব্যস্মৃতিমীমাংসাতীর্থ।

ইঁহাদের গৃহে বেদান্ত-উপনিষদের পুঁথি পাওয়া যায়। তাহা পূর্ব্বপুরুষ-সংগৃহীত নহে। পিতার দার্শনিকত্ব, অলঙ্কারবোধ, তর্কভূষণ মহাশয় পাইয়াছেন। তর্কভূষণ মহাশয় দেশবিশ্রুত পণ্ডিত। ইনি সুস্থ থাকিলে দেশের অনেক কার্য্য করিতে পারিবেন, ভগবান্ ইঁহাকে নিরাময় করুন।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

প্রাচীন পুঁথি

(১)

[বঙ্গদেশে প্রাচীন-পুঁথি-সংগ্রহকার্য্য বহু দিন হইতেই আরব্ধ হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-প্রমুখ বহু সাহিত্য-সমিতি এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বহু ঐতিহাসিকবৃন্দ এই কার্য্যে অগ্রণী। সংগৃহীত পুঁথির বিবরণও কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বহু স্থলেই সেগুলি বস্তাবন্দী হইয়া পচিতে থাকে। ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয়। সেই জন্য যাঁহারা বহুকষ্টে সংগৃহীত পুঁথির বিবরণ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। আমরা পূর্ব্বে চট্টগ্রামের বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে প্রদর্শিত কতকগুলি পুঁথির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। অদ্য শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত, পরলোকগত রাধেশ-চন্দ্র শেঠ এবং মালদহ জাতীয়-শিক্ষাসমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত কতকগুলি পুঁথির বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।]

নিম্নলিখিত পুঁথি-পত্রাদি পরলোকগত রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত।—

১। সত্যনারায়ণের পুঁথি—

তুলট কাগজে ২২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। কতক-গুলি পত্র এক পৃষ্ঠা লেখা। (৩র পৃষ্ঠায় আর একখানি সত্যনারায়ণ পুঁথি)

আরম্ভবাক্য—

ওঁ গণেশায় নমঃ। ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ॥
প্রণমোহ নারায়ণ সত্য ভগবান।
তাহাকে সেবিলে লোক পায় পরিত্রাণ॥

সমাপ্তিবাক্য—

জেবা পড়ে জেবা শুনে সত্যের পাচালি।
সংসার সাগর তরি জায় বিষ্ণুপুরি॥
দিজ বিশ্বেশ্বরে বলে ভাবিঞা নারায়ণ॥
ইতি সত্যনারায়ণ কথা সমাপ্ত॥

বিশ্বেশ্বরের সত্যনারায়ণ পাঁচালি মালদহে পঠিত হইয়া থাকে। প্রথমে এক কাঠুরিয়া সত্যনারায়ণ পূজা করিয়া দরিদ্রতার হস্ত হইতে নিস্তার পায়, তাহা দেখিয়া এক ব্রাহ্মণ ঐ পূজা করিয়া দুঃখের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। তৎপরে লক্ষপতি সাধু, কন্যা কলাবতী ও সাধুর জামাতার বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

বিশ্বেশ্বরের এই পুঁথিখানি পড়িলে মনে হয় পূর্ব্বে ইহা গীত হইত।

মনে অনুমান করি বোলে বিশ্বেশ্বর।
কহিল নাচাড়ি কিছু পদ মনোহর॥

'নাচাড়ি' পদ থাকায় ইহা গানের পুঁথি এবং নাচিয়া নাচিয়া গান করিত তাহাই বুঝাইতেছে। মুসলমানী 'সত্যপীরে'র গান ঐ প্রকার নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে হয়।

"ব্রহ্মপুত্র কুলে জন্ম নাম কাসিপুর।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈষ্য বসতি প্রচুর॥
সেই গ্রামে সদানন্দ বৈদিক ব্রাহ্মণ।
প্রথম প্রকাশ তথা সত্যনারায়ণ॥
লক্ষপতি ও শঙ্খপতি দুই সদাগর।
বাণিজ্য করিতে দুহে চলিল সফর॥

তাহাদের নৌকার অগ্রে

আগে আগে চলি জায় সপ্ত পালোঅর।
সেই অনুসারে নৌকা বাহে কর্ণধার ॥

নৌকায় গমন-পথের বর্ণনা মধ্যে দেখিতে পাই—

ডাহিনে সমুদ্রগড় বসতি প্রচুর।
রত্ননদি বাহি জান বামে শান্তিপুর ॥
সপ্তগ্রাম দিয়া নৌকা করিল গমন।
ত্রিবেণীর ঘাটে ডিঙ্গা প্রবেশ করিল ॥

২। লক্ষ্মীব্রত কথা—

তুলট দেশী সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠা লেখা—কিন্তু দুই পৃষ্ঠা একত্র সংবদ্ধভাবে পত্রাঙ্ক গণিত। ১০ পত্রাঙ্ক।

আরম্ভবাক্য—

প্রণমহো নারায়ণ লক্ষ্মীকান্ত সতি।
মহা মা আচরণ বন্দো দেবি সরস্বতি ॥
গণেসাদি দেবতার বন্দিআ চরণ।
ব্যাস আদি মুনি বন্দো জত কবিগণ ॥

সমাপ্তিবাক্য—

কহেত জাদব দাস করিঞা মিনতি।
লক্ষ্মীর চরণে মোর রহুক মোতি ॥
ইতি শ্রীলক্ষ্মীর চরিত্র ধানাই গাণাই
——ব্রত-কথা সমাপ্ত।

৩। আকুলাই ও সংকুলাই কথা

খণ্ডিত পুঁথি

একটি পত্র, এই পত্রাঙ্কের সংখ্যা ১২

সমাপ্তিবাক্য—

আকুলাই সংকুলাই কথা সমাপ্ত অস্থ।
শকাব্দা—১৭২০। মাহা ভাদ্রে ॥ ২৫ ॥
মঙ্গলবার ।।।।

৪। স্কন্দপুরাণে শীতলাষ্টক

খণ্ডিত। ১টি পৃষ্ঠা—

৫। শুবচনই কথা

পত্র ৭

তুলট শাদা কাগজের এক পৃষ্ঠা করিয়া দুই পৃষ্ঠায় এক পত্র।

আরম্ভবাক্য—

অথ আকুলাই কথা লিখ্যতে।
পাচ বছরের পুত্র মোর চক্র দিআ পাও।
বিহার উত যোগ তরে করে বাপ মাও ॥
সাত বৎসরের জদি খুলনা জুবতি।
বিভা করি নিয়া গেলো সাধু ধনপতি।

সমাপ্তিবাক্য—

জেবা গানে জেবা শুনে তাহার জয় করে।
রাজ ঘরে প্রজা ঘরে সর্ব্বসিদ্ধি করে ॥
ইতি শুবচনই কথা সমাপ্ত।

৬। নিস্তারিণী লিখ্যতে

(খণ্ডিত)

পত্রসংখ্যা ৫

আরম্ভবাক্য—

পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণি আছিল।
একটি পুত্র লঞা আনন্দে থাকিল ॥
ব্রাহ্মণি বোলে আমি পুত্রক বিভা দিবো।
ভালো কুলসিল দেখা পুত্র বিভা দিবো ॥

৭। শিতলার স্তব

একপত্র—একপৃষ্ঠা

আরম্ভবাক্য—ওঁ নমঃ শীতলায়ৈ ॥

ওঁ নমামি শীতলাং দেবী রাশভস্তাং দিগাম্বরীং।
মার্জ্জনীং কলশোপেতাং শূর্প্পাঙ্কিত মস্তকাং ॥

৮। অথ বীরাষ্টমী ব্রতং

২ পত্র

আরম্ভবাক্য—

অথ কথা ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ ॥

সমাপ্তিবাক্য—ইতি ভবিষ্যোত্তর পুরাণোক্ত বীরাষ্টমীব্রত কথা সমাপ্ত।

৯। কোজাগর লক্ষ্মীপূজা

২ পত্র

আরম্ভবাক্য—পবিত্র পাণি বাচাস্ত স্বস্তিবাচনং কৃত্বো—

সমাপ্তিবাক্য—কোজাকর লক্ষ্মীপূজা সমাপ্ত॥

১০। অথ মঙ্গল চণ্ডিকা পূজা বিধি।

পত্র

আরম্ভবাক্য—

ঘটং সংস্থাপ্য গণেশাদি পঞ্চ দেবতা.........

১১। শ্রীমদ্ভাগবতগীতা

(তেরিজ পাতা)

পত্র ৭৬

১২। শ্রীশ্রীলক্ষীর ব্রত কথা

(খণ্ডিত) ২ পত্র

১৩। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর ব্রতকথা

পত্রাঙ্ক ৯

যাদবদাস প্রণীত—

আরম্ভবাক্য—

প্রণমহো নারায়ণ লক্ষ্মীকান্ত মতি।
মহা মা আচরণ বন্দো দেবি সরস্বতী॥

১৪। সত্যনারায়ণ পুঁথি

পত্র ৩৩

১৫। সত্যনারায়ণ পুঁথি

পত্র ২২

১৬। সারস্বত ব্যাকরণ।

(তুলট কাগজ)

জগদানন্দ সত্তর্কবাগীশস্য

(লিপিকার জগন্নাথ দাস)

আরম্ভবাক্য—

৭ওঁ নমঃ কৃষ্ণায়॥
বন্দেহং পরমানন্দ স্বরূপং গোপরূপেনং।
সম্মেকো কটাক্ষো যেন গোপী মনোহৃতে॥

সমাপ্তিবাক্য—

ইতি সারস্বত প্রক্রিয়াপদকৌমুদী সমাপ্ত

১ খণ্ড—১ পত্র হইতে ১৬৩ পত্র পর্য্যন্ত
২ খণ্ড—১ " " ৫৮ " "
৩ খণ্ড—১ " " ৭৫ " "
৪ খণ্ড—১ " " ৪২ " "

১৭। হনুমান কবচ

(তুলট কাগজ)

পত্র ৩

শাক্ষরমিদং শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দেবশর্ম্মা॥

আরম্ভবাক্য—

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ। অথ হনুমান কবচ লিখ্যতে॥ শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ

সমাপ্তিবাক্য—

ইতি শ্রীমদ্রামচন্দ্র বিরচিতং হনুমান কবচং শ সম্পূর্ণং। শুভমস্তু সিদ্ধিমস্তু॥

১৮। অথাঙ্গপ্রায়শ্চিত্তবিধিঃ

৫ পত্র

১৯। অথ সম্বিদাশোধন বিধিঃ

১ পত্র

২০। বস্তুসংজ্ঞাপ্রকরণ

তুলট কাগজ

৪ পত্র

২১। স্বরসন্ধিপ্রকরণং

তুলট কাগজ

১ পত্র

২২। শ্রীপঞ্চমী ব্রত

তুলট কাগজ

১ পত্র

২৩। চণ্ডিপাঠ মাহাত্ম্য

তুলট কাগজ

৯ পত্র

আরম্ভবাক্য—

শ্রীশ্রীরামঃ ॥ ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ॥

শ্রীরুদ্র উবাচ ॥

সমাপ্তিবাক্য—রুদ্রচণ্ডী মাহাত্যং

পঞ্চবৃত্তং পাঠকর্ম্মাহং করিষ্যে।

লিখিতং শ্রীরামনারায়ণ দেবশর্ম্মণা

শকাব্দ ॥ ১৭৮৩।২।২৬।৩০।০

২৪। অথ অন্নপূর্ণাষ্টকং

তুলট কাগজ

১ পৃষ্ঠা

২৫। আপদুদ্ধার দুর্গাস্তব

তুলট কাগজ

২ পত্র

লিখিতং শ্রীরামনারায়ণ দেবশর্ম্মণঃ

শকাব্দ ১৭৮৫।৪।১৩।১০।২২।০ ॥

২৬। শান্তিশতকং

তুলট কাগজ

৯ পত্র

শ্রীচণ্ডীচরণ শর্ম্মণা লিখিতং।

২৭। সত্যনারায়ণ

স্বপারীর বাকলের মলাট

তুলট কাগজ

পত্র ৪০

আরম্ভবাক্য—

প্রণমামি গুরু দেবচরণ-যুগল।

জাহাকে ভাবিলে প্রাণ হয় নিরমল ॥

সমাপ্তিবাক্য—

পুজ সত্যনারায়ণ ভক্তি করিঞা।

শ্রীকৃষ্ণ জিবনে বোলে প্রণতি করিয়া।

ইতি সত্যনারায়ণ পাচালি প্রবন্ধ কথা সমাপ্ত।

২৮। সূর্য্যশান্তি

তুলট কাগজ

পত্র ৬

আরম্ভবাক্য—

৭ওঁ নমঃ সূর্য্যায়। বশিষ্ঠ উবাচ ॥

স্তবং তত্র ততঃ শাম্বঃ। কৃশোধমনিসন্তুতঃ

রাজন্নাম সহস্রেণ সহস্রাংশ দিবাকরং ॥

সমাপ্তিবাক্য—

ইতি মহাদেব ভাসিতং কার্ত্তিকেয়

প্রশ্নানুগতং শ্রীসূর্য্যশান্তি সমাপ্ত ॥

২৯। অষ্টলোকপাল কথা

তুলট কাগজ

পত্র ৩১

গুণ রাজখান কৃত

আরম্ভবাক্য—

বন্দে ত্রিদশ শঙ্কাসং জগন্নাথং সনাতনং।

সংসার শ্রীষ্টী কর্ত্তারং লোকনাথং দিবাকরং ॥

সমাপ্তিবাক্য—

কলিতে প্রত্যক্ষ বড় দেব দিবাকর।

গুণরাজ খাখানে বোলে হরিসকিঙ্কর ॥

৩০। সত্য সংহিতা

তালপাতার পুঁথি

পত্র

আরম্ভবাক্য—

ভূমিতে করিঞা নতী বন্দ দেবগণপতি

বিঘ্ন বিনাশ শিবের নন্দন।

সমাপ্তিবাক্য—

যে জন এ কথা শুনে সর্ব্ব দুঃখ বিমোচনে

অন্ধ কুষ্ট দারিদ্র বিনাশে।

রাজ্য ভ্রষ্ট রাজ্য পাবে রাম ভদ্র যেই ভাবে

সত্যদেব সংহিতা প্রকাশে ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণতন্ত্রে সত্য সংহিতা সমাপ্ত।

৩১। জিমূতবাহন ব্রতকথা

তালপাতার পুঁথি

পত্র ৩১

আরম্ভবাক্য—

নারদে কহেন কথা শুন নৃপবর।
কৈলাস পর্ব্বত আছে দেখিতে সুন্দর॥
তাহাতে বসিঞা আছে গৌরী মহেশ্বর।
গৌরী কহেক কথা সুনেন সঙ্কর॥

সমাপ্তিবাক্য—

গৌরী * * কথা ভোলা মহেশ্বর।
পাচালি প্রবন্ধে রচিল দ্বিজবর॥
ইতি শ্রীজিমূতবাহন কথা সমাপ্ত।

প্রথমে গজারূঢ় দেবরাজকে ধ্যান ও পূজা করিবার প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

৩২। জসোদা কৃষ্ণের কথা

তুলট কাগজ পুঁথি

পত্র ৪

আরম্ভবাক্য—

একদিন জসোমতি বসা নিজ ঘরে।
কোলে করি রাম কৃষ্ণ বলে ফিরে ফিরে॥

সমাপ্তিবাক্য—

ইতি জসোদা কৃষ্ণের কথা সমাপ্ত।
পাঠক শ্রীশ্রিধরা মাদব। সন ১১৭৮ সাল সমাপ্ত।

৩৩। গোবিন্দ দাসের পদাবলী

তুলট কাগজ

পত্র ১৫

আরম্ভবাক্য—

আসোয়ারি॥
সপনমে দেখল সাবঙ্গ পানি।
নয়ন জুড়াএল নিজ পতি জানি॥
ছল এক অছলিলুঁ রূপ নিহারি।
কতহুঁ কহমে ধনি কতয়ে মুরারি॥

সমাপ্তিবাক্য—

সন ১১৬৫ সাল মাহা ফাল্গুণ। * *
রামদাস ইন্দ॥ তস্য পাঠতাং।
আটচল্লিশ পদ এক দফা লেখা হইল।

মন্তব্য—

ইহাও গোবিন্দ দাসের পদ বলিয়া মনে হয়।

৩৪। স্মরণীয় পদাবলী

তুলট কাগজ

পত্র ১৬

রচয়িতা—গোবিন্দ দাস

আরম্ভবাক্য—

৺শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥ বিভাষ॥
নিশিয়বসেসেঃ জাগি সব সখিগণ
নন্দাদেবি সুখ চাই।
রতি রসে অবশ সুতি রহনা
বহে তনু তুরি তহিঁ দেহ জাগাই॥

সমাপ্তিবাক্য—

সুভাশিত পিচকারি ভরি সহচরি
রাখত ঢুড়ি জন পাস।
মাঙ্গিব নিকট হি পদতলে পুতল সহচরি
গোবিন্দ দাস॥
ইতি স্মরণীয় পদাবলী সমাপ্তং॥ সন ১১৬৪ সাল লিখিতং শ্রীযুক্ত রামদাস ইন্দ পদবে॥ তস্য পাঠার্থং মাহ ২৩ ফাল্গুণ।

মন্তব্য—এই পুঁথি ১৫৪ বৎসরের পুরাতন।

৩৫। প্রসাদচরিত্র (প্রহ্লাদচরিত্র?)

তুলট কাগজ

পত্র ১৪

কবিচন্দ্র বিরচিত

আরম্ভবাক্য—শ্রীশ্রীহরি॥

(ওঁ) সত্য কৃষ্ণ সত্য আর সব মিথ্যা।
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম কৃষ্ণ নাম বিনে বৃথা॥
ভজহ গোবিন্দ পদ কাল জায় বঞা।
ভবসিন্ধু হবে পার হরি গুণ গাঞা॥

সমাপ্তিবাক্য—

সপ্তম স্কন্ধের কথা কবিচন্দ্র গায়।
এতদূরে প্রসাদ চরিত্র হইল সায়॥

ইতি শ্রীপ্রসাদচরিত্র সমাপ্ত॥ জথাদিষ্টং তথা-লিখিতং লেখোক দোষ নাস্তি॥ লিখিতং শ্রীরাধাচরণ দাস বৈষ্ণব স্বাক্ষর মিদং শ্রীচৈতন্য চরণ পাল সাং বড়জালালপুর পাঠার্থং পুস্তকঞ্চ ইতি সন ১০৮২ সাল তাং ২ কার্ত্তিক॥

মন্তব্য—

এই পুঁথিখানি ২৩৬ বৎসরের পুরাতন।

৩৬। সেক শুভোদয়া

শ্রীহলায়ুধ মিশ্র কৃত

৺রাধেশচন্দ্রের হস্তলিখিত

(প্রথম হইতে নবম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত)

আরম্ভবাক্য—

ওঁ নমো গণেশায়। শ্রীগুরুবে নমঃ

গঙ্গাতীরে মহাত্মা নৃপবর তিলকো লক্ষ্মণ ক্ষৌণী পালো বিষ্ণুর্লেখ প্রকটিত মহিমা দর্শয়ন্ জাহ্নবীঞ্চ। আয়াতঃ পশ্চিমাস্তদ্দিশে দিশি সদৃশে শাসয়ন্ পূজ্যমানং ক্রতঃ কস্বং কস্বং পুনরপি নৃপতিং সন্নিধানাদ্ বভাষে। ততোরাজা মনসা বিচিন্তং প্রণম্য শিরসা দেবীং গাঙ্গাগঙ্গেতি কীর্ত্তনাং অপশ্যং পশ্চিমায়াতং জলোপরি পার্থিবঃ।

মূল পুঁথিখানি মালদহের অন্তর্গত পাড়ুয়া নামক স্থানে ২২ হাজারি নামক মসজিদের মধ্যে রক্ষিত ছিল। তদানীন্তন কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় তাহা তথা হইতে আনয়ন করেন। মূল পুঁথি দেখিয়াছি। তাহা হইতে নকল করা হয়। সেই নকল হইতে পরলোকগত রাধেশবাবু নকল করেন। ইহার লেখক শ্রীহলায়ুধ মিশ্র। লক্ষ্মণসেন কিছু ভূমি উক্ত পশ্চিমদেশীয় সেখকে দান করিয়া-ছিলেন। এই দানপত্র কৌশলে ইহাতে লিখিত রহিয়াছে। লক্ষ্মণসেন ও তদানীন্তন দেশের কথা ইহাতে আছে।

বিংশতি পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে।

৩৭। বৈষ্ণববন্দনা

তুলট কাগজ—পত্রাঙ্ক ১১

আরম্ভবাক্য—

৺রাধাকৃষ্ণ চরণ সহায়॥ *॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপাময়।
সর্ব্ব অবতার সম্ভক্তো সর্ব্বভক্তা জনাশ্রয়ো।

আহিররাগ।

সমাপ্তিবাক্য—

দেবের দুর্লভ প্রেম ভক্তি সেই লোভে।
দৈবকী নন্দন কয়ে এই সব লোভে॥

ইতি বৈষ্ণববন্দনা সমাপ্ত॥ ইতি লিখিতং শ্রীকৃপারাম দাস সাকীন নিজধাম ইতি তাং ২৮ কার্ত্তিক সন ১১৩২ সাল কৃষ্ণদাষ বৈরাগীর আছরম॥

৩৮। পার্শী হইতে ইংরাজি ও বাঙ্গলা অভিধান

হস্তলিখিত

লেখক এলাহিবকস মুন্সী

৩৯। হিন্দি মৌকিমী মিশ্র

গানের খাতা

হস্তলিখিত

৪০। ক্ষুদ্র নোটবুক

রাধেশচন্দ্রের হস্তলিখিত।

১ম নোট—জমিদারী পত্রকনের জন্য।

২য় নোট—চরিত্রমালা।

(ক) বিদ্যাসাগর

৩য় নোট—বৈষ্ণবপত্রের জন্য

৪র্থ নোট—বিবিধ

৪১। মালদহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ও

গৌড় বণিক জাতিদের আয়ো হওন

এবং

বাঙ্গলা—১৩১০ শাল হইতে মালদহের ঘটনাসমূহ।

লেখক শ্রীহাজারীলাল বসাক

(সাধারণ খাতা)

৪২। কতিপয় মুদ্রিত পুস্তক { জীবকৌমুদী, বিদ্বজ্জন ইত্যাদি }

ও

চিঠি পত্রাদি— { সাধারণ, মালদহের [illegible] }

৪৩। সাধারণ খাতা

হস্তলিখিত গোস্বামিমতে বৈষ্ণবদিগের পূজাপদ্ধতি বিষয়ক উপাসনা

শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত এবং মালদহ জাতীয়-শিক্ষাসমিতি কর্তৃক সংগৃহীত পুঁথি-পত্রাদির মধ্য হইতে নিম্নে কতিপয় পুঁথির বিবরণ অদ্য দেওয়া যাইতেছে।—

১। পুরাণ

পত্র সংখ্যা ১৮ পত্রাঙ্ক ৩৬

বঙ্গাক্ষরে লিখিত

তুলট কাগজ—হরিদ্রাবর্ণ

অনুলিপির তারিখ সন ১২২৪ সাল ২৭শে ভাদ্র—রাজারাম দাস বিরচিত।

জয়মনি ভারত

দণ্ডি প্রসঙ্গ

আরম্ভবাক্য—

৺৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।

একাদশ কন্ধে এই শ্রীভাগবতে।
শুকমুনি কহে শুন রাজা পরিক্ষিতে॥
দণ্ডিবর নৃপতির বিবরণ শুনি।
শুকদেব স্থানে জিজ্ঞাসিলা নৃপমনি॥
দণ্ডি নৃপতির কথা সংক্ষেপে রচিল।
বিস্তারিয়া শুনিবারে বড় শ্রদ্ধা হৈল॥

সমাপ্তিবাক্য—

মুনি বোলে পাণ্ডবের জয়ের কারণ।
তিন লোক এক স্থানে কৈলা নারায়ণ
কহিল সকল কথা তোমার গোচরে।
দণ্ডির প্রসঙ্গ সমাধান এত দূরে॥
ইতি দণ্ডি পর্ব্বের সংবাদ সমাপ্তঃ॥
লিখিতং শ্রীবৈরাগী গোপীদাস॥
সন ১২০৯ সাল [illegible] তারিখ ২৭ ভাদ্র
পত্রাদিষ্ট [illegible] ইত্যাদি।

"শ্রীভাগবতের কথা [illegible] রচিত গাথা:
শোন [illegible] প্রকাশ।
ভাবিয়া [illegible] রাজা রাম দাস বোলে:
সেই কথা রচিয়া পয়ার॥

সংক্ষিপ্ত বিবরণ—মহামুনি দুর্ব্বাসা একদা ইন্দ্রালয়ে গমন করিলে স্বর্গবেশ্যা উর্ব্বশী দেবসভামধ্যে তাঁহাকে কদাকার দেখিয়া মনে মনে 'পশুবৎ' জ্ঞান করিয়াছিল।

পশুর সরির আমি দেখি যে ইহার।
আমাকে বোলেন ইন্দ্র নিত্য করিবার॥

মুনিবর উর্ব্বশীর মনের ভাব অবগত হইয়া ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন—

শুন মোরে বেশ্যা তোর মনে নাহি জ্ঞান।
আমাকে করিলা তুমি পশুর সমান॥

*   *   *   *

স্বরূপা হইয়া তুমি হও তুরঙ্গিণী।
এই বাক্য সত্য মোর জানিহ আপুনি ॥

উর্ব্বশী মুনির এই বাক্যে ভীতা হইয়া উদ্ধারের উপায় প্রার্থনা করিল। মুনিবর বলিলেন—

দিবাতে থাকিবা তুমি অশ্বনী হইয়া।
রাত্রিতে হইবা নারী ধরি নীজ কায়া ॥
অষ্টবজ্র একত্র হইবে যে কালেতে।
সেই কালে মুক্ত হইয়া আসিবে স্বর্গেতে ॥

যে বনে উর্ব্বশী অশ্বিনীরূপে ভ্রমণ করিত, সেই বনে অবন্তিপতি দণ্ডী একদা মৃগয়া করিবার জন্য সৈন্যসহ গমন করেন। এবং সেই অপূর্ব্ব অশ্বিনীকে দেখিতে পান। অশ্বিনীর পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে দূরবনে গমন করিলেন।

"হেন কালে দিবাকর অস্ত হৈয়া গেল।
তুরঙ্গীনি রূপ ছাড়ি দিব্য মূর্ত্তি হৈল ॥"

নরপতি উর্ব্বশীর এই মূর্ত্তি পরিবর্ত্তনের কারণ তাহার নিকট অবগত হইলেন। দণ্ডীরাজা উর্ব্বশীকে গৃহে আনিলেন এবং গুপ্তস্থানে রাখিয়া দিলেন।

নারদমুনি দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সভায় গিয়া এই অপূর্ব্ব তুরঙ্গিণীর কথা বলিলেন এবং ইহা আনিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দূত পাঠাইলেন। দণ্ডী বলিলেন

মোর স্থানে নাহি অশ্ব না দিব তাহারে।
যেই ইস্যা হয় কৃষ্ণ করিবেন মোরে ॥

দূতকে এই কথা বলিলে পর দূত প্রত্যাগমন করিল এবং রাজা দণ্ডী—

না শুনিল কারু বাক্য দণ্ডি নরপতি।
তুরঙ্গিণী সাজাইয়া আনে শীঘ্রগতি ॥

রাজ্যপাট পুত্রেকে করিয়া সমর্পণ।
ঘোড়াতে চড়িয়া রাজা করিলা গমন ॥

নিজ রাজ্য ত্যাগ করিয়া 'প্রথমে রাজা সমুদ্রের স্থানে' যান। সিন্ধুরাজার নিকটে তাঁহার স্থান হইল না। তৎপরে দণ্ডী লঙ্কাপুরী যাইবেন স্থির করিলেন।

লঙ্কাপুরি জাই জথা রাজ বিভিসন।

বিভীষণ অসম্মত হইলে "সুমেরু পর্ব্বত জানি বড় বলবান" ভাবিয়া তথায় গমন করিলেন। সুমেরু তাঁহাকে আশ্রয় দিতে পারিল না।

বাসুকির স্থানে গেলা পাতাল ভুবনে।

তথায় স্থান মিলিল না। তৎপরে দণ্ডী—

হস্তিনাতে গেলা জথা কুরু নৃপমণি ॥
দুর্য্যোধন শুনে দণ্ডিরাজ আগমন।
সভা হইতে উঠিয়া রাজা করিল গমন ॥

দুর্য্যোধন স্থানদানে অস্বীকৃত হইলে তিনি 'এত ভাবি গেলা রাজা যুধিষ্ঠির স্থানে।' তথায় স্থান না পাইয়া গঙ্গাজলে দেহবিসর্জ্জন মানসে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন।

বলভদ্র সহোদরা কৃষ্ণের ভগীনী।
বসুদেব সুতা যেই অর্জ্জুন ঘরনী।
সুভদ্রা তাহার নাম জানে সর্ব্বজনে।
গঙ্গাস্নান করিবারে গেলা সেই খানে ॥
লোকে গিয়া কহিলেন তাহার গোচর।
গঙ্গাতে মরয়ে এক পুরুষ সুন্দর ॥

দণ্ডী সুভদ্রার নিকট আত্মবিবরণ প্রকাশ করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন।

শুভদ্রা বলেন শুন মোর পরিচয় ॥
শুভদ্রা আমার নাম কৃষ্ণের ভগিণী।
বলভদ্র শহদরা জননী রোহিণী ॥

বসুদেব কন্যা আমি শুন নরপাত।
অর্জ্জুন আমার পতি পাণ্ডুর সন্ততি ॥
তোমারে দেখিয়া মোর জন্মিল করুণা।
অবশ্য করিব আমি উপায় মন্ত্রণা ॥
শুন দণ্ডি রাজা ভয় না করিহ মনে।
তোমাকে রাখিব ভীম শেনের সরণে ॥"

ভীমসেন দণ্ডীরাজার নিকট আগমন করিলে দণ্ডী তাঁহাকে সকল ইতিহাস বলিলেন।

এখন লইনু আমি তোমার সরণ।
প্রাণ রক্ষা কর বির পাণ্ডুর নন্দন ॥

ভীম বলিলেন—

শুন রাজা থাক তুমি না কোরিহ ভয় ॥
অভয় বচন আমি দিলাম তোমারে।
কিছু ভয় নাহি থাক আমার গোচরে ॥

ক্রমশঃ যুদ্ধের আয়োজন হইল; একদিকে রাজন্যগণ এবং অপর পক্ষে অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে দেবতাগণ মিলিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

"এথাতে দেবতাগণ সঙ্গে পুরন্দর।
কৌরব পাণ্ডব সঙ্গে করয়ে সমর ॥"

ক্রমশঃ উর্ব্বশীর শাপ-মোচনের সময় উপস্থিত হইল।

সকল দেবতাগণ আছে এক দলে।
জার জার নিজ অস্ত্র আছে তার করে ॥

* * * *

হেনই শময়ে তথা দণ্ডি নৃপমান।
ধনু হাথে ধরি সেই চড়ি তুরঙ্গিনী ॥
ভীমের স্বহায় হৈঞা আরম্ভিল রণ।
অষ্টবজ্র এক কালে হইল তখন ॥
বিষ্ণু চক্র ইন্দ্র বজ্র শিবের ত্রিশুল।
কুবেরের গদা জে ব্রহ্মার কমণ্ডল ॥
কার্ত্তিকের তির আর সমনের দণ্ড।
ভবানীর হস্তে খড়্গ বড়ই প্রচণ্ড।
অষ্টবজ্র উপস্থিত হইলেক আসি।
সাপ মুক্ত হঞা স্বর্গে গেলেন উর্ব্বশী ॥
তুরঙ্গিনী রূপ ছাড়ি নিজরূপ ধরি।
আচম্বিতে চলি গেল অমরা নগরি ॥
এথাতে দারুণ যুদ্ধ করে দুই দলে।
প্রিথিবি কম্পিত দুই সৈন্য কোলাহলে ॥"

যে কারণে বিবাদ হইতেছিল তাহা স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে তবে আর বিরোধের প্রয়োজন কি [illegible] এই কথা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন।

এতেক প্রমাদ হেল তুরঙ্গিনী লঞা।
সাপে মুক্ত হঞা সেই গেল ত চলিঞা ॥

ভৌগোলিক

অবন্তিদেশ, [illegible], লঙ্কা, পাতাল, কৈলাসপর্ব্বত, [illegible], পাতাল, সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, [illegible], [illegible], কুরুক্ষেত্র, পর্ব্বত।

জ্যোতিষিক—চন্দ্র, সূর্য্য।

ঐতিহাসিক—

অবন্তিরাজ [illegible], ভীষ্মকনন্দিনী, [illegible], সিন্ধুরাজ, [illegible], [illegible], লঙ্কা, বাসুকী, বলভদ্র, [illegible] [illegible], প্রহ্লাদ, হিরণ্যকশিপু, [illegible], ভীমসেন, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, বিরাট, দ্রুপদ, সহদেব, অভিমন্যু, দুর্য্যোধন, ভগদত্ত, বাহ্লিক নৃপতি।

রাষ্ট্রীয়—

মৃগয়া, নৃপ [illegible] সৈন্য, দূত, মহাদেবী পাটরাণী), [illegible], অগ্নিবাণ, সারথি।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয়—

ঋষি, মুনি, [illegible], নারদ, দুর্ব্বাসা, কর্ম্মভোগ, ব্রহ্ম, [illegible], বরুণ, দিকপালগণ, ইন্দ্র, শিবলোক, [illegible], বাসুকী, [illegible], [illegible], নন্দী, মহাকাল-ভৈরব, পঞ্চানন, ত্রিপুরারি, পশুপতি।

শিল্পসম্বন্ধীয়—

পুষ্পকবিমান, ধ্বজ, পতাকা, রথ, নেতের পতাকা, স্বর্ণকলস, মুক্তার ঝারা, শ্বেত-চামর, শ্বেতছত্র, বিচিত্র কবজ, দণ্ড, কমণ্ডলু, ধনুক, বাণ, ত্রিশূল, গদা।

২। মহাভারত—অশ্বমেধ পর্ব্ব —
পত্রাঙ্ক ১৪৭।

আরম্ভবাক্য—

৺শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ॥ নম ভগবতে বাসুদেবায়॥
অনুভব পদপুরে: জয়মুনির অনুসারে:
শুতয় কহিল সৌনকেরে॥

নৈমিশারণ্যে বসিঃ অষ্টাসিসহস্র ঋসি:
দীর্ঘ সত্র মহাযজ্ঞ করে॥

সমাপ্তিবাক্য—

জয়মুনি কহেন জন্মেজয়ের তরে।
অশ্বমেধ পুর্ব্বে সুত বলিল লোকেরে॥
পুরান পুরান্ত কথা বিচিত্র কাহিনী।
ফল শ্রুতি কেহ তার কহিতে না জানী॥

ইতি শ্রীজয়মুনি ভারত কথা সমাপ্ত॥ জথাদৃষ্টং তথালিখিতং লেক্ষিকোনাস্তিদোষকং ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। ইতি শ্রীবৈরাগী গোপী অধম॥ সাকিম মোহদ্দীপুর পরগণে কাশীনগর॥ ১২২৩ সাল তারিখ ৫ আশ্বিন।

ভণিতা—

পুণ্য কথা অনুপমে অমৃত রসময়।
বাগিশ্বরী প্রণমিঞা কৃষ্ণ রামে কয়॥

এই গ্রন্থাংশ ১৪৭ পৃষ্ঠাব্যাপী অশ্বমেধ পর্ব্ব কথায় পূর্ণ—

করি জোড়কর: বোলে নরেশ্বর:
শুণ শুণ ব্যাস মুনি॥
জজ্ঞ অশ্বমেধ: কোন পরিচ্ছেদ:
তার কথা কহ শুনি॥
কোন বর্ণের হয়: কহ মহাশয়:
কোন দেশে আছে সে।
যজ্ঞ হয়ে স্বাশ: কাহারে প্রকাশ:
কোন যুগে কৈল কে॥
চাহি কত ধন: কতেক ব্রাহ্মণ:
নাপেয়ে কোন বিধান।
কোন পাপ ক্ষয়: কিবা পুন্য হয়:
কত দিনে সমাধান॥

ব্যাস বলিলেন—আজ কাল অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পারে এমন রাজা কয়জন আছেন?

বিংশতি হাজার: দ্বিজ সদাচার:
সর্ব্বশাস্ত্রে অবিরোধ।
সঙ্গম ভোজন: চাহি জনে জন:
ভারত বেদিয়ে সোধ॥

তৎপরে কি প্রকার অশ্বের আবশ্যক তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অঙ্গ সেত বর্ন: স্যাম দুই কর্ণ:
পিত পুচ্ছ হইতে চায়।
চারু তাম্রধর: তুরঙ্গ মোনহর:
কলশুবর্ণের প্রায়।
সর্ব্ব শুভলক্ষণ: নৌতুন জোবন:
হেন রূপ চাহি হয়॥

এই প্রকারের অশ্ব প্রাপ্ত হইলে যজ্ঞ আরম্ভ করিতে পারেন।

বর্ষ চৈত্র মাসে: উত্তম দিবসে:
জজ্ঞ আরম্ভ করি।
রক্ষক তুরঙ্গ: নিয়োজিঞা সঙ্গ:
ব্রতে রহে অধিকারি॥

নানা অহলঙ্কারে : দিঞা তুরঙ্গেরে :
সর্ব্বদবর্চ্চন লিখনে।
জতেক জস : যতেক পৌরস :
লিখিঞা পলাবে নামে।
ঘোড়ার ললাটে : সেই সর্ব্ব পাটে :
লিখিব জতন করি।
শুত সহোদর : নিজ দিঞা ঘর :
ব্রতে রহে অধিকারি ॥
অসিপত্র ব্রত : যজ্ঞের নিয়ত :
উত্তম মাস হয়েজে।
ভদ্রাবতি দেশে : স্যাম কর্ন্ন আছে :
এক আছে তার স্থানে ॥

যজ্ঞের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ধন-প্রাপ্তির কথারও উল্লেখ আছে :—

ত্রেতাতে মরুত রাজা অশ্বমেধ কৈল।
আজ্যসমশনে অগ্নির অশুভ জন্মিল ॥
সবর্ন্নের পাণ পাত্র অনেক প্রকার।
অনেক করিঞাছিল জজ্ঞের সম্ভার ॥
সম্পর্ন্ন নাহিল জজ্ঞ আসোচ্য করণ ॥
সেই ত উত্তম দ্রব্য প্রিথিবিতে আছে।
আনিঞা করহ যজ্ঞ আপনার কাছে ॥
মোর শুভদৃষ্টে জদি তার লাগি পাও।
তবে সে মনের দুঃখ সকলি এড়াও ॥
মুনি বোলে তপস্যা করিয়ে পুন্য বোধে।
সকল ছাড়িনু আমি ভায়ের বিরোধে ॥
মুনি বোলে মরুত শুন মোর বাত।
আমি গেলে তোর যজ্ঞে হবে উতপাত ॥
আমার বিরোধ বাক্যে আসিবে বহস্পতি।
তখন করিবি রাজা কেমন দুর্গতি ॥
রাজা বোলে মোর জজ্ঞ হয়ে কদাচিত।
তোমা বিনে তাকে মুক্তি না করো পুরোহিত।
মুনি বোলে সাবধান হয়ো নৃপরাজ।
উৎকণ্ঠাত নিঞা জাবি পাছে দিবি লাজ ॥
জাবত থাকয়ে মোর সরিরেত প্রাণ।
পুরোহিত তোমা বিনে নাহি কর আন ॥
আনিঞা সম্বর্ত রাজা আরম্ভিল জাগ।
কৃষ্ণরাম দ্বিজে রচে পয়ার পুন্য ভাগ ॥
শুনিঞাত বৃহস্পতি : হইলা দুখিতমতি :
সব কথা ইন্দ্রেরে কহিল।
কেনে তেন কৈলে কাজ : শুন দেবতার রাজ :
তোর বোলে অপমান গেল ॥"

উদ্ভিদ—শতদল, নারিকেল, চম্পা, নাগেশ্বর।

জীব—ভ্রমর, ভ্রমরা, অশ্ব।

ভৌগলিক— ভদ্রাবতীদেশ, দ্বারকাপুরী, প্রথিবী।

শিল্পদ্রব্য—ঝারি, থাল, ডাবর্কা, ভৃঙ্গার, ঝারি, লোটা, ঘটি, বাটি, বলাহাঁড়ি, থাল, চৈর্নকি, পীকদান, বারোকোস, গটা লোটা, পাটা, ডাবর তাম্রকটা, খুড়ি, খোড়া, থাল, থাল।

ঐতিহাসিক—

মরুৎরাজা, নারদ, শুরপুর, বারানসী, কাসিরাজ, সম্বর্ত, (বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ), মাদ্রিন কমার, সাল্যরাজ, অনুসাল্য জারা।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয়—

পুরোহিত, অশ্বমেধ, পাদ্য, অর্ঘ, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, সারথি, তুরঙ্গ, কেশী, কুবলয়, দ্রৌপদী, পাণ্ডব, সত্যভামা, পারিজাত, স্বরথরাজ, পাটরড়া।

রাজনৈতিক—

অন্তপুরে, সহস্র স্তম্ভের ঘর, অগ্নসালা, ঘোড়ার মন্দুরা, গৌঘরা, চতুর্দোল, কর্ম্মকার, সিংহবাহনামে গড়,

৩। জয়মনি ভারত (খণ্ডিত)

তুলট কাগজ—পত্রাঙ্ক ১০০ পর্য্যন্ত আছে।

আরম্ভবাক্য—

/৭ অথ জয়মনি ভারথ পুস্তক লিক্ষতে :
নম ভাগবতে বাসুদেবায় নম
অনুভর পদ ভরে : জয়মনি অনুস্বারে :
সত মুনি সোলোকেত কহে।
নৈমিশ অরণ্যে বসি : অষ্টাসি সহস্র রিসি :
দির্ঘ সুন্নে মহাতপ করে।

সমাপ্তিবাক্য—

ভনিতা—

অশ্বমেধ পুর্ণ্য কথা সুধারস ময়।
বন্দিয়া ভারথি পুঁথি কৃষ্ণ রামে কয়॥

অনুশ্বাল্যের খেদ—

প্রজাপাপে রাজা পিড়ে শাস্ত্রের বিধানে :
মোর দেশে কোন শুদ্রে হরিলে ব্রাহ্মণি।

(৩১ পত্রাঙ্ক) * * *

পাপকার্য্য—

কুমারি দুহিতা কার হৈল ঋতুমতি

* * *

অপুত্রের ধন কে বা আনিল ভাণ্ডারে।

* * *

পর নারি কোন পাপে হরিলেক বলে।

* * *

পোন লঞা কন্যা বিভা দিল কোন নরে।

* * *

যজ্ঞের সময়—যজ্ঞাশ্ব সজ্জা—

গঙ্গাজলে স্নান : ঘোড়াকে করান :
নানা গন্ধ দিঞা গায়।
উত্তম চামর : ঘণ্টা থরে থর :
প্রবাল রচিল গায়॥
কিঙ্কিনি কঙ্কন : রত্ন আভরন :
গাথিল হিরার হার।
সর্ব্ব অলঙ্কার : মনি মুক্তা আর :
গলায় দিলেন তার॥
সোনার দর্পনে : সাক্ষর লিখনে :
পরাক্রমে জস জত।
রাজ্যে রাজধানি : জতেক কাহিনি
লেখি দিলেন বহুত॥

সত্য করি কহি : ঘোড়া ধরে যেই :
তাহাকে বধিব প্রাণে।
ধন জন আর : সব নিব তার :
আর করো অপমান॥

* * *

চাম্পা নাগেশ্বর মালা : বিভূসিত কৈল গলা :
আনন্দিত হৈলা নরেশ্বর॥

যাদব রমণীগণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এমন সময়ে আনন্দ-উৎসব আরম্ভ হইল।

মঙ্গলাচার-পদ্ধতি—

জতেক পুজিঞা ঘট : নাচুক নাটিনি নট :
মঙ্গল পুরহ জনে জন।
বোলে রাজা মহাশয় : রাজাহ রাজন জয় :
গায়নে সকল গিত গায়।
ধুপ দিপ আলিপন : দ্বারে দেহ সর্ব্বজন :
আর কর মঙ্গল উপায়।
হস্তি ঘোড়া রথ জান : বাহন সকল আন :
সাজিঞা পাঠাহ শীঘ্রগতি।

বাদ্যভাণ্ড—

চলিল নৃপতি আনিবারে জড়গণ।
চতুরঙ্গ সেনা সব করিঞা সাজন॥

দুন্দুভি অনেক বাজে প্রণত গোভির ।
ভেরি সিংহা কাড়া বাজে ভরিঞা সিবির ॥
করল বিসান বাঁসি কাঁসি করতাল ।
নৃত্যগীত বাদ্যে চলিলা মহিপাল ॥

সকলে একত্র সমবেত হইয়া 'আনন্দ-সম্মিলন' জনিত পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। পরস্পর আলাপ আপ্যায়িত হইতে আরম্ভ হইল। "বধূবর্গে হইল অপূর্ব্ব পরিচয়।"

অনুশ্বাল্যের সহিত যুদ্ধ-বর্ণন-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই—

কামদেব যুদ্ধ—

রথ হৈতে আগুসরি ঃ বাপেরে প্রণাম করি ঃ
হাথেতে তুলিয়া নিল বান ॥

অনুশ্বাল্যের রণে কামদেব পরাজিত হইলে কৃষ্ণ বলিলেন—

কৃষ্ণের উক্তি—

ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান ঃ হাথে কেনে কৈলে বান ঃ
তোমাপরে নাহিক বস্থর ॥

ভীমের উক্তি—

না বোলো না বোলো কিছু ঃ [illegible] নাহি
তার [illegible] ঃ
সাবধানে নাছিল ছায়াল ॥

তুষ্ট হৈলা পঞ্চানন ঃ উঠিল সকল দন ঃ
আপনে সকল দিল দেখা ।

উটহে সকট গাড়ি ঃ বাছিঞা বলদ জোড়ি ঃ
সকল পাঠায় হস্তিনাতে ।

খাদ্যদ্রব্য—

যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম দ্বারকাপুরী গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করিতে দেখিলেন—

আহার্য্যদ্রব্যাদি—

দেখিলা ভোজন করে কমললোচন ।
চামরেতে সত্যভামা করয়ে ব্যজন ॥
কালিন্দি বন্ধন করে রুক্মিনী পরসে ।
সত্যভামা [illegible] আছেন পরিহাসে ॥
দধি মধু সন্দেশ নবনি সর আর ।
লড্ডুক [illegible] চিনী অনেক প্রকার ॥
উপহার [illegible] লক্ষণা দেবি দিছে ।
কর্পূর বা[illegible] জল ভৃঙ্গারেত আছে ॥
বিবিধ [illegible] সপিষ্টক রেক ।
ভোজন করেন কৃষ্ণ সংসার নায়েক ॥

ভীমের [illegible] হস্তিনায় সকলে আগমন করিবার উদ্যোগ করিলেন ।

জতুকলে [illegible] যতেক পরিবার ।
হস্তিনাকে [illegible] নিকলে পাটো আর ॥
রথ গাড়ি [illegible] পাইক মদ মাতা ।
নানাবিধ [illegible] কি কহিব কথা ॥
সঘন [illegible] ঘন পড়ে কাড়া ।
লেক্ষ লেক্ষ হস্তি নাচে লেক্ষ লেক্ষ ঘোড়া ॥
নানা [illegible] বড় মূল্যবান ।
সঙ্গে [illegible] দিতে নিল নারায়ণ ॥

গোবিন্দ [illegible] উপস্থিত হইলে —

"চাহে [illegible] ঃ গবাক্ষে মুখ ভরি ঃ
[illegible] দৃষ্টি করি ।

* * *

হস্ত জোড় করে সব ঃ হস্তিনার প্রজা সব ঃ
নরহরি রাজপথে জান ।

এই অশ্বমেধ [illegible] ২৩ পত্রে লিখিত আছে —

জৌবন্নাশ্ব [illegible] যাইতে যুধিষ্ঠির ।
সর্ব্বজনে [illegible] পুরির বাহির ॥
তুই সন্মে [illegible] সমান পরিচ্ছেদ ।
মন দিঞা শুন [illegible] পয়ার অশ্বমেধ ॥

প্রাচীন সম্ভাষণ-প্রথা—

যুধিষ্ঠির মহাস্বাস ঃ দেখিঞাত জৌবন্নাশ্ব ঃ
সত্বরে নামিলা রথ হৈতে ।

পাত্রমিত্র বন্ধু জন : জার জেবা আরোহন :
নাম্বিঞা চলিলা সর্ব্বজনে ॥
দেখি ধর্ম্ম নররায় : রথ এড়ি পদে জায় :
ভায়ি সব স্বজন সহিত।
অর্ঘ বর্জ্জি দুই জন : দুহে করি আলিঙ্গন :
অন্তরে বাড়িল সুখ অতি ॥
দুহে করে নমস্কার : প্রেম পরিচয় আর :
দুহার ধরিল দুই হাথে।
কোলাকুলি মিষ্ট বোল : দুই সঙ্গে উত্তরোল :
পরিচয় হৈল ভালমতে ॥

এই পুঁথির ২৪ পত্রে শিবপূজা সম্বন্ধে লিখিত আছে—

দিঞা দুগ্ধ ঘৃতচিনী : সন্দেস মোদক আনি :
স্বস্তিক অক্ষত ধূপ দানে।
করি বাদ্য নানা রব : হস্ত জোড়ে করে স্তব :
প্রণাম করিল একিবারে ॥
বোলে জয় গৌরীপতি : করুনা বিভব মতি :
ত্রিভুবনে অরনাথ গতি।
তুয়া পদ পরিহরি : ই ভব সাগর তরি :
কুবেরে করিলা ধনপতি ॥
যেজনা সেবয়ে তোমা : সেইসে জ্ঞানের সিমা :
ঈষ্ট সিদ্ধি জ্ঞানের মহিমা ॥
জন্মে জন্মে তোমা সেবি :
কিছু না জানিল দেবি :
তোমার গুণের তুমি সীমা ॥
স্তবত করিতে সিবে : গতি মতি অন্ন ভবে :
সুপ্রিত হইল সুলপানি।
জত দ্রব্য দিল দেখা : কি করিব তার লেখা :
ভজনের নাম নাহি জানি ॥
উঠে বাটা বাটি থুরি : ভাবকা ভৃঙ্গার ঝারি :
সোবর্ন্নের উঠে লোটা ঘটি।
নানা বর্ন্ন উঠে ঝাড়ি : সোবর্ন্নের বলাহাঁড়ি :
সর্ব্বাঙ্গ থালের পরিপাটি ॥
উঠিল রজত চৌকি :
রৌদ্রে করে ঝিকি মিকী :
সুন্দর রূপার পীকদান।
বারোকোস গটা গোটা : সোবর্ন্নের যত পাটা :
রজতের ডাবর নির্ম্মান ॥
তোলে কত তাম্র কটা :
সোবন্নের পিড়ি খোড়া :
খাল খালি কত দিব লেখা।।

* * * *

শ্রীকৃষ্ণচরণ সরকার,
তত্ত্বাবধায়ক, জাতীয় শিক্ষাসমিতি, মালদহ।

তোগলক-বংশ

এই নূতন রাজবংশের প্রথম সুলতান গিয়াসুদ্দিন তোগলক তাঁহার অত্যল্পকাল স্থায়ী রাজত্ব সময়েই দেশে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা আনয়ন করেন এবং পরবর্ত্তীকালে শিক্ষার যে বিপুল উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তিনি তাহারও সূচনা করিয়া যান। গিয়াসুদ্দিন প্রতিভাবান ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে ভাল বাসিতেন এবং তাঁহাদিগকে তাঁহার সভায় নিমন্ত্রণ করিতেন। তিনি বিবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্য মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং বিদ্বান সেখ ও সৈয়দগণকে বৃত্তিপ্রদান করিতেন। দেওয়ানী বিভাগের বিচার ও শাসনের সুবিধার জন্য কোরাণের মতের সহিত দিল্লীর পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের

ব্যবস্থা মিলাইয়া তিনি এক নূতন আইন সঙ্কলন করেন।

এই সুলতান তাঁহার ক্ষণিক রাজত্ব সময়েই শিক্ষার যে রাগিণী তুলিয়াছিলেন, তাহা প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী যাবত ধ্বনিত হইয়া ফিরোজ সাহের সময়ে তাহার চরমমাত্রায় উত্থিত হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে অধঃপতন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আলাউদ্দিনের রাজত্ব সময়ে বিদ্বজ্জনের কেন্দ্রস্থান দিল্লীতে হওয়া একটু আশ্চর্য্য রকমের হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন আর সেই দিল্লী তাঁহাদের সমাগমস্থান নহে। এই জন্যই আবদুলহক হকী লিখিয়াছেন :—

"আলার রাজত্বের অবসানেই পাণ্ডিত্য ও শিক্ষার ক্রমশঃই অধোগতি হইতে আরম্ভ হয় এবং তৎসঙ্গে সাহিত্যও নূতন আকার ধারণ করে। কারণ, সুলতান মহম্মদ তোগলক সর্ব্ববিধ শিক্ষার অনুরাগী হইলেও আলাউদ্দিনের রাজত্বকালের ন্যায় তাঁহার রাজত্বে তত অধিকসংখ্যক বিদ্বান ও পণ্ডিতগণের আবির্ভাব হয় নাই।"

এরূপ না হইবার কারণ দ্বিবিধ। প্রথম—মোবারক খিলিজির অশান্তিপূর্ণ ও অনুন্নত রাজত্বকালের মধ্যবর্ত্তিতা। দ্বিতীয়—মহম্মদ তোগলকের একগুঁয়েমী ও বাতুলতা-মূলক কার্য্য।

এই সুলতান তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পরমবন্ধু ছিলেন। দিল্লীর সিংহাসনে যে সকল সম্রাট অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত ও বিদ্বান। নিজে একজন সুদক্ষ লেখক ও কবি। তাহার লেখা, রচনা-মাধুর্য্য ও কল্পনা বহু পণ্ডিত ও দক্ষ সাহিত্যিকগণের রচনা হইতে অনেক অংশে উৎকৃষ্ট। উপমা-ব্যবহারে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অসংখ্য ফারসি পদ্য তাঁহার মুখস্থ ছিল। আরবি ও ফারসি ভাষায় লিখিত পত্রাবলীতেই তিনি তাঁহার উপমা প্রয়োগের ও পারসিক কবিতা-প্রয়োগের দক্ষতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার পত্রাবলী গাম্ভীর্য্য ও রচনা-চাতুর্য্যের জন্য বিখ্যাত। ইতিহাস পড়িতে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। এবং মেধা ও স্মরণ-শক্তি প্রখর হওয়াতে তিনি প্রায় সমুদয় ঐতিহাসিক ঘটনাই সন তারিখ সহ মনে রাখিতেন। সিকান্দার-নামা, তারিখি-মামুদি এবং এমি-সালিম-নামা তিনি বেশ ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যেমন সুবক্তা ছিলেন, তেমনি সুদক্ষ তার্কিকও ছিলেন। তিনি যে-কোন সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিককে উপযুক্ত যুক্তি-প্রয়োগপূর্ব্বক তর্কে পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনয়ন করিতে পারিতেন। হস্তাক্ষরেও সুলতান সুনিপুণ লেখককে হারাইয়া দিতেন।

পদার্থ-বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ এবং অঙ্কশাস্ত্রে উঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। রোগের বিভিন্ন লক্ষণ শিখিবার জন্য তিনি অসাধারণ রোগে আক্রান্ত পীড়িতকে দেখিবার জন্য স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি গ্রীক দর্শনও পড়িয়াছিলেন। সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার পরও তিনি প্রসিদ্ধ দার্শনিক আসাদ মুলতুফী, কবি আবিদ, মুয়্যুদ্দিন ইলস্তার, মাওলানা ঈযুদ্দিন সিরাজী প্রভৃতি বহু পণ্ডিতগণের সহিত আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক বিবিধ বিষয়ে তর্ক

করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি গল্প-উপন্যাসে আমোদ পাইতেন না। আবদুল আব্বাস লিখিয়াছেন :—

"প্রসিদ্ধি আছে—ধর্ম্মগ্রন্থ ও আবু হানিফার বিধানের ব্যাখ্যাযুক্ত হিদয়-নামক আইন-শাস্ত্র সুলতানের কণ্ঠস্থ ছিল। কবিতা আবৃত্তি ও রচনা করিতে এবং কবিতা পাঠ শুনিয়া শীঘ্র তাহার গূঢ় মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন। তিনি গুণী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিতে ভাল বাসিতেন। পারসিক কবিতা তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। তিনি পারসিক ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন।"

সুলতানের শৈশবের ও যৌবনের শিক্ষার ভার কাহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল তাহা আমরা সবিশেষ জানি না। তবে ইহা জানা গিয়াছে যে, কুতলু খাঁ তাঁহার একজন শিক্ষক ছিলেন। সুলতান তাঁহাকে দৌলতাবাদের শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করিয়াছিলেন।

শিক্ষা-ক্ষেত্রে সুলতান যেমন প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বে ও সাহসিকতায় এবং দরিদ্র্যের প্রতি সহৃদয়তায় তিনি কম খ্যাতি লাভ করেন নাই। তিনি মুক্তহস্তে রোগীদের জন্য বহু দাতব্যচিকিৎসালয় স্থাপন করেন এবং বিধবা ও অনাথাগণের জন্য অনাথাগার স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে বিদ্বান্ ও পণ্ডিত-গণকে পুরস্কার প্রদান করিতে মুক্তহস্ত ছিলেন। এসিয়ার বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু পণ্ডিতগণ দিল্লীতে আগমন করিয়া বিবিধ উপহার ও সম্মানে ভূষিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

কিন্তু তাঁহার চরিত্রে দুইটি প্রধান দোষ বর্ত্তমান ছিল। তিনি সহজেই রাগিয়া উঠিতেন এবং যাহার উপর রাগিতেন তাহার প্রতি তিনি অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। এমন কি ক্রোধপরবশ হইয়া তিনি সামান্য অপরাধেই বহুসংখ্যক বিদ্বান ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। একগুঁয়েমী তাঁহার চরিত্রের অন্যতম দোষ। চরিত্রের এই দোষের জন্যই সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে এত অধোগতি হইয়াছিল। সুলতানের মস্তিষ্কে যতগুলি বদখেয়াল প্রবেশ করে, তাহার মধ্যে দৌলতাবাদ নাম প্রদান করিয়া দেওগিরিতে অতি সত্বর রাজধানী স্থাপন করা একটি। এই খেয়াল কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইয়া দিল্লীর অধিবাসিগণকে দেওগিরিতে বা দৌলতাবাদে গমন করিতে আদেশ প্রদান করেন। কিছু-কাল পরে কিন্তু তাঁহাকে দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিতে হয়, এবারও তিনি জনসাধারণকে দৌলতাবাদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন।

এই খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া সুলতান যে কেবল জনসাধারণের অশেষ কষ্টের কারণ হইয়াছিলেন তাহা নহে, দিল্লীতে সাহিত্যের যে কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল তাহাও ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুলতান ফিরোজ সাহের সভার ঐতিহাসিক জিয়া বারণী প্রসিদ্ধ রাজ-ধানীর দুরবস্থার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান তাহা পাঠে সহজেই জানিতে পারা যায়, সাহিত্যের দিক হইতেও দিল্লীর কিরূপ অধঃ-পতন ঘটিয়াছিল।

"দেওগিরিতে রাজধানী স্থাপন মহম্মদ তোগলকের দ্বিতীয় চেষ্টা। ইহাতে ১৭০ কি ১৮০ বৎসরের সমৃদ্ধিশালী কোইরো এবং বগদাদের প্রতিদ্বন্দ্বী চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ৪।৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত উপনগর ও উপগ্রাম সহ দিল্লী-নগরীর ধ্বংস সংঘটিত হয়। সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছিল। একটি বিড়াল কুকুর পর্য্যন্তও কোন প্রাসাদে, হর্ম্ম্যে বা উপনগরে দৃষ্ট হইত না। শিক্ষিত, ভদ্রলোক, ব্যবসায়ী, জমিদার প্রভৃতি সকলকেই সুলতান নূতন রাজধানীতে আনয়ন করিয়া তথায় তাহাদিগকে বাস করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এইরূপে দেও-গিরিতে লোক আনয়ন করিয়াও তাহার লোকসংখ্যা অধিক বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। কারণ তথায় বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং অনেকে স্ব স্ব গ্রামে ফিরিয়া যায়।"

তানগিরের উৎসাহী ভূপ্রদক্ষিণকারী ইব্‌ন্ বাতুতা ১৩৪১ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিলে সম্রাট তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। তিনিও দিল্লী সম্বন্ধে ঐরূপই উল্লেখ করিয়া যান। পৃথিবীর মধ্যে তাৎকালীন সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী দিল্লীনগরী কিছুদিনের জন্য মরুভূমিপ্রায় ছিল এবং অতি অল্প জন মানবই তথায় দৃষ্ট হইত।

এইরূপে মুসলমান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র সাহিত্যিকগণ দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল যে সকল বিদ্যালয় ও শিক্ষাগার সহস্র সহস্র ছাত্র দ্বারা মুখরিত হইত, তথায় আর একটিমাত্র ছাত্রের কণ্ঠস্বরও শুনা যাইত না। হায়, সুলতানের খেয়ালে সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত দৌলতাবাদ আর কি সেই পরিত্যক্ত প্রাচীন রাজধানীর অমূল্য সম্পত্তি সাহিত্যের যশ, মান ও ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হইতে পারে!

যাহা হউক, সুলতানের সাহিত্যানুরাগের জন্য তিনি কখনও সাহিত্যিকগণ কর্ত্তৃক পরি-বেষ্টিত না হইয়া থাকেন নাই। কিন্তু যাঁহাদের তিনি দৌলতাবাদে আনয়ন করেন বা যাঁহারা স্বেচ্ছায় তথায় আগমন করেন, তাঁহাদের দ্বারা, তিনি যতটা হারাইয়াছিলেন তাহা পূরণ করিতে পারেন নাই। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার রাজ-সভায় সর্ব্বদাই উচ্চ সাহিত্যের আলোচনা হইত। তিনি তাঁহার নূতন নগরের অধি-বাসিগণের শিক্ষার জন্য কি বন্দোবস্ত করিয়া-ছিলেন, তাহা ঠিক বলিতে না পারিলেও পরবর্ত্তী সুলতান নূতন রাজধানী ফিরোজা-বাদে যেমন বহু মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনিও সে সকল না করিয়াছিলেন এরূপও আমাদের মনে হয় না। যাহা হউক, তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে যে তাঁহার দানে ও সাহিত্যানুরাগিতায় আকৃষ্ট হইয়া বহু পণ্ডিত ও বিদ্বান দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। এই ঘটনাই আবদুল আব্বাস আহাম্মদ একটু অতিরঞ্জিত ভাষায় বর্ণনা করেন। তিনি বলেন দিল্লীর রাজসভায় আরবিক, পারসিক অথবা ভারতবর্ষীয় যে কোন ভাষায় বিশেষ পারদর্শী এক সহস্র কবি, দ্বাদশ শত ভিষক ছিলেন এবং [illegible] তাঁহার দৈ[illegible] তাঁহাদের [illegible] বিবিধ উচ্চ [illegible] বিষয়ের আলোচনা করিতেন। যে-কোন

সাহিত্যিক—বিদেশীই হউক বা দেশীই হউক—সকলেই মাদ্রী জাহান ও তাঁহার কয়েক জন সহকারী দ্বারা পরীক্ষিত হইত, এ কথাও তাহাতে উল্লিখিত আছে। সে যাহা হউক, তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগে সুলতান যেরূপ শিক্ষার ও সাহিত্যের উৎসাহী ছিলেন এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। সুতরাং তিনি তদনুসারে প্রশংসার্হ। যে সকল পণ্ডিত সুলতানের সভায় আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নাসিরুদ্দিন, আবদুল আজিজ, সামসুদ্দিন, আধৌদ্দিন, মাজাদুদ্দিন এবং বোর্হানুদ্দিনের নাম উল্লেখযোগ্য।

তারিখি-ফিরোজ-সাহী-লেখক বারণী শাসন সম্বন্ধে উপদেশ ও পরামর্শ দিবার জন্য সুলতান কর্ত্তৃক দুইবার আহুত হইয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাটের কর্ণে তাঁহার উপদেশ প্রবেশ লাভ করিয়াও কোন সুফল প্রদান করে নাই। এই ঘটনাটি বাস্তবিকই সম্রাটের রাজত্বের একটি বিশেষত্ব বলিতে হইবে।

যদি এই সুশিক্ষিত সুলতানের মস্তিষ্ক একটু উষ্ণ না থাকিত, তবে ভারতীয় মুসলমান-গণ-সম্রাটের নিজের বিদ্যা ও জ্ঞানের অনেক অংশ লাভ করিতে পারিত। কিন্তু তাহাদের ভাগ্যবিধাতা অন্যরূপ লিখিয়াছিলেন।

সম্রাটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দৌলতাবাদের ঐশ্বর্য্যও অন্তর্হিত হইতে লাগিল এবং পুনঃ দিল্লীর অবস্থা ভাল হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু দিল্লীর আর পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিল না। কারণ ফিরোজ তোগলক নূতন রাজধানী তৈয়ার করিবার সঙ্কল্প করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে না হইতেই তিনি এই উদ্দেশ্যে অট্টালিকা সকলের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করেন। এই নূতন রাজধানী নির্ম্মাণে তিনি কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটের ন্যায় দিল্লীবাসিগণের অশেষ কষ্টের কারণ হইয়া উঠেন নাই। কারণ এই নূতন রাজধানী দিল্লীর অতি নিকটবর্ত্তী ছিল, এবং সম্রাট কাহাকেও পূর্ব্ব রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া নূতন স্থানে যাইতে বাধ্য করেন নাই। পূর্ব্ব ও নূতন রাজধানী অতিশয় নিকটবর্ত্তী হওয়ায় উভয় স্থানের অধিবাসীবৃন্দের ভাগ্যই তুল্যরূপ হইয়াছিল। যখন ফিরোজাবাদ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী এবং শিক্ষার প্রধান কেন্দ্ররূপে বিখ্যাত হইয়া উঠিল, দিল্লী তদনুযায়ী উন্নত হইতে পশ্চাৎপদ রহিল না। কিন্তু কিছুকালের জন্য নূতনের ছায়ায় পুরাতন ঢাকিয়া গিয়াছিল।

"যুদ্ধের ন্যায় শান্তিও জয়লাভ করে" এ কথা যদি সত্য হয়, তবে মুসলমান শাসন-কর্ত্তাদের মধ্যে ফিরোজ তোগলক এ বিষয়ে অগ্রণী। তাঁহা দ্বারাই মহানুভব আকবরের কর্ম্মপ্রণালী বহুপ্রকারে বহুপূর্ব্বে সূচিত হয়।

সুলতান ফিরোজ যেমন ন্যায়পরায়ণ ও উৎকৃষ্ট শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তেমনি দাতা ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন প্রজাগণের আর্থিক বিষয়-সম্পত্তির উন্নতির চেষ্টা করিয়া-ছিলেন তেমনি অন্যদিকে তাহাদের সুশিক্ষার জন্যও বহু যত্ন লইতেন। যৌবন সময়েই তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত গিয়াসুদ্দিন তোগ-লকের নিকট রাজ্যশাসন বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। তিনি তাঁহার রাজ্যে পরিভ্রমণ সময়ে ফিরোজকে সঙ্গে লইয়া শাসনসম্বন্ধে নানা কুটিল সমস্যার মীমাংসা করিয়া দেখাইতেন। মহম্মদ তোগলক সিংহাসনে

আরোহণ করিবার পরও ফিরোজকে তিনি পূর্ব্ববৎ যত্ন ও মনোযোগের সহিত শিক্ষা দিতেন। মহম্মদ তাঁহাকে নায়েব বারবক উপাধি প্রদান করিয়া নিজের সহকারী পদে গ্রহণ করেন এবং ১২০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করেন। সুলতান সর্ব্বদাই ফিরোজকে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন এবং রাজ্যের যে সমস্ত সমস্যা বিবেচনার জন্য তাঁহার নিকট আসিত তিনি তাহা মীমাংসা করিয়া ফিরোজকে শুনাইতেন। সুলতান তাঁহার রাজ্যকে চারিভাগে বিভক্ত করিলে পর যাহাতে ফিরোজ শাসনসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহাকে বিভক্ত রাজ্যের এক অংশ শাসন করিতে দেন। এইরূপে ফিরোজ সাহ সর্ব্বদাই রাজত্ব ও শাসনসংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ে লিপ্ত থাকায় শাসনে সুনিপুণ হইয়া উঠেন। এবং রাজ্যপ্রাপ্তির পর তিনি সেই শিক্ষার পরীক্ষা অতি সুন্দররূপে প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়েও তিনি উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি ফাতুহাটি ফিরোজসাহী নামক আত্মচরিত স্বহস্তে লিখিয়া যান। ইতিহাসে তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। যে সকল ঐতিহাসিক তাঁহার সভায় ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জিয়াউদ্দিন বারণী এবং সিরাজ আলিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে বারণীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার রাজত্বের ঐতিহাসিক ঘটনা সকল লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রায় প্রত্যেক পণ্ডিতের নিকটই ব্যক্ত করেন। কিন্তু তিনি ঐতিহাসিকগণকে যেরূপ উচ্চ আদর্শে দেখিতেন তাহাতে তাঁহার মনোমত কোন ব্যক্তিকে না পাওয়ায় নিরাশ হইয়া তিনি নিজেই তাঁহার রাজত্ব বিষয়ে কয়েক ছত্র লিখিয়া স্বর্ণাক্ষরে ছাপাইয়া তাহা উভয় প্রাসাদের দেওয়ালে, গুম্বজে টাঙ্গাইয়া দেন।

রাজসভায় জনসাধারণের সম্ভাষণের জন্য যেরূপ বন্দোবস্ত করেন তাহাতেই বিদ্বানগণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার পরিমাণ অবগত হওয়া যায়। তিনি তিনটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন—(১) দ্রাক্ষামন্দির, (২) কাষ্ঠাসনযুক্ত প্রাসাদ, (৩) সাধারণ সভাগৃহ। প্রথমটি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের এবং দেশের সম্রান্ত ব্যক্তিগণের, দ্বিতীয়টি সুলতানের নিজের প্রধান পার্শ্বচর ও কর্ম্মচারিগণের ও তৃতীয়টি সর্ব্বসাধারণের সম্ভাষণের জন্য।

শিক্ষার জন্য তিনি যে প্রচুর মুদ্রা ব্যয় করেন তাহাতেই তাঁহার বিদ্যানুরাগ ও বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি ১৩৬ লক্ষ টাকা বৃত্তিতে ও দানে ব্যয় করেন, তন্মধ্যে ৩৬ লক্ষ টাকা পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণকে প্রদান করেন।

ফিরোজ সাহই বোধ হয় ভারতের মনোহর, আশ্চর্য্যজনক অথবা কৌতুকাবহ স্থাপত্যশিল্পকে ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা করেন। খিজিরাবাদ পার্ব্বত্য প্রদেশান্তর্গত টোব্রাগ্রামে ও মিরাট সহরের নিকটবর্তী স্থানে প্রাপ্ত দুইখানি অশোকস্তম্ভ যেরূপ যত্ন সহকারে ও অর্থব্যয়ে নিজরাজধানীতে আনয়ন করেন, তাহাতে সুলতানের স্থাপত্যশিল্পের প্রতি অনুরাগের ও তখনকার দিনে বিরল হিন্দু নিদর্শনগুলির

প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল স্তম্ভ পাণ্ডবদের সময়ের বলিয়া অনেকে মনে করেন এবং ঐতিহাসিক আফিফ সেগুলি মহাভারতের ভীমসেনের ভ্রমণযষ্টি বলিয়া প্রচার করেন। এই স্তম্ভ দুইটির একটিকে ফৈজাবাদের জুম্মা মসজিদের নিকটবর্ত্তী প্রাসাদে স্বর্ণস্তম্ভ নামে এবং অন্যটিকে বহু নিপুণতা ও পরিশ্রমের সহিত মৃগয়াগৃহে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

বৈদ্যুতিক অথবা বাষ্পীয় পোত বা যান আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে এই সকল প্রকাণ্ড ও ভারী স্তম্ভ সকল যেরূপভাবে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। খিজিরাবাদ ফিরোজাবাদ হইতে প্রায় ১৮০ মাইল। সুলতান সেখানকার স্তম্ভ দেখিয়াই তাহা সেস্থান হইতে আনয়ন করিতে সংকল্প করেন এবং উহা যাহাতে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের বিস্ময় উৎপাদন করে ও তাহাদের নিকট যাহাতে ফিরোজ সাহের নাম স্মরণীয় থাকে সেই জন্য সেই স্তম্ভটি তিনি আনয়ন করিয়া কোন নূতন স্থানে স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত ও আনয়নের জন্য তিনি নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের লোকের প্রতি ও সৈন্যগণের প্রতি আদেশ প্রদান করেন। স্তম্ভের গোড়ার মাটী খুঁড়িয়া ফেলিলে যাহাতে উহা নরম স্থানে পড়ে, তজ্জন্য স্তম্ভটীর চতুর্দ্দিকস্থ স্থানে রেশম ও তুলা যথেষ্ট পরিমাণে ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। স্তম্ভটির গাত্রও নানা লতা পাতা ও লোমযুক্ত চর্ম্ম দিয়া মণ্ডিত করা হইয়াছিল। ৪২টি চক্রবিশিষ্ট একটী গাড়ী প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং প্রত্যেক চক্রের সহিত রজ্জু বাঁধা ছিল। গাড়ীর উপর স্তম্ভটি স্থাপিত করা হইলে উহাকে সহস্র সহস্র লোকে টানিয়া যমুনার তীরে আনয়ন করে। তথায় ৭০০ মণ হইতে ২০০০ মণ পর্য্যন্ত শস্য বহন করিতে পারে এরূপ বহুসংখক নৌকা করিয়া উহাকে ফিরোজাবাদে আনয়ন করা হয়। তথায় নূতন গাড়ীতে করিয়া উহাকে সংস্থাপন করিবার জন্য যে হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাতেই অতিশয় দক্ষতার সহিত স্থাপন করা হয়। বহু ব্রাহ্মণ ও হিন্দু সন্ন্যাসীকে স্তম্ভের গাত্রে খোদিত লিপি পাঠ করিতে বলা হয়, কিন্তু কেহই তাহার পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই।

অন্য স্তম্ভটিও সুলতান এইরূপ দক্ষতার সহিত শিকার-গৃহে স্থাপন করেন। এবং স্থাপনকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে নিমন্ত্রণ, ভোজ ইত্যাদি নানা প্রকার আমোদ করিয়াছিলেন।

চিত্রশিল্পের প্রতি সুলতান ফিরোজের অনুরাগ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মগ্রন্থের অনুশাসনদ্বারা পরিচালিত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান সম্রাটগণের বাসগৃহ নানা প্রকার চিত্রে সুশোভিত ছিল। একাকী অবস্থান সময়ে সম্রাটগণ তৎসমুদয় অবলোকন করিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিতেন। মুসলমান ধর্ম্ম-গ্রন্থের অনুমোদিত নহে বলিয়া তিনি প্রাসাদের কোনও স্থানে যাহাতে চিত্রিত মূর্ত্তি না থাকে তাহার আদেশ করেন, তিনি উদ্যানাদি প্রাকৃতিক শোভা চিত্রিত করিতে দিতেন।

প্রত্যেক শুক্রবার সাধারণ ভজন শেষ হইলে প্রায় ৩০০০ গায়ক বাদ্যকর, গল্পকথক, এবং কুস্তিগিরগণ দিল্লীর বিভিন্নস্থান হইতে তথায় সমবেত হইয়া সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ক্রীতদাস রাখিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে ও উপযুক্ত কার্য্য প্রদান করিতে সুলতান বিশেষ আমোদ উপভোগ করিতেন। সুলতান সামন্ত বা কর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে উপঢৌকন গ্রহণ করা রহিত করিলে, তাঁহারা সুলতানকে ক্রীতদাস রাখিতে উৎসাহী দেখিয়া, বহুসংখ্যক ক্রীতদাস ব্যতীত আর কিছুই তাঁহাকে প্রদান করিতেন না। যখন তাঁহার নিকট বহুসংখ্যক ক্রীতদাসের সমাগম হইল, তখন তিনি তাহাদের কতকগুলি করিগা নায়কের অধীন করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে খাদ্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে প্রদান করা হইত। কতকগুলি দান ধর্ম্ম গ্রন্থ পড়িয়া ও মুখস্থ করিয়াই সময় কাটাইয়া দিত, অন্যগুলি ধর্ম্ম-আলোচনায়, কেহ বা পুস্তক নকল করিয়া লিখিতেই জীবন অতিবাহিত করিত। কেহ বা ব্যবসাদারদের নিকট শিক্ষালাভ করিত। এইরূপে প্রায় ১২০০০ দাস সুলতানের বিবিধ শিল্প-কার্য্যের জন্য নিযুক্ত ছিল। দিল্লীতেও অন্যান্য স্থানের প্রায় ১৮০০০ ক্রীতদাসের পরিপোষণ ও সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য সুলতান বিশেষ যত্ন লইতেন। এই ঘটনা এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে কেবল তাহাদের দেখিবার জন্যই কতকগুলি কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়, এবং তাহাদের বৃত্তিদানের জন্য একটি স্বতন্ত্র তেরজারী প্রধান মন্ত্রীর নিকটে না রাখিয়া সুলতান নিজের অধীনেই স্থাপন করেন। মহম্মদ ঘোরী দাসগণকে শিক্ষিত করিবার জন্য এইরূপ খেয়াল দেখাইয়াছিলেন। ইহাও অনেকটা তদ্রূপ।

অশোকের স্তম্ভ-রক্ষণে সুলতান যেরূপ আগ্রহ ও যত্ন করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমরা তাঁহার শিল্পকলার প্রতি অনুরাগের আভাস পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত তখনকার কার্য্যকরী বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইত, সেরূপ যত্ন সহকারে তিনি সেগুলি ব্যবহার করিতেন, তাহাতে শিল্প-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার প্রীতির পরিমাণ অবগত হওয়া যায়। বলা বাহুল্য, সম্রাটের এই সকল দ্রব্যের ব্যবহারে শিল্পিগণ উৎসাহিত ও পরিপুষ্ট হইতেন।

সুলতানের সময় যে সকল আশ্চর্য্য পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে তাসিঘড়িয়াল (উপাসনাদির সময়নির্দ্ধারক তাসের ৭ প্রকার ব্যবহার) অন্যতম। ফিরোজাবাদের দরবার-গৃহের উপরিভাগে ইহা রক্ষিত হইয়াছিল এবং ইহা দেখিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হইত।

পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান সম্রাটগণের মধ্যে কেহই সুলতান ফিরোজের ন্যায় প্রজাগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য এত পরিশ্রম বা যত্ন করেন নাই। তিনি বহু নূতন উৎকৃষ্ট ও কার্য্যকরী আইন প্রচলন করেন। ইহাদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যে নিয়মাবলী প্রচার করেন তাহাই প্রধান। শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে উৎসাহ দেওয়া ও পোষণ করা এবং তাহাদিগকে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বাস করাইয়া দেশের সর্ব্বত্র শিক্ষা বিস্তার করা তিনি

শাসনের বিশেষ অনুকূল বলিয়া মনে করিতেন এবং আদেশের সহিত সেইরূপ নিয়মাবলী সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছিলেন।

তাঁহার অনুশাসনের অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় "মসজিদ, পান্থশালা, কূপ, পুষ্করিণী, বিদ্যালয় প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষকৃত সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানসমূহের সংস্কার করা এবং তাহাদের পরিপোষণ ও রক্ষণের জন্য রাজস্বের কিঞ্চিৎ অংশ প্রদান করা আমি আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিয়াছি।"

কার্য্যতঃ ইহাতে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা আমরা দেখিব। কতগুলি সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন ফেরিস্তাতে তাহার এক ফর্দ্দ আছে। তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে শিক্ষার জন্য নিতান্ত কম চেষ্টা হয় নাই।

প্রাসাদ	২০
পান্থশালা	১০০
সহর ও নগর	২০০
জমির উর্ব্বরতা বর্দ্ধনের জন্য পুষ্করিণী-তড়াগাদি	৩০
দাতব্য চিকিৎসালয়	১০০
কবরের উপর স্মৃতিচিহ্নসূচক অট্টালিকাদি	৫
সাধারণ স্নানাগার	১০০
স্মৃতিস্তম্ভ	১০
সাধারণ কূপ	১০
পুল	১৫০

এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক বাগান ও প্রমোদোদ্যানও করাইয়াছিলেন। এই সমুদয়ের রক্ষণ ও সংস্কারের জন্য বহু নিষ্কর জমিও দেওয়া হইত।

আফিফ বলেন—

"ভগবানের লোকদিগের থাকার জন্য এবং বিভিন্ন দেশীয় পথিকগণের অন্ততঃ তিন দিবস থাকার জন্য তিনি দিল্লী ও ফিরোজাবাদে ১২০টি খোন্‌কা বা পান্থশালা নির্ম্মাণ করান।

"ভগবান অধীনকে যে ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন এ দাস তাহা হইতে সাধারণের জন্য বিবিধ অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করে। সেইজন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণেরা, গুরুজনেরা, পবিত্রাত্মা ও ভক্তেরা যাহাতে ভগবানের উপাসনা ও ঈপ্সিত কার্য্য করিতে পারেন এবং উপাসনা দ্বারা এ দাসের সাহায্য করিতে পারেন, তজ্জন্য বহুসংখ্যক মসজিদ, বিদ্যালয়, পান্থশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা হইল। পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থের উপদেশানুসারে পয়ঃপ্রণালী আদি খনন, বৃক্ষাদি রোপণ, ভূসম্পত্তি দান প্রভৃতিও করা হইয়াছে। এবং ভগবানের আদেশ অনুসারে আমার নিজকৃত অট্টালিকাদি শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমার পূর্ব্বপুরুষ ও তৎসাময়িক প্রধান ব্যক্তিগণের হর্ম্ম্য সকলের জীর্ণসংস্কার হইতেছে। প্রাচীন দিল্লীতে সুলতান মুইজুদ্দিন সামের কৃত মসজিদ জামি ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছিল আমি তাহার পুনর্নিম্মাণ করাইয়াছি।

"সুলতান সামসুদ্দিন আলতামাসের মাদ্রাসাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছিল। তাহার পুনর্নিম্মাণ করাইয়া তাহাতে চন্দনকাষ্ঠের দ্বার সংযুক্ত করা হয়। সমাধির উপরের যে সকল স্মৃতিচিহ্ন নষ্ট হইয়া গিয়াছিল সেগুলি পুরাতন অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট করিয়া তাহার পুনর্নিম্মাণ করা হয়। পূর্ব্বনির্ম্মিত যে সব

সমাধির চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকল প্রস্তুত হয় নাই, আমি তৎসমুদয় নির্ম্মাণ করাইয়াছি। * *

"সুলতান আলাউদ্দিনের সমাধির সংস্কার সাধন করিয়া তাহাতে চন্দনকাষ্ঠের দ্বার সংযুক্ত করিয়া দিয়াছি, আব্দার খানার দেওয়ালগুলি এবং মাদ্রাসার অন্তর্গত মসজিদের পশ্চিম ধারের দেওয়ালেরও সংস্কার করাইয়াছি। * * *

"সৈখুল ইসলাম নিজামুল হকের সমাধির চন্দনকাষ্ঠের দ্বারেরও পুনর্নির্ম্মাণ সাধন করিয়াছি। তাহার গুম্বজের চতুর্দ্দিকে স্বর্ণ-শৃঙ্খলযুক্ত স্বর্ণপরদা টাঙ্গাইয়া দিয়াছি। পূর্ব্বে কোন সভাগৃহ না থাকায় আমি তথায় একটী সভাগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছি।

"সমাধি ও বিদ্যালয়সমূহের সংস্কার ও পুনর্নির্ম্মাণ সাধনের খরচ তাহাদের নিষ্কর বিত্ত হইতেই পাইয়াছি। আর যে সকল স্থানে গালিচা, আলোক, আসবাব প্রভৃতির জন্য কোন নিষ্কর সম্পত্তি ছিল না, তথায় আমি তাহাদের জন্য গ্রাম সকল নিষ্করভাবে দান করিয়াছি।"

বিস্তারিত বিবরণে আমরা আরও বহু বিষয় জানিতে পাই। উদার সুলতানের লেখনী হইতে আমরা দুইটি নূতন বিষয় অবগত হইলাম—সুলতান আলতাস ও সুলতান আলাউদ্দিনের বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চবিদ্যালয়। শেষোক্তটি কাহা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল জানা যায় নাই। সুলতান আলাউদ্দিনের সমাধির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় মনে হয় সম্ভবত মৃত সুলতানের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপে উহারা তাঁহার পুত্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সুলতানের নির্ম্মিত মসজিদসহ ৩০টি উচ্চ-বিদ্যালয়ের মধ্যে ফতে খাঁর সমাধির নিকট-বর্ত্তী কাদামসেরিফ-নামক উচ্চবিদ্যালয় ও তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী মসজিদ ও পুষ্করিণী অন্যতম। যুবরাজ ফতে খাঁ ১৩৭৪ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ উহা নির্ম্মিত হয়।

ফিরোজসাহী মাদ্রাসা নামক উচ্চবিদ্যালয় আর একটি ফিরোজাবাদে বিদ্যমান ছিল। বারণীর লিখিত উৎকৃষ্ট বিবরণ হইতে সহজেই অবগত হওয়া যায় যে, সাহিত্য-চর্চ্চাতেই হউক বা বিদ্যালয়-গৃহের শিল্প-নৈপুণ্যে হউক এরূপ মাদ্রাসা তৎকালে ভারতবর্ষে আর ছিল না। প্রকৃত পক্ষেই ফিরোজ সাহের নবরাজধানী-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ও উৎসাহ এবং তাঁহার শিক্ষা-প্রচারের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ দর্শন করিলে, তিনি যে ঐ বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন তাহা আর বিচিত্র কি?

বহু সুদৃশ্য গুম্বজসহ সুপ্রশস্ত অট্টালিকা দ্বারা মাদ্রাসাটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা বৃক্ষবাটিকা-সমাচ্ছন্ন উপবনশোভিত হওয়াতে তথায় প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম শোভার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল। নিকটবর্ত্তী স্বচ্ছ জলাশয়ের বক্ষে তটস্থ অভ্রভেদী সুরম্য অট্টালিকা প্রতিবিম্বিত হইত। শত শত কর্ম্মী ছাত্রগণ যখন মসৃণ বিদ্যালয়-গৃহের উপর গমনাগমন করিত বা সুপণ্ডিত শিক্ষক-গণের নিকট যখন বিদ্যাভ্যাস করিত বা উপবনের চতুষ্পার্শ্ব যখন তাহাদের কর্ম্ম-কোলাহলে মুখরিত হইত, তখন না জানি উহা কি বিচিত্র শোভাই ধারণ করিত!

আমরা মাত্র দুইজন অধ্যাপকের উপর ছাত্রগণের শিক্ষার ভার ন্যস্ত দেখিতে পাই। সুবিখ্যাত বহুশাস্ত্রজ্ঞ মৌলানা জালাউদ্দিন রৌমীকে দর্শন, স্মৃতি (বা আইন), কোরাণের ভাষ্য প্রভৃতি পড়াইতে দেখিতে পাই। অন্য অধ্যাপকটী সমরখন্দ হইতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মগ্রন্থেরই একজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন।

অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েই বিদ্যালয়-গৃহে বাস করিতেন, সুতরাং সর্ব্বদাই তাঁহাদের মধ্যে ভাব-বিনিময় হইবার সুযোগ ছিল। বলা বাহুল্য, বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র অর্থকরী বিদ্যাই অধীত হইত না; ছাত্রের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষার প্রতিও দৃষ্টি থাকিত। বিদ্যালয়-সংলগ্ন মসজিদে প্রত্যহ নিয়মিত পাঁচ বার ও অতিরিক্ত একবার করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করা হইত। সুফীগণই উপাসনা দেখাইয়া দিতেন। অন্য সময়ে তাঁহারা মালা জপ করিতেন এবং ভগবানের নিকট সুলতানের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেন। হাফিজ (যাঁহারা সমস্ত কোরাণ কণ্ঠস্থ করিয়াছেন) সমস্ত কোরাণ আবৃত্তি করিয়া সুলতান এবং সমুদয় মুসলমানগণের জন্য প্রার্থনা করিতেন।

বিদ্যালয়ের সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া বহু দূরদেশ হইতে পণ্ডিতগণ দর্শনাশায় তথায় আগমন করিতেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য ভিন্ন অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দীনদরিদ্রের দানের জন্যও বিদ্যালয়সমূহ প্রসিদ্ধ ছিল। বিদ্যালয়-সংলগ্ন মস্‌জিদ হইতেই দান করা হইত।

সফলকাম ছাত্রগণকে বৃত্তি প্রদান করিবার জন্য অর্থ বা বিত্ত সঞ্চিত থাকিত। বৃত্তি ব্যতীত শিক্ষক, ছাত্র বা দর্শক যেই বিদ্যাগৃহে থাকুক তাহার ভরণের দৈনিক সাহায্য ধার্য্য থাকিত। এই সকল খরচ বহনের জন্য প্রায়ই সুলতান নিষ্কর বিত্ত দান করিতেন এবং কোন কোন সময়ে উপযুক্ত মুদ্রাও সঞ্চিত থাকিত।

বারণীর কথানুসারে দিল্লী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহিত তুলিত হইতে পারিলেও সেইকালের গৌরব সেই মাদ্রাসা এখন কোথায়? হায় কাল-সাগরে ইহার ছাত্র, অধ্যাপক, সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য, মসজিদসহ সকলই নিমজ্জিত হইয়াছে!

দেখিতে পাওয়া যায় ফিরোজসাহী মাদ্রাসার ন্যায় ফিরোজ সাহের প্রতিষ্ঠিত সমুদয় মাদ্রাসাই মসজিদসংযুক্ত ছিল এবং বিদ্যালয়বাসী সমুদয় ছাত্রেরই ইসলামধর্ম্মানুসারে চলিতে ও ধর্ম্মশিক্ষা করিতে হইত।

সুতরাং ঐ সমুদয় মাদ্রাসায় হিন্দু যুবকগণের অবস্থিতি ও বিদ্যালাভ যে অসম্ভব তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অথচ আমরা দেখিতে পাই যে হিন্দুরা শাসন-সংক্রান্ত উচ্চ পদে নিযুক্ত হইতেন। ফিরোজসাহ প্রকৃতপক্ষে যাঁহাদের উপর সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই রাজনীতিবিশারদ ও সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা পিতা-পুত্র খানিজাহানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত উচ্চ পদের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে আরবি, পারশি প্রভৃতি বিজাতীয় ভাষায় সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মুসলমানদিগকেই এইরূপ ভারতীয় ভাষায় পারদর্শী হইতে দৃষ্ট হয়, এবং নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে

ইহার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে। নগরকোটের রাজা কোনও এক যুদ্ধে ফিরোজ সাহের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্যে তিনি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে তৎকালে স্থানীয় লোক সকল ফিরোজ সাহকে বলিল যে নগরকোটের মন্দিরে হিন্দুরা যে মূর্ত্তির পূজা করে তাহা আলেকজাণ্ডার-পত্নী নাওসবার প্রতিমূর্ত্তি এবং ইহা গ্রীক আক্রমণকারী দ্বারাই তাহাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে। সেই সময়ে জ্বালামুখী নামে ঐ মূর্ত্তি পরিচিত হইত। এই মন্দিরে ১৩০০ খানা হিন্দু-পুস্তকসম্বলিত একটি সুন্দর পুস্তকাগার ছিল। কয়েকখানি পুস্তক অনুবাদ করিবার জন্য ফিরোজ সাহ কয়েকজন হিন্দুপণ্ডিতকে তথায় প্রেরণ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তন্মধ্যে একখানি পদ্য পুস্তক পারশ্যভাষায় গদ্যে অনুবাদ করিবার জন্য এইজুদ্দিন খালিয়া খানি নামক একজন বিখ্যাত কবিকে নিযুক্ত করা হয়। যখন উক্ত পুস্তক শেষ হইল, সুলতান তাঁহাকে তুলাইল ফিরোজসাহী এই উপাধি দ্বারা ভূষিত করিলেন।

এইরূপে হিন্দু-মুসলমান বিজিত ও শাসক পরস্পর পরস্পরের ভাষা শিক্ষা করিত। হিন্দু বা মুসলমানের বিদ্যালয়ে বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, অথবা তাহা স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষা করিতে হইত, তাহা জানা যায় না।

ফিরোজ সাহের রাজত্বকালে অনেক বিদ্বান, দার্শনিক ও আইনজ্ঞ ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ধর্ম্ম ও বিধি সম্বন্ধে বহু পুস্তক-প্রণেতা মৌলানা আলিম আন্দপাঠী;

কাজি সাহাবুদ্দিন দৌলতাবাদীর গুরু মৌলানা খোয়াজগি,

মৌলানা আহম্মদ থানেশ্বরী; কাজি আবদুল মুক্তাদির শারিহি,—ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, সুললিত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। ইঁহার পারশি পদ্য অপেক্ষা আরবি পদ্য অতিশয় মধুর হইত।

সর্ব্বজনবিদিত "আইনুল মুলকি"-গ্রন্থের রচয়িতা আইনুল মুলক।

সাহিত্যিকগণের অন্নচিন্তা দূর করিবার জন্য ফিরোজ সাহ যথেষ্ট সংস্থান করিয়া দিতেন, ইহাও তাহার উদার অন্তঃকরণের অন্যতম পরিচয়। সকল যুগেই বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ নানা কারণে অর্থের অভাব খুব বেশী অনুভব করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ লজ্জার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের অভাব কাহাকেও জানান না, এই জন্য ফিরোজ সাহ পণ্ডিত এবং সাহিত্যিকগণের আর্থিক অবস্থার সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করিবার জন্য কর্ম্মচারিগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রকৃত অভাব থাকিলে তিনি সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতবর্গকে রাজসরকারে নিযুক্ত করিতেন।

হৌজ খাস নামক গ্রামে নাসিরুদ্দিন তোগলক সাহ কর্ত্তৃক ৭৯১ হিজরী সালে (১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে) এই দেশবিশ্রুত ও অশেষগুণান্বিত সম্রাটের কবর নির্ম্মিত হয়। ইহার উত্তর কোণেই মাদ্রাসা অভিমুখী একটি তোরণদ্বার এবং উত্তর দিকস্থ সোপানাবলীর নিকটে হৌজ খাস বা হৌজ আলাইয়ের দক্ষিণে মিঃ ষ্টিফেন

সাহেব বর্ণিত ফিরোজসাহ কলেজের ধ্বংসাবশেষ।

ফিরোজ সাহ তোগলকের রাজত্বকালের উজ্জ্বল আলোক শীঘ্রই অন্তর্হিত হইল। পরবর্ত্তী গিয়াসুদ্দিন (দ্বিতীয়), আবুবেকর এবং নাসিরুদ্দিন এই সম্রাটত্রয়ের রাজত্বকাল ঘোর তমসাবৃত।

প্রবল ব্যাত্যার বিপুল বেগে যেমন সম্মুখস্থ যাবতীয় পদার্থ উড়াইয়া লইয়া যায়, তেমনই তৈমুরলঙ্গের ভীষণ আক্রমণে পরবর্ত্তী মামুদ তোগলকের রাজত্বকাল বিপদগ্রস্ত হইল। অসংখ্য সমৃদ্ধিশালী নগর জনপ্রাণিহীন হইল, জীবন্ত নগরবাসীর পরিবর্ত্তে মৃত শবরাশি চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং লোক-কোলাহলের পরিবর্ত্তে শিবার বিকট চীৎকারে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। মানব সাধারণের শত্রুর আগমনে লোকসমূহ ভীতিবিহ্বল হইয়া নিজের গ্রাম হইতে দূর দূরান্তরে প্রস্থান করিতে লাগিল, এইরূপে যে সমুদয় দেশের মধ্য দিয়া তিনি অভিযানসহ অগ্রসর হইয়াছিলেন তৎসমুদয়ই মরুভূমিতে পরিণত হইল। যে দিল্লী এক সময়ে ভারতীয় নগরীসমূহের অগ্রণী ছিল, তাহা লুন্ঠিত হইল এবং উপর্য্যুপরি পাঁচ দিন পর্য্যন্ত হুতাশনের ক্রীড়া-ভূমিতে পরিণত হইল। এইরূপ আক্রমণ এবং লুণ্ঠন হরিদ্বার পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়াছিল।

এইরূপ চরিত্রসত্বেও তাইমুরলঙ্গের যে সাহিত্যের দিকে আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল না তাহা নহে। লোনি নগরী অবরোধকালে তিনি সৈয়দ, সেখ এবং শিক্ষিত মোল্লাগণের গৃহাদি রক্ষা করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন এবং অভিযান-কালেও তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীর সহবাস করিতেন, ইহাতে তাঁহার বজ্রকঠোর তুর্কী-চরিত্রের মধ্য দিয়া সাহিত্যপ্রবণতার ও বিদ্যোৎসাহিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্বয়ং একজন গ্রন্থকার ছিলেন এবং মালকুজাৎ তাইমুরি নামক একখানি আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন এবং এইরূপ জীবনী লিখিবার প্রবল স্পৃহা বাবর, জাহাঙ্গীর এবং তাঁহার অন্যান্য বংশধরগণের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়।

তাইমুর আত্মজীবনীতে শৈশবের বিদ্যাশিক্ষার বিবরণ বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম সাত বৎসর, তাঁহার পিতা তখন তাঁহাকে একটি বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়া মোল্লা আলি বেগ নামক একজন শিক্ষকের হস্তে তাঁহার শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। মোল্লা সাহেব একটি কাষ্ঠখণ্ডের উপর আরবি অক্ষর সমূহ লিখিয়া শিশু তাইমুরের সম্মুখে ধরিতেন এবং তিনি অতিশয় কৌতুক সহকারে সেই সমস্ত অক্ষরগুলির অবিকল নকল করিতেন।

নয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাইমুর মসজিদে যাইয়া নমাজ পড়িতে শিক্ষা করেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ চেঙ্গিস্ খাঁর সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করিয়াছিলেন। চেঙ্গিস্ খাঁ বুখারার জামি-মসজিদে প্রাপ্ত কোরাণসমূহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং সিন্ধুকগুলিকে (যাহাতে কোরাণসমূহ রক্ষিত হইয়াছিল) তাঁহার অশ্ব-সমূহের জলপাত্ররূপে ব্যবহার করিতেন এবং পণ্ডিত, সৈয়দ ও পুরোহিতগণকে তাঁহার পশুশালায় সহিস ও রক্ষকরূপে পরিণত করিতে জোর জবরদস্তি পর্য্যন্ত করিতেন।

এরূপ কথিত আছে যে, তাইমুরের পুত্র শাহরুখ পারশ্যের সুলতান উলজায়তু খাঁর নিকট হইতে পারস্য ভাষায় মূল জামে-উল-তোয়ারিখ্ পুস্তক খানি প্রাপ্ত হন। গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার প্রবন্ধগুলি নকল করিতে ও বাঁধাইতে প্রায় ৬০,০০০ দীনার ব্যয় করিয়াছিলেন এবং মুসলমান জগতের প্রধান প্রধান সহরে পারশ্য ও আরব্য ভাষায় অনুবাদ প্রচার ও বিতরণ করিতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। শাহ-রুখ কাব্যরসের রসিক ছিলেন। উক্ত পুস্তকের প্রতিলিপি করিতে যত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে তাহা হইতেই তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও বিদ্যোৎ-সাহিতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তাইমুর জীবিত থাকিতে যেমন বিদ্বন্মণ্ডলী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, মৃত্যুর পরেও তাঁহার দেহাবশেষ সেইরূপ উপযুক্ত স্থানেই রক্ষিত হইয়াছে। জাহাঙ্গীর মীর্জ্জার পুত্র এবং তাইমুর বেগের পৌত্র মহম্মদ সুলতান মীর্জ্জা সমরখন্দের প্রস্তরদুর্গের বহির্দ্দেশেই একটি বিদ্যালয় (কলেজ) স্থাপন করেন। সেই স্থানই তাইমুর বেগ এবং সমরখন্দের সিংহাসনে তাহার যত বংশধরগণ রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই কবরভূমি।

সুলতান ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পরে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজদরবার পণ্ডিতশূন্য ছিল। রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনও এদিকে কোন পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারে নাই। দিল্লী ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহ যুদ্ধ ও রক্তপাতের রঙ্গভূমি হইয়াছিল। তাইমুর যে সমস্ত প্রদেশের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন সমস্তই এত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল যে, তাহার পুনঃ সংস্কার সহজ নহে। বস্তুতঃ দিল্লী ও ফিরোজাবাদই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা,
এম্-এ, বি-এল্।

শিল্প-প্রচার

উপাসনা হইতে উদ্ধৃত।

স্বাধীনবৃত্তি জাতীয় উন্নতির সহায়

কর্ম্ম করিতে করিতেই মানুষের শক্তি বৃদ্ধি পায়, অধিকন্তু ঐ কর্ম্মের জন্য যদি সে পর-নির্ভর না হয়, কার্য্যে যদি তাহার স্বাধীনতা থাকে, তাহা হইলে তাহার শক্তির পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার জীবন ধারণের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। বিনা পরিশ্রমে এ জগতে জীবিকার্জ্জন অসম্ভব। জীবিকা-অর্জ্জনের উপায়কে আমরা বৃত্তি বলিয়া থাকি। যাহাদের পরাধীন বৃত্তি, তাহারা কর্ম্মক্ষম হইতে শিখে না, কারণ কার্য্যের ফল হইতে বঞ্চিত হয় বলিয়া তাহাদের অধিক পরিশ্রম করিবার উৎসাহ থাকে না। বাস্তবিক যে বৃত্তি যত অধিক পরিমাণে স্বাধীন, তাহাতে কর্ম্মশক্তির তত অধিক উদ্রেক হয় বলিয়াই অর্থাগমের তত সুবিধা ঘটিয়া থাকে।

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥

ইহা আমাদের অতি প্রচলিত কথা। যাহাদের ভিক্ষাবৃত্তি, তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। কাজেই লক্ষ্মী তাহাদিগকে কৃপা করেন না। ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা রাজসেবা অথবা চাকরীতে মানুষ অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। ভিক্ষাবৃত্তিতে সে সম্পূর্ণ পরনির্ভর, কিন্তু চাকরীজীবী হইলে সে তাহার পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফললাভ না করিলেও কিছু ফল পাইয়া থাকে। কৃষিকার্য্য, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই মনুষ্যের কর্ম্ম-শক্তির আমরা চরম বিকাশ দেখিতে পাই। যে এই সকল ক্ষেত্রে যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করিবে, সে সেই পরিমাণ লাভ হইতে কখনই বঞ্চিত হয় না। উপরন্তু স্বাবলম্বন হেতু কতকগুলি নৈতিক গুণও বিশেষ পুরিস্ফুট হয়। চিন্তার স্বাধীনতা সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রেই বিশেষ কল্যাণপ্রদ। স্বাধীন জীবিকা চিন্তার স্বাধীনতার পরিপোষক। বাস্তবিক স্বাধীন অন্নসংস্থান একদিকে যেরূপ কর্ম্মশক্তি-বিকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়, অপরদিকে মনুষ্যের চিন্তাস্রোতকে বিভিন্নমুখে প্রবাহিত করাইয়া উহাকে স্বচ্ছ এবং প্রবল করিয়া তুলে। কোন নির্দ্দিষ্ট খাতে যদি চিন্তাস্রোত ক্রমাগতই প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে উহা অচিরেই আবিল পঙ্কিল হইয়া উঠে। এইরূপে পরাধীন জীবিকা চিরকালই কর্ম্ম ও চিন্তা-বিকাশের প্রধান অন্তরায়। জীবিকা-অর্জ্জনে যে সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা আছে, সেখানে নিত্য নূতন অর্থাগমের উপায় এবং অর্থোৎপাদন-প্রণালী আবিষ্কৃত হয়, প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া সে সমাজ অতি সহজেই তাহার অভাব মোচন করিতে সমর্থ হয়। চিন্তাজগতেও সেখানে নূতন নূতন সত্যের আবিষ্কার হইয়া থাকে,—সমাজের সকল দিকেই উন্নতি হয়।

"স্বদেশী" আন্দোলন ও স্বাধীন-জীবিকা

আমরা চাকরীজীবী; কিন্তু চাকরীজীবী হইলেও আমাদের দেশে স্বাধীন অন্ন-সংস্থানের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। চারিদিকেই শিল্প এবং ব্যবসায়-শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। দেশের নানা স্থানে বিজ্ঞানশিক্ষা-বিস্তারের জন্য বিদেশ-প্রেরণ-পরিষৎ স্থাপিত হইতেছে। রাজা, মহারাজা, জমিদারেরাও বিদেশে বিজ্ঞান ও ব্যবসায়-শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াছেন। বহু ছাত্র অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া বিদেশের কারখানায় শিল্পবিদ্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষা করিতেছে। বহু ছাত্র ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, অনেকে দেশে প্রত্যাগমন করিয়া ব্যবসায়েও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছে। ১৯০৫ সাল হইতে এই কয় বৎসরের মধ্যে যে কতগুলি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু দেশে যে বিপুল ব্যবসায়-আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল, তাহার হঠাৎ প্রতিরোধ দেখা গিয়াছে। অনেকগুলি ব্যবসায়ই "ফেল" করিয়াছে, ব্যবসায়-জগতে আবার অবসাদ দেখা দিয়াছে। বিদেশীয় পণ্যে আমাদের বাজার আবার ভরিয়া গিয়াছে। দেশে কয়েক বৎসর সুবাতাস বহিয়াছিল, এখন বাতাস বিপরীত দিকে বহিতেছে। ব্যবসায়-জগতে আমাদের এই আকস্মিক উত্থান এবং পতনের কারণ কি? এ প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক।

"স্বদেশী"র অবনতির কারণ

আমাদের বৈষয়িক জীবনের এই কয় বৎসরের ইতিহাস স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা আমাদের দোষ দেখিতে পাইব। আমরা ভাবিয়াছিলাম, বিদেশের যে কোন কারখানায় যে কোন শিল্প বা ব্যবসায়ে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিলেই—যে কোন ব্যক্তি এ দেশে অতি সহজে কলকারখানা চালাইতে পারিবে। দেশে কোন্ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, কোন্ ব্যবসায় অতি সহজেই বিদেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও লাভজনক হইবে তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি নাই। দেশের প্রকৃত অভাবের দিকে মনোযোগ না দিয়া আমরা কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম। উপরন্তু বিদেশে শিক্ষিত ব্যক্তির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অত্যধিক পরিমাণে ছিল। বিদেশের কারখানায় দুই এক বৎসর শিক্ষানবিশরূপে থাকিয়া যে কোন ব্যক্তি এখানে কারখানা স্থাপন করিয়া অতি সহজেই এখানকার বাজার হস্তগত করিবে, ইহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। বিদেশ হইতে একজন যে কোন শিল্প বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে কাজে লাগাইবার জন্য আমরা তখনই বহু অর্থব্যয়ে বিরাট কলকারখানার আয়োজন করিয়া ফেলিলাম। আমরা যদি তাহাকে কয়েক বৎসর দেশের বিভিন্নস্থানে শিল্পবাণিজ্যকেন্দ্রে ভ্রমণ করিবার সুযোগ প্রদান করিতাম, বিভিন্ন বাজারের দালাল, পাইকার এবং শ্রমজীবিগণের সহিত পরিচয়-লাভের অবসর দিতাম, তাহা হইলে আমাদের অনেক অর্থব্যয় সার্থক হইত। দেশের কোন্ স্থানে কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিলে যাতায়াতের সুবিধাহেতু দ্রব্যবিক্রয়ের বিশেষ সুবিধা হইবে, দেশীয় শিল্পী শ্রমজীবীর শক্তি এবং কর্ম্মকুশলতা ব্যবহার করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে, দ্রব্যপ্রস্তুতকরণের উপাদান-সামগ্রী অতি সুলভ মূল্যে ক্রয় করা যাইবে,—এ সকল বিষয়ের প্রতি আমাদের সবিশেষ দৃষ্টি ছিল না। কোন স্থানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বে সে স্থানের সুবিধা অসুবিধাগুলি বিশদভাবে দেশে আলোচিত হয় নাই। এ জন্য কারখানা স্থাপন করিবার পর দ্রব্যোৎপাদন এবং দ্রব্য-বিক্রয়ের অসুবিধা বোধ হওয়াতে ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থের অযথা অপব্যয় হইয়াছে। তাহার পর আমাদের আর একটি দোষ হইয়াছে, আমরা অবস্থার মত ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। আমাদের মূলধনের পরিমাণ অল্প, আমাদের শিল্পীদের বংশপরম্পরা-লব্ধ শিল্পনৈপুণ্য থাকিলেও আমরা তাহাদিগকে কারখানার কার্য্যে না লাগাইয়া অপটু শ্রমজীবিগণকে লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, অথচ আমরা আশা করি বিলাতের বড় বড় কারখানার মত অতি সুন্দর মনোরম দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিব। দৃশ্য-মনোহর দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা অপেক্ষা সাধারণ-ব্যবহৃত সুলভ দ্রব্য প্রস্তুত করা সহজ। লৌহ ইস্পাতের কারখানা স্থাপন না করিয়া ছুরী, কাঁচী, কব্জা, পেরেক প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার কারখানা, বড় বড় কাঁচের কারখানা না করিয়া ভাঙ্গা কাচের জিনিষ হইতে বোতল চুড়ী প্রভৃতির কারখানা, কাগজের পরিবর্ত্তে কার্ডবোর্ড প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করিলে ফেল হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু আমরা আশার বশবর্ত্তী হইয়া সহজসাধ্য

কাজ ছাড়িয়া কঠিন কাজে হাত দিয়াছি, সুতরাং আমাদের পরিণামে ঠকিতে হইয়াছে,—

'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ
উদ্বাহুরিব বামনঃ।'

অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা আবশ্যক

আপাতত বড় বড় কারখানা খুলিবার জন্য প্রভূত অর্থ এবং শ্রমজীবিশক্তি ব্যয় না করিয়া যাহাতে অল্প মূলধনে স্বাধীন জীবিকার উপায় হয়, আমাদের তাহা এখন দেখা আবশ্যক।

(ক) ক্রয়-বিক্রয়—বাণিজ্য

আমাদের আধুনিক অবস্থায় দালাল বণিক প্রভৃতির কার্য্য সম্পন্ন করিয়া জীবিকার্জ্জন করা শিক্ষিত সমাজের পক্ষে সহজসাধ্য এবং আশুফলপ্রসূ হইবে। বাঙ্গালাদেশে প্রায় ৩০ কোটী টাকার পাট ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে, ইহাতে বাঙ্গালী যে সম্পূর্ণ উদাসীন তাহা অতীব দুঃখের বিষয়। পাট ক্রয় বিক্রয় করিয়া বিদেশী দালাল বণিকগণ বৎসর বৎসর ৩০ লক্ষেরও অধিক টাকা লাভ করিয়া থাকে। বিদেশী বণিকগণ আমাদের দেশে আসিয়া আমাদেরই কৃষকগণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত শস্য ক্রয় বিক্রয় করিয়া ধনী হইতেছে। আর আমরা এক মুঠা অন্নের জন্য চাকরী খুঁজিতেছি। বণিকবৃত্তিতে ব্যবসায়সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান হইলেও বেশ চলে, কোন বিশিষ্ট ব্যবসায় সম্বন্ধে ব্যবহারিক বিদ্যার আবশ্যকতা নাই। অর্থ ব্যয় করিয়া আমেরিকা ও জর্ম্মাণীর শিল্প-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবার প্রয়োজন নাই। এ দেশেরই প্রধান প্রধান হাট-বাজারে ভ্রমণ করিয়া ব্যবসায় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারে। অধিক মূলধনেরও আবশ্যকতা নাই। অল্প টাকায় আরম্ভ করিয়া ব্যবসায় খুব বাড়িয়া উঠিতে পারে। বাস্তবিক বড় বড় কারখানা খুলিয়া দ্রব্যোৎপাদন করা অপেক্ষা দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিয়া আমাদের দেশে আধুনিক কালে অধিক লাভের সম্ভাবনা আছে।

(খ) এবং ক্ষুদ্র কারখানার উপযোগিতা

কেবল বাণিজ্য নহে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ও বড় বড় কারখানায় দ্রব্যোৎপাদন অপেক্ষা আধুনিক কালে আমাদের অধিক উপযোগী এবং লাভজনক। কলিকাতার বড় বড় পাটের কল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ছাড়িয়া দিলে অধিকাংশ কারখানাই ক্ষুদ্র আয়োজনে পরিচালিত হয় এবং অনেকগুলি বাঙ্গালী মধ্যবিত্তশ্রেণী কর্ত্তৃক পরিচালিত ও লাভজনক হইয়াছে। ক্ষুদ্র কারখানাগুলির মধ্যে ৩৬৭টি কারখানা ভারতবাসী, ১৭৯টি ইংরাজ, ৪টি ইংরাজ ও ভারতবাসী, এবং ৭টি চীনা কর্ত্তৃক পরিচালিত। ব্যবসায়ের অনেক বিভাগেই ভারতবাসীর কেবল প্রাধান্য নহে, প্রভুত্ব রহিয়াছে। দড়ি, কাঠ, টাইপ, লৌহ, পিত্তল, তেল, সাবান, ময়দা, চিনি, ছাতা, সুরকী প্রভৃতির কারখানার প্রায় সবগুলিই ভারতবাসীর হস্তগত। ছাপাখানা, কেমিকাল ওয়ার্কস, পাট-প্রেস প্রভৃতি আমাদেরই একচেটিয়া। বাস্তবিক আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে ধীরেধীরে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপন করিতেছে, তাহা আমরা এত দিন চিন্তা করি নাই। এই বৎসরের কলিকাতার গণনায় এ বিষয় সম্বন্ধে আমাদের

চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে। কলিকাতায় মোট ১৫০টি যৌথ-কারবার এবং কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত আছে; ইহাদের মধ্যে কেবল ৭টি কোম্পানীর মধ্যে ভারতবাসী ডিরেক্টর আছে, বাকি সবগুলিরই সাহেব ডিরেক্টর। সুতরাং যৌথ-কারবার দেশে বিশেষ প্রচলিত হয় নাই, ইহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু ব্যক্তিগত কারবারের মধ্যে ৩৬০টি কারখানা ভারতবাসী এবং ৮৫টি ইংরাজেরা পরিচালনা করিতেছে।

বাঙ্গালাদেশে ক্ষুদ্র কারখানার প্রাধান্য

দেশে শিল্প-ব্যবসায়ে আন্দোলনের প্রারম্ভে ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠাই স্বাভাবিক এবং অধিক ফলপ্রদ। প্রথমতঃ ব্যবসায়-ক্ষেত্রে আপাততঃ অল্প পরিমাণে মূলধন পাওয়া যাইবে, সুতরাং কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করিতে যৌথভাবে মূলধন-সংগ্রহের চেষ্টা বিশেষ ফল-প্রদ হইবে না। দ্বিতীয়তঃ কোম্পানীর দ্বারা ব্যবসায় চালিত হইলে দায়িত্ব-বোধ লঘু হয়, এক জনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ে যেরূপ শৃঙ্খলা এবং সুবন্দোবস্ত দেখা যায়, কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিচালিত ব্যবসায়ে আমাদের দেশে সেরূপ দেখা যায় নাই। সুতরাং যতদিন আমাদের ব্যবসায়িগণ আপনাদের কর্ম্মক্ষেত্রে সমবেত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে শিক্ষা না করিবে, ততদিন ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায়-প্রচলনই শ্রেয়স্কর। কলিকাতার ক্ষুদ্র কারখানাগুলি ব্যক্তিগত দায়িত্ব-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ঐগুলি বিশেষ লাভজনক হইয়াছে। ব্যবসায়ের আনুমানিক ব্যয় অধিক হয় না, বন্দোবস্ত সুচারু হওয়াতে লাভ হইয়া থাকে। এইরূপে মধ্যবিত্ত লোকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে আপনাদের অল্প মূলধন নিয়োজিত করিয়া ধনী হয়। মধ্যবিত্তদিগের ধনবৃদ্ধি সমাজের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলপ্রদ। ধনীদের বিলাসিতা সৌখীনতা আছে, কিন্তু মধ্যবিত্তদের স্বোপা-র্জ্জিত অর্থের অধিক সঞ্চয় হয় না। উপরন্তু মধ্যবিত্তদের ভাবুকতা আছে, তাহারা সমগ্র সমাজের অভাব-আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে অধিক সক্ষম, সুতরাং সমাজের উন্নতিসাধনের জন্য তাহারা অকাতরে অর্থ সাহায্য করিতে পারে। বাস্তবিক আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বাধীন ব্যবসায় ক্ষেত্রে আরও অধিক পরিমাণে অর্থ নিয়োজিত করিতে আরম্ভ করিলে, সমগ্র সমাজে চিন্তা এবং কর্ম্মের স্বাধীনতা দেখা যাইবে; এবং দেশে এমন একটা চিন্তার আন্দোলন আসিয়া উপস্থিত হইবে, যাহা আমরা এখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না। মধ্যবিত্তেরাই চিরকাল সমাজের নেতা। জীবিকার্জ্জনে তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিলে, সমাজের চিন্তা এবং কর্ম্মশক্তির পরিমাণ যে বৃদ্ধি পাইবে তাহার ইয়ত্তা নাই।

কলিকাতার ব্যবসায়জগতে মধ্যবিত্তদের মধ্যে যাহারা স্বাধীনভাবে ক্ষুদ্র কারখানাগুলি পরিচালনা করিতেছে, তাহাদের তালিকা দেওয়া হইল।

ব্রাহ্মণ	৬১
কায়স্থ	৬৫
তিলী	২৮
সদ্গোপ	২৮
কলু	২০
বৈদ্য	১৬
চাষীকৈবর্ত্ত	১২
সুবর্ণবণিক	১০

মাড়োয়ারীদের মধ্যে ১৯টি এবং সেখদিগের মধ্যে ১২টি কারখানার স্বত্বাধিকারী বর্ত্তমান। কলিকাতায় যেভাবে মধ্যবিত্তশ্রেণী কারখানা প্রভৃতির সত্বাধিকারী হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিতেছে, সেরূপ দেশের সর্ব্বত্রই বাঞ্ছনীয়।

মধ্যবিত্তশ্রেণী কর্ত্তৃক পরিচালিত কুটীরশিল্প ও ক্ষুদ্র কারখানা

আমাদের দেশে এখন সাধারণতঃ দুই প্রকার শিল্পপদ্ধতি দেখিতে পাই—(ক) কুটীর-শিল্প এবং (খ) কারখানা। কুটীর-শিল্পে শিল্পী সাধারণতঃ আপনার পরিবারবর্গের সাহায্যে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। যেখানে শিল্পী কয়েকজন মজুর নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে মজুরী দেয় এবং তাহাদের নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া লয়, আমরা তাহাকে কারখানা বলিয়া থাকি। কুটীর-শিল্পকে আমরা পারিবারিক শিল্প বলিতে পারি, কিন্তু কারখানা-শিল্পীরা পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। কুটীর-শিল্পে শিল্পী আপনার মূলধন যোগাইয়া থাকে। কারখানায় ওস্তাদ অথবা মিস্ত্রী শিল্পের সমস্ত মূলধন দেয়, শিল্পীরা তাহার মজুর মাত্র। আমাদের দেশে প্রত্যেক সহরেই আমরা কারখানা দেখিতে পাই। বিশেষতঃ যে সমস্ত শিল্পে মূলধন অধিক পরিমাণে আবশ্যক, যেখানে বহুমূল্য যন্ত্রপাতী ক্রয় করিতে হয়, অথবা দ্রব্যের কাটতি খুব কম, বড়লোকের পছন্দের উপরই যে শিল্প প্রতিষ্ঠিত, সেখানে কারখানাই দৃষ্টি-গোচর হয়। শিল্পীদের মধ্যে একজন ধনী হইয়া কারখানা প্রতিষ্ঠিত করে এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শিল্পিগণকে আপনার কারখানায় নিযুক্ত করে। সোণা, রূপা, কাঁসা, উৎকৃষ্ট কাঠ এবং হাতীর দাঁতের কাজ সহরের কারখানাতেই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কলিকাতার কাঁসারীপাড়া, চিৎপুর, ভবানীপুর প্রভৃতি স্থানের কারখানার কাজ বিখ্যাত। আধুনিক কারখানার ওস্তাদ অথবা বড় মিস্ত্রী দ্রব্যপ্রস্তুতকরণের উপকরণ-সামগ্রী ও যন্ত্রপাতী ক্রয় করিয়া থাকে এবং দ্রব্যসমূহের বিক্রয়েরও ব্যবস্থা করে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি শিল্পশিক্ষার আয়োজন হয়, তাহা হইলে কারখানা-শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে। বাজারে কি প্রকার দ্রব্যের কাটতি হইবে, এ সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিক জ্ঞান থাকে, সুতরাং দ্রব্যবিক্রয়ের অধিক সুবিধা হইবে, নূতন যন্ত্র এবং প্রক্রিয়া প্রভৃতিও অতি সহজেই প্রচলিত হইবে। বাস্তবিক বিভিন্ন সহরে যেখানে দ্রব্যের অধিক কাটতি আছে, সেখানকার কারখানাগুলি যদি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যদি বিভিন্ন শিল্পের কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া তাহাদের মূলধন নিযুক্ত করে এবং শিল্পিগণের বিদ্যাচাতুরী নিয়োগ করে, তাহা হইলে কেবল শিল্পসমূহের যে উন্নতি হয় তাহা নহে, তাহাদের নিজেদেরও স্বাধীন অন্নসংস্থানেরও উপায় হইয়া থাকে। কারখানা-শিল্পগুলি মধ্যবিত্তদের হস্তগত হইলে যেরূপ সমাজের বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা, কুটীরশিল্পগুলিতেও তাহাদের প্রভাব বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

কলের শক্তির সহিত শিল্পের প্রতি-যোগিতা—ব্যবসায়-জগতের কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পের প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী

আমাদের দেশে পল্লীগ্রামসমূহে কুটীর-শিল্পগুলি যে একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। দ্রব্যোৎপাদনে কলের শক্তি অধিক স্থলে বিশেষ সুবিধা প্রদান করিলেও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে শিল্পীকে কলকারখানার নিকট হার মানিতে হইবে তাহা নহে। যে ক্ষেত্রে একই প্রকার দ্রব্য অনেক পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হইবে, সেখানে মনুষ্য-শক্তি তড়িৎ অথবা ষ্টীম-এঞ্জিনের শক্তির নিকট হার মানিবে। কিন্তু যেখানে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হয়, সেখানে শিল্পীর কর্ম্মকুশলতাকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। দ্রব্য ক্রয়-ব্যাপারে যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন রুচি প্রকটিত হয়, সে ক্ষেত্রে দ্রব্যোৎপাদনে শিল্পীর বিদ্যা এবং চাতুরী কলের শক্তি অপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হইবে। বাস্তবিক আমাদের দেশে যতদিন রুচির বৈচিত্র্য আছে, ততদিন শিল্পীর ব্যবসা কখনও মন্দা হইবে না। উপরন্তু পল্লীগ্রামে মূলধন খুব অল্প পরিমাণে পাওয়া যায় এবং কাটতি অধিক হয় না; সুতরাং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ই সেখানে লাভজনক হয়। অল্প মূলধন বৎসরে তিন চারিবার ব্যবসায়ে ফিরিয়া আসিলে গড়ে লাভ অধিক হয়। বহুল পরিমাণে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই, যে পরিমাণ দ্রব্য প্রস্তুত হয় সেই পরিমাণই বাজারে কাটে।

পাশ্চাত্য ব্যবসায়-জগৎ হইতে ইহার উদাহরণ

বাস্তবিক এই সকল কারণে ইউরোপেও কুটীরশিল্প এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায় এখনও বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস ইউরোপ বড় বড় কারখানা ফ্যাক্টরী স্থাপন করিয়াই বৈষয়িক উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু ইউরোপে ক্ষুদ্র ব্যবসায় বড় বড় কারখানার সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় সক্ষম হইয়া এখনও যে উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহা অনেকের ধারণা নাই। জর্ম্মাণিতে ১৭৩ ক্রোর শ্রমজীবিদের মধ্যে ৫'৪ ক্রোর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। ইংলণ্ডে বড় বড় কারখানা, যেখানে ১০০০এর অধিক লোক কাজ করে, শ্রমজীবিদের সংখ্যা, ছোট ব্যবসায়ে যে সকল লোক কাজ করে, তাহাদের সংখ্যার সমান। ইতালী, বেলজিয়াম, সুইজারলণ্ড প্রভৃতি দেশে কুটীরশিল্প এখনও বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। সুতরাং বড় কারখানা বা ফ্যাক্টরীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষুদ্র ব্যবসায় অথবা কুটীরশিল্প যে সমূলে বিনষ্ট হইতেছে তাহা পাশ্চাত্য বৈষয়িক জীবন হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। বস্তুতঃ পাশ্চাত্যজগতে একদিকে কল-কারখানার যেরূপ বিরাট আয়োজন, অপরদিকে ক্ষুদ্র শিল্পব্যবসায়েরও সেরূপ বিপুল বিস্তৃতি।

কুটীরশিল্পের উন্নতিসাধন-প্রণালী—(ক) বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং প্রক্রিয়া অবলম্বন

আধুনিক কালে কুটীরশিল্পসমূহ যে কারখানার প্রতিযোগিতায় নিশ্চয়ই সমূলে

বিনষ্ট হইবে, পাশ্চাত্যজগতের বৈষয়িক জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা বোধ হয় না। কিন্তু নানা উপায়ে কুটীরশিল্পগুলির উন্নতিসাধন করিতে না পারিলে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখা সুকঠিন। পাশ্চাত্যজগৎ অনেক উপায়ে কুটীরশিল্পগুলির উন্নতিসাধন করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, নূতন নূতন যন্ত্রপাতী এবং প্রক্রিয়ার প্রচলন প্রভৃতি শিল্প-গুলির নূতন জীবন প্রদান করিয়াছে। জর্ম্মাণীর প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানবিৎ অধ্যাপক সোম্বার্ট বলিয়াছেন যে, ১৯০৭ সালের লোক-গণনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে জর্ম্মাণীতে পুরাতন গৃহ-শিল্পসমূহের মধ্যে যে গুলি নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারিতেছে না, সে গুলির ক্রমাবনতি হইতেছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অনেক গৃহ-শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন ব্যতীত আর এক উপায়ে পাশ্চাত্য জগতের গৃহ-শিল্পগুলি নবজীবন লাভ করিয়াছে,—তাহার নাম সমবায়।

(খ) শিল্পে সমবায়-পদ্ধতি-প্রচলন

বাইফেজেল কৃষিকার্য্যে সমবায় প্রচলন করিয়া পাশ্চাত্য কৃষক-সমাজে এক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিলেন। হারস্থল্জ্ জোলিট্জ্ শিল্পী এবং শ্রমজীবিগণের মধ্যে যৌথকারবার প্রচলন করিয়া শিল্পিগণের মধ্যে সেইরূপ আর একটি আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া তাহাদের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন। শিল্পিগণের মধ্যে সমবায়ের উদ্দেশ্য মোটামুটি এই,—শিল্পিগণ মূলধন-অভাবে পাইকার অথবা ধনীর নিকট দ্রব্য-প্রস্তুতকরণের উপকরণ-সামগ্রী লইতে বাধ্য হয়। অবশেষে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া পাইকার অথবা ধনীকে উহা প্রদান করে এবং তাহাদের নিকট মজুরী পাইয়া থাকে। অনেক সময়ে ধনী এবং পাইকার শিল্পীকে অত্যল্প মজুরী দিয়া লভ্যের অধিকাংশই আত্মসাৎ করে। শিল্পিগণের মূলধন নাই বলিয়াই তাহাদের দারিদ্র্যের সীমা থাকে না। এ স্থলে যদি কয়েকজন শিল্পী সমবেত হইয়া মূলধন সংগ্রহ করে এবং ঐ মূলধনে উপকরণ প্রভৃতি ক্রয় করিয়া দ্রব্য প্রস্তুত করে এবং অবশেষে নিজেরাই দ্রব্যবিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে, তাহা হইলে দ্রব্যোৎপাদনের ন্যায্য লাভ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইতে পারে না। ইহাকেই শিল্পে সমবায়-পদ্ধতি বলা হয়। শিল্পে সমবায় এদেশে নূতন নহে। আমাদের সমাজে অনেক স্থলেই সমবেত ভাবে শিল্প-কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। কাশীর বিখ্যাত বারাণসী সাড়ী প্রভৃতি সমবেত প্রণালীতেই প্রস্তুত হয়। তন্তুবায়গণ সম্মিলিত হইয়া রেশম ইত্যাদি ক্রয় করে এবং বস্ত্র বয়ন করিয়া অবশেষে তাহা-দিগেরই নিযুক্ত পাইকার দ্বারা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। কাশীর মদনপুরা পল্লীতে যাইয়া অনেকে ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। পশ্চিম অঞ্চলে গভর্ণমেণ্ট তন্তুবায়, কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতির মধ্যে অনেকগুলি সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেগুলিরও বিশেষ উন্নতি হইতে দেখা গিয়াছে।

শিল্প-প্রচারকের আবশ্যকতা—তাঁহার কর্ম্মপ্রণালী

পল্লীগ্রামের অসংখ্য শিল্পী এবং শ্রমজীবি-গণকে যদি কঠোর দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করিতে

হয়, তাহা হইলে সর্ব্বত্রই এই সমবায়-পদ্ধতির প্রচলন আবশ্যক। সমবায়-পদ্ধতি যাহাতে দেশময় প্রচলিত হয় তাহার জন্য প্রচার আবশ্যক। মধ্যবিত্তদিগকেই এই প্রচার-কার্য্য করিতে হইবে। উপরন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীর পক্ষে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের সহায় হইবে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা দেশে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাপ্রচারক, স্বাস্থ্যপ্রচারক দেখা দিয়াছেন। পল্লীগ্রামের দুঃখ দৈন্য ক্লেশ নিবারণ করিবার জন্য তাঁহারা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি-সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। শিক্ষাপ্রচারক এবং স্বাস্থ্য-প্রচারকের মত পরহিতব্রত শিল্প-ও-ব্যবসায়-প্রচারকও এখন দেশে আবশ্যক। গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া যেখানে শিল্পীরা তাহাদের বিরল কুটীরে বসিয়া সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমের পর মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে, সেখানে যাইয়া তাহাদিগের নিকট আশার কথা প্রচারিত করিতে হইবে। জগতের বিভিন্ন স্থানে কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া সেখানকার শিল্পিগণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতেছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে; জর্ম্মাণী, ইতালী, হল্যাণ্ড এবং জাপান প্রভৃতি দেশের শিল্প-জগতের বিচিত্র খবর আমাদের শিল্পিগণের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। আমাদের শিল্পিগণকে জানাইতে হইবে যে তাহাদেরই মত কুটীরে বসিয়া এই সমস্ত দেশের শিল্পিগণ নানাবিধ যন্ত্রাদির সাহায্যে এবং নূতন নূতন প্রক্রিয়া দ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট দ্রব্যসমূহ প্রস্তুত করিতেছে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-ব্যবহার এবং প্রক্রিয়া-প্রচলন যাহাতে সহজসাধ্য হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঋণ-ভারে জর্জ্জরিত শিল্পিগণের নিকট সমবায়-পদ্ধতির উপকারিতা বুঝাইয়া তাহাদের ভগ্নহৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার করিতে হইবে। সমবায়-প্রণালী অবলম্বন করিয়া জর্ম্মাণী, বেলজিয়াম্, ইতালী, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের শিল্পিগণ তাহাদের অবস্থার কি বিপুল উন্নতি সাধন করিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া যৌথ-ঋণ-ক্রয়-সমিতি এবং দ্রব্য-ভাণ্ডারের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায় শিল্পশিক্ষার এই বিপুল আন্দোলনের নেতা হইবেন। শিল্পপ্রচার-কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণ নূতন নূতন স্বাধীন জীবিকা-র্জ্জনের উপায় আবিষ্কার করিবেন। এই উপায়ে একই সঙ্গে শিল্পপ্রচার এবং স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা চলিতে থাকিবে।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অবনতির কারণ—আমাদের চিত্তসম্মোহন

দেশে শিল্পপ্রচার এবং স্বাধীন জীবিকা-র্জ্জনের উদ্যোগ হইবার পূর্ব্বে আমাদের বৈষয়িক জীবনে অ-স্বশক্তির অনুভূতি হওয়া আবশ্যক। আমাদের সমাজে সাহিত্য, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতির ভিতর দিয়া চিত্তসম্মোহন এবং পরানুকরণের কুফল মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে আমাদের চিত্তসম্মোহন সর্ব্বাধিক পরিমাণেই দেখা গিয়াছে। এ কারণে ধর্ম্ম, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমাদের সমাজ কথঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিয়া ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অনেকটা নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে; এই চিত্তসম্মোহন যতদিন না সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়, ততদিন আমাদের শিল্পব্যবসায়ের উন্নতি একেবারেই অসম্ভব। আমাদের মধ্যে অনেকেরই এখনও ধারণা

আছে যে, ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, ভারতবাসী শিল্পবাণিজ্যের উপর নির্ভর না করিয়া কৃষিজীবী হইয়া সুখী হইবে, শিল্পব্যবসায়-প্রতিষ্ঠা এ দেশে অসম্ভব, কারণ তাঁহারা উদাহরণ দিয়া বলেন লোহাকে গড়িয়া পিটিয়া কখনও কেহ সোণা করিতে পারিবে না। সুতরাং শিল্পব্যবসায়-প্রবর্ত্তনের জন্য সমস্ত চেষ্টা-উদ্যোগ যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জ ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব হেতু যে আমাদের দেশে শিল্পব্যবসায় কখনই উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দেয় না। ইতিহাস বলে যে, আমাদের শিল্পিগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত দ্রব্যাদি পাশ্চাত্য জগতে রোম এবং পূর্ব্ব জগতে চীন, জাপান এবং ভারতীয় সাগরের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণের নিত্য ব্যবহার্য্য ছিল। ভারতবর্ষ কেবল কৃষির জন্য যে ধনশালী হইয়া উঠিয়াছিল তাহা নহে, তাহার শিল্পজাত সামগ্রী পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশ প্রভূত অর্থ দিয়া ক্রয় করিত। এমন কি এক সময়ে রোম নগরীর বিপুল অর্থ ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী হেতু নিঃশেষিত হইয়া যাইবার আশঙ্কা হইয়াছিল বলিয়া প্লিনি প্রমুখ রোমীয় স্বদেশসেবকগণ ভারতীয় দ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইন পাশ করাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সকল বিষয়েই ভারতবাসীরা উন্নতি লাভ করিয়াছিল বলিয়াই ভারতবর্ষে তদানীন্তন কালে সভ্যজগতের সমস্ত অর্থ আসিয়া সঞ্চিত হইত। সুতরাং আমাদের দেশে শিল্পব্যবসায়-প্রতিষ্ঠা প্রকৃতির বিরুদ্ধ আয়োজন এবং আমাদিগকে চিরকালই বিদেশী পণ্যের দ্বারা নিত্য অভাব মোচন করিতে হইবে, এ কথা স্বীকার করা যায় না। এ কথা আমাদের চিত্ত-সম্মোহনের একটি উদাহরণ মাত্র। আজকাল অনেকেই এই ধারণার ভুল বেশ বুঝিয়াছেন এবং দেশময় শিল্পব্যবসায়ের বিপুল আয়োজনের ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা এ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী, তাঁহারাও যে চিত্তসম্মোহনের ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত তাহাও নহে। বিদেশের ফ্যাক্টরী কলকারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের কুটীরশিল্পগুলিকে বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া তাঁহারা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে, এ দেশের কুটীরশিল্পগুলি একেবারেই সেকেলে, আধুনিক বৈষয়িক জীবন-সংগ্রামের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। সুতরাং তাঁহারা বলেন এগুলি রক্ষা করিতে গেলে জাতীয় শক্তির অপব্যয় হইবে। কুটীরশিল্পগুলির বিনাশ একেবারে অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া তাঁহারা সকল প্রকার দ্রব্যোৎপাদনের জন্য কারখানা-প্রতিষ্ঠা আমাদের বৈষয়িক উন্নতির একমাত্র সোপান মনে করেন। পাশ্চাত্যজগৎ কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া পৃথিবীর সমস্ত হাটবাজার করায়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে, অতএব আমাদিগকেও কল-কারখানার বিপুল আয়োজন করিতে হইবে, নচেৎ আমাদিগের রক্ষা নাই—এই ধারণার মূল আমাদের পরানুকরণের প্রবৃত্তি।

অনুচীকির্ষা এবং ব্যবসায়-ক্ষেত্রে জাতীয় আদর্শের লোপসাধন

বহু বৎসরের ধীর ক্রমবিকাশের ফলে পাশ্চাত্যজগতের বৈষয়িক জীবন বিপুল শক্তি

সঞ্চয় করিয়া আধুনিক কালে কল-কারখানা-গুলিকে দ্রব্যোৎপাদনের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, আমরা মনে করিতেছি আমরাও পাশ্চাত্য সভ্যতার দুই একটা বুলী শিখিয়াই উহার ভিতর দিয়া অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত যে প্রবল শক্তির প্রক্রিয়া চলিতেছে তাহারও ভাগ লইতে সমর্থ হইয়াছি। বড় লোকের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আমরা তাহার মনুষ্যত্বটুকুও পাইলাম মনে করিয়া গৌরব অনুভব করিতেছি। জাতীয় শক্তি যে জাতীয় সাধনার ফল তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। শুধু তাহা নহে, আমাদের চিত্তসম্মোহন এতদূর হইয়াছে, পাশ্চাত্যজগতের সাধনা সফল হইয়াছে কি না তাহার দিকে আমাদের দৃক্‌পাত নাই। পাশ্চাত্য বৈষয়িক অনুষ্ঠান-গুলি সেখানকার সমাজে কি যে চির অশান্তি কলহ আনিয়া দিয়াছে তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। ধনীদিগের সহিত শ্রমজীবী সমাজের সংঘর্ষ পাশ্চাত্যজগতে এক ভয়ঙ্কর বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে, তাহা আমরা মোহান্ধ হইয়া দেখিতে পাই না। চিত্তসম্মোহনের ফলে আমরা বিদেশীয় অনুষ্ঠানগুলির গুণ ভিন্ন দোষ দেখি না এবং স্বকীয় বৈষয়িক অনুষ্ঠান-গুলিতে অবজ্ঞা অবিচার করিতেছি। আমাদের পারিবারিক শিল্পগুলি আমাদের শিল্পিগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সহায় হইয়াছে এবং গৃহকেই জীবিকার্জ্জনের ক্ষেত্র করিয়া দৈনন্দিন কর্ম্মকে কিরূপ সুন্দর ও শান্তিদায়ক করিয়া তুলিয়াছে তাহা না ভাবিয়া আমরা ইহাদের বিনাশসাধনের পথ মুক্ত করিয়া দিতেছি। আমাদের আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্মজীবনের আদর্শ-গুলি আমাদের শিল্পকলাতে পরিস্ফুট হইয়া বৈষয়িক ও সামাজিক জীবনে প্রেম ও ভাবুকতা আনিয়া দিয়াছে তাহা অনুভব না করিয়া আমরা দৃশ্যমনোহর বিদেশী পণ্যের লোভে দেশীয় শিল্পকলাকে বিসর্জ্জন দিতেছি। আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করিয়া, ব্যক্তিজীবনের সহিত সমাজ-জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সমাজে কিরূপ শান্তি-সদ্ভাবের স্রোত প্রবাহিত করাইয়াছে, এবং সামাজিক জীবনে দারিদ্র্যের কঠোরতার মধ্যেও একটা সহজ সরল ত্যাগের সুরকে জাগাইয়া রাখিয়াছে, তাহা আমরা জন্মের মত ভুলিতে বসিয়াছি। দেশীয় বিচিত্র বৈষয়িক অনুষ্ঠানগুলি যতদিন নবজীবন লাভ করিয়া নূতন অবস্থার উপযোগী হইয়া বিকাশলাভ না করে, ততদিন আমাদের বৈষয়িক উন্নতি অসম্ভব। বৈষয়িক জীবনে আমরা যতদিন আত্মশক্তির মর্য্যাদা অনুভব না করিব, ততদিনই আমরা আমাদের পারিবারিক শিল্পকলা, ব্যবসায় প্রভৃতি নূতন অবস্থার উপযোগী করিয়া গঠন করিতে পারিব না।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে আত্মশক্তি এবং জাতীয় আদর্শের ক্রমবিকাশ

অনুচিকীর্ষা বলবতী থাকিলে, আত্মশক্তির প্রতি বিশ্বাস হারাইতে হয়। এজন্য আমরা স্বকীয় বৈষয়িক অনুষ্ঠানগুলি পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসিয়া যে নূতনভাবে নবযুগের উপযোগী হইয়া পুনর্গঠিত হইতে পারে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। সমাজের চিন্তা ও কর্ম্ম এ কারণে এ বিষয়ের প্রতি নিয়োজিত

হয় নাই। এক্ষণে আমাদিগকে পরানুকরণের পরিবর্ত্তে আত্মশক্তির মর্য্যাদা প্রচার করিতে হইবে, আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ কি এবং তাহার সার্থকতা কোথায় সমগ্র সমাজের নিকট এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া সমাজকে ধীরে ধীরে অনুকরণের প্রবলস্রোত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

ইহা কি আমরা এখনও বুঝি নাই যে, পাশ্চাত্য বৈষয়িক অনুষ্ঠানগুলি এ দেশে আনয়ন করিতে গেলে দেশের সামাজিক শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্য, আধ্যাত্মিকতা একেবারেই লোপ পাইবার সম্ভাবনা আছে। আদর্শের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে এগুলিকে অনুকরণ করিতে যাওয়া আমাদের নির্বুদ্ধিতা ও হঠকারিতার পরিচয় মাত্র। আমরা কি এত দিনেও অনুভব করিতে পারি নাই যে, পরানুকরণ করিয়া কোন জাতি বড় হইতে পাবে না, জাতীয় জীবন কখনই পরানুকরণ হইতে শক্তিলাভ করে না। ভগবান প্রত্যেক জাতিরই এক একটি ক্রমবিকাশের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ঐ পথ বিপুল অধ্যবসায়ের সহিত অনুকরণ করিতে পারিলে সে জাতি তাহার চরম সার্থকতা লাভ করিতে সমর্থ হয়।

রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদামনোঃ বর্ত্তনঃ পরম্।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ॥

জাতীয় সাধনা একমুখী হইয়া একাগ্রতার সহিত রথচক্রাঙ্কিত নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর না হইলে জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। জগতের নিয়মই এই—প্রত্যেক জাতি আপনার সেই নির্দ্দিষ্টপথে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া বিশ্বের সভ্যতা-মন্দিরের এক একটি গুপ্ত দ্বার খুলিয়া দেয়। বিবিধ রত্নরাজি-মণ্ডিত বিশ্ববিধাতার বেদীতে উপনীত হইবার যে কেবল একটিমাত্র পথ আছে, তাহা নহে; এবং মণিময় বেদীর উপর বিশ্ব-সভ্যতার যে একই রূপ তাহাও নহে; বেদীর উপর বিশ্বদেবতা লক্ষ মূর্ত্তিতে,—লক্ষ অবতার, লক্ষ মহাবিদ্যার মূর্ত্তিতে দেখা দেন। যে যে পথ দিয়া আসিবে, সে সাধনশেষে এক নূতন দ্বার খুলিবে, নূতন মূর্ত্তির সাক্ষাৎ পাইবে। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"। ভগবানের ইহাই অমোঘ বাণী।

অতীতকালে আমাদের জাতীয় জীবনের নিকট বিশ্বদেবতা স্বতন্ত্র অপরূপ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিলেন, আমাদের সামগান-মুখরিত তপোবনে, শিল্প-ভাস্কর্য্য-কারুকার্য্যখচিত দেব-মন্দিরে, গুহাগহ্বরে, ধর্ম্মরাজাধ্যুষিত বিচার-মণ্ডপে, ধর্ম্মপ্রচারকবাহী সামুদ্রিক পোতে সে মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া জাতীয় আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধন করিয়াছিল। বিশ্বদেবতার সেই মূর্ত্তির প্রতি বিমুখ হইয়া তাঁহার অন্যমূর্ত্তি চাহিলে তিনি আমাদিগকে কখনই কৃপাচক্ষে দেখিবেন না। ভিন্নপথে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অন্য মন্দিরে খুঁজিতে যাইলে আমরা নিশ্চয়ই বিফল হইব। তিনি ত তাঁহাকে পাইবার পথ আমাদিগকে পূর্ব্বেই দেখাইয়াছিলেন, এখন আমাদিগকে সেই পথে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হইয়া বিপুল প্রয়াস এবং কঠোর অভ্যাসের সহিত একাগ্রচিত্তে অগ্রসর হইতে হইবে। যতই আমরা অগ্রসর হইতে পারিব, ততই আমাদের জাতীয় জীবন-দেবতার সনাতনী মূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, এখনকার সমস্ত দ্বিধা-আশঙ্কা তখন দূর হইবে। এখন চাই শুধু কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আর ভবিষ্যতের সার্থকতায় অটল বিশ্বাস।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম্, এ।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব সীমা *

ভারতবর্ষের সীমান্ত ও বৈদেশিক সমস্যার শেষ সমাধান কোন কালে হয় নাই, হইবেও না। কখনও কখনও শুনিতে পাই যে অমুক সীমান্ত-সমস্যার শেষ মীমাংসা হইয়া গেল বা অমুক জাতি এইবার যথেষ্ট শিক্ষা পাইয়াছে ; এখন হইতে প্রান্তদেশসমূহে শান্তি বিরাজ করিবে। প্রকৃতপক্ষে যখন ভারতের সমতল অতিক্রম করিলেই অপর রাজ্যের সীমায় পদার্পণ করিতে হয়, তখন স্বীকারযোগ্য শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। গ্রেট ব্রিটেন একদিন চিন্তা করিয়াছিল যে, যখন সে অত্যুচ্চ, হিমালয়-শিখর ও ঈষৎধূম্র খাইবার পাহাড় পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন ভারতের সমস্ত গোলযোগই মিটিয়া গিয়াছে। সে যে প্রতারিত তাহা শীঘ্রই সে বুঝিতে পারিল। তাহার কতদূর ভ্রম হইয়াছিল সীমান্তজাতিসমূহের সমরসজ্জার বিস্তৃত কাহিনী হইতে বেশ জানা যায়। অনেক অর্থব্যয়ে আফগানিস্থানে যে দুইটি যুদ্ধ হইয়াছে, তাহা ভারত-গবর্ণমেণ্টকে ঐ বাধাদানকারী মিত্র রাজ্যের (Buffer State) জন্য উদ্বেগ ও চিন্তার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে অক্ষম। লাসা পর্য্যন্ত ইংরাজের সৈন্য গিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনো তিব্বতের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি অত্যন্ত বিরক্তিকর কার্য্য বলিয়া মনে হয়। বেলুচিস্থান ও মেক্রানের মরুভূমি ভারতকে দক্ষিণ পারস্যে বিজড়িত হইবার সম্ভাবনা হইতে দূরে রাখিবে এমন নহে। চীনের বর্ত্তমান বিগ্রহবহ্নি কলিকাতা হইতে বহুদূরে ; কিন্তু ইহার [illegible] ব্রহ্মদেশ ও আসামের সীমায় উপনীত হইয়াছে। সীমান্তের যুদ্ধবিগ্রহ দশ বৎসরের অল্পাধিক কাল নিবৃত্ত হইয়াছে। এই অত্যল্পকালের মধ্যেই আমরা নানা পর্ব্বত ও ওয়াজিরী দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমরাভিযানের কথা শুনিতে পাইতেছি। গত নব্বই বৎসরের মধ্যে [illegible] জাতির আবরণস্বরূপ টিরা উপত্যকা অধিকারকালে যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমরবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত তাহার অধিবাসী পুনরায় যে সেরূপ অগ্নি জ্বালাইবে না তাহা কে বলিল? আধুনিক রাজনীতিবিদগণের মধ্যে যে লর্ড কর্জ্জন সীমান্ত-ব্যাপারসমূহকে নিরাপদ, দৃঢ় ও সতর্কতাযুক্ত [illegible] উপর স্থাপন করিতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চেষ্টা করেন, তিনিও সীমান্ত সমস্যার শেষ সমাধান করিয়াছেন এরূপ দাবী করিতে পারেন নাই। তিনি শান্তি স্থাপিত করিলেও সাহস করিয়া বলিতে পারেন নাই যে এই স্থায়ী শান্তি। তাঁহার প্রত্যাগমনের পর বিস্তৃত প্রান্তরাজ্যের সমস্ত অবস্থার রূপান্তর ঘটিয়াছে। পারস্য এখন নানা অংশে [illegible]ক ; তাহার অরাজকতা আমাদের সীমা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারে। আফগান ওলন্দাজদিগের দুঃসাহসের পরিচয়

* বিলাতের বিখ্যাত 'টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ

আমরা পাইয়াছি। তাহারা মেক্রানে উপদ্রব করিয়া সীমান্ত রাজনীতিতে বিপজ্জনক নূতন সমস্যা আনয়ন করিয়াছে। পাঠান জাতি বাহ্যতঃ শান্তশিষ্ট; কিন্তু তাহাদের বিশাল অস্ত্রাগার ও গোলাবারুদ-ভাণ্ডার ভীতিপ্রদ সম্পত্তি বলিয়াই ধারণা হয়। আফগানিস্থানে খষ্টবিদ্রোহ (Khost rebellion) ও তাহাদিগের হস্তে আফগানের সমরনিপুণ স্থায়ী (Regular) সৈন্যের পরাভব হওয়াতেই রাজা হবিবুল্লার ক্ষমতা যে আমাদের ধারণানুরূপ নহে, তাহা বেশ বুঝা যায়। চীন তিব্বতের উপর পুনরাধিপত্য স্থাপন করিল; সুতরাং লাসার সহিত ভারত-গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ এখন বিচারসাপেক্ষ। আসাম ও ব্রহ্মদেশের উপান্তে পার্ব্বত্যজাতি ক্রমশঃ অবাধ্য হইয়া উঠিতেছে। চীনজাতি অস্তরোন্নতি সত্ত্বেও ক্রমশঃ তাহাদের সৈন্যাবাস আমাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আনয়ন করিতেছে। এই সমস্ত নূতন নূতন প্রশ্ন এখন একবার বিশেষভাবে আলোচ্য। একে একে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

উত্তর পশ্চিম প্রান্তস্থিত পাঠান জাতির বিষয়ই এখন সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। এই আলোচনা যে বর্ত্তমান অবস্থার বিকাশ লইয়া নয়, এরূপ বুঝিতে বলি না। সীমান্তনীতির ভবিষ্যৎগতি কোন দিকে তাহাই বুঝাইবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। অবশ্য পরবর্ত্তী দুই চারি বৎসরের কথা নয়, যতদিন অবস্থার পরিবর্ত্তনে বাধ্য করিবে ততদিন আমাদিগকে এই নীতির অনুসরণ করিতে হইবে। উত্তর-পশ্চিম সমস্যা যদিও ক্রমশঃ অর্থসচ্ছলতার উপর নির্ভর করিতেছে, তথাপি প্রধানতঃ উহা সামরিক শক্তির অধীন। এই প্রশ্ন লইয়া রাজনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে দুইটি মত প্রচলিত। একদল স্বার্থরক্ষার বর্ত্তমান (অর্থদান) নীতির পক্ষপাতী; অন্যদলের মত, যেরূপেই হউক একটা শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে; অর্থের দ্বারা কত দিন চলিতে পারে? এক দিক হইতে উভয় মতই সত্য। বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত গোলযোগময়। ব্রিটিশ শাসনাধীন রাজ্যের সীমা সীমান্তরাজ্যের অতি নিকটেই শেষ হইয়াছে। মধ্যস্থিত স্থানসমূহ পর্ব্বত-সঙ্কুল ও অনুর্ব্বর হইলেও উর্ব্বর উপত্যকাগুলিতে যুদ্ধপ্রিয় লোকেরই বাস। আইনের মর্য্যাদা রক্ষা তাহারা জানে না, এবং সংখ্যায়ও তিন লক্ষের কম নহে। অধিকাংশ যোদ্ধা আধুনিক যুগের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। ইহাদের দুর্গের অনতিদূরে ভারত-গবর্ণমেণ্টের সৈন্য রক্ষিত; আমরা তাহাদিগকে আমাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী সৈন্য দলভুক্ত করিয়া থাকি। যদি তাহারা ব্রিটিশের অধীন জেলায় লুণ্ঠনাদি করে, তবে তাহারা শাস্তিও পাইয়া থাকে। কিন্তু ভারতের এই শান্তিরক্ষার প্রধান উপায় অর্থদান। এই পার্ব্বত্য জাতিকে যে অর্থদান করা হয়, তাহার পরিমাণ অধিক নহে, বরং ফলে অনেক বিদ্রোহের হাত হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা পায়, এই অর্থদানে বশীভূত রাখার প্রথা নূতন বা অপমানসূচক নহে; কারণ, স্মরণাতীতকাল হইতেই উহা চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই বোধ হয়। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মোগলেরা সীমান্ত জাতিকে কর দিতেন;

হিন্দুস্থানের অন্যান্য শাসনকর্ত্তারাও ঐরূপ করিয়াছেন। যাহাই হউক না কেন, এ সতর্কতা কিন্তু বড়ই সন্দেহজনক ও অনিশ্চিত, কারণ যে কোন মুহূর্ত্তে ইহা নষ্ট হইতে পারে। কোন সময়ে হয়তঃ আফগানিস্থানে একদল সৈন্য প্রেরণের আবশ্যকতা উপস্থিত হইতে পারে এবং ইহারা নানা দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন পথে যাইবে ইহাও সত্য। তখন ঐ সমস্ত ইংরাজের শাসন-বহির্ভূত জাতিদিগের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া বর্ত্তমান নীতির ফলাফল স্থির করিতে হইবে। যদি তাহারা ইংরাজসৈন্যের গমনাগমন ও সংবাদাদি আদানপ্রদানে বাধা দান করে, তবে বর্ত্তমান স্বার্থরক্ষা-নীতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া উঠিবে। সম্ভবতঃ ইহার ফলে রেলওয়ে-বিস্তারই ভবিষ্যৎ সীমান্ত-নীতির লক্ষ্য হইবে।

যখন কাবুলের শাসনকর্ত্তারা তাঁহাদের রাজ্যে রেলওয়ে বিস্তারের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছেন, তখন ভবিষ্যতে সীমান্ত-ব্যাপারে আমাদের বর্ত্তমান নীতির নিষ্প্রয়োজনীয়তা আশা করা যায়। নিশ্চয়ই প্রত্যেক গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া আফগানিস্থান পর্য্যন্ত লাইট রেলওয়ে নীত হইবে এবং ট্রেণের গমনাগমনে পাঠানদিগের পুরাতন ধারণা-সমূহ অবশ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। এই সুযোগে যদি তাহারা লাঙ্গল ত্যাগপূর্ব্বক অস্ত্রধারণে প্রবৃত্ত হয়? এইরূপ করিবার একটি কারণ, তাহাদের বর্দ্ধমান জনসংখ্যার ভরণপোষণোপ-যোগী কর্ষণযোগ্য ভূমি নাই। সুতরাং এক-দিকে প্রবৃত্তি অন্যদিকে আবশ্যকতা তাহা-দিগকে সমতল ভূমিতে আসিয়া লুণ্ঠন করিতে বাধ্য করিবে। কিন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্টের রাজ্য যে পরিমাণ বিস্তৃত তাহার শান্তিরক্ষা বহু ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া পড়িবে। সামরিক ব্যয় চিরকালের জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ও ভারতসৈন্য আফগানসৈন্যের অতিসান্নিধ্যে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া বাস করিবে।

আফগানিস্থান

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ভারত-গবর্ণমেণ্টের অবস্থা এইরূপ অনিশ্চিত ও গোলযোগ-পূর্ণ। এখন আফগানিস্থানের প্রশ্ন আলোচনা করা যাউক। এই রাজ্যের আয়তন ২৪৬,০০০ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা ৫০,০০০০০ পঞ্চাশ লক্ষ। ইহা অধিপতি কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে গড়দ্বারা পরিরক্ষিত। ভিতর দিয়া রাজা ও প্রজাবর্গ ব্যতীত আর কাহারও গমনাগমনের অধিকার নাই। এরূপ রাজ্য এসিয়াতে চিরকালের জন্য অন্য সকল হইতে দূরে থাকিতে পারিবে না। চীন একদা বহিঃস্থ অসভ্য জাতি সকল হইতে পৃথক থাকিতে চেষ্টা করিয়াছিল, জাপান নিজের নির্জ্জন গণ্ডীর মধ্যে বাস করিত, কিন্তু উভয়েই অনেকদিন হইতে বাহিরের চাপে মস্তক অবনত করিয়াছে। অবশ্যম্ভাবী ঘটনাক্রমে একদিন আফগানিস্থানও ঐরূপ করিতে বাধ্য হইবে। গ্রেট ব্রিটেনের হয়তো হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন হইবে না। আফগানিস্থানের অবস্থায় মনে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। কারণ বহিঃস্থ পৃথিবীর সংস্পর্শ হইতে ইহার পৃথগবস্থান অতি অল্পদিনই ঘটিয়াছে। বহু শতাব্দী হইতে ইহা এসিয়ার একটা বিস্তৃত রাজপথ সদৃশ ছিল, এবং ইহা যেমন অন্য কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে অধিকৃত হইয়াছে, তেমনি

সময়ে সময়ে অন্য দেশ অধিকারে অভিযানও করিয়াছে। বিগত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধভাগে ইংরাজকর্ম্মচারীরা আফগানিস্থান বর্ত্তমানাপেক্ষা অনেক বেশী জানিত। যে আব্দার রহমান ইংরাজ সাহায্যে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন তিনিই বহিঃসংশ্রব ত্যাগ করিলেন। তবে তিনি জানিতেন আবশ্যক হইলে সন্ধির প্রস্তাবানুযায়ী ইংরাজদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীও এইরূপ আশ্বাস পাইয়াছেন। আফগানিস্থান যে একদিন তাহার প্রাচীর ধ্বংস করিয়া ফেলিবে, তাহার কারণ তাহার রাজ্যের মধ্য দিয়া ইউরোপে যাইবার সহজ ও সরল পথ আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব। উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ সার টমাস হলডিক্ প্রমুখ লোকেরা বিবেচনা করেন পারস্যের ভিতর দিয়া লৌহবর্ত্ম না যাইতে পারে, কিন্তু সহজ ও দ্রুত পথে ইউরোপে যাইবার রাস্তা আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া অতিক্রম করিবে ইহা নিশ্চিত। রাজা হবিবুল্লার মত উহার প্রতিকূলে নয়; কারণ তিনি জানেন ইহাতে তাঁহার রাজ্যের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু প্রজাগণের মত ইহার অনুকূলে নয়। সুতরাং রাস্তা-নির্ম্মাণের অনুকূল মত গঠন করিতে অনেক সময় অতিবাহিত হইবে। এখন চিন্তার বিষয়, দুরাণিবংশ দেড় শত বৎসর রাজত্ব করিল, আর কত কাল তাহারা এক যোগে উহা রক্ষা করিতে পারিবে। আব্দার রহমানের মৃত্যুকালে অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে তাহার উত্তরাধিকারীর সৌভাগ্যরবি শীঘ্রই অস্তমিত হইবে। হবিবুল্লা দ্বাদশ বৎসর নির্ব্বিবাদে রাজ্যভোগ করিলেন, কিন্তু গত দুই বৎসর যাবৎ দেখা যাইতেছে তাঁহার আসন টলিয়াছে। কতিপয় প্রজা শুল্ক দিতে অস্বীকার করিয়াছে, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্রোহ ঘটিয়াছে। সৈন্যগণের ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বেকার ন্যায় নিপুণতাও আর নাই। রাজা হবিবুল্লা যদিও ভারত-গভর্ণমেণ্টের উপর কতকটা অসন্তুষ্ট, তবু তাঁহার রক্ষায় ব্রিটিশের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিবে, সুতরাং তাহারা কোন দিন হবিবুল্লার উচ্ছেদসাধনের সমর্থন করিবেন না।

তিব্বত-সমস্যা

ভারত-সীমান্তের সমস্যাগুলির মধ্যে তিব্বত-প্রশ্নই সর্ব্বাপেক্ষা সমাধানযোগ্য। লাসার ব্রিটিশ প্রতিনিধি চীনের বাধ্যতা অগ্রাহ্য করেন নাই। তিব্বতের সহিত ইংলণ্ডের রাজনীতিক সম্বন্ধ চীনের সাহায্যে রক্ষিত হইবে, ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছিল। রুশের সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হয় তাহাতে তিব্বতের অন্তর্ব্যাপারে কেহই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না, এই একটা সর্ত্ত হয়। চীন এই সুযোগে তিব্বতের জনবহুল অংশ পুনরধিকার পূর্ব্বক তাহাকে বশ্যতার পারবশ্যে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব স্বীকার করাইতে চেষ্টা করে। গ্রেট ব্রিটেন চীনের এইরূপ ব্যবহার আশা করেন নাই। বর্ত্তমান বিগ্রহ ঘটনাক্রমে চীনের এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। অরাজকতায় সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাসার চৈনিক সৈন্য তিব্বতীয়দিগের বাড়ীঘর লুণ্ঠন করিয়া মুক্তি ঘোষণা করিল। লাসার অধিবাসীরা লুণ্ঠিত দ্রব্য ফিরিয়া লইতে দলবদ্ধ হইল; তিব্বত হইতে চীনাদিগকে বহিষ্কৃত

করিল ও দালাইলামা পুনরায় লাসায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিব্বত এখন প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন; তাহার উপর পিকিনের কোন আধিপত্য নাই। একদল চীনা সৈন্য তিব্বতে প্রবেশ করিতে যাইয়া পরাজিত হইয়াছে; অনেক কামান-বন্দুক শত্রুকরে অর্পণ করিয়াছে। এবং এ পর্য্যন্ত কোন পথ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। শুনা যাইতেছে, তিব্বতের পূর্ব্ব দিকের প্রবেশদ্বার দুর্ভেদ্য। উহা ভেদ করিতে চীনের প্রাণপণ চেষ্টাও ব্যর্থ হইতেছে। জিয়াংসিতে ব্রিটিশের একজন বাণিজ্য-প্রতিনিধি অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার নিকট কোন সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে এখনও ব্রিটেনকে ১৯০৬ সালের পিকিন সন্ধি ও ইংরাজ-রুশের সন্ধি অনুসারে পিকিনের মধ্য দিয়া সংবাদ প্রেরণ করিতে হয়। যদি তিব্বতে চীনের কোন আধিপত্য স্বীকৃত না হয়, তবে কি হইবে? লাসা-সন্ধিতে গ্রেট্ ব্রিটেনকে কয়েকটী প্রয়োজনীয় পৃথক্ সত্ত্ব বা অধিকার দেওয়া হয়। তিব্বত-গভর্ণমেণ্টের সম্পর্ক লইয়া তিনি উহার প্রয়োগ করিতে পারিবেন এই স্থির করা হয়। এই সত্ত্বের সাহায্যে আমরা তিব্বত-গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব স্বীকার করি। এখন যদি ঐ গবর্ণমেণ্ট বাস্তবিকই কৃতকার্য্যতার সহিত চীনের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া থাকে, তবে গ্রেটব্রিটেনকে তাহা মানিয়া লইতে ও তিব্বতে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে হইবে। এই পন্থা অবলম্বন করিতে রুশ-ইংরাজের সন্ধির পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ভারতের সীমান্তব্যাপারে তিব্বতে গোলযোগ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ব্রিটিশ-নীতি এই নূতন অবস্থার উপযোগী করিয়া গঠন করা আবশ্যক; যে সকল বন্দোবস্ত উপন্যাসে প্রহসনে শোভা পায়, তাহাতে অকর্ম্মণ্য ব্যবস্থা চিরকালের জন্য লাগিয়া থাকা আর উচিত নয়। সম্ভবতঃ পর্ব্বতমালা ও মরুভূমি পরিবেষ্টিত তিব্বত অপর কতকগুলি কারণেও অনেকদিন পর্য্যন্ত বহির্জগত হইতে একেবারে পৃথক থাকিবে। যদি কোন দিন তাহার উচ্চ মালভূমিতে যাইতে কাহারও বাসনা হয়, সে কেবল তাহার পশ্চিম-উপত্যকায় সৈন্ধব নদীর তলদেশজাত স্বর্ণরেণু লাভের আশায়। তিব্বতভূমি ক্লনডাইক্ অপেক্ষা অনেক অধিক স্বর্ণের অধিকারিণী; ইহার লোকের নিশ্চয় সময়ে মানবজাতির দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হইবে।

উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত

উত্তর-পূর্ব্বসীমার অবস্থা উত্তর-পশ্চিমের তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক। পাঠান রাজ্যের বৃক্ষবর্জ্জিত পর্ব্বতমালার পরিবর্ত্তে উত্তর-পূর্ব্বে হিমালয়ের পাদদেশে দুর্ভেদ্য জঙ্গলাবৃত ক্ষুদ্র পাহাড়শ্রেণী বিরাজিত। স্রোতউপম বৃষ্টিধারা নিপীড়িত এ স্থান কিয়ৎকাল বেগগামী প্রবাহ সকল এরূপ খণ্ডাকার ধারণ করে যে, মানুষের গমনাগমন অসম্ভব হইয়া পড়ে। এখানে যে সকল মানুষগুলি আদিম মঙ্গলীয়দিগের বংশধর, তীর ধনুকে ও প্রাচীন কালের অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত, তাহারা আবরণের অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করে। যুদ্ধের জন্য এক একটি প্রাচীর বা বেষ্টনী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার আশ্রয়ে দণ্ডায়মান হয়। বনের মধ্যে তাহাদের আশ্রয়ের জন্য নির্ম্মিত আবাসস্থান পর্য্যন্ত যে সময়ে যে সমস্ত শত্রু-

দল উপস্থিত হয়; তাহাদের বিনাশের জন্য উহারা স্থানে স্থানে গর্ত্ত করে ও ভিতরে সূচ্যগ্র কাঠ পুতিয়া রাখে। মাঝে মাঝে ইহাদিগকে দমন করিতে শান্তিরক্ষাকারী সৈন্যের অভিযান আবশ্যক হয়, কিন্তু এই দিকে এখনও ইংলণ্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। এত দিন ইহার ফল ঐ স্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল। উহা ক্রমশঃ নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী ত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইবার উপক্রম করিতেছে ও বৃহৎ সমস্যার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। তিব্বতীয় ও চৈনিকদিগের অশান্তির ফলে ইংরাজের সত্ব ও সীমা আরও পরিষ্কাররূপে নির্দ্ধারিত করার সময় আসিয়াছে। উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে কতকাংশে আজিও প্রকৃতরূপে সীমা নির্দ্ধারিত হয় নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযান দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে পরিশেষে এদিকের সীমান্ত-নীতিও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এ যাবৎ আসাম ও ব্রহ্মদেশের গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছেন। একটু একটু স্থান কিয়ৎপরিমাণে গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীন হইয়াছে। উহাদের অধিবাসীরা অল্পসংখ্যক সামরিক পুলিশের সাহায্যে কতিপয় কর্ম্মচারী দ্বারা পুরাকালের আদিম শাসন-পদ্ধতিতে শাসিত হয়। ভারত-গবর্ণমেণ্টের কয়েকটি অর্দ্ধ স্বাধীন রাজ্যও আছে; তাহাদিগকে কোন কাজেই এপর্য্যন্ত বিশেষ বাধা দেওয়া হয় নাই। অবশিষ্ট বহুবিস্তৃত অনেক স্থান ব্রিটিশ অধিকৃত বলিয়া কথিত হয়। বস্তুতঃ সে কেবল নাম মাত্র। ঐ সমস্ত স্থান মানচিত্রে লোহিত বর্ণে চিত্রিত করা হয়, কিন্তু রাজ্যেশ্বরের কোন আদেশ সে পর্য্যন্ত পৌঁছায় কি না সন্দেহ। যখন কোন সৈন্যদল কোন অন্যায় কার্য্যে বাধা দিতে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়, তখন ব্রিটিশ শক্তির সহিত তাহাদের একটু পরিচয় হয়। এই সীমান্তের সমস্যাসম্বন্ধেও নানারূপ মতামত বিদ্যমান। অনেকে বলেন ইংরাজ ক্রমান্বয়ে তাহাদের রাষ্ট্রীয় সীমা পর্য্যন্ত সমানাধিপত্য লাভ করিবে। সে বড় সহজ ব্যাপার নহে। আর সেই জনশূন্য ও ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত বসবাসসম্পন্ন সহস্রক্রোশব্যাপী স্থানের উপর আধিপত্য করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি না তাহাও বিবেচ্য। আজকাল প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, এই সমস্ত ভূখণ্ড প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে অপসারিত করিয়া একটা নূতন "উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত-প্রদেশ" গঠিত করা উচিত ও উহা রাজপ্রতিনিধি ও প্রধান শাসনকর্ত্তার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকা আবশ্যক। পরিশেষে এইরূপ ঘটিবে ইহাও ঠিক। তাহা হইলে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট ব্যয়সঙ্কুল ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের হস্ত হইতে কিছু নিষ্কৃতি পাইবেন ও ঐ নূতন প্রদেশের বন্দোবস্তও সত্বরই সাধিত হইবে।

খাদ্যে অন্নসার

খাদ্য হিসাবে আমরা যাহা কিছু খাইয়া থাকি তাহাদের সকলগুলিকেই পাঁচটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এইগুলির নাম অন্নসার (Protien), শ্বেতসার (Carbo-

hydrate) স্নেহ, জল, লবণ। প্রথম তিনটিতেই অঙ্গার সার (Carbon), জলজান (Hydrogen) ও অম্লজান আছে, তবে অন্নসারের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে সোরাজান (Nitrogen) বিদ্যমান আছে। শরীরের পুষ্টির জন্য সোরাজান অপরিহার্য্য। উক্ত পাঁচ প্রকার খাদ্যের মধ্যে কেবল অন্নসারেই সোরাজান আছে। কাজেই খাদ্য হিসাবে, শরীরের পুষ্টির হিসাবে অন্নসার খাদ্য-বিভাগের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। সেইজন্য প্রথমেই আমরা অন্নসার সম্বন্ধে আলোচনা করিব এবং পরে অপরগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

অন্নসারের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে শতকরা নিম্নলিখিত ভাগ পাইয়া থাকি।

অঙ্গার সার	...	৫০	হইতে	৫৫	ভাগ
জলজান	...	৬.৫	„	৭.৩	„
সোরাজান	...	১৫	„	১৭.৬	„
অম্লজান	...	১৯	„	২৪	„
গন্ধক	...	০.৩	„	২.৪	„

সোরাজান-সাম্যাবস্থা (Nitrogen Equillibrium)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সোরাজানের অস্তিত্বই অন্নসারের প্রাধান্য। খাদ্যরূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া ইহার পরিপাক হয়। পরিপাককালে ইহার স্বগুণ ও স্বধর্ম্মের নানা প্রকার বিকৃতি ঘটে, কারণ ইহার অণুগুলি (molecules) এত বড় যে উহা পাকস্থলী ও অন্ত্রের ঝীল্লির মধ্য দিয়া আসিয়া রক্তস্রোতের সহিত মিশিতে পারে না। কাজেই ইহার নানাপ্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে। ইহা জলের অণুর সহিত মিশিয়া ক্রমে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে থাকে। এই ক্রিয়ার নাম হাইড্রোলিসিস (Hydrolysis) এই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অণুগুলি ক্রমে রক্তের স্রোতের মধ্যে আসিয়া পড়ে। পরে নানা-প্রকার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া দ্বারা ভোক্তার দেহের সহিত এমন ভাবে মিশাইয়া যায় যে, তখন তাহার ভিন্ন অস্তিত্ব প্রমাণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। পরে দেহের উন্নতির জন্য, তাপাদি উৎপাদনের জন্য আবার নানা-প্রকারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তখন আবার রক্তের সহিত আসিয়া মিশ্রিত হয়। অধিকাংশ মূত্রের সহিত ত্যক্ত হয়, আর কিয়দংশ ঘর্ম্ম ও মলের সহিত বাহির হয়।

যেমন একদিকে খাদ্যের সহিত সোরাজান গ্রহণ করিতেছি, তেমনি অপরদিকে মল, মূত্র, ঘর্ম্মাদির সহিত ইহা আমাদের দেহ হইতে বহির্গত হইতেছে। যদি কোনও উপায়ে শরীরত্যক্ত সোরাজানের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিতে পারি এবং কি পরিমাণে খাদ্যের সহিত গ্রহণ করিতেছি তাহাও নির্ণয় করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের লাভ হইতেছে কি লোকসান হইতেছে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিব। দেহত্যক্ত সোরাজানের পরিমাণ জেলদহল (Kjeldahl) মতে অতি সহজেই নির্ণীত হইতে পারে। সমস্ত মলমূত্রাদি একত্রিত করিয়া ইহাতে গাঢ় দাহজল (concentrated Sulphuric acid) দিয়া তাপ লাগাইলে সোরাজান এমোনিয়া (ammonia) রূপে নির্গত হইতে থাকে। ইহা হইতে সোরাজানের পরিমাণ নির্ণয় করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া আমরা জানি যে অন্নসারে শতকরা ১৬ ভাগ সোরাজান আছে। কাজেই

যদি আমরা উক্তরূপে লব্ধ সোরাজানের পরিমাণকে ৬·২৫ দিয়া গুণ করি তাহা হইলে কত অন্নসার হইতে এই সোরাজানের উৎপত্তি তাহা অতি সহজেই নির্ণয় করিতে পারি। খাদ্যের সহিত কত পরিমাণে সোরাজান গৃহীত হইতেছে তাহা হিসাব করিয়া দেখিতে পারি যে, সোরাজান জমিতেছে কি না। দৈহিক বর্দ্ধনের সময় সোরাজান অধিক মাত্রায় জমিতে থাকে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে স্বাস্থ্যের অধিকাংশ সময়ই যে পরিমাণে সোরাজান গৃহীত হয়, ঠিক সেই পরিমাণেই ইহা দেহত্যক্ত হয়। ইহাকে Nitrogen Equillibrium বা "সোরাজান-সাম্যাবস্থা" বলে।

দেহের আয় বা খাদ্য	সোরাজান	অঙ্গারসার
অন্নসার ১০০ গ্রাম ...	১৫·৫	৫৩
স্নেহ ১০০ গ্রাম ...	০	১৯
শ্বেতসার ২৫০ গ্রাম ...	০	১৫৩
	১৫·৫	২২৫

দেহের ব্যয়	সোরাজান	অঙ্গারসার
মূত্র		৬·১৬
মল		১০·৮৪
শ্বাসপ্রশ্বাস		২০৮·০০
		২২৫

আর একটি বিশেষ কথা এই যে খাদ্যের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় "সোরাজান-সাম্যাবস্থা" (Nitrogen equillibrium) ঘটিতে পারে। একটি উদাহরণ দিলেই কথাটা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ধরা যাউক একজন লোক ১০ গ্রাম সোরাজান গ্রহণ করিয়া সোরাজান সাম্যাবস্থায় আছেন অর্থাৎ প্রতিদিন তিনি ১০ × ৬·২৫ = ৬২·৫ গ্রাম অন্নসার গ্রহণ করেন এবং ঠিক এই পরিমাণেই অন্নসার তাঁহার দেহত্যক্ত হয়। এক্ষেত্রে যদি তাঁহাকে ১২৫ গ্রাম বা তিনি যাহা খাইতেন তাহার দ্বিগুণ অন্নসার খাইতে দেওয়া যায় তাহা হইলে ফল কি দাঁড়াইবে? ফল দাঁড়াইবে এই যে ১২৫ গ্রামই সাধারণ নিয়মানুসারে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া দেহত্যক্ত হইবে। কাজেই দেহের অন্নসারের হ্রাস বা বৃদ্ধি কিছুই হইবে না। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে "সোরাজান-সাম্যাবস্থা"র শেষমাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যের পরিপাকের যতদূর শক্তি আছে তাহার মধ্যে যে পরিমাণেই অন্নসার দেওয়া যাউক না কেন দেহের অন্নসারের হ্রাসবৃদ্ধি কিছুই ঘটিবে না অর্থাৎ দেহ সোরাজান-সাম্যাবস্থায় থাকিবে। অবশ্য এখানে আমি পূর্ণবয়স্ক সুস্থলোকের সম্বন্ধেই বলিতেছি। কখন কখন এমনও ঘটে যে দেহ সোরাজান-সাম্যাবস্থায় থাকিলেও দেহের হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটিতেছে। "অন্নসার হীন" (Non-protein) অংশের হ্রাস বা বৃদ্ধিতে এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

সোরাজান-সাম্যাবস্থায় অন্নসার-হীন খাদ্যের কার্য্যকারিতা

কেবল অন্নসারজাতীয় আহার দ্বারাও শরীরের সোরাজান-সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে অন্নসারের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। যদি অন্নসার-হীন খাদ্যের মিশ্রণ ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প অন্নসার ব্যবহারেই সোরাজান-সাম্যাবস্থা

ঘটিয়া থাকে। এক্ষেত্রে অন্নসার-হীন খাদ্য অন্নসার-রক্ষকের (Protein sparer) কার্য্য করিয়া থাকে। মিশ্রিত খাদ্যের (mixed diet) ব্যবহারে অন্নসার-হীন খাদ্যের পরিমাণ অধিক করিয়া দিলে সোরা-জান সাম্যাবস্থা নষ্ট না করিয়াই অন্নসারের ভাগ সহজে হ্রাস করা যাইতে পারে। ইহার কারণ এই যে খাদ্যের কার্য্য সাধারণতঃ দুইটি বিশেষ কার্য্যে লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ উহা হইতে নূতন তন্তু-মাংসাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং দিবারাত্র যে ক্ষয় হইতেছে তাহারও পূরণ সাধিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইহা দ্বারা তাপ শক্তি ইত্যাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। অন্নসার, শ্বেতসার, স্নেহ এই তিনটিরই শক্তি-উৎপাদনকারী ক্ষমতা আছে। তবে শ্বেতসারই এ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ, আর ক্ষয়পূরণের জন্য অন্নসার একেবারে অপরিহার্য্য। আমরা সকল ক্ষেত্রেই অন্নসার-হীন খাদ্যের মাত্রা বাড়াইয়া অন্নসারের মাত্রা কমাইতে পারি। কিন্তু ইহার একটা সীমা আছে; এই সীমা অতিক্রম করিলে আর দেহ "সোরাজান-সাম্যাবস্থায়" থাকিবে না, তখন গৃহীত অপেক্ষা ত্যক্ত সোরাজানের মাত্রা অধিক হইয়া পড়িবে এবং ফলে শরীর ক্লিষ্ট হইতে থাকিবে।

দেহে সোরাজানের পরিণতি ও খাদ্যহিসাবে মূল্য

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অন্নসার খাদ্যরূপে জীবদেহে প্রবেশ করিয়া পরিপাককালে নানা প্রকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা স্বধর্ম্ম হারাইয়া থাকে। জলের সহিত রাসায়নিক সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া (হাইড্রোলিসিস্—Hydrolysis) ইহার অণুগুলি (molecules) ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে থাকে এবং উপর্য্যুপরি পাঁচ প্রকার অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, যথা—প্রোটিনস্, প্রোটিওসেস্, পেপটোন্স্, পোলিপেপটাইডস্, য়্যামিনো-এসিডস্ (Proteins, Proteoses, Peptones, Polypeptides, Amino-acids) এবং শেষে রক্তস্রোতে য়্যামিনো-এসিডস্ রূপে শোষিত হয়। তখন ইহার স্বধর্ম্মের লোপ হয়। এক্ষণে এই য়্যামিনো-এসিডের পরিণতি কোথায় দেখা যাউক। ভয়েটের মত যে, এই সমস্ত য়্যামিনো-এসিডস হইতেদেহ মধ্যে এক নূতন ও দেহের উপযোগী অন্নসার সৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার গুণ অনেকটা সেরাম য়্যালবুমিন বা অন্য কোনপ্রকার অন্নসারের ন্যায়।

তিনি আরও বলেন যে এই নূতন অন্নসারের কিয়দংশ ক্ষয়পূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়; ইহার নাম টীস্যু-প্রোটিন বা "তন্তু অন্নসার"। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই ক্ষয়পূরণ কার্য্য অন্নসারহীন (non-nitrogenous) খাদ্যের দ্বারা সম্ভব নহে। আর নূতন অন্নসারের অপরাংশ হইতে দেহ-কোষগুলি শরীররক্ষার জন্য তাপ উৎপাদন করে, কিন্তু ইহা কখনও প্রকৃত-প্রস্তাবে দেহ-গত হয় না। রক্ত ও লিম্ফ (lymph) স্রোতে ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়া ইহার নাম আবর্ত্তিত অন্নসার বা সার্কুলেটিং প্রোটিন।

কিন্তু অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকের মতে য়্যামিনো-এসিডের কিয়দংশ অন্ত্রের ঝিল্লীতে বা যকৃতে গিয়া নূতন দেহোপযোগী অন্নসারে পরিণত হয়। আর অবশিষ্ট অংশ হইতে

দেহের তাপ উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে য়্যামিনো-এসিডের সোরাজান কোনও কাজেই আসে না। এই সোরাজান হইতে যকৃতে য়্যামোনিয়া উৎপত্তি এবং পরে ইউরিয়াতে পরিণত হয় এবং মূত্রের সহিত ত্যক্ত হয়। সোরাজান-বিবর্জ্জিত অবশিষ্ট অংশ হইতে দেহের তাপাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং মাত্রা অধিক হইলে "জৈবিক শর্করা" (Glycogen) ও স্নেহে পরিণত হইয়া দেহে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত থাকে। ভয়েটের মতের সহিত পার্থক্য এই যে, তিনি বলেন সমস্ত য়্যামিনো-এসিডসই নূতন অন্নসারে পরিণত হয়, কিন্তু নূতন বৈজ্ঞানিকগণের মত এই যে, কেবলমাত্র ইহার কিয়দংশই নূতন অন্নসারে পরিণত হয়।

দেহরক্ষার জন্য অন্নসারের পরিমাণ

প্রথমে দেখান হইয়াছে যে সোরাজান-সাম্যাবস্থা অন্নসারের বিভিন্নমাত্রায় ঘটিতে পারে। এক্ষণে কথা হইতেছে দেহরক্ষার জন্য কত পরিমাণে অন্নসার গ্রহণ করা উচিত। মূল্য হিসাবে অন্নসার জাতীয় খাদ্য অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ্য। কাজেই কত অল্প অন্নসারে শরীরের উন্নতি ও পুষ্টি সাধিত হইতে পারে তাহা বিচার্য্য। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি অধিকমাত্রায় অন্নসার ব্যবহার করিলে বিশেষ কোনও ফল নাই। কেননা কেবলমাত্র ক্ষয়পূরণের জন্য যেটুকু আবশ্যক সেটুকু ব্যতীত অপর অংশ সাধারণতঃ শ্বেতসার বা স্নেহজাতীয় খাদ্যের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে।

অন্নসারের মাত্রা লইয়া নানা মুনির নানা মত। সভ্যজগতের খাদ্যের বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে মোটের উপর প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তি প্রায় ১০০—১২০ গ্রাম অন্নসার গ্রহণ করিয়া থাকে। ভয়েট ১১৮ গ্রাম অন্নসার পরিমিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। র‍্যাঙ্ক (Ranke) ১০০ গ্রাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্নসারের কিয়দংশ অপরিপক্ক (undigested) অবস্থায় মলের সহিত বাহির হয়। যাহাই হউক ১০০—১০৫ গ্রাম দেহে গৃহীত হইয়া থাকে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। দেহের ওজনের অনুপাতে প্রতি কিলোগ্রামে * ১·৫ গ্রাম অন্নসার আবশ্যক।

সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকগণ চেষ্টা করিতেছেন কত অল্প অন্নসারে দৈহিক ও মানসিক অবনতি না ঘটাইয়া সোরাজান-সাম্যাবস্থা রক্ষা করা যাইতে পারে। বিখ্যাত অধ্যাপক চিটেনডেন (Chittenden) এ সম্বন্ধে ৫ জন শিক্ষক ৮ জন ছাত্র-এবং ১৩ জন সৈনিকের উপর পরীক্ষা করেন। তিনি কয়েকমাস পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে ভয়েট-নির্দ্দিষ্ট অন্নসারের পরিমাণ অর্দ্ধেক করিয়া দিলেও দেহে সোরাজান সাম্যাবস্থায় থাকে, অথচ মানসিক ও শারীরিক দৌর্ব্বল্য ঘটে না। অনেকে বলেন চিটেনডেনের মতানুসারে চলিলে রোগের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার ক্ষমতা হ্রাস পাইবে। এ সম্বন্ধে হ্যালিবার্টন (Halliburton) লিখিয়াছেন—"In countries like India where vegetarian

* কিলোগ্রাম (Kilogram)=২ পাউণ্ড ৩ আউন্স প্রায় ১ সের সাধারণ লোকের ওজন ১ মণ ৩০ সের হইতে ৩৫ সের। ১০৫ – ১·৭৫ চটাক প্রায় (?)

population is diluted with meat-eating white-races, it is the former who more readily succumb to the disease." কিন্তু এক্ষেত্রে হ্যালিবার্টন সাহেবের মত ভ্রান্ত। দারিদ্র্যই আমাদের রোগের প্রধান কারণ।

ডাক্তার ম্যাক্কাবে (Maccabe) বাঙ্গালীর উপর এই সম্বন্ধে নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার পরীক্ষার ফল 'দি মেটাবোলিজম অব বেঙ্গলীস, ক্যালকাটা ("The metabolism of Bengalis, Calcutta") নামক পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ আছে। তিনি নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক বাঙ্গালী ৩৭°৫ গ্র্যাম মাত্র অন্নসার গ্রহণ করিয়া থাকে। (প্রতি কিলোগ্র্যামে °৭ গ্র্যাম অন্নসার বা ০°১৩ গ্র্যাম সোরাজান)।

রুবনার (Rubner) বলেন যে শিশুর প্রধান খাদ্য দুগ্ধে (ভয়েটের মতের হিসাবে) অতি অল্পই অন্নসার থাকে, কিন্তু শিশু তাহাতে বেশ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে কত অল্প পরিমাণ অন্নসারে যে শরীর রক্ষা করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে এখনও বিশেষ কিছু নির্দ্ধারিত হয় নাই। বাঙ্গালীরা অতি অল্প অন্নসার খাইয়া বেশ সুস্থ থাকে। কিন্তু এত অল্প অন্নসার গ্রহণই ম্যাক্কাবে সাহেবের মতে বাঙ্গালীর শারীরিক দৌর্ব্বল্যের প্রধান কারণ। অনেকের মত যে যাহারা অল্প অন্নসার খাইয়া থাকে, তাহাদের মূত্রাশয়-রোগ (Kidney diseases) হয় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে ম্যাক্কাবে বলেন যে বাঙ্গালীদের প্রায়ই এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

ক্ষয়পূরণের জন্য যতটুকু আবশ্যক তাহার অধিক অন্নসার খাইলে উহার সোরাজান ইউরিয়া রূপে মূত্রের সহিত দেহত্যক্ত হয়, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, যতটুকু ক্ষয়পূরণের জন্য আবশ্যক, তাহা যদি জানিতে পারি তাহা হইলে সব গোল মিটিয়া যায়। পরীক্ষার দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে কেবল মাত্র ৩০ গ্র্যামেই কাজ চলিতে পারে, কিন্তু এক্ষণে অন্নসার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এত অল্প, কাজেই জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। তাহা ছাড়া আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক জাতিই (যাহাদের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য নাই) গড়ে প্রায় ৮০-১০০ গ্র্যাম স্বতঃই নির্ণয় করিয়া লইয়াছে। সকল দেশের লোক যে ভুল করিয়াছে, বিজ্ঞান এখনও সে কথা জোর করিয়া বলিতে পারে না। অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন জাপানীদের দৈহিক ও মানসিক উন্নতির কারণ এই যে, এক্ষণে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অন্নসার খাইয়া থাকে।

এতক্ষণ আমরা অন্নসারের উপকারিতা ও দেহের সহিত সম্বন্ধের কথা বলিলাম। এক্ষণে অন্নসারসংযুক্ত প্রধান প্রধান খাদ্যের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

চাল, দাল, ময়দা, আলু, ছানা, দুগ্ধ, গিলেটিন (Gelatin) প্রভৃতি প্রধান অন্নসার যুক্ত খাদ্য।

চাল—ভারতবাসীর বিশেষতঃ বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। ইহাতে শতকরা ৭°৯ ভাগ অন্নসার আছে। কিন্তু আমরা সচরাচর যে

চাল ব্যবহার করি তাহাতে ৭·৯ ভাগ অন্নসার থাকে না। চালের দানার উপর কার্ণেল (Kernel) নামক যে সূক্ষ্ম আবরণ থাকে তাহাতে অধিকাংশ অন্নসার থাকে। "মাজা" চালে এই আবরণ থাকে না। তাহা ছাড়া সিদ্ধ করিয়া "ফেন" বা "মাড়" ফেলিয়া দিলে তাহার সহিতও অধিকাংশ অন্নসার চলিয়া যায়। অন্নসার হিসাবে ভাত খাওয়ার বিশেষ কোনও মূল্য নাই। অন্নের সার হইতে "অন্নসার" নামকরণ হইয়াছে, কিন্তু আমরা যে অন্ন গ্রহণ করি তাহা "অন্তঃসার-শূন্য"। একেই বলে গোড়ায় গলদ।

দা'ল—ভাতের সহিত দা'ল আমরা প্রত্যহই ব্যবহার করি। দা'লে ১৭ হইতে ২৪·৮ পর্য্যন্ত অন্নসার থাকে। মসূর দা'লে অধিক মাত্রায় অন্নসার থাকায় অনেক সময় মসূর দাল সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া "মসূর দা'লের যূস্" খাইতে দেওয়া হয়। তবে একটা কথা এই যে মসূর দা'ল (সাধারণত সমস্ত বৃক্ষজাত অন্নসার বা vegetable proteins) সহজে হজম হয় না। প্রায় ৩০·৩ ভাগ মলের সহিত ত্যক্ত হয়। যাহাই হউক দা'ল হইতে যথেষ্ট পরিমাণে অন্নসার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ময়দা বা আটাতে ১২·৪ ভাগ অন্নসার আছে। জলের সহিত ইহা তাল বাঁধিয়া যায়, ইহার কারণ যে ইহাতে গ্লিয়াড্যান (Gliadan) নামক এক প্রকার অন্নসার আছে, ইহার স্বধর্ম্ম জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাল বাঁধা। ইহাতে গ্লুটেনিন (Glutenin) নামক অন্নসারও আছে।

আলু—ইহাতে কেবলমাত্র ২ভাগ অন্নসার আছে।

ছানা—৩৩ ভাগ

দুগ্ধ—৩·৫ *

ডিম্ব—ইহাতে ১২·২ ভাগ অন্নসার আছে, খাদ্য হিসাবে ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং কাঁচা খাইলে অতি শীঘ্র জীর্ণ হয়। সিদ্ধ করিয়া খাইলে ইহা একটু দেরীতে পরিপাক হইয়া থাকে।

মৎস্য—বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ্য, ইহাতে ১৮ ভাগ অন্নসার আছে। ইহা অতি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর।

মাংস—মাংস বলিলে আমরা ছাগ বা ভেড়ার মাংস বুঝিয়া থাকি। অন্যান্য মাংস ধর্ম্মনিষিদ্ধ কাজেই আলোচনা অনাবশ্যক। ইহাতে ১৯ ভাগ অন্নসার আছে। মাইওসিন (Myosin) নামক অন্নসারই ইহাতে প্রধান।

গিলেটিন (Gelatin)—আমাদের দেশে ইহার ব্যবহারও প্রচলন নাই। হাড় সিদ্ধ করিয়া যে কাথ বাহির হয় তাহাকে গিলেটিন বলে। ইহা অনেক অংশে অন্নসার-রক্ষকের (Protein sparer) কার্য্য করিয়া থাকে। তবে ইহাতে ট্রাইওজিন ও ট্রিপটোফেন (Tryosin ও Tryptophen) থাকায় অন্নসার জাতীয় খাদ্যের জন্য ইহার উপর নির্ভর করিলে শরীরের হ্রাস হয়।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* এ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় মল্লিখিত "দুগ্ধের উপাদান" শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

উড়িষ্যা-সংবাদ

উড়িয়াজাতির সহিত বাঙ্গালীজাতির মিশ্রণ

উড়িয়াজাতি বাঙ্গালীর প্রতিবেশী। বহুকাল হইতে এই উভয় জাতির ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণ চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুতীর্থ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র উড়িষ্যার অন্তর্গত। সুদূর অতীত হইতে অদ্যাপি প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র বাঙ্গালী উড়িয়া-ভ্রাতৃগণের জন্মভূমি—হিন্দুগণের শ্রেষ্ঠ পুণ্যভূমি পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করেন। শুধু যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় লইয়াই উড়িয়াজাতির সহিত বাঙ্গালীজাতির এই ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণ তাহা নহে। বহু প্রাচীন কাল হইতে, এমন কি অশোকের পিতৃ-পিতামহের শাসন সময় হইতে উড়িয়াজাতি বহুবার বাঙ্গালীজাতির সহিত রাষ্ট্রীয় ঐক্য ভোগ করিয়াছে এবং সম-শাসন-জাত সুখ-দুঃখের সহানুভূতি লাভ করিয়াছে, বিগত শতাধিক বৎসর হইতে ইংরাজশাসনাধীনেও অবিচ্ছিন্নভাবে সেই ঐক্য-সুখ যে লাভ করিয়া আসিতেছে। বহু বঙ্গসন্তান বিবিধ কর্ম্মোপলক্ষে উড়িষ্যায় প্রবাস করিতেছেন এবং কেহ কেহ স্থায়ীভাবেও বাস করিতেছেন।

যে যে সূত্রে বাঙ্গালীর সহিত উড়িয়া-জাতির সংমিশ্রণ ও ভাব-বিনিময় সাধিত হইয়া আসিয়াছে, মহাপ্রভু চৈতন্যের উড়িষ্যায় ভক্তিযোগ-প্রচার তন্মধ্যে একটি প্রধান সূত্র। বঙ্গকুলগৌরব চৈতন্যদেবের ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিতে গিয়া উড়িয়াজাতি বাঙ্গালী-জাতির সহিত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রাণে প্রাণে মিশিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি বহু উড়িয়া চৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ভুক্ত এবং চৈতন্যদেবের সময় হইতে অদ্যাবধি সহস্র সহস্র উড়িয়াকণ্ঠে বঙ্গভাষায় রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী গীত হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, প্রতিবেশিতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়গত এই সংমিশ্রণের ফলে উভয় জাতির মধ্যে পরস্পরের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, রীতি-নীতি, ভাষা, শিল্প ইত্যাদির প্রভূত বিনিময় সংসাধিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই প্রতিবেশী জাতির সমাজ, ধর্ম্ম ও শিল্পকলাদির যৎকিঞ্চিৎ আধুনিক চিত্র প্রদান করা যাইতেছে।

উড়িষ্যার মঠ-মন্দিরসমূহ

উড়িষ্যার কথা মনে করিলেই প্রথমে আমাদের তথাকার অসংখ্য মঠ-মন্দিরের কথা মনে পড়ে। এত অধিকসংখ্যক মঠ ভারতবর্ষের অন্য কোথায়ও নাই। এই মঠ সকল উড়িষ্যাবাসিগণের ধর্ম্মপ্রাণতার ও দয়াদাক্ষিণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। নিয়মিতরূপে ঠাকুরসেবা, অতিথি-অভ্যাগতের সৎকার এবং সমাগত সাধুসন্ন্যাসিগণকে আশ্রয় প্রদান করিবার জন্যই এগুলি ধর্ম্মপরায়ণ সাধু মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন কালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই মহদুদ্দেশ্য-সাধন-কল্পে তাঁহারা স্বোপার্জ্জিত ও সহৃদয় দেশবাসিগণের নিকট হইতে সংগৃহীত প্রভূত অর্থ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠিত মঠে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল দেবোত্তর-সম্পত্তির বাৎসরিক

আয় একত্রে প্রায় সাত লক্ষ টাকা। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে অনেক মঠে এই টাকার সদ্ব্যবহার হইতেছে না। যে উদ্দেশ্যে মহাত্মাগণ ইহা উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, সে উদ্দেশ্যে ব্যয়িত না হইয়া অনেক স্থলে ইহার অপব্যয় হইতেছে। অনেক মঠেই এখন অতিথি-অভ্যাগতের স্থান হয় না, দীন-দরিদ্রের প্রতি অনুকূল দৃষ্টি নাই, সাধু সন্ন্যাসিগণ অনাদৃত। অনেক মঠের মোহান্ত বিলাসপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা এই অর্থের দ্বারা আপনাদিগের ভোগবিলাসিতার পরিতৃপ্তি করিতেছেন। ধর্ম্ম ও পরোপকারার্থে উৎসর্গীকৃত সম্পত্তির এবম্বিধ অসদ্ব্যবহারে সকলেরই ব্যথিত হইবার কথা। উড়িষ্যায় যতগুলি মঠ আছে, তাহার অধিকাংশই পুরী জেলায়। এক একটি মঠের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মাকে অনুসরণ করিয়া এখানে নামগত কতকগুলি সম্প্রদায় আছে। এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মগত কোন প্রকার বৈষম্য নাই। সকল মঠেই ৺জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি বা অন্য কোন বিষ্ণুবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। কোন কোন মঠে এই সকল ব্যতীত গৌরাঙ্গ, ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মূর্ত্তি দেখা যায়। নিম্নে কতগুলি বড় বড় মঠের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

শঙ্কর-সম্প্রদায় :—

গোবর্দ্ধন মঠ—ইহা স্বামী শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রভাবে হিন্দুধর্ম্ম যখন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছিল, সেই সময় হিন্দুগৌরব ভগবানের অবতাররূপী স্বামী শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হয়। তিনি স্বীয় অলৌকিক বুদ্ধি ও যুক্তি বলে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া ভারতে গরিমাকে পুনর্জীবিত করেন। এবং ইহার ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য ও প্রচার জীবিত রাখিবার জন্য ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপন করেন ও এক একটিতে এক এক জন প্রধান শিষ্যকে পরিচালক নিযুক্ত করেন। উত্তরে হরিদ্বারে জ্যোতির্মঠ (ইহাকে চলিত কথায় লোকে জোশী মঠ বলে); পশ্চিমে দ্বারকায় সারদা-মঠ; দক্ষিণে সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে শৃঙ্গেরিমঠ এবং পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন-মঠ।

অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ের পর হইতে তথায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃতির কথা অবগত হওয়া যায়। এমন কি অনেক ঐতিহাসিক ৺জগন্নাথদেবের মন্দির ও তৎসন্নিহিত অন্যান্য মন্দিরকে বৌদ্ধমন্দির বলিয়া অনুমান করেন। যাহা হউক, বৌদ্ধ-যুগে উড়িষ্যায় যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অদ্যাপি পুরী জেলায় ভুবনেশ্বর হইতে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী ধৌলি নামক পাহাড়ে অশোকের শিলা-খোদিত অনুশাসন বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্বামী শঙ্করাচার্য্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বৌদ্ধ-প্রভাবের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং সনাতন আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া উড়িষ্যা হইতে ইহাকে সমূলে উৎপাটিত করেন। পরধর্ম্ম হইতে আত্মরক্ষা ও স্বধর্ম্মের প্রচার জন্য গোবর্দ্ধন-মঠ স্থাপিত করিয়া তাঁহার ঋক্‌বেদজ্ঞ প্রধান শিষ্য পদ্মপাদ আচার্য্যকে মঠাধীশ

নিযুক্ত করেন। অদ্যাপি উপরোক্ত চারিটি মঠই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সকল মঠে এখনও অনেক সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রাধ্যায়ী অবস্থান করেন। সকলগুলিতেই বহু হস্ত-লিখিত ও মুদ্রিত শাস্ত্রগ্রন্থ রক্ষিত আছে। মঠের অধীশগণ হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। গোবর্দ্ধন-মঠের বর্ত্তমান অধীশ বা পরিচালক স্বামী মধুসূদন তীর্থ, ইনি স্বামী পদ্মপাদাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া এইখানকার ১৪৬ জন মঠাধীশের পর মঠাধীশ হইয়াছেন। দর্শন-শাস্ত্রে ইঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি আছে। কিছু-দিন হইল ইনি ধর্ম্মপ্রচারার্থ ভারত-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। বিগত চৈত্রমাসে কলি-কাতা নগরীতে আগমন করিলে অতি সম্মানের সহিত ধর্ম্ম-প্রাণ বিদ্বন্মণ্ডলী ইঁহার সাদর অভ্যর্থনা করেন। গোবর্দ্ধন-মঠ ব্যতীত পুরীতে শঙ্করানন্দ মঠ ও মহাপ্রকাশমঠ নামে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অপর দুইটি মঠ আছে।

চৈতন্য-সম্প্রদায় :—

(ক) রাধাকান্ত মঠ বা গৌরাঙ্গ-গম্ভীরা, (খ) গঙ্গামাতা-মঠ, (গ) রাধাবল্লভ মঠ। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে চৈতন্যদেবের উড়িষ্যায় ভক্তিযোগ প্রচার দ্বারা বাঙ্গালীজাতির সহিত উড়িয়াজাতির প্রাণে প্রাণে মিশ্রণ সাধিত হইয়াছিল। এরূপ কথিত আছে যে, চৈতন্য-দেব যখন শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে ভগবৎ-প্রেম বিতরণ করিতে উপস্থিত হন, তখন তাঁহার ভক্তিযোগ সম্বন্ধে উড়িষ্যা-প্রবাসী তাৎকালিক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও দার্শনিক বাঙ্গালী বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিচার হয়। বিচারে সার্ব্বভৌম মহাশয় চৈতন্যদেবের নিকট পরাজিত হন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ সার্ব্বভৌম মহাশয়কে মহাপ্রভুর পন্থা অবলম্বন করিতে দেখিয়া অন্যান্য বড় বড় পণ্ডিত এই ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এমন কি উড়িষ্যার তাৎকালিক রাজা প্রতাপ-রুদ্র এবং উদীয়মান বঙ্গসন্তান রামানন্দ রায় গৌরাঙ্গদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই রূপে ক্রমে ক্রমে সহস্র সহস্র উড়িষ্যাবাসী বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হন। চৈতন্যদেব বহুদিন শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করেন। তথা হইতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে সেই স্থানেই ফিরিয়া আসেন। কথিত আছে শ্রীক্ষেত্রেই তাঁহার মানবলীলার অবসান হয়। অদ্যাপি অধিকাংশ হিন্দু-পরিবারে শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিত। উপরের রাধাকান্তমঠ বা গৌরাঙ্গ-গম্ভীরার কথা উল্লিখিত হইল, তথায় মহাপ্রভুর ব্যবহৃত মৃৎকমণ্ডলু ও একখানি কন্থা আছে। কমণ্ডলুটি কিঞ্চিৎ ভগ্ন হইয়াছে। কন্থাখানি কাচের আবরণযুক্ত একটি ছোট বাক্সে অতি যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে। মঠের সেবকগণ দর্শকবৃন্দকে আগ্রহের সহিত এই সকল দ্রব্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই মঠে একটি গ্রন্থশালা আছে, তাহাতে অনেক বৈষ্ণবগ্রন্থ ও অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থ রহিয়াছে।

শ্রী বা অতিবড়ি সম্প্রদায় (বৈষ্ণব-সম্প্রদায়) :—

উড়িষ্যার ভক্ত কবি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদক ৺জগন্নাথ দাস এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহাদের দুইটী মঠ আছে। বড় উড়িয়ামঠ এবং সান উড়িয়ামঠ। উড়িয়া-ভাষায় সান শব্দের অর্থ ছোট।

রামানুজ-সম্প্রদায় :—

(ক) এমার-মঠ বা রাজগোপাল-মঠ, (খ) দক্ষিণ পার্শ্বমঠ, (গ) উত্তর পার্শ্বমঠ,—৺জগন্নাথ-দেবের মন্দিরের দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্বে মঠ দুইটি অবস্থিত বলিয়া তাহাদের ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। (ঘ) রাঘবদাস-মঠ।

নানকপন্থী-মঠ বা পঞ্জাবী-মঠ। ইহা সমুদ্র-তীরের নিকটবর্ত্তী। এইখানে বাবা নানকের উৎকৃষ্ট সঙ্গীত মধুর কণ্ঠে গীত হইত।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বা জটিয়া বাবাজীর জটিয়া-মঠ ও কোটভোগ-মঠ।

উড়িষ্যায় অসংখ্য মন্দির আছে। তাহা-দিগের মধ্যে প্রধান প্রধানগুলির নামোল্লেখ করা গেল।

পুরীতে—জগন্নাথ-মন্দির (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ); বিমলামন্দির; লোকনাথ-মন্দির; কপাল-লোচন-মন্দির; সিদ্ধ মহাবীর। সত্যবাদীতে সাক্ষীগোপাল-মন্দির। ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ-মন্দির; অনন্ত-বাসুদেব-মন্দির; কেদার গৌরী-মন্দির (ইহার চারিপার্শ্বে কতকগুলি কুণ্ড আছে, তাহার দৃশ্য বড়ই মনোহর এবং কয়েকটির জলও স্বাস্থ্যকর)। এখানে শিবমন্দিরের সংখ্যাই বেশী। কোণারকে সূর্য্যমন্দির। কাকটপুরে মঙ্গলা-মন্দির। যাজপুরে বিরজা-মন্দির (পীঠস্থান), ইহার অনতিদূরে বৈতরণী নদী প্রবাহিত। কটকে—ধবলেশ্বর-মন্দির। কেন্দ্রপাড়ায় বলদেবজিউ। সম্বলপুরে—সম্বলাই-মন্দির। এই সকলের মধ্যে পুরীর জগন্নাথমন্দির, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজমন্দির এবং কোণারকের সূর্য্যমন্দিরই সর্ব্বপ্রধান এবং ইতিহাস-বিখ্যাত। যে প্রস্তরশিল্পের জন্য উড়িষ্যা ভারতবিখ্যাত এবং ঐতিহাসিক ও কলাবিদ্-গণের অতি সমাদরের স্থান, সেই প্রাচীন শিল্পকলার আধার এই মন্দিরসমূহ। এই সকল শিল্পকলায় বিদেশীয় প্রভাবের চিহ্ন মাত্র নাই। *

জগন্নাথদেবের মন্দিরের নির্ম্মাণকাল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন ইহা গঙ্গাবংশীয় নরপতি গঙ্গেশ্বর বা চোড় গঙ্গাদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় এবং কেহ কেহ ইহাকে সেই বংশীয় পরবর্ত্তী নরপতি অনঙ্গভীমদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া মনে করেন। উভয়েই দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। চোড়গঙ্গাদেব প্রথম অর্দ্ধাংশে এবং অনঙ্গ-ভীমদেব শেষভাগে রাজত্ব করেন। এই মন্দিরের বর্ত্তমান বিগ্রহ ইঁহাদিগের কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মন্দির-নির্ম্মাণের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী কাল হইতে অধিষ্ঠিত ও পূজিত পুরুষোত্তম-বিগ্রহকে রক্ষা করিয়া বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের সীমা-প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ৬৬৫ ফিট এবং প্রস্থ ৬৩০ ফিট, ইহার গর্ভবেদীমূলক বা মূলমন্দিরের চূড়া ১৯২ ফিট উচ্চ। প্রাচীরের উচ্চতা ২০ ফিট। মন্দিরের বহির্দ্দেশে সিংহদ্বারের সম্মুখে একটি অরুণস্তম্ভ আছে, তাহা একটি প্রকাণ্ড-কায় কৃষ্ণপ্রস্তর কাটিয়া প্রস্তুত, ইহা উচ্চে ১২ হাত।

এই মন্দিরের গাত্রে যে সমস্ত শিল্প উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা স্থানে স্থানে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। কোন কোন স্থান একেবারেই নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহার সংস্কার সাধিত

* Orissa and her Remains by M. M. Ganguli, Ch. I.

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির
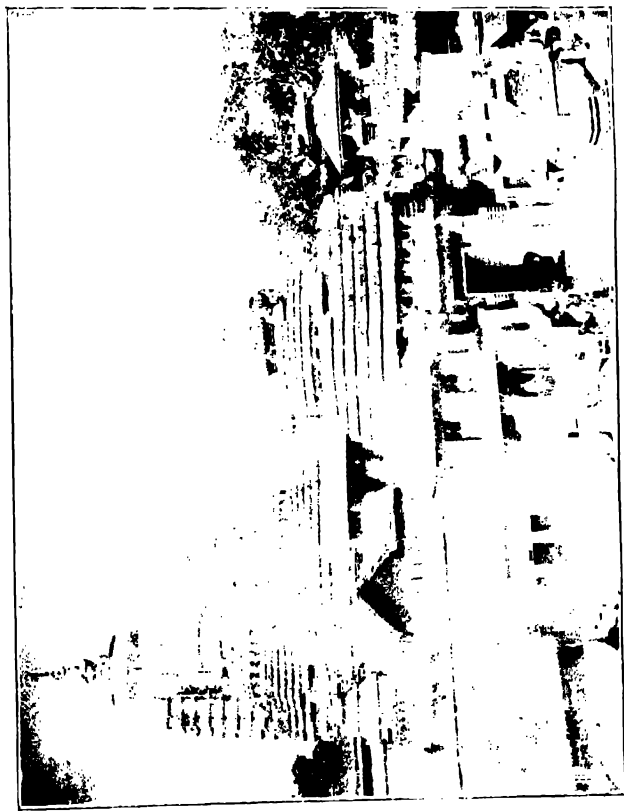
হইয়াছে। কিন্তু এই সংস্কার-ক্রিয়ায় পূর্ব্ব কারুকার্য্য রক্ষিত হয় নাই। যে যে স্থান সংস্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের সঞ্চার হয়। বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বকালের ন্যায় শিল্পকলাবিদ্ উড়িষ্যায় অতি বিরল। তথাপি যে দুই-একজন এখনও প্রসিদ্ধ শিল্পী বলিয়া খ্যাত, শিল্প-কলার সংরক্ষণে তাদৃশ যত্ন না থাকায় তাঁহাদিগের সমাদরও অতি অল্প। ভুবনে-শ্বরের বৈরাগী মহারাণা একজন বিখ্যাত প্রস্তর-শিল্পী। ইনি উড়িষ্যার প্রাচীন শিল্প-কলার অনুরূপ কার্য্য করিতে পারেন। ভুবনেশ্বর ও তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ স্থানসমূহেই মন্দিরের সংখ্যা অধিক। এত অধিক মন্দির দেখিয়া এ স্থানটিকে মন্দিরের বন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই স্থানে ভগ্ন মন্দিরের সংখ্যাও অধিক। এখানকার মন্দিরসমূহের মধ্যে লিঙ্গরাজ-মন্দির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ইহাই ভুবনেশ্বরের মন্দির বলিয়া খ্যাত। মন্দিরের মধ্যস্থ কতকগুলি সুচারু দেবদেবী-মূর্ত্তি অস্বাভাবিকরূপে ভগ্ন। শুনা যায় কালাপাহাড় এই সকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছেন। জগন্নাথ-মন্দিরেও কতকগুলি ভগ্নমূর্ত্তির কারণস্বরূপ ঐ একই কথা শুনা যায়।

ভুবনেশ্বরের মন্দির নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কেশরী বংশীয় নরপতি যযাতি কেশরী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। কিন্তু ইহার কতকগুলি অংশ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়।* মন্দিরের সীমার দৈর্ঘ্য ৫২০ ফিট এবং প্রস্থ ৪৬৫ ফিট। মূল মন্দিরের চূড়া ১৬০ ফিট উচ্চ। ভুবনেশ্বরের বড় পাণ্ডা একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও দার্শনিক এবং কবি। ইনি 'অলঙ্কার[illegible]বোধোদয়' নামক একখানি উৎকৃষ্ট অলঙ্কারশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

কোণারক পুরী সহর হইতে ২১ মাইল পূর্ব্বে। এখানকার সূর্য্যমন্দিরকে সাধারণতঃ লোকে কোণারকের মন্দির বলে। ইহা গঙ্গাবংশীয় নরপতি প্রথম নৃসিংহদেব কর্ত্তৃক ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে নির্ম্মিত হয়।† মন্দিরের দৈর্ঘ্য [illegible] ফিট এবং প্রস্থ ৫৪০ ফিট। ইহার চূড়া ১৮০ ফিটেরও অধিক উচ্চ ছিল। কিন্তু বহুদিন হইল চূড়া ও উপরিভাগের বহু অংশ একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে এরূপ কথিত আছে যে মন্দিরের চূড়ায় একটি প্রকাণ্ড চুম্বক-প্রস্তর সংযুক্ত ছিল। তাহা অদূরবর্ত্তী সমুদ্রতীরস্থ [illegible] পোতসকলকে আকর্ষণ করিয়া [illegible] নিক্ষেপ করিত। পোতসমূহের [illegible] দুর্দ্দশায় অবশেষে একদল [illegible] আকর্ষণ-গণ্ডীর কিয়দ্দূরে পোত হইতে অবতরণ করিয়া সহসা মন্দির আক্রমণকরতঃ চূড়ার ধ্বংসসাধন পূর্ব্বক ঐ প্রস্তর অপহরণ করে। পক্ষান্তরে ইহার স্বাভাবিক পতনের কথাও শ্রুত হওয়া যায়। কথিত আছে দ্বাদশ বৎসরের রাজস্ব ব্যয়ে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। "এই সময়ে কলিঙ্গ-রাজের বার্ষিক তিন কোটী টাকা রাজস্ব আদায় হইত।"‡ যাহা হউক, বহুপরিমাণে

* Orissa and her Remains, by M. M. Ganguli, P. 363.

† Ibid, Pp. 401-404. ‡ Ibid P. 4[illegible]

ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা হিন্দু-স্থাপত্য-বিদ্যার গৌরবের একটি প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। তাহার নির্ম্মাণপ্রণালী ও চিত্রকলা দর্শনে চমৎকৃত হইতে হয়। 'আইন-ই-আকবরী'-প্রণেতা আবুলফজল ইহার নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন "যাঁহাদিগের সমালোচনা বড়ই কঠোর এবং যাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করা কঠিন, তাঁহারাও ইহার দৃশ্যে বিস্মিত হন।" প্রস্তর কাটিয়া গজারূঢ় সিংহ এবং পৃথক্ পৃথক্ গজ ও সিংহ প্রস্তুত করণে ও প্রস্তরগাত্রে তাহাদিগকে খোদিত করণে উড়িষ্যার শিল্পিগণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এবং এই সকলের প্রচলন অত্যধিক মাত্রায় ছিল। এরূপ মন্দির বোধ হয় এখানে নাই যাহাতে ইহা দৃষ্ট না হয়। গ্রামে গ্রামে কোন কোন গৃহস্থের বাটীর সম্মুখেও এইরূপ ছোট ছোট সিংহ অথবা গজমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। উড়িষ্যার প্রধান মন্দিরগুলি দেখিতে প্রায় এক রকমের, এখানে অনেক পুণ্যসলিল সরোবর আছে তাহাদের প্রত্যেকটিরই মধ্যস্থানে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরবিশেষ দেখা যায়। ভুবনেশ্বরের বিন্দুসরোবরটি অতি বৃহৎ, ইহা দৈর্ঘ্যে ১৩০০ ও প্রস্থে ৭০০ ফিট।

কালের প্রবাহে উড়িষ্যার মন্দিরসমূহের অনেকগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং অনেকগুলি ধ্বংসোন্মুখ। প্রাকৃতিক ধ্বংস ভিন্ন কালাপাহাড় অনেক দেবমূর্ত্তি ও মন্দির বিনষ্ট করিয়া গিয়াছেন। প্রধান প্রধান মন্দিরের নষ্ট স্থানসমূহের সংস্কার সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। মন্দিরসমূহের প্রতিষ্ঠাতৃরাজগণ কর্ত্তৃক দেব-সেবা-উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি হইতে এবং যাত্রিগণের দত্ত অর্থ হইতে মন্দিরের সকলপ্রকার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। এই সকল মন্দিরের মধ্যে জগন্নাথদেবের মন্দিরের ঠাকুরসেবা প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য-নির্ব্বাহ একটি বিরাট-ব্যাপার। রথযাত্রা, দোলযাত্রা, স্নানযাত্রা, চন্দনযাত্রা প্রভৃতি উৎসব স্বচক্ষে দর্শন না করিলে ইহার প্রকৃত অনুভূতি হয় না। রথযাত্রাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসব এবং অতুলনীয়। এই সময় ভারতের সকল প্রদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়। নিত্যসেবায়—প্রত্যহ অনেকবার নানা দ্রব্য দ্বারা ঠাকুরের ভোগ হয়। এই সকল ভোগের মধ্যে কয়েকবার অন্নভোগ হয়। ইহার রন্ধনশালার বিশালতা দর্শন করিলে ভোগের পরিমাণের বিশালতা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়। ঠাকুর-সেবা হইয়া গেলে অন্নভোগের মহাপ্রসাদ ও অন্যান্য সকল প্রসাদ মন্দিরমধ্যস্থ আনন্দ-বাজারে বিক্রীত হয় এবং স্থানীয় অনেক মঠে নীত হয়। অধিকাংশ পুরীনগরবাসী প্রত্যহ এই মহাপ্রসাদ ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করেন। এখানে স্ব স্ব গৃহে রন্ধনের বন্দোবস্ত খুব কম। এতদ্ব্যতীত রাশি রাশি মহাপ্রসাদ প্রত্যহ নানাস্থানে নীত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর এখানে রথযাত্রাদি উৎসবে যে অগণ্য যাত্রীর সমাগম হয় তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি এই মহাপ্রসাদ হইতেই হইয়া থাকে। প্রসাদ-ভক্ষণে জাতিভেদ নাই। একজন অস্পৃশ্যজাতি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের মুখে এবং ব্রাহ্মণ তাহার মুখে অম্লানবদনে প্রসাদ তুলিয়া দিতেছে। যে হিন্দুধর্ম্মে জাতিভেদের এত বাঁধাবাঁধি, এত কঠোর-শাসন, শ্রীক্ষেত্রে প্রসাদভক্ষণে তাহা একেবারে শিথিল;

তাহার চিহ্নমাত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। জগন্নাথদেবের মন্দিরের বর্ত্তমান তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত গৌরীশ্যাম মহান্তি একজন আদর্শচরিত্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ। শিক্ষাবিষয়েও ইঁহার পৃষ্ঠপোষকতা আছে।

সমাজ-চিত্র

উড়িষ্যায় নানাধর্ম্মাবলম্বী লোক আছে। হিন্দুর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শতকরা ৯৫ জন হিন্দু। মুসলমান শতকরা ২ জন। খৃষ্টানের সংখ্যাও খুব কম, যাহা আছে তাহাদিগের মধ্যে দীক্ষিত উড়িয়াই অধিক। এখানে ব্রাহ্মণ, করণ, খণ্ডাইত, চসা বা তসা, গউড়, কান্দ্র এবং পান প্রভৃতি জাতিই প্রধান। করণ জাতির কাজ লেখা-পড়া করা, লেখনী ধারণই তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রধান উপায়। এখানে লেখা-পড়ার কাজে তালপত্রের ব্যবহার খুব বেশী। নরুণের মত লৌহশলাকা দিয়া খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া ইহাতে অক্ষর কাটা হয় এবং মসী লেপন করিয়া তাহা মুছিয়া ফেলিলেই উজ্জ্বল লেখা ফুটিয়া উঠে।

খণ্ডাইত ও তসা জাতিদ্বয় প্রধান কৃষি-জীবী। গউড় আমাদের দেশের গোয়ালের অনুরূপ। কান্দ্র ও পান জাতিদ্বয় শ্রমজীবী অর্থাৎ মজুর-শ্রেণীর অন্তর্গত। আমাদের বঙ্গদেশে সূত্রধর ও কামার দুইটি পৃথক্ জাতি আছে, এখানে সেরূপ নাই, এক জাতিই দুই কাজ করে। একভাই সূত্রধর অন্যভাই কামার। ইহাদিগকে বড়ই বলে। উড়িষ্যার রজকেরাও বঙ্গদেশ হইতে কিছু ভিন্ন ধরণের। ইহাদের দুইটি ব্যবসায়, কাপড়-ধোয়া ও কাঠ-চেরা। অন্যজাতি কাঠ কাটিতে পারে, কিন্তু [illegible] তাহার জাতি যাইবে। আজকাল সকল দেশে যেরূপ জাতিগত ব্যবসায়ের বৈলক্ষণ্য ঘটিতেছে, এখানেও তদ্রূপ ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

স্ব স্ব জাতির [illegible] মঙ্গলের জন্য এখানে দুই একটি জাতীয় আন্দোলন দেখিতে পাওয়া যায়। পুরীর ব্রাহ্মণগণের এই প্রকার আন্দোলনের ফলে 'উৎকল ব্রাহ্মণ-সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য উৎকলীয় নিঃস্ব ব্রাহ্মণগণকে শিক্ষাবিষয়ে [illegible] করা। পুরীর ৺রামচন্দ্র দাস ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই উদ্দেশে তিনি কিছু অর্থদান করিয়া গিয়াছেন। পুরী জেলা স্কুলের [illegible] পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র এই সমিতির সভাপতি এবং প্রধান উদ্যোক্তা।

করণগণেরও 'উৎকল করণ-সমিতি' নামে এই প্রকার একটি প্রতিষ্ঠান আছে। ইহারও উদ্দেশ্য স্বজাতীয় দরিদ্র বালকগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। পুরীর বাবু রাধাশ্যাম মহান্তি উকীল প্রমুখ ব্যক্তিগণ ইহার পরিচালক। পুরীতে কুষ্ঠরোগী এবং যক্ষ্মা রোগীদিগের জন্য দুইটী স্বতন্ত্র আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শিক্ষাবিষয়ে উড়িষ্যা অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। সমস্ত উড়িষ্যায় একটি কলেজ (কটক র‍্যাভেন্‌সা)। [illegible] উচ্চ ইংরাজী-বিদ্যালয় আছে। ইহা ছাড়া ৭৫টি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়, কতকগুলি মধ্য উড়িয়া বিদ্যালয় এবং অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। কটকে একটী মেডিক্যাল স্কুল, একটি কৃষি স্কুল, একটী সার্ভে স্কুল, একটি গুরুট্রেণিং স্কুল

এবং একটি বস্ত্রবয়নবিদ্যালয় আছে। পুরী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য টোল আছে। পুরীর টোলের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মিশ্র মহাশয় উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। উড়িষ্যার সাহিত্য-ভাণ্ডারও অতিক্ষুদ্র। ভাষার উন্নতির জন্য 'উৎকল সাহিত্য-সমাজ' নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট-উড়িয়া-অনুবাদক শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস তাহার সম্পাদক। কিন্তু ইহার কাজ অতি মৃদুমন্দ চলিতেছে।

শিক্ষাপ্রচারের জন্য উচ্চ-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আজকাল আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থত্যাগ দেখা দিয়াছে। পুরীর সত্যবাদী নামক স্থানে কয়েকজনের এইরূপ আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থত্যাগের ফলে প্রায় তিন বৎসর হইল একটি বিদ্যামন্দির স্থাপিত হইয়াছে। ইহা প্রথমে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে উচ্চ ইংরাজী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত এখানে খোলা হইয়াছে। আগামী সেসন হইতে প্রথম শ্রেণী খুলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার ইচ্ছা ইঁহাদের আছে। কিছুদিন হইল দৈববিড়ম্বনায় বিদ্যামন্দিরটি দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় ইহাকে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে বর্ত্তমান সময়ে দেড়-শতেরও অধিক ছাত্র অবস্থান করিতেছে। সাধারণ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ন্যায় কেবলমাত্র একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা ইঁহাদিগের উদ্দেশ্য নহে। ইহার সঙ্গে জাতি-নির্ব্বিশেষে বয়ন, সূত্রধরের কাজ প্রভৃতি অন্যান্য শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত থাকিবে। পরসেবা, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি সৎকর্ম্মে বালকদিগের কর্ত্তব্যবোধ জন্মাইবার জন্যও ইঁহাদিগের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ দাস, এম-এ, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। উড়িষ্যায় শিক্ষা প্রচার করিবার জন্য ইনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

পুরীর উকীল শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু দাস এই বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ইহার জন্য অনেক অর্থ দান করিয়াছেন।

স্ত্রীশিক্ষার প্রচারের জন্যও আজকাল চেষ্টা চলিতেছে। কটকের শ্রীমতী শৈলবালা দাস এবং 'প্রভাত'-পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী রেবা রায় উড়িষ্যায় স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

উড়িষ্যার সংবাদপত্রগুলির মধ্যে একখানি ইংরাজী ভাষায় ও অপরগুলি উড়িয়া ভাষায় পরিচালিত নিম্নে তাহাদের নামোল্লেখ করা গেল।

ষ্টার অব্ উৎকল	(সাপ্তাহিক)	সম্পাদক	শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়,	কটক
উৎকল-দীপিকা	(সাপ্তাহিক)		শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর রায় *	
মুকুর	(মাসিক)		শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর দাস	
উৎকল-সাহিত্য	(মাসিক)		শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর	
প্রভাত	(মাসিক)		শ্রীমতী রেবা রায়	

* বোধোদয়, চরিতাবলী, কথামালা প্রভৃতি অনেক স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ ইঁহার দ্বারা উড়িয়া ভাষায় অনূদিত হয়। ইনি একজন উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালী। উড়িয়াভাষা ইঁহার নিকট বিশেষ রূপে ঋণী। ইনি বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরবের বিষয়।—শ্রীমতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত উড়িষ্যার চিত্র

উড়িষ্যার পরলোকগত
কবিবর রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর

India Press, Calcutta

এতদ্ব্যতীত বালেশ্বর হইতে 'সংবাদ-বাহিকা' ও করদমিত্ররাজ্যসমূহ হইতে দুইখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

উড়িষ্যার সম্প্রতি পরলোকগত খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের কিছু পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে।

৺রাও মধুসূদন রাও বাহাদুর, পুরী—ইনি বিদ্যোৎসাহী ও পরোপকারী ছিলেন। কটক ভিক্টোরিয়া স্কুলের স্থাপনা করেন। ইনি কবি ছিলেন। বসন্তগাথা, ছন্দমালা, সঙ্গীতমালা ও প্রবন্ধমালা (গদ্য) প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার রচিত।

বালেশ্বরের ৺রাধানাথ রায় বাহাদুর – বিদ্যানুরাগী ও বর্ত্তমান উৎকল সাহিত্যের প্রধান কবি ছিলেন। মহাযাত্রা, চিল্কা, নন্দকিশোরী, ঊষা, যযাতিকেশরী, পার্ব্বতী প্রভৃতি অনেকগুলি কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন।

ময়ূরভঞ্জের মিত্ররাজা ৺রামচন্দ্র ভঞ্জদেব—সুশাসক, শিক্ষা-ও-সাহিত্যানুরাগী ছিলেন।

খণ্ডপাড়ার (করদ মিত্ররাজ্য) ৺মহামহোপাধ্যায় সামন্ত চন্দ্রশেখর সিংহ—প্রসিদ্ধ হিন্দু-জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। ইনি স্বহস্তনির্ম্মিত যন্ত্রদ্বারা গ্রহাদির গণনা করিতেন। এই যন্ত্র তাঁহার গৃহে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইনি "সিদ্ধান্তদর্পণ"-নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা।

৺শ্যামসুন্দর রাজগুরু——সাহিত্যসেবী ছিলেন। উৎকল-সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। 'উৎকল-সাহিত্য' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

বামণ্ডা করদমিত্র রাজ্যের রাজা ৺সার সুঢ়লচন্দ্র দেও, কে, সি, এস্, আই—সুশাসক, বিদ্যোৎসাহী, সংস্কৃত সুপণ্ডিত এবং কবি ছিলেন। 'চিত্রোৎপলা'-কাব্য ইঁহার প্রণীত।

জীবিত সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে বালেশ্বরের কবি শ্রীযুক্ত ফকিরমোহন সেনাপতি উৎকল সাহিত্যের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন। রামায়ণের পদ্যানুবাদ, ভগবদ্গীতার পদ্যানুবাদ, মহাভারতের পদ্যানুবাদ, উপনিষদের অনুবাদ এবং ছয়মাণ আটগুঠ (উপন্যাস) ও উপহার (পদ্য) প্রণয়ন করিয়াছেন।

কটকের শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর রায় কাঞ্চীকাবেরী, সীতার বনবাস, কলিকাল এবং কাঞ্চনমালা, এই কয়খানি নাটক এবং বিবাসিনী (উপন্যাস) প্রণয়ন করিয়াছেন।

ব্যবসায়োপযোগী শিল্প

উড়িষ্যার ব্যবসাবাণিজ্যের উপযোগী শিল্পের মধ্যে কাঁসা ও পিতলের বাসন, তুলার কাপড়, হাতীর দাঁত, হরিণের ও মহিষের শিংএর জিনিস এবং রূপার অলঙ্কার প্রধান। কটকে রূপার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তার হইতে এরূপ কারুকার্য্যপূর্ণ সুচারু অলঙ্কার প্রস্তুত হয় যে, বোধ হয় ভারতে অন্যত্র সেরূপ হয় না। এখানে তুলা হইতে সকল জেলাতেই যথেষ্ট কাপড় প্রস্তুত হয়। তন্মধ্যে কটকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। এখানকার অধিকাংশ লোক নিজেদের তাঁতে বোনা কাপড়ই অধিক ব্যবহার করে। এ বিষয়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় উড়িষ্যা অধিক স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে নাই। যে সকল কারণে উড়িষ্যায় বিদেশীয় বস্ত্র প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই, তন্মধ্যে এখানকার সাধারণ-শ্রেণীর উপযোগী বস্ত্র বিদেশীয় বস্ত্রাপেক্ষা

সুলভ ইহা একটি প্রধান কারণ। কটক ও পুরী জেলায় তুলা হইতে সূক্ষ্ম ও চিক্কণ বস্ত্র এবং রেশমের পা'ড়যুক্ত উৎকৃষ্ট বস্ত্রও প্রস্তুত হইয়া থাকে। কটকে হাতীর দাঁত হইতে বিবিধ মনোহর দ্রব্য এবং মহিষের শিং হইতে কলম, কলমদানি, নস্যের কৌটা, চিরুণী, ছড়ি এবং নানাপ্রকার খেলনা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। হরিণের শিং হইতেও ঐ প্রকার অনেক রকম জিনিষ তৈয়ারী হয়। এই সকল জিনিষ উড়িষ্যার বাহিরেও নানা স্থানে রপ্তানী হয়। কাঁসা ও পিতলের বাসন ও অন্যান্য দ্রব্য সকল জেলাতেই প্রস্তুত হয়। পুরী-সহরে তাহার আমদানী অধিক হয়। ভারতের সকল প্রদেশ হইতে সমাগত লক্ষ লক্ষ যাত্রী প্রতিবৎসর এই সকল দ্রব্য আদরের সহিত ক্রয় করে। কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান হইতেও পুরীতে কাঁসা পিতলের অনেক জিনিষ আমদানী হয়। কাঁসা, পিতল ও গালা হইতে স্থানীয় ব্যবহারের জন্য সকল জেলাতে প্রচুর অলঙ্কার প্রস্তুত হয়। পুরী জেলায় আক হইতে 'কন্দ' নামক এক প্রকার চিনি প্রস্তুত হয়। ইহার দানা খুব মোটা। সম্বলপুরের প্রধান শিল্প তসর নামক বস্ত্র। পূর্ব্বে এ জেলাতেই তসর পোকার চাষ হইত, এখন ছোটনাগপুর ও সন্নিহিত করদরাজ্য-সমূহ হইতে আমদানী হয়। এই কাপড় স্থানীয় লোকেই অধিক ব্যবহার করে। অল্প পরিমাণে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে রপ্তানি হয়। পুরী জেলায় এবং বারম্বা ও টেগরিয়া এই দুইটি করদরাজ্যেও তসর প্রস্তুত হয়। আঙ্গুল জেলার লোহার জিনিষ প্রসিদ্ধ।

এই সকল ছাড়া কটক পুরীও আঙ্গুল জেলায় বেত ও বাঁশের ঝুড়ি, পেটারি এবং বালেশ্বর ও আঙ্গুলে মাদুর প্রস্তুত হয়। করদরাজ্যসমূহের মধ্যে খণ্ডপাড়া ও নরসিংহপুরে পিতল কাঁসার পাত্র বহু পরিমাণে প্রস্তুত হয়। বোদ, ঢেনকেনাল, দশপল্লা, খণ্ডপাড়া, ময়ূরভঞ্জ এবং পালবরে কুঠার, কোদাল, দা, ছুরি প্রভৃতি লোহার জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এগুলি কেবল স্থানীয় অভাব মোচন করে। বারম্বা ও টেগরিয়ায় তুলার কাপড় প্রস্তুত হয়। ঢেনকেনাল ও নয়াগড়ে হাতীর দাঁতের জিনিষ তৈয়ারী হয়।

নিম্নে উড়িষ্যার শিল্পবাণিজ্যের কয়েকটী প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নামোল্লেখ করা গেল।

১। উৎকল ট্যানারি—কটক। ২। উৎকল আর্ট ওয়্যার্স—কটক। এই দুইটিরই প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস সি, আই, ই। ইনি উড়িষ্যার জন-নায়ক, দেশহিতৈষী, বক্তা এবং বড়লাট ও ছোটলাটের সভার সদস্য। 'উৎকল-সম্মিলনী' স্থাপয়িতা। ৩। জি, সি, পুষ্টি ব্রাদার্স—কটক। ইহা সোনারূপা এবং হাতীর দাঁত ও শিংএর কারুকার্য্যের কারখানা। ৪। কটক ট্যানারি। ৫। জেনাপুর লাইমওয়ার্কস—বালেশ্বর। ৬। যোবরা রাইস্‌মিলস্—কটক। ৭। কটক হোসিয়ারি।

করদ ও মিত্ররাজ্য

উড়িষ্যায় ২৪টি করদ ও মিত্র রাজ্য আছে। তন্মধ্যে ময়ূরভঞ্জ, কেঁয়ুঞ্জর, ঢেনকেনাল, বোদ, আটমলিক, নয়াগড়, রণপুর, খণ্ডপাড়া এই কয়টি প্রধান। উড়িষ্যার

বিভাগীয় কমিশনার এবং অপর একজন পলিটিক্যাল এজেণ্ট এই রাজ্যসমূহের তত্ত্বাবধান করেন। ব্রিটিশ-শাসিত উড়িষ্যার ভূপরিমাণ অপেক্ষা এই রাজ্যসমূহের একত্রে ভূপরিমাণ অধিক, কিন্তু লোকসংখ্যা তুলনায় অনেক কম।

শ্রীব্রজগোপাল দাস।

আধুনিক বিদ্যালয় ও সমাজশক্তির কেন্দ্র

আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় কতিপয় গুরুতর দোষ

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কতকগুলি গুরুতর দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দোষগুলি দূর না করিলে শত চেষ্টাদ্বারাও বিদ্যালয়গুলির উন্নতিসাধন বা সংখ্যাবৃদ্ধি হইবে না। আমি আজ সেই দোষগুলি সংক্ষেপে দেখাইয়া, তাহাদের নিবারণের কতিপয় উপায় ইঙ্গিত করিব। আশা করি, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমহাশয় ও শিক্ষাসংস্কারকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিবেন।

শিক্ষকগণের শিক্ষাতত্ত্বে অনভিজ্ঞতা, সুতরাং প্রহার-নীতির প্রভাব

বিদ্যালয়গুলির কথা মনে করিলেই প্রথমে গুরুমহাশয়গণের যষ্টির "সপাং সপাং" শব্দ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে। তাঁহাদের বিশ্বাস, যষ্টিপ্রহারই ছেলেকে মানুষ করার রাজপথ। ক খ হইতে আরম্ভ করিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উচ্চ শ্রেণিগুলি পর্য্যন্ত এই "ধনঞ্জয়" যষ্টির বিরাম নাই। ইতিহাসের সাল তারিখ বলিতে একটু এদিক ওদিক হইল— অমনই চপেটাঘাত; দক্ষিণ আমেরিকার নদীগুলির নাম "ঝাড়া মুখস্থ" বলিতে গিয়া একটু উলট্ পালট্ হইল—অমনই "সপাং" এক ঘা; ভীষণাকার এক জটিল ভগ্নাংশ সরল করিতে গিয়া যদি কোনও স্থানে ছয়ের যায়গায় নয় হইয়া গেল—অমনই বেঞ্চের উপর দণ্ডায়মান;—ইত্যাদি। এই ত গেল ছাত্রের মানসিক দুর্ব্বলতার শাস্তি; তারপর নৈতিক দুর্ব্বলতার দণ্ড আছে। ইহার শাস্তি আরও নিষ্ঠুর ও মর্ম্মান্তিক; কারণ আমরা চরিত্রকেই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান মনে করিয়া থাকি। ইহাদের বালকদের কোনমতেই নিস্তার নাই। যদি সৌভাগ্যক্রমে কোনও বালক জন্মের সঙ্গে নির্দ্দোষ দেহ-মন-নীতি লইয়া আইসে, তবেই সে কোনও রকমে বেত্রের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে— তদ্ব্যতীত আর কাহারও উদ্ধার নাই।

ব্যাপকভাবে শিক্ষানীতির অনুসরণই ইহার নিবারণের প্রকৃষ্ট পন্থা

এখন প্রশ্ন এই, ইহার জন্য দোষী কে? ছাত্র না শিক্ষক? ব্যক্তিগতভাবে বিচার করিলে অনেকে উভয়কেই স্ব স্ব কর্ম্মের জন্য দোষী করিবেন। কিন্তু আজকালকার মতে কোন ব্যক্তির ভালমন্দ চরিত্র কেবল তাহারই কর্ম্ম ও বংশলব্ধ বিশেষ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না। ইহাতে পারিপার্শ্বিকেরও অনেক প্রভাব বিদ্যমান আছে। অতএব কাহারও

চরিত্র বিচার করিতে হইলে বংশ ও পারিপার্শ্বিক উভয়কেই বিবেচনার বিষয়ীভূত করিতে হইবে। দোষ করায় হয় ত বংশের প্রভাব বেশী থাকিতে পারে, কিন্তু দোষ-সংশোধনে পারিপার্শ্বিকই অধিকতর শক্তিমান্। সুতরাং দোষসংশোধনের জন্য যখন শিক্ষকমহাশয় ছাত্রকে কেবলই প্রহার করেন, অথবা কুশিক্ষার জন্য শিক্ষকমহাশয়কে তাঁহার "উপরওয়ালা" কেবলই তাড়া দেন—তখন বুঝিতে হইবে, তাঁহারা উভয়েই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, সামাজিক জীবের উন্নতির জন্য নির্জ্জন কারাবাসের ব্যবস্থা করিতেছেন। অনেকে বলেন, মাঝে মাঝে দু'এক ঘা না দিলে ছাত্রের তন্দ্রা ভাঙ্গে না, তাহার জড়িমা-যুক্ত দেহ-মন কর্ম্মসাধনের জন্য উপযুক্ত শক্তি ও উত্তেজনা লাভ করে না। কিন্তু আবার অনেকে বলেন, এ সব ভুল বিশ্বাস। তাঁহারা বলেন—মানুষ ত পশু নয়; তাহার ইন্দ্রিয়-গুলি অধিকতর পুষ্ট; মানসিক ও নৈতিক জ্ঞান এবং শারীরিক বললাভের জন্য সে অনেক উচ্চতর নীতি অবলম্বন করিতে পারে—সুতরাং মানুষের শিক্ষার জন্য প্রহার-নীতির কোনই প্রয়োজন নাই। অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানলাভের শক্তি মানুষেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কিন্তু ইহাও বুঝা উচিত যে, সমাজের জটিলতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার জ্ঞানলাভ ও চরিত্র-গঠনের উপায়গুলিও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং মানুষের সংশোধন বা উন্নতির জন্য কোনও নীতি অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে তাহার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই দিকই বিবেচনা করিতে হইবে। কেবল মুখের ক্ষণিক নিষেধ বাণীতে বা প্রহারে অভীষ্ট ফললাভ হইবে না। ইহার জন্য ভিন্ন ব্যবস্থার প্রয়োজন।

মানবপ্রকৃতি ক্রমপরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং আদর্শ ছাত্র ও শিক্ষক-সমাজের ক্রমপরিবর্ত্তন

আমরা বহু অভিজ্ঞতার ফলে জানিতে পারিয়াছি যে, মানবপ্রকৃতি ক্রমপরিবর্ত্তন-শীল। গণিতের একটি উপস্থিত সমস্যার সমাধানের ন্যায় ইহার পরিবর্ত্তন একদণ্ডে বা এক দিনে হয় না—ইহা ক্ষণে ক্ষণে, দিনে দিনে ও তিলে তিলে হইয়া থাকে। স্বাধীন চিন্তা, বিভিন্ন জাতির ইতিহাসালোচনা, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা, স্বীয় সমাজের বিবিধাবস্থার পর্য্যালোচনা প্রভৃতির মিলিত প্রভাব মানুষকে ক্রমশঃ সত্য ও আদর্শের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়। আদর্শছাত্র ও আদর্শশিক্ষক এই প্রণালীতেই গঠিত হইবে এবং আদর্শপ্রণালী অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান ও প্রচারের ক্ষমতা এইরূপেই লব্ধ হইবে, অন্য উপায়ে নয়। অবশ্য কোন এক বিচক্ষণ শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ সুশিক্ষা-প্রণালীর কতিপয় নিয়ম ও সংজ্ঞা স্থির করিয়া দিয়া কার্য্যোদ্ধারে কথঞ্চিৎ সহায়তা করিতে পারেন বটে, কিন্তু এই প্রণালীতে কখনই সম্পূর্ণ ফললাভের আশা করা যাইতে পারে না। শিক্ষক পরনির্দ্দিষ্ট কতিপয় সংজ্ঞা ধরিয়া চলিলে, ছাত্রের চিত্তদ্বার খুলিয়া যায় না, তাহার মন বিকশিত ও চরিত্র গঠিত হয় না। অতএব আদর্শশিক্ষক ও আদর্শ ছাত্র প্রস্তুত করিতে হইলে ব্যাপকভাবে শিক্ষাতত্ত্বের অনুশীলনের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে—উচ্চতর শিক্ষা-নীতির উপকারিতা ও প্রয়োগবিধি হৃদয়ঙ্গম

করাইতে হইবে; নতুবা চিরন্তন প্রণালীর পরিহার দুঃসাধ্যই থাকিয়া যাইবে। এই প্রণালী কেবল বিদ্যালয়েই নয়—ব্যক্তির চরিত্রে, সামাজিক রীতি-নীতিতে, এমন কি ধর্ম্মাচরণেও ইহা প্রযোজ্য।

বিদ্যালয়গুলির অধীনতা প্রকৃত শিক্ষানীতির উন্নতির পথে অন্তরায়

বিদ্যালয়গুলির অধীনতা আমাদের শিক্ষা-প্রথার আর একটি দোষ। ইহাতে শিক্ষা ও সমাজের অশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকগণের স্বাধীন চিন্তা উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র পায় নাই; সুতরাং দেশের শিক্ষানীতি সমাজের বিবিধ প্রয়োজন সাধন জন্য বিচিত্র হইয়া উঠে নাই। কোনও একজন নগরস্থ অট্টালিকার অপ্রশস্ত এক প্রকোষ্ঠে চিন্তা করিয়া এক শিক্ষানীতি ও পাঠ্যতালিকা স্থির করিলেন, অমনই তাহা কিছুকালের জন্য নির্ব্বিবাদে গ্রামের বিদ্যালয়-গুলির উপর চাপাইয়া দেওয়া হইল। পাঠ্য-তালিকাটি বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী হইয়াছে কি না, ইহা বিবিধ সমাজের বিচিত্র অভাবমোচন করিবে কি না—ইহা বুঝিয়া দেখিবার সুযোগ দেওয়া হইল না; বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও উদ্যোক্তৃগণের মতামত গ্রহণ করা হইল না। কিন্তু বিশ্বে বহু পরিবর্ত্তন আসিয়াছে; রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সবই অনেক উল্টাইয়া যাইতেছে। এখন আর ব্যক্তি-বিশেষের বড় একটা "জারী-জুরী"র দিন নাই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু লোকের স্বাধীন চিন্তাসমূহ পরস্পরের সংঘর্ষে সংস্কৃত ও দৃঢ়ীভূত হইয়া প্রতিদিনই প্রত্যেক বিষয়ে অভিনব নীতির সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। অচিরেই আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালীতেও ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইবে।

স্বাধীনতা বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন—অধীনতামূলক স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা

কিন্তু এই স্বাধীনতা বিষয়ে আমাদের বিশেষরূপে সাবধান হওয়া দরকার। স্বাধীনতার অর্থ উল্টা বুঝিয়া যেন উন্মত্ত হইয়া না যাই। যে স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়ন করে ও বিশ্বসংসারের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়, সে স্বাধীনতা স্বীয় ধ্বংসের পথ নিজেই পরিষ্কার করে। অতএব আমাদিগকে স্বাধীনচিন্তার সঙ্গে চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাতও করিতে হইবে—বিশ্বসংসারে বিভিন্ন শক্তিরাশির সহিত পরিচিত হইতেও হইবে। স্বাধীনতার কথা ভাবিতে গিয়া আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান যুগের সামাজিক জটিলতা একদিকে যেমন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার গণ্ডী প্রসারিত করিতেছে, অপরদিকে ইহা তেমনই আবার অধীনতার পাশ প্রস্তুত করিতেছে। স্বাধীনতার পরিধি যতই প্রসারিত হউক না কেন, অধীনতার কেন্দ্র হইতে তাহা কখনই মুক্তিলাভ করিবে না। এই অধীনতামূলক স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা এবং উভয়ের যুগ্মপ্রভাব মানবসমাজকে সর্ব্বদা নিরাময় রাখিয়া, ক্রমশঃ উন্নতির পথে ঠেলিয়া লইয়া

যায়। এইরূপ অধীন স্বাধীনতা ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ প্রভৃতি সকলেরই জীবনকে চালিত করিলে কর্ম্মে অনেক সুফল পাওয়া যায়—সকলেরই বিধাতার আদেশ পালন করা হয়। আমি শিক্ষক, অতএব আমার ব্যক্তিত্বের "চটকে" ছাত্রগণ সর্ব্বদা "থরহরি" কম্পমান্ না থাকিলে আমার শিক্ষকত্বের অভিমানে আঘাত লাগিল; তিনি অভিভাবক, অতএব তাঁহার আজ্ঞাবহনে বালকগণ একটু এদিক ওদিক করিলে সব মাটি হইয়া গেল; উনি কর্ত্তৃপক্ষ, অতএব উঁহার পাঠ্যতালিকা অক্ষরে অক্ষরে কার্য্যে পরিণত না হইলে, শিক্ষকগণ "উপরওয়ালা"র প্রতি বিদ্রোহাচরণের দোষে দুষ্ট হইল—ইত্যাকার ভাবরাশি আমাদের সকলকে দাসত্ব-প্রভুত্বের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত রাখিয়া সত্যোপলব্ধি করিতে দেয় নাই। ইহাই আমাদের শিক্ষাজীবনকে পঙ্গু ও তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এ জগৎ সকলেরই কর্ম্মক্ষেত্র, প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্ব-বিকাশ ও চরিত্রগঠনের স্থান। সকলেই সব কর্ম্মের উপযোগী নয় বটে, কিন্তু যাহাকে যে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহাতে তাহার ব্যক্তিত্বের দাবী আছে—তাহার স্বাধীন চিন্তার অধিকার আছে। এই স্বাভাবিক অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত রাখিলে মানবত্বের অবমাননা করা হয়, জগতের উন্নতির পথে বাধা দেওয়া হয়।

শিক্ষা ও সমাজ-জীবনের চিরবিচ্ছেদ

তার পর, বিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত সমাজ-জীবনের চিরবিচ্ছেদ আমাদের শিক্ষাপ্রথার তৃতীয় দোষ। এই বিচ্ছেদ শিক্ষানীতি-বিষয়ক আমাদের ঔদাস্য ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফল। বহুকাল হইতে এই ভ্রমপূর্ণ নীতির অনুসরণ করিয়া আমাদের শিক্ষা ও সমাজ-জীবন এক বিকৃত অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। বিদ্যালয়গুলি ত সমাজ হইতে এক রকম নির্ব্বাসিত; পাঠ্যবিষয়গুলির সহিত ব্যক্তিগত বা সমাজগত জীবনের অভাব-অভিযোগের কোন সম্পর্কই নাই। মামুলিভাবেই সব চলিতেছে। বিশ্বসংসারের সহিত সম্বন্ধরহিত গুটিকত শুষ্ক অঙ্ক কষিতে, নীতিপূর্ণ কয়েক খানি সাহিত্যপুস্তক পড়িতে ও ভূগোলের নামগুলি "ঝাড়া মুখস্থ" বলিতে পারিলেই, ছেলেদের লেখাপড়া বেশ চলিতেছে, মনে করা হয়। বিংশশতাব্দীর সমাজজীবন কি এক জটিল অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, এবং তদুপযোগী ব্যবস্থা করিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—এ সবের প্রতি কাহারও দৃক্‌পাত নাই। যাঁহারা এ সমস্ত বিষয়ে চিন্তা করিবার যোগ্য, তাঁহারা ত সমাজের নিকট হইতে এক রকম নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করিতেছেন। এই হইল ঔদাস্যের ফল। তার পর ভ্রান্ত বিশ্বাসটি এই—আমাদের বিজ্ঞ অভিভাবক ও শিক্ষক-মহাশয়গণ মনে করেন যে, বাহিরের সমাজের সহিত সরল ও শান্তস্বভাব বালকগণকে মিশিতে দিলে তাহারা অচিরেই "জ্যাঠা" হইয়া যাইবে—উচ্ছৃঙ্খল ও শিথিলচরিত্র হইয়া যাইবে। তাঁহাদের বিশ্বাস, ঘরে যে যত একাকী বসিয়া থাকিতে পারে, সে ততই সুন্দর ও সচ্চরিত্র বালক। কিন্তু এ গুলি মানসিক ও নৈতিক জীবন সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা। নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্বের অনুশীলন হয় ত

নীরবে সুসাধিত হইতে পারে, কিন্তু মানসিক ও নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, ইহার ঠিক বিপরীত নীতি অবলম্বন করিতে হয়। মানবের সহিত মানবের সম্বন্ধেই মানসিক ও নৈতিক জীবনের সূত্রপাত। এ সম্বন্ধ যতই প্রসারিত হয়, উভয়বিধ জীবনের গভীরতা ততই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এমন দিন হয়ত ছিল, যখন প্রকৃতির সহিত সরল সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াই সমস্ত জীবনের অধিকাংশ অভাব মোচন হইত। এমন দিন থাকিলেও তাহা এখন সুদূর অতীতে লীন। অতএব আমরা যে যুগে বাস করিতেছি, উন্নতির কামনা করিতে হইলে, আমাদের জীবনের সর্ব্ববিধ অবস্থায় তদুপযোগী ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

বিংশ শতাব্দীর সমাজোন্নতি তাহার বিবিধ প্রত্যঙ্গগুলির এককালীন উন্নতির উপর নির্ভর করে

এ স্থলে আপত্তি উঠিতে পারে—এত বড় বড় কাজ থাকিতে বালক-শিক্ষার সৌকর্য্য-বিধানের জন্য এত মস্তক সঞ্চালন কেন? কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি প্রকৃত দেশ-হিতকর কাজ ছাড়িয়া দিয়া নিম্নশিক্ষার বিলাসিতার জন্য এত শক্তি, এত মনোযোগ ও এত অর্থব্যয়ের প্রয়োজন কি? শাসন-গর্জ্জন, তাড়ন-প্রহারণে ত তাহারা কোন রকমে মানুষ হইবেই। আমি বলিতেছি না যে, সমস্ত কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল বালক-গণেরই সেবায় সর্ব্বদা নিরত থাকিতে হইবে। প্রত্যুত, বিংশশতাব্দীর মানব-সমাজ এমন এক জটিল অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, কোনও দেশের বা সমাজের উন্নতিসাধন করিতে হইলে, তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-গুলিকে একসঙ্গে উন্নীত করিয়া তুলিতে হইবে। এখানেও দর্শনবিজ্ঞানের সূত্র খাটে। তাহা এমনই অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ যে, একটির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে অপরটির যথোচিত পুষ্টিসাধন হইবে না। শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি সম্পূর্ণ অবহেলা প্রদর্শন করিয়া মানসিক উন্নতির চেষ্টা করিতে গেলে যেরূপ ফললাভ হয়, সমাজের ভিত্তিস্বরূপ এই শিশুদলকে অন্ধভাবে দলিত করিলে তদপেক্ষাও বিষময় ফল ফলিবে—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মানবশৈশব কি, এবং শিক্ষা ও সমাজের উপর ইহার কতখানি প্রভাব, এ কথা বুঝিতে পারিলে বালক-শিক্ষার উন্নতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হইবে। অতএব নিম্নে এই শৈশবতত্ত্বেরই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইল।

শৈশবতত্ত্ব এবং শিক্ষা ও সমাজের উপর ইহার প্রভাব

এককোষ প্রাণী আমিবা (amœba) মাতৃদেহ হইতে বিভক্ত হইয়াই স্বাধীন জীবন-যাত্রা আরম্ভ করে। কীটপতঙ্গগুলি স্বাধীন জীবনযাত্রার জন্য সমস্ত শক্তি লইয়াই মাতৃগভ হইতে বাহির হয়। প্রাণিজগতের এই নিম্নস্তরের জীবগুলির শৈশবকাল নাই। বংশ-লব্ধ দৈহিক গঠনের সহিত ইহারা স্বাধীন জীবন-যাত্রার উপায়গুলি লইয়া আইসে—পিতামাতার যত্নের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আমরা প্রাণি-জগতের উচ্চতর স্তরসমূহে আরোহণ করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে, এই শৈশবকাল ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। গো-বৎস প্রসবের পর কিছুদিন মাতৃস্তন্য ব্যতীত

বাঁচিতে পারে না। বানর ও অরাং-উটান্ (orang-outang) স্বীয় সন্তানকে বক্ষে রাখিয়া পালন করে। মানবসমাজে এই শৈশবকাল চরমে আসিয়াছে। আবার বিভিন্ন মানবসমাজের মধ্যেও আমরা এই শৈশব-কালের তারতম্য দেখিতে পাই। অসভ্য ভীলশিশু সাত আট বৎসর বয়সেই পিতার কার্য্যে সাহায্য প্রদান করে, কিন্তু সভ্য ব্রাহ্মণ-শিশুকে কর্ম্মোপযোগী হইবার জন্য অন্ততঃ পনর ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। এই ক্রমবর্দ্ধনশীল শৈশবের অর্থ কি? ইহা কি কেবল প্রকৃতির খেয়াল, না ইহার মধ্যে সৃষ্টির কোন গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে?

ফিস্ক্ ও বাট্লারের ব্যাখ্যা

ভারতে কখনও এই প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে কি না জানি না, তবে আধুনিক কালে পাশ্চাত্যজগতে জন্ ফিস্ক্ ইহার সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিয়াছেন। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি বাট্লার ইহার বিস্তার সাধন করিয়া শিক্ষা ও সমাজের সহিত এই ক্রমবর্দ্ধনশীল শৈশবের সম্বন্ধ বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। মিঃ ফিস্ক্ বলেন—"এই ক্রমবর্দ্ধনশীল শৈশব প্রাণ-বিজ্ঞানের এক নির্দ্দিষ্ট নীতি। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ইহারই সাহায্যে শিক্ষা ও সভ্যতার গতি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। দৈহিক-গঠনের বিশেষত্বদ্বারা জটিল জীবনসংগ্রামে জয়লাভ অসম্ভব হইয়া পড়িল, সুতরাং শৈশব-কাল বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই শৈশবে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া মানুষ স্বীয় সন্তানগণকে সভ্য সমাজের উপযোগী করিয়া তুলে। এই সময়ে শিশুর মনোরাজ্যে বিবিধ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এই শৈশবই মানব-পরিবারের বন্ধন ও সমাজোন্নতির কারণ। এই ক্রমবর্দ্ধনশীল শৈশবই মানবসমাজে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি আনয়ন করিয়া দিয়াছে—প্রকৃত ধর্ম্মজীবন ও অসীমের উপ-লব্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।" মিঃ বাট্লার্ দেখাইয়াছেন—মানবশিশু পিতৃ-পুরুষের নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে অনেক দৈহিক গুণ ব্যতীত পরোক্ষভাবে বহু সামাজিক অধিকার লাভ করে। এই সামাজিক অধিকারগুলি সাধারণতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—সাহিত্য, বিজ্ঞান, সৌন্দর্য্য, ধর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠান। (এই পাঁচ-প্রকার অধিকারে আর একটি যোগ করা যাইতে পারে, সেটি শিল্প)। এই কয়েকটি অধিকারলাভ ব্যতীত কাহাকেও প্রকৃতরূপে শিক্ষিত বলা যাইতে পারে না। নিম্নস্তরের প্রাণিগণের ক্ষণস্থায়ী শৈশব যেমন দৈহিক ক্রিয়াগুলির মধ্যে বিবিধ সম্বন্ধ স্থাপনে ব্যয়িত হয়, তেমনই শৈশবে প্রত্যেক শিশুকেই সমাজলব্ধ এই কয়েকটি গুণের সহিত পরিচিত করিয়া দিতে হইবে। অভিব্যক্তিবাদের উপর স্থাপিত হইয়া প্রাণ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান আধুনিক শিক্ষা সম্বন্ধে এই শিক্ষাই প্রদান করিতেছে।

এমন শৈশবের প্রতি আমাদের অবহেলা

এমন অমূল্য শৈশবের যথোচিত যত্ন আমরা করি না। ব্যক্তিগতভাবে বালকগণের প্রতি আমরা যথেষ্ট মায়া-মমতা দেখাইয়া থাকি, পিতা-মাতা সন্তানগণের লালনপালনের জন্য

অনেক কষ্ট বিড়ম্বনা সহ্য করেন, নিজে অনাহারে থাকিয়াও তাহাদের ভরণ পোষণ করেন। এ সমস্তই সত্য ও প্রয়োজনীয়; কিন্তু স্নেহাদরের সঙ্গে বুক বাঁধাও যে দরকার, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। আর আমাদের ভাগ্যবিধাতারা ত এ সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার আদর

ভারতে এমন একদিন ছিল, যখন এই শিক্ষার জন্যই বহু অর্থ ও বহু শক্তি ব্যয়িত হইত। অনেক বিদ্বান ও ধনবান কেবল ইহারই জন্য তাঁহাদের সমস্ত বিদ্যা ও ধন উৎসর্গ করিতেন। প্রাচীন কালের মঠ, আশ্রম, গুরুগৃহ প্রভৃতি কেবল গল্পগুজব নহে—ইহারা শিক্ষা ও সমাজের সমস্ত শক্তির কেন্দ্ররূপে বিরাজমান থাকিয়া বিবিধ উপায়ে সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিত এবং তাহার দ্বারা নিজে নিয়ন্ত্রিত হইত। কালক্রমে আমরা সবই হারাইতে বসিয়াছি। কিন্তু আর বসিয়া থাকিলে চলিবে না; নূতন উদ্যমে নব প্রণালীতে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। সমস্ত সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কেবল এই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি ও প্রচারের জন্যই বহুলোককে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে—কেবল এই উদ্দেশ্যেই দেশমধ্যে একদল আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ প্রস্তুত করিতে হইবে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে য়ুরোপ ও আমেরিকায় স্বতন্ত্র আন্দোলন

এই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার ও প্রচারের জন্য অর্থলোলুপ ও সহরপ্রিয় য়ুরোপ ও আমেরিকায়ও আজকাল স্বতন্ত্র আন্দোলন চলিতেছে। সমাজে সুখ ও শান্তি অটুট রাখিতে হইলে এই বিদ্যালয়গুলিকেই যে বিশ্বশিক্ষা ও সমাজশক্তির কেন্দ্র করিয়া তুলিতে হইবে, পাশ্চাত্যজাতি আজকাল তাহা বেশ বুঝিয়া উঠিতেছে। এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে এই দেশসমূহের প্রায় প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস, বিজ্ঞান, শিল্প, এঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ন্যায় শিক্ষাবিভাগ নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগেরই সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে প্রাণবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের আলোকে একদিকে যেমন বিশুদ্ধ শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোচনা হয়, অপরদিকে তেমনই আবার সমাজের বিবিধ অভাব মোচনকল্পে গ্রাম্যবিদ্যালয়গুলির উপযোগী কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতি নানাবিধ ব্যবহারিক শিক্ষারও আলোচনা হইয়া থাকে। এ সমস্ত আলোচ্য বিষয়ই আজকাল তাহাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যতালিকায় স্থান পাইতেছে।

বিদ্যালয়ে বিশ্বশিক্ষার প্রবর্ত্তন আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অনুমোদনীয়

এতদিন মানব-মন সম্বন্ধে সকলেরই একটা সঙ্কীর্ণ ধারণা ছিল। অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে, ইতিহাসের ঘটনাপুঞ্জ আয়ত্ত করিবার জন্য স্মৃতিশক্তির প্রাচুর্য্য, গণিতের প্রশ্ন-সমাধানে ক্ষিপ্রহস্ততা, অথবা সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় কল্পনার দৌড় দেখাইতে না পারিলে—বালকমাত্রই অপদার্থ। এরূপ অপদার্থ যাহারা, তাহারা বিদ্যালয় হইতে খসিয়া পড়িবেই—পচিয়া মরিবেই। কিন্তু

আধুনিক বিজ্ঞানবলে, তাহারা অপদার্থ নয়—তাহাদের যোগ্যতা আরও নানা বিষয়ে থাকিতে পারে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাহারা তাহাদের নিপুণতা ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রদর্শন করিয়া বিবিধ প্রকারে সমাজের হিতকর ব্যক্তি হইয়া উঠিতে পারে। গণিত, ইতিহাস, দর্শন বা সাহিত্যের ন্যায় কার্য্যকারণ দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে শিক্ষা দিলে শেষোক্ত বিষয়গুলির অনুসরণ ও অনুশীলন করিয়াও মানুষ হইতে পারা যায়—মানবীয় গুণসমূহ লাভ করিতে পারা যায়। আর পুস্তকের জ্ঞানার্জ্জনের দ্বারা তাহাদের স্বীয় নৈতিক চরিত্র গঠিত করিবার শক্তি না থাকিলেও, কর্ম্মক্ষেত্রের জীবন্ত সম্বন্ধ দ্বারা মানবীয় গুণগুলি লব্ধ হইয়া যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিবিধ বিষয়ের অধ্যয়নের সুবিধা প্রদান করিয়া বালকগণের বিচিত্র শক্তির আবিষ্কারের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে, এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই বহুমুখীন শক্তিসমূহের ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

আধুনিক বিদ্যালয় বিশ্বশিক্ষা ও সমাজশক্তির কেন্দ্র

অতএব আমরা বিদ্যালয়গুলিতে বিশ্বশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। বিবিধ শক্তিসম্পন্ন বহু লোককে নানাপ্রকারে সমাজের হিতকারী করিয়া তুলিতে হইলে, বিদ্যালয়গুলিতে বিশ্বশিক্ষার প্রবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। এই বিদ্যালয়গুলিতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতার জন্য বিচিত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে, এস্থানেই সমাজের বিবিধ অভাব-অভিযোগের আলোচনার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতির ন্যায় দেশকালোপযোগী কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, স্বাস্থ্য, নীতি প্রভৃতিরও আলোচনার স্থান এই বিদ্যালয়গুলিতেই করিয়া দিতে হইবে। প্রাণবিজ্ঞানবিদ্‌গণ প্রত্যক্ষভাবে বংশলব্ধ গুণসমূহের অধিকারলাভ সম্বন্ধে এখনও নিঃসন্দেহে কোনও মত প্রদান করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু সমাজলব্ধ গুণগুলি পরোক্ষভাবে বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে পরবর্ত্তী পুরুষগণ লাভ করিতে পারে—এ সম্বন্ধে এখন আর কাহারও দ্বিধা নাই। এই বিদ্যালয়গুলিতে বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন বহুলোক বিবিধ অনুষ্ঠানের সংস্পর্শে নানা প্রকারের শক্তি লাভ করিয়া সমাজ-জীবনকে দিন দিন গভীরতর ও সুগুপ্তর করিয়া তুলিবে। এইরূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থাকিয়া ছাত্রগণের মানসিক ও নৈতিক জীবন ক্রমশঃই দৃঢ়, প্রশস্ত ও কর্ম্মঠ হইয়া উঠিবে—ক্রমশঃই তাহারা সমাজের বিবিধ অভাব মোচনের জন্য উপযুক্ত শক্তি লাভ করিবে।

কর্ম্মের অনিবার্য্যতা

কিন্তু আর বেশী কথা বলিয়া প্রবন্ধটির কলেবর বর্দ্ধিত করিতে চাহি না। পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমার বক্তব্যটি কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট হইয়াছে, এরূপ আশা করি। আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, মানব-সমাজের উপর দিয়া যত ঝঞ্ঝাবাতই বহিয়া যাউক না কেন, যতদিন মানক-সমাজ থাকিবে, ততদিন এই শিক্ষার আবশ্যকতা থাকিবেই, তজ্জন্য কর্ম্ম করিতে হইবেই। জগতকে 'মায়াময়' ও জীবনকে 'জলবৎ তরল' মনে করিয়াও ত

সংসারের শত বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় নাই। শত শত বৎসরের সহস্র সহস্র চেষ্টার পরও ত মানব-নিয়তির চরম পরিণতির খাঁটি সংবাদ কেহ দিতে পারিল না। এক দল মানুষ কালের গর্ভে লীন হইতেছে—অপর দল পরক্ষণেই আবার শত আকাঙ্ক্ষা, শত প্রশ্ন লইয়া সংসার-রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে প্রস্তুত। জীবস্রোত চলিবেই—অভিব্যক্তির ধারা রুদ্ধ হইবে না। তবে আর তন্দ্রাভিভূত থাকিয়া ভারগ্রস্ত জীবনের দিনগুলি গণিয়া লাভ কি? অতএব জীবনের অবস্থাগুলিকে সহাস্যবদনে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদের উন্নতিসাধনের জন্য বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সকাম কর্ম্ম সাধনে যদি অনন্ত ও অসীমের উপলব্ধির পথে বাধা প্রদান করে, তবে না হয় ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া নিষ্কাম-ভাবেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যাক্।

কতিপয় শিক্ষাপরিচালন-নীতি

শিক্ষাবিজ্ঞান সৃষ্টির জন্য বিদেশীয় শিক্ষাবিদ্ ফ্রোয়েবেল্, পেষ্টালজী, মনটেস্বরী প্রভৃতি শিক্ষাসম্বন্ধে কি কি নীতির প্রচার করিয়াছেন, একদিকে তাহা যেমন আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞগণের আলোচনার বিষয়ীভূত হইবে, অপরদিকে তেমনই আবার দেশের পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র, ভূদেবচন্দ্র শিক্ষার উন্নতিকল্পে কি কি প্রণালীর অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং বিংশশতাব্দীতে বিনয়কুমারই বা শিক্ষাসংক্রান্ত কি এক অভিনব প্রণালীর প্রচার করিতেছেন, তাহাদেরও আলোচনা তাঁহারা করিবেন। এই সব আলোচনার সহিত তাঁহারা নিজ নিজ স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণের তুলনা করিয়া শিক্ষা-বিজ্ঞানের সৃষ্টিকার্য্যে সহায়তা করিবেন। কোনও এক পাঠ্য পুস্তকের উপর বেশী নির্ভর না করিয়া শিক্ষকগণকে বিবিধ পুস্তক ও বাহ্যজগতের বিবিধ ক্রিয়াকলাপ হইতে দৈনিক অধ্যাপনার বিষয়গুলি প্রস্তুত করিতে হইবে। এরূপ করিতে হইলে ছাত্রের ন্যায় তাঁহাদিগকেও নিয়মিতরূপে দৈনিক পাঠ প্রস্তুত করিতে হইবে। শিক্ষক নিজে ছাত্র না হইলে, শিক্ষণীয় বিষয়ে তাঁহার নিজের আমোদ ও উৎসাহ না থাকিলে, তিনি কখনই ছাত্রের মনোযোগ আকর্ষণ ও উৎসাহ উৎপাদন করিতে পারিবেন না। ছাত্রের অধৈর্য্য ও অমনোযোগিতা নিবারণের মহৌষধি কটূভাস ও বেত্রপ্রহার কখনই নয়। তারপর বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাপ্রদানে নিপুণতা অর্জ্জন ব্যতীত প্রত্যেক শিক্ষককেই কিয়ৎপরিমাণে সমাজতত্ত্বজ্ঞ হইতে হইবে। অধ্যাপনা ব্যতীত তাঁহাকে সমাজের নানা কথা ভাবিতে হইবে। সমাজের নানা অভাব ও আকাঙ্ক্ষার সহিত পরিচিত হইতে হইবে। পঠনীয় বিষয়গুলি ছাত্রের কেবল মানসিক উৎকর্ষ সাধন ব্যতীত সমাজের কোনও অভাব মোচন করিতেছে কি না, ইহাও তাঁহার চিন্তার বিষয় হইবে। এ সমস্ত বিষয় সুন্দররূপে চালিত করিতে হইলে শিক্ষার বড় বড় কেন্দ্র-সমূহে শিক্ষাবিষয়ক এক একটি স্থায়ী আলোচনার বন্দোবস্ত থাকা উচিত, এবং এই সমস্ত আলোচনার ফল দেশের যাবতীয় বিদ্যালয়গুলিতে প্রচার করিবার জন্য দুই

একটি মাসিক বা পাক্ষিক পত্রিকার পরিচালন আবশ্যক। এই পত্রিকাগুলিতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষানীতি, অধ্যয়ন-প্রণালী, সমাজের উপযোগী বিবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের আলোচনা থাকিবে। এই সমস্ত আলোচনার ফলে এক নূতন শিক্ষা ও সমাজ-বিজ্ঞানেরই সৃষ্টি হইয়া উঠিবে, এবং শিক্ষকগণের নির্জ্জীব, অবসন্ন ও উৎসাহহীন জীবনে নব প্রাণ ও নব আশার সঞ্চার হইবে। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, কেবল বেত্রপ্রহার দ্বারাই ছেলেকে মানুষ করিয়া তোলা যায় না, এবং ভূগোলের গুটিকত নদী-পর্ব্বতের নাম মুখস্থ করাইয়াই ব্যক্তির ও সমাজের সমস্ত অভাব মোচন হয় না, ইহাতে অনেক ভাবিবার ও বুঝিবার কথা আছে।

আশার কথা

কিন্তু আশার কিরণ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। দেশের নানা স্থানে নানা আন্দোলন চলিতেছে। শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতির সঙ্গে গ্রাম্য শিক্ষার উন্নতির জন্যও কেহ কেহ চেষ্টিত হইয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি ভারতে শিক্ষায় এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। তৎপ্রদর্শিত আরোহপদ্ধতির শিক্ষাপ্রণালী অনুযায়ী শিক্ষা-প্রদানের জন্য বঙ্গে কতিপয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। এই সমীচিন নীতি অবলম্বন করিয়া কতিপয় পাঠ্যপুস্তক লিখিত হইয়াছে। সত্যসত্যই তাঁহার 'ইতিহাস বিজ্ঞান'টিতে যেমন ইতিহাস-শিক্ষার নব পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাঁহার 'শিক্ষা-বিজ্ঞান'টিতেও তেমনই শিক্ষার গীতা রচনার পথ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। তাঁহার "শিক্ষা-সমালোচনা" গ্রন্থে তিনি শিক্ষার সংস্কার ও প্রচারের বিভিন্ন উপায় জলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় লিখিত শিক্ষানীতি-সংক্রান্ত প্রায় সব পুস্তক-গুলিই আমি দেখিয়াছি; কিন্তু তাহার কোনটাতেই শিক্ষানীতিসম্বন্ধীয় অত কথা অমন নিরেট ভাষায় ও অমন স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত নাই। ইহারা প্রাণবিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিশাল জলধি মন্থন করিয়া আজ পর্য্যন্ত শিক্ষাসংক্রান্ত যে কয়েকটি সূত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন, অধ্যাপক সরকার মহাশয় তাহার সবগুলিই তাঁহার "আরোহপদ্ধতির শিক্ষাপ্রণালী"র জালে আবদ্ধ করিয়াছেন। এদিকে এখনও বহু-বিষয়াভিজ্ঞ বহু লোকের প্রয়োজন। আশা করা যায়, আজকাল দেশে এরূপ লোকের অভাব হইবে না।

শ্রীনবীনচন্দ্র দাস,
আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা।

গৌড়নগরে সেকাবির্ভাব

(সেক শুভোদয়াবলম্বনে)

(প্রথমাভিনয়)

গঙ্গাতীরে মহারাজ লক্ষ্মণসেন, সেকের জলোপরি আবির্ভাব

মহাত্মা নৃপবরতিলক ক্ষৌণীপাল লক্ষ্মণসেন দেব একদা সায়াহ্নকালে গঙ্গাতীরে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেবী জাহ্নবী দর্শন করিতে করিতে তাঁহার স্তব করিতেছিলেন। অকস্মাৎ পশ্চিম তীর হইতে একব্যক্তি জলোপরি পাদচারণ করিতে করিতে নৃপসন্নিকটে উপস্থিত হইয়া "তুমি কে" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। নৃপতি দেখিলেন—একজন কৃষ্ণাম্বর পরিধান পূর্ব্বক মস্তকে কৃষ্ণবর্ণের পাগড়ী বন্ধন করিয়া ইতঃস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়াই "তুমি কে ? কাহার পুত্র ? কথা কহিতেছ না কেন ?" এই প্রকার বাক্যদ্বারা পুনঃ পুনঃ সম্ভাষণ করিল।

প্রকৃত শাসক কে ?

মহারাজ সক্রোধে সেককে বলিলেন—"তোমার মত মূর্খ আর দ্বিতীয় দেখিতেছি না! কিন্তু তোমার কর্ম্ম অদ্ভুত দেখিলাম—তোমার তপঃপ্রভাবে তুমি জল হইতে উত্থিত হইলে, তোমার আখ্যান আমি অজ্ঞাত, অধিকন্তু তোমার উক্তিতেও আমার শ্রদ্ধা হইতেছে না।" সেক আপন হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক মৃদুমন্দ হাস্য সহকারে শরৎজলধর-নির্ঘোষবৎ ধ্বনিসহ বলিতে আরম্ভ করিলেন—চতুর্দ্দিক সুরভি বসন্তবায়ুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল—"তুমি সেনবংশজাত লক্ষ্মণনামক শস্ত্রপাণি ভূপতি। আমি দুর্দ্দৈববশতঃ এ স্থানে আগমন করিয়াছি।" মহারাজ সক্রোধে পুনশ্চ বলিলেন—"দণ্ড ছত্র দ্বারা শোভিত হইয়া পৃথিবী শাসন করিতেছি, তুমি নরপতির উপযুক্ত সম্মান সহ বাক্য উচ্চারণ করিতেছ না কেন ?" সেক শান্ত অথচ হাস্যযুক্ত বদনে উত্তর করিলেন—"তুমি বলিলে পৃথিবী শাসন করিতেছ! যদি তোমার এতাদৃশ ক্ষমতা বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা হইলে—ঐ যে বক গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয়া গোটা মৎস্য ধৃত করিয়াছে, উহাকে মৎস্যটি ত্যাগ করিতে আদেশ কর দেখি, তোমার শাসনে থাকিয়া বক তোমার বাক্য মান্য করিতেছে কি না দর্শন করি—তাহা হইলে বুঝিব তুমি পৃথিবী শাসন করিতেছ।" মহারাজ বলিলেন—"বক তির্য্যক্‌যোনি জ্ঞানহীন, উহারা আমার বাক্য শুনিবে কেন ? তোমার শক্তি থাকিলে তুমি উহাকে মৎস্য ত্যাগ করিতে অনুজ্ঞা কর দেখি!" সেক হাস্য সহকারে বলিলেন—"আমি যাঁহার শাসনে অবস্থান করি, তাঁহার নাম লইয়া বককে মৎস্য ত্যাগ করিতে বলিলে বক নিশ্চয়ই মৎস্য ত্যাগ করিবে। আমার রাজ্যের রাজার প্রভাব দর্শন কর।" এই বলিয়া সেক বকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র বক মৎস্য ত্যাগ করিয়া উড়িয়া গেল।

লক্ষ্মণের ভয়াপনোদন

মহারাজ সেকের এই অলৌকিক কার্য্যে চিন্তিত ও ভীত হইয়া মনে মনে ইষ্টমন্ত্র 'দুর্গানাম' জপ করিতে করিতে বলিলেন—"মা দুর্গে, আমাকে রক্ষা কর মা। এই সেক কালস্বরূপ হইয়া আমার রাজ্যে আগমন করিয়াছে।" সেক রাজাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন—"ভীত হইও না, আমার ক্রোধ নাই, আমি দুর্ব্বাক্য বলি না, আমি কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এস্থানে আগমন করি নাই। আপন ইচ্ছায় আমি যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি কাহার শত্রু বা মিত্র নহি।" লক্ষ্মণসেন বলিলেন—"হে ভদ্র যদি আপনার দয়া হইয়া থাকে, তবে আমার সহিত আগমন করুন।"

সেকের রাজসহ নগর-প্রবেশ

সেক ও রাজা বাক্যালাপ করিতে করিতে গৌড়পুরী-বহিস্থ রাজপথ অতিবাহিত করিয়া চলিতেছেন, এমন সময়ে মন্ত্রী সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া রাজ-সম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন—"দেখিতেছেন না এই ব্যক্তি কৃষ্ণাম্বরধারী, দেখিয়া বোধ হইতেছে—যবন, আপনি ইহার সহিত একত্রে গমন করিয়া কুকার্য্য করিয়াছেন!" রাজা বলিলেন—"মন্ত্রিন্, এই মহাপুরুষের তত্ত্ব আপনি অবগত নহেন, সেই কারণে এ প্রকার বলিতেছেন—ইনি দরবেশ-বেশধারী সাক্ষাৎ ইন্দ্ররূপে আমার রাজ্যে আগমন করিয়াছেন।" মন্ত্রী বলিলেন "মহারাজ! দুর্জ্জনের সহিত বাক্যালাপ যুক্তি-যুক্ত নহে—উহারা সর্ব্বদা মায়াবিস্তারপূর্ব্বক আগমন করে—উহাকে যথা ইচ্ছা গমন করিতে দিন" ইত্যাদি বিবিধ বাক্য দ্বারা মহারাজের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া আলাপে রত রহিলেন।

সেকের নগর-প্রবেশ, পথে গঙ্গানট-বধূ বিদ্যুৎপ্রভার দর্শনলাভ

সেক তথায় দণ্ডায়মান না থাকিয়া গঙ্গাতীরস্থ পথ অতিক্রম করিতে করিতে পথিমধ্যে কঞ্চুকশোভিতা গঙ্গানট-বধূ বিদ্যুৎ-প্রভাকে শূন্য স্বুবর্ণ কলস কটিদেশে রক্ষা করিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে আগমন করিতে দেখিলেন এবং বিদ্যুৎপ্রভাকে বলিলেন—"রে পাপিনী, যদি আপন ভদ্রতা ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে কটিস্থিত শূন্য কুম্ভসহ গৃহে প্রত্যাগমন কর।" বিদেশী ভিন্নজাতীয়ের মুখে এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদ্যুৎপ্রভা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল—এ ত দেখিতেছি বিদেশাগত যবন, এ ব্যক্তি আমাকে এই প্রকার বিগর্হিত বাক্য বলিতে সাহসী হইয়াছে—নিশ্চয় এ ব্যক্তি আমাকে অবগত নহে—এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বিদ্যুৎপ্রভা সেক-সন্নিকটে গমনপূর্ব্বক বলিল—"ওহে বৈদেশিক, 'মমাননং পশ্য'—ইহাতেও যদি তোমার ক্রোধ সাম্য না হয় তাহা হইলে তোমার বাক্যের উত্তর দিব।"

বিদ্যুৎপ্রভার ব্যবহার

সেক মস্তক নত করিয়া বলিলেন—"তুমি যাহা ইচ্ছা বলিতে পার, আমি তোমার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিব না।" বিদ্যুৎপ্রভা সেকের গন্তব্য পথের অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল—"ওহে সেক, তুমি যাহা ইচ্ছা বলিতে পার, আমি তাহার উপযুক্ত উত্তর দিব, কিন্তু ইহাও অবগত হইও যে 'কটূত্তরং ন বক্তব্যং দরিদ্রায় নৃপায় চ'। ওহে বৈদেশিক! আমার

সম্মুখে তোমার "পাপিনী, শূন্যকুম্ভকটিস্থিতা" বলিবার হেতু কি প্রমাণ কর দেখি ?" সেক বলিলেন—"শোন ধাত্রি! পুরুষগণ কর্ত্তৃক পুণ্যের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, আর তোমাদের দ্বারা সর্ব্ববিধ পাপের প্রবর্ত্তন হয়! তোমাদের হস্ত হইতে মুক্তির জন্ম ব্রাহ্মণাদি নরগণ বাণপ্রস্থাবলম্বন করিয়া অরণ্য বাস করেন। এমন কি দরবেশগণও গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনপূর্ব্বক দেবসদনে অবস্থান করিয়া থাকেন। তোমরা তাঁহাদের পবিত্রতা বিনষ্ট করিবার জন্ম অরণ্যে দেবস্থানে গমনপূর্ব্বক কটাক্ষ দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা বিনষ্ট কর, সেই কারণে তোমাকে 'পাপিনী' বলিয়াছি।" নটী বিদ্যুৎপ্রভা সেকের বাক্য শ্রবণ করিয়া কঞ্চুক অপসারণ পূর্ব্বক বলিল—"সেক! 'অমৃতস্রাবিণীং পশ্য কিং বৃথা ভাষসে।' কটিদেশে শূন্যস্বর্ণকুম্ভধারিণী এই অমৃত-স্রাবিণী বিদ্যুৎপ্রভার প্রভা দর্শন কর।" ওহে সেক, সংসারে সর্ব্বত্র অমৃতস্রাবিণী-ভারে ভারাক্রান্তা ভাবিনীগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আমরা না থাকিলে তোমাদের অস্তিত্ব কোথায় থাকিত? বালক বৃদ্ধ যুবাগণ এই অমৃতস্রাবিণীর আদর করিয়া থাকে। বালকগণ অধর ওষ্ঠ দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক এই অমৃতস্রাবিণীর অমৃত পান করে। যুবকগণ নিয়ত স্রকচন্দনাদি দ্বারা এই অমৃতস্রাবিণী-দ্বয়ে পত্রাবলী অঙ্কিত করিতে মনন করে। বৃদ্ধগণ শিবপূজার্থ আনীত চম্পকদাম অমৃত-স্রাবিণীগণের কবরীভূষণরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। বলিতে কি, পৃথিবী রক্ষার জন্যই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। শিরবাস অপ-সারিত করিয়া সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কেশদাম প্রসারণ পূর্ব্বক স্তনদ্বয়মধ্যে রক্ষা পূর্ব্বক বলিল—"দেখ সেক, স্বর্ণকুম্ভসম পয়োধর দ্বারা যে পাপ কাষ্যই সাধিত হয়, ইহা কি পুনশ্চ বলিতে পার? ইহার দ্বারাই সিংহের সিংহত্ব বিনষ্ট হইয়া মৃগত্ব প্রাপ্তি হয় এবং ইহা দ্বারাই মৃগের মৃগত্ব বিদূরিত হইয়া থাকে। ত্রিভুবনের সর্ব্বত্র নারীর জয় হইয়া থাকে। তুমি নারীকে পাপিনী বলিলে, কিন্তু আমি দেখিতেছি একমাত্র পুরুষগণই পাপের জীবন্ত প্রবাহ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ওহে পথিক! শুন, মহারণ্যস্থ মদমত্ত সারঙ্গ, গিরি-গুহায় বিক্রমশীল কেশরী, দিগন্তমথন-কারী হস্তীনিচয়, স্ত্রীগণের ভাববিভঙ্গ নেত্রদ্বারা দর্শন করিবামাত্র বশীভূত হইয়া পড়ে, কুটীল জনগণও সরল মনে আমাদের বশীভূত হয়। তোমাকে অধিক আর কি বলিব, তুমি তরল পঙ্ক, তোমাতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে দেহ কর্দ্দমাক্ত হইবে—নীচের সহিত বাক্যালাপে নীচত্বই প্রাপ্ত হইতে হয়।'

সেকের নগর বহির্ভাগে অবস্থান

এমন সময়ে মহারাজ মন্ত্রীসহ সেই স্থানের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন দেখিয়া, গঙ্গানট-বধূ সেককে প্রণামপূর্ব্বক পথত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। মহারাজ সেক-সন্নিকটে উপস্থিত হইলে মহাবুদ্ধি সেক রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—"রাজন্, শ্রবণ করুন, আপনি নিজ প্রাসাদে গমন করুন। আমি এই স্থানেই অবস্থান করিব, নগরে গমন করিব না। নগর-প্রবেশকালে প্রথমে আমি শূন্যকুম্ভ দর্শন করিয়াছি। এই মহানগরী অচিরে বিনষ্ট হইবে।" রাজা বলিলেন—"এই স্থানে ব্যাঘ্রের ভীষণ ভয়

বিদ্যমান রহিয়াছে, আপনি একাকী অবস্থান করিতে পারিবেন না, এই স্থানে আপনাকে অবস্থান করিতে দেওয়া উচিত নহে।" সেক বলিলেন—"একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা ব্যতীত কেহই হনন করিতে সমর্থ নহে।" মন্ত্রী, মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মহারাজ, এই দরবেশ অতিশয় নিষ্ঠাবান্, আপনি নিজ প্রাসাদে গমন করুন, ইনি এই স্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন।" মহারাজ বলিলেন—"সেকের জন্য অন্ন ও পানীয় প্রদান করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব মন্ত্রী তাহার ব্যবস্থা করিবেন।" এই বলিয়া রাজা প্রস্থান করিলেন।

মন্ত্রী হলায়ুধ কর্ত্তৃক সেককে বিষ-মিশ্রিত অন্নদান

সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিয়াছেন, অচিরে নৈশ অন্ধকারে ধরণী আবৃতা হইবেন, এমন সময়ে মন্ত্রী চিন্তিত হইলেন এবং মনে মনে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"কোথাকার কে দক্ষিণ হস্তে করবাল ধারণ করিয়া এস্থানে উপস্থিত হইল। কোথা হইতে অকস্মাৎ যবন আসিল—এ এক দুর্দ্দৈব। যাহাই হউক, অদ্য ইষ্টদেবতার নাম স্মরণপূর্ব্বক বিষপ্রয়োগে এই যবনকে পরলোকে প্রেরণ করিব।" এই প্রকার স্থিরনিশ্চয় হইয়া মন্ত্রী বলিলেন—"হে মহাবুদ্ধে সেক! মহারাজ আপনার জন্য ভোজনাদির ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহা আপনি অবগত আছেন—রাজার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিতেছি না, আপনার জন্য নূতন শাকাদির ব্যঞ্জন সহ অন্ন আনয়ন করিব কি?" তৎপরে মন্ত্রী চিন্তিত হইলেন—কে যবনের জন্য অন্ন বহন করিয়া আনিবে? যবনের জন্য এই অন্ন আনীত হইল, ইহা অবগত হইলে কোন ব্যক্তিই এ কার্য্যে অগ্রসর হইবে না! এক্ষণে উপায় কি?

জান বা দানা রজকের ব্যবহার

'জান' নামক এক রজকপুত্র সেই স্থানের অনতিদূরে দণ্ডায়মান ছিল, সে দ্যূতক্রীড়ায় সকল অর্থ বিনষ্ট করিয়া মাতৃবস্ত্র বন্ধক প্রদানে দ্যূত-ক্রীড়া করিয়াছিল। সেই ব্যক্তি মন্ত্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল "ভো মন্ত্রিন্—আমাকে কি দিবেন? তাহা হইলে আমি যবনান্ন বহন করিয়া আনিব।" মন্ত্রী বলিলেন—"তুমি কি চাও?" জান বলিল "আমি এক পণ কড়ি চাহিতেছি।" মন্ত্রী সন্তোষ সহকারে বলিলেন—"তাহাই দিব।" মন্ত্রীর সহিত জান প্রস্থান করিল।

সেখের নামাজ

অতঃপর সেক জাতি ও ধর্ম্মানুসারে আপন কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন, সেক 'নামাজ' আরম্ভ করিলেন—নামাজের ভীষণ শব্দ সমগ্র আকাশে পরিব্যাপ্ত হইল—চতুর্দ্দিকে হাহা শব্দ উত্থিত হইল। জনগণ পরস্পর বলিতে লাগিল এ কি শব্দ উত্থিত হইল—কেহ বলিল মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, কেহ বলিল বৃক্ষ পতিত হইল, কেহ বলিল গঙ্গাগর্ভে মৃত্তিকার ধস্ পড়িয়াছে।

মন্ত্রীর দুর্ব্যবহার

নামাজ সমাপনান্তে রজকপুত্র মন্ত্রীকর্ত্তৃক শৃঙ্গিবিষমিশ্রিত অন্ন আনয়ন করিয়া সেকসমীপে রক্ষা করিল। সেক সেই বিষমিশ্রিত অন্ন আহার করিয়া তিন্তীড়ি ফল বৃক্ষ হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ

করিলেন। এমন সময়ে মন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্রসহ মহারাজ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রী রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—"মহারাজ! দরিদ্রের স্বভাব দেখুন—আমি কর্পূরাদি সংযুক্ত তাম্বুল প্রদান করিয়াছি, কিন্তু তাহা উপেক্ষা করিয়া আহারান্তে বৃক্ষ হইতে কাঁচা তেঁতুল পাড়িয়া মুখশুদ্ধি করিতেছে। দরিদ্র ধনী হইলেও বাইশ বৎসরেও তাহার দরিদ্র স্বভাব নষ্ট হয় না।" মন্ত্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া সেক রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—"আপনাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিতেছি—আপনার প্রেরিত বিষমিশ্রিত অন্ন ভোজন করিয়া মুখ তিক্ত হইয়াছে, সুতরাং তেঁতুল চর্ব্বণ করিতেছি।" এই কথা শুনিয়া রাজা রোষকষায়িতনেত্রে মন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি সঞ্চারিত করিলেন। মন্ত্রী বলিলেন—"মহারাজ সেক ভোজন বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ তাহা বুঝিলাম—মূর্খ অগ্রে মিষ্ট দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিয়া সর্ব্বশেষে তিক্তদ্রব্যমিশ্রিত খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছে—সুতরাং মুখ তিক্ত হইয়াছে। নিতান্ত নির্ব্বোধ কি না।"

মহারাজের ভবিষ্যৎ কথা

সেক বলিলেন "মহারাজ আপনার রাজ্য ভবিষ্যতে যাহা হইবে, মন্ত্রীকর্ত্তৃক পূর্ব্বেই তাহা বিজ্ঞাপিত হইল।" মন্ত্রীপ্রবর হলায়ুধ মিশ্রের প্রতি ক্রোধনেত্রে দৃষ্টি পূর্ব্বক বলিলেন—"ভো পাপবুদ্ধি মন্ত্রিণ, তুমি যে কাজ করিলে ইহা কখন দেখি নাই, কখন কর্ণেও শ্রবণ করি নাই। ইহা অতি অদ্ভুত দৃশ্য—গৃহাগত অতিথিকে বিষমিশ্রিত অন্ন প্রদান করিয়াছে এমন কথা শ্রুত হই নাই। ধিক তোমাকে! যদি যবনের কর্ত্তৃত্ব কাল আগত হইয়াই থাকে, তবে কাহার সাধ্য তাহা রোধ করিতে সমর্থ হইবে। সময়ের স্রোত দৈব কর্ত্তৃক যাহা অনুষ্ঠিত হইবে, তাহা রাজশক্তি দ্বারা রোধ করা আদৌ চলিবে না। রাজমিত্রগণও তখন বিপক্ষ-পক্ষ অবলম্বন করিবে। সময়ের স্রোত যে দিকেই বহিবে, সেই দিকেই বহিবে, মানবের ইচ্ছায় তাহা পরিচালিত হয় না—দৈববলে তাহার গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। মন্ত্রি, তুমি বিষ দ্বারা কি সৈন্যদ্বারা সে স্রোত কি অবরোধ করিতে পারিবে?"

বেহার-ভূমে তুরস্কাগমন

পূর্ব্বকালে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় আকাশ হইতে একটি পত্র পতিত হইয়াছিল, তাহাতে লিখিত ছিল

চতুর্ব্বিংশোত্তর শাকে সহস্রৈকশতাধিকে
বেহার পাটনাং পূর্ব্বং তুরষ্ক সমুপাগতঃ।

আমি অবগত আছি যে পুরুষ পঞ্চেন্দ্রিয় বিজয় করিয়াছেন, আজানুলম্বিত যাঁহার বাহু সেই ব্যক্তি সর্ব্ব প্রথম পূর্ব্বদেশে আগমন করিবেন। মহাত্মা সেক সেই লক্ষণাক্রান্ত মহাপুরুষ দেখিতেছি। কে এমন মহাপাতকী আছে যে এতাদৃশ গুণবান পুরুষকে মান্য না করিবে। ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহা হউক, তদন্যথার জন্য চেষ্টা করিব না, আমার সহায় নীলকণ্ঠ হর থাকিতে আমি ভবিষ্যৎ অমঙ্গল চিন্তায় কাতর নহি। সেককে সম্বোধনপূর্ব্বক মহারাজ বলিলেন—"হে মহাবুদ্ধে, রাত্র হইল এখানে ব্যাঘ্রের অতিশয় ভয়, সুতরাং আপনি নগর মধ্যে গমন করুন।" সেক বলিলেন—"হে রাজন্, আপনাদের শাস্ত্রে আছে, আয়ু, কর্ম্ম, চিত্ত, বিদ্যা, মৃত্যু এই পঞ্চ জন্মিবার পূর্ব্বেই গর্ভবাস কালেই স্থির হইয়া থাকে, সুতরাং অদ্য যদি আমার ব্যাঘ্রের

দ্বারা মৃত্যু নিশ্চয় থাকে, তবে কোথাও গমন করিলে রক্ষা প্রাপ্ত হইব না। অদ্য মৃত্যুর সময় উপস্থিত না হইলে ব্যাঘ্র আমাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। মহারাজ আপনি এস্থান হইতে আপন প্রাসাদে গমন করুন, আমি এই স্থানেই অবস্থান করিব।" তাঁহারা গমন করিলে রজকপুত্র জান (দানা) ব্যাঘ্রভয়ে নগরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সেকসমীপে অবস্থান করিল।

পরিশিষ্ট

সেক শুভোদয়ার ঐতিহাসিক ভিত্তি কতদূর দৃঢ় তাহা বলিতে পারিব না। তত্রাচ ইহার বর্ণনার মধ্যে বহু ঐতিহাসিক সত্য বিদ্যমান যে নাই এ কথা বলা চলে না। গৌড়-রাজ্যের বহু কথা জনশ্রুতিমূলে যাহা লোকসমাজে প্রচলিত ছিল, তাহার অধিকাংশ অবলম্বনে সেক শুভোদয়ার কলেবর পুষ্ট হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে এদেশে মুসলমানগণের মধ্যে কেহ না কেহ যে গৌড়রাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন, ইহা সত্য বলিয়া মনে করিবার বিশেষ হেতু আছে। হইতে পারে সেই প্রথম গৌড়াগত দরবেশের নাম ও কীর্ত্তি-কলাপের সহিত পরবর্ত্তী সেক বা ধর্ম্মপ্রচারকগণের কীর্ত্তি-কলাপের সংযোগ ঘটিয়াছে। প্রায় অধিকাংশ ফকিরের জীবনী একই উপাদানে গঠিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে দেখিতে পাই। দেশের আভ্যন্তরীণ গুহ্যভাব এদেশে অবস্থান না করিলে অবগতির উপায় নাই। বখ্‌তীয়ারের আক্রমণের পূর্ব্বে এদেশে মুসলমানের আগমন হইয়াছিল—ফকির-বেশেই হউক অথবা বণিক-বেশেই হউক। মহারাজের ধর্ম্মভাব, গৌড়নগরের সভ্যতা, আচার-ব্যবহার, বহুবিষয়ের জ্ঞান পূর্ণভাবে না হউক আংশিক ভাবেও বর্ণিত হইয়াছে। গঙ্গানট-বধূ বিদ্যুৎপ্রভার ব্যবহার দ্বারা এদেশের যে-কোন সময়ের বারবিলাসিনীগণের চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। রজকপুত্রের দ্বারা দ্যূত-ক্রীড়ার ফলাফল বিবৃত হইয়াছে। হলায়ুধ হইতে যবনগণের প্রতি দেশবাসীর প্রাথমিক মনোভাব বা পরবর্ত্তী কালের মনোভাব সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। পুনশ্চ সেক শুভোদয়া প্রথম হইতে সাধু পুরুষের প্রভাব দর্শনে যত্নবান হইয়াছেন। ত্যাগী স্বদেশ-প্রেমিকের কর্ত্তব্য কর্ম্মে সকল বাধা দূরে অপসারিত হইয়া সাধুপ্রবর্ত্তিত পন্থাই বলবৎ হইয়া উঠে, রাজবাক্য, রাজশাসন মান্য না করিয়া ত্যাগ-ধর্ম্মে দীক্ষিত মহাত্মার আদর সকলেই করিয়া থাকে, লোকে সাধুকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করে। সাধু মহান বিশ্বপ্রেমিক, ইহা সেক শুভোদয়ায় বিদ্যমান।

শ্রীহরিদাস পালিত।

মফঃস্বলের বাণী

১। ৭ই আগষ্ট

৭ই আগষ্ট আসিল, যাইল; স্বদেশীকে কেহ ভ্রমেও স্মরণ করিল না। কেহ একবার ভাবিল না, স্বদেশীই দেশের দৈন্যদুঃখ-মুক্তির উপায়। এরূপ হইল কেন? স্বদেশী কি পঞ্চত্ব পাইয়াছে?

পুলিস সাহেবগণের প্রতি উপদেশের ইস্তাহারে স্পষ্টই ত বলা হইয়াছে, শুধু 'স্বদেশী' হইলে অর্থাৎ দেশীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার-প্রচারাদির পক্ষে কাহারও ঝোঁক থাকিলে, তাহা দোষাবহ নহে। তবে এই ভাব কেন?

লুটপাট্, হুড়োহুড়ি, কাড়াকাড়ি, হুজুগ করিতে বলি না। ও সকল ব্যাপার নাই বা থাকিল। উদ্দামতার ফল বিশৃঙ্খলা। তাহা কেবল অনিষ্টই প্রসব করিয়া থাকে। সে রকম ভাব বজায় রাখার পক্ষে আমরা বিরোধী। তাই হুজুগ চাহি না।

৭ই আগষ্ট স্বদেশী-প্রচারের জন্মদিন। জন্মদিন উপলক্ষে সকল কার্য্যেই একটা উৎসব, আনন্দ, প্রীতি-প্রকাশের নিয়ম আছে। স্বদেশীর সম্বন্ধেও ঐরূপ প্রীতি-প্রকাশ আবশ্যক। নচেৎ বুঝিতে হইবে যে স্বদেশী পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

প্রীতি-প্রকাশ কি রকমে করা যাইতে পারে? স্বদেশী একটা দেবতা নহে যে, তাহার যোড়শোপচারে পূজা চলিবে। স্বদেশী একটা জীব নহে যে তাহাকে চব্যচোষ্য দ্বারা ভোজন করাইতে হইবে। তবে প্রীতি-প্রকাশ কিরূপে করিব?

প্রীতি-প্রকাশের অর্থ আদর করা। ৭ই আগষ্ট দিনে স্বদেশীকে আদর করিতে হইবে। ক্ষমতানুযায়ী আবশ্যকীয় স্বদেশী দ্রব্য কিনিয়া আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবকে দান বা প্রদর্শন করিলে উহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করা হয়। আদরের সামগ্রী লোকে কত আগ্রহে বন্ধুদের দেখায়।

৭ই আগষ্টে পূর্ব্বে কত স্থানে স্বদেশী হাট, স্বদেশী মেলা বসিত; সে হাটে, সে মেলায় কত লোক খরিদ-বিক্রয় করিত। ইহা স্বদেশীর উপর প্রীতি-প্রকাশের চিহ্ন। গত বৎসরও অনেক স্থানে এরূপ মেলার কথা প্রচারিত হইয়াছিল। এবার কোন মেলার খবর পাওয়া গেল না।

এবার হয় ত সর্ব্বব্যাপী ভীষণ বর্ষায় অতি-শয় জলপ্লাবনে এরূপ ঘটিয়াছে। নচেৎ ৭ই আগষ্টে বাঙ্গালীর মনে একটু স্বদেশী ভাবের উন্মেষ হইবে না, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? স্বদেশের বাণিজ্য, স্বদেশী শিল্প স্বদেশের ধনবৃদ্ধির উপায়, এ কথা বুঝে না কে?

স্বদেশী যেন একটা উপহাসের বিদ্রূপের সামগ্রী না হয়। ৭ই আগষ্টে ইহাকে প্রতি বৎসরই আদর করিয়া জাগাইয়া রাখিতে হইবে। এমন মঙ্গল অনুষ্ঠান আর নাই—আর হইতে পারে না। দেশের সুখসমৃদ্ধি যাঁহারা চান, তাঁহারা যেন অন্ততঃ ৭ই আগষ্ট স্বদেশীকে স্মরণ করেন।

পল্লীবার্ত্তা।

২। নৈশ বিদ্যালয়

দেশের শ্রমজীবিগণকে তাহাদের জীবনোপায়ের সাহায্যকল্পে লেখা-পড়া এবং নানাবিধ শিল্প শিক্ষা দেওয়ার জন্য বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের সুযোগ্য প্রোফেসার বাবু রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, মহোদয় স্থানীয় কতিপয় সুশিক্ষিত যুবকগণের সহযোগে নানাস্থানে অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা উদ্যোগ করিতেছেন। রাধাকমল বাবু নিজের বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়া এবং স্বোপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ মাসে মাসে ব্যয় করিয়াও এই দেশহিতকর-

ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। তজ্জন্য তিনি আমাদের অশেষ ধন্যবাদার্হ। তাঁহার কার্য্যে আড়ম্বর নাই, জাঁকজমক নাই, বাকপটুতা নাই, সভা-সমিতি নাই, বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি নাই; আছে—কার্য্যতৎপরতা ও উৎসাহ। তিনি যথোপযুক্ত মহাত্মাগণের নিকট তাঁহার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া কার্য্য-পরিচালনের সহায়তা চাহিতেছেন, অল্প দিন মধ্যেই তিনি বহরমপুর মিউনিসিপালিটীর মধ্যে গোরাবাজার, কাদাই, সৈদাবাদ এই তিনটী স্থানে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। গোরাবাজার বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা ৩৫ জন, কাদাই বিদ্যালয়ে ৬০ জন, সৈদাবাদ বিদ্যালয়ে ৪০ জন হইয়াছে। কেবল মাত্র সহরেই তাঁহার অভিপ্রায় সীমাবদ্ধ নাই; পল্লীগ্রামেও তাঁহার দৃষ্টি বিশেষভাবে পতিত হইয়াছে, তাঁহার "পল্লীসেবক" পুস্তক পাঠ করিলেই সকলে বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবেন তাঁহার উদ্দেশ্য কত মহৎ। ইতিমধ্যে দশটী পল্লীতে দশটী অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহাতে শ্রমজীবী বালক ও যুবকগণকে নিয়মিত পাঠাদি এবং শিল্প শিক্ষা দিতেছেন। নিম্নলিখিত পল্লীগুলিতে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

চৌতাপুর, বেণীদাসপুর, মদনপুর, সেখালীপুর, বহুরুল, সোমপাড়া, বীরচন্দ্রপুর, মণীগ্রাম, অজীপুর, পশ্চিমগামিনী, সম্প্রতি এই দশটী পল্লীতে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তিনি সমস্ত মুর্শিদাবাদ জেলার এবং তৎদৃষ্টান্তে বিভিন্ন জেলার সমস্ত স্থানেই যাহাতে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। পল্লীগ্রামের উদ্যোগী উৎসাহী যুবকগণ স্ব স্ব পল্লীর গরীব প্রতিবাসিগণের হিত ইচ্ছা করিয়া যদি রাধাকমল বাবুর সহায়তা চান, তাহা হইলে তিনি বিশেষ আনন্দের সহিত সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছেন। পাঠ্য পুস্তকাদি সম্বন্ধেও তিনি পরমুখাপেক্ষী হন নাই। এ সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষার উপযোগী পুস্তক প্রণয়ন করিয়া অশেষ উপকার করিতেছেন। তাঁহার প্রণীত "শিক্ষাপ্রচার" নামক পুস্তকখানি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। পুস্তকের স্থানে স্থানে ছবি দেওয়ায় শিক্ষার্থিগণের উৎসাহ এবং তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার ইচ্ছা প্রবল করিয়া দেয়। এই প্রকার পুস্তক সকল বিদ্যালয়েরই প্রথম পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। রাধাকমল বাবুর ন্যায় দেশের সমস্ত শিক্ষিত যুবকগণের স্বার্থত্যাগ, কর্ম্মপটুতার প্রবৃত্তি যতদিন না আসিবে, ততদিন দেশের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে না।

রাধাকমল বাবু আর একটী মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন, যদ্যপি কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহা হইলে দেশের প্রকৃতই একটী হিত সাধন হইবে। অতঃপর স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে সমস্ত পদ্ধতি আছে তাহা তিনি হিতজনক বলিয়া মনে করেন না, বিশেষতঃ হিন্দুঘরের স্ত্রী-কন্যাগণের পক্ষে সম্পূর্ণ অহিতকর। আমরাও তাঁহার মতের সমর্থন করিতেছি। হিন্দুর ঘরের স্ত্রী, কন্যা হিন্দু-শাস্ত্রের হিন্দু-রীতিনীতির অনুগত থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিলেই তাহার ফল অমৃততুল্য হইবে, আর বিধর্ম্মিগণের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে গিয়া হিন্দুধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে আচার-ব্যবহার শিক্ষা করা হিন্দু রমণীগণের কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়; তাহার বিষময় ফল

অনেকেই বিশেষরূপ অনুভব করিতেছেন। যাঁহারা নিজ স্ত্রী-কন্যাকে স্ত্রীসুলভ অতি-স্নিগ্ধ, অতিপবিত্র মধুময় কোমল ভাবের পরিবর্ত্তে কঠিন পুরুষভাবাপন্ন সাজ-সজ্জায় সাজাইয়া, আসনের পরিবর্ত্তে চেয়ারে বসাইয়া বিবি করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা হয় তো মনে করিবেন এখন যাহা হইতেছে ভালই হইতেছে। কিন্তু অমৃত ভ্রমে বিষ ভক্ষণ করা হইতেছে; ইহা অনেকেই বুঝিতেছেন না। রাধাকমল বাবু অনুভব করিয়াছেন—হিন্দু রমণী দ্বারা হিন্দু স্ত্রী-কন্যাগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাঁহার এই মহতী চেষ্টা যদি সফল হয় তাহা হইলে সকলে বুঝিতে পারিবেন—কত উপকার সাধিত হইবে। আমরা মদ্যপগণের ন্যায় নিজ অর্থে জীবনক্ষয়কারী বিষ ক্রয় করিয়া ক্রমে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছি। হিন্দু ঘরের ললনাগণ বিধর্ম্মিগণের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের অনুমোদিত মধুর ভাবকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। দেশের ধনিগণকে তাহা বুঝাইয়া দিলেও বুঝিতে পারিতেছেন না। এই বিষয়ে ভাণ্ডার স্থাপন জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেই মুক্তহস্ত; ইহাকেই বলে "সপাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা"। নালা কাটিয়া জল আনার ব্যবস্থা করিলে তাহার পরিণাম যে অতি ভীষণরূপে পরিণত হয়, তাহা একদিন অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন; কিন্তু তখন আর সহজে সংশোধন হইবে না; কেবল পরিণামে পরিতাপ করাই সার হইবে।

মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী

৩। পাবনার প্রাচীনত্ব

শুনিলাম বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির অনেক সভ্য মহোদয়, পাবনা জেলাকে গঙ্গানদীর 'ব'দ্বীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস উক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মহাশয়ের অনুসন্ধান ঠিক নির্ভুল হয় নাই। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত অনুসন্ধানের আবশ্যক। আমরা এ বিষয়ে অনুসন্ধানে যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সহায়তার জন্য এ স্থানে তাহা বিবৃত করিলাম।

যাহার নাম বর্ত্তমান সময়ে পাবনা জেলা, এই ভূখণ্ডটি যে প্রাচীন কালে কি নামে অভিহিত ছিল, তাহা আমরা অবগত নহি। পাবনা জেলাটি অতি প্রাচীন স্থান। অনুসন্ধান করিলে তৎসম্বন্ধে বহুল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কিঞ্চিদধিক অশীতিবৎসর পূর্ব্বে, বর্ত্তমান পাবনা নগরীর প্রায় ৬ মাইল পূর্ব্বদিকস্থিত কামারজানী নামক পল্লীটি, উত্তালতরঙ্গিণী, খরস্রোতপ্রবাহিনী ভীষণ পদ্মানদীর গর্ভে নিমজ্জিত হইলে, ঐ স্থানে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিপাকের আবির্ভাব হয়। কত বণিকের বাণিজ্যতরণী পণ্যসম্ভার লইয়া, কত যাত্রীপূর্ণতরী হতভাগ্য আরোহীদিগের গগনভেদী আর্ত্তনাদসহ, ঐ ঘূর্ণিপাকে প্রবেশ করিতেছিল। কয়েক দিন এই ভাবে অতিবাহিত হইলে, একদা ঢাকা জেলার ৭ খানি সুবৃহৎ গরুৎমতী তরী অগ্র পশ্চাৎ হইয়া, এই স্থান দিয়া গমন করিতেছিল। প্রথম ৬ খানি ঘূর্ণিপাক অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু শেষের খানি প্রবল পাকের আকর্ষণে পড়িয়া স্থির হইয়া থাকে। ঐ নৌকাতে একজন সুদক্ষ ডুবুরী

ছিল। নৌকাখানি অনায়াসে পাক উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না ভাবিয়া, সে পাকের ভিতর অবতরণ করে এবং বহু চেষ্টা ও যত্ন করিয়া, প্রায় দৈর্ঘ্যে দুই হাত প্রস্থে দেড় হাত ও উচ্চতায় তিন হাত পরিমিত কয়েকখণ্ড প্রস্তর এবং ৪ কি ৪॥ হাত উচ্চ, মনোহর কারু-কার্য্য-খচিত মন্দিরের চূড়ার ন্যায় প্রস্তর-নির্ম্মিত আর একটি স্তম্ভ উত্তোলন করে। ঐ প্রস্তরগুলি উঠাইলে পরই ঘূর্ণিপাক প্রশমিত হয় এবং নাবিকগণও স্বকার্য্য সাধনার্থ গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়। উত্থিত প্রস্তরখণ্ডের একখানা খোর্দ্দ চাঁদপুর বাঙ্গাল সাহেবের দরগায় ও একখানা ভাড়ারার গোলার উপর অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, পাবনার পাথরতলাতে এবং নাজিরপুরের দরগায় যে দুইখণ্ড প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়, উহাও ঐ ঘূর্ণিপাক হইতে উত্থিত হইয়াছিল।

প্রাগুক্ত প্রস্তর-নির্ম্মিত সুদৃশ্য স্তম্ভটির গাত্রে কি অজ্ঞাত অক্ষরে যেন কি লেখা দৃষ্ট হয়! বহু পণ্ডিত ও মৌলবীগণ অশেষ চেষ্টায় তাহা পাঠ করিতে সক্ষম হন নাই। ঐ স্তম্ভটি বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতার যাদুঘরে বিরাজমান।

কামারজানীর ঘূর্ণিপাক হইতে শিলাখণ্ড ও স্তম্ভ উত্থিত হওয়াতে এবং তৎসন্নিকটবর্ত্তী দেবালয় মহাদেবপুর, ভাড়াবাড়িয়া, ঘোড়াদহ, করীয়াদহ ও ভাড়ারা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী-গুলির একত্র সমাবেশ থাকাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, বহু পূর্ব্বকালে কোন রাজা, মহারাজা বা তত্তুল্য শক্তিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি এই স্থানে বাস করিতেন।

সুরাজ।

৪। নিম্নশিক্ষা

গবর্ণমেণ্ট নিম্নশিক্ষার জন্য যে নিয়ম প্রচলন করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা আমাদের পল্লীসমূহের সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে কি না তাহা ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। একে পাঠশালার শিক্ষকদের আয় অত্যন্ত কম, তাহার উপর যদি তাঁহাদিগকে কতকগুলি কঠোর নিয়মের অধীনে চলিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের দারুণ অসুবিধা উপস্থিত হইবে এবং অনেককে কার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট দেশের উপযোগীভাবে নিয়মাবলী প্রবর্ত্তন করুন ইহাই আমাদের অনুরোধ। গবর্ণমেণ্ট যে সকল নিয়মের প্রচলন ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা অগ্রে সাধারণের গোচরে আনয়ন করুন, তার পর সুবিধা-অসুবিধার কথা উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া যাহা দেশের সম্পূর্ণ উপযোগী তাহাই প্রবর্ত্তিত করুন। নতুবা সুবিধা করিতে গিয়া অসুবিধা উপস্থিত হইবে, শিক্ষার পথ বিস্তৃত করিতে গিয়া শিক্ষার পথ অবরুদ্ধ হইবে। গবর্ণমেণ্ট অবশ্য বলিতে পারেন যে, শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদস্থ দেশীয় কর্ম্মচারীদের মতামত লইয়া নিয়মাবলী প্রচলিত হইবে। কিন্তু যত বড় উচ্চপদস্থ দেশীয় কর্ম্মচারী হউক না কেন, উপরওয়ালা ডিরেক্টার মহোদয়ের প্রস্তাবের বিপক্ষে কেহই মতামত প্রকাশ করিতে সাহস করিবেন না। বিলাতে অধীন কর্ম্মচারী দেশের পক্ষে যাহা ভাল বা মন্দ, তাহা উপরিতন কর্ম্মচারীকে বুঝাইয়া দেন। কিন্তু আমাদের দেশ বিলাত নহে। এ দেশের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ দেশের ভাল-মন্দ বুঝিলেও চাকরীর মমতায়

উপরিতন কর্ম্মচারীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে পারেন না। অবশ্য পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। স্বর্গগত বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনস্বী ব্যক্তিগণ তাহা পারিতেন বলিয়া সে সময়কার নিম্ন-শিক্ষার অবস্থা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল। এখনকার শিক্ষা-বিভাগের দেশীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ দেশের ভাল-মন্দ সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়াও কিরূপ পঙ্কিল-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন, তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন।

প্রসূন।

৫। কুলীনকন্যা অত অবিবাহিত থাকে কেন?

আমাদের মনে হয়, তাহার কারণ এই ত্রিবিধ—

১। অধিকাংশ কুলীনের ছেলেই শ্রোত্রীয়ের কন্যা বিবাহ করিয়া থাকেন।

২। পণের টাকার পরিমাণ অত্যধিক, এমন কি অসীম বলিলে ও অত্যুক্তি হয় না, তদুপরি অলঙ্কার ও দানসামগ্রীর অত্যধিক দাবী।

৩। মেল-বাঁধাবাধি এবং লোকের সহৃদয়তা ও দয়ার অভাব।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজেই অনুমিত হইবে যে, উল্লিখিত কারণেই কুলীনকন্যাদের বিবাহ দেওয়া বর্ত্তমান সময়ে এক কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি অনেক কুলীনকন্যা অবিবাহিতা অবস্থায়ই জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

হে কুলীন-সমাজ! আমরা একটী নিবেদন করি যে, সামাজিক উন্নতি করিতে হইলে সমাজস্থ লোকের অবস্থার দিকে সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য নয় কি?

১। কুলীনের কন্যা বিবাহ দিতে কুলীনের ছেলে ব্যতীত কুলীনের উপায়ান্তর নাই; তথাপি অধিকাংশ কুলীন ছেলেরাই শ্রোত্রীয়ের কন্যা বিবাহ করিয়া থাকেন। তন্নিবন্ধনই কুলীনের অবিবাহিত ছেলের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইতেছে। শ্রোত্রীয় ব্যক্তি তাঁহার কন্যা কুলীনেও বিবাহ দিতে পারেন এবং শ্রোত্রীয়েও বিবাহ দিতে পারেন; কুলীনের কিন্তু দ্বিতীয় পথ নাই। এমত স্থলে কুলীনের ছেলেদের এ বিষয় একটু বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য নয় কি? যাহাতে নিজ কুলের কন্যাগণের বিবাহ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের সচেষ্ট হওয়া সঙ্গত। আরও দেখা যায় যে, কেহ হয় তো নিজের ভগিনী বিবাহ দিতে পারিতেছেন না, অথচ নিজে অবলীলাক্রমে একাধিক বিবাহ করিতেছেন। এ স্থলে অন্ততঃ পরিবর্ত্তন-ক্রমে নিজের ভগিনীর বিবাহ দিবার চেষ্টা করাই বোধ হয় সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

২। প্রথম যখন কৌলীন্য-প্রথা স্থাপিত হয়, তখন নিয়ম ছিল, বরকে ১৬৲ টাকা ভার দিতে হইবে। এ ভার শব্দের অর্থ বোধ হয় ওজন বা পাত্রের মর্য্যাদা। দানসামগ্রী প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন কথাই ছিল না, যে যাহা পারিত দিত। তখন অলঙ্কারের মধ্যে হিন্দুরমণীর চির আদরের শাখাযুগলই অলঙ্কারের সাধ মিটাইত। সেই ১৬ টাকা ভারের স্থলে ভার শব্দ উঠিয়া গিয়া পণ শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। এই পণ শব্দের অর্থই, বোধ হয়, পাত্রের মর্য্যাদার মূল্য। ইহার নিম্নতম সংখ্যাও ৩০০৲ টাকা, উর্দ্ধতম সংখ্যার কোন সীমা

[illegible] বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! তদুপরি [illegible] ও দানসামগ্রীর অত্যধিক দাবী। অনেক স্থলে অলঙ্কারের দাবীটা পণের টাকাকেও অতিক্রম করিয়া থাকে। এমন কি অনেকেই কন্যা বিবাহ দিতে ভিটাবাড়ী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। এখন যেন আর সুটুম্বিতা বলিয়া একটা বিশেষ কিছু নাই, বিবাহ করিতে শ্বশুর মহাশয়কে সর্ব্বস্বান্ত করাই যেন পণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হায় কুলীনসমাজ! ইহাতে যে সমাজে কি বিষময় ফল হইতেছে তাহা একবারও চিন্তা করিয়া দেখা উচিত নয় কি? আর একটী কথা—ধনী ব্যক্তিও তাঁহার ছেলে বিবাহ করাইতে টাকার প্রার্থী হ'ন। অন্যান্য বিষয় মনোমত হইলে, তাঁহার ছেলেকে দরিদ্রের কন্যা বিবাহ করাইলেই বা ক্ষতি কি? গৃহে বিবাহের যৎকিঞ্চিৎ অর্থ তাহার ঐ বিপুল অর্থের সহিত যোগ না দিলে বিশেষ কি ক্ষতি হইতে পারে? পক্ষান্তরে একটী দরিদ্রের উপকার করা হয়, এবং অর্থের সদ্ব্যবহারও করা হইয়া থাকে। সমাজে এই কুপ্রথা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যে সমাজকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিতেছে তাহা কি একবারও চিন্তা করিয়া দেখা উচিত নয়! সামাজিক উন্নতি করিতে হইলে, সমাজ যাহাতে শান্তিপূর্ণ হয় সর্ব্বাগ্রে তাহাই করা কর্ত্তব্য।

৩। মেল-বাঁধাবাঁধি।—হে কুলীনসমাজ! আমরা অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি যে, স্বীয় সন্তান আদরের কন্যারত্নকে আজীবন অবিবাহিতা রাখাই ভাল, না মেল ভঙ্গ করিয়া যাহাতে তাহার বিবাহ দেওয়া যায় তাহা করাই কর্ত্তব্য। সন্তানের সুখ-শান্তির জন্য মেল-বাঁধাবাঁধিটা একটু শিথিল করিয়া দিলে ক্ষতি কি? তাই নিবেদন করি যে, সকলেই মনপ্রাণে বদ্ধপরিকর হইয়া এ প্রথাটী সমাজ হইতে দূরীভূত করতঃ, যাহাতে কুলীনকন্যাগণের বিবাহ হইতে পারে তাহাই করুন। যাহাতে সমাজস্থ দরিদ্র কুলীনগণ কন্যাবিবাহ দিতে একেবারে উৎসন্ন না হ'ন, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি করা প্রয়োজন। সমাজস্থ ব্যক্তিমাত্রেরই তদ্বিষয়ে আন্তরিক সহানুভূতি থাকা আবশ্যক। ধনী কুলীনগণ যদি এ বিষয়ের প্রতি একটু সকরুণ দৃষ্টিপাত করেন, তবে অনেকটা মঙ্গল হইতে পারে; তাঁহারা উদাসীনতা ত্যাগ করিয়া অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির অভাব মোচন করিতে ও তদ্দ্বারা সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে মনপ্রাণে যত্নবান হ'ন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। এ বিষয়ে সহৃদয়তা, সংসাহস, উদ্যোগ ও উৎসাহ চাই। কেবল মুখে বলিলে হইবে না; কার্য্যে পরিণত করিতে আরম্ভ করিলেই সমাজের মঙ্গল হইবে।

[illegible]

পরিশিষ্ট।

নিরয়ণ তাৎকালিক রবি ২।১৬।৫৪৩; ২ রাশি অর্থাৎ মেষ আর বৃষ গত হ'য়ে মিথুনের ১৬।৬ গত হ'য়েছে। অয়নাংশ শুদ্ধ লগ্ন-খণ্ডায় দেখ—

মিথুনের মান ৩৩০ পলে ৩০ অংশ; সুতরাং ১৬ অংশ ৬ কলাতে কত পল?

৩০ : ১৬।৬ : : ৩৩০ : কত?

$$= \frac{১৬।৬ \times ৩৩০}{৩০}$$

= ১৬।৬ × ১১ = ১৭৭ পল

+ জন্ম সময় উদয়াবধি = ১৩৮৬ পল

সমষ্টি ১৫৬৩ পল
— মিথুন ৩৩০ „
১২৩৩ „
— কর্কট ৩৩৯ „
৮৯৪ „
— সিংহ ৩৩৩ „
৫৬১ „
— কন্যা ৩২৬ „
বাকী ২৩৫ তুলার

তুলার মান ৩৩৬ পলে ৩০ অংশ

∴ ৩৩৬ : ২৩৫ : : ৩০ : কত?

$$= \frac{২৩৫ \times ৩০}{৩৩৬}$$

$$= \frac{৭০৫০}{৩৩৬}$$ = ২০ অংশ ৫৯ কলা।

∴ নিরয়ণ লগ্ন ৬।২০।৫৯ অর্থাৎ তুলার কুড়ি অংশ উনষাইট কলা।

এই যে বেশী হলো, সেটা ঐ অয়নাংশ বেশী স্বীকার করার ফল মাত্র।

আমি। এইবার আমি অপর কয়টি লগ্ন করি।

গুরুদেব। তা পার, কিন্তু আগে সচরাচর কোষ্ঠীতে যেরূপ জন্মকুণ্ডলী লিখিত হয়, এই লগ্ন সাহায্যে সেইরূপ একটি চক্র করা মন্দ নয়।

আমি। আমি সেরূপ চক্র উদ্ধার করতে পারি।

গুরুদেব। আচ্ছা কর দেখি?

আমি। এই চক্র এঁকে, প্রথমে নিরয়ণ লগ্ন, তুলায় বসালাম তা'র পর আষাঢ় মাসের রবি মিথুনে দিলাম পাঁজীতে ঐ তারিখের পার্শ্বে লেখা আছে ৬৮/ সুতরাং রবির পাশে ৬ বসালাম, তা'র পর চন্দ্র বৃষে বসিয়ে, কৃত্তিকার ভোগ্য ২০।২৬ দণ্ডাদি ব'লে, চন্দ্রের পাশে ৪ বসাইলাম।

তা'র পর এই পঞ্জিকার ১২৪ পৃষ্ঠায় [illegible] গ্রহের রাশ্যাদি সঞ্চারে দেখছি ১৭ই তারিখের পূর্ব্বে শুক্র [illegible] ৩, মঙ্গল ২ ভরণীতে, এবং বুধ ৮ পুষ্যাতে গেছেন, বাকী সব সংক্রান্তির দিনের মতই আছে, সুতরাং চক্র অনুসারে গ্রহ ও তাহাদের আশ্রয় নক্ষত্র নির্দ্দেশ কল্লাম।

গুরুদেব। ঠিক হ'য়েছে।

আমি। ভাবচক্র কিরূপে প্রস্তুত ক'র্ত্তে হয়, সেটা শিখিয়ে দিন।

গুরুদেব। তুমি দু'একটা লগ্ন কর; তা'র পর দশম নির্ণয় ক'রে, কেমন ক'রে দ্বাদশ ভাব ও ভাবসন্ধি নির্ণয় ক'র্ত্তে হয় এবং বিভিন্ন দেশে চক্র আঁকবার রীতিই বা কি রূপ তা দেখিয়ে দিব।

আমি। যে আজ্ঞা। লাহোরের অক্ষাংশাদি ৩১।৩৪উ তদনুসারে পলভা হয়েছে ৭ অঙ্গুল ২২ ব্যঙ্গুল। এই অঙ্ককে যথাক্রমে ১০,৮ ও ১০ দিয়ে গুণ করে মেষের ৭৪, বৃষের ৫৯ এবং মিথুনে ২৫ চরার্দ্ধ পল স্থির করলাম।

৭।২২	৭।২২	৭।২২
১০	৮	১০
৭৩।৪০	৫৮।৫৬	৭৩।৪০
		২৪।৩৩

গুরুদেব। কোন কোন জ্যোতিষাচার্য্য গুণ ক'রে ৬০ দিয়ে ভাগ দিতে বলেন, কিন্তু বচনানুসারে সেরূপ কোন প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে না।

আমি। এখন মেষের লঙ্কোদয় ২৭৮ থেকে ৭৪ বাদ দিয়ে পেলাম ২০৪, বৃষের ২৯৯—৫৯=২৪০ এবং মিথুনের ৩২৩—২৫=২৯৮ পল হ'লো। তা'র পর কর্কটের ৩২৩+২৫=৩৪৮, সিংহের ২৯৯+৫৯=৩৫৮ এবং কন্যার ২৭৮+৭৪=৩৫২ পল এই গুলিই ব্যুৎক্রমে তুলাদির মান। সুতরাং লাহোরের জন্য প্রাচীন লগ্ন খণ্ডা হ'লো—

৩১।৩৪ উ অক্ষাংশাদি সন্নিহিত দেশের লগ্নখণ্ডা।

রাশি	মেষারম্ভ হইতে অংশ পরিমাণ	মেষারম্ভ হইতে উদয়পল পরিমাণ	ভোগ্য
১ মেষ	৩০	২০৪	২৭০
২ বৃষ	৬০	৪৪৪	২৯৮
৩ মিথুন	৯০	৭৭৪	৩৪৮
৪ কর্কট	১২০	১০৯১	৩৫৮
৫ সিংহ	১৫০	১৪৪০	৩৫২
৬ কন্যা	১৮০	১৮০০	৩৫২
৭ তুলা	২১০	২১৫২	৩৫৮
৮ বৃশ্চিক	২৪০	২৫১১	৩৪৮
৯ ধনু	২৭০	২৮৫৮	২৯৮
১০ মকর	৩০০	৩১৫৬	২৪০
১১ কুম্ভ	৩৩০	৩৩৯৬	২০৪
১২ মীন	৩৬০	৩৬০০	২০৪

এখন সেই পূর্ব্বনির্ণীত তাৎকালিক রবি অবলম্বন ক'রে ক'সবে কি ?

গুরুদেব। তা হ'বে কেন ? কলিকাতায় যখন সূর্য্যোদয় হয়, লাহোরে তা'র অনেক পরে সূর্য্যোদয় হয়। তখন লাহোরের ২টা ৩৫ মিনিটে কলিকাতার ২টা ৩৫ মিনিটের সমান স্ফুট হ'বে কি ক'রে ?

আমি। তবে স্বতন্ত্র ভাবে নির্ণয় করতে হ'বে। লাহোরের অক্ষাংশাদি ৩১।৩৪ আর কলিকাতার ২২।৩৩, উভয়ের অন্তর ৯ অংশ ১ কলা। ১৫ অংশ ১ ঘণ্টার তুল্য সুতরাং ৯ অংশ ১ কলাতে প্রায় ৩৬ মিনিট হ'বে সুতরাং লাহোরে যখন ২টা ৩৫ মিনিট, তখন কলিকাতায় ৩টা ১১ মিনিট হ'বে ; সুতরাং ৩টা ১১ মিনিটের সময় কলিকাতায় যে স্ফুট তাই লাহোরের ২টা ৩৫ মিনিটের স্ফুট হ'বে। কি বলেন ?

গুরুদেব। হাঁ তা' হ'লে ঠিক হ'বে।

আমি। তবে কলিকাতার ৩টা ১১মিঃ সময়ের রবিস্ফুট করি। ২৪ ঘণ্টায় ঐ দিন রবির গতি পেয়েছি ৫৬।৫১ ; কলিকাতার ঐ দিন সূর্য্যোদয় ৫।২১ মিঃ সময়ে সুতরাং—

১২।০ — ৫।২১ + ৩।১১ = ৯ঘঃ ৫০ মিনিটের গতি নির্ণয় ক'ত্তে হ'বে।

২৪ : ৯।৫০ :: ৫৬।৫১ : কত ?

$$= \frac{৫৯০ \text{ মিঃ} \times ৫৬।৫১}{১৪৪০} = ২ \text{ কলা } ১৯.৭ \text{ বা } ২০ \text{ বি}$$

∴ ২।১৫।৪৩।৫০ + ০।০।২।২০ = ২।১৫।৪৬।১০ তাৎকালিক রবি

গুরুদেব। ৫৬।৫১-র পরিবর্ত্তে ৫৭ কলা নিলেও ঐ ফল হ'তো।

আমি। লাহোরের সূর্য্যোদয় কস্‌তে হ'বে—২।১৫।৪৬ + ০।২১।৪৭ = ৩,৭।৩৩ সায়ন সূর্য্য সুতরাং টেবিল (৪২ পৃ) অনুসারে ক্রান্তি ২৩।৯উঃ; লাহোরের অক্ষাংশাদি ৩১।৩৪, দিবার্দ্ধ ও রাত্র্যর্দ্ধ সারিণী (২০ পৃঃ) সাহায্যে—

২২।২৮ ক্রান্তি ৩০ অক্ষ = ৬।৫৮ ও ৪০ অক্ষ = ৭।২১
২৩। ০ „ „ = ৬।৫৭ „ = ৭।২৩
২৮ „ „ ০। ১ „ ০। ২

২৮ কলা : ৯ কলা : ১মিঃ : কত ?

$$= \frac{৯ \times ৬০}{২৮} = ১৯ \text{ সে}$$

∴ ২মি = ৩৮ সেঃ

∴ ৩০ অক্ষে ২৩।৯ ক্রান্তিতে ৬।৫৭।১৯
৪০ „ ২৩.৯ „ ৭।২৩।৩৮
১০ অক্ষে ২৬।১৯

১০ অংশে : ১।৩৪ :: ২৬।১৯ : কত ?

$$= \frac{৯৪ \times ২৬।১৯}{৬০০} = ৪।৭$$

∴ ৩১।৩৪ অক্ষে ২৩।৯ ক্রান্তিতে ৬.৫৭।১৯ + ০।৪।৭ = ৭।১।২৬ অস্তকাল, এবং ৪।৫৮।৩৪ উদয় কাল; তা'তে কালসমীকরণাঙ্ক ২ মিঃ যোগ ক'রে ৫টা উদয় কাল পেলাম। সুতরাং সূর্য্যোদয়ের পর ৭।০ + ২।৩৫ = ৯ ঘণ্টা ৩৫ মিঃ সময়ের লগ্ন করতে হ'বে।

৯।৩৫মি = ২৩'৫৭ দণ্ডাদি = ১৪৩৭ পল।

৩০ : ৭। ৩৩ :: ৩৫৮ : কত ?

$$= \frac{৭।৩৩ \times ৩৪৮}{৩০} = ৮৭$$

তাৎকালিক রবির ৩ রাশি = ৭৪২
৭।৩৩ = ৮৭
উদয়াবধি = ১৪৩৭
মোট ২২৬৬
১ তুলা পর্য্যন্ত = ২১৫২
বৃশ্চিক ১১৪ ভুক্ত

∵ বৃশ্চিক = ৩৫৮
∴ ৩৫৮ : ১১৪ :: ৩০ : কত ?

$$= \frac{১১৪ \times ৩০}{৩৫৮} = ৯° - ৬'$$

∵ সায়ন লগ্ন ৭।৯।৬
অয়নাংশ ০।২১।৪৪
নিরয়ণ লগ্ন = ৬।১৭।১৯

এস্থলেও তুলা লগ্ন, সুতরাং জন্মকুণ্ডলী পূর্ব্ববৎ হ'বে।

গুরুদেব। তবে তুমি প্রক্রিয়াটি বেশ বুঝেছ দেখ্‌চি ; এখন আর মান্দ্রাজের লগ্ন না ক'রে, মেলবোর্ণের লগ্ন কর। ঐটিতে একটু বিশেষত্ব আছে।

আমি। দক্ষিণ অক্ষে অবস্থিত ব'লে ?

গুরুদেব। হাঁ!

আমি। আচ্ছা কর্‌চি। মেল্‌বোর্ণের অক্ষাংশ ৩৭।৫০ দ। দেশান্তর গ্রীণীচ পূর্ব্ব
১৪৪ — ৫৯ বা ১৪৫ = ৯ ঘণ্টা ৫০ মিনিট
৩৭ অংশ ৫০ মিঃ ট্যান = ৯·৮৯০২০৫০

গুরুদেব। ওটা যে লগারিথিমিক ট্যান। ওকে ১১ দিয়ে গুণ ক'র্ত্তে হ'লে ১২ র লগ্ অঙ্ক বা চারাঙ্ক ১·০৭৯১৮১২ ওর সঙ্গে যোগ ক'রে ফলের লগ. নাহির ক'র্ত্তে হ'বে ?

আমি। যোগ ক'র্‌চি—

৯·৮৯০২০৪০
১·০৭৯১৮১২
১০·৯৬৯৩৮৫২ হ'লো!

তা'র পর ?

গুরুদেব। ও ১০ ছেড়ে দিতে হয়। এখন গ্রন্থে ৯৬৯৩৮ ইত্যাদি খুঁজে বার কর। চেম্বসের টেবিলের ১৭২ পৃষ্ঠায় ৯৬৯৩৮ = ৯৩১৯৪ পাওয়া গেল সুতরাং ৯৩১৯৪ অঙ্গুল হ'লো পলভা আর আমি স্বাভাবিক ট্যান সাহায্যে কর্‌ছিলাম ৩৭।৫০এর স্বাভাবিক ট্যান (৩১৩পৃ) ·৭৭৬১১৮ তারে ১২ দিয়ে গুণ কর, ফল হবে ৯·৩১৯৩৪১৬ দুই প্রকারেই এক ফল হ'লো।

আমি। লগারিথিম্‌টা আমায় বুঝিয়ে দিন।

গুরুদেব। ঐ বইয়ের প্রথম ৮১ পৃষ্ঠায় যা লেখা আছে, তা পড়লেই সহজে বুঝ্‌তে পার্‌বে ; যদি একান্ত কোন জায়গা কঠিন বোধ হয়, পরে জিজ্ঞাসা ক'রো।

তবে এখন চর নির্ণয় করি। আপনার পলাঙ্কের ৪ পদ দশমিক পর্য্যন্ত নিয়ে যথাক্রমে ১০, ৮ ও ১০ দিয়ে গুণ ক'রে মেষাদি রাশির চর যথাক্রমে ৯৩, ৭৪ ও ৩১ পল পেলাম এখন টেবিল ক'র। মেষ ২৭৮ তা থেকে ৯৩ বিয়োগ ক'র্লে—

৯·৩১৯৩	৯·৩১৯৩	৯·৩১৯৩
·১০	৮	১০
৯৩·১৯৩	৭৪·৫৫৪৪	৩·৩১·১৯৩
		৩১·০৬৪

গুরুদেব। এখানে বিয়োগ হবে না। দক্ষিণ গোলার্দ্ধস্থিত দেশে মকরাদি ছয় রাশি তুলাদি ছয় রাশি অপেক্ষা দূরে অবস্থিত, এজন্য ঐ গুলির উদয়কাল বর্দ্ধিত হ'বে সুতরাং বিয়োগের পরিবর্ত্তে যোগ করতে হ'বে আর তুলাদিতে যোগের পরিবর্ত্তে বিয়োগ কত্তে হ'বে।

আমি। তাই কর্‌চি—

৩৭।৫০ দ অক্ষাংশাদি সন্নিহিত দেশের লগ্নখণ্ডা।

রাশি	লঙ্কোদয় মান	± চর	= প্রাচীন মান পল	মেষারম্ভ হইতে পল	ভোগ্য
১ মেষ	২৭৮	+ ৯৩	= ৩৭১	৩৭১	৩৭১
২ বৃষ	২৯৯	+ ৭৪	= ৩৭৩	৭৪৪	৩৫৪
৩ মিথুন	৩২৩	+ ৩১	= ৩৫৪	১০৯৮	২৯২
৪ কর্কট	৩২৩	− ৩১	= ২৯২	১৩৯০	২২৫
৫ সিংহ	২৯৯	− ৭৪	= ২২৫	১৬১৫	১৮৫
৬ কন্যা	২৭৮	− ৯৩	= ১৮৫	১৮০০	১৮৫
৭ তুলা	২৭৮	− ৯৩	= ১৮৫	১৯৮৫	২২৫
৮ বৃশ্চিক	২৯৯	− ৭৪	= ২২৫	২২১০	২৯২
৯ ধনু	৩২৩	− ৩১	= ২৯২	২৫০২	৩৫৪
১০ মকর	৩২৩	+ ৩১	= ৩৫৪	২৮৫৬	৩৭৩
১১ কুম্ভ	২৯৯	+ ৭৪	= ৩৭৩	৩২২৯	৩৭১
১২ মীন	২৭৮	+ ৯৩	= ৩৭১	৩৬০০	৩৭১

এইবার রবিস্ফুট। কলিকাতা ৮৮।২৩ মেলবোর্ণ ১৪৪।৫৯ উভয়ের অন্তর ৫৬°।২৬′ =(১৫°=১ ঘণ্টা হিসাবে) ৩ ঘ ৪৫ মি ৪৪ সে বা ৩ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট। ২৪ ঘণ্টায় ঐ দিন রবির গতি পেয়েছি ৫৭ কলা—

$$\therefore\ ২৪ : ৩।৪৬ :: ৫৭ : কত?$$

$$= \frac{৩।৪৬ \times ৫৭}{২৪} = ৯।১৩$$

$$\therefore\ ২।১৫।৪৩।৫০ - ৯।১৩$$

$$= ২।১৫।৩৪।৩৭$$

+ অয়নাংশ ২১।৪৭

৩। ৭।২২

নিরক্ষ বৃত্তে অবস্থিত; তথায় ও তাহার দক্ষিণে যা'রা বাস করে তা'রা উত্তরমুখ' হ'য়ে রাশি চক্র দর্শন ক'রে ব'লে, মেষের দক্ষিণে বৃষ ইত্যাদি দেখে ও রাশিচক্রেও সেই রূপ লেখে। দাক্ষিণাত্যের জ্যোতিষীরা সেই পন্থা অবলম্বন করেন ব'লে এইরূপ রাশিচক্র লিখে:—

মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট
মীন			সিংহ
কুম্ভ			কন্যা
মকর	ধনু	বৃশ্চিক	তুলা

সুতরাং এদেশের জন্য—

ম	শু চ শ	র	বু
রা	জন্মকুণ্ডলী। মেলবোর্ণ। অক্ষ ৩৭।৫০ দ দেশান্তর ১৪৫।৩ পূ সন ১৩২০ সাল ১৭ই আষাঢ় সময় ২টা ৩০ মি অপরাহ্ন		
×			কে
/	বৃ	লং	×

এইরূপ রাশিচক্র হ'বে। আমাদের দেশের মত ক'রে আঁকা হ'বে না।

পাত্রাণাঞ্চমসানাঞ্চ বারিণা শুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ৬ ॥
তাম্রায়ঃকাংস্যরৈত্যানাং ত্রপুষঃ সীসকস্য চ ।
শৌচং যথার্থং কর্ত্তব্যং ক্ষারাম্লোদকবারিণা ॥ ৭ ॥
তথায়সানাং তোয়েন গ্রাব্ণঃ সঙ্ঘর্ষণেন চ ।
সস্নেহানাঞ্চ ভাণ্ডানাং শুদ্ধিরুষ্ণেন বারিণা ॥ ৮ ॥
শূর্পধান্যাজিনানাঞ্চ মুষলোলূখলস্য চ ।
সংহতানাঞ্চ বস্ত্রাণাং প্রোক্ষণাৎ সঞ্চয়স্য চ ॥ ৯ ॥
বল্কলানামশেষাণামম্বুম্বচ্ছৌচমিষ্যতে ।
তৃণকাষ্ঠৌষধীনাঞ্চ প্রোক্ষণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ১০ ॥
আবিকানাং সমস্তানাং কেশানাঞ্চাপি মেধ্যতা ।
সিদ্ধার্থকানাং কল্কেন তিলকল্কেন বা পুনঃ ॥ ১১ ॥
সাম্বুনা তাত ভবতি উপঘাতবতাং সদা ।
তথা কার্পাসিকানাঞ্চ বিশুদ্ধির্জলভস্মনা ॥ ১২ ॥
দারু-দন্তাস্থি-শৃঙ্গাণাং তক্ষণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ।
পুনঃপাকেন ভাণ্ডানাং পার্থিবানাঞ্চ মেধ্যতা ॥ ১৩

চমসাদি পাত্র সব শুদ্ধিযোগ্য হ'লে,
ধৌত করি' লইবেক সুবিমল জলে।
তাম্র কাংস্য রৈত্য ত্রপু সীসক সে আর,
এ সব ধাতুর দ্রব্য করি' ব্যবহার,
শুদ্ধিযোগ্য হ'বে যবে করিয়া যতন.
ক্ষারাম্ল-জলেতে তবে করিবে মর্দ্দন।
লৌহময় দ্রব্য শুধু ধৌত কর জলে,
পাষাণ মর্দ্দন কর সলিল বিমলে,
স্নেহযুক্ত পাত্র যবে শুদ্ধিযোগ্য হয়
উষ্ণ জলে ধৌত তা'রে করিবে নিশ্চয়। ৬-৮
শূর্প, ধান্য, অজিন, মুষল, উলূখল,
সংহত-বসন, শুদ্ধ কর দিয়ে জল।
সর্ব্ববিধ বল্কল শোধিত হয় জলে,
তৃণ, কাষ্ঠ, ঔষধি, সে প্রোক্ষণের ফলে।
মেষরোমজাত বস্ত্রচয় কেশ আর
তিল বা সর্ষপ কল্ক জলে শুদ্ধি তা'র। ৯-১১
কার্পাস নির্ম্মিত দ্রব্য শুদ্ধিযোগ্য হ'লে
শোধন করিবে তাহা ভস্মযুক্ত জলে। ১২।
দারু, দন্ত, অস্থি, শৃঙ্গ করিতে শোধন,
উচিত, জানিও বৎস, করিতে তক্ষণ।
মৃন্ময় পাত্রের শুদ্ধি করিবার তরে
পুনবার দগ্ধ কর অগ্নির ভিতরে। ১৩।

শুচিভৈক্ষ্যং কারুহস্তং পণ্যং যচ্চ প্রসারিতম্।
যোষিন্মুখং বালমুখমাত্মবৃদ্ধমুখং তথা।
রথ্যাগতমবিজ্ঞাতং দাসবর্গাদিনাহৃতম্॥ ১৪॥
বাক্‌প্রশস্তং চিরাতীতমনেকান্তরিতং লঘু।
অতিপ্রভূতং বালঞ্চ বৃদ্ধাতুরবিচেষ্টিতম্॥ ১৫॥
কর্ম্মান্তাঙ্গারশালাশ্চ স্তনন্ধয়সুতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
শুচিন্যশ্চ তথৈবাপঃ স্রবন্ত্যোঽগন্ধবুদ্‌বুদাঃ॥ ১৬॥
ভূমির্বিশুধ্যতে কালাদ্দাহ-মার্জ্জন-গোক্রমৈঃ।
লেপাদুল্লেখনাৎ সেকাদ্বেশ্ম সম্মার্জ্জনার্চ্চনাৎ॥ ১৭॥
কেশকীটাবপন্নে চ গোঘ্রাতে মক্ষিকান্বিতে।
মৃদম্বুভস্মনা তাত প্রোক্ষিতব্যং বিশুদ্ধয়ে॥ ১৮॥
ঔদুম্বরাণামম্লেন ক্ষারেণ ত্রপু-সীসয়োঃ।
ভস্মাম্বুভিশ্চ কাংস্যানাং শুদ্ধিঃ প্লাবো দ্রবস্য চ॥ ১৯

ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আর কারুজীবীকর,
পণ্যদ্রব্য, নারীমুখ শুদ্ধ নিরন্তর।
বাল-মুখ, বৃদ্ধ-মুখ, আত্ম-মুখ আর,
সহজে সতত শুদ্ধ জেন ইহা সার।
রথ্যাগত, অবিজ্ঞাত, ভৃত্যের আহৃত,
বহু পুরাতন কিম্বা বহু অন্তরিত,
অতি লঘু দ্রব্য আর প্রভূত প্রমাণ
বাল বৃদ্ধ আতুরের কর্ম্ম শুদ্ধ জান।
শুদ্ধ বলি' গ্রহণ করিলে শুদ্ধ হয়—
শাস্ত্রের বচন ইথে না কর সংশয়। ১৪-১৫
কর্ম্মশেষে শুদ্ধ সে অঙ্গারশালা হয়,
স্তনন্ধয়সুতানারী শুদ্ধা সুনিশ্চয়;
গন্ধবুদ্‌বুদাদিশূন্য স্রোতস্বিনি-জল,
অতীব সুশুদ্ধ বলি' বলে জ্ঞানীদল। ১৬।

কালান্তর ঘটিলেই ভূমি শুদ্ধ হয়
দাহ সম্মার্জন আর গোক্রমে নিশ্চয়।
লেপনোল্লেখন সেক সম্মার্জন আর
অর্চ্চনায় শুদ্ধ গৃহ, সন্ধ নাহি তা'র। ১৭।
কেশকীটযুক্ত কিম্বা গোঘ্রাত হইলে,
শুদ্ধ করি' ল'বে, আর মক্ষিযুক্ত হ'লে,
মৃত্তিকা সলিল ভস্ম, করিয়া গ্রহণ,
অবশ্য করিবে ইথে শুদ্ধি-সংসাধন। ১৮।
উডুম্বর-বিনির্ম্মিত যত দ্রব্যচয়
অম্লের যোগেতে বৎস সদা শুদ্ধ হয়।
ত্রপু আর সীসক নির্ম্মিত দ্রব্য যত
ক্ষার যোগে শুদ্ধ করি' ল'বে অবিরত।
কাংস্য দ্রব্য শুদ্ধ হয় ভস্ম আর জলে,
দ্রবদ্রব্য শুদ্ধ হয় ঢালিয়া লইলে। ১৯।

অজাশ্বৌ মুখতো মেধ্যৌ ন গোর্বৎসস্য চাননম্ ।
মাতুঃ প্রস্রবণং মেধ্যং শকুনিঃ ফলপাতনে ॥ ২৭ ॥
আসনং শয়নং যানং নাবঃ পথি তৃণানি চ ।
সোমসূর্য্যাংশুপবনৈঃ শুধ্যন্তে তানি পণ্যবৎ ॥ ২৮
রথ্যাবসর্পণ-স্নান-ক্ষুৎপান-স্নানকর্ম্মসু ।
আচামেচ্চ যথান্যায়ং বাসো বিপরিধায় চ ॥ ২৯ ॥
স্পৃষ্টানামপ্যসংসর্গো বিরথ্যাকর্দ্দমাম্ভসাম্ ।
পক্কেষ্টরচিতানাঞ্চ মেধ্যতা বায়ুসঙ্গমাৎ ॥ ৩০ ॥
প্রভূতোপহতাদন্নাদগ্রমুদ্ধৃত্য সন্ত্যজেৎ ।
শেষস্য প্রোক্ষণং কুর্য্যাদাচম্যাদ্ভিস্তথা মৃদা ॥ ৩১ ॥
উপবাসস্ত্রিরাত্রন্তু দুষ্টভক্তাশিনো ভবেৎ ।
অজ্ঞাতে জ্ঞানপূর্ব্বন্তু তদ্দোষোপসমেন তু ॥ ৩২ ॥
উদক্যা শ্ব-শৃগালাদীন্ সূতিকান্ত্যাবসায়িনঃ ।
স্পৃষ্ট্বা স্নায়ীত শৌচার্থং তথৈব মৃতহারিণঃ ॥ ৩৩

ছাগমুখ, অশ্বমুখ শুদ্ধ সুনিশ্চয়,
গোবৎসের মুখ কিন্তু পবিত্র না হয়,
গাভীর পুরীষ মূত্র সুপবিত্র অতি,
পক্ষির পাতিত ফলে শুদ্ধ রাখ মতি। ২৭
আসন, শয়ন, যান, নৌকা, আদি আর
পথেতে পতিত তৃণ, শুদ্ধি হয় তা'র
চন্দ্র আর সূর্য্য রশ্মি করি' পরশন,
আর বায়ুস্পর্শে শুদ্ধ শুন বাছাধন,
পণ্যদ্রব্য সম যে সে এই সমুদয়
সহজেই শুদ্ধ হয় নাহিক সংশয় ।২৮।
পথপর্য্যটন, স্নান, ক্ষুৎ, পান আর
মলমূত্র বিসর্জ্জন অন্তেতে সবার,
গ্রহণ উচিত হয় অপর বসন,
পরেতে করিবে যথাবিধি আচমন ।২৯।
পথ, আর কর্দ্দম, সলিল শুদ্ধ হয়
বায়ুর স্পর্শনে ইহা জানিও নিশ্চয় ।
পক্ক আর ইষ্টকে নির্ম্মিত দ্রব্য যত
বায়ুর স্পর্শনে শুদ্ধ রহিবে সতত ।৩০।
রাশিকৃত অন্ন যদি দোষযুক্ত হয়,
দুষ্ট অংশ ত্যাগ করি' লইবে নিশ্চয়,
অগ্র ত্যাগ করি' শেষে করিবে প্রোক্ষণ
জল আর মৃত্তিকায় করি' আচমন ।৩১।
দুষ্ট অন্ন না জানিয়া করিলে ভোজন
তিন রাত্রি উপবাস শাস্ত্রের লিখন ;
জ্ঞানপূর্ব্ব হেন কার্য্য করিলে নিশ্চয়
শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত করা যোগ্য হয়। ৩২।
রজঃস্বলা নারী আর কুক্কুর শৃগাল
সূতিকা, শববাহক আর সে চণ্ডাল
এ সবারে স্পর্শ যদি করে কোন জন
স্নান করি' শুদ্ধ হ'বে শাস্ত্রের লিখন। ৩৩।

নারং স্পৃষ্ট্বাস্থি সস্নেহং স্নাতঃ শুধ্যতি মানবঃ।
আচম্যৈব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যার্কমীক্ষ্য বা ॥ ৩৪।
ন লঙ্ঘয়েৎ তথৈবাসৃক্‌ষ্ঠীবনোদ্বর্ত্তনানি চ।
নোদ্যানাদৌ বিকালেষু প্রাজ্ঞস্তিষ্ঠেৎ কদাচন ॥ ৩৫
ন চালপেজ্জনদ্বিষ্টাং বীরহীনাং তথা স্ত্রিয়ম্।
গৃহাদুচ্ছিষ্টবিণ্মূত্র-পাদাম্ভাংসি ক্ষিপেদ্বহিঃ ॥ ৩৬ ॥
পঞ্চ পিণ্ডাননুদ্ধৃত্য ন স্নায়াৎ পরবারিণি।
স্নায়ীত দেবখাতেষু গঙ্গা-হ্রদ-সরিৎসু চ ॥ ৩৭ ॥
দেবতা-পিতৃসচ্ছাস্ত্র-যজ্ঞ-মন্ত্রাদিনিন্দকৈঃ।
কৃত্বা তু স্পর্শনালাপং শুধ্যেতার্কাবলোকনাৎ ॥ ৩৮।
অবলোক্য তথোদক্যামন্ত্যজং পতিতং শবম্।
বিধর্ম্মি-সূতিকা-ষণ্ড-বিবস্ত্রান্ত্যাবসায়িনঃ ॥ ৩৯ ॥
সূতনির্যাতকাশ্চৈব পরদাররতাশ্চ যে।
এতদেব হি কর্ত্তব্যং প্রাজ্ঞৈঃ শোধনমাত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

স্নেহযুক্ত নর-অস্থি যদি স্পর্শ করে,
শুদ্ধ হ'বে তবে, স্নান করিবার পরে।
স্নেহশূন্য অস্থিস্পর্শ ঘটিবে যখন
গোস্পর্শ করিবে আর সূর্য্যের দর্শন।
অথবা কেবল যদি করে আচমন
বিষ্ণু স্মরি' শুদ্ধ হ'বে শাস্ত্রের লিখন। ৩৪।
অসৃক ষ্ঠীবন আর উদ্বর্ত্তন চয়
কোনো দিন কাহারো লঙ্ঘন-যোগ্য নয়।
বিকাল হইলে পরে, জ্ঞানবান জন
উদ্যান আদিতে না রহিবে কদাচন। ৩৫।
নিন্দিতা রমণী আর, অবীরার সনে
আলাপ না করিবেক কভু হেন ক্ষণে।
উচ্ছিষ্ট, পুরীষ, মূত্র, পাদ ধৌত-বারি
গৃহের বাহিরে সদা ত্যজ ত্বরা করি। ৩৬।
পঞ্চ পিণ্ড উদ্ধার না করি' বাহাধন
পরকৃত খাতে স্নান না কর কখন।
দেব-খাতে, আর বহে জাহ্নবী সলিলে
হ্রদে, কি সরিতে স্নান কর অবহেলে। ৩৭।
যেই জন দেব আর পিতৃ নিন্দা করে
সচ্ছাস্ত্র নিন্দয়ে, নিন্দে যজ্ঞে মন্ত্রাক্ষরে।
হেন জন সনে নাহি কর আলাপন
যদি দৈবে ঘটে তার আলাপ স্পর্শন,
তবে আচমন করি সূর্য্যেরে দেখিলে,
শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে অবহেলে। ৩৮।
রজঃস্বলা নারী আর অন্ত্যজ মানব,
পতিত মানব আর সর্ব্ববিধ শব,
বিধর্ম্মী, প্রসূতানারী আর ষণ্ড নর,
বিবস্ত্র, অন্ত্যাবশায়ী, পরস্ত্রীতৎপর,
সূত নির্যাতকে আর করি দরশন,
করিবেন আত্মশুদ্ধি সদা প্রাজ্ঞজন। ৩৯-৪০

অভোজ্যং সূতিকা-ষণ্ড-মার্জ্জারাখু-শ্ব-কুক্কুটান্।
পতিতাবিদ্ধচণ্ডাল-মৃতহারাংশ্চ ধর্ম্মবিৎ ॥ ৪১ ॥
সংস্পৃশ্য শুধ্যতে স্নানাদুদক্যা-গ্রামশূকরৌ।
তদ্বচ্চ সূতিকাশৌচ-দূষিতান্ পুরুষানপি ॥ ৪২ ॥
অতঃপরং শৃণুষ্ব ত্বং স্ত্রীধর্ম্মাননুবিস্তরাৎ ॥ ৪৩ ॥
উডুম্বরে বসেন্নিত্যং ভবানী সর্ব্বদেবতা।
ততঃ সা প্রত্যহং পূজ্যা গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥ ৪৪ ॥
অশূন্যা দেহলী কার্য্যা প্রাতঃকালে বিশেষতঃ।
যস্য শূন্যা ভবেৎ সা তু শূন্যং তস্য কুলং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥
পাদস্যস্পর্শনং তত্র অসংপূজ্য চ লঙ্ঘনম্।
কুর্ব্বন্নরকমাপ্নোতি তস্মাত্তৎ পরিবর্জয়েৎ ॥ ৪৬ ॥
প্রাতঃকালে স্ত্রিয়া কার্য্যং গোময়েনানুলেপনম্।
প্রত্যহং সদনে তস্মান্নৈব দুঃখানি পশ্যতি ॥ ৪৭ ॥
স্পৃশন্তি রশ্ময়ো যস্য গৃহ সম্মার্জ্জনাদৃতে।
ভবন্তি বিমুখাস্তস্য পিতরোদেবমাতরঃ ॥ ৪৮ ॥

অভোজ্য, সূতিকা, ষণ্ড, ইন্দুর, মার্জ্জার,
কুক্কুর, কুক্কুট, সে পতিতাবিদ্ধ আর,
চণ্ডাল, মৃতকহারী করি' পরশন,
স্নানেতে হইবে শুদ্ধ কহে প্রাজ্ঞগণ।
রজঃস্বলা নারী গ্রাম্যশূকর সে আর
সূতিকা-অশৌচ-দুষ্ট-দেহ সে যাহার
এদেরো স্পর্শনে সদ্য দেহাশৌচ হয়
স্নানেতে হইবে শুদ্ধ নাহিক সংশয়। ৪১-৪২
এবে শুন বিস্তারিয়া বলিব তোমায়
নারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম যেবা শাস্ত্রে গায়। ৪৩।
দেহলীতে নিত্য বাস করেন ভবানী
আর যত দেবগণ এই মত জানি;
গন্ধ পুষ্প অক্ষতে পূজিবে নিত্য তাঁ'য়,
মঙ্গল হইবে ইথে সন্দেহ কি তা'য়। ৪৪।
দেহলী অশূন্য কর পরম যতনে—
বিশেষ প্রভাতকালে—রেখো ইহা মনে।
দেহলী হইলে শূন্য কুল শূন্য হয়
শাস্ত্রের বচন এই নাহিক সংশয়। ৪৫।
পূজা না করিয়া তাহে পদের স্পর্শন
কভু না করিবে—না করিবে উল্লঙ্ঘন,
এই বিধি যেই নারী না করে পালন,
নিশ্চয় তাহার ভাগ্যে নরকে গমন। ৪৬।
প্রভাতে ভবনে নিত্য গোময় লেপন,
নারীর প্রধান কার্য্য শুন বাছাধন।
এই কার্য্য প্রতিদিন যেই নারী করে,
না থাকে দুঃখের লেশ তাহার অন্তরে। ৪৭।
গৃহে সম্মার্জ্জনী দান করিবার আগে,
দিনকর প্রকাশ হইয়া পূর্ব্বভাগে

নিশায়াঃ পশ্চিমে যামে ধান্যসংস্করণাদিকম্।
কুরুতে যাতু মোহেন বন্ধ্যা জন্মনি জন্মনি ॥ ৪৯ ॥
সন্ধ্যাকালে তু সংপ্রাপ্তে মার্জ্জনং ন করোতি যা।
ভর্ত্তৃহীনা ভবেৎ সা তু নিঃস্বা জন্মনি জন্মনি ॥ ৫০ ॥
অকৃত-স্বস্তিকাং যা তু কামলিপ্তাঞ্চ মেদিনীম্।
তস্যাঃ স্ত্রিয়া বিনশ্যন্তি বিত্তমায়ুর্যশস্তথা ॥ ৫১ ॥
মার্জ্জনী-চুল্লিকা-ষ্ঠীব-দৃষদশ্চোপলস্তথা।
নাক্রমেদঙ্ঘ্রিণা জাতু পুত্রদারধনক্ষয়াৎ ॥ ৫২ ॥
উলূখলঞ্চ মুষলং তথাচৈব তু ঘর্ষণম্।
পদাক্রমণাৎ পাপী যা প্রাপ্নোত্যন্তমাত্মা গতিং ॥ ৫৩ ॥
ভিন্নাসনং যোগপট্টং তথৈব মৃগচর্ম্ম চ।
কৃষ্ণাবিকং তথা তাত বর্জ্জয়েৎ পুত্রবান্ গৃহী ॥ ৫৪ ॥
দক্ষিণাভিমুখো যস্তু বিদিক্‌সংমুখ এব চ।
কেশান্ সংস্কুরুতে মর্ত্তো ধননাশঞ্চ বন্দতি ॥ ৫৫ ॥
অনূঢ়স্তু ন কুর্ব্বীত ভুক্ত্বা দন্তবিশোধনম্।
পাদুকারোহণঞ্চৈব তিলৈস্তর্পণ সংশ্রয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

যদি নিজ করে গৃহ করেন স্পর্শন,
তবে সেই গৃহ ত্যজি' যত দেবগণ
পিতৃগণ আর যত মাতৃকা নিকর
বিমুখ হইয়া যান, তাহারে সত্বর। ৪৮।
রজনীর শেষ যামে ধান্য সংস্করণ
করে যেই নারী বন্ধ্যা হয় সেই জন।
জন্ম জন্ম বন্ধ্যা রয় কহিনু নিশ্চয়
শাস্ত্রের বচন ইথে না কর সংশয়। ৪৯।
সন্ধ্যাকালে নাহি যেবা করে সম্মার্জন,
জন্ম জন্ম ভর্ত্তৃহীনা নিঃস্বা সেই জন। ৫০।
অকৃত স্বস্তিকা যথা কামলিপ্তা ধরা,
বিত্ত আয়ু বশ হীনা হয় যেই ত্বরা। ৫১।
সম্মার্জ্জনী চুল্লী ষ্ঠীব, দৃষদ, উপল
পদস্পর্শে হরে পুত্র ধন আর বল। ৫২।
উলূখল মুষল [illegible] আর
পদে স্পর্শ করিলে বাড়য়ে পাপ ভার। ৫৩।
ভগ্ন সে আসন, যোগপট্ট, মৃগচর্ম্ম,
কৃষ্ণবর্ণ ছাগ [illegible] গৃহীধর্ম্ম। ৫৪।
বসিয়া দক্ষিণমুখ কিম্বা কোণ মুখে,
কেশের সংস্কার করি না পড়িও দুঃখে।
এইরূপে কর যদি কেশ প্রসাধন,
ধননাশ হবে তার শুন বাছাধন। ৫৫।
ভোজনের পরে নিজ দন্তের শোধন
কভু নাহি করিবেক অনূঢ় যে জন।
কিম্বা পদে না করিবে পাদুকা ধারণ,
তিল সহযোগে নাহি করিতে তর্পণ। ৫৬।

ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্য্যাদর্দ্ধকক্ষোত্তরীয়কম্।
দর্শশ্রাদ্ধং ন কুর্ব্বীত দর্শস্নানং কথঞ্চন ॥ ৫৭ ॥
পাদুকারোহণঞ্চৈব যোগপট্টকমেব চ।
ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্য্যাদ্গয়াশ্রাদ্ধং তথৈব চ ॥ ৫৮ ॥
দীপভাণ্ডময়ীচ্ছায়া বিভীতক-কুরণ্টজা।
বর্জনীয়া সদা পুত্র যদি জীবিতুমিচ্ছসি ॥ ৫৯ ॥
অধোবস্ত্রেণ যো বায়ুং কুরুতে শিরসি দ্বিজঃ।
স্থালেন ধর্ম্মশূর্পাভ্যাং সুকৃতং তস্য নশ্যতি ॥ ৬০ ॥

অলর্ক উবাচ।

ভবত্যা কীর্ত্তিতাভোজ্যা য এতে সূতিকাদয়ঃ।
অমীষাং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতো লক্ষণানিহ ॥ ৬১ ॥

মদালসোবাচ।

ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণস্যেহ যাবরোধত্বমাগতা।
তাবুভৌ সূতিকেত্যুক্তৌ তয়োরন্নং বিগর্হিতম্ ॥ ৬২
ন জুহোত্যুচিতে কালে নাশ্নাতি ন দদাতি চ।
পিতৃদেবার্চ্চনাদ্ধীনং ষণ্ড স পরিগীয়তে ॥ ৬৩ ॥

জীবৎপিতৃক যেবা সে জন কখন,
অর্দ্ধকক্ষউত্তরীয় না করে ধারণ।
দর্শশ্রাদ্ধ না করিবে কিম্বা দর্শস্নান,
পদেতে পাদুকা না ধরিবে মতিমান,
যোগপট্ট ব্যবহার কভু না করিবে,
গয়াশ্রাদ্ধ হেন জন, অবশ্য ত্যজিবে।৫৭-৫৮।
প্রদীপের ছায়া, বিভীতক বৃক্ষ ছায়া,
কুরণ্টক বৃক্ষ ছায়া সদা বর্জ্জনীয়া।
আয়ুঃ শক্তি ক্ষয় হয়, এ সব ছায়ায়
শাস্ত্র বাক্য এই—নাহি সন্দেহ তাহায়। ৫৯
পরিধেয় বস্ত্রে কভু মস্তকে ব্যজন,
নাহি করিবেন, বৎস, ব্রাহ্মণ যে জন;
চর্ম্ম আর শূর্পযোগে করিলে ব্যজন
সকল সুকৃতি নাশ শাস্ত্রের বচন। ৬০।
অলর্ক বলেন, মাগো, জিজ্ঞাসি তোমায়,
সূতিকাদি তত্ত্ব বল বিস্তারি আমায়। ৬১।
মদালসা বলে বৎস, করহ শ্রবণ
অবরোধ গত যেই ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ,
সূতিকা শব্দেতে বাচ্য দুজনে নিশ্চয়,
তাহাদের অন্ন, বৎস, কভু গ্রাহ্য নয়। ৬২।
যথাকালে যেই জন হোম নাহি করে
সময়ে ভোজন দান যেবা পরিহরে।
পিতৃদেবার্চ্চনা হীন হয় যেই জন,
ষণ্ড বলি শাস্ত্রে তারে করেন কীর্ত্তন। ৬৩।